CALCUTTA

চতুর্বিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

একই মানুষকে বহু রূপে যদি দেখতে হয় তাহলে আমার মামাকে দেখতে হবে।

সম্পর্কে মামা, কিন্তু আমাদের দুজনের একই বয়স্থ। একই সঙ্গে পড়েছি, একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি। নাম গুরুপদ। তাকি গুরুমামা বলে।

ছেলেবেলায় এক একদিন ঝগড়া হতো গুরুমামার সঙ্গে। তখন বলতাম গরুমামা।

তা গরুই বলি আর যাই বলি, আমার এই মামাটির জীবন পর্যালোচনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

প্রচুর পয়সা রেখে গেছে বাপ, উপার্জন করবার তাগিদ নেই, তাই সে তার জীবটাকে শুধু তাগিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছে।

খারাপ কাজ কিছু করেনি সে।

একবার আধ্যাত্মিকতা মাথায় ঢুকলো, যেখানে যত ধর্মপুস্তক পাওয়া যায় সব কিনে ফেললে। তারপর তার পড়বার ঘরে নিজেকে বন্দী করে সংসার থেকে নির্বাসিত করে নিলে। সেইখানেই খাওয়া সেইখানেই শোওয়া। দু'জন চাকর রইলো তাকে দেখাশোনা করবার জন্যে।

বৌ থাকলে স্বাধীনতা চলে যাবে তাই সে বিয়েই করলে না।

একদিন বললাম, গুরুমামা, তোর এই এত এত বিষয়-সম্পত্তির কি হবে? কাকে দিয়ে যাবি?

মাথায় তখন তার আধ্যাত্মিকতা ঢুকেছে। হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, দেবার আবার লোকের ভাবনা? কোনও ভাল কাজে দান করে দিয়ে যাব। বিষয় তো বিষ রে! অর্থের সঙ্গে অনর্থ এসে জোটে তা জানিস তো। রামকৃষ্ণদেব কি বলেছেন? কামিনী আর কাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে জীবনে সুখ পাওয়া যায় না।

এ সময় তার সঙ্গে কথা বলা বৃথা। দেখলাম সেখান থেকে পালিয়ে না গেলে তার বক্তৃতা থামবে না। তাই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

বিষয়-সম্পত্তি সে যার অবশ্য কাউকে করেনি। তবে গরীব দুঃখী তার কাছে এসে বঞ্চিত কেউ কোনদিন হয়নি। যে দিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে তাকেই কিছু-না-কিছু দিয়েছে।

প্রায়ই ভাবতাম—আমার এই গুরুমামাটি শেষে পাগল না হয়ে যায়!

তা পাগল সে কিছুদিনের জন্যে হয়েছিল। তখন তার যৌবনকাল। ভারতবর্ষ তখন বৃটিশের অধীনে। প্রথমে দেখলাম খুব ভাল চিঠির কাগজের ওপর 'এমবস্' করে নিজের নাম-ঠিকানা ছাপালে। ওঁকপদ গাঙ্গুলী হলো G-G। চিঠির কাগজের কোণে G-G, খামের ওপর মনোগ্রাম—G-G। এমনকি জামায়, কাপড়ে, ঘরের দরজায়, সর্বত্রই 'জি-জি'র ছড়াছড়ি।

তারপর পোষ্টাপিস থেকে একগাদা টিকিট কিনে এনে ক্রমাগত চিঠি লিখতে লাগলো। ভাইসরয়কে চিঠি লিখছে, ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখছে, এস-ডি-ওকে লিখছে—মোটকথা ইংরেজ হলেই হলো।

গুরুমামা ইংরেজি ভালই লিখতো। এই চিঠি লিখবার জন্যে খুব ভাল একটি টাইপরাইটার মেসিন কিনলে, একজন টাইপিষ্ট রাখবার জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, কিন্তু গাধা গাধা টাইপিষ্ট যখন তার ঘোরে এসে 'কিউ' দিলে, ঘোরের সামনে বড় বড় লাইন পড়তে লাগলো, তখন একদিন ঘোর বন্ধ করে দিয়ে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলে—No vacancy.

জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, লোক পেলি?

মামা হলে কি হবে, সে আমার সমবয়সী বন্ধুর মত। 'তুই' বলতাম তাকে। সেও আমাকে 'তুই' বলতো। বললে, 'না, টাইপিষ্ট রাখবো না। এ-সব আমার খুব 'কনফিডেন্সিয়াল (গোপনীয়) চিঠি। নিজেই যেমন পারি—টাইপ করবো।

তারপর চললো তার টুক্ টুক্ করে দিবারাত্রি টাইপরাইটারের ওপর আঙুলের কসরৎ। এ, বি, সি, ডি, খুঁজে খুঁজে এক আঙুলে টাইপ করে। এক অক্ষরের জায়গায় আর-এক অক্ষর পড়ে যায়। তখন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কাগজটা। মেসিনে আবার নতুন কাগজ পরিয়ে নতুন করে লিখতে বসে।

ছেঁড়া কাগজের স্তূপ জমে ওঠে। সারাদিনে হয়ত একখানি চিঠি শেষ হয়।

কিছুতেই ভেবে না তবু আমি একদিন তার একখানি চিঠি দেখেছিলাম। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। বাংলায় তর্জমা করলে তার মানে দাঁড়ায়—

'দোহাই তোমাদের, আমাদের দেশ শাসন করতে এসেছ শাসন কর, কিন্তু তার বেশি কিছু করবার চেষ্টা কোরো না। তোমাদের পোষাক পরিয়ে তোমাদের খানা খাইয়ে মডার্ন করিয়ে আমাদের সাহেব সাজিয়োনা। আমরা আমাদের মা-বাপ ভাইবোন নিয়ে যেমন সংসার পাতিয়েছি তেমনি সংসারে আমাদের থাকতে দাও। স্বাধীনতার নামে সে সংসার ভেঙে দিয়ে আমাদের ছত্রছাড়া করে দিও না। মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, চণ্ডী, কবি আর যাত্রাগান, দেবদেবী আর মাটির প্রতিমা নিয়ে আমরা যেমন অসভ্য আছি তেমনি অসভ্য থাকতে চাই। আমাদের সুসভ্য ইংরেজ করবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে আমরা ইংরাজও হতে পারবো না—বাঙালীও থাকবো না। শেষে একটা বর্ণসঙ্কর জাতিতে পরিণত হয়ে তোমাদেরই গালাগালি দেবো। দোহাই তোমাদের, সে অভিশাপ তোমরা কুড়িয়ো না।'

এমনি-সব আজগুবি কথায়-ভরা বড় বড় চিঠি।

বললাম, এ-সব পাগলামী ছেড়ে দে মামা, অন্য কাজ কর্।

গুরু-মামা তখন বোধকরি চিঠি লিখে লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। টাইপ করে করে আঙুলে তার ব্যথা ধরেছিল। তাই বলেছিল, কি করি বল্ দেখি ?

কি করবে বলতে পারিনি।

বললে সে আমার কথা শুনতোও না।

অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা করিনি। পেটের ধাঁধায় অনেকদূরে চলে গিয়েছিলাম।

ফিরে যখন এলাম, মামার বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দেখলাম, মামা বসে বসে কি যেন লিখছে। চারিদিকে নানারকমের খাতা আর বই। নানারকমের কলম আর কালি।

আমাকে দেখে খুব খুশী হলো মামা। হেসে বললে, আয়। তোকেই খুঁজছিলাম। কোথায় ছিলি এতদিন ?

বললাম, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

মামা বললে, আমার কাছেই থাক্‌না। তোর খাওয়া-পরার ভাবনা ভাবতে হবে না।

বললাম, না মামা, তোর কাছে থাকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কি করছিস আজকাল ? এখনও কি চিঠি লিখছিস নাকি ?

মামা বললে, না, চিঠি লেখা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। এই ভাখ কত বই লিখেছি।

—বই ?

—হ্যাঁ, গল্প, উপন্যাস আর গান লিখেছি।

বলেই ভাঁই-করা একগাদা বাঁধানো খাতা বেরিয়ে দিলে। বললে, এখন কবিতা লিখছি।

কবিতা ?

মামা বললে, হ্যাঁ এইটেই সোজা। গল্প-উপন্যাসগুলো কেউ ছাপতে চাইলে না। কবিতাগুলো কিন্তু পটাপট ছাপানো হচ্ছে। এই ভাখ আজকাল প্রায় সব কাগজেই আমার কবিতা ছাপা হয়।

তারপর দুঃখু করে বললে, শোনাবার লোক পাই না রে। কেউ শুনতে চায়না। চা সন্দেশ খেতেদিই। খেয়ে দেয়ে উঠে পালায়। আজ আর আমি তোকে ছাড়ছি না।

এই বলে আমাকে শোনাবার জন্যে একখানা খাতা খুলে মামা বললে, শোন্ !

বললাম, থাম্। আগে চা খাই। দুটো কথা বলি। তারপর শুনবো।

চা আর খাবার আনতে গেল শুকদেও আর গুরুমামা আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে।

—তা কোথায় কোথায় ঘুরলি ?

বললাম, বলতে গেলে একরকম সারা ভারতবর্ষটাই ঘোরা হয়ে গেল আমার।

কথাটা শুনে গুরুমামার মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, ভাখ, আমার ইচ্ছে ছিল সারা পৃথিবীটা ঘুরবো। আমার টাকা ছিল, তোকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হতো। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন সব-কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন আর ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় নেই। —যাক্‌গে, রাজনীতির কচকচি এসে যাবে। ওই নে, চা এসে গেছে। খা।

চা খেতে খেতে গুরুমামা আবার বললে, ভাখ, দু'দুটো যুগ আমাদের চোখের সুমুখ দিয়ে কেমন করে পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। স্বাধীনতা পাবার আগের একটা যুগ, আর স্বাধীনতা পাবার পরের একটা যুগ।

বললাম, আবার তুই সেই রাজনীতি আরম্ভ করলি গুরুমামা। যুগের কথা শুনলে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। যে যুগে এখন আমরা চলছি এটা স্বাধীনতা পাবার একুশ বছর পরের যুগ। অথচ চারিদিকে চেয়ে ভাখ—মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। দিনদিন তা যেন বেড়েই চলেছে। —নে, তুই কবিতা শোনাবি বলছিলি শোনা।

গুরুমামা একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে বললে, শোন্!

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ছাপা কবিতা?

মামা বললে, হ্যাঁরে, আমার নামে ছাপা হয়েছে। এইরকম কত কবিতা ছাপা হয়ে গেল।

এই বলে মামা পড়তে আরম্ভ করলে—

আমার অপ্রতিগ্রাহ্য, অভিশপ্ত প্রতিভার বিড়ম্বনা মাঝে
ধূসরিত ধূমায়িত হেমন্তের রসন্থ প্রান্তর
নির্ব্বাণ লভিল যেথা নিষ্কারণ অতৃপ্তি যন্ত্রণা
কলুষ কালিমা শুধু রেখে গেল নিঃসঙ্গ আশ্বাস।

গুরুমামাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, থাম্, আর পড়তে হবে না।

মামা বললে, কেন?

বললাম, সহ্য করতে পারছিনা। এর কোনও মানে হয় না।

মামা আর-একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে বললে, তাহলে এইটে শোন্। বলেই পড়তে লাগলো—

ইঁদুরের ছানা আর ধূর নীলিমার সমুদ্রের চূড়া
গর্জ্জন করে চলেছে দুপুরের দাঁড়কাক—মাটির কান্নার লাগি।
শিকল-ছেঁড়া কুরুক্ষেত্র আর ওতপ্রোত অদৃশ্যতা নীল-নীল
হাওয়ায় মিশেছে সর্ব্বঙ্গনীন পরিভাষা।

বললাম, না মামা, এটাও তাই। এরও কোনও মানে হয় না।

দেখলাম, গুরুমামা মুখ টিপে টিপে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে।

—হাসছো যে?

গুরুমামা তার কোনও জবাব না দিয়ে বললে, প্রথমে যে কবিতাটা পড়লাম তার প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলি ভাখ, লেখা আছে 'আধুনিক।' এইগুলোই হলো আধুনিক যুগের কবিতা আধুনিক যুগের মানুষগুলিও হয়েছে এমনি। এগুলোও যেমন দেখতেও কবিতার মত শুনতেও কবিতার মত অথচ কবিত্ব কোথাও নেই, মানুষগুলিও হয়েছে তাই। দেখতে মানুষের মত, আগেকার যুগের মানুষের চেয়েও হয়ত বা পরিচ্ছন্ন, হয়ত বা মার্জিত, কিন্তু মনুষ্যত্বটুকু অনুপস্থিত। কোথায় আমরা চলেছি ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই বসে বসে এই সব লিখে সময় কাটাচ্ছি আর মনে মনে হাসছি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জয়যাত্রার পথে

এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তেইশ বৎসর পূর্বে বাঙালীর সমস্তাবহুল জীবনের সন্ধিক্ষণে 'গল্প-ভারতী' আত্মপ্রকাশ করে। জাতির মানসিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বিপন্ন-লগ্নে 'গল্প-ভারতী' জাতির নব জাগরণের এক মহৎ আদর্শ তার প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে। জাতির উন্নয়নের কাজে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সাহিত্য। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'গল্প-ভারতী' বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে এক নতুন সঞ্জীবনী-সুর ধ্বনিত করে তুলেছে এবং জাতির অন্তরের চাহিদা মেটাবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

গল্প-ভারতীর পরম সৌভাগ্য যে বাংলার প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তানায়ক এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যরথীই 'গল্প-ভারতী'কে তাঁদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতির দ্বারা সমৃদ্ধ করে আসছেন এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই আজ 'গল্প-ভারতী' বাংলার মানসিক জগতে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে ও সাহিত্য-জগতে এক গৌরবময় নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সাহিত্য-সাধনার ব্রতে আমরা আপনাদের প্রত্যেকের একান্ত সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

গল্প-ভারতীর ঐতিহ্য, আদর্শ এবং তার সাহিত্যসেবা সম্পর্কে দেশব্যাপী ও দেশের বাইরে অগণিত গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকার কাছে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা জানাচ্ছি যে গল্প-ভারতীর প্রতিটি সংখ্যা নামী লেখকদের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ছাড়াও চমকপ্রদ অসাধারণ ও অভিনব রচনায় সমুজ্জ্বল হবে। গল্প-ভারতীর নিয়মিত বিভাগগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা আমরা পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকেই অবগত হয়েছি। সেইসব বিভাগগুলি যাতে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয় তারও আয়োজন চলেছে প্রতি দিন।

পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বজনপ্রিয়, আরও সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য আমরা সর্বদাই যত্নবান থাকব এবং এই সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার অভিমত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করব।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা-মাসিক সাহিত্য পত্রিকারূপে গল্প-ভারতী দেশবাসীর সামনে যে আদর্শ স্থাপন করেছে, যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, যে অভূতপূর্ব খ্যাতি লাভ করেছে, তা সমস্তই সম্ভব হয়েছে লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, পৃষ্ঠপোষকগণ ও অনুরাগীদের বিশেষ আনুকূল্যে। আমরা বিশ্বাস করি জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত গল্প-ভারতী তাঁদের কাছ থেকে আগামীদিনে অনেক অধিক পরিমাণে সেই সহায়তা ও সহৃদয়তা লাভ করবে।

পরলোকে শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

গল্প-ভারতীর অন্যতম পরিচালক ও আজন্ম বন্ধু শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্যের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।

গত ২৬শে আষাঢ় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ৯সি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতার বাসভবনে তাঁর নরদেহের অবসান ঘটে। এই নিদারুণ সংবাদ শোনামাত্রই গল্প-ভারতীর কার্যালয় বন্ধ হয়ে যায়; এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের উদ্দেশে আন্তরিক সমবেদনা জানান হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন-স্বরূপ শবাধারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

স্বর্গীয় তারাপদ ভট্টাচার্য ১৩১১ সালের ২৪শে পৌষ, ৩৪নং সুরি লেন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাসস্থান খড়দহে (২৪ পরগণা) তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। সেখান থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার পর সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করতে সুরু করেন। এই সময় থেকে কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ২৪ বৎসর পূর্বে যখন গল্প-ভারতীর জন্ম হয়,তখন তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তার পর থেকে এই সুদীর্ঘ দিন তিনি গল্প-ভারতীর উন্নতিকল্পে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করে গিয়েছেন।

মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা পার্শ্বে তাঁর পত্নী, দুইপুত্র, পুত্রবধূ, একমাত্র দৌহিত্র, বহু আত্মীয় ও সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন।

আমরা তাঁর অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ধর্ম্ম মহাসভার পথে স্বামিজী

চিকাগো রেল স্টেশনে নেমেই সন্ন্যাসী দিশাহারা হয়ে পড়লেন। তাইতো কোথায় যাবেন তিনি! কার বাড়িতে উঠবেন—কি তার ঠিকানা! বিরাট সহর এই চিকাগো, এখানে কে কার খোঁজ রাখে! তাছাড়া এখানে তিনি একেবারে নতুন; এ সহরের কিছুই জানেন না, কেউ তাঁকে চেনে না, তিনিও কাউকে চেনেন না। বিপদের ওপর বিপদ—রাতও হয়ে গেছে।

কাউকে কি বুঝিয়ে বলা যায় না তাঁর অসহায় অবস্থা! কেউ কি বুঝবে না তাঁর কষ্ট! ইংরেজীতে দু'একজনকে বললেন তাঁর বিপদের কথা। কিন্তু কে কার কথা বোঝে, চিকাগো রেলস্টেশনের কাছে যে সব জার্মানদের বাস, তারা না বোঝে সন্ন্যাসীর কথা, সন্ন্যাসী না বোঝেন তাদের কথা। তার ওপর কালো মনে করে তাঁকে কেউ গ্রাহ্যই করছে না, একটা হোটেলের রাস্তা পর্যন্ত কেউ দেখিয়ে দিচ্ছে না।

মহা ফাঁপরে পড়লেন সন্ন্যাসী।

সঙ্গে খাবার নেই, কাছে আশ্রয় নেই, নূতন দেশ, শ্রান্ত ক্লান্ত সন্ন্যাসী নিরাশ হয়ে তাকালেন চতুর্দিকে।

ঐ যে স্টেশন ইয়ার্ডে কি একটা পড়ে আছে না! মালগাড়ি রাখবার জায়গায় একটা বড় বাক্স! না তাই তো।

এর মধ্যে কি মানুষ থাকতে পারে!

আর অত চিন্তার সময় নেই, সেইখানেই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী, এখন ভগবান যা করেন।

কোন রকমে রাতটুকু কাটল। সকাল হতেই আবার সেই চিন্তা—কোথায় যাবেন—কি খাবেন!

খিদে পেয়েছে, তীব্র খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী, অজানা রাস্তার ধারে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করতে লাগলেন। এছাড়া আর কি উপায় আছে! আজও একবার করবে। সবাই প্রত্যাখ্যান করল তাঁকে। অনেকে অপমান করল। কেউ কেউ তাঁকে বিদ্রূপ করলে, টিটকারি ও লাঞ্ছনার শেষ নেই। তবু হেঁটে চলেছেন সন্ন্যাসী আর বলছেন, ভিক্ষে না দাও তো পথটা দেখিয়ে দাও।

কেউ কান দিচ্ছে না।

তবুও ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে অজানা ভাগ্যের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী চলেছেন।

চলতে চলতে কখন যে ভিয়ারবর্ণ এভেনিউতে এসে পড়েছেন খেয়াল নেই।

পা আর চলতে চায় না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে পড়ছে।

দরজায় দরজায় করাঘাত করে চলেছেন—যদি যা আজ মেলে!

শক্তি যেন ফুরিয়ে এসেছে।

রাস্তার ধারে বসে পড়লেন সন্ন্যাসী—ঠিক ৫৩১ নম্বর বাড়ির বিপরীত দিকে।

চতুর্দিকে নিরাশার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে—না—আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে একজন মহিলা নেমে এলেন, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তিনি তাও জেনে নিলেন। তারপর মহিলাটি তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন।

অবশেষে সন্ন্যাসী আশ্রয় পেলেন, পেলেন ধর্মমহাসভার অফিসের ঠিকানা।

ঐ ঠিকানা লেখা পরিচয় পত্রটি হারিয়ে যাওয়ায় ঘোর বিপদে পড়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, আর সেই সময়ে তাঁকে পরম সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন মিস্টার জর্জ ডব্লু হেল নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী মিসেস্ হেল।

তিন তলা বাড়ি। বাড়ির স্থাপত্য শিল্প প্রাচীন। একটি মহামূল্যবান স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সে। আমাদের কাছে সে এক অবিস্মরণীয় তীর্থ।

কতটা যত্ন ও শ্রমশীলতার সঙ্গে হেউডর মশায় তথ্য সংগ্রহ ক'রে বইখানাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং পাঠক-পাঠিকার তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভারতে বৃটিশ প্রভু শ্রেণীর শাসনের নামে শোষণের বিরুদ্ধে! ভারতীয় রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় (ইণ্ডিয়ান্ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলে) তৎকালীন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রখ্যাতনামা লোকনায়ক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তাঁর ভাষণে তথ্যাদি সহযোগে প্রমাণ করে দেন শাসনের নামে ভারতবাসীকে কিরূপ কৌশলে তলেতলে শোষণ করা হচ্ছে। তিনি এটাও দেখিয়ে দেন যে—বিদেশী শাসকশ্রেণী কখনো কখনো নিজেদের মতন নয়-ভাবে চালিয়েছেন শোষণ। তাঁর ভাষণের শোষকতায় তিনি যে সমূহ নির্ভীক প্রতিকূল মন্তব্য উদ্ধার ক'রে শোষণ-নীতির নগ্নতা প্রকটিত ক'রে দিয়েছেন, তা কস্মিন কালেও ভুলবার নয়। স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের (আই-সি এস) 'Economic History of British India' হতেও উদ্ধৃতি দিয়ে শোষণ-নীতির নগ্নতা প্রকট করেছেন।

ভারতের তৎকালীন রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীগোখলে মধ্যপন্থী (মডারেট) নেতা ব'লে সুবিদিত হলেও নির্ভীক অখণ্ডনীয় যুক্তি ও তথ্য-সমৃদ্ধ ভাষণের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ওই মহারাষ্ট্রীয় মডারেট নীতারের ভাষণ বিশদ ভাবে উদ্ধৃত ক'রে হেউডর মশায় সরকারী শোষণ-নীতির উপর হানলেন তীক্ষ্ণ বাণ। শ্রীগোখলের ভাষণ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কারমাইকেলও বিচলিত করত।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'দেশের কথা' গ্রন্থখানির কয়েক সংস্করণে বিক্রয় হল বিশ-পঁচিশ হাজার কপি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হলেও মূল্য বাড়ানো হয় নাই। এরই মধ্যে প্রেস আইন পাশ হল এবং দমন ও দলন নীতির ষ্টীম রোলার চালানো হল বাংলার বুকের উপর দিয়ে বেপরোয়া ভাবে। কিন্তু রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করার পথ ছিল না ব'লেই নগ্ন প্রেস আইনে বাজেয়াপ্ত করা হ'ল গ্রন্থখানাকে।

'দেশের কথা' হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন গ্রন্থকারের ভাগিনেয় বাবুরাও বিষ্ণু পড়াসকর,—যিনি হিন্দী সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুনাম পেয়েছিলেন সুলেখক ব'লে এবং যিনি বারাণসী ধাম থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত হিন্দী দৈনিক 'আজ' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে দীর্ঘকাল। হিন্দী অনুবাদও একাধিক সংস্করণ হয়েছিল এবং তাও বাজেয়াপ্ত করলেন বিদেশী সরকার ওই আইনের বলে।

হেউডর মশায় কলকাতা হাইকোর্টে সরকারী বাজেয়াপ্তের আদেশের বিরুদ্ধে মামলা রায়ের করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মামলা নিষ্পত্তি হবার আগেই তিনি লোকান্তরিত হলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে। বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ সখারাম গণেশ হেউডর মশায়কে অভিহিত করেছেন 'মারাঠী-বেঙ্গলী' ব'লে। তিনি ছিলেন দেওঘরের স্থায়ী বাসীন্দা। বৈদ্যনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হতে তিনি উত্তীর্ণ হন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ওই বিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। স্থানীয় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে তিনি সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় পত্র পাঠান। তা প্রকাশিত হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তৎকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক 'দি বেঙ্গলী' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'হিতবাদী' একই অফিস থেকে প্রকাশিত হত। সখারাম বাবু 'হিতবাদী' পত্রিকায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে প্রুফ রীডারের কার্যে নিযুক্ত হলেন। কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পরে প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে মাসিক একশত দশ টাকা বেতন পেতেন।

তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুগামী ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের পরে 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁকে তিলকের প্রতিকূল সমালোচনা ক'রে লিখতে বলা হয়। তিনি অসম্মতি

জ্ঞাপন ক'রে সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ (উত্তর কালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) পরিচালিত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে তিনি বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ওই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডে তিনি ছিলেন 'রাজা' সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের মনোনীত সদস্য।

হেডস্তর মশায় ভারতের বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। দুই কন্যার মধ্যে একটি বিধবা কন্যা জীবিত আছেন, তিনি কলকাতায়ই বাস করছেন। পূর্ববঙ্গের একজন রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষিত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সমর্থন ক'রে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী সি. আই. ই. উপাধি পান। ওই সংবাদ শুনে হেডস্তর মশায় এতটা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলেন যে সেদিন আর কলেজের ক্লাসে পড়ালেন না। তিনি মন্তব্য করলেন—সাহিত্যিক জনমতের বিরোধিতা করেছেন ব'লে আমি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছি।

সখারামের প্রবন্ধাবলী বাংলার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে প্রকাশিত হত। 'দেশের কথা' ব্যতীত তাঁর লেখা আরও কয়েকখানা গ্রন্থ বের হয়েছিল, যথা- 'ফ্রান্সিস্ রানাডে,' 'তিলকের মোকদ্দমা', 'হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' শিবাজী সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি মারাঠী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি ও পুরাতন কাগজপত্র হতে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেন নাই।

অথচ বঙ্গে শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল প্রধানতঃ হেডস্তর মশায়ের চেষ্টায়। প্রথমে কলকাতা মহানগরীতে ওই বীর পূজার অনুষ্ঠান হয় সমারোহের সঙ্গে। লর্ড কারজনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' ও স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সাতই আগস্ট মোতাবেক ১৩১২ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ। সখারাম বাবুর অনুরোধে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর 'শিবাজি-উৎসব' নামক একটি অনবদ্য কবিতা রচনা ক'রে পাঠালেন শিলাইদি থেকে ১৯১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। সেইটি উৎসব-সভায় পঠিত হয়েছিল এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কতকাংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
আজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের ধন।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সফল।
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।
আজি এ সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
এক সঙ্গে করুক ভোগ একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

সখারাম সাধারণতঃ পোষাক পরতেন। পরনে ধুতি, গায়ে ফুল হাতা সার্ট, পায়ে নাগরাই জুতা। তাঁর শিরোদেশে শোভা পেত ঝোটা শিখা। এক দিন এক ঙন বাঙালী বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিলেন—সখারাম বাবু, আপনার নাগরাই জুতার টিকির সঙ্গে মাথার টিকির সামঞ্জস্য দেখবার মতো। শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললেন—ব্রাহ্মণের টিকির সঙ্গে পায়ের জুতার টিকির তুলনা হিন্দু ভদ্র লোকের পক্ষে নিন্দনীয়। তবে আপনি বহু দিনের বন্ধু ব'লে রেহাই পেয়ে গেলেন। নইলে কী জানেন, জুতার এক পাটি আপনার গালে লাগত। বন্ধুটি বুঝতে পারলেন কী অন্যায় ও অশোভন মন্তব্য তিনি করেছেন এবং সেজন্য ক্ষমা চাইলেন করজোড়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে। উদার-চরিত বন্ধু-বৎসল সখারাম হাসি-মুখে বললেন—ওই রকম বলতে হয় না।

হেরম্বর মহাশয়ের জন্ম বৈদ্যনাথ ধামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা সদাশিব মহেশ হেরম্বর ছিলেন ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে ভূষিত। সখারাম বাংলা দেশকে তাঁর জন্মভূমি ব'লে গণ্য করতেন এবং বাংলা ও বাঙালীর হিত-সাধনে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বৈদ্যনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বৎসর তিনেক পরে তিনি ওই বিদ্যায়তনের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। স্থানীয় মহকুমা হাকিমের বিরুদ্ধে একখানা পত্র প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তজ্জন্য ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়। তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং 'হিতবাদী' পত্রিকায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকতার বৃত্তি অবলম্বন করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই জাপান থেকে ফিরবার পথে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যু হলে সখারাম বাবু সেই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন; এবং কৃতিত্বের সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেন। বৈদ্যনাথ ধামে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

মেয়ে মজলিশ

আমাদের সমস্যা

বেলা দে

মেয়েদের সমস্যা কি ভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা ভাবলে আঁৎকে উঠতে হয়!

সমস্যা অনন্ত। যত দিন যাচ্ছে ততই সমস্যা বাড়ছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাই আজকের সমস্যা বেড়েই চলেছে। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অনেক সময় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে তার সামগ্রিক সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু এই ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যায় সকলেই ক্লিষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ছেড়ে দিলেও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আজকের বিশেষ সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ এ সমস্যা শুধু ব্যক্তিগত নয় এ সমস্যা আজ জাতির জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন আজকের মেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এটা যেমন গৌরবময় দিক তেমনি আবার এর বিপরীত দিকও আছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সেটা লজ্জার, ঘৃণার এবং কলঙ্কের। জীবনের সেই অন্ধকার দিকটা অপরাধের আগাছায় পরিপূর্ণ। এই অপরাধপ্রবণতা যেন আজকের নারী সমাজের একটা অংশের মধ্যে উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এমন কোনো অপরাধ নেই যা এঁদের মধ্যে দেখা যায় না। সমগ্র নারী জাতির গৌরবময় ইতিহাস কয়েকজনার অবাঞ্ছিত পদক্ষেপে আজ কলঙ্কিত। কিন্তু সমাজের এই অভিশাপকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। মনে হয় এই ধরণের মনোভাব কিছুটা এসেছে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে। এমনি একখানি চিঠির উল্লেখ করছি এখানে, তা থেকেই সমাজ ভাঙ্গাগড়ার একটা চিত্র দেখতে পাবেন—

প্রিয় মেরী গ্রাণ্ট—

আমি একটী স্কুলের ছাত্রী, আমার বয়স চৌদ্দ। আমি বন্ধুদের মধ্যে খুবই প্রিয় ছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝছি তারা পাকামিতে আমাকে অনেক পিছনে রেখে এগিয়ে গেছে। ওদের এই বড় হয়ে যাওয়ার কথাটা আমি শারীরিক দিক থেকে মোটেই বলছি না—সম্পূর্ণই মৌন ব্যাপার। তারা দিনরাত শুধু তাদের ছেলে বন্ধুদের কথা নিয়ে আলোচনা করছে। কে কার সঙ্গে কি ভাবে মিশছে, কতদূর এগিয়েছে এই সব। আমার এ ধরণের কথা বড় একঘেঁয়ে আর বিশ্রী লাগে। আমার কোনো ছেলে বন্ধু নেই। তাই আমাকে তারা দলছাড়া করে দিয়েছে।

আমি মাত্র যে কয়টী ছেলেকে চিনি তারা আমার ভাইয়ের মতো। আর তাদের সঙ্গে আমি এইভাবে চলতেই ভালবাসি। আমি কোনদিন কোনো ছেলেবন্ধুর সঙ্গে তারিখ ঠিক করে তাদের কাছে যাই নি। কিন্তু আমার মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে কুমারীত্ব হারিয়ে বসেছে। আমার সত্যি এরকম ছেলেবন্ধু ভাল লাগে না। আমি ভাবি, আমি যদি এই চৌদ্দ বছর বয়সে একটী ছেলের সঙ্গ পছন্দ করি তাহলে আমার চব্বিশ বছর বয়সে আর ভাল লাগার মতো কি থাকবে? আমি এ বিষয়ে কারুর কাছে

উপদেশ নিতে যাচ্ছি শুনলে আমার, মা বাবা দুঃখিত হবেন। তাই মনে করছি, বরং এ প্রশ্নটা আমাদের প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরলে কেমন হয় কিন্তু আমার মাকে কি করে বলব? ইতি—

তাহলে দেখা যাচ্ছে আজকের ছেলেমেয়েদের মনে এমন কথা জাগে না যে এটা আমার করা উচিত কি না! তাদের কথা হলো কেন এমনটা করব না? বিগত কয়েক বছরের মধ্যে নীতিবোধের মূলে এত বড় রকমের একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যেখানে 'কেন এমনটা করব না' এর কি জবাব আপনি দেবেন? বিষয়টা এতদূর গুরুত্বপূর্ণ, যে এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা এবং আলোচনার প্রয়োজন। সভ্য জগতের গৌরব হলো যেখানে রীতি এবং নীতি দুইই মেনে চলা যায়। এ না হলে সমাজের ভিত্তি কোনদিন গড়ে উঠবে না। তাই আবার বলছি এ প্রসঙ্গে গল্পভারতী পত্রিকার যে বিভাগটী নতুন খোলা হয়েছে সেখানে আলোচনা ও মতামত আদানপ্রদানের একটী ক্ষেত্র থাকবে। পাঠক পাঠিকার মতামত আহ্বান করছি। ইতি—

নতুনদি

এ তো গেল একটী বিদেশী মেয়ের চিঠি কিন্তু সমস্যা কি শুধু ওদেশেই আছে এ দেশেও আজকাল বহু সমস্যা জন্মে হয়েছে যার মীমাংসা এখনো হল না। আমরা এই সমস্যাজনিত যেসব চিঠি পেয়েছি কিন্তু এক সঙ্গে সব চিঠির উত্তর বা আলোচনা করা সম্ভব হল না। যাই হোক আর একটী চিঠির কিছু অংশ এবারে উদ্ধৃত করব। তবে তার আগে এই মেয়েটীর কথা একটু বলে রাখি। মাত্র ১৯ বছরের একটী মেয়ে মা বাবার একমাত্র সন্তান। বি. এ. পড়ছিল। ওদেরই পাড়ার ৪৫ বছরের অমলবাবুর বরাবর মেয়েটীর দিকে লক্ষ্য ছিল। মাঝে মাঝে সুমিতা যখন কলেজ থেকে ফিরত ওকে বাড়ীতে ডেকে খুব আপ্যায়িত করতেন। সুমিতা এই আপ্যায়নকে স্নেহ বলেই মনে করতো প্রথমটা। অমলবাবুও ওদের বাড়ী আসতেন। ইদানীং ওদের বাড়ীর সঙ্গে খুব আত্মীয়তা করে ফেলেছিলেন। এমনি একদিন সুমিতা অমলবাবুর বাড়ীতে বসে গল্প করছিল হঠাৎ তিনি বলে বসলেন 'তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী করতে ইচ্ছে করে' প্রথমটা সুমিতা চমকে উঠেছিল পরে যখন অমলবাবু প্রায়ই এই কথাই বলতেন এবং মাঝে মাঝে শাড়ী, গহনা, কিনে দিতে লাগলেন তখন একদিন ওর মা জানতে চাইলেন এ সব কে দিলে? সুমিতা বেশ সহজভাবেই বলল অমলদা দিয়েছেন। মা চুপ করে রইলেন। সুমিতাদের অবস্থা ভাল ছিল না বাবা সামান্য সদাগরী অফিসের কেরাণী, কাজেই মেয়েকে সাধ আহ্লাদের কোনো খোরাকই দিতে পারতেন না বরং মাঝে মাঝে মেয়ে যখন টাকা খরচ করে এটা ওটা সংসারে দিতে লাগল মা বাবা নীরবে মেনে নিতেন। এমনি একদিন অমলবাবু নিজেই প্রস্তাব করলেন সুমিতাকে তিনি বিবাহ করতে চান—সেদিন কিন্তু বাড়ীতে একটা ঝড় বয়ে গেল—মাত্র উনিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের বিবাহ এ হতেই পারে না। ওঁরা মুখের উপর বলে দিলেন এ বিয়ে হতে পারে না—আপনি ভবিষ্যতে এ বাড়ীতে আসবেন না। বেশ কিছুদিন সবাই চুপচাপ রইলেন কিন্তু হঠাৎ একদিন কলেজের ছুটীর পর সুমিতা আর বাড়ী এল না। কারুরই বুঝতে বাকী রইল না ওরা দুটীতে বিবাহ করে কোথাও চলে গেছে কারণ অমলবাবু নাকি একমাস আগেই বাড়ী ছেড়ে দেবেন বলে নোটিশ দিয়েছিলেন।—পাড়া প্রতিবেশী সবাই এ খবর জানল কিন্তু ওঁরা আর মেয়ের খোঁজ খবর করলেন না। বহুদিন পরে জানা গেল বম্বেতে ওরা ঘর সংসার করছে। মাকে চিঠিও লিখেছিল সুমিতা কিন্তু জবাব পায় নি। এই হলো সুমিতার জীবনের একটী অধ্যায়। এরপর সে তার বন্ধু মায়াকে চিঠি লিখেছে—

বন্ধু মায়া !

হাঁা, চলে এসেছি অনেক দূরে কিন্তু উপায় ছিল না—জানি তোমরা আমাকে ঘৃণা করছ। কিন্তু আমি যে এ কাজ করেছি এর জন্য দায়ী আমার মা—তাঁদের দারিদ্রের সংসারে এসে পরণের একখানা শাড়ীও পেতাম না তাই যখন অমলদা আমাকে মুঠো মুঠো টাকা, গয়না, শাড়ী দিতেন আমার খুব ভাল লাগত, দেখতাম মাও খুশী হোতেন। কই তখন তো কোনদিন অমলদার কাছে ওসব নিতে নেই বলেন নি ? তারপর যখন দিনের পর দিন ওঁর কাছে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ হোলাম এবং তিনি চাইলেন আমায় বিয়ে করতে তখন 'না' বলতে পারলাম না এই আমার অপরাধ।—হাঁা অমলদাকে আমি ঠিক ভালবাসতে পারিনি আজো শুধু

আর পাঁচজনের মত ওর টাকাকে ভালবেসেছিলাম আর সেইটুকু কৃতজ্ঞতা বজায় রাখতে গিয়ে আমি মা বাবাকে হারিয়েছি।—আজো তার জন্য ঠিক আমার অনুতাপ আসেনি—কারণ দারিদ্র্য আমাকে বারে বারে আঘাত করেছে কতদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনেছি মা বাবাকে বলছেন, মেয়ে বড় হচ্ছে কিন্তু কি করব বিয়ে তো দিতে পারব না ওর যা ভাল লাগে তাই করুক। তাই আমি অমলদাকে বিয়ে করেছি আর যাই হোক্ খাওয়া পরার অভাব তো হবে না ; তাহলেই হল। আমার মত কত মেয়েই তো আজকাল এইভাবে টাকা এনে মা বাবার সংসার চালিয়ে দিচ্ছে আমার বেলায় বা তার ব্যতিক্রম কেন ? ভালই করেছি সমাজকে ভয় করে দারিদ্রাকে আমি মেনে নিতে রাজী নই। তোমরা আমায় ক্ষমা করো বন্ধু—

ইতি—স্মিতা

সত্যিই তো এ দোষ আজকের সমাজ ব্যবস্থার। এর প্রতিকারের উপায় একমাত্র মায়েরাই করতে পারেন।—সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মেয়েটিকে গড়ে তুললে সমাজের বুকে এমন একটী কলঙ্কের ছাপ পড়ত না।

অন্তরীক্ষে

দেশের অবস্থা—

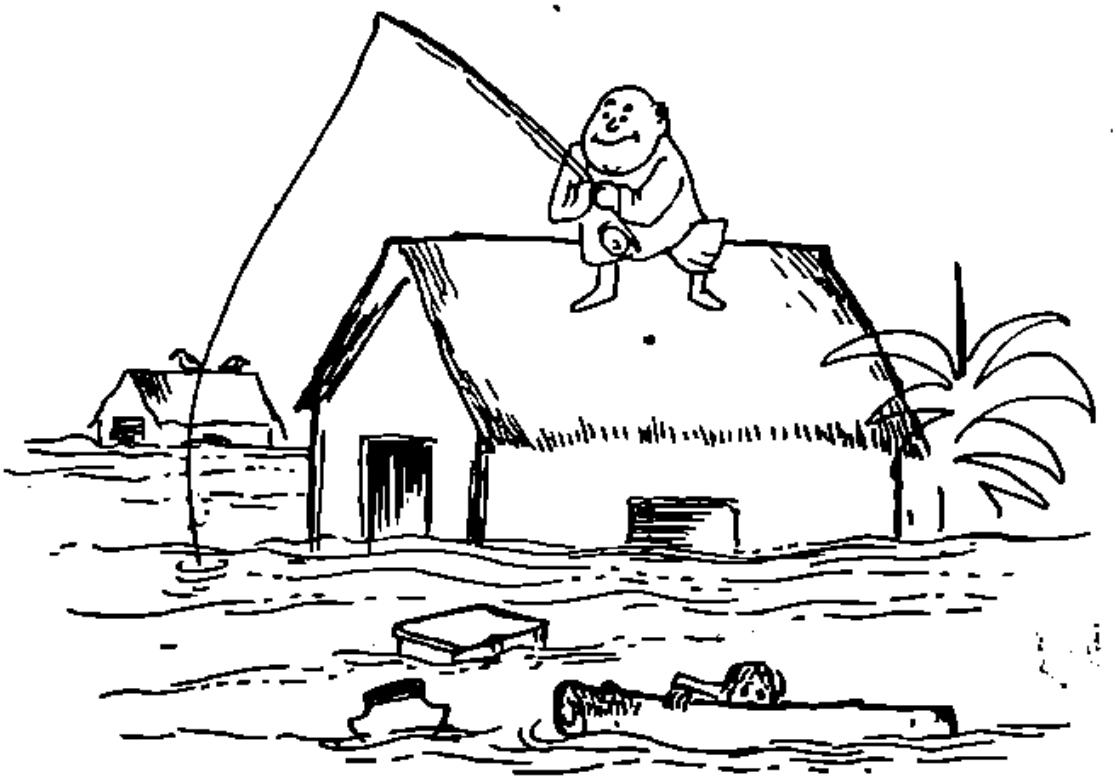

নেপোয় মারে দই !

.....অভিসার

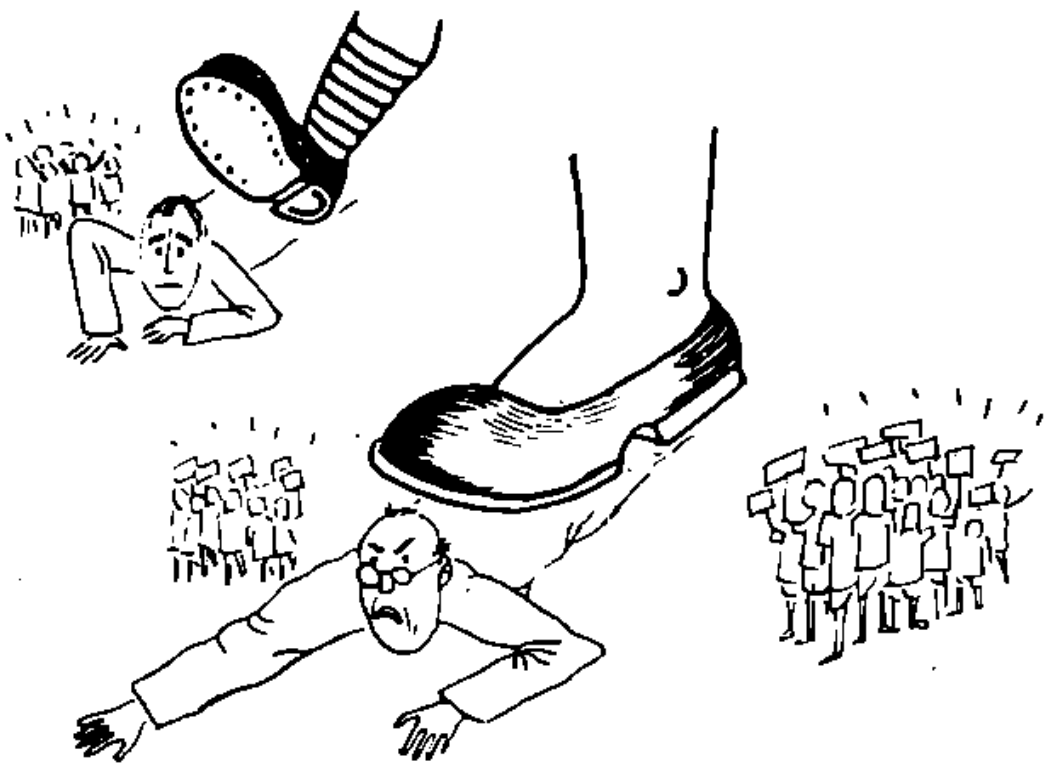

সেদিনও যা আজও তাই!

গল্পভারতীর পাতা থেকে

গত তেইশ বছর ধরে গল্পভারতীতে বাংলা দেশের সব সেরা লেখকই নিয়মিত ভাবে লিখছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পরলোকগত, তাঁদের লেখা পুনরায় প্রকাশ করার অনুরোধ আমরা বহুবার আমাদের সহৃদয় পাঠক, পাঠিকাদের কাছ থেকে পেয়েছি।

তাঁদের স্মৃতি সমুজ্জ্বল মূল্যবান রচনা আমরা এখন থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করবো।

গল্পভারতীর এই নববর্ষ সংখ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অত্যুজ্জ্বল গল্প এবং সেদিনের গল্পভারতীর সম্পাদক প্রথিতযশা সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি রুশ-গল্পের অনুপম অনুবাদ প্রকাশ করা হল। এই দুটিই গল্পভারতীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এ দুটি অতুলনীয় রচনা বর্তমানের সাহিত্য রসিক পাঠক-পাঠিকাদের প্রচুর আনন্দ এবং তৃপ্তিদান করবে।

সম্পাদক : গল্প-ভারতী

পৃথিবীর সেরা গল্প

লেখকের—ডারলিঙ

অনুবাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছা আছে, পর্য্যায়ক্রমে, জগতের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য হইতে, সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগুলি বাংলা ভাষার অন্তঃপুরে অনুবাদের সাহায্যে লইয়া আসিব। ইহা তাহার প্রথম চেষ্টা।

গল্পলেখকের পরিচয় :

আন্টন শেখভ রুশ সাহিত্যের গত যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশ্বসাহিত্যে যাঁহাদের নাম অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে, তাঁহাদের একজন। সাহিত্যের দুইটি বিশেষ অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে, একটি হইল ছোটগল্প, অপরটি নাটক। নাটক সম্বন্ধে তাঁহার দান, এখানে আলোচনা করিতে চাহিনা। নাটক অপেক্ষা, সংখ্যার দিক হইতে ছোটগল্পই তাঁহার প্রতিভার বিশেষ বাহন, রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাকাব্য রচনা না করিয়া লিরিক কবিতার মধ্যেই তাঁহার এপিক প্রতিভাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিভিন্ন বিচিত্ররূপ দিয়াছেন, শেখভও তেমনি তাঁহার কাহিনী সৃজন এপিক—প্রতিভাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছোট গল্পের বিভিন্ন খণ্ড মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিভিন্ন লিরিক কবিতার মধ্যে যেমন একটা বিরাট ভাবের ঐক্য ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া তাঁহার সমগ্র সৃজনকে এপিক-

মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি শেখভের সমস্ত ছোট গল্পের মধ্য দিয়া একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা এবং ভাব সঙ্গতি তাঁহার সমস্ত বিভিন্ন গল্পগুলিকে একটা সমগ্র বিরাট কাহিনীর অপরূপ একত্বের মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এক মোঁপাসাঁ ছাড়া আর কোনো ছোট-গল্পলেখক সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। সাধারণত যাঁহারা ছোটগল্প লেখক, তাঁহাদের বিভিন্ন গল্প হইল, তাঁহাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন ফল। কিন্তু শেখভ এবং মোঁপাসাঁর ছোটগল্প হইল, তাঁহাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার একটা সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক প্রকাশ যার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইল, এক একটি স্বতন্ত্র গল্প, এইজন্যই ছোটগল্পের রাজ্যে শেখভ এবং মোঁপাসাঁ হইলেন স্বতন্ত্র।

শেখভ মোপাসাঁর পরে পৃথিবীতে আসেন। শেখভ যখন জগৎ দেখিতে আরম্ভ করেন, জগৎ তখন মোপাসাঁকে শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে। আজও পর্য্যন্ত অনেকের বিশ্বাস যে, মোঁপাসাঁ হইলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক সেই বিশ্বাসের মধ্যেই আমাদের সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হয়। কিন্তু যৌবনের প্রথমদিনে যেদিন শেখভের সহিত পরিচয় হইল, সেদিন, আমার অন্তরে একটা ঘোর বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সেই বিপ্লবের ফলে দেখিলাম, আমার অন্তরে মোঁপাসাঁর নামের উপরে শেখভের নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা একান্ত আমার নিজের মানসিক ইতিহাসের কথা। দেখিলাম রচনার কৌশল, গল্পের বৈচিত্র রসসৃষ্টির ক্ষমতা এই দুই মহারথীর সমান আয়ত্ত কিন্তু একটি বিষয়ে শেখভ বিশেষ করিয়া আমার অন্তর হরণ করিয়া লইল। সে বিষয়টী হইল জীবনকে দেখিবার তাঁহার অপরূপ ভঙ্গী। মোঁপাসাঁরও একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তবে তিনি জীবনকে, নর-নারীর মিলনকে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিয়াছেন। জীবনকে দেখার যে অন্য দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকতে পারে, তাহা তাঁহার রচনা হইতে বোঝা যায় না। শেখভের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গী একটা বিচিত্ররূপে ফুটিয়া আছে, সে দৃষ্টিভঙ্গী হইল, নির্লিপ্ত স্রষ্টার দৃষ্টি ভঙ্গী···এই অনাদি বৈচিত্র্যময় বিশ্বঘটনার প্রবাহের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া বিশ্বস্রষ্টা যে উদাসীন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাঁহারই সৃজিত ঘটনাকে দেখিতেছেন। তাই শেখভের কাছে এই আমাদের জীবন, যাহা লইয়া গল্পের সৃষ্টি, তাহা হইল, এক বিরাট সাতমহলা বাড়ী·· ইহার এক এক মহলায় এক এক ধরণের জীব···প্রত্যেক মহলার অধিবাসী ভাবিতেছে, তাহার বিশ্ব তাহার মহলাটুকুর সীমানাতেই শেষ · কিন্তু বাড়ীর যিনি আসল কর্ত্তা, তাঁহাকে এই সাতমহলারই খবর রাখিতে হইতেছে এবং খবর রাখিতে গিয়া কোনো এক মহলার সঙ্গে তিনি নিজেকে নিঃশেষে সংযুক্ত করিতে পারিতেছেন না কোনো এক বিশেষ মহলার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্বও তাঁহার নাই···সেই সাতমহলার পরস্পর বিরোধী জীবন এক সঙ্গে তিনি দেখিতেছেন বলিয়াই তিনি অপূর্ব্বভাবে নিঃস্পৃহ, কাহারও প্রতি বিশেষ কোন ঘৃণা নাই, কাহারও প্রতি বিশেষ কোনো প্রেম নাই · সকলের জন্যই মুখে সবসময় তাঁহার লাগিয়া আছে, এক অদ্ভুত রহস্যময় ম্লান হাসি তাহা ব্যঙ্গ নয়, উল্লাস নয়, বৈরাগ্যও নয়···

এইখানেই শেখভ স্বতন্ত্র ও একক···

এই গল্পটি সম্বন্ধে :

শেখভের ভারলিঙকে কেন পৃথিবীর একটা সেরা গল্প মনে করি? যে সব উপাদান থাকিলে ছোটগল্প মুক্তার পরিপূর্ণ নিটোল সৌন্দর্য্য লাভ করে, অন্য অনেক ভাল ছোটগল্পের মতন ভারলিঙেও সে-সব উপাদান প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিদ্যমান আছে- কিন্তু তাহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আছে, যাহার জন্য এই গল্পটি লাভ করিয়াছে।

প্রথম, ইহা একটি বিশেষ দেশের, বিশেষ মনুষ্য-সমাজের কাহিনী কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটি সার্বজনীন ভাব আছে যে, যাহার দরুণ, ইহা সর্বদেশের সব মনুষ্য সমাজে সমান ভাবে গৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়, এই কাহিনীটিতে একটি রূপ নারীর মনের যে ইতিহাস দেখানো হইয়াছে, তাহার পরিবেশ নিছক রূপ দেশীয় এবং তৎকালীন। কিন্তু পরিবেশের কথা বাদ দিলে, ইহার মধ্যে নিখিল নারীর একটা সত্যমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহা সর্বকালীন।

তৃতীয়, এই গল্পটি অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, কি ভাবে তত্ত্ব আলোচনা না করিয়াও ঘটনার সংস্থানের মধ্য দিয়া বিরাট সার্বজনীন তত্ত্বকে রূপ দেওয়া যায়—এক্ষেত্রে যে তত্ত্বটি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, তাহা হইল, নারীর মাতৃত্ব সুধা। এই তত্ত্বকে ফুটাইবার জন্য বহু গল্প লেখা হইয়াছে সত্য এবং তাহার কতকগুলি সার্থক সৃষ্টিও হইয়াছে কিন্তু ভারলিঙের বিশেষত্ব হইল যে, এই অতি পুরাতন তত্ত্বটিকে একটা সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে অপরূপ কৌশলে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বিশেষ বক্তব্য :

লজ্জার বিষয়, ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ করিতে হইয়াছে। তবে গার্থেটের অনুবাদ শেষত স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মূলের সহিত ইহার কোনো পার্থক্য নাই। ইংরাজী ভাষার গতিশীল স্বচ্ছতা য়ুরোপীয় যে কোন ভাষার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করিতে পারে। তবে বাংলা ভাষায় ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিতে হইলেও, ভাষার বৈদেশিকতার ত্রুটি ভোগ করিতেই হয়, য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষার অভিধান শব্দ সমষ্টির দিক হইতে প্রায় এক, য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রায় এক স্তরের হওয়ার দরুণ, তাহাদের পারিভাষিক ঐশ্বর্যও সমান। কিন্তু সমুদ্র পারে আমাদের ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক অভিজ্ঞতা য়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। সেইজন্য অনুবাদে আমাদের পারিভাষিক দৈন্য থাকিয়াই যায়। যেমন এক্ষেত্রে "ডারলিঙে"র কোন প্রতিশব্দ আমাদের অভিধানে নাই। য়ুরোপীয় দেশে, ডারলিঙ কথাটি, সব সম্পর্কের মধ্যে সমান ওজনে ব্যবহার করা হয়, মা ছেলেকে বলিতে পারে, ছেলে মাকে বলিতে পারে, বন্ধু বন্ধুকে বলিতে পারে, স্বামী স্ত্রীকে বলিতে পারে, স্ত্রী স্বামীকে বলিতে পারে। আমাদের ভাষায় একান্ত প্রিয়ত্ব সূচক অনুরূপ কোন অন্তরঙ্গতা-সূচক প্রতিশব্দ নাই। ব্যাকরণের দিক হইতে নূতন শব্দ তৈয়ারী করিলে, তাহার প্রধান অসুবিধা হয়, প্রয়োগের দ্বারা শব্দ যে বিপুলার্থ লাভ করে, তাহা আর থাকে না। সুতরাং সেইরূপ নূতন শব্দ মৃতশিশুর মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া পড়ে। তাই 'ডারলিঙ' ডারলিঙেই রহিয়া গেল।

অবসরপ্রাপ্ত কলেজের হিসাব-পরিদর্শকের কন্যা শ্রীমতী ওলেন্কা বাড়ীর পিছনকার বারান্দায় একা বসিয়া ভাবিতেছিল :

সারাদিন গুমোট করিয়া আছে, অসহ্য গরম তাহা আরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে মাছির অবিশ্রান্ত উৎপাতে একমাত্র সান্ত্বনা, এখনি সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে···

পূর্বদিগাঙ্গন হইতে জলভরা কালো মেঘ স্তরে স্তরে সারা আকাশ ছাইয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে তাই বাতাসের স্নিগ্ধ আশ্বাস আভাসে গায়ে আসিয়া লাগিতেছে।

সামনের বাগানের ঠিক মাঝখানে, আকাশের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কুকিন দাঁড়াইয়া···সে-ও ঐ বাড়ীর বাসিন্দা ভিভোলী নামে·· নূতন যে খোলা থিয়েটার শহরে চলিতেছে, তাহার ম্যানেজার এবং মালিক।

ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে কুকিনের বক্ষভেদ করিয়া সশব্দে বাহির হইল। আবার সেই বিষ্টি। রোজ রোজ বিষ্টি···যেন আমার পেছনে লেগেছে···আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না! ব্যবসা-পত্র রসাতলে গেল!

ওলেচ্কার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হয় তাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিয়া চলে;

—দেখেছ ওলগা, এই আমাদের জীবন। ইচ্ছা করে ভাক ছেড়ে কাঁদি সারাদিন পরিশ্রম কর ...মাথার ঘাম পায়ে ফেলো সারারাত জেগে জেগে ভাবো কি কাকে ভালো জিনিষটি দেওয়া যায়·· আর তার বদলে? প্রথম ধর, দর্শক যাঁরা আসেন, নিরেট মুখ্খু হল···আমি বিশ্বভুবন এক করে ভাল অপেরাটা দিলাম—বেছে বেছে সেরা আর্টিষ্টদের নিয়ে এলাম···যারা সত্যি গান গাইতে জানে·· তুমি ভাবছো, লোকে খুব খুশীই হলো বুঝি? মোটেই না। তাদের ওসব রুচবে কেন? তারা চায় স্রেফ ভাঁড়ামি·· কাঁচা-খোলা ভাঁড়ামি। তাতেই কি নিস্তার আছে? বেই সন্ধেটা হয়ে আসবে, আর অমনি বিষ্টি···বিষ্টি·· সেই যে মাসের দশ তারিখ থেকে সুরু হয়েছে···আর এই যে গেল·· ছুল গেল সন্ধে হলেই বিষ্টি। কি জ্বালা! বিষ্টির জন্যে লোক হয় না কিন্তু আমাকে তো সেই ভাড়া সমানে গুঁজে যেতে হয়···বিষ্টি বলে তো ভাড়ার রেহাই আমি পাই না। আর আর্টিষ্টদেরও তো বলতে পারি না, বিষ্টি পড়ছে মাইনে পাবে না।

ওলেচ্কা নীরবে শোনে···

পরের দিন ঠিক সন্ধ্যার মুখে আবার আকাশে মেঘ জমিতে আসে···তেমনি বাগানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে বজ্রমুষ্টি তুলিয়া কুকিন ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করিতে থাকে, "দাও, দাও, ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও সব···ঘর ডুবুক···বাড়ী ডুবুক···থিয়েটার ডুবুক···সেই সঙ্গে আমিও ডুবে মরি···

মনে মনে দেখিতে পায় আর্টিষ্টরা মাইনের জন্যে লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া আছে···অদ্ভুত জনতাকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিয়া ওঠে··

—মাইনে? কোথায় পাব? আদালত···হাঁ জানি·· জেল···জেলেই যাব···সাইবেরিয়ায় পচে মরবো ···তা ছাড়া আর এ কাটাকপালে হবে কী?

নিজের পরিণাম কল্পনা করিয়া উন্মাদের মত অট্টহাস্য করিয়া ওঠে···

পরের দিন···আবার সেই মেঘ, সেই বৃষ্টি···সেই ব্যর্থ হাহাকার···

ওলেচ্কা নীরবে শোনে···একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে না···হঠাৎ মাঝে মাঝে চোখ দিয়া নীরবে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে··কুকিনের ভাগ্য-বিপর্যয় তাহার অন্তরে আসিয়া আঘাত করে··· দুঃখী বলিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ভাল লাগে।

চেহারার দিক হইতে কুকিনের আকর্ষণীয় কিছু ছিল না ছোট পাতলা মানুষটা···ভাবনায় ভাবনায় মুখের রঙ হলদে হইয়া আসিয়াছে মিহি গলার আওয়াজ · যখন জোরে কথা বলিতে যায়, ঠোঁটের দুধারে এমন একটা রেখা পড়িয়া যায়, যাহাতে সমস্ত মুখখানা বিষণ্ণ দেখায় · তবুও সেই লোকটার জন্য ওলেচ্কার মন একান্ত কাতরভাবে কাঁদিয়া ওঠে। জল যেমন বিনা আধারে থাকিতে পারে না, ওলেচ্কার মনও তেমনি কাহাকেও না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। শৈশবে তাহার সব ভালবাসা একান্তভাবে তাহার বাবাকে

সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল···তিনি এখন বৃদ্ধ স্থবির, ঘর হইতে বাহিরে আসিতে পারেন না; স্কুলে পড়িবার সময়, যে মাষ্টার ক্লেক পড়াইত, তাহাকে মনে মনে সে ভালবাসিত, স্কুল হইতে বাহির হইয়া তাহার এক পিসীমাকে আশ্রয় করিয়া তার মন বাঁচিয়াছিল· তিনি আর তাদের সঙ্গে থাকেন না···তবে বৎসরে একবার করিয়া দেখাশোনা করিয়া যান।

ওলেস্কার নিজের চেহারার দিক হইতে বলিবার অনেক কিছুই ছিল। তাহার পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য, স্নিগ্ধ করুণ দুটী চোখ দেখিলেই মনে হইত, তাহাদের আড়ালে লুকাইয়া আছে এক শান্ত মমতাময়ী নারী।

রক্তিমাভ দুইগণ্ড···প্রস্তর মসৃণ শুভ্র গ্রীবাতট···তটমূলে গভীর কৃষ্ণ একটি তিল···কথা শুনিতে শুনিতে মুখের দিকে চাহিয়া কেমনভাবে একটুখানি হাসি হাসিতে থাকে· আনমনে আলাপ করিতে করিতে পুরুষের হঠাৎ কথা থামিয়া যায়···তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের মন বলিয়া উঠে, মস্ত কি? মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাহার দুটি হাত নিজেদের দিকে টানিয়া লইয়া অস্ফুট আনন্দে বলিয়া উঠে, ভারলিঙ আমার।

যদিও তাহাদের বাড়ী শহরের একপ্রান্তে ছিল তবুও সেখান থেকে টিভোলী থিয়েটার খুব বেশী দূরে ছিল না। সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়াই সে শুনিতে পাইত, বাতাসে থিয়েটারের ব্যাণ্ডের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে···তাহার সঙ্গে দুম্‌দাম্ করিয়া বাজীর আর বন্দুকের আওয়াজ আসে···ওলেস্কার মনে হয় যেন কুকিন বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে···বন্দুকের আওয়াজে সে তার চিরশত্রু উদাসীন জনতার দুর্ভেদ্য দুর্গকে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে চলিয়াছে···এ যুদ্ধে যে কুকিনই অবশেষে জয়ী হইবে, সে কথা ভাবিতে তাহার মনে এক মধুর উন্মাদনা জাগিয়া উঠিত, ঘুমাইতে মন চাহিত না। রাত্রিশেষে ভোরের দিকে যখন কুকিন বাড়ী ফিরিয়া আসিত, নিশুতি বাড়ীর মধ্যে সে একা জাগিয়া উঠিত, কুকিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিজের ঘরের খোলা জানালায় মৃদু করাঘাত করিত—তারপরে পর্দাটি সরাইয়া একবার তাহার মুখটি বার করিয়া দেখাইত··শিথিল অঙ্গবাস পরিয়া গিয়া একটি কাঁধ উন্মুক্ত হয় হইয়া থাকিত।

একদা কুকিন বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল···

যেদিন নববধূর দেহের অন্তরঙ্গতায় পৌঁছিয়া দূর হইতে দেখা সেই গ্রীবা এবং সুগঠিত বাহুমূলের পরিপূর্ণ দৃষ্টির সৌভাগ্য অর্জন করিল, আপনা হইতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া কুকিন তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, ভারলিঙ আমার!

বিবাহের দিন কুকিন মহানন্দেই ছিল, তবে ঠিক সন্ধ্যার মুখে সেদিনও বৃষ্টি হওয়ার দরুন, তাহার মুখের সেই নিত্য হতাশার ভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

দুজনে মহানন্দে সংসার পাতিল। ওলেস্কা বাড়ীর কাজ সারিয়া, নিয়মমত ঘড়ি দেখিয়া, থিয়েটারের অফিসে গিয়া বসিত। স্বামীর হইয়া খাতা-পত্র হিসাব-নিকাশ সমস্তই সে নিজে দেখিত, আর্টিষ্টদের মাইনে দিত। থিয়েটারের মধ্যে যেখানেই যাও, তাহার হাসি-ভরা আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি চোখে পড়িবেই· এই অফিসের জানালায়···একটু পরে থিয়েটারের হোটেলে···ষ্টেজের ধারে···গ্রীনরুমের পাশে বন্ধুবান্ধব যাহার সহিতই দেখা হয়, অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়া সে তাহাদের বুঝাইয়া দেয় যে, থিয়েটারই হইল জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য··এবং নাটকের সাহায্যেই মানুষ একদিন তার অমৃতত্বের সন্ধান পাইবে যেহেতু নাটকই হইল মানুষকে সত্য এবং ভব্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার সবচেয়ে বড় উপাদান।

বন্ধুরা প্রতিবাদ করিবার অবকাশটুকু পাইত না ··সে তাহাদের মুখের কথার উপরেই বলিয়া চলিত, তা বলে মনে করছেন, লোকে এসব বোঝে? মোটেই না! তারা কি চায় জানেন? ভাঁড়ামি-মেশা ভাঁড়ামি···পরশুদিন আমরা দিয়েছিলাম, "কাউণ্ট · অফর ও বাহিরে" একটিও বকসে লোক ছিল না। কিন্তু তার বদলে উনি যদি সস্তা কিছু একটা দিতেন ··আমি বলছি ··বিশ্বাস করুন···থিয়েটারে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না···কাল উনি "প্রেতলোকে আক্সিডেণ্ট" দিচ্ছেন · আসবেন কিন্তু!

অর্থাৎ কুকিন থিয়েটার এবং আর্টিষ্ট এবং নাটক সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিত, ওলেচ্কা নিজের অজ্ঞাতসারে তারই পুনরাবৃত্তি করিত ··তাহারই মতন ঠিক তাহারই ভাষায় সে জনতাকে তিরস্কার করিত···মূর্খ বলিয়া গালাগাল দিত···ঠিক তাহারই মতন জনতার উদাসীন অজ্ঞতায় সে-ও ভাঙিয়া পড়িত···

কুকিনের দেখাদেখি সে রিহার্সালে গিয়া বলিত, আর্টিষ্টদের ভুল হইলে দেখাইয়া দিত · মাঝখানেই কোথায় ঢুকিয়া দিয়া আড্ডা দিতেছে খুঁজিয়া ফিরিয়া তাহারও করিত খবরের কাগজে কি সমালোচনা বাহির হইতেছে দেখিত···কোন বিরূপ সমালোচনা বাহির হইলে, পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িত···পরের দিনই নিজে কাগজের অফিসে গিয়া হাজির হইত···

থিয়েটারের আর্টিষ্টেরা তাহাকে ভালই বাসিত। তাদের কাছেও ওলেচ্কা ছিল, ভারলিঙ। মাঝে মাঝে অবশ্য আড়ালে তাহাকে "উনি" বলিয়াও তাহারা উল্লেখ করিত, কারণ "উনি" কথাটা ওলেচ্কা প্রায়ই ব্যবহার করিত। বিপদে আপদে পড়িলে তাহারা ওলেচ্কার কাছেই হাত পাতিত·· সাধ্যমত সে তাহাদের ধার দিত···কেউ কেউ শোধ না করিয়াই পলাইয়া যাইত সেক্ষেত্রে ওলেচ্কা কাহাকেও কিছু না বলিয়া একলা দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া নিজেকে শান্ত করিত স্বামীকেও জানাইত না।

দেখিতে দেখিতে শীতকাল আসিয়া পড়িল। সমস্ত থিয়েটার লইয়া তাহারা দুইজনেই শহরে চলিয়া আসিল। সেখানে মাঝে মাঝে থিয়েটার ভাড়া খাটিতে লাগিল। ওলেচ্কাই ভাড়ার কথাবার্তা সব ঠিক করিত। যত দিন যাইতে লাগিল, ওলেচ্কা ততই মোটা হইতে লাগিল তাহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, আনন্দে তাহার অন্তর টলমল—করিতেছে · কিন্তু কুকিন দিন দিন সেই অনুপাতে যেন আরো রোগা হইয়া যাইতে লাগিল, তাহার মুখের সেই হলুদ রঙ যেন আরো হলুদ হইয়া উঠিতেছিল আর যতই লাভ হউক না কেন, তাহার মুখে ক্ষতির কথা লাগিয়াই আছে···ক্ষতি দিতে দিতে তাহার প্রাণান্ত হইল·· যদিও সে-বছরে তাহারা বেশ দুপয়সা গুছাইয়া লইয়াছিল। ইদানীং রাত্রি হইলেই তাহার কাশি শুরু হইত·· ওলেচ্কা বিব্রত হইয়া পড়িত তাড়াতাড়ি সুন আদা দিয়া গরম চা তৈয়ারী করিয়া দিত তাহাতেও না কমিলে, ইউ-ডি-কলোঁ দিয়া বেশ করিয়া মালিশ করিত তারপর একটা গরম শাল সারা দেহে জড়াইয়া দিয়া ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করিত। মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিত, ওগো, ঘুমোও, লক্ষীটি ·

বড়দিনের দিকে, কুকিনকে মস্কো যাইতে হইল, নূতন আর্টিষ্ট সংগ্রহের জন্য। একা একা ওলেচ্কা রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে না, সারারাত্রি জানালার কাছে বসিয়া আকাশের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া থাকে··· মনে মনে ভাবে, যেদিন তাহাদের গৃহপালিত মোরগটী থাকে না, সেদিন মুরগীগুলোর বুঝি তাহারই মত অবস্থা হয়···

কুকিন মস্কোতে আটকাইয়া পড়িল ওলেচ্কাকে লিখিয়া জানাইল যে ইস্টারের আগে সে কিছুতেই যাইতে পারিবে না···ইস্টারসপ্তাহে থিয়েটার সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে তাহা সব তাহাকে বিশদভাবে লিখিয়া জানাইল কিন্তু ইস্টারের আগের রবিবার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, হঠাৎ সদর দরজার বাহির হইতে যে কেন

সহসা করাঘাত করিয়া উঠিল···ঠক্···ঠক্ ··ঠক্···ওলেন্কার মনে হইল কে যেন তাহার বুকে হাতুড়ি দিয়া পিটিতেছে···

যে মেয়েটি বাড়ীর রান্নাবান্না করিত, তখন সবে তাহার ভক্তা আসিয়াছে, সেই অবস্থায় খালি পায়ে সে ছুটিয়া দরজার সামনে গিয়া হাজির হইল ··

বন্ধ দরজার ওপার হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, দরজা খুলুন ! টেলিগ্রাম আছে !

ইহার পূর্বে স্বামীর নিকট হইতে ওলেন্কা বহুবার টেলিগ্রামে পাইয়াছে কিন্তু কেন জানিনা আজ যেন টেলিগ্রামের কথা শুনিয়াই এক অজানা আতঙ্কে তাহার সারা দেহ হিম হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে টেলিগ্রামখানি ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল ··

আইভান পেট্রোভিচ কুকিন হঠাৎ আজ মারা গিয়াছেন···মঙ্গলবার···স-সৎকার···অপেক্ষা প্রার্থনীয়···

টেলিগ্রামে সৎকারের স্থলে স-সৎকারই ছিল এবং উপদেশের স্থলে অপেক্ষাই ছিল···তলায় সই ছিল, অপেরাদলের ষ্টেজম্যানেজারের ··

ওলেন্কার হাত হইতে টেলিগ্রামখানি পড়িয়া গেল···সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভারলিঙ আমার, ওগো আমার ভানিচ্কা, আমার সর্বস্ব · কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ? দেখা হয়েছিল তো কেন তোমাকে গোলাম জানতে, বুঝতে ? কেন এমন করে দিলাম তোমার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে ! ওগো, দেখে যাও একবার, তোমাকে হারিয়ে তোমার ওলেন্কা আজ কত একা !

মঙ্গলবার যথারীতি মস্কো শহরেই শেষকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। বুধবার ওলেন্কা ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়াই সে ঘরের ভিতর গিয়া খিল দিল এবং বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এমনভাবে ফুঁপাইতে লাগিল যে পাশের বাড়ীর লোকেরা তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল।···

পথে প্রতিবেশীদের সহিত দেখাশোনা হয় ·····তাহারা বলে, আহা বেচারা ভারলিঙ ! ওলেন্কা পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

তিনমাস পরে···একদা গির্জায় উপাসনা শেষ করিয়া ওলেন্কা বাড়ী ফিরিতেছিল···সারা অঙ্গে শোকের কৃষ্ণ আবরণ···মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর। ঘটনাচক্রে সেদিন তাহাদেরই প্রতিবেশী—পুস্তোভালভ্, গির্জা হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত তাহার পাশাপাশি আসিল। পুস্তোভালভ্ স্থানীয় কাঠের গুদামের ম্যানেজারী করে। কিন্তু তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, বুক-পকেটে ঝোলানো সোনার ঘড়ি—ঘড়ির চেন দেখিলে মনে হইত যে, সে শুধু কাঠেরই ব্যবসা করে···

পথে আসিতে আসিতে পুস্তোভালভ্ নীরব সহযাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, যা ঘটবার, তা ঘটবেই ওলগা···

তারপর তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভিজাইয়া লইয়া সে বলিতে থাকে, যখন আমাদের পাশ থেকে, যাদের আমরা ভালবাসি, তারা চলে যায়···বুঝতে হবে ভগবান্ নিজেই তাদের ডেকে নিয়েছেন···এবং সেই বিবেচনায় আমাদের সেই বিরাট দুঃখ নীরবে নতমস্তকে সহ্য করাই উচিৎ···

দরজা পর্য্যন্ত ওলেন্কাকে পৌছাইয়া দিয়া পুস্তোভালভ্ নতমস্তকে বিদায় গ্রহণ করিল···

সেদিন সারারাত্রি ধরিয়া ওলেন্কা শুনিতে পাইল যেন, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে—পুস্তোভালভ্ তাহার তাপিত চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য উপদেশ দিতেছে···চোখ বুজিলেই দেখিতে পায় পুস্তোভালভের সেই মনকষ্ট দাঁড়ি···তাহারই সামনে যেন দুলিতেছে।

ইহার তিনদিন পরে এক প্রতিবেশী মহিলা কফির নিমন্ত্রণে আসিয়া কফি খাইতে খাইতে হঠাৎ পুত্তোভালডের কথা উত্থাপন করিল।…বলিল, নির্ভরযোগ্য এমন পুরুষ মানুষ এ অঞ্চলে আর দুটি নাই…যে কোন মেয়ে অমন লোককে হাত ধরে এনে সেধে বিয়ে করবে…

তিনদিন পরে স্বয়ং পুত্তোভালড্ আসিয়া উপস্থিত হইল। বেশীক্ষণ রহিল না, মাত্র দশমিনিট…বেশী কিছুই বলো না·· কিন্তু যখন চলে গেলো ··ওলেভা বেশ বে সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে…এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে যে সারা রাত্রি জ্বরে ছটফট করিল এবং ভোর না হইতেই সেই প্রতিবেশীনীকে ডাকিয়া আনিল। বিবাহের প্রস্তাবে বিশেষ কোন হাঙ্গামা হইল না এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিবাহও হইয়া গেল। নির্ভাটে ওলেভা নূতন সংসারের ভার আনন্দে তুলিয়া লইল।

সাধারণত দ্বিপ্রহরের আহার না হওয়া পর্যন্ত স্বামী অফিসেই থাকিত, তারপর বাহিরের কাজে বাহির হইয়া যাইত। তখন স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত চেয়ারে আসিয়া বসিত, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত খাতা লইয়া হিসাব-পত্র, আমদানি-রপ্তানী সমস্তই দেখাশোনা করিত।

গুদামে কাঠ কিনিতে যাহারা আসিত, স্বামীর হইয়া ওলেভাই তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিত,

"কাঠের দর দেখছেন তো বছরে বছরে বেড়ে যাচ্ছে·· গত বছরে যা দাম ছিল, এ বছরে তার শতকরা দশগুণ বেড়ে গিয়েছে…"

বন্ধু বা বান্ধবীদের সহিত দেখাশোনা হইলে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিতে শুরু করিয়া দিত, কাঠের কথা আর বলো না ভাই…আগে আমরা কোন রকমে এখানকার কাঠ নিয়েই বেচাকেনা করতাম…এখন "উনি" আজ এখানে ছুটছেন, কাল ওখানে ছুটছেন…বাইরে থেকে কাঠ না আনলে আর চলে না! আর বাইরে থেকে আনানো মানে?

কথার সঙ্গে সঙ্গে ওলেভার হাত গালে উঠিয়া যাইত, এবং ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া, ভীত সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিত, তার মানে কি জানেন? 'বাড়তি খরচ…হাল চালানের ভাড়া…অতিরিক্ত… অতিরিক্ত…

ঠিক এই সব কথাই তাহার স্বামী ব্যবহার করিত। বন্ধু-বান্ধবেরা শুনিয়া মনে করিত, ওলেভা বুঝি খুব খুব ধরিয়া এই কাঠেরই ব্যবসা করিয়া আসিতেছে এবং মানব জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হইল, কাঠ। এই সম্পর্কে কথা বলিতে বলিতে যখন সে "কড়ি-কাঠ", "বরগা", "তক্তা", "পোষ্ট", "খুঁটি", "পাল", সেগুন" প্রভৃতি কাঠের ব্যবসা সংক্রান্ত চলিত শব্দগুলি উচ্চারণ করিত; তাহার উচ্চারণের ভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বর হইতে মনে হইত যেন সে অন্তরের সহিত অতি অন্তরঙ্গ কোন বিরাট ভাবধারাকে বাণী-রূপ দিতেছে।

রাত্রিতে গভীর ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখিত, স্তূপের পর স্তূপ কাঠ…কোথায় কোন অজানা দেশে যেন অসংখ্য লোক সব কাটা সব কাঠ গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে…সারি সারি-বোঝাই গাড়ী লাইন ধরিয়া চলিয়াছে…কোনদিন বা দেখিত, হু-ইঞ্চি সব তক্তা, লম্বায় চল্লিশ ফিট, দলে দলে সব সৈন্যদের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন কোন অদৃশ্য নেতার ইঙ্গিতে রাস্তা দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া চলিয়াছে…যাইতে যাইতে কেহ দলকে পড়িয়া যাইতেছে, কেহ বা পাশের তক্তার ঘাড়ে পড়িতেছে…আবার সামলাইয়া লইয়া লাইনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—চারিদিক হইতে তুমুল শব্দ উঠিতেছে…ভয়ে ওলেভার ঘুম ভাঙিয়া যায়…স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠে তাহাতে স্বামীর ঘুম ভাঙিয়া যায়…আদরে স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠে, ওলেভা ডারলিঙ আমার!

পুষ্পোভালভ্ যাহা ভাবিত, যাহা বলিত, ওলেচ্কারও ঠিক তাই ভাবনা, তাই বক্তব্য। পুষ্পোভালভ্ যদি মনে করিত ব্যবসা মন্দা যাইতেছে, ওলেচ্কা শহরময় তাহাই বলিয়া বেড়াইত। থিয়েটার বায়োস্কোপ যাওয়া পুষ্পোভালভ্ পছন্দ করিত না, তাই ছুটির দিন সে বাড়ীতেই থাকিত। ওলেচ্কাও বিনা প্রশ্নে তাহাই করিত।

বন্ধুবান্ধবেরা অনুযোগ করিয়া বলিত, একি ব্যাপার, ভারলিঙ? হয় বাড়ীতে, না হয় অফিসে! মাঝে মাঝে এক-আধবার থিয়েটারে কি সার্কাসে—তোমার যাওয়া উচিত।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ওলেচ্কা উত্তর দিত, ওঁনার বা আমার সময় কোথায় ভাই যে থিয়েটারে যাবো? আর তা ছাড়া ওসব বাজে জিনিষে মাতবার সময় আমাদের নেই! থিয়েটার দেখে কি হবে?

প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রী গির্জার উপাসনায় যোগদান করিত··· ছুটির দিন সকালবেলা সমবেত-প্রার্থনায় গিয়ে হাজির হইত উপাসনা শেষ হইলে স্মিতমুখে পাশাপাশি দুজনে মৃদুপদক্ষেপে বাড়ী ফিরিয়া আসিত ··দুজনার দেহ হইতে যেন এক স্নিগ্ধ মধুর সুরভি ছড়াইয়া পড়িত।

বাড়ীতে আসিয়া দুজনে ঘটা করিয়া চায়ে বসিত···চায়ের সঙ্গে নানান ধরনের রুটী আর জ্যাম···

প্রত্যেকদিন ঠিক বারোটার সময় রান্নাঘর হইতে টাট্‌কা মাংসের উত্তপ্ত সুবাস পথে আসিয়া পথিককে পর্য্যন্ত লুব্ধ করিত। কোন কোন দিন তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে, রান্না মাছের মিষ্টি গন্ধে পথিক থমকাইয়া দাঁড়াইত, মনে পড়িয়া যাইত সে ক্ষুধার্ত! অফিসেও সারাক্ষণ সামোভার টস্‌বস করিয়া ফুটিতেছে, ঘরিদ্দার আসিলেই এক কাপ্ গরম চা কোথা হইতে সামনে আসিয়া হাজির হয়।

"সত্যি ভাই, ভগবানের দয়ায়, অভিযোগ করবার আমাদের কিছু নেই···ওঁরও না·· আমারও না··· তাই মনে মনে বলি, সবাই যদি ওঁর আর আমার মত সুখী হতো"—ওলেচ্কা বান্ধবীদের বলে।

যখন পুষ্পোভালভ্ কাঠ কিনিবার জন্য প্রদেশান্তরে যাইত, একা থাকিতে ওলেচ্কার বুক ফাটিয়া যাইত···সারা রাত্রি বিছানায় আসিয়া বসিয়া থাকিত; শিশুর মতন কাঁদিয়া উঠিত। সেই সময় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় সেই বাড়ীর একজন ভাড়াটে···সামরিক বিভাগের একজন পশুচিকিৎসক ডাক্তার ওলেচ্কাকে সঙ্গদান করিত। নানা রকম কথাবার্ত্তায় সে-ভদ্রলোক ওলেচ্কাকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা যথাসাধ্য করিত। বিশেষ করিয়া ভদ্রলোক যখন তাঁহার বাড়ীর গল্প করিতেন ওলেচ্কার বড় ভাল লাগিত। ভদ্রলোক বিবাহিত এবং একটি পুত্র সন্তান আছে। তবে বর্ত্তমানে স্ত্রীর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তাঁহার স্ত্রী বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা এমনভাবে নষ্ট করিয়াছে যে তিনি আজ মনে প্রাণে তাঁহাকে ঘৃণা করেন। তবে ছেলের ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে মাসে মাসে চল্লিশ রুবেল করিয়া পাঠাইতে হয়।

ওলেচ্কা চুপটি করিয়া শুনিত। ভদ্রলোকটির দাম্পত্য-জীবনের সেই শোচনীয় পরিনামে মর্ম্মাহত হইত। দুঃখ দেখিলে সে নিজে সব চেয়ে বেশী দুঃখিত হইয়া পড়িত।

উঠিবার সময় সান্ত্বনা স্বরূপ ওলেচ্কা বলিত, ভগবান আপনাকে এই দুঃখ সইবার শক্তি নিশ্চয়ই দেবেন।

নিজে আলোটী তুলিয়া ধরিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিত। সিঁড়ি পার না হইয়া চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে সিঁড়ির উপরে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তারপর নিজের শূন্য ঘরে আসিয়া বিছানায় উপর নিজার বৃথা চেষ্টায় ছটফট করিত।

স্বামীর মতন সব জিনিষ ওলেচ্কা বিচার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিত, কখনও কোন বিষয়ে বাচালতা

প্রকাশ করিত না, যাহা কিছু বলিত, স্বামীরত্ন ধীর স্থির ভাবে একটি একটি শব্দ যেন আলাদা করিয়া উচ্চারণ করিত।

একদিন কথাবার্ত্তার শেষে ডাক্তার যখন বিদায় লইয়া উঠিতেছিলেন, ওলেন্কা একান্ত দ্বিধাভরে বলিয়া ফেলিল, দেখুন ভ্লাডিমির প্রেটোনিচ্, আমার মনে হয়, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলা ভালো। অন্তত আপনার ছেলের জন্যে আপনার স্ত্রীকে ক্ষমা করা উচিৎ, ছেলে এখন বড় হচ্ছে, সে তো বুঝছে সব!

তারপর যখন পুস্তোভালভ্ ফিরিয়া আসিল, ওলেন্কা স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওগো, শুনেছ?

ডাক্তারের হাসপাতাল-জীবনের সেই করুণ কাহিনী যাহা শুনিয়াছিল আনুপূর্বিক সব স্বামীকে জানাইল ...ডাক্তারের সমবেদনায় দুজনার বুক হইতে এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল...একসঙ্গে দুজনাই সেই হতভাগ্য বালকটীর ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল...এবং সেই অজানা পিতৃসঙ্গ বঞ্চিত বালকের কথা ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার উপাসনায়, তাহারা দুইজনেই সেদিন নিজের একটি বালকের একান্ত প্রয়োজনের কথা ভগবানের কাছে নিবেদন করিল।

দীর্ঘ ছয়বৎসরকাল তাহারা দুইজনে পরম শান্তিতে কাটাইয়া দিল, তাহার মধ্যে তৃতীয় কোন প্রাণীর আবির্ভাব আর ঘটিল না। দীর্ঘ ছয়বৎসর কাল...

তারপর হায়! একদিন সকালবেলা যথারীতি চা খাইয়া পুস্তোভালভ্ ওষুধে বাহির হইয়া গেল, একটী বড় অর্ডার ছিল, তাহা সিয়াছে কিনা তদারক করিবার জন্য। তখন শীতকাল...বরফ পড়িতেছে...ভুল করিয়া সেদিন টুপি না লইয়াই চলিয়া যায়...ফিরিয়া যখন আসিল...তখন ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর একটু খারাপ বোধ হইল...ক্রমশ সর্দ্দি এবং সেই সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। ওলেন্কা পয়সার মায়া না করিয়া শহরের সব বড় ডাক্তার জড় করিল। কিন্তু যে মরিবে, কোন বড় ডাক্তারই তাহাকে বাঁচাইতে পারে না...ওলেন্কা আবার বিধবা হইল.....

শোকস্থানে দাঁড়াইয়া ওলেন্কা কান্না আর থামাইয়া রাখিতে পারিল না, আমার যে কেউ আর নেই, ওগো, কার ভরসায় আমায় এমনি ফেলে গেলে...ওগো...

বাড়ী ফিরিয়া শোকের কৃষ্ণবাস পরিধান করিল। মুখ ঢাকিয়া "কান্না-বসন" টানিয়া দিল... চিরকালের মত মাথায় টুপি আর হাতে দস্তানা পরিত্যাগ করিল। বাড়ীর বাহিরে এক-পাও বাড়াইত না। ...মাঝে মাঝে শুধু গির্জ্জায় বা পুস্তোভালভের কবরে যাইবার সময়ই যা লোকে তাহাকে দেখিতে পাইত, নতুবা অষ্টপ্রহর বাড়ীর ভিতর সন্ন্যাসিনীর মত নির্জ্জন বাস গ্রহণ করিল...বাড়ীর জানালাগুলিও বন্ধ করিয়া দিল।

ছয়মাস পরে মুখ হইতে কান্না যখন ঘুচিল...এবং লোকে দেখিল, বন্ধ জানালা দু-একটা খুলিয়াছে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা যাইত, নীরবে সঙ্গে ঝাঁদুনীকে লইয়া বাজারে চলিয়াছে কিন্তু বাড়ীর ভিতরে সে কিভাবে থাকে, কি করে, তাহার সংবাদ কেহই জানিত না। তবে ইদানিং তাহাদের বাড়ীর সামনের বাগানে দুটি সামনা সামনি চেয়ারে দেখা যাইত, সকালবেলা সেই ডাক্তার আর ওলেন্কা চা পান করিতেছে, ডাক্তার দিনের খবরের কাগজখানি হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদ তাহাকে পড়িয়া শোনাইতেছে। এবং একদিন নাকি পোষ্ট অফিসে স্বামীর কোন মহিলার সঙ্গে ওলেন্কার দেখা হইয়াছিল এবং ওলেন্কা নাকি বলিয়াছিল,

আমাদের এই শহরে পশুচিকিৎসার তেমন কোন ভাল বন্দোবস্ত নেই···সেই জন্যই জানোয়ারদের মধ্যে এত মড়ক দেখা দিয়েছে···আর জানোয়ারদের কাছ থেকে রোগ মানুষের দেহে ঢুকছে·· গরু, ছাগল, ঘোড়া, এদের স্বাস্থ্য অবজ্ঞা করলে মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য·· ঠিক এই কথাই সেই ডাক্তারের মুখেও ইদানীং শুনিতে পাইতেছিল। এই সব ঘটনার যোগাযোগ হইতে লোকে ওলেক্সার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গড়িয়া লইয়াছিল ··এবং ওলেক্সা বলিয়াই লোকে কোন কুৎসা রটাইত না। তবে ওলেক্সা বা ডাক্তার, তাহারা কেহই কোন লোককে জানায় নাই যে তাহাদের সম্পর্ক ইদানীং পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বরঞ্চ তাহারা এই পরিবর্তনের কথা লুকাইয়া রাখিতেই চেষ্টা করিত কিন্তু ওলেক্সার পক্ষে সে চেষ্টা করা যে বৃথা, তাহা ওলেক্সা না বুঝিলেও প্রতিবেশীরা বুঝিত। যাহা সে লুকাইতে প্রাণপনে চায়, তাহাই সে প্রথম যাহার দেখা পায়, তাহাকেই জানাইয়া দেয়। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ বৃদ্ধ কেরৎ সৈনিকও ছিলেন, ওলেক্সা পাকা গৃহিনীর মত তাঁহাদের চায়ে পরিতৃষ্ট করিত এবং তাঁহারা কোন কথা উত্থাপন করিবার আগেই ওলেক্সা উত্থাপন করিত, গরু ছাগলের মড়কের কথা···নতুন যে অসুখ গোয়ালে গোয়ালে দেখা দিয়াছে···তাহার বিবরণ·· শহরের কসাইখানায় যে সব বে-বন্দোবস্ত এখনও চলিয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ···

ডাক্তারের মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিত · অভ্যাসমতো চলিয়া গেলে, ওলেক্সার হাত টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিত তোমাকে এই সেদিন এত করে বারণ করলাম, যে জিনিষ জান না, বোঝ না, তা আলোচনা করো না। ডাক্তারে ডাক্তারে যখন কথা হয়, তখন বাইরের লোকের তার মধ্যে কথা বলতে নেই···বড় বিরক্তি লাগে।

ওলেক্সার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠে···ভীত, সন্ত্রস্ত-নয়নে সে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে আমি বলবো কি ?

দুচোখ দিয়া মুক্তাধারা গড়াইয়া পড়ে···স্বামীকে বাহু বন্ধনে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ওলেক্সা মিনতি করে, ওগো, আমার উপর রাগ কোরো না তুমি !

ডাক্তারের রাগ পড়িয়া যায়···আবার সুখে ঘরকন্না চলিতে থাকে।

কিন্তু এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ডাক্তার যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, হঠাৎ রাজধানী হইতে আদেশ আসিল, ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া তাহাদের অন্যত্র যাত্রা করিতে হইবে। বহুদূরে হয়তো লাইবেরিয়ায় ডাক্তারকে যাইতেই হইল···ওলেক্সা জীর্ণবসনের মত একা পড়িয়া রহিল।

আজ সে একান্তই একা। কিছুদিন হইল বৃদ্ধ পিতা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার শূন্য ইজি-চেয়ারখানি শূন্য পড়িয়া আছে · দিনের পর দিন ধুলা পড়িয়া তাহার রঙ বদলাইয়া গিয়াছে·· একটি পায়াও ভাঙিয়া গিয়াছে, আর মেরামত হয় নাই।

দিন দিন তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। পথে ইদানিং যাহাদের সহিত দেখা হয়, তাঁহারা আর আগের মত হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে না।·· মনে হয়, তাহার জীবনের স্বর্ণ-রথ তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে·· একা সে পিছনে, বহু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। আজ আর এক নূতন জীবন··· সে জীবন যেন এতটুকু আলোর ভর সয় না। সেই সন্ধ্যায় বাড়ীর পিছন দিককার বারান্দায় সে তেমনি বসিয়া থাকে, তেমনি সেই ঝিতোলী খিয়েটার হইতে বাজীর আর বন্দুকের আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া আসে ·· কিন্তু তাহার মনে আজ আর তাহা কোন সাড়া জাগায় না। সামনের শূন্য প্রান্তরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে সে

চাহিয়া থাকে, শুধু চাহিয়াই থাকে, বিশেষ কিছু চিন্তাও করে না, বিশেষ কিছু কামনাও মনে জাগে না···তারপর আলস্য ভারাক্রান্ত দেহকে টানিয়া শয্যায় লইয়া যায়···রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে, সেই শূন্য প্রাঙ্গনের শোয়া, বসা, ওঠা, খাওয়া যেন অভ্যাসবশতই করিয়া চলে।

সকলের চেয়ে মারাত্মক হইল, আজ আর কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ কোন মতামত নাই। তাহার চারিদিকে যাহা কিছু সে দেখিত, বুঝিতে তাহার কোন অসুবিধা হইত না কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কোন মতামত সে গড়িয়া তুলিতে পারিত না। আজ তাহার মন বোবা···কোন বিষয়ে কোন মতামত তাহার নাই ·· ভাবিতেও তাহার অসহ্য লাগিত। এই যে সামনে খালি ওষুধের বোতলগুলি রহিয়াছে · কিম্বা বর্ষার দিনে এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে · রাস্তা দিয়া চাষী বোঝাই-গাড়ী লইয়া চলিয়াছে· আজ তাহার কাছে উহারা আছে এই মাত্র ··তাহা ছাড়া আর কোন অন্তরঙ্গ যোগ তাহার মনের সহিত নাই। এইরূপ অবলম্বনহীন মন লইয়া সে থাকিবে কি করিয়া? যখন মুন্সিন ছিল, পুরোভালত্ বা ডাক্তার ছিল, তখন যাহা কিছু সে দেখিত, যাহা কিছু তাহার সামনে ঘটিত, প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিবার আগেই লোকে জানিতে পারিত কিন্তু আজ সামনের ঐ প্রাঙ্গনে যেমন বস্তুহীন শূন্যতা বিরাজ করিতেছে, তেমনি শূন্যতা তাহার মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সে কথা ভাবিতে, বিষণ্ণ ভিক্ততায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে।

বাহিরে পৃথিবী ক্রমশঃ বদলাইয়া চলিয়াছে। কাল যেখানে ছোট গলি ছিল, আজ সেখানে প্রশস্ত রাজপথ হইয়াছে; এই সেদিনও ত্রিভোলীর আশেপাশে সব অপরিষ্কার ছিল। আজ সেখানে নূতন সব রাস্তা, নূতন বাড়ী জাগিয়া উঠিয়াছে। কাল বিহঙ্গমের কি নিঃশব্দ দ্রুতগতি!

ওলেভার নিজেদের বাড়ীটিও তাহারই মত জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে চারদিকে ছাদে কার্নিশ ধরিয়াছে··· ধূলায়, রোদে আর বর্ষার জলে রেওয়ালের আসল রঙ আর দেখা যায় না · একদিক পাঁচিল শুদ্ধ ধসিয়া পড়িয়াছে···সামনের বাগান আগাছা আর কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে···

ওলেভারও সর্বদেহে কালের ছাপ আসিয়া লাগিয়াছে গ্রীষ্মের দিনে একলাটি সামনের বারান্দায় বসিয়া থাকে, শূন্য, বিষণ্ণ · শীতের দিনে ঘরের ভিতর জানালার ধারে বসিয়া বাহিরে দেখে, বরফ পড়িতেছে। হঠাৎ কোনদিন বাতাসে এক বলক বসন্তের উষ্ণ সুবাস মনে আসিয়া ধাক্কা দিয়া যায়. কিম্বা অন্যমনে ভাবিতে ভাবিতে কানে সহসা আসিয়া বাজে অদূরাগত ঘণ্টার ধ্বনি, তখন সহসা মনের রুদ্ধ অর্গল ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিয়া অতীত দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে এক মধুর বেদনায় হৃদয় অবশ হইয়া আসে · চোখের দুই কোণে অশ্রু টলমল করিতে থাকে · কিন্তু এ চেতনা ক্ষণিকের জন্য···ক্ষণিকে উঠিয়া ক্ষণিকে মিলাইয়া যায়। আবার জাগে সেইহৃদয় জোড়া শূন্যতা ব্যর্থ জীবনের অসহায় হাহাকার···

বৃদ্ধা মা ঘেঁসিয়া গলায় শব্দ করিয়া সোহাগ জানায়, বৃদ্ধা তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী···একটি কালো বিড়ালছানা · কিন্তু ইদানীং ওলেভার মন তাহাতে সাড়া দেয়না·· এতো সে চাহে না সে চায় এমন ভালবাসা, যাহা তাহার সমগ্র দেহ-মনকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে···তাহার সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিবে···জীবনের নূতন অর্থ আনিয়া দিবে এবং ধমনীর হিম-স্রোতে আবার জীবনের অগ্নিকণাকে জাগাইয়া তুলিবে···তাই বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধাকে টানিয়া দূরে সরাইয়া দেয়, বলে, দূরহ! তোকে কে চায়?

এমনি ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলিয়া যায় · কোন আনন্দ নাই··· আনন্দের কোন স্বাদ নাই—কোন কিছুর কোন অর্থ নাই···

হঠাৎ একদিন জুলাই মাসে, সন্ধ্যার দিকে, রাস্তার ধূলা উড়াইয়া মাঠ হইতে যখন গরুর পাল ঘরে

ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ দরজায় কে কড়া নাড়িয়া উঠিল। ওলেক্সা নিজেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে গেল···দরজা খুলিয়াই, বিস্ময়ে সে হতবাক হইয়া গেল। দেখে, দরজার সামনে দাঁড়াইয়া, ডাক্তার·· মাথার চুল সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে···এক নিমেষে হারাইয়া যাওয়া সমস্ত অতীত জাগিয়া উঠিল · অস্ফুট আর্তনাদে সে ডাক্তারের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুইজনে দরজা হইতে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে··চায়ের টেবিলে বসিয়াছে কি করিয়া কখন তাহা আবেগের আতিশয্যে সে লক্ষ্যই করে নাই।

আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলে, ডারলিঙ আমার···আমার মেটোনিচ্···এ কি সত্য?

ডাক্তার বলে, আর কোথাও যাব না ওলেক্সা ··এবার যতদিন আয়ু আছে···এইখানে থাকবো। চাকরী আমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি আমার ভাগ্যে যদি থাকে, এইখানেই যা হোক্ করে রোজগার করবো। তা ছাড়া, ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাতে হবে · তার পড়াশুনা আর ফেলে রাখা চলে না...রীতিমত এখন বড় হয়ে উঠেছে ··আর···সোনমি বোধহয়, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে গেছে? ওলেক্সা জিজ্ঞাসা করে, তিনি এখন কোথায়?

—তাকে হোটেলে রেখে এসেছি · ছেলেটা তারই কাছে আছে···আমি বেরিয়েছি বাড়ী ভাড়ার সন্ধানে!

—ওমা! সে কি কথা! বাড়ী ভাড়া? কেন আমার বাড়ী তো রয়েছে! অসুবিধে হবে তোমাদের? আমি বাড়ী ভাড়া চাই না ··আমি বলছি তোমাদের যা'খানা ঘর দরকার, আমি ছেড়ে দেবো বিশ্বাস কর, আমি আনন্দে ছেড়ে দেব।

পরের দিনই পাড়ার লোকে অবাক হইয়া দেখিল, ওলেক্সার সেই পুরানো বাড়ীতে মজুর লাগিয়াছে··· একদল চুনকাম করিতেছে · আর একদল ঘরের ভিতরের দেয়ালের রঙ ফিরাইতেছে। বহুদিন পরে তাহার মুখে আবার সেই হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে··দেহের জড়তা যেন নিমেষে উধাও হইয়া গিয়াছে·· যেন দীর্ঘ নিদ্রার পর নূতন স্বাস্থ্য লইয়া সে নব-প্রভাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারের স্ত্রী আসিলেন। রোগা, পাতলা মানুষ, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, কিন্তু মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন। শাশার হাত ধরিয়া সে বাড়ীতে ঢুকিল। শাশার বয়স দশ বছর হইবে কিন্তু দেখায় বয়সের তুলনায় ঢের ছোট ··নীল চোখ · গোল গাল—দুইগালে দুই টোল্···বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না ঢুকিতেই বৃদ্ধার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল · যেন কত কালের চেনা · বহুদিনের পর আবার দেখা হইল·· মার হাত ছাড়িয়া দিয়া শাশা ছুটিল বৃদ্ধাকে ধরিতে...তাহার হাসিতে ছোট বাড়ী ভরিয়া উঠিল···

সোজা ওলেক্সাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার বিড়াল বুঝি? কাকীমা যখন চানা হবে, একটা আমাদের দেবেন, বলুন? জানেন, মা বড্ড ইঁদুর ভয় করে।

ওলেক্সা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া চা দিল। শাশার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার বুকের ভিতর যেন টন্ টন্ করিয়া উঠিল···যেন শাশা তাহারই ছেলে...

সন্ধ্যাবেলা শাশা বই লইয়া পড়িতে বসিল। ওলেক্সা নিঃশব্দে আসিয়া একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। স্নেহগদগদ কণ্ঠে আপনার মনে সে বলিয়া উঠে, ওমা···সোনা আমার · মনি আমার···এতো বই পড়ে ফেলেছ এর মধ্যে?

উৎসাহিত হইয়া শাশা কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া দিয়া পড়িতে থাকে, যে ঘরটার চতুর্দিকে ঘর··· তাহাকে দ্বীপ বলে···দ্বীপ বলে···

দুই চোখে আনন্দের দুই দীপশিখা জ্বালিয়া দিয়া ওলেঙ্কা আপনার মনে বলিয়া উঠে যে স্থলভাগের চতুর্দিকে জল, তাহাকে দ্বীপ বলে। বহুবৎসরের নীরবতা এবং ভাবশূন্যতার পর আজ এতদিনে ওলেঙ্কা আবার একটা স্পষ্ট মত জাহির করিতে পারিল। অন্তরের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সে আপনার মনে তাই বলিয়া উঠিল, যে স্থলভাগের চতুর্দিকে জল, তাহাকেই দ্বীপ বলে।

এতদিন পরে সে আবার বলিবার মত জিনিষ পাইয়াছে। রাত্রির আহারের সময় শাশার মা-বাপকে শুনাইয়া সে বলে, আজকাল হাইস্কুলে পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা হউক···সাধারণ পেশাদারী স্কুল হইতে ছেলেদের হাইস্কুলেই পড়ানো ভাল·· তাহাতে ছেলেদের ভবিষ্যতে, ডাক্তার হউক, ইঞ্জিনীয়ার হউক, একটা জীবনের পথ খোলা থাকে···

সুতরাং শাশা হাইস্কুলে ভর্তি হইল। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাহার মা হারকোভে তাহার মাসীর বাড়ী চলিয়া গেল এবং আর ফিরিয়া আসিল না। ডাক্তার সারাদিন বাইরে থাকে, কোথায় কোন্ গোয়ালে কাহার গরু অসুস্থ হইয়াছে·· কাহার ঘোড়া হঠাৎ খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাঝে মাঝে বাইরের ডাকে তিন চার দিনের মত চলিয়া যায় ··ওলেঙ্কা অবাক হইয়া দেখে, ছেলেটির জন্য এতটুকু ভাবনা নাই·· তাহাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়াই তিনি চলিয়া যান · ওলেঙ্কার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে সে শাশাকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া আসে।

দুমাস এইভাবে কাটিয়া গেল। প্রতিদিন ভোর হইতে না হইতে ওলেঙ্কা তাহার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত, দেখিত তখনও গভীর ঘুমে সে ডুবিয়া আছে...ছোট্ট হাতটির উপর আপেলের মত লাল গণ্ডদেশটি রাখিয়া ··দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত···জাগাইতে কেমন মায়া লাগিত···

তারপর যেন বহু চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিত, শাশেঙ্কা···সোনামণি · ওঠো তারলিঙ আমার ·· বেলা হয়ে গিয়েছে·· স্কুলে যেতে হবে আবার ··

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসে, হাত মুখ ধুইয়া ছোট্ট উপাসনাটুকু সারিয়া লয় · তারপর ওলেঙ্কা নিজের হাতে তাহাকে তিন কাপ চা খাওয়ায় · সেই সঙ্গে দু টুকরো কেক·· এক স্লাইস্ মাখন দেওয়া রুটী···

ওলেঙ্কা বলে, পড়াশুনা সব ঠিক হয়েছে তো বাবা? তারপর এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে যেন, সে কোন দূর দেশে যাত্রা করিতেছে।

—তোকে নিয়ে কি যে ভাবনা আমার! খুব মন দিয়ে পড়বি···মাষ্টার যেন খুসী হয়। মাষ্টার মশাইয়ের কথা যেন অমান্য করো না!

উপদেশ চলিতেই থাকে · শাশা মাঝে মাঝে বলিয়া উঠে, খুব হয়েছে, খুব হয়েছে...থামো এখন!

তারপর মাথায় একটা মস্তবড় টুপি দিয়া, বগলে বইয়ের ব্যাগ ঝুলাইয়া ছোট্ট মানুষটি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। ওলেঙ্কা নীরবে তাহার পিছু পিছু চলে।

হঠাৎ ডাকিয়া উঠে, শাশাঙ্কা!

শাশা ফিরিয়া দাঁড়ায়, ওলেঙ্কা তাহার পকেটে একটা বিস্কুট কি একটা চকোলেট দিয়া দেয়। স্কুলের কাছাকাছি আসিয়া শাশার লজ্জা হয়; কেন তাহার পিছনে পিছনে একজন লোক আসিবে। সে কি একা আসিতে পারে না? ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, কাকীমা, এবার তুমি বাড়ী যাও! এটুকু আমি একলা যেতে পারবো!

ওলেঙ্কা আর অগ্রসর না হইয়া সেইখান হইতে দাঁড়াইয়া দেখে, যতক্ষণ না স্কুলের গেটের মধ্যে শাশা অদৃশ্য হইয়া যায়।

জীবনে বহুবার বহু লোককে সে তাহার মন দিয়াছে। কিন্তু এই ছোট্ট ছেলেটি আজ এমনভাবে তাহার মন কাড়িয়া লইয়াছে যে, অপরকে দিবার আর কিছু অবশেষ নাই, এমন গভীরভাবে এমন নিঃস্পৃহ-ভাবে সে আর কাহাকেও ভাল বাসে নাই। আজ মাতৃত্বের অপরূপ বেদনায় মাথায় বৃহৎটুপী সেই ছোট্ট ছেলেটির জন্ত, সে হাসিতে হাসিতে তাহার জীবনের যথা সর্বস্ব দিয়া দিতে পারে। কেন? কেন এমন হয়, কে বলিতে পারে?

স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া, অন্তরের পরিপূর্ণ স্নেহে টলমল করিতে করিতে সে বাড়ী ফিরিত। এই কয়েক মাসের মধ্যে তাহার মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। যেন সে নূতন করিয়া আবার তরুণী হইতেছে। পথে লোকের সহিত দেখাশুনা হইলে, এখন আবার লোকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করে, ওলেন্কা, ভারলিড, কেমন আছ বোনটী?

বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়া মুদীকে সে জানাইয়া আসে, আজকাল হাইস্কুলে পড়াশুনা বড্ড কড়াকড়ি হয়েছে · এত বেশী চাপ ভাল নয়·· জান আমার শাশাকে; স্কুলের মাষ্টার একটা ল্যাটিন গল্প মুখস্থ করতে, সেই সঙ্গে একটা ল্যাটিন অনুবাদ·· তার উপর আবার অঙ্ক দিয়েছে একসঙ্গে এতগুলো বিরেক্তিকর··· আপনিই বিবেচনা করুন, একটা ছোট্ট ছেলের পক্ষে এটা খুব বেশী চাপ নয় কি?

যতক্ষণ দোকানে থাকে, সে গল্প করিয়া চলে, শাশার মাষ্টারদের কথা, কি কি বই এখন সে পড়িতেছে···মাষ্টাররা কে কি বলে···শাশার কাছে যাহা শুনিত, অবিকল তাহাই বলিয়া যাইত।

তিনটার সময় তাহারা দুইজনে একসঙ্গে খাইতে বসিত। তারপর সন্ধ্যায় দুইজনে একসঙ্গে পড়িতে বসিত। রাত্রিতে তাহাকে ঘুম পড়াইয়া, তাহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে প্রার্থনা করিত, তারপর দুই হাত তাহার বুকের উপর তুলিয়া ধরিয়া অদৃশ্য শত্রুদের দূরে রাখিবার জন্ত নানাবিধ প্রক্রিয়া করিত। তারপর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিত, শাশা বড় হইয়াছে··ডাক্তার হইয়াছে···মস্তবড় বাড়ী···গাড়ী-ঘোড়া ··মহা-ধুমধামে তাহার বিবাহ হইল·· তারপর · তাহার পুত্র সন্তান ··

স্বপ্নের মধ্যে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া শুকাইয়া থাকিত · গভীর ঘুমের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই দৃশ্য বারবার সে দেখে ··হঠাৎ বাইরে কড়ানাড়ার শব্দে সে চমকিয়া উঠে···

তাহার বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ থামিয়া যায় শয্যায় সে উঠিয়া বসে আবার সেই শব্দ!

মাথা হইতে পা পর্যন্ত তাহার কাঁপিতে থাকে। মনে মনে ভাবে, নিশ্চয়ই হারকোভ্ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। শাশার মা তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত তার করেছে···সোহাই ভগবান।

তাহার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসতে থাকে · মনে হয়; তাহার মত হতভাগিনী পৃথিবীতে বুঝি আর কেহ নাই···ভয়ে সে উঠিতে পারে না···কয়েক মিনিট পরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়···কান খাড়া করিয়া থাকে···দেখে, ডাক্তার অত রাত্রিতে ক্লাব হইতে ফিরিতেছে·· টেলিগ্রাম নয়···

মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলে, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে! তুমি সত্যিই দয়াময়!

ধীরে ধীরে তাহার মনের ভার কমিয়া আসিতে থাকে·· আবার সে সহজ স্বচ্ছন্দ হয়···একবার শাশার মুখখানি ভাবিয়া লইয়া আবার শয্যায় শুইয়া পড়ে। শাশা তখন পাশের ঘরে ঘুমের মধ্যে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চিৎকার করিয়া উঠে,:

"চুপ্ করও ··নইলে···গেট্ আউট্!" :

সিঁদুর চরণ

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁদুরচরণ আজ দশবারো বছর মালিপোতায় বাস করছে বটে কিন্তু ওর বাড়ী এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথাথেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মশাই তামাক টানতে টানতে বল্লেন—"কে, সিঁদুরচরণ? ওর বাড়ী ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি। গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে কারণ সিঁদুরচরণ গরীব লোক। জীবনে সে ভাল জিনিষের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিলনা, সম্প্রতি মালিপোতায় এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। অজাত-কুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায়নি। মালিপোতায় এক বুনো মালি আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামীস্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরীও নেই। বুনো বলে এদেশে সেই সব কুলী মজুরের বর্ত্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীল কুঠির আমলে রাঁচি হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রভৃতি থেকে এসেছিল নীলকুঠীর আমলে মজুরী করতে। এখন তারা বেমালুম বাঙালী হয়ে গিয়েচে ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার ব্যবহার সব রকমে। পূর্ব্ব পুরুষের সোংগা পুজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরি সংকীর্ত্তন করে ঘরে ঘরে, মনসা পূজো, ষষ্ঠী পুজো করে, কালীতলায় মানত করে।

এখন যদি এদের জিজ্ঞেস করা যায় তোরা কোন দেশ থেকে এসেছিলি রে? তোদের আপনজন কোথায় আছে?

ওরা বলবে তা কি জানি বাবু!

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না?

—শুনেছি বাপ ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ ছ পুরুষ আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্যযুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এহেন বুনো মালীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু হয়তো 'কাত্যায়নী'র অপভ্রংশ হবে মাঝটা কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভাল নাম তাকে কেউ দেয়নি।

সিঁদুরচরণ পরের গরু চরিয়ে আর পরের দাদন চষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওঠ্‌বসি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হোল। সেবার বাইশ

টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত টাকা পেলে সিঁদুরচরণ, যত টাকা একসঙ্গে তার ভিন পুরুষে কখনো দেখেনি। দশটাকার নোট বাইশখানা।

কাতু বললে হ্যাগো, দশহাত ডুরন শাড়ির দাম কত?

—কেন, নিবি?

—হাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভাবচি। বড্ড সখ।

—এই বয়সে ডুরন শাড়ী পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না? কথাটা কিকিৎ রূঢ় হয়ে পড়লো, মনে হলো সিঁদুরচরণের। অল্পবয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল? আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হোলই তখন অল্প বয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি? তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ডুরন শাড়ী শুধু নয় তার সঙ্গে এলো একখানা সবুজ রংয়ের গামছা।

কাতু খুসিতে আটখানা। বললে শাড়িখানা কি চমৎকার—না?

খুব ভাল। তোর পছন্দ হয়েছে?

—তা পছন্দ হবে না? যাকে বলে ডুরন শাড়ী।

—আর গামছাখানা কেমন?

—অমন গামছা খানা কখনো দেখিইনি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারবো না প্রাণ থোয়ে। তাহলি খারাপ হয়ে যাবে।

খারাপ হয় আবার কিনে দেবো। আমার হাতে এখন কম টাকা নয়!

সেদিন কামার দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনলো সিঁদুরচরণ। বাড়ী এসে কাতুকে বললে—কাতু তুই থাক, আমি দুদিন বেশ বেড়িয়ে আসি—

—কোথায় যাবে?

একদিকে বেড়িয়ে আসি

—আমারে নিয়ে যাবা না?

—তুই যাস তো চল্ ভালোই তো—দুজনে জিনিষপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরি হোল। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে তুমি যাও আমি যাবো না। গরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যি। যদি আসতি দেরি হয় বাছুরটা বাচবে না।

—তুই যাবিনে?

—আমার সেলি চলবে কেমন করে? বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটি আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও আমি যাবো না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হোল বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়ীতে সামান্যই চড়েছে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গরুর হাট দেখতে। সেই জীবনে একবার মাত্র রেলগাড়ী চড়া পরের চাকুরী করতে করতে সারাজীবন কেটেছে।

ষ্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশটাকার নোট নিয়েছে। কেউটে পাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা ঘর রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে ও সিঁদুরচরণ, ক'নে চলেচ এত সকালে?

—একটু ইষ্টিশানে যাবো।

—কোথায় যাবা ?

—বেড়াতি যাবো রাণাঘাটের দিকি।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসলো। কাছেই একটা বাঁশনি বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে ? সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি বাঁশ। এই রকম কঞ্চির ফুল কি অন্য জায়গাতেও আছে ? দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি বড় মজা দেশবিদেশে বেড়ানো !

সিঁদুরচরণ ষ্টেশনে পৌঁছিবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো ঢংঢং করে। একজন ওকে বল্লে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ী আসচে।

টিকিটের জানালায় গিয়ে ও বল্লে ও বাবু, একখানা টিকিট দেন মোরে—

টিকিটবাবু বললে—কোথাকার টিকিট ?

—জান বাবু, রাণাঘাটেরই জান আপাততোক একখানা।

গাড়ীতে উঠে সিঁদুর চরণের ভীষণ আমোদ হোল। সে আমোদ রূপান্তরিত হোল বার বার ওর ধূমপান করবার ইচ্ছায়. ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরার, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রাণাঘাটে গাড়ী এসে পড়তে ও আশ্চর্য্য হয়ে পড়লো। ষোলমাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেনি।

রাণাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায় ? এখন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায় নি।

ষ্টেশনের এপারে একটা উঁচুমতো রোয়াক বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেল লাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালা সিঁদুরচরণ কখনো দেখেনি। সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সেই টিনের চালার তলায় বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান, বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—লোকজনে কিনচে। যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এ রকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তুরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নিচে। ও সেখানে গিয়ে বললে ক'নে যাবা ?

তারা বললে মুকসুদাবাদ, বেলডাঙ্গা।

—সে ক'নে ?

—উত্তুরে।

—কোথায় গিয়েলে ?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর। মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ির কাছে। লোকগুলো সেখান থেকে আসছে শুনে সিঁদুরচরণের মনে হোল এই দূর বিদেশ বিভূঁইয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুরের নবিছদ্দি সেখকে চেন ?

—তেনার বাড়িতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্র দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুটও তাঁরে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা?

—বেড়াতি বেরিইচি। যতদূর পাওয়া যায়, ততদূর যাবো। ওরের মধ্যে একজন বললে তবুও কদ্দুর যাওয়া হবে? আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো। আমি সেখানে যাবো।

—সে ক'নে?

—কেষ্টনগর ছাড়িয়ে।

—তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিস্ খানা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এসো ভাই।

—দাও ট্যাকা

—কত লাগবে?

—এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট এনে তার হাতে দিলে। সিঁদুরচরণ পুঁটুলির মধ্যে কাতুর দেওয়া মুড়ি পিঠে খেতে লাগলো এবং তার সঙ্গীকে দিলে: মুড়ি পিঠে আর কিছুই নয় শুধু চালের গুড়ার পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন টটের মত জিনিষ গলা দিয়ে নামে না—কিন্তু গুড় সে সঙ্গে করে আনেনি কাপড় চোপড়ে লেগেযাবে বলে। ওর সঙ্গী বলে—একটু রসগোল্লার রস কিনে আনবা? এ বড্ড শক্ত।

—হ্যাগা উত্তরের গাড়ি কখন আসবে?

—এই এল। তামুক খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা পান, পাঁউরুটি কিরিওয়ালাদের চিৎকারে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠলো। যাত্রীরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগলো গাড়ীতে উঠবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তার নতুন সঙ্গী তাকে একটা কামরায় ওঠালেন।

গাড়ী রানাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক মুখ তামাক সেবে হাঁপ ছেড়ে বললে—বাবা: —এর নাম গাড়ী চড়া? কি কাণ্ড!

সিঁদুরচরণের মনে হোল কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশ বিভূঁইয়ের দিকে চলেছে। না এলেই যে ছিল ভালো! কে জানে বাড়ীর বার হোলেই এ সব হাঙ্গামা ঘটবে। বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি? তার টাকা ক'টা কেড়ে নিতেও পারে।

তার সঙ্গী তাকে বলে বলে দিচ্ছে এই উলো, এই বাদকুল্লো, এই কেষ্ট নগর।

—কেষ্টনগর? কই দেখি দিকি? নাম শুনা আছে বহুৎদিন থেকে। সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলেনা। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ী, দুচারটি কোঠাবাড়ী। তাই দেখেই সে মহাখুশী। মস্তজায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মতো কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানাছাদে গল্প করতে হবে বাড়ী ফিরে।

আরও একটা ষ্টেশন গেল। পরের ষ্টেশনেই বোধহয় তার সঙ্গী বললে— নামো, নামো, বাহাদুরপুর।

সিঁদুরচরণ মোচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। তখন সন্ধ্যা হয়হয়—সে চেয়ে দেখে, ধূ ধূ মাঠের মধ্যে ছোট ষ্টেশন—চারিধারে কুলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ।

ঘুরে ঘুরে দুচারটে তালগাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যেটা ধ-ড় করে উঠলো। কোথায় কাতু, তাদের মাসিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে!

মনে মনে বললে—এ্যামধারা বিদেশেও মানুষ আসে! ভগমান এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে।

ওর সঙ্গী বললে—চলো।

ও বললে—ক'নে যাবো?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দুকোশ পথ।

—সেখানে যাবো?

—যাবো না তো এখানে থাকবা কোথায়? খেতে দেতে হবে তো?

—কি নাম তোমাদের গাঁ?

—গোয়ালডাঙান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সিঁদুরচরণ চললো নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ি। ক্রোশ দুই হাঁটবার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ী। ভাতপানি খাও, হাতমুখ ধোও।

সিঁদুরচরণ বললে—ভাতপানি খাবো কি, মুই ক'নে এসে পড়েছি তাই শুধু ভাবতে লেগেচি।

—কদ্দুর আসবা আবার?

—কোথায় ছেলাম আর ক'নে আলাম! উঃ! এ পিরথিমের কি সীমেমুড়ো নেই হ্যাগা? আর কদ্দুর আছে ইদিকি?

—আরে তুমি কি পাগল নাকি? কি বলে আর কি করে।

ন্যাও ভাত পানি খাও।

ভাত খেয়ে সিঁদুরচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল। বড় বড় মাঠ, ঘুরে ঘুরে তালগাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি। আর চারিদিকেই আখের ক্ষেত। উই কি একটা গ্রাম দেখা যায়। ওরপরও পিরথিম আছে ওদিকে? বাব্বাঃ!

একজন লোককে বললে—হ্যাগা ইদিকি এত আকের চাষ কেন?

—কেন, বেলডাঙায় চিনির কল আছে। আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো।—

—সব আক?

—একি আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিকে ঘাটসত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ শুদ্ধু—আক। ওর বন্ধুর বাড়ীতে দিন দুই থাকবার পরে আখের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়লো। ওদের পরামর্শে সিঁদুরচরণও আখের ক্ষেতে আখ কাটবার কাজে লেগে গেল। আটআনা রোজ। সিঁদুরচরণদের দেশে মজুরদের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে এ দেশে মজুরির রেট ভালই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার। হবেই বা না কেন, কোন্ দেশে এসে পড়েচো এখানে সবই সম্ভব।

নাগর পাড়ার ওপারে যেখানে, তার পাশে বুবলি। এই দুই গ্রাম থেকে অনেক মজুর আসতো আখের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সিঁদুরচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা? সেখানে ঘোষ মশায়দের বাড়ীতে একজন কিষাণ দরকার। দশটাকা মাইনে খাওয়া পরা।

সিঁদুরচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হোল। তাদের দেশে কৃষাণদের মাইনে মাসে পাঁচটাকার বেশি নয়, খাওয়া পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কিষাণদের রেট একটাকা বেড়েছে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিকবে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে, থাকবে কতদিন?

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরী করবা না?

—মরতি যাবো কেন বিদেশে পড়ে? মোদের গাঁয়ে চাকুরীর—অভাবটা কি?

মেয়ে দেখে বেশ দুপয়সা হাতে জমবে যখন, তখন পরের চাকুরী করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভাল একখানা রঙিন্ গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরপুরের হাটে একদিন।

রঙীন গামছাখানাই হোল কাল—এখানা কিনে পর্য্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগলো কাতু যদি তাকে এ গামছা কাঁধে না দেখলো তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি? সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল, সে কাতুর জন্যে। একদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছে। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ ছায়া ফেলেছে অনেকখানি ঠাকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে গেঁজে খুলে পয়সা কড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে, উনিশ টাকা তেরো আনা জমেছে মজুরী টাকা—সামনে একটা খালে তেরো চোদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুকগুলি তুলছে। ও বললে—কি তোলচো ও খুকি?

মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি?

—তোলচো কি?

—শুগলি।

—কি হবে?

মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাবো।

—কি জাত তোমরা?

—বাউরি।

—বাড়ী ক'নে?

মেয়েটি আবার ওদিকে যেন খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বলে নটবরপুর।

আর কোন কথা হয়না। মেয়েটি আপন মনে শুগলি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড় মনে হয়। আর থাকা যায়না। একোন মুলুক, কতদূর বিদেশ বিভূঁই যেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ পিতেমোর জন্মে শুনেচে বাউরি বলে কোন জাতের কথা, যারা খালেবিলে শুগলি তুলে খায়?

ওর মনটা হু-হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কি যেন একটা মোচড় খায়।

যদি এই বিদেশে সে মারা যায়?

কাতুর সঙ্গে তাহলে দেখাই হবেনা।

কাতু সজনে ডগায় গরু বেঁধে বিচুলি কেটে দিচ্ছে, সন্ধের সিঁদুর ঘরে ঘরে সবে জ্বালা শুরু হয়েছে, এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠলো—বল হরি হরিবোল! ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাঁদুড়ের গঙ্গাতীরে। কাতুদের পাড়ার কে একজন জিগ্যেস করলে—ক'নে কার মড়া?

—সনেকপুর!

—কি জাত হ্যাগা?

—সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ? তেনার ছেলে।

—কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড্ড কষ্ট তোল শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারাগেল—বাপমায়ের কি কষ্ট! এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানেনা। খবর পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বললে—কানচিস কেন রে?

মনটা 'বড্ড' কেমন করচে।

—দূর! বাছুরটা ধর। ইদিকি আয় দিকি?

—একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি? বিপিনঘোষের ছেলে।

—নিয়ে গেল তা তোর কি? মর মাগী। বাছুর ধর। এখুনি পিটিয়ে যাবে।

শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েচে। আর আসবে না, এতদিনে বোঝাগেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে—বিয়ে করা সোয়ামী নয়তো। গিয়েচে তা কি হবে। সকটা রয়েচে, অমন ভাল বকনাবাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

আরও দিন পনেরো কাটলো।...কাতুর চোখের জল শুকোয়না। রোজ সন্ধেবেলা মন হু-হু করে। এমন বকনাবাছুর হোল গরুটার, যার দোয়া শেষ করে আজ সেই গরু বেহুসের দুধ দিচ্ছে দুবেলায়—ও এসে বেধুক বইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে যেদিকে দুচোখ যায়।

পাড়ায় ছিচরণ সর্দার আজকাল ওর বাড়ী বড় যাতায়াত শুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর সন্ধ্যাবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে—ছিচরণ এসে বললে—ও কাতু?

—কি?

—ঘরে আছিস্?

—কেনে?

—একটু তামুক খাওয়া।

—তামুক নেই গো!

—পানসাজ একটা।

—পান ক'নে পাবো? মানুষ ঘরে না থাকলি ওসব থাকে? তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দার ঘরবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে আজ দু বছর। অবস্থা ভালো, এক এক আউড়ি ধান ঘরে তুলচে গড় তারমাসে। এবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্য্যের কিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দু'একদিন অন্তর আসে—কাতু বলতে না বললে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প

জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভাল লাগেনা এসব। আর কিছুদিন সে দেখবে—তারপর গরু বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির।

ডাকদিলে—ও কাতু!

—কি?

—বাবা:, তা একটু ভাল করে কথা বললি কি তোর জাত যাবে?

—তুমি রোজ রোজ ভর সন্ধেবেলা এখানে আস কেন?

—তার দোষটা কি?

—না তুমি এসো না! লোকে কি মনে করবে।

—একটা কথা বলি তোর কাছে আমার সংসারটা তো গিয়েছে তুই জানিস্। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

—তা কি করবো আমি?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হোল না, আমতা আমতা করে বললে—না, না, তাই বলচি।

কাতু বললে এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায়না। বললে ওরে দাঁড়া যাবো, যাবো, থাকতি আসিনি। এই দুবিশ ধান কর্জ্জ হেলায় পাঁচুকে। বলি হয়েনে বেড় পৌটি ধান, তো লোকের উপকারে লাগেতো লাগুক। ধান বেড়ে দিয়ে খুয়ে এই আসচি! বড্ড কষ্ট হয়েছে আজ।

কাতু ঝাঁকালো সুরে বললে—কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে?

—তোর সঙ্গে দুটো কথা বলসি আমার মনটা জুড়োয়। সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছোটবেলা থেকে। আমি যখন গরু চরাই, তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম।

—বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কষতে কে বলচে তোমায়?

—হ্যাঁরে, সিঁদুরচরণ তোকে কেলে এমনিই পালালো না পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে? চলাচলতির একটা ব্যবস্থা চাই তো?

—সে জন্যি তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম দুই, জিগ্যেস করি?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসলো। তার বয়েস হয়েচে একথা সত্যি, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিষের মুখ এই ক'বছর দেখচে, সিঁদুর চরণের কাছে থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়েসে? একটা পেট চলেযাবে ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবেনা। দুদিনের পেরথালি জেল্লেই যদি যায়—আর কোথাও পেরথালি বাঁধবেনা, সব ছেড়ে পথে বেড়িয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়ালো। কাতু জানে ও কেন আসে। আসে একটা অছিলা নিয়ে অবিশ্যি। বললে একটু হলুদবাটা দেবা?

নিয়ে যাও।

—দুসের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দারের বাড়ি থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোন জিনিষের অভাব নেই। হলুদ বলো, কাল বলো, পেঁজ, লঙ্কা বলো—সব মজুদ। গুড় আমার বেশ বছরে একখানা করে। ওর চার পাঁচ মণ গুড় হয় কি বছর।

কাতু বললে—তা এখন হলুদ বাটনা নেবা?

শিবির মা বললে—হলুদ বাঁটা দেও একটু। মাছ রাঁধবো।

—তবে নিয়ে যাও। আমার শরীর খারাপ, ঐ ঘর থেকে নিয়ে এসো।

—তাই তো, এই বয়েসে শরীর খারাপ হলি দেখাশুনা করে কে তাই ভাবচি!

—সে ভাবনা তোমার ভাবতি কেডা পলা ধরে সেধেছে শুনি? গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ও কাতু!

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে—তুমি! ওমা, আমি কনে যাবো!

শিবির মা অন্যদিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পাবনা পেয়ে।

এই হোল সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস এরপর থেকে মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ঘরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণ কাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুরপুর গিয়েল। জোয়ান বয়েসে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ বিদেশে। অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না।

মানুষের কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুমরির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাটথেকে ফিরচে, আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে?

সিঁদুরচরণ বিনত হস্তের সঙ্গে বললে—তা গিয়েছিলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

বটে। আচ্ছা সে কতদূর?

—আপনি কেষ্টনগর চেন?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে।

কোন দিকি জানো?

—তা কি করে জানবো, আমি কি সেখানে গিয়েছি?

—বাহাদুরপুর কেষ্টনগরের দু ইস্টিশান পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধহয় এই দেখবার জন্যে যে তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।

পিছনের জানালায়

(ক্ষেত্রমণি)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

আমি কাশীর মত আর এক জন বর্ষীয়সীকে মনে পড়ছে। ভাগবতের আসরে ওঁকে কোনদিন দেখিনি, গঙ্গাস্নানের পথেও নয়—তবু মনে পড়ছে। অমি কাশীর মত নিরাত্মীয় আত্মীয়-স্বজনহীন নয়, অথচ সব থেকেও উনি ছিলেন সর্বস্ব হারা। উনি কিন্তু এটা স্বীকার করতেন না। প্রায়ই বলতেন। আমার আত্মীয় তো বিশ্বভুবন জুড়ে—কাউকেই তো পর মনে করতে পারি না।

ওঁর বিশ্বভুবন খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল; পুরো একটি গ্রামও নয়—গ্রামের অতি ক্ষুদ্র অংশ একটি পাড়া—যেখানে উনি বাস করতেন। ওই পাড়াটিতেই বিশ্বভুবনের রূপকল্পনা—যেমন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। পাড়ার প্রতিটি বাড়ীর উনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া—দিদি, মাসী, পিসী, মামী, বুড়ি—এক এক সংসারে এক এক রকমের সম্পর্ক। বালা থেকে যৌবনোত্তরকাল পর্যন্ত নানা সম্পর্কের বহুবীর সুতোর জালে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন অক্ষুণ্ণ ভাবে। অথচ নিজে জীবনের প্রায় অপরাহ্ণকাল পর্যন্ত একটি সংসারের মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন। সদ্ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, একেবারে দরিদ্রও নয়, বাবা মা সেকালের প্রথা অনুযায়ী যথাকালে গৌরীদান করে ছিলেন, কিন্তু বিয়ের বছর পার হতে না হতে সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের নোয়া খুইয়ে ফিরে এলেন পিত্রালয়ে। সেকালের সমাজ যেমন কড়া ছিল তেমনি কুসংস্কারের অন্ধকারও কায়েমী বাসা বেঁধে থাকতো মানুষের মনে। না হলে বাল্য বিবাহের যেটা অবশ্যম্ভাবী ফল সেটা একমাত্র বালিকা বধূরই অদৃষ্টভাগ্য বলে বিবেচিত হবে কেন। আট বছরের মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে গৌরীদান করেছিলেন ওর বাবা পঞ্চাশোর্ধের এক বৃদ্ধের হাতে। শুধু বৃদ্ধ নয় রোগগ্রস্তও। কিন্তু সে কথা স্বীকার করবে কেন সংসার। সংসারের যাবতীয় ভালমন্দের কর্ণধারী তো নরবপু। তাইই এয়োতের পাতায় স্বামীর পরমায়ুর হিসাব। সে হিসাব যেখানে মেলে না—সেখানে নরবপু রাক্ষসী ডাইনী আরও বহুতর অখ্যাতির অংশভাগিনী। সুতরাং শ্বশুরগৃহে ক্ষেত্রমণির স্থান হয়নি, উনি আজন্ম পিতৃগৃহবাসিনী। পতির গৃহে নারীর যথার্থ মর্যাদা—পিতৃগৃহ স্নেহের আগার হলেও নির্ভরতার আশ্বাস দেয় না। যতদিন বাবা-মায়ের সংসার ততদিন কর্তৃত্বের কিছু অংশ থাকে—তাঁদের অবর্তমানে কথায় বলে—ভায়ের ভাত, ভাজের হাত। সেই অন্নে দাবির চেয়ে দয়ার অংশ অধিক। ক্ষেত্রমণির ভাগ্যেও এর অন্যথা হয়নি।

তা ভাই বোন মিলিয়ে ওঁদের সংসারটা ছিল বিরাট। সাত ভাই পাঁচ বোন। বিয়ের পর বোনেরা অন্য সংসারে স্থানান্তরিত, ভাইয়েরাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে দেশান্তরিত। একমাত্র মেজো ভাই বাপের ভিটেয় বাস করতেন। ক্ষেত্রমণি ওই মেজো ভায়ের সংসারে আশ্রিতা। 'আশ্রিত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে

মর্যাদাবহ নয়—কৃপার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৃষ্টত দাসীবাঁদীর চেয়ে উঁচু তলার মান হলেও স্বাধীনতা হীনতায় বেঁচে থাকাই এদের ললাটলিপি। শেষ পর্যন্ত সেই অসম্মানের আশ্রয়টুকুও ওঁকে হারাতে হয়েছিল। সে বৃত্তান্ত পরে। আপাতত ক্ষেত্রমণি সব ঘরের মানুষকে পরমাত্মীয় করার মন্ত্র কেমন করে পেয়েছিলেন সেই সূত্রটি ধরা যাক।

বাপের ছিল ছাপানী—মায়ের ছিল বাত; দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের পরিচর্যা করেছেন ক্ষেত্রমণি। সংসারে যে লোক কালচু সাধারণত সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমসাধ্য কর্মগুলি তারই ঘাড়ে এসে চাপে, উপরন্তু রোগে সেবা—শোকে সান্ত্বনা প্রভৃতি নানা অভাবিত কৃত্যভার তাকেই বহন করতে হয়। এই ভাবেই সেবাকর্মে নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন উনি। বাপ মা গত হওয়ার পর ক্ষুদ্র সংসারের তাঁর এতটুকু কর্তৃত্ব রইল না ভাজের গঞ্জনায় সংসার থেকে বা'র হয়ে এলেন ক্ষেত্রমণি। একেবারে বাস্তুচ্যুত হলেন না—যেহেতু হিস্তামত একখানা ঘর লেখাপড়া করা ছিল ওঁর নামে। শুধু ঘর থাকলেই তো একটা মানুষের খাওয়া পরা চলে না। বাপের আমলে হাতখরচ থেকে সামান্য টাকা জমিয়েছিলেন, বিয়ের সময়কার গহনাও ছিল খান দুইতিন—এ ছাড়া সেকালে মেয়েদের সামান্য উপার্জনের ব্যবস্থাও কিছু ছিল—তাঁত প্রধান অঞ্চলে তাঁতের শাড়ীতে গুল তোলার রেওয়াজ। মাসান্তে দু'তিন টাকা তাতেও আসতো। গহনা বন্ধক রেখে সামান্য সুদও পেতেন—ওই পরিমাণ টাকা। তখন চালের মণ ছিল দু'টাকা। দুটো একাদশী আর বারব্রতের উপবাস বাদ দিলে একজন একাহারী বিধবার পক্ষে সাত আট সের চালই যথেষ্ট। ভায়ের সংসার থেকে বা'র হয়ে এসেও অকূল পাথারে পড়েন নি ক্ষেত্রমণি।

এই সময়েই গ্রামের দিকে ওঁর দৃষ্টি পড়লো। সংসারের ছোট পাটীলটা যখন রইল না, কাজের চাপও অনেকখানি কমে গেল, তখন হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে কি করবেন ক্ষেত্রমণি? কাপড়ে গুলতোলা সারাক্ষণের কাজ নয়। সর্বক্ষণ পারাও যায় না। আঙুল ব্যথা হয়, চোখ টন্‌টন্ করে—মনই কি মানে? ওটা সব চেয়ে ভাল লাগে দুপুরের ছোট্ট ঘুমটুকু সেরে পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে বেওয়াল পিঁড়ি ঠেস্ দিয়ে ঘরে নানাধরণের গল্পগাছার মধ্যে ডুবে গিয়ে। হাত চলে মুখও চলে সময় দীর্ঘ হলেও শীঘ্র ফুরিয়ে যায়, পরিশ্রম শরীর মনকে অবসন্ন করে না। এই গল্পের আসরেই প্রতি সংসারের সুখদুঃখ আপদবিপদের বার্তা বিনিময় হয়। ফলে বন্ধ্যা নারী মনে সেবাপরায়ণতার যে অঙ্কুরটুকু উপ্ত হয়েছিল একদা-তা শাখাপ্রশাখা বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

খুড়শুতো বৌদি হয়তো বললেন, ঠাকুরঝি, ক'দিন ধরে তোমার কথাই ভাবছি। ভুবনের বউ পয়সো (প্রসব) হবে আজকালের মধ্যে আনন্দাশৌচ হলে কে যে নিত্যি নারায়ণ পুজোর উদ্যোগ করে দেবে ভেবে মরছি।

ক্ষেত্রমণি বললেন, এর জন্যে ভাবনা—আমি তো রয়েছি। ঠাকুরের জন্যে ভেবোনা বৌদি।

পাশের বাড়ী দাসেদের লোকাভাব। দাস-গিন্নী জ্বরে শয্যাগত, দাস-কর্তা নিজে হাত পুড়িয়ে কোনমতে ভাতে ভাত করে নিচ্ছেন। রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো, ডাক্তারখানায় যাওয়া, হাট বাজার করা কাঁথাকানি কাচা সবই করতে হচ্ছে ওঁকে। খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। ক্ষেত্রমণি দাস-গিন্নীকে দেখতে এসে বললেন, কাকা, আজকে খবর দিন, বৌমাকে নিয়ে আসুক না হলে খুড়িমাকেই বা কে দেখবে—আপনাকেই বা কে রেঁধে দেবে।

দাস-কর্তা বললেন, সেই কপাল কি করেছি ক্ষেত্তর। ছেলে আমার পাষণ্ড। জানিস তো বউটাও

পাশী, বলতা করে কলকাতায় বাসা করে আছে। এক রকম আলাদা হয়েই সংসার পেতেছে, ওরা আসবে না।

আর কোন আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন।

কে আসবে বল, সবাই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার কর্মের ভোগ আমি ছাড়া কে ভুগবে বল।

ক্ষেত্রমণি বললেন, আচ্ছা—আপনি উঠুন পাড় থেকে উঠুন তো, আমি ভাত তরকারি বাড়িয়ে দিচ্ছি।

ভূই! অবাক হলেন দাস-কর্তা। বামুনের মেয়ে—

ক্ষেত্রমণি হেসে উঠছেন। কাকা যে কী! এ কাজ তো বামুনেরই। সকল—সকল।

ওঁকে রান্নাঘর থেকে বার করে দিয়ে হেঁসেলে ঢুকলেন। শুধু হেঁসেল নয়, পরিপাটি করে ঘরদোর গুছিয়ে, রোগীকে সাগু দুধ খাইয়ে, বিছানায় চাদর পালটে দিয়ে সংসারের শ্রী ফিরিয়ে দিলেন। তিনদিন—চারদিন এক সপ্তাহ যতদিন না রোগী আর পথ্য করে বিছানায় উঠে বসছে ততদিন ক্ষেত্রমণিও সেবার কাজ চালিয়ে যাবেন।

দাস-গিন্নী কৃতজ্ঞতায় চোখের জল ফেলে বলেন, ক্ষেত্তর আর জন্মে আমার পেটের মেয়ে ছিল।

ক্ষেত্রমণি হেসে জবাব দেন, এ জন্মে বুঝি সতীন-ঝি?

একদিন সন্ধ্যাবেলায় খবর এলো হীরু চক্রবর্তীর মেজ ছেলে মারা গেছে—বউ আছাড়-পাছাড় করে কাঁদছে—সংসারে দ্বিতীয় মানুষ নেই তাকে সান্ত্বনা দেয়—ছোট বাচ্চাগুলোকে সামলায়। হীরু চোখের জল মুছতে মুছতে শবযাত্রার আয়োজন করছেন। পড়শীরা অবশ্য এসেছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে হায় হায় করে সমবেদনা জানাচ্ছে—কিন্তু বারান্দায় উঠে হীরুর বউকে তুলে ধরা বা চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মাথায় বাতাস করা—এই সব কালোচিত কর্তব্যের কথা ভাবছে না। কিংবা ভাবলেও শবস্পর্শের ভয়ে যথা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষেত্রমণিও দেখতে এসেছেন কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ওঁর অভ্যাস নয়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছেন বারান্দায় যেখানে শবদেহের বুকের উপরে পড়ে শোকাতুরা জননী অঝোর ধারায় চোখের জল ফেলছে। মৃত দেহের পাশে বসে শোকাতুরাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ক্ষেত্রমণি, কাঁদিসনে বউ, কাঁদিসনে—যে যাবার সে যাবেই, তাকে ধরে রাখা যায় না। এযে বিধাতার সৃষ্টি, মানুষের কি হাত আছে।

শোকের মধ্যেও চক্রবর্তীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যাক, ক্ষেত্র এসেছে আর ভাবনা নাই। এখন যা কিছু করণীয় ওই করিয়ে নেবে। এই সন্ধ্যাবেলায় বউকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনবে—ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে দুইয়ে ঘুম পাড়াবে—ঘর বারান্দা ধোয়া মোছা উঠোনে গোবরজল ছড়ানো সবই ঘথা নিয়মে হবে। শ্মশান থেকে না ফেরা পর্যন্ত বউকে আগলে বসে থাকবে ক্ষেত্র। আগুন জ্বালাবার ঘুঁটে দেশলাই, নিমপাতা, খাঁড়গুড় গুছিয়ে রাখবে। ক্ষেত্র যখন এসে পড়েছে, ভাবনা নাই।

এমনি করে পাড়া জুড়ে ক্ষেত্রমণির সংসার পাতা। যেদিকে জল গড়েছে—ছাতা ধরেছেন সেই দিকে। গ্রামের মধ্যে এমন তরদা আর কোথাও নাই।

ক্রোশ দুই দূরে ঘাগুদেবীর থান। বড় জাগ্রত দেবী। ফাল্গুন চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে মেলা বসে দূর দূরান্তর থেকে যাত্রী আসে মানত শোধ দিতে। পাড়ার বউয়েরা গিন্নিদের সঙ্গে সকাল বেলায় পায়ে

হেঁটে চলে যায় সেখানে। মায়ের পুজো দেয়, চিঁড়ে দই বা দুধ দিয়ে কলায় খেয়ে পালন করে ব্রত, ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলায়। চন্দ্রইতাতির আনন্দের চেয়ে বেশী। পথ কিন্তু খুব সুগম নয়—সবটাই কাঁচা রাস্তা। হাঁটুভর ধুলো, ক্ষেতের বেড়াভাঙা সেয়াকুল কাঁটা বাতাসের বেগে উড়ে এসে ধুলোর সঙ্গে মিশে থাকে—আবার বৃষ্টি হলে এঁটেল মাটির পা-হড়কানো কাদা। তবু যেতে হয় ক্ষেত্রমণিকে সপ্তাহে অন্তত তিনটি দিন—না হলে মানত শোধ দেওয়া বউয়েরা যে অসহায়।

একবার আমাদের বাড়ী বন্ধ করে কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হল। বাড়ী আগলাবার জন্য অবশ্য চিন্তা ছিল না ক্ষেত্রদি তো আছেনই বিপদে-আপদে উৎসবে আনন্দে নানা সমস্যার সমাধানে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কিন্তু বাড়ী আগলাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যা গুরুতর বোধ হতে লাগল। বাড়ীতে দুটো আইরিশ টেরিয়ার জাতীয় কুকুর ছিল, ওদের দেখাশোনা করবে কে? ব্রাহ্মণের বিধবা ক্ষেত্রদি ওঁকে তো আর বলা যায় না কুকুর দুটোকে স্নান করিয়ে খাবারটাবার দেবেন, কি রাত্রিতে ছেড়ে দিয়ে দিনের বেলায় বেঁধে রাখবেন। তা ছাড়া ওদের খাবার তৈরীর হাঙ্গামাও ছিল। মাংসের ছাঁট বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে তিনদিন। সেটা শুধু নুন দিয়ে ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করে দেওয়া। মাত্র দুপুর বেলায় খাবার। ওঁকে তো এত কথা বলা যায় না।

বললামও না। বললাম, কুকুর দুটোকে ভাবছি যাদবের বাড়ীতে রেখে যাব।

ক্ষেত্রদিদি বললেন, ওরা ওদের বাড়ীতে কেন রাখবি? আমি তো রইলাম নিজের দুমুঠো চাল ফুটিয়ে তো নিতেই হবে না হয় আর দুমুটো বেশি করে নেব। ওরা থাকলে রাতবিরেতে সাহস পাব—বাড়ী আগলাবে।

সেবার সবশুদ্ধ মাইসোর ছিলাম দশদিন। ফিরে এসে দেখি কুকুর দুটোকে যত্নেই রেখেছেন উনি। ওদের খাবা ভালই হয়েছে। বললাম, দিদি তোমার আতপ চালের গুণ দেখছি চমৎকার। এ দুটোর চেহারা একটুও টসকায় নি।

দিদি হেসে বললেন, পোড়া কপাল, আমাদের নিরিমিষি শাক পাতা সে আবার খাওয়া নাকি। কোন রকমে গর্ত বুজুনো। ওরা কোন্ দুঃখে অমন খাবার খেতে যাবে! তোমরা যা খাওয়াতে তাই খেয়েছে। তবে মাংস ভাতের সঙ্গে একটু নুন দিতাম বলি, আহা, অবোলা প্রাণী মুখের তার করে থাক।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, মাংস! কোথায় পেতে দিদি?

কেন যোগানের মাংস যোগানদার একদিন নিয়ে এলো। বললে, বাবু তো বারন করে যাননি আজ দেখছি দোকানে হবে। আমি বললাম, তা কেন, এনেইছ যখন রেখে যাও, আমি রেঁধে দেব। যেমন দিতে তেমনি দিও। ওদের রান্না আগে সেরে তারপর নেয়ে ধুয়ে আমার দুমুটো ফুটিয়ে নিতাম। তারি তো রান্না।

আমি তো অবাক! এমন করে পরের বাড়ীতে নিজের বাড়ী করতে পারে ক'জন! বালবিধবা হিন্দু মেয়ের মন বিশেষ করে ব্রাহ্মণের ঘরে এমন শুচি বায়ু রোগহীন দুইই বা ক'টি ক্ষেত্রে?

প্রতিদিন বিকেলবেলায় কাজের অবসরে প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে কে কেমন আছে তত্ত্বতল্লাস নেওয়ার রেওয়াজ আজকাল উঠেই গেছে। এখন পল্লীগ্রামেও রীতিমত শহরের হাওয়া লেগেছে। এক পাচীলে দু'খানা বাড়ী কেউ কারও চেনে না যেন বিভিন্ন ভাষাভাষী পৃথক দুটি অঞ্চল; জাতি ধর্ম ভাষা ও ভাষা মিলে যাবখানে উত্তরঙ্গ সমুদ্র! এই সমুদ্র পার হওয়া কত কঠিন—এই সত্য ভারতবর্ষের ভাষা আন্দোলন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এমনদিনে ক্ষেত্রদিদিদের কথাই বেশি করে মনে পড়ে।

রাক্ষসগণ

বেলা দেবী

জন্ম পত্রিকায় দেখা গেল—মেয়ের রাক্ষসগণ।

ঠাকুমা বললেন—মেয়েটার রাক্ষসগণ হল! ভাল নয়!

বাবা বললেন—তাতে কি হয়েছে? বিয়ের সময় কোষ্ঠি ঠিকুজী মিলিয়ে নিলেই হোল। ঠিকুজীর মিল হলে আর কোন দোষ থাকে না।

ছোট কাকা বলেন—তোমাদের যত বাজে সংস্কার। জ্যোতিষীরা দু'পয়সা করে খাবার জন্য জ্যোতিষচর্চা করে। ওরা নিজেরাও জানে গ্রহ কোষ্ঠি রাশি গণ কেউ সত্যি কথা বলে না। বরং ডাক্তারদের বড় জ্যোতিষ বলতে পারো। তারা মানুষকে দেখেই ঠিক রোগটি ধরে ফেলে। আর রোগ বুঝে অষুধটি পড়লেই আধিব্যাধি সব ঠাণ্ডা, তবেই দেখ, ডাক্তারের অভিজ্ঞতাও হাতযশের উপর নির্ভর করে গ্রহ নক্ষত্র-রা চলে কি না। ডাক্তার ঠিক ঠিক অষুধ দিলে গ্রহ শত কুপিত হয়েও কিছু করতে পারবে না। বুঝলে?

বলা বাহুল্য - ছোট কাকা একজন ডাক্তার।

জয়ন্তী ছোটবেলা থেকেই প্রায় প্রতি ব্যাপারে শুনে এসেছে তার রাক্ষসগণ। মার কাছে যদি কিছু খাবার জন্য বেশি বায়না ধরেছে তাহলেও ঠাকুমা ধমকের দিয়ে বলেছেন—মেয়ের শুধু খাই খাই। রাক্ষসী! হবে না! রাক্ষসগণ যে!

বিয়ের সময় হল যত মুস্কিল। যত সম্বন্ধ আসে ঠিকুজী মেলে না। রাক্ষসগণের জন্য বাতিল হয়ে যায়। দেবগণের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চলে না। তাহলে নাকি সারাজীবন সুরাসুরের যুদ্ধ লেগেই থাকে। আর নরগণ হলে! বাপরে! রাক্ষস কি নরকে ছেড়ে কথা কয়? নির্ঘাৎ বৈধব্য। জয়ন্তী আড়াল থেকে সবই শুনতে পায়। নিজের উপর কেমন একটা বিরূপ ভাব জাগে। মনটা কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, শুনতেই কেমন লাগে। রাক্ষসগণ। বিচ্ছিরি।

ছোট কাকা তার জানাশোনা একটি খুব ভাল বিবাহ প্রস্তাব আনলেন। বললেন—ঠিকুজী বাক্সে পুরে তখন তালা দিয়ে রাখো তো, যদি ওরা জয়াকে পছন্দ করে তবে তার বিয়ে আমি ওখানে দেবই।

বাবা বললেন—তা কি হয়! মেয়ের যে রাক্ষসগণ!

খুব হয়। মানুষ সবাই নরগণ। তার আবার দেবগণ রাক্ষসগণ কি?

না রে না, মেয়ের বিয়ে বলে কথা। যদি কিছু হয়।

কিছু হবে না হবে না। আমি বাজি রাখতে পারি।

যেই কথা সেই কাজ। ছোট কাকা কোষ্ঠির কথা ওদের কাছে তুলতেই দিলেন না। যেমাদুম

চেপে গেলেন—মেয়ের ঠিকুজীপত্র কিছু নেই, আমরা ওসব মানি না। সাত তাড়াতাড়ি একথা বলে বাবার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

মা বাবা ঠাকুমার খুঁতখুঁতনি সত্ত্বেও কোষ্ঠীর মিল ছাড়াই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের দু'দিন আগে বাবার বন্ধু প্রবোধ দত্ত বেড়াতে এসেছিলেন। কথায় কথায় বললেন—পাত্রটি বেশ ভাল পেয়েছ হে! ঐ পাত্রের সঙ্গে আমার ভাগ্নির বিয়ের কথা হয়েছিল। আমি সব জানি।

বিয়ে হলো না কেন?

কি সব কোষ্ঠী ঠিকুজীর ব্যাপার। মেলেনি নাকি তাই।

বাবা সচকিত হলেন—কি রকম!

না, অন্য কিছু নয়। আমার ভাগ্নির ছিল রাক্ষসগণ আর ছেলেটির শুনেছি নরগণ। এই মাত্র! তবে আমি ওসব বিশ্বাস করি না ভাই।

বাবা যেন চুপসে গেলেন।

বন্ধু চলে গেলে বাবা ছোট কাকাকে ডেকে সব জানিয়ে বললেন—কিছুতেই আমি এখানে বিয়ে দেব না মেয়ের। বিয়ে ভেঙে দাও।

চোখ কপালে তুলে ছোট কাকা বললেন—বল কি! বিয়ের আর দু'দিন বাকি, নিমন্ত্রণ চিঠি বিলি হয়ে গেছে। এখন বিয়ে ভেঙে দিয়ে কি একটা কেলেঙ্কারি করতে চাও?

বাবা গর্জন করে উঠলেন—হুম্ করে তুই এমন সর্বনেশে কথা বলতে গেলি কেন হতভাগা?

তুমি বিশ্বাস করো দাদা, ওসব নিছক মনের দুর্বলতা, কুসংস্কার। আমি বাজি রেখে বলতে পারি—

বাবা দ্বিগুণ গর্জন করলেন—একটা মেয়ের ভাগ্য নিয়ে বাজি ধরতে তোমার এতটুকু বাধে না!

জয়ন্তী আড়াল থেকে সব শুনলো। তার বুকটাও সংশয় আর শঙ্কায় দুলে দুলে উঠল।

বাসর ঘরে প্রথম পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতে অপরেশ বলল—ওঃ মাথাটা বড্ড ধরেছে।

জয়ন্তী শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল। মৃদু কণ্ঠে বলল—টিপে দেব?

সন্তর্পণ নববধূর কোমল হাতের শীতল পরিচর্যা চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ উপভোগ করল অপরেশ। কিন্তু আবার ছটফটিয়ে উঠল—ওঃ, দারুণ যন্ত্রণা। মাথাটা যেন কেটে যাচ্ছে।

জয়ন্তীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে খাট থেকে নেমে পড়ে বলল—ছোট কাকাকে ডেকে আনি।

না না, তাকে ডেকে কি হবে, সারাদিন উপোস গেছে কি না। তারপর এই ধকল। তাই হয়তো মাথা ধরেছে। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? শোন, যেও না—

ততক্ষণে জয়ন্তী দোর খুলে বেরিয়ে পড়েছে।

পর্বত প্রমাণ ক্লান্তি আর ঘুমে ছোটকাকা বুঝি কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দরজায় টুকটুক্ শব্দ। কোনরকম উঠে দোর খুলে ছোটকাকা অবাক, বাসরঘর ছেড়ে জয়ন্তী এখানে!

ছোটকাকা, শিগগীর চলো, ভয়ানক মাথা ধরেছে।

মাথা ধরেছে! কার! ও, জামাইয়ের। বৌ, এই ট্যাবলেট দু'টো খাইয়ে দে গিয়ে। সেরে যাবে।

না না, তুমি চলো। অসহ্য যন্ত্রণা। ব্লাড প্রেসার নাকি একটু বেশি নিয়ে অসুখ হাও।

এই ক'ঘণ্টায় ভাইঝির এহেন উন্নতি দেখে ছোটকাকা মনে মনে একটু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন—চল্ দেখি।

অপরেশ তো লজ্জায় অস্থির—দেখুন তো কি কাণ্ড! রাত দুপুরে আপনাকে আবার—। সারাদিন উপোস ছিলাম বলে হয়তো—। ও এমন কিছু নয়।

তোমার ব্লাড প্রেসার আছে নাকি বাবাজী।

ব্লাড প্রেসার! কে বলবে।

ছোটকাকা আড়চোখে ভাইঝির মুখের দিকে দেখলেন, অপরেশকে বললেন—এই ট্যাবলেট দু'টো খেয়ে নাও তো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাথাধরা ছাড়ল।

যাবার সময় ছোটকাকা ভাইঝিকে সস্নেহ কৌতুকে চুপিচুপি বলে গেলেন—ছোকরাকে বেশি রাত অবধি বক্‌বক্ করতে দিস্ না। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে।

সেই থেকে সুরু, অপরেশের এতটুকু অসুখ হলে জয়ন্তী অস্থির হয়ে ওঠে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। তার জন্য স্ত্রীর এ হেন উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা দেখে প্রথমদিকে অপরেশ রীতিমত তৃপ্তি ও গৌরব বোধ করত। তারপর ঠিক ততটা না হলেও অপরেশের ভালই লাগত। আমার জন্য একজন এমন করে ভাবে—এতে কার ভাল না লাগে!

এক এক সময় অপরেশ হেসে বলত—আচ্ছা জয়া, এ কি পাগলামি তোমার। আমার একটু অসুখ হলে এত ব্যস্ত হও কেন তুমি?

সে তুমি বুঝবে না।

সত্যিই সেকথা কেউ বুঝবে না। ছোটবেলা থেকে একই কথা বাড়ীর সবার মুখে শুনে শুনে তার মনে যে সংশয় ঢুকেছে জয়ন্তী যে তাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু একথা কি আর কাউকে বলা যায়? জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি সত্যি হয়!

জয়ন্তী ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।

জয়ন্তীর এই ব্যবহারে এক এক সময় অপরেশকে যে বিব্রত হতে হয় না এমন নয়। একদিন এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণে গিয়ে সে কি কাণ্ড! বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় অপরেশ বলে ফেলেছিল—গা-টা একটু জর জর লাগছে।

ব্যস্, হয়ে গেল, অমনি জয়ন্তী ব্যস্ত হয়ে অত লোকের মাঝে তার কপালে বুকে পিঠে হাত দিয়ে বারবার উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগল। অপরেশ লজ্জিত হয়ে বলে—কি করছ, কিছু হয়নি আমার—জয়ন্তী তবু বলে—না না, তুমি বুঝছ না। অল্পে সাবধান হওয়া ভাল, বাড়াবাড়ি হতে কতক্ষণ। শেষ পর্যন্ত একটা গরম শাল জোগাড় করে এনে ভাদ্রমাসের গুমোট গরমে অপরেশের গায়ে জড়িয়ে দিলে তার প্রবল আপত্তি চাপা দিয়ে। সবাই মুখ টিপে হাসছে। অপরেশ লজ্জায় আর গরমে সমানভাবে ঘেমে উঠল।

বাড়ী ফিরে রাগে ফেটে পড়ল অপরেশ—তুমি কি বলতো? স্থান কাল পাত্র ভেদ নেই তোমার! কি কাণ্ডটা করলে? সবাই মুখ টিপে হাসছিল। আমি তো লজ্জায় মরে যাই।

জয়ন্তী গম্ভীর হয়ে বলল—তোমার অসুখের সঙ্গে যাদের ভাল মন্দর সম্পর্ক নেই তারা হাসতে পারে। তাই বলে আমার ভালমন্দ আমি দেখব না?

আর একদিন অপরেশ জয়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। মামীমা খুব পান খান। অষ্টপ্রহর একটা পানের চিপি তাঁর গালে থাকে। অন্যকেও পান সেজে খাওয়াতে ভালবাসেন। তাঁর পানের বাটায় দোক্তা জর্দা ইত্যাদি নানা মসলার সমারোহ. এদিকে অপরেশ দোক্তা জর্দার গন্ধ ও সহ্য করতে পারে না। খাওয়ার পর মামীমা খুব যত্ন করে অপরেশকে একটি পান সেজে দিলেন। যদিও পানে জর্দা দেওয়া হয়নি তবু কি ভাবে হয়ত সংস্পর্শ এসে থাকবে, পান খেয়ে তার মাথা ঘুরে উঠল. বমি হয়ে গেল। হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। হয়ত একটু পরেই সে ধাতস্থ হয়ে উঠত। কিন্তু জয়ন্তী যা সুরু করলো—সে এক বর্ণনাতীত ব্যাপার। অপরেশ বলে—ও কিছু নয়, এক্ষুনি সামলে উঠব। অভ্যেস নেই বলে এমনটা হয়েছে, কিন্তু শোনে কে। জয়ন্তী চারদিকে এলোপাথাড়ি ফোন করতে লাগল—আত্মীয়-স্বজনকে, ডাক্তারকে। বললে—ডাক্তারবাবু. শিগ্‌গির আসুন, ভয়ানক অবস্থা. দেখে আমার হাত পা কাঁপছে। মামীমা চুপসে এতটুকু হয়ে গেলেন। আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং জয়ন্তীর কাণ্ড দেখে অপরেশের মরে যেতে ইচ্ছে হলো।

এমন মানুষকে নিয়ে অপরেশ করে কি?

এমনি করে তেইশ বছর যৌথ জীবন কাটিয়ে গ্যাসট্রিক আলসার অপারেশন করাতে গিয়ে জয়ন্তী একদিন চোখ বুজল, অপরেশ তখনও সুস্থ এবং সমর্থ। মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক আগে—হয়ত জয়ন্তী বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু নিকটে—মাথার কাছে বসা ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসিতে বললে—ছোটকাকা, আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেলুম।

আর একথাও সে স্বীকার করে গেল—দীর্ঘদিন এই রোগ তার দেহে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু ডাক্তার দেখালে পাছে সেরে যায় তাই ঘৃণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয়নি। তার কোষ্ঠির লিখনকে মিথ্যে করে দেবার জন্য এ হল জয়ন্তীর ইচ্ছামৃত্যুর সাধনা।

• • • •

বড়লোকের বাড়ীর রেলিঙে টবে গোলাপ ফুলের গাছ! কেমন করে টবটা পড়ে ভেঙে গেল। টবের মাটি পথের কাদার উপর এসে পড়লো।

পথের কাদা টবের মাটিকে ডেকে বলে: ভাই! তুমিও মাটি আমিও মাটি কিন্তু তোমার এমন সুন্দর গন্ধ!

টবের মাটি বলে, তুমিও মাটি, আমিও মাটি সত্যি। কিন্তু ভাই! আমি যে এদিন ধরে গোলাপ গাছকে জড়িয়ে ছিলুম।

আলো নেই

জীবন সরকার

গ্রামে ডাক্তার আছে কয়েকজন। বুঝিনা তবু তারা জয়দেবের কাছে কেন যায়! কেন তারা বোঝে না যে সে ডাক্তার নয়। রোগের চিকিৎসা সে করে না, সে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। অথচ তারা আসে। ব্যবসার খাতিরে তাদের জয়দেব অপ্রীতিকর না করতে পারে না। রোগের কথা শুনে দরদ হলে ওষুধ দেয়।

নিজের গ্রামে ছোটখাট একজন ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করে দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। বাজার থেকে আসার সময় এই কথাটা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে কাননের বরের সঙ্গে দেখা হল। কানন হল এই গ্রামের কিশোরীবধূ। মনেহল লোকটা কিছু বলবে। অথচ বলতে পারছে না। জয়দেবই প্রথম কথা বললো: কিছু বলবে? কাননের স্বামী মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জয়দেব আবার বললো: চুপ করে রইলে কেন?

দিন-দিন ওর শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা ওষুধ দেন যাতে ও মোটা-সোটা হয়। মিহি গলায় উত্তর দিল; অবিশ্যি কথার স্বরে একটু যেন লজ্জার ভাব। কাননের মোটা-সোটা দেহটার প্রতি লুক্কায়িত লোভটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বলে হয়তো। কাননের স্বামী হরিপদ বিড়ি বাঁধে। শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। চেউখেলান চুল। কাননের সঙ্গে এর চেহারা বিস্তর ব্যবধান। বয়সেও অনেক বড়। অথচ ওদের বিয়ে হয়েছে। আর এই অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদে বলল: আচ্ছা।

কাননকে প্রথম দেখেছে বছর দুয়েক আগে। তখন ছোট কিশোরীবধূ। রোগা লিকলিকে চেহারা। বয়েস খুব বেশী হলে তের। কখনো দেখা যেত প্রকাণ্ড একটা পিতলের কলসী ভরতি জল নিয়ে ধীরে ধীরে নদী থেকে ফিরছে। কলসীর ভারসাম্য রক্ষা করতে কাননকে নিজের দেহটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুলিয়ে দিতে হয়েছে। কখনোও বা কানন নদীর ঘাটে দুলে দুলে জলে কাপড় কাচছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নদীতে স্নান করছে। কানন ওদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছে। কখনো বা চেয়ে থাকছে অনেকক্ষণ ধরে। মাথার কাপড় খসে পড়েছে। খেয়াল নেই। কাননের ঐ রূপ মনে করিয়ে দিত— কানন বধূ হলেও কিশোরী। বধূ জীবন যাপনের ফাঁকে ফাঁকে কাননের কিশোরী মন এই ভাবেই উঁকি ঝুঁকি দিত। কিশোরী আর বধূ এই দুটো রূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা কাননকে ভাল লাগতো। কিশোরী মনের উঁকি ঝুঁকি ভাল লাগতে বাধ্য করিয়েছিল।

প্রতিবারেই জয়দেব বাড়ীতে এসে কাননের কমবেশী পরিবর্তন লক্ষ্য করতো। শেষের দিকটায় কাননের কিশোরী মনটা যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। ওর দৈহিক অপূর্ণতা নজরে পড়তো। আর এই

অপুষ্টির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা সে করেনি তা নয়। তাই কাননের দেহকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা না থাকলেও দেহের অপুষ্টির কারণ হয়তো ডাক্তারের অজানা ছিলনা। বিয়ের পর কাননের দেহ মনের উপর দিয়ে চলেছে অত্যাচার। এই অত্যাচারের কোন বিচার নেই। এই অত্যাচার ধর্মানুমোদিত। স্ত্রীর উপর স্বামীর শাশ্বত অধিকার। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার সামাজিক অধিকার কাননের নেই।

কিন্তু কাননের দেহের সেই অধিকার আছে। তাই দেহ মন আজ ওর বয়সী আর পাঁচটি মেয়ের মত নয়। মোটাসোটা নয়। কামুক পুরুষের ভোগের উপযোগী নয়।

জয়দেব দ্রুত চিন্তা করছিল কি করবে। টনিক দেবে, না উপদেশ দেবে। ভাববার বিষয় কেননা ওরা দুজনেই লেখাপড়া জানেনা, বা বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। বিশেষ কেন—নেই বললেই চলে। বলা তো যায় অনেক কিছু—কিভাবে নেবে সেটাই চিন্তা করা দরকার। এসব কথাগুলো কাননকে উঠনে দেখেই চিন্তা করছিল। ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য নিজেকে সহজেই প্রস্তুত করে নিল। কানন ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। বোধহয় হরিপদই পাঠিয়েছে। বলল ঐ চেয়ারটায় বসো।

কানন একটু ইতঃস্তত করতে লাগল। বসবে কি বসবে না। এমত অবস্থায় জয়দেব আবার বলল বেশ গম্ভীর গলায়—ডাক্তারের কাছে লজ্জা কিসের। কথা বলে পরিবেশটা সহজ করে নেবার জন্যই বলতে বাধ্য হল। কাননের দীর্ঘ ক্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল কিশোরী কানন হারিয়ে গেছে। তলিয়ে গেছে অতল জলের গভীরে। দুঃখ হল, মায়া হল, এবং সেই সহানুভূতির জন্যই মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল : তোমার শরীর এত খারাপ হল কি করে ?

কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ পায়ের বুড়ো আঙুল মাটিতে ঘসতে লাগল। মনেহল কাঁদছে। আরো গলার স্বর নামিয়ে মুখটা কাছে নিয়ে বলল : কাঁদছো কেন ? আমি বলছি তুমি ভাল হয়ে যাবে। একমাসের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার কিছু হয়নি।

কথা শুনে কাননের চোখের জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। কি বলতে চায় কানন নিঃশব্দ কান্নার মধ্যদিয়ে। চোখের জলে কি ব্যথা লুকিয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোন দুঃখ মনের মধ্যে রয়েছে। হয়তো অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে আছে ওর নিঃশব্দ কান্নার ইতিহাস। দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা কান্না আজ ঝরাতে পেরে কাননের মন সহজ হয়ে গেল। আরো কয়েকবার চোখের জল ফেলে কানন বিবাহিত জীবনের কথা বলেছিল। সেই কথায় নেই আনন্দ। নেই স্বামীর প্রতি সহজ ভালবাসা। আছে শুধু অপ্রাপ্তবয়স্কা কাননের ওপর তার স্বামীর অত্যাচারের প্রতি অশেষ ঘৃণা। আছে কাননের বুক ভেঙে বেরিয়ে আসা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কিশোরী বয়সেই কানন বধূ। সংসারে অভাব অনটনের জন্যই এত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিল তার বাপ-মা। বিয়ে হলে কি হবে, মনে তখন ধরেনি রামধনুর রং, দেহে আসেনি যৌবনের ঢল। সুপ্ত উদ্ভিন্ন যৌবনের রেখা কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে।..... স্বামী তিরিশ বছরের যুবক। বলাবাহুল্য চেহারা। মনে হয় লোহা পিটান শরীর। অনেকেই হরিপদকে ভয় করতো। কাননও ভয় পেয়েছিল এবং তা স্বাভাবিক।

ছোটবেলা থেকেই কানন একটু আত্মকেন্দ্রিক। ভয় পেলেও তা নিজের মনেই চেপে রাখতো। ভয়ের কথা প্রকাশ করার মধ্যে ছিল আরো বেশী ভয়। বিয়ের পর দেখা গেল সে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দিনের বেলা যদিও কোন ভাবে কাজেকর্মে কাটে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলেই ওর চোখের কোণে জমাট

বেঁধে আসে ভয়ের অন্ধকার। রাত্রিকে আরো বেশী ভয়। রাত্রি আসে গলা টিপে মারতে। যেন ওকে খেয়ে ফেলবে কোন বনের রাক্ষস। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে ওঠে ওর দেহ মন।

সন্ধের শেষ সীমায় এসে বড়জার কাছে সব বলে। নিজের দেহ মনের উপর রাত্রির অত্যাচারের কথা। যন্ত্রণার কথা। আর এই অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় ওর মন ওর দেহ। কিন্তু কর্তব্যের আসনে সমাসীন মানুষ বড় নিষ্ঠুর। বাড়ীর বড়বৌ রসিকতা দিয়ে সবকিছু ঢেকে রাত্রিতে পৌঁছে দেয় দেবরের ঘরে। যন্ত্রণায় জর্জরিত কানন কাঁদে। চোখের জলে বালিশ ভিজায়। স্বামীর অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করে। যন্ত্রণায় অপুষ্ট দেহটা ভেঙে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

দিন যায়—মাস যায়। এখন আর কানন কেঁদে বালিশ ভিজায় না। সারাদিনের পরিশ্রম ক্লান্ত জীর্ণ-শীর্ণ কানন একটু বিশ্রামের আশায় বিছানায় যায়। কিন্তু তা আর হয় না। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে, খিস্তি করে, তারপর গোটা কতক কিল চড় খায়। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী ধর্ম পালন করে। সারারাত ছটফট করে কাটায়। বেহুসের মত পড়ে থাকে।

দীর্ঘক্ষণ মৌন থাকার পর কানন বলল: দিন রাইত কানতে কানতে আমার চখের জল শুকাইয়া গেছে। আমি আর কানতে পারিনা।

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কানন চুপ করল। কতকগুলি মূল্যহীন সান্ত্বনার কথা শুনাবার পর অমরদেব বলল: কাল সকালে হরিপদকে নিয়ে এসো। এবং একটা টনিক নিয়ে যেও।

দু'তিন দিন পর হরিপদ এবং কানন এসেছিল। দেহ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অমরদেব কয়েকটি কথা বলার পর এবং টনিক দেবার পর বলেছিল: মানুষকে পরিশ্রম করতে হয় প্রায় সব সময়েই। এমন কি আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়া দুটোর পিছনেই থাকে মানুষের পরিশ্রম ও সংযম। কানন যে অল্প বয়সী একটি কিশোরী মাত্র সেকথা ভুলেই গিয়েছে। অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস;—সুদীর্ঘ চারবছর ধরে লুকিয়ে আসতে হচ্ছে তাকে আনন্দের পসরা। কানন তাই আজ স্বাস্থ্যবতী নয়—মোটা-সোটা নয়।

পরের দিন বিকালে নিজের ঘরে বসে কাজ করছিল অমরদেব। একটু পরেই কানন এল। সুসংবাদের আশায় বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল: আরে কি খবর?

ভাল তো। ওষুধ খাচ্ছ তো। কানন হাঁটি হাঁটি পায়ে ঘরে ঢুকল। এবং মুখটা নীচু করে উত্তর দিল: খাইতে আছি; এই দেহেন।

বলেই কানন নিজের পিটের কাপড় সরিয়ে ফেলল। পিঠের উপর দু-তিনটা লাল-লাল দাগ সাপের মত ফুলে রয়েছে। কানন কেঁদে ফেলল। কিছু বলার আগেই টাকা বিছানার ওপর রাখলো ও নিঃশব্দে চলে গেল আর কোন কথা শোনার অপেক্ষায় না থেকে। অথচ ইচ্ছে ছিল কেন এই ব্যাপার ঘটল। উপদেশের জন্য না টনিকের জন্য। কোনটা? এই প্রশ্ন উঠল—ঘর—ঘর—উঠনে ঘুরতে লাগল।.....

সময়

অশোক বসু

গতরাত্রের ঝড়ে রাসবিহারী এভিনিউর অনেক গাছ ধরাশায়ী হয়েছে। ঐ গাছেরা বহুকাল ধরে কলকাতার মাটিতে কঠিন শিকড় গেঁথে দাঁড়িয়েছিল? ভগ্নপ্রাপ্তি সত্ত্বেও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এরা এতদিন কঠিন সংগ্রাম করেছে ঝড়ঝাপটা, নিষ্ঠুর মানুষের অত্যাচার, ফাইকেপারের উদ্যত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে। আজ পুলিশ আর দমকলবাহিনী এদের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করছে।

সমীরের কষ্ট হচ্ছিল গাছগুলির অবস্থা দেখে। মাধুরীর সঙ্গে ৬'টায় সময় দেখা করার কথা গড়িয়াহাটার মোড়ে। রাস্তার এ দৃশ্য দেখে কিন্তু মাধুরীর কথা মনে পড়ছিল না। গাছ দেখতে তার বরাবরই ভাল লাগে। বিশেষ করে সবল,সতেজ, অসংখ্য ডালপালা-সংবলিত বট, অশ্বত্থ গাছেরা তাকে বড্ড আকর্ষণ করে। কি যে রহস্য থাকে এ গাছগুলির মধ্যে তা বলার নয়। সাইকলজিষ্টরা হয়ত এ আকর্ষণের সঙ্গে তার মাতৃগর্ভের অবস্থিতির একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করবে, কিন্তু সমীরের তাতে খুব একটা বিশ্বাস নেই। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করার বহুদিনের প্রচেষ্টা থেকে তার ধারণা হয়েছে, সাইকলজি অনেক মূল সত্যকে ধরতে পারলেও আবার প্রচুর ব্যাপারে তুলকে আঁকড়ে ধরে আছে অবথা পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে।

মাধুরী সময় মতই এসেছে। দূর থেকে মাধুরীর দীঘল শরীর, নগ্ন অথচ ভরাট বুক, স্নিগ্ধ মুখশ্রী দেখতে পেয়ে সমীর হাত নাড়ল। শিল্পীরা নারীদেহের সঙ্গে গাছের তুলনা করেন। মাধুরীকে কি জাতীয় গাছ বলা যায়? লতা না স্ব-নির্ভর?

"কাছেই একটা ভাল রেষ্টুরাণ্ট খুলেছে, যাবে নাকি?"

"চল। একটু ভাল কফি খাওয়া যাবে।" সমীর উৎসাহিত বোধ করল। টাটকা কফির স্বাদ ভারী উপাদেয়।

গড়িয়াহাটে যৌবনের মেলা বসে গেছে। অগুণতি ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেনাকাটা করছে গল্পগুজবে মগ্ন রয়েছে। কে বলে বাঙালী স্বাস্থ্যহীন, বিত্তহীন, সৌন্দর্যহীন? মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, ছেলেদের চেহারা চোখ জুড়োয়। প্রাচুর্যের কি অকুণ্ঠিত প্রকাশ এদের পোষাকে, উদ্ধত ভংগিমায়, চলনে-বলনে। এরা কারা—বাংলার Cream না Scum?

রেষ্টুরাণ্টের দরজা ঠেলে ঢুকবার সময় সমীরের হঠাৎ হাসি পেল। সে যেন অন্য কিছু। এই ছেলেমেয়েরা Cream অথবা Scum যাই হোক্, এদের সঙ্গেই তার মিল বেশী। সে এদেরই সগোত্র।

"স্রেফ কফি খাব, আর কিছু নয়। তুমি অবশ্য ইচ্ছে করলে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করতে পার।"

"কিছু খাবার ইচ্ছে আমারও নেই," মাধুরী বলল। "তাছাড়া এ কালের মেয়েদের সাধনা Slim হবার, যন্ত্রতন্ত্র উদরপূর্তি তার সম্ভাবনা রোধ করে। বেয়ারা, দুটো কফি।"

"Slim and hot, Cold Coffee এবং Hot woman কোন এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বিশেষ অপছন্দ ছিল, তাঁর নামটা এখন মনে করতে পারছি না। Cold Coffee-তে আমার আসক্তি নেই, যুবলে, কিন্তু একটি hot woman বহুদিন ধরে খুঁজছি।"

"আফশোষ! আফশোষ! সত্যি বাংলার বড় দুর্দিন। একটা চমচমে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এত রগ্‌রগে উপন্যাস লেখা হচ্ছে! তবে হাল ছেড়ে দিয়ো না, অন্বেষণ চালিয়ে যাও। দেখি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় কি না।"

সমীর বাঁকা চোখে মাধুরীর দিকে তাকাল। "তোমাকেই একবার পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করছে। বলা যায় না, বাইরে থেকে যতটা ধীরস্থির, নিরাপদ মনে হয়, তা হয়ত নও। আগুন ছাইচাপা রয়েছে।"

"আমি ধন্য হব। আমার এ জীবন যৌবন তো আপনারই উপভোগের নিমিত্ত। তবে আশঙ্কা পরীক্ষায় কেন না করি।"

সমীর এবার হেসে ফেল। মেয়েটার রসবোধ আছে।

রেইন্‌ট্রাণ্ট থেকে লেক। আশ্চর্য, লেকের সব গাছ আজকেও সটান দাঁড়িয়ে আছে। এরা কি সত্যিই নবীন বয়সী না রাতদিন অবাধ প্রেমের লীলা দেখে ওদের আর বয়স বাড়ে না?

"বিয়ের আগেই আমরা কি রকম কটিনে পড়ে গেছি। সপ্তাহে দুদিন দেখা করা, চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ কাটানো, অতঃপর সিনেমা কিংবা লেক··· ···"

"পরিশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রোমন্থন," সমীর পাদপূরণ করল। "বিয়ের পরে ব্যাপারটা আরো অনেক গতময় হয়ে দাঁড়াবে। অফিসে যাবার আগে একপ্রস্থ ঝগড়া, ফিরে এসে অকারণ মান অভিমানের পালা, রাত্রিকালে একত্র শয়ন। রোজ রাত্রিতে তো একসঙ্গে শুতেই হবে, নইলে বিয়ের খরচা পোষাবে না; পরে দেখবে সকাল বিকেল ঝগড়া হয় কথাকথি না করলেও কিরকম ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে। তোমার কি মনে হয়না, ইদানীং বিয়েটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য কারণে, ঠিক ভালবাসা বা পুত্রার্থে নয়? Boxing-এ যেরকম Sparring Partner থাকে, স্ত্রী বা স্বামীও অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌনতা আর হিংসাবৃত্তির অনুশীলনে সহায়ক মাত্র।"

"আসলে হৃদয় আজকাল শুষ্ক বুদ্ধির কাছে বড্ড মার খাচ্ছে। চালাকের ভয়ঙ্করকারই এখন বেশী, হৃদয়বানের জয়। দুঃখ এই, তুমি আমিও এ গতানুগতিকতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকব। অথচ আমাদের দোষটা কোথায় তা আমরা বুঝতে পারছি। হয়ত এখনও সময় আছে আমাদের নীচ প্রবৃত্তিকে লালনে চলবার, শঠতা নির্দয়তার গলা টিপে ধরার। এর পরে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।"

সমীর চমকে উঠল। মাধুরী কি বিশেষ করে ওকেই কিছু বলছে? না এ যুগের সবাইকে? আর মাধুরী যা বলছে তা কি তারও নিজেরও কথা নয়? ইদানীং গল্পলিকা প্রবাহেও অনেক বেশী গা ছেড়ে দিয়েছে। সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে না পারার ক্ষোভে সস্তা আমোদ-প্রমোদে মন দিয়েছে, সমস্যার মুখোমুখি হবার থেকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়বোধ করছে। মাধুরী কি তার পরাজিত মনোবৃত্তির কথা আঁচ করতে পেরেছে?

"বেশ তেষ্টা পেয়ে গেছে। Cold drinks কিছু একটা নেওয়া যাক।" মাধুরী হাত নেড়ে একটি বাচ্চা ছেলেকে ডাকল। এরা ঘুরে ঘুরে আশেপাশের দোকানগুলোর জন্য চা সিগারেট ইত্যাদির অর্ডার জোগাড় করে।" দুটো Spencer-এর Mango নিয়ে এস তো।"

"না না, দুটো নয়, একটা" সমীরের হাঁস কিরল। নানান চিন্তায় মনটা অস্থির লাগছে। এখন একটা সিগারেট না হলে চলবে না। Cold drink-এর কোন প্রয়োজন নেই।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে গিয়ে সমীরের হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে সিগারেটের মধ্যে গাঁজা পুরে টেনেছে অনেকক্ষণ। মাথা ধরেছিল বেশ, চারপাশের সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসছিল, কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না একবার। কিন্তু যে দু'চারদিন মদ খেয়েছে, কথা বলেছে প্রচুর; বন্ধুরা পরে ক্ষেপিয়েছে এ নিয়ে।

সমীর সিগারেট বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখে নিল। না, এতে গাঁজা নেই। মাধুরীকে বলবে না কি গতকাল ও গাঁজা টেনেছিল? কেন টেনেছিল—বাহাদুরি দেখাবার জন্য? অথচ মাদক দ্রব্যে ওর যে বিশেষ কোন আসক্তি আছে তা নয়। সেহাই পাবার এত সস্তা উপায় বের করে তো কোন লাভ নেই।

"কি ভাবছ, এত গভীরভাবে?" মাধুরী প্রশ্ন করল।

"কিছু না।" না! মাধুরীকে বলা যায় না। ও এখনও কয়েক দশক পেছিয়ে আছে। প্রেম এবং বিশ্বাসের পবিত্রতা, চিন্তাধারার স্বচ্ছতা রক্ষায় আগ্রহী। আমি অনেককাল সে যুগকে ছেড়ে এসেছি মাধুরী, সমীর মনে মনে বলে—তা আমার যত বড় দুর্ভাগ্যই হোক এখন আর সম্ভব নয় সেই পরিচিত বিশ্বাসের জগতে ফিরে যাওয়া।

মাধুরী একমনে আমের নির্যাস নিয়ে ব্যস্ত। চারপাশে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে। আকাশে ইতস্তত মেঘ। গতকালের অত প্রচণ্ড ঝড়ও যেন আকাশের রাগকে পুরো প্রশমিত করতে পারি নি।

মাধুরীকে আর কতকাল ও ঠকাবে? যে মন নিয়ে মাধুরীর সংগে মেশা শুরু করেছিল সে মন তো কবেই হারিয়ে গেছে। সুস্থ চিন্তার থেকে অসুস্থ কামনাই এখন তার মাথায় বেশী ভিড় করে। মাধুরী কিন্তু তার সুকুমার মন নিয়ে এখনও তাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে। মাধুরী তো জানে না সে যে মাঝে মাঝে নেশার আস্তানায় যায়। তার এমন অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যাদের মধ্যে সুস্থ চিন্তার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই, অশ্লীল রসিকতাই যাদের রসবোধের একমাত্র পরিচায়ক, আর্থিক সাফল্য অর্জনের জন্য যারা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। এদের সংগে যে সমীরের নেহাৎই আকস্মিক যোগাযোগ বা অত্যন্ত শিথিল সম্পর্ক তা ত নয়। সত্যি বলতে গেলে সমীর এ পরিবেশের সংগে একাত্মই অনুভব করে। কই, মাধুরীকে তো তা বলতে পারছে না।

মাধুরী কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। সমীরকে আজ বড্ড চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে।

"তোমার কি হয়েছে বল তো, লুকিয়ো না।"

"কি আবার হবে!" সমীর হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর নিজেকে অত্যন্ত অসৎ শঠ বলে বোধ হচ্ছিল। কিছুদিন আগে এক বিখ্যাত সিনেমায় দেখা একটি Scene তার মনে পড়ছিল। নায়ক নায়িকা আলিংগনে বদ্ধ। ক্লোজ আপে দেখা গেল নায়কের মুখে উগ্র কামনার বিলাস, উপভোগ বাসনায় সে অস্থির অথচ নায়িকার মুখশ্রী শান্ত, কিছুটা করুণ, যেন এ নায়কীয় উল্লাসে তার কোন আগ্রহ

নেই। নেহাৎই বলির পাঁঠা। সমীর তাদের দুজনকে নায়ক নায়িকার জায়গায় কল্পনা করার চেষ্টা করল। আশ্চর্য। কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখতে পেল অনুরূপ পরিস্থিতিতে তারা নায়কনায়িকার হুবহু প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়াবে। ছেলেটির চরিত্রের সঙ্গে সে পুরোপুরি মিশে যাবে নারীদেহের আকর্ষণই তার কাছ একমাত্র সত্য। নায়িকা এবং মাধুরীও সমগোত্রীয়। চেনেছে ভালবাসা, পাবে মাংসের আস্বাদ।

না, আর নীচে সে নামবে না। তার থেকে মাধুরীকে ফিরিয়ে দেওয়া অনেক ভাল। এ মুহূর্তে পারা যাবে না। পরে ভেবে চিন্তে উপায় বার করা যাবে। আপাতত এখন থেকে ওঠা যাক্।

"চল, ওঠা যাক আজকে।"

মাধুরী শুনেছে বলে মনে হল না। চুপচাপ বসে রইল জলের দিকে তাকিয়ে।

"চল চল, আমার একটু কাজ আছে।" সমীর তাড়া দিল।

মাধুরী একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সমীরের দিকে তারপর ধীরেসুস্থে উঠল।

সমীর আর মাধুরীর দিকে তাকাতে পারছিল না। কি বা করা যাবে। বিদ্রোহের উত্তেজনার অবিশ্বাসের পাকে চক্রে অর্থকে মোক্ষ জেনে ভালবাসার জগৎ থেকে সে অনেক দূরে সরে গেছে। এখন আর সম্ভব নয় খোলামন নিয়ে কাউকে ভালবাসা বা কারোর ভালবাসা গ্রহণ করা। কামনার হাতে নিজেকে সঁপে না দেওয়ার চেষ্টা একমাত্র করা যেতে পারে। তাতেও অবশ্য শান্তি নেই। কামনা চরিতার্থ না করার দুঃখ চিরকাল অসংখ্য সূঁচ হয়ে মাথায় হল ফোটাবে। তবু সম্পূর্ণ অসৎ হবার চেয়ে এ দুঃখকে বরণ করা ভাল।

লেকের রাস্তার গাছগুলিকে এখন আর নবীন বয়সী মনে হচ্ছিল না। ওদেরও ওসময় হয়ে এসেছে।

———

• • • •

কোম্পানী আমলে চিৎপুর রোড ও আলবাজারের সংযোগ স্থলে ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে একটি কয়েদখানা ছিল। এই কয়েদখানার পাশেই খোলা জায়গায় ফাঁসীর মঞ্চ ছিল। এবং অনেকদিন পর্যন্ত সেই উন্মুক্ত স্থানে দিনের বেলায় জনসাধারণের চোখের সামনেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসী দেওয়া হত।

রঙ্ করা পাখি

অনিল কুমার ভদ্রাই

রাঙা-বৌ হাই তুলে বলে : নাঃ, পাখি-বৌকে নিয়ে আর পারা গেল না।

কচি-বৌ বলে : কাড়া হাত পা লোক, তবু কুবলয়ং নেই। দুপুর গড়িয়ে এলো, খেলব কখন!

: যা বলেছিস্, কচি-বৌ, ওর আর অবসর হয় না। যদি আমার মত হতো, নাইতে খেতে সময় পেত না। আর বসতে পারছি না, একটু গড়িয়ে নিই, ও এলে ডাকিস্। হাসি-বৌ মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে।

: এটা খুব সত্যি। কচি-বৌ হাসে।

: আচ্ছা হাসি-বৌ, তোর ভালো লাগে? প্রশ্ন করে রাঙা-বৌ।

: কি?

: এই বছর বছর বিয়োনো?

হাসি-বৌ জবাব দেয় : কচি-বৌ এখন হাসছিস, নোতুন বিয়ে হয়েছে, হাবু-ডুবু খাচ্ছিস। কোলে একটা আসুক, বুঝবি এর কি স্বাদ।

: তোমার স্বাদ, তোমার থাক, হাসি-দি।

: তোর হবে না? জিজ্ঞেস করে হাসি-বৌ।

: হবে—একটা কি দুটো।

: তারপর?

: আর নু-না।

রমেশ মিস্ত্রি লেনের, দশ নম্বর বাড়িতে ছ'টা ফ্ল্যাট আছে। পাঁচটায় ভাড়া আছে, বাকিটা খালি। রাঙা-বৌ আর কচি-বৌর স্বামী কাজ করে সওদাগরী অফিসে, হাসি-বৌর স্বামী সরকারী চাকুরে; পাখি-বৌর স্বামীর আছে কারবার। প্রফেসর-বৌর স্বামী অর্থনীতির অধ্যাপক। সকলের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। সব ফ্ল্যাটই ছিমছাম—শ্রীময়ী।

পাঁচ ফ্লাটের পাঁচ কর্তা বেরিয়ে গেলে বৌয়েরা চান খাওয়া সেরে প্রফেসর বৌয়ের ঘরে এসে জোটে, সংসারের দুপুর তন্দ্রালু হয়ে পড়ে গলির ছায়ায়। সারা বাড়িটা ঝিমোয়। ছেলেপুলেরা সব ইস্কুলে। মাঝে মাঝে হাসি-বৌয়ের কোলের মেয়েটা কেঁদে ওঠে। পাখি-বৌয়ের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসে নানা পাখির কলরব। ঝিমনো দুপুরটা চমকে চমকে ওঠে।

প্রফেসর-বৌ আজ বাড়ি নেই। কচি-বৌ একধারে শুয়ে পড়ে। কাল রাতে সুধাংশু একটুও

ঘুমোতে দেয়নি। এতো রাতে বকতে পারে। কচি-বৌয়ের নিষেধ কিছুতেই কানে করে না। আদরে সোহাগে তাকে অস্থির করে তোলে। সে সব কথা এদের বলা যায় না। তারও চোখে ঘুম আসে।

পাখি-বৌ আসে।

রাঙা-বৌ বলে : হলো এতক্ষণে?

: হ্যাঁ, রাঙা-দি। তাস কোথা?

কচি-বৌয়ের ঘুম পালায়। বলে : পাখি-দির এতো দেরী যে?

: আর বলিস্ কেন, কাজের কি শেষ আছে। মহুয়াগুলোকে চান করাচ্ছিলুম।

: মহুয়াপাখি কবে কিনলি? রাঙা-বৌ প্রশ্ন করে।

: উল্‌টো রথে।

: কিছু বলিস্‌নি তো?

: বললে তোমরা তো শুধু ঠাট্টা করবে।

: ওঃ। তা বাপু, একটু তাড়াতাড়ি আসতে পার তো। তিনটে বাজে, এখুনি বেরে আবার খাবিতে লাগতে হবে।

: আসতে তো চাই, হয়ে ওঠে না যে।

টোয়েন্টি এইট্ খেলা সুরু হয়। একদিকে হাসি-বৌ ও পাখি-বৌ; অপরদিকে রাঙা-বৌ ও কচি-বৌ। সকলের খেলার প্রতি একলব্য মনোযোগ। মাঝে মাঝে পাখি-বৌ বলে : রাঙা-দি উঁকি দিও না··।

'তাকের' শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। বিরাট বাড়ি নির্জীব। ইট-কাঠগুলো চুপ। সকলেই ঝুঁকে পড়ে তাসের ওপর। পাখি-বৌয়ের কালো খোপে একের পর এক। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার হাতে ঘুতসই তাস আসে না। কিন্তু রং করার প্রতি তার একটা প্রবল নেশা আছে। 'ডাক' এলে সে ছাড়তে পারে না।

হাসি-বৌ অনুযোগ করে : পাখি-দি, পাঁচটা কালো, আবার রং করলে?

: তুই ভাবিস্ নি কিছু।

রাঙা-বৌ বলে : কচি-বৌ, ঠিক করে খেল, এবার সেটের খেলা।

দুপুরের চোখের তন্দ্রা কচি-বৌয়ের চোখে নামে। মাঝে মাঝে পাতা দুটো একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ে। সারা রাতের ঘুম তার চোখে ভর করে এ নির্জন দুপুরে। হাতের কার্ডগুলো শিথিল হয়ে যায় বারে বার। সাহেব-বিবি-গোলাম পরস্পরায় ভুলে একাকার হয়ে যায়।

: কচি-বৌ। উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠে রাঙা-বৌ।

: কি হলো?

: তোর হাতে রং আছে?

: হ্যাঁ।

: তবে তুরুপ করলি না কেন?

কচি-বৌ চুপ। তার হাতে রঙের সাহেব রয়েছে কইতনের বিবির পাশে।

রাঙা-বৌ আগুন হয়ে ওঠে : সেটটা মাটি করে দিলি? একটা কোটা পেলে ওরা কালো সেট খায়, আর তোর হাতে রং থাকা সত্ত্বেও হরতন পাশালি? কোথা যে তোর মন থাকে।

: আমি দেখতে পাইনি। কচি-বৌ আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

হাসি-বৌ বলে ওঠে : চোখ বুজে থাকলে দেখতে পাবি কি করে, কচি-বৌ? বেচারীর সা। রাত ঘুম হয়নি হয়তো!

: আমাকে কোথা ঘুমোতে দেখলে, হাসি দি?

হাসি-বৌ হাসে। বলে : ঘুমিয়েছিস্ বেশ করেছিস্।

: বাজে কথা বলো না, হাসি-দি। লাল হয়ে যায় কচি-বৌ।

: বাজে কথা! জানিস বেহের হত সত্যি একেবারে। বিয়ের পর সব মেয়ে-পুরুষ মাস দুয়েক রাতের ঘুম ছেড়ে দেয়।

পাখি-বৌ বলে ওঠে : আরে আমার যা হয়েছিল, বলার নয়।

: কি হয়েছিল, পাখি-দি? টান হয়ে বসে হাসি-বৌ।

পাখি-বৌ সুরু করে : তখন নবে আমার মাস দুয়েক বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ী বললেন, বৌমা, তোমার শ্বশুরের সামনে পাখাটা নিয়ে একবার বসোত। আমার শ্বশুর খেতে বসলে, একজনকে পাখা নিয়ে সামনে বসতে হবে বারমাস। মাথায় বেশী করে কাপড় টেনে দিয়ে বসলুম। পাখা আস্তে আস্তে নাড়তে থাকলুম। হঠাৎ শাশুড়ীর গলা শুনলুম, বৌমা, ও বৌমা! ধড়মড় করে উঠলুম, পাখাটা আমার হাতে ধরা আছে বটে কিন্তু ঠেকে আছে শ্বশুরের ভাতের ওপর।

গল্পে সকলে মশগুল। পাখি-বৌয়ের গল্প সকলে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে। কচি-বৌয়ের চোখের ঘুম উধাও। হাসি-বৌ খিটিমিটি হাসে; জল জল করে তার চোখের তারা। রাঙা-বৌ 'সেট' না দিতে পারার শোক ভুলে যায়।

গল্পের কোন ফাঁকে প্রফেসর-বৌ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, কারোও নজরে পড়ে না। পাখি-বৌয়ের নব-পরিণীত জীবনের মুখরোচক গল্প সকলের মনে মায়াজাল বিস্তার করে। প্রফেসর-বৌয়ের উপস্থিতি কেউ জানতে পারে না।

: পাখি-বৌ, আবার? ছিঃ!

সকলে চমকে ওঠে—প্রফেসর বৌয়ের মুখ কঠিন—চোখে ঘৃণা।

বোবা হয়ে যায় সকলে। ঘরটাও চুপ।

প্রফেসর-বৌ হতবাক্। এদের আচরণ তাকে বিস্মিত করে। সুযোগ এলেই ওরা ওদের মুখোশ খুলে ফেলে। পরিবেশ আবিল হয়ে ওঠে। প্রফেসর-বৌ ওদের মন থেকে পঙ্কিলতাকে দূর করতে চেয়েছে। তার একান্ত ইচ্ছা, পরিষ্কার হোক্, নির্মল হোক, শুচিস্মিত হোক্ ওদের মন।

কিন্তু তার চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম। আজই নয়, আরো কতবার ওরা এমনি আলোচনায় মেতে উঠেছে। অথচ সে ওদের শিক্ষা দিতে চেয়েছে। দুপুরে ওদের কাছে পাঠ করেছে সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী। কখনো বা বঙ্কিমের উপন্যাস। ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করেছে উপন্যাসের গূঢ় অর্থ। মুগ্ধ ছাত্রের মত ওরা শুনেছে। ক্ষণে ক্ষণে ওদের চোখে চমকে উঠেছে আলো। প্রফেসর-বৌ তৃপ্তিলাভ করেছে—গভীর, অনুভূত।

প্রফেসর-বৌয়ের আত্মতৃপ্তি লাভ স্বাভাবিক। শুধু তার জন্যে চারটি আত্মা আলোর সন্ধান পেয়েছে। এটা কৃতিত্ব বৈকি এবং তার একার। আর কারো নয়—সর্বৈব ভাবে শুধু তার-ই।

বার বার সে বলেছে : সৎচিন্তা, সৎ প্রয়াস, সৎসঙ্গ মানুষকে মহৎ করে। আপনাদের চিন্তা কেবলমাত্র আপনাদের ব্যক্তিগত নয়, আপনাদের ছাড়িয়ে আপনাদের সন্তান-সন্ততিদেরও। পর-আলোচনা মহাপাপ। হিংসা পরিহার করবেন।

ছোটখাট নারদও নৈতিক বক্তৃতা—মহাপুরুষদের অমরবাণীর চুম্বক। তার বুক ভরে গেছে, তৃপ্তির সুখাঘাণে।

আর চারটি বৌ অবাক। প্রকেসর-বৌয়ের সো-মসৃণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে অপলক চোখে ওর প্রতি ওদের শ্রদ্ধা জেগেছে—ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। ভেবে স্থিরিত হয়েছে : ও' তাদের মত মেয়ে, বৌ, মা কিন্তু তফাৎ কত। ভাবতে পারা যায় না। ও' সাধারণ নয়—অসাধারণ। ওদের মাঝে থাকে তবু ওদের দলের নয়—দূরের, অনেক যোজন ব্যবধানের। ওকে দেখা যায় ওর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না—ও' থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

রাঙা-বৌ বলেছে : বুঝলি, পাখি-বৌ, কুসুম (প্রকেসর-বৌয়ের নাম) সত্যি জ্ঞানী।

পাখি-বৌ বলেছে : কেন হবে না, ওর স্বামী প্রকেসর, আমাদের ওনার মত নয়।

সেদিনও প্রকেসর-বৌয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে ওরা মেতে উঠেছিল। পাশের বাড়ির বৌটা পালিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। খবরটা এনেছিল সুধাংশু। কচি-বৌ অপর তিন-বৌয়ের পাতে পরিবেশন করেছিল।

তিনটি কণ্ঠ ককিয়ে উঠেছিল বিস্ময়ে : এ্যা, বলিস্ কিরে, কচি-বৌ!

ঠিক এমনি মুহূর্তে এসেছিল প্রকেসর-বৌ। বলেছিল : ছিঃ, হাসি-বৌ।

হাসি-বৌ চুপ।

আজও সকলে চুপ হয়ে যায়। ভাসগুলো ছড়ান চারধারে। কচি-বৌয়ের চোখের ঘুম পালায়। সকলে মহা অপরাধী। ধরা পড়েছে হাতে-নাতে। কারো কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। প্রতিবাদ করার পথ বন্ধ।

কিন্তু প্রকেসর-বৌ কিছু বলে না। ওদের অবস্থা দেখে বুঝতে পারে, ওরা অনুতপ্ত। সে তাদের পাশ কাটিয়ে কাপড় ছাড়তে চলে যায়। শুধু একটা অস্বস্তির কাঁটা বেঁধে বুকে খচ্‌খচ্ করে। ওরা এতো আত্মবিস্মৃত কেন?

সে এ ঘরে ফিরে আসে। সকলে উঠে দাঁড়ায়। সে বলে : চললেন, রাঙা-দি?

: হ্যাঁ, যাই, চারটে বেজে গেছে।

: কাল সকাল সকাল আসবেন।

: আসব।

বাইরে এসে সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলে। এ ওর দিকে তাকায়। কচি-বৌ বলে : কুসুমদি ঠিক সময়ে কি করে এসে পড়ে বলদিকি, রাঙা-দি?

: আমিও তাই ভাবি। গম্ভীর রাঙা-বৌ জবাব দেয়।

প্রকেসর-বৌয়ের প্রতি এদের কোন বাদিশ নেই। ও ভালো—বড় ভালো। ওর মন সকালের ফুলের মত তাজা পবিত্র। নিজের বিবাহিত জীবনের একান্ত গোপন ঘটনার কোন শব্দ বিবরণ শোনেনি কেউ প্রকেসর-বৌয়ের মুখে। এসবও পছন্দ করে না। শুধু মাঝে মাঝে বলে : ওসব কথা মুখে বলে কি লাভ! বিবাহিত সকলেই ওসব জানে।

ঠিক, সবার জানা, বিবাহিত সবার। তবু বৈচিত্র আছে—কিছু-বা নতুনত্ব। পুরোণ কথা বলার ও শোনার নতুন স্বাদ—নতুন রস গ্রহণ। একথা প্রকেসর-বৌ বোঝে না। সে বলে: লজ্জাকর ওসব। লজ্জাকর শুধু? কৌতুককর নয়? কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলতে পারে না। তার মুখের ওপর ওসব কথা বলা যায় না।

এ জন্যে ওদের সকলের চোখে প্রকেসর-বৌ বড়। ওর প্রতি শুধু ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধাই নয়, ভালবাসাও আছে সকলের। সকলেই একটা আকর্ষণ অনুভব করে। সেজন্যে আবার ওরা আসে, কেউই বাদ করে না।

এদের জীবন গড়িয়ে চলে। দুপুর বিমিয়ে আসে। পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে বাসি রোদের ম্লান আলো সরে যায়। পাখি-বৌয়ের ফ্ল্যাট থেকে পাখির ডাক ভেসে আসে। এদের পরার দুপুরের জীবন চলে বাঁধা পথে, বাঁধা গতি মেনে।

প্রকেসর-বৌয়ের পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়া আসে। চার বৌ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। প্রকেসর-বৌ বেরোয় না। সে নিরাসক্ত—নিষ্কৌতূহলী তার মন। তার ঘরের ভারী পর্দা নিশ্চুপ। কিন্তু এরা থাকতে পারে না, বেরিয়ে আসে ঝলমল করে।

রুচি-বৌ বলে: এবার পাখি-দির জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হবে না। আর একটা পার্টনার পাওয়া গেল।

: খেলতে নাও জানতে পারে? পাখি-বৌ বলে।

খাপ থেকে হাসি-বৌ বলে: দিখিয়ে নোব, পাখি-দি।

: চুপ কর্ তোরা। মানুষের দেখা নেই, এর মধ্যে তোরা খেলার লোক ঠিক করে ফেললি।

লোকের দেখা পাওয়া যায় পরের দিন সকাল বেলা। স্বামী-স্ত্রী। ছেলেমেয়ে নাস্তি। স্বামী কোথায় যেন কাজ করে। কোম্পানীর এক সহী নাম মনে রাখা যায় না। ভদ্রলোক সুপুরুষ। মেয়েটি ছিপছিপে: হাসিখুশি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম রমলা।

দুপুরে চার বৌ রমলাকে নিয়ে প্রকেসর-বৌয়ের ঘরে আসে। রাঙা-বৌ বলে তোমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এসেছে, দুপুর।

: ওঃ। প্রকেসর-বৌ স্থির, নিস্পন্দ।

হাসি-বৌ বলে বলে: আমাদের এখানে, ভাই, আমরা নিজেদের নামে পরিচিত নই। কারো-বা নামের পাশে অথবা কারো-বা নোতুন নাম দিয়ে একটা 'বৌ' জুড়ে দেওয়া হয়। তুমি নোতুন এসেছে, তোমাকে কি বলে ডাকব, তাই?

: কেন, নোতুন-বৌ বলে। জবাব দেয় রমলা।

: ঠিক, ঠিক।

প্রকেসর-বৌ বলে: আজ 'পীতাম্বর' পড়ব, শোন।

সকলের মনটা তাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আজ একজন নোতুন লোক এসেছে। আজ তাস অন্ততঃ খেলা জমবে ভালো।

রাঙা-বৌ বলে: দুপুর, আজ তাস খেলা হোক।

: রোজ-রোজ তাস খেলে কি সুখ পান, রাঙা-দি। বঙ্কিম স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে যেয়ে আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম রচনা করেন! আপনাদের এসব শোনা দরকার।

প্রফেসর-বৌয়ের মতে যখন দরকার, তখন দরকার বৈকি! সকলে চুপ করে বসে। মনটা কেমন কেমন করে সকলের। তাস খেলা হলো না। আপশোষ হয়। যাক্, কাল হবে। এত ভেবে—এই বই পড়া।

ঘড়িতে চারটে বাজে সকলে আড়মোড়া ভাঙে—এবার উঠতে হবে। ছেলেদের ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় হয়েছে। জলখাবার তৈরী করতে হবে। প্রফেসর-বৌ বই বন্ধ করে। ঘরের বাইরে আসে সকলে।

নোতুন-বৌ বলে: খেলা হলো না ত?

: কাল হবে। বলে কচি-বৌ।

: এসব আপনাদের ভালো লাগে? আমার একটুও ভালো লাগে না।

চুপ, চুপ, শুনতে পাবে।

সকলে বলে ওঠে। পেছনে তাকায় ভয়ে ভয়ে—তারি পরদাটা দুলে উঠল নাকি? না, স্থির—নিষ্কম্প।

নোতুন-বৌ বলে। আসুন না, কচি-দি, আমার ঘরে।

মাটিতে পাতা বিছানার ওপর বসে দুজনে। ঘরে জিনিষ-পত্তর প্রায় কিছুই নেই। ফাঁকা-ফাঁকা চারধার। তাকের ওপর সাজানো বই আর পত্রিকা।

: ওসব কার? জিজ্ঞেস করে কচি-বৌ।

? : টাকা পেলেই কেনে ওসব। ওগুলো ওর ভারী প্রিয়।

: তোমার চেয়ে?

: বুঝতে পারি না। লেখাপড়া আমার ভালো লাগে না। সেজন্যে ও রাগ করে।

: কতদূর পড়েছ?

: বি. এ. ফার্স্ট পার্ট।

: ওঃ বাব্বা! আমরা তাই একেবারে মুখ্যু। তুমুরদি খুব লেখা পড়া জানে।

: জানুক। সারাদিন সংসার ঠেলার পর ঐ বইয়ের কচ্‌কচানি আমি বরদাস্ত করতে পারি না। একটু আনন্দ চাই তো।

: কি করব, তুমুরদি বললে, না করতে পারি না।

: ছবি দেখবেন?

: কি ছবি?

নোতুন-বৌ একটা সিনেমা পত্রিকা দেয় কচি-বৌকে। পাতা ওল্টায় কচি-বৌ। পাতায় পর পাতা কতো মেয়ে-পুরুষের ছবি। কত রঙ্, কত ঢঙ্। চোখের চাহনি কত রকমের। ভালো লাগে কচি-বৌয়ের। তার কাছে নতুন একটা জগতের সিংদরজা খুলে যায়। একটু যেন নেশা হয় তার।

একটা ছবি দেখিয়ে কচি-বৌ বলে: এরা কারা স্বামী-স্ত্রী নাকি?

: বুঝলেন কি করে?

: এমন করে চুমু খাচ্ছে যে লজ্জা করে না?

: ওরা ইংরেজি ছবির নায়ক-নায়িকা। ইংরেজি ছবি দেখেন না?

: না। তুমি?

: কত।

: কার সঙ্গে?

: ওর সঙ্গে।

: পাশাপাশি বসে?

: একেবারে গায়ে-গা দিয়ে।

অবাক কচি-বৌ। বলে কি মেয়েটা ছবিটা আর একবার দেখে। মন্দ না কিন্তু—বেশ। বলে: দিয়ে যাব বইটা?

: যান না।

সংক্রামক রোগের মত বইটা হাত বদলায়। একবার ছুঁলে আর নিষ্কৃতি নেই। হাসি-বৌ বেজায় খুশি। সে বইটার প্রেমে পড়ে যায়। বার বার ছবি দেখে আবার, তারপর আবার। পাখি-বৌ তো স্বামীকেই দেখায়। বলে: যাবে একদিন ইংরিজি ছবি দেখতে? রাঙা-বৌ বয়স্থা। যৌবন হেমন্তের বেলার মত যাই যাই করছে—পড়ে এলো বলে। রাতে স্বামী ঘুমুলে আলো জ্বালে। মিটিমিটি রঙিন আলো। সময় চলে, রাত বাড়ে, বাতাস আসে একটানা গায়ের কাপড় দোলে, কাঁপে, এলোমেলো হয়। জানলায় দাঁড়ায়। ভাবে: এ জীবনে আর নয়!

টুক করে নোতুন-বৌয়ের ঘরে ঢুকে পড়ে কচি-বৌ। দরজা বন্ধ করে। টিপি টিপি হাসে মিষ্টি করে। সূর্যা লাগান টানা-টানা চোখে তাকায়। শুধু বলে: এলুম।

: ওখানে গেলেন না?

: না।

: কেন?

: ভালো লাগছে না।

: নোতুন ব্যাপার। আপনাদের কুসুমদি কিছু বলবেন না?

: বলুক গে। তুমি, ভাই, আপনি আপনি করো না। আমরা প্রায় একবয়েসী, 'তুমি' বলো।

সমবয়সী চঞ্চল প্রাণ। কৌতুক প্রবণ মন। নোতুন স্বামী, নোতুন ঘর, ঘনিষ্ঠ জীবন। দুজনে মিশে যায়।

প্রফেসার-বৌ বলে: কচি-বৌ এলো না যে?

পাখি-বৌ জবাব দেয়: হয়তো শরীর ভালো নয়।

আজো শুরু হয় 'সীতারাম' পড়া। হাসি-বৌয়ের মনটা বাইরে বেরিয়ে যায় ভারী পর্দার পাশ কাটিয়ে। টোকা দেয় নোতুন-বৌয়ের দরজায়—টুকটুক। চুপিচুপি। কেউ যেন শুনতে না পায়। প্রফেসর বৌয়ের পড়া তার কানে ঢোকে না।

কচি-বৌ তাকে বলেছিল: আসুন না।

: না, ভাই, কুসুমদি···

ঠীক হাসি-বৌ। কষ্ট হয়েছিল কচি-বৌয়ের।

হঠাৎ তীব্র হাসির শব্দ আসে। লুটোপুটি খায় ঘরের মেঝেয়। চোখ তোলে প্রফেসর-বৌ। মুখ তোলে সকলে। মিলিত কণ্ঠের হাসি—উচ্ছলিত হাসির জোয়ার।

: কচি-বৌয়ের গলা না? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন প্রফেসর-বৌয়ের।

: বোধহয়। সায় দেয় রাঙা-বৌ।

: পাখি-দি বললেন কি না ওর শরীর খারাপ। শুনুন···

সন্তোষ মুখে হাসি-বৌ ঘ'রে কচি-বৌকে। বলে: অত জোরে হাসছিলি কেন? কুসুমদি···

: রেখে দাও তোমার কুসুমদি। কি গল্প···হি-হি-হি·· মনে পড়লে হাসি পায়। আর শুনে না হেসে থাকা যায় বুঝি!

: কি গল্প রে, কচি-বৌ?

: কাল বলব। ও' এসেছে, জলখাবার দিতে হবে।

দিন কয়েকের মধ্যে প্রফেসর-বৌয়ের ঘর একেবারে শূন্য। এখন চোখে পড়ে, একটা নোতুন লোক এসেছে বাড়িতে। সামান্য মেয়ে নয়—আকর্ষণও যেন কিছু আছে। হ্যাঁ, আকর্ষণই বটে—পতঙ্গের কাছে প্রদীপ। একহারা কালো মেয়েটা ওদের কি দিয়ে ভোলাল? প্রশ্ন একবার পাক খায় তার মনে।

এ দুপুর বড় ফাঁকা। বড় একা-একা। ঘুম আসে না তার। জলেও চোখের পাতা খোলা থাকে। এটা সহভ্যাস। কিন্তু আজ মনে হয়—বদভ্যাস। ঘুমুতে পারলে দুপুরের অসহ্য নীরব শূন্যতাকে কিছুটা ভরিয়ে দেওয়া যায়।

রবিবার দুপুরে বিনোদ বলে: তোমার শিকারী কোথা গেল?

প্রফেসর-বৌ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলে: ঠাট্টা করছ?

: রামচন্দ্র! আজ এ অসময়ে আমার কাছটিতে বসে আছ, তাই জিজ্ঞেস করছি।

: ওরা নোতুন-বৌয়ের ঘরে গেছে।

: হঠাৎ?

: কি করে জানব।

: ভদ্র মহিলার কিন্তু গুণ আছে নিশ্চয়, না হলে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

: মানে?

: তোমার প্রতিপক্ষ আর কি।

: বাজে বকো না।

: তবু সত্যি কথাটা স্বীকার করতে হয়, তোমার হার হয়েছে।

: তোমরা এসব ভাব কি করে? আমার শিক্ষা এমন নয় যে শুধু শুধু একজনকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে যাব। মনটা পরিষ্কার কর।

জ্বলে ওঠে প্রফেসর-বৌ। বিনোদ শিক্ষিত কিন্তু মনটা?—কুৎসিত। যার মনে চেনা নেই, জানা নেই সে প্রতিদ্বন্দ্বী হয় কি করে? আর ঐ একরত্তি মেয়ে হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী?—ধিক! প্রফেসর-বৌ স্বামীর ওপর ভীষণ রেগে যায়—বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে বিনোদের।

দুপুর আসে। ভটিৎ কাক-ডাকা দুপুর। ঢুলু ঢুলু চোখ। এমন স্তব্ধতার মাঝে সে বিনোদের কথাটা ভাবে। ভাবতে চায় না, সরিয়ে দেয় দূরে। আবার আসে—মাছি যেন। বাতাস পেলে উড়ে যায় কিন্তু আবার আসে। ওটার হাত থেকে মুক্তি নেই।

নোতুন-বৌয়ের ঘরে কলরব উদ্যম হয়। সে বিরক্ত হয়। দরজাটা বন্ধ করা দরকার। উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়। কচি-বৌয়ের গলা তার কানে আসে : তারপর ?

একটু চুপ। হাসি-বৌয়ের বিস্মিত স্বর : এঁ্যা। তুই! গলা ধরে ··

আবার হাসি—উচ্চগ্রাম। নোতুন-বৌয়ের দরজা বুঝি খোলা।

সে দরজা বন্ধ করে। ছিঃ ছিঃ আর সেই সব! ভাবতেও লজ্জা পায় সে, আর ওরা ? নিঃসঙ্কোচে বলে যায়—অবলীলাক্রমে। আর হাসি দেখ—অসভ্য কোথাকার—মুখ হলে যা হয় আর কি।

ওদের হাসি তার বুকে বাজে। একটু যন্ত্রণা, মৃদু জ্বালা—হুড়ে যাওয়া চামড়ায় চিন্‌চার আইডিন পড়েছে। জ্বালা- চিন্‌চিনে। যায়—আসে।—কেন ?

সকলে ভীত। সন্ত্রস্ত।

বাড়ির চারধারে পুলিশ। বিশ্রী ব্যাপার। নোতুন-বৌ কারো বিয়ে-করা বৌ নয়। পালিয়ে এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করেছে। ও' লোকটা নোতুন-বৌয়ের আপন পিসতুত ভাই।

সকলেই এসেছে! প্রফেসর-বৌও। শুধু পাখি-বৌ গর হাজির। সে পাখি চান করাচ্ছে।

পুলিশ চলে যায়। নোতুন-বৌ যায়। যায় তার সাময়িক স্বামী।

রান্না-বৌ বলে : মেয়েটা বড় ভালো ছিল।

হাসি-বৌ বলে : কচি-বৌকে বড্ড ভালোবাসত।

কচি-বৌ কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

: চুপ কর্, কচি-বৌ চুপ কর্। রান্না-বৌ সান্ত্বনা দেয়।

: বেরিয়ে আসা মেয়েদের ধরণ-ধারণ আলাদা। ওরা ভোলাতে ওস্তাদ।

সকলে তাকায় প্রফেসর-বৌয়ের মুখের দিকে। কচি-বৌও। একি কথা ওর মুখে।

পাখি-বৌ আসে। বলে : জানো, রান্না-দি, মদ্দুয়াগুলোকে চান করাতে একটার রঙ্ উঠে গেল কি ধড়িবাজ লোক বাব্বা! বাচ্চা চন্দুইকে রঙ্ করে মদ্দুয়া বলে চালিয়ে দিয়েছে।

চার-বৌ চুপ। নির্বাক।

• • • •

ক্রমে ক্রমে কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো কলকাতা বদলাতে লাগলো। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে নূতন লোকের পক্ষে তাকে চেনা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যদি না থাকতো কেল্লা, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট আর গঙ্গা।

বিশ্বাস

প্রভাত দেবসরকার

তখন বয়স্কদের সলাপ দৃষ্টির জন্যে আমাদের আড্ডাটা সব সময় এক জায়গায় স্থিতি হ'তে পারতো না। তার উপর ছিল বেকার ছেলেদের ওপর অভিভাবকদের অষ্টপ্রহর খবরদারি! তাই কোন জায়গায় বসে, মুখিয়ে হ'য়ে জমিয়ে কোনদিন আমরা আড্ডা দিতে পারতুম না; সব সময় ভয়, এই বুঝি গুরুজন কি পার্জেন কেউ দেখে ফেললেন! আর তা, হ'লেই হ'য়ে গেল! পরের দিন পাড়ার রোয়াকে (তখনকার বুড়োদের আড্ডা) তাই নিয়ে আলোচনা: ছেলেগুলো সব বকে গেল হে! শুনতে যদি ওদের কথাবার্ত্তা……।

আড্ডায় আমরা নিজেদের মধ্যে কি বলি, না বলি তার কোন ঠিক আছে: বুড়োরা কিন্তু তাই নিয়েই খোঁট ক'রবেন: সব গোল্লায় গেছে! বেকার বসে বসে ঐসব হ'চ্ছে!

কি সব? সে-কথা আর কে জিজ্ঞেস করে, কি কারো সাহস হয় বুড়োদের মুখের ওপর জিজ্ঞেস করায়? (এখনকার ছেলেছোক্‌রা তো নয় যে, কারো খাতির ক'রবে না, কি ছেড়ে কথা কইবে না!) তখন পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তি আর বাড়ীর অভিভাবক, দুই-ই আমাদের কাছে সমান ছিল।

• • • •

ছাড়ান চীনাবাদামগুলো হাতের চেটোয় রগড়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে খোসা উড়িয়ে বিজন বললে, তখন বলেছিলুম না কারো বাড়ীতে বসে, কাজ নেই!

নতুন সিগ্রেট্ খেতে শিখিছি: বিনয় এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রিং করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললে, তারকের জ্যেঠাটাই অমনি, ছিলুকে ভাল বাসেন!

নীহার নাকে নস্যি গুঁজে প-প ক'রে বললে, আর কি আশ্চর্য দেখ এত লোক থাকতে উনিই শুনলেন!

তারক নিজের জ্যেঠাকে তোয়াজ না করার ভঙ্গিতে বললে, শুনেছেন তো শুনেছেন!

তারকের সৎ সাহসে আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করলুম্। পাড়ার বুড়োদের মধ্যে ওঁকেই তো আমাদের সব চেয়ে বেশি ভয়। অভয়চরণবাবু কোন ছেলের সম্বন্ধে কিছু বললেন মানে, তার হ'য়ে গেল! অর্থাৎ সে ছেলে গণনার বাইরে!

ভয়ে ভয়ে সুভাষ জিজ্ঞেস ক'রলে, কারো নাম করেছেন কি?

তারক গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিলে, না!

আধ-খাওয়া সিগ্রেট-টা আমার হাতে চালান ক'রে দিয়ে বিনয় বললে, তা হ'লে আর ভয়ের কি আছে? ভাববার কিছু নেই।

ভাববার কিছু নেই বলেই তো যত ভাবনা! তারকের জ্যেঠা কি আর কিছু না বলে, ছেড়েছেন। কারো নাম না করলেও আমাদের দলটাকে তিনি বেশ দিয়েছেন!

জেরা করার ভঙ্গিতে নীহার জিজ্ঞেস ক'রলে, সেদিন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছিলুম রে? কি কথা বলেছিলুম্?

বিজন গলদ্ঘর্ম গাম্ভীর্যে বললে, কি নিয়ে আবার! মনে নেই?

মনে আমাদের সবারই আছে, তার ভাবটাও সবার মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে!

তবু নীহার সহাস্যে বললে, কিরে সোনুতে, তুই অমন ক'রে আছিস্ কেন, বল্না?

তারক খিঁচিয়ে উঠলো, কি আর বলবে! ও একা নাকি! সবাই মিলে তখন খুব যে—

সোনুতে অর্থাৎ সন্তোষ, তখনো মুখ নিচু ক'রে বুড়ো আঙুলের টিপ্ দিয়ে পুট্ পুট্ ক'রে চীনাবাদাম ভাঙছে।

তেমনি গাম্ভীর্য সহকারে বিজন বললে, তখন ঐজন্যে তোদের বার বার বলেছিলুম ঘরের মধ্যে নয়। নাও, এখন তারকের জ্যেঠাকে সামলাও!

বিনয় বললে, তুই আবার তখন বল্লি? তুই-ই তো সুভাষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরম্ভ ক'রলি!

বিজন চোখ বড় বড় ক'রে বললে, আমি আরম্ভ করলুম? ভ্যাট্-ই বাজে বকিস্নি!

বিনয় বললে, এখন তো ঝাড়ে হ'বেই! তারকদের বৈঠকখানায় সুভাষকে বসিয়ে তুই আরম্ভ করলি না?

বিজন অস্বীকার ক'রে বললে, কি আরম্ভ করেছিলুম বলুক সুভাষ!

তখন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কথায় কথায় যেমন রাগ হ'তো তেমনি আবার ভাবও হ'তো। (ভাগ্যে তখন হাত-বোমার বা ছোরাছুরির এত চল হয়নি। বলতে গেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরুই হয়নি) মধ্যস্থতা ক'রতে আমি বল্লুম, থাকগে, থাকগে বাদ দাও ওসব কথা।

বিনয় বললে, বাদ দেবে কেন, বলুক না!

সন্তোষ এতক্ষণে মাথা তুলে মনে মনে চীনাবাদাম বিলি ক'রে বললে, তোদের কি আর কোন কথা নেই? তারকের জ্যেঠাকে বুঝিয়ে বল্লেই হয়, আমরা যেদিন একটা চাকরির ধরণাস্তর সুবিধা করছিলুম। বেকার ছেলেরা একধারগায় জড় হ'লে চাকরির কথাই বলে।

কিন্তু তারকের জ্যেঠাকে কে বুঝিয়ে বলবে? আর বললেও তাঁর বিশ্বাস ক'রতে বয়ে গেছে!

তবে সেদিন আমরা তারকদের বৈঠকখানায় বসে যে গল্প-গাছা করেছিলুম তাতে দোষের কি আছে বুঝতে পারছিলুম না। এদিকে আমাদের নিয়ে বুড়োদের আড্ডায় খুব জোর আলোচনা হ'য়ে গেছে!

নীহার বললে, ছন্ছিল ছন্ছিল নিজেদের মধ্যে গল্প, তারকের জ্যেঠাকে দেখে অমন ক'রে ওঠা উচিত হয়নি সন্তোষের! কেন আমরা কি চুরি করছিলুম্?

ব্যস্! এবার লেগে গেল সন্তোষে আর নীহারে! দূর থেকে তারকের জ্যেঠাকে দেখে কে জিভ্ কেটে খাৎকে উঠেছিল, নীহার না সন্তোষ?

আবার বুঝি একটা বিবাদের সৃষ্টি হয় নিজেদের মধ্যে।

সন্তোষ চীনাবাদাম ভাঙা বন্ধ ক'রে বললে, খাৎকে ওঠবার জন্যে আমার কলা কেঁদেছে। তাছাড়া দরজার গোড়ায় আমি ছিলুম না কি?

নীহার সুর ক'রে বললে, না তুমি ঘরের মধ্যে ছিলে। মধ্যমণি যে!

তারক বিরক্ত হ'য়ে বললে, বুড়োর নিমুচি করেছে! সেই তোরা মালিশি করবি? বলটি কিছু হয়নি! ও জ্যেঠার কথা বাদ দে!

বাদ দিলেও, কথা যখন উঠেছে তখন তার ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ বিবেচনা ক'রে দেখার দরকার আছে। পড়াশোনা শেষ ক'রে দুদিনে কোথায় আমরা চাকরির জন্যে পাগল হ'য়ে যাচ্ছি, না, বুড়োরা আমাদের সমালোচনা ক'রতে আরম্ভ করেছেন!

নীহার বললে, তুই তো বলছিস কিছু হয়নি, তোর জ্যেঠার কথা বাদ দিতে, এদিকে যে—

নীহার কথাটা শেষ ক'রতে পারলে না, সবাই তার মুখের দিকে এমন ক'রে চাইলে যেন চাতার বাতির আলোর ফোকাস তার মুখের ওপর ফেলা হ'য়েছে।

হঠাৎ নীহার থতমত খেয়ে যেন খেই হারিয়ে ফেল্‌লে।

অনেকগুলো প্রশ্ন নিঃশব্দে উত্থাপিত হল, এদিকে আবার কি?

নীহার ধীর কণ্ঠে বললে, যাকে নিয়ে এত চাপাচুপি সে-ই ওদিকে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে!

এ্যাঁ!!! আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলুম্। সুভাষের মাথাটা ঘাটিতে মিশে যেতে চাইলে।

বিনয় এক হাত নিয়ে বললে, কেমন বলিনি তখন ও মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই!

একজন আবার আর্ত বাক্য উচ্চারণ করলে, হ্রীদ্ রাজকুলেষু চ!

তারক জিজ্ঞেস ক'রলে, তুই কার কাছে শুনলি? কোথায় শুনলি?

গম্ভীর হ'য়ে নীহার বললে, কোথায় আবার! যেখানে শোনবার সেখানে!

ডুবন্ত লোক তলিয়ে যাবার আগে যেমন ক'রে শেষবারের মত মাথাটা তুলে ভেসে ওঠে তেমনি ক'রে মাথাটা তুলে সুভাষ নীহারের মুখের দিকে চেয়ে করুণ সুরে বললে, সত্যি শুনিচিস্ কিন্তু?

সত্যি মিথ্যে জানি না ভাই, পুষ্পর ন'কাকীমা উষাদির কাছে গল্প ক'রেছে; পুষ্প বলেছে, তুই নাকি তাকে মিছিমিছি—শুধু শুধু—

আবার সবাই মিলে নীহারকে কথাটা শেষ ক'রতে দিলে না। মিছিমিছি? শুধু শুধু? এমন একটা সত্যি জিনিষ, যা নিয়ে আমরা সবাই মেতে আছি, বলে কিনা শুধু শুধু, মিছিমিছি? তাও আবার পুষ্পর নিজের মুখে!

সুভাষ আবার মাথা নিচু ক'রে মাঠের সবুজ ঘোষ হয় হলুদে দেখলে।

একজন আক্ষেপের সুরে বললে, ফ্রেন্‌চি ভাই নেম্ ও'ম্যান!

তারক এবার জেরা করার ভঙ্গিতে বললে, উষাদির সঙ্গে পুষ্পর ন'কাকীমার কি সম্পর্ক শুনি?

নীহার বললে, তোর জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

তারক উড়িয়ে দিয়ে বললে, ধ্যাৎ-র! তুই বাজে কথা বলছিস্! এসব ব্যাপারে মেয়েরা খুব চাপা, তা জানিস? মরে গেলেও তারা—

সন্তোষ এতক্ষণ চুপ ক'রেছিল, আর একবার সবার হাতে চীনা বাদাম দিয়ে বললে, থাক, মেয়েদের কথা আর বলিস্‌নি! মেয়েরা চাপা আর ছেলেরা খোলা? ক'টা মেয়েদের ব্যাপার তুই জানিস?

তুই ক'টা জানিস্?

যতটাই জানি তাতে যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়ে গেছে। ওদের হ'য়ে ওকালতি করিস্‌নি!

সুভাষ আমার মুখ তুলে চেয়ে যেন বলতে চাইলে, ভাইসব, তোরা আর এ নিয়ে কিছু বলিস্‌নি! আমাকে স্থির হ'য়ে ভাবতে দে!

(আহা, বেচারাকে পুরো একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে! হাবুডুবু খেতে-খেতে ছেলেটা যেন একেবারে তলিয়ে গিয়ে মাটি ছুঁয়েছে!)

সেদিন তারকদের বৈঠকখানায় সুভাষের নব প্রেমের অনুভবের স্পর্শটা মনে পড়ে। ঘোর গোড়ায় একজনকে পাহারায় রেখে ঘরের ভেতর আমরা ক'জন বেকার বন্ধু মিলে যেন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করছি! সুভাষের মুখ থেকে ফলটা নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি করছি!

সুভাষকে কেবল ভাগ্যবান বলেই মনে হয়নি, সে যেন খুব একটা অসম্ভব আশ্চর্য কাণ্ড ক'রে বসেছে, যার অনুভূতিতে আমরা আনন্দে যন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে ছটফট ক'রছি!

সেই সুভাষ আর এই সুভাষ! ভাবাই যায় না।

আমাদের নীরবতা ভঙ্গ ক'রে সন্তোষ বললে, শুনতে চাস? বল্, কটা শুনবি?

আমরা কি বলবো ভেবে পেলুম না। তারক কিন্তু শুনতে চাইলে।

সন্তোষ বললে তাদের নাম কিন্তু আমি বলবো না। তাদের দেখা হ'য়েছিল একটা বিয়ে বাড়ীতে। সেই থেকে ভাব। মেয়েটা নাকি বলেছিল তাকে না পেলে নিশ্চয় আত্মঘাতী হ'বে!

মাঝখান থেকে তারক বললে, যার কথা বলছিস সে-ও নিশ্চয়ই ঐ কথা বলেছিল? এসব ব্যাপারে আত্মঘাতী তো আর একা হওয়া যায় না!

বিরক্ত হ'য়ে বিনয় বললে, হ'য়েছে, এখন ওকে বলতে দে! তোর একস্‌পিরিয়েন্স পরে শুনবো।

সন্তোষ বললে, সে সব জানিনা, একসঙ্গে সুইসাইড ক'রবে কি, আলাদা ক'রবে সে ওরা বুঝবে! তারপর হঠাৎ একদিন ও এসে আমাকে বললে, মেয়েটি নাকি ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায়। সর্বনাশ! পাগলামি কিরে? আমি অনেক ক'রে বোঝালুম, পালিয়ে কোথায় যাবি শুনি? বড়জোর চন্দননগর কি ব্যাণ্ডেল গির্জে! তারপর? তারপর ক'দিন আর কোন খবর নেই, চুপচাপ: মনে করলুম ঘোর কেটে গেছে এদিকে দেখি ও হঠাৎ খুব ব্যায়াম করতে আরম্ভ ক'রেছে—জিম্‌ন্যাসিয়ামে সবার আগে এসে মুগুর ভাঁজছে, ডন্ করছে, বৈঠক মারছে! কি ব্যাপার? ও কিছু ভাঙে না, কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, চেহারাটা কেমন হোচ্ছেরে সোনুতে? মানে বরাবর ওএকটু ইয়ে কিনা—

তারপর বললে, যত সব বাজে কথা! কোথায় 'লাভ' হ'চ্ছে না, তার মধ্যে ডন-বৈঠক এসে গেল! যেমন তোর বন্ধু খেয়ালে—

সন্তোষ রাগ করলে না, হেসে হেসে বললে, ও হরি, আমি কি অত জানি: হঠাৎ একদিন জিমন্যাসিয়ামের মাষ্টার ষোড়শীবাবু এসে—

আমরা চমকাবার, এর মধ্যে আবার ব্যায়ামের মাষ্টার কেন?

সন্তোষ আমার দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করলে যেন খুব একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করছে, তারপর ঘন নিয়ে বললে,—

সেদিন দু'জনে খুব এক্সারসাইজ করিছি, গায়ে মুখে ঘাম ঝরছে। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। গায়ের ঘামটা মরলে বে-বার বাড়ী যাবো ভাবছি, এমন সময় ষোড়শীবাবু এসে হাজির। ক'দিন উনি আসছিলেন না, শুনেছিলুম ওর নাকি বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে, ব্যায়াম-করা শক্ত, মজবুৎ চেহারাটা বরের পিঁড়িতে যেমন

মানাবে তাই নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করেছি, তবে হ্যাঁ, দেখবার মত চেহারা বটে! কত ভেবেছি, ষোড়শীবাবুর মত চেহারাওলা বরের উপযুক্ত বউ কি বাংলা দেশে আছে? থাকলেও সে-মেয়েও নিশ্চয়ই মুণ্ডর ভাঁজে! ···ষোড়শীবাবু এসেই আমার বন্ধুকে আড়ালে ডেকে কিসব যেন বললে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ও মাথা নিচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে আছে! ষোড়শীবাবু হেসেহেসে বুক দুলিয়ে, বাইসেপ উঁচিয়ে কিসব বলছিলেন। মনে হল ব্যায়ামের নতুন কিছু প্যাঁচট্যাঁচ বোধ হয়।

'জিম' থেকে বেরিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, মাষ্টার কি বলছিল রে? তখুনি তখুনি ও আমাকে কিছু বলেনি, তবে ওর মুখচোখ দেখে মনে হল, মনে ও খুব আঘাত পেয়েছে: কিন্তু কিসের আঘাত?

পরে শুনেছিলুম, ওর সেই 'লাভার' যে নাকি আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল, বাড়ী থেকে পালাতে চেয়েছিল, ডুবিয়ে দিয়েছে, ষোড়শীবাবুর সঙ্গে বিয়ের কথা হতেই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। কি ভাগ্যি, জিম্ মাষ্টার ওকে চড়চাপড় কষায়নি!

নীহার জিজ্ঞেস কর'লে, তোর সেই বন্ধু এখনো ব্যায়াম করছে? হেসে সন্তোষ বললে, পাগল: আর ব্যায়ামের দরকার?

বলে সন্তোষ কেমন ক'রে যেন আবার আমার দিকে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলুম।

• • • •

সবাই উঠে যাবার পরও সুভাষ একা একা পার্কে বসেছিল। আমরা কি ভেবে ওকে একলা বসে থাকতে দিয়েছিলুম।

ঘণ্টা দু'তিন পরে চুপিচুপি ফিরে এসে দেখি সুভাষ তখনো চুপ ক'রে মাঠে বসে আছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত।

কাছে আসতে সুভাষ ছলছল্ চোখ ক'রে বললে, তোর বিশ্বাস হয় পুষ্প কাউকে কিছু বলেছে?

বিশ্বাসের কথা কি বলবো, আমারও যে আর সত্যি বিশ্বাস করলেও খুব ছুটে সেদিন কোন কথা বলিনি, কেন না ওর পুষ্পকে আমার নিজের সঙ্গে এক করতে চাইনি।

• • • •

কলকাতার লোক সংখ্যা আগে কত কম ছিল এবং কোম্পানী আমলে কি করে বাড়তে লাগল তার হিসাব দেখুন—১৮২২ সালে মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৭২,৩১৭—ক্রিশ্চান ১৩১৩৮, মুসলমান ৪৮১৬২, চীনা—১৪০০, হিন্দু ১,১৮২০৩। তারপর ১৮৪৭ সালের লোক গণনায় দেখা যায় যে খাস কলকাতার লোকসংখ্যা ৪ লক্ষের উপর সংলগ্নতলী সমেত প্রায় ৮ লক্ষ: তার মধ্যে ৩০০০০ ছিল ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী।

ন্যাপা কাহিনী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

প্রায় ছ'ফিট লম্বা, ঘন কালো দীর্ঘ চেহারার ন্যাপাকে আপনাদের চেনার কথা নয়। সে ওয়াং, হো, না মুণ্ডা, তা আমার আজ মনে পড়ছেনা। নেহাৎ ঘটনাচক্রে এই ন্যাপা কাহিনী শোনার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এই শহর জীবনে এতদিন পরে সে কাহিনী আজ আর তেমন উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিনের প্রবাস জীবনে, সেই পাহাড় অরণ্য নদী এবং বিস্তীর্ণ লোহার খনি অঞ্চলের এক বিচিত্র পরিবেশে সন্ধ্যাবেলা ডাঃ সারেঙ্গীর কোয়ার্টারের 'লন'এ বসে, সে কাহিনী আমাকে এক নূতন স্বাদ এনে দিয়েছিল। আমি যেন সেই আদিম যুগের ইতিহাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

রাজখরসোয়ান থেকে যে লক্ষ ট্রেন লাইনটা এঁকে বেঁকে দুপাশের ঘন অরণ্যের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেছে, ওরা তার শেষ ষ্টেশন। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর একটা ছোট্ট শহর। দেখলে মনে হবে, কোন শিল্পীর হাতে আঁকা একটি 'ষ্টীল-লাইফ' ছবি। ডাঃ সারেঙ্গী এই শহরের বড় ডাক্তার। বালা বন্ধু, এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। নর শব্দের রূপ সম্পর্কে বিরূপ হওয়ার জন্য বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় উভয়কেই বানরের সঙ্গে তুলনা করতেন। ফুটবল মাঠে আমি যখন 'ব্যাক' সারেঙ্গী তখন 'গোলকীপার'।

তারপর যেমন হয়। কে কোথায় ছিটকে পড়েছি। পৃথিবীর পথ বিস্তীর্ণ, বহু তার শাখা। সে শাখার সীমানা কোন দেশের দিগন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে, কে তার খবর রাখে!

হঠাৎ একদিন ডাঃ সারেঙ্গীর একটা পোষ্ট কার্ড পেলাম। 'তুই নাকি আজকাল কবি হয়েছিস্। মাঝে মাঝে লেখাটেখা দেখি কাগজে। একবার ওরা এসে দেখে যেতে পারিস্, কী সুন্দর জায়গাটা। কবিতার খোরাক পাবি। আমি কবি নই, রসিকও নই। পেশাটা বরং রাসায়নিকের কাছাকাছি। তবু মাঝে মাঝে এই সব পাহাড় ঘন বন, আর সেই বনের ওপরে মেঘের ছায়া, দেখতে দেখতে পাগল হয়ে যাই। পারলে চলে আয়।

চিঠিটা কয়েকবার উল্টেপাল্টে দেখলাম। হাঁ, আমাদের সেই ম্যাট্রিক ক্লাসের চিত্তরঞ্জন সারেঙ্গীর বটে। আমার ডাকনামটা এখনও ভুলেনি দেখছি।

একে সুন্দর পাহাড়ে জায়গা, জল ভাল, তারপর ডাক্তারের কোয়ার্টার। আমার মত ঘরঘুনো, তার সঙ্গে এক সঙ্গে পাহাড় অরণ্য ও নদী দেখার জন্য লোভাতুর ব্যক্তির পক্ষে, এরকম একটা সুযোগ হারানো অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এক সন্ধ্যায় ট্রেনে চেপে বসলাম।

পরের দিন দুপুর নাগাদ ষ্টেশনে নামতেই দেখি, ডাঃ সারেঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রজীবনের চেহারার সঙ্গে, এই মধ্যজীবনের চেহারার মিল থাকার কথা নয়। এবং তা নেইও। তবু চিনতে দেরি হলনা। কপালের কাটা দাগটা এখনও তেমনি উজ্জ্বল।

তুই এসি শেষ পর্যন্ত ?

ডাঃ সারেঙ্গীর কথা বলার ভঙ্গীটা ঠিক আছে অথবা ছেলে বেলায় আমরা ফিরে গেছি বলে অমনি মনে হচ্ছিল।

'হ্যাঁ এলাম কেন চিঠি পাসনি আমার ? যেমন লোভ দেখিয়েছিস্, না এসে আর পারি ?

ডাঃ সারেঙ্গী বলল, 'মিছিমিছি লোভ দেখাইনি। একবার চারদিকটা চেয়ে ছাখ্।

আমি আগেই চেয়ে দেখেছি। সত্যকথা বলতে কি, এমন উদার দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। পাহাড়টা ঘুরে। অরণ্যের নীল আর আকাশের নীল এক হয়ে মিশে গিয়ে সে যেন এক শুভ্র সমুদ্র !

কিন্তু আমাকে কাব্য করার অবসর না দিয়ে ডাঃ সারেঙ্গী বলল, 'সঙ্গে কি আছে রে ?'

'কিছু না শুধু হোল্ড্অল আর সুটকেশ।'

'এই ছাপা, উতার লে আও।'

সেই ছাপাকে প্রথম দেখলাম। নির্ঘাত একটা সরু কচি শাল গাছের মত শরীর। ছাপা দু'টো জিনিষকে অত্যন্ত অনায়াসে ও অবলীলায় নামিয়ে নিয়ে এল। বুঝলাম শুধু লম্বা নয়, লোকটা অসীম শক্তিমানও বটে।

আমার ঘরে হোল্ড্অল আর সুটকেশটা রেখে একটা নমস্কার ঠুকে ছাপা চলে যাচ্ছিল। মিসেস সারেঙ্গীর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল 'একটু থেকে যা, ছাপা। আমি আসছি'।

মাথায় ঘোমটাটা একটু টানার ভঙ্গি করে মিসেস্ সারেঙ্গী এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

তিন চারটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও মিসেস সারেঙ্গী এখনও যেমন দেখতে, তাতে একটু মেকআপ দিয়ে নিলে পাত্রী দেখার 'ইনটারভিউ' দেওয়া অনায়াসে চলতে পারে। ডাঃ সারেঙ্গীর চেয়ে বয়সে অন্ততঃ দশ বারো বছরের কম বলে মনে হয়। চিরকালই বাংলা দেশের বাইরে থেকেছেন। তাই শরীরের বাঁধুনিটা এখনও একটুও বুড়িয়ে যায়নি। রংটা ঠিক ফর্সা নয়, তবে উজ্জ্বল শ্যামল। মুখশ্রী সুন্দর শুধু নয়, ভারি সুশ্রী। স্নান সেরে মাথার চুল এখনো বাঁধেননি। তাই তার দৈর্ঘ্য বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। হাত পা নিটোল, মসৃণ।

আমি মুহূর্তের মধ্যে ঘুরের পাহাড় ও অরণ্যের ক্যানভাসে একটি সুন্দর পবিত্র নারী মূর্তির ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই পরিবেশে মিসেস্ সারেঙ্গীর মত একটি অপরূপ ভাস্কর্য না থাকলে সবকিছু বিস্বাদ হয়ে উঠত।

'পথে কষ্ট হয়নি ত ?' মিসেস্ সারেঙ্গী শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন। আমি চমকে উঠলাম একটু। অর্থাৎ কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হেসে বললাম, 'কষ্ট হয়েছিল কি না ঠিক বুঝতে পারিনি'।

মিসেস সারেঙ্গীও নিঃশব্দে হাসলেন একটু। 'কবিদের ও রকম মনে হয়। আচ্ছা, রাত্রে ঘুম হয়েছিল ?'

'ঘুম ? না, একটুও না। ট্রেনে আমি ঘুমুই না। আর এখানে আসার সময়ও ঘুমুবার প্রশ্নই ওঠেনা। ঘুমুলে ঘুষারের পাহাড়, বনজঙ্গল, অচেনা মাঠ কে দেখবে বলুন ? ঐ সব দেখতেই ত বেরিয়েছি। এই গুলিই ত দেবতার কাব্য'।

আপনাদের কথা কি করে বুঝব বলুন ? আমি একেবারে নীরস গদ্য। তা এখন চানটান করুন। বাথরুমে সব আছে।'

'একটু আসবেন, মা—' ছাপার ফাঙর, গলা শোনা গেল বাইরে থেকে।

'ও, তুই দাঁড়িয়ে আছিস্। আচ্ছা, আপনি স্নান করুন। আমি আসছি'।

আমি বললাম, 'আপনার কাছে আমাকে জমা করে দিয়ে ডাক্তার কোথা পালাল ?'

মিসেস সারেঙ্গী হেসে বললেন, 'উনি হাসপাতালে গেছেন। এই এসে যাবেন এক্ষুনি'।

আমি জামা খুলে বাইরের বারান্দার চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ঠিক এই মুহূর্তে স্নান করতে যেতে ইচ্ছা করছিল না।

এখন দুপুর। ভাদ্র মাসের উদার রৌদ্রে সব ভুবে গেছে। ট্রেন লাইনের ওপার থেকেই পাহাড় শুরু। লম্বা লম্বা গাছগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। অনেক দূর থেকে পাথর ভাঙার শব্দ ভেসে আসছিল। কোথায় ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কাটানো হচ্ছে। তারও প্রচণ্ড আওয়াজ আসছে মাঝে মাঝে। সব মিলে দুপুরের একটা তন্দ্রালস জগৎ আমার সামনে বিছানো রয়েছে !

কতক্ষণ বসেছিলাম। এক সময় মনে হোলো ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে একটা লম্বা লোক কেমন টলতে টলতে যাচ্ছে। গাছের আড়াল পেরিয়ে আসতেই চিনতে পারলাম।

মিসেস সারেঙ্গী, স্নান করবার তাগাদা দিতে এলেন।

আমি বললাম, 'আচ্ছা ঐ লোকটা ছাপা না ?'

উনি হেসে বললেন, 'ছাপাকে চিনতে ভুল হয় না।'

'কিন্তু টলতে টলতে যাচ্ছে কেন' ?

'কেন আবার ? এই পয়সা নিয়ে গেল তাড়ি খেয়ে বাড়ী যাচ্ছে। আর বাড়ী গিয়ে বৌর হাতে বেদম মার খাবে।'

আমার কেমন মজা লাগছিল এবং ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। এই ছাপাকে তার বৌ মার দেবে ? তা হলে সেই বৌটি কেমন ? একেবারে মা রণচণ্ডী বোধ হয় ?

মিসেস্ সারেঙ্গী বললেন, 'না না,। আর পাঁচ জনের বৌ যেমন হয়, ছাপার বৌও তেমনি। শুধু বড্ড ঝগড়াটে। আর রাগের সময় হাতের কাছে যা পাবে, সে লাঠি হোক্, গাছের ডাল হোক, চেলাকাঠ হোক্, তা-ই দিয়ে বেদম ঠেঙাবে।'

আমি বললাম, 'বেশ মজা ত।'

'আপনিত বলবেন ! এই দেখুন, একটা টাকা দিলাম। কোথায় চাল কিনবে, না, তাড়ি খেয়েই শেষ করে দিয়ে বাড়ী চলল। বৌ আসুবে 'কাষ্ট শিফট'-এর কাজ শেষ হলে। সেই একটা নাগাদ। এসে দেখবে, ছাপা বেহুঁস মাতাল হয়ে উঠানে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তখন মার না দিয়ে কি ফুল দিয়ে পুজো করবে ?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হল। বুঝতে পারলাম, ছাপা কাজকর্ম কিছু করেনা। বৌ-র মজুরীর ওপর সংসার চলে। অর্থনীতির ভাষায় ছাপা 'লায়েব্লিটীজ', 'এসেটস' নয়।

স্নান করতে যাব-যাব ভাবছি, এমন সময় কোন দিক দিয়ে ঘুরে ছাপা 'সন-এর সামনে এসে হাজির। তখনও টলছে। দূর থেকে বলল, 'সেলাম, হুজুর'—

ছাপা কপালে হাত ঠেকিয়ে মিলিটারী কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় মিসেস্ সারেঙ্গী বেরিয়ে এলেন।

ছাপা হঠাৎ হাত নামিয়ে নিল। মনে হল ও যেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে।

মিসেস্ সারেঙ্গী রেগে বললেন, 'যাওনি যাদনি এখনো? যা, এক্ষুনি যা বলছি।'

'যাই মা। আভি যাতা হ্যায়, আভি যাতা হ্যায়। লেকিন—' ছাপা ছেঁড়া পকেটটা উল্টে দেখাল। 'টু টু, কিছু নেই।'

মিসেস্ সারেঙ্গী বললেন, 'তা থাকবে কেন? তাড়ি খেলেই চলবে! হারামজাদা। ডাক্তার বাবু আসুক, সব বলে দেব।'

হঠাৎ ছাপা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। 'দোহাই মা, ডাক্তার বাবুকে বলবেন না। আমায় মেরে ফেলবে। হাম আভি যাতা হ্যায়।' ছাপা দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা গান ধরল।

রাস্তার ওপর বাগানের জল যাবার একটা ছোট্ট নালা ছিল। মাত্র হাত দুই চওড়া। ছাপা যেতে যেতে হঠাৎ নালাটার কাছে একবার থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ মন দিয়ে কি যেন দেখল। তারপর বিড় বিড় করে বলতে লাগল, 'হুঁ, এইটা লাফাতে পারব না? হুঁপা আবার এই নালাকে ভয় পায়। হেঁ হেঁ, কত খাল লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলাম এই নালাটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আরে যা যা ভাগ্।'

ছাপা দুপা পিছিয়ে গেল। তারপর আবার নালাটার কাছে এসে দাঁড়াল। এমনি করে বেশ কয়েকবার পায়তারা কষতে লাগল যেন সত্যি সত্যি একটা প্রকাণ্ড 'লংজাম্প' দেবার জন্য ছাপা শরীরে শক্তি সঞ্চয় করছে, তৈরি হচ্ছে। 'তবে রে শালা, এইটা পেরতে পারবনা। হুঁ। আখ পারি কিনা, ছাপা কোন শালাকে ভয় করেনা।' বলেই এক লাফ। আর লাফ দিতে গিয়েই, পড়বি ত পড় একেবারে মুখ থুবড়ে নালার ঠিক মাঝখানে। কাপড়-চোপড় কাদায় ভর্তি। মাথায়, মুখে, হাতের কনুই সবখানেই কাদা।

আছাড় খেয়েই বোধ হয় ছাপার চৈতন্য হল। উঠে দাঁড়াল, তারপর লজ্জা পেয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করল। আর ফিরে তাকাল না।

আমি আর মিসেস্ সারেঙ্গী দুজনেই হাসছিলাম ছাপার কাণ্ড দেখে।

মিসেস্ সারেঙ্গী বললেন, 'এই পাগলা ছাপা কিন্তু খাঁটি মানুষ একচুল কথার নড়চড় হবে না কক্ষনো। টাকা ধার নেবে, কিন্তু শোধ দেবে ঠিক যেদিন যখন বলবে। আর ওঁর জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও ছাপার দুঃখ নাই। এ রকম লোক পাওয়া ভার!'

আমি বললাম, 'ডাক্তারকে ভয় করেও বলে মনে হয়?'

'তা করে। যেদিন অবশ্যই ওঁর নাম শুনলে পাগলামি ছেড়ে যাবে। কিন্তু আপনি এখন উঠুন। স্নান করবেন কখন? বেলা দুটো বাজতে চলল যে!'

ডাঃ সারেঙ্গীর গলার স্বর শোনা গেল, 'কিরে এখনো বসে আছিস্?'

এই পাহাড় ও অরণ্যের রাজ্যে দিবসের প্রতিটি প্রহরে রূপ বদলের নিঃশব্দ আয়োজন চলে। দুপুরে যে ছবি দেখেছিলাম, এই শেষ অপরাহ্নে সে ছবির রং রেখা, ভাষা, সব কখন পাল্টে গেছে। এখন গাছগুলোকে আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে না। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ভাঙার শব্দও এখন আর শোনা যায় না। অরণ্যের ওপর দিয়ে নেমে আসা 'রোপওয়ে'তে ওঠানামা চলাচল এখন বন্ধ। শুধু একটা ঘুমন্ত জগৎ। পাহাড়ের ওপারে উড়িষ্যার কোন এক অচেনা অদেখা গ্রামের ওপরে তখন সূর্যাস্তের শেষ আলো বিছানো আবুপাহাড়ের এপারে অন্ধকারের প্রথম নিঃশব্দ পদক্ষেপ।

'লন'এ বসে এই ছবি দেখছিলাম। সামনের চেয়ারে মিসেস্ সারেঙ্গী এসে বসলেন। বললেন, 'ভিসটার্ব করলাম বোধ হয়?'

মনে মনে বললাম, এতক্ষণে ছবিটা সম্পূর্ণ হল। কিন্তু বাইরে তা বলা যায় না। অথচ কিছু একটা না বললেও সৌজন্য রক্ষা হয় না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'স্থাপা এখনো আসে নি?'

মিসেস সারেঙ্গী বললেন, 'এসেছিল। আপনি তখন ঘুমুচ্ছেন। ওকে বাজার পাঠালাম। এখানে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। তাই'—

'বাজার কদ্দূরে?'

'তা দূর আছে। যেতে আসতে যাবো চৌদ্দ মাইল হবে।'

আমি চমকে উঠলাম। স্থাপা এই বিকেলে চলল এতো দূরের বাজারে মাছ কিনতে? কেমন একটা অপরাধবোধ অনুভব করছিলাম। আমার জন্যই বেচারার এই শাস্তি।

মিসেস সারেঙ্গী হাসলেন একটু। 'ওর কাছে এই রাস্তা জলভাতের মত। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে।'

'বলেন কি? পাহাড়ে রাস্তা, অন্ধকার। তারওপর ডাঃ সারেঙ্গী বলেছিল রাত্রিতে এসব রাস্তায় বাঘও বেরয়। বুনো ভালুকও আছে!'

মিসেস সারেঙ্গী বললেন, 'ও কিছু নয়।' স্থাপা 'অল প্রুফ'। একটা লাঠি নিয়ে যায়। ওটাই যথেষ্ট। শুধু একবার—'। মিসেস সারেঙ্গী থামলেন। বি চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

ডাঃ সারেঙ্গীর বিরহে সেই রাত আটটা নটা। ছেলে মেয়েরা স্কুল থেকে এসে আবার বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। 'লন'এর চায়ের টেবিলে মৃদুমন্দ ছাড়া চার পাশে আর কোন শব্দ নেই এমনি পরিবেশে চুপচাপ চা খাওয়াটা কেমন বড্ড বেসুরো মনে হচ্ছিল। তাই বললাম, 'স্থাপা কদ্দিন ডাক্তারের কাছে আছে?'

মিসেস সারেঙ্গী চা খেতে খেতে বললেন, 'ঠিক আছে বললে ভুল হবে। তবে আমাদের কাজকর্ম করে দেয়। অমনি ভাবে প্রায় বছর দশ হতে চলল। কি হয়েছিল শুনুন। উনি পাশ করেই 'টিস্‌কো'র চাকরী নিয়ে এখানে আসেন। সেই বছরই আমাদের বিয়ে হয়।' মিসেস সারেঙ্গী কথাটা বলেই একটু আরক্ত হয়ে উঠলেন তারপর বললেন, 'তখন উনি একাই থাকতেন এ কোয়ার্টার্সে ছিল না। শহরও নতুন গড়ে উঠছে। কুলীদের বস্তী টেন লাইনের ওপারে তৈরী হয়েছে। হাসপাতাল অবশ্য হয়েছে। কিন্তু কলেরায় বসন্তে মরবে, টাইফয়েডে ভুগবে, ম্যালেরিয়ায় ভুগবে, তবু হাসপাতালে আসবে না। হাসপাতালকে ওদের ভীষণ ভয়। এই সময় একবার স্থাপার অসুখ হয়েছিল। ও অবশ্য ওর স্ত্রীর তিন নম্বর স্বামী। আগের দুজনের খবর আমরা জানিনা। স্থাপার সঙ্গেই ও এই খনিতে কাজ করতে এসেছিল। তা স্থাপার অসুখের চিকিৎসা হচ্ছিল, ঘরে ঢুকিয়ে জানালা কপাট বন্ধ করে ধোঁয়া দিয়ে দেওয়া। অসুখটাত আর কিছু নয়, ভূতে ধরেছে! ভূত ছাড়ানোর এই হ'ল দেশজ ব্যবস্থা। ওরা এসে ঝাড়ফুঁক দিয়ে, শেষ 'প্রেস্‌ক্রিপশান' হিসেবে এই ধোঁয়া দেবার ব্যবস্থা করে যায়। কিন্তু স্থাপার বৌ শেষ রাতের দিকে ঘর খুলে দেখল, রোগী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কেমন ভয় পেয়ে গেল বেচারা কুলী সর্দারকে নিয়ে ভোরে এসে হাজির। উনি গিয়ে দেখেন, খুব খারাপ ধরণের ম্যালেরিয়া। প্রায় মর মর। তক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে এলেন, তাও একরকম জোর করে। দিন কুড়ি পরে স্থাপা ভালো হল। সেই

থেকেই ওঁর কাছছাড়া হয় না। দুবেলা আসে। এটা ওটা কাজ করে। আর বৌটাও বড্ড ভালোবাসে ন্যাপাকে। শুধু তাড়ি খেলেই মার লাগায়। আবার রাগ পড়লে ন্যাপার পা-হাত পা টিপে দিতে বসে। গরম তেল মালিস করে দেয়। আর কাঁদে, 'তুই কেন তাড়ি খাস!'

আমি একটি বিচিত্র দাম্পত্য জীবনের কাহিনী শুনছিলাম। এই আদিবাসী, সভ্যতার আলো যাদের ফুটিয়ে আজও পড়েনি, আজো যারা প্রায় মানুষই নয়, তাদের উদার উন্মুক্ত জীবন আমাকে কেমন যেন আকর্ষণ করছিল।

মিসেস সারেঙ্গী আবার সুরু করলেন, 'একবার কি হ'ল শুনুন। তখন শহরটা এভাবে এগিয়ে আসেনি। এদিকটা তখন ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা। শুধু ঐ একেবারে পশ্চিম দিকে দু'একটা অফিসার্স কোয়ার্টার হয়েছে। ডাকঘর তখন মাইল খানেক দূরে। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। তখন ওঁর বাবুন বলতে ঐ ন্যাপা। তা ন্যাপাকে একদিন আমার কাছে একশ টাকা মানিঅর্ডার করতে পাঠিয়েছেন। মানিঅর্ডার ফর্ম আর টাকাটা খামে আছে। সন্ধ্যার [illegible]। চলেছে ডাকঘরের দিকে। দেরি হলে যদি মাষ্টার বাবু মনিঅর্ডার না নেয়। উনি ত ন্যাপাকে পাঠিয়ে দিয়ে হাসপাতালে চলে গেছেন। গিয়ে ভাবছেন এ দুর্যোগে না পাঠালেই হত!

ন্যাপা চলতে চলতে একটা গর্জন শুনে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু প্রথমে ভালো করে নজর করার আগে, বুঝতে পারল কার দুটো দাঁত ডান হাতটা প্রচণ্ডভাবে কামড়ে ধরেছে। ন্যাপা তৎক্ষণ বুঝতে পেরেছে, প্রকাণ্ড একটা ধুনো ভালুক। দুটো পা ন্যাপার কোমরে দিয়ে একটা জীবন্ত যম দূতের মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। হাতটা ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, আর ঐ হাতেই টাকার খামটা ন্যাপা কিছুতেই ছাড়ছে না। বাঁ হাত দিয়ে দমাদম ঘুঁষি চালাচ্ছে, ভালুকটার মাথায়। ভালুকটাও আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে ন্যাপাকে।

কতক্ষণ এইভাবে চলছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঘুঁষির চোটে ভালুকটাই বগে ভঙ্গ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ন্যাপাকে হন্ হন্ করে এত কম সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে দেখে উনি তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। গিয়ে অবাক! সারা কাপড়ে রক্ত। বুকটা জ্বালি জ্বালি করে কে যেন চিরে দিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য, হাতের মুঠোয়, টাকার খামটা ন্যাপা তখনও অক্ষত রেখেছে। শুধু রক্তের দাগ লেগে গেছে বাইরে।

খামটা ন্যাপা ওঁর দিকে এগিয়ে ধরল। না, আজ সে মার কাছে টাকাটা পাঠাতে পারল না। বড্ড কথার খেলাপ হয়ে গেছে তার! শালা ধুনো ভালুকটা রাস্তায় না পড়লে……উনি ধমক দিয়ে উঠলেন, চুপ কর, হতভাগা। আবার কথা বলছে। লোক ডেকে তাড়াতাড়ি অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে তুললেন, ন্যাপাকে। সেরে উঠতে দু'মাস লাগল। দেখবেন, এখনও ওর ডান হাতে, বুকে ভালুকের কামড়ের দাগ আছে।'

'জন'-এর চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি যেন অনেকক্ষণ এখানে ছিলাম না। সেই ইতিহাসের যুগে, যখন মানুষই ভালোবাসত, বিশ্বাস রাখত, জীবন দিয়ে! আধুনিক সভ্যতার আলো তখন আসেনি। তবে এই ন্যাপার মত মানুষই কি সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে!

ওপাশ থেকে ন্যাপার গলা শোনা গেল—'মাছ নিয়ে এসেছি, মা। একদম টাটকা। দেরি হয়নি ত?'

মিসেস সারেন্দী উঠে গেলেন। আমি সেই অন্ধকারে বসে রইলাম। বসে বসে মনে হচ্ছিল, সব চরিত্রের থেকে, স্তাপাই আমার কাছে আজ প্রধান হয়ে উঠেছে। এই পাহাড় অরণ্য এবং লোহার খনি অঞ্চলের আদিম পরিবেশে, যে নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, স্তাপাই তার প্রকৃত নায়ক।

বারান্দার উজ্জ্বল আলো এখন মনে এসে পড়েছে। টেবিল থেকে চায়ের কাপ প্লেট নিতে এল স্তাপা। আমি ওর হাতের দিকে তাকালাম। কয়েকটা দাগ এখনও জল জল করছে। মনে হল, 'ডাক্তার কেন, বাঘ কামড়ালেও স্তাপা প্রাণ থাকতে ডাক্তার বাবুর টাকার থামটা ছাড়ত না!

এতদিন পরেও স্তাপার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আজিও সে বেঁচে আছে কিনা জানিনা। কারণ ডাক্তার সারেন্দী চাকরী ছেড়ে এসেছে। আমিও আর কখনও ওয়া যাইনি।

• • •

গ্রীষ্মকালেই সহর সমূহের অবস্থা সবচেয়ে খারাপের দিকে যায়। তখন স্কুল সমূহ বন্ধ থাকে, লক্ষ লক্ষ তরুণেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, জটলা পাকায়। এদের আত্মপ্রকাশের কোন গঠনমূলক রাস্তা নেই। অনেকেই দরিদ্র, অনেকেই এসেছে নিগ্রো ও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে। বস্তী এলাকার নোংরা ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশেই এদের বাস।
বাল্যকাল থেকেই এই তরুণ তরুণীরা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এদের জন্যই ম্যান পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেনিং অ্যাক্ট নামে একটি আইন গৃহীত হয়েছে। এদের পুরো বা আংশিক সময়ের জন্য ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে জন কোর, দি নেবারহুড ইয়ুথ কোর প্রভৃতি বহু কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। ১৯৬৮ সনের ২৩শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট জনসন কংগ্রেসে জনশক্তি সম্পর্কে প্রদত্ত এক বাণীতে এই সঙ্কটজনক জাতীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য দেশের ব্যবসায়ী মহলকে আহ্বান করেছেন। ফলে "স্তাশান্যাল এসোসিয়েশন অব বিজনেস-ম্যান" নামে একটি নূতন সংস্থা গঠিত হয়েছে।

প্রেম

॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥

নিশ্চয়ই এক আত্মহত্যার ঘটনা।

সবাই একমত এ বিষয়ে। রেলকর্মীদের এখন সমস্যা, কী করে লোকটির পরিচয় উদ্ধার করা যাবে।

সকালবেলা বোগদেহ অমন একটা মৃত চোখে পড়লে কি আর কোনো কাজ করা যায়?

রেঙ্গুনের মহলাগাও শান্টিং ইয়ার্ডের রেল শ্রমিকরা সত্যি সত্যি কোনো কাজ করতে পারছিলো না এ ব্যাপারটার একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

যুবকটি এভাবে স্বেচ্ছায় কেন মৃত্যুবরণ করলো, কী তার কারণ হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা চলছিলো অনেকক্ষণ ধরে।

একজন বলছিলো, এ নিশ্চয়ই কোনো প্রেমের ব্যাপার। এ তরুণ যে একটি ব্যর্থ প্রেমের বলি তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

এতোটা জোর দিয়ে এরূপ একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা বোধহয় ঠিক হবে না আমাদের পক্ষে, আরেকজন এমনি মন্তব্য করলো রেলকর্মীদের মধ্যে থেকে।

তাদেরই মধ্যে থেকে তৃতীয় ব্যক্তি গলা বাড়িয়ে বললে, ও গবেষণার কী যে প্রয়োজন তাতো আমি বুঝতে পারছি না। আসলে লোকটি কোথাকার, কোথা থেকে এলো এখানে সে এমনভাবে ট্রেনের তলায় পড়ে প্রাণ দিলো সেটাই প্রথমে খুঁজে বের করা দরকার।

কথাটা শুনে সবাই যেন একেবারে হারমোনিয়ামের মতো একই সঙ্গে বেজে উঠলো। সকলেরই এক সুর, এক কথা—ঠিকই তাই, ঠিকই তাই।

কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এসে মাঝে মাঝেই মৃত লোকটির সারা দেহে বিশেষ করে তার মুখ এবং হাত দুটি শুঁকে শুঁকে এবং চেটে চেটে যাচ্ছিলো।

রেলকর্মীদের মধ্যে একজনের চোখ পড়েছিলো ঐ কুকুরটার দিকে। সে খুবই খুঁটিয়ে লক্ষ্য রাখছিলো ঐ কুকুরটার কাণ্ডকারখানার ওপর। তার যেন কেমন একটা সন্দেহ, ঐ মৃত লোকটিই হয়তো কুকুরটার প্রভু। তা না হলে ওর এই ছোটাছুটির মধ্যে এমন একটা অধীরতা প্রকাশ পাবে কেন?

এ প্রশ্নটা মনে আসতেই ঐ বুড়ো শ্রমিকটি হাতের শাবলটাকে রেলওয়ের পাথুরে খোয়ার ওপর ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলো, আমার মনে হয় একমাত্র এই কুকুরটার সাহায্যেই মরা লোকটির বাড়ির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কুকুরটা ঠিক পথে ঘুরে বেড়ানো নেড়িকুত্তা জাতের নয়, দেখেই বুঝতে পারা যায়, এ একটা পোষা কুকুর—উঁচু জাতের কুকুর। বুড়োর হাকে সবারই নজর পড়ে সেদিকে।

ঢিল মেরেও কুকুরটাকে তাড়ানো যায় না। দু'চার পা হটে গেলেও পর মুহূর্তেই আবার ছুটে আসে। ঘাড়-খিংলানো ও উরু-খিংলানো যুবকটির সারা দেহ শুঁকতে থাকে।

তখন নিঃসন্দেহ হয়েই একদল রেলকর্মী দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে তাড়া করে। কুকুরটাও ছোটে, তার পিছে পিছে তারাও। প্রায় বিশ-বাইশ মিনিট ধরে ছুটতে ছুটতে শহরের উপান্তে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে কুকুরটা। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখন উপায়? রেলের লোক ক'জন ভাবতে থাকে। এতটা পথ এসে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে?

না, ফিরে যেতে হবে না। ঐ তো হাঁপাতে হাঁপাতে লেজ নাড়তে নাড়তে জোর ছুটে আসছে শাদা-কালো রঙের সেই বিলিতি কুকুরটাই।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, ধলহাড়া হয়ে পড়ে ধলকে খুঁকে নেবার কারণেই ও ব্যাটা আবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ছুটে আসছে।—প্রথম জনের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আরেক জন বললে নৈরাশ্য ভেঙে।

বাস্তবিকই কুকুরটা তাদের সামনে পর্যন্ত এসে আবার ফিরে চললো। এবার অনেকটা আস্তে আস্তে এগুতে থাকলো সে। দল যেন আবার অনেক দূরে পড়ে না যায়।

না, আর হকাহারা হয়নি রেলের লোকরা। একটানা সোজা কিছুটা পথ চলে একটা মোড় ঘুরে ছোট্ট কুটীরের সামনে এসে বসে পড়েছে কুকুরটা। ও খুব জোরে জোরে তখন হাঁপাচ্ছিলো এবং ওর জিভ দিয়ে খুব লালা ঝরছিলো।

রেলকর্মীরা বুঝতে পারলো, এ বাড়িতেই থাকতো আত্মঘাতী ঐ যুবকটি।

বাড়িটার দুটো অংশ। দু'অংশের দুই দরজা। এক দরজার সামনে তালা, আরেক দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

সেই ভেতর থেকে বন্ধ-করা ঘরের লোকদের ঘুম ভাঙেনি তখনো। অথচ বাইরে শুধু সুবোধরই ঘটেছে তা নয়, রোধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

অগত্যা ডেকে ডেকেই ঘুম ভাঙাতে হয় ঐ ঘরের লোকদের। ওরা স্বামী-স্ত্রী। আউঙ্ মঙ্, আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। প্রথম পক্ষের স্ত্রী বছর পাঁচেক আগে ওরই লাঠির ঘায়ে মারা গেলে আউঙ্ আরেকটা বিয়ে না করে পারেনি। বয়েস তার ষাট পেরিয়ে গেছে, তাই অনেকেই তাকে বারণ করেছিল আবার বিয়ে করতে। কিন্তু সে শোনেনি। এমন কি তার জোয়ান ভাইপোর বাধাও সে মানেনি। একমাসের মধ্যেই এক অষ্টাদশীকে সে তার ঘরে এনে চাজির করেছে। সবাইকে বলেছে, আমি রাত্তার রাত্তার আলো জ্বালাই আর আমার ঘর থাকবে অন্ধকার—সে আবার কি কথা! তা' ছাড়া মেয়েমানুষ ছাড়া কোনো পুরুষের পক্ষে কি বেঁচে থাকা সম্ভব?

হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং সেটা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে খুড়োকে দেখিয়ে দিয়েছে খেইন মঙ্।

একই সঙ্গে থাকতো খুড়ো-ভাইপো। একেবারে শিশু বয়েসে পিতৃমাতৃহীন খেইন তার কাকীর হাতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। খুড়ো তার রেঙ্গুন শহরের একটা সম্ভ্রান্ত পাড়ার বাড়ি-মিস্ত্রী। সন্ধ্যা-সকালে আলো-জ্বালানো আর আলো-নেভানো এবং কোথাও কোনো বাহ্যিক গোলযোগ হলে সেটা মেরামত করাই

তার কাজ। বেঙ্গল কর্পোরেশনের সে অনেক দিনের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী এবং এই একই কাজে দীর্ঘকাল বহাল থাকায় পত্নীর অনেক সাহেব-সুবোই তার ওপর প্রসন্ন। সেই সুযোগ নিয়েই আউড এক বিলিতি সাহেবকে ধরে তাঁর বাড়ির মালীর চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল ভাইপো খিয়েনকে।

আঠারো বছর বয়েস থেকে খিয়েন সেই মালীর কাজই অতি সুন্দরভাবে করে আসছিলো। সাহেব এবং তাঁর মেম দু'জনেই তার ওপর ভারি খুশি প্রথম থেকেই। বছরখানেকের মধ্যে নিঃসন্তান ঐ ইংরেজ দম্পতি মিঃ ও মিসেস হল্যাণ্ডের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো খিয়েন। স্কুলের কোনো শিক্ষা না পেলেও প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে ইংরেজী কথাবার্তায়ও সে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠলো। কিন্তু ভোথায় কতোদিন কার কাছে কার হানাপানি এ বোধহয় কেউই বলতে পারে না।

তিন বছর মালীর কাজ করার পর হঠাৎ একদিন যখন মিসেস হল্যাণ্ড খিয়েনকে জানালো তাঁরা একমাসের মধ্যেই দেশে ফিরে যাবেন তখন খিয়েনের সে কি অবস্থা! তার দু'চোখে জল। মুখ কালি করে মেম সাহেবকে সে জিগ্যেস করলো, তোমরা তো বিলেতে চলে যাবে, আমার কি উপায় হবে?

মিসেস হল্যাণ্ড ওকে তখন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, সে তোকে ভাবতে হবে না। তোর মাস্টারই তোর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।

ঠিকই খিয়েনকে যাবার আগে একটা পাকা চাকরিতে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ হল্যাণ্ড।

সত্যি সত্যি খিয়েনকে ছেড়ে যেতে খুবই দুঃখ হয়েছিল হল্যাণ্ড দম্পতির। একবারতো সাহেব ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবারই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু খুড়ো-খুড়িকে ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না ওর পক্ষে।

হল্যাণ্ড সাহেবের সুপারিশে শহরের বাইরে মাইল আটেক দূরে এক বিলিতি ওষুধের কারখানায় চাকরি নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলো খিয়েন। আগের চেয়ে কিছু বেশি টাকাই সে নতুন কাজে রোজগার করতো। খুড়ো-খুড়ির কাছে তার ইজ্জতটাও একটু বেড়ে গিয়েছিলো তার জন্যে।

তবে একটা ঝকমারি খিয়েন নিজে থেকেই সৃষ্টি করে নিয়েছিলো। তার আগের প্রভুর কুকুরটা তিন বছরের মধ্যে খুবই ভক্ত হয়ে উঠেছিলো খিয়েনের। হল্যাণ্ড সাহেব যতক্ষণ বাইরে থাকতেন তার কুকুরটা ততোক্ষণ একেবারে খিয়েনের গা ঘেঁষে থাকতো। ফলে জ্যাকির এমন ভক্ত হয়ে উঠেছিলো সে যে তাকে সাহেবের সঙ্গে ছেড়ে দিতে তার মন চাইলো না। হল্যাণ্ড দয়াপরবশ হয়ে জ্যাকিকে উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে গেলেন খিয়েনের হাতে।

সেই জ্যাকি কুকুরটাকে খাইয়ে দাইয়ে আদর-যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে খিয়েনের রোজগারের একটা বড়ো অংশ বেরিয়ে যেতে থাকলে খুড়ো-চাইপোর মধ্যে তা নিয়েই একটু খিটিমিটি লেগে উঠেছিলো। কিন্তু সেই খিটিমিটি বেশি দূর গড়াতে পারে নি খিয়েনের কাকীর জন্যে। মদ খেতে খেতে কথায় কথায় কুকুর নিয়ে তর্ক বেঁধে যেতো মাঝে মাঝে। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে মনে হলেই খিয়েনকে টেনে তুলে নিয়ে তার নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিতো তার খুড়ি।

এমনি ভাবেই গৃহকর্ত্রী অনেকদিন ধরে হাতাহাতি মারামারি থেকে গৃহকে মুক্ত রেখেছিলো, কিন্তু স্বামীর হাতের মার থেকে নিজেকে সব সময় বাঁচতে পারে নি।

একদিন তেমনি পরিবেশেই বিপর্যয় ঘটে গেলো। আউড সেদিন বড়ো বেশি মদ টেনেছিলো। তার বৌ এবং ভাইপোও, তবে তার মতো এতো নয়। তাই তার মতো জ্ঞানলোপ পায়নি তাদের। চূড়ান্ত মত্ত অবস্থায় সেদিন এক হুকুম জারী করে বসলো আউড। ভাইপোকে কড়া হুকুমে বললে, মাসে একদিন

আমরা চাঁদ চিবুতে পারিনে আর তোমার কুকুরকে রোজ মাংস খাওয়াতে হবে, এ আমি হতে দেবো না। আজই জ্যাকিকে বিদায় করে দিতে হবে বাড়ি থেকে।

জ্যাকিকে বিদায় করে দিতে হবে? তার চেয়ে আমিই বরং চলে যাবো বাড়ি থেকে।—প্রায় সমান তড়া মেজাজেই এই উত্তর এলো ভিয়েনের দিক থেকে।

অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে বুঝেই বুঝি উঠে এসে ঠেলে বের করে দিলে ভাসুরপোকে।

মদের ঘোরে এবং রাগে উত্তেজনায় আউঃ তখন উন্মত্ত প্রায়। মুখের ওপর ওরকম জবাব দেওয়ায় ভাইপোর ওপর সে তখন চটে আগুন। কোথায় তাকে সেজন্যে সে উপযুক্ত ভাবে শায়েস্তা করবে, সে সব বানচাল করে দিয়ে মাগী কিনা ছোঁড়াটাকে ঘর থেকেই সরিয়ে দিলে!

ফেলে দিয়ে হাতের কাছের লাঠিটা তুলে নিয়ে সবে এক ঘা বসিয়ে দিলে বৌ-এর মাথায় এবং ঘা মারতে মারতে বললে, চারামজাদী, এবার আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ঐ জোয়ান ছোঁড়াটার দিকেই তোর মন টেনেছে, তুই ওর সঙ্গে ষড় করেছিস।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বৌয়ের মাথা কেটে কিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখে আউঃয়ের মাথাটাও ঘুরে গিয়েছিলো সেদিন। সেও অনেকক্ষণ ধরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তার অচৈতন্য বৌয়ের পাশেই মাটিতে শুয়ে পড়েছিলো।

মাতলামি কেটে গেলে আউঃ বুঝতে পেরেছিলো কতো বড়ো অন্যায় সে করেছে।

সে অন্যায়ের কোনো প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিলো না।

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো বউটাকে বাঁচানো যেতো। কিন্তু কে কাকে হাসপাতালে নেবে? সন্ধ্যার পর সকলেরই যে প্রায় এক অবস্থা, প্রায় সব ঘরে ঘরেই যে মদের বোতাত। গোটা বস্তীর আকাশ-বাতাস তখন বিশ্রী মদের গন্ধে ভরপুর!

কারেই যা হবার তাই হয়েছে। সকাল বেলা বৌয়ের অসাড় দেহটাকে আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে বসে থেকেছে আউঃ। রক্ত ক্ষরণ হতে হতে কখন বৌ তার প্রাণ হারিয়েছে মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে বসে সে কথা সে যখন ভাবছিলো সেই মুহূর্তেই খুড়োর ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছে ভিয়েন।

কিন্তু কি আর করা যাবে? খুড়োকে তো রক্ষা করতে হবে যেকোনো রকমে! তাই চারদিকে কেবলি চুপ, চুপ, চুপ! থানা পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে দু'চার জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে যেভাবে ভিয়েন অতি সঙ্গোপনে সেদিন খুড়ির শেষ কৃত্যটা সেরে ফেলেছিলো তার জন্যে আউঃ অনেক বাহবাই দিয়েছিলো তার ভাইপোকে। নির্ঘাত জেল থেকে বাঁচানো, সে কি বড়ো কম কথা!

এর পরেও ভিয়েনের সঙ্গে খুড়োর যে বনিবনা হলো না, সেটা যেন মানুষের ওপর খুড়োর অতিরিক্ত আকর্ষণের ফল। যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতাশ বছর ঘর করে আউঃ তাকে নিজের হাতে মেরে ফেলেও অনুতপ্ত নয়, সে-ই তো তাকে শিশুকাল থেকে মায়ের মতো করে লালন-পালন করে বড়ো করে তুলেছিলো। ভিয়েন ভাবে আর চোখের জল ফেলে। শেষ পর্যন্ত আউঃ যখন প্রথমা স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এক আঠারোকে দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসাবে ঘরে নিয়ে এলো, ভিয়েন সেই খুড়োর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে জ্যাকিকে নিয়ে পৃথক সংসার পেতে কাল কাটাচ্ছিলো বেশ কয়েক বছর ধরে।

এসব কাহিনী পাড়াপড়শিদের কাছ থেকেই শুনে নিয়েছে রেলশ্রমিকরা। তার পরেই তারা ডেকে তুলেছে আউঃ মঃ এবং তার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে।

এক সঙ্গে এতোগুলি লোককে তার বাড়ির দরজায় উপস্থিত দেখে বুড়ো আউড় খুবই অবাক।

রাস্তার আলো নেভাতে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে বলেই বোধহয় লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। প্রথমে তেমনি সন্দেহই হয়েছিলো আউডের। কিন্তু কেউ যখন তেমন কোনো কথা বললো না, কুকুরটার প্রশংসা করতে আরম্ভ করলো, তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠলো র‍্যাকির প্রশংসায়।

কীভাবে র‍্যাকি তাদের বাড়িতে এসেছে সে কাহিনীটি বেশ পরিপাটি করে আউড় শোনালো তাদের। সে বললে, হল্যাণ্ড সাহেবের উপহার র‍্যাকি। আমার ভাইপো থিয়েন মালীর কাজ করতো সাহেবের বাংলোয়। দেশে ফিরে যাবার সময় সাহেব তাকে এই কুকুরটা উপহার দিয়ে গেছে। এটাকে নিয়েই তো যতো গোলমাল।

কেন কী হয়েছে?—একজন প্রশ্ন করে।

সে সব থাক। বরং একটা মজার গল্প বলি। থিয়েন যেদিন প্রথম এই বাড়িতে র‍্যাকিকে নিয়ে এলো সেদিনই সে আমার কাছে আর তার বুড়ির কাছে এই গল্পটা বলেছিলো। হল্যাণ্ড সাহেবের কাছ থেকে শোনা সেই গল্পটা ভারি চমৎকার। মানুষের চেয়েও যে একটা কুকুর মানুষকে অনেক বেশি ভালোবাসতে পারে এ তার এক জলন্ত প্রমাণ।

আপনি বলুন না গল্প, শুনি।—বেলকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন একই সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।

বেশ, শোনো তা'হলে।—এই বলে আরম্ভ করে আউড়।

হল্যাণ্ড সাহেব থিয়েনকে বলছিলেন তাঁদের দেশের আরেক সাহেবের এক কুকুরের গল্প। স্ত্রী বিয়োগের পর ঐ কুকুরটাই ছিল বুড়ো সাহেবের একমাত্র সঙ্গী। সাহেবও হঠাৎ একদিন চোখ বুজলেন।

তারপর?—আর যেন সহ্য না, এমনিভাবে অধীরতা প্রকাশ করে সহসা এই প্রশ্ন করলো এক শ্রোতা।

সে প্রশ্নের খুব সহজ উত্তর দিলে আউড়। বললে, কুকুরটা নাকি তার প্রভুকে হারিয়ে একরকম পাগলই হয়ে গিয়েছিলো। তাকে নাকি কেউ আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেনি সেই বুড়ো সাহেবকে কবর দেওয়ার পর। ঐ কবরের পাশেই দিনরাত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রভুকে পাহারা দেওয়াটি যে তার কাজ! তার পবিত্র দায়িত্ব!

কী অদ্ভুত!—শ্রমিকদের মধ্যে একজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে ওঠে। আরো বলে, একেই বলে ভালোবাসা, এই হলো প্রেম।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। হল্যাণ্ড সাহেব এ সম্পর্কে আরো বিস্ময়কর কথা জানিয়েছিলেন থিয়েনকে।

বলুন না সেকথা, তাড়াতাড়ি বলুন।—একই সঙ্গে আবার কয়েকটি কণ্ঠে ব্যাকুলতা ঝরঝরিয়ে ওঠে, গল্পের ক্লাইমেক্স-এ তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর ব্যাকুলতা।

একটি ছোট্ট উত্তরেট তাদের সে আগ্রহ মিটিয়ে দেয় বৃদ্ধ আউড়।

সে বলে, কয়েকদিন ধরে না খেয়েদেয়ে প্রভুর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সেই কুকুরটা হঠাৎ একদিন মারা গেল। কুকুরটার হঠাৎ হঠাৎ চিৎকারে একটা কান্নার সুর ভেসে আসতো, আশপাশের লোকরা সচকিত হয়ে উঠতো। সহসা সে চিৎকার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারদিকে নাকি কেমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো।

তারপর ?—আবার সেই প্রশ্ন।

তারপর আর বিশেষ কিছু নেই সে গল্পের। প্রভুভক্ত সে কুকুরটার মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর সেইবুড়ো সাহেবের বন্ধু-বান্ধবরা এসে কুকুরটাকে তার প্রভুর কবরের পাশেই সমাহিত করেছেন এবং তার একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি গড়ে নাকি সেই সমাধির ওপরে ঠিক সান্ত্রীর মতো করে স্থাপিত করে তার নাম দিয়েছেন 'সমাধিক্ষেত্রের সান্ত্রী।'

বাঃ, অপূর্ব।—সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে এই বলে।

তারা চুপ হলে আউড বলে, নিজের কুকুরের গুনগান করতেই হল্যাণ্ড সাহেব তাঁর বেশের ঐ কুকুরটির প্রভুভক্তির গল্প শুনিয়েছিলেন খিয়েনকে। জ্যাকিকে সাহেবের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পেয়ে তাকে নিয়ে বাড়ি এসেই খিয়েন আমাদের ঐ করুণ গল্পটি শুনিয়েছিলো। বাস্তবিকই কুকুরের প্রভুভক্তির বিশ্বস্ততার এ এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তা' ঠিক। তবে আপনাদের জ্যাকিটরা কম কিসে ?

কেমন ?—রেল শ্রমিকদের সর্দার স্থানীয় একজনের প্রশ্নে চমকে উঠে পাল্টা প্রশ্ন তোলে আউড মত।

দেখছেন না আপনাদের জ্যাকি কেমন পাগলের মতো এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। জানিনা যে লোকটি আজ সকালে ট্রেনে কাটা পড়ে শান্টিং ইয়ার্ডে মারা গেছে সে তার প্রভু কিনা, তবে তার শবের কাছেই এই কুকুরটি ঘোরাফেরা করছিলো এবং সেই আমাদের পথ চিনিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।

আউডের চোখ দু'টো ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠেছিলো এক তরুণ রেল শ্রমিকের মুখে এই কথাগুলি শুনতে শুনতে। আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সে ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, এসব কী বলছো তোমরা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে খিয়েন তা' হলে একেবারেই চলে গেল !

চিৎকার শুনে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেলো আউডের বাড়ির সামনে।

ট্রেনে কাটা মড়া সনাক্তকরণে আউডকে নিয়ে সবাই রওনা হবে ঠিকঠাক, ঠিক তখুনি সেখানে একদল পুলিশ হাজির। পুলিশ নাকি খবর পেয়েছে ঘটনাস্থলে গিয়ে, যে ও শব এ বাড়ির অধিবাসী খিয়েন মতেরই। তাই পুলিশ এসেছে তার ঘর তল্লাসী করতে, তথ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে।

জ্যাকি ততোক্ষণে খিয়েনের ঘরে ঢোকবার সিঁড়ির দু'পাশে আচড়ে আচড়ে বিরাট দুই গর্ত করে ফেলেছে। তখনো সে আচড় কেটেই চলেছে, কোনো বিরাম নেই। কেন সে অমন করছে কে জানে।

তাকে সরিয়েই পুলিশ তালা ভেঙে ঘরে ঢোকে এবং তল্লাশী করে এমন কিছু উদ্ধার করে যা থেকে দুর্ঘটনার পটভূমিকা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

এক টুকরো কাগজে বর্মিজ ভাষায় পুলিশকেই জানিয়ে গেছে খিয়েন, সে আর ঘরে ফিরে আসবে না, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবারই সে সিদ্ধান্ত করেছে। তার মৃত্যুর জন্যে অন্য কেউ দায়ী থাকবে না।

কিন্তু এমনি ভীষণ সিদ্ধান্ত নেবার কী এমন কারণ থাকতে পারে ? সে কথাও খিয়েন লিখে রেখে গেছে ঐ চিরকুটে।

সে লিখেছে, হল্যাণ্ড সাহেব একটা বিলিতি ওষুধের কারখানায় আমায় যে চাকরি দিয়ে গেছেন তাতে কাকার সঙ্গে থাকায় প্রথম দু'তিন বছর আমাদের অর্থাৎ আমার আর জ্যাকির মোটামুটি একরকম চলে গেছে।

কিন্তু দু' দু'বার বাড়তি মাইনে পেয়েও আর চালানো সম্ভব হচ্ছে না। জ্যাককে হলাও সাহেব যেভাবে রাখতেন সে তো আমি জানি। তাকে খাওয়ার কষ্ট দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আর নিজের খাওয়া কমিয়ে কমিয়ে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছে যার পরে আরো কম খাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। কাজেই আত্মহত্যা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখছি না।

পুলিশের লোক সকলকে পড়ে শোনালো চিঠিখানা। কতোগুলি সাক্ষী-সাবুদের দইসত্র নিয়ে তারা চলে গেলো ঘটনাস্থলে। রেলকর্মীরাও সেখানেই গেলো আউড আর তার নতুন বৌকে নিয়ে। জ্যাকিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলো।

হ্যাঁ, এই তো আমাদের বিয়েন!—বুড়ো আউড রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভাইপোর দেহটাকে দেখে একটা চিৎকার দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লো সেখানে। রেলকর্মীরা তার ভার নিলে। আর মৃত দেহগুলিকে ময়না তদন্তের জন্যে পুলিশ মর্গে নিয়ে গেলো।

কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ হলো না।

পরদিন সকালে দেখা গেলো ঠিক একই জায়গায় রেল লাইনের ওপর ট্রেনে কাটা আরেকটি অসাড় দেহ।

সে লাশ সনাক্ত করতে কোনোই বেগ পেতে হলো না। সে দেহ প্রভুপতপ্রাণ জ্যাকির।

---

* * *

আমেরিকায় একশ্রেণীর লোক আছে তারা যেন চিরকালেরই দরিদ্র। দেশের সমৃদ্ধি যত বাড়ছে তাদের অবস্থাও যেন ততই খারাপ হচ্ছে। যে দেশে সাড়ে সাত কোটি লোক নানা ধরনের কাজ করে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে তুলছে, প্রতিদিন ৫০০০ হারে নূতন কাজের সৃষ্টি হচ্ছে, সেদেশে তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না, তারা আরও দারিদ্র্যের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও লাঙলসরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষা না থাকার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের জন্যই এদের এই অবস্থা।

একটি শিশির বিন্দু

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় ফিরছি। রাতের আহারের পর কলকাতাগামী দার্জিলিঙ মেল ছাড়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে। ভোর বেলায় খেজুরিয়া ঘাট। স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে ফরাক্কা থেকে কলকাতার ট্রেন, শিয়ালদহে পৌঁছয় বিকেলবেলায়। ফরাক্কার উপরে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এই বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে তার উপরে রেল লাইনও বসবে। তখন আর স্টীমারে গঙ্গা পার হবার প্রয়োজন থাকবেনা। আর এমন দেরি করেও ছাড়বেনা দার্জিলিঙ মেল। রাত আটটায় ছেড়ে সকাল আটটায় হয়তো কলকাতা পৌঁছে-দেবে। ঘুমিয়ে আমরা ফারাক্কার বাঁধ পৌঁছে যাব। যাত্রীদের ঘুমোতে দেবার জন্যেই আজকাল দেরিতে ট্রেন ছাড়ছে, আর ভোর বেলায় পৌঁছে-দিচ্ছে গঙ্গার ধারে।

ট্রেন ছাড়বার অনেক আগেই আমরা গাড়িতে এসে উঠেছিলাম। যাত্রীদের একজন নামবেন মালদহে। রাত চারটে নাগাদ এই ট্রেন মালদহে পৌঁছবে? শেষ রাত, অনেক সময় নাকি সকাল করে যায়।

আমি শুনেছিলাম যে এই মালদহের কাছেই আছে বাঙলার পুরনো রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়া। অনেক কিছু দেখবার আছে বলে শুনেছি। কিন্তু নানা কারণে আজ অবধি দেখবার সুযোগ হয়নি। কিছু জানবার লোভে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। নাম তাঁর বিশ্বাস, মালদহেই তাঁর বাস। কিছু কাজ নিয়ে শিলিগুড়ি এসেছিলেন, এবারে ফিরে যাচ্ছেন। আমি গৌড় পাণ্ডুয়া দেখিনি শুনে বললেন: সেকি, এত বড় ঐতিহাসিক স্থান আজও দেখেননি! কত দূর, দূর দেশ থেকে দেখতে আসে, আর—

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম: যাতায়াতের সুবিধা নেই কিনা, তাইতেই দেখা হয়ে উঠেনি।

সুবিধে নেই মানে! আমার সঙ্গে নেমে পড়ুন না মালদহ, সব দেখিয়ে দেব আপনাকে।

মনে মনে আমি মাসের তারিখ ও বার মনে করবার চেষ্টা করলাম। কাল রবিবার, ছুটি আমার। কাজেই কালকের দিনটা আমি অনায়াসেই পথে যাপন করতে পারি। বললাম: একদিনেই দেখা হয়ে যাবে তো?

ভদ্রলোক একটুখানি ইতস্তত করলেন, তারপরে বললেন: তা মোটামুটি হবে বৈকি।

মোটামুটি কেন!

ভালো করে দেখতে সময় লাগে তো।

তা বটে।

আমি মেনে নিলাম তাঁর কথা, তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম; কী দেখবার আছে সেখানে?

ভদ্রলোক হাসলেন একটুখানি, বললেন; না গিয়েই সব জেনে নিতে চান! কাল নামুন মালদহ, নিজের চোখে সব দেখে নিন। পরের মুখে ঝাল খাবার অভ্যাসটা ভাল নয়।

এ কথাও আমি মেনে নিলাম, বললাম : কথা আপনার মিথ্যে নয়। কিন্তু সব সময় তো সকলের ভাগ্যে সব জায়গা দেখার সুযোগ আসেনা। তাই কখনও ভ্রমণ কাহিনী পড়ে, কখনও বা যাত্রীদের মুখে শুনে শখ মেটাতে হয়।

ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না।

কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে দিলামনা, বললাম : কলকাতার কাছে এক পাণ্ডুয়া আছে বলে শুনেছি। আবার মালদহে আছে গৌড়-পাণ্ডুয়া। পাণ্ডুয়া একটা, না অনেক গুলা পাণ্ডুয়া আছে বাংলা দেশে, তাই আমার জানা নেই।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন : এরকম আরও অনেক নাম আছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে বললেন : এই ধরুন না ভবানীপুর নাম। কলকাতার ভবানীপুর নাম কে না জানে? কিন্তু চাওড়া জেলার ভবানীপুর নাম শুনেছেন?

বললুম : না।

দেখলেন তো!

আমি বললাম : সে ভবানীপুর কি কোন বিখ্যাত জায়গা?

বিখ্যাত নয়! পীঠস্থান সেটা। রাণী ভবানীর নাম শুনেছেন তো!

শুনেছি।

তাঁর নামেই ভবানীপুর নাম। এক সময় নাকি সেখানে করতোয়া আত্রেয়ী ও যমুনার ত্রিবেণী সঙ্গম ছিল। কেউ আদুলে পীঠ বলে, আর ভবানীর পূজারীরা বলেন যে সতীর বাঁ কান পড়েছিল সেইখানে। দেবীর শাঁখা পরার গল্প শোনেন নি?

বললাম : না।

সেকি মশাই, নিজের দেশের একটা পীঠস্থান। তার কথা জানেন না।

আমি লজ্জা প্রকাশ করে বললাম, কতটুকুই বা আমরা জানি!

ভদ্রলোক বললেন : একবার রাণী ভবানী এসেছিলেন ভবানীপুরে। মন্দিরের কাছে এক শাঁখারী তাঁর কাছে একজোড়া শাঁখার দাম চাইল, বলল, আপনার মেয়ে পরেছে। রাণী ভবানী আশ্চর্য হলেন, তাঁর বিধবা মেয়ে তো শাঁখা পরবেনা, আর সে তাঁর সঙ্গেও আসেনি। তাই তিনি বললেন, আমার মেয়েকে একবার দেখিয়ে দাও তো বাবা। শাঁখারী তাঁকে পুকুরের ঘাটে নিয়ে গেল। কিন্তু কেউ নেই ঘাটে। এদিকে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল যে গভীর জলের ভিতর থেকে শাঁখা পরা একটি হাত এল জলের বাইরে। মা ভবানীর হাত, রাণী ভবানীর মেয়ে সেজে শাঁখা পরতে এসেছিলেন তিনি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এ গল্প বুঝি আপনার বিশ্বাস হল না?

বললাম : অলৌকিক গল্প কি এ যুগে কারও বিশ্বাস হয়।

ভদ্রলোক বললেন : বিশ্বাস না করলেও এসব সত্যি গল্প কোনদিন মিথ্যা হবে না।

এইবারে আমার মনে হল যে ভদ্রলোক বোধহয় ধার্মিক হয়েছেন। এখন প্রশ্ন করলে গৌড় পাণ্ডুয়ার কথাও কিছু বলবেন। তাই বললাম গৌড় কি রাণী ভবানীর রাজধানী ছিল?

ভদ্রলোক বললেন : কি যা-তা বলেন! রাণী ভবানী হলেন নাটোরের রাণী।

আমি বললাম : হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাহলে গৌড় কার রাজধানী ছিল?

ভদ্রলোক যেন কিছু বিরক্ত হলেন। বললেন: ধর্মে আপনার মন নেই বুঝি?

আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন বলুন তো!

আমি ভেবেছিলাম যে আপনি এবারে রাম কৃষ্ণের কথা জানতে চাইবেন।

পরমহংসদেব!

ভদ্রলোক বললেন: হ্যাঁ কী অজ্ঞতা আপনার! কলকাতার লোকের বিদ্যাবুদ্ধি এই রকম। ভবানীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন, কিন্তু নাটোরের কথা হচ্ছে জেনেও রামকৃষ্ণ কে তা বুঝতে পারলেন না! বোধহয় এই রাজযোগীর নাম আপনি আজও শোনেন নি।

আমি স্বীকার করলাম যে শুনিনি।

ভদ্রলোক বললেন: রাণী ভবানীর ছেলে যারা গিয়েছিল, বিধবা হয়েছিল তাঁর পুত্রবধূ। তারপরে তিনি রামকৃষ্ণকে দত্তক পুত্র নিয়েছিলেন। এঁরই হাতে বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়ে রাণী ভবানী গঙ্গার তীরে চন্দননগরে বাস করতে চলে যান। কিন্তু বিষয়ে মন ছিলনা রামকৃষ্ণের। শ্মশানে তিনি তান্ত্রিক সাধনা করতেন। ভবানীপুরে তাঁর তপোবন ও যজ্ঞভূও আজও আছে।

আমি নীরবে রইলাম খানিকক্ষণ, বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক গৌড় পাণ্ডুয়ার কথা আমাকে বলবেন না। কিন্তু কেন বলবেন না, সেই কারণটি জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল। বললাম: গৌড়ের নামও শুনেছি অনেক পুরাণ-টুরাণে আছে।

ছাই আছে! গুড়ের হাট ছিল বলে তো নাম হয়েছে গৌড়। এর আবার ইতিহাস।

শুনেছি—

শুনবেন না কিছু, সব থাকলে নিজের চোখে দেখুন।

এমনি সময়ে ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা পড়ল। যে দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরাও উঠে পড়লেন গাড়িতে। প্লাটফর্মের উপরে খানিকটা তৎপরতা দেখা গেল। তারপরেই শোনা গেল গার্ডের বাঁশি। আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক এবারে একটা ধমক দিয়ে বললেন: শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি। যদি নামতে চান তো বলুন, ভোরবেলায় জাগিয়ে দেব আপনাকে।

বলে উপরের বাঙ্কে উঠে পড়লেন।

আমি জায়গা পেয়েছিলাম নিচে। দেরি না করে আমিও শুয়ে পড়লাম। শেষ রাতে মালদহে নামব কিনা ভেবে স্থির করবার আগেই দুচোখ ভরে ঘুম নামল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আমাদের ট্রেন একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে, কলরব হচ্ছে যাত্রীদের। খেজুরিয়া ঘাট নয় তো! তাড়াতাড়ি উঠে আমি আলো জেলে সময় দেখলাম। প্রভাত হচ্ছে, কিন্তু খেজুরিয়া ঘাটে পৌঁছবার সময় হয়নি। মিস্টার বিশ্বাস তখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তাঁর নাক ডাকছে। অন্য দুজন যাত্রীও ঘুমচ্ছেন। আমি সন্তর্পণে ছিটকিনি সরিয়ে দরজা খুললাম। বেশ বড় স্টেশন, কিন্তু স্টেশনের নাম দেখতে পেলাম না। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমরা মালদহে এসেছি।

এবারে আমার কর্তব্য স্থির করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল না। মিস্টার বিশ্বাসকে জাগিয়ে দিয়ে নিজের বিছানাপত্রও জড়িয়ে নিলাম। তারপরে নেমে পড়লাম প্ল্যাটফর্মে।

মিস্টার বিশ্বাস চমকে উঠেছিলেন, তারপরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন : যাও চক্ষেন কেন। গাড়ি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।

বলতে বলতে তিনিও হুড়মুড় করে নেমে পড়লেন।

আমি বললাম : এবারে কী করতে হবে বলুন। পরের ট্রেন বোধহয় বিকেলে, এই সময়ে সব দেখে নিতে পারব তো!

ভদ্রলোক বললেন : কেন পারবেন না, একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, দু' ঘণ্টাতেই সব দেখে শুনে ফিরতে পারবেন।

পথের একটা পরিমাণ অনুমানের জন্য আমি বললাম : কত ভাড়া লাগবে?

ভদ্রলোক একটা কুলির মাথায় তাঁর জিনিষপত্র চাপিয়ে বললেন : কত আর, দুতিন টাকায় হয়ে যাবে।

বলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

আমি ওয়েটিংরুমে গেলাম। সকাল হতে তখনও দেরি আছে বলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে আমি তৈরি হয়ে নিলাম। মালপত্র-জমা করে দিলাম ক্লোকরুমে।

কিন্তু বাহিরে গিয়ে রিক্সাওয়ালাদের মুখে যা শুনলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির। গৌড় এখানে থেকে মাইল দশেক ঘুরে, আর পাণ্ডুয়া উল্টোদিকে এগার মাইল। তার মানে গৌড় পাণ্ডুয়া দেখতে হলে আমাকে বিয়াল্লিশ মাইলের বেশি ঘুরতে হবে। সাইকেল রিকসায় এতটা পথ ঘোরা একবারেই অসম্ভব। ট্যাক্সির খোঁজ নিলাম। ট্যাক্সিতে দুবেলায় দুটো জায়গা দেখা সম্ভব। ভাড়া দিতে হবে গোটা পঁয়ত্রিশেক টাকা।

বড় আশ্চর্য মনে হল আমার সহযাত্রী ভদ্রলোককে। তিনি এই মালদহের মানুষ, গল্প বললেন ভবানীপুরের সম্বন্ধে। অথচ নিজের বাড়ির কাছে যে বাঙলার বিখ্যাত রাজধানী সে সম্বন্ধে কোন খবরই নেই।

রবীন্দ্রনাথের কথা আমার মনে পড়ল :—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
　　দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
　　দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু-মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
　　একটি ধানের শিষের উপরে
　　একটি শিশির বিন্দু।

দণ্ডদাতা

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

জীবনে মহান দৃশ্য দেখবার পরম মুহূর্ত খুব বেশী আসে না। তাই পরশু সন্ধ্যাবেলায় যে দৃশ্যটি দেখলাম তাতে আমার মনে হল মানবতার এই ঘোর দুর্দিনেও মানুষের আশা করার এখনও কিছু আছে। আমার পাশের ফ্লাটের বাসিন্দা শ্রীযুক্ত মহীতোষ বসু আমাকে নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যে যে আলোটুকু দেখালেন তাতে আমি শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর সেনগুপ্ত, কলকাতার এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান পেলাম।

ব্যাপারটার সম্পূর্ণটা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি শুনুন।

শিক্ষক হিসাবে আমার যোগ্যতা যতটা না থাক, কমিটী মেম্বারদের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা আমার অসীম। আর কমিটী মেম্বাররা তো সবাই সাক্ষাৎ পুতুল। যিনি সবকিছু নাড়েন চাড়েন সেই কমিটী সভাপতিই হলেন আমাদের বিদ্যালয়ের হর্তা, কর্তা এবং বিধাতা। সুতরাং তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট এই পদ্ধতি অনুসারে আমি তাঁকেই সবদিক দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করেছি। কারণ অতীতে দেখেছি তাঁর কৃপাতেই পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করেছে, অর্থাৎ অপদার্থ বহু লোক আমাদের এই শিক্ষায়তনে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে পদোন্নতির সঙ্গে প্রচুর টিউশানি ইত্যাদি করে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছে, শুধুমাত্র আমাদের ধর্মাবতার সভাপতির কৃপাকটাক্ষে। তবে কৃপাকটাক্ষ তাঁর অমনি হয়নি। দস্তুর মতো দাম ধরে দিতে হয়েছে তাদের সবাইকে। খোদামুদি, পদলেহন থেকে সুরু করে একজন তো তাঁর বিধবা যুবতী মেয়েকেই—থাকগে এসব হিংসুকে লোকের রটনা আপনারা নাই শুনলেন।

আমি অবশ্য সভাপতি মশাইকে হস্তগত করেছি অন্য উপায়ে। লেখার হাত আমার বরাবরই ছিল। বাংলাদেশের তিনচার ক্লাশ অবধি পড়া গিন্নী বা ঝি বৌদের ঘুমের ওষুধ হিসাবে যে সাহিত্য বাজারে কাটতি পেঁয়াজ বড়ার মতো রাশি রাশি বিক্রী হয়, আমি একজন সেইসাহিত্যের নাম করা লেখক। এ রকম বইয়ের পাব্লিশাররা সবাই আমাকে বেশ ভাল ভাবেই চেনে। তাদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে আমি আমার কয়েকখানা বই (যা আমি ছেলে ছড়িয়ে তিন দিনে একখানা করে লিখতে পারি) আমার স্কুল কমিটীর সভাপতির নামে ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছি। ব্যস, ফল হয়েছে অব্যর্থ। কারণ সভাপতি মহাশয়ের অভাব ছিল কেবল ঐ একটার, সাহিত্যিক খ্যাতির। ধন তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন নানা রকম জিনিষের দালালী ও অনেক রকম অসাধু ব্যবসা করে। প্রতিপত্তি তাঁর কিছু কম ছিল না, না হলে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হলেন কেমন করে? আর বি. এ., বি. এল, হয়ে কোর্টে না গিয়েও শুধুমাত্র মামলার পরামর্শ দিয়ে আইনজ্ঞ হিসাবে এমন সুনাম তিনি কিনেছিলেন যে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পার্টীর লোকেরা তাঁকে বার কয়েক

নমিনেশন পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল এলেকট্রিকে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে ইলেকশনের জন্যে এক পয়সা ব্যয় না করে, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিলেন শুধুমাত্র পদের জন্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা করে। ইলেকশন ক্যাম্পেন তাঁর কাছে ছিল ডাল ভাতের মতন সোজা ব্যাপার। তিনি তাঁর স্কুলের শিক্ষকদের আর কয়েকশ' ছাত্রদের লাগিয়ে দিতেন এই কাজে প্রায় নি-খরচায়। তাতেই তাঁর নাম হয়ে ছিল কিং-মেকার বলে।

সবই তিনি পেয়েছিলেন, ছিল না শুধু তাঁর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার। সেই পথটা খুলে দিয়েছিলাম আমি। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন জুনিয়ার টীচারের পদ থেকে মাত্র দু'মাসের মধ্যেই আমার জায়গা হয়ে ছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। যে এম. এ. বি. টী., ভদ্রলোকটী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁকে অপদার্থ ও ম্যাদামারা প্রমাণ করে আমি আগেই কানভাঙানী দিয়ে রেখেছিলাম সভাপতির কাছে। কাজেই তাঁর ওপর বরখাস্তের নোটিশ জারীতে খুব বেশী দেরী হল না।

কিন্তু আসনটায় বসে দেখছি, যে সেটা মোটেই সুখাসন নয়। একে তো আমার এই রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ফলে আমার সহকর্মী শিক্ষকরা বেশ কিছুটা আমার ওপর বিরূপ হয়ে আছেন। তার ওপর আছে ছেলেরা। তাদের সামলান যে কি কঠিন কাজ তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। টের পাচ্ছি প্রায় প্রত্যেক পদক্ষেপে।

আমাদের এই স্কুলের খ্যাতি (সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই বলুন) হল গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার জন্য। যে সব বাপে তাড়ান মায় খেদান ছেলেরা, যমের অরুচির মতো কোন জায়গায় ঠাঁই পায় না, তাদের জন্যে আমরা কোল পেতে রাখি। অন্য স্কুলে বেশ কয়েকবার ফেল করার পর যে সব ছাত্র প্রায় হতাশ হয়ে ট্রাম বাস পোড়ানর কাজে হাতে খড়ি নিতে যায়, কি খেলার মাঠে লাঠালাঠি করবার জন্যে হাত পাকায়, আর যাদের লুফে নেবার জন্যে খাপ পেতে বসে থাকে রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের বাপ মায়েদের একটা চোখে-জল-মেওয়া সান্ত্বনার মতো আমরা সে সব ছেলেদের আমাদের স্কুলে ভর্তি করি। আর সেই জন্যেই আমাদের ছাত্র সংখ্যা প্রায় হাজার দেড়েকের কাছাকাছি। লোকে অবশ্য বলে গরুর গোয়াল। কিন্তু আমরা গৌরব করে বলে থাকি এশিয়ার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্কুল, যার ছাত্র সংখ্যা দিয়ে একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে।

কিন্তু ওসব বার কাটাই বাইরে রাখলেও, এই রকম স্কুলের ছাত্রদের সামলান যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার তা বোধহয় আপনাদের ধারণায় আসবে না। আপনারা তো বাড়ীতে একটী, দু'টী, বড় জোর এক ডজন ছেলেমেয়ে নিয়ে হিমসিম খান। আর আমাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয় ঐ হাজার দেড়েক ছেলেগুলোকে সামলাতে। আর সব ছেলে কি! উঁচু ক্লাসে যে সব ছেলেরা পড়ে তাদের গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে প্রায় পেকে যাবার মতোই। জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্সি কোডে যতো রকম উদাহরণ পাওয়া যেতে, প্রায় সব কটাই এরা রপ্ত করে বসে আছে। মারামারি, খুনোখুনি, পকেটমার এসব তো আছেই, আছে স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে নানা রকম কীর্তি কাহিনী যা শুনলে আপনাদের গায়ের লোম পর্যন্ত সটান খাড়া হয়ে উঠবে, তা হলপ করে বলতে পারি। স্কুলের শিক্ষকদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, তা পড়াশুনো তো দূরের কথা। স্কুলের খাতায় তাদের নাম লেখানো আছে শুধু জেল ফাঁকি দেবার জন্যে। গোটা কয়েক ছেলে তো সিগারেট খেয়ে আমারই মুখের সামনে ভক্ ভক্ করে নিস্তা ধোঁয়া ছেড়ে যায়। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তা হলেই রাস্তায় ধরে হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করে ছাড়বে। এই মাস কতক আগে

আমাদের থার্ড টিচার নিতাই বাবুর সেই দশাই হয়ে ছিল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের ওসব উৎপাতগুলো আমি প্রায় হজম করেই নিচ্ছিলাম। কিন্তু দিন দিন আমার সহের সীমা প্রায় পার হয়ে যাচ্ছিল। এমনিতে তো স্কুলের কাজ, তার ওপর ছেলে গুলোকে যে কি করে সামলাব, তাই ভাবতে ভাবতে আমার দিনরাতের খাওয়া, ঘুম চুকল। আর চারিদিক থেকে আমার স্কুলের ছাত্রদের নামে এতো নালিশ আসতে লাগল, যে এতটুকু বিশ্রাম তো চুলোয় থাক আমি প্রায় পাগল হয়ে ওঠবার মতো হলাম ক'মাসেই। নিজের ঘর সংসার চুলোয় গেল, ছেলেমেয়ে গুলোকে আর দেখতে শুনতে পারিনা। গিন্নী বাড়ীতে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করলেন। বাড়ী এলেই খালি চেঁচান—ছেলেমেয়েগুলো যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তাদের দিকে একটু দেখো, শাসন কর।

শাসন করা কি চাট্টিখানি কথা! ছেলে মানুষ করা আর কেরিয়ার তৈরী করা কি একসঙ্গে কাজ হয়? অগত্যা আমি গৃহিনীকে প্রথমে অশিক্ষিত অপদার্থ ইত্যাদি বলে গালাগালি করলাম। তাতেও তাঁর মুখবন্ধ না হওয়াতে সটান দরজায় খিল দিয়ে ধরে আচ্ছা করে প্রহার দিলাম একদিন।

তারপর থেকে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বাড়ীতে সুখ রইল না। আমার সতেরো বছরের বড় ছেলেটা একদিন বাপের চাবি হাতিয়ে শ'দুই টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বাড়ীতে মরা কান্না উঠল।

তখন স্থির করলাম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে, তাদের ঠাণ্ডা রাখা দরকার। নৈলে ঘরবার দুই'ই আমার পুরোপুরি গোল্লায় যাবে। সুতরাং তাদের দলের মাথাওয়ালা ক'জনকে বাড়ীতে ডেকে প্রচুর খাওয়ালাম। আমার সামনেই তাদের বিড়ি সিগারেট খাবার অনুমতি দিলাম। আর বললাম স্কুলে তারা যদি খুব বেশী উৎপাত না করে, তাহলে তাদের প্রত্যেক সপ্তায় সিনেমা দেখার খরচটা আমিই দেব।

বেশ মাস কতক শান্তিপূর্ণভাবে চলল। তারপর একদিন তাদের একজন এসে বললে—স্যার, ঐ সপ্তায় একদিন সিনেমার খরচে আর চলছে না, আরও কিছু বেশী ছাড়তে হবে। আমাদের ফুর্তি করতে বড্ড বেশী খরচা হচ্ছে। আজকাল সবকিছুর দাম চড়ে গেছে।

বলে যে অঙ্কের পরিমাণটা তারা বললে শুনে আমার পিলে চমকে যাবার মতো হল। বললাম, গরীব স্কুল মাষ্টার অত টাকা কোথা থেকে পাব বল।

দলের সর্দারটী মিচ মিচ করে হেসে বললে—অতবড় স্কুলের থেকে ইনকাম তো কম হয় না স্যার। স্যার বেশীর ভাগটাইতো আপনি আর সভাপতি মশাই বেঁটে খান। আমরা সব জানি স্যার। এখন টাকা ধার করুন।

বলে খি-খি করে হাসতে লাগল। সেই হাসি দেখে আমার আপাদমস্তক জ্বলতে লাগল। মনে হল ওটাকে পিটিয়ে শেষ করি। কিন্তু উপায় নেই। তখনকার মতো বাবা বাছা বলে বিদায় করলাম বটে। দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে নির্জন ছাদে হাওয়া খেতে গিয়ে দেখি সেই ছাত্র নেতাটি আমার তেরো বছর বয়সের কন্যাকে সেখানে প্রেম নিবেদন শেখাচ্ছে।

দেখে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। হাতের কাছে পড়ে ছিল একটা ভাঙ্গা ছাতার বাঁট। সেটা দিয়ে পাগলের মতো দুটোকে ঠেঙ্গালাম ছাদের দরজা বন্ধ করে। ছাতার বাঁটটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেই ছাত্রনেতার পিঠের ওপর। (গায়ের জোরে আমি ঐরকম দু'চারটে ছাত্র নেতাকে খতম করে দিতে পারতাম, কিন্তু বিশ পঁচিশ জনকে তো আর রোকা যায় না)।

এর পরেই আগুন জ্বলে উঠল। ঐ ঘটনার দু'দিন পরেই ছাত্র আন্দোলন সুরু হয়ে গেল আমার স্কুলে আমার অপসারণের দাবীতে। শিক্ষকরা তো আগেই থেকেই আমার উপর বিরূপ ছিলেন পরোক্ষে

তাঁরা ছাত্রদাবীকে সমর্থন করতে লাগলেন। স্কুলে চৈ চৈ বেঁধে গেল। একদিন প্রায় শ'দুই ছাত্র আমার ঘর ঘেরাও করল। আমি বাথরুমের জানালার কাঁচের পাল্লা খুলে ফেলে পিছনের ড্রেন পাইপ বেয়ে সটান রাস্তায় পড়ে দে' দৌড়। ক'টা ছাত্র রাস্তা থেকে তাই দেখতে পেয়ে ধরধর রে, পালায় রে শালা বিশে। বলে আমার পিছনে তেড়ে এল। আমি সামনে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে চড়ে বসলাম। কিন্তু ওঠবার পর দেখলাম তারা আমার কাপড়ের একটা দিক ধরে নিয়েছিল, তাইতে সমস্ত কাপড়টা তাদের হাতেই রয়ে গেল। আণ্ডারওয়ার পরা অবস্থায় আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিসঙ্গে আমার এক বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা দিলাম। দেখলাম উত্তর কলকাতায় থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। নিজের বাড়ীতেও কোনরকমে আর থাকা উচিত নয়, অন্ততঃ গণ্ডগোলটা থেমে না যাওয়া পর্যন্ত।

বন্ধুটী থাকেন রাজা বসন্ত রায় রোডে। তাঁকে সব কথা খুলে বলতে আর আমার ঐ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে স্থান দিলেন তাঁর ফ্ল্যাটের একটা ঘরে। সেই খানেই আমি ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে রইলাম।

এই গা ঢাকা দেওয়া অবস্থায় আমি বাড়ীর বার হই কখন যখন কিন্তু খুব সাবধানে। বেশীরভাগ সময় জানালায় চুপচাপ বসে থাকি। নানান ভাবনা আমাকে আলিয়ে পুড়িয়ে যায়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিতান্তই অপদার্থ, একটা হেড মাষ্টারের পদ পেয়েও রাখতে পারলাম না। আবার মনে হয় থাকগে ও হেডমাষ্টারী, সামান্য কাজকর্ম করে খাব। ঘরে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা একান্ত দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, মানুষ করব কেমন করে? এই ভয়ানক অমানুষের দেশে ছেলে মানুষ করা কি সোজা! তাছাড়া নিজেকেই কেমন যেন একটা অপরাধী বলে মনে হতে থাকে। আমি বাপ হিসাবে নিতান্তই অপদার্থ! না হলে আমার ছেলেমেয়েরা ঐ রকম কেন হবে? আমি নিজেই তো কেরিয়ার তৈরী করার জন্যে অযথা সব মিথ্যে কথাগুলো গিয়ে সভাপতিকে লাগিয়েছি, তাড়িয়েছি আগের ভালমানুষ হেডমাষ্টারকে। তারপর নিজে বই লিখে সভাপতির নামে চালিয়ে দেওয়া। মনে হল, আমড়া গাছের ফল কি আম কখন হয়। তাছাড়া শিক্ষক হিসাবেও আমি কী নিদারুণ রকমে অযোগ্য। আমি শেষে গেলাম কিনা ছাত্রদের শাসন করতে। সঙ্গে সঙ্গে মন রিরি করতে লাগল। ওই বাঁদর, অমপাজী হারামজাদা ছেলেগুলোর সঙ্গে গেলাম বন্ধুত্ব করতে। চোর-ডাকাত, খুনী, অলক্ষরিত্রের দল। শেষ পর্যন্ত মনে পড়ত চাঁদে আমার নিজের মেয়ের সেই অবস্থাটা। সমস্ত মন হাউ হাউ করে জলে উঠত।

ভাবতাম এই সব। আর পাশের বাড়ীর ঠিক একটা পাশাপাশি ঘরে দেখতাম একটি কিশোরকে। নিষ্পাপ ঢলঢল করছে তার মুখশ্রী। গোঁফের রেখা এখনও দেখা যায়নি। বয়স হবে বারো তের। যেন ঠিক রাজপুত্র একটি। ঘরের তাকে বই সাজান। দেখে মনে হয় ছেলেটা অষ্টম কি নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বসে পড়া তৈরী করে। পড়া হয়ে গেলে সে কতকগুলো যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘরে বসে কি সব খেলায় মেতে যায়। তার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকতে থাকেন—খোকন, ওঠ সাড়ে নটা প্রায় বাজে। স্নানকরে খেয়ে নাও, স্কুলে যেতে দেরী না হয়।

ছেলেটিও তখুনি খেলা ছেড়ে উঠে পড়ে। সন্ধ্যায় ছেলেটির বাপ অফিস থেকে ফেরেন। ভদ্রলোক খুব একটা বড় চাকরী না করলেও মোটামুটি রোজগার করেন। দেখে মনে হয় সংসারে অভাব কিছু নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা আমি দেখি পরিবারটি বেশ সুখী। সন্ধ্যায় বাবা বাড়ী ফিরলে মা ও ছেলের যতো কাজই থাক তারা এসে বাবার সঙ্গে কিছু খায়, বসে, গল্প করে। তখন ছেলে বাবাকে উত্তেজিত হয়ে

বেরাতে থাকবে সে স্কুলে কি কি করেছে। কি রকম পড়া বলেছে। মাষ্টার মশাইরা কে কি রকম বলেছে। এমনকি সহাধ্যায়ী ছেলেরা পর্যন্ত কে কি বলেছে সব একের পর এক নিষ্পাপ কিশোর মন উজাড় করে বলতে থাকবে মা-বাবার সামনে। মা বাবা কখনো সামান্য প্রশংসা, কখনো উল্লাস, কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে সেই সব গল্প শুনে যাবেন। খেলারমাঠে ছেলেটি কি কি খেলেছে, কারা হারল, কারা জিতল, এসবও বাদ যাবে না। গল্প শুনতে শুনতেই বাবা ছেলেকে পরামর্শ দেবেন—ছিঃ খোকন ওরকম বলতে নেই। কিন্তু কাল এইভাবে মাষ্টার মশাইকে কথাটা বুঝিয়ে বলবে, বুঝলে। যে রকমভাবে বলেছ তাতে মাষ্টার মশাইয়ের মনে লাগতে পারে। এমন কি খেলাধুলো সম্বন্ধেও বাপের পরামর্শ চলতে থাকে। —আর একটু ভরসা করে যদি তুই এগিয়ে যেতিস তো দেখতিস ও পক্ষের বড় মোটাসোটা ছেলেটা তোর কাছে হটে যেত। ইত্যাদি। এরপরেও বেশ কিছুকাল গল্প হয় মা-বাবাতে। ছেলেও সেখানে থাকে এবং তাঁদের সব আলোচনাতেই যোগ দেয়।

আমি ঠিক দুভিক্ষ পীড়িতের মতো এই পরিবারটিকে দেখি। এরকম পারিবারিক সুখ আজকাল প্রায় চোখেই পড়েনা। বন্ধুর স্ত্রীর কাছে খোঁজ নিলাম। শুনতে পেলাম ভদ্রলোক শ্রীমহীতোষ বসু কোন ফার্মে একটা বিরাট কাজ করতেন। কয়েক হাজার টাকা মাইনে পেতেন। তাঁর ওপরওয়ালারা তাঁকে এক সময় এমন একটা কিছু করতে বলেন যাতে কোম্পানীর প্রচুর মুনাফা থাকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অনেক বেশী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল দেশের ও দশের। তিনি সেটা করতে রাজী হননি তো বটেই, প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন শক্ত কথায়। কোম্পানী অসন্তুষ্ট হল তাঁর ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে এখানে সাধারণ অবস্থার মধ্যেই বাস করছেন, আর জীবন সংগ্রাম চালাচ্ছেন একটা ছোটখাট রুটো মেটিরিয়াল্‌স্‌এর দোকান করে। ভদ্রলোকের ঐ একটা মাত্র ছেলে। তারওপর বাপমায়ের সমস্ত নজর পড়ে আছে। ছেলে স্কুলে পড়ে। কিন্তু ঘরে রাতে পড়ে বাবার কাছে, দিনে পড়ায় তার মা। বন্ধুর কাছে শুনলাম, একমাত্র ছেলে অত আদরের ফলে কি হবে বাপ-মায়ের শাসন বড় কড়া। অথচ কখনও ছেলের গায়ে হাত তোলেন না তাঁরা।

আমার শুনে কেমন অদ্ভুত লাগল। আমি নিজে শিক্ষক ও বাপ। আমার ধারণায় কিছুতেই এল না যে, যে ছেলে বাঁদরামী করে, তাকে না মেরে শাসন করা যায় কেমন করে। কিন্তু সুযোগ শীঘ্রই এল। আমি স্বচক্ষে দেখলাম সেই শাসন।—

সকালে জানালা দিয়ে পাশের ঘরে নজর পড়তেই দেখলাম বাপ-ছেলেতে কথা হচ্ছে। বাপ বলছেন—গতকাল ইলেক্ট্রীকএর বিলের টাকা জমা দেবার শেষ দিন ছিল। তুমি ভুলে গেলে কেমন করে?

ছেলের মুখের দিকে নজর করে দেখলাম, সেটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সে বাপের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নীচু করে অস্পষ্ট গলায় বললে—ইস্কুল-এর এক পিরিয়ড পরেই ছুটী হয়ে গেল। আমরা খেলায় জিতেছি বলে। তাই কজন বন্ধু আমরা নতুন ইলেক্ট্রীক ট্রেনে চেপে বালিগঞ্জ থেকে বারুইপুর গিয়েছিলাম। আমার ভুল হয়ে গেছে যে ইলেক্ট্রীকের টাকাটা জমা দেবার কালই শেষ তারিখ ছিল।

তারপর আর একবার উচ্চারণ করল—আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে বাপি। তার সমস্ত গলার স্বরে তার ভুলের অনুতাপটা প্রকট হয়ে উঠল

কিন্তু দেখলাম বাপকে। তিনি অত্যন্ত কাট কাট গলায় বললেন—ভুল যখন করেছ সে খেসারত

তোমাকেই দিতে হবে। এই সিনেমা রিবেট হল পাঁচ সিকে। ঠিক দিনে বিল না দেবার জন্যে এই পাঁচ সিকে বৃথা নষ্ট হল। তুমি এই টাকাটা আজ রোজগার করে নিয়ে আসবে যেখান থেকে পার। আর তোমার মাকে বলে যাচ্ছি, যতক্ষণ তুমি এই টাকাটা রোজগার না করবে ততক্ষণ সে তোমাকে খেতে দেবে না। তুমি কোন বন্ধুর কাছ থেকে এই টাকা ধার করবে না। কোন রকম অসৎ উপায়ে রোজগার করবে না। আর যতক্ষণ পাঁচ সিকে রোজগার না করবে ততক্ষণ হাজার খিদে পেলেও কিছু খাবে না।

বলেই তিনি আর ঘরে দাঁড়ালেন না। গট গট করে বার হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে বিরক্ত হলাম। একি বাড়াবাড়ি। অতটুকু একটা ছেলের ওপর একি কঠিন আদেশ। এযে অপরাধের তুলনায় শাস্তিই গুরুতর হল। লোকটা কি সাংঘাতিক অর্থ পিশাচ যে পাঁচ সিকের পয়সা খরচ হয়েছে বলে দুধের বাচ্চাকে ঐ রকম একটা শাস্তি দিয়ে গেল।

ছেলে কিন্তু কিছুই বললে না। সেদিন কিসের একটা ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। দেখলাম ছেলেটা একটা আধময়লা প্যান্ট আর সার্ট পরে আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। তার চোখে মুখে একটা চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে, যেটা আমি প্রায়ই দেখে থাকি বয়স্ক লোকদের চোখে মুখে যখন তারা জীবনে একটা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে ভাবটা আদৌ ছেলে মানুষের নয়।

আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বার হয়ে গেলাম, আমার বিপদের কথা ভুলে গিয়ে। ছেলেটাকে আমি এই ক'দিনের দেখাতেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে রাস্তায় ধরে বললাম,—খোকা, আমি শুনেছি তোমার পাঁচ সিকে পয়সার দরকার। আমি যদি তোমাকে সেটা দিয়ে দিই, তুমি নেবে কি ?

ছেলেটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার ডাগডাগে দু'চোখ মেলে। তারপর আমায় গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল—আপনি কে ?

—আমি তোমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকি।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে কখনও দেখিনি। তাছাড়া আপনার দেওয়া পয়সা আমি নেব কেন ? আমি তো ভিক্ষুক নই।

সেই অতটুকু যার তের বছরের ছেলের মধ্যে আমি যে আত্মমর্যাদার মহিমা দেখলাম, সত্যি করে বলছি মহাশয়রা তা আমার জীবনে পূর্বে দেখার সুযোগ হয়নি। মনে হল সে বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, আমাদের দেশের সংখ্যাহীন পরনির্ভরশীল বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে অনেক বড়। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু তুমি পাঁচ সিকে কি ভাবে রোজগার করবে ?

ছেলেটা তখন আর কিশোর নয়, ঐ কুঁচকে ভারিক্কি বয়স্কের মতো আমাকে প্রায় ধমকের সুরে বললে—তাতে আপনার দরকার কি ?

সত্যি বলছি মশাইরা, আমি পালিয়ে এলুম। নেড়ী কুকুরে যেমন তাড়া খেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসে, এমনি করে পালিয়ে এলুম। কিন্তু দূরে থেকে দেখতে লাগলুম ও কি করে !

দেখলাম ছেলেটা সেক মার্কেটের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি মার্কেটের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে দেখলাম সে মাথায় আর হাতে দুটো মোট নিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বুঝলাম সে মাল বয়ে পয়সা উপার্জন করবে।

আমি বাড়ীতে ফিরে এলাম। কিন্তু দৃষ্টি রাখতে লাগলাম পাশে সেই ছেলেটার ঘরে। আমার

সারাদিন প্রায় সন্ধ্যাকটকী হয়ে উঠল। আমি কিছুতেই আরাম পাচ্ছিলাম না। না খেয়ে, না শুয়ে, না বসে। খালি ঘরটা খাঁ খাঁ করছিল আর আমার চোখের উপর ভাসছিল সেই চলচলে কিশোর মুখখানা, না খেয়ে সে মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। আর মনে মনে আমি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিলাম সেই নিষ্ঠুর বাপটার ওপর।

সন্ধ্যার পর পাশের বাড়ীর ঘরেতে আলো জ্বলল না। বাবা, মা আর ছেলের দৈনন্দিন গল্পের আসর বসল না। এখন এ বাড়ীতে বন্ধু পত্নী একটু সম্বিত হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওবাড়ীতে গেলেন খোঁজ নিতে ব্যাপারটা কি।

কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন—এমন অদ্ভুত কথা কোথাও শুনেছেন ঠাকুরপো? ছেলেকে বাপ শাস্তি দিয়েছে, ছেলে বেরিয়ে গেছে না খেয়ে। তাই বাপও কিছু খেয়ে যায়নি। যাও সারাদিন উপোষে আছে। তাছাড়া মায়ের ঐ উপোষের ওপর উদ্বেগটা দেখুন। সন্ধ্যা আটটা বাজতে চলল। ছেলেরও পাত্তা নেই, বাপেরও পাত্তা নেই। দেখি উনি এলে একবার খুঁজতে পাঠাব।

কিন্তু আমার বন্ধুটী রাত নটার আগে বাড়ী আসেন না। কাজেই আমি বললাম—আমি যাব কি খুঁজতে? আমি জানি ছেলেটা কোথায় আছে?

বলতে বলতে দেখলাম—ছেলের ঘরে আলো জ্বলে উঠল। বাবা আর ছেলে দু'জনে ঘরে ঢুকল। বাবা ডাকলেন—উমা, উমা, এই এ ঘরে এসো।

আমি বাপের গলার স্বরে একটা চাপা উত্তেজনা ও আনন্দের আওয়াজ পেলাম। দেখলাম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন তার বাপ দৃঢ় আলিঙ্গনে। আর সেই নিষ্ঠুর দণ্ডদাতা বাপের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। বাপ বলছে—তুই আমার হীরে মাণিকের থেকেও দামী বাপি! সেই তোকে আমি সারাদিন কিছু না খেতে যে দিয়ে শাস্তি দিয়েছি, তার শাস্তি কি আমি কিছু কম পেয়েছি রে? তুই কিন্তু খাসনি ভেবেই তো সারাদিন আমি কিছু মুখে তুলতে পারিনি। তোর মাও কিছুই খায়নি। তুই শাস্তি নিয়ে সে শাস্তি যে দ্বিগুণ করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিস বাপি।

এমন সময় স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। বাবা লাফিয়ে উঠলেন—উমা, এই ছাখ, বাপি সারাদিন ঘোট ঘরে পাঁচ দিকে উপার্জন করেছে। ও হেরে যায় নি, একি আমার কম গর্বের কথা উমা।

হাতের মুঠোটা তিনি ওপরে উঠিয়ে দোলাচ্ছিলেন। সেই মুঠো নামিয়ে স্ত্রীর হাতে পয়সাগুলো ফেলে দিয়ে তিনি বললেন—এই বাপির প্রথম রোজগার। এ ওর ভুলের শাস্তি নয়, এ হল ওর অপরাজেয় মনের চিহ্ন। এটা যত্ন করে তুলে রাখ উমা, এ বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী।

মার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। বাপের চোখের জল তখনও শুকোয় নি। সে দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ল—রবীন্দ্রনাথের কোথায় কবে যেন পড়েছিলাম—'দণ্ডদাতা কাঁদে যবে দণ্ডিতের সাথে' সার্থক সেই দণ্ড দেওয়া।

মা চোখের জল মুছে বললেন—যাই আমি খাবার গরম করিগে, তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এসো।

ঘর ফাঁকা করে সবাই চলে গেল। আর আমার মনে হল আমার খালি ঘর যেন ভর্তি করে দিয়ে গেল ঐ দণ্ডদাতা পিতা।

———

অঙ্গনা-সংবাদ

—দেবযানী

চার বছরের ছোট্ট মেয়ে লেস্‌লি পার্ণ। লণ্ডন শহরের অফিস যাত্রীদের বুক দুরুদুরু লাগিয়ে দিলেন সকালে। অ্যাম্বুলেন্স, দমকল—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

লণ্ডনের একটা ব্যস্ত রাস্তা। প্রচুর লোকজন গাড়িঘোড়ার যাতায়াত দেখান দিয়ে অনবরতই। সেই রাস্তার ধারে একটা আপিসবাড়ি। রাস্তা থেকে আধি ফুট উঁচুতে ছাতের আল্‌সে—মাত্র ৯ ইঞ্চি চওড়া।

আপিসবাড়ি নীচে, উপরে বাড়িওয়ালা বাস করেন। সেই বাড়িওয়ালার ছোট্ট নাতনি লেস্‌লি। মা, বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা ঘরে বসে বসে গল্পগুজব করছেন, মেয়ে এদিকে কখন্ সুট্ ক'রে চলে গেছে ছাতের দিকে। দরজা খোলা ছিল, ছাতের রেলিং পরে একেবারে জানিসের ওপরে চলে গেছে। চারদিকে উঁচুনীচু নানা মাপের বাড়ি, মাথার ওপর মস্ত খোলা আকাশ, নীচে ভরাদুপুরে রাস্তা—বেশ মজাই লাগে চেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে, আর আল্‌সের ওপর দিয়ে গুটিগুটি হাঁটছে—

ওদিকে নীচের রাস্তায় মানুষজন চলছিল যারা, উপর দিকে তাকিয়ে তাদের তো চক্ষুস্থির! আরে কী সর্বনাশ! ঐ কার্নিস জানিস, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই আর দেখতে হবেনা। হে ভগবান, রক্ষা কর।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল দমকল আর অ্যাম্বুলেন্সে। পড়ি-পড়ি ক'রে ছুটে এল তারা। নীচে সবাই নিশ্বাস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছে। মেয়ের বাবা-মাকে খবর দিয়ে দিলে। মেয়ের কিন্তু ভ্রুক্ষেপই নেই, ভয়ও নেই এতটুকু। পাশের বাড়িখানার তত্ত্বাবধায়কের নাম অ্যালান কোয়াটারমেন—তিনি চলে গেলেন নিজের ছাতে, গিয়ে লেস্‌লিকে একজায়গায় স্থির রাখবার জন্যে সেখান থেকেই তার সঙ্গে নানারকম গল্প জুড়ে দিলেন। ওদিকে লেস্‌লির মা চুপি চুপি ছাতে গিয়ে অতি সাবধানে ও সুকৌশলে মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেন ঐ বিপজ্জনক জায়গা থেকে। পরের দিন খবরের কাগজের পাতায় লেস্‌লির বৃত্তান্ত বেরিয়ে গেল।

—কিন্তু আল্‌সে থেকে উদ্ধারের পর শখ তথা দুঃসাহসের জন্যে লেস্‌লি যে আচ্ছা ক'রে পিটুনি খেয়েছিল, তার খবর কজনে রাখে? বেচারি তার চারবছরের জীবনে বড়রকমের মার খেল এই প্রথম।

• • • •

নয়াদিল্লির সুজন সিং পার্ক। আসলে পার্ক নয়, রাস্তা, যেমন কলকাতায় হিন্দুস্থান পার্ক। এখানে একটা বাড়ির চারতলায় ফ্ল্যাটে থাকেন মিসেস বেটি কীট ক্যানান নামে একজন মার্কিন মহিলা। বয়স পঞ্চত্রিশ। লোকে বলে, মাথায় গোলমাল আছে। সত্যি-মিথ্যে কে জানে। পুলিশের কাছে নালিশ গেল, ভদ্রমহিলা ওপর থেকে নির্বিচারে বাচ্চা-ভাঙা মাথায় শিশি-বোতল, হাতা-খুন্তি, চেয়ার, লাঠি ইত্যাদি ছুড়ে মারেন। ফ্ল্যাটে ভদ্রমহিলা একা থাকেন, সামলাবার বা বাধা দেবার কেউ নেই।

আদালত থেকে সমন গেল। কিন্তু কে মানে সে সমন! ক্যালিন দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকেন, পুলিশ নাগালই পায়না তাঁর। তিনদিন ধরে চেষ্টা হল দরজা খোলাবার। তখন বাধ্য হয়ে অন্য পথ।

বারোজন মহিলা পুলিশ সন্তর্পণে মই বেয়ে উঠলেন সেই চারতলার বারান্দায়। ফ্ল্যাটেরই বারান্দা। ঘরে ঢুকে তাঁরা ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলেন। সেখানে আরো লোকজন অপেক্ষা করছিল। ক্যালিন অবশ্য বরাবরই চেষ্টা করলেন বাধা দিতে, কিন্তু একা পারবেন কেন? মেয়ে-পুলিশের হাতে আমেরিকার মেয়ে বন্দী হয়ে চালান হলেন পাশাপাশি ব্লিটের একটা চাজতে। সেখান থেকে কারাগারে।

• • • •

ক্যা তাজ্জব!—তেহেরাণের সেই ইরাণী বোড়শীটিকে দেখে—অর্থাৎ তার কার্যকলাপ দেখে, সবাই একবাক্যে বলবে একথা। সত্যি তাজ্জব হবারই কথা বটে। আর শুধুতো আজকের ঘটনা নয়, আজ দু'বছর ধরে মেয়েটি দেখিয়ে আসছে এই তাজ্জব-কা-খেল। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এহেন শক্তির পরিচয় দেয়া আশ্চর্য বটে।

লরেন্স বানাপুর ব'লে ঐ মেয়েটি নাকি গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে কোন্ মানুষের ক্যান্সার হয়েছে। এ রোগের অথবা রোগীর, নাকি বিশেষ একটা গন্ধ আছে তা থেকে ঠিক বলে দেয়া যায়। তেহেরাণের একটা মহিলা পত্রিকায় খবরটা প্রথমে বেরোয়। লরেন্স বলে, 'অনেক সময় হয়ত কোন দোকানে ঢুকেছি, কি কোন ঘরে—বাতাসে গন্ধ পেলুম ক্যান্সারের অথচ আগে থাকতে আমার জানাই ছিলনা সেখানে সত্যি-সত্যি তেমন কোন রোগী আছে কিনা।'

গন্ধটা কী রকমের সে পায় জিজ্ঞেস করা হলে মেয়েটি জবাব দেবে, 'বদ্ গন্ধ কিছু পাই যে তা নয়, আবার ধূপ বা আতরের মত সুগন্ধিও নয়।'

গন্ধ শুঁকে এই রোগটি চেনার বিশেষ ক্ষমতা সে কী ক'রে লাভ করলে? বানাপুর বলে, 'আমার এক আত্মীয়ের ক্যান্সার হয়েছিল। আমি প্রায়দিনই তাঁকে দেখতে যেতাম। সেই থেকেই ক্রমশ এই ক্ষমতাটা আমার আসে।'

তেহেরাণের সেই মহিলা পত্রিকাটি একটি তাক্তারি 'বোর্ড' বসাচ্ছেন লরেন্সর 'ক্ষমতাটি' নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা থাকবেন এই 'বোর্ডে'।

• • • •

পাঞ্জাব সরকার এক নতুন নিয়ম জারি করেছেন। যেসব মেয়ের বয়স পঁচিশের নীচে কিংবা যাদের বিয়ে হয়নি, সমবায় বিপণিগুলিতে তাদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা চলবে না। আর এই শ্রেণীর যারা ইতিমধ্যে এইধরণের কাজে নিযুক্ত আছে, ক্রমশ তাদের অন্যত্র নিয়োগ বা বদলি করা দরকার।

• • • •

শ্রীমতী জিনাইদা ভরোনিনা মহিলা জিমন্যাস্ট হিসেবে সোভিয়েট রাশিয়ায় সুপরিচিত। তাঁর স্বামী মিখাইল ভরোনিনও একজন সুখ্যাত জিমন্যাস্ট। জিনাইদার বর্তমান বয়স ২০, কুমারী জীবনে পরিচিত ছিলেন রুসিনিনা নামে। ১৯৬৭ খ্রীঃ আমস্টার্ডামে জিমন্যাস্টিক্সের সর্ববিষয়ক ইউরোপীয়ান কাপ প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক লাভ করেন। স্কুলে পড়ার সময় পরীর চর্চাই জিনাইদার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। দৈনিক তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা ইনি অনুশীলন ক'রে থাকেন এখনও। ১৯৬৬ সালে কিয়েভে রাশিয়া বনাম জাপান যে মৈত্রী প্রতিযোগিতা হয় তাতে ইনি বিজয়ী হন। স্বামীর ক্রীড়াকৌশল তাঁকে অত্যন্ত

আনন্দ দেয়। জিনাইদার ইচ্ছা, আরো ৬-৮ বছর তিনি জিমন্যাস্টিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সক্রিয় থাকেন। এবং তা সুন্দর প্রদর্শনী বজায় রেখে। পারিবারিক দিকে তরুণী গৃহিনীরূপে নিজ কর্ত্তব্য পালন করতে তিনি খুবই ভালবাসেন।

• • • •

ইটালির সিসিলি দ্বীপের বাসিন্দা উনত্রিশ বছরের মেয়ে শ্রীমতী মারিয়া পুলিয়ো। এই বয়সেই সে দিদিমা অর্থাৎ মাতামহীর মহিমা লাভ করেছে। সারা ইটালির মধ্যে ওর চাইতে অল্পবয়সী দিদিমা বর্ত্তমানে কেউ আছে বলে জানা নেই।

মারিয়ার কন্যার বয়স এখন ষোল বছর। চোদ্দবছর বয়সে তার বিয়ে হয়। সম্প্রতি সেই মেয়ে একটি শিশুকন্যার জননী হয়েছে। দিদিমা মারিয়ার বিয়ে হয়েছিল জনৈক শ্রমিকের সঙ্গে ষোল বছর আগে; নবজাতকের দাদু অর্থাৎ মাতামহের বয়স তখন উনিশ। নবজাতকের পিতার বয়সটা জানা যায়নি।

• • • •

মার্কিন সেনাবাহিনীর 'মেরিণ' শাখায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কাজে যোগ দিয়েছেন অথচ ঐ যুদ্ধ সমর্থন করেন না, এমন একটি মেয়ের নাম মেরি এলিজাবেথ বার্নস্। 'কর্পোরাল'-এর পদে তাঁর চাকরি। বয়স একুশ। এই সেদিন তাঁর নামে অভিযোগ আনা হয়েছে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার দায়ে। এবং এর জন্যে তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্টমার্শাল-এর সম্মুখীনও হতে হয়েছে। বার্নসের বিরুদ্ধে আনীত তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুটি হচ্ছে: মিলিটারি ইউনিফর্ম পরতে অস্বীকার করা; এবং অফিসে ডিউটি দিতে অস্বীকার করা। এলিজাবেথ যে বিভাগে কাজ করেন, সে-বিভাগের কাজ হচ্ছে ভিয়েতনামে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যদের কাছে কেন্দ্রীয় হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশ ও খবরাখবর রেডিও মারফৎ পৌঁছে দেওয়া।

• • • •

এবারের আন্তর্জাতিক 'মিস্ টীন' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানের অধিকারিনী হয়েছেন জ্যানেট ম্যাকলাউড্। 'মিস্ টীন' প্রতিযোগিতা হল এমন সব কিশোরীদের ব্যাপার যাদের বয়স উনিশের মধ্যে। বাংলা ক'য়ে বলতে গেলে হয়ত বলা যায় 'বিশ্ব-কিশোরী-শ্রী' প্রতিযোগিতা। এর আগে মোট দু'বছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে; এবারেরটা হল তৃতীয় বছর। ফাইনালে উঠেছিলেন বারোটি বিভিন্ন দেশীয়া তরুণী। এদের মধ্যে বিচারে বিজয়িনী জ্যানেট অষ্ট্রেলিয়ার মেয়ে, এ বছরেই 'মিস্ টীন অষ্ট্রেলিয়া' আখ্যা পেয়েছেন। ওর বাবা সিডনি শহরের উপকণ্ঠে একটা রুটি তৈরির কারখানার মালিক। জ্যানেটের বয়স সতেরো, উচ্চতা ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি, ওজন ১২৬ পাউণ্ড। মাথার চুল মোলায়েম, কালো রঙের, চোখের রংটি কিন্তু নীল। ওর দৈহিক সৌষ্ঠবের মাপ হচ্ছে ৩৫—২৪½—৩৬।

'মিস্ টীন কানাডা' অ্যান গ্রাজিয়ানা ভাশীজা এরও বয়স সতেরো - প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারিনী হয়েছেন। তৃতীয়ার নাম পায়েলা মার্টিন ওরফে 'মিস্ টীন ইউ-এস-এ'; বয়স আঠারো।

• • • •

পশ্চিম বঙ্গ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এবছরে কিশোর ও সাধারণ দুই বিভাগেই সিঙ্গলস্-এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স পনের। মহিলা বিভাগে ও কিশোরী বিভাগে জয়ী হওয়া ছাড়াও তুলসী মহিলা ও মিক্সড্ ডাবলসের ফাইনালেও বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ছিলেন।

• • • •

নেপালের বিরাটনগর ব'লে জায়গায় এক বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। কিন্তু তারা ঠিক জানত না বা বুঝতে পারেনি যে, ঐ বাড়িতে রায়বাঘিনী শ্রেণীর একজন মহিলা আছেন, তাঁর নাম শ্রীমতী বাঘামবালি। মহিলার প্রতিরোধের বাঁধ ভাঙতে তারা অনেকভাবে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা। কার সাধ্য তাকে ডিঙিয়ে ভিতরে যায়! তখন বেগতিক দেখে তারা বাঘামবালির নাকটাই দিলে কেটে।

মহিলাটিকে পরে চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

• • • •

জোহানেসবার্গের উনিশ বছর বয়স্কা মেয়ে টাইপিস্ট লিজা নৌতে দাবী করেছে যে, সে না ঘুমিয়ে জেগে থাকার ব্যাপারে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে—১২১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। এই সময় ধরে জেগে থাকার ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি প্রকাণ্ড মনোহারী দোকানের শো-কেসে। নৌতে বলে, "পুরুষদের আমার দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, মেয়েরাও তাদেরই মত নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে পারে।"

• • • •

ব্রাজাভিল্-এর যে সব অল্পবয়সী মেয়েরা (অথবা অধিকবয়সীরাও) মিনি-স্কার্ট পরতে অভ্যস্ত, তাদের কিন্তু এবার থেকে একটু ঝুঁকি নিতে হবে। কারাবাসের ঝুঁকি।

ওখানকার সরকারী মহল থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, এর পর থেকে 'মিনি'-পরা মেয়ে দেখলেই তাকে ধরে জেলে পোরা হবে। তারপর তার বাবা-মা বা বাড়ির অন্য কোন লোক যদি তাদের জন্তে যথেষ্ট ভদ্র পোষাক নিয়ে আসেন, তবেই তারা ছাড়া পাবে, নচেৎ হইল আটক। এই নিয়ম কেবল দেশীয় মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ইউরোপীয় মেয়েদের বেলায়ও। বলা হয়েছে যে মিনিস্কার্ট এমন একটা পোষক যা কিনা একটু বেশি মাত্রায় উহার সামাজিক নীতিশীলতার পরিচায়ক, এবং সেই হেতু তা অসামাজিক হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

• • • •

ভারতের শিল্পকলা, হাতের কাজ প্রভৃতির জন্তে জার্মানীর মেয়েদের অনুরাগ সুবিদিত। এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক নৈপুণ্য ওঁদের বরাবর আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে থাকে। ভারতের যে বৈশিষ্ট্য এইদিকে রয়েছে তাকে তাঁরা আয়ত্ত করতে সর্বদা সচেষ্ট। যেসব ভারতীয় মহিলা জার্মানীপ্রবাসী তাঁদের ওঁরা নানারকমে উৎসাহিত ও সম্মানিত ক'রে থাকেন। বিনিময়ে নিজেদের যা কিছু দেবার তাও তাঁরা শিখিয়ে যেন ভারতীয় বোনেদের। এইভাবে পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময়—এ এক অতি উৎসাহজনক জিনিস।

• • • •

একমাত্র মহিলা-পরিচালিত ও মহিলাদের জন্তই সমবায় সমিতির সংখ্যা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে নেহাৎ কম নয়। এটা জানা গেছে একটি মহিলা-পরিচালিত সমীক্ষার ফলে, যার নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী লীলাবতী ব্যাস্থার। এই সমীক্ষায় জানা গেছে যে, মহিলা সমবায়ের সংখ্যানুপাতিক হিসাব এইরকম :—

পাঞ্জাব ৬১৩, উত্তরপ্রদেশ ২১৬, উড়িষ্যা ৬০, বোম্বাই ৫২, অন্ধ্র ৪৫, মাদ্রাজ ৪৩, পশ্চিমবঙ্গ ২৮, রাজস্থান ও বিহার ২৩, মহীশূর ১৮, মধ্যপ্রদেশ ১৪ ও হিমাচল ৩।

পশ্চিম বাংলার সমিতিগুলোর শেয়ার-ক্যাপিটালের অবস্থা বিশেষ উন্নত নয় এবং সভ্যদের সংখ্যাও বেশি নয়।

ফেমিনা সাহিত্য পুরস্কার এবছরে পাচ্ছিল তরুণী শ্রীমতী ফ্রেজার এথেরেলি-র বরাতে। এঁর বই 'এ্যালিস আইলা ভাই ভাই'। বিচারক ছিলেন দশজন মহিলা। এথেরেলির বইটি জীবনগাথা শ্রেণীর। লেখিকার জন্ম বোর্দো শহরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বাবা বন্দর সংক্রান্ত একজন কর্মচারী। লেখিকা একটি পর্যটন-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। আরো তিনটি লেখিকাও বিচারকমণ্ডলীর কাছে ভাল ভোট পেয়েছেন। এঁদের নাম জাঁ মর্তোরিয়র, জর্জেস ওয়াল্টার আর ক্রিসটাইন আরনটি।

• • • •

পুরুষদের বেলায় যদি বলা হয় দৌড়বীর, মেয়েদের বেলায় কী বলা হবে?—দৌড়বীরাঙ্গনা? সেই রকম একজন বীরাঙ্গনার নাম ম্যাডেলিন ম্যানিং। দৌড়ে ওস্তাদ এই নিগ্রো-কিশোরী। বয়স কুড়ি। ওহিওর ক্লীভল্যাণ্ডে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জন্ম। দৌড়ের মাঠে নেবেছে কিন্তু বেশিদিন নয়—১৯৬৫ সালে আরম্ভ করেছে নিয়মমাফিক অনুশীলন ও শিক্ষাগ্রহণ। ওর নিজের ভাষায় শুনুন, "এত তাড়াতাড়ি জিনিষটা [দৌড়] বশ হয়েছে আমার, যে কী বলব। শুরু করলাম জানুয়ারি মাসে, ৬ মাস অনুশীলন ক'রেই জুলাই মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলীট দলে নির্বাচিত হয়ে গেলাম। জাতীয় মহিলা ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম জিতলাম। তারপরে ইউরোপেও গেছি।" আশা করা হয়, পরবর্তী অলিম্পিকে ৮০০ মিটার দৌড়েও ও জয়লাভ করবে।

এই তো সেদিন চারটে বড় বড় প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হল। নিজেদের দেশের হয়ে কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, ইউরোপের দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিলিত আমেরিকান দলের হয়ে প্রথম; এবং তারপরে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ছাত্র-প্রতিযোগিতায় একটি স্বর্ণপদক লাভ।

মাথায় ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি, ওজনে ৬১·২ কিলোগ্রাম এই মেয়েটি সমাজতত্ত্বের ছাত্রী। এখনো তিন বছর ওর কলেজ জীবন আছে। কথাবার্তায় খুব চৌকস, এবং ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

• • • •

নর্থ ক্যারোলিনার অধিবাসী শ্রীমতী লটি কুইন অভিযুক্ত হয়েছিলেন নরহত্যার দায়ে। বিচারে তাঁর সাত বছরের মেয়াদ হয়। কিন্তু অতদিন তাঁকে কারাবাস করতে হল না—দেহের ওজনই তাঁকে মুক্তির পথে নিয়ে গেল।

কি ক'রে জানতে চান? জেলের সাধারণ যে খাবারের পরিমাণ, তাতে দেখা গেল শ্রীমতী কুইনের কুলোচ্ছে না একেবারেই। ঐটুকু বাঁধাধরা আহারে তাঁর শরীর ঠিক থাকে না। তার ওপরে আবার ঠিকমত ডাক্তারী দেখাশুনো হচ্ছিল না। এহেন অবস্থায় কর্তৃপক্ষের উপায় রইল না শ্রীমতীকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া। কোথায় পালাবেন না, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁকে ছেড়েই দেওয়া হল শেষে।

কুইনের দেহের ওজনটি রাজকীয়ই। ছাব্বিশ স্টোন। অর্থাৎ ৩৬৪ পাউণ্ড। অর্থাৎ চার মণ বাইশ সের।

• • • •

আমেরিকার উপন্যাসলেখিকা মিস্ এডনা কার্বার সম্প্রতি নিউইয়র্কে মারা গিয়েছেন। মিচিগান-এর অন্তর্গত কালামাজু নামে জায়গায় ১৮৮৭ খৃঃ তাঁর জন্ম। সতের বছর বয়স থেকেই সংসারের ভার পড়ে তাঁর ওপর, বাবা দৃষ্টিশক্তি হারাবার ফলে। সাংবাদিক হিসেবে জীবন সুরু করেন। কলম হাতে তুলে নিলেন সেই প্রথম। ক্রমশ ছোটগল্প বেরোতে লাগল। প্রথম সাফল্যময় উপন্যাস ১৯২৪ সালে 'সো বিগ'। প্রচুর বিক্রী বিরাট খ্যাতি পেলেন এর পরে 'সো-বোট' লিখে। মোটমাট প্রায় তিরিশখানা বই লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে বহুলপরিচিত কয়েকখানি: 'সারাটোগা ট্রাঙ্ক', 'মাদার নোজ বেস্ট', 'তিনার এ্যাট এইট', প্রভৃতি।

দিবা স্বপ্ন

সুভাষ সেন

দীপার বাবা-মার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি ছিল না। অন্তত আমার তো তাই মনে হত। নইলে রোজ সকালে আমার পাশে বসিয়ে ওকে যখন কলেজে নিয়ে যেতাম ওঁরা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে টা টা করবেন কেন? আর দীপা? দিব্যি সেজেগুজে বইখাতা বুকে চেপে আমি যতক্ষণ না আসি, গেটের কাছে অস্থিরভাবে পায়চারি করত। আবার বিকেলেও সব কিছু ফেলে চারটা বাজতে না বাজতে যখন কলেজের গেটে এসে হাজির হতাম, দেখতাম সারাদিন ক্লাস করে মুখ শুকিয়ে দীপা আমার অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে বড় মায়া হত। বলতাম "দেরি করে ফেললাম নাকি?" আমার বাঁদিকের দরজা খুলে ভেতরে এসে বসতে বসতে দীপা জবাব দিত, "না, কই দেরি হয়নি তো। এই তো সবে দুটি হল।" কখনো কখনো ওর দু'একজন বন্ধুও উঠে পড়ত গাড়িতে। সেসব দিন সারা রাস্তা খোশগল্প আর হাসির হররায় সরগরম হয়ে থাকত। দীপার বন্ধুদের যার যার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যখন আমরা দীপাদের বাড়ির গেটে ঢুকতাম প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে যেত। দীপার মা তখন উতলা হয়ে বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই ওঁর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বলতেন, "এত দেরী হল যে আজ? রাস্তায় কোন গোলমাল হয়নি তো? আমার ভাবনাই হচ্ছিল, যা দিনকাল পড়েছে।"

আমি স্বভাবতই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তাম। তবে আমি মুখ খোলবার আগে দীপাই জবাব দিত, "কই মা, দেরি তো বেশি হয়নি। সোমা, ইন্দ্রাণী আর কমলাকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম কিনা, একটু ঘুরে আসতে হল।"

দীপাকে এতদিনেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার যে ওকে ভালো লাগে সেটা ও না বোঝারই ভান করে, না সত্যি বোঝে না, সেটাই ধরতে পারি না। অবশ্যি আমিও যে কথাটা ঠিক মুখ ফুটে কখনো ওকে বলেছি তা নয়। কেই বা বলে, নেহাৎ দুঃসাহসী বা নির্লজ্জ না হলে। হাবভাবেই বুঝে নিতে হয়। সবে কলেজে উঠলেও এমন কিছু ছেলেমানুষ নয় দীপা। তবে আমাকে যে ওর খুব অপছন্দ নয় সেটা খানিকটা আঁচ করতে পারি। দীপা যে শুধু দেখতেই সুন্দর তা নয়, জামাকাপড় পরেও ভারী চমৎকার। খুব সৌখীনও বটে মেয়েটা। একই শাড়ি কখনো ওকে পরপর দুদিন পরতে দেখিনি। বাপমায়ের একমাত্র সন্তান, সুতরাং আদুরে তো একটু হবেই। যখন যে শখ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ সেটা মেটানো হচ্ছে। শাড়ি, ব্লাউজ, জুতো, পাউডার, স্নো, লিপ্‌স্টিক—এসব তো প্রতিমাসেই কেনা হচ্ছে। আমার সঙ্গে গিয়েই তো কতদিন কিনে এনেছে। টাকাটা অবশ্যি যায় ওর বাবার পকেট থেকেই, কিন্তু আমার যা

একটু চড়চড় না করে পারে না। কিন্তু রোজ সকালে সিনেমা স্টারের মতো সেজে, ভালো ভালো সুগন্ধী মেখে যখন দীপা গাড়িতে আমার পাশে এসে বসে, সমস্ত গাড়িটা সুগন্ধে ম' ম' করতে থাকে। আমি তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে না তাকিয়ে পারি না। আজকালকার মেয়েদের পোশাক পরবার ধরণটা আমার বেশ লাগে। যারা সুন্দরী নয় তাদেরও সুন্দর মনে হয়। আর দীপা তো রম্ভার মতো সুন্দরী। গাড়ি চালাতে চালাতে আড়চোখে ছাড়া পাশের লোকের দিকে তাকানো চলে না। কিন্তু তাতেই বুঝতে পারি ও আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছে। চলন্ত গাড়িতে হাওয়ার দমকে যদি বুকের আঁচলটা খসেও পড়ে সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দিব্যি নির্বিকার ভাবে ঐ অবস্থাতেই বসে থাকবে। অবশ্যি আমার কাছে ওর লজ্জা না পাবারই কথা। কিন্তু ওকে ঐভাবে দেখলে আমার ভেতরে যে কী হয় সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি ওর থাকা উচিত। বিশেষ করে ঐ এক চিলতে কাপড়ের তৈরী বোম্বাই মার্কা ব্লাউজগুলো যখন ও পরে আসে তখন আমার পক্ষে স্থির থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ওকে বোঝাই কি করে। একেক সময়ে ভয়ই হয় অ্যাকসিডেন্ট না করে বসি।

দীপার মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। সারাই ডেকে খোঁজখবর নেন। বাড়ির সবাই কে কেমন আছে, বোনের বিয়ের কদ্দূর হল, ছোট ভাইটি ঠিক মতো স্কুলে যায় কিনা, এসব কথা হয়। কাছে বসিয়ে চা জলখাবার খাওয়ানো তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ছুটির দিনগুলিতে ওঁকে নিয়ে পরেশনাথের মন্দির, বেলুড়মঠ, গঙ্গার ধার অথবা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাওয়া আমার এক কাজ। আমারও খারাপ লাগেনা ওর সঙ্গে সারা রাস্তা কথা বলতে বলতে যেতে। দীপা কিন্তু কিছুতেই আর সঙ্গে যাবে না। আমি এক একদিন বোঝাবার চেষ্টা করেছি ওকে। বলেছি বেলুড় মঠ কত সুন্দর জায়গা, পরেশনাথের মন্দিরের ভেতরে কতকিছু দেখবার আছে, সকালবেলা গঙ্গার ধারে কী চমৎকার ফুরফুরে বাতাস। কিন্তু ওর এসব মোটেই পছন্দ নয় ✓ ওর ইচ্ছে ধনটায় শোয়ে সিনেমা দেখে, কিংবা একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে পার্কস্ট্রীটের কোনে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়াদাওয়া হৈ হল্লা করে, নয় তো শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে চড়ুইভাতি করে। ওর বয়সে অবশ্যি এসবই বেশি ভালো লাগার কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের কথামতো চললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। এই কথাটা একদিন ওকে বেফাঁস বলে ফেলেছিলাম। ওতো রেগেমেগে অস্থির। আমাকে বলে কিনা, "তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাওগে, আমার কী করা উচিত বা অনুচিত সে আমি বুঝবো। সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।"

ছেলেমানুষ মায়ের মাথায় কথাগুলো বলে ফেলেছে। কিন্তু তাহলেও আমার বড় খারাপ লাগল। আর কিছু না হ'ক বয়সের তো একটা মর্যাদা আছে। ব্যাপারটা দীপার মায়ের সামনেই ঘটেছিল। উনি দীপার কথায় লজ্জা পেলেন, আমায় বললেন, "ও যেতে চাও, তুমি আর অনর্থক কথা বাড়িয়ো না। ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি বেলা বাড়বার আগে।"

দীপার বাবা এমনিতে আমার উপর খুবই সদয়। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নেহাতই পোশাকী। প্রয়োজন ছাড়া পারতপক্ষে ওর সঙ্গে কোনো কথাই হয় না। অত্যন্ত রাশভারী লোক। আমিও দরকার না পড়লে ওর কাছে ঘেঁষিনা। তবে আমাকে যে উনি অপছন্দ করেন না সেটা ওর হাবভাবে বুঝতে পারি।

কিন্তু দীপা দিনদিনই আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে উঠছে। একেক সময়ে ওকে হৃদয়হীন ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আমি যে অনুগত ভৃত্যের মতো ওর চলনদার হয়ে দকাল বিকেলে ওকে পাশে বসিয়ে

টহল দিয়ে বেড়াবো এটা ও বরেই নিয়েছে। প্রতিদানে আমারও যে কিছু চাওয়ার থাকতে পারে সেটা ও স্বীকার করে বলেই মনে হয় না। ওর জন্যে আমি কী না করেছি। পুলোভার বুনবে, ছোটো অমনি বাজারে উল কিনে আনতে। বন্ধুরা আসবে আড্ডা মারতে, নিউমার্কেটে যাও, ভালমুট, কেক প্যাটিস কিনে আনো। রোববার সকাল, যাও ইডেনের শোয়ের টিকেট কেটে আনো। পরীক্ষা এসে গেছে, বন্ধুর বাড়ি থেকে বইখাতা নিয়ে এসো আবার পরের দিনই ফেরত দিয়ে এসো। পরীক্ষার সময়ে টিফিন খাইয়ে আসা তো ছিলই। এ ছাড়া আরো কতরকমের ফরমাশ যে রাতদিন লেগে ছিল তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু আমি কোনোদিন এ নিয়ে ওকে কিছু বলিনি। বলিনি কারণ দীপার জন্য আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলাম। ওর হাসিমুখ দেখলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। ওর জন্য কিছু একটা করবার সুযোগ পেলে আমি বর্তে যেতাম।

মেয়েদের বলা হয় করুণাময়ী। আমার কিন্তু মনে হয় কথাটা সত্যি নয়। অবশ্যি খুব বেশি মেয়ে আমি দেখেনি। তাহলেও বলতে পারি বেশির ভাগ মেয়েই বড় নিষ্ঠুর। ওরা নিজেদের সুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে চায় না। বোধ হয় দেখতে পায় না। নইলে সেদিন দীপা আমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করতে পারত না।

দীপাকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে ফিরছি। ও বললে পার্কস্ট্রীট দিয়ে যেতে, কি একটা দরকার আছে। পার্ক স্ট্রীটে ওর প্রিয় রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামাতে বলে ও আমাকে বললে ঘণ্টাখানেক বাদে এসে ওকে নিয়ে যেতে। বলেই ও ঢুকে পড়ল রেস্টুরেন্টে। অগত্যা আমি এলোপাতাড়ি এদিক ওদিক চক্কর দিয়ে কোনো রকমে একটা ঘণ্টা কাটিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে ফিরে এলাম। তারও আধঘণ্টা বাদে দীপা বেরুল। সঙ্গে বেশ কায়দাদুরস্ত এক ছোকরা। রাস্তায় দাঁড়িয়েও দুজনের কথা আর ফুরোয় না। খানিক বাদে দীপা এসে গাড়িতে উঠল। সেই ছোকরা হাত নেড়ে দীপাকে বিদায় জানিয়ে একটা সুন্দর চকচকে বিলিতী গাড়িতে উঠে চলে গেল।

সারাপথ দীপা কোনো কথা বললে না। আমিও না। বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে চাপা গলায় দীপা বললে, "মা জিগ্যেস করলে বলবে গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়, তাই দেরি হল, বুঝলে?"

দীপার মাকে এই ডাহা মিথ্যে কথাটা আমায় বলতে হল তিনি কথাটা বিশ্বাস করলেন এবং আমাকে চা খেয়ে যেতে বললেন। কিন্তু একটা ওজর দেখিয়ে আমি সটান বাড়ি ফিরে এলাম। মাথার মধ্যে তখন দীপার অদ্ভুত আচরণের কথা ঘুরছে। ও কি আমাকে ইচ্ছে করেই আঘাতটা দিলে? না রোষটা আমারই। ওর প্রতি আমার মনের ভাব তো কখনো খোলাখুলি প্রকাশ করিনি। হয়তো ও ঘুণাক্ষরেও জানেনা যে ওকে আমি মনে মনে পুজো করি। সকালবিকেল ওকে কলেজে দিয়ে নিয়ে আসার সময়টুকুর জন্য আমার মনপ্রাণ সারাটা দিন উন্মুখ হয়ে থাকে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ফিল্মস্টারদের চাইতেও সুন্দর মুখ, কমলালেবুর মতো লাল ঠোঁট, চঞ্চল একজোড়া চোখ আর উঠতি বয়সের ভরন্ত শরীর, যাহারে শাড়ি ব্লাউজে ছলছল করছে পাশে এসে যখন বসে, ইচ্ছে করে গাড়ি থামিয়ে শুধু ওকে দেখি।

রোজকার মতো কলেজের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দীপার জন্য অপেক্ষা করছি। দীপার এক বন্ধু এসে বললে, "দীপার জন্য অপেক্ষা করছেন? ও তো আজ অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে।"

কী ভেবে সেই রেস্ট রেস্টের সামনে গিয়ে গাড়ি পার্ক করলাম। তারপর মনে মনে ভাবছি ভেতরে

দিয়ে দীপার খোঁজ করব কি না, এমন সময়ে ওরা দুজনে বেরিয়ে এল হাত ধরাধরি করে। দীপা আমাকে দেখতে পেয়েছিল। কাছে এসে বললে, "আমি জানতাম তুমি আসবে। চল, আজ আর দেরি করা চলবে না, মা বকুনি লাগাবেন।" ছেলেটি আগের দিনের মতোই বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

বলতে গেলে সেদিনই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। এ জন্য দীপার মনে কোনো রকম বিকার ছিল না। আমি মুখ বুঁজে সব সহ্য করে যেতে লাগলাম। যেন নাটকের শেষ দৃশ্যে পৌঁছবার অপেক্ষায়।

সকালে কলেজে যেতে যেতে দীপা বললে, "পার্ক ষ্ট্রীটে সেই রেস্টুরেন্টে একটু চল তো।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "এখনি?"

চোখ দিয়ে যদি বাস্তবিকই অগ্নিবর্ষণ সম্ভব হত, তবে সেদিন নির্ঘাৎ আমি পুড়ে মরতাম। দীপার সেই দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না। রাগে ওর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় ঠোঁটদুটো কাঁপছে। চাপা গলায় শুধু বললে, "বেয়াদবি কোরো না।" ঝকঝকে বিলাতী গাড়িটা আগে থাকতেই অপেক্ষা করছিল। দীপা এ গাড়ি থেকে নেবে ও গাড়িতে উঠল। তারপর ওকে নিয়ে গাড়ি উধাও। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আমিও নিজের পথ ধরলাম।

বিকেলে রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দীপার জন্য অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও যখন ও বেরোল না, ভেতরে ঢুকে পড়লাম ওর খোঁজে। দীপা ছিল না। সেই ছোকরাটিও নয়। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। দীপার জন্য আরো অপেক্ষা করা উচিত কিনা বুঝতে পারছিলাম না। অথচ ওদের বাড়ি গেলে দীপার বাবা মাকেই বা কী জবাবদিহি দেব? বরাবর আমার সঙ্গেই ফেরে। ওর কলেজে গেলাম যদি ওখানে থেকে থাকে। সেখানেও নেই। নানাবিধ বিবেচনা করে শেষটা ওদের বাড়ি যাওয়াই স্থির করলাম। আমার উপর যখন দীপার দায়িত্ব দিয়েছেন ওর বাপ-মা, জবাবদিহি করতেই হবে আমায়। প্রয়োজন হলে সত্যি কথাই বলব।

ওদের বাড়ি সেদিন না গেলেই পারতাম। তাহলে আঘাতটা এত বেশি বাজত না। গাড়ি দীপাদের গেটের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল, গাড়িবারান্দা জুড়ে সেই সুন্দর ঝকঝকে বিলিতী গাড়িটা দাঁড়িয়ে। ঘরের ভেতর থেকে এক ঝলক হাসির হররা বেরিয়ে এল। অনেকগুলো গলা। দীপা আর দীপার বাবা মার গলা ছাড়াও নতুন একটা গলা।

ভাবলাম চুপচাপ সরে পড়ব, কিন্তু পারলাম না। দীপাদের চাকর বেরিয়ে এসে বললে, "ড্রাইভারবাবু, গাড়ি গেরাজে তুলবেন না। কর্তাবাবু বেরোবেন। আপনাকে দাঁড়াতে বলেছেন একটু।"

পুরাতন পাতা

সেদিনের সাহিত্য-সমালোচকদের কড়া মেজাজ

বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার যুগে সাহিত্য সমালোচনা মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই একটি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করতেন। এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনে তাঁরা যে সাহস নিরপেক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতার স্বাক্ষর রাখতেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর একটি সমালোচনা তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য (১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ) থেকে পুনরুদ্ধার করে পত্রস্থ করা হল। অতীতের "ভিনটাজ রিডিং"-এর মতো এটি পাঠকদের প্রচুর আনন্দ দেবে. মনে করি—সম্পাদক গল্প-ভারতী

ভারতী। বৈশাখ ১৩০৯: বর্ষমঙ্গল একটি মামুলী কবিতা। শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর রচিত। হালখাতার মতো নববর্ষের কবিতাও এদেশে 'নিত্য'—কিন্তু আসল কবিতা পদার্থটা বোধ করি মোটের ওপর 'নৈমিত্তিক।' মাসিক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা পায় বলিয়া তাহা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু দরকার মতো কবির হুকুম মতো ভাবের জোয়ার তো আসে না। তাই এই শ্রেণীর কবিতা প্রায় সার্থক হয় না। ছন্দে কতকটা অধিকার থাকিলে কবিতার কাঠামোর উপর খুব 'রঙচঙ' চলিতে পারে। কিন্তু দৈব প্রেরণা (জ্ঞানের চন্দ্রনাথ বাবু সম্প্রতি Inspiration-এর এই অনুবাদ করিয়াছেন। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।") নহিলে সে মৃন্ময়ী মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বর্ষ-মঙ্গল যে কবিতার স্বাভাবিক লীলায় বঞ্চিত। মনোগ্রামের গানের মতো বুদ্ধিত, কাগজের ফুলের মতো কুঞ্চিত, তাহারও বোধহয়, কারণ এই। কবির 'প্রকৃতি অরি'র প্রসাদ প্রভাব ও পরিমল 'বর্ষমঙ্গলে' নাই। কিন্তু আমরা কবির কবিতায় সেইরূপ প্রতিভারই প্রত্যাশা করি।

এ আলোক ছটা
স্বর্গের দিতারে এসে কালবৈশাখীর বেশে
আবরিবে মেলি নীল জটা।

পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অথচ শব্দ কটির অর্থ জানি। "আশুক সবার মনে অতীতের প্রকাণ্ড প্রমাদ" প্রভৃতিও তথৈবচ। আসল কথা কবিতাটির কল্পনা যেমন উচ্চ ও গুরুগম্ভীর, 'রচনা' সেরূপ হয় নাই।' কবি যতখানি ভাবিয়াছেন, ভাষায় ততখানি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 'মৃন্ময়ী' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত 'দেবকৌতুক' নামক পঞ্চাঙ্কিকার কৌতুক ঠাকুর দেবতার ভোগ্য হইবে,—আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। "হিন্দুর নারী মর্য্যাদা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় বাংলার প্রতিপন্ন করিতেছেন,

হিন্দুরা নারীর মর্যাদা জানিতেন ও রাখিতেন। গ্রন্থকারের অনুসন্ধান ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। এম, কে গান্ধীর "দক্ষিণাফ্রিকার ভারতোপনিবেশ" প্রবন্ধে বিশেষ তথ্য নাই, তাঁহার আলবার্ট হলের বক্তৃতার অনুবাদ করিলে কাজ হইত। আর একটি কথা, 'দক্ষিণ আফ্রিকা' প্রভৃতি সন্ধিবন্ধন শুনিলে 'বস্তপ্যাঠারো টাকা দিলাম, তথাপ্যাটচালা সারা হইল না,' মনে পড়ে না? একেই তো রবীন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সন্ধি সমাস প্রভৃতিকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য লাঠি উঁচাইয়া পরিষদের প্রাঙ্গণে 'পারতাড়া' করিতেছেন. এ সময়ে এ পক্ষে একটু সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নয় কি? শ্রী সরলাদেবীর "বাঙালী পাড়ায়" মন্দ কি! আমাদের পাড়ার প্রশংসা, মিষ্ট লাগিবে না? আমাদের এই তেল তামাক ও মুড়ি মুড়কির সমারোহের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, 'আস্তাকুঁড়ের' কাছে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাই নাই। লেখিকা দেখিয়াছেন এবং অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, এ জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। রচনাটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য, সমাপ্ত হইবে তো? অন্ততঃ আমরা সমাপ্তির আশাকরি। লেখিকার দুই একটি রচনার ভাগ্যে 'শেষ সুখ পরম সুখ' ঘটে নাই। তাই বলিতেছি। ঠাকুমা দিদিমার আমলে ভয় ছিল, গল্প শেষ না করিলে 'আধকপালে' ধরে! এখন বিংশ শতাব্দীর নব-বিধানে সে শঙ্কা নাই। এইজন্যই পাঠকদিগকে তথা সম্পাদক সম্প্রদায়কে অনেক সময়ে কর্মভোগ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাস্তসাপ' একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্প বটে, কিন্তু 'আষাঢ়ে'. প্রভাতের ছাপ নাই। ছোটগল্পের 'জান' যাহা, তাহারই অভাব। সুতরাং রসভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতা' যুক্তির অনুকূলে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। পরেশবাবুর অনুশীলনের ফল ও মন্তব্যের আলোচনা প্রার্থনীয়। 'মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী' একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ বসুর রচিত। কর্মবীর গান্ধী স্বদেশের জন্য অনেক সহ্য করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার জন্য অম্লান বদনে এই ছড়াটি সহ্য করিব। দক্ষিণাবাবুর গুণানুরাগ প্রশংসনীয়। কিন্তু হৃদয়ে "এক অপূর্ব বিস্ময়, সম্ভ্রম ও প্রীতির প্রবাহ ছুটিলেই" যে মানুষ 'কবি' হয়না,—মানুষের মনে কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া উঠেনা, সে অপরাধ দক্ষিণাবাবুর নহে, বিধাতার। ইঁহারা যদি বিধাতার উপর অনবরত পত্র লিখিয়া হতভাগাকে জব্দ করিয়া দেন তাহা হইলে কবিরাও বাঁচেন; আমরাও বাঁচি। "ভারত ইতিহাসের একাংশ" সুরচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ, উল্লেখযোগ্য;—রচনার হিসাবেও বটে, লেখকের জন্যও বটে। নাটোরের সুপ্রথিত মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ইতিহাস চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বাংলা মাসিকে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা আহ্লাদের কথা, বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কথা এবং আশার কথাও বটে। এদেশে যাঁহাদের অনবরতের সংস্থান আছে, তাঁহারা প্রায় দুনিয়ার কোন কাজেই লাগেন না।—কথাটা ঠিক হইল না।—অনেক অকাজে লাগেন বটে। —তারপর, রাজা মহারাজার দল বিলাসে ভাসেন। গৌরাঙ্গ সমাজে (বাগবাজারের নয়) চাঁদা দেন ও লেলাম বাজান, বড় জোর অবঃপাতে যান। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ইতিহাসের দুর্গম গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সত্যরত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কী হইতে পারে? শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়ের নববর্ষে পল্লীদৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত 'ভূমিকর আন্দোলনের' ফলাফল লিখিতেছেন। কিন্তু ফলাফল তো জানা আছে,—একটি সুগোল শূন্য। বীরবলের 'হালখাতা' যেন,—টক্‌টকে খেরোর বাঁধা খাতাখানির মলাট দেখিয়াই মনশ্চক্ষু হই নাই, ভিতরে পদার্থ আছে। লেখক ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে পারেন। আশা করা যায় বীরবলের মিঠেকড়া রকম চিরণ চাবুকের চোটে অন্ধামর সমাজের কুর্মপৃষ্ঠে একটু দাগ পড়িবে।

যুদ্ধের অমানুষিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ফরাসী কাহিনী

ফরাসী সাহিত্যে আধুনিকতার পূর্বসূরিদের মধ্যে আলফঁসো দোদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বালজাক, মোঁপাসার সমগোত্রীয় ছিলেন তিনি। তাঁর উপন্যাস-গল্পের মধ্যে যে-গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা 'শেষপাঠ' গল্পটির মধ্যেও বিদ্যমান। ৭০। ৮০ বছর আগেকার ঘটনা। ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি ফরাসী শহর জার্মানরা অধিকার করেছে, এবং শহরের সকল প্রতিষ্ঠানে নিজেদের ভাষা আইন কানুন এবং রীতি-নীতি প্রচলন করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে। যে সব স্থান তাদের অধিকারে এসেছে সেইসব স্থানের বিদ্যালয়গুলিতে ফরাসী-ভাষা পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে জার্মানভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। গল্পটি সেই সময় লেখা। "লাস্ট লেসন্"। অনুবাদ করেছেন মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ।

শেষ পাঠ

আলফঁসো দোদে

সেদিন স্কুলে যাবার জন্য বেরতে দেরী হয়ে যাওয়ায় ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। তার উপর কথা ছিল আজ আমাদের মাষ্টার মশাই গ্রামারের পার্টিসিপল পড়া নেবেন। বারেকের জন্যে মনে হল নাইবা গেলাম স্কুলে। পথে পথে ঘুরে বেড়ান যাক। গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আকাশে শাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। পাখীরা গাছে বসে গান গাইছে। উন্মুক্ত মাঠে প্রুসিয়ান সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে। স্কুলে যাওয়া অপেক্ষা এগুলো যে আমার কাছে অনেক বেশী লোভনীয় একথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু বহু কষ্টে নিজের ইচ্ছাকে দমন করে স্কুলের পানে পা বাড়ালাম।

টাউন হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম বুলেটিন বোর্ডএর কাছে জনতার ভীড়। দু'বৎসর ধরে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সেখান থেকে। যুদ্ধে পরাজয়, বিপ্লব এবং এমনি আরও অনেক সংবাদ রাজকর্মচারীরা প্রকাশ করছে। মনে ভাবলাম আবার বুঝি নতুন কোন বিপদ এল।

তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে চললাম। কামার ওয়াকটার বুলেটিন পড়তে পড়তে আমায় দেখতে পেয়ে বললে—"অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কেন? তোমার স্কুলে পৌঁছবার সময় এখন অনেক আছে।"

বুঝতে পারলাম না সে আমার সঙ্গে পরিহাস করছে কিনা। আরও জোরে পা চালিয়ে স্কুলে পৌঁছলাম।

স্কুল আরম্ভ হবার পূর্বে প্রত্যহ সে কী ভীষণ গোলমাল! ডেস্ক খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ, সমস্বরে পড়া মুখস্থ করার স্বর, মাষ্টার মশাইয়ের টেবিল-এ বেতের আঘাতের আওয়াজ—সবগুলো এক সঙ্গে রাস্তা থেকেই শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সেদিন চারদিক নিস্তব্ধ। যেন শ্মশানের নীরবতা। জানলার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম আমার সহপাঠীরা তাদের জায়গায় বসে, এবং মাষ্টার মশাই সেই ভয়াবহ বেতটি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। আমার সকলের সামনে দিয়ে নিজের জায়গায় যেতে হবে ভেবে প্রাণ দুরুদুরু করতে লাগল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিছুই হল না। মাষ্টার মশাই স্নেহের সুরে বললেন, "তাড়াতাড়ি জায়গায় গিয়ে বস। তোমাকে ছাড়াই আমরা আরম্ভ করে দিচ্ছিলাম।"

আমি আমার জায়গায় বসে পড়লাম। তখনও আমার বুক কাঁপছে। দেখতে পেলাম মাষ্টার মশাইয়ের গায়ে চমৎকার সিল্কএর কোট, কোঁচকান কাপড়ের প্যাণ্ট, কালো সিল্কএর টুপি তাঁর মাথায়। সারা স্কুলে নিস্তব্ধতা। আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম পিছনের বেঞ্চের পানে চেয়ে; যেগুলো সব সময়েই খালি থাকত—সেখানে আমাদের মতই নীরবে বসে আছেন—বৃদ্ধ হসার, ভূতপূর্ব্ব মেয়র, ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার এবং আরও অনেকে। সকলেরই মুখ ম্লান। হসার-এর হাতে একখানি প্রাথমিক বর্ণপরিচয়, কোলের উপর রেখে চশমার ভিতর দিয়ে পাতার উপর একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

এমন সময় মাষ্টার মশাই চেয়ার থেকে উঠে তাঁর সেই গাম্ভীর্য্য মাখান স্নেহের সুরে বললেন, "বৎসগণ! আজ তোমাদের আমার শেষ পড়ানো। বার্লিন থেকে আদেশ এসেছে আলজাস্ এবং লোরাইন-এর স্কুলে কেবলমাত্র জার্ম্মান ভাষা পড়ানো হবে। কালই তোমাদের নতুন মাষ্টার মশাই আসছেন আজই শেষ ফরাসী ভাষা পড়া। সকলে মন দিয়ে শোন।'

এই দুঃসংবাদে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মনে পড়ল, টাউন হলে জনতার কথা। এই সংবাদই হয়ত বুলেটিন বোর্ডে প্রচার করা হয়েছিল।

শেষ ফরাসী ভাষা পড়া। সামান্য শিখতে না শিখতেই যে বাধা সামনে এল তাতে হয়ত এইখানেই তার শেষ, আর অগ্রসর হতে পারবনা। হয়ত সারাদিন ভবঘুরের মত বেড়াতে হবে কিম্বা পাখীর ডিম জড় করবার জন্য গাছে উঠতে হবে পাড়ার অপর ছেলেদের সঙ্গে। যে বইগুলো কিছুক্ষণ পূর্বে ভয়াবহ ছিল, যা অত্যন্ত ভারী বলে মনে হ'ত, দুর্ব্বোধ্য গ্রামার আর ইতিহাস—এরা আজ আমার পুরানো বন্ধুর মত, এদের আমি প্রাণ ধরে ত্যাগ করতে পারব না। মাষ্টার মশাইয়ের জন্যেও প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি চিরকালের মত বিদায় নেবেন—আর কখনও দেখতে পাবনা। ভুলে গেলাম তাঁর সেই গম্ভীর মুখ আর ভয়াবহ বেত। কতদিন হয়ত তাঁকে কত অভিশাপ দিয়েছি, কত অমঙ্গল কামনা করেছি, কিন্তু আজ যখন বিদায়ের সময় এল, চোখের কোণে অশ্রু ভেসে উঠল তাঁরই জন্যে।

বুঝলাম, আজ শেষ দিন বলে মাষ্টার মশাই তাঁর ভাল পোষাকটি পরে এসেছেন। বুঝতে পারলাম গ্রামের ঐ সকল বিশিষ্ট লোকদের শেষ বেঞ্চে বসবার মানে। কারণ তাঁরা আর ঐ ইস্কুলে আসতে পারবেন না। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর নিপুণভাবে এই স্কুল পরিচালনা করার জন্যে মাষ্টার মশাইকে তাঁরা ধন্যবাদ দিতে এসেছেন।

মনে মনে এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় মাষ্টার মশাই আমায় ডাকলেন। এইবার আমার পড়া বলার সময়। বাড়ী থেকে ভাল করে পড়ে আসা সত্ত্বেও আমি নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার ডেস্কের পাশে। কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না। ভয়ে এবং লজ্জায় কাঁপতে লাগলাম। ডেস্কটা ভাল করে দু'হাতে ধরে মাথা নীচু করে রইলাম।

মাষ্টার মশাই বলতে আরম্ভ করলেন, "ক্লাস্‌, আজ আমি তোমায় বোকব না। তোমরা অনেক সময় বল 'যাক, অনেক সময় আছে, কাল পড়ে নেব'। এখন বুঝতে পারছ কোথায় এসে আমরা পৌঁছেছি। আলজাক-এর মহাদুর্দিন আজ। তাকে কাল থেকে ফরাসী পড়া বন্ধ করতে হবে। হয়ত তোমাদের শাসকরা বলবে, "একি ব্যাপার। নিজেদের ফরাসী বলে ভান করছ, অথচ নিজের ভাষায় লিখতে কিম্বা পড়তে পর্য্যন্ত জান না।"

তারপর মাষ্টার মশাই ফরাসী ভাষার গুনগান করতে লাগলেন। বিশ্বের মধ্যে ফরাসী ভাষা অতি মধুর, অতি সরল, এ ভাষা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এই ভাষার দ্বারাই সবার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে, এ ভাষা যেন জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি।

তারপর তিনি গ্রামার খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়ানোতে অভিভূত হয়ে গেলাম। সহজেই সব বুঝতে পারলাম। তিনি যেন আরও সরল ও সহজভাবে পড়িয়ে গেলেন। এমন মন দিয়ে কোনদিন পড়া শুনিনি আর তিনিও এত সহজ করে কোনদিন পড়ান নি। হয়ত তিনি তাঁর বিদায়ের পূর্ব্বে জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে যেতে চান আমাদের কাছে।

গ্রামার পড়ার পর হাতের লেখা আরম্ভ হ'ল। তিনি আমাদের জন্যে নতুন খাতা নিয়ে এসেছিলেন, তাতে সুন্দর করে লেখা, ফ্রান্স, আলজাক, ফ্রান্স, আলজাক। যেন সারা ঘরে ছোট ছোট নিশান উড়ছে।

সকলে নিঃশব্দে লিখতে লাগল। কেবল কলমের খসখস শব্দ। কারুর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। সেই ছাদে বসে কতকগুলো পায়রা ডাকছিল, ভাবলাম, এই পায়রাগুলোকেও কি তারা জার্ম্মান ভাষায় গান গাইবার জন্য আদেশ করবে?

মাথা তুলে দেখতে পেলাম মাষ্টারমশাই নিশ্চলভাবে বসে আছেন। কালই তিনি সপরিবারে এ শহর ছেড়ে চলে যাবেন।

তা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লেখা দেখতে লাগলেন। লেখার পর ইতিহাস পড়া হল। ছোট ছোট ছেলেরা বি, এ বে; বি, ই বি পড়তে লাগল। শেষ বেঞ্চের শেষে বসে বৃদ্ধ হেসার কোলে বই নিয়ে তাদের সঙ্গে সুর মেলাতে লাগলেন তাঁর কাঁপা স্বর দিয়ে, সেই শুনে আমরা হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। হায়! আজও আমার বেশ মনে পড়ে সেই শেষ পাঠের দিন।

গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজল। জানলার পাশ দিয়ে প্রুসিয়ান সৈন্যদের বাজনা বাজিয়ে কুচকাওয়াজ শেষ করে ফিরতে দেখলাম। মাষ্টার মশাই সেই শুনে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখে বললেন, "বন্ধুগণ, আমি আমি,"...বাক্‌-রোধ হয়ে গেল তাঁর। কোন কথা বলতে পারলেন না আর।

ব্ল্যাক বোর্ডের পানে ফিরে এক টুকরো খড়ি নিয়ে আড়ষ্টের ভঙ্গীতে যথা সম্ভব জোর দিয়ে বড় বড় করে লিখলেন, "ফ্রান্সের জয় হোক!" তারপর হেডমাষ্টারের গায়ে ক্লান্ত মাথা রেখে কোন কথা না বলে হাতের ইসারায় জানিয়ে দিলেন, "স্কুল শেষ হয়েছে—তোমরা যেতে পার।"

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেম যে নাটক
দেখছি। মুক্তকীর অভিনয় মনকে
উচাটন করে দিয়েছিল, আত্মবিস্মৃত
হয়েছিলেম।
হ্যাঁ, নটের ক্ষমতা বড় সহজ ক্ষমতা
নয়। মানুষকে ভুলিয়ে দেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটক দেখছেন বিদ্যাসাগর। অত্যাচারী দুর্বৃত্তের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের চটি খুলে ছুঁড়ে মারলেন অভিনেতাকে। অভিনেতা সেই চটির পাটি মাথায় রেখে বললেন, এতদিনে সার্থক হল আমার অভিনয় করা।
ঐ ঘটনার পর একদিন সেই কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায় যে উক্তি করেছিলেন তা উপরে দেওয়া হল।

নাট্য চিন্তা

আধুনিক সমাজ ও বাংলা নাটক

আজকের বাংলা নাটকে সমাজ জীবনের বাস্তব রূপ আমরা কতটুকু দেখতে পাই? এ'কথার জবাব দিতে গেলে বলতে হবে যে বাংলার অখণ্ড সমাজ বলতে আজ আর কিছু নেই—তা সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—একটি নাগরিক আর একটি পল্লীর সমাজ। উভয়ের মধ্যে একদিন যে সম্পর্ক ছিল তা ক্রমে দূর হয়ে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের স্বাধীন হয়ে উঠেছে। পল্লীর সমাজ আজ শক্তিহীন সুতরাং তাকে অবলম্বন করে কোন সার্থক রচনা, তা নাটকই হোক কিংবা উপন্যাসই হোক, প্রকাশ পায় না। অতএব বাংলার সমাজের একাংশ এখানে উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ এই অংশটির মধ্যেই বাংলার জাতীয় জীবনের রূপটি প্রকাশ পায়। তারপর নাগরিক জীবনের সমস্যা বহুমুখী, তবে তাও প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক ও পারিবারিক। এখানে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা নেই; কারণ, যে ভাবে সামাজিক আদর্শ পল্লীজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, সে

ভাবে নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। তারপর অর্থ-নৈতিক সমস্যাটির মূল্যও সাময়িক, তা' চিরস্থায়ী নয়। আজকের বাংলা নাট্য-কারদের দৃষ্টি প্রধানত জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে, পারিবারিক জীবনকেও অর্থনৈতিক দিক থেকেই বিচার করা হচ্ছে।

একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন। নাগরিক জীবনের অর্থ-নৈতিক সমস্যার একটি দিক যে আধুনিক বাংলা নাটকে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে, তাও লক্ষ্য করবার বিষয়, তা মালিক এবং শ্রমিকের সম্পর্ক। নাগরিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের কথা বিচার করে দেখতে গেলে এই সমস্যা তার একটি মাত্র অংশ অধিকার করতে পারে। বিশেষতঃ এই সমস্যাটি বহির্মুখী সমস্যা মাত্র, জীবনের অন্তর্মুখী সমস্যা নয়। সুতরাং এই সমস্যাটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে জীবনের যে একটি সূক্ষ্ম অন্তর্মুখী পরিচয় আছে, তা' প্রকাশ পেতে পারে না। মালিক শ্রমিকের সমস্যা পৃথিবী ব্যাপী এক, কিন্তু ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক জীবনের অন্তর্মুখী সমস্যা দেশে দেশে বিভিন্ন। সুতরাং অন্তর্মুখী পরিচয়ের উপর নির্ভর করে সাহিত্য রচিত না হোলে তা জাতির নিজস্ব রূপ প্রকাশ করতে পারে না। আজকের বাংলা নাটকে এই অভাব দেখা দিয়েছে।

—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

জীবনী ও স্মৃতিকথা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

১৮৯২-১৯৫১

বিগতদিনের মঞ্চনায়ক

যাঁদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

অন্যমনস্ক, সব সময়েই যেন কী ভাবছেন, কতকটা উদাসীন এবং অন্যমনস্ক, এমনি বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। আড্ডায় বসেছেন। হাসি গল্প ঠাট্টা ইয়ার্কির স্রোত বইছে। যোগেশচন্দ্র নির্বিকার। খুব একটা হাসির ব্যাপার ঘটল, হয়ত একটু মৃদু হাসলেন। ঐ পর্যন্ত। কিন্তু লক্ষ্য করছেন সব। এই লক্ষ্য করাটাই ছিল যেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। নাটক ও অভিনয় প্রসঙ্গে একদিন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যকে বলেছেন, "দেখ, নাটক ছড়িয়ে আছে পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, লোকের ভিড়ের মধ্যে। আর সেসব জায়গায় প্রত্যেক মানুষই জীবন নাট্যের অভিনয় করে চলেছে। তাদের কাছ থেকেই নাটকের খোরাক পাওয়া যায়, চরিত্রসৃষ্টির হদিস মেলে অভিনয়েরও হাতিয়ার পাওয়া যায়। লক্ষ্য করতে হবে। তাহলে আর নাটকের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি করার জন্যে বেগ পেতে হবে না।"

মনে পড়ছে, বিখ্যাত অভিনেতা হেনরি আরভিং ঠিক এমনি লক্ষ্য করেই, একবার ট্রেন ভ্রমণের সময় তাঁর এক সহযাত্রীর কথাবার্তা হাবভাব ভঙ্গী এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে করে তার ছাঁচ মনের মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন এবং তারই সাহায্যে সৃষ্টি করেছিলেন দি বেলস নাটকে তাঁর সেই অসামান্য চরিত্র চিত্রণ —ম্যাথিয়াস।

মানুষটি আচারে ব্যবহারে ছিলেন যেমন সংযত উচ্ছ্বাসহীন, অভিনয়েও তেমনি। কখনো তাঁর অভিনয়ে আবেগের লোচ্চার ঘোষণা দেখিনি! আত্মসমাহিত হয়ে অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় ধারা ছিল তাঁর নিজস্ব।

ছেলেবেলা থেকেই নাটক লেখবার ঝোঁক ছিল। ১৯০৮ সালে টাকীর ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজে এফ, এ, পড়তে এলেন। তখন থেকেই নাটক লিখছেন। ঐ সময় তিনি রাজস্থানের কাহিনী নিয়ে একটি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। ক্ষেত্রমোহন মিত্রের থেস পিয়ান থিয়েটারে তাঁর একটি দেশাত্মবোধক নাটকের বিজ্ঞপ্তি দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত নাটকটির অভিনয় হয়নি।

কিছুদিন পরে যখন তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের বড় বাজার শাখায় শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন সেই সময় শিবিরচন্দ্র সম্পর্কে এক সমালোচনা প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। বসিরহাট সাহিত্য সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে একশ টাকা পুরস্কার পান। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল আজীবন। মেট্রোপলিটন ছেড়ে তিনি ওরিয়েনটাল ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। কিছুদিন বাদে এই কাজ ছেড়ে দেশে ফিরে দেশী কাপড় তৈরীর কাজে নিযুক্ত হন।

বসিরহাটের চাষঘাট গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা স্বর্গত বিরাজ মোহন চৌধুরী। মাতা স্বর্গত বীরেশ্বরী দেবী। ছেলেবেলায় বাপকে হারিয়ে খুড়োর কাছে মানুষ হন। তাঁদের পরিবারে লেখাপড়ার খুব চল ছিল। ছোটভাই সুরেশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ একজন বড়দরের পণ্ডিত ছিলেন। যখন নবম শ্রেণীতে পড়েন তখন যোগেশচন্দ্র একটি নাটিকা লেখেন, তার নাম সীতার বনবাস। ছোটবেলায় যাত্রার দল গঠন করেন এবং জনায় জনায় চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে সুখ্যাতি পান।

কলকাতায় প্রথম জীবনেই শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শিশিরকুমার মানুষ চিনতেন। তাই যখন তিনি তাজমহল পিকচার্সে যোগ দেন তখন যোগেশচন্দ্রকে ডাকিয়ে এনে 'আঁধারে আলো' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেন। ১৯২২ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। যোগেশচন্দ্র সেই ছবিতে দেওয়ানের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

তারপর 'সীতা' নাটক লেখার ব্যাপার। স্টার থিয়েটার যখন কৌশল করে শিশিরকুমারের কাছ থেকে আইনের জোরে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের স্বত্ব ছিনিয়ে নিলে তখন শিশিরকুমারের অনুরোধে ও নির্দেশে যোগেশচন্দ্র নতুন করে 'সীতা' নাটক লিখলেন। ১৯২৪ সালের ৬ই আগষ্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ঐ তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ তারিখেই এক যুগ প্রবর্তক দিগ্বিজয়ী প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ। যোগেশচন্দ্র সীতা নাটকে লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করেন। এই চরিত্রসৃষ্টি যোগেশ চন্দ্রের এক অসাধারণ কীর্তি।

এরপর শিশির সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ শিল্পীরূপে তিনি অনেকগুলি নাটক লেখেন এবং সব নাটকেই অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য থিয়েটারেও বহু নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে, সীতা, দিগ্বিজয়ী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, নন্দরাণীর সংসার, মহামায়ার চর, পরিণীতা, তাছাড়া নাট্যরূপ দেন, মহানিশা, পতিব্রতা, বাংলার মেয়ে, পথের সাথী, চরিত্রহীন, অচল প্রেম।

চলচ্চিত্রেও তিনি বহু চরিত্রের অভিনয় করেছেন বহুতর চিত্রনাটকে।

শিশির সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি আমেরিকা যান এবং সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

নিরহঙ্কার, সরলচিত্ত, বন্ধুবৎসল এবং আত্মনিষ্ঠ এই শিল্পী ও মানুষটিকে সকলেই ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

স্মরণীয় ৬ই আগস্ট ১৯২৪

বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের সূচনা

সীতা নাটকের উদ্বোধন

নব-যুগন্ধর শিশিরকুমারের নব আবির্ভাব

মনে পড়ছে সেদিন বিকেল বেলায় মনোমোহন থিয়েটারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ আগে থেকেই। ভিতর থেকে সানাই-এর সুর ভেসে আসছে। বাংলায় টিকিট ছাপা হয়েছে। টিকিট ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলায় বিজ্ঞপ্তি—'এক টাকার আসনে স্থানাভাব', 'দু'টাকার আসনে স্থানাভাব', ইত্যাদি।

ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। 'কর্টেন' (কনসার্ট) নেই। তার বদলে সানাই বাজছে। যবনিকা উঠল। একী দৃশ্য দেখছি চোখের সামনে! যেন নতুন এক কল্পলোক। যেন কোনো বৈদিক যুগের স্থাপত্য শিল্পীর তৈরী রাজ-প্রাসাদ। নিটোল নিখুঁত ভারতীয় ঐতিহ্যের স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে—রংএ রেখায় গঠনে।

আজকাল দু-স্তর, ত্রি-স্তর কতরকম স্টেজেরই সেট সীনের কথা শুনি ও দেখি। কিন্তু সীতা নাটকের প্রথম দৃশ্যের অলিন্দ প্রাকার প্রকোষ্ঠ মিলিয়ে যে সেট রচিত হয়েছিল, রূপে রঙে তার তুলনা আজো পাওয়া যায়নি। এই সূত্রে মনে পড়ছে আর একটি দৃশ্যের কথা। দিগ্বিজয়ী নাটকে দিল্লী আলানোর সেই দৃশ্য, যা দেখে শম্ভু মিত্র অবাক হয়ে গিছলেন এবং সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

বলতে ভুলে গিয়েছি নাটক আরম্ভ হবার আগে যবনিকা স'রে গিয়ে দেখা যেত, আলোয় উজ্জ্বল শুভ্র-বসনা এক নারীমূর্ত্তি—স্ট্যাচুর মত নিশ্চল, শুধু তার কণ্ঠ দিয়ে গান নির্গত হত—'হে অতীত কথা কও।' রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনীর' মুখবন্ধের কবিতাটিকে সুর দিয়ে গাওয়া হত। সুদূর অতীতকে আবাহন করা হত তার বাণী শোনাবার জন্যে। স্পষ্ট সতেজ উচ্চকণ্ঠে শিল্পী গানটি গাইতেন—উচ্চতম পর্দায় গানটি শেষ হত— তার রেশ বহুক্ষণ পর্যন্ত যেন প্রেক্ষাগারে ঝঙ্কার করে বাজতো। সেদিনের সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা: মনে আছে নাচঘরে প্রবন্ধ লিখলাম—'নাট্য-জগতের মার্টিন লুথার শিশির কুমার ভাদুড়ী।' লেখাটি পড়ে শিশিরকুমার হেসেছিলেন এবং নাচঘরের সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়কে বলেছিলেন 'ইতিহাসের ছাত্রটিকে নিয়ে এস, তাকে আরও ভালোভালো লোকের নাম দেব, আমার সঙ্গে তুলনা করতে।'

সারা শহর তোলপাড়। দেখতে দেখতে সে কী জনপ্রিয়তা লাভ করলেন তিনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাংলার মাথার মণি। সেই সময় জনপ্রিয়তায় তাঁর পরেই বোধকরি শিশিরকুমার। পাগল হয়ে গিয়েছিল বাংলার যুবকের দল। আর শুধু কী যুবক এবং ছাত্র? সেরা সেরা পণ্ডিত, সুধী, অভিজাত মণ্ডলী

ঘিরেছেন সেই সময় শিশিরকুমারকে। নবযুগের সে এক নতুন মধুচক্র। হারালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুতকুমার বসু, কাশীর বিখ্যাত গায়ক সুধা মুখোপাধ্যায় (সুধাদা), হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি মুখোপাধ্যায়।

সে এক আশ্চর্য পরিবেশ। সাধারণত রবিবার সকালে সেই আড্ডা বসত। এবং দূরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আমরা তার আস্বাদ গ্রহণ করতুম। শিশিরকুমার তো ছিলেন না শুধু একজন অভিনেতা, তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, শিল্পপীঠের প্রধান পূজারী, এক নতুন যুগের প্রবক্তা। শিশিরকুমারের "সীতা" অভিনয়ের পটভূমিকায় একটি ছোট চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন প্রবীণ শ্রীনরেন্দ্র দেব। এই সূত্রে সেটি নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"ময়দানের এক শিল্পপ্রদর্শনীতে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অধ্যাপক শিশিরকুমার তাঁর শিক্ষাব্রত ত্যাগ করে সর্বপ্রথম দক্ষিণায় বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বীকার করে অভিনয় আরম্ভ করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকখানি নিয়ে। এ অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে যতদিন শিল্প-প্রদর্শনী, চলেছিল, রঙ্গালয়ের তাঁবুতে দর্শকের অভাব হয়নি। প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যাবার পর শিশিরকুমার আনেন ম্যাডান কোম্পানীর 'বেঙ্গলী থিয়েটারের' প্রধান অধ্যক্ষ ও পরিচালক হয়ে। এখানে তাঁর পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকাভিনয় দেখে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। যে মেয়েরা এতদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কেবলমাত্র সখী সেজে নাচতো, শিশিরকুমারের আশ্চর্য শিক্ষার গুণে তারা জনে জনে প্রধানা নটি হয়ে ওঠবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। যেমন 'প্রভা', 'চারুশীলা', 'নীরদা সুন্দরী' প্রভৃতি। শিশির কুমারের আলমগীরের ভূমিকায় অভূতপূর্ব অভিনয়ের কথা সকলের মুখে মুখে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে শুরু হয়েছিল।

কিন্তু পাশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিশিরকুমারের বনিবনাও হলনা বেশীদিন। ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন তিনি বেঙ্গলী থিয়েটার। এই সময় 'মনমোহন রঙ্গমঞ্চ' খালি আছে দেখে স্বর্গীয় মনমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে উক্ত নাট্যশালাটি 'লীজ' নিলেন তিনি। রঙ্গালয় 'লীজ' নেবার সময় বহু টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। শিশিরকুমার গুণবান ছিলেন বটে কিন্তু ধনবান ছিলেন না। অর্থকোষ ছিল তাঁর শূন্য। তবে, বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন তিনি। এগিয়ে এসেছিলেন ধনী বন্ধুরা তাঁদের টাকার থলি নিয়ে। সাধ্যমত সকলে মুক্তহস্তে সাহায্য করলেন। শিশিরকুমার তাঁর প্রথম নিজস্ব নাট্যশালা 'নাট্যমন্দির' উদ্বোধন করলেন সেখানে এক শুভদিন দেখে। কিন্তু বাধা পড়লো। তিনি স্থির করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের যে 'সীতা' নাটক নিয়ে তিনি শিল্প প্রদর্শনীতে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পেয়েছিলেন, সেই নাটক নিয়েই তাঁর এই নিজস্ব নাট্যশালায় যবনিকা উত্তোলন করবেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্টার' থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এ সংবাদ পেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের নিকট থেকে উক্ত নাটকের অভিনয় স্বত্ব আগেই কিনে নিলেন। শিশিরকুমার এ ঘটনায় দুঃখিত হলেও হতাশ হলেন না। নাট্যকার ও অভিনেতা যোগেশ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নূতন এক 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নিলেন। সে নাটকের অপ্রত্যাশিত সাফল্য শিশিরকুমারকে আবার যশের জয়মাল্য পরিয়ে দিলো।

ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রিকার সান্ধ্য আসরে শিশিরকুমার বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর 'আলমগীর' অভিনয় দেখে 'ভারতী'র সাহিত্যিক দল তাঁর শুধু মুগ্ধ ভক্ত নয়, আন্তরিক বন্ধু হ'য়ে উঠেছিলেন। ওই ভারতীর আসরে হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গাঙ্গুলী, সত্যেন বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

এবং এই প্রবন্ধ লেখকও প্রায় নিত্য সন্ধ্যায় হাজিরা দিতেন। কিন্তু শিশিরকুমারের নিজস্ব রঙ্গালয় 'নাট্য-মন্দিরের' দ্বারোদ্‌ঘাটন হবার আগে থেকেই ভারতীর আড্ডার প্রধান পাণ্ডারা নিত্য সন্ধ্যায় নাট্যমন্দিরেই অন্নায়েৎ হতে লাগলেন।

মণিলাল ও হেমেন্দ্রকুমার ওখানে নৃত্যগীত শেখাবার ভার নিলেন। শিল্পীবন্ধু চারু রায় রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট প্রাচীন ভারতের কালোচিত করে এঁকে দিলেন। বন্ধুবর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ব ঘেঁটে রামায়ণের যুগের সাজ-পোষাকের পরিকল্পনা দিলেন। ফলে নাট্যমন্দিরের 'সীতা' অভিনয়ের জয়-জয়কার পড়ে গেল দেশময়।"

নানা প্রসঙ্গ

আমেরিকায় নব-নাট্য পরিবেশনে ব্রডওয়ের বিস্তার

আমেরিকায় বর্তমানে যে প্রবল নাট্যস্রোত চলেছে তার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ব্রডওয়ে। এখানেই আমেরিকার বড় বড় পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি দূর দূরান্তের দর্শকদের প্রতিদিন আকর্ষণ করছে।

কিন্তু তাই বলে দেশের কেন্দ্রীয় নাট্য সংস্থাগুলির বাড়-বাড়ন্ত ব্যাহত হয়ে নেই। বরং তারা তাদের দেশের নাট্য-প্রবাহে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তাদের এখন খুবই চাহিদা। নতুবা ছোটোবেড়ার প্রেক্ষাগারের বদলে এখন তারা আধুনিক পো প্যালেসে অভিনয় করে এবং তাদের অভিনয় দেখবার জন্যে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও, যা কিছু নাট্য প্রচেষ্টা সবই নিউইয়র্ক সহর থেকেই সুরু হত।

কিন্তু এখন আর নিউইয়র্কের সেই একচেটিয়া প্রাধান্য নেই। এখন 'ব্রডওয়ের পশ্চিমে' অর্থাৎ দেশের নানা সহরে পেশাদার, অর্ধ-পেশাদার, সৌখিন, অ-পেশাদার—বহু নাট্যদল তাদের নাটক দেখাচ্ছে এবং প্রচুর পয়সা রোজগার করছে। তারা নতুন নাটক সৃষ্টি করছে, সৃষ্টি করছে নতুন দর্শক সমাজ।

রিপার্টোরি থিয়েটর, ভ্রাম্যমান থিয়েটর, পরীক্ষামূলক থিয়েটর, নানা আদর্শের বহু নাট্যসংস্থা দেশের দিকে দিকে নাট্যভাবনার নতুন আগুয়াজ তুলেছে।

নিউইয়র্ক সহরে নাট্য প্রযোজনা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। তাই এই সব নাট্য দলগুলি সহরতলীতে মফঃস্বলে এবং নগরে নগরে তাঁবুর ঘাটি স্থাপন করেছে এবং নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ করে নিচ্ছে। তারা শুধু যে অতি আধুনিক নাটকই নামাচ্ছে তা নয়, ক্লাসিক নাটকেরও উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছে।

এই সব কেন্দ্রীয় নাট্যসংস্থা ব্রডওয়ের সাধারণ মঞ্চকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিয়ে অভিনয় করছে। তাদের নাট্যপ্রযোজনা দর্শকদের সহরে সহরে শিক্ষিত করে দিচ্ছে, এমন সব অভিনেতা অভিনেত্রীর দেখা মিলছে যারা সাধারণ মঞ্চের শিল্পীদের টেক্কা দিচ্ছে, এমন সব নাটক লেখা হচ্ছে যার নতুনতর চিন্তা আর চরিত্রসৃষ্টি দর্শকদের নতুন চেতনায় উদ্দীপিত করছে।

এইসব নাট্যসংস্থাদের অনেকেই সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য পায়। ১৯৬৫ সালের মধ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন একাই বিভিন্ন নাট্যসংস্থাদের সাহায্য খাতে সাত মিলিয়ন ডলার (তিনকোটি পাঁচলক্ষ টাকা) খরচ করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ হাউসটন, টেকসাসের অ্যালি থিয়েটরের কথা বলা যেতে পারে। এইটাই সবচেয়ে

পুরনো নব-নাট্যমঞ্চ। ১৯৪৭-এ স্থাপিত হয়ে ১৯৫৪ পর্যন্ত এটি ছিল পুরোপুরী অপেশাদার সংস্থা। তারপর পেশাদার রূপে নতুন করে তার কর্মোদ্যম শুরু হয়। ১৯৬০-এ ফোর্ড ফাউনডেশন এই সংস্থাকে অর্থ সাহায্য দেয়।

আজকে অ্যালি থিয়েটরের যা রোল বোলাও তা সবচেয়ে বড় পেশাদার সাধারণ মঞ্চেরও ঈর্ষা উদ্রেক করে। এই সংস্থার এখন চাঁদা দেওয়া বাঁধা দর্শক আছে ৬৬০০। এদের নাটকে প্রতিরাত্রেই হাউস ফুল। এখানে নতুন নাটক, নতুন শিল্পী, নতুন প্রতিভা, নতুন ভাবধারা, নতুনতর সমাজ চেতনার দোস্কার ঘোষণা।

এই যে দিকে দিকে নব-নাট্যসংস্থাদের প্রসার ও সাফল্য, এর মূলে নিহিত আছে কী উদ্দেশ্য?

আমেরিকার জনৈক ক্রিটিক বলছেন—They all aim towards the revitalization of the theatre as a meaningful forum for discussion and expression.

ওদেশের নবনাট্য প্রবাহের সঙ্গে এদেশের বিশেষ করে এই শহর কলকাতার বহু মিল আছে।

সাধারণ মঞ্চের বাইরে যে অগণিত নব-নাট্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কয়েকটি তো রীতিমত অসাধারণ কর্মকুশলীর পরিচয় দিয়েছে এবং দর্শকদের অনুরাগ ও আনুকূল্যও লাভ করেছে। কিন্তু তাদের অগ্রগতি এবং পরিপুষ্টির জন্যে কোন ফাউনডেশনের পৃষ্ঠপোষকতা নেই, নেই সরকারী উৎসাহ। সেদিক থেকে আমাদের এই শহরের নাট্যসংস্থাগুলির কৃতিত্ব, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং সাধনা ওদেশের নাট্য-সংস্থাদেরও উপরে গেছে, তা সহজেই বলা যেতে পারে।

নব নাট্য গোষ্ঠী

গত মাসের নানা অভিনয়

দিশারী

সম্প্রতি জামসেদপুরের দিশারী নাট্যসংস্থার শিল্পিবৃন্দ 'ঘুটির খেলা' নাটকটি অভিনয় করেন।

রুমানিয়ান নাট্যকার মিহাইল সিবেস্তিয়ানের নাটক অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন অনিতা রায়। নাট্য নির্দেশনায় উন্নত ধরণের শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন অমল দাশগুপ্ত, অনুপ দাশগুপ্ত। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন, অজন দাশগুপ্ত, পূর্ণব্রত সিংহরায়, শ্যামলকুমার বাগচী, চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, রঞ্জিত সেনরায়, বিষ্ণুপদ রায় সরকার, প্রীয়ান অমিত কর, মঞ্জুশ্রী গুহরায়, বালা মৈত্র। মঞ্চ-সজ্জায় নাটকের পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ধ্রুব গাঙ্গুলী,তাপস দাস, রমেন চট্টোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত ও আলোক সম্পাতে ছিলেন সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন মজোপাধ্যায়।

টালিগঞ্জ ট্যাকস রিক্রিয়েশন ক্লাব। কয়েকদিন আগে এঁরা রঙমহল মঞ্চে 'কালিন্দী' নাটক পরিবেশন করেছেন। প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসাবে এঁদের অভিনয় মোটামুটি ভালই হয়েছে। কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ মেটিয়া, বিভেন্দ্রির চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মৈত্র, সত্য দে, হারাধন কৌচ, গোবিন্দ দে, গোপালচন্দ্র পাল, মালা রায়, সুকৃতি সিনহা, রমা দাস, বেলা রায়।

তরুণ সংঘ। প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে এঁরা ডাঃ অরুণ দে'র 'কার দোষ' নাটকটি পরিবেশন করেন। নাট্যনির্দেশনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন রঞ্জিত মুখার্জি। সাবলীল অভিনয় করে যারা প্রশংসা অর্জন করেন তাঁরা হলেন তরুণ মুখার্জি, সৈবাল দাশগুপ্ত, সমীর গুপ্ত, প্রদীপ

দাশগুপ্ত, অনিন্দ্য ঘোষ, চঞ্চল মিত্র, অভিজিত ঘোষ, চিরঞ্জীব মুখার্জি, সনৎ মিত্র। আবহসঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন পাল।

গীতবীথি। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা কিছুদিন আগে 'চিরকুমার সভা' নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। নির্দেশ দেন প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন কল্যাণকুমার সাহা, অসীম চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা ঘোষ, স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়, অমিতা বসু, মিহির চট্টোপাধ্যায়; শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, প্রণব বসু ও নির্দেশক প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শা ওয়ালেস ইনসটিটিউট। সম্প্রতি এঁরা বাৎসরিক সম্মেলন উপলক্ষে 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে 'কিন্নের বন্দী' নাটকটি পরিবেশন করেন। কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন রঞ্জিত দত্ত। এর রচয়িতা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন—শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সুশীল রায়চৌধুরী, প্রতিমা চক্রবর্তী, বাসন্তী চ্যাটার্জী, কল্পনা ভট্টাচার্য, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, পাঁচু চক্রবর্তী, অরুন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বসু, প্রভাত বসু, দুলাল বন্দোপাধ্যায়।

হিন্দাই টীন ষ্ল্যাণ্ড। মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রনার পটভূমিতে লেখা নাটক 'আজকাল' সম্প্রতি উক্ত সংস্থা কর্তৃক বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনীত হোল। 'অবিনাশ' চরিত্রে হরেন বসু অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন মাধব বসু, রতন রায়চৌধুরী, শৈলেন মিত্র, সরোজ গুপ্ত, কল্পনা বাগ, শম্ভু শেঠ, গোপাল শেঠ, ভোলা সেন, বিজন দাস, সন্ত রাই। নাট্যপরিচালনা করেন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন। সম্প্রতি এই ক্লাবের সভ্যরা 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে 'রাহুমুক্ত' নাটকটি অভিনয় করেন। প্রতিটি শিল্পীর সনিষ্ঠ অভিনয়ের স্পর্শে সমগ্র নাটকটি উজ্জল হয়ে ওঠে। কয়েকটি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য নাম করেন মায়া ঘোষ, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন সিকদার, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দেন—বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সোম, বরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামকেশ মিত্র, গোপাল হাজরা, পরেশনাথ সিংহ।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি এই ক্লাবের সদস্যরা কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'ইঙ্গিত' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অসীম বসুর নির্দেশনায় এই নাটকে অংশ নেন রত্না মুখোপাধ্যায়, দীপক চক্রবর্তী, নলিনাক্ষ ঘোষ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, মনোজিত তালুকদার, নিখিল সোম।

ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন। এই ক্লাবের সদস্যরা কিছুদিন আগে বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন অপূর্ব দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—সুকুমার ঘোষ, স্বপন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ সিংহ, দীপক রায়, গৌতম দত্ত, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম দত্ত, বাবলু ঘোষ, প্রদীপ পাল, অরুন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ সাহা।

গিরিশ নাট্য সংসদ। গত মাসে এই সংসদের সভ্যরা বি, টি, রোড সি, আই, টি, বিল্ডিং প্রাঙ্গনে অবেন্দ্রকুমার দে রচিত 'রাজা দেবদাস' নাটকটি পরিবেশন করেন। যাত্রাভিনয়ে এই সংসদকে কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সংস্থা বলা যায়। এঁরা এই নাটকটির অভিনয়ে এঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সংসদের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

পথিক। মুক্তাঙ্গন মঞ্চে এঁরা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধ' নাটকটি পুনরভিনয় করলেন। যুগোচিত কাহিনী, সুন্দর টিমওয়ার্ক এবং কয়েকজন শিল্পীর প্রাণবন্ত অভিনয় সমগ্র নাটকটিকে একটি বাঞ্ছিত শিল্পমূল্য দিতে পেরেছে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন গোপাল দে, ভয়ন্ত মতিলাল, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুর, কিরণ সেন, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ ঘোষ, কান্তিময় রায় চৌধুরী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সান্ত্বনা ঘোষ।

ইরিগেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব। এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির-ঘর' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয়ে নাটকটি বিশেষ অন্তরস্পর্শী হয়। অভিনয়ে 'রিলিফ' চরিত্র হিসাবে জীবন রায়ের উৎপল সুন্দর ও স্বাভাবিক। শ্রীরায়ের অভিব্যক্তি ও বাচন ভঙ্গিতে যে বিশেষ 'টাইপ' নিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত, উদার বাস্তুঘুঘু মুখার্জিও (সত্যপ্রসন্ন) সুন্দর। একদিকে যার্থ প্রেম, অন্যদিকে আবার নতুন করে পাবার চাহিদা, এই মানসিক দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণধন আচার্যের (অলক) অভিনয়ে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন বীরেন চক্রবর্তী (শংকর) কল্যাণ ঘোষ (চঞ্চল) দেবীদাস আচার্য (অশোক)। স্ত্রী চরিত্রে প্রতিমা পালের ছন্দা উল্লেখিত প্রশংসার যোগ্য। খুকু ভট্টাচার্যের নন্দা সুন্দর।

বাণীরূপা। মুক্ত অঙ্গনে এই সংস্থার শিল্পীরা দুটি নাটক অভিনয় করলেন। নাটকদুটি হল—'কেন এই অবক্ষয়?' ও 'আবর্ত'। আবর্ত, গৌরীন সেনের 'আমের স্বাদ নোনতা'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন তোলা দত্ত। কিউবার বিপ্লবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী এবং আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এর মঞ্চরূপ দিয়েছেন দলের শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ। নাটকের শুরুতে নেপথ্য ভাষণের মাঝে সৈনিকদের প্যারেডের তালে গান এক অপূর্ব আমেজের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয় মনে রাখবার মত। তার মধ্যে বাবলু দাশগুপ্ত ও বাচ্চু ভট্টাচার্যের নাম নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চ ও আলো পরিবেশানুগ।

অপর নাটকটি বাবলু দাশগুপ্ত রচিত 'কেন এই অবক্ষয়?' মানুষের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের উপর চাবুক চালিয়ে আঙুল দিয়ে নাট্যকার পথ নির্দেশ দিয়েছেন এ থেকে মুক্তি পাবার।

নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন তোলানাথ চক্রবর্তী, কানু ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ বিশ্বাস, নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী, দীপক গুহ, অশোক বসু, সুরজিৎ সাহা, প্রদ্যোৎ পাকুলী, কালো লাহিড়ী ও আরও অনেক শিল্পী।

নাটকদুটি পরিচালনার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাবলু দাশগুপ্ত।

গন্ধর্ব নাট্যদল। সম্প্রতি অভ্যমঞ্চে এই সংস্থার শিল্পীরা "একা নয়" নাটকটি পরিবেশন করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কির একটি ছোটগল্প অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। নৈরাশ্য পীড়িত মানুষের বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই নাটক।

দেবকুমার ভট্টাচার্য নাট্যনির্দেশনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন। অপূর্ব অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অরুণা চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বতী ভট্টাচার্য, জগন্নাথ হালদার, সলিল বিশ্বাস।

হাওড়া পার্শেল রিক্রিয়েশন ক্লাব। সম্প্রতি এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দ 'কেরা' নাটকটি অভিনয় করলেন। রূপক নাট্য রচনায় নাট্যকার যতন ঘোষের এই প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য। নাটকটিকে সার্থকভাবে মঞ্চে পরিবেশন করার দায়িত্ব বহন করেন নাট্য নির্দেশক সুবোধ রায়চৌধুরী। অনন্তলাল ভদ্রের মঞ্চসজ্জা কল্পনা শক্তির স্বাক্ষর রেখেছে। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রানুযায়ী যথাযথ অভিনয় করেছেন। 'ঋত্বিক', 'সর্বকাল' ও 'নির্বোধ' চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন সুবোধ রায় চৌধুরী, প্রণব পাল, শঙ্কর ঘোষ। 'শবরী'র ভূমিকায় গৌরী ব্যানার্জির আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন—বিজেন ঘোষ (প্রভু), ভবেশ বেরা (৩৪৭), ধীরেন ব্যানার্জি (কাল) অসীম ঘোষ (ঘোষক) অরিন্দম ব্যানার্জি (ঘাতক), বীরেন গুহ (প্রথম) বিপদবারণ রায় (দ্বিতীয়) শক্তিপদ রায় (তৃতীয়)।

নীলকণ্ঠ। জিয়াগঞ্জের এই বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা সম্প্রতি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'শঙ্করাজের হাততালি' নাটকটি লক্ষ্মী সিনেমা হলে পরিবেশন করেন। প্রতিটি শিল্পীই সু-অভিনয় করে নাটকটির মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছেন। যাঁরা এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—অতুল বিশ্বাস, দেবাশীষ সিংহ, চণ্ডী চৌধুরী, নবীন বণিক, ডাঃ পরিতোষ গুপ্ত, শীতেন বসু, স্বাতী ঘোষ।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান। গত মাসের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রসদনে দু'দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন আশ্রমিক সঙ্ঘ করেছিলেন তা রবীন্দ্র অনুরাগীদের অশেষ তৃপ্তি দান করেছে। এই অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় যথাক্রমে মায়ার খেলা, তাসের দেশ, বাল্মিকী প্রতিভা, ভানুসিংহের পদাবলী এবং চিত্রাঙ্গদা। বিরাট আয়োজন এবং সেইমত বিপুল শিল্পী সমাবেশ। আশীজনের উপর শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং নৃত্য ও অভিনয় ছাড়া শতাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৃত্যে অভিনয়ে এবং গানে প্রত্যেকটি পালাই অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা কেউই পেশাদার নন। এবং বৎসরে এই একবারই আত্মপ্রকাশ করেন—অবশ্য দু'একজন ছাড়া। তাই এতগুলি নাচো তাঁরা যে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা দর্শক ও শ্রোতাদের শুধু পুলকিত করেনি, বিস্ময়াবিত করেছে। এবছরকার অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে।

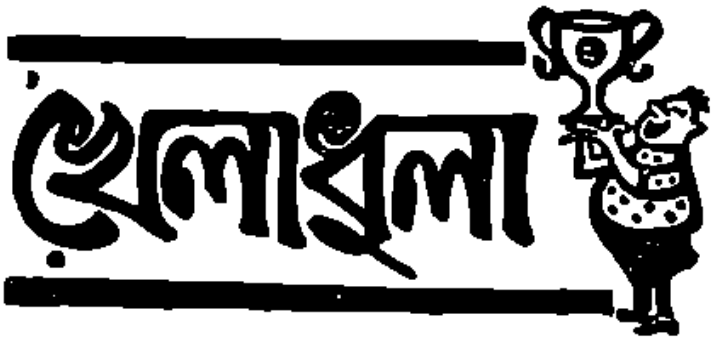

জ্যোতির্ময়

ফুটবলের আকর্ষণ : অতীতের দিকপাল

বাঙালীর কাছে ফুটবলের চেয়ে আকর্ষণ বোধ করি আর দ্বিতীয় নেই। একথা প্রমাণ করার আজ আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এই বিদেশী খেলাকে বাঙালী নিজের করে নিয়েছে।

কিন্তু খুব বেশি দিনের কথা নয়। একশো বছর হতে এখনো অনেক দেরী। গোরার দলই তখন কেল্লার ধারে নিজেরা নিজেরা খেলতো। তাদের খেলা দেখে বাঙালীদেরও সাধ হল তারা ফুটবল খেলবে ওই রকম লাজ পোষাক পরে। জন্মালো দুটি একটি ক্লাব। টাউন, ক্যালকাটা, হেয়ার স্পোর্টিং আর শোভাবাজার। তাদের মধ্যে শোভাবাজারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা। আর ছিলেন ওই খেলার অনেক বড় দরের রসিক। এখন যেখানে ভবানীপুরের তাঁবু সেখানে শোভাবাজারের তাঁবু পড়ল। ছেলেরা দস্তরীতিমত বুট পায়ে ইউনিফর্ম পরে অনুশীলন করতে লাগল। ক্রমে কেল্লার গোরাদের সঙ্গে শোভাবাজার ক্লাবের ভাব হল। তাদের সঙ্গে প্রীতিফুটবল ম্যাচ শুরু হল। কিন্তু দেখে দেখে সেরা খেলায় আর কতটুকু পারদর্শিতা জন্মায়। খেলায় অনেক গোল হতে লাগল শোভাবাজারের বিরুদ্ধে।

১৮৯০ সালের কথা। তখনো আই. এফ. এ শীল্ডের পত্তন হয় নি। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তখন রাগবি খেলে! সেই সময় কেল্লায় ছিল বাফ্‌স্ রেজিমেণ্ট। ফুটবলে অত্যন্ত দক্ষ তারা। তাদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে শোভাবাজার বেজায় হারল। তারপর স্থির হল, বাফস দলের অধিনায়ক কর্পোরাল এভানস শোভাবাজারের খেলোয়াড়দের খেলা শেখাবে। এক বছর শিক্ষার পর শোভাবাজারের সঙ্গে আবার বাফস দলের খেলা হল। সে খেলায় বাফস দলের অধিনায়ক এভান্‌স খেললো না, বরং শোভাবাজারের খেলোয়াড়দের লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগল। ফল হল সমান সমান। সেই দিনটি বাঙালীর ফুটবলের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। তখনকার দিনের সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'দি এম্পায়ার' কাগজে তার এক সুদীর্ঘ বিবরণ বেরুলো, তার মধ্যে বাঙালী খেলোয়াড়দের অকুণ্ঠ প্রশংসা। বিবরণের হেড্ লাইন ছিল :

HOW EVANS OF THE BUFFS
TOUGHT THE BENGALEES
TO PLAY FOOTBALL

সেই ঘটনাটি কিছু বিশদভাবে নীচে দেওয়া হল :

শোভাবাজার ক্লাবের কর্মকর্তারা সকলেই ছিলেন ইংরাজীনবিশ ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন যাঁদের তুল্য ইংরাজী বলনেওয়ালা বা লিখনেওয়ালা বাঙালীদের মধ্যে বেশি দেখা যেতো না। ফলে, সাহেব মহলে তাঁদের খুব খাতির ছিল। শুধু সাহেব মহলেই নয়। মিলিটারিদের মহলেও। তাঁরা বোধকরি তখনকার দিনের দু'তিনজন মাত্র বাঙালী যাঁদের কোর্ট উইলিয়মে প্রবেশ করবার অবাধ ছাড়পত্র

ছিল। তাঁদের নামগুলি আজ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়: নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কালিনাথ মিত্র, মন্মথ পাকুড়সী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়। সে সময়ে আই. এফ. এ-তে সাহেবদেরই একচেটে প্রাধান্য। সেই সমিতিতে প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন কালিনাথ মিত্র।

কেল্লায় গোরা দলের সঙ্গে খেলতে হবে। তখন কেল্লায় রয়েছে বাফস রেজিমেণ্ট। সেই বাফস রেজিমেণ্টকে শোভাবাজার চ্যালেঞ্জ জানালো। এইভাবে তখন ফ্রেণ্ডলী ম্যাচ খেলা হত। একদল অপর দলকে চ্যালেঞ্জ বা আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতো।

বাফস দলের কাপ্তেন আর অন্যান্য কর্তারা শোভাবাজারের কর্তাদের চিনতো। অনেকদিনই সন্ধ্যায় তারা শোভাবাজারের তাঁবুতে এসে পানাহার করে গেছে। তাই তারা সাদরে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। নির্ধারিত দিনে খেলা হল। খেলার প্রারম্ভে কেল্লা থেকে গোরার দল এসে বাজনা বাজালো। দুর্ধর্ষ দল বাফস রেজিমেণ্ট। তাদের পাসিং, ড্রিবলিং সমস্তই উচ্চতম পর্যায়ের। সেই উৎকর্ষের বিরুদ্ধে শোভাবাজারের ছেলেরা দাঁড়াতেই পারলো না। তাদের ছুটোছুটিই সার হল। প্রতিপক্ষের নাগাল তারা পেল না। মাঠে যেন সারাক্ষণ নাচতে লাগল। তাঁদের বিরুদ্ধে গোল হল এগারোটা। আরও গোল হোতে পারতো। কিন্তু বাফস দলের কাপ্তেন এভানস খেলায় ঢিলে দিল। যাইহোক কোনক্রমে খেলা শেষ হল। গোরারা শোভাবাজারের ছেলেদের সান্ত্বনা দিল, তোমরা বেশ খেলেছো, পারবে, তোমরাও একদিন খেলতে পারবে, আমাদের মত। কিন্তু শোভাবাজারের কর্তাদের আর খেলোয়াড়দের মন বড় হয়ে গেল। এতদিন তো তারা ছুটোছুটি করেছে, বলে কিক্ মেরে দৌড়েছে সেই বল ধরতে, যে যত বেশি কিক্ করেছে সেই তত ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু আসলে তা তো নয়। এ খেলার পদ্ধতি তো অন্য। সেই পদ্ধতি কী করে আয়ত্ত করা যায়?

সেই মরশুম শেষ হবার পর, শোভাবাজারের কর্তারা গেলেন কেল্লায়। বাফস দলের কর্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় জানালেন। শুনে তিনি বললেন, এর আর কথা কী! আমি এখনি ডাকছি এভানসকে।

এভান্স এলো। তাঁদের কর্তা বললেন, দেখ এভান্স, এঁরা বলছেন, এঁদের ছেলেদের খেলাটা শেখাতে হবে। আর তোমাকেই নিতে হবে সেই ভার।

এভান্স সানন্দে সম্মত হল। পুজোর পর শীত এলো! তখন ফুটবল বন্ধ। কিন্তু শোভাবাজার মাঠে ফুটবল পড়েছে। শোভাবাজারের ছেলেরা অনুশীলন করছে। একজন গোরা তাদের শেখাচ্ছে। দিনের পর দিন এই অনুশীলন চলতে লাগল। এভান্সের সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীরাও আসতো। প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মধ্যে দুই জাতের ছেলেরা মিলেমিশে খেলতো। আর খেলার পর গলা জড়াজড়ি করে মাঠে শুয়ে থাকতো। তারপর শোভাবাজারের আতিথ্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে রাত নটা দশটায় গান গাইতে গাইতে তারা কেল্লায় ফিরতো।

এমনি করে অনুশীলনের পর আবার ফুটবল মরশুম ঘুরে এলো! অনেকগুলো ছোট বড় খেলার পর এলো শোভাবাজারের যথার্থ শক্তি পরীক্ষার দিন। বাফস রেজিমেণ্টের সঙ্গে খেলা।

শোভাবাজার মাঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামিয়ানা পড়েছে! একটার পর একটা! প্রথম সামিয়ানায় কেল্লার বড় বড় অফিসার আর কলকাতার শ্রেষ্ঠ সাহেব নাগরিকের দল। তাঁদের মধ্যমণি কে? না, মহারাজা অফ্ কোচবিহার। বিশেষ আমন্ত্রণে এ খেলা দেখবার জন্যে তিনি কোচবিহার থেকে এসেছেন। দ্বিতীয়

শামিয়ানায় কলকাতার ধনকুবেরের দল। তাঁদের মধ্যমণি শোভাবাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব শোভাবাজার ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয় শামিয়ানায় কলকাতার যত ফুটবল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ আর খেলোয়াড়। ইত্যাদি। হাজার হাজার ছোট বড় পতাকা উড়ছে তাঁবুর চারপাশে। দু'তিনটে গোরা বাদ্যদলের দল বিকাল চারটা থেকে বাজনা বাজাচ্ছে। তাঁবুর একধারে খেরা জায়গায় লম্বা টেবিলে বার সাজানো হয়েছে। উইলসন হোটেলের উর্দিপরা খানসামারা ঘুরছে। যত চাও তত পাবে, পয়সা চাবে না।

যথা সময়ে খেলোয়াড়রা মাঠে নামল। কিন্তু একী! রাফস দলে তো এডামস নেই? না। তিনি নেই। জানা গেল, তিনি আজ খেলবেন না। যেহেতু তিনি বাঙালী ছেলেদের হাতে ধরে এত মাল শিখিয়েছেন, সেই হেতু তিনি আজ তাদের বিরুদ্ধে খেলবেন না, বরঞ্চ লাইনের পাশ থেকে তিনি তাদের উৎসাহ দেবেন, নির্দেশ দেবেন। সাহেবদের দল হাসলো। মাইবা রইল এডামস। তা হলেও বাঙালীর দল কি দাঁড়াতে পারবে? খেলা সুরু হোল। রাফস দল রীতিমত চাপ দিয়ে গোড়া পত্তন করবার চেষ্টা করল। তাদের ওপর সেই রকমই নির্দেশ আছে। যত জোরে পার খেলো, যত পার গোল দেবে। কিন্তু শোভাবাজারের ছেলেরা একি দারুণ খেলছে! ঠিকঠাক পাস, ঠিকমতো দৌড়—বল আদান প্রদান। রাফসদের দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগ যে বিব্রত হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে এডামসের গলা শোনা যাচ্ছে, 'পাস অন টু রাইট, কাম আপ গাঙ্গুলী।' কখনো শোনা যাচ্ছে, 'সুট।' কখনো বা, 'ফল ব্যাক।' গুরুর নির্দেশমতো নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে শোভাবাজারের তরুণ খেলোয়াড়রা সেদিন অদ্ভুত খেলা দেখালো। গোল তারা করতে পারলে না বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষকে গোল করতেও দিলে না। গোলশূন্য খেলা হলো সমান সমান। কোথায় গত বছরের ১১ গোলে হারার খেলা আর কোথায় এবারকার খেলা।

সাহেব সুবো আর গোরার দল গুণের কদর করতো। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ডেকে তারা অভিনন্দন জানালো। পরদিন ইংরাজী কাগজগুলোতে এই খেলার দীর্ঘ রিপোর্টের মধ্যে রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত শোনা গেল: 'খেলার মাঠেও বাঙালীদের নবজাগরণ দেখে এলাম আমরা।' সান্ধ্য পত্রিকা এম্পায়ার প্রাণ খুলে বাঙালীদের প্রশস্তি গাইলো। যদিও হেড লাইন ছিল 'কেমন করে রাফসদলের এডামস্ বাঙালীদের ফুটবল খেলা শেখালো'—তাহলেও বাঙালী খেলোয়াড়দের গুণপনা স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের সেই রিপোর্টটি বাঙালী ফুটবল খেলার ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল।

১৮৯৩ সালে লীগ খেলা সুরু হল। সেই প্রতিযোগিতায় একমাত্র বাঙালীদল যাকে খেলবার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল তা হল শোভাবাজার ক্লাব। সেই দলের জ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন, ব্যাক কালী মুখুজ্যে। ছ' ফুট লম্বা চেহারা, তেমনি বুকের ছাতি। খেলতেনও তেমনি। কালী মুখুজ্যের নাম তখন দর্শকদের মুখে মুখে। যে কেউ ভাল খেললেই দর্শক চেঁচাতো, বাক আপ কালীবাবু!

ট্রেডস ক্লাব (বর্তমানে ভালহৌসি) আর নেভাল ভলানটিয়ার্স (বর্তমানে নেভাল)—এই দুই সেক্টাংগ দলই প্রথম এই খেলায় পুরোপুরী নামে। তারপর ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব।

ভালহৌসির বিখ্যাত সেন্টার ফরওয়ার্ড ছিলেন, সিনক্লেয়ার। প্রতিপক্ষ দূর থেকে বল পেলেও আর রক্ষা নেই বিপক্ষের গোলকীপারের, এমনি ছিল তাঁর জোর আর অব্রান্ত সট।

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অ্যাশটনও ছিলেন এমনি এক দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়।

বাঙালীদের মধ্যে নগেন আর বিনয় সর্বাধিকারী (শোভাবাজার) গোবর মুখার্জি (জাতনাল),

বিজেন বসু (শোভাবাজার), অদ্ভুত পাল (শোভাবাজার), সুহৃদার সেনগুপ্ত (টাউন) এবং দুর্গাদাস মজুমদার (এরিয়ান)—এঁরাও সেদিন প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন এই খেলায়।

তারপর উঠল মোহনবাগান ক্লাব। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ পরপর তিনবছর ট্রেডস কাপ জিতে মোহনবাগান ১৯১০ সালে শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সদের কাছে তিন গোলে হেরে গেল। কিন্তু তারপরের বছরই শীল্ড জয় করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করল, বাঙালীর ফুটবলের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে।

* * *

বিগত কালের অনেক দেশী বিদেশী ফুটবল খেলোয়াড়ের কথা আমরা শুনেছি। অনেককে খেলতে দেখেছিও। তাঁরা অনেকে আজ প্রায় বিস্মৃত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

কর্পোরাল গ্রেডস

হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যানট্রির সেনটার ফরওয়ার্ড। অনেকের মতে গ্রেডস-এর মতো সেণ্টার ফরওয়ার্ড এদেশে আর দেখা যায়নি। খেলতেন ছবির মতো। তাড়াহুড়ো নেই। ধাক্কাধাক্কি নেই। সারা মাঠ নখদর্পণে। তাঁর দিকের অন্য ফরওয়ার্ডরা কে কোথায় আছে তা জেনে নেবার যেন ছিল অলৌকিক শক্তি তাঁর। পাস দিতেন নিখুঁত নির্ভুল। প্রতিপক্ষকে কাটাবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। ফলে গোলও করতেন সর্বাধিক। ১৯০১ সালে ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় তিনগোল পিছিয়ে থেকেও এইচ, এল, আই ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে এবং সেই চারটি গোলই করেছিলেন গ্রেডস একা। সেনাদল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি ইংলিশ লীগের প্রথম ডিভিসন দল আর্সেনেলের তরফেও কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন।

শরৎ সিংহ

ঘাটুতে যদি চোট না খাবতো আর চাকরির জন্যে যদি কুচবিহারে থাকতে না হত তাহলে শরৎ সিংহ সর্বকালের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড রূপে গণ্য হতে পারতেন। যে ক'বছর মোহনবাগানের তরফে কলকাতার মাঠে তাঁকে দেখা গিয়েছিল সেই ক'বছর তিনিই ছিলেন মাঠের সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড। ১৯২২ সালে তাঁর খেলা হয় অবিস্মরণীয়। সেই বছর দুপরাজের ডি, সি, এল, আই গোরাদলকে মোহনবাগান শীল্ডে দু গোলে হারায়। দুটি গোলই করেন শরৎ সিংহ। পরে ১৯২৭—১৯২৯-এ তিনি ই, বি, রেলের তরফে খেলেছিলেন।

কিড ডি' সিলভা

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত গোলকিপার হিসেবে ডি' সিলভার নাম ছিল যেন প্রবাদের মত। গোলকিপার হিসেবে যে কেউ ভাল খেললেই আমরা বলতাম ডি' সিলভা গোলকিপার। প্রথমে মেসার্সারস্ দলে খেলতেন। তাঁরই অনন্যসাধারণ খেলার গুণে ১৯১৪ সালে মেসার্সারস দল প্রথম ডিভিসনে ওঠে। তারপর তিনি ই, বি, রেলে যোগ দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মেসার্সারস দলেরও পতন ঘটল। মধ্যে দু বছর এরিয়ানের তরফেও খেলেছেন। অদ্ভুত গোলকিপার ছিলেন। এক একদিন এমন গেছে, সমস্ত বিপক্ষ দল একদিকে আর একা ডি সিলভা অন্যদিকে। কিন্তু তবুও তিনি পরাস্ত হননি। ডি সিলভা একজন মুষ্টিযোদ্ধাও ছিলেন।

এল সামাদ

মাঠে যেন ডেকিংগী হচ্ছে। একজনের পর একজন। তারপর একসঙ্গে দুজন। মাঝ গোলকিপার পর্যন্ত। সবাইকে কাটিয়ে পায়ে বল নিয়ে সামাদ ঢুকলেন বিপক্ষের গোলের মধ্যে! সামাদের পায়ে বল মানেই বিপক্ষের হৃৎকম্প।

তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় ছিলেন ফুটবলের মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। তাজহাট নামে ফুটবল দল তৈরী করেছিলেন। সেই দল শিল্ড্ খেলতে আসত। সেই দলে ১৯১৭ সালে দেখা গেল এক লম্বা ছিপছিপে শক্ত সমর্থ লেফট আউট-কে, যার নাম সামাদ। খেলা তো নয়, যেন যাদু। যে পরিমন থেকে গোল করার কল্পনাও করা যায় না সেখান থেকেও তিনি অবলীলাক্রমে গোল করেছেন। বল পায়ে করে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও ছিল আশ্চর্য।

খেলা চলছে। ঢিলে ঢালে খেলছেন সামাদ। বল ধরছেন, প্রতিপক্ষকে কাটাচ্ছেন, পাস করছেন। কিন্তু গোল আর হয়না। এদিকে প্রতিপক্ষ তাঁর দলকে খুব চেপে ধরেছে। এই বুঝি গোল হয়। হঠাৎ দেখা গেল সামাদ নিজেদের গোলের কাছে পেছিয়ে গিয়ে ব্যাক দুজনকে সাহায্য করছেন। তারপর সেখান থেকে একটা বল নিয়ে ছুটলেন তিনি বিপক্ষে গোলের দিকে। সে কি বিদ্যুৎ গতি। রুখে এল একজন। পাশ কাটালেন তাকে। তারপর একজন হাফব্যাক, দুজন ব্যাক, আর একজন হাফব্যাক। এমনি করে সবাইকে কাটিয়ে অনায়াস গোলকিপারের সামনে এসে বলকে দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে বল ঠেলে দিলেন গোলের এক কোনে। গোলকিপার দাঁড়িয়েই রইল। বুঝেছিল এ গোল রোধ করবার ক্ষমতা তার নেই। ১৯১৯ সালে শিল্ড্এ এমনি একটি অসম্ভব গোল দিয়ে তিনি দুর্জয় গোরাদল এেকনকল্‌কে হারিয়ে দিয়েছিলেন। দেশ ভাগ হবার পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান।

হিউ শারম্যান

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের রাইটউইং প্লেয়ার। বিংশ শতাব্দির প্রথম দলকে অতবড় রাইট উইং আর কেউ ছিল না। দুইভাই ডিকটর এবং হিউ। দুজনেই চমৎকার খেলতেন। ডিকটর ১৯০৮ সালে অবসর নেন। হিউ শারম্যান ১৯১৯ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। যেমন ছিল তীব্র গতি, তেমনি ছিল নিখুঁত পাস। নিজের দলের খেলোয়াড়কে এমনভাবে বল দিয়ে সুযোগ দিতেন যে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা শক্ত হত না। তাঁরই জোলতেই তো হোসি আর কেন প্রচুর গোল করতে পারতেন।

জো পলস্রেথ

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের মধ্যে এতবড় চৌখস খেলোয়াড় আর কেউ বোধহয় জন্মায়নি। ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেট তিন বিভাগেই অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯০৮—১৯৩১ পর্যন্ত নিয়মিত খেলেছেন। প্রথমে কাসটমস্ তারপর ই. বি. রেল। সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলতেন। খুব জবরদস্ত খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। মার খেতেন যেমন, মারতেনও তেমনি। স্যুটিং ছিল অপূর্ব। ১৯১৫ সালে বলতে গেলে প্রায় একাই কাসটমস দলকে কাঁধে করে শিল্ড ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। কালকাটার সঙ্গে প্রথম দিন ড্র করে দ্বিতীয় দিন কাসটমস হারল বটে কিন্তু সেই দুদিনই মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন জো পলস্রেথ। ১৯২১ সালে ডালহৌসীর হয়ে খেলেছিলেন এবং তাঁরই খেলার দাপটে ডালহৌসী সে বছর লিগ জয় করেছিল।

ভূতি মুকুল

ছোটখাট মানুষটি। কিন্তু তাঁকে কাটার সাধ্য কার। পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে একাই রুখতেন সময় সময়। ১৯০৯ সালে মোহনবাগান ক্লাবে খেলতে আসেন বিহার থেকে। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিলড বিজয়ে তাঁর অবদান বড় কম ছিলনা। বেশীদিন খেলেননি। ১৯১৬ সালে গোষ্ঠ পালকে নিজের জায়গায় বসিয়ে তিনি অবসর নেন। গোষ্ঠ পাল স্বীকার করেছেন যে মুকুলের কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

শিবদাস ভাদুড়ী

বাংলা দেশের ফুটবল খেলায় যে নামটি আমাদের কাছে সবচেয়ে গর্বের, সেটি হচ্ছে—শিবদাস ভাদুড়ী। তিনি অবিসম্বাদিত ভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। পরিবারের চার ভাই, চারজনেই ফুটবল খেলতেন। হরিদাস, রামদাস, বিজয়দাস, শিবদাস। শিবদাস ছিলেন সবার ছোট কিন্তু সবার সেরা। পাস্তির মাঠে (বর্তমানে যেখানটা বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল) খেলায় হাতেখড়ি। বড়ভাই হরিদাস ভাদুড়ী আর দুর্যীরাম মজুমদার, এই দুজন ছিলেন তাঁর উপদেষ্টা ও গুরু। ১৯০৪ সালে শিবদাস মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং সেই বছরেই মিনটো কেট প্রতিযোগিতায় খেলার কায়দায় সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। শিবদাসের পায়ে একবার বল পড়লে আর রক্ষে নেই। বল আয়ত্তে রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা, অসাধারণ ক্ষিপ্রগতি এবং সর্বোপরি আশ্চর্য বুদ্ধি—তাঁকে রুখতে পারার মতন ক্ষমতা দুর্ধর্ষতম হাফব্যাক দূর ব্যাকেরও ছিল না। গোল তিনি করতেনই। প্রধানতঃ তাঁরই জন্যে মোহনবাগান ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে কুচবিহার কাপ জিতেছিল, ট্রেডস্‌কাপ জিতেছিল পরপর তিনবার ১৯০৬—৭ ও ৮ সনে এবং শিল্ড জিতেছিল ১৯১১ সালে। ফাইনাল খেলায় এক গোলে পিছিয়ে পড়ে দুটি গোল করেছিলেন তিনি। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত শিবদাস মোহন বাগানের তরফে খেলেছেন।

এ. এল. হোসি

দুঁদে দুর্বিনীত খেলোয়াড় কিন্তু কী চৌখস—অতুলনীয়। যেমন ফুটবল, তেমনি ক্রিকেট, তেমনি হকি। বিলাতের কাউন্টি প্লেয়ার ছিলেন। ছিলেন অক্সফোর্ড ব্লু। লণ্ডনে সেন্টলরেন্স স্কুলে পড়বার সময় ফুটবল খেলা শেখেন। ১৯১১-১২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে খেলে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতায় আসেন ১৯১৪ সালে। ১৯১৫ সালে ফাইনাল খেলায় তিনি ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের তরফে চোখ ঝলসানো খেলা দেখিয়েছিলেন, যদিও সে খেলায় ক্যালকাটা কিংস ওন নামে গোরা দলের কাছে এক গোলে হেরে যায়। পরের বছর ক্যালকাটা একটি ম্যাচেও না হেরে লিগ জয় করে এবং নিজেদের ঘরে প্রচুর সংখ্যক গোল জমা করে। সে বছর সবচেয়ে বেশী গোল করেন হোসি। ইনসাইড লেফ্‌ট রূপে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু মাথা গরম করতেন। প্রথম প্রথম বাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু ইদানীং তাঁকে দেখেছি বাঙালী খেলোয়াড়দের, বিশেষকরে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, উৎসাহ দিতেন এবং সর্বরকমে তাঁদের সাহায্য করতেন।

বিদেশী ফুটবলের টুকিটাকি : অতীত কাহিনী

অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। শতেক বছর আগে গ্লাসগোর একটি অপেশাদার ফুটবল সংস্থা ছিল। নাম, কুইনস পারক্। ১৮৬৭ সালে ক্লাবটির জন্ম। শুনলে অবাক হবেন, প্রথম সাতবছর তাদের বিপক্ষে একটিও গোল কেউ করতে পারেনি! বিস্ময়কর রকম দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগ নয় কি! তাদের বিপক্ষে প্রথম গোল দেয় "ডেল অফ লেভেন" নামে একটি ক্লাব। তাদের প্রথম হার হয় ১৮৭৬ সালে। সেই সময়কার অগ্রগণ্য ফুটবল দল ওয়ানডারার্স ক্লাব তাদের হারিয়ে দেয়। সেবছর সেই একটিই হার। কিন্তু সেই একটি হারের জন্যই তাদের শোকের অন্ত ছিল না। সেবছরটাকে তারা তাদের জীবনের 'কালোবছর' রূপে চিহ্নিত করেছিল।

স্কটল্যাণ্ডে ফুটবলকে জনপ্রিয় করবার ব্যাপারে এই ক্লাবটির অবদান ছিল অসামান্য। ১৮৭৩ সালে এদের দ্বারাই স্কটিশ ফুটবল এ্যাসোসিয়েসান স্থাপিত হয়। এবং একটি চ্যালেঞ্জ কাপের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কুইনস পারক প্রথম তিন বছর পরপর জেতে। পরের তিনবছর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ডেল অফ লেভেন। তারপর আবার উপরি উপরি তিনবছর জেতে কুইনস পারক।

এই প্রতিযোগিতায় এক একটা দলের বিরুদ্ধে গোল হত তখন তখন। এবিষয়ে দুটি রেকর্ড আছে। ১৮৮৫ সালে এই সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতায় বন এ্যাকর্ড নামে একটি দল আয়রোথ নামে আর একটি দলের কাছে ৩৬-০ গোলে হেরে যায়। বিজয়ী দলের রাইট আউট জন পেট্রি একাই ১৩টি গোল করেন। ঐদিনেই আর একটা মাঠে ডানডিস হারপ নামে দলটি অ্যাবারডিন রোভার্স দলকে ৩৫—০ গোলে হারিয়ে দেয়।

স্কটিশ কাপ ফাইনাল খেলা দেখবার জন্যে দর্শকদের ভিড়ও হত কম নয়। ১৯২৮ সালে হ্যাম্পডেন পার্কে যে ফাইনাল খেলা হয়েছিল তাতে দর্শক সংখ্যা ছিল ১,১৮,১১৫। এটি তখনকার দিনের বিশ্বরেকর্ড।

• • • •

ছাতা মাথায় দিয়ে ফুটবল খেলার কথা শুনেছেন কখনও? সত্যি একজন খেলোয়াড় বৃষ্টির জন্যে ছাতা মাথায় দিয়ে খেলেছিলেন। অনেকদিন আগেকার কথা। খেলোয়াড়টির নাম চার্লি অ্যাগার সিমথ। এ্যাশটন ভিলা ক্লাবে ফরওয়ার্ড খেলতেন তিনি। নভেম্বর মাসের এক বর্ষণ মুখর দিনে খেলতে নেমে এ্যাগার সিমথ সত্যি ছাতা ব্যবহার করেছিলেন। ছাতা মাথায় দিয়েই দৌড়চ্ছেন, বল কিক করছেন, পাস করছেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। তাঁর এক "সেখো', নিজের দলেরই আর একজন খেলোয়াড়, নাম জন ডেভি, তিনি পরে ছিলেন এক লম্বা রেইন কোট। যে বৃষ্টি আর ফনফনে ঠাণ্ডা, তাই তাঁদের কেউ দোষ ধরেনি। সেই খেলায় বহু খেলোয়াড়কেই হাঁচতে হাঁচতে বা হাতে পায়ে খিল ধরে অকেজো হয়ে পড়তে হয়েছিল।

আজও যা ভুলিনি

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিনের অনেক কথা, অনেক ঘটনাই মনে আসে, যার অধিকাংশই ভুলবার নয়। দিনপঞ্জীর মধ্যে সেগুলি স্থান পায় কিন্তু ছাপার অক্ষরে কোনটিকে স্থান দেওয়া উচিত, কোনটির গুরুত্ব অধিক বা অল্প, তার জন্য বেশ চিন্তায় পড়তে হয়েছে। জীবনে, অনেক ঘটনার স্রোত বেয়ে চলে। নানা কল্পনা, নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। জীবনপথে দেখা দেয় দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশা, সাফল্য, বিফলতা,—এর মধ্যে কোনটিই মানুষের মন থেকে মুছে যায় না। ফেলে আসা দিনগুলি কেউ ভুলতে পারে না।

আমি শিল্পী। শিল্পীর জীবন ঘটনাবহুল। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবির ক্ষেত্র ব্যাপক। জীবনে আমার সুযোগ হয়েছে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ঘুরবার। এরূপ একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত উল্লেখ করি, যা' মনে এখনও আনন্দ সঞ্চার করে।

১৯০৫ সাল, জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বঙ্গভঙ্গ আইনকে বাঙ্গালী সেদিন বানচাল করে দিয়েছিল। প্রবলপ্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকে এই আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। বাংলার স্বদেশী গান দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। সে গানের মর্ম ছিল এক জাতি এক দেশ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস বাংলার ওপর বুঝি বিধাতার অভিশাপ পড়ল। কালের চক্র ঘুরে গেল—১৯০৫ সালের অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। কেন সম্ভব হল, তা রহস্যময়। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি এর পেছনে কাজ করেছিল তাও সকলের অজানিত। ইতিহাসে পড়েছি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—এক দেশ, এক সংস্কৃতি কিন্তু তাদের পার্থক্য কিন্তু পরস্পর বোধগম্য। রাজনীতির স্বার্থে দেশগুলি ক্রমান্বয়ে বিভাগ ও পৃথক হতে শুরু হল। সংকীর্ণতা, জটিলতা, নানা সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শাসন সংস্কার প্রবর্তন হল। এ সবের প্রয়োজন আছে তা' না হলে ইতিহাস একঘেয়ে হয়ে যায়।

১৯২৮ সাল ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীন বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাই বোঝাত। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি এক। সুজলা, সুফলা বাংলার আকাশ বাতাস চিরদিনই গানে মুখর। পার্বত্য দেশ চট্টগ্রাম, পৌরাণিক নাম চট্টল। (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) কি সুদৃশ্য সহর। ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর বাড়িগুলি যেন সাজান ; রাস্তাঘাট সুন্দর। একটি বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বিখ্যাত। সহরের একদিকে কর্ণফুলি নদী বয়ে গিয়ে সাগরে মিশেছে। লোক সংস্কৃতির জন্য স্থানটি বিখ্যাত। তা'ছাড়া পুরাকাল থেকে এ দেশ

ক্লাসিক্যাল সংগীত অনুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কয়েকজন সংগীতসাধকের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ সালে আর্যসংগীত সমিতি স্থাপিত হয়। জন্মাষ্টমীর দিন স্থাপিত হওয়ার জন্য প্রতি বৎসর ঐ সময় বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ১৯২৮ সালে এই বাৎসরিক উৎসবে, আমার পিতা, আমি, তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক পণ্ডিত দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে চিটাগঙ্গ মেলে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সকালে রওনা হলাম। ভট্টাচর্য্য মহাশয়েরা ভ্রাতুষ্পুত্র সমেত আমরা চারজন যাত্রী ছিলাম। তৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা আমাদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। সে সময়ে যাতায়াতের কোন সমস্যা ছিল না বরং বেশ আনন্দদায়ক ছিল। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তীতা ও প্রণালীবদ্ধ কার্যক্রম ছিল। যাত্রাকালীন খাওয়া-দাওয়া, সুখ-সুবিধার দিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে নজর দিতেন। মেল ট্রেন ছুটে চলেছে, বাংলার এ-দিকে এই আমার প্রথম যাত্রা। নানা দৃশ্য, নানা স্টেশন দেখতে দেখতে সময় কেটে যেতে লাগল। সেপ্টেম্বর মাস বর্ষার অব্যবহিত পরেই। গাছপালা সবুজ, পুকুর, খাল জলে ভরা, ধান ভরা মাঠ। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, পূর্ব্ববঙ্গে নদ-নদী আরও বেশী। অনেক কিছু নূতন দেখব, এই উৎসাহ নিয়ে চলেছি। পদ্মার কথা শুনেছি, বর্ষায় আকার ভয়ঙ্কর হয়। মানুষের কত কীর্তি তার অতল গহ্বরে লীন হয়ে গেছে ; সেজন্য পদ্মার অপর নাম কীর্ত্তিনাশা।

দুর্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর মৃদঙ্গ শিক্ষা, সংগতের জন্য বড় বড় ওস্তাদের সংগলাভ এবং তাঁর গুরু মুরারি গুপ্ত মহাশয় সম্পর্কে অনেক কথা বলতে শুরু করলেন। মুরারি গুপ্তের বৈঠকখানা শিক্ষার্থীদের অবারিত দ্বার ছিল, তাঁর নিঃস্বার্থ অকৃপণ শিক্ষাদানের ফলেই বাংলা দেশ বিশেষ করে কলকাতা মৃদঙ্গ চর্চায় সারা ভারতের গৌরব ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংগীত পেশা ছিল না, কিন্তু বাংলার সংগীত ক্ষেত্রে তাঁর একছত্র আধিপত্য ছিল। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী ও উদার চেতা। গুরুর মৃত্যুর পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে বাৎসরিক মুরারি সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিংশতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এই মুরারি সম্মেলন ছিল একটি প্রধান কেন্দ্র যেখানে বাংলার এবং বহিরাগত ওস্তাদগণের পাণ্ডিত্য ও কলাকৌশলের মান নির্দ্ধারিত হত। শুনলাম্ বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী কত ওস্তাদ সম্মেলনে স্বীকৃতি না পেয়ে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে আরও ১০।১২ বছর শিখে ও রেওয়াজ করে যোগ্যতা অর্জন করে আসতেন। অর্থাৎ এই সম্মেলন থেকে pass port না পেলে সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করতেন না। শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বসত বাটির সম্মুখে ও রাস্তা ঘিরে এই সম্মেলন হত। তদানীন্তন বাংলায় ধ্রুপদের মান অতি উচ্চাঙ্গের ছিল এবং বাংলা দেশ ধ্রুপদ চর্চায় সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই সম্মেলনে রাজা, মহারাজা থেকে অতি সাধারণ ও দরিদ্র সংগীত রসিক শ্রোতাদের এক আসন ছিল। তখনকার দিনে প্রায় ১০।১২ হাজার শ্রোতা উপস্থিত হতেন এই সম্মেলনে। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ গুণীগণই যে এই আসর অলঙ্কৃত করতেন তা' নয়, নবীন শিল্পীদেরও উৎসাহ দেওয়া হত। এত জনসমাবেশ কিন্তু পরিবেশ কি সুন্দর এবং শান্ত। কলকাতার বাইরে থেকে যে শিল্পী বা শ্রোতা আসতেন তাদের রাত্রিতে থাকার এবং আহারের বন্দোবস্ত সম্মেলন থেকে হত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুরুভাই ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ স্বেচ্ছাভাবে এই কর্তব্য সমাধা করতেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধি, অন্ধ বিশ্বাস ও দলগত সংস্কার বাংলার সংগীত আসরকে তখন কলংকিত করতে পারে নি। কথাবার্ত্তার মধ্যে অনেক সময় কেটে গেল, বিকেলে গোয়ালন্দঘাট স্টেশনে পৌছলাম এবং স্টীমারে উঠলাম। এই স্টীমার পদ্মার ওপারে চাঁদপুর স্টেশনে পৌছাতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লাগে। স্টীমার ছোটখাটো কয়েকটি স্টেশনে থামল— স্টীমারে কেবিনের সামনের বারান্দায়

আমরা চেয়ার নিয়ে বসলাম্ পদ্মার একুল ওকুল যেন দেখা যায় না। ষ্টীমার ঘাটে ছোট ছোট নৌকায় নানারূপ মিষ্টান্ন, খাবার বিক্রী হচ্ছে। ঢেউ লেগে নৌকাগুলি অসম্ভব ভাবে দুলছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই নৌকানদার যাত্রীদের খাবার বিক্রী করে চলেছে। খাবারদাবার তখন খাঁটি ছিল। Market তখন black হয় নি, ও কথাটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। জলপথে যাত্রা খুবই ভাল লাগল। বিকেলে অনেক যাত্রী আমাদের কেবিনে এসে আলাপ পরিচয় করলেন। রাত্রি ৮টা নাগাদ, আমরা চাঁদপুরে পৌছালাম বালুর চরের ওপর চাঁদপুর ষ্টেশন। সেখান থেকে চট্টগ্রামগামী ট্রেনে উঠ্লাম। যতদূর মনে পড়ে রাত্রি ১০টা নাগাদ ঐ ট্রেন ছাড়ল ; দূরে পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। চাঁদপুর ষ্টেশনে আমরা রাত্রির আহার শেষ করলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, তিনি ফলমূল খেয়ে কাটালেন। চাঁদপুরে ট্রেনে উঠে নিজের আসন পেতে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করলেন। আমার পিতা এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগমনবার্তা ঐ অঞ্চলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কয়েকটি ষ্টেশনে বহু দর্শনাভিলাষীর সমাগম হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অল্প সময়ের মধ্যেই, আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন।

সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম ষ্টেশনে ট্রেন পৌছাল। ষ্টেশনে আর্য্য সংগীত সমিতির শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ এবং সংগীত প্রিয় বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আমরা গাড়ি থেকে নাম্লাম। চট্টগ্রামের তদানীন্তন Income tax officer যতীন্দ্রনাথ শেঠ এবং তাঁর সহধর্মিণী শেফালিকা শেঠ তাঁদের গাড়ি নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে আমাদের আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করি, শেফালিকা শেঠ আমার পিতার একজন কৃতী ছাত্রী ছিলেন এবং সারাজীবন সংগীত অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। সংগীত বিষয়ক একটি পুস্তক লিখে তিনি সুধী-সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। 'বিদ্যাসাগর জীবনী লেখক স্বনামধন্য চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি কন্যা। তাঁর স্বামী যতীন্দ্রনাথ, পাণ্ডিত্যে, সংগীত প্রেমিক হিসেবে, চট্টগ্রামে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর গৃহে আমরা যেরূপ আদর যত্ন ও আনন্দে ছিলাম, তা' কোন্দিনই ভুলবার নয়। এতদ্ব্যতীত সব সময় আমরা একটা সংগীত পরিবেশের মধ্যে ছিলাম। বিশিষ্ট সংগীতবিদ্, লেখক, অধ্যাপক প্রায় তাঁদের বাড়িতে আসতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালির জমিদার রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের গৃহে অবস্থান করলেন। এই জমিদার বাড়ি সংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিখ্যাত গায়ক বাদককে তিনি আদর অভ্যর্থনা করে গৃহে নিয়ে গান বাজনা শুনতেন।

যে বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে আমরা চট্টগ্রামে উপস্থিত হলাম, সেই আর্য্য সঙ্গীত সমিতি তখন সুরেন দাস এবং শ্রীদলাপদ আচার্য্য এই দুইজন সুযোগ্য শিক্ষকের পরিচালনাধীন। এঁদের আমার পিতার একলব্য শিষ্য বলা হত। কারণ তাঁরা আমার পিতার রচিত সংগীত চন্দ্রিকা গ্রন্থ দৃষ্টে সংগীত শিক্ষা করেন। কয়েকবার হয়ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং কিছু উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। আর্য্য সংগীত সমিতি দেখে খুব ভাল লাগল। ক্লাসগুলির সমলাম, দেয়ালে অঙ্কিত সংগীত শাস্ত্র বিষয়ক শ্লোক সুরুচির পরিচায়ক। চারিপাশে ফুলের বাগান। সংগীতের উপযুক্ত পরিবেশ মনে হল। শিক্ষা ও পাঠ্যসূচি প্রণালীবদ্ধ। ৮ই সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের উৎসবে আমরা সকলে উপস্থিত হলাম। অনুষ্ঠানটি দীর্ঘ হলেও, আকর্ষণীয় ছিল। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ধ্রুপদ, খ্যাল এবং যন্ত্র সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে আমরা নিষ্ঠা ও সুশিক্ষার পরিচয় পেলাম। বৈষ্ণবাওয়া রচিত জন্মাষ্টমীর বিষয় বিখ্যাত ধ্রুপদ "এরি অব আনন্দ ভয়োরি, ব্রজমে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লয়ো আজ"—গানটির সঙ্গে উচ্চাঙ্গ ক্লাসিক নৃত্য পরিবেশিত হয়। ধ্রুবপদটির তালের

ছন্দ রক্ষা এবং সেই গানের ভাব মূহার প্রকাশ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়। অভ্যাগত গুণী অতিথিদের সন্তুষ্ট করতে পেরে সমিতির শিক্ষার্থীরা অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হলে ৭ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর বিরাট সংগীত আসরের আয়োজন হয়েছিল। বহু আসরে গান করেছি কিন্তু এত বিপুল জনতা অতি অল্পই দেখেছি। শুনলাম চট্টগ্রামের আসপাশের ৪০।৬০ মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে শ্রোতৃবর্গের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের শোনার আগ্রহ, আমাদের মুগ্ধ করেছিল। তখনকার সংগীত আসরে দ্রুপদেরই শ্রেষ্ঠ আসন ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ গান শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখত। সকলের অনুরোধে আমি কয়েকটি খ্যাল ও রবীন্দ্র সঙ্গীত ২।১টি গেয়েছিলাম। আমার পিতার গান ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃদঙ্গবাদ্য কত আদরে যে শুনেছি, তা বলে শেষ করা যায় না, কিন্তু গুণীজনের আসরের গান বাজনা ও পরিবেশ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে হয় শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে অন্তরের যোগ ছিল শিল্পীর ভাব সৃষ্টি এবং শ্রোতার রসোপলব্ধি এই দুইয়ের সমন্বয় না ঘটলে কোন শিল্প পরিবেশন সার্থক হয় না। ৭ এবং ৯ তারিখ দুই দিনের আসরেও শ্রোতাদের আকাঙ্খা মিটে নি। ১০ই সেপ্টেম্বর জমিদার শ্রীরোদচন্দ্র রায়ের প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হলঘরে প্রাতঃকালীন সংগীত আসর হয়। সেদিন ঐ অঞ্চলের বাছা বাছা শ্রোতা এবং জমিদারের আত্মীয়বর্গ উপস্থিত ছিলেন। সে দিনের সংগীত আসর হয়েছিল অভূতপূর্ব। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেরই সেই আসর স্মরণীয় হয়ে আছে। ৪ঘণ্টা একাদিক্রমে গান ও বাজনা হয়েছিল। এর মধ্যে কোন বিরাম ছিল না। বিরামের সময় ও ছিল না। শিল্পী, শ্রোতা সকলেই মেতে উঠেছেন। খাওয়া দাওয়া করে কেরা বা বিশ্রামের কথা কেউ ভাবেন নি। আসরের পর দেখা গেল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তের আঙুল কেটে রক্ত ঝরছে। সংগীতের মধ্যে ডুবে ছিলেন, দৈহিক কোন কষ্ট বুঝতে পারেন নি।

রায় বাহাদুরের ম্যানেজার বরোদা প্রবাসী একজন সংগীতজ্ঞ ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। রন্ধনেও তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল, বিশেষ বিশেষ অতিথি এলে, তিনি শুধু রান্নার তত্ত্বাবধান করতেন তা নয় নিজেও এ কাজে হাত দিতেন। সে দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন একবারে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ও হাতে। সে আয়োজন দেখবার মত, থালার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাটি সাজান, মাছ, মাংস, ডিমেরই কত বিভিন্ন প্রকারের রান্না, তা ছাড়া তরিতরকারী নানাবিধ। মোগলাই, বিলাতিখানা, সবেতেই তিনি পটু। সকলে একসঙ্গে খেতে বসা হল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৃথক ব্যবস্থা কারণ তিনি নিরামিষাশী। ম্যানেজার মহাশয় আমার সামনে বসে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। তিনি সকলকে খাইয়ে পরিতৃপ্তি পান। আমি কোনদিনই বেশী খাই না। কিন্তু তাঁর অনুরোধে সেদিন কিছু বেশী খেতে হল। সেদিনের রান্নার item এবং স্বাদ এখনও কিছু ভুলিনি। সেকালে খাওয়া পরার অভাব ছিল না। জিনিসপত্র ছিল অপর্য্যাপ্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। খাওয়া দাওয়ার পর, আমরা সকলের কাছে বিদায় নিলাম। সে দিনের দ্রুপদের আসরে প্রমাণ হয়েছিল, ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠরূপ বাঙ্গালীকে কিরূপ অভিভূত করত। চটুল ধারা সংগীতের সেকালে বাংলাদেশে স্থান ছিল না। সে দিনের সংগীত-সমাজের আদর্শ ছিল মহান্। সংগীতবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিবেশন করতেন, শ্রোতারাও সেরূপ শুনতে অভ্যস্থ ছিলেন এবং সংগীতের সারমর্ম উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন। সংগীত জগতে box office-এর স্থান ছিল না, সংগীতজ্ঞ শিল্পী অধিকাংশই রাজা মহারাজা, জমিদার কর্তৃক প্রতিপালিত হতেন। শিক্ষাদান বা গান শুনিয়ে অর্থ উপার্জনকে তখন হেয় জ্ঞান করা হত। তাঁরা বিদ্যাদান করতেন। বিদ্যা বিক্রয় করতেন না। ১০ই বিকেলে আমরা steam Launchএ কর্ণফুলি নদীতে বেড়াতে গেলাম। মিসেস শেঠ এই ভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন।

আর্য্য সংগীত সমিতির সুরেন দাস, গঙ্গাপদ আচার্য্য, এবং কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছিলেন। steam lunch-এ গান-বাজনা এবং ডিনারে চাদের ব্যবস্থা ছিল। আমরা বঙ্গোপসাগরের মুখ পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরলাম, কারণ আবহাওয়া ভাল না থাকায় নাবিক আর এগিয়ে যেতে রাজি হল না। steam lunch-এ সাগরের মুখ পর্য্যন্ত যাত্রা অতিশয় উপভোগ্য হয়েছিল। ১১ ও ১২ তারিখে আমরা সকালে ও দুপুরে চট্টগ্রামের দ্রষ্টব্য সমূহ দেখলাম, আদিনাথ পাহাড়, চন্দ্রনাথ পাহাড়, চট্টেশ্বরী কালীবাড়ি, বায়তুল্ শোভামিয় দরগা (এখানে খুব পুরাণ মসজিদ আছে), বদরবাটি (কিম্বদন্তী আছে বদর পীর সাহেব চট্টগ্রাম পত্তন করেন তার পূর্বে ঐ যায়গায় নদী ছিল), কক্সবাজার Sanitorium (বঙ্গোপসাগরের তীরে) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত (আদালতে এক হাজার কামরা আছে)

সংগীতে প্রতিভাধর সুরেন দাস বাংলা বিভাগের পর কলিকাতা রেডিও ষ্টেশনের অর্কেস্টা পরিচালক নিযুক্ত হন।

যাঁদের কথা লিখলাম, তাঁদের প্রায় সকলেই গত হয়েছেন। ২।১ জন যাঁরা আছেন তাঁরা বৃদ্ধ অসুস্থ ও রোগশয্যায়। ১১ই চট্টগ্রাম থেকে ফিরলাম। মাত্র ৬।৭ দিনের মধ্যে, কতজনের সহিত পরিচয়, সৌহৃদ্য লাভ করলাম তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের আতিথেয়তা স্নেহ শ্রদ্ধা এখনও মনে আনন্দ সঞ্চয় করে। যেদিন চলে এলাম, মনে হল যেন আপনজনকে ছেড়ে গেলাম। আবার চট্টগ্রাম ষ্টেশন থেকে চাঁদপুর এবং গোয়ালন্দ ঘাট থেকে ধরস্রোতা পদ্মাকে পেছিয়ে রেখে কলকাতার ট্রেনে উঠলাম। এরপর ১৯৩৮ সালের মধ্যে আরও ২বার চট্টগ্রাম গেছলাম; পূর্ববঙ্গের বগুড়া প্রভৃতি স্থানেও কয়েকবার গেছি। কিন্তু প্রথম ১৯২৮ সালের যাত্রার কথা ভুলি নি, আর ভুলিনি কীর্ত্তিনাশা পদ্মাকে।

———

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রত্যেক আড্ডার যেটা জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য তা অনেক আগেই রচনা করে রেখে গেছেন। সে গানটি হ'ল—

"ভালো মানুষ নইরে মোরা, ভালো মানুষ নই,
গুণের মধ্যে ঐ, আমাদের, গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে;
পুঁথির কথা কইনে মোরা, উল্টো কথা কই।
তাই মোদের স্পর্শে
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি
বইলো শনির দৃষ্টি!
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা
রাখিনে ভাই ফলের আশা
আমাদের আর নেই যে গতি ভেসেই চলা বই।"

এই ভেসে চলাই আমাদের নিয়ে চলে আড্ডা থেকে আড্ডান্তরে।

এবার যে আড্ডার কথা বলছি সেটি শুরু হয় সকলেরই ছাত্রবয়সেই। কিন্তু, আমার বেলা তা হয়নি। আমার স্কুল জীবনের আড্ডা শুরু হয়েছিল গোলদিঘির পাড় থেকে, আর শেষ হয়েছিল এসে পান্তির মাঠে। অধিকাংশ ছাত্রই "ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের" সভ্য হবার পর তাদের আড্ডার জীবন শুরু হয়। হোস্টেলে, যোড়িএ, খেলার মাঠে, সেকালে ছাত্রাবাস বেশি না থাকায় 'মেসে'ও থাকতো অনেক ছাত্র। রেলখোস্-কেবিন'ই, সেকালে 'কফি-হাউসের' কাজ করতো, কিন্তু পাড়ীর আঁচলের চিহ্নও দেখা যেত না সেখানে। এই সব ক্ষেত্রেই হোতো ছাত্রদের আড্ডার হাতে খড়ি। রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় ছাত্রদের এই মেসের উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন গ্রন্থেও ছাত্র সতীশ ও সাবিত্রী বৌকে আমরা মেসেই পাই। হোস্টেলে বা ছাত্রাবাসে নয়।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে কোনও ছাত্রী দরখাস্ত দেওয়া হ'ত না। ৭০।৭৫ বছর আগে কলকাতায় ছাত্রী সংখ্যাও ছিল খুব কম। বেথুন কলেজেই তাদের স্থান হ'য়ে যেতো। কিছু সংখ্যক ব্রাহ্ম-ছাত্রী কেশব সেনের ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনেও স্থান পেতেন। মেয়েদের কথা থাক। অনধিকার চর্চা করবোনা। আমাদের "ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের" কথাই বলি। ছাত্রদের আদর্শ আড্ডা ছিল এটি। অবশ্য একমাত্র সৎ বা ভালো ছেলেদেরই নয়, সব রকম ছাত্রই আসতেন এখানে।

যতদূর মনে পড়ে—বোধহয় ইংরিজী ১৯১১ সাল বা তারপর বন্ধুবর শ্যামাপদ বসু (প্রেসিডেন্সী ফার্মাসির যিনি তখন কর্ণধার) এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে ও আগ্রহাতিশয্যে আমি ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সিনিয়র মেম্বারদের তালিকায় নাম লিখিয়েছিলুম। সে হবে প্রায় বছর ৫৭ আগের কথা। আমার বয়স তখন মাত্র ২৩ বছর। যৌবন-তারুণ্যে সারা দেহমন টলমল করছে। কিন্তু ওই বয়সেই পারিবারিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য পাঠশালার পাঠ ছেড়ে দিয়ে আমাকে জীবিকা অর্জনে নিযুক্ত হতে হয়েছিল।

তা ব'লে জীবনটাকে 'পাউণ্ড-শিলিং'এ পরিণত করিনি কোনও দিনই। দেবী ভারতীর বাণীকুঞ্জের আকর্ষণ ছাত্রাবস্থা থেকেই আমাকে সাহিত্যের পথে টেনে নিয়ে চলেছিল। কাব্য সাধনার সঙ্গে নাট্যানুরাগও ছিল আমার প্রবল। এ কথা আগেই বলেছি। ক্লাসে ছেলেদের নামে কবিতা লিখে শাস্তিও পেয়েছি, সমাদরও পেয়েছি।

যখন হিন্দুস্কুলের পুব কোণ ঘেঁষে গোলদীঘির উত্তর পাড়ে মাত্র দুখানি ঘরে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের বাল্যলীলা শুরু হয়েছিল তখন আমরা কিন্তু ছাত্রদের অবসর বিনোদনের এই আড্ডায় যোগ দিইনি। কারণ, আমরা তখন 'আউটবয়'। যদিও আমাদের জানা-শোনা সহপাঠি বন্ধুরা অনেকেই এর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু, আমরা তখন এঁচড়ে পাকা ছেলে। ডিঙি মেরে দাদার বয়সীদের কাঁধ ধরে আড্ডা দিতে শুরু করেছি। কাজেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছেলের দল আর তাদের বাঘাভাল্লুক মাষ্টারদের সঙ্গে তখন ভিড়তে চাইনি।

আগেই বলেছি জন্ম আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের মধ্যে হ'লেও প্রকৃত পক্ষে যৌবন এসেছে আমাদের বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদেই। সুতরাং আমরা কোন শতাব্দীর মানুষ বলতে হ'লে আমাদের 'বিংশ শতাব্দীই' বলতে হবে। কারণ, সাবালক হ'তে হ'তেই আমাদের জন্ম-শতাব্দী অতীত কালের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

আমরা যখন তরুণ কিশোর তখন থেকেই অভিনয় কলার একান্ত অনুরাগী এ খবর আগেই জানিয়েছি। নাট্যমঞ্চের আকর্ষণ আমাদের মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল বলেই, অন্য আকর্ষণ আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে তুলতে পারিনি। ইডনিং ক্লাবের বর্ণনা ইতিপূর্বে সবিস্তারেই করেছি। এই "ইডনিং ক্লাব" যখন ষোলো কলায় উদ্ভাসিত পৌর্ণমাসীর শোভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই সময় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটেরও খুব বোলবোলাও চলেছে। যদিও আজকের তার এই প্রাসাদ তুল্য হর্ম্য তখনও সম্পূর্ণ গড়ে উঠেনি। সেই হিন্দুস্কুলের পুব কোণে একতলার দুটি ছোট ঘরে যে ভবিষ্যতের এক বিরাট বটবৃক্ষের চারা রোপিত হয়েছে অনেকেই তা জানতেন না বা অনুমানও করতে পারেননি। আমরাও এটা আশা করিনি। তাই একটি ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান জেনে 'ইডনিং ক্লাবেই' ঢুকেছিলুম। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটকে আমরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি নিরামিষ 'প্রমোদসঙ্ঘ' বলেই জানতুম। কাজেই আমাদের মতো পাঠশালা থেকে নামকাটানো সেপাই ছেলের দল ওখানে ঢুকতে আগ্রহ বোধ করিনি।

কিন্তু ইনষ্টিটিউটের সমস্ত সাধারণ ছাত্র ও স্নাতকোত্তর ছাত্রের দল মিলে যাকে মাঝে যে নাট্যাভিনয় করতেন, আমরা নাট্যানুরাগীরা তার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে তাঁদের অভিনয় দেখতে যেতুম। কারণ অভিনয় খ্যাতি এঁদের খুবই প্রচারিত হয়েছিল। শুধু অভিনয় কেন; মাঝে মাঝে ইনষ্টিটিউটের পরিচালকরা যে সব প্রাতঃস্মরণীয় দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের অতি মূল্যবান বক্তৃতার আয়োজন করতেন আমরা সর্বকাজ ফেলে সেই সব সভায় নিয়মিত উপস্থিত হতুম। ভালো ভালো লোকের বক্তৃতা শোনবারও আমাদের একটা নেশা ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে এতে খুবই উপকৃত হয়েছি।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের তরুণ সদস্যরা আরও অনেক ভালো কাজ করতেন। যেমন এঁদের নিজস্ব পাঠাগার ও গ্রন্থশালায় বিশ্ব-সাহিত্যের জ্ঞানগর্ভ শ্রেষ্ঠ পুস্তকাদি সংগ্রহ করে রাখা। জিমনেস্টিয়মে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার দ্বারা শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন। রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা, শিল্পকলার প্রদর্শনী, বিবিধ 'ইনডোর' ও 'আউটডোর' স্পোর্টস, সাঁতার, দুঃস্থ ছাত্রদের অর্থ ও পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সাহায্য করা এবং নির্দোষ আমোদ প্রমোদ আয়োজন করে, ছাত্রদের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র নৃত্যগীত অভিনয় প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রচলনের দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎসংগঠকদের সকল দিক থেকে সাংস্কৃতিক উন্নতি ও তাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন।

দেশের যাঁরা শিক্ষার উন্নতিকামী সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা তাঁরা সকলেই প্রায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, স্যার দেবপ্রসাদ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি। সম্পাদকদের মধ্যেও আমরা পেয়েছি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ হীরালাল বসু, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র বসু প্রভৃতি। এঁরা সকলেই নিজগুণে বহুজন প্রিয় হ'তে পেরেছিলেন।

আমরা যারা 'আউট-বয়' অর্থাৎ ছাত্র নই; সবে ছাত্রের খোলসটি ভেঙ্গে তারা মেলেছি, আমরা ছিলাম ইনষ্টিটিউটের নাট্যাভিনয়েরই সমধিক অনুরাগী। কাজেই মেম্বার থাকা-না-থাকা সত্ত্বেও এদের প্রায় সব অভিনয়েই উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলুম। তখনকার দিনে পাড়ার কোনও ক্লাবের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় স্ত্রী ভূমিকায় মেয়েদের মঞ্চে নামাতে পারতেন না একথা আগে একবার বলেছি। ইনষ্টিটিউটের অভিনয়েও ছেলেদেরই মেয়ে সেজে মঞ্চে নামতে হ'ত। কিন্তু এমন দক্ষতার সঙ্গে ছেলেরা এই মেয়ে চরিত্র অভিনয় করতো যে সহজে কেউ বুঝতে পারতো না যে এরা স্ত্রীলোক নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই হরি-হর আত্মার মতো পুরুষ ও নারী যে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে এ অভিনয় সেই সত্য প্রমাণ করতো। বিশেষ করে বন্ধুবর কান্তি গুপ্তের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। কি বিলিতী মেমসাহেব অথবা দেশী ভারতীয় মহিলার ভূমিকা—কান্তিভায়া এমন কান্তিময় করে অভিনয় করতো যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের যশস্বিনী অভিনেত্রীরাও প্রতিযোগিতায় তার কাছে পরাস্ত হত। সঙ্গীত সমাজের 'লুটু' আর 'অশ্বিনী' ছাড়া কান্তির জুড়ি আর দেখিনি।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের আড্ডা ভরপুর তরুণ ছাত্রদের আড্ডা বলে যে একেবারে 'শুভ বয়সের গুদোম' একথা বলতে পারলে সুখী হতুম, অবশ্য ইনষ্টিটিউটের মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণ - এমন ছেলেও ছিল যাদের দেখলে মনে হ'ত—এমন ছেলে আর হয়না! কিন্তু কতক্ষণই বা থাকতো তারা ইনষ্টিটিউটে? বাড়িতে চৈকিৎসা দেবার জন্য একবার বুঝি ছুঁয়ে যেত মাত্র! তারপর? তারপর—

"তুমি আমি দুইটাই ভূপাল ইস্যার—"

(৺অমৃতলাল বসুর "অমৃত মদিরা" কাব্য অনুকরণে)

প্রোফেসারদের গুণের আলোচনা ত' হ'ত, দোষের আলোচনাও হ'ত ততোধিক। তবে ছাত্রও অধ্যাপকদের মধ্যে যেন একটা আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গড়ে উঠতো সেকালে। ছাত্রেরা তাদের অনেক প্রিয় অধ্যাপকের বাড়িতেও যাতায়াত করতো, কেউ কেউ যেন তাঁদের পরিবারেরই ছেলে বা আপন জন বনে যেতো। বিশেষতঃ যে অধ্যাপকের ঘরে বিবাহ যোগ্যা কিশোরী কন্যা শশীকলার মতো বেড়ে উঠছে ভালো ছেলেদের আদর ছিল সেখানে বেশি এবং ডাকও পড়তো ঘনঘন।

আমরা তখন সে সৌভাগ্যের চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি। ইনস্টিটিউটের আড্ডা আর অভিনয়েরই সমাধিক অনুরাগী ছিলুম বরাবর। যতদূর মনে পড়ে আমি বোধহয় ইনষ্টিটিউটের প্রথম অভিনয় দেখি আমাদের পাড়ার 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের' রঙ্গমঞ্চে। স্মরণ নেই কী কারণে অভিনয় এবার ইনষ্টিটিউটের হলে না হয়ে এখানে হল। হলের তখন অস্তিত্ব ছিলনা হয়ত। সম্ভবতঃ ইং ১৯০৩ অথবা ১৯০৪ সাল সেটা। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মেতে ওঠবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের "রাজরাণী" নাটকখানি নিয়ে তাঁরা পাদপ্রদীপের সমুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। ৬০।৬৫ বছর আগের কথা কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সঠিক স্মরণ নেই। কিন্তু, কান্তি মুখোপাধ্যায় রাণী সুচিত্রার ভূমিকায় যে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন আজও যেন তা চখের সাম্নে ভাসছে। এখনও কানে বাজছে—

"এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি! প্রভু,
পারিনা শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন।"

শিশির কুমার ভাদুড়ীকে প্রথম অভিনয় করতে দেখি সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট" নাটকের একটি ছোট ভূমিকায়। নামটা মনে পড়ছেনা। কিন্তু সে রাত্রে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপর বাইরে চলে যাওয়ায় এ অঞ্চলের আর কোনো খবর রাখিনি। কিন্তু মন থেকে এঁদের কথা মোছেনি। কলকাতায় ফিরে এসে শুনলুম এঁরা কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের নাট্যরূপ নিয়ে অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ছাত্রমহলে এবং সাধারণ রঙ্গালয়েও যিনি "মাষ্টার মশাই" নামে খ্যাতছিলেন সেই "জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজের" অধ্যাপক মন্মথ বসু মহাশয় এবার অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। কুরুক্ষেত্রের নাট্যরূপও তিনিই দিয়েছিলেন।

এই 'কুরুক্ষেত্র' অভিনয়েই বোধকরি বন্ধুবর কান্তি মুখোপাধ্যায় প্রথম নারী ভূমিকা থেকে অব্যাহতি পেয়ে একেবারে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু, 'মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' অভ্যাস যাবে কোথা? অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ একটু মেয়েলী ভাব উঁকি মারছিল। কিন্তু তা'সত্ত্বেও অভিনয় তিনি ভালই করেছিলেন। শিশির কুমার নেমেছিলেন 'অভিমন্যুর' ভূমিকায়। অপূর্ব সে অভিনয়। সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক যেমন পরবর্ত্তীকালে প্রতিভাবান অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে ছোট্ট একটি ভূমিকা 'বিকর্ণ' অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বাংলার সমস্ত দর্শকদের বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত অভিনেতা নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র এই নাটকেই 'দুর্বাসার' ভূমিকায় প্রথম অবতরণ করেন। ছোট্ট একটি ভূমিকা! কিন্তু বন্ধুবর নরেশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার স্পর্শে "দুর্বাসা" সেদিন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রারম্ভেই অকপটে স্বীকার করেছি যে আমি ছিলুম একটি থিয়েটারের নেশায় মাতালের মতো বুদ! এরপরই ইনষ্টিটিউটে মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের "বুদ্ধদেব" নাটকখানি অভিনীত হল। সাধারণ

রঙ্গালয়ে এ নাটকের অভিনয় দেখে আমাদের পরিচিত কেউ কেউ 'অহিংস' হয়ে উঠে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব মাছ মাংস খেতেন। তবে তাঁর আহারের জন্য বিশেষভাবে কোনো প্রাণী হত্যা করবার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি মৃত পশু পক্ষীর মাংস আহারিকপে গ্রহণ করতেন। এ শোচনীয় ঘটনার কথা সোদরত সকলেই জানেন যে চুন্দের গৃহে অতিথি হয়ে বাসি শূকরের মাংস খাওয়ার ফলেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

এ নাটকে শিশির কুমারকে নায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে দেখি। সে অভিনয় এক কথায় বলা চলে Sublime! অর্থাৎ মহিমান্বিত! নরেশচন্দ্র নেমেছিলেন 'মারে'র ভূমিকায়। ছোট ভূমিকা। নগণ্য বলাও চলে! কিন্তু তাঁর গুণে তা গণ্য হয়ে ওঠে। নরেশচন্দ্রের 'মার' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এরপর ইনস্টিটিউট "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি তখন "ইডনিং ক্লাবের" সহকারী সম্পাদক হ'লেও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র মেম্বর হয়েছি। ইডনিং ক্লাবও ঠিক এই সময় 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইডনিং ক্লাবের 'প্রেসিডেন্ট' স্বয়ং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি নিজে অভিনেতাদের তালিম দিয়ে 'কোরাস' ও 'সোলো' গানগুলির সুর শিখিয়ে দিচ্ছিলেন।

ইনস্টিটিউটও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে জেনে আমি মাঝে মাঝে তাঁদের 'মহড়া' দেখতে যেতুম। সদস্যদের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এখানে গান শেখাতেন বন্ধুবর জ্ঞানপ্রিয় মিত্র। গিয়ে দেখতুম তাঁদের সে কী উৎসাহ ও উত্তেজনা। নবীনদের সে উদ্যম যৌবনের তারুণ্যে সমুজ্জ্বল। বন্ধুবর আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্বের নানা বই ঘেঁটে ইতিহাসের পাতা উল্টে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের যুগোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজন্যবর্গ ও নাগরিকদের অভিবাদন রীতি এবং সেই সঙ্গেই আবার দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের গ্রীক সেনানীর ও গ্রীক রমণীর পোষাক পরিচ্ছদ গ্রীসের সামরিক অভিবাদন প্রথা এবং উষ্ণীষ ও পাদুকার বিশেষত্ব নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

সবরকম ঐতিহাসিক নাটকের কালোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ বাজারের ড্রেসারদের কাছে ভাড়া পাওয়া যায়না। ছবি দেখিয়ে তৈরি করে দেবার অর্ডার দিলে যা চার্জ পড়বে তাতে জমিদারী লাটে উঠে যেতে পারে। ইনস্টিটিউটের তরুণ নাটুকে দল এসব জেনে একটুও দমে গেলনা। লেগে গেল তারা নিজেরাই বোর্ড কেটে রাংতা মুড়ে গ্রীকদের চর্ম ও হেল্‌মেট বানাতে মহা উৎসাহে। কালোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ পরে তদানিন্তন প্রচলিত আদব কায়দায় দুরস্ত হয়ে কোনও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় এই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আড্ডাধারী ছেলেরাই প্রথম প্রবর্তন করলেন রঙ্গমঞ্চে।

বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়গুলি এদিকে মোটেই দৃষ্টি দিতেন না। মনে আছে আমার, একবার নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যখানি মহাকবি গিরিশচন্দ্র নাটকাকারে রূপান্তরিত করে অভিনয় করেন। আমার বয়স তখন কৈশোর সীমার মধ্যেই, তবু 'দাঁড়াবে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন! সকিল মোহনলাল নিকট শমন!' মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল! সেই অপরিণত বয়সেই "পলাশীর যুদ্ধ" নাটকাকারে অভিনয় দেখবার সময় আজও বেশ মনে পড়ে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের ভূমিকায় স্বয়ং নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন একজন যাত্রাদলের সেনাপতির ভেলভেট, মখমল আর সস্তা চুমকির কাজকরা পোষাকে। মাথায় সেই পালক লাগানো ভেলভেটের টুপি। পায়ে জরীর জুতো পরা!

কোন নাটকের কোন্ ভূমিকায় কোন্ অভিনেতা কী পোষাক পরে নেবেছেন সেদিনের দর্শকরা তা গ্রাহ্যও করতেন না। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের পশ্চাতে কী 'সীন' বা দৃশ্যপট খোলানো আছে সেদিকেও তাঁরা দৃষ্টি দিতেন না, তাঁরা শুনতেন 'এ্যাক্টিং'! মুগ্ধ হয়েই শুনতেন। দেখতেন চরিত্রোপযোগী ভূমিকায় অভিনেতা ঠিক যথাযথ মনের সূক্ষ্মভাবগুলি প্রকাশ করতে পারছেন কিনা? শুনতেন অভিনেতার কণ্ঠস্বর তার মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক উচ্চ গ্রামে ও নিম্নগ্রামে ওঠানামা করছে কিনা?

দর্শকদের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সচেতনতা এনে দিয়েছিলেন বন্ধুবর সুনীতিকুমারই প্রথম—রঙ্গমঞ্চে কালোচিত পোষাক পরিচ্ছদের প্রবর্তন করে। বলাবাহুল্য যে ইন্‌স্টিটিউটের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ের জয় জয়াকার পড়ে গেল চারিদিকে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 'চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে। নরেশের 'কাত্যায়ন'ও কেউ ভুলবেনা। একটা খবর দিই, অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ে চাণক্যের ভূমিকায় নরেশচন্দ্রই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এরপর আরও বহু নাটকই ইন্‌স্টিটিউটে অভিনীত হয়েছে যেমন 'জনা' 'অশোক' (গিরিশচন্দ্রের, ক্ষীরোদ প্রসাদের নয়) শিশির কুমারের সহোদর সুদর্শন নট বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন এই নাটকেই এক সৈনিকের ভূমিকায়। সেই ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয়েই তিনি সকলের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

'রাজা ও রাণী' মঞ্চস্থ করার বহুকাল পরে এঁরা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেও চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের পরবর্তী দুখানি নাটক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঞ্জাবতী' ও 'ভীষ্ম' দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়নি। "ইন্‌স্টিটিউটে আমি শিশিরের শেষ অভিনয় দেখি ক্ষীরোদ প্রসাদের "রঘুবীর" নাটকের নাম ভূমিকায়। সে অপূর্ব অভিনয় যাঁরা দেখেছেন জীবনে কখনো ভুলবেন না। রঘুবীরের যে ছুটি রূপ ব্রাহ্মণ-শিষ্য শান্ত নম্র বীর রঘুবীর, প্রশান্ত হৃদয়, ধৈর্য ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি! আবার এই মানুষই শয়তান ভাস্করের বারংবার অমানুষিক অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে যখন আরণ্যক ভীল সর্দারের সংহার মূর্তি ধরলেন সে অভিনয়ের তুলনা মেলেনা! একা শিশিরকুমারেই তা সম্ভব।

শিশির কুমার যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করে ইন্‌স্টিটিউটের আরও অনেকগুলি বন্ধু ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক, যেমন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারানাথ ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, রবি রায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ফণেন রায়, শৈলেন চৌধুরী, সুশীল মজুমদার, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি শিল্পীর দল। নাট্যশালার ইতিহাসে এঁরা অমর হয়ে থাকবেন।

অভিনয়াসক্ত মানুষ আমি, তাই ইন্‌স্টিটিউটের আড্ডার কথা বলতে বসে কেবলই তাদের নাট্যাভিনয় নিয়েই বকেছি। কিন্তু নাট্যাভিনয় ছাড়াও বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইন্‌স্টিটিউটের অন্যান্য দানের কথা না বললে এ ছবি নিতান্ত একপেশে হয়ে থাকবে। শিল্প-বিজ্ঞানে যাকে বলে "Profile-Drawing"! অতএব আমাদের যৌবনের এই সাংস্কৃতিক আড্ডাটির আরও কিছু কেরামতির কথাও বলা চাই।

মানুষ 'ভূমিকম্প' 'অগ্নুৎপাত' বা প্লাবনের কথা অনেককাল মনে রাখে। কারণ সেই বিপদের ফলে বহুলোকের সর্বনাশ হয়ে যায়। কিন্তু, আনন্দের কথা, প্রীতির স্মৃতি, উৎসব রাত্রের চিত্তবিনোদনের সরণীয় ঘটনা তাদের বেশিদিন স্মরণ থাকে না। ফুলশয্যার রাত্রের কথা—সেই প্রথম প্রিয়-মিলন-যামিনীর মিষ্ট সুরভিত শয়নে ছুটি তরুণ হিয়ার দুরু দুরু কম্পন কজন বৃদ্ধের মনে আজও রোমাঞ্চ তোলে? তোলেনা। বরং মনে করিয়ে দিলে লজ্জা পায়।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট যে কেবলমাত্র যৌবন জলতরঙ্গে ভাসমান তরুণদেরই আড্ডাখানা ছিলনা সেটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি। ইন্‌স্টিটিউট মধ্যে মধ্যে নানা শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সভা সমিতির আয়োজন করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা অভিভাবকদের কড়া শাসন থেকে মুক্তি-পাবার পর থেকেই ইন্‌স্টিটিউটের সাংস্কৃতিক অধিবেশন গুলিতেও যোগদিতে আরম্ভ করি। এরফলে আমরা কত যে দেশ বরেণ্য মহাপুরুষদের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্যলাভ করি একথা মনে হ'লে আজও অন্তর তাঁদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কত যে স্মরণীয় মানুষদের দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছিলাম এখনও তা মনে হলে সৌভাগ্য গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বুকটা। তালিকা দিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে উঠবে। শুধু বলি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন এখানেই পাই এবং তাঁর অমৃতকণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য এই ইন্‌স্টিটিউটের কল্যাণেই পেয়েছিলুম একথা কোনও দিন ভুলবোনা। আর একটি মানুষের কথা আমার আমরণ স্মরণ থাকবে। তিনি ইন্‌স্টিটিউটের তদানিন্তন 'সম্পাদক' অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। এই দেবতুল্য মানুষটির পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে বহু ছাত্রই সেদিন বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাঁর মেছুয়া বাজারের বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতুম তাঁর পুণ্য চরিত্রের স্পর্শে মনটাকে বলিষ্ঠ করে তোলবার জন্য। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের তুলনা মেলেনা।　　(ক্রমশঃ)

•

•　　•　　•　　•

"বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার। কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাহা ও তাহী আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কি দেখলাম

নাট্যকার মন্মথ রায়

সোভিয়েটল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারের একটি অঙ্গ ছিল সোভিয়েত দেশ দর্শনের নিমন্ত্রণ। সেই সুযোগে তিন সপ্তাহ সোভিয়েত দেশে কাটিয়ে এলাম। সমাদরের অন্ত ছিল না, বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। দেখেছি আর মনে হয়েছে, মানুষ যদি সঙ্কল্প করে, কী অসাধ্যই না সাধন করতে পারে, এবং তা কত অল্প সময়ে। ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম বিশ বৎসর গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন ধ্বংসস্তূপের ওপর পুনর্গঠন কার্যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায় নি। বিশ্বের এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক মহারাষ্ট্রটি মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন-সাফল্য অর্জন করেছে আজ তা বিশ্বের বিস্ময়। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ব্যাপী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আজ খাওয়া পরার ভাবনা নেই, বেকারি নেই, গৃহসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানও সুদূরবর্তী নয়। এই বিরাট দেশটির সর্বত্রই বিনামূল্যে চিকিৎসার, ব্যবস্থা—গৃহে এবং প্রয়োজন হলে হাসপাতালে। শিক্ষা সর্বত্রই অবৈতনিক, প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই বিশাল দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্বাসিত। কি কৃষক, কি শ্রমিক মাসিক বেতনে কাজ করে, বোনাস পায়, স্বাস্থ্যনিবাসে সবেতন ছুটি উপভোগের সুযোগ পায়। ৫৫ বৎসর বয়স হলেই মেয়েরা এবং ৬০ বৎসর বয়স হলেই পুরুষেরা পেন্সন পায়—তাদের বেতন থেকে কেটে নিয়ে এ পেন্সন দেওয়া হয় না—পেন্সনের টাকাটা দেন হয় রাষ্ট্র, নতুবা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের সর্বত্র শিশু ও মাতৃ মঙ্গলের সুব্যবস্থা। সোভিয়েত দেশে আজ আর কোন রাজা নেই, রাজার খাতির পায় শুধু শিশুরা। তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও আনন্দবিধানের জন্য সর্বোচ্চ বিধি ব্যবস্থা। অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা কর্মক্ষেত্রে হালকা কাজের সুযোগ পান, প্রসবের পূর্বে দুই মাস এবং পরে দুইমাস সবেতন ছুটি পান। পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি লোক সংখ্যা চীনে; তারপর ভারতে, তার পরেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ২৩৪ মিলিয়ন, তার মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন স্ত্রীলোক। নারী এবং পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। শিশু ও মাতৃমঙ্গলের বহর দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে সোভিয়েত দেশের ভয় নেই, বরং আগ্রহ আছে। খাদ্যের অভাব নেই, ভূমিও বিস্তর। কাজেই অন্য বহুবিধ পরিকল্পনা থাকলেও সোভিয়েত দেশে পরিবার পরিকল্পনা নেই। কৃষক ও শ্রমিক সপ্তাহে কাজ করে পাঁচ দিন এবং সবেতন ছুটি ভোগ করে দুদিন। দৈনিক কাজের পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই সাতঘণ্টার বেশি নয়—কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাঁচ ঘণ্টাও আছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে, ষ্ট্রাইক নেই, লকআউট নেই। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। মসজিদ ও গীর্জায় বদনয়নারীকে উপাসনা করতে দেখেছি। গঠনতন্ত্রে এ বিষয়ে কোন বাধা নেই; ঈশ্বর নেই, এ মত প্রচারেও কোন বাধা নেই; রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষমতাই জনগণের হস্তে ন্যস্ত—শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব মূলক 'সোভিয়েত'

প্রতিষ্ঠানগুলির গোপনীয় ব্যালট ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই পরিচালিত হয় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সমাজ ব্যবস্থা। ১৫টি সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতাও রয়েছে তাদের।

এই সব তথ্য সোভিয়েত দেশে না গিয়েও অনায়াসে জানা যায়। জানেনও অনেকেই। কিন্তু যে জিনিষটা স্বচক্ষে দ্রষ্টব্য, সেটা হচ্ছে ক্রমাগত সম্পদ সৃষ্টি করে সমাজিগত সামাজিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সোভিয়েত নরনারীর দুনিবার সংগ্রাম ও অপরাজেয় সাধনা। সর্বাত্মক ক্রমোন্নয়নের জন্য অনলস অক্লান্ত প্রচেষ্টা। শুধু খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র্য দূর করেই সোভিয়েট নরনারী তৃপ্ত নয়, জ্ঞানে ও সংস্কৃতিতে, এবং সামরিক শক্তিতে অদ্বিতীয় এবং অপরাজেয় হবার অপ্রতিরোধ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সুশৃঙ্খল দুনিবার কর্মোদ্যমের চিহ্ন সর্বত্র। ফলশ্রুতিও বিস্ময়কর।

আর যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি তা হচ্ছে সোভিয়েত দেশের নগর ও পল্লী গঠনে অপরিসীম কৃতিত্ব। সব প্রয়োজনই মেটানো হয়েছে, সব সুখ সুবিধারই সুব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু, তা অতিরিক্ত হয়েছে সৌন্দর্যে। কি রাজপথে, কি গৃহে এই সৌন্দর্যের আরতি সুপ্রকাশ। শুধু নগরে নয়, পল্লী অঞ্চলেও। মানুষ আর প্রকৃতি যেন হাত ধরাধরি করে গিয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টির মহোৎসবে। সোভিয়েট দেশকে 'রেড' বলে চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু তাকে 'গ্রীন' বললেও অত্যুক্তি হবে না। সোভিয়েট দেশে তরুলতা প্রীতি সর্বত্র প্রতিভাসিত। সর্বত্র সবুজের জয়যাত্রা। এ যেন 'যৌবনে দাও রাজটীকা'।

বলা হয় Not by bread alone. সোভিয়েত দেশেও তাই। জীবিকা সমস্যা, গৃহ সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চমকপ্রদ অগ্রগতি সোভিয়েত দেশে লক্ষ্যনীয়। বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। সমগ্র দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্বাসিত হয়েছে আগেই বলেছি। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিও সুবিদিত। ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক-এর মহাকাশ পরিক্রমা এবং ১৯৬১ সালে গ্যাগারিন ও টিটভের মহাকাশে জয়যাত্রা মানুষের শক্তি ও কীর্তিকে গগনস্পর্শী করেছে। এবং এ জয়যাত্রা আজও অব্যাহত। গত ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত দেশে শতাধিক ভাষায় ১৩০০ মিলিয়ন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এটা পৃথিবীর রেকর্ড। সাত হাজারেরও বেশি সংবাদপত্র এবং কয়েকশো চার হাজার সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রাভদা, ইজভেস্টিয়া এবং ট্রুড সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীর হিসাবে প্রাভদা মুদ্রিত হয় ১০ লক্ষ কপি, ইজভেস্টিয়া ৮৪ লক্ষ, সেলস্কায়া জিজন্ (Selskyh Zhizn) ৬৭ লক্ষ। আরো রয়েছে অগণিত পত্র পত্রিকা। কোন পত্র পত্রিকার মালিকই ব্যক্তি বিশেষ নয়, মালিক হয় রাষ্ট্র নতুবা জনপ্রতিষ্ঠান। প্রতি সোভিয়েত পরিবার গড়ে চারটি সংবাদপত্র ও পত্রিকার গ্রাহক। 'working woman' নামক একটি মাহিলা পত্রিকার প্রচারই দশমিলিয়ন কপি। 'krokodile' অর্থাৎ 'কুমীর' নামক একটি রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা চার মিলিয়নের বেশি।

সোভিয়েত নরনারী বিদেশে 'বাঙ্কুসে' পাঠকরূপে কীর্তিত। সমগ্র সোভিয়েত দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা তিনলক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশি। গ্রন্থ ও পত্রিকা সংখ্যা ২০০০ মিলিয়ন। বই ধার নেয় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়তে বা সেখান থেকে বই ধার নিতে কোন ব্যয় নেই। সবই বিনামূল্যে।

এবার সঙ্গীত নৃত্য নাটক সিনেমা রেডিয়ো ও টেলিভিশন সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

সমগ্র সোভিয়েত দেশে পাঁচশ পেশাদারি থিয়েটার পঁয়তাল্লিশটি ভাষায় অভিনয় করে চলেছে। প্রতিবছর এই থিয়েটারগুলির দর্শক সংখ্যা গড়ে একশ মিলিয়নেরও বেশি। 'এসকিলাস' 'সফোক্লিস' 'ইউরিপিডিস' এর নাটকও যেমন চলে, তেমনি চলে সেক্সপিয়র শিলার গেয়ভে ও গর্কির নাটক। তা ছাড়া বার্ণাড শ, ব্রেক্ট, ভিক্টিলিয়ো প্রভৃতি আধুনিক বিদেশী নাট্যকারদের অবদানও অভিনীত হয়। সোভিয়েত ব্যালেও অপেরার জন্য মস্কোর বলসই থিয়েটার, লেনিনগ্রাডের কিরভ থিয়েটার এবং নাটকের জন্য মস্কোর মালী থিয়েটর এবং আর্টথিয়েটার জগদ্বিখ্যাত। তাছাড়া মস্কোর ভাকানভ থিয়েটার লেনিনগ্রাডের পুসকিন থিয়েটার কিভের ক্র্যাসো থিয়েটারও সুবিখ্যাত। সোভিয়েত দেশে এ্যামেচার আর্ট গ্রুপ অর্থাৎ সৌখিন সাংস্কৃতিক সংস্থা অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমেচার নাট্য সঙ্গীত ও নৃত্য সংস্থাগুলির সংখ্যা অগণ্য। সভাসমিতিতে, ক্লাবগুলিতে, শিক্ষায়তন সমূহে, আপিসগুলিতে এবং সৈন্য ব্যারাক—প্রায় সর্বত্রই এদের আনন্দধারা পরিবেশিত হয়। এ্যামেচার দল হলেও এদের কৃতিত্ব বহু ক্ষেত্রে পেশাদারদেরও তাক লাগিয়ে দেয়। পিপল্‌স থিয়েটার অর্থাৎ গণনাট্য সংঘগুলি নিয়মিত অভিনয় করে। এরা অবশ্য ত্রিশ থেকে ষাট কোপেক দর্শনী নেয়, এদের প্রযোজনার ব্যয় নির্বাহের জন্য। এরূপ গণনাট্য সংস্থার সংখ্যা ১৯৬৬ সালে ছিল নয়শত।

এবার সিনেমায় আসা যাক্। সাম্প্রতিক একটি বিশ্বসমীক্ষায় সর্বদেশের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ বারোটি ফিল্মের মধ্যে সোভিয়েত দেশের ফিল্ম স্থান পেয়েছে তিনটি। এই সেনট্রিনের 'ব্যাটেলসিপ পোটেমকিন,' পুডোভকিনের 'মাদার' এবং ভোডবেথোর 'দি ল্যাণ্ড'। এই সমীক্ষায় ব্যাটেলসিপ পোটেমকিন সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই অসামান্য ঐতিহ্য বহনকারী সোভিয়েত ফিল্ম নবনব পরীক্ষা নিরিক্ষায় নিরত। গত ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত দেশের একচল্লিশটি ফিল্ম ষ্টুডিয়ো ১৫৮টি পূর্ণদৈর্ঘ চিত্র এবং নয়শচুরাশিটি স্বল্পায়তন চিত্র নির্মাণ করে। পৃথিবীর ষাটটি দেশে সোভিয়েত ফিল্ম প্রদর্শিত হয় এবং জনপ্রিয়ও হয়েছে। ১৯৬৬ সালে একলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সিনেমা প্রজেক্টর চিত্রগৃহে, সংস্কৃতিভবনসমূহে এবং চিত্তবিনোদন আসরে সিনেমা দেখিয়েছে। বছরে গড়ে চল্লিশ হাজার মিলিয়ন দর্শক সিনেমা দেখে। সোভিয়েত দেশে সার্কাসও খুব জনপ্রিয়। স্থায়ী সার্কাসের সংখ্যা পঞ্চাশ, ভ্রাম্যমান সার্কাসের সংখ্যা পনেরো। দর্শকের সংখ্যা বছরে কুড়ি মিলিয়ন। সোভিয়েত সার্কাস বিদেশেও সবিশেষ জনপ্রিয়। সোভিয়েত রেডিয়োর অগ্রগতিও চমকপ্রদ। দেশের পঁয়ষট্টিটি ভাষাভাষীর জন্যই রেডিয়ো প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়—'রেডিয়ো মস্কো। বিদেশে প্রচারের জন্যও বিদেশী চুয়াত্তরটি ভাষায় প্রোগ্রাম পরিবেশন করে। সোভিয়েত বেতারের শ্রাব্যতা ইউরোপে সর্বোচ্চ এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয়স্থানের অধিকারী। টেলিভিশনেও সোভিয়েত অগ্রগতি অসামান্য। ১৯৫০ সালে রিলে ব্যবস্থা সমন্বিত টেলিভিশন কেন্দ্র ছিল দুইটি। ১৯৬৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় সাতশত চল্লিশ এবং টেলিভিশন সেটের সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশ মিলিয়ন। টেলিভিসনের দর্শক সংখ্যা দাঁড়ায় একশত পনেরো মিলিয়ন। মহাকাশ থেকে টেলিভিসন বাণীচিত্র প্রচারের কীর্তি অর্জন করে সর্বপ্রথম সোভিয়েত দেশই।

সোভিয়েত দেশে ব্যায়ামচর্চার গুরুত্ব যে কতখানি তা বোঝা যায় একটি আবশ্যিক ব্যবস্থা থেকে। প্রায় প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও আপিসে প্রত্যহ বেলা ১১টা ও বেলা ২টায় পাঁচ মিনিট ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এই ব্যায়াম পরিচালিত হয় মস্কো রেডিয়ো থেকে সমগ্র সোভিয়েত দেশে ব্যায়াম বিশেষজ্ঞদের নির্দেশমতো। কর্মরত বিশ মিলিয়ন শ্রমিক এই স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম চর্চায় যোগদান করে। বিভিন্ন

খেলাধূলায় যোগদানকারী সোভিয়েত নরনারীর সংখ্যা ছয়চল্লিশ মিলিয়ন। সমগ্র দেশে ১৯৬৬ সালে ছিল ২৭০০ বৃহৎ এবং আধুনিক ষ্টেডিয়াম ৯৪,২৬০০ ফুটবল ক্রীড়াক্ষেত্র, ২৬,২০০ স্পোর্টস ক্ষেত্র, ২১,০০০ জিমনেসিয়াম, ৪০০টি সন্তরণ জলাধার এবং ৩৬১,০০০ টেনিস ভলিবল বাস্কেটবল ক্রীড়াঙ্গন। কর্তৃপক্ষ এই সংখ্যাগুলিও ক্রম বিবেচনা করেন। সমগ্রদেশে ১,২৪০,০০০ অবৈতনিক স্পোর্টস শিক্ষক অবসরকালে স্পোর্টস শিক্ষনের কাজে নিযুক্ত, তাছাড়া পেশাদার শিক্ষকরা তো আছেনই। ফলশ্রুতিও অসাধারণ। ১৯৬৪ সালে বিশ্বের এবং ইউরোপের ৯১টি স্পোর্টস রেকর্ড স্থাপন করে সোভিয়েত দেশ। এই রেকর্ড পরে আরো বেড়ে গেছে। আজ সোভিয়েত ক্রীড়া-কুশলীরা ৩৫টি স্পোর্টের জগজ্জয়ী চ্যাম্পিয়ন। অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও সোভিয়েট ক্রীড়া কুশলীরা অর্জন করেছে ২৭৯ সোনার ২৩৪টি রূপার এবং ২০৪টি ব্রঞ্জের মেডেল। তা ছাড়া, কে না জানে, মহাকাশেও সোভিয়েত শক্তি অপরাজেয়।

আজ সর্বক্ষেত্রেই সোভিয়েত অগ্রগতি বিশ্বের বিস্ময়। এই বিষয়টির পরিসংখ্যান ভাগ সংগ্রহ করেছে সরকারী রিপোর্ট থেকে, কিন্তু ঐ দেশটা, ঐ লোকগুলি স্বচক্ষে না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হত অনেক কিছু। কিন্তু আজ আমার আর সে অবকাশ নেই।

১৯১৭ সালের মহান বিপ্লবোত্তর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশব্যাপী সোভিয়েত কৃষকে এই বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি। দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিক জনসাধারণ। অন্যকোন মালিক নেই। সমগ্রজমির মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় খামারে চাষ হয়, আর চাষ হয় সমবায়িক পদ্ধতিতে পরিচালিত যৌথ খামারে। যৌথ খামারকে চাষের জন্য জমি দেন রাষ্ট্র। শুধু জমি দেন না, সর্বপ্রকারে সাহায্যও করেন। কৃষকরা এই রাষ্ট্রীয় অর্থ যৌথ খামারের বেতন কৃষক কর্মী। সোভিয়েত নাগরিকের সীমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তিও রয়েছে। ব্যক্তিগত ঐ সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার এবং তার উত্তরাধিকার স্বত্বও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত। যে কোন সোভিয়েত নাগরিক একটি বাড়ির মালিক হতে পারেন, একটি বাগান করতে পারেন, একটি মটর-গাড়ি কিনতে পারেন, কিন্তু এমন কোন খেত খামার বা কলকারখানার মালিক হতে পারেন না—যাতে করে তিনি শ্রমিক নিয়োগ করে নিজে লাভবান হতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেককেই পূর্ণ পরিশ্রমে নিজের ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে এবং প্রত্যেকেরই অভাব মোচন করার দায়িত্বও রয়েছে সমাজের। ৺কামিনী রায়ের সেই কবিতাটি মনে পড়ে—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' শিল্পের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের এই সর্বাত্মক মালিকানা। লক্ষ্যও ঐ প্রত্যেককে দিতে হবে তার পূর্ণশ্রম, প্রত্যেকেরই হবে অভাব মোচন। বলাবাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক এই নীতি সম্পূর্ণরূপেই অনুসৃত হয়েছে সোভিয়েত দেশে। ধনতান্ত্রিক শোষনের অবসান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বাত্মক সমাজ কল্যাণ। ১৯২০ সালে রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "অধিকাংশ মানুষকে ভলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমৃদ্ধ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে মনে ধিক্কার আসে। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।" রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে কী খুশি হতেন সহজেই অনুমেয়। আমি শুধুমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলাম "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"।

এই প্রথম

[গল্প-ভারতী 'এই প্রথম' এই পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি এবং এতে কাগজের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বেড়েছে। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। যাদের ভেতরে প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যারা একদিন সুনাম ও প্রতিভা লাভ করতে পারবে তাদের রচনা পাঠকদের সামনে ধরে তাদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকলেই এই করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা প্রথম সারিতে স্থান পাবে না কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতে একটু জানিয়েছেন কেন না পাঠকদের এইসব জানার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

হোয়ার ফ্রস্ট

তাপস ঘোষ

ক্লাস নাইনে উঠে অনেক আশার সারেন্স্ নিল বিভূতি. বিভূতিভূষণ যে। পরের বছর ফিজিক্স্ পড়াতে আরম্ভ করলেন হৃষীকেশবাবু - মাঝবয়েসী, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পড়ান ভাল, ছাত্রমহলে যথেষ্ট আছে। এক কথায় কোন "কিন্তু" মেলে না তাঁর মধ্যে। পাঠ্য সম্বন্ধে যেমন কড়া তেমনি গল্পও করেন সময় থাকলে. নানা বিষয়ে। বিবিধ জানবার খবর সরবরাহ করেন। হৃষীকেশবাবু সবার প্রিয়পাত্র। একজন সাধারণ শিক্ষক হয়েও মুখে মুখে তাঁর আলোচনা হয়। কেবল ছাত্রসম্প্রদায়ের নয়, সহকর্মীমহলেও তাঁর খ্যাতি আছে।

হাফ-ইয়ার্লির আর বেশীদিন দেরী নেই, আর একসপ্তাহ পর থেকে গ্রীষ্মের ছুটি, খুলে খুলেই পরীক্ষায় বসতে হবে। শিক্ষকরা মনে মনে ক্লাসে এসে যার যার সিরিয়ভে প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তার থেকেই চতুর ছেলেরা বুঝে নিচ্ছে পাশের Hint-এর আভাসটুকু--কেউ কেউ বুঝবার ভান করছে—বাকীরা ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে চুপচাপ বসে আছে—লাস্ট বেঞ্চ থেকে যথারীতি গুঞ্জন।

হৃষীকেশবাবু ক্লাসে আসতেই সবাই একত্রিত হয়ে ছেঁকে ধরল তাঁকে—কিছু সাজেশান দিতে হবে। মাষ্টারমশাই খানিকটা জল দেখিয়ে হাত নেড়ে এড়াবার চেষ্টা করলেন, "আরে জানতে পারলে আমার চাকরী চলে যাবে। তাছাড়া এভাবে তো আর কাইন্যালে পাশ করতে পারবে না। নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হবে—তোমাদেরও উপকার নেই ভবিষ্যতে।"

শেষে নাছোড়বান্দা ছাত্রদের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে হৃষীকেশবাবু সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

উনি এক একটা কথা বলছেন আর টকাটক খাতায় উঠে যাচ্ছে—মহামূল্যবান তথ্য এক একটি, ছাত্রদের কাছে।...সট নোটস্ কয়েকটা যেমন, সেকেণ্ড পেণ্ডুলাম, মিস্ থার্মোমিটার, তাপবিকীরণ, হোয়ার ফ্রস্ট,—

"কি স্যার? কি স্যার? আমাদের পড়াননি। আউট অফ সিলেবাস। নামই শুনিনি।" চারিদিক থেকে এরকম বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে অসন্তুষ্ট হলেন উনি।

তবুও ঠাণ্ডা মাথায় বললেন। "বেশ তো। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তারপর বইয়ে পড়ে নিও যদি ইন্টারেস্ট থাকে। আর্দ্র বায়ু শীতল হতে হতে যখন তাঁর জলীয় বাষ্প আর বাষ্পাকারে থাকতে পারে না তখন আমরা শিশিরের উৎপত্তি লক্ষ্য করি। কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থায় শিশির বিন্দুর পরিবর্তে একবারেই বায়ুর জলীয় বাষ্প কঠিন বরফ কুচিতে পরিণত হয় তখনই বলা হয় হোয়ার ফ্রস্ট।"

বিভূতি বিস্ময়াবিষ্ট হল—তার চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে বাষ্প থেকে বরফ—জল না হয়েই—; অর্থাৎ ফুলের কুঁড়ি অবস্থাতেই মৃত্যু, পুরোটা না ফুটে—পাপড়ি না মেলেই; কিম্বা প্রভাতের পরমুহূর্তেই সন্ধ্যা দিনের অস্তিত্ব লোপ পেলে যেমন হয়। অথবা পঞ্চাঙ্ক নাটকের শুরুতেই শেষ—পাঁচটি অঙ্কের অভিনয়ের আর অবকাশ নেই। কেমন অদ্ভুত। সত্যি, বিজ্ঞান জগতে সবই সম্ভব।

বিকেলে বাড়ির পথে ফিরে চলেছে বিভূতি। হৃষিকেশবাবুর কথাগুলো তাকে রীতিমত অস্বস্তিতে ফেলেছে আজ। নতুন ফাউন্টেন পেন কেনার পরেই দেখা যায় যদি তার জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে—কালি ঝরছে অনবরত, অব্যবহার্য, তবে কার ভাল লাগে? পুরনো হতে আর কিছুদিন সময় লাগা উচিত। সত্যি হৃষীকেশবাবুর কথাগুলো বেশ গোলমেলে। যাবার সময় উনি বললেন বই-এ দেখে নিতে—বইতে নিশ্চয়ই একই কথা থাকবে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে বিজ্ঞানের ভেতি।

বাড়ি পৌঁছে উপলব্ধি করল বিভূতি—খিদেটা বেশ চনমনিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মিনিট কুড়ি পথ হাঁটার পরিশ্রমের পর সে উপলব্ধিটা আরও দৃঢ় হল। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল বিভূতি—জলখাবারের পরোটা করছে মা আর পাশে পিঁড়ি পেতে বসে আছে শর্বানী।

নিমেষের মধ্যে সরে এসে গামছাটা কাঁধে ফেলে কলতলার দিকে গেল। ভালই হয়েছে তাকে দেখতে পায়নি। দাবানের ফেনা মুখে ঘসতে ঘসতে মনে পড়ল হৃষীকেশবাবুর বাড়ী যেদিন প্রথম গিয়েছিল বছর চারেক আগে। উনি খুব কাছেই থাকেন। শর্বানী তাঁর একমাত্র সন্তান—আদরে বড় হয়েছে। সে তখন পড়ত ক্লাশ থ্রিতে, আর বাবার কাছে ছাত্ররা যখন এসে কথাবার্তা বলত। সে অমনি পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের আলোচনা গলাধঃকরণ করত।

বিভূতির আজও মনে পড়ে, সেদিন একটি শতমলিন ছিটের জামা গায়ে দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল নবছরের শর্বানী—কপালে ধ্যাবড়ানো টিপ, পান খেয়ে মুখের স্থানে স্থানে লালের ছিটে লেগেছে। বিচিত্র মূর্তি দেখে অবজ্ঞায় বলেছিল, "মাস্টার মশাই আছেন? খবর দে।"

"বাবাকে চাই? আচ্ছা।" ভেতরে গিয়েছিল শর্বানী।

আর ভয়ে শিউরে উঠেছিল বিভূতি—এই হৃষীকেশবাবুর মেয়ে? বাড়ীতে কাজ করে ভেবে থাকে তুই তোকারী করল নাক সিঁটকিয়ে। কি হবে এখন? যদি বলে দেয়?

হয়নি অবশ্য কিছুই। তার ঘৃণ্য ব্যবহারের কথা বাপকে বলেনি শর্বানী—কেন কে জানে।

তারপর থেকে বলত, "স্যারকে একটু খবর দেবে?"

শর্বানী সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ওলটাত—"বলব বিভূতিটা জ্বালাতে এসেছে।" বলেই সে দৌড়। বিভূতি বেশ ঘাবড়ে যেত।

তারপর ক্রমশঃ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। শর্বানীও বড় হয়েছে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে

শিখেচ, বিভূতির মায়ের কাছে উল-বোনা শিখতে আসে প্রায়ই, আর বিভূতির বৈকালিক জলযোগে ভাগ বসায়। আগে বিভূতির বরাদ্দ ছিল চারটে পয়োটা, একবাটি ক্ষোল, দুটো জিলিপি—এখন শর্বানী থাকলে আধাআধি ভাগ হয়ে যায়।

আজও বিরক্ত হল বিভূতি। মায়ও যে কি মতি, মাস্টারের মেয়েকে আপ্যায়ন করলেই হয়ে গেল, এমনিতেই তো বোনা শিখিয়ে পরমার্থ করা হচ্ছে। তারপর আবার ভাল করে খাওয়াও রে, আদর যত্ন কর রে—হাজার হোক বিভূতির গুরুকন্যা তো।

আগে কখনো রাগ প্রকাশ করেনি বিভূতি সবার সামনে আজ অনেকটা জেদ নিয়েই খেতে বসল ও।

ঠিক যা ভেবেছে তাই। খাওয়ার ভাগে কম পাত চেটে-পুটে সাফ করে নির্বিকার চিত্তে আরও চাইল মায়ের কাছে। মা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে হাইলেন, "রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিস।"

ব্যাজার হল বিভূতি, "সে জানিনা,—খিদে পেয়েছে। এখনই যেখান থেকে পার দাও।"

অগত্যা মা আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা করতে উঠলেন। সংসারে কর্ত্রী তিনি। হিসেব করে খরচ না করলে মাসের শেষে টানাটানির ভয় আছে। ছেলে কি তা বোঝে?

বিভূতি না তাকিয়েও অনুভব করল শর্বানী তখনও দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, দরজার পাল্লায় ভর দিয়ে, সব শুনেছে। —"তুমি আর বিকেলে এসো না, বুঝলে!"

"কেন? কার অসুখে হয়?"

"আমার। খিদেটা বেড়ে যায়।"

আর চাপতে পারল না শর্বানী, খিল খিল করে হেসে ফেলল। রাগে সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল বিভূতির।

"তুমি একটা কে হে মাহিলা যে তোমায় আপ্যায়ন করতে হবে? চুপচাপ আসবে যাবে, হাসাহাসি বরদাস্ত করা হবে না।"

ওর এতবড় রাগের কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না শর্বানী। তার খিদের উপশম এখনও হয়নি। কিন্তু এত বিপরীত কথা ভেবেও নিজেকে সংবরণ করতে পারল না শর্বানী।

"এতটা বয়সেও মেয়েদের সম্মান দিতে যারা জানে না, তাদের আর কি বলবো?"

এই নিষ্ঠুর অপমানজনক বাক্যোক্তিতে ঠিক হোয়-ফ্রস্টের মতই জমে কঠিন হয়ে গেল বিভূতি। হৃষীকেশবাবুর কথাগুলো সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নিতে যে দ্বিধা ছিল শিক্ষকন্যা শর্বানী যেন তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিল।

নির্ভয়, নিরলস প্রাণে বাষ্প মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হল, প্রকাশ পেল কঠিন শীতল বাধ্যতা। চোখের পলকে যেন বিভূতির কতকগুলো বছরের যৌবন, জীবনের তারুণ্য উপে গেল। বিভূতি যেন ভুলে যাচ্ছে যে, একজন সামান্য ক্লাস টেনের ছাত্র। আর ঐ মেয়েটি-হোকনা কেন সে তার গুরুকন্যা, তার বয়স এখন তের পেরোয়নি।

কিন্তু উত্তাপে কি বরফ গলেনা? তবে? এটাও তো বৈজ্ঞানিক সত্য; কোনক্রমে ফিরে চাইল শর্বানীর দিকে শর্বানীর দুচোখের উষ্ণ অশ্রুধারা বেয়ে নামছে গালের ওপর;—শর্বানীর উত্তাপকে হঠাৎ নিজের খুব কাছে মনে করল বিভূতি।

———

চতুর্বিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গুরুমাদা যেতে বলেছিল। যাচ্ছিলাম তারই কাছে। পথের মাঝখানে পাড়ার ছেলেগুলো ধরে বললো—আপনাকে একবার আসতে হবে আমাদের ক্লাবে।

—তোমাদের ক্লাব হলো কখন থেকে?

—কেন, আপনি জানেন না?

বললাম, না। এতদিন তো বাড়ীর রকে আর পার্কের বেঞ্চিতে আড্ডা মারতে।

একজন বললে, সে আমরা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

আর-একজন বললে, পরিমলবাবু সেই পার্কের মিটিংএ যেদিন আমাদের গালাগালি দিলেন, আমরা তো সবাই রেস্‌পেক্টেব্‌ল্ ফ্যামিলির ছেলে আমাদের ওইরকম করে বলা কি ওঁর উচিত হয়েছিল? আপনিই বলুন।

কি আর বলবো? আমি সব জানি। এই সব ছেলেদের জ্বালায় পাড়ার মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে যেতে পারছিল না। পকেটে টাকা-পয়সা নিয়ে অন্ধকার রাত্রে পথ চলা মানুষের দায় হয়ে উঠেছিল। মারধোর করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেবার ভয়ে ফিরিওলারা পাড়ায় আসা বন্ধ করেছিল।

পরিমলবাবু পাড়ার জে-পি (Justice of Peace)। পার্কে একদিন একটা মিটিং করে এই পরিমলবাবু ছেলেদের ডেকে খুব খানিকটা তড়্‌পে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এরকম করলে তোমাদের সব জেলে ঢুকিয়ে দেবো। দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে। এই কি স্বাধীন দেশের কাজ?

পাড়ার একজন ভদ্রলোক বলেছিলেন, ওদের কোনও কাজ নেই। ওরা বেকার। Idle brain is devil's workshop. কাজকর্ম পেলে আর এরকমটি হবে না।

জে-পি পরিমলবাবু বিদ্বান ব্যক্তি। কোন্ একটি কলেজের অধ্যাপক। খুব ভাল একটি বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকলে সবই হয়। অবাঙালী ছেলেদের দেখুন। তাদের মধ্যে বেকার নেই। বাঙালীর মত তারা চাকরির জন্যে হাঁ করে বসে থাকে না। রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে জিনিস বেচতেও কুণ্ঠিত হয় না। তারপর একদিন ছোট থেকে বড় ব্যবসাদার হয়ে ওঠে। বাঙালী তখন তাকে হিংসে করে। বলে—ব্যাটা টাকার কুমীর।

সুখেন বলেছিল, খুব তো বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিলেন! রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমি তিনদিন বেচতে রাজী আছি। কিন্তু তারও তো কিছু 'ক্যাপিটাল্' দরকার। আপনি দেবেন টাকা?

অবাঙালী বদ্রীপ্রসাদ আমাদেরই পাড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরি করে বাস করছে। কম বয়েসে খুব উন্নতি করেছে ছেলেটা। কলকাতা শহরে তার ছোট বড় অনেক রকমের কারবার। দু-দুটো মোটরকার বাড়ীর দরজায় হরদম দাঁড়িয়ে থাকে। খদ্দর পরে ঘুরে বেড়ায়। গত দুতিন বছর ধরে ইলেক্‌সনে দাঁড়াচ্ছে। মনে-মনে মন্ত্রী হবার সাধ।

সেই বদ্রীপ্রসাদ সেদিন এগিয়ে এসে 'আর্টিস্ অভ্ পিস্' পরিমলবাবুর মুখরক্ষা করেছে। বলেছে, ছেলেদের রোজগারের ব্যবস্থা যতদিন না করে দিতে পারি ততদিন ওদের দিয়ে দেশের কাজ কিছু করিয়ে নেওয়া যাক্।

বদ্রীপ্রসাদের বাড়ীর নীচের তলার মস্ত বড় একটা ঘরে হয়েছে তাদের ক্লাব। দেশের কাজের জন্ত তারা প্রস্তুত হচ্ছে। দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্ত যে তার জীবন উৎসর্গ করেছে সেই বদ্রীপ্রসাদের জন্ত ভোট সংগ্রহ করবে তারা। তারপর যদি কোনোরকমে বদ্রীপ্রসাদকে তারা জিতিয়ে দিতে পারে দেশের মানুষের সব দুঃখ-কষ্ট সে দূর করে দেবে।

আপাততঃ তারা একটু আনন্দ করছে।

স্বাধীন দেশের উপযোগী দেশাত্মবোধক একটি নাটক লিখেছে।

আমাকে যখন ধরে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখলাম সেই নাটকের রিহার্শ্যাল্ চলছে। জন দশ-বারো ছেলের সঙ্গে পাড়ার তিনটি মেয়ে বসে আছে।

সুধাবাবুর মেয়ে মঞ্জরী স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে। উনিশবুড়ি বছরের ডাগর-ডোগর মেয়ে। বাপ খুব গরীব। তাই বদ্রীপ্রসাদ ব্যবস্থা করেছে—প্রত্যেক রিহার্শ্যালের দিন সে পাবে দুটি করে টাকা, আর ষ্টেজের ওপর নাচের দিন পাবে পাঁচ টাকা। বাকি দুটি মেয়ের দু'টাকা করে রোজ।

ছেলেরা এখন শুধু পাচ্ছে এক পেয়ালা করে চা, চারখানি বিস্কুট আর তার সঙ্গে এক-একদিন একটি করে লাড্ডু।

তাই-বা কে দেয় বলুন!

ছেলেরা খুব খুশী।

আমাকে একটি কোরাস্ গান তারা না শুনিয়ে ছাড়লে না।

গানের কথাগুলি এইরকম—

স্বাধীনদেশের মানুষ আমরা বিশ্বের বিস্ময়
সারা পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দেবো সুখ এবং শান্তি কাকে বলে
দেখিয়ে দেবো কেমন করে জীবন যাপন করতে হয়
দেখিয়ে দেবো স্বাধীনতা কেমন করে রক্ষা করতে হয়!
ইত্যাদি ইত্যাদি—

এমনি আরও অনেক-কিছু। অনেক বাক্য, অনেক প্রতিজ্ঞা।

বদ্রীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হলো। সাদা খদ্দরের টুপি, পাঞ্জাবী, ধুতি—এমন-কি পায়ের জুতো-জোড়াটি পর্য্যন্ত সাদা। হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, কেমন?

আমি বোধহয় উল্টো বুঝলাম। তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললাম, বাঃ, সব সাদা।

বদ্রীপ্রসাদ খুশী হলো। বললে, সাদা মানেই তো পবিত্র দাদা। বিন্দুমাত্র কলঙ্কের কালিমা কোথাও নেই। এইটেই আমি পছন্দ করি, এইটিই আমার জীবনের ব্রত।

ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললাম, এরা আনন্দ করছে করুক, এদের রোজগারের ব্যবস্থা কিছু করে দাও।

বদ্রীপ্রসাদকে কিছু বলতে হলো না। আমার পাশের বাড়ীর বন্ধু বললে, তাও উনি করেছেন।

—কি করেছেন?

—স্যার্, ঘোঁৎনা আর লালুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঘোঁৎনা বেশ ভাল রোজগার করছে। রোজ পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা। এ কি চারটিখানি কথা? আমারাও করবো—ইলেকশনের পরে।

খুশী হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে-মনে বললাম, বদ্রীপ্রসাদের জয় হোক্!

আমার বলার প্রয়োজন ছিল না। বদ্রীপ্রসাদেরা কর্মিৎকর্মা ব্যক্তি। জয়ের গৌরব তারা অর্জন করতে জানে।

সেদিন তারই নমুনা দেখলাম শ্যামবাজারের মোড়ে। যে-বাঙালী ছেলেগুলির রোজগারের ব্যবস্থা বদ্রীপ্রসাদ করে দিয়েছে তাদেরই ভেতর একজনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। দেখি আমাদেরই পাড়ার ডাকসাইটে ঘোঁৎনা একগোছা ফাউন্টেন্ পেন নিয়ে বিক্রি করছে।

শুনে এসেছিলাম—বদ্রীপ্রসাদের দয়ায় রোজ সে পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা রোজগার করে! তবু তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, দে আমাকে একটা।

খুব খুশী হয়ে ঘোঁৎনা একটি ফাউন্টেন পেন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—ছ'আনার জাপানী ফাউন্টেন্ পেন আর কারও কাছে পাবেন না।

নেড়েচেড়ে দেখলাম—দেখতে চমৎকার। তার ওপর পেনের গায়ে ছাপমারা রয়েছে—MADE IN JAPAN.

পেনটি দিয়েছিলাম আমার ভাইঝিকে।

তিনদিন পরে পেনটি সে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—এই নিন আপনার পেন।

দেখলাম তার হাতে কাগজে আর পরনের শাড়ীতে কালিতে কালিতে ছয়লাপ্।

গুরুমামার বাড়ী যেতে যেতে ঘোঁৎনাকে কলমটি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, এই নে তোর কলম।

ঘোঁৎনা হাসতে হাসতে সেই ভাঙা কলমটি ফিরিয়ে নিয়ে তার ব্যাগে পুরলে। বললে, ছ'আনায় এর চেয়ে ভাল কলম পাওয়া যায় না।

বললাম্, এটা তো নকল।

ঘোঁৎনা বললে, এ-যুগে সবই নকল দাদা, আসল আর পাবেন কোথায়?

—এ কলম তুই পেলি কোথায়?

—বদ্রীপ্রসাদের দোকান থেকে। মুগাহাটায় ওর মস্ত কারবার আছে।

—তবে যে MADE IN JAPAN ছাপা রয়েছে কলমের গায়ে?

ঘোঁৎনা চুপি-চুপি বললে, কাউকে বলবেন না বদ্রীপ্রসাদের একটা খুব দামী মেশিন আছে আমি

দেখছি। তাতে হরদম ছাপা হচ্ছে 'MADE IN JAPAN' 'MADE IN ENGLAND' 'MADE IN GERMANY.'

বললাম, এবার তুই লোকের কাছে যার খাবি যে ৎনা।

যে ৎনা বললে, তার আগে কলমের কারবার ছেড়ে দিয়ে অন্য কারবার ধরবো। বিলিতি সেন্ট, বিলিতি ওষুধ বিক্রি করবো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পাবি?

—বদরীপ্রসাদ দেবে বলেছে।

বদরীপ্রসাদের চেহারাটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই আপাদমস্তক শ্বেত শুভ্র কলঙ্ক কালিমামুক্ত পবিত্র বদরীপ্রসাদ!

আবার একবার মনে মনে বললাম, তোমার জয় হোক্ বদরীপ্রসাদ!

গুরুমায়ের কাছে আর যাওয়া হলো না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন পাতা

হিন্দুমেলা

বিপিনচন্দ্র পাল

আজিকালি আমরা স্বাদেশিকতা বলিতে কেবল হিন্দুয়ানী বুঝি না। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ-ভাবটা ফুটিয়া উঠে নাই। সেকালের এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির এদেশের উপরে কোনও বিশেষ দাবী-দাওয়া আছে, ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। ইংরাজ যেমন পরদেশী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত লোকেরা এদেশের মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানকেও সেইরূপ পরদেশী বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের বাংলা সাহিত্য ইহার বিশেষ প্রমাণ। সেকথা উপযুক্তরূপার সময় ও শক্তি পাইলে ক্রমে খুলিয়া বলিব। আর এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা লিখিত হয়। সেই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নামের দ্বারাই তাঁহার স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সে সময়ে আদর্শের অনুসরণ একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেও হয়। ইংরাজেরা এদেশে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেন, তাহারই ফলে আমরা বহু শতাব্দীর ঘোর নিদ্রার অবসানে আধুনিক চিন্তা ও কর্ম জগতে জাগিয়া উঠিয়াছি। ইংরাজি শিক্ষার শতপ্রকারের ত্রুটি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আর হিন্দুরাই সর্ব প্রথমে এই নূতন শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হয়েন। মুসলমানেরা বহুদিন পর্য্যন্ত এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের লুপ্ত গৌরবের ও হৃত তক্ত-খানির স্মৃতি বুকে ধরিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত নিজের আত্মমর্য্যাদার অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথম হইতেই ভারতের এই নবজাগরণের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে পারেন নাই; শিক্ষিত হিন্দুদিগের সঙ্গেও সাধারণ স্বদেশাভিমানের ভূমিতে আসিয়া মিলিত হন নাই। এই সকল কারণে আমাদের প্রথম যুগের স্বাদেশিকতা যে হিন্দুত্বের অভিমানকেই আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। এইজন্যই আধুনিক বাংলার প্রথম স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহামেলা নামে অভিহিত না হইয়া হিন্দুমেলা নামে অভিহিত হয়।

যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কাজেও ইহা হিন্দুমেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়, তাহা সকলেই হিন্দুভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর জন-পরিবার পরিপুষ্ট ছিল।

হিন্দুমেলাতে স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত হইত। ব্যায়ামাদি পরীক্ষা হইত, এবং স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত। পণ্য ও ব্যায়াম প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করা হইত এবং যথাযোগ্য মূল্যবান পুরস্কারও দেওয়া হইত। বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসিত। কিন্তু বৎসর ধরিয়া নবগোপালবাবু এবং তাঁহার সহকর্মীরা ইহার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। শহর ঘোষের লেনের আখড়ায় ব্যায়ামচর্চ্চা হইত। তখনও অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক ছোঁড়া বা তরোয়াল খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দুমেলার বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দুমেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল এরূপ মনে পড়ে। ত্রিপুরা জেলার সরাই পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন ধরণের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একটা তাঁত তিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেন্দ্রবাবুর এই নূতন তাঁত হিন্দুমেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সঠিক কহিতে পারি না; কিন্তু এইরূপ শুনিয়াছি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন। তাহা অসম্ভব নহে; কারণ নবগোপাল বাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা নূতন স্বদেশীভাবে একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে এই সময়েই জ্যোতিবাবুরা নন্দী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রবিবারে রবিবারে ধাপার মাঠে শিকার করিতে যাইতেন।

কয়বার এই মেলাটী বসিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। শেষ বারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তার পর হইতেই হিন্দুমেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই মেলাতেই আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। টালায় রাজা রমনচাঁদের বাগানে এই মেলা বসে। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহযোগে কলিকাতার ছাত্রমহলে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন। সে কথা সবিস্তারে আর একদিন কহিব। আমরা কেবল সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষান্ত রহি নাই। স্বদেশের উদ্ধারের জন্য যৌবনসুলভ উৎসাহ ও কল্পনার প্রেরণায় যথাসম্ভব আয়োজন এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এই ভাবের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের 'আখড়ায়' যাইয়া ভর্ত্তি হই। এই সূত্রেই সেবারকার হিন্দুমেলাতেও আগ্রহ সহকারে যোগদান করি। মনে পড়ে যেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই মেলায় উপস্থিত কিন্তু এবারে বোধ হয় তিনি কোন বক্তৃতা করেন নাই। কে কি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই। মনে আছে কেবল মারামারির কথা। আর একরূপ আমা হইতেই এই মারামারি হয় বলিয়া তাহার ইতিহাসটা আমার জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের পরে ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন হয়। বাগানটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালীরাই যে মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা নহে; দু'দশজন ইংরাজ দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ দর্শকদিগের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব ষ্টার জন ষ্ট্রাচি, এই দুইজনের নাম মনে আছে। বক্তৃতাদি ঘরের ভিতরে হইয়াছিল। বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চৌকি লইয়া

ব্যায়াম দেখিবার জন্য বাহিরে যাইয়া এক জায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন ইণ্টেলেক্চুয়াল পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন। ইহারা ইংরাজ কি ইউরোপিয়ান ছিলেন, ঠিক বলিতে পারি না। পুরুষটি অতি রূঢ়ভাবে আমাকে চেয়ারটি ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না, যেমন বসিয়াছিলাম তেমনই বসিয়া রহিলাম। তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাইলেন। আমি তখন উঠিয়া চৌকিখানার সামনের পা দুখানি শক্ত করিয়া ধরিলাম ও নীরবে চেয়ারখানিকে তাঁহার হাতছাড়া করিবার জন্য শরীরের সকল বল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। আমরা দুজনে চেয়ার লইয়া টানাটানি করিতেছি দেখিয়া দুই একটি বাঙ্গালী যুবক আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন সাহেবের হাতে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সাহেব তখন চেয়ারখানি ছাড়িয়া দিয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি আরম্ভ করিলেন। আমি তখন চেয়ারখানি লইয়া জনতার বাহিরে আসিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইলাম। তখন সাহেব-বাঙ্গালীতে পুরাদস্তুর মারামারি সুরু হইয়াছে তারপর পুলিশ আসিয়া হাজির হইল। লাইঙ্গাম নামে একজন ইংরাজ চিৎপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। মারামারি আরম্ভ হইলে সেখানে ছুটিয়া যান। ইহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়াই সাহেবদের পক্ষ অবলম্বন করেন; শুনিয়াছি যথাসাধ্য বাঙ্গালীদিগকে মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করেন। বাঙ্গালীরা তখন লাইঙ্গাম সাহেবকেও শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে কলিকাতার বাঙ্গালী পল্টনের দলে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার হাতে লাইঙ্গাম নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন; শুনিয়াছি তিনি লাইঙ্গামের দুটা হাত ধরিয়া কাঠুরিয়ারা যেমন করাত দিয়া কাঠ চিরে, সেইরূপভাবে একটা আমগাছে ঘষিয়াছিলেন। সামান্য মারামারির জন্য যতটা না হউক, পুলিশ সাহেবের এই লাঞ্ছনার দরুণই পুলিশের হল্লা হয়। হনুমান সিং-এর দল খালি গায়ে লালকোর্তা মারিয়া, কোমরে চাপরাশ বাঁধিয়া বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইল। শত্রুপক্ষের এই নূতন শক্তি সংগ্রহ দেখিয়া বাঙ্গালী যোদ্ধৃবর্গ একটা ইটের চিবির উপর দাঁড়াইলেন, এবং সেই ইট ছুঁড়িয়া পুলিশের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাগানের ফটকের কাছে কোনও ইটপাটকেল ছিল না। ফটকের সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে বাঙ্গালী যোদ্ধাদিগের ব্যূহ। পুলিশেরা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াইটা চলিল। শুনিয়াছি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত নাকি ইহা চলিয়াছিল। শুনিয়াছি বলিতেছি এইজন্য যে আমি এই যুদ্ধের প্রথমেই পুলিশের হাতে বন্দী হই। আমা হইতেই মারামারির সূত্রপাত; মারামারির মূল কারণ চেয়ারখানি আমি হল্লার বাহিরে আসিয়াও প্রাণপণে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একজন পুলিশের জমাদার ও দুইজন কনষ্টেবল একটি যুবকের পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া বেদম মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন। আমার মনে হইল যুবকটি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। আমি অমনি সেই চেয়ার লইয়া যাইয়া সেই জমাদার ও কনেষ্টবলদের আক্রমণ করিলাম। তাহারা তখন সেই যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিল; আর অমনি আরও পাঁচ ছয়জন পুলিশ আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিল। যে যুবকটিকে পুলিশ মারিতেছে দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া গিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম সুন্দরীমোহন নহে। সুন্দরীমোহন তখন অন্যত্র মারামারির বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে ঘেরাও করিয়া মারিতেছে দেখিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া নিজের শরীর দিয়া আমার শরীরকে রক্ষা করিতে গেলেন। তখন পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। এইরূপে আমরা দুজনে সকলের আগে বন্দী হই। আমাদের দুজনকে যখন পুলিশ থানায় লইয়া যায়,

তখনও দলে দলে হনুমান সিংএর দল বদনচাঁদের বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার পরেই লড়াইটা ভাল করিয়া জমাট বাঁধে। কাজেই সকল ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখি নাই। সাইক্লোনের লাহনাও দেখি নাই; বাঙ্গালী যুবকগণের রণনীতিও দেখি নাই। কি করিয়া যে তাহারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অবার্থ সন্ধান ইঁট ছুড়িয়া পুলিশের কটককে কটকের মুখে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দেখি নাই। এ সকল পরে শুনিয়াছি।

এই মারামারির সম্বন্ধে সুরেন্দ্রমোহন এবং আমি ছাড়া আরও দুইজন গ্রেপ্তার হইল। তাহাদের একজন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব; তাঁহার জামাতার সহোদর। ইনি হাওড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক বা ফিজিক্যাল মাষ্টার ছিলেন। শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে আমাদের বিচার হয় শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তখন শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নবগোপাল বাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও আমার বৃত্তি টাকা জরিমানা হয়। সুবিচার হইয়াছিল কিনা সেকথা তুলিতে চাহি না।

• • •

"বাঙালী জাতিকে স্বদেশ প্রেমে ও স্বজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং জাতীয় প্রাণে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চারকল্পে স্বদেশী যুগে বহু জাতীয় সংগীত রচিত ও গীত হইয়াছিল। প্রত্যেক জাতির অভ্যুত্থানে জাতীয় সংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় সংগীতের অবদান অবিস্মরণীয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীতটি এই বিশাল দেশের নরনারীর মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

"Shyamsundar was a patriot of transparent sincerity"—শ্যামসুন্দর সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তিটির মধ্যে সেই লোকোত্তর দেশপ্রেমিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি আভাসিত হয়েছে। সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি—ঋষিতুল্য বললেই হয়। ১৯০৫ সনে যখন শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম, সেই সময়ে এক পত্রে আমি তাঁকে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমার সেই চিঠির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "The Swadeshi movement was not a mere political agitation, it was in fact the advent of the national spirit the like of which was never witnessed before in India. The Bandemataram was not a mere newspaper—it became the trumpet-voice of the surging nation. Among my associates in this paper, Shyamsundar was the most ablest. Nationalism was not a mere creed with him, it was a faith with him, and he stuck to it as passionately as myself." (অর্থাৎ—"স্বদেশী আন্দোলন একটি নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল জাতীয় সত্তার অভ্যুত্থান, ভারতবর্ষে যাহা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। 'বন্দেমাতরম' কেবলমাত্র একখানি সংবাদপত্র ছিল না, ইহা উদ্বেলিত জাতির মুখপত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পত্রিকায় আমার যাঁরা সহযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম লেখক ছিলেন শ্যামসুন্দর। জাতীয়তা তাঁর কাছে একটি মত হিসাবে গৃহীত হয়নি, আমার যেমন, তাঁরও জীবনে তেমনি ইহা ধর্মবিশ্বাসের সামিল হয়ে উঠেছিল।")

শ্যামসুন্দর ছিলেন মনে-প্রাণে একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী। রাজনীতি তাঁর কাছে পণ্যের সামগ্রী ছিল না, ছিল প্রাণের জিনিষ, সর্বস্ব দিয়ে সাধনার জিনিষ। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও অপূর্ব চরিত্র তাঁকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। চরিত্রবান মানুষই প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির প্রধান সম্পদ। দুঃখের বিষয়, তাঁর শেষ জীবনে তাঁর দেশবাসীর উপেক্ষা ও অনাদর তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। দেশসেবার চরম মূল্য তিনি আজীবন দিয়ে গেছেন, এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বীয় মতবাদ ও আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল। সেইজন্যই বোধ হয় মহাত্মা গান্ধী শ্যামসুন্দরের দেশপ্রেমের আন্তরিকতার এমন প্রশংসা করতেন। এমন যে একটি সর্বত্যাগী ও দোষোপম চরিত্রের স্বদেশপ্রেমিক মানুষের নাম ও স্মৃতি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে, এটা বেদনার কথা। অথচ ষাট বছর আগে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠির কাছে এই নামটি ছিল কোটি কোটি ভারতীয়ের মধ্যে মূর্তিমের বিশিষ্টের একজন। গভর্ণমেণ্টের চক্ষে তিনি ছিলেন একজন 'রাজদ্রোহী'। এই রাজদ্রোহীর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবচরিত আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। আমরা তাই আশা করব যে তাঁর শতবার্ষিকীর সময় কোন না কোন স্বদেশভক্ত সাহিত্যিক এই কাজটি সমাধা করবেন। শ্যামসুন্দরকে বাদ দিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কিছুতেই লেখা হতে পারে না।

পাবনা জেলার ভাংরেজা গ্রামে ১৮৬৯ সনের ১২ই জুলাই শ্যামসুন্দরের জন্ম আর কলিকাতায় ১৯৩২ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর লোকান্তর গমন ঘটে। স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের একদা গৃহশিক্ষক ছিলেন শ্যামসুন্দর; সেইজন্য নলিনীরঞ্জন তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন এবং মৃত্যুকালে তিনিই তাঁর চিকিৎসা করেন। একেবারে শেষের দিকে বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে বলেন, "এ সাধারণ অসুখ নয়: হাজারে একটির বেশি লোক এই অসুখে আক্রান্ত হয় কি না সন্দেহ। এই অসুখের নাম 'প্যালেগ্রা'। এ অনাহার-জনিত অসুখ।" শ্যামসুন্দরের মৃত্যুর পর অ্যালবার্ট হলে যে শোকসভার অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে যতদূর স্মরণ হয়, অন্যতম বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার

সুন্দরীমোহন দাস। তিনি সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "শ্যামসুন্দরের মতো দেশভক্ত মানুষ পাশেগ্রা অসুখে মারা যান, এ জাতির পক্ষে সত্যিই কলঙ্কের বিষয়। মো-চেক্সার হওয়ায় ফলে তাঁকে রাজনীতি থেকে একরকম অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বছর যে এমন দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল, আমরা তার খোঁজ রাখিনি।"

ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের অনুশীলন সমিতির আদিপর্বে যাঁরা এর মূল সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন শ্যামসুন্দর তাঁদেরই মধ্যে একজন। বাংলার জাতীয় জাগরণের প্রাণবেদী রচিত হয়েছিল এই অনুশীলন সমিতির উদ্যোগেই, এটা ঐতিহাসিক সত্য। তারপর এলো ১৯০৫—বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে কার্জনী বিধানে বাংলাকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করা হয়। এরই পরিণতি বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন। বাংলার নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে লর্ড কার্জন একে আরো উস্কে দিলেন। সেই উস্কানীতে জাতীয়তার দীপ আরো বেশি জ্বলে উঠল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সেদিন বাংলাদেশে যে চরমপন্থী রাজনীতি আত্মপ্রকাশ করেছিল, উত্তরকালে তার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজ-নীতিতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বিলাতি আদর্শে রাজনীতি চর্চার দিন শেষ হয়ে এলো। কার্জনী অত্যাচারের পথ দিয়ে এল নূতন ভাবের প্রবাহ যা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চলেছিল। সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে যে কয়জন চরমপন্থী দেশনেতাকে দেখা গিয়েছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশজননী তিন মুখে জাতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর এক মুখ ছিল 'সন্ধ্যা', আর দুটি মুখ ছিল 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্'। 'সন্ধ্যা'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ১৯০৫-এর জুন মাসে এই কাগজ প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যার আসরে যে ঐকতান বাদন—সে ঐকতানের মধ্যে শ্যামসুন্দরের কণ্ঠস্বর শোনা যেত। তারপর ১৯০৬ সনের আগস্ট মাসে রণভেরী বাজিয়ে এল 'বন্দেমাতরম্'। এই 'বন্দেমাতরম' সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর মধ্যে শ্যামসুন্দর ছিলেন একজন।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্যামসুন্দরের সাংবাদিক প্রতিভা এক নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল যার পরিণতি দেখা গিয়েছিল পনর বছর পরে তাঁর নিজস্ব 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায়। শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ-কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলা দেশে আসবার অল্পকাল পরেই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার আবির্ভাব হয়। দৈনিক সংবাদপত্র রূপেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ৬ই আগষ্ট, ১৯০৬ এবং অল্পদিনের মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পায় যে ১৯০৭ সনের ২রা জুন এর একটি সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক উভয় সংস্করণের বন্দেমাতরমের সম্পাদকীয় গোষ্ঠী একই ছিলেন—বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সম্পাদকীয় লেখবার দায়িত্ব ছিল প্রথম তিন জনের উপর। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম জীবনীকার কে. আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর Sri Aurobindo গ্রন্থে লিখেছেন :

"Some of these editorial articles and other snappy items like satiric compositions and paradoxes were the work of Shyam Sunder Chakravarty, not of Sri Aurobindo. Shyamsunder was a witty parodist and could write with much humour as also with a telling rhetoric ; he had besides caught up some imitation of Sri Aurobindo's prose style and many could not distinguish between their writings. Whenever Sri Aurobindo was away from Calcutta, it was Shyamsunder who wrote most of the editorials for the Bandemataram."

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় একবার শ্যামসুন্দরের একটি প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক রচনা নানা ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। রচনাটির নাম 'Mock Petition to honest John'। এটি সাপ্তাহিক বন্দেমাতরমের উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং তারপর এটি যখন গ্লাসগোর বিখ্যাত 'News' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় তখন ইংলণ্ডে যথেষ্ট আলোড়ন দেখা গিয়েছিল আর ভারতে সরকারি মহলেও এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের অন্যতম জননায়ক সর্দার অজিত সিং যখন নির্বাসিত হন তখন সাপ্তাহিক বন্দেমাতরমে 'পাগড়ি সামালো জাঠা' শীর্ষক তিনি যে নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। জোনাথান সুইফটের মতনই শ্যামসুন্দর ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পারঙ্গম ছিলেন। লেখনিয়র ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, তাই তাঁর লেখনী যখন বিদ্রূপে অমন তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠতে পেরেছিল। মোট কথা, বন্দেমাতরমের অন্যতম লেখক হিসাবে সেদিন বাংলার চরমপন্থী রাজনীতিতে শ্যামসুন্দর যে শক্তির সঞ্চার করেছিলেন তা কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামসুন্দর একজন এবং সেদিন তাঁর লেখনী ও বক্তিতা সমানভাবে এই আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই আন্দোলনই ভারতবর্ষকে তার রাজনৈতিক আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়েছে—দিয়েছে যুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। শ্যামসুন্দর সেই আদর্শেরই একজন সাধক ছিলেন। "Nationalism is a religion that has come from God. It has not been crushed. It is not going to be crushed." অরবিন্দের মত শ্যামসুন্দরও এই বিশ্বাস পোষণ করতেন। আবার এই স্বদেশী আন্দোলনই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবের গুরুদেব। ভগিনী নিবেদিতার নামও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বিপ্লবের প্রথম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে মজঃফরপুরে ১৯০৮ সনের ১০ই এপ্রিল। সন্ত্রাসবাদের এই আবির্ভাবে বিচলিত আমলাতন্ত্র দমননীতির সাহায্যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ করে। এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই অরবিন্দ প্রমুখ প্রায় চল্লিশজন গ্রেপ্তার হন; আরম্ভ হয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা; অরবিন্দের গ্রেপ্তারে বিচলিত শ্যামসুন্দর আদালতে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য 'অরবিন্দ ডিফেন্সফাণ্ড' নাম দিয়ে জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রধানত তাঁর ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের উদ্যোগেই অল্পদিনের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। সরকারের শ্যেনদৃষ্টি তখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ হলো এবং আলিপুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই রেগুলেশন আইনের বজ্র নেমে এলো তাঁর মাথার উপর। ১৯০৮ সনের ১১ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় ১৮১৮-এর তিন নম্বর রেগুলেশনে তিনি ধৃত, বন্দী ও নির্বাসিত হন। তাঁর সঙ্গে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ আরো সাতজন ঐ সুখ্যাত আইনে ধৃত, বন্দী ও নির্বাসিত হয়েছিলেন। শ্যামসুন্দরের লেখা Through solitude and sorrow নামক পুস্তিকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেখানকার মান্দালয় জেলে তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন চৌদ্দমাস। তিনি যখন নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আলিপুর বোমার মামলার উপর যবনিকা পতন হয়েছে এবং এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ প্রায় একবৎসর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও সরকার প্রমাণ করতে পারেন নি, তাই বিচারপতি বীচক্রফট তাঁকে বেকসুর খালাস দেন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিষ্টার সি. আর. দাস (চিত্তরঞ্জন দাস) পরবর্তীকালে জাতির অন্তরে যিনি 'দেশবন্ধু' নামে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত শ্যামসুন্দরকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য অরবিন্দ স্বয়ং জাহাজ ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাসন থেকে ফিরে এসে শ্যামসুন্দর দেখলেন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। এর কিছুকাল পরই অরবিন্দ রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে দিব্যজীবনের সন্ধানে পণ্ডিচেরীতে তাঁর নিভৃত ধ্যানের আসন পাতেন। মডারেট দল তখন আবার কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। ১৯১০ থেকে ১৯১৬—এই ছয়বৎসর শ্যামসুন্দর প্রথমে অমৃতবাজার পত্রিকা, তারপর বেঙ্গলী কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিপিন পালের পত্রিকায় বেতন সামান্যই ছিল; সুরেন্দ্রনাথের সাদর আহ্বানে তিনি পরে একশটাকা বেতনে 'বেঙ্গলী'র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দর আবার ধৃত হন এবং দীর্ঘকাল কালিম্পং-এ অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। তাঁকে যখন ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় তখন মডারেট সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে শ্যামসুন্দর অথবা রাজনীতি নাম দিয়ে একটী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন পুরোদস্তুর মডারেট বা নরমপন্থী, আর শ্যামসুন্দর ছিলেন চরমপন্থী তথাপি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিগৃহীত চরমপন্থী বা বিপ্লবী দলের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন—এ উদারতা তাঁর চরিত্রকে একটি বিশিষ্ট গৌরব প্রদান করেছে। শ্যামসুন্দরের গ্রেপ্তারে তিনি যা করেছিলেন তার তুলনা নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা মনোরমা লাহিড়ী লিখেছেন, "বাবার গ্রেপ্তারে সুরেন ব্যানার্জি যা করেছেন তা লেখার ভাষা আমার নেই। তিনি বাবার জামিনের জন্য ইংরেজ ব্যারিস্টার দেন। জামিন মেলেনি। বাবাকে জেলের প্রায় আলো বাতাসহীন এক নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। এই খবর পেয়ে সুরেন ব্যানার্জি অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন গভর্ণরের কাছে। তিনি বাবার জন্য গভর্ণরের কাছে গিয়েছেন অনেকবার, যুক্তি আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্যামসুন্দরের পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কত করেছেন। এমনকি, নিজ দায়িত্বে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে বাবাকে রাখতে চেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তারপর যখন কোন চেষ্টাই সফল হলোনা তখন বাবাকে কালিম্পং-এ ভালো বাড়িতে অন্তরীণ রাখবার ব্যবস্থা করেন সরকার। হয়ত এর পিছনে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল।·· কালিম্পং শীতের দেশ। তখনই রাত্রি থেকে তিনি দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে বাবার সকলের জন্য গরম আলখাল্লা বেনিয়ন প্রভৃতি তৈরী করিয়ে দেন, নিজের হাতে আমার বোতাম বসিয়ে দেন এবং ষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিলেন।" রাষ্ট্রগুরুর চরিত্রের এই এই মহানুভবতা পরবর্তীকালে শ্যামসুন্দর কখনো বিস্মৃত হন নি।

কালিম্পং থেকে প্রায় চার বছর পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তখন দেশে এক নূতন শাসনতন্ত্র (যা ১৯১৯-এর Reforms নামে বিখ্যাত) প্রবর্তিত হয়েছে। এর অল্পকাল পরেই ঝড়ের মতো দেশের উপর প্রবাহিত হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ভারতের রাজনীতিতে তখন কটিবাস পরিহিত এক নূতন নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনিই ছিলেন এই নূতন আন্দোলনের প্রবর্তক। বাংলাদেশে শ্যামসুন্দরই সর্বপ্রথম গান্ধীর অসহযোগ নীতিকে সমর্থন জানালেন, তার অনেক পরে চিত্তরঞ্জন অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ মন্ত্রকে সমগ্র দেশে প্রচার করবার জন্য শ্যামসুন্দর এই সময়ে তাঁর নিজস্ব 'দি সার্ভেণ্ট' (The Servant) পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন এই নূতন ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সেই সময়ে সার্ভেণ্ট পত্রিকার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে যুগান্তর এনেছিল, সে ইতিহাস অবিস্মরণীয়। এই "সার্ভেণ্ট" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেদিন এক নূতন সাংবাদিক-গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ভক্টর বীরেন্দ্রনাথ দেব শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকাতেই সাংবাদিকতায় প্রথম

পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ), অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

সার্ভেন্টের যুগ ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যেমন নবযুগ ছিল, তেমনি শ্যামসুন্দরের রাজনৈতিক জীবনেও এই সময়টা ছিল বিশেষভাবে গৌরব প্রদীপ্ত। দেশবন্ধু যখন কারারুদ্ধ হন, তখন তিনি শ্যামসুন্দরকেই বাংলায় কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী "ডিক্টেটর" মনোনীত করেন। ১৯২২-এর জানুয়ারী মাসে শ্যামসুন্দর কারারুদ্ধ হয়ে যখন আলিপুর জেলে আসেন তখন এখানে প্রায় পাঁচশত হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার সমাগম ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, জে. এম. সেনগুপ্ত, আবুল কালাম আজাদ, সবোটিয়ার জমিদার পানি সাহেব, আক্রাম খান, অধ্যাপক জে. এন. ব্যানার্জি, বসন্তকুমার মজুমদার, হীরালাল গান্ধী, (মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র) অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্যখ্যাত নেতৃবৃন্দ। এই আলিপুর জেলেই স্বরাজদলের পরিকল্পনা রচনা করেন দেশবন্ধু। এই স্বরাজদল উপলক্ষ করে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। নৃপেন্দ্র চন্দ্র তখন 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক ; জেল থেকে শ্যামসুন্দর এই দায়িত্ব তাঁকে অর্পন করেছিলেন। কারামুক্তির পর দেশবন্ধু এই সার্ভেন্ট পত্রিকাকে স্বরাজদলের মুখপত্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেন ; নৃপেনবাবু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নো-চেঞ্জার দলের মুখপত্র হিসাবে শ্যামসুন্দরের'সার্ভেন্ট' পত্রিকার জনপ্রিয়তা দেখে চিত্তরঞ্জন 'করোয়ার্ড' নামে নিজস্ব একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্র স্থাপন করেন।

শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল—মাত্র বছর পাঁচ চলবার পর এই কাগজ উঠে যায়। তার দ্বিতিকালে 'দেশবন্ধুর' অকালমৃত্যু একটি স্মরণীয় ঘটনা। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি যারপরনাই ব্যথিত হয়ে তাঁর পত্রিকায় যে সম্পাদকীয়টি রচনা করেন, তা একমাত্র তাঁরই লেখনী থেকে নির্গত হওয়াই সম্ভব ছিল। সেই সম্পাদকীয়টির প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন; "Bengal if you have tears, prepare to shed them now." উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতের দুস্তর পার্থক্য ছিল। কিন্তু মানুষ শ্যামসুন্দর চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন! তিনি দেশবন্ধুকে 'চিত্ত' বলে ডাকতেন। অতঃপর কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে তিনি ধীরে সরে যান এবং তাঁর প্রিয় সার্ভেন্ট পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁকে বাংলার রাজনীতিতে আর কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। শেষজীবনে মার্কিন মহিলা মিস মেয়ো যখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপহাস করে "The slaves of the Gods" বই লেখেন (মিস মেয়োর প্রথম বই ছিল 'Mother India' এবং এই বইটি নিয়েই এদেশে তুমুল আলোড়ন হয়েছিল) তখন একমাত্র শ্যামসুন্দরই তার সমুচিত জবাব দিয়ে লিখেছিলেন 'My Mother's Picture' নামে একখানি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ।

যুগ আসে, যুগ চলে যায়, কিন্তু মহৎসাধনার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল। ইতিহাসে যাঁরাই স্বকীয়তন্ত্র মানুষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন মানবভাগ্য বিধাতা তিনি তাঁদের দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। স্বজাতির নিন্দা অসম্মান তাই তাঁদের কাছে তুলা-মূল্য বিবেচিত হয়। শ্যামসুন্দর তাঁর শেষজীবনে স্বজাতির হাতে অনাদর ও উপেক্ষা লাভ করেছিলেন সত্য। কিন্তু জাতির পরাধীনতার বেদনা এই ব্রাহ্মণের অন্তরে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং মুক্তি সংগ্রামে যেভাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সে-ইতিহাস তো কোনদিনই মুছে যাবার নয়। ইতিহাস বিধাতার দেওয়া সম্মানের টীকাই ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দরের, স্বদেশী শ্যামসুন্দরের ললাটে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে চিরকাল।

———

সুরেন্দ্রনাথের রক্ষী স্বরূপ গমন করিতে লাগিলেন, তাদের পরে সুরেন্দ্রনাথ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরস্পরে যাত্রা করিলেন। তাদের পরই ৫০০ শত পতাকাধারী যুবক বীর পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। সর্বশেষে বিরাট জনসমুদ্র—এরূপ বিপুলকায় ও বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতাবাসী ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। সকলের মুখে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ছাপ। দৃঢ়সংকল্প, জীবনপণ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনতা, ধীর, স্থির, সংযত, শ্রেণীবদ্ধ যেন যন্ত্র পরিচালিত। অথচ জনতার কণ্ঠনিসৃত বন্দেমাতরম সংগীত আকাশ বাতাস মুখরিত ও আলোড়িত করিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের জয়ধ্বনি দূরশ্রুত সাগর গর্জনের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ফটোগ্রাফারের দল ফটো তুলিতে ব্যস্ত. রাস্তার দুই পার্শ্ব হইতে কুলনারীরা শঙ্খধ্বনি দ্বারা এই জাতীয় উৎসবকে অভিনন্দন জানাইতেছিলেন। পুলিশ উপস্থিত না থাকায় পথিমধ্যে কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই। যখন এই বিরাট শোভাযাত্রা পার্শীবাগান স্কোয়ারে পৌঁছিল তখন সমস্ত স্কোয়ারটি বিপুল জনসমূহে পরিণত হইল। হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে যথাক্রমে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও আবদুল হালিম গজনবি, সুরেন্দ্রনাথের হাতে নবনির্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন। সমুন্নত পীত ও লাল রংয়ের জমির উপর প্রথমে আটটি পদ্ম দ্বিতীয় সারিতে সূর্য ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই পতাকার বৈশিষ্ট ছিল। জনসাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন এবং গগন বিদারী বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন।

The National flag showing the three colours—red, green and yellow and with Bandemataram (in Devnagri) in the centre, eight half-bloomed lotus at the top and sun and the moon below was taken possession of by a young Bangalee Jatindra Kumar of Allahabad on horse back. The procession then moved slowly with Babu Surendranath on foot at the head—the procession was more than a mile long. —The Bengalee (1906, 7th Agaust.)

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলিয়াছিলেন এই জাতীয় পতাকাই ভারতীয় সমুদয় জাতির সংহতির চিহ্ন ও প্রতীক। উহাই তাহাদের ঐক্যের আদর্শ। তাহারা সকলে যেন জীবনপণ করিয়া এই সংকল্প গ্রহণ করেন যে যখনি এই পতাকা উর্ধ্বে উড্ডীন হইবে তখনি যেন তাঁহারা উহাকে অনুসরণ করিয়া চলেন। এই পতাকা-ই তাহাদিগকে লইয়া যাইবে মুক্তির পথে, বিজয়ের পথে। এই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট দিনটি তাহাদিগের জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই দিনটিই জাতির জীবনে নূতন প্রাণ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল এবং জাতির গৌরবময় মুক্তির পথে সকলকে দ্রুত অগ্রসর হইবার প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিবে। এই অনুষ্ঠানে ৫০,০০০ নরনারী অংশগ্রহণ করেন ও জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান। সেদিনের অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন।— The National flag was hoisted. by Babu Surendranath Banerjee and in doing so said that that was an emblem of union and he asked the assembly to salute it.

এই জাতীয় পতাকার পরিকল্পনার কয়েক মাস পূর্বে সেই বৎসরই (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) এই বাংলাদেশেই আর একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা হয়। অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, চারুচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবী নেতৃবর্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির দ্বারা উহা পরিকল্পিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ পতাকা কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় নাই। পতাকাটির ভূমি গৈরিক। তার উপর ত্রিশূল তরবারি চক্র ও অর্ধচন্দ্রশোভিত তারকা বিরাজমান। ত্যাগের ভিত্তিতে শক্তির সাহায্যে হিন্দু মুসলমানের মিলনে স্বাধীন

ভারতের মুক্তির পথ দেখানই এই পতাকার উদ্দেশ্য। পতাকার গৈরিক বর্ণ ত্যাগের প্রতীক। কাল শক্তির প্রতীক ত্রিশূল, তরবারি ও বিষ্ণুচক্র। অর্ধচন্দ্রশোভিত তারকা হিন্দু মুসলমানের একতার প্রতীক।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক উৎসবে বাঙালী পরিকল্পিত ও বাংলাদেশে প্রথম ব্যবহৃত জাতীয় পতাকাটি পরবর্তী বৎসর খ্যাতনামা বিপ্লবকর্মী ভারতীয় মহিলা মাদাম কামা টুটগার্টে প্রকাশ্য সভায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৯০৭ সালে জার্মানীর স্টটগার্টে সোশিয়ালিষ্ট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে মাদাম কামা এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা কালে তাঁর হাতে ছিল ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের প্রতীক এই পতাকা। তখনকার দিনে শাড়ী পরিহিতা ভারতীয় মহিলার এ হেন পতাকা হস্তে সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা ইউরোপের পক্ষে এক অভাবনীয় ব্যাপার। সেখানকার সেদিনের অনেক কাগজে এই লইয়া তোলপাড় হইয়াছিল। মাদাম কামা পার্শী ধর্মাবলম্বী হইয়াও নিজেকে হিন্দু-মহিলা বলিয়া ইউরোপে পরিচয় দিতেন। তাঁর প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্য্য ছিল এবং তিনি ভারতের কাজে সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন।

জাতীয় পতাকা National flag প্রতিটি স্বাধীন জাতির সর্বস্রেষ্ঠ সম্পদ। জাতির গৌরব জাতির সম্মান জাতির মর্যাদা নির্ভর করে তার পতাকার উপর।

পরাধীন ভারতে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা সত্যিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পতাকাই সেদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাকামী কোটি কোটি নরনারীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং তাদের মনে অসীম শক্তি ও সৌর্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল। সেদিন দেশমাতৃকার মুক্তি কামনায় ভারতবাসী যে জীবনপণ সংগ্রাম ও মৃত্যু মৃত্যুবরণ ও সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল সে সমস্তই সম্ভব হইয়াছিল জাতীয় পতাকার প্রতি ভারতবাসীর গভীর শ্রদ্ধা অবিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দ্বারা।

• • • •

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগ অস্বীকার করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির সৌহার্দ্যের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠান। রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। রাখিবন্ধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন—'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু' সংগীতটি।

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

[একদিন ছিল যেদিন পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কথা সাহিত্যে বেশ সুনাম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তাঁর গল্প পড়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন পাঠকেরা। গল্প-ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল প্রথম থেকেই। তিনি গল্প-ভারতীর সহায়ক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। এই লেখাটি গল্প-ভারতীর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর লেখনী আজ স্তব্ধ। আজকের-দিনের অনেক পাঠকই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত নন। তাই এই লেখাটি প্রকাশ করে আজকের পাঠকদের সামনে তাঁকে তুলে ধরা হল]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

ময়ূর

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপিয়ে কল্যাণী শিল-নোড়া পেতে হলুদ বাঁটতে বসেছিল। শ্রাবণমাসে, শেষরাত্রি থেকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে গেছে, রান্নাঘর থেকেই দেখা যাচ্ছে গলিটায় এক হাঁটু জল। রান্নাঘর মানে দৈর্ঘ্যে চার এবং প্রস্থে তিনহাত একটা জায়গা, মাথার উপরটা অবশ্য ঢাকা। কল্যাণীর ভাসুর গেছেন বাজারে, নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তাঁকে আফিসে হাজরে দিতে হয়, কাজেই বাজারটা নিয়ে না গেলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। অন্যদিন মুখ থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে নিয়েই তিনি বাজারের থলেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, আজ বৃষ্টি না ধরায় একটু দেরী হয়ে গেছে। সংসারে দু'ভাইয়ের ছাতা মাত্র একটি, সেটি নিয়ে কল্যাণীর স্বামী অনিল বেরিয়ে গেছে ছেলে পড়াতে। অনিলকে অফিসে যেতে হয় একটু বেলায়, কাজেই ছেলে পড়িয়ে ফিরলেই কল্যাণীর ভাসুর শিবনাথ সেই ছাতাটা নিয়েই অফিসে যেতে পারবেন।

পাশের ঘরে ছেলেরা পড়তে বসেছে। কল্যাণীর দুটী, ভাসুরের পাঁচটী। সব কটির বয়স অবশ্য পড়তে বসার মত নয়, কিন্তু পড়াশুনোর ব্যাপারে উৎসাহ এদের এতই বেশী যে একজন বই শ্লেট নিয়ে বসলেই সবচেয়ে ছোটটা পর্য্যন্ত সেখানে গিয়ে ভিড় করবে। তাদের মধ্যে তিনজনকে সাড়ে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাত দিতে হবে, স্কুলে যাবে তারা। আর যারা স্কুলে যাবেনা তারাও কোথা থেকে এক একটি খাবার বা বাটী যোগাড় করে ভাত খাবার জন্যে কলরব জুড়ে দেবে। তাদের সামলাতে হবে।

আগে কল্যাণীর এত ঝঞ্ঝাট ছিল না কিন্তু। সকালে উঠে ছেলেদের জলখাবার, বড়দের চা, আর ভাসুরের চারগণ্ডা পান সেজে দিলেই এবেলার কাজ চুকতো। বাকী কাজগুলোর ভার ছিল তার জায়ের ওপর। কিন্তু বিভাবতী আজ তিনমাস অম্বলের ব্যথায় শয্যাগত, মাঝে মাঝে জ্বরটাও লেগেই আছে।

স্বামী আর ভাসুরের অফিসের ভাত এবং ছেলেদের স্কুলের ভাতের তাড়ার মাঝখানে কল্যাণীকে তাই বিভাবতীর ওষুধ পথ্যির ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। বিভাবতী অবশ্য লোক ভাল, একটু ভাল থাকলেই ছেলেদের ছুটে আসে, কিন্তু খানিক বসতে না বসতেই ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠে, ফলে কল্যাণীর কাজের হাঙ্গামা বাড়ে বই কমে না। মোটের উপর এই সংসারের খাতা-কলমটা আপাততঃ একা কল্যাণীকেই ঘোরাতে হচ্ছে, শিবনাথের বাজার করা এবং অনিলের একটু বেলায় অফিসে যাওয়া ছাড়া আর কোন দিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণী তার গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় হলুদ বাটবার চেষ্টা করেছিল। হলুদের পর বিভাবতীর ঝোলের জন্যে একটু ধনে বাটতে পারলেই বাটনার পালা তার চোকে। তারপর ভাসুর বাজার থেকে ফিরে আসবার আগেই পান কটা সেজে রাখা দরকার। পান খাওয়াটাই শিবনাথের জীবনের একমাত্র উত্তেজনা, গুনে গুনে ষোলটি পান তার মোড়ে নিয়ে যাওয়া চাই অফিসে। একটি কম হলে চলে না। পান কটা সাজা না হতেই শিবনাথ বাজার থেকে ফিরে আসবেন নিশ্চয়ই, তা হলেই কল্যাণীকে আশবঁটিটা নিয়ে মাছ কুটতে বসতে হবে। একটুকরো মাছ অন্ততঃ ভাসুরকে ভেজে দেওয়া দরকার। জল-কাদায় শিবনাথের ফিরতে আর যদি একটু দেরীই হয়ে যায় তা হলে কল্যাণী সেই ফাঁকে বিভাবতী কবরেজী ওষুধটা খাইয়ে আসতে পারবে। অবশ্য কবরেজী ওষুধ, বল দিয়ে মেড়ে অনুপান সহযোগে খাওয়ান একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, অতটা সময় কল্যাণী পাবে কি না সন্দেহ। কল্যাণী আরও তাড়াতাড়ি হাত চালায়।

স্বামী ঘড়ির কাঁটার মত এসব ব্যাপারে কল্যাণীর হাত চলে নির্ভুলভাবে, কোনদিন সে এতটুকু এদিক ওদিক হতে দেয় না। পাছে দেরী হয়ে যায় সেই ভয়ে নিজে চা খায় ছেলেরা স্কুলে যাবার পর, জল খাওয়ার কথাটা তার প্রায় মনেই থাকে না। চা টুকু খেয়ে নিয়েই ছোটে কলতলায়, ছেলেদের ভিজে প্যান্ট, ভাসুরের ভিজে কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে ছাদে গিয়ে শুকোতে দেয়। এমনিতেই ছাদ, তাতে আবার জায়গা পাওয়া যায়না, বৃষ্টি হলে আরও অসুবিধে। ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে কিম্বা রেলিং জানালার মাথায় কাপড় জামাগুলো শুকোতে দিতে হয়। ঘরগুলোয় মধ্যে নড়বার জায়গা থাকে না। কল্যাণীর বাটনা বাটা শেষ হবার আগেই ছাদ এবং আশপাশের কয়েকটা বাড়ী থেকে হঠাৎ একটা হট্টগোল শোনা গেল। অস্পষ্ট যে দু'চারটে কথা কল্যাণীর কানে এল তাতে স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু তার পরেই শোনা গেল পাশের ঘর থেকে ছেলের দল হৈ হট্টগোল করে ছুটছে ছাদের দিকে, দুপদাপ পায়ের শব্দে বহুকালের জরাজীর্ণ সিঁড়িটা ভেঙে পড়বার উপক্রম! পড়তে বসলেও এসব ব্যাপারে কান তাদের সজাগ থাকে।

কিছু একটা যে ঘটেছে তাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা সঠিক কি সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করবার সময় নেই কল্যাণীর। বাটনার পালা শেষ করে কল্যাণী বসলো পান সাজতে। শিবনাথের বাজার থেকে ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হচ্ছে, পাশে কাদের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বেজে গেল। কিন্তু তাদের আর আশপাশের বাড়ীগুলোর ছাদে কলরবটা যে ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। ঠিক কি ঘটেছে কে জানে, হয়তো বড়বাড়ীর ছেলেরা ঘুড়ি কিম্বা পায়রা ওড়াচ্ছে, ওদের তো এরকম লেগেই আছে। কিন্তু তার জন্যে এত হৈ-হট্টোগোল কেন? কল্যাণীর ইচ্ছে করে একবার ছাদে গিয়ে ব্যাপারটা এক ছুটে দেখে আসে, কিন্তু তাতেই তো খানিকটা সময় নষ্ট হবে!

কল্যাণী খুব তাড়াতাড়ি পান কটা সেজে ফেলবার চেষ্টা করে।

পান সাজা শেষ হবার আগেই শিবনাথ যদি এসে না পড়েন তা হলে কিন্তু একবার সে ছাদে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসবেই।

পানগুলি চিরে চুন মাখিয়ে কল্যাণী সবে সুপুরি কুচোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় ছাদের কলরবটা প্রায় হট্টোগোলে দাঁড়াল।

"ঐ যা উড়ে গেল!"

"উড়ে গেল, উড়ে গেল—"

"আয়, আয়—"

"ঐ যে, ঐ যে ওই বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসেছে। আ—মা কি উড়ে গেল, কেন উড়ে গেল, পায়রা কিনা, পায়রা বোধ হয় নয়, এমনি সব প্রশ্ন যখন কল্যাণীর মাথার মধ্যে ছট পাকিয়ে তুলছে, সেই সময় কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল আরে: "ময়ূর! ময়ূর! দেখবি আয়—"

এর পর কে কি বললো না বললো কল্যাণীর কানে গেল না, পড়ে রইলো তার পান সাজা, হাতের সুপুরি আর জাঁতি তার হাতেই রইলো, কল্যাণী ছুটলো ওপরে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল ছাদের উপর। আশপাশের প্রত্যেকটা বাড়ীর ছাদে ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী পুরুষের ভিড়; জানালা বারান্দা সব কিছুতেই সিপসিপ করছে লোক, এত লোক আছে এই কটা বাড়ীর কোকরে কোকরে আগে সে কথা কে জানতো? কল্যাণী এসে দাঁড়াল সেই জনারণ্যের মাঝখানে। অন্য দিন ছাদে ওঠবার আগে কাপড়ের আঁচলটা সে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়, কপাল পর্যন্ত টেনে দেয় ছোট্ট একটু ঘোমটা, অথচ ছাদে সে সময় কেউই একটা বড় থাকে না; আজ কিন্তু বহু চক্ষের সামনেও সে সব সতর্কতা অবলম্বন করবার কথা কল্যাণীর মনে রইলো না, যেমন ছিল রান্নাঘরে ঠিক সেই ভাবে এসে দাঁড়িয়ে রইলো ছাদের মাঝখানে।

"ওই যে, ওই যে—"

"দেখেছ মা কি সুন্দর ময়ূর—"

ছেলেদের দৃষ্টি অনুসরণ করে কল্যাণী এতক্ষণে দেখতে পেল ময়ূরটিকে, ডানদিকের লাল রঙের তেতলা বাড়ীর চিলে কোঠাটার উপর বসে পেখম মেলে রয়েছে। উপরে শ্লেটের মত গাঢ় ছাই রঙের আকাশ। হাওয়ায় হাওয়ায় হালকা মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে, তারই নিচে চিলেকোঠার উপর ময়ূরটা বসে রয়েছে ঠিক যেন সিংহাসনের ওপর মহারাজার মতন। আশপাশের বাড়ীগুলোর ভাঙা, ভাঙলাধরা ছাদ আর পাঁচিলগুলো তার সঙ্গে যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান। আর বেমানান বলেই অকস্মাৎ তার আবির্ভাব বোধ হয় এমনি অদ্ভুত আর বিস্ময়কর।

"কাদের ময়ূর কাকীমা?"

"ওটা কোথা থেকে এল মা? কোথায় থাকে ওটা?"

কল্যাণী অন্যমনস্কের মত জবাব দিল, "বনে।"

"বনথেকে কি করে এলো কাকীমা? উড়ে?"

"হয়তো এখানে কারও বাড়ীতে পোষা ছিল, পালিয়ে এসেছে।"

ছেলের দল এলোমেলো আরও কত কি প্রশ্ন করে, কিন্তু কথাগুলো কল্যাণীর কানে যায় কিনা সন্দেহ। সে শুধু একাগ্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে ডানদিকে লালরঙের সেই তেতলা বাড়ীর চিলেকোঠাটার দিকে। ময়ূরটার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চিলেকোঠাটার চেহারাই যেন বদলে গেছে; আশপাশের বাড়ীগুলোর

ছাদ থেকে ওটা যে কত উঁচু, কত মস্তর তা যেন এমন স্পষ্ট করে এর আগে কোনদিন বোঝা যায় নি। শুধু কি তাই, কলকাতা শহরের আকাশ যে এমনি দিগন্তবিস্তৃত, সে—আকাশে যে এমন স্লেটের মত গাঢ় ছাই রঙের মেঘ করে, হাওয়ায় হাওয়ায় হালকা মেঘগুলো এলোমেলো ভাবে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ভেসে যায় সে কথাও যেন কল্যাণীকে আজ নূতন করে উপলব্ধি করতে হলো। ওই হালকা মেঘগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী ভেসে গেল অনেক দূরে, সেই পুণ্যি-পুকুর আর পুতুল খেলার পৃথিবীতে।

ওর ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামের রাস্তায় ছুটোছুটি করে, তালপিঠে ছেলেদের সঙ্গে মিশে পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছানা ধরে, দুপুরবেলায়, নদীর ধারে গিয়ে জল আর বালি নিয়ে খেলাঘর তৈরীর দুঃসাধ্য চেষ্টায়। নদীতে স্নান করতে করতে বৃষ্টি নামলে ও উঠতে চাইতো না কিছুতে, বৃষ্টির পর্দায় এপার ওপার একাকার হয়ে, পাঁচ-সাত হাত দূরের লোককেও যখন আবছা লাগতো তখনও সে জল থেকে উঠতে চাইতো না, বরং পেতলের কলসীটা নিয়ে সাঁতরে বেড়াত একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে। গাঁয়ের জমিদার বাড়ী ছিল ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানা; চিড়িয়াখানার চিড়িয়ার ভিড়ই ছিল বেশী—শাল, নীল, সবুজ, হলদে নানা রকম পাখী; ময়ূরও ছিল গুটি তিনচার, সেগুলো পেখম মেলে জমিদার বাড়ীর বাগানে ঘুরে বেড়াত; সেদিকটা ছিল তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কল্যাণীদের ময়ূরগুলোর কাছে যেতে দেওয়া হতো না; সবাই বলতো, কাছে গেলেই ওরা চোখ ঠুকরে দেয়। কিন্তু কল্যাণীর ভয় করতো না মোটে, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই তারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো; বাড়ী থেকে হয়তো কিছু কিনতে দিয়েছে, কল্যাণী পয়সা হাতে নিয়ে ছুটলো এসে জমিদার বাড়ীতে, তারপর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কেটে গেল একঘণ্টা কিম্বা তারও বেশী। শেষ পর্যন্ত হয়তো হাতের পয়সা দিয়েই কল্যাণী বাড়ী ফিরলো, কিম্বা জিনিষটা যখন কিনে নিয়ে এল তখন সেটা না আনলেও আর ক্ষতি নেই।

কল্যাণীর বয়স যখন বারো বছর তখন ওর বাবা দেশের বাড়ী বিক্রী করে চলে আসেন কলকাতায়। সেই থেকে গ্রামে যাওয়া আর হয়নি কল্যাণীর। কলকাতার সহরের এপাড়া থেকে ওপাড়ার ভাড়াটে বাড়ীর ঘরগুলোয় কেটেছে তার বাকী দিনগুলো। তারপর একদিন বিয়ে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আর এক ভাড়াটে বাড়ীর কয়েকটা ঘরের মধ্যে হয়ে গেছে তার ঠিকানা নির্দিষ্ট। আশ্চর্য্যের কথা এই যে ছেলেবেলার সেই লাল, নীল, সবুজ, হলদে রঙের পাখীগুলোর জন্যে, কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে সকরুণ সেই তিন চারটি ময়ূরের জন্য কোনদিন তার মন কেমন করেনি।

তাদের কথা সে ভুলে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কোথা দিয়ে, কেমন করে কি হলো কে জানে, আশপাশের বাড়ীর লোকগুলোর চীৎকার, মহুর ধরবার চেষ্টা, ভৈ হট্টগোলের মধ্যে কল্যাণী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেই চিলে কোঠাটার দিকে চেয়ে, ঠিক যেমন করে, দাঁড়িয়ে থাকতো সে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে। মনে রইলো না যে ষোলটি পানের একটিও এখনও সাজা হয়নি, উনুনের উপর তাতের হাঁড়ি ধরে এতক্ষণে হয় ত দুর্গন্ধ বার হচ্ছে, বিভাবতীর ওষুধ খাওয়ার সময়টাও বুঝি পার হয়ে গেল!

কল্যাণী আরও কতক্ষণ সেইখানে ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো কে জানে, কল্যাণীর বড় ছেলেটা বলে উঠলো, "মা, আঠাইমা তোমায় ডাকছে—"

কল্যাণীর যেন চমক ভাঙলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো, বিভাবতী সিঁড়ির দেওয়াল ধরে ধরে উপরে উঠে আসছে। বিভাবতী বললে, "তোমার ভাসুরের টান হয়ে গেছে, যাও ভাই ভাতটা বেড়ে দিয়ে এসো। জানো তো কি রকম মানুষ। এক মিনিট দেরী হলে ....."

বিভাবতীর কথা শেষ না হবার আগেই কল্যাণী প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেল। নিচে এসে দেখলো, শিবনাথ বাজার থেকে ফিরে ভাতের হাঁড়িটা নিজেই উনুন থেকে নামিয়ে কলে স্নান করতে গেছেন। বোঝা গেল যে তিনি বেশ কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছেন বাজার থেকে, ভাতের হাঁড়িটা ধরবার উপক্রম করতে সেটা নামিয়ে রেখে হাত ভাত ফুঁড়ে দিয়েছিলেন আর তার ফলেই বিভাবতীকে হাঁকাতে হাঁকাতে উপরে ছুটতে হয়েছিল।

কল্যাণী আঁশবঁটিটা নিয়ে মাছ বাছতে বসছিল, কলতলা থেকে শিবনাথের গলা শোনা গেল—"মাছ বাছতে গেলে আর ভাত খাওয়া হবেনা বৌমা, তুমি ভাতটা বেড়ে ফেল। রাস্তায় এক হাঁটু জল ভেঙে বাজারে যেতে আসতেই আধঘণ্টা লেট হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা চলবে না।"

আঁশবঁটিটা ফেলে রেখে কল্যাণী ঘরে এসে কড়াটা চাপিয়ে দিল উনুনে : একটা আলু আর পটল কুটে একটু হলুদ নুন মাখিয়ে ছেড়ে দিল কড়ায়। তারপর বসলো ভাত বাড়তে।

শিবনাথ ভাত খেতে বসতেই কল্যাণী মাথার ঘোমটা আর একটু নামিয়ে দিয়ে বসলো পান কটা সেজে ফেলতে। কিন্তু জাঁতি আর সুপুরিটা রেখে এসেছে ছাতে—পাচিলের ওপর, খেয়াল হলো এতক্ষণে। ভাসুরের সামনে গলা ছেড়ে ছেলেদের ডাকবার উপায় নাই, কল্যাণী আবার উপরে ছুটলো।

মহুরটা তখনও চিলেকোঠার ওপর বসে আছে, তাকে ধরবার জন্যে অতগুলো লোকের কৌশল তখনও সফল হয়নি। কিন্তু সেদিকে চেয়ে থাকার সময় নেই, কল্যাণী জাঁতি আর সুপুরিটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এলো।

শিবনাথের খাওয়া তখন প্রায় আধাআধি শেষ।

"দাও, দাও বৌমা, পান কটা চট করে সেজে ফেলো।"

মুহূর্তের জন্য কল্যাণীর একবার মনে হলো, পান সাজা রেখে উঠে যায়। রোজই ত নিখুঁতভাবে সে গুনে গুনে ষোলটি পান সেজে দেয়, এতটুকু দেরী হয় না ; হলোই বা একদিন একটু বিশৃঙ্খলা, দোকান থেকেও ত একদিন পান কিনে খাওয়া চলে, কিন্তু হাত তার থামলো না, আঙুলগুলো নির্ভুলভাবে কাজ করে গেল, শেষ হয়ে গেল পান সাজা এবং শিবনাথের খাওয়া শেষ হবার আগেই!

সাজা পানগুলো ভিজে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানের ডিবের ভরে কল্যাণী শিবনাথের সামনে রাখলো। কোন রকমে বাঁচিয়ে এসে জামাটা গায়ে দিয়েই তিনি ডিবেটা পকেটে পুরলেন ; তারপর ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "ছাতা—ছাতাটা কোথায় গেল? অনিল—অনিলটা এখনও ফেরেনি বুঝি?"

ঘোমটার ভেতরে থেকে ঘাড় নাড়লো।

অনিলের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে এতক্ষণে নিঃসংশয় হয়ে শিবনাথ বললেন, "ফিরবেই বা কি করে! রাস্তায় এক হাঁটু জল। কিন্তু আমার ত আর অপেক্ষা করা চলে না, এমনিতেই পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট। চাকরীটাও গেল বোধ হয় আজকে—"

বলতে বলতেই তিনি মালকোঁচা বেঁধে কাপড়টা হাঁটুর কাছ পর্য্যন্ত তুলে বেরিয়ে গেলেন।

কল্যাণী তখনই ছুটলো উপরে। কিন্তু আশপাশের বাড়ীর ছাদ, জানালা, দরজা, সব জনশূন্য, চিলেকোঠাটার ওপর মহুরটাও নেই, এই ক' মিনিটের মধ্যেই যত একটা ভোজবাজী হয়ে গেছে যেন! শুধু তাদের বাড়ীর ছেলেগুলোই এখনও ছাদের এখানে সেখানে জটলা করছে, বিভাবতী চুপকরে বসে আছে তারই এক কোনে।

কল্যাণীকে দেখে বিভাবতী বলে, "উঠে যে আর ফিরে যেতে পারলাম না ভাই, হাঁফ ধরতে লাগলো, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।"

অন্য সময় হলে কল্যাণী হয়ত হাত ধরে বিভাবতীকে নামিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতো, কিন্তু এখন সে কিছুই করলো না, একটি কথা পর্যন্ত বললো না, চুপ করে চেয়ে রইল সেই তেতলা বাড়ীর শূন্য চিলেকোঠাটার দিকে।

ছেলেদের মধ্যে কে একজন এগিয়ে এসে বললে, "জানো কাকীমা, ময়ূরটা উড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে?"

কল্যাণী শুধু বললে, "উড়ে গেছে।"

বিভাবতী বললে, "হ্যাঁ ভাই ছোটো, কেউ ধরতে পারলে না।"

কল্যাণী মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো একতলায়। মনে হোলো কল্যাণী হঠাৎ নিভে গেছে, ফুরিয়ে গেছে একেবারে।

কলতলায় শিবনাথের কাপড়টা পড়ে রয়েছে, কেচে শুকোতে দেওয়া দরকার। ছেলেরা স্কুলে যাবে তার খানিক পরেই, ওদের জন্যে তরকারী একটা না করলে নয়। তারপর বিভাবতীর কালের কোল, অনিলও অফিস যাবে ঠিক এগারোটায়, মাছের তরকারীটা তার আগেই হওয়া দরকার।

কিন্তু কল্যাণী এ ঘরের কোনটাতেই হাত দিল না, পানের ডাবরটার সামনে চুপ করে বসে রইলো। এমনি ভাবে কাটলো কিছুক্ষণ। তারপরেই হুড়মুড় করে নামলো ছেলের দল।

"কাকীমা, আমার প্যান্ট্ কোথায়—স্কুলে যাবার প্যান্ট্?" হাঁকলো শিবনাথের বড় ছেলে সুধীর।

"মা, তেল দাও—সরষের তেল নয়, আমি নারকোল তেল মাখবো।" চেঁচিয়ে উঠলো কল্যাণীর বড় ছেলেটা।

"কাকীমা ঘন্টু আমার জামা পরে ময়লা করেছে, কি পরে ইস্কুলে যাব?" হাঁকলো আর একজন।

"স্কুলে তোমাদের কাউকে যেতে হবে না।" ঘরের ভিতর থেকে কল্যাণী হঠাৎ ফেটে পড়লো।

সুধীর রান্নাঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো, "কেন কাকীমা?"

"রান্না হয়নি।"

"কিন্তু হাফ্-ইয়ারলি এক্সামিন যে খুব কাছে কাকীমা, এখন স্কুল কামাই—"

"এত তাড়া থাকলে বাবাকে রাঁধুনি রাখতে বলিস্।" কল্যাণী যেন আরও জ্বলে উঠলো।

ছেলের দল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এ-ওর মুখের দিকে চাইলো। তারপর কে কোন দিকে ছটকে পড়লো কে জানে!

কল্যাণী সেই পানের ডাবরটার সামনে তেমনি করে বসে রইলো। উনুনে গন্ গন্ করছে আঁচ, কিছু চাপান হয়নি। অন্য দিন হলে দুলভ কল্পনায় এই অপচয় কিছুতেই সহ্য হ'ত না কল্যাণীর; আজ কিন্তু সে উঠে বসে কিছু একটা উনুনে চাপিয়ে দেবার উৎসাহ খুঁজে পেল না মনের মধ্যে।

কাটতে লাগলো সময়। রান্নাঘরের পাশের গলিটায় জল তখনও কমেনি, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে, ছাতা বগলে কত লোক যাওয়া আসা করছে সেই জল ভেঙে, ছপছপ জলের শব্দ হচ্ছে তাদের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে; কল্যাণী নির্নিমেষ চোখে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। ঘরের ভেতরটা এত অন্ধকার যে বাইরের লোকের তাকে দেখবার উপায় নেই, সেই ওদের দেখছে বসে বসে। নোংরা ঘোলাটে জল, ময়লা, ছেঁড়া

কাপড় পরা লোকজন—কারও হাতে বাজারের থলে, কারও হাতে ছেঁড়া ছাতা—কল্যাণীর চোখে তাই সমুদ্রের মত রহস্যময়।

ঘরের বাইরে অনিলের গলা পাওয়া গেল—"আরে চুপচাপ দিব্যি বসে আছো দেখছি—উনুনটা যেমালুম জ্বলে যাচ্ছে!"

কল্যাণী মুখ তুলে চাইলো দরজার দিকে। বললো, "তারজন্যে কি করতে হবে কি?"

"যা রোজ করে থাক তাই। অর্থাৎ কিছু একটা চাপিয়ে দাও, স্নানটা সেরে এসে চাকুরী বজায় করতে যাই। বেলা এগারোটা বাজে।"

অনিল সহজ ভাবেই কথা বলছিল, কিন্তু কল্যাণী যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো—"এগারোটা বাজে ত আমার কি?"

অনিল তবুও হালকা সুরেই বললো, "তোমার কিছুই নয়, চাকরীটা পরের কিনা, তাই একটু সময় মত যাওয়া দরকার।"

"কিন্তু শরীরটা আর হাত-পাগুলো আমার নিজের। সেগুলো তোমার বড়সাহেবের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে সব সময় নাও চলতে পারে।"

"শরীরটা তোমার ঘড়ির কাঁটার চেয়ে অনেক মজবুত বলে আমার ভরসা ছিল"; অনিল একটু বিব্রত ভাবে হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফল হলনা কিছুই।

কল্যাণী হঠাৎ উঠে এসে অনিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, "মজবুত শরীরটাই শুধু দেখতে শিখেছিলে আর শিখেছিলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাধার মত খাটতে। রাস্তায় এক হাঁটু জল একদিন যদি আপিস না গিয়ে ছদণ্ড বাড়ীতে থাক তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবেনা নিশ্চয়ই! আর চাকরী বজায় রাখার কথাটাই ভাবলে শুধু সকাল থেকে উঠে, চাকরী থেকে ফিরে বাড়ীর এই বিনা মাইনের ঝিকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবার সাধও ত হয়না একদিন? কিন্তু যেচে মান, কেঁদে সোহাগে আমার দরকার নেই, এ আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না—এই তোমায় স্পষ্ট বলে দিলাম।"

কথাটা শেষ করেই কল্যাণী বালতি থেকে একঘটি জল নিয়ে জলন্ত উনুনটায় ঢেলে দিয়ে হুড়মুড় করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের শোবার ঘরে খিল দিল।

———

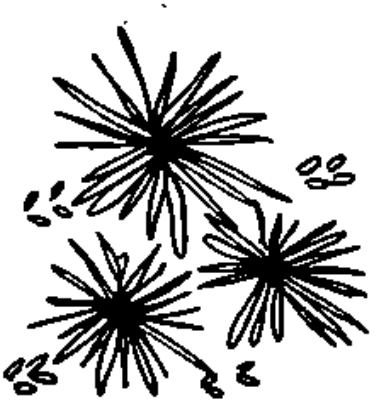

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাংলা পুলিশের দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তদন্তকার্যে যে অসামান্য কর্মকুশলতার পরিচয় দেন, তাঁর প্রামাণিক তথ্য তিনি নিজেই লিপিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর রচিত 'দারোগার দপ্তর' বই গুলির মধ্যে। বাংলার রহস্যরচনার ক্ষেত্রে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় আদিপুরুষ! তাঁর রচিত দারোগার দপ্তরের সেই সব ছোট ছোট কাহিনীগুলি আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। আমরা সম্প্রতি কয়েকটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। একটি কাহিনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, আর একটি আধুনিক কালের উপযোগী ভাষায় বক্তব্য ও বিন্যাস অক্ষুণ্ণ রেখে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

কাটামুণ্ড রহস্য

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সে বছর শারদীয়া পূজায় অনেক কষ্টে কয়েকদিনের ছুটি সংগ্রহ করে দেশের বাড়িতে রওনা হব, এমন সময় শহর কতোয়ালের কাছ থেকে জরুরী তলব এলো—"যে অবস্থায় আছ, চলে এসো। অদ্ভুত অবস্থায় একটি লাশ পাওয়া গেছে। তোমায় অনুসন্ধান করতে হবে। আপাতত তোমার ছুটি রদ হল।"

তলব পেয়ে আমার জল জল হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। কোথায় যাব মহামায়াকে দর্শন করতে, না, চললাম লাশ দেখতে!

কতোয়াল সাহেব আমায় দেখে খুশী হয়ে বললেন—"এই যে এসে গেছ! একটা খুন হয়েছে। কোথায় যে এ ঘটনার সূত্রপাত, কোথায়ই বা এই খুন ঘটেছে, তার কোন হদিস নেই। কোন গতিকে লাশ এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। আজ ভোর বেলা এই লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু কোন সূত্র এখনো পাওয়া যায়নি। তোমার ওপর তদন্তের ভার দিলাম। তুমি প্রথমে লাশ দেখ, যা কিছু জানবার জেনে নাও, তারপর তদন্ত সুরু করে দাও। ইতিমধ্যে দু'তিনজন সাব ইনসপেক্টার খোঁজ খবর নিচ্ছে বটে, কিন্তু আমি তাদের জানিয়ে দেব, তারা তোমার নির্দেশমত কাজ করবে।"

* * * *

লাশ দেখতে গেলাম ভেড্ হাউসে! ডাক্তার সাহেব তাকে কেটে চিরে নিজের পরীক্ষার কাজ শেষ করেছেন। একটা টেবিলের বিকৃত অবস্থায় লাশটা রয়েছে। শুধু ধড়টা দেখতে পেলাম। মাথা নেই। দেহটা স্ত্রীলোকের।

সেখানে যে পুলিশ অফিসারটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম—"যখন লাশ এখানে এলো তখন আপনি লাশটা দেখেছিলেন কি?"

সে বললে—"দেখেছি বৈকি। লাশ যখন পাওয়া যায় তখন থেকেই আমি বরাবর আছি।"

জিগেস করলাম—"কেমন করে লাশ পাওয়া গেছে?"

উত্তরে সাব ইন্সপেক্টারটি বললে—"আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ আমি আমার থানায় ডিউটিতে ছিলাম। সেই সময় দেখলাম পোর্ট কমিশনারের একজন চাপরাশী আর একটি মুটে থানার ভিতর এলো, মুটের মাথায় একটা বড় টিনের তোরঙ্গ। চাপরাশী মুটের মাথা থেকে বাক্সটা নামিয়ে আপিসঘরের সামনে রাখল এবং মুটেকে চারটি পয়সা দিয়ে বিদায় করল। আমি ভিতরের ঘরে বসে সবই দেখলাম বটে কিন্তু কোন কৌতূহল বোধ হল না, কেননা, আমাদের ওই গঙ্গার ধারের থানায় প্রায়ই এইরকম ঘটে, অর্থাৎ কেউ না কেউ এসে বেওয়ারিশ জিনিষ সামেশাই থানায় জমা দিয়ে যায়। যাই হোক জমাদার যখন এসে বলল যে একটা বাক্স জমা করে নিতে হবে তখন উঠে এলাম। চাপরাশীকে জিগেস করতে সে বললে, রাত দুটোর সময় গঙ্গার ধারে মাল গুদামে তার পাহারার পালা সুরু হয়। পাহারায় এসে গুদামের একধারে ঐ বাক্সটা তার নজরে পড়ে। তার মনে হয়, হয়ত কেউ বাক্সটা রেখে কোথাও গেছে, এখনি আসবে। কিন্তু যখন দুঘণ্টা কেটে গেল, কেউ এলোনা, তখন চাপরাশী তার ওপরওয়ালাকে গিয়ে খবরটা জানাল। ওপরওয়ালা এসে বাক্সটা দেখে বললেন, যখন মালিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা, তখন এই বেওয়ারিশ মাল থানায় দেওয়াই উচিৎ। এই বলে চাপরাশীকে বাক্সটা থানায় নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। সেই মত চাপরাশী মুটের মাথায়ো বাক্সটি থানায় এনেছে। চাপরাশীর কথা শুনে আমি বাক্সটা জমা করে নেব ভাবছি এমন সময় আমার বড়বাবু এসে হাজির হলেন। আমার মুখে ঘটনাটা শুনে বললেন, কেবল বাক্সটা জমা করে নিলে চলবেনা, বাক্সের মধ্যে কি আছে খুলে দেখা হোক এবং সেই মত রসিদ লিখে দেওয়া হোক। কারণ পরে না কেউ বলতে পারে বাক্সের মধ্যে অমুক অমুক জিনিষ ছিল, পাওয়া যাচ্ছেনা। ও. সির কথা শুনে জমাদারকে ডেকে বাক্সটা খুলতে বললাম। খুব মজবুত তোরঙ্গ, মস্ত একটা তালা দেওয়া। জমাদার শেষ পর্যন্ত একটা লোহার ছাতা দিয়ে বাক্সর হাসকলটাকে উপড়ে বাক্সটা খুলে ফেলল। তার পরেই সে এক ভীষণ চিৎকার করে ছিটকে সরে গেল বাক্সর কাছ থেকে! কী হল? ব্যাপার কি! বলতে বলতে আমি তোরঙ্গর কাছে এগিয়ে গেলাম। ও. সিও জমাদারের চিৎকার শুনে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাক্সের ঢাকাটা খোলা হয়েছে, ভিতরে দেখা যাচ্ছে, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দুমড়ে মুচড়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা তো স্তম্ভিত! ও. সি ব্যাপারটা লিখে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমায় বললেন, বাক্স সমেত লাশ নিয়ে মেডিকেল কলেজে চলে যেতে। তাঁর আদেশমত লাশ নিয়ে এলাম। ডাক্তার সাহেব এসে লাশ বাক্স থেকে বার করলেন। সেই সময় দেখলাম একগাছা মোটা দড়ি স্ত্রীলোকটির গলা চেপে বাঁধা রয়েছে।"

বললাম—"লাশ তো দেখছি মুণ্ডহীন। গলা পর্যন্ত কাটা। তাহলে দড়িবাঁধা ব্যাপারটা…"

পুলিশ কর্মচারীটি বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠলেন—"আগে সবটা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

বললাম—"হ্যাঁ, আপনি বলুন, বাকিটুকু আমিও ধীরে ধীরে সব বলুন, তাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।"

মাথা নেড়ে সে বললে—"শুনুন, সবই বলছি। ডাক্তার সাহেব লাশের ঐরকম অবস্থা দেখে, যে তোমকে দিয়ে লাশ চেরার কাজ সমাধা করেছিলেন তাকে ঐ দড়ি খুলতে বললেন। তোম দড়িটা খুলল। দেখলাম সেটা শুধু লম্বা একগাছা দড়ি নয়, সেটা দড়ি দিয়ে তৈরী, 'সিকা'। সিকা গাছটি ডাক্তার সাহেব

সরিয়ে রেখে লাশ পরীক্ষা করে আমায় বললেন, গলার দড়ি বেঁধে স্ত্রীলোকটিকে খুন করা হয়েছে। তারপর তোমাকে বললেন, লাশের মুণ্ডটা রাখতে হবে, সহর কতোয়াল-এর নির্দেশ, কারণ লাশ এখনও সনাক্ত হয়নি। লাশের গতি হ'য়ে গেলে সনাক্ত হবার আর কোনো উপায় থাকবে না, আর এই খুনের কোনো কিনারাও হবে না। তাই মুণ্ডটা রেখে দেওয়া দরকার। ডাক্তারের নির্দেশে তোমি একটা বড় ছুরি দিয়ে মৃতদেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে একটা বড় কাঁচের জারের মধ্যে রাখল আর কি একটা আরক এনে কাঁচের পাত্রটা পূর্ণ করে দিল। ডাক্তার সাহেব মুণ্ড সমেত কাঁচের জারটি নিজের গাড়ীতে নিয়ে চলে গেলেন। 'সিকা' গাছটি এবং টিনের বাক্সটি আমার জিম্মায় দিয়ে গেলেন। এই সেই 'সিকা' আর ঐ দেখুন সেই বাক্স। এই তো মশাই অবস্থা। এছাড়া আর কোনো কথাই আমি জানিনা।"

সহকারী দারোগার কথা শুনে আমি মাথাকাটা লাশটা আর একবার দেখলাম। বাক্সটি আর 'সিকা' গাছটিও নেড়েচেড়ে দেখে নিলাম। তারপর চলে আসবার আগে আরও দু'চারটে প্রশ্ন করে জানলাম মৃতদেহের পরণে কাপড়-চোপড় কিছু ছিল না, কোনো গয়নাগাঁটিও গায়ে ছিল না, সধবা কি বিধবা তা জানা যায় নি। মাথায় বা কপালে সিঁদুরের চিহ্ন ছিল না, তবে স্ত্রীলোকটি বাঙালী হিন্দু ঘরের বলেই মনে হয়।

• • •

ডেডহাউস থেকে বেরিয়ে প্রথমে ডাক্তার সাহেবের বাড়ী গিয়ে কাটা মুণ্ডটি দেখলাম। তারপর থানায় এসে সন্ধ্যা নাগাদ অন্যান্য খবরাখবর সংগ্রহ করলাম। ইতিমধ্যে একটি কুলির কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে কাল রাত দুটোর সময় সে যখন জাহাজে কাজ করবার জন্যে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখতে পায় মাল গুদামের কাছে রাস্তার ওপর একটি ঠিকাগাড়ীর মাথা থেকে একজন লোক ঐ বাক্সটি নামাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সেই সময় কুলিটিকে দেখে লোকটি তাকে ডাকে এবং তার সাহায্যে বাক্সটাকে নামিয়ে রাস্তার ওপর রাখে। তারপর লোকটি গাড়োয়ানকে এক টাকা ভাড়া দেয় এবং গাড়োয়ান গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দিকে চলে যায়। লোকটি তখন ঐ কুলির সাহায্যে বাক্সটাকে মালগুদামের মধ্যে রেখে কুলিকে চারটি পয়সা বকশিস দেয়। পয়সা নিয়ে কুলি নিজের কাজে চলে যায়। কুলির কথায় জানা গেছে বাক্সটা যে এনেছিল সে বাঙালী এবং ছোকরা বয়সী, তাকে দেখলে কুলি চিনলেও চিনতে পারে।

আরও জানলাম, ইতিমধ্যে সেই গাড়ীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কালীপুরের এক হাবুনি ক্যারেজের আড্ডায় সেই গাড়ী ও গাড়োয়ানের সন্ধান মেলে। গাড়োয়ান বলে, তার গাড়ী রাত্তিরে যখন ওই আড্ডায় ছিল সে সময় একটি লোক এসে গাড়ীটা ভাড়া করে নিয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে গাড়ীকে রাস্তার ওপর রেখে লোকটি একটু এগিয়ে যায় তারপর আরেকটি লোক নিয়ে ঐ বাক্সটা দুজনে ধরাধরি করে এনে গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দেয়। যে লোকটি গাড়ী ভেকে নিয়ে গিয়েছিল, বাক্স ওঠাবার পর সে সেখান থেকে চলে যায়। যে লোকটি পরে বাক্স নিয়ে এল সে গাড়ীর ভিতর উঠে বসে গলার ধার দিয়ে গাড়ীকে কোলকাতার দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে বলে আর তারপর সেই কুলির সাহায্যে গাড়ী থেকে বাক্সটা নামিয়ে তার ভাড়া দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেয়।

অতঃপর প্রথম কাজ হল লাশ সনাক্ত করা।

সহর কতোয়ালের আদেশ অনুযায়ী সহর এবং সহরতলীর সমস্ত থানার এলাকাধীন বহু অধিবাসীকে ডেকে আনিয়ে মৃতদেহ এবং কাটামুণ্ড দেখান হল কিন্তু কেউই লাশ সনাক্ত করতে পারল না। এমনি করে সপ্তমী পূজার রাত কেটে গেল।

• • •

অষ্টমীর দিন সকালেও বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা লোক কাটামুণ্ড দেখে গেল। দুপুরের দিকে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বললে, কাটামুণ্ডর মুখটা দেখতে ঠিক কাশীপুরের গোপাল বিশ্বাসের মেয়ের মুখের মত।

এই কথা শুনে তখনি কাশীপুর অভিমুখে রওনা হলাম।

আমাদের এই কাজের এই ধারা। যখনই যে কোনো খবর পাওয়া যাবে তখনই সেই খবরের মূল সূত্র সন্ধান করবার জন্যে দৌড়োতে হবে। বারবার নিরাশ হলেও ধৈর্য্য হারালে চলবে না, দিনরাত জ্ঞান করা চলবে না, নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলে যেতে হবে, বাড়ীঘরদোরের চিন্তাও মনে থাকবে না—এমনি সবকিছু ভুলে তদন্তের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। তবেই হয়ত পেয়ে আসবে সাফল্য।

কাশীপুরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে গোপাল বিশ্বাসের বাড়ী বার করলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। আমার কথা শুনে আমার গাড়ীতে চেপে আমার সঙ্গে এলেন এবং কাটামুণ্ড দেখলেন। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে শেষে বলে উঠলেন, "মশায়, মনে হচ্ছে এ আমার মেয়েরই মুখ।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আরও জানতে পারলাম, কোনো কারণে তাঁর জামাই-এর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় প্রায় চার বছর তিনি তার সঙ্গে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান নি। কিন্তু পাঁচ ছ'দিন আগে তাঁর জামাই তাঁর বাড়ী এসে ক্ষমাটমা চেয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। জামাই-এর বিনয় আর অনুনয়ে গোপালবাবু মেয়েকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার পর আর কোনো খবর পাননি।

দেখলাম বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমার তো চুপ করে থাকলে চলবে না। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হল। জামাই-এর নাম জেনে নিলাম। তারপর যখন শুনলাম যে তাদের বাড়ী শেওড়াফুলী ষ্টেশনের দু'এক ক্রোশের মধ্যে একটি গ্রামে, তখন আর দেরী করতে ইচ্ছে করল না। বৃদ্ধ গোপালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলাম হাওড়া ষ্টেশনে। তারপর প্রথম যে ট্রেন পেলাম তাতে চেপেই শেওড়াফুলী। কথায় কথায় সময় কেটে গেল। শেওড়াফুলী পৌঁছে গোপালবাবুকে নিয়ে যখন তাঁর বেয়াই বাড়ী পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই।

সেখানে সংবাদ পেলাম গোপাল বাবুর জামাতা বাবাজী সেই যে তার স্ত্রীকে আনতে গেছে কয়েকদিন আগে, তারপর আর ফেরেনি এবং কোনো সংবাদও দেয়নি।

গোপালবাবু তো কেঁদে আকুল হলেন। আমারও দৃঢ়বিশ্বাস হল যে গোপালবাবুর জামাই শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঐভাবে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে আর তারপর তাকে খুন করে লাশ বাক্সয় পাচার করে দিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়েছে।

ক্রমে পল্লীর অনেকেই এসে জড় হলেন এবং গোপালবাবুর কথা শুনে সকলেই আমাদের মত সন্দেহ প্রকাশ করলেন। জামাই-এর বাড়ীতে ছিল তার বিধবা মা এবং এক বিধবা বোন। তারা ভিন্ন ভিন্ন মুখে কি যে বলল তা ভাল মত বোঝা গেল না। তাদের এলোমেলো কথায় আমাদের সন্দেহ যেন আরও বাড়ল। গোপালবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, তাঁর জামাই তাঁর মেয়েকে খুন করেছে। আরও কিছু সময় অতিবাহিত করে তখনকার তদন্ত শেষ করে দুক্রোশ পথ ভেঙে ক্লান্ত শরীরে শেওড়াফুলী ষ্টেশনে পৌঁছে শুনলাম কলকাতা যাবার শেষ ট্রেন চলে গেছে।

অষ্টমী পূজার বাকি রাতটুকু ষ্টেশন প্লাটফরমেই কেটে গেল।

• • •

পরদিন ভোরবেলা প্রথম ট্রেনেই গোপালবাবুকে নিয়ে কলকাতা ফিরলাম।

ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফরমের বাইরে এসে পৌঁছেচি এমন সময় গোপালবাবু আমার জামায় টান দিয়ে বললেন, "দারোগাবাবু, ঐ দেখুন আমার জামাই দাঁড়িয়ে আছে।" বৃদ্ধের এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, যখন কোনো রহস্যের পথ পরিষ্কার হবার হয় তখন এইভাবেই হঠাৎ হয়। লাশ সনাক্ত হয়েছে, অপরাধী কে জানা গেছে, বাকি কেবল তাকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করা। আর দেখুন ঈশ্বরের কি মহিমা। দেখতে দেখতে অপরাধী নিজেই একেবারে সামনে এসে হাজির।

গোপালবাবুর নির্দেশ মত আমি ছুটে গিয়ে লোকটির হাত চেপে ধরলাম। হঠাৎ আমাকে ঐভাবে চড়াও হতে দেখে লোকটি খুব অবাক হয়ে বললে, "ব্যাপার কি মশায়? আমি কি করেছি যে এভাবে আমাকে ধর পাকড় করছেন?"

বললাম,—"শুধু, ধরপাকড় নয় তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাব।"

গোপালবাবুর জামাই বললে, "কে আপনি যে আমাকে বাঁধবেন?"

বললাম, "আমি একজন পুলিশ অফিসার। তুমি কি নিজে বুঝতে পারছ না, কেন তোমাকে গ্রেপ্তার করছি? এই দেখ আমার পরিচয় চাকতি।"

বলে পকেট থেকে আমার পিতলের চাকতিটা বের করে দেখালাম। গোপালবাবুর জামাই অবুঝের মত বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কি। আমি কি এমন অপরাধ করেছি, যার জন্যে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন!"

বললাম, "মিথ্যে ভড়ং এ কাজ হবে না। খুন করে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়।"

—"খুন। কি বলছেন আপনি। আমি কাকে খুন করেছি? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। কাকে ধরতে এসে কার ঘাড়ে পড়েছেন।"

কঠিন স্বরে বললাম, "আমার ভুলই হোক, বা যাই হোক এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বাড়াতে চাইনা। তোমাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে কলকাতার থানায় যেতে হবে। এস, এই গাড়ীতে এসে উঠে বস।"

গোপালবাবু ইতিমধ্যে পাশে দাঁড়ানো একটা টিকা গাড়িতে উঠে বসেছিলেন, আমি সেই দিকে তাকে নিয়ে যেতে চাইলাম।

আমার কথা শুনে গোপালবাবুর জামাই বিমূঢ় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "আপনি যখন পুলিশের লোক তখন আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যেতে বাধ্য। কিন্তু মশায়, আমার একটি নিবেদন আছে: আমার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক আছেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে ঐ মেয়েলোকটিকে বাসায় পৌঁছে দেবার আর কেউ নেই। তাই তাঁর জন্যে একটা বন্দোবস্ত করা দরকার।"

তার কথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম, "যে স্ত্রীলোকটির কথা বলছ তিনি তোমার কে হন?"

গোপালবাবুর জামাই বললে, "তিনি আমার স্ত্রী।"

গোপালবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত পাশের গাড়ীর ভিতর বসে আমাদের কথা শুনছিলেন। এইবার হড়মুড় করে গাড়ী থেকে বেরিয়ে জামাই-এর কাছে এসে ব্যাকুলভাবে বললেন, "বাবা! তুমি বলছে তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু সে কে? সে কোথায়?"

গোপালবাবুর জামাই উত্তর দিল, "সে কে তাকি আপনি জানেন না? কে আমার স্ত্রী আপনি কি তা ভুলে গেছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমার আর কটি স্ত্রী আছে। আপনার মেয়েই তো আমার স্ত্রী। ঐ দেখুন ঐ যে দূরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

তার কথা শুনে আমরা তো অবাক। গোপালবাবু এক দৌড়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে আমার দিকে ফিরে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "দারোগাবাবু, এই আমার মেয়ে বটে। এ খুন হয়নি।"

আমার অবস্থাটা পাঠকরা বুঝুন। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলাম। গোপালবাবুর জামাই তখন শ্বশুরের কাছ থেকে সব ঘটনাটা জেনে নিল। তারপর সকলে মিলে আমার গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল।

গোপালবাবু জামাইকে উদ্দেশ করে বললেন, "আজ কয়েকদিন কাটল, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী যাবে বলে আমাদের বাড়ী থেকে এসেছিলে, কিন্তু বাড়ী যাওনি, তাইতেই গোলযোগ এতটা বেড়ে গেছে।"

উত্তরে তাঁর জামাই বললে, "কি করি বলুন? আপনার বাড়ী থেকে আমরা সোজা হাওড়া স্টেশনেই আসছিলাম, পথে হঠাৎ আমার—খুড়তুতো ভায়ের সঙ্গে দেখা। তাদের বাড়ীতে প্রতিবছর দুর্গোৎসব হয়। এ বছর তার পালা পড়েছে। তাই সে আমাদের কিছুতেই ছাড়ল না, এক রকম জোর করেই তাদের বাড়ী নিয়ে গেল আর সেখানেই তিনদিন থাকতে হল। সেইজন্যে কদিন বাড়ী পৌঁছতে পারিনি। আজ কোনোরকমে বলে কয়ে বাড়ী যাবার জন্যে স্টেশনে এসে দারোগা বাবুর হাতে পড়লাম।"

এই বলে সে হাসতে লাগল। গোপালবাবুও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমিও কোন রকমে মেঁতো হাসি হেসে শ্বশুর জামাই মেয়েকে সেইখানে রেখে একাই বাসায় ফিরে এলাম।

• • • •

স্নানাহার সেরে বাসায় ফিরে ইচ্ছা হল সেই বাক্স আর 'সিকা' আর একবার পরীক্ষা করে দেখি। পঞ্চমী পূজার দিন সন্ধ্যে বেলায় সেগুলি দেখেছিলাম। এখন আবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম।

'সিকা'টি বেশ মোটা ধরণের। সচরাচর গৃহস্থের ঘরে যেরকম 'সিকা' থাকে এটি তার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত। গোয়ালারা বা ভারিরা যেরকম সিকা ব্যবহার করে এটিও সেই ধরণের।

জোরসটা প্রথমে মনে হয়েছিল নতুন। কিন্তু ভাল করে দেখে বুঝলাম, নতুন নয়, রং করা। বাক্সের তালার ওপর এক কোণে ইংরাজীতে কয়েকটা অক্ষর লেখা ছিল সাদা কালিতে। তার ওপর কালো রং পড়ে সেটা মুছে গেছে, কিন্তু তাহলেও আবছা অক্ষরগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করে অক্ষরগুলো পড়তে পারলাম, ইংরাজীতে লেখা, নিমতা। নামটার কোনো অর্থবোধ হল না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর হঠাৎ মনে হল, কাশীপুরের কিছু দূরে নিমতা নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। বাক্সটা সেখানকার কোনো বাসিন্দার হতে পারে মনে করে নিমতায় গিয়ে একটু অনুসন্ধান করা মনে মনে স্থির করলাম।

একজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তখনি। একটা টিকা গাড়ী ভাড়া করে কাশীপুর পেরিয়ে, নিমতার প্রান্তে পৌঁছলাম। আর গাড়ী চলবার রাস্তা নেই। কাজেই গাড়ী থেকে নেমে, গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলাম।

ছোট পল্লী। লোকজনের বেশী বসবাস নেই। তিনচার ঘর ব্রাহ্মণ এবং দশবিশ ঘর অপর জাতের লোক নিয়ে নিমতা গ্রাম।

ঘুরে ঘুরে দেখছি এবং দু'চারজনকে প্রশ্ন করছি কিন্তু কোনো সূত্রই পাচ্ছিনা, এমন সময় একটা সামান্য দৃশ্য দেখে আকৃষ্ট হলাম। সে দৃশ্য আর কিছুই নয়, রাস্তার ধারে এক জায়গায় কতকগুলি রান্নাকরা পুরানো হাঁড়ি পড়ে আছে।

পাঠকরা হয়ত ভাবছেন, এ আর এমন কী তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য, রাস্তাঘাটে এমন তো কতই দেখা যায়। কিন্তু আমি অন্যরকম চিন্তা করলাম। মনে হল, হাঁড়িগুলি বেশীদিন আগে ফেলা হয়নি, দু'এক দিনের মধ্যেই যার করা হয়েছে। কিন্তু মহামায়ার পূজার মধ্যে এভাবে তো কেউ হাঁড়ি ফেলেনা। কেউ মারা গেলে, বিশেষ করে অপঘাতে মৃত্যু ঘটলে তিনদিন অশৌচের পর হিন্দুরা হাঁড়ি ফেলে দেয়। যাই হোক হাঁড়ি ফেলার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।

অনেকক্ষণ খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল গোরাচাঁদ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে ঐ হাঁড়ি ফেলা হয়েছে। গোরাচাঁদরা চার ভাই। প্রথম গোরাচাঁদ, তৃতীয় ও চতুর্থ কেবলচাঁদ ও রূপচাঁদ সেই বাড়ীতেই থাকে। দ্বিতীয় ভাই রামচাঁদ পাঁচবছর আগে মারা গেছে। তার বিধবা স্ত্রী ভাসুর দেওরদের কাছে থাকে, তার কোনো ছেলে পুলে হয়নি। গোরাচাঁদের স্ত্রী ও দুটি ছোট ছেলে মেয়ে। কেবলচাঁদ ও রূপচাঁদ এখনও পর্যন্ত বিয়ে করেনি। একান্নবর্তী পরিবার। কেউই চাকরি বাকরি করে না। চাষ আবাদ করে ভালভাবেই সংসার চালায়।

• • • •

গোপনে গোপনে এইসব তথ্য সংগ্রহ করে গোরাচাঁদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। গোরাচাঁদ বাড়ীতেই ছিল, আমাকে দেখে এবং আমার পরিচয় জেনে মনে হল যেন বেশ ঘাবড়ে গেল। ভিতু ভিতু চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

বললাম, "আমি কী জন্যে এসেছি, কী ব্যাপারে তদন্ত করছি তা সবই ক্রমশ জানতে পারবেন। আপাতত আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আপনাদের রাঁধবার পুরোনো হাঁড়িগুলো বাড়ী থেকে বাইরে ফেলেছেন কেন?"

গোরাচাঁদ আমতা আমতা করে বললে, "কই, আমরা তো হাঁড়ি ফেলিনি। কে বললে আপনাকে এ কথা।"

আমি ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললাম, "দেখুন, মিছে কথা বলে কোনো লাভ হবেনা। জানেন তো পুলিশ অফিসার হিসেবে আমি এখুনি আপনার বাড়ী ঢুকে খানাতল্লাস করতে পারি।"

আমার কথাশুনে গোরাচাঁদ বেশ ঘাবড়ে গেল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "কিন্তু হাঁড়ি ফেলায় দোষ কী হয়েছে?"

বললাম, "দোষের কথা পরে হবে। প্রথমে আমি জানতে চাই হাঁড়ি ফেলার কারণ কী?"

এমন সময় গোরাচাঁদের আর দুই ভাই কেবলচাঁদ আর রূপচাঁদ আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। আমার কথাবার্তা শুনে তারাও খুব বিব্রত বোধ করতে লাগল।

আমি একটু তফাতে এসে আমার অনুচরটিকে চুপিচুপি বলে দিলাম, কাছাকাছি যে থানা আছে সেখানে গিয়ে দু'চারজন লোক নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। রাত হয়ে আসছে, কখন কি দরকার হয় বলা যায়না।

গ্রামের দুজন চৌকিদারকে ডাকিয়ে আনালাম। তারপর রাস্তার ধারে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে পাড়ার দু'চার জনকে ডেকে গল্প করতে লাগলাম।

একজন চৌকিদার আমার কাছেই রইল। আর একজনকে গোপনে বলে দিলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে এখুনি সে খোঁজ নিয়ে আসুক, গোরাচাঁদের ভাইবৌ এখন কোথায়, কী করছে এবং কী করে তার দেখা পাওয়া যায়।

চৌকিদার চলে গেল। নানা কথায় সময় কাটছে। ঘণ্টাখানেক পরে চৌকিদারটি ফিরে এসে দূর থেকে আমায় ইসারা করে ডাকল। আমি তার কাছে গিয়ে তার মুখে যা শুনলাম তা মস্ত খবর। গোরাচাঁদের বিধবা ভাইবৌ ঐ বাড়ীতেই বরাবর বাস করেছে। কিন্তু গত চার পাঁচদিন থেকে তাকে কেউই দেখতে পায়নি। সকাল বিকেল গাঁয়ের পুকুর ঘাটে সব মেয়েদেরই দেখা যায়। কিন্তু রামচাঁদের স্ত্রীকে দেখা যায়নি। স্ত্রীলোকটির চরিত্র ভাল ছিলনা। তার সম্বন্ধে নানান লোক নানান কথা বলত। শোনা গেছে ইতিমধ্যে একাধিকবার—ভাসুর আর দুই দেওর তাকে খুব তিরস্কার এমনকি প্রহার পর্যন্ত করেছে। চৌকিদার বুদ্ধি করে একটি স্ত্রীলোককে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে খোঁজ করায়। স্ত্রীলোকটি জানিয়েছে যে ঐ বিধবাটি বাড়ীতে নেই এবং আরো জানা গেছে যে সে কুলত্যাগ করেছে।

চৌকিদারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি নিজের জায়গায় এসে বসলাম। এমন সময় আমার সেই অনুচর থানা থেকে চারজন সেপাই নিয়ে এসে উপস্থিত হল। আমি পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে নিয়ে প্রস্তুত হলাম। দেখা যাক, আমার সন্দেহ এবং অনুমান সত্যে পরিণত হয় কিনা।

* * * *

আমার সহকারী, চারজন পুলিশ কর্মচারী, দু'জন চৌকীদার এবং আমি, এই আটজনে মিলে চক্রবর্তীদের বাড়ীটা ঘিরে ফেললাম। উদ্দেশ্য, বাড়ির ভিতর থেকে কেউ কোন জিনিষ বাইরে না পাচার করতে পারে।

বাড়ির চারপাশে পুলিশের পাহারা দেখে গোরাচাঁদ এবং তার দুইভাই আমার কাছে এলো। তারা কোন কথা বলবার আগেই আমি প্রশ্ন করলাম, "গোরাচাঁদবাবু, আপনারা চার ভাই ছিলেন না?"

গোরাচাঁদ বললে, "হ্যাঁ, চার ভাই ছিলাম। তাদের মধ্যে আমার মেজভাই বছর দুয়েক হল মারা গেছে, তাতো আগেই বলেছি।"

বললাম, "তাঁর স্ত্রী, যিনি আপনাদের কাছেই থাকতেন, তিনি কোথায়?"

দেখলাম, আমার কথা শুনে তিন ভাইএরই মুখ শুকিয়ে গেল। গোরাচাঁদ বললে—"তিনি এখানেই থাকতেন, তবে আজ ক'দিন আগে তিনি বাপের বাড়ি গেছেন।"

বললাম, "তাই নাকি! কিন্তু আমি আপনাদের বাড়ি সার্চ করে দেখতে চাই।"

পাঠকগণ! এইখানে আপনাদের একটি কথা আমার জিগেস করতে হল। বলুন দেখি, আমি কিসের জন্যে বাড়ি তল্লাসী করতে চাইলাম, কি এমন প্রয়োজনীয় জিনিষ আমি বাড়ির মধ্যে পেতে পারি যাতে এই তদন্তে আমার সুবিধা হবে? এক, বাড়ি তল্লাস করে দেখা যেতে পারে সেই বিধবা আছে কি না। কিন্তু তা তো জানতেই পারলাম, সেই স্ত্রীলোকটি নেই। হয় সে তার পিত্রালয়ে গেছে, নাহয় তারই কাটামুণ্ড কাচের পাত্রে রয়েছে। দুই, এই খুনের উদ্দেশ্য চুরী নয় যে বাড়ি তল্লাসী করে কোন চোরাই মাল উদ্ধার করব। তিন, হাঁড়ী ফেলার ব্যাপার! তা, তারা তো স্বীকারই করেছে। তাহলে কিসের জন্যে খানাতল্লাসী করব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আপনার সক্ষম হন তাহলে বুঝবো যে আমার এই গল্পের লেখা সার্থক হয়েছে। না যদি পারেন, তাহলে শুনুন, আমি বলছি। স্মরণ করুন, যে সময়ে

মৃত দেহটি পাওয়া গিয়েছিল সেসময় তার গলায় একগাছা সিকা বাঁধা ছিল। আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন, ঐ ধরণের সিকা একটা ব্যবহৃত হয় না, এক জোড়া ব্যবহৃত হয়। এখন, ঐ বাড়ি তল্লাস করে যদি ঐ সিকার জোড়াটি পাই তাহলে তা আমার পক্ষে কতখানি কাজে লাগে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। তাই বাড়ির মধ্যে তল্লাসী চালানোয় এবং আমার উদ্দেশ্য সফলও হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই সিকার জোড়াটি পাওয়া গেল।

তখন তিন ভাইকেই আটক করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি চিঠি লিখে আমার অনুচরকে কলকাতার সদর থানায় পাঠিয়ে দিলাম। সে আমার গাড়িতে চেপে চলে গেল। আমরা সেইখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত প্রায় তিনটের সময় আমার অনুচর ফিরে এলো। তার সঙ্গে এসেছেন, আমারওপরওয়ালা আসিটাণ্ট কমিশনার। পত্রে যে যে জিনিষগুলি আনবার জন্যে লিখেছিলাম, সেগুলিও এসেছে, যথা, সেই কাটামুণ্ড, সেই টিনের ভোরঙ্গ, আর সেই সিকা।

গ্রামবাসীদের সেই কাটামুণ্ড দেখানো হল। যারা বিধবাকে চিনত তারা সকলেই একবাক্যে বললে যে এ সেই বিধবারই মুণ্ড।

অবশ্য সোরাচাঁদ এবং তার দুই ভাই কোন কথাই স্বীকার করল না। কিন্তু আমরা যা সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছি তার জোরে তিন ভাইকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে এলাম।

তারপর সন্ধান করে সেই বিধবার বাপের বাড়ী খুঁজে বার করলাম। তার বাপ মা দু'জনেই ছিল। তারা কাটামুণ্ড দেখে সনাক্ত করল, এ তাদেরই মেয়ের কাটামাথা।

সেই গাড়োয়ান আর সেই মুটেকেও খুঁজে বার করা হল। গাড়োয়ান তিন ভাইকে দেখে এজাহার দিল যে, রূপচাঁদ তার গাড়ী ডেকে এনেছিল এবং কেবলচাঁদ তার গাড়ীতে চেপে ভোরঙ্গ নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। মুটে কেবলচাঁদকে সনাক্ত করে বললে যে গাড়ীর মাথা থেকে বাক্স নামাতে এই লোকটিই তাকে বলেছিল।

যোকর্দমায় তিন ভাইকেই আসামী করা হল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষীদের জবান বন্দী নিয়ে আসামীদের দায়রা সোপর্দ করলেন।

স্পষ্টই বোঝা গেল, মতলবী ভাইবৌকে তিন ভাই মিলে খুন করে ঐ ভাবে লাশ পাচার করেছে। আসামীরা উকিল কৌঁসুলী দিয়ে মামলা চালাতে লাগল। বিচারে খুনের কোন প্রমাণ না হওয়ায় সোরাচাঁদ ছাড়া পেল। কেবলচাঁদ লাশ গুম করার অপরাধে দু'বছরের জন্যে জেলে গেল। কেবলচাঁদের সহায়তা করার অপরাধে রূপচাঁদের প্রতিও এক বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হল।

মামলা শেষ হল! যে যার কর্মের ফল পেল। কিন্তু আমি বেচারা বিনা অপরাধে সে বছর মহামায়ার পূজা দর্শনে বঞ্চিত হলাম।

[দুর্গম পাহাড় ঘেরা পূর্বাঞ্চলের এক অরণ্যের পটভূমিকায় হঠাৎ দুর্ঘটনায় নিক্ষিপ্ত একটি নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর পুরুষ ও একজন উচ্চতলার মহিলার জীবনের কয়েকদিনের ঘনিষ্ঠ বিচিত্র ঘূর্ণনিবদ্ধ উপন্যাসোপম কাহিনী। অরণ্য এখানে নিজেই একটি বিশিষ্ট চরিত্র। গল্পের উর্ধ্বে বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জীবনের একটি গভীর মর্মান্তিক সত্যের যে প্রতীক সংকেত এই কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছে—এই কাহিনীর সেটিই প্রধান সাহিত্য মর্যাদা।]

অরণ্য

প্রফুল্ল সরকার

ভয়ও নয়, বিস্ময়ও নয়, কেমন যেন একরকম সর্বাঙ্গীন নিষ্ক্রিয়তা। শুধু নিচের দিকে চাইলেই পায়ের পাতাদুটো কেমন শিরশির ক'রে ওঠে। তা'হলেও চোখ সমানে মেলে চলেছে, মন ব'লছে, এ কোথায় এলাম—এ কোথায় যাচ্ছি!

মাটির বুকে যে পরম নির্ভর নিশ্চিন্ততা, তা মাটি না ছাড়লে সত্যিই বোঝা যায় না।

ওই যে নিচে খেলাঘরের মতো বাড়িঘর, ওই যে সরু রেখার মতো নদীগুলো কোন্ দিগন্তের দিকে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, সবুজ হলদে কার্পেটের মতো যে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত-খামার ওগুলো কোন্ পৃথিবীর!

শক্ত মাটির কথা মনে হ'লেই আবার পায়ের তলা দুটো কেমন অদ্ভুত শিরশির্ করে ওঠে। কে জানে, আবার মাটির ওপর পা রাখা যাবে তো! শোনা জানা যত রকম দুর্ঘটনার কথা মনে হ'য়ে বেশ অন্য রকমের একটা দীর্ঘনিশ্বাস প'ড়লো সুরেনের।

এরোপ্লেনখানা তখন শিলচর ছাড়িয়ে আসামের পাহাড় আর জঙ্গলের ওপর দিয়ে চলেছে। মাটির থেকে ন'দশহাজার ফুট উঁচু দিয়ে চ'লেছে, চারদিকে উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল।

সুরেনের এই প্রথম এরোপ্লেনে ওঠা, অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নব অভিজ্ঞতা। দু'কানে তুলো আটকে রেখেও থাকলে কি হবে, কানের দফারফা হ'য়ে গিয়েছে। এঞ্জিনের অতো যে কড়া শব্দ, এখন শুধু একটু মৃদু কাতরানির্ মতো শোনাচ্ছে।

এয়ার-হস্টেস তিনবার বলতে তবে সে বুঝতে পারলো, চা খাবে না কফি খাবে, যদিও হস্টেস্ কানের অতি কাছে মুখ রেখে গানের ঝঙ্কারের মতো কথাগুলি উচ্চারণ ক'রেছিল।

হস্টেসটি বেশ, বাঙালী নিশ্চয়ই, নইলে অতো সুন্দর বাঙলা কথা বললো কি ক'রে! তারি স্মার্টতো, তারি সুন্দর মুখখানা, চোখ দুটো আরো ভালো।

সুরেনের লজ্জা ক'রলো নিজের অন্যের কথা ভেবে। ঐ মেয়েটিতো নিত্যই এমনি যেন যাতায়াত করে, চলন্ত প্লেনে হেঁটে হেঁটে ঐ তো কেমন যাত্রীদের সুখ-সুবিধের খবর নিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, যেন কিছুই

হয় নি, যেন মাটির ওপর মশলাহীন ফুট উঁচু দিয়ে নির্ভর-হীন অবস্থায় তারা ভেসে চলছে না, ঐ মেয়েটির কাছে উড়ন্ত প্লেনটা যেন দুর্নিবার।

সুরেন কি একটি কাপুরুষ নয়।

সে অন্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলে, এর আগেও অনেকবার দেখেছে। প্রায় সকলেই একটা খবরের কাগজ, কি ম্যাগাজিন নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। দু'একজন ছোট গোল জানলার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। বোঝবার যো নেই, কি এরা ভাবছে।

তাকে দেখে কি কেউ বুঝতে পারবে, সে কী ভাবছে!

আলোর সংকেত ফুটে উঠলো—গ্রীজ ফাস্ন্ দি বেল্ট—বেল্ট বাঁধো। সুরেনের আবার গোলমাল হলো, বাঁধতে পারছিল না। কথায় তো হস্টেস্ শিখিয়ে দিলে। হস্টেস্ একটু হেসে তা'র ভুলটুকু শুধরে দিয়ে গেল।

তারপর সত্যিই সুরেনের সর্বশরীর হিম হয়ে যেতে লাগলো। প্লেনটা ভীষণ দুলছে, সড়সড় ক'রে নিচে আরও নিচে নামতে লাগলো, আবার যেন কে বাইরে থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে পাশ ফিরিয়ে দিলে। এবার হস্টেস্ অভয় দিয়ে গেল এখানকার এয়ার পকেটটা একটু বেয়াড়া, এটা পার হ'লেই ঠিক হ'য়ে যাবে। সুরেন জানলা দিয়ে দেখলে চারদিক অন্ধকার মতো দেখাচ্ছে, বড় বড় মেঘের চাঙড়গুলো হস্ হস্ করে পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে যাচ্ছে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ছোট জানলার কাচের ওপর এসে পড়ছে। মেঘের ঘন কালো পর্দার ভেতর দিয়ে নিচে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাতাসের বল দিয়ে মাথার ওপর অবিশ্রান্ত যে বাতাসের ধারা ধরে চলেছে, তা কন্‌কনে ঠাণ্ডা, মরামানুষের গায়ের মতো হিম।

তারপর বোধ হয় বাজ প'ড়লো, না আকাশটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। সুরেনের সমস্ত চৈতন্য যেন লোপ করে নিতে গেল। শুধু প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ, সুরেনের আর কিছু মনে নেই।

হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা নয়তো চব্বিশ দিন, সময় বা সংস্থানের কোন খেয়াল নেই সুরেনের। চোখ মেলে যখন চাইলে তখন প্রচণ্ড পাহাড়ে বৃষ্টির ধারায় তার সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপ্ ক'রছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ প্রতিহত হ'য়ে চারদিকের সমস্ত পাহাড়গুলো যেন হাজার হাজার অসুর মতো বন্য উল্লাসে আকাশ অরণ্য মাটি কাঁপিয়ে একটানা হুঙ্কার দিচ্ছে। ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়ী গাছের ঘন দুর্ভেদ্য ঝোপের ওপর তার সারা শরীরটা ঝুলে রয়েছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে, সুরেন খানিকক্ষণ ব'সে ভেবেই গেলেনা।

এটা সকাল না বিকেল—দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তা দেখে কিছুই বোঝা গেলনা।

ধীরে ধীরে সব কথা তার মনে পড়লো।

প্লেন ভেঙে প'ড়েছে, তাহলে—না—সে পুড়ে মরেনি। এইতো—এইতো সে হাত নাড়তে পারছে, পা-ও। সে উঠে বসবার চেষ্টা করলে, বড় দুর্বল হয়ে গেছে সে। শুয়ে শুয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখলো —কি উঁচু উঁচু পাহাড়—এদিকে—ওদিকে—সেদিকে, মাঝখানে ঘন জঙ্গল, মাথার ওপর আকাশ সহজে দেখা যায় না।

বৃষ্টির বেগ কমে আসছে। সুরেন তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে ধীরে ধীরে গাছ বেয়ে নিচে নামলো। বৃষ্টি ধরে আসায় সে এক অদ্ভুত শব্দ, পাহাড় ধুয়ে ওপর থেকে মোটা জলের তোড় প্রচণ্ড

বেগে একটানা ঝরঝর শব্দে নিচে নেমে আসছে। পাহাড়ের তলা দিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে পাহাড়ে নদীটা ফুলে ফুলে গোঁ গোঁ করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গিয়েছে। ভয়ে সুরেনের বুকের ভেতরটা গুরগুর করতে লাগলো।

সুরেন তো কোন কালে এত ভীরু ছিলনা। সে পাড়াগেঁয়ে ছেলে, অনেককাল বাবার সঙ্গে সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে ঘুরেছে বেড়িয়েছে। জঙ্গল দেখে তার ভয় হবার কথা নয়। তবে ভয় তার অন্য জায়গায়।

নির্ঘাত মৃত্যু থেকে বেঁচে কী লাভ হ'লো! এ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের কারাগার থেকে কে তাকে বাঁচাবে, কেমন করে সে উদ্ধার পাবে? চারদিক দেখে মনে হলো এখানে কোনদিন কোন মানুষ আসেনি, আর কোনও দিন আসবেনা। সেই একমাত্র এসেছে এবং ভিলে ভিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তার স্ত্রী মমতার কথা মনে পড়লো, তার বড়মেয়ে ভক্তির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তারপর নন্টু—সেই দুষ্টু ছোট ছেলেটি, আর সেই রোদায় শুয়ে চোখ পিটপিট করে চেয়ে থাকা বাচ্চা মেয়েটি—ভক্তি! মা তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না জীবনে! অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখের সমস্ত পেশীগুলো কেমন থরথর করে কেঁপে কুঁচকিয়ে উঠলো, তারপর টপটপ করে চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ ডান দিকের ঐ ঝোপের নিচে চোখ পড়তেই সুরেন আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু তার গলা দিয়ে শুধু একটা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হ'লো না।

ভুল নয়, মায়া নয়, এক্কার হুইলের পাড়ীর একটা কোণা গাছের ডালে আটকে রয়েছে। মেয়েটির অর্ধেক শরীর ঝোপের ওপর, আর অর্ধেকটা ঝুলে দুলছে।

সুরেন তাড়াতাড়ি গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠলো। মনে হ'লো, মরে গিয়েছে, অনেকক্ষণ ম'রে গিয়েছে। তবু তা'র শরীর স্থির হ'য়ে গেল, নিজের কথা একেবারে ভুলে গেল। কোথা থেকে তার গায়ে যেন ভূতের শক্তি এলো। মেয়েটির ছিপছিপে দেহটা বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে সে আস্তে আস্তে নিচে নামলো। তারপর সেই পাহাড়ে নদীটার ধারে একটা সমতল জায়গায় তাকে খুব সন্তর্পণে শোয়ালে। মনে হ'লো, মেয়েটির বুকের কাছটা যেন অল্প ওঠা-নামা ক'রছে। নাকের কাছে হাত দিয়ে অনুভব করলে, বোধহয় মৃদু মৃদু নিশ্বাস প'ড়ছে। কি করবে সে? শার্টটা খুলে জলে ভিজিয়ে নিংড়ে ওর মুখে চোখে দেবে? কিন্তু ঐ তো একটু আগে অতো বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তার নিজের প্যান্ট্ ও শার্টের মতো মেয়েটির পাড়ী ব্লাউজও ভিজে সপ্ সপ্ ক'রছে। যে বৃষ্টি তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে, এরও ফিরিয়ে দেবে। শুধু সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পৃথিবীতে এখন তার একমাত্র কাজ—একে বাঁচিয়ে তোলা, তার পাশে আর একটা জীবনের স্পন্দন তা'র না হ'লেই নয়। তার নিজের বাঁচার জন্যে একে বাঁচিয়ে তোলা তার একমাত্র দরকার। সে ধীরে ধীরে অসীম স্নেহে মমতায় তা'র গালে কপালে হাত বোলাতে লাগলো।

অনেকক্ষণ—একঘণ্টা—দু'ঘণ্টা—তা'র কোন পরিমাপ নেই, সময় বল্গাহীন ঘোড়ার মতো ছুটে চ'লেছে। শুধু বোঝা যায় রোদ উঠেছে, তার আভাস অরণ্যের অনেকখা ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে কোন প্রাণের সাড়া নেই, একটা পাখিও ডাকে না। শুধু ঝর ঝর একটানা শব্দে এখনও মোটা তোড়ে পাহাড়ের ওপর থেকে সেই জলের ধারা সমানে নিচে এসে পড়ছে ও ভেঙে পড়ছে।

মেয়েটি চোখ খুলে তাকালে, তারপর আবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য সেবা ক'রে সুরেন তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে পরদিন সকালবেলা।

অতি ক্ষীণ দুর্বল গলায় মেয়েটি বললে, আমি কোথায়—ওঃ—মা—

সুরেন অতি সন্তর্পণে অতি কোমলভাবে তার মাথায় কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ভয় নেই, আমি আছি, আপনার কোন ভয় নেই—আমরা বেঁচে গেছি। হ্যাঁ, শুনুন, আমরা বেঁচে গেছি।

সুরেনের আশ্বাস ভরা মৃদু কথাগুলি তার নিশ্চেতন দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে বোধহয় মৃদু সংস্কারের মতো খেলেছিল। অসীম ক্লান্তিতে মেয়েটির বড় বড় চোখের পাতা দুটি আবার বুজে এলো। সেই জঙ্গলে রাতের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা সুরেন হয়তো জীবনে আর কোনও দিন ভুলতো না, যদি না—সে অনেক পরের গল্প. আরও এক ভয়ঙ্করতম অভিজ্ঞতা, আর এক চরমতম সংকটের সেই ভয়াবহতা.- সুরেন অবিশ্যি তখন একেবারে উন্মাদ, তা না হ'লে—সে যাক্।

দিনের, সময়ের কোন হিসেব নেই। তবু তারা দু'জনে ওপর দিকে দিনভোর চেয়ে থাকে, কোন উদ্ধারকারী প্লেনের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় কি না। তাদের প্লেনখানা ও আর আর যাত্রীদের যে কোথায় কি দশা ঘটলো, তারও কোন হদিস্ তারা পেল না। দিনটা যায় আহারের সন্ধানে, রাতটা যায় ভয়ে ভয়ে বিনিদ্র। সে ভয়কে বোঝানো যায় না, সে ভয়ের অস্তিত্ব আছে, আকার নেই, অবর্ণনীয়।

চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া উঁচু পাহাড়ের পাঁচিলের মধ্যে যে জঙ্গলটুকুর মধ্যে তারা বন্দী, তার কোন গাছে কোনও চেনা জানা ফলের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিছু কিছু বিচিত্র রকমের ছোট ছোট ফলের গুচ্ছ কতকগুলো গাছে পেকে র'য়েছে, তলায় অপর্যাপ্ত বিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু ভয় হয় খেতে, যদি বিষফল হয়।

প্রথম তিনদিন একেবারে অনাহারে কেটেছে। ভগবানের আশীর্বাদের মতো হঠাৎ কয়েকটি আমলকী গাছের সন্ধান পাওয়া গেল, প্রচুর বড় বড় আমলকী ফলে রয়েছে। তাই অমৃতের মতো লাগলো। সেই কষায় অম্ল তিক্ত রস পাকস্থলীর স্তরে স্তরে গিয়ে সারা শরীরময় যেন প্রাণসঞ্চার করলে।

এই নিবিড় জঙ্গলে রাতের একমাত্র অস্ত্র ছিল আগুন। পাহাড়ের ধারে তিনকোণা একটা জায়গা—ওপরে আচ্ছাদন না থাকলেও কিছুটা গুহার মতো নিরাপদ। সেখানটা পরিষ্কার ক'রে দু'জনে মিলে শুকনো কাঠ-কাটরা যোগাড় ক'রে আনলে, তারপর আগুনের একটা বেড় জ্বালিয়ে সারারাত তারা আধো ঘুম আধো জাগার মধ্যে কাটিয়ে দিত। এই অরণ্য জীবনে সুরেনের পকেটের ভরা দেশলাইটা ভাগ্যক্রমে তাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র অস্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের ধুনীর মতো আগুন একটা দিনরাত তারা জ্বালিয়ে রাখতো।

সুরেন রোজ বেরোয় পথের সন্ধানে, ইন্দিরা থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে; প্রথম প্রথম ইন্দিরা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, একা একা থাকা সে বড়ো ভয়ের ব্যাপার। সুরেন বুঝিয়েছিল, তার পক্ষে জঙ্গল ভেঙে পাহাড়ে চড়া, সে ভয়ঙ্কর কষ্টের ব্যাপার, সহ্য করতে পারবে না। অগত্যা ইন্দিরা একা বসে থাকে সুরেনের পথের দিকে চেয়ে। কি উৎকণ্ঠা, কি দুর্ভাবনা! সুরেন রোজই ফিরে আসে অসীম ক্লান্তি আর হতাশা নিয়ে।

আজও এখান থেকে বেরোবার কোন পথ পেলেন না? কি হবে সুরেনবাবু?—ম্লান দুটি চোখ তুলে ইন্দিরা ব'ললে। মানুষের গলায় এমন নৈরাশ্যের সুর সুরেন জীবনে কখনও শোনেনি।

পেলাম না, পেলাম না, পথ নেই—বোধহয় পথ নেই! দিন ভোর ঘুঁজলাম।

ইন্দিরা হাত দেখিয়ে বললে, ঐ দিকটা গিয়েছিলেন—ঐ যে যেখানে পাহাড়টার মাঝামাঝি একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে?

গিয়েছিলাম, আর একটু হলেই ম'রতাম?

ইন্দিরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কেন—কেন ?

সমস্তটা জায়গা জুড়ে কিং কোব্‌রার বাসা। বোধ হয় একশো ছুশো সাপ কিলবিল করছে। কত বাচ্চা, এক একটা বাড়ি ছ'সাত ফুট, চার পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে ফণা তুলে দুলছে। কোনক্রমে যদি একবার দেখতে পেতো—তেড়ে এসে একবারে মাথায় ছোবল মারতো। সুরেন ক্লান্তিতে হতাশায় অনাহারে অবসন্ন হ'য়ে দুটো হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ব'সে পড়লো।

এমনি ভাবেই মরতে হবে, তবে বেঁচে কি লাভ হ'লো ? এবার হয়তো ইন্দিরা নীরাহীন হতাশার অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে যেন নিজেকে নিজে বললে।

সুরেন একবার চোখ তুলে তাকালো, তারপর আবার মাথা গুঁজে ব'সে রইলো। আস্তে আস্তে সারা অরণ্যে দিক্‌ভোড়া অন্ধকার নেমে আসছে।

সেদিনও সুরেন বেরিয়েছে পথের আর খাদ্যের সন্ধানে। কত সময় কেটে গেছে তার ঠিক নেই। সেই নিবিড় জঙ্গলের কোন্ দিকে কোন্ পাহাড়ের মাথায় কোন্ আড়ালে সূর্য এগিয়ে এসেছে, তার নিশানা পাওয়া দুষ্কর। শুধু দিন, শুধু উজ্জ্বল আলোর আভাস দুর্ভেদ্য জঙ্গলের পাতার ফাঁক দিয়ে বোঝা যায়। কোথাও তির্যকভাবে রোদের রশ্মিগুলি উজ্জ্বল বর্শার মতো যেন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করতে চাইছে কিন্তু লক্ষভ্রষ্টতার লজ্জায় সে নিজেই যেন নিষ্প্রভ ম্রিয়মান।

ইন্দিরা পাথরের মূর্তির মতো গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। মনে হয়, সে যেন মৃত্যু-পুরীর কোন মৃত শরীর। সুরেন যতক্ষণ পাশে থাকে তবু মনে হয় বেঁচে আছে। যা থাকলে মনে হয় মৃত্যুর শূন্যতায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করা সুরেনের পায়ের শব্দের ক্ষীণ আভাসটুকু শোনবার জন্যে। ভয় পেয়ে পেয়ে ভয় পাবার সূক্ষ্ম যন্ত্রটাও বুঝি বিকল হ'য়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে একটা আতঙ্ক হয়, সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথার মতো সে আতঙ্ক ছুরির ফলার মতো বিঁধে যায়—সুরেন যদি আর ফিরে না আসে।

হঠাৎ ইন্দিরা ক্ষুব্ধ পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। সে খাড়া হ'য়ে বসলো, কোন্‌দিক দিয়ে আওয়াজটা আসছে ঠাহর করবার চেষ্টা ক'রলে। সুরেন ছাড়া আর কে! ইন্দিরা দেখতে পেয়েছে। দূরে অসংখ্য দীর্ঘ তালগাছের গোলকধাঁধার মতো রন্ধ্রপথে সুরেনের দীর্ঘ দেহটী দেখা যাচ্ছে। সুরেন দৌড়চ্ছে কেন ? পথের সন্ধান পেয়েছে ? আবার বাঁচবো—আবার কি—

সুরেন ততক্ষণে এসে পড়েছে। সে হাঁপাচ্ছে। তাঁর হাতে ঝোলানো দুটো আহত বন-মুরগী মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটাচ্ছে। তাদের ঝোঁতলানো মাথা দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

দেখুন—মেরেছি পাথর দিয়ে—অনেক অনেক আছে—সুরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

পাকস্থলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই অতি-চেনা কিন্তু প্রায় বিস্মৃত যন্ত্রণার সাড়া মুহূর্ত থেকে স্পষ্ট হ'চ্ছে। কোন নিবিড় আস্তব ক্ষুধা যেন নতুন ক'রে শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে। ইন্দিরা মহা আগ্রহে সুরেনের হাত থেকে একটা মুরগী তুলে নিলে। তখন তার পাখার ঝাপট ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। শুধু রক্তের বিন্দুগুলি তাজা টক্‌টকে লাল।

সেই জঙ্গলের জীবনে এ যেন নতুন কোন উন্মাদনা। পরিবেশ, ভবিষ্যৎ, আশা, আতঙ্ক, মৃত্যু সব সেই রাতটার জন্যে অন্তত সাময়িক ভাবে দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

দিন যায়। উদ্ধারের কোনরকম আর কোন উপায় নেই। দু'জনে দু'জনের নিজের নিজের কথা ভাবে, কেউ জানেনা কে কি ভাবছে। এ রকম বিপদের মধ্যেও কেন যে তা'রা অস্বস্তি হ'তে পাচ্ছেনা, কোথায় যেন কি এক অদৃশ্য তালের মতো বাধা র'য়েছে, তা' ঠিক বোঝা যায় না। হাসছে, কথা বলছে, সুরেনের সামান্যতম অসুবিধাতেও উৎকণ্ঠা হয়—তবু এক অদৃশ্য দুর্লঙ্ঘ্য আড়াল দুজনার মাঝখানে নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে। সুরেন এই বন্য পরিবেশে কি বন্য হ'য়ে গেল? সেও তো বেশি কথা বলেনা বাড়ীর কথা ভেবে চোখ জলে ভরায় না। যেন বন্য-মুরগীর সন্ধান করা, পাথর হাতে ক'রে শুধু পেতে ব'সে থাকা ছাড়া জীবনে আর তাঁর কোন কাজ ছিল না। সে সাড়ে তিনশো টাকার মাইনের লিপ্টন্ কোম্পানীর চায়ের এজেন্ট্ নয়, মমতা ব'লে তার স্ত্রী নেই, বন্টি ব'লে আট বছরের মেয়ে। বন্টু ব'লে ছেলে আর তুলী ব'লে জোলার মোয়া বাচ্চা মেয়ে, এ সব কিছু নেই, কিছু ছিল না তার। তার ট্রাউজার ময়লা, চুল রুক্ষ, হাওয়ায় উড়ছে, চোখে কিরকম বন্য ক্ষুধার্ত লাল চাউনি। যেদিন বন মুরগী মেলে, কেমন যেন বন্য একটা হাসির দীপ্তি খেলে যায় তার রাঙা রাঙা ক্ষুধার্ত দুই চোখে।

আর ইন্দিরা। চেহারার পরিবর্তন হ'য়েছে অনেক। যে রূপ ও যৌবনের জন্য তার চাকরি, যাকে ঘষা-মাজা ক'রে সে অপরূপ হয়ে উঠতো, তা' ম্লান হ'য়ে আসছে তবু মাঝে মাঝে তার ভয় হয়, বড় ভয় হয়। সুরেনের ক্ষুধার্ত চোখ দুটোর দিকে তাকালেই তার ভয় হয়। কলাপাতা মুরগীর পায়ের হাড় ধরে চোখ বুজিয়ে ওপরকার শক্ত মাংস সুরেন যখন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবুতো, আর সেই সঙ্গে তার ভারী চোয়ালের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে ওঠানামা করতো, তা' দেখে ইন্দিরার বড় ভয় লাগতো, বুকের ভেতর কেঁপে উঠতো। সুরেনের মোটা ভুরু, খর্বাকৃতি নাক, বড় বড় দাঁত, তার সুপুষ্ট পেশীবহুল শরীর, তাঁর মোটা ভারি গলার আওয়াজ—যা কিছুদিন আগে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, আশ্বাস দিয়েছিল, এখন কেমন ক'রে জানি না, তা'র ভয়ের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে একদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে গেল। অবিশ্যি অদ্ভুত ঠিক নয়, এতদিন এই আসামের জঙ্গলে না ঘটাটাই অদ্ভুত ছিল। বিকালের একটু আগে ইন্দিরা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে একমনে অতল ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছে। হঠাৎ সামনের একটা গাছের পাতায় ঢাকা বেঁকানো এক ডাল থেকে সবুজ সাদা আর কালোয় মিশানো প্রকাণ্ড এক ময়াল সাপ্ বিরাট হাঁ ক'রে তার প্রকাণ্ড শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে তার দিকে এগোচ্ছে। পাতার শব্দে ওপর দিকে তাকিয়েই একটা ভয়ার্ত চীৎকারে সারা বনকে সচকিত করে অসাড় হ'য়ে ইন্দিরা একদৃষ্টে সেই ভয়ঙ্কর সাপটির দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলো। আত্ম চৈতন্য ব'লতে যেন আর কিছু নেই, পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। জীবন আর মৃত্যু তখন কয়েক সেকেণ্ডের কাঁটায় দুলছে। কোথা থেকে গাছের ডালের একটা ভারি লাঠি নিয়ে সুরেন ছুটে এলো, তারপর অসুরের শক্তি দিয়ে সাপটির মাথার ওপর সজোরে বাড়ির পর বাড়ি মারতে লাগলো। সাপটি বিরাট কুণ্ডলি পাকিয়ে মাটির ওপর প'ড়ে গেল, তারপর পাক খেয়ে খেয়ে হঠাৎ বেগের এক ঝাপটে ইন্দিরাকে দশগজ দূরে ছিটকে দিলে।

তারপর সাপে আর সুরেনে সে কী মর্মান্তিক সংগ্রাম!

অবশেষে সাপটা নেতিয়ে পড়লো। তারপর একেবারে স্থির হ'য়ে গেল।

সুরেন মোটা লাঠিটার ভর দিয়ে প্রাণপণে হাঁপাচ্ছে, তাঁর ছেঁড়া শার্টের ভেতর দিয়ে দু'হাতের স্ফীত

পেশীগুলো দেখা যাচ্ছে। কামারের হাপরের মতো তার বুকটা প্রবলভাবে ওঠাপাড়া করছে। প্রায় আধঘণ্টা কি আরও বেশি, তারপর সুরেন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

ইন্দিরার কাছে ছুটে গিয়ে দেখে সে মূর্ছিতের মতো প'ড়ে আছে। দুহাতে পালকের মতো তা'র শরীরটা জড়িয়ে ধ'রে সে পাহাড়ে নদীর দিকে এগিয়ে চ'লতে লাগলো। সুরেনের মনে হলো তার পেশীতে পেশীতে তা'র রক্তের ধারায় কী যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা হ'চ্ছে। তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। নিশ্বাসে জলন্ত আগুনের দাহ। বন্য মৃগীর কলজানো মাংসের রস ও স্বাদ তার তৃষ্ণার্ত জিহ্বা যেমন চুষে চুষে নেয়, সুরেনের মনে হ'লো তা'র সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত জিভ মেলে এই অর্ধ-মূর্ছিতা মেয়েটির শরীরের রস ও স্বাদ চুষে চুষে নিচ্ছে, তবুও ক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নেই, তৃষ্ণার যেন শেষ নেই।

সুরেন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলের ধারা ইন্দিরার চোখে মুখে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। ইন্দিরা একবার অভিভূতের মতো গভীর কৃতজ্ঞতা ভরানো দুই চোখমেলে সুরেনের দিকে তাকালো।

সুরেনের বুকের মধ্যে আবার তোলপাড় করতে লাগলো। বিকেলের যতটুকু আলো ইন্দিরার মুখে চুলে তার মৃদু আন্দোলিত বুকের ওপর প'ড়েছিল, তা দেখে সুরেনের মনে হ'লো, কোন বন্য জন্তুর মতো সে চীৎকার ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে, তারপর এই নির্জন নদীর ধারে এই সুকুমার যুবতীর দেহকে সে নিজের ইচ্ছামতো দলিত পিষ্ট মথিত ক'রে তার সর্বাঙ্গের জিভ দিয়ে ধীরে ধীরে চুষে চুষে উপভোগ করে।

সুরেনের ঐ দৃষ্টিতে ইন্দিরা আবার ভয় পেলো। মুখে অসাড় খেঁতলানো মরা সাপটার দিকে একবার, তারপর সুরেনের দিকে সে ভীত চোখে দেখলে। তারপর নিজের বিশৃঙ্খল বেশবাসকে গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে তাদের আস্তানার দিকে গেল।

সে রাতে কোন আহার্য যোগাড় ছিল না। আগুনের সস্নেহ তাপ, অবসন্ন স্নায়ু আর অনাহার ইন্দিরাকে ঘুমে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল সেই রাত্রিতে।

আর সুরেন, সে কি ঘুমিয়েছিল?

তখন অনেক রাত—অনেক অন্ধকার। জলন্ত আগুনের যেটুকু অস্পষ্ট আলো প'ড়েছিল তাতে দেখা গেল যে দুটো দেহ কঠিন নিবিড় বন্ধনে জড়াজড়ি ক'রে গুহার কোণের দিকে ওলোট-পালট খাচ্ছে। শুকনো পাতার ওপর প্রবল খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। শুধু একটা তীব্র তীক্ষ্ণ কান্নার ছিন্নভিন্ন মেয়েলি স্বর মাঝে মাঝে ফুঁসিয়ে উঠছে—ইউ বীষ্ট্—ইউ বীষ্ট্—

পরদিন অনেক সকালে উঠে সুরেন গুণ্ গুণ্ ক'রে গাইতে গাইতে শিকারের সন্ধানে চ'লে গেল। তা'র চোখের লাল আভা যেন অনেকটা ক'মে গিয়েছে। মনে হয়, এই জঙ্গলের মধ্যে হয়তো সে কোথাও এমন কোন ফলের সন্ধান পেয়ে তা'র রসাস্বাদন ক'রেছে, যা খেলে আর ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না। দু'হাতে ঐরাবতের শক্তি আসে, সমস্ত মনটা মাধুর্যের অপূর্ব রসে ভ'রে ওঠে।

সেদিন সুরেন যখন ফিরে এলো তা'র হাত শূন্য। আজও কোন শিকার মেলেনি। ইন্দিরা তখনও স্তব্ধ হ'য়ে তেমনি ব'সে আছে। তা'র সমস্ত শরীরে, চুলে, শাড়ীতে ব্লাউজে এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, জায়গায় জায়গায় ছিন্নভিন্ন। তা'র মুখে এখানে ওখানে ছ'ড়ে যাওয়া দাগ, কোথাও কোথাও রক্ত ফুটে উঠেছে। সেই দিকে চেয়ে সুরেনের সমস্ত মনটা ধক্ ক'রে উঠলো। নিজেকে সে শত সহস্রবার ধিক্কার দিয়ে উঠলো। সুরেন কিছুক্ষণ সেই স্থির বিষণ্ণ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

শুনুন—অনুতপ্ত সুরেন মিনতি করে বললে, শুনুন—

ইন্দিরা তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো।

শোন, তুমি আমায় ক্ষমা করো! সুরেন তা'র হাত ধ'রে ওঠাতে গেল।

আগুন ভরা চোখে ইন্দিরা তা'র দিকে হিংস্র বাঘিনীর মতো এমনি ক'রে তাকালো যে সুরেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলো। তা'র নিজের মুখেরও অনেকটা জায়গা ইন্দিরার সুচলো তীক্ষ্ণ নখে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে আছে, মাঝে মাঝে তখনও জ্বলছে।

হঠাৎ ইন্দিরা তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে উঠলো, ধড়মড় ক'রে উঠে সামনের দিকে ছুটে গেল। সুরেন পিছন ফিরে ছিল, দেখতে পায়নি। তারপর ইন্দিরা যে দিকে ছুটে গেল সেই দিকে ফিরে সে একেবারে নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলো।

ঘুরে পাইলটের পোষাক-পরা একজন লোক টল্‌তে টল্‌তে এই দিকে আসছে। তার চেহারা ক্ষীণ, পোষাক ময়লা। মাথায় পাইলটের টুপিটা নেই। চুল উস্‌কো খুস্‌কো। এ ও বেঁচে গিয়েছিল তা হ'লে কিন্তু কোথায় ছিল এতদিন? সুরেন ইন্দিরার পেছন পেছন দৌড়লো।

ইন্দিরা তত্তক্ষণে লোকটাকে দু'হাতে শরীরের সমস্তখানি জোর দিয়ে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে ঘ'রেছে, না হ'লে বোধ হয় প'ড়ে যেত। ইন্দিরার অদ্ভুত উত্তেজিত ছিন্নভিন্ন কণ্ঠ গলার স্বর সেই জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে যেন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিল - ক্যাপ্টেন লাহিড়ী—ক্যাপ্টেন্ লাহিড়ী কোথায় ছিলেন—কেমন ক'রে এলেন—

সুরেন কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের প্লেনের ক্যাপ্টেন্। প্লেনে ওঠবার সময়, তারপর প্লেনের ভেতরও এ'কে বারকয়েক দেখেছে। কিন্তু কি চেহারা কী হ'য়ে গেছে?

ইন্দিরা অধীর ব্যগ্র হ'য়ে সুরেনকে ব'ললে। কেস্ট হ'য়ে গেছে, শীগগির ধরুন, এঁকে ঐ জলের ধারে নিয়ে যাই।

তারপর দু'জনে ধরাধরি ক'রে ক্যাপ্টেন লাহিড়ীকে নিয়ে এলো। তা'র চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হ'লো। কিন্তু লাহিড়ী যেন ক্রমশই অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর ইন্দিরা বোধহয় একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠলো, যেন আপনমনে প্রলাপ ব'কছে, বাঁচাতেই হবে—বাঁচাতেই হবে! সুরেনকে ব'ললে, আপনি ওদিকে যান। সুরেন গেল কি না গেল তা'র অপেক্ষা না ক'রেই ত্বরিত গতিতে নিজের বক্ষবাস আলগা ক'রে তা'র একটি পরিপুষ্ট স্তন লাহিড়ীর মুখের মধ্যে দিয়ে একহাতে মুখটা চেপে ধরলে আর অন্য হাতে সেই স্তনাগ্র দলিত মথিত ক'রে দুধের কোথাও যদি কণামাত্রও পাওয়া যায় তা'র জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতে লাগলো ইন্দিরা। দুধ হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না। সুরেন আর দাঁড়ায়নি দেখবার জন্যে। ইন্দিরার শরীরের উত্তাপে, তা'র অক্লান্ত সেবায় লাহিড়ী চোখ মেলে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

তারপর দিনের পর দিন ইন্দিরার আপ্রাণ শুশ্রূষায় ক্যাপ্টেন লাহিড়ী সুস্থ হ'য়ে উঠলো। অনাহারে আতঙ্কে নৈরাশ্যে লাহিড়ী বোধ হয় আর একদিনও বাঁচতো কিনা সন্দেহ। তাদের মতো সেও ছিটকে প'ড়েছিল এ জঙ্গলের আর এক প্রান্তে। সমস্ত জিনিষটা এমনি আকস্মিক ভাবে ঘটে গিয়েছিল যে প্যারাসুট্ খোলবার সুযোগই হয়নি। এই পাহাড় আর জঙ্গলের অন্ধ কারাগার থেকে বাঁচবার জন্যে তাদেরই মতো পথ খুঁজেছে, পথ হারিয়েছে, একই জায়গায় চক্রির মতো ঘুরেছে। কোন্ পথ দিয়ে এখানে কেমন ক'রে পৌঁছলো লাহিড়ী তা'র কোন কিছুরই দিক্ নির্দেশ দিতে পারলো না।

এম্‌নি এসে প'ড়েছি। দি স্পিরিট্ অব্ দি আজস্ এেভড্, দি ক্রস্ ওয়াইন্ড্, যীশুস্ অ্যাণ্ড পাইথন্স্ লেড্ মি টু ইউ! গভীর বিশ্বাসের গলায় লাহিড়ী ব'ল্লে।

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার, ইন্দিরা সুরেনের কাছে অদ্ভুত সহজ হ'য়ে এসেছে। যেন এর আগে কোন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেনি, যদি ঘটেও থাকে ইন্দিরা যেন তা' সমস্ত দেহ আর মন থেকে কোন মন্ত্রবলে একেবারে ঝেড়ে মুছে নিজেকে সাফ ক'রে ফেলেছে। হেসে বলে, যান্ সুরেনবাবু বেরিয়ে পড়ুন, লাহিড়ী ইজ্ ইন্ নীড্ অব্ ফুড্! শিকারে তো আপনার খুব হাত! আমি ব'ল্‌ছি, আজ মুরগী পাবেনই!

ইন্দিরার মুখে এমন হাসি সুরেন এর আগে কখনও দেখেনি। সুরেন মনে মনে ভাবে ভোজবাজী নাকি!

সুরেন সেদিন সত্যিই চার চারটে বনমুরগী মেরেছিল। কোথা থেকে একটা বড় ঝাঁক এসে প'ড়েছিল। পর পর দুটো পাথরের চাদড়েই কাজ হ'য়েছে।

সুরেন ফিরে এসে দেখলো লাহিড়ী ইন্দিরার কোলে মাথা দিয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে আছে, গল্প ক'রছে। ইন্দিরার মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল।

অতগুলো মুরগী দেখে ইন্দিরা উল্লাসে যেন নেচে উঠলো—হুর্‌রে— আমি তোমায় বলিনি ক্যাপ্‌টেন্, সুরেনবাবু খুব—খুব ভালো শিকারী!

লাহিড়ী তড়াক্ ক'রে উঠে এসে সুরেনকে জড়িয়ে ধরলে, ব্রাভো, মাই বিগ্ বয়! ইউ আর এ জেম্! দেখুন—এ সেই জঙ্গলের গুড্ স্পিরিট্, হাউ কাইণ্ড্ টু মি!

সুরেন এই স্থানকাল-বহির্ভূত অমিত উল্লাসে যোগ দিতে পারলে বেঁচে যেতো, কিন্তু কেন জানিনা তা'র বুকের ভেতরটা কেমন অস্পষ্ট জ্বালা জ্বালা ক'রতে লাগলো। এ যন্ত্রণা সে চায় না। মুখের মাংসপেশী-গুলো কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধ'রে কে যেন তা'কে হাসবার কোন অবকাশই দিচ্ছে না।

লাহিড়ী বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌লে, হোয়াট্ মেক্‌স্ ইউ সো মোরোজ্, বিগ বয়?

সুরেন সে কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজনই মনে করলো না। একধারে চুপ্ হয়ে ব'সে অসহ্য জোরে দাঁতে চেপে ছিঁড়ে মুরগীগুলোর গা থেকে পালকের পর পালক ছাড়িয়ে চ'ললো।

লাহিড়ী একবার ব'ল্লে, সাহায্য ক'রবো?

সুরেন হেম্‌নি গম্ভীর মুখেই ব'ললে, না, থাক্!

ক্যাপ্টেন্ লাহিড়ীর আসাটাও যেমন অবিশ্বাস্যরকমের আকস্মিক, তা'র আবার হারিয়ে যাওয়া-টাও তেম্‌নি এক রহস্যময়, ঘটনা। মানুষটা যেন বুনো হাওয়ার মুখে শুক্‌নো কুটোর মতো কোন্ নিরুদ্দেশে উড়ে গেল। দিনের পর দিন ব্যর্থ প্রতীক্ষা। না, মানুষটার কোনও চিহ্ন কোথাও নেই!

ইন্দিরার দিকে চাওয়া যায় না। সমস্ত আলো, সমস্ত আশা, সমস্ত ভবিষ্যত তা'র দু'চোখ থেকে কে যেন উপ্‌ড়ে নিয়ে গেছে। আবার সে একলা, পাশে নোলুপ বন্য পশুর মতো সুরেন!

ইন্দিরা এ রহস্যের কিনারা করতে পারে না, শুধু এক স্থির জটিল সন্দেহের চোখে সুরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুরেন সে দৃষ্টি সহ্য ক'রতে পারে না।

কান্না নয়, আক্ষেপ নয়, শুধু এক বিশ্ব যন্ত্রণার গলায় ইন্দিরা মাঝে মাঝে বলে, আপনারা তো একই সঙ্গে গিয়েছিলেন সুরেনবাবু, তবে—

সুরেন বারবার এই একই প্রশ্নে বিব্রত হয়, একই সন্দেহের আঙুল-বাড়ানো চাউনিতে অসহিষ্ণু হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে, উত্তর দিকোতে তা'র কথা জড়িয়ে যায়—আমি—আমি কি জানি—আমি তো খুঁজছি—রোজ খুঁজছি, আপনার বিশ্বাস—আমি তা'কে -

ইন্দিরার গলায় বারান্দো করাতের মতো স্নেহ ঝলকে ওঠে—বিশ্বাস! এক কুটিল হাসি তা'র বাঁকানো ঠোঁটে স্থির হ'য়ে থাকে।

সুরেন তখনই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে গাইবার আওড়ায়—আমার কি দোষ! তুমি গেলে কেন? আমি ব'লেই যেতে হবে! আমিও তো গিয়েছিলাম! এখানে তো পায়ে পায়ে বিপদ! তুমি সাবধান হ'তে পারোনি তা'র আমি কি জানি! দোষ দেবে কে—কে শুনি?

এ অনুতাপ নয়, স্বীকারোক্তি নয়। কোণ-ঠাসা প্রশ্নের মুখে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এ যেন কোন মিথ্যাবাদী সাক্ষীর বাতিব্যস্ত আবোলতাবোল অসংলগ্ন সাফাই দেবার ব্যর্থ প্রয়াস!

যতই সে নিজেকে ছাড়াতে চায়, নিজের মনের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলের মতো সত্যের জটিল নাগপাশ ততই সুরেনকে জড়িয়ে ধরে, পালাবার পথ আটকায়।

সেদিনের ঘটনাটা যতই সে ভুলতে চায়, আবার আগের মতো সহজ সরল হ'তে চায়, যাবারবার সেটা ততই তা'র চোখের সামনে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ভেসে ওঠে। গোপন অপরাধ বোধের ভার দিনের পর দিন ভারি হয়—আরো ভারি হয়, মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে নিশ্বাসের পথ যেন বন্ধ হ'য়ে যায়।

সময় যত সামনের দিকে ছুটতে থাকে কি এক অদৃশ্য কুহকের মতো সুরেনকে সেই মৃত অতীতের প্রেতটা হাতছানি দিয়ে বার বার ফিরে ফিরে নিঃশব্দে ডাকে সেই উজ্জ্বল সকালটার দিকে।

অন্য অন্য দিনের মতো সেদিনও একই সঙ্গে তা'রা পথ খুঁজতে বেরিয়েছিল। ক্যাপ্টেন সাহিত্যীর নির্দেশ মতো কোন পাহাড়ের চূড়োয় উঠে কোন নিশানা উড়িয়ে কোন চলন্ত ট্রেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তা'রা দুজনেই নতুন উদ্যমে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাহাড়ে চড়া দূরে থাক্, ঘন জঙ্গলের কঠিন আবেষ্টন ছাড়িয়ে সামান্য দূরে ওঠাও অসাধ্য।

সেদিন সকালটা খুব উজ্জ্বল ছিল। তাদের আস্তানা থেকে অনেক দূরে আমলকী আর শাল গাছের জটলার কাছে এসে তারা দাঁড়ালো। সুরেন ব লেছিল, একসঙ্গে না থেকে—চলুন, আজ দুজনে দু'দিকে যাই, ভাগ্যে থাকলে দুজনের একজন হয়তো পথের হদিস্ পেয়ে যেতেও পারি, তারপর আবার এখানে এসে মিলবো।

ক্যাপ্টেন্ বললে, ভেরি গুড্, য়্যান্, লেট্ আস্ ট্রাই আওয়ার লাক্!

সুরেন হাত নেড়িয়ে বললে, ঐ যে পাহাড়টার একটু উঁচু দিয়ে একটা ঢাক র'য়েছে, দেখুন দেখি ওদিকে কোন রাস্তা পান্ কিনা, আমি অন্য দিকটায় যাই।

ক্যাপ্টেন্ শিষ দিতে দিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় একঘণ্টা, কিংবা তা'রও বেশি। সুরেন কিন্তু কোথাও যায়নি, একটা মোটা গাছের আড়ালে কান খাড়া ক'রে অপেক্ষা করছিল। তারপর হঠাৎ ক্যাপ্টেনের সেই দিক্-বিদিক্ বিদীর্ণ-করা ভয়ার্ত চীৎকার—হাঁ—হাঁ—হাঁ—আ—আ—

সুরেনের বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠেছিল প্রথমে, তারপর যখন কান খাড়া ক'রে শুনলে আর কোন আওয়াজ নেই, সুরেন নিজের মনে মনেই ভাবনাটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভাবলে—যাক্!

তারপর মর্মান্তিক ব্যঙ্গের মতো কথাটা হঠাৎ তা'র মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—স্পিরিট্ অফ্ দি জাঙ্গল্—অল্ রাবিশ্—অল্ নন্‌সেন্স্—বাঁচি যদি আমরা দু'জন একসঙ্গে বাঁচবো, মরি যদি একসঙ্গে মরবো—ড আর্ ইউ— ড আর্ ইউ—স্যাট্ অল্!

সুরেনের কয়েকদিনের সঞ্চিত আক্রোশ ক্রুদ্ধ কিং কোবরার ছোবলের মতো ফুঁসিয়ে উঠলো।

দিন প্রায় কাবার ক'রে সুরেন একলা ফিরে এসেছিল—ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত, বিধ্বস্ত!

ইন্দিরা জানে না, কিছুই জানে না। শুধু একটা অস্পষ্ট অনুমান, ধোঁয়াটে সন্দেহ।

আমি যে একলা কোথাও যেতে পারি না—নইলে—

সুরেন দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে ফুসে উঠতো—নইলে—নইলে ফিরিয়ে আনতে—না?

মাঝে মাঝে ইন্দিরার অসহায় কাতর কান্নাকাটির দিকে খানিকটা বিদ্রূপ খানিকটা বিরাগের চোখে চেয়ে থাকতো, ক্রমশঃ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুরেন কানে হাত চাপা দিত।

বার বার একই ব্যর্থ কান্নার কাতরানি একটা লোক কত দেখতে, কত শুনতে পারে!

তারপরও দিন কেটেছে। যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ আশা। অন্ধ সংস্কারের একটা আকারহীন আতঙ্ক সুরেনের পেছনে যেন ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে চ'লছে। আর একবারও সে মনের ঐ অঞ্চলটার ত্রিসীমানায় যায়নি। একেবারে অন্যদিকে উল্টো মুখে চলা-ফেরা করতো। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই আর্ত চীৎকারের মতো একটা আওয়াজ দূর থেকে প্রতিধ্বনির মতো ভেসে ভেসে আসছে। পরক্ষণেই নিজেকে নিজে বোঝায়—ওটা হাওয়ার কারসাজি, জঙ্গলের হাওয়ার কত রকমফের তার কি ঠিকঠিকানা আছে। স্পিরিট্ অফ্ দি জাঙ্গল্—মজার কথা, কেউ কোথাও শুনেছে না কি!

সেদিনটা জীবনে ভোলবার নয়, না ইন্দিরার, না সুরেনের। নিয়মমত সেদিনও সুরেন সকালে বেরিয়েছিল। দুপুরের একটু পরে সুরেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো ছুটতে ছুটতে এলো। সে প্রচণ্ডভাবে হাঁপাচ্ছে কোন কথা বলতে পাচ্ছে না, তার দুচোখ দিয়ে কিসের যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে একহাতে ইন্দিরার হাত ধ'রে যে দিক দিয়ে এসেছিল সেইদিকে দৌড়তে লাগলো। এত জোরে সে ইন্দিরার হাতখানা ধ'রেছে, মনে হ'লো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। পাহাড়ের গা আঁকাবাঁকা পথ-বিপথ ধ'রে দৌড়তে দৌড়তে ইন্দিরার পা কেটে গেল, রক্ত ঝরতে লাগলো, তবু সুরেন থামে না।

ইন্দিরা একবার আশায় আতঙ্কে উত্তেজনায় জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—সুরেনবাবু পথ পেয়েছেন?—লাহিড়ীর দেখা পেয়েছেন?

সুরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বোবা-কাটার মতো গর্জন ক'রে উঠলো—হাউ ইয়োর লাহিড়ী—আমরা—আমরা—সে আর কথা শেষ করতে পারলো না।

তারপর সব পথের যেমন শেষ আছে, ইন্দিরার ভয়-কৌতূহল-উদ্বেগ-সংকুল পথেরও শেষ হ'লো।

একটা সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহার মধ্যে সুরেন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালে। প্রচণ্ডভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে সে ব'ললে—দেখ—দেখ—আমরা—রুদ্ধ-করা উত্তেজনায় তা'র কথা আটকে গেল।

অন্ধকার গুহাটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হীরের উজ্জ্বল আভায় ঝলমল ক'রে জ্বলছে। আর এক কোণে অনেক পাথর জড়ো হয়ে রয়েছে। কোনটা সবুজ, কোনটা লাল, কোনটা ভালিমদানার রঙ্।

ওগুলো নিশ্চয়ই মোতি পান্না চুনী। সমস্ত গুহাটায় জ্যোতি ও রঙের সে কী অপূর্ব সমারোহ! এ ঐশ্বর্যের পরিমাপ ক'রবে কে? গুহার ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে, নিচে মেঝেতে কোন কোন জায়গায় জল জমে র'য়েছে। সেই জলের ওপর ধীরে মোতি চুনী পান্নার নানারঙের ছায়া পড়'ছে। চোখ তাদের ধাঁধিয়ে গেল। তারা নির্বাক। নিশ্বাস এত ঘন ঘন পড়ছে, মনে হ'চ্ছে ফুসফুসটা বোধ হয় এখনি ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে।

ইন্দিরার দু'চোখে আর পলক পড়েনা। সব ভয়, সব বিষাদ, ক্যাপ্টেন লাহিড়ীর কথা, সুরেনের ওপর অবিশ্বাস—সব কোথায় এক লহমায় মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে শরীরে আর মনে এত শক্তি এলো তার? চোখে অই অলৌকিক জ্যোতি কেন? অসংখ্য অদ্ভুত আকারের বড় বড় ঐ যে হীরক-স্তূপ - মাত্র ওর দশটার দাম কত হবে—কত টাকা—এক লক্ষ—দু'লক্ষ—দশলক্ষ—তারপর ঐ মোতি পান্না চুনী! ইন্দিরার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হ'য়ে আসবে না কি! ইন্দিরার অবসন্ন দেহ, স্নায়ু আর কিছুরই অর্থবোধ ক'রতে পারছে না। শুধু একটা প্রবল প্রচণ্ড উত্তেজনা তড়িৎ-শক্তির মতো তার শিরায় শিরায়, শরীরের কোণে কোণে অণুপরমাণুতে বিদ্যুতের ঝাঁকাবাঁকা আলোর ঢেউয়ের পর ঢেউ হ'য়ে দুলছে। ইন্দিরার মনে হলো সে এক্ষুণি নেচে উঠবে নাকি—যেমন সে কত উৎসব মুখর পর্বতে নেচেছে—তা'র জন্মদিনে তার স্বামী যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তারি সুন্দর সেই জড়োয়া নেকলেসটা পরিয়ে দিয়েছিল সেদিন যেমন উল্লাসে ভালবাসায় নেচে উঠেছিল!

সুরেন তখনও হাঁফাচ্ছে। তারপর দুজনে দু'জনের দিকে চাইলে। সে চাওয়া নয় যেন কথার অনুভূতি তারা মনের আকাশে নিঃশব্দে হেসে উঠলো। সেই দুর্ঘটনার পর এই বোধ হয় তারা প্রথম প্রাণখুলে হাসল।

তারপর তাদের কি হ'লো, কে জানে! দু'জনে সেই মণি-রত্নের স্তূপের দু'ধারে ব'সে সেই হীরা পান্না চুনী মোতি মুঠো মুঠো ক'রে আঁকড়ে ধরে আবার সন্তর্পণে রেখে দেয়। নিমান্ত আওয়াজ প্রতিধ্বনিতে গম্ গম্ ক'রে গুহাটার ভেতর স্বরতরঙ্গে ঢেউ উঠলো।

মা যেমন কচি শিশুটিকে আদর করে। তেম্‌নি ক'রে তা'রা সেই ধনরত্নের ওপর দু'হাত বোলাতে লাগলো। তারা হয়তো সাময়িকভাবে উন্মাদ হ'য়ে গেছে।

দিন প'ড়ে আসছে। তাদের এবার ফিরতে হবে।

ইন্দিরা বললে, আমরা যদি এখানেই কাছাকাছি থাকি—ওখানে যদি নাই ফিরি সুরেনবাবু?

সুরেনের বুদ্ধি বিবেচনায় ইন্দিরার এখন অগাধ বিশ্বাস। একটা চিন্তা এখন ইন্দিরার সমস্ত মনকে অধিকৃত করে দিচ্ছে। সুরেন তো এই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার তা'কে না জানাতে, না দেখাতেও পারতো, সে তো তা'র কেউ নয়। আকস্মিক এক দুর্ঘটনা তাদের বিচিত্রভাবে ক'টা দিনরাতের জন্যে এই পাহাড় আর জঙ্গলের অবরোধের মধ্যে আটকে দিয়েছে. নইলে তাদের দু'জনের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ তারা দু'জনে দুই বিপরীত সমাজের মানুষ, মাঝখানে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। ইন্দিরার অনুতাপ হ'লো, সুরেনের ওপর সে অবিচার করেছে. নিষ্ঠুর সন্দেহ ক'রেছে। এমন কি সেই রাত্রির অন্ধকারে সুরেনের নৃশংস পাশবিক আচরণও ইন্দিরার চোখে ক্ষমা হ'য়ে এলো। তা'র নিজের সমাজে বহুলোকের চোখে, ক্যাপ্‌টেন্ পাইলটের মধ্যে সে তো আরও বীভৎস লালসার আগুন জ্বলতে দেখেছে। ক্যাপ্‌টেন্ লাহিড়ীর কথা আলাদা, অমন মানুষ হয়না, নিজের ভাইও বোধ হয় অতো আপনার হয় না। মানুষ নয়

দেবতা। কিন্তু আর—আর সবাই! তাদেরই কেউ একজন যদি এই জনমানবশূন্য জঙ্গলে তাকে এমন অসহায় অবস্থায় পেতো, তাহ'লে তারা কি ক'রতো! তাদের প্রায় সকলের চোখের নির্লজ্জ ভাবনায় তাদের অজানা নয়, আর সে-ই বা কি ক'রতে পারতো! কিন্তু সুরেনের মতো তা'রা কি কেউ এতো হৃদয়বান হ'তে পারতো! এই আটাশ বছরের জীবনে ইন্দিরা অনেক দেখেছে। যত উঁচু সমাজ, তত ওপরে পালিশ্, কিন্তু ভেতরে মালিশ, কেউ তাউকে দেখতে পারেনা। ওপরে হাসে, ভেতরে কাঁসে। সম্ভব নয় তাই হয় না, নইলে সকলকে পায়ের তলায় ফ'লে পিষে মেরে সবাই চাইছে একলা পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ আর সুন্দরী নারী নিজের দখলে রাখতে।

তড়িৎ-গতিতে এই সব ভাবনা ইন্দিরার মনের মধ্যে খেলে গেল, বল্লে, সুরেনবাবু, কিন্তু নিশানা দেওয়া ভাল, যদি পথ হারিয়ে যায়!

সুরেন ব'ল্লে, ঠিক ব'লেছেন।

তারপর বনের লতাপাতা গাছের ডাল দিয়ে তারা সেই গুহাটার মুখটা যথাসম্ভব গোপন ক'রে রাখলো। নিজেদের চেনবার জন্যে বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন রেখে দিল। আর একটু পরেই রাতের ঘন অন্ধকার নেমে আসবে। তারা একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেদের আস্তানার দিকে পা চালালো।

সারারাত ধ'রে তারা দু'জনে কেউ ঘুমোতে পারলো না। দু জনে কে কী ভাবছে, কে জানবে! তারা ঠিক করলে সকাল হ'লেই এখান থেকে বেরোবার পথ আবার নতুন ক'রে খুঁজবে। অনেকবার এর আগে খুঁজেছে। অনেক চেষ্টা ক'রেছে, পথ তারা পায়নি। তবু আবার খুঁজবে। বেরোতেই হবে এখান থেকে। ঐ মণিরত্নের মতো এলোমেলো জীবন যে ঐ পাহাড় জঙ্গলের সীমানার বাইরে কল্পনায় সাজানো সাতমহল থেকে তাদের অনবরত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পথ তাদের পেতেই হবে, যেমন ক'রেই হোক্, যেখানে গিয়েই হোক্।

ভোরের আলো ভাল ক'রে না ফুটতেই তারা সেই গুহার সামনে গেল। উঁকি দিয়ে দেখলে, সব যেমন ছিল তেমনিই আছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে দুজনে। ভয় ছিল যদি এই পাহাড় আর জঙ্গলের গোলকধাঁধায় তারা ঐ গুহার পথ আর না খুঁজে পায়। রাত্রির স্বপ্নের মতো ঐ বনরত্নের ভাণ্ডার যদি রাতভোরেই মিলিয়ে যায়!

তারপর এবার তারা দুজনে পথ খুঁজতে লাগলো। সুরেন সামনে ইন্দিরা পেছনে। বহুবারের মতো ইন্দিরাকে নিয়ে সুরেন আবার একবার সেই পাহাড়ে নদীটির ধার দিয়ে চলতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে তাদের থামতে হ'লো। নদীর ধারা খাড়া পাহাড়ের অতলে ঝরণার মতো উপছিয়ে নিচে পড়েছে, ওখান দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। এ পাশে ও পাশে পাহাড়ে ওঠবার কোন পথ নেই। এ ধারে ও ধারে ঝাঁকে ঝাঁকে বনমুরগীগুলো শব্দ পেয়ে একঝোপ থেকে অন্যঝোপে পালাচ্ছে। দূরে একটি বাচ্চা হরিণ তীর-বেগে জঙ্গলের অন্তরালে পালিয়ে গেল। অন্য সময় হ'লে সুরেন পাথরের চাঙড় নিয়ে হয়তো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো শিকারের আশায়, কিন্তু আজ ও সবে কোন মন নেই সুরেনের। একটি মারাত্মক ভয় কিং-কোব্রার কোথাও ধারে কাছে তাদের আস্তানা থাকলে আর রক্ষে নেই। গাছের ডাল জড়িয়ে পাইথন্ আছে, সরছে ফিরছে, ফিরুক্, তারা কিছু ভেড়ে আসবে না, মুখের সামনে না পড়লেই হলো। আর ভয় আছে বুনো হাতীর, চিতাবাঘের। এ জঙ্গলে সুরেন ওসব কিছু দেখেনি এ পর্য্যন্ত।

সামনে খাড়া নিবেধের মতো দাঁড়িয়ে একেবারে আকাশ-ছোঁয়া উঁচু পাহাড়। ওপরের দিকে নজর

চলে না এতো উঁচু। এ পাশে ও পাশে পাহাড়ে ওঠবার কোন পথ নেই। ঐ উঁচু পাহাড়ের ওপারে পথ আবার কোথায় গেছে তাও জানা নেই। ওপারে যদি আবার ঐ রকম পাহাড়ের কারাগার থাকে—তাহ'লে?

ইন্দিরা যেন কোথা থেকে কোন নতুন শক্তি পেয়েছে। কোন ক্লান্তি, কোন অবসাদ তার শরীরকে যেন ছুতে পারছে না। ব'সলে, থামলে চ'লবে না, সুরেনবাবু ঐ দিকটায় চলুন, আমার জন্যে ভাববেন না, পথ আছে, সেটা বার করতেই হবে।

সুরেন একবার ইন্দিরার উদ্দীপনা-ভরা মুখের দিকে চাইলে, তারপর বললে, চলুন, দেখা যাক্!

দু'জনের মনে শুধু একটাই চিন্তা ঘুরছে ফিরছে। পথ আছে, সে পথ খুঁজে বা'র করতেই হবে। সে পথের শেষে লোক আছে, বন্ধু আছে, আত্মীয় স্বজন আছে। তারা খুঁজবে। আজ না হয় কাল পাবেই পাবে।

অথচ আশ্চর্য তা'রা সেই গুহার থেকে দূরে কোথায় যেতে চায়না। মাঝে মাঝে সেই হীরা-পান্না-মোতির স্তূপের ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাদের আর দেখা ফুরোয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাদের মনেই নেই যেন একেবারে।

পরদিন হঠাৎ জঙ্গলের ঠিক ওপরে পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনতে পেলো। তারা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখলে, দুটো প্লেন অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে অনেকক্ষণ চক্কর দিয়ে ঘুরতে লাগলো। এরই জন্যে তারা কত দিনরাত আশা ক'রে আছে। প্রথমটা সুরেনের মনে হ'লো, চীৎকার ক'রে কাপড় উড়িয়ে ব'লবে—এই যে, এই যে আমরা, বেঁচে আছি, আমাদের উদ্ধার করো এখান থেকে!

কিন্তু সুরেন বোধ হয় উন্মাদ হ'য়ে গেছে। ইন্দিরার হাতটা ধরে সজোরে টান দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত বন্য পশুর মতো তারা কোপের মধ্যে লুকিয়ে প'ড়লো! সে চায় না ঐ অতুল ধনরত্নের সন্ধান আর কেউ পাক্। এর মালিক তা'রা—একলাই, আর কেউ নয়। তারা নিজেরাই খুঁজে পাবে। কারোর সাহায্যের কোন দরকার নেই তাদের।

এরোপ্লেনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই আবার তা'রা কোপ থেকে বেরিয়ে এলো। ইন্দিরারও যেন নেশা লেগেছে। তা'র নিজের বুদ্ধি বিবেচনাও যেন সুরেনের হাতে সুতোয় বাঁধা প'ড়েছে। সুরেন যেমন টানে, পুতুলের মতো সেও তেমনি হেলে দুলে চলে।

সেই রাতে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা সুরেনের মনে এক নতুন আলায় জ্বলিয়ে দিলে। সুরেন ভাবতে লাগলো, সে তো একলাই ঐ ধনরত্নের মালিক হ'তে পারে। যত পারে নিয়ে যাবে, তারপর ফের ফিরে আসবে গোপনে, সব উজোড় ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু ইন্দিরাও যদি তাই করে? ইন্দিরাকে কেন সে তা'র ভাগ দেবে। ইন্দিরা কোথাকার কে তা'র? ইন্দিরার রূপ যৌবন যেন চিবিয়ে-খাওয়া আঁটার ছিবড়ের মতো তুচ্ছ অবজ্ঞার সামিল মনে হ'লো তা'র।

ঐ অতুল ঐশ্বর্য তা'র নিজের, শুধু তা'র নিজের। তা'র স্ত্রী মমতা কত কষ্ট পেয়েছে তা'র কাছে। গয়না সে দিতে পারেনি একখানাও। শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরে জানোয়ারের মতো ঠাসাঠাসি ক'রে থাকে। তার ওপর হাপানি রুগী বুড়োবাপ আর অথর্ব মা। ঝি নেই; চাকর নেই। সংসারে খেটে খেটে মমতার শরীরে আর কিছু নেই। হয়তো কিছুদিন পরে

তা'র ধন্দা হবে। তারপর তা'র ছেলেমেয়েরা—ভাল ক'রে খেতে পায় না তা'রা না পায় ভাল জামা কাপড় পরতে। বড় হ'লে ছেলেটা হয়তো তারই মতো অসহায় গরীব হবে। মেয়েদুটো মায়ের মতই কষ্ট পাবে। সারাদিন খাটতে হবে, পুষ্টিকর খাবার জুটবেনা। ভাগবানের দেওয়া খোলা বিশুদ্ধ হাওয়াও হয়তো পাবেনা তা'রা কেউ। তা'রাও মরবে—না হয় আরও অল্প কিছুতে। না—না, ঐ ঐশ্বর্যের ভাগ সে কাকেও দিতে পারবে না। ইন্দিরা কে তার? কোথাকার কে এলার হুসেন্, তা'র প্রাণ বাঁচিয়েছে, সেই তা'র কত বড় ভাগ্য।

তা'র নিজের বোকামিতে তা'র নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে হ'লো। কেন সে ইন্দিরাকে দেখাতে গেল ঐ ধনরত্নের গুহাটা! যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে। এবার তা'কে সাবধান হ'তে হবে।

হঠাৎ সুরেনের চোখ ইন্দিরার ওপর প'ড়লো। নিজের জায়গায় মেয়েটা চুপ্ হ'য়ে ব'সে আছে। সুরেনের ঝাঁৎ ক'রে মনে প'ড়লো—ইন্দিরাও নিশ্চয়ই তা'র মতো ভাবছে। ঐ যে আগুনের লাল আভায় দেখা যাচ্ছে, ইন্দিরা কেমন অদ্ভুত হিংস্র জানোয়ারের মতো তা'র দিকে চাইছে। ও ঘুমোয় না কেন? এ পৃথিবীতে ভাগীদারকে কেউ সহ্য করেনা। সুরেনের দৃঢ় বিশ্বাস হ'লো, ইন্দিরা তা'কে মেরে ফেলে একলাই ঐ সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হবার সুযোগ খুজছে। ওৎ পেতে ব'সে আছে। ইন্দিরাকে একটা কুৎসিত ডাইনির মতো মনে হ'লো সুরেনের। আজকাল বড় কাছে কাছে থাকতে চায়, আগে তো তা'র ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে দূরে থাকতো, সে যেন কোন অজাত কুজাত ছোটলোক! হঠাৎ সুরেনের মনে প'ড়লো। আজ দিনের বেলা নদীর তীর ধ'রে যখন তা'রা সেই পাহাড়ের খাদের একেবারে ধারে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দিরা তা'র দিকে একবারে কাছে কাছে স'রে আসছিল। নিশ্চয়ই তাকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের নিচে ফেলে দেবার মতলব ছিল তা'র। শুধু পারেনি, ঠিকমতো সুযোগ পায়নি। সুরেন ঠিক সময় স'রে এসেছিল তাই।

ইন্দিরার রুক্ষ করা এলোমেলো রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ছে, তা'র বড় বড় চোখে আগুনের লাল ছায়া প'ড়েছে। তার শাড়ীতে, অনাবৃত কাঁধে হাতে আগুনের লালচে লালচে আভা। তা'কে ঠিক ডাইনির মতো মনে হ'লো সুরেনের। সুরেন আজ থেকে আর ঘুমোবে না। সাবধানে থাকতে হবে তা'কে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

ইন্দিরাও ভাবছে। কিন্তু কি ভাবছে, কে জানে?

সুরেনের এই উন্মত্ততা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটলো পরদিন ঠিক দুপুর বেলা।

সেদিনও তারা প্রাণপণে পথ খুজতে লাগলো। নদী থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে দুজনেরই ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহ্য প্রদাহ কিছুটা দূর হ'লো। তারপর তা'রা দুজনে একটা বড় গাছের তলায় বিশ্রাম ক'রতে লাগলো। সুরেনের চোখদুটো অবিশ্রাম উদ্বেগ ও অবসাদের ভারে সবে তন্দ্রায় বুজে আসছে। ইন্দিরাও ঝিমোচ্ছিল ঠিক ওপরের একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর ব'সে। হঠাৎ ঘোর-লাগা অবস্থায় ইন্দিরা সুরেনের মাথার ওপর গড়িয়ে প'ড়লো।

ধড়মড় ক'রে সুরেন জেগে উঠলো। তা'র বুদ্ধিবৃত্তি তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। যে ভয় আর সংশয় তা'র শরীরের সমস্ত অণুতে অণুতে বিষাক্ত জীবাণুর মতো পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ছিল, সেই আদিম জান্তব অনুভূতিটাই উন্মত্ততার আগুনে ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো।

ইন্দিরা তা'কে আক্রমণ ক'রেছে। প্রাণপণে ইন্দিরার সেই শাঁখের মতো সুডৌল গলাটা তা'র

দুই সবল কর্কশ হাতের বল আঙুলে বীভৎস নিষ্ঠুরতায় চেপে ধরলো। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে অসহায় ইন্দিরা সুরেনের মুখে চোখে তা'র দু'হাতের চাপার কলির মতো নরম আঙুল দিয়ে আটকাতে গেল, তা'র অনামিকার সুচলো নখের ডগায় সুরেনের বাঁ চোখের কোণে রক্ত ফুটে উঠেছে।

তারপর ইন্দিরার দেহটা স্থির হ'য়ে গেল। তা'র চোখের তারা দুটো যেন ঠেলে চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে। আতঙ্কে মিনতিতে বিস্ময়ে সে চোখের ভাষা দুঃসহ; মর্মান্তিক জীবন। সুরেন একদৃষ্টে সেইদিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলো। সূর্যের আলো প'ড়ে ঐ বড় বড় স্ফীতকায় মরা চোখ দু'টো সেই গুহার হীরের মতো জ্বলছে। দু'টো কোঁচকানো ঠোঁট সুরেনকে বিদ্রূপ ক'রছে না কি? সুরেন আর সহ্য ক'রতে পারলো না। এক ঝটকায় ইন্দিরার দেহটা ঠেলে দিলে। নিচের কঠিন পাথরের ওপর সশব্দে ইন্দিরার নিঃসাড় দেহটা গড়িয়ে প'ড়লো সুরেনের পায়ের তলায়।

সুরেনের হঠাৎ কি হ'লো! আনন্দ—মুক্তি—না অতো ঐশ্বর্যের সে একেশ্বর মালিক ব'লে। সে গলা কাটিয়ে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলো। চারিদিকের পাহাড়ের ধ্বনি-তরঙ্গ তোলপাড় ক'রে হাজার প্রতিধ্বনিতে সেই হো-হো করা উন্মত্ত হাসি ভৌতিক আর্তনাদের মতো বাজতে লাগলো। সুরেনের মনে হ'লো, বিরামহীন—বিচ্ছেদহীন—কোনকালে যেন সেই উন্মত্ত হাসির আর শেষ হবে না।

কে যেন সেই গুহার দিকে তা'কে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। সে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সেই হীরা-পান্না-চুণী-মোতির স্তূপের ওপর সুরেন ঝড়াঝড়ি দিচ্ছে, আর অস্ফুট চীৎকার ক'রছে। দু'হাতে-মুঠো মুঠো ক'রে সেই অতুল ধনরাশি সে গুহার একদিক থেকে আর একদিকে ছুড়ে ফেলতে লাগলো। ওপরের চোয়ানো জল ফোঁটা ফোঁটা তা'র কপালে চোখে প'ড়ছে। ভারি এক শান্তি খুঁজে পাচ্ছে সুরেন। সে উঠে ব'সলো। তা'র সম্বিৎ ফিরে আসছে। সে আজই পালাবে। তা'র মনে হ'লো, একটু খুঁজলেই সে পথ পাবে। পথ তাকে পেতেই হবে।

কিন্তু এই রাশি রাশি হীরা পান্না চুণী মোতি—এর ঠিক কত দাম তা সে জানে না। তবে অনেক হবে, তা সে জানে। এ গুলো কেমন ক'রে সে নিয়ে যাবে। তা'র পরণে ছিন্ন ট্রাউজার আর সার্ট মাত্র তো সম্বল। সে আবার ছুটলো যেখানে ইন্দিরার মৃতদেহ প'ড়ে আছে।

ইন্দিরা স্থির হ'য়ে তেমনি প'ড়ে আছে। তা'র সেই স্ফীতকায় কটাক্ষহীন দুই চোখের বীভৎস দুই তারায় সেই আতঙ্ক, সেই মিনতি, সেই জিজ্ঞাসা। সুরেনের ওসব দেখবার সময় নেই। এই মৃতদেহ থেকে, পাহাড়ের জঙ্গলের এই ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধা থেকে তা'কে পালাতেই হবে—পালাতেই হবে। এখানে আর সে একরাতও কাটাতে পারবে না। সে পাগল হ'য়ে যাবে।

আস্তে আস্তে সুরেন ইন্দিরার পরণের শাড়ীটা টেনে খুলতে লাগলো, সেই সঙ্গে আর যা কিছু অবশিষ্ট, সব তা'র দরকার। তারপর নগ্ন মৃত নারীদেহটা তা'র পায়ের কাছে প'ড়ে রইলো। সুরেনের চোখে মনে তা'র কোন বিশেষ অর্থ আর নেই। চতুর্দিকে ছড়ানো নুড়ি, পাথর, শুকনো গাছের ডালপালা পাতার মতো নিরর্থক—নিষ্প্রাণ।

কাপড়ের কোন ভাঁজ থেকে একটা খাম ঠক্ ক'রে নিচে প'ড়ে গেল। সুরেন কুড়িয়ে নিয়ে খোলা খামটার ভিতর থেকে বের ক'রলে একটা ছোট্ট ফটো আর সেই রকম ছোট্ট একটা চিঠি। ফটোটা একটা সাত আট বছরের সুশ্রী ছেলের অবিকল ইন্দিরার মতো মুখ।

ছোট চিঠিটা এক নিশ্বাসে সে প'ড়ে ফেললে—ওপরে ভন্ স্কুলের ঠিকানা—"মা মণি, পুজোর ছুটির সময় তুমি আমায় নিয়ে যাবে, তোমার জন্যে আমার ভারি মন কেমন করে। চিঠি দিয়ো। ইতি—তোমার মানি—অলক।" সুরেনের হাতে কোন এক ছোট শিশুর স্পর্শ নয় যেন হঠাৎ আগুনের ছ্যাঁক লাগলো। সে আগুন তা'র বুকের মধ্যেও হাউ হাউ ক'রে জ্বলতে লাগলো।

কে যেন আবার তাকে ছোটালে। মনে হ'লো কয়েদ খুঁড়ে সে যেন মৃত গলিত শবদেহ থেকে তাদের পরিধের কাপড় ছিনিয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ সারি সারি গাছ ঐ পাহাড় তা'রা যেন ভুরু কুঁচকিয়ে সব দেখছে, এখনি হয়তো তা'র পিছনে তা'রা একদঙ্গে তাড়া ক'রে আসবে, তাকে ধ'রবে, পিষে মেরে ফেলবে। সে রুদ্ধশ্বাসে গুহার দিকে দৌড়তে লাগলো। পাথরের ঘায়ে তা'র পা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছে! ইস্পিরার শাড়ীখানা তা'র হাতে বাওয়ার পালের মতো ফেঁপে ফুলে উড়ছে। তারপর গুহার মধ্যে সেই শাড়ী বিছিয়ে তার ওপর দু'হাতে অঞ্জলি ভ'রে সে বড় বড় হীরেগুলো স্তূপাকার ক'রতে লাগলো। হীরের ওপর পান্না, পান্নার উপর চুনী, তা'র ওপর মোতি। বিরাট সেই ঐশ্বর্যের মোট নিয়ে সে পালাবার পথ খুঁজতে গেল।

শরীরের শিরায় শিরায় প্রতি রক্ত-কণায় এক দুঃসহ দুর্বার উত্তেজনার আগুন শতশিখায় হাউ হাউ ক'রে জ্বলছে। তারপর বুনো পাগলা হাতীর মতো সুরেন দিগ্‌বিদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝোপে ঝাড়ে কাঁটাগুল্মে কঠিন পাথরের ঘায়ে তা'র পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে সুরেনের—পথ চাই, পালাবার পথ চাই! চারদিকে অবরোধ—এদিকে ওদিকে সেদিকে, উঁচু পাহাড়ের খাড়া দুর্গ নিশ্চল নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ে নদী বিশাল অজগরের মতো এঁকেবেঁকে পাথরের বড় বড় চাঙড়ে প্রতিহত হ'য়ে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত তুলে ঘুরে বহুঘুরে খাদের অতলে ফণা হয়ে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়েছে, সে পথ দেখেছে সুরেন বহুবার, সেখান থেকে চেষ্টা করা বাতুলতা—নিশ্চিত মৃত্যু। দুর্দান্ত উত্তেজনায় বার বার একই পথে সেই পুরোণ অতি-চেনা পাহাড়গুলোর ধাক্কা খেতে খেতে সুরেন বরিয়া হ'য়ে উঠলো। সে উন্মত্তের মতো চারদিকে দাপাদাপি ক'রতে লাগলো। সমস্ত শরীর ঘামে নেয়ে উঠেছে, কপাল বেয়ে ঝরঝর ক'রে ঘাম এসে চোখের ওপর প'ড়ছে, দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে, মোছবার অবকাশ নেই। বাধার পর বাধায় বারবার যত ঠোকাঠুকি যাচ্ছে ততই ক্ষেপে উঠছে সুরেন। পারতো যদি বোধহয় দাঁতির পর দাঁতি ঘেরে পাহাড়গুলো গুঁড়িয়ে চুরমার ক'রে দিয়ে পথ ক'রে নিত। যদি চুড়োয় একবার উঠতে পারতো, খাদ যতই অতল সীমাহীন হোক্ না কেন, সে ঝাঁপ দিত। এক বন্য ক্রোধে আক্রোশে তা'র বিশাল বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। রক্তের প্রবল প্রচণ্ড চাপে তা'র চোখ দুটো কাটা মহিষের রক্তের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে।

এক সময় একটু দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো সুরেন। হঠাৎ এক বিভ্রান্তিকর অসীম নৈরাশ্যে অবসন্নে মনে হ'লো সমস্ত শরীর যেন বিমিয়ে আসছে। কা'র ওপর কিসের অভিমানে রাগে হঠাৎ তা'র দু'চোখে উত্তপ্ত অশ্রুর দুটি বিন্দু ফুটে উঠলো, গাল বেয়ে ঝরঝর ক'রে পড়তে লাগলো। একটা বুড়ো সেগুন গাছের তলায় সে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো, মাথাটা দু'হাঁটুর মধ্যে গুঁজে নিঃসাড় হ'য়ে রইলো। কতক্ষণ হ'য়ে গেছে কে জানে। হঠাৎ এক ঝটকায় সে মাথা তুলে সামনের দিকে তাকালো। একি! তোজবাজী নাকি? ঘুরতে ঘুরতে এ কোথায় সে এসে প'ড়েছে! কোথায় সেই পরিচিত পাহাড় নদীর দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ

—এ যে একেবারে আনকোরা নতুন জায়গা! দু'হাত দিয়ে ব'গড়ে ঘ'গড়ে চোখ মুছে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলো, আনন্দে আশায় তা'র সর্বশরীর নেচে উঠলো। একটু দূরে—একেবারে সামনে—যতদূর চোখ যায়, খোলা মাঠ ধূ ধূ ক'রছে সবুজ ঘাসের সমতল পথ। তবে—তবে তো সে পথ পেয়েছে—ঐ তো—ঠিক সামনে—একটু দূরে? সে মুক্তির প্রচণ্ড আনন্দে চীৎকার ক'রতে গেল কিন্তু আশ্চর্য, তা'র গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না। আনন্দে আবেগে উত্তেজনায় বোধহয় তার গলা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। সে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সেই মণিমাণিক্যের পুঁটলি একহাতে মুঠে ক'রে ধ'রে একটি লাফ দিয়ে দৌড়তে গেল, কিন্তু পারলে না। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, সেই পাড়ীতে বাঁধা মণিরত্নের ভার অসহ্য আকর্ষণে তা'র হাত যেন ছিঁড়ে নেবে। ওটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো সে. মনে হলো, হু হু ক'রে যেন ঐ বোঝার ভার বাড়ছে. দেহ থেকে দুটো হাতই বুঝি এখনই ছিঁড়ে প'ড়বে। মহা আতঙ্কে সে ঐ বিরাট ঐশ্বর্যের বোঝা মাথায় তুলে নিল। কিন্তু চ'লতে পারছে না কেন? মনে হ'লো মাটির নিচে পাতাল থেকে কে যেন তা'কে টানছে, একটু একটু করে এবার সে যেন তলিয়ে যাবে। না, এতো দুর্বল সে এখনও হয়নি। শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার মতো সে আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে চল্‌লো। মনে হ'লো, পথ যেন ফুরোবে না। আর একটু, আর একটু গেলেই তো সে এই গোলকধাঁধার ব্যূহ ভেদ ক'রে মানুষের লোকালয়ের মধ্যে আশ্রয় পাবে, সম্মান খ্যাতি সুখ ঐশ্বর্য ভালবাসা স্ত্রী সন্তান বন্ধু—সব পাবে। কত সময় চ'লে গেছে তা'র খেয়াল নেই। আর একটা লাফ মারলেই ওপারের মুক্ত খোলা মাঠ। শরীরের সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত শক্তি কুড়িয়ে সে এক লাফ মারলো, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা যেন কঠিন পাথরে আছড়ে হমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল—কে যেন নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় তাকে ছুড়ে ফেলে দিল। আঘাতের যন্ত্রণায় সে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। বুড়ো সেগুনের পাথরের মতো কঠিন গুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তা'র মাথাটা হেলে প'ড়েছে। তবে—সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? দু'হাতে জোরে জোরে চোখ দুটো ঘষতে ঘষতে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। কোথায় সেই উন্মুক্ত সমতল মাঠ! সামনে বিরাট পাহাড়টা আগের মতোই তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হ'লো সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হ'য়ে গেছে? কোন যন্ত্রণা, কোন বেদনা-বোধ আর নেই, ক্ষুধা নেই—তৃষ্ণা নেই, দেহ-হীন এক হারানো আত্মার মতো সে যেন এই অরণ্যের বন্দীশালায় যুগ-যুগান্তর ধ'রে নিশিদিন পালাবার পথ খুঁজছে—পাচ্ছে না। হঠাৎ ধক্ ক'রে তা'র মনের মধ্যে কথাটা কেঁপে উঠলো—ক্যাপ্‌টেন লাহিড়ীর সেই আজগুবি কথা—স্পিরিট্ অফ্. দি জাঙ্‌গ্‌ল্. সেই স্পিরিট-টাই তবে কি তা'র দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাচ্ছে—পথে বিপথে হয়রান ক'রে খাদের মধ্যে ফেলে দেবার জন্যে মরীচিকা দেখাচ্ছে। এক অজানা আতঙ্কে সে পড়ি মরি ক'রে উল্টো দিকে দৌড়তে লাগলো। দু'কানে তালা লাগিয়ে যেন হাজার ইঞ্জিনের শব্দ কেটে পড়ছে, তা'র মধ্যে বজ্র-নির্ঘোষের মতো একটি আর্তচীৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে—পালা—পালা—পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়্. ক্লিফ থেকে—পালা—পালা! সমস্ত চৈতন্য-নেতৃস্থানীয় আর এক শব্দ তা'র বুকের ভেতর থেকে যেন সাড়া দিয়ে ব'লছে—তাই দেবো—তাই দেবো—আর একটু সবুর করো—আর একটু দাঁড়াও? এখনো আলো আছে—আর একটু দেখতে দাও—আর একটু। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো দৌড়তে দৌড়তে সে এসে দাঁড়ালো বিরাট শাল আমলকী গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেই বিরাট হাঁ-করা দৈত্যের মুখ-গহ্বরের মতো দু'ভাগ হ'য়ে যাওয়া সেই বিশাল ফাঁকটার সামনা-সামনি, যা'র একটু দূরে অসংখ্য কিং কোব্‌রার দল এই মহা-অরণ্যের নির্মম দ্বাররক্ষীর মতো করাল

মৃত্যুর ভয়াল ফণা দুলিয়ে পালাবার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ পথে কে তাকে ঠেলে ঠেলে আন্‌লে! এ পথে তো সুরেন ভুলেও আসতে চায়নি। আতঙ্কে তা'র সর্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো, সে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে উল্টোমুখে ছুটতে লাগলো। কখন সারা পশ্চিম আকাশ নিবন্ত আগুনের অঙ্গারের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, আলো প'ড়ে এসেছে, সুরেনের কোন হুঁস্ নেই। সে দম্ দেওয়া কলের লাটিমের মতো নিজের চারদিকেই যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে। তারপর দম যখন এক সময় ফুরিয়ে এলো, বহু পথ-বিপথ অতিক্রম ক'রে সে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু দাঁড়ালো, মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলো, ঠিক তা'র সামনেই সেই মণি-রত্নের গুহা! এতক্ষণ তাহ'লে একই রাস্তায় সে চরকীর মতো ঘুরেছে। এক অন্ধ নিয়তির হাতে সে যেন সুতোয় বাঁধা পতঙ্গ। নৈরাশ্যে অবসাদে সে সেখানেই ব'সে প'ড়লো, তারপর উপুড় হ'য়ে পাথুরে মাটীর ওপর মুখ গুঁজে রইলো। হাপরের মতো তা'র বুকটা ওঠা-নামা ক'রছে, মনে হয় যেন ফুস্‌ফুস্‌টা এখনই ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে! অনেকক্ষণ—মনে হয় যুগ-যুগান্তর সে যেন এমনি ক'রে পাথরের সঙ্গে পাথর হ'য়ে প'ড়ে আছে। আস্তে আস্তে সারা অরণ্যকে আবৃত ক'রে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। সুরেন একবার মুখ তুলে সেই ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো। হাওয়া নেই। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা অদৃশ্য জালের মতো সারা অরণ্যময় ছড়িয়ে প'ড়েছে। আজ সেই মুহূর্তে প্রথম তার বুকটা ধক্ ক'রে উঠলো, মনে পড়লো কি যেন ছিল, কি যেন নেই? ইন্দিরা নেই! ইন্দিরা নেই! কথায় বার্তায় গল্পে এই দুঃসহ বন্য জীবনে ইন্দিরা তা'র স্পর্শ গন্ধ অস্তিত্ব কণ্ঠস্বর দিয়ে এই মৃত্যুপুরীর মতো গহন অরণ্যের দুঃসহ ক্লান্তি আর অন্ধকার উড়িয়ে দিত। প্রতিদিন প্রভাতে নতুন আশা হ'য়ে, দিনের শেষে নিদারুণ ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারার মতো ইন্দিরা তার একেবারে পাশে ছিল। এক টুকরো হাসি, হেরি ক'রে ফিরলে অভিমান ভরা অনুযোগ, অসুখ হ'য়ে প'ড়লে সেই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা—আজ কেউ কোথাও নেই—সে একা—একেবারে একা! মনে পড়লো, একদিন তা'র জ্বর মতো হয়েছিল, ইন্দিরা কতক্ষণ তা'র মাথা টিপে দিয়েছিল, ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। আরও মনে পড়ে কতবার কাকুতি মিনতি ক'রে অনুরোধ ক'রেছিল, শেষকালে দু'সন্ধ্যায় দু'টি গান গেয়েছিল ইন্দিরা—একটা মনে আছে: "যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে" আর একটা মনে পড়ছে—"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে!" কিন্তু কোথা দিয়ে সব কি হ'য়ে গেল। একটা অসহ্য কান্নার বেগ ভেতর থেকে বুকটা পাকিয়ে উঠছে। এলোমেলো ঝ'ড়ো বাতাসে শুক্‌নো ঝুটোর মতো সুরেনের সেই প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো চেহারাটা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। সেইখানে সেই পাথরের ওপর মুখ গুঁজে কোন জটিল অভিমানে অনুতাপে দুঃখে নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায় সুরেন একটা অবুঝ ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মনে হ'লো এ কান্না যেন আর থামবে না, যেন শুধু সুরেনের কান্না নয়, অরণ্যের সেই ঘনায়মান রাত্রির মর্মমূল থেকে যেন সেই কান্না উৎসারিত হ'য়ে দিকে দিগন্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক বিচিত্র আবেগে সুরেন উঠে ব'সলো, তারপর সেই মণিমাণিক্যের টুক্‌রোগুলো মাটির ওপর ছুড়ে ছড়িয়ে দিয়ে ইন্দিরার শাড়ীটা সুরেন দুহাতে নিবিড় ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরলো, তার ওপর নিজের মুখ ঘষতে লাগলো। তা'র মনে হ'লো ইন্দিরার স্পর্শ গন্ধ এখনো জড়িয়ে আছে এর প্রত্যেক সুতোয়, বুনোনে, রঙে, নক্সায়! বিহ্বল আবেগের ঘোরে তার মনে হলো সে যেন ইন্দিরার সেই নরম সুকুমার দেহটা বুকে জড়িয়ে ধ'রেছে, আর কী উষ্ণ, কী নরম, কী জীবন্ত। হঠাৎ একী হ'লো, শাড়ীটার প্রতি অণু-পরমাণু থেকে এমন মর্মান্তিক গোঙানির শব্দ উঠছে কেন। কা'র এ নিরুদ্ধ আর্তনাদ, কা'র এ আকুল কান্না! যেন আগুনের তীর এসে লাগলো সুরেনের বুকের মাঝখানে, দুহাতে যখন সেই নরম গলাটা সে টিপে ধ'রেছিল,

ইন্দিরার অসহায় অন্তর থেকে এমনি গোঙানির আওয়াজ উঠেছিল। সুরেন বোধহয় উন্মাদ হ'য়ে গেছে। সে কান্না জড়ানো গলায় ব্যাকুলভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, না—না, আর আমি অমন করবো না, তুমি দেখাচ্ছিলুম—ভয়, ছিঃ কাঁদতে নেই! চল চল আজ আমরা এক্ষুণি এখান থেকে পালিয়ে যাই—এক্ষুণি—এই রাত্তিরেই—এইসব ধরণের সান্ত্বনাবাণিকা—কিছু চাই না—কিছু চাই না! কেঁদো না, চুপ করো—চুপ করো লক্ষীটি। শাড়ীটা সে বুকের মধ্যে নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে ধ'রে রইলো।

সমস্ত বনস্থলীর বুকের মধ্যে বোধহয় দিনের পর দিন অনেক উত্তাপ সঞ্চিত হ'য়েছিল, হঠাৎ সে উত্তাপ দিকে দিকে ফেটে প'ড়লো। ঝড়ের মতো প্রবল হাওয়া উঠলো, গাছ-পাহালি সেই ঝড়ের বেগে উন্মত্তের মতো দুলতে লাগলো। দূর-দূরান্তর থেকে দৈত্যের গর্জনের মতো হুহার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে সেই মহা-অরণ্যকে আদিম তাণ্ডব-নৃত্যের আহ্বান জানিয়ে প্রচণ্ড দামামার মতো বাজতে লাগলো। সুরেন সভয়ে শুনতে পেলো—একটুও ভুল হয়নি তা'র। ক্যাপ্টেন লাহিড়ীর গলা—দিগন্ত জুড়ে সেই আঁ—আঁ—আঁ—আ—আ—আর্তরব ক'রতে করতে ক্যাপ্টেন তা'র দিকে ছুটে আসছে—পিছনে শত সহস্র নাগ নাগিনীর ফণা মৃত্যু-ভয়াল ফণা দুলিয়ে তা'র দিকেই তেড়ে আসছে। আর ঐ তো সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর নিয়ে বিস্ফারিত দুটি ভীষণ চোখের দৃষ্টি নিয়ে ইন্দিরাও র'য়েছে তার পাশে, আঙুল দিয়ে তা'র দিকে দেখাচ্ছে। আর তো লুকোবার সময় নেই—কোথায় লুকোবে—কোথায় পালাবে? সুরেন ইন্দিরার শাড়ীখানার বুকপিঠ মুখ ঢেকে উন্মত্তের মতো হাপাহাপি ক'রতে লাগলো। এরোপ্লেনের একশো প্রকেশারের মতো প্রবল বজ্র-গর্জনের মতো তার কানে বাজতে লাগলো—পালা—পালা—পাহাড় ডিঙিয়ে—লাফিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালা—পালা—সুরেন চীৎকার ক'রে সেই ধ্বনি তরঙ্গে প্রহত প্রতিধ্বনির মতো চীৎকার ক'রে উঠলো—পালাবো—পালাবো—যে ক'রেই হোক—আজ এই রাত্তিরেই—পালাতে হবেই—পালাতে হবেই! ফাঁদে পড়া বাঘের মতো একেবারে উন্মাদ সুরেন ইন্দিরার শাড়ীটা দুহাত দিয়ে কঠিন নিষ্পেষণে রশ্মির মতো পাক দিতে দিতে গর্জাতে লাগলো—এই দেখ্, কেমন পালাব পালাই, এই দেখ্ কেমন পালাব পালাই!

সুরেন পালিয়েও ছিল।

সে কাহিনী জানা গেল দিন চারেক পরে।

উদ্ধারকারী দলের অধ্যবসায়ের প্রশংসা ক'রতে হয়। ধোঁয়া দেখে এই জায়গাটার প্রথম নিশানা তা'রা পায়। নিচের থেকে কোন কিছু সংকেত পাবার প্রত্যাশায় তা'রা এরোপ্লেন্ নিয়ে ওপরে চক্কর দিয়ে ঘুরছে। বড় বড় পাহাড়, এয়ার-পকেটও খারাপ, খুব নিচে প্লেন নিয়ে ওড়া সম্ভব ছিল না। তারপর দুঃসাহসী একটা দল বাধা পাইলই ক্যাপ্টেন্ মাথুলির নেতৃত্বে খানিকটা প্যারাশুটে, খানিকটা দড়ি-পথে এই জায়গায় নামলো। তা'রা এয়ার-হষ্টেস ইন্দিরার নিহত নগ্নদেহের সন্ধান পেল। সেই গুহার সামনে একটা গাছের ডালে একটা শাড়ীর ফাঁস-লাগানো অবস্থায় সুরেনের মৃতদেহ দুলছে। হাওয়ায় দুলছে। তা'র জিভটা এক মর্মান্তিক বিদ্রূপের মতো মুখের বাঁ থেকে লম্বমান বেরিয়ে র'য়েছে। নিচে জমির ওপর উদ্ধারকারীদল দেখলে, এখানে ওখানে চড়ানো চক্‌চকে রঙীন অজস্র ক্রীষ্টাল্ পাথর।

সেই গুহার সন্ধানও তা'রা পেলো, যেখানে লাইমষ্টোনের ভেতর দিয়ে জল চুঁয়ে চুঁয়ে কত শতাব্দী ধ'রে প্রকৃতির বিচিত্র কারিকুরিতে কালো পাথরের ওপর নানা রঙের ইন্দ্রজাল ফুটে উঠেছে। কোনটায় হীরকের ছ্যুতি, কোনটায় চুণী পান্না মোতির বিচিত্র বর্ণালি।

তা'রা শুধু ঐ টুকুই জান্‌লো।

তা'র আগের কথা, ক্যাপ্টেন্ লাহিড়ীর কথা তাদের কাছে ঐ যোজন-জোড়া বুকো পাহাড়ের মতো, অরণ্যের মতো স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

গল্পের শেষ লাইন লিখে ভাবলাম, আমিও কি সেই স্তব্ধতার পর্দা তুলে সব রহস্যের শেষে এসেছি!

এখন রাত চারটে। তিনসুকিয়ার সুদূর প্রান্তে ওইভান্ ফরেষ্টের ধারদেশে এই ছোট্ট ফরেষ্টার-বাংলোর আউট্-হাউসে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় এইমাত্র এ গল্প শেষ করলাম। এই নির্জন নিস্তব্ধ রাত। গভীর রাতের অরণ্যের এই নিবিড় স্পর্শ গন্ধ সব না পেলে এ গল্প বোধ হয় কখনও লিখতে পারতাম না। আমি অরণ্যের আরও নিবিড়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফরেষ্টার্ শ্রীবিশ্বাস আমায় একলা ছেড়ে দেননি।

ক্যাপ্টেন্ গাঙ্গুলি আমার বন্ধু। সুরেনের পকেটে পাওয়া ছোট্ট ডায়েরিটা আমায় দিয়েছিল হারিয়ে-যাওয়া কাহিনীটা নতুন ক'রে লিখতে। এখানে ওখানে অস্পষ্ট সংকেতের মতো কতটুকুই না লেখা আছে ছেঁড়া-খোঁড়া ঐ ছোট্ট ডায়েরির পাতায়! কল্পনা দিয়ে কত ফাঁক আমি ভরাতে পারি!

এমন সময় ঘটনাটা ঘটলো। জানি না, এ আমার মোহাচ্ছন্ন মনের বিভ্রম, না, মনের গভীর টানে মৃত্যুর দেশে ও সে টান গিয়ে লাগে!

সুরেনের ডায়েরিটা আমার সামনে টেবিলে প'ড়ে আছে। আর কেউ কোথাও নেই। আসামের জঙ্গলের অদ্ভুত বিচিত্র ঝিঁঝিদের কোনও একটা একটানা আর্তনাদের মতো ডাকছে—ঠিক যেন কারও গোঙানো কান্নার মতো। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ডায়েরির পাতাগুলো এলোমেলো উড়তে লাগলো, মাঝ থেকে দুটো পাতা এক সঙ্গে গায়ে গায়ে জুড়ে উঁচু হ'য়ে দুলছে, মনে হ'লো সুরেন যেন দুটি হাত জোড় ক'রে কোন্ দূর মৃত্যুর দেশ থেকে ছায়ার মতো এখানে এই ঘরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু করুণ গলায় কিস্ কিস্ ক'রে বলছে—আমায় ক্ষমা করুন, আপনি তো সব জানতে পেরেছেন—আমায় ক্ষমা করুন, আমায় দয়া করুন!

আমি একদৃষ্টে সেই উড়ন্ত পাতাদুটির দিকে চেয়ে রইলাম। আর সেই অদৃশ্য ছায়ার উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আমি কে! আমি তোমারই মতো একজন আগুন-পিয়াসী পতঙ্গ। যাঁর হাতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভার, সব মানুষের সুখ দুঃখের ভার, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা ক'রবেন সুরেন! তোমার মতো আমরা সবাই সমান অভিশপ্ত, কোন্ এক অ্যাক্সিডেন্টে আমরা সবাই যেন চারদিকের জটিল অরণ্য আর কঠিন পাহাড়ের মধ্যে আটকে প'ড়ে আছি, বাইরে যাবার পথ পাচ্ছি না। নিশিদিন শুধু বুকের মধ্যে দুরুদুরু ভয় আর উৎকণ্ঠা ঐ বুঝি কে আমায় আচমকা পেছন থেকে নিচে অতল গাঙের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমার সব ক্রীষ্টাল্ পাথরগুলো চুরি ক'রে নিয়ে যাবে।

তারপর আশ্চর্য, হাওয়াটা যেন শাঁখ খেয়ে জানলা দিয়ে মাঠ পেরিয়ে শাল-দেওদারের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল। ডায়েরির পাতাগুলো কোন মৃত শরীরের মতো আগে যেমন ছিল তেমনি নিশ্চল হ'য়ে প'ড়ে রইলো।

বাইরে কাঠের পাটাতন বেওয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দূর দূরান্তের অরণ্যের বাতাস আমার ক্লান্ত দেহের ওপর যেন চন্দনের স্নিগ্ধ শীতল প্রলেপ লাগিয়ে দিল। যোজন-জোড়া গুইতাল্ ফরেষ্ট দূরে বহু দূরে মোহিত নদী ছড়িয়ে মেকা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে আছে। পূব আকাশ আস্তে আস্তে লাল হ'য়ে উঠছে। আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারিগুলি কালো অস্পষ্ট ঘাসের মতো মনে হচ্ছে। অরণ্য পাখিরা ডাকছে। দূরে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের স্পষ্ট আভাস দেখলাম। আমার সমস্ত শরীর মন আত্মা রোমাঞ্চিত হ'য়ে যেন একটি গভীর প্রার্থনায় আনত হ'য়ে নিঝ'রের সঙ্গীতের মতো বেজে উঠলো :

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্,
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

হে দিবাকর, তুমি সব অন্ধকার আলোকিত করো! আমার হাত দিয়ে তুমি শতচ্ছিন্ন জীর্ণ বিশ্বাস সকল মানুষের প্রণাম গ্রহণ করো!

• • • •

চন্দননগরের যে বোমা তৈয়ারী হইত, তাহার প্রথম পরীক্ষা হয় শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার তৈয়ারী একটি ছোট বোমার মুখে ক্যাপ লাগাইয়া মতিবাবুর দালানের ছাদ হইতে উঠানে আছাড় মারেন। কিন্তু তা ঠিকমত ক্যাপের দিকে না পড়ায় ফাটে না। মতিবাবু তৎক্ষণাৎ উহা মাটি হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার দালানের পাকা ধাপের উপর আছাড় মারেন, এবং উহা সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে বিদীর্ণ হইয়া সিমেন্টের ধাপের এক অংশ ও খিলানের এক অংশ ভাঙ্গিয়া দেয়। সুখের বিষয় কেহই আহত হন নাই।

চন্দননগরের তৈয়ারী বোমা যখন কৃতকার্যতার সহিত ফাটান যায় দেখাগেল তখন উহা নানা জায়গায় পাঠান হইল।

পৌনঃপুনিক

অতুলরঞ্জন দেব

মাত্র সেদিনের কথা। মাস পাঁচেকও হয়নি। বিয়ে হয়েছে। শেষ পর্বটা পর্যন্ত নিঃশেষ হয়নি। কিন্তু হাস্যতা জীবনে অজস্র চিড় ধরে গেলো। এরকম অবস্থায় ভঙ্গে সজল হয়তো আগের থেকেই প্রস্তুত ছিলো। তা নাহলে এ ব্যাপারে বাধা ধামানোর তেমন প্রয়োজন বোধ করে না কেন? বিধাতা তার আসন মনস্কামটা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাতেই সে পরিতৃপ্ত। এখন পরিণামটা যা-ই হোক না কেন, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করার মধ্যে কোন রকম প্রশ্ন থাকবে না। তাছাড়া, এসব চিন্তা-ভাবনা করার সময়ই বা সজলের কোথা? বড় চাকুরে। ঘরে সুখ শান্তির অভাব হলেও কী হবে, বাইরে তার হাটের সুখের অভাব নেই। কেবল ভোগ করলেই হলো! কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, রেবারই। সারাদিন অখণ্ড অবসর। ঘড়ির কাঁটা যেন ঘুরতেই চায় না। বিয়ের আগে তবু একটা উপলক্ষ ছিলো। চাকরি করতো। তখন ছুরসত বলে কোন জিনিস-ই ছিলো না। আর এখন? চাকরি ছাড়তে রেবা চায়নি। কিন্তু সজল ওর কোন ওজর-আপত্তি শোনেনি। বলেছিলো, 'তা হয় না, রেবা। আমার একার রোজগারেই দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আর দুজনাই যদি চাকুরে হই, তাহলে কে কার ক্লান্তি-অবসাদটা দূর করবে শুনি?'

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এখন দেখছে চাকরি ছেড়ে সে কী ভুলটাই না করেছে! অন্তত সময় কাটানোর জন্যে এতো কসরত করতে হতো না। গল্প-উপন্যাসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ঠিকই। কিন্তু মনটা বড় অশান্ত। কিছুতেই স্থির, সংহত করতে পারে না। পড়াও হয় না। শান্তিও পায় না। অতীতের টুকরো স্মৃতি আগুনের ফুলকির মত ঝিলিক মারে। রোমন্থনে যন্ত্রণাটাই বাড়ে। বিয়ের আগের মধুর স্বপ্ন-কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ কি এ-ই? তাই রেবার মনে দিনের পর দিন প্রশ্নের ভিড় ও বিস্ময়। এই অশান্তি কি একা তার-ই? সজলের সুখের দিকে তাকালে তো তাকেও সুখী বলে মনে হয় না। অথচ সে রেবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায় না কেন? এভাবে কি আর জীবন কাটানো যায়? যতোদিন যাচ্ছে বিষয়টা ততো জটিল আকার ধারণ করছে। আর দেরি না। এবার খোলাখুলি আলাপ করে নেওয়াই ভালো। কিন্তু উত্থাপন করার মত তেমন সুযোগ-সুবিধেও পায় না রেবা। আজও সভীর রাত হয়েছে। ঢং-ঢং করে কখন বারোটাও বেজে গেছে। কিন্তু কারো চোখেই ঘুম নেই। একই বিছানায় দুজন। রেবা ও সজল। পাশাপাশি। অথচ পিঠাপিঠি। ঘরে একটা নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। স্নিগ্ধ সবুজ আলোয় আবেশের আশ্চর্য সৃষ্টি। উভয়েই যেন কথা বলতে চায়। অথচ বলতে পারছে না। শেষপর্যন্ত রেবাই প্রথমে মুখ খুললে, 'ওগো শুনছো?'

—'কী? কিছু বলবে নাকি?'

—'বলতে চাই অনেক কিছু। অনেকদিন ধরে। কিন্তু বলতে পারছি কই?'

—'অবিকল আমার মনের কথাটাই বলে ফেলেছো রেবা।'

—'আচ্ছা, বলতে পারো এমনটি হলো কেন?'

—'সবই নিয়তি!'

রেবার স্বরটা স্বগতোক্তির মতো শুনালো।

বললো, 'আমাকে বিয়ে করেছো বলেই হয়তো তুমি সুখী হতে পারলে না।'

—'এ তোমার অকারণ সন্দেহ, রেবা। আমি মোটেই অসুখী নই।'

—'এটা মুখের কথা। ঠিক অন্তরের কথা নয়। আমি কি আর বুঝিনে!'

—'বুঝেছো হয়তো। কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারোনি। আমার ব্যাপারটা-ই যেন কী রকমের! সকলেই দেখি বুঝতে ভুল করে। তুমিও করবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আজকাল সুখের ওপর নির্ভর করিনা। সংসারে একমাত্র দুঃখটাই বিশ্বস্ত -এ সমস্ত ঠেকে শিখেছি, রেবা। এখন দেখছি দাম্পত্য জীবনের এই চেহারার কথাটা আমি আগে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম।'

এ ধরনের কথার জন্যে রেবা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। প্রত্যুত্তরে তার কণ্ঠে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো, 'কী করে বুঝতে পেরেছিলে? ঠিকুজী বিচার করিয়েছিলে নাকি?'

—'না।'

—'তাহলে?'

—'বলবো, রেবা। আমিও বলতে চাই। হালকা হতে চাই।'

—'ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমার ধারণাটা যখন এতো স্বচ্ছ-ই ছিলো তাহলে বিয়ে না করলেই হতো। সঙ্গে আরেকটা জীবনকে এভাবে বিপন্ন না করলেই পারতে।'

সোজাসুজি উত্তরটা দিলে না সজল। ঘুরিয়ে বললে, 'আমি তো রক্ত-মাংসেরই মানুষ, রেবা। যুক্ত পুরুষ নই যে বিয়ে না করে থাকবো। তাছাড়া সামাজিক একটা কর্তব্যও তো রয়েছে।'

—'ঠিকই বলেছো। তোমার মনটা বড় বেশি জটিল। কারো পক্ষেই বই পাওয়াটা সহজ কর্ম নয়!'

প্রত্যুত্তরে সজলের স্বরটা ভারী ভারী শোনালো. 'প্রথম থেকেই মনটা এতো জটিল ছিলো না, রেবা। ধীরে ধীরেই হয়েছে। শেষের দিকে এক বন্ধুর জীবনের নির্মম আলেখ্যটাই এব্যাপারে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।'

—'এমন কী হয়েছিলো তোমার বন্ধুটির?'

—'কী হয়নি তাই বলো!'

—'হেঁয়ালির সৃষ্টি করছো কেন? বলতে হয় বলেই ফেলো না? দেখি জটিলতার প্যাচ কিছুটা খুলতে পারি কিনা।'

—'সত্যিই, কথাটা তোমাকে আগে বললেই হয়তো ভালো হতো।'

—'যা হবার হয়ে গেছে। এখনই বলো. শুনি।'

—'তাহলে শোনো।—তখন আমরা অর্থাৎ আমি, দীপঙ্কর ও কৃষ্ণা য়ুনিভারসিটিতে পড়ি। কী আশ্চর্য উজ্জ্বল ছিলো সেই দিনগুলি! আমি ও দীপঙ্কর পরস্পর বন্ধুতো ছিলামই. বন্ধুর অধিকও বলতে পারো। কোন ছাত্র-ছাত্রীই আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারেনি। এই দীপঙ্করই ভালোবেসেছিলো কৃষ্ণাকে। কী সেই ভালোবাসা! অনেকেই ঈর্ষায় জলে-পুড়ে মরছিলো। তাদেরও কিছু রাখা-ঢাকা ছিলো না। দুজনে

দিনে মাঠে-হাটে বেড়িয়েছে। লেকে বসে সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। সিনেমায় গিয়েছে। মুখোমুখি বসে দিনের পর দিন গল্প করেছে। তবুও যেন দীপঙ্কর নিঃসন্দেহ হতে পারতো না। মাঝেমাঝে আমাকে বলতো, "সুখের নীড় গড়ার স্বপ্নটা কি আমার সফল হবে, সজল?"

: "না হওয়ার কী আছে, দীপু? তোদের দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করে, কারো সাধ্যি নেই।"

: "এসব ব্যাপারে এতো জোর করে কিছু বলা যায় না, সজল। এই ইউনিভার্সিটিতেই কৃষ্ণার প্রেমাভিলাষী যুবকের অভাব নেই। শেষ পর্যন্ত যদি প্রতিযোগিতায় হেরে যাই!"

: "কী যে বলিস! অন্যদের তো কৃষ্ণা পাত্তাই দেয় না। হেসে দু' চারটে কথা বললেই কি আর ভালোবাসা হয়ে যায়?" দেখতাম, দীপঙ্কর আমার কথায় আশ্বস্ত হতো।

কৃষ্ণাও আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করতো। বলতো, "দীপুদাকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব-ই কল্পনা করতে পারি না, সজলদা।"

: "দীপঙ্করেরও ওই একই কথা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এমনি ধারা ছিলো কৃষ্ণা-দীপঙ্করের হৃদয়-বিনিময়। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনা আর কাকে বলে! দীপঙ্কর ছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র। ও তখন রিসার্চ করছিলো। একদিন কী একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েই সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। বিস্ফোরণটা বড় রকমের না হলে কী হবে, মুহূর্তের ব্যবধান—সুন্দর, সুগোল চেহারাখানি অল্পেপুড়ে বীভৎস হয়ে গেলো!'

—'উ।' একটা বেদনার্ত শব্দ করে উঠলো রেবা।

—'কী হলো, ভয় পেলে নাকি? তাহলে থাক্ গল্পটা।'

– 'না। সে হয় না। কৌতূহলটাকে মাঝপথে গলা টিপে মারলে অস্বস্তিটাই বাড়বে বেশি।'

—'আচ্ছা, শুনতে চাও শোনো।—সঙ্গে সঙ্গেই দীপঙ্করকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। যথারীতি চিকিৎসাও চললো। খবর পেয়ে কৃষ্ণা পাগলের মত ছুটে এলো। দেখলাম, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মুখেও তার তেমন কথা সরছে না। চোখ দু'টি কেবল ছলছল করছে। সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবেরাও দেখতে এসেছিলো। কৃষ্ণার এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলেরই যে সহানুভূতি জেগেছিলো তা নয়। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে খুশী-ই হয়েছিলো। যাক্—দীপঙ্কর যতোদিন হাসপাতালে ছিলো কৃষ্ণা তাকে সান্নিধ্যদান করেছে। একদিন কথায় কথায় মনের কথাটা বলেই ফেললো দীপঙ্কর, "আচ্ছা কৃষ্ণা তুমি কি আমাকে আর আগের মত ভালোবাসতে পারবে?"

: "এ ধরণের প্রশ্ন কেন করছো দীপুদা? আমার কার্যকলাপে কি তা-ই মনে হচ্ছে?"

: "না, কৃষ্ণা। মোটেই নয়। কিন্তু কী জানি কেন, এক্সিডেন্টের পর থেকে মনটা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

: "দোহাই তোমার, এসব আজেবাজে চিন্তা এখন করো না দীপুদা। ভালোবাসা হলো হৃদয়ের ব্যাপার। তা সত্যিকারের হলে রূপলাবণ্যের ওপর কখনো নির্ভর করে না।"

সেদিন কৃষ্ণার সেই আশ্বাসে দীপঙ্করের মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিলো। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনের সুন্দর ছবিটাকেও কল্পনায় দেখেছিলো। তারপর একদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলো। কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা নিজে দেখেই আঁতকে উঠলো দীপঙ্কর—এ কী? নিয়তির খেলা এখানেই শেষ হলো না। অন্যদিকে ঝাঁক নিলো। কৃষ্ণা হঠাৎ অবিশ্বাস্যরকম বদলে যেতে আরম্ভ

করলো। আগের কটিনটাই সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে। সময়ে-অসময়ে উপস্থিত করতে আর আসে না। পড়াশোনার দোহাই দিয়ে ঘুরে ঘুরে সরে থাকতে লাগলো। বিষয়টার এই প্রায়শ্চিত্তটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সবকিছু বুঝেসুঝেও যেন দীপঙ্করের মনটা কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। দেখতেও চাইলে না। শেষপর্যন্ত একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করেই বসলো, "এসব ছলাকলা-লুকোচুরির দরকার কী, কৃষ্ণা? তার চেয়ে বরং পরিষ্কার বলেই ফেলো সোপন মতলবটা।"

: "তোমার এই অকারণ সন্দেহটাকে কিছুতেই দূর করতে পারবো না। দুর্ঘটনাটা দেখছি আমাদের মাঝে একটা দারুণ দুর্যোগ-ই ডেকে আনলো!"

: "তুমি নিজেকেই নিজে একবার বিচার করে দেখো, আগের কৃষ্ণার মত এখনের এই কৃষ্ণা কি না।"

: "আমি তো আর যন্ত্র নই দীপুদা যে সব সময় একই রকম থাকবো।"

: "হাঁ আমি বুঝতেই ভুল করেছি কৃষ্ণা। ভালোবাসা কখনো জোর করে আদায় করা যায় না।"

: "অনর্থক মনঃকষ্ট পেয়ো না, দীপুদা। এইসব ছোটখাটো সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি সব সময় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশি হয়ে থাকে। আমাদের স্বপ্নটা নিশ্চয়ই সার্থক হবে! তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

: "নিশ্চিন্ত না থেকেই বা কী করবো, কৃষ্ণা?"

এমনি করেই তাদের দিনগুলো কাটছিলো। পরিণাম কী হবে জেনেও আশাটাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফেলতে পারেনি দীপঙ্কর। কৃষ্ণা যেন তাকে যাদু করে ফেলেছিলো। বছরখানেক বাদে কৃষ্ণা এম. এ.-টা পাশ করে চাকরি নিয়ে স্থানান্তরে চলে গেলো। তারপর সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তা-ই হলো। প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র বজায় ছিলো। ক্রমে ক্রমে সেটাও একদিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দীপঙ্কর তবু আশা ছাড়েনি। চিঠি লিখেছে। শেষের দিকে কোন একটিরও উত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এই নেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কৃষ্ণা দীপঙ্করকে সহজেই ভুলে যেতে পারলো। কেন না, এ ব্যাপারের প্রস্তুতিপর্বটা সে দুর্ঘটনার পর থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিলো। কিন্তু দীপঙ্কর কৃষ্ণাকে ভুলতে পারেনি। আরো ভুলতে পারেনি ভালোবাসার অমর্যাদার জ্বালাটাও।'

এ পর্যন্ত শুনেই যেন রেবা আর সহ্য করতে পারছিলো না। মন্তব্য করলো, 'ও দেখছি মেয়ে জাতটারই নাম ভুবালে! বিশ্বাসঘাতকতায় জীবনে কখনো সুখ আসে না।'

—'এখানেই শেষ নয়, রেবা। আরো আছে।'

—'বলো। তারপর কী হলো?'

—'জেদী মানুষ দীপঙ্কর। সেই থেকে একটি কঠিন প্রতিজ্ঞাও করে বসলো—এই অবহেলনার প্রতিশোধ সে একদিন নেবে। নেবে-ই।'

—'প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছিলো নিশ্চয়ই।'

—'হ্যাঁ। সেটাই মূল বিস্ময়কর বিষয়! শোনো—

দীপঙ্কর কৃতিত্বের সহিত এম. এস-সি পাশ করেছিলো। তারপর একদিন উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলেতে গেল। যখন ফিরলো, সে তখন আরেক দীপঙ্কর! প্লাস্টিক সার্জরির সাহায্যে কৃষ্ণার চেহারাটাকে বদলে সুশ্রী, সুন্দর করে ফেলেছে। দেশে ফিরে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে লেগে গেলো। অন্যের কাছ থেকে কৃষ্ণার খবর সংগ্রহ করলো—কোথায় আছে। কী করছে ইত্যাদি।

কৃষ্ণা তখন একটা হাল্কার সেক্রেটারীতে চাকরি করছিলো। বিয়ে করেনি। সোনায় সোহাগা! হীপঙ্কর সেই শহরে গিয়ে একটা বিদেশী কাগে চাকরি নিলো। বিধাতাও অদৃশ্য হাতে চাবিকাঠি নাড়ছিলেন। তাই তাদের মাঝে আবার যোগাযোগ হবে বাধার সৃষ্টি হলো না। নতুন হীপঙ্কর নতুন নামে কৃষ্ণার কাছে হাজির হলো। প্রথম দর্শনেই যেন কৃষ্ণা তাকে দেখে আকৃষ্ট হলো। তারপর সেই চিরাচরিত পথ—ভালোবাসাবাসি! শেখানো বুলির মত সেই একই কথা—তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। ইত্যাদি। এইতো একালের ভালোবাসা, রেবা!'

এক্ষেত্রে একটা প্রতিবাদ না করলে কী রকম দেখায়। তাই যেন প্রতিবাদ করলে, 'কৃষ্ণার মত তো আর সকলে হয় না। একমাত্র এই কারণেই এ-যুগের ভালোবাসা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া চলে না।'

—'কিন্তু আরো আশ্চর্য কী জানো রেবা, ওই কৃষ্ণাই শেষপর্যন্ত হীপঙ্করকে বিয়ে করলো।'

—'তবু রক্ষে, এইবার ও বিয়ে করেছে। অন্তত ঘর বেঁধেছে।'

—'কিন্তু বড় অসময়ে। বড় ঘুরিয়ে। তাই সেবের ভাল কেউ-ই সামলাতে পারলে না। বিবেকের খোঁচায় হীপঙ্করের পক্ষে রহস্যটা চেপে রাখা বেশিদিন সম্ভব হলো না। কৃষ্ণার কাছে ধরা দিলে।'

সঙ্গে সঙ্গে রেবা যেন পাদপূরণ করে বললো, 'আর কৃষ্ণা লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে একদিন আত্মহত্যা করলে—এই তো?'

—'না, রেবা। তা হতে যাবে কেন? এর চেয়ে কি সুন্দর সমাধান আর নেই?'

—'না। মোটেই না।'

সজল সিগারেটের ছাইটুকু সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে একটা লম্বা টান দিলে। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'তাই নাকি? কিন্তু এখনো কি বুঝতে পারোনি রেবা সেই কৃষ্ণা যে তুমি-ই। আর হীপঙ্করটা অভাগা আমি-ই।'

এ্যাঁ! বিস্ময়-বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস একটা শব্দ ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। রেবা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবো। সজল বাধা দিলে না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সিগারেট-টা টানতে লাগলো।

মৃগয়া

নারায়ণ চক্রবর্তী

ঘরে ঢুকেই পাখাটা সুবোধমে চালিয়ে দেয় অনন্ত, খালি ইজি-চেয়ারটায় ধপ্ ক'রে বসে, হাঁক দেয়,—"স্বপন,—স্বপন, আছিস নাকি ?"

"কী বলছিস্ অন্ত -" ব'লে ভেতর থেকে ছুটে আসে স্বপন সেন। তার এক গাল চাঁছা ছোলা পরিষ্কার, অন্য গাল সাবানের সাদা ফেনায় ঢাকা। তার হাতে ফেন শুভ্র সেফটি রেজার।

স্বপন সেন অনন্ত সরকারের ছেলেবেলার বন্ধু, তার সাংসারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব সমস্যার একমাত্র পরামর্শ দাতা।

অনন্ত চোখ বুজে নিজের সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, চোখ মেলেই স্বপনের 'ফয়হান্স্' মার্কা বক্তৃতকে উজ্জ্বল হাসি দেখে যা বলতে এসেছিল তা বেবাক ভুলে যায়।

স্বপন তাড়া লাগায়,—"ন'টা বাজে। তুই না হয় কলকাতা সহরের চারটে বাড়ির মালিক, আমাকে কিন্তু খেটে খেতে হয়, কোর্টে গিয়ে কথা বেচে পকেটে পয়সা আনতে হয়,—সময় নেই মোটে,—যা বলতে এসেছিস চটপট ব'লে ফেল—"

স্বপনের কথায় তোড়ে হাবুডুবু খেয়ে আরও দিশেহারা হয়ে যায় অনন্ত, আমতা আমতা ক'রে ব'লে—"চটপট বলব বলেই না পঞ্চান্ন মাইল স্পীডে গাড়ি হাঁকিয়ে তোর কাছে এলুম স্বপন, কথাটা ভীষণ দরকারী জীবন মরণ সমস্যা—"

"আহা সমস্যটা কী তাই বল আগে—"

"সমস্যা ? তাই তো,—কী যেন বলতে এলুম—দূর ছাই, মনেই পড়ছে না—"

স্বপনের স্ত্রী মীরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল, এবার ঘরে ঢুকে মিহিগলায় বলে,—"এই রকম মনে রাখার ক্ষমতা নিয়ে তোমার বন্ধুটি কী ক'রে বি. এ. পাশ করেছিল বলো তো ?"

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে স্বপন বলে,—"লেখাপড়ায় ও আশ্চর্য ভালো ছাত্র ছিল, টলষ্টয় ক'খানা বই লিখে গেছেন জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, এক্ষুনি ব'লে দেবে ও—"

"শুধু ভুলে যায় বুঝি নিজের দরকারী কথাগুলি ?"

হৈ হৈ ক'রে অনন্ত ব'লে ওঠে,—"ঠিক,—ঠিক বলেছেন বউদি,—তাই তো বার বার ছুটে আসতে হয় স্বপনের কাছে, ও আমার স্মৃতি রক্ষক— এই স্বপন, বল না, কী বলতে ছুটে এলুম তোর কাছে ?"

স্বপনের দাঁতের ছটা আরও বিস্তৃত হয়, বলে,—"অনীতার কথা নয় তো ?"

অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে,—"ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে—"

গালে হাত দিয়ে মীরা বলে,—"অনীতা ? সে আবার কে ?"

স্বপন বলে,—"অনীতা হচ্ছে অনন্তর নবতমা—"

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে অনন্ত বলে, "এবং ও-ই হবে আমার শেষতমা—"

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে মীরা,—"দেখবেন,—নাম ভুলে গিয়ে সেবারের মতো গণ্ডগোল পাকাবেন না যেন—"

"না না, আর ভুল হবে না—"

স্বপন বলে,—"সে জন্যই তো অনীতাকে বেছে নেওয়া—অনন্তর আগেও 'অ', অনীতায় ও 'অ'—তা ওর ব্যাপারে কী বলতে ছুটে এসেছিস রাত সকালে ?"

অনন্তর উদ্দীপ্ত মুখ এক ফুঁয়ে নিবে যায়, বিমর্ষ ভাবে বলে,—"নাঃ, হ'ল না—"

মীরা বলে,—"কী হ'ল না অনন্তবাবু ?"

"বলা হ'ল না—"

সাবানের ফেনা শুকিয়ে গাল চড়চড় করছিল, তবু তা উপেক্ষা ক'রে স্বপন বলে,—"সে কী রে অন্তা ? অমন পাখি পড়াবার মতো ক'রে শিখিয়ে দিলুম,—সব ভুলে গেলি ?"

রেগে উঠে অনন্ত বলে, -"ভুলব কেন ? ভুলিনি—"

"তবে ?"

ঘুরে এসে টুলি চেয়ারটায় বসে অনন্ত বলে, -"তোর পরামর্শ মতো সবই করেছিলাম। অনীতাকে তার বাড়ি থেকে আমার গাড়িতে তুলে নিলুম,—আমার পাশেই উঠে বসল সে, পার্কষ্ট্রীটে গাড়ি পার্ক ক'রে ব্লু এ্যাঞ্জেলে ঢুকলুম। চারদিকে বুক দেখানো মেয়ে গিস্‌গিস করছিল—ওঃ, মাপ করবেন বউদি—"

মীরা মাপ না ক'রে চোখ পাকিয়ে বলে,—"সিনেমায় না গিয়ে রেস্তোরাঁয় কেন ?"

"বা,—আপনার ভাসুরঠাকুরই তো বলেছিল যে নানা রকম সুখাদ্য পেটে পড়ার পরই মেয়েদের মেজাজ প্রণয় নিবেদনের অনুকূল হয়—এটা নাকি ওর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—"

মীরার ভ্রূকুটি কুটিল মুখে আড়চোখে তাকিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত স্বপন তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে,—"আরে না—ওটা একটা কথার কথা বলেছিলুম রে—তারপর কী হ'ল বল, - আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—"

"এক কোনে একটি টেবিল নিয়ে বসলুম আমরা। কী সুন্দর সেজেছিল অনীতা! দেখলে মাথা ঘুরে যায়, বসবার সময়ে ওর সিল্ক-এর শাড়ির আঁচলটা আমার মুখ ছুঁয়ে গেল। বয় এলো, মেনু ঘেঁটে তারী অর্ডার দিলুম। অনীতা মাঝে মাঝে আমার মুখে তাকাচ্ছিল, মাঝে মাঝে হল ভর্তি প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখছিল, একবার মনে হ'ল যে ওর নিশ্বাস যেন আমার গা ছুঁয়ে গেল, চোখের পাতা কাঁপিয়ে ভুরু নাচিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল যে তোর মানা না থাকলে, আমি তক্ষুনি ওর হাত ধরে আমার হার্টের ওপর রেখে বলে ফেলতুম, - 'অনীতা,—নীতা, নীতু, - অনি, তানি, তা আ,—আমি তোমাকে—মানে তুমি কি আমাকে, মানে আমরা কি পরস্পরকে—' কিন্তু বলা হ'ল না, বদলে মুরগা মুসল্লমের বোঁয়া ওঠা প্লেটটা টেনে নিলুম। ও-ও তাই করল। খেতে খেতে অনীতা হরেক রকম বকম বকম ক'রে চলল, তার বান্ধবী শুক্লার ভালোবাসার গল্প বলল, কলেজের সহপাঠী ছোঁড়াগুলো তার চার পাশে কেমন ছোঁক ছোঁক করে তা বলল, কলকাতায় আমার বাড়িগুলো কোন কোন পাড়ায় তা জেনে নিল এবং আমি আমার পরনের স্যুটটা কোন দোকানে করিয়েছি তা জিজ্ঞেস করল "

মীরা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, বলে, "আপনার পালে এবার সত্যি সত্যিই হাওয়া লেগেছে অনন্তবাবু,—সময়ে পৌঁছুতে আর দেরী নেই, কিন্তু বিয়ের পরেও কি ঐ অতগুলো মাসে তাকবেন অনীতাকে ?"

স্বপন খাঁড় মুনসেফ, কোর্টের হাকিম কপোতাক্ষ কর এর মতো মুখ গম্ভীর ক'রে বলে,—"কোশ্চেন্—"

"প্লেটের পর প্লেট আসছিল, উড়েও যাচ্ছিল। এক সময়ে খাওয়া শেষ হ'ল, ওর শাঁখের মতো সাদা গলা বেয়ে তৃপ্তি সুখের মৃদু উসাস বেরিয়ে এলো, চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়ে জলের গ্লাসটা তুলে নিল সে ঢকঢক ক'রে জল খেল, তারপর লিপস্টিকের রঙ না মুছে যায় এমন আলতো ভাবে রুমাল তুলে ঠোঁট মুছল। শেষে দুই চোখ মেলে আমার মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো—"

"তাকিয়ে রইলো ?" খলখল ক'রে মীরা বলে,—"কী দেখলেন সেই চোখে ? অনুরাগ না বিরাগ না বীতরাগ না অনুরাগ ?"

"সেটাই যে বুঝতে পারলুম না বৌদি,—মনের ভেতর ভালোবাসার ভালো ভালো কথাগুলো কেঁদিয়ে উঠছিল, কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারলুম না—মানে স্বপনের পরামর্শ মতো সোহা ঠিক গরম হয়েছে কিনা বুঝতে পারছিলুম না,—অনীতা প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়েই রইলো,—কি কী সুন্দর ওর চোখ দুটো বৌদি,—ঠিক যেন—ঠিক যেন—"

"—পদ্ম কলি—"

"—না না—"

"তবে কি পটল চেরা ?

"তাও না—"

"তবে কি মীন আঁখি ?"

"তাও না—"

"তবে ?"

"বলতে পারেন ও তিনটের যোগফল ইনটু তিন ইনটু তিন—

স্বপন বিরক্ত হ'য়ে ব'লে—"আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তারপর কী হ'ল তাই বল না অন্তা—"

"তার পর ? ওর রাঙা ঠোঁট চিরে একসার ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা দিল—"

"তার মানে হাসল ?"

"হ্যাঁ, মানে ওকে তো হাসিই বলা হয় সাধারণ ভাবে—"

মীরা তার গালে তান হাতের তর্জনী লীলায়িত ভাবে ঠেকিয়ে বলে,—"কী রকম হাসি ? প্রশ্রয়ের না বিদ্রূপের, না অনুকম্পার, না—"

কলকাতা সহরে চারখানা বাড়ি, অনেক ঘর ভাড়াটে, মাসান্তে যা পায় তাই দিয়েই দিব্যি হেসে খেলে দিন কেটে যেতে পারে অনন্ত সরকারের। কিন্তু কী একটা খেয়ালে বিদেশী এক সওদাগরী আপিসে এ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ নিয়েছিল সে।

সেই আপিসেরই রিসেপ্‌শনিষ্ট অনীতা ব্রত,—তন্বী, রূপসী, খুটখুট ক'রে হাইহিল জুতো পায়ে হাঁটে, দুলদুল ভ্যানিটি ব্যাগ দোলায়, ঝিক-ঝিক হাসে, যখন মুখে থাকে।

প্রথম দর্শনেই প্রচণ্ড ভাবে তার প্রেমে পড়ে গেছে অনন্ত।

কিন্তু ভুলো-মন, মুখচোরা অনন্ত মেয়েদের কাছে চির বোবা। অনীতার কাছে ঘুর ঘুর করে, এক আধটা সরকারী কথা বলে, কিন্তু ঘরকারী কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

বালাবন্ধু স্বপন সেন এ্যাডভোকেট, ডুখোড় ছেলে, প্রেম ক'রে বিয়ে করেছে মীরাকে। প্রেম করবার কায়দা কানুন জানবার জন্য তার কাছে ছুটে গিয়েছিল অনন্ত। মীরার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অভিজ্ঞ কোচ্-এর মতো তাকে শিক্ষা দিয়েছে স্বপন।

ফল ফলতে দেরী হয়নি।

টিফিনের সময়ে নিজের জন্য আনা মোগলাইখানা অনীতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে অনন্ত। খুশী হয়েছে অনীতা, ধন্যবাদ দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছে, খাবার ফাঁকে ফাঁকে অনন্তকে দুটি কথা কি তিনটি চাইনী উপহার দিয়েছে।

এর পরের স্টেপ বাসস্টপে বাদুড় ঝোলা বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অনীতাকে নিজের গাড়ি ক'রে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। তা-ও করেছে অনন্ত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তার পাশে বসেছে অনীতা।

এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই অনীতার আমন্ত্রণে ওদের লেক টেম্পল রোডের ফ্ল্যাটে গেছে অনন্ত। অনীতার মাকে মাসীমা বলেছে, অনীতার অধ্যাপক বাবাকে মেসোমশাই বলেছে, অনীতার ছোট ভাই-বোনদের টফি চকোলেট দিয়ে বশ করেছে। মাসীমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে কোন কোন রাত খেয়েও এসেছে।

আস্তে আস্তে সাহস বাড়ছিল অনন্তর। অনীতাকে পাশে নিয়ে ভারমণ্ডহারবার রোড দিয়ে লম্বা ট্রিপ দিয়েছে, কিন্তু বুক দুরদুর আর গলা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য প্রণয় মুখর হ'তে পারে নি, স্বপনের ট্রেনিং মতো বলতে পারে নি,—অনীতা, নীতা, অনি,—তোমার প্রেমে আমার বুক ভরে গেছে, উপচে পড়ছে—তুমি তাকে দু'হাতে অঞ্জলি পেতে নাও—পাশে বসা অনীতা উদখুশ করেছে, দু'চারবার আলতো ভাবে যেন অসাবধানে তাকে ছুঁয়েছে, গভীর চোখে তার মুখে তাকিয়েছে। তাতে অনন্তর বুকের প্যালপিটেশন শুধু বেড়েই গেছে। অনীতা বিরক্ত হয়েছে, অস্থির হয়েছে। চোখের ভাষায়, মুখের রেখায়, হাতের ছোঁয়ায় কী যেন বলতে চেয়েছে।

দিনের শেষে রিপোর্ট নিয়ে মীরা বলেছে,—"আপনি কোন কাজের লোক নন অনন্তবাবু, এমন সুন্দর মুহূর্তগুলো বয়ে যেতে দিলেন!"

স্বপন বলেছে, "ক্যাভাল্যারাস,—হোপলেস—"

"কী জানি বৌদি,—ঐ হাসি দেখেই তো আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, স্বপনের কাছে বার বার রিহার্সাল দেওয়া মুখস্থ করা কথাগুলো আমার পেট থেকে উঠে কণ্ঠনালী বেয়ে মুখে এসে জমা হল, আমি হাত বাড়িয়ে ওর যুঁই ফুলের মতো নরম হাতখানা মুঠো ক'রে ধরলাম, মুখ খুললাম,—এমন সময়—"

হৃদ বন্ধ ক'রে শুনছিল মীরা, রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে,—"থামলেন কেন? বলুন,—এমন সময় কী হ'ল?"

"এমন সময়ে অর্কেস্ট্রার শব্দ ছাপিয়ে একটা চিল-তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলা আমাদের দু'জনের মাঝখানে বোমার মতো ফেটে পড়ল—অনন্তদা—! আহ্লাদে গলা,—মুখ না তুলেই বুঝলুম যে কালিপদ দাশুলের ছোট শালী পলি সান্যাল তা'র ঐ বেঁটে, কালো, হোঁৎকা শরীর নিয়ে কোত্থেকে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, আদুরে গলায় বলল,—"উঃ, কতোদিন পরে দেখা তোমার সঙ্গে,—সেই রিয়ার ট্রিপের কথা মনে আছে?'

অন্য টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে আমাদের টেবিলে প্যাট্ হ'য়ে বসে পড়ল পলি সান্যাল। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল অনীতা দেখলাম বেজায় গম্ভীর মুখে পলির প্রায় টপলেস বেশভূষা দেখছে সে "

স্বপন বলে,—"বাঃ, এবে দেখছি সিনেমা সিচুয়েশন—"

মীরা ব'লে,—"কী ট্রাজিক—"

অনন্ত ব'লে চলে—"পলিকে যেন পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের নেশায় পেয়েছিল, কবে কোথায় তাকে সিনেমা দেখিয়েছি, কোথায় কোথায় কার-ট্রিপ দিয়েছি, কোথায় কোথায় তাকে খাইয়েছি, কবে কি প্রেজেন্ট্ করেছি সব কথা এক নাগাড়ে ব'লে চলল, আর এক একটি ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনীতার মুখে এক এক পোঁচ শ্রাবণ আকাশ আঁকা হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে পলির সঙ্গী এক সুবেশ ভদ্রলোক একা এক টেবিলে বসে উলখুস করছিল—"

মীরা বলে,—"আহা বেচারা—"

"দশ মিনিট ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে পলি উঠে গেল। আর তখন অনীতার আগুন ঝরা মুখ, ঝড়ের সঙ্কেত মাখা চোখ দেখে আমার সর্বনাশের চেহারাটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলুম, গলায় বাঘের গর্জন তুলে সে বলল,—"ও মেয়েটা কে ?"

"আমি আমতা আমতা ক'রে কী যে মাথামুণ্ডু বকে গেলুম মনে পড়ছে না, কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল অনীতা, খুব মিষ্টি ক'রে বলল,—'খাওয়াবার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ,—এবার চলি'—আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম,—কোথায় ?"

"যেখানেই হোক—"

"চলো, আমার গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দি—"

"তার দরকার হবে না, ধন্যবাদ—' বলে গট গট ক'রে বেরিয়ে গেল অনীতা—আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম—"

মীরা বলে,—আপনার উচিত ছিল ওর পেছনে পেছনে ধাওয়া করা—"

"হয়তো করতুম,—কিন্তু সেই মুহূর্তেই বয় বিল নিয়ে এসে হাজির হ'ল। পাওনা মিটিয়ে বাইরে এসে দেখি রাস্তায় সব কিছুই আছে শুধু অনীতাই নেই। এখন কী করি বল তো স্বপন ?"

চওড়া কপালে ভুরু দুটো যেখানে পরস্পরকে ছোঁবার চেষ্টা করেছে সে জায়গাটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টিপে ধরে স্বপন, চোখ বুজে থাকে পাক্কা দু'মিনিট।

অনন্তর অধীরতা বাড়তে বাড়তে সশব্দে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়।

মীরা চা করে আনতে ভেতরে চলে যায়।

হঠাৎ চোখ খুলে মিটমিট ক'রে তাকায় স্বপন, বলে,—"ঘাবড়াবার কিছু নেই—"

"নেই ?",

"না। বাঘের যেমন যেমন আছে, হলোলি পাণ্ডও তেমনি আছে—"

"মানে ?"

"মানে ওভাবে তোকে কাট্ ক'রে যাওয়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ওটা অভিমান ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না—"

"অভিমান !"

"হ্যাঁ, আর ধোঁকা ও আগুনের মতো অভিমান ও প্রেমের একেবারে অজানী সম্পর্ক। অনীতার যদি শুধু তোর টাকার ওপরই নজর থাকতো, তা হলে ওভাবে উঠে যেত না—"

আশার আলো পড়ে অনন্তর অন্ধকার মুখে, কী বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই চা নিয়ে ঘরে ঢোকে মীরা, বলে,—"চা খান অনন্তবাবু—"

"দিন বৌদি,—কাল রাত থেকে কিছুই খাইনি জানেন ?"

হেসে উঠে মীরা বলে,—"আচ্ছা পাগল তো আপনি, দাঁড়ান কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে আসছি—"

চায়ে চুমুক দিয়ে অনন্ত বলে,—"তুই বলেছিলি যে উদয়ের পথে যে প্রেম আসে তা হয় উদার, কিন্তু আমার কপালে হয়ে গেল উল্টো—"

"এই উল্টোই উল্টে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, দেখবি—"

একটা প্লেটে এক দাদা বিস্কুট নিয়ে ফিরে আসে মীরা, অনন্তর হাতে দিয়ে স্বপনকে বলে,—"যাও, তুমি ততক্ষণে দাড়িটা কামিয়ে এসো—"

বাধ্য স্বামীর মতো সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায় স্বপন।

তার চেয়ারের হাতলে ব'সে অনন্তর গোগ্রাসে বিস্কুট খাওয়া দেখে মীরা, বলে,—"আপনি ভাববেন না অনন্তবাবু, ভেবে চিন্তে উপায় একটা বার করবেই ও—"

মুখ ভরতি বিস্কুট, কথা বলতে পারে না অনন্ত, তাড়াতাড়ি এক ঢোঁক চা গিলে বলে,— স্বপন বলেছিল যে গাড়ি ক'রে বাড়ির পথে একত্রে পথ চললেই একদিন তাকে জীবন পথের সঙ্গিনী ক'রে নিতে পারব—"

"ঠিকই তো বলেছিল,— তবে বাড়ির পথে না গিয়ে হোটেলের পথে যাওয়াতেই হয়েছে গোল, তাই গোল এ পৌঁছুতে দেরী হয়ে গেল—"

কয়েকদিন মুষড়ে থেকেছে অনন্ত, তার পর আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। অনীতাকে নিয়ে মেট্রো বা লাইট হাউসে গিয়ে বসেছে। ইংরিজি প্রেমের ছবি দেখেছে, কাকে বা রেস্তোঁরায় গেছে। কিন্তু তবু প্রেমের গুঞ্জনে তার কান ভ'রে দিতে পারেনি।

শেষ কালে মীরার পরামর্শে বার বার রিহার্সাল দিয়ে পাট মুখস্থ ক'রে আসরে নেমেছিল অনন্ত, অনীতার হৃদয় দুর্গ অধিকার করবার দিন ছিল সে দিন সন্ধ্যায়। কিন্তু মহেন্দ্রক্ষণে পলি সান্যাল এসে সব ধানচাল ক'রে দিয়ে গেছে।

দিন দুই অনন্তর দিকে মুখ তুলেই তাকায় না অনীতা। সংসারটা মরুভূমি ব'লে মনে হয় অনন্তর কাছে, জীবন যেন নরক যন্ত্রণা।

তারপর একদিন হঠাৎ মেঘ কেটে যায়, অনীতা আবার চোখ তুলে তাকায়, ঠোঁট টিপে হাসে, বলে, 'ক' দিন আমাদের বাড়ি যাওনি ব'লে মা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। দাদা এসেছে রাউরকেল্লা থেকে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়···

শুনে মীরা বলে, "শুভলক্ষণ, বরফ গলছে—"

স্বপন বলে,—"তোকে লাই চান্স দিতে চায় অনীতা, এবার যেন ফস্কে না যায়,— খুব সাবধান—"

পরামর্শ সভা বসে।

CALCUTTA CENTRAL

অনেক তর্কবিতর্কের পর মীরা বলে,—"আমি বলছিলাম কি, ও সব হোটেল-টোটেল ছেড়ে রাস্তা ছেড়ে দিন, ওসব জায়গায় মাটি মুড়ে চেনা মানুষ বেরিয়ে আসে। এবার যদি ভলি [illegible] আসি দেখা যেত তা হ'লে কিন্তু—"

শিউরে উঠে অনন্ত বলে,—"তা হ'লে কোথায় যাব বলুন ?"

"গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গায় অনীতাকে নিয়ে গিয়ে বসুন না! পায়ের নীচে নদীর জল কুলকুল ক'রে বয়ে যাবে, মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইবে, সেই নির্জন নিরিবিলিতে বেশ কাব্যময় ভাষায়—"

অনন্তর চোখ গোল হ'য়ে যায়, বাধা দিয়ে স্বপন ব'লে ওঠে,—"যেমনটি তোমাতে আমাতে হয়েছিল, তাই না মীরা ?"

হাসি লুকিয়ে মীরা বলে,—"হ্যাঁ—"

"আমার কিন্তু গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, বুক দুরুদুরু করছিল, কথাই বলতে পারছিলাম না, তখন বেগতিক দেখে তুমি—নিজে থেকে—"

চোখ পাকিয়ে মীরা বলে—"ইস্, তাই বই কি !"

"তা নয় ?"

"নিশ্চয়ই নয়,—তুমিই তো প্রথমে,—"

তুমুল তর্ক বেধে যায় স্বপন-মীরার মধ্যে।

মীরার প্রস্তাবটা অনন্তর মনে গেঁথে গিয়েছিল, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় সে, গলা চড়িয়ে বলে,—"চমৎকার প্ল্যান বউদি,—কালই বিকেলে ওকে নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসব, তারপর যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছেন···"

কিন্তু অনন্তর কথা তর্করত বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর কাছে অবান্তর বলে মনে হয়, তারা একটা জটিল দাম্পত্য প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিল।

গঙ্গার তীরে বেশ একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে সবুজ মখমলের মতো ঘাসের গদীতে বসেছে ওরা দু'জন, অদূরে আবর্তিত গঙ্গার ঘোলা জল রাশ না মানা ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে সমুদ্রের টানে। তার পিঠে সওয়ার হয়েছে বিকেলের পড়ন্ত রোদ।

ঝুরঝুরে বৈকালী বাতাসে অনীতার চূর্ণ অলক দুলছিল, শাড়ির আঁচল উড়ছিল, মন হালকা হচ্ছিল।

মুখোমুখি বসেছিল ওরা। দু'জনের মাঝখানে অনীতার রুমালখানি পাতা, তার ওপর একরাশ চিনেবাদাম। চিনেবাদামের শুকনো খোলা ভাঙবার মৃদু মৃদু শব্দ গাছের পাতার মৃদু মর্মরের সঙ্গে মিশে মিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ দূর আকাশের গায়ে অস্ত সূর্যের গাঢ় বর্ণচ্ছটার দিকে তাকায় অনন্ত,—আকাশটা যেন তার মনের অনুরাগের মতোই রক্তিম।

অনীতার মুখে তাকায় সে, অনীতার গালেও রক্তিমাভা। মৃদু গলায় আবেগে কাঁপা স্বরে অনন্ত বলে,—"অনীতা—"

অনেকক্ষণ হ'ল এসেছে, অনেকক্ষণ ধরে অনন্তর মুখ থেকে যে কথাটা শুনবার জন্য কান পেতে ছিল, এবার তারই সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে খুশী হয় অনীতা, টুপ ক'রে একটা খোসা ছাড়ানো চিনেবাদাম

মুখেফেলে অনন্তর মুখের দিকে তার মুখখানা সূর্যমুখী ফুলের মতো তুলে ধরে সে, গদগদ স্বরে বলে,—"কী বলছিলে অনন্ত ?"

কোন ফাঁকে কখন যেন বাতাসের একটা ছোট্ট খোপা অনন্তর মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, কথা বলবার জন্ত হাঁ করতেই হঠাৎ সেটা তার গলায় আটকে যায়।

প্রথমে খুক খুক, পরে ধক ধক শব্দে বেজায় কাসতে থাকে অনন্ত, প্রণয়-মধুর যে পরিবেশটি নিপুণ ভাবে গড়ে উঠেছিল তা সেই কাসির ভাঙা বেসুরো আওয়াজে ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। সরে বসে অনীতা।

কাসির দমকে অতবার রিহার্সাল দিয়ে তৈরী করা সুন্দর সুন্দর প্রণয়-ভাবগুলো ভুলে যায় অনন্ত।

অনীতার মসৃণ কপালে কুঞ্চন রেখা দেখা দেয়, অনন্তর কাসি-রক্তিম মুখের দিকে বিরাগভরে একবার তাকিয়ে অন্তদিকে চোখ ফেরায় সে। কিন্তু দূরে বসা একজোড়া তরুণ তরুণীর স্বচ্ছন্দ প্রণয় লীলা দেখে।

কাসি অবশ্ত এক সময়ে থেমে যায়, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি আর অনন্তর মন থেকে হারিয়ে যাওয়া কথাগুলি আর ফিরে আসে না।

অনীতা অবশ্ত সাহায্য করে, বলে,—"কী যেন বলবে বলছিলে ? কী একটা জরুরী দরকারী কথা—" বলে কাছে সরে আসে।

কথার সঙ্গে প্রণয়ের স্পষ্ট হাসিও হাসে অনীতা, কারণ তার মা এরই মধ্যে অনেকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, অনন্তর মতো হীরের টুকরো ছেলে বেহাত হ'য়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, অনীতার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। অনীতা তাই বিশেষ ভাবে সাজগজা ক'রে এসেছে আজ। একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলতে চায় সে।

ওদিকে অনন্ত বৃথাই মনের ভেতরে সেখানো কথাগুলো হাৎড়ে মরে, পার্ট ভুলে যাওয়া অভিনেতার মতো এক বর্ণও মনে করতে পারে না।

"নাঃ, আজও সব ভেস্তে গেল,—" মনে মনে ব'লে ওঠে অনন্ত,—আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে,—কিন্তু অনীতা কি আর সে সুযোগ দেবে আমাকে ? দিনটাই মাটি, আর মাটি ক'রে দিলে এই হতচ্ছাড়া চিনেবাদামগুলো—দুত্তোর—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় অনন্ত। রাগের মাথায় সব অনর্থের মূল সেই চিনেবাদামশুদ্ধ রুমালখানা সজোরে ছুঁড়ে দেয় দূরে।

"ওকি ! ওকি করছ ? ও যে আমার রুমাল—" চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনীতা বলে,—"ফেলে দিলে যে বড়ো ?"

অপ্রস্তুত অনন্ত আড় চোখে অনীতার নিরুদ্ধ রোষ রক্তিম মুখে তাকায়, তারপর রুমালটাকে দেখে।

ছোট্ট, হালকা, সেন্টিড রুমালটা তখন সন্ধ্যার প্রবল বাতাসে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু ক'রেছিল।

"একটু বোসো অনীতা, এখুনি নিয়ে আসছি—" ব'লে হপ্, স্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প্-এর অনুশীলনের অনুকরণে রুমালের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে অনন্ত।

কিন্তু নানা আঁকাবাঁকা পথে উড়তে উড়তে তার নাগালের বাইরেই থেকে যায় রুমালটা।

ঠিক অনীতার মতোই।

এখানে ওখানে ইতস্তত: ছড়িয়ে থাকা কয়েক জোড়া যুবক যুবতী তাদের কণ্ঠকূজন থামিয়ে অবাক চোখে অনন্তর দুরহ ব্যায়াম চর্চা দেখতে থাকে। মেয়েদের পেছনে ছোটাটা না হয় যুগধর্ম, কিন্তু একজন সক্ষম সমর্থ পুরুষ মানুষ এমন হন্যে হ'য়ে একটা রুমালের পেছনে কেন ছুটছে তা বুঝে উঠতে পারে না।

অনেকক্ষণ পরে পরাজিত সেনানীর মতো ম্লানমুখে ফিরে আসে অনন্ত, ক্লান্ত ভাবে বলে,—"উড়তে উড়তে একটা উঁচু গাছের ডালে আটকে গেছে রুমালটা,—মই থাকলে পেড়ে আনা যেতো—"

এতক্ষণ তাকে একা ফেলে যাবার জন্যে বিলক্ষণ চটেছিল অনীতা, তার বিশেষ সাজ পোষাক, কসমেটিকের বিরল চাতুর্য সব কিছুই যেন ব্যঙ্গ করছিল তাকে। বাড়ি ফিরে মা-র চোখের নিরুচ্চার প্রশ্নের কী জবাব দেবে তা ভাবতে গিয়ে কান্না পাচ্ছিল তার।

কথা না ব'লে, যাবার পথে পা বাড়ায় অনীতা, গাড়িতে উঠে অনন্তর পাশে না ব'সে পেছনের সীটে বসে সে।

এক ঘুষে নিবিয়ে দেওয়া সলতের মতো কালো মুখে গাড়ী চালায় অনন্ত।

"নাঃ,—আপনি একটা হোপলেস্ অনন্ত বাবু—" সব শুনে মন্তব্য করে মীরা,—"আপনার দ্বারা প্রেম ক'রে বিয়ে করা হবে না—"

করুণ চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে অনন্ত।

স্বপন তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে,—"মীরার কথায় তুই কান দিসনেরে অন্তা, অত হয়ে যাস নে—"

অনন্ত চুপ ক'রেই থাকে।

মীরা বলে,—"বলেন তো ঘটকালী ক'রে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করি—"

"দি আইডিয়া—" চেঁচিয়ে ওঠে স্বপন,—"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,—যা বলি শোন—" ব'লে অনন্তকে ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে যায় সে, ফিসফিস ক'রে তার কানে কানে কী যেন ব'লে চলে। ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে অনন্ত, আস্তে আস্তে তার মুখে লাজুক হাসি ফোটে।

দিন সাতেক পরে।

আপিস ছুটি হ'য়ে গেছে। অনীতা উঠি উঠি করছিল। সে দিনের পর থেকে অনন্ত আর আপিসে আসে নি, সে জন্য তার মন ভালো ছিল না, একবার অনন্তর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবে কিনা ভাবছিল সে।

হঠাৎ একটা লম্বা ছায়া তার ঝকঝকে বার্নিশ করা টেবিলের ওপর পড়তেই চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় অনীতা।

টিপটপ সুট পরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত,—যেন তার মনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

চোখের ভেতর খুশীর আলো চিকচিকিয়ে ওঠে, হালকা গলায় অনীতা বলে,—"এ সাত দিন কোথায় ছিলে?"

"ছুটি নিয়েছিলাম—" সংক্ষেপে বলে অনন্ত—"এই নাও—"

একটা সুদৃশ্য কাগজের বাক্স এগিয়ে দেয় সে।

"এটা কি?" ব'লে বাক্সটা হাতে নেয় অনীতা।

"খুলেই দেখ না—"

বাক্সটার ডালা খুলে ভেতরে উঁকি দেয় কৌতূহলী অনীতা, অবাক গলায় বলে,—"একি! এযে রুমাল! এক রাশ রুমাল!"

"হ্যাঁ, এক ডজন আছে, অত রুমাল বাতাসে উড়ে যেতে পারবে না—"

অনীতার চোখে জল আসে, প্রাণপণে চেপে রেখে বলে,—"আমি কি রুমাল আনতে বলেছিলাম তোমাকে?"

"না বললেও আমার একটা দায়িত্ব আছে তো।—" বলে মুখ মুছতে নিজের রুমালটা পকেট থেকে বার করে অনন্ত, পকেট থেকে একটা খাম বেরিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। খামের ওপর প্রজাপতি আঁকা, তার নীচে লাল অক্ষরে 'শুভ-বিবাহ' লেখা।

অনীতার বুক হ্যাৎ করে ওঠে, নীচু হয়ে খামটা কুড়িয়ে নেয় সে, বলে,—"কার বিয়ে?"

"ইয়ে—মানে,—আমার—"

"তোমার!" প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে অনীতা, তার মুখ থেকে সবটুকু রক্ত সরে যায়, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হ'য়ে আসে।

মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব এমন শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে অনীতা বলে,—"কার সঙ্গে? সেই পলি দাস্যাল? না অন্য কোনো মেয়ে?"

"অন্য মেয়ে—"

"নামটা শুনতে পারি?"

"কী হবে শুনে? সাতই অঘ্রাণ বিয়ে, যেও কিন্তু—"

কান্না কান্না কান্না। কান্নার সমুদ্র উথলে ওঠে অনীতার বুকে, চাপা দিয়ে শুকনো গলায় বলে,—"তা ঠিক। জানো, ক'দিন ধরে এক ভদ্র মহিলা এসে আমার বিয়ের ঘটকালী করছেন, যার সঙ্গে রোজই পরামর্শ চলছে, বাবা রাজী। ভাবছি আমিও রাজী হ'য়ে যাবো।"

"সেই ভালো,—"ব'লে খামটা টেনে নেয় অনন্ত; যাবার জন্য পা বাড়ায়। মন্ত্র হল একেবারে ফাঁকা।

হঠাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসে অনীতা ছোঁ মেরে খামটা অনন্তর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। খাম কাঁপানো চোখে পাত্রীর নাম পড়ে।

প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারে না অনীতা। পাত্রী আর তার বাবার নাম বার বার পড়ে। দেখতে দেখতে তার মুখে রক্তের ছোপ লাগে, সোজাসুজি অনন্তর মুখে তাকিয়ে বলে,—"এর মানে কি?"

"মানে প্রেম করে বিয়ে করা আমার কপালে নেই,—তাই—"

"কে বলে এ কথা?"

"স্বপনের বউ,—মীরা—"

"অ, সেই ভদ্র মহিলা! কিন্তু তাঁর অনুমান মিথ্যে—"

"মিথ্যে?

"হ্যাঁ—"ব'লে দুহাতে অনন্তর গলা জড়িয়ে ধরে অনীতা, মুখখানা তুলে ধরে। আর প্রেমে অনভিজ্ঞ অনন্ত কাজ শেখানো ছাড়াই দিব্যি অনীতার ঠোঁট খুঁজে নেয়।

ফিস্‌ফিস ক'রে অনীতা বলে,—"সাতই অঘ্রাণের কথাটা ভাঁওতা না খাঁটি?"

তাকে বুকের ভেতর আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রে মৃদু নিশ্বাসে অনন্ত বলে,—"খাঁটি। আমাদের ভালোবাসার মতোই খাঁটি।"

———

সুখের খবর

নির্মলেন্দু গৌতম

কথা ছিলো বিকেল চারটের যদি হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পড়ে, তাহলে আমরা যাবো না।

তিনটের পর থেকেই কিন্তু আকাশে মেঘ জমলো। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে একসময় সূর্যও চলে গেলো মেঘের আড়ালে। সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যেতেই গাছের পাতাগুলি, কয়েকটা পাখী এবং একটা দীর্ঘ সুপুরী গাছ দেখে আমার মনে হলো তারা সবাই বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। যদিও যাবার ইচ্ছাটা আমার প্রবল হয়ে আছে, তবু ওরা আমায় এমন করে তুলিয়ে ফেললো যে আমিও চাইলাম বৃষ্টি হোক।

সরসী খাটের ওপর ঘুমোচ্ছিলো। শোবার আগে সরসী বলেছিলো, 'তিনটে বাজলে ডেকে দিও।'

বলেছিলাম, 'আচ্ছা।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি সরসীকে ডাকবো কিনা ভাবতে থাকলাম। কারণ খানিক পরে বৃষ্টি নামবেই।

সরসীর বুকের ওপর রোববারের কাগজখানা। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে সরসী।

সরসী ঘুমোক। ওকে আমি ডাকবো না এখন। যাওয়া যখন হচ্ছে না তখন ঘুম থেকে জাগিয়ে লাভ কি!

মেঘের গায়ে এবার কাজল ঘুচে গিয়ে কেউ। অদ্ভুত ভারী দেখাচ্ছে মেঘগুলোকে। ঝুলে পড়তে পড়তে ওরা সুপুরী গাছের মাথা হয়তো ছুঁয়ে ফেলবে হঠাৎ। মনে হচ্ছে, বৃষ্টিটা বেশ দাপুটে হয়েই নামছে। গোটা শহরের আকাশ জুড়ে নিশ্চয়ই এই মেঘ। কাজেই অন্তত স্পষ্টই বুঝতে পারবে আমরা চারটের সময় যাচ্ছি না।

রোববারের শেষবেলাটুকু অজয়ের বাড়ীতে কাটাতে পারলে ভালো লাগতো খুব। অবশ্য বৃষ্টিটাকেও মন্দ লাগবে না। শেষবেলার আলোটুকু মুছে মেঘের ছায়ায় ছায়ায় বৃষ্টির ধারাগুলো গাছে পাতায়, ছাদে বাজতে থাকবে। একথা ভাববার জন্যে একটা দারুণ রোমান্টিকতা আছে। আমি আড়চোখে সরসীকে দেখলাম। ওর বুকের ওপর রোববারের কাগজখানা তেমনি আছে। মেঘের থেকে গলে পড়া মৃদু শীতলতায় সরসী যেনো ঘন হয়ে গেছে আরো।

ঘরের মধ্যে ছায়ার মতো অন্ধকার। সরসীর পাশে বুকের তলায় বালিশ চেপে জানালার দিকে চোখ রেখে আমার শুতে ইচ্ছে করলো। সরসী যদিও শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে, তবু সরসীর শরীরের উত্তাপটুকু আমার সমস্ত শরীর স্পর্শ করবে।

ইচ্ছেটা আমাকে যেনো পেয়ে বসলো। নেশাগ্রস্তের মতো আমি চোখদুটোকে ঘর বার করতে থাকলাম।

জানালা থেকে সরে এসে অবশেষে আমি খাটে উঠে এলাম। সরসী শিশুর মতোই ঘুমোচ্ছে। দুটো বালিশ বুকে চেপে শুয়ে পড়লাম আমি। চোখ বাইরে রাখলাম। বৃষ্টি নামলো বলে। একবার নামলে চারটের সময় বৃষ্টি থাকবেই। কাজেই আমাদের যাওয়াটা হচ্ছেনা। নিশ্চিন্ত হলাম আমি।

সরসীর বুকের ওপরের কাগজখানাতে একটা গল্প আছে। আমি গল্পটা পড়েছি অনেক আগে। গল্পটা অসম্ভব হাসির গল্প। গল্পটা গল্পই। সত্যি হতে পারে না। সরসীকে আমি পড়তে বলেছিলাম। কারণ সরসীর একধারার সঙ্গে গল্পটার একটা চরিত্রের অসম্ভব মিল আছে। সরসী গল্পটা পড়েছে কিনা তা আমি জানিনা। কারণ সরসী রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে এসে কাগজটা নিয়ে কতোক্ষণ পরে ঘুমিয়েছে তা আমি খেয়াল করিনি।

সরসীর সঙ্গে আমি ঘন হয়ে শুয়ে আছি। সরসীর শরীরের হালকা এবং মৃদু একটা সুন্দর গন্ধ আমি পাচ্ছি এখন। ওর উত্তাপটুকু আমার রোমকূপকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই-ই ভালো লাগলো আমার। বাইরে আসন্ন বাদলের মুখের সঙ্গে এমন রোমাঞ্চিকতাই মানাচ্ছে। তার বাইরে কিছু হলেই বোধ হয় এই যে মেঘে আর ছায়ায় অন্য এক পৃথিবী গড়ে উঠেছে, তা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। আমি তা ভাবতে পারলাম না।

এমনিভাবে অনেকটা সময় শুয়ে থাকবার পর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির শব্দ গানের ভেলা একটা সুরের মতো মনে হলো আমার। সরসীর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো হঠাৎ। আমি সরসীর দিকে ফিরে এবার সরসীর ঘুমন্ত মুখ দেখলাম। তারপর মুখখানা সরসীর মুখের খুব কাছে এনে নাক দিয়ে ওর নাকটাকে ঘসে দিতে থাকলাম।

দু'চোখ বুঁজেই সরসী হেসে ফেললো। আমি দু'হাতে সরসীকে নিয়ে হাসিটুকু পান করলাম।

সরসী চোখ খুললো এবার। বললো, 'কী হচ্ছে এসব?'

আমি হাসলাম। আরো ঘন হয়ে বললাম, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে সরসী।'

সরসী বললো, 'তুমি যখন খাটে উঠে এসেছো তখনই ঘুম ভেঙে গেছে আমার। বৃষ্টি টের পেয়েছি আমি। কিন্তু আজ আর অজয়বাবুর ওখানে যাওয়া হলো না।'

বললাম, 'কথাই তো ছিলো, চারটের সময় বৃষ্টি নামলে আমরা যাবো না!'

সরসী বললো, 'চারটে বেজে গেছে নাকি?'

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, 'বাজেনি এখনও। তবে বাজতে দেরী নেই।'

ঘুম ভেঙে ওঠবার সঙ্গেই বোধ হয় সরসীকে খুব ভালো লাগছে। একটা পরিচ্ছন্ন ঘুম আমাদের চেহারায় সুখ এবং সৌন্দর্যের চিহ্ন এঁকে দেয়। সরসীর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো।

'এমনিভাবে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগছে না কিন্তু।' সরসী ছোট্ট একটা হাই তুলে বললো। সামান্য আড়মোড়া ভাঙলো তারপর।

সরসীর বুকের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা সরে গেছে। সংবৃত হয়ে শুলো সরসী।

আমি কাগজখানার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সেই হাসির গল্পটা পড়েছো?'

'উঁহুঁ!'

'খুব হাসির গল্প কিন্তু।' আমি কের বললাম।

'যা ঘুম পাচ্ছিলো। তারেই চোখ বুঁজেছি তাই।' সরসী হাসলো।

কাগজখানা একেবারে মুচড়ে গেছে। আমি সেখানা চোখের সামনে তুলে ধরলাম, 'এখানা কি আর পড়তে পারবে?'

সরসী চোখের তারা নাচিয়ে হাসতে থাকলো এবার। বললে, 'এইমাত্র অমন দশা করেছো কাগজখানার। একেক সময় তুমি এমন অধৈর্য হয়ে যাও যে তখন আর কিছু খেয়াল থাকে না তোমার।'

কথাটা শুনে আমি আস্তে আস্তে হাসতে থাকলাম। সরসীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব ভাঙা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আবার আমার অধৈর্য হতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু না, হলাম না আমি।

বাইরে টানা বৃষ্টি পড়ছে। দীর্ঘ সুপুরী গাছটাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে আমার।

সরসী কাগজখানা ভাঁজ করে পাশের টেবিলে অত্যন্ত যত্নে রাখলো। গল্পটার জন্যেই বোধহয় সরসীর এতো যত্ন করে কাগজখানা রাখা। আমি ভাবলাম। সত্যি গল্পটা পড়লে সরসী খুশী হবে। বিশেষ করে যদি সেই চরিত্রটার সঙ্গে তার দাদার চরিত্রের মিল খুঁজে পেতে পারে।

আমার দিকে ফিরে হঠাৎ সরসী বললো, 'কতোক্ষণ এমন শুয়ে থাকবে?'

'যতোক্ষণ ভালো লাগবে।'

'ভালোলাগার শেষ আছে নাকি? আমার তো এমনি বৃষ্টির দিনে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না।' সরসী চোখে হাসলো। তারপর হাসতে হাসতে উঠে বসলো।

আমি অবাক হলাম। বললাম, 'উঠে পড়লে যে হঠাৎ!'

'এখন তোমার চা টাইম। লজ্জায় কথাটা বলতে পারছো না।' বলে খাট থেকে নেমে টান টান দাঁড়ালো। একটা আশ্চর্য বয়স সরসীর মধ্যে উন্মাদ হয়ে আছে। আমি অনুভব করলাম। আমার অধৈর্য ইচ্ছে যখন আমার সমস্ত শরীরে খেলা করে, তখনই আমি একথাটা অনুভব করি।

কোনো উত্তর না দিয়ে আমি হেসে ফেললাম।

সরসী শাড়িটাকে ঠিকঠাক করে আয়নায় একবার উঁকি দিয়ে চলে গেলো।

আমি বুকের তলায় সরসীর মাথার তলাকার বালিশটুকো চেপে ধরলাম। সরসীর চুলের গন্ধ ভাসতে থাকলো আমার চারপাশে। আমি খানিকক্ষণের জন্য বালিশে নাক ডুবিয়ে রইলাম। আমার কৈশোর এমনি গন্ধে গলে গলে সমুদ্র হতো। মনে হলো আমার।

অজয়ের কাছে আজ আর যাওয়া হলো না। এইমাত্র চারটে বাজলো। এখনও বাইরে বৃষ্টি ঝরে চলেছে। কথা চারটের সময় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পড়লে আমরা যাবো না। অজয় আজ সকাল বেলাতেই আমাদের খুব করে বলে গিয়েছে। যেতে না পারার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। সরসীরও খারাপ লাগবার কথা। কারণ সরসী আমার বন্ধুদের মধ্যে অজয়কেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে। এ নিয়ে আমি মাঝে মাঝে সরসীকে ঠাট্টা করি। সরসী একটুও রাগ করে না। ভালোলাগাটাকে মনের একটা অমিষাদ সংস্কার বলে মনে করে সরসী। সেটুকু সরসী তাই কখনোই মনের মধ্যে চেপে রাখেনা।

এ সব কথা গভীর আলস্যে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আমি।

সরসী এলো চা নিয়ে।

আমার সামনে একটা পুরোনো ম্যাগাজিন রেখে তার ওপর চায়ের কাপটা নামিয়ে দিলো সরসী। তারপর আমার গা ঘেঁষে বসে পড়লো।

আমি চা খেতে খেতেই অবাক হয়ে দেখলাম বৃষ্টির মাতামাতিটা যেন কমে এলো। যেমন ঘটা করে এসেছিলো, তাতে মনে হয়েছিলো আজ আর বৃষ্টিটা থামছে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর খানিকক্ষণ আকাশ থেকে জল ঝরবে। আকাশের কোণায় কোণায় আলো দেখা যাচ্ছে এখুনি।

সরসী বললো, 'চায়ের লীকার ঠিক হয়েছে তো?'

'হয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কড়া চা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে।' সরসী হাসলো।

আমিও সরসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম।

সরসী তার বাঁ হাতখানা আমার পিঠে রেখেছে। মাঝে মাঝে হাতখানা এমন করে পিঠের ওপর বুলোচ্ছে যে সুড়সুড়ি লাগছে আমার।

বাইরে ঘটা করে নামা বৃষ্টির জের টেনে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘে এখন কাটল ধরবে।

সরসী বললো, 'অজয়বাবুকে জানে বলে দিও বৃষ্টির জন্ত যেতে পারিনি আমরা।'

আমি আবারও সেই কথাটা আবৃত্তি করলাম, 'কথাই তো ছিলো, চায়টার সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলে আমাদের যাওয়া হবে না।'

সরসী বললো, 'তাইতো।'

সন্ধ্যের অল্প আগে আকাশটা আশ্চর্যরকম পরিষ্কার হয়ে উঠলো। এদিকে ওদিকে জমে যাওয়া মেঘের মধ্যে নীল রঙের আকাশটা উঁকি দিয়ে হাসতে থাকলো প্রসন্ন মুখে।

আমি সরসীকে বললাম, 'সরসী চলো আমরা বেড়িয়ে আসি।'

সরসী বললো, 'যা জল জমেছে পথে ঘাটে, তুমি বরং বেড়িয়ে এসো একটুখানি।'

সরসী আমার সার্ট আর প্যান্ট এনে দিলো।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সার্ট প্যান্ট পাল্টে নিলাম। মাথায় চিরুনী চালাতে চালাতে দেখলাম সরসী এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

'একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।' সরসী বললো।

'আচ্ছা।'

'ছাতাটা সঙ্গে নেবে নাকি?'

'উহুঁ বৃষ্টি আর নামছে না।'

'আমাদের সঙ্গে দারুণ শত্রুতা করলো বৃষ্টিটা। এখন আমার রাগ হচ্ছে খুব।'

'তোমার রাগে কারো কিছু এসে যাচ্ছে না।' আমি হাসতে থাকলাম কথাটার সঙ্গে সঙ্গে। সরসীও হাসতে থাকলো।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকটা সময় একা একা হাঁটলাম। ভেজা রাস্তায় আলো, ব্যস্ততা গাড়ি ঘোড়া আশ্চর্য লাগছিলো আমার। আমি কোথাও যাব না। শুধু নির্জন কোনো জায়গার দিকে পা বাড়ালাম না। আমার মনে হলো এখন আমি নির্জনতায় সুখ পাবো না।

বস্তুত আমি কোনোদিনই নির্জনতায় সুখ পাইনা। পথের মধ্যে জীবনের গতি প্রবাহিত হচ্ছে। যেখানে নির্জনতা সেখানে সময়ের কাঁটা ছুটো রাশি রাশি ভাবনায় ভার হয়ে থাকে। সে জন্য অত্যন্ত দ্রুত পায়ে চলতে থাকে। দুরন্ত এবং অনিবার্য সময়ের এমন ক্লান্তিকর অবস্থাটুকু আমাকে সুখ দেয় না।

চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো, অজয়ের বাড়ি গেলে মন্দ হয় না। অজয় অবশ্য সরলীকে না আনবার জন্য অভিযোগ করবে। সেই কথাটাকে ফের আবৃত্তি করে সে অভিযোগটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। আবৃত্তির কথাটা মনে হতেই মনে মনে হেসে ফেললাম আমি।

অজয়ের বাড়ি যাবার জন্য দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম।

মনে রইলো, সরলী তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে।

অজয় বাড়িতেই ছিলো। কিন্তু আমাকে দেখে অজয় অবাক হলো না. সরলীকেও সে প্রত্যাশা করেছিলো।

আমি বললাম, 'সরলী শাড়ি ছুতো সাবলে আনতে চাইলো না।'

অজয় বললো, 'শাড়িতে আর জুতোয় মেয়েদের সুখ। কাজেই সরলীর না আসাই অবশ্য স্বাভাবিক।'

আমি হাসতে থাকলাম। অজয়ও।

'চায়ের সময় অসম্ভব বৃষ্টি ছিলো কিন্তু। সরলী তো হাসল মেঘেছে বৃষ্টির ওপর। আমি বলেছি ওতে কারো কিছু এসে যাবে না।' আমি আস্তে আস্তে বললাম।

অজয় হেসে বললো, 'বৃষ্টির ওপর রাগটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে।'

সরলীর মুখখানা মনে করে আমি বললাম, 'তা সত্যি।'

সরলী বলেছে তাড়াতাড়ি ফিরতে। আরও মনে হলো আমার। আমি যেনো ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। তবু অজয়ের সঙ্গে আরো অনেকক্ষণ আমি গল্প করলাম।

ওঠবার সময় হঠাৎ কী খেয়াল হতেই বললাম, 'তুমি কি কাগজ রাখো অজয়?'

অজয় কাগজের নাম বললো। যে কাগজ আমি রাখি অজয়ও সেই কাগজই রাখে।

বললাম, 'তোমার কাগজখানা আমায় দাও তো!'

অজয় কোথা থেকে যেনো কাগজখানা কুড়িয়ে এনে বললো, 'কী ব্যাপার বলোতো? কোনো জরুরী খবর টবর আছে নাকি এর মধ্যে?'

বললাম, 'উহুঁ!'

'তা হলে?'

সরলীর সেই কথাটা মনে হলো আমার। আমি একেক সময় অসম্ভব অধৈর্য হয়ে উঠি। আর তখন আমার কিছু খেয়াল থাকে না। সে কথাটা মনে রেখেই বললাম, 'সরলীর একটা গল্প পড়বার আগেই আমি কাগজখানাকে পাঠের অযোগ্য করে ফেলেছি।'

অজয় কিন্তু একটা ভেবে কাগজখানা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো। 'তাই বলো।'

আমি হাসিতে থাকলাম।

আমি বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই অজয় বললো, 'আগামী বুধবার একটা ছুটি আছে, সেদিন কিন্তু বৃষ্টি নামলেও আসতে হবে।'

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'আচ্ছা বলবো। বেচারী অবশ্য রাগ করে আমি আজ একা একা এসেছি শুনলে। তোমার এখানে আসবো জানলে নিশ্চয়ই আসতো সরসী।'

কাগজখানা সযত্নে নিয়ে আমি পকেটে রাখলাম। সত্যি সেই কাগজখানা এমনভাবে মুচড়ে গেছে যে সেখানা আর পড়া যাবে না। অথচ সরসীর গল্পটা পড়বার আগ্রহ আছে। সেজন্যেই সযত্নে তখন সেখানা টেবিলে তুলে রেখেছে সে।

ফিরে এসে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে সরসীকে বললাম, 'গল্পটা পড়বার জন্য নতুন একখানা কাগজ নিয়ে এলাম সরসী।'

সরসী কিছু বললো না।

'অজয়ের কাছ থেকে এলাম। আগামী বুধবারে ও যেতে বললো। বৃষ্টি থাকলেও যেতে হবে।' আমি ফের বললাম।

'বুধবার একটা যজ্ঞ আছে সত্যি। বৃষ্টি থাকলেও সেদিন যাওয়া উচিত আমার।' সরসী বললো। যজ্ঞগুলো ওর মুখস্থ থাকে।

আমি ঘরের জামা পরতে পরতে বললাম, 'গল্পটা প'ড়ো কিন্তু।'

সরসী বললো, 'পড়বো।'

আমি পোষাক পালটে বাথরুম থেকে ফিরে আয়নার সামনে এবার দাঁড়ালাম। চুলে চিরুণী চালালাম আস্তে আস্তে। সরসী রান্নাঘরে। এখুনি খেতে ডাকবে সরসী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ন'টা বাজে।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করেই উঁচু গলায় বললাম, 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছি কিন্তু।'

আস্তে বললেও কথাটা সরসী শুনতে পেতো। কারণ আমাদের রান্নাঘরটা দেয়ালের ও পিঠেই।

সরসী ও ঘর থেকেই বললো, 'কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নয়। এখন খেতে এসো তো।'

আমি আয়না থেকে ছায়াটা ফিরিয়ে রান্নাঘরে এলাম।

খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে দু'জনে ঘরে এলাম অনেকটা সময় পরে। সরসী চোখের তারায় হাসিটা নাচিয়ে বললো, 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি এখন সেই হাসির গল্পটা পড়বো।'

আমি অসহায়ভাবে সরসীর দিকে মুখ করে আধশোয়া হলাম বিছানায়।

সরসী টেবিল থেকে সেই মুচড়ে যাওয়া কাগজখানা তুলে নিলো। তারপর চেয়ারে বসে সেখানা চোখের সামনে মেলে ধরলো।

আমি অবাক হলাম। বললাম, 'ওখানা পড়বে কি করে? একেবারে মুচড়ে গেছে যে। নতুন একখানা নিয়ে এসেছি সে জন্যে।'

সরসী কাগজ থেকে মুখ না তুলেই আশ্চর্য শান্ত গলায় বললো, 'সেখানা দিয়েই তো আজ দুপুরে গল্প করেছি। হীটারটা জ্বালাইনি বেখেলে না!'

সরসী অত্যন্ত, সহজভাবে যেনো কাগজখানা মেলে রেখেছে চোখের সামনে।

ঘরের অসম্ভব উজ্জ্বল আলোয় আমি এবার টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। স্পষ্টই মনে হলো সরসীর সুখের খবর এবার আমি পেয়েছি, যে খবরটা এতোদিন আমার জানা ছিল না।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, জড়; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিষ্ফল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণে যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব-সত্যকেও বাধা দেয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগচিন্তা

আধুনিক নাটক প্রসঙ্গে

নাটকের মধ্যে যুগ-মানস যতখানি প্রতিফলিত হয়, সাহিত্যের অপর কোনো বিভাগে তা হয় না। তার কারণ, গল্প-উপন্যাস-কবিতার লেখক সমসাময়িক যুগচেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সুদূরাভূত কল্পনার উপর নির্ভর করে সাহিত্য রচনা করতে পারেন। তাঁর লেখা যিনি পাঠ করেন, তিনিও নিজেকে আত্মসমাহিতের মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিছক রসভোগের আনন্দে সেই রচনার রস আস্বাদ করতে পারেন। কিন্তু নাটক লেখা হয়—প্রধানত একক পাঠকের জন্য নয়, সম্মিলিত দর্শক সমাজের জন্য। সেই দর্শক সমাজে থাকে নানা শ্রেণীর লোক, তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, রুচি ও রসভোগের ক্ষমতা বিচিত্র। বিভিন্ন লোকের এই বিচিত্র মনকে আকর্ষণ করতে গেলে যা প্রত্যক্ষ, বর্তমান ও সর্বজনের গোচরীভূত তাই নাটকের মধ্যে দেখানো দরকার। প্রত্যেক যুগের এমন কতকগুলো মৌলিক সমস্যা থাকে যেগুলি বেশির ভাগ লোকের চিত্তই আলোড়িত করে। সেগুলিই সাধারণত নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। সে জন্য সব দেশে ও সব যুগেই নাটক হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ এবং যুগমানসের সার্থক অভিব্যক্তি। এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের পরিচয় শেকসপীয়রের নাটকে যেমন পাওয়া যায় সমসাময়িক অন্য কোন প্রকার সাহিত্যে তেমন দেখা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে অভিজাত সমাজের কৃত্রিমতা এবং নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচরণ সব কিছুর মধ্যে আতিশয্য ও কপটতা প্রভৃতি মলিয়েরের নাটক যেমন ভুলে

ধরতে পেরেছে এমন বোধ হয় অন্য কোনো প্রকার সাহিত্য পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি ইতিহাসের মত আর কোনো সাহিত্যিক বোধ হয় নাড়া দিতে পারেন নি। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও এসে আমরা দেখি, একশ' বছর ধরে বাংলা নাটক সমসাময়িক যুগচেতনাকে যে-ভাবে প্রকাশ করেছে, বাংলা কবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি সেভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৌলীন্যপ্রথা, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, নীল-আন্দোলন প্রভৃতি, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিক্ষোভ ও উদ্দীপনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের নাটকে ফুটে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সর্বাঙ্গীন যুগচেতনা সমাজের মধ্যে এসেছিল তার যথাযথ প্রতিফলন হয়েছিল গিরিশচন্দ্র ও তাঁর যুগের নাট্যকারদের মধ্যে। আবার বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিবাণী দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখের নাটকে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। আধুনিক সমাজের সমস্যা ও সঙ্কটও আধুনিক নাটকের মধ্যে সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

—ডঃ অজিত ঘোষ

নাট্যাচার্য প্রসঙ্গে

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা দেশ যেন তাঁর জনপ্রিয়তার প্লাবনে ভেসে গেল। একজন অভিনেতার পক্ষে এমন করে দেশের আপামর জনসাধারণ, ধনী নির্ধন, বিদ্বজ্জন ও সাধারণ, ছাত্র ও শিক্ষক, দলনির্বিশেষে রাজনৈতিক, সমাজসেবী ও সকল স্তরের মানুষকে মুগ্ধ অভিভূত ও প্রভাবান্বিত করার দৃষ্টান্ত জগতে বোধ করি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আজকাল সিনেমা ষ্টারদের দেখবার জন্যে খুব ভীড় হয়। কিন্তু সে কাদের ভীড়! শিশিরকুমার কোন সভায় যাচ্ছেন এই সংবাদ পেলে সেখানে ছাত্ররা তো ভেঙে পড়তই, তাছাড়া সমস্ত কাজ ফেলে সেখানে ছুটতেন, কলেজের বড় বড় অধ্যাপক, ডাকসাইটে আইনজীবী, জজ, ব্যারিস্টার, শিল্পী, ও বিদগ্ধ শিল্পরসিকের দল। প্রত্যেকেই স্বনামে বিখ্যাত। আর তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার। চাণক্যের সেই শ্লোক মনে পড়ত - একশ্চন্দ্রোতমোহন্তি, ন নক্ষত্রৈস্তারকাগণাঃ।

এই যে বিপুল জনপ্রিয়তা এ তো প্রধানত তাঁর অভিনয় গুণেই। অবশ্য ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। এতএব এমন কি ছিল তাঁর অভিনয়ের মধ্যে যা মনকে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো? এ সম্পর্কে তারী সুন্দর কয়েকটি কথা বলেছেন আমাদের ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই কথাগুলি পরিবেশন করলাম :

"শিশিরের অভিনয় ছিল চরিত্রের শুধু যথাযথ রূপায়ণ নয়, তাদের প্রাণশিখার নিগূঢ় দীপ্তি, অন্তর-রহস্যের গূঢ়তম স্পন্দন, স্রষ্টার আসংজ্ঞান অভিপ্রায় তাঁর অভিনয়ে এমন নির্ধারিতভাবে ফুটে উঠতো যে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হয়ে যেতাম। সৃষ্টির যবনিকার অন্তরালে স্রষ্টার যে গোপন রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যেন হঠাৎ সেই প্রাণনিকেতনের অন্তঃপুরে নীত হয়ে এই রহস্যের অংশীদার হয়ে যেতাম। সৃষ্টিলীলার তত্ত্ব

যেন আমাদের সামনে রূপ নিয়ে অপরূপ ছন্দে প্রকাশিত হয়ে উঠতো। শিশিরকুমার যখন যে চরিত্র অভিনয় করতেন তখন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন. তাঁর সমস্ত চিন্তা, কর্ম, অবচেতন মনের ভাবপ্রবাহ যেন তাঁর সহজ সংস্কারের নিকট ধরা পড়ে যেত। এ যেন অন্তর-প্রকটনের জন্য দিব্য অনুভূতির X Ray এর অপরূপ প্রয়োগ।

সময় সময় কৌতূহল জাগে যে এই অসংখ্য চরিত্রাবলীর মধ্যে কার কার মধ্যে অভিনেতার নিজ জীবন-রহস্যের স্বচ্ছতম প্রতিফলন ঘটেছে—কাদের মধ্যে অভিনেতা নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? আমার মনে হয় মাইকেল ও জীবানন্দ এই দুটি চরিত্রই শিশির-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, নিজ ব্যক্তিত্ব প্রক্ষেপের সার্থকতম পটভূমিকা—প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ জীবনের অসামঞ্জস্য, রুদ্ধ বেগমান আবেগের প্রকাশে—ব্যাকুলতা, মানস-অভীপ্সা ও বস্তুগত বাধার দ্বন্দ্ব দিয়ে তার দুরূহ গঠিত রূপায়ণ—শিশির চরিত্রের অসাধারণত্ব ও তাঁর জীবনে ট্রাজেডির মূল উৎস। মাইকেলের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখীর এই অশান্ত পক্ষ-বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত রূপ পেয়েছিল। মেঘনাদ রচনাকালে কবির অস্থির পদচারণা, উজ্জ্বল কল্পনার বহিঃপ্রকাশে শব্দ ভাণ্ডার ও ভাষা প্রয়োগের অপ্রাচুর্যজনিত বাধার দুরূহ অনুভূতি শিশিরের অন্তর্বেদনায়, কৃপণ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচিত চিত্তপ্রবৃত্তির ঘৃণ্য প্রতিবাদেরই অনিবার্য সংকেত। জীবানন্দের বেদনরোদ্যা অসংযম, অকুণ্ঠ আত্মপ্রসার ও শেষজীবনের মর্মবাহী অনুশোচনা—মনে হয় যেন এর ভিতর দিয়ে শিশিরের ব্যক্তি-জীবনের ঘৃণ্য সাহসিকতা ও করুণ আত্মগ্লানির কিছুটা সুর-মূর্চ্ছনা মিশেছিল। তাঁর চাণক্য, রাসবিহারী, আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, এমন কি রামও—সব তাঁর নটকল্পনার অপূর্ব আত্মপ্রসারণের নিদর্শন। কিন্তু মাইকেল ও জীবানন্দে তাঁর নটজীবন ও ব্যক্তিজীবন এক অপরূপ সমন্বয়ে, পরস্পরের পরিপূরকরূপে, আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে।

শিশিরের জীবন যে শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির একাধারে গৌরবোজ্জ্বল ও বিষাদগম্ভীর সুরের সংমিশ্রণ তা অস্বীকার করার উপায় নাই। মহৎজ্যোতি, বিরাট সফলতা, কর্মসাধনায় অদ্ভুত চরিতার্থতার সঙ্গে এক বেদনাপ্লুত, সুমহান ব্যর্থতা, বিপুল ব্যক্তিত্বের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির নিকট বীরোচিত পরাজয় স্বীকারে নতোচারী অভীপ্সার শোচনীয় পরিসমাপ্তি—এই বিরোধী ভাবগুলিই তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি অনেক করেছেন, বহু রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর নিয়ে এসেছেন, অভিনয়কলার আশ্চর্য রূপান্তর সাধন করেছেন, কিন্তু তবুও অ-চরিতার্থ সংকল্পের বেদনা তাঁকে ঘিরে থেকেছে। রঙ্গমঞ্চের যাদুকর শেষপর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সহজ বিচরণভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে অখ্যাত গৃহকোণে মাথা গুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটেনি, তথাপি ভুবনবিজয়ী নেপলিয়নের মত তাঁকে একরা দ্বীপে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। যাদব সূর্যের তেজে মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করে, অস্তগমন কালে তাঁর চারিদিকে দুর্দশা ও দারিদ্রের মেঘমালিমা সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দৃপ্ত আত্মপ্রভায়, তাঁর বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ববোধ ও প্রখর স্বাধীনতাস্পৃহা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর শক্তি অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছিল কিন্তু কোন দুর্বলতায় ভেঙে পড়েনি। কলালক্ষ্মীর প্রতি তাঁর অনাবিল নিষ্ঠায় এতটুকু ব্যবসায়িত্বের খাদ মেশেনি। অন্তিম সময়ে তুচ্ছ সরকারী খেতাবের প্রত্যাখ্যানে তাঁর এই অনির্বাপিত তেজোবহ্নি শেষবারের মত জ্বলে উঠেছে। মাইকেলের সঙ্গে যেমন তাঁর চরিত্রগত মিল তেমনি তাঁদের মৃত্যু দিবসের অভিন্নত্বও তাঁদের উভয়ের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ককে উদ্ভাসিত করেছে। এক শতাব্দী পূর্বে নব বাংলার মহাকবি যে ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন অধুনাতনকালে নব-রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান নির্মাতাও সেই একই ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয়েছেন।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

বিগত দিনের মঞ্চনায়ক
যাঁদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

নির্মলেন্দু লাহিড়ী

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০

এক দিকে অভিনেতা, অন্য দিকে সাধক। নটের জীবনে এমন সমন্বয় কদাচিৎ দেখা গেছে। নির্মলেন্দু ছিলেন সারদানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ শিষ্য। জীবনের একটি দিক ছিল যেটি গুরুর নির্দেশের দিকে ঊর্ধায়িত হয়ে থাকত। তাঁর চরিত্রের এই দিকটির পরিচয় বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

চেহারার মধ্যে কী সৌকুমার্য আর কী আভিজাত্য। মামাতো ভাই দিলীপ রায়ের সঙ্গে অনেক আদল ছিল, দূর থেকে দেখলে। আর তেমনি মিষ্টি সুরেলা গলা। তাই তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে উপাধি দিয়েছিল—বাণীবিনোদ।

অদ্ভুত ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর 'দেবতার গ্রাস' কবিতার আবৃত্তি ছিল তুলনারহিত।

মনে আছে ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে এক ছাত্র সম্মেলনে হুল্লোড় গোলমাল করছে। অনুষ্ঠান চালানো বুঝি আর সম্ভব হল না। নির্মলেন্দুর আবৃত্তি ছিল অনেক পরে। কিন্তু গোলমাল থামাবার জন্যে আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সভাপতি জে. এল. ব্যানার্জি মশায়কে বললাম, "নির্মলেন্দুবাবুর আবৃত্তিটা এসময় হলে বোধ হয় গোলমাল থামতে পারে।" সভাপতি বললেন, "বেশ তো, দেখ চেষ্টা করে।" চিৎকার করে ঘোষণা করলাম (তখন মাইক ছিল না) 'এবার নির্মলেন্দুবাবুর আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস।' মুহূর্তে সব চুপ। আবৃত্তি সুরু হল। দীর্ঘ কবিতা। আবেগের কত উচ্ছ্বাস। ভাবের কত পরিবর্তন। নির্মলেন্দুবাবু তাঁর কণ্ঠস্বর দিয়ে যেন যাদু বিস্তার করলেন সারা প্রেক্ষাগৃহে। সেই যে সবাই চুপ করল, শেষ পর্যন্ত তা বজায় রইল। নির্মলেন্দুবাবুর আবৃত্তি সেদিন সেই সময় না হলে বোধকরি দ্বিজেন্দ্রলালের জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর দেওয়া হত না।

নির্মলেন্দুর জন্ম দিনাজপুরে। বাবা স্বর্গত নিকুঞ্জ মোহন ছিলেন সেখানকার সিভিল সার্জন। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ছোট মামা। তাঁর মা মালতীবালা ছিলেন কার্তিকচন্দ্র রায়ের সাত পুত্র ও একমাত্র কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

স্কুলে পড়তে পড়তে নির্মলেন্দু পালিয়ে যান জাপানে। ডাকাবুকো ছেলে। বললেন, ব্যবসা করব। ছাতা তৈরীর কাজ শিখেছিলেন। তারপর টাকা পয়সার অভাবে চলে এলেন জাপান থেকে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এনট্রান্স পাশ করলেন। কিন্তু আর পড়াশুনো এগুলো না। থিয়েটার করার দিকে ভারী ঝোঁক। বড় ভাই অমলেন্দুর সাহায্যে কর্পোরেশন প্রেসে একটি কাজ পেলেন এবং ১৯১২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সেখানে কাজ করলেন। ইতিমধ্যে সখের থিয়েটারে বেশ নাম করেছেন। ইউনিং ক্লাবেও যাতায়াত করছেন। মনমোহন থিয়েটারে একটি ক্লাবের হয়ে এক অভিনয় করেন। সেই অভিনয় আসরে ম্যাডান কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে মাসিক ৪০০ টাকা মাইনেতে বেঙ্গলী থিয়েটারে ভর্তি করে নিলেন। কর্পোরেশন থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'রত্নেশ্বরের মন্দির' নাটকে নির্মলেন্দু নায়কের ভূমিকায় সাধারণ মঞ্চের নটরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তারিখ ছিল ১৯২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর।

তারপর ১৯২৪ থেকে তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তি। স্টারে গোলকুণ্ডার হাসান, সরলায় বিল্বমঙ্গল, মিত্র থিয়েটারে শ্রীদুর্গায় মহিষাসুর, কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল, চন্দ্রশেখরে নবাব, মনমোহনে বঙ্গে-বর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত, দেবলা দেবীতে খিজির খাঁ, প্রতাপাদিত্যে প্রতাপ, বীরাবাঈতে রাণা কৃষ্ণ, পথের শেষেতে নলিনী, বিল্বমঙ্গলে শ্রীশ, দক্ষ যজ্ঞে দক্ষ, প্রাণের দাবীতে কেশব, রক্ত কমলে দালামশায়, সাজাহানে দিলদার, মন্ত্রগুপ্তে মন্ত্রগুপ্ত, জাহাঙ্গীরে সাজাহান, মহুয়ায় হুমড়ো সর্দার, সৈরিন্ধ পতাকায় শিবাজী, কারাগারে কংস, প্রবতারায় উপেন, সাবিত্রীতে অশ্বপতি, রক্তের রাতেতে প্রশান্ত, সিন্ধু গৌরবে রঞ্জলাল, স্বর্ণলঙ্কায় রাবণ, সিরাজদ্দৌলায় সিরাজ, সিঁথির সিঁদুর-এ মাধব, পি. ডবলু. ডি-তে রায় বাহাদুর, দেবদাসে বসন্ত ইত্যাদি বহু বহু নাটকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী অভিনয় করে দর্শকদের চিত্ত জয় করেন।

তাঁর অভিনীত স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার জন্যে যেগুলি মনে পড়ছে, তার সংখ্যা কম নয়,—চন্দ্রশেখরে নবাব, প্রতাপাদিত্যে প্রতাপ, প্রফুল্লর ভজহরি, সাজাহানে দিলদার, বঙ্গেবর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত, দেবলা দেবীতে খিজির খাঁ, সৈরিন্ধ পতাকায় শিবাজী, রক্তের রাতে-তে প্রশান্ত, দেবদাসে বসন্ত এবং আবুল হাসানে হাসান।

চলচ্চিত্রেও অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন। নির্বাকযুগে, পাপের পরিণাম ও শংকরাচার্য এবং সবাকযুগে কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল, কণ্ঠহারে মধু, গাঙাবৌ-তে মিঃ বোস, এবং আরও কয়েকটা ছবিতে সুঅভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ধারার তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরপুরুষ। ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অতি শুদ্ধাচারী সাধক। মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ঠাকুরের চরণামৃত পান করে সেই যে অজ্ঞান হলেন, সে জ্ঞান আর ফিরলো না।

পরদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ মঙ্গলবার সকাল ৯-৩৫-এ ৫৯ বছর বয়সে তিনি পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

আলোচনা

রবিশংকর

যাত্রাগানের আদিগুরু মতি রায়

মতিলাল রায়কে বলা হয় বর্তমান পেশাদার যাত্রাগানের আদিগুরু। তাঁর প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে যাত্রাগান ও যাত্রা-ওয়ালারা ভদ্র সমাজে স্থান পেয়েছিল।

মতিলাল রায় সম্পর্কে যখন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বঙ্গভাষার প্রধান অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য থিসিস লেখার মনস্থ করলেন তখন অনেকেই বললেন ? একজন যাত্রাওয়ালাকে নিয়ে থিসিস হয়না। ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু তা মানতে রাজী নন। তিনি বললেন, মতিলাল রায়ের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ছিল বিরাট। তিনি যেখানে যেতেন পেতেন গুরু ও রাজার মত সম্মান।

অধ্যাপক হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য থিসিস লেখা শেষ করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে শুধু ডি. ফিল দিয়ে সম্মানিত করেন নি, বাঙলার লুপ্তপ্রায় যাত্রার সংস্কৃতিকে সম্মানিত করেছেন, যাত্রাগানকে স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি নবদ্বীপের চন্দ্রিকা প্রকাশনী থিসিসটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন পুস্তকের অভিবচনে বলেছেন, "শ্রীযুক্ত হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য 'যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়' গ্রন্থে এক অন্ধকার যুগের ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছেন, বইটি ডি-ফীলের থিসিস কিন্তু অপেক্ষিত 'যাগান চচ্চড়ি' নয়।

এতে যা আছে তা সবই প্রাসঙ্গিক এবং খুঁজে খুঁজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যার করা, যাঁরা নতুন কিছু জানতে অনুৎসুক নন, যাঁরা পুরাতন জানাকে নতুন তথ্যের পরিচয়ে বালিয়ে নিতে চান তাঁরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন, হয়ত খুশিও হবেন।"

১২৮০ থেকে ১৩৪৩ সাল, পঞ্চান্ন বছর মতি রায়ের 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয়' সম্প্রদায় যাত্রাগানকে মহত্তর মর্যাদার উচ্চ শিখরে স্থাপন করে গিয়েছে। মতি রায়ের দলের বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যাত্রাগানের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেল। সুরু হয়ে গেল মথুর সাহ থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা। যাত্রা-নাটক থিয়েটারের কাছে চলে গেল।

মতি রায় যখন যাত্রার দল গঠন করেন তখন বাঙলা দেশে যাত্রাগানের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে যাত্রাগান নিষিদ্ধ ছিল, মতি রায় প্রথম রাজবাড়ীতে গান করে মহারাজ ক্ষিতীশ চন্দ্রের নিকট হতে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন মতি রায়ের গুণগ্রাহী, তাঁর কমল কুটীরেই রামকৃষ্ণদেব মতি রায়ের 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয় শুনে পরিতৃপ্ত হয়ে মতি রায়কে ভাবে গদ গদ হয়ে আলিঙ্গন করেন।

শুধু বাঙলাদেশে নয় উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে জয়পুর থেকে আসাম পর্যন্ত মতিলালের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। মানভূমের পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ বাহাদুর তাঁর রাজ্যে মতিরায়ের নামে 'মতিমেলা' স্থাপন করেছিলেন। মহীশূরের মহারাজা মতি রায়কে স্বর্ণপদক উপহার দিয়েছিলেন।

মতি রায় শুধু যাত্রাওয়ালা ও অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন গৈরিশযুগের এক সুদক্ষ নাট্যকার ও গীতিকার, মতিলালের গুরু স্থানীয় নাট্যকার মনোমোহন বসুও মতিলালের প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে মতি রায়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। মতি রায়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটকগুলি মতি রায়ের যাত্রার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণ বধে' (১২৮৮) মতি রায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রভাব বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ। চৈতন্য লীলায় গিরিশচন্দ্র মতিলালের উপদেশ নিয়েছিলেন।

নাটকে মতিলাল কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুরীতির গদ্যের ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়, গদ্যের মত পদ্যেও অনুপ্রাস-যমকের ব্যবহার করেছেন বক্র-তন্ত্র। দাশু রায়ের প্রভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়।

ভক্তি রসই মতি রায়ের নাটকে প্রবল, রচনায় হাস্য রসেরও অবতারণা, তিনি প্রয়োজনে করেছেন, কিন্তু সর্বত্র ভাড়ামি ও অশ্লিলতা বর্জন করেছেন। করুণ রস সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রকৃত পক্ষে হাস্য, করুণ ও ভক্তি এই ত্রিবিধ রসই মতিলালের গীতাভিনয়ে সহজ স্ফূর্তিলাভ করেছে, মতিলালের হাস্যরস ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে পূর্ণ নয়, এগুলি নিছক কৌতুক,—হিউমার শ্রেণীভুক্ত।

এই যাত্রার ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে আজো রচিত হয়নি। সম্প্রতি আমি যাত্রার উৎস থেকে সুরু করে মতি রায় পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে দেখলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে গেছে। পত্র পত্রিকায় যা আছে তাও অতি নগন্য। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রয়েছে, যাত্রার নেই। ডঃ ভট্টাচার্য্য যখন থিসিস লিখতে সুরু করেন তখন বহু লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। গল্প-ভারতীর সম্পাদক প্রবীণ কথা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, "তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করুন, হারিয়ে যাবে।"

১। বাঙলার যাত্রা গানের ইতিহাস (১ম পর্ব্ব)। প্রকাশক নির্মল সাহিত্য মন্দির।

২। যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায় প্রকাশক চন্দ্রিকা, নবদ্বীপ।

নাট্য দর্শন

শ্রীরঙ্গমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নতুন নাটক : দ্বিধা।
নাট্য-সংঘাতে দুর্নিবার, আঙ্গিকে অভিনব, অভিনয়ে
প্রাণবন্ত একটি বিশিষ্ট নাট্য পরিবেশন।

নাটকের পথ বড় কঠিন। এর ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, সমস্যা—সব কিছুই এর পাত্র-পাত্রীরা দর্শকের সামনে উন্মোচন করবে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির রূপায়নের মাধ্যমে এবং তাঁর রচিত সংলাপের যথাযথ প্রক্ষেপনে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে নাট্য-পরিচালকের কারুকৃতি, প্রযোজকবর্গের সৌষ্ঠব এবং সমগ্র নাট্যের উপস্থাপন-পারিপাট্য। শুধু তাই নয়, ঘটনার পর ঘটনার উদ্ঘাটন এবং তাদের পরিণতি হওয়া চাই অনিবার্য এবং সেই সব ঘটনা ও সেই সঙ্গে চরিত্রগুলি হওয়া চাই স্বাভাবিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং আবেদন সমৃদ্ধ।

এই ধরণের কড়া দর্শের কষ্টিপাথরে ফেলেও দ্বিধাকে যদি বিচার করা যায় তাহলেও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে—দ্বিধা এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি, এক অনাস্বাদিতপূর্ব নাট্যরসের বিরল পরিবেশন। বিনা দ্বিধায় সেই সঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'দ্বিধা' সর্বকালের সার্থকতম নাট্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য।

অপ্রতিরোধ্য এই নাট্যের আবেদন, দুর্বার এর গতি, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং স্বাভাবিক এর ঘটনা-সংস্থাপন, চমকপ্রদ নাট্যমুহূর্তের উদ্ঘাটন এর প্রতি দৃশ্যে, বাস্তব অথচ তীব্র এর সমস্যা, সুক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এর চরিত্রগুলির কার্যকলাপে, অবশ্যম্ভাবী এর আংগিক এবং সর্বোপরি সুললিত তীক্ষ্ণ এবং শ্রবণাভিরাম এর সংলাপ।

নাটকের পটভূমি বড় নয়। উত্তর কলকাতার একটি ঘর, সেই ঘরে থাকে এক মেডিক্যাল স্টুডেন্ট (নায়ক) আর দক্ষিণ কলকাতার একটি ঘর, সেই ঘরে থাকে এক চাকুরে মেয়ে (নায়িকা)। এই দুটি ঘরকে পাশাপাশি সাজিয়ে একটি সেট-এ নাটকটি বিধৃত। এক সঙ্গে দুই ঘরেই সময়ে সময়ে অভিনয় চলেছে। অভিনেতৃরা ছাড়া আরো দুটি জড়বস্তু—প্রাণ স্পন্দনে উদ্দীপ্ত হয়ে অভিনয় করেছে এই নাটকে—দু'টি ঘরের দু'টি টেলিফোন। ক্ষণে ক্ষণে, ব্রাহ্মমুহূর্তে, চরম সংকটকালে, মধুর বিশ্রম্ভালাপে তারা মেতেছে এ ঘর থেকে ও ঘরে এবং নাট্যরসকে ঘনীভূত করে তুলেছে। বস্তুত পক্ষে এই দুটি টেলিফোন যেন অন্য সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই নাটকের গতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাটক শুরু হয়েছে টেলিফোন দিয়ে, শেষও হয়েছে টেলিফোন দিয়ে। যে-ভাবে দর্শকদের শ্রবণ ও নয়নগোচর করে এই দুটি টেলিফোনকে নাট্যকার ও পরিচালক কাজে লাগিয়েছেন তা যেমন অদৃষ্টপূর্ব তেমনি আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে।

সমগ্র ভাবে নাটকটি কোথাও তার স্বাভাবিকত্ব এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি, কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই, সেই জন্যেই বোধ করি তিন ঘণ্টা সময় রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কেমন করে যে কেটে যায় তা দর্শকরা বুঝতেই পারেন না।

একটি চাকুরে মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী। মেয়েটির বাপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মা চিররুগ্ন, ছোট ছোট ভাই বোনেরা অসহায়। দাদা আলাদা থাকে—বাপ-মাকে দেখে না! তাই মেয়েটিকেই বাপ মা ভাই বোনদের বাঁচাবার জন্যে কলকাতায় এসে এক বড় কার্যের মালিকের পার্সোনাল

অ্যাসিসটেন্ট-এর চাকরি নিতে হয়েছে। কিন্তু সেই চাকরির পথ সোজা বা সরল নয়, তার আত্মলিপ্সু মনিব তাকে পেতে চায়, মাঝে মাঝে জোর করে তাকে কাছে টেনে নেয়। চাকরি ছাড়বার উপায় নেই, তাহলে বাপ মা ভাই বোনেরা উপোস করে মরবে, অথচ চাকরি বজায় রাখতে গেলে ইজ্জৎকে হারাতে হয়। সে এক দুঃসহ পরিস্থিতি। এরই মাঝে তার আলাপ হল ঘটনাচক্রে, টেলিফোনের রং কনেক্সনের সূত্রে, একটি মেডিক্যাল ছাত্রের সঙ্গে যার মধ্যে মেয়েটি খুঁজে পেল তার জীবনের পরম সার্থকতা, আস্বাদ পেল ভালবাসার। কিন্তু এ সুখ, এ আশা তার জীবনে সইল না। অন্য একটি মেয়ের সুখের জন্যে তাকে রিক্ত হতে হ'ল। এমন সময় টেলিফোন বাজল। তার মনিব তাকে ডাকছে—নিশীথ অভিসারে। দ্বিধার আতংকে বিহ্বল হ'য়ে মেয়েটি তাকিয়ে রইল সেই বেজে-যাওয়া যন্ত্রটার দিকে। যবনিকা নামল।

এর মধ্যে মধ্যে আছে নানা জটিল গ্রন্থি, নানা চরিত্র, নানা সমস্যা, পদে পদে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, দ্বিধা, সংশয়, না বোঝা এবং ভুল বোঝা। সর্বোপরি সাম্রাজ্ঞ অনুরণিত হয়েছে সেই ভাগ্যহতা মেয়েটির জীবনসংগ্রামের করুণ আকুতি, তার ক্ষণিক আনন্দ আর অপার বেদনার ব্যঞ্জনা।

অভিনয়ে এই চাকুরে মেয়েটির ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। চরিত্রটির অন্তর্নিহিত মানসিক বিপর্যয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, তার আশা নিরাশা, হাসি আর অশ্রু, আনন্দ আর বেদনাকে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীমতী মিত্র তাঁর আশ্চর্য নিপুণ অভিনয়ে, তার তুলনা নেই। এই দুরূহ চরিত্রটিকে রূপ দেবার ক্ষমতা বর্তমানে বাংলা মঞ্চে আর কারুরই নেই—একথা যিনি এই অভিনয় দেখবেন, তিনিই সানন্দে স্বীকার করবেন। তাঁর সঙ্গে সমান তালে অভিনয় করেছেন নায়করূপে অসীমকুমার। তাঁর চরিত্র রূপায়ণে পরিণত অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। পার্শ্বচরিত্রে তরুণকুমার ও অনিতাবরণ এই নাট্যের বিশিষ্ট সম্পদ। স্বল্প অবকাশেও তাঁরা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। ভানু চট্টোপাধ্যায়ও যথাযথ। অন্যান্যরাও সাধ্যমত সুঅভিনয় করেছেন। তবে জমিদার (নায়কের শ্বশুর) এবং নায়িকার দাদা—এই দুটি চরিত্রে অধিকতর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল।

নায়িকার পাশের ঘরের প্রতিবেশিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী ধনানী ভট্টাচার্যের অভিনয় যেমন স্বাভাবিক তেমনি শোভনীয়, মনে হচ্ছিল না যে তিনি অভিনয় করছেন। শ্রীমতী লতিকা দাশগুপ্তার অভিনয় যেন কিছু দীপ্তিহীন, অভিব্যক্তির অভাবে যেন নিষ্প্রাণ। আশা করি ক্রমে তিনি তাঁর ভূমিকাটিকে সার্থক করে তুলতে পারবেন। দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত নাটকের মেজাজকে পরিস্ফুট করেছে। নাট্য-পরিচালকের সূক্ষ্ম কার-কর্মের পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া গেছে, তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'দ্বিধা' বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল।

নাট্য প্রবাহ

গতমাসের নানা অভিনয়

নতুনের সঙ্গে পুরানো :

দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষ : নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা

উদয় সংঘ (শ্রীরামপুর)। বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটকের মধ্যে রূপালী পর্দার অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদ আর দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত একটি বলিষ্ঠ নাটক—'মায়াডুবি'। সংঘের শিল্পীরা সম্প্রতি এই নাটকটি অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। দলগত-শিল্পকৃতিতে অভিনেতৃরা নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় প্রদ্যোত দাসগুপ্ত, নায়িকা অরুণার ভূমিকায় তৃপ্তি দাস এবং সহকারী পরিচালক রূপে বিভূতি মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন, সুনীল দাস, শীতল চক্রবর্তী, সুনীল সরকার, শৈলেন লাহিড়ী, সুনীল ঘোষ, শিবনাথ নাথ, সতীশ দাস, সরাজ মুখোপাধ্যায়, বীরেন মুখোপাধ্যায়, শচীন দাস, সুশীল দাস, মদন সরকার।

সি. পি. ডব্লু. ডি। এই ইন্সটিউটের মহিলা কর্মীরা সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ম মঞ্চে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন, নিলীমা মুখোপাধ্যায় (মানস), ভারতী পাল (নীহারিকা), পারুল সরকার (ধাত্রেয়ী), অনিমা মুখোপাধ্যায় (হারানিধি), আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজেন), পারুল পোদ্দার (মানময়ী), লক্ষ্মী কর্মকার (বাণী), রেখা দত্ত (কারনাভেল), বন্দনা গুপ্ত (চপলা) উষা দে (বৈকুণ্ঠ)।

কল্লোল। বরাহনগরের এই সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের বার্ষিক মিলনোৎসবে "ভানুসিংহের পদাবলী" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। নৃত্য পরিচালনা ও রাধার ভূমিকায় ছিলেন, রেখা চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যে আরতি মল্লিক, দীপা দাসগুপ্ত, রূপালী দত্ত, নন্দিতা রায়, সঙ্গীতে দেবব্রত মল্লিক, মিনতি মুখোপাধ্যায়, ছবি মৈত্র, ছবি সেন, মায়া সেন, লক্ষ্মী দাসগুপ্তা, গ্রন্থনায় বিমল মৈত্র, হর সঙ্গীতে, সমর দত্ত, প্রশান্ত মণ্ডল, বিশ্বনাথ সিংহ, শিবদাস দাস, গোপাল দত্ত, অরুণ দাস এবং কৃষ্ণের ভূমিকায় ও নাট্য পরিচালনায় রেখা রায় স্বল্প দায়িত্ব নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। এরপর অভিনীত হয় দীপক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পৃথ্বীশ সরকারের সুখ্যাত নাটক 'লবণাক্ত'। অভিনয়ে ছিলেন, অজ মুখোপাধ্যায়, সত্যেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ রায়, অজয় সেন, শিশির ঘোষ, প্রণব ঘোষ, বিকুপদ ভট্টাচার্য, সোমনাথ মৈত্র, তপন পাল, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, রতন মুখোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ রায়, অমর দত্ত, বিপুল চট্টোপাধ্যায় রবিন দে, গোপী মিত্র, নীলিমা চক্রবর্তী, মীরা আইচ ও কল্যাণী দাস। দলগত অভিনয়ের মান উন্নত ছিল।

অবকাশ। এঁরা সেদিন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ম মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' অভিনয় করলেন। নাট্যপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর কাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। দলগত অভিনয় এক কথায়

সুন্দর। ওঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ ভাবে নজরে পড়েছেন তাঁরা হলেন, চিত্তরঞ্জন দাস, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মিত্র, তারাপদ ঘোষ, কবী মিত্র, গীতা দাস, রত্না পাল, সুতপা চক্রবর্তী।

নাট্য কল্লোল। কয়েকদিন আগে বিশ্বরূপা মঞ্চে এঁরা পরিবেশন করলেন বিমল মিত্রের বৃহৎ উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর নাট্যরূপ। নাট্যরূপদাতা ইলাবন্ত ঘোষ প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে নাটকটিকে সাজিয়েছেন। অভিনয়ে ইলাবন্ত ঘোষ (ঘোষাল), গীতা দে (সত), সাধনা ঘোষ (লক্ষ্মী), দীপঙ্কর সেন (মৃদুল), সন্তোষ দত্ত (পনদেব), আলোক মিত্র (রাঘুদা), শেফালী দে (দীপুর মা) ও ছবি চট্টোপাধ্যায় (নয়নরঞ্জনা) সু অভিনয় করে সমগ্র নাটকটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন।

হেভি ইলজিনীয়ারিং কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সমিতি সম্প্রতি নেতাজী সুভাষ ইনসটিটিউট মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'মমতাময়ী হাসপাতাল'। হরেন ভৌমিকের নির্দেশনায় সুঅভিনয় করেন, জে. পি. চক্রবর্তী, শৈলেন দাস, কালী বর, কৃষ্ণ ঘোষ, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মিত্র।

নব নাট্যম মহিলা শাখা (খড়্গপুর)। রবীন্দ্র ইনসটিটিউট মঞ্চে এঁরা সম্প্রতি 'পাপমোচন' নৃত্যনাট্যটির অভিনয়ের আয়োজন করেন। পরিচালক ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী ও যতেন সরকার। নৃত্য-পরিচালনায়, শ্যামল বিশ্বাস ও পম্পা চক্রবর্তী, সঙ্গীত পরিচালনায় প্রিয়কুমার রায়, মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণে সুশীল করণ। চরিত্ররূপায়ণে ছিলেন পম্পা চক্রবর্তী, শ্যামলী বিশ্বাস, শর্মরী ভরদ্বাজ, বুলবুল বসু, গীতা গাঙ্গুলী, দেবযানী বসু। আবহসঙ্গীতে সুধাময় ঘোষ, দেবব্রত মণ্ডল, ছবি চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী মৈত্র, মনী ঘটক, নির্মল দত্ত। ব্যবস্থাপনা, মঞ্চসজ্জা ও বিশেষ সঙ্গীতানুরোধে ছিলেন, যথাক্রমে, বীরেন গৌতম, দুলাল মিত্র ও সুধাময়। অভিনয় বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হয়।

— - —

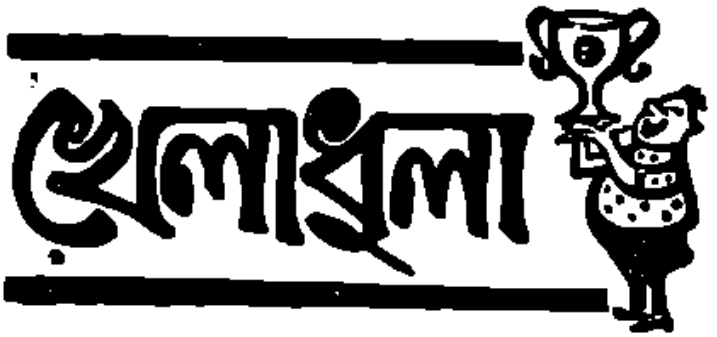

জ্যোতির্ময়

একটি নেপথ্য কাহিনী

১৯১১ সালে মোহন বাগান ক্লাব আই. এফ. এ শীল্ড জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই জয়ের পিছনে ছিল এক নাটকীয় কাহিনী যা অনেকেরই জানা নেই।

শুনলে অবাক লাগবে, মোহনবাগানের সেই মহাসাধনালব্ধ সাফল্যের মূলে ছিল একটি ব্যঙ্গ-পত্র, আর, একজন মানুষের সর্বস্ব নিবেদনের নিষ্কৃত প্রতিশ্রুতি।

মোহনবাগানের বাড় বাড়ন্ত দেখে প্রতিবেশী দু'তিনটি ক্লাবের সভ্যরা সে সময় হিংসায় জ্বলে মরছিলেন যেন, পর পর তিনবার টেম্পল কাপ জিতল মোহনবাগান, আর তো আমাদের মুখ দেখাবার উপায় নেই, শিবে বিজে কী কাণ্ডই করছে। বড়ই মনস্তাপ সেইসব ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের।

পরের বছর মোহনবাগান শিল্ড-এ নাম দিলো এবং গড়ফের কাছে তিন গোলে হারল। তখন সেই সব হিংসুটে প্রতিবেশী খেলোয়াড়দের কী আনন্দ! মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের নামে কত ঠাট্টা, ভেংচিকাটা, শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা পত্র লিখে ফেললেন আর সেই পত্রটা ছাপিয়ে বিলি করতে লাগলেন। একেই তো এই পরাজয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী শৈলেন বসু (স্বনামধন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভাইপো) অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন, তাপর সেই পত্র পড়ে তিনি যেন মুহ্যমান হলেন। ফুটবল খেলায় মোহনবাগান শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে, মোহনবাগান শিল্ড জিতবে, এই স্বপ্ন দেখেছিলেন শৈলেনবাবু, আর সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন, লালন করেছিলেন, পুত্রস্নেহে কয়েক বছর ধরে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের।

শুধু পত্র বিলি করেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধপক্ষ ঈর্ষাপরায়ণ মানুষগুলো ক্ষান্ত হলেন না, সেই মর্মে-আঘাত দেওয়া খেউড়কে সুর দিয়ে তাঁরা কাঁটাপুকুর পার্কে বসে গাইতে লাগলেন।

এই স্নেষ বিদ্রূপ আর অপমান শৈলেনবাবুকে যেমন উত্তেজিত করেছিল তেমনি আঘাত দিয়েছিল। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

একদিন শিবদাসকে ডেকে বললেন—শিবদাস! এত বড় অপমানও জীবনে সইতে হল।

শিবদাস বললেন—খেলায় হার জিত তো আছেই···

—না, না, তোক নয়। চাই প্রতিকার, মুখের মত জবাব। আর তার একমাত্র পথ··

শিবদাস বললেন—বুঝেছি। আসছে বছর দেখবো।

—পারবে ?

চোখ বুজে শিবদাস বললেন—পারবো।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেদিন সে এক আশ্চর্য শপথ নিয়েছিলেন শিবদাস, পিতৃসম জাতের ধনপতির হেঁট মাথা উঁচু করতেই হবে। শিবদাস যেন সেদিন নিজের জীবনকে বাজী ধরেছিলেন।

বছর ঘুরে এলো। শিল্ড খেলার সময় এলো। মোহনবাগান আবার নাম দিল। কিন্তু এই এক বছরের নেপথ্য ইতিহাস ক'জনই বা জানল ? ক'জনই বা জানল, এই একবছর ধরে খেলোয়াড়দের পিছনে শৈলেনবাবু কত অর্থ ব্যয় করলেন, এই এক বছর ধরে কী অবিচল নিষ্ঠায় এই দলের খেলোয়াড় আর ধনপতির ধ্যানজ্ঞানমনপ্রাণ অহর্নিশি একটিমাত্র লক্ষ্যের প্রতি উর্দ্ধায়িত হয়ে রইল, দুঃসাধ্যকে জয় করবার দুস্তর তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইল।

এক বছর পরে শিল্ডের প্রতিযোগিতায় আবার যখন নামল মোহনবাগান তখন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বুকে অনেক আত্মপ্রত্যয়—মরণপণ মনোভঙ্গী। এতখানি মানসিক আর দৈহিক প্রস্তুতি নিয়ে বোধ করি কোন দলই কোনদিন কোন প্রতিযোগিতায় নামেনি।

শুরু থেকেই শক্ত পাল্লা, যাই হোক প্রথম দিকের বাধাগুলো একে একে সরে গেল। শেষ ধাপে পৌঁছলো মোহনবাগান। সেখানে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে দুস্পরাজের ইষ্ট ইয়র্ক যাদের শেষ ব্যূহে আছে এমন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোলকীপার যে নাকি দুর্ভেদ্য।

বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়িতে রুদ্ধদ্বার ঘরে শলাপরামর্শ চলল। বিপক্ষদের লক্ষ্য আর চাপ শিবদাসের ওপরেই সবচেয়ে বেশি। ঐ একটা লোককে আটকাতে পারলেই আর চারজন খোঁড়া। ইষ্ট ইয়র্কও সেকথা জেনেছে, বুঝেছে। শিবদাস বললেন, আক্রমণ বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। ইসারা করলেই মেজদা সরে যাবে বাঁয়ে আর কাছু তুমিও প্রস্তুত থেকো। কাছু বললেন, তুমি পুবমুখো হলেই আমি হব পশ্চিম মুখো, ব্যাটাদের বুঝতে দেব না। দুরপাল্লার শটে ক্লেসিকে ভেদ করা যাবেনা, তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অভিলাষ জানালেন, তিনি তাই করবেন, প্রাণ যদি যায় সেতো একবারই যাবে, দুবার তো আর নয়।

খেলার দিন ভোরে দল নিয়ে শৈলেনবাবু কালীঘাটে পুজো দিতে গেলেন। মন্দির চত্বরে ভিড়েভিড়, আর কী আশ্চর্য, সেই ভিড়ের মধ্যে ওরাও তো রয়েছে, পদ্য লিখে গান গেয়ে যারা মোহন বাগান আর শৈলেনবাবুর চূড়ান্ত অপমান করেছে, ওরা এসেছে কেন ?

ওরা এসেছে সেদিন প্রার্থনা জানাতে। সেদিন মনের সব কলুষ ঘুচে গেলে ওরা সমস্ত জাতির সঙ্গে প্রার্থনা জানাতে এসেছে, জয় হোক মোহনবাগানের, আজ ওদের মনে কোন জ্বালা নেই, আজ আছে শুধু শুভকামনা, আজ আর মোহনবাগান তো শুধু একটা বিশেষ দল নয়, আজ সে সমগ্র জাতির প্রাণের প্রতিনিধি, তাই তার জয় কামনায় ওদের চোখ দিয়েও অজ্ঞাতের আকুতি জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চতুর্দিকে সে এক অভূতপূর্ব আবেগের আলোড়ন। বাঙালীর মনপ্রাণ সেদিন যেন একটিমাত্র সুরে বাঁধা হয়েছিল।

সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক খেলার বিবরণ সকলেই জানেন। এই খেলার উপর যাঁর মন প্রাণ নির্ভর করছিল, সেই ধনপতি শৈলেনবাবু, খেলার সময় পারাক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। খেলা শেষ হল। জনসমুদ্রের তরঙ্গে খেলোয়াড়রা ভেসে গেল। সারা মাঠে উদ্দাম নৃত্য। একজন এলো তাঁর কাছে। তাঁর চেতনা বুঝি ফিরল—খেলা শেষ হয়েছে বুঝি ? শিবদাস কোথায় ? উত্তর হল—

আজো, শিবদাস তো এখন লোকের কাঁধে। শুধু তিনি নন, সব খেলোয়াড়দের কাঁধে করে মাঠের চারিদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

সেদিন রাত্রে বেলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়িতে অনেকেই গিয়ে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেই পদ্য-লেখকরাও ছিলেন। শিবদাস তাঁদের দেখে ছুটে গিয়ে সবার আগে তাঁদেরই বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—জাগিয়ে পদ্য লিখেছিলি তোরা।

অতীতের দিকপাল : বিজয় ভাদুড়ী

মোহনবাগানের চতুরতম লেফট-উইং। তিনি না থাকলে শিবদাসের খেলা কি অমন খুলতো? বুকে শুকে ঠিক সময় খুঁ পালটি দিতেন আর তাই নিয়ে হাওয়ার বেগে বেরিয়ে যেতেন শিবদাস। পরমুহূর্তেই গোল। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল মাঠের মধ্যে। আর শুধু কি ড্রিবলিং, বল কনট্রোল, পাসিং?—নিজের দলের খেলোয়াড়দের কাকে কখন কী ভাবে বল দিলে সবচেয়ে বেশি কাজ হবে সে জ্ঞানও তাঁর আশ্চর্য ছিল! কোথায় বিজয়দাস আর কোথায় কানু, এক প্রান্ত এবং আর এক প্রান্ত! কিন্তু চোখের পলকে দেখা গেল বিজয়দাসের পা থেকে কানুর পায়ে বল, আর একজনকে কাটিয়ে সেই বল ঠেলে দিল কানু অভিলাষের পায়ে। অভিলাষের কামানের গোলায় গোলের জাল ছিঁড়ে গেল। খেলার মধ্যে এই যে সংহতি আর কমবিনেশন তার নায়ক ছিলেন বিজয়দাস ভাদুড়ী। যেমন বিচক্ষণ তেমনি নিঃস্বার্থপর। সাথীরা গোল করছে, তাতেই তাঁর আনন্দ! ১৯১৬ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। তারপর কুচবিহারের মহারাজার এডিকং (পার্শ্বচর) রূপে বহুদিন সেখানে বাস করেন।

পার্সি নাইট :

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বহুবিখ্যাত লেফট আউট। দার্জিলিং-এ লেড়াপড়া করেছেন। ছেলে খেলায় রীতিমত দৌড়বীর ছিলেন। অনেক বেসে ভাল ফল দেখিয়েছেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ১০০ গজ এবং ২২০ গজ দৌড়ে তিনি প্রায়ই প্রথম তিনজনের মধ্যে স্থানলাভ করতেন। ১৯১৩ সালে ডালহৌসি ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে যোগ দেন এবং এক নাগাড়ে ১৯৩৪ পর্যন্ত খেলেন। অসামরিক সেরাদ্র দলের মধ্যে তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ লেফট আউট। তাঁর বহু খেলা দেখেছি। বল নিজের আয়ত্তে রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। বহু খেলায় একক চেষ্টায় বহু আশ্চর্য গোল তিনি করেছেন। এখানে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলি। গোষ্ঠ পাল পুরোপুরি ছিলেন নাইটের সমসাময়িক। তিনিও ১৯১৩ সালে খেলা শুরু করেন এবং ১৯৩৫ সালে অবসর নেন। আর এই ক'বছরই খেলার মাঠের দুনিবার আকর্ষণ ছিল নাইট বনাম পালের লড়াই। নাইট স্বীকার করেছেন, সবচেয়ে যে খেলোয়াড়কে তিনি সমিহ করেছেন তিনি হচ্ছেন গোষ্ঠপাল। একমাত্র তাঁর কাছেই তিনি অব হয়েছেন। পাল ছিলেন যেন সত্যিই চাইনিজ ওয়াল তাঁর কাছে। গোষ্ঠ পালও স্বীকার করেছেন, একমাত্র নাইট ছাড়া অন্যকোন লেফট আউটকে তিনি পরোয়া করেন নি। তিনি বলেছেন, নাইট সত্যিই এক অপূর্ব খেলোয়াড়।

রাজেন সেন

১৯১১ সালের শিল্ড বিজয়ী মোহন বাগানের সেন্টার হাফ। ঢাকা কলেজে পড়তেন এবং সেখানে ফুটবলে খুব নাম করেছিলেন। ১৯১০ সালে কলকাতায় পড়তে এলেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তখন তাঁর খুব নামডাক। ওরকম পরিশ্রমী এবং নির্ভীক খেলোয়াড় বড় একটা দেখা যায়নি। গোলাদের বুটের সামনে পা বাড়িয়ে দিয়ে অম্লানবদনে বল কেড়ে নেওয়ায় তাঁর জুড়ি ছিলনা। স্বাস্থ্যও ছিল খুব সুদৃঢ়, শক্ত যেন ইস্পাত। হেড করতে পারতেন সুন্দর। আট বছর মোহনবাগানে খেলবার পর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদেন এবং ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

পিটার কলডিন

যেমন চেহারা, তেমনি লম্বা কিক আর তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞ খেলোয়াড়। ১০ বছর ধরে কলকাতার মাঠে পিটার কলডিন ছিলেন সব সেরা ফুলব্যাক। ১৯১৪ সালে স্কটল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথমে হাফব্যাক-এ খেলতেন। সেইবছর লিগ-এ তিনি হাফব্যাকই খেলেন কিন্তু শিল্ড প্রতিযোগিতায় তাঁকে ব্যাকে খেলতে বলা হয়। শিল্ড-এর প্রথম রাউণ্ডেই ক্যালকাটার বিরুদ্ধে মিডল সেক্স। এই গোরাদল সে বছর লিগ জিতেছে এবং ক্যালকাটাকে লিগ-এর দুটো খেলাতেই সোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছে, প্রথমবার ৫—১ গোলে, দ্বিতীয়বার ৪—০ গোলে। শিল্ড-এর খেলায় সেই মিডল সেক্সকেই ক্যালকাটা এক গোলে হারাল। এবং এই জেতার মূলে কলডিনের অবদান ছিল অসামান্য। মিডলসেক্স-এর ফরওয়ার্ডরা গোরাদের মত গোল করত। সেদিন একা তাদের সবাইকে রুখে রেখেছিলেন পিটার কলডিন। মিডলসেক্স দলে এলসন নামে এক খেলোয়াড় ছিলেন। সে সময়ে তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলতেন। গোল তিনি করবেনই। সোজাভাবে না হলে উলটোভাবে বল মেরে গোল করতেন—অর্থাৎ নিজের গোলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে বিপক্ষের গোলে বল মারতেন। তাঁর সেই অদ্ভুত শট কোন গোলকিপারের পক্ষেই বুঝতে পারা বা রুখতে পারা সম্ভব হতনা। এহেন খেলোয়াড়কেও সেদিন পিটার কলডিন সারাক্ষণ হারিয়ে রেখেছিলেন। এলসন-এর সেই শুটিংকে ইংরেজিতে বলা হত—এলসোনিয়ান শট! কিন্তু সেদিন পিটার কলডিন এলসনকে সেরকম শট করবার সুযোগই দেননি।

——

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ভারতীয়" আড্ডার কবিশ্রেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আর কথাশিল্পী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ সাঁতারে মেতে উঠলেন।

গোলদিঘির পাড়ে ছাত্রাবস্থায় যে আড্ডা কুইন ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের পর শুরু হয়েছিল ইং ১৯০০ সাল থেকে, ১৯১৭ সালে সে আড্ডা ভুবে এলো হেদোর পুকুর পাড়ে। অবশ্য গোলদিঘির পাড়ে যে কিশোর বালকেরা একদিন জড়ো হ'তো নছক গল্প-গুজবের জন্যই, যাদের আলোচনা আবর্তিত হত পড়াশুনা, পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র আর মাষ্টার মশাইদের রীতি নীতি ও প্রকৃতি নিয়েই, কেউ কেউ সহপাঠীদের তাদের বাড়ির কথা, অভিভাবকদের আচরণ, মা-মা-পিসিমা কে তাকে বেশি ভালোবাসে এসবও অকপটে বলতো। সংসারের কুটিলতা তখনও তাদের মনটাকে ঝাপ্‌সা করে তুলতে পারেনি।

কোথায় হারিয়ে গেল সেই জীবন প্রভাতের শুভ্র নির্মল কোমল মন? সেই পরদুঃখে কাতর, সহানুভূতি ও সমবেদনা ভরা তরুণ সুন্দর হৃদয়? মানুষের ওপর থেকে আজ আমাদের সে দৃঢ় বিশ্বাস চলে গেছে। আজ আমাদের সন্দিগ্ধ মন সকলকেই সন্দেহ করে। বন্ধুর ওপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছে না কেউ। মিথ্যা ভাষণ ও প্রবঞ্চণা যেন এ যুগের মানুষের চারিত্রিক বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদটা সুহৃদজনের অকলংক সংসর্গে আনন্দলোকে কাটিয়েছি আমরা।

গোলদিঘির ধারে গিয়ে যখন বসতুম তখন সেখানে সাঁতারের উৎপাত শুরু হয়নি। ওটা হয় অনেক পরে। এই সাঁতারের ক্লাবগুলি যে এক একটি 'ক্যাও-আড্ডা' এ পরিচয় পেলুম ঐ হেদোর পুকুর পাড়ে 'সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের'র তাঁবুতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হওয়াতে। গোলদিঘির 'ঝুনিয়ার' হলেও হেদোর 'সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব' আভিজাত্য ও সম্ভ্রম রক্ষতার গৌরবে গোলদিঘির চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই হেদোর পুকুরে সাঁতারের আড্ডার বেশ একটু চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। সেটা আগে বলে নিই। প্রেসিডেন্সি কার্যালির বামাপদ বসুর নাম এই আড্ডা প্রসঙ্গে আমার মুখে বোধহয় একাধিকবার শুনে থাকবেন। ইনি এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীই আমাকে 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন একথা আগে বলেছি। গোলদিঘিতে Y. M. C. A.-এর স্পোর্টিং বিভাগের চেষ্টায় তদানিন্তন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্তর সহায়তায় গোলদিঘিতে প্রথম এদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য সাঁতারের ক্লাব স্থাপিত হয়।

আমাদের কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের তদানিন্তন সম্পাদক মহাশয় এই সুযোগে ইনস্টিটিউটের মেম্বারদেরও এখানে সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা করলেন। বামাপদ এ ব্যাপারে পরম উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে আরও কয়েকজন ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের জপিয়ে নিয়ে এর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এইখানেই বন্ধুবর বামাপদ ভায়া 'সুইমিং' আর 'লাইফ-সেভিং'এ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। হেদোর পুকুরের সাঁতারের আড্ডা সম্বন্ধে এঁরই মুখে শুনিছি "প্রেসিডেন্সী কার্যালির" ঠিক ওপর তলায় থাকতেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি. সি. বোষ,

বিলেত ফেরত ডাক্তার। অত্যন্ত সুচিকিৎসক ছিলেন তিনি। আমার একবার পেটে অসহ্য বেদনা হয়। নড়তে চড়তে, কথা বলতে, হাঁচতে, কাসতে এমন ব্যাথা লাগতো যে প্রাণ যেন বেরিয়ে যায়।

বড় বড় ডাক্তার এসেছিলেন। সবাই দেখে বললেন "এ্যাপেনডিসাইটিস্!" "acute stage." পেকে উঠেছে! এখনি অস্ত্রোপচার না করলে রোগী মারা যাবে। আমার মরণাপন্ন অবস্থা শুনে বন্ধুরা অনেকেই দেখতে এসেছিলেন। বাবাপদও এসেছিল। সে বললে একবার ডাক্তার বি. সি. ঘোষকে দেখান। আমি ব্যবস্থা করছি। ডাক্তার বি. সি. ঘোষ এলেন। বেশ যত্ন করেই আমাকে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং বললেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই। 'এ্যাপেনডিসাইটিস নয়। আমি ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। খেলেই সেরে যাবে। আশ্চর্য! ডাঃ বি. সি. ঘোষের 'প্রেসক্রিপশান' করে দিয়ে যাওয়া ওষুধের দু'চার দাগ খাবার পরই আমার পেটের ব্যথা যেন জাদুমন্ত্রে উড়ে গেল। ডাঃ ঘোষ বলেছিলেন রোগটা 'এ্যাপেণ্ডিসাইটিস' নয়—'পেরিটোনাইটিস্'! আমি বাবাপদর বন্ধু শুনে তিনি এক কপর্দকও 'ফী' নেননি। অবশ্য, এরপর আমিও তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম।

ডাক্তার বি. সি. ঘোষের স্ত্রী ছিলেন একজন অশেষ গুণবতী ইংরেজ মহিলা। তার নাম শ্রীমতী এভিথ ঘোষ। শ্রীমতী ঘোষ একদিন বাবাপদর কাছে এসে বলেন যে—"কর্পওয়ালিস স্কোয়ারের অমন বিউটিফুল ট্যাঙ্কটায় তোমরা সাঁতারের ক্লাব করনা কেন?"

বাবাপদ বলেছিল ঐ পুকুরের মালিক কলিকাতা কর্পোরেশন। এতে স্নান করা কাপড় কাচা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কলেজ স্কোয়ারের ট্যাংকটায় অবশ্য "ক্যালকাটা সুইমিং এণ্ড স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন" সাঁতার কাটা ও সাঁতারের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু সাঁতারে অনভিজ্ঞদের সাঁতার শেখাবার অনুমতি পাননি!

শ্রীমতী ঘোষ বলেন—"এ বড় অন্যায়। সাঁতার যারা জানে না তাদের সাঁতার শেখানো প্রত্যেক সুইমিং ক্লাবের অবশ্য কর্তব্য। আচ্ছা, আমি দেখছি কি করতে পারি কর্পোরেশনের দিক থেকে। তুমি চেষ্টা করো সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা করতে পারো কি না।"

অগত্যা বাবাপদ কলেজ স্কোয়ারের সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় নৈপুণ্য দেখিয়ে যারা শীল্ড, কাপ্ প্রভৃতি ট্রফী অর্জন করেছিলেন তাঁদের কাছে অনভিজ্ঞদের সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থায় তাঁরা সাহায্য করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা সানন্দে রাজী হওয়ায় শ্রীমতী এভিথ ঘোষ আর বাবাপদর চেষ্টায় বেহুয়ার পুকুরে "সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নিবারণ দে, হিমাংশু গুপ্ত, রবিন রক্ষিত, শান্তি পাল, মন্মথ দে, অনিল গুপ্ত, বরেণ বোস, অঘোর ঘোষ, বলাই মিত্র আর বাবাপদর ভাই শ্রীপদ। বলা বাহুল্য যে, শ্রীমতী এভিথ আর বাবাপদ ভায়া তো ছিলেনই।

এই সাঁতার আড্ডার উদ্বোধন হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৩রা মার্চ। বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যহ সকালে ছাতি মাথায় হেদোর ধারে ঘুরে বেড়াতেন। একদা যে পুকুরে কারো নামা নিষেধ ছিল সেখানে সাঁতারের পোষাক পরা ছেলেরা পুকুর তোলপাড় করছে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হ'য়ে খোঁজখবর নিয়ে যখন জানতে পারলেন সাঁতার শেখাবার জন্য এখানে 'সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি মহাউৎসাহে অবিলম্বে তার সদস্য হলেন এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংকুর আতর্থী, হারিংকৃষ্ণ দেব, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্কুলের ছাত্র যাঁরা, এবং কোনও কোনো অধ্যাপকও সাঁতারের টানে এ আড্ডায় জুটেছিলেন। বাবাপদর দুই মেয়ে বিভা আর শোভা আর শ্রীমতী এভিথ ঘোষ এই সাঁতার ক্লাবের প্রথম মেম্বার সভ্যা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ছেলে। চাঁচরের রাজবংশের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল তাঁর। সুন্দর সুপুরুষ। সাঁতারে ছিলেন যাকে বলে একেবারে ওস্তাদ্। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সাঁতারে আনাড়ী। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত কম বলে চশমা পরেই নেমেছিলেন প্রথমদিন এবং প্রথম দিনেই শিখে ফেলেছিলেন সাঁতার। কিন্তু পাছে সাঁতার কাটার ফলে দৃষ্টি শক্তি আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে এই ভয়ে তিনি আর সাঁতার কাটতেন না। সাঁতার কাটা আর সাঁতার শেখানো দেখতেন। পরে ক্লাবের টেন্টে এসে বসে তোফা আড্ডা জমাতেন।

এই সাঁতার ক্লাব আর সাঁতারুদের নিয়ে তিনি একাধিক কবিতা লিখেছিলেন। একটার একটু নমুনা তুলে দিচ্ছি এখানে—

রঙ বেরঙের সঙের বাসা, আমাদের এই শহর খানা
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক সকল ক্লাবের সেরা
পুকুর জলে তৈরি সে যে, ঝাঁকি আলে ঘেরা।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
আৎলা, চিতল, কাঁকড়া কাছিম ব্যাঙের বিহার ভূমি।

দ্বিজেন্দ্রলালের আমার জন্মভূমি অনুকরণে সুদীর্ঘ এ কবিতা। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের গলির সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল।

প্রসিদ্ধ সাঁতারু শান্তি পাল সত্যেনের ছত্রাশ্রয়ে থেকে দেখতে দেখতে কবি হয়ে উঠলো। রকমারি সাঁতার দিতে বা সাঁতার কাটতে এবং সাঁতার শেখাতে সে যেমন দক্ষ ছিল, দেখা গেল কাব্য রচনাতেও কৃতীত্ব তার কিছু কম নয়। অন্ততঃ আধ ডজন কবিতার বই সে আমাকে উপহার দিয়ে গেছে। সত্যেনের যৌবন আস্তাচলে হেলে পড়বার আগেই সে যখন অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তখন থেকে শান্তি পাল তার গুরু সত্যেন্দ্রকে হারিয়ে নতুন কবিতা লিখলেই দৌড়ে আসতো আমাকে শোনাতে। শান্তি ছিল চিরকুমার। সেও আজ আমাদের ফেলে চলে গিয়ে পরমা শান্তি লাভ করেছে হয়তো।

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সেট ছিল যেন সজীব প্রাণশক্তি। অবশ্য উপযুক্ত সঙ্গী ও সাহচার্যের অভাব হয়নি তার কখনো। সাঁতারুদের সে যেমন সহোদরের মত ভালবাসতো তেমনি সাঁতার ক্লাবের সাহিত্যিক সদস্যদেরও সে তেমনি প্রেমিক ভক্ত হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ আমার কাছে সে সাঁতারু শান্তি পালের চেয়ে প্রকৃতির উদাস পূজারী পল্লীপ্রেমিক কবি শান্তি পাল রূপেই অধিকতর আদরনীয় ছিল।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র সদস্যরা যেমন গোলদিঘির সাঁতার ক্লাবে সুইমিং শিখতেন হেদোর পুকুরের এই 'সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে' তেমনি 'জেনারেল এ্যাসেম্ব্লির' ছাত্রেরা দল্য হয়েছিল সাঁতার শেখবার জন্য। আজ অবশ্য জেনারেল এ্যাসেম্ব্লির রূপান্তর ঘটেছে স্কটিশ চার্চ কলেজে আর 'হেদোর পুকুর' যাকে কর্পোরেশন বলতো 'কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার' তার নাম হয়ে গেছে "আজাদ হিন্দ বাগ!"

হেদোর সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের টেন্টে সকাল সন্ধ্যে যে আড্ডা বসতো সে কেবল সাঁতারুদেরই নয়, ডাঙার মানুষও অনেকেই ঘাই মারতো সেখানে। দুষ্ট সরস্বতী সম্বন্ধে একটা গ্রাম্য ছড়া আছে না যে "পথে যেতে যেতে হঠাৎ তিনি এক জায়গায় রথচালককে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন—"সারথি! কিরাও ঘোড়া-এই খানে মিলিয়াছে কৌরবের গোড়া!" আড্ডাধারীদেরও অনেকের সেই অবস্থা। ও যেন অহিফেনের নেশা! কাজ ভুলিয়ে দেয়। পথে যেতে যেতে আড্ডার পাশ কাটিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব বলা চলে। বিশেষ যদি দেখা যায় সেখানে 'তাশ' 'দাবা' কিম্বা 'পাশা' চলছে। আড্ডার আকর্ষণ ষোড়শী রূপসী তরুণীর

হাতছানি বা আড়নয়নের ইসারা ইঙ্গিতের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। "ভারত সঙ্গীত সমাজের" আড্ডার কথা বলবার সময় এর একটু আভাষ দিয়েছিলুম যে কর্তারা তাঁদের নিশিবুকে রাত্রি যাপনে যাবার আগেও একবার আড্ডায় এসে বুঝি ছুঁয়ে যেতেন।

এই সাঁতার ক্লাবের আড্ডাও তেমনি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

হেদোর চুকলে একবার বিকেলে সেণ্ট্রাল সুইমিংয়ের টেন্টে উঁকি না মেরে কি ফেরা যায়? এখানে শুধু সাঁতারের কথাই হতনা, কে কোথায় কোন জলখেলায় কী ট্রফী জিতেছে, কতগুলো কাপ, শিল্ড পেয়েছে এ নিয়ে আর কতক্ষণ আসর জমজমাট থাকে? কাজেই শুরু হত গালগল্প, কবিতা, আবৃত্তি, গান। গানও রকমারি হত। পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কোনোটাতেই বাধা ছিল না।

সাঁতার মাষ্টার নিবারণ দের সঙ্গে এই খানেই আলাপ হয়েছিল। তারও বহুকাল আর দেখা সাক্ষাৎ পাইনি। হঠাৎ খবর পেলুম নিবারণের মেয়ের সঙ্গে আমাদের কবি-বন্ধু রমেন মল্লিকের শুভ পরিণয় মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। 'বৌভাত' উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে রমেনদের পাথুরেঘাটার বাড়িতে গেছলুম। নিবারণের মেয়েকে সেই প্রথম দেখলুম। শিল্পী মেয়ে, সুন্দর প্রকৃতি, কবি-পত্নী হবার যোগ্যতা নিয়েই যেন জন্মেছিল। এ বিবাহে আমরা প্রীত হয়েছিলুম।

নিবারণ বেশ খাইয়ে লোক ছিল। যাকে বলে ভোজন-বিলাসী। এই অতিরিক্ত আহারাদির ফলে আমারই মতো বুড়ো বয়সে বেচারা খুবই ভুগছে। কিন্তু, সাঁতারের মাষ্টার হিসেবেও তার সুনাম ছিল যথেষ্ট। তার কাছে অনেক ছেলেই সাঁতার শিখে একেবারে মেছো-কুমীর হয়ে উঠেছে। আর একটা ছেলের নাম কবি "বোকা" বা শ্রীমান প্রফুল্লঘোষ! সাঁতারে একেবারে দিগ্বিজয়ী হয়ে উঠেছিল। এর শিক্ষক সাঁতারু কবি শান্তি পাল। কিন্তু জলের প্রথম পাঠ নিয়েছিল 'গুরুদেব' রামাপদ বসুর কাছে। কবি সত্যেন দত্ত একে সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন এবং নানাপ্রকার সাহায্যদানে তার উপকার করার ফলে শেষপর্যন্ত সেটা বোকার বোকামিতে তার অপকারে দাঁড়িয়ে গেছলো।

যাক এসব জলচরদের কথা। আসল কথা হ'ল এই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের টেন্টের মধ্যে আমাদের গোধূলি বেলার আড্ডা। আগেই বলেছি সেখানে সাহিত্য চর্চা, কাব্যপাঠ সবই চলতো। মাঝে মাঝে 'গার্ডেন-পার্টি' করবার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং প্রতিবছর তার পুনরনুষ্ঠানও হত। এইরকম কত যে 'গার্ডেনপার্টি' আর মৌলো নিয়ে বাদল গোপালের পার্বনে গান বাজনা করতে করতে ভাগীরথী বিহার হয়েছে তার সংখ্যা হয়না। আজ ভাবি—সেদিন কোথায় গেল? বাদল গোপালের দিন নৌকা যাত্রীদের মধ্যে সেই 'বাইচ' খেলা আজ আর হয়না। বাবুদের কাপ্তেনি করবার মতো পয়সা আর নেই। এখনও 'গার্ডেন পার্টি' আর 'ষ্টীমার পার্টি' হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু, সে বারোয়ারী ধরণে। সকলের কাছে কিছু কিছু চাঁদা আদায় করে।

এই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের আড্ডাধারীরা নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের বাগান যোগাড় করে সেখানে একবার খুব ঘুমের গার্ডেন পার্টি লাগিয়েছিলেন। আর টেন্টের মধ্যে ছোটখাটো পার্টিতো প্রায় রোজই হত। কল্পুর দোকানের গরম গরম ডিমের কচুরি, আলুর দম, কোনওদিন বা চাচার হোটেলের চপ্ কাটলেট, অবশ্য শাঁসালো মেম্বার জোটার কাজ না থাকায় ঘাড়ভেঙে এটা হোতো।

চাঁদা তুলে যে বারোয়ারি গার্ডেন পার্টি হ'ত তাতে একেবারে অমিদারী ভোজের "মেহ্না"।

মাংস পোলাও চপ কাটলেট, দই সন্দেশ আর চাটনির ব্যবস্থা থাকতোই। তবে, খাবার ডাক যে কখন পড়বে তার কোনও স্থিরতা ছিল না। সবারই এমন একটা ভাব যেন "হচ্ছে হবে—এতই কীবা?"

সময় কাটাতো গান বাজনা, তাস দাবা কাব্যচর্চা আর স্নানের সময় সাঁতারের প্রতিযোগিতা নিয়ে। বাগানের বৈঠকে আড্ডায় স্ফূর্তির চোটে যাদের কোনও সরঞ্জাম নেই তারাও বেসুরে চেঁচাতো। এমনকি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বয়সে সবার বড় হলেও ছেলেদের সঙ্গে মিশে বেসুরো গান ধরতেন :—

"এ-রি-কুম'···তেরি না ;—
টিকি রাখ !—হোরী না-আ-আ !"

সত্যেন্দ্রনাথ গান লিখতেন খুব ভালো। বিশেষ করে 'স্যাটায়ার' রচনায় তাঁর খুবই দক্ষতা ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কেউ পত্র পত্রিকায় কিছু অমর্যাদা করেছে দেখলে তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠতেন। তাঁর ছন্দোবাঁধা লেখনী তৎক্ষণাৎ ক্ষুরধার অসির মত উদ্যত হয়ে উঠতো সেই বেয়াদপের প্রতিবাদে। দু'একটি নমুনা তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর "কবিরত্ন" এবং "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি' দু'জনেই একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অসম্মান জনক কিছু কটূক্তি করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের তা' দৃষ্টিগোচর হবামাত্র তাঁর লেখনী চকল হয়ে উঠলো। তিনি "নবকুমার কবিরত্ন" এই ছদ্মনামে উপরোক্ত দুই রবীন্দ্র বিদূষণকারীকে আক্রমণ ক'রে লিখেছিলেন :—

"বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ"

(যাদবেশ্বর কবিরত্নের উদ্দেশে)

কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত !
বাংলা ভাষার জ্ঞান তুমি বোঝা তো ছাই ঘণ্টা।
মিথ্যে কেন মাথা বকাও, সরম কর মনটা !
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ,
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার তাই করোগাল মন্দ।

• • •

সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস সারস কিংবা বক।
ভাব সাধনায় ধার ধারোনা, ঠাট্টা জানো বুঝ হে !
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছো গ্রীবা গৃধ্রহে !"

• • •

(সাহিত্য সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির উদ্দেশে, সমাজপতি আকৃতিতে বিরাট পুরুষ ছিলেন)

"কাগজের হাতী"

বা

নব্য দিঙ্‌নাগ প্রশস্তি

"দূর থেকে দেখে দিগ্‌গজ বলে ভুল করেছিনু প্রাণ ভাবে,
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি ? নড়নড়ে এযে একেবারে।

পথ ছুটে চলে, প্রতিপদে টলে, ঠাচাছি-চেরাই ঘরে,
ঘোড়া ভড়কায় দেখে আচমকা-ছেলে ভয়পায় অন্তরে।
আগে আগে চলে মযূরপঙ্খী, কাদাদের হাতী ধায় পিছে,
প্রহ্লাদ আঁকা শুঁড়ের বহর-কিন্তু সে ফুরো, সব মিছে।"

• • •

এসব কবিতা প'ড়ে সাহিত্য সমাজের একদল লোকেরা সত্যেন্দ্রনাথ ওরফে 'নবকুমার কবিরত্ন'কে প্রচণ্ড বাহবা দিয়ে তারিফ করেছিলেন। তাঁর এই কারণ সমাজে 'ক্ষত্রিয় মুখোস' পরে টিকি গৈতে নেওয়ার বিরুদ্ধে এই টিকি মহল গানটি "এ-রি-মুয়! তেরিনা, টিকে রাখো,—দেরী না-আ-আ!" খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেদিন সাঁতারুদের আড্ডার সেই উত্থান সম্মেলনে সত্যেন দত্তর "হলন্তিকা" আর দ্বিজেন্দ্র লালের "হাসির গান" গুলিই সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় হৈ চৈ করেন না। ঠাণ্ডা মানুষ, শান্ত মেজাজ। রান্নার দিকটা তিনিই দেখেছিলেন। সুগন্ধি চালের ঘী ভাত, ডাল কিছু ভাজাভুজি আর মাংসের কারি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সকলে পেটভরে খেয়ে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত বাগান পার্টি থেকে যে যার গৃহাভিমুখে রওনা হলেন।

এই সাঁতারুদের আড্ডার ভিত্তিস্থাপন যিনি করেছিলেন এবং যাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে সেই ক্ষুদ্র বীজ আজ মহামহীরুহ হয়ে উঠেছে তাঁর এই কীর্তির জয়ধ্বজা ঊর্ধ্বগগনে আজ অনুকূল বায়ুভরে আন্দোলিত হচ্ছে এ দেখবার জন্য শ্রীভগবানের কৃপায় আমার সেই 'প্রেসিডেন্সী কার্যালী' 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট' ও 'সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের' জনক বন্ধুবর রামাপদ বসু আজও এই ৮২ বৎসর বয়সেও বেশ সুস্থ ও সক্ষম আছেন। সাঁতারুদের মধ্যে এক অন্তর্হিত নিবারণ ছাড়া আর কেউ বেঁচে আছেন কি না জানি না।

রামাপদ আজও সাঁতার কাটছেন, কিন্তু, কোনও পুকুরে নয়। সংস্কৃত সাহিত্য সাগরে তিনি পরমানন্দে সন্তরণ করছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান দান পেয়েছি। দু'হাজার বছর আগেকার ভারতীয় মহাকবি ভাসের তিনখানি অমূল্য নাটক "প্রতিমা" "স্বপ্ন-বাসবদত্তা" আর "মধ্যম ব্যায়োগ" তিনি সচ্ছন্দ বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। তারপর পেয়েছি আমরা তাঁর কাছে এই পরিণত বয়সে অনুদিত অমরুকের অমৃত সমান 'অমরু শতকে'র অনুপম কাব্যানুবাদ। দুএকটি নমুনা না-তুলে দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করতে পারছি না।

"শোনো গো দেখা নিকটে এসো, বিজনে কথা তোমার সনে,—
বলিল মোরে। শুনিতে তাই বসিনু পাশে সরল মনে।
একটা কিছু কহিল কানে, পাইনু মুখের সুরভি ঘ্রাণ—
কী কব সখী! খোঁপাটা ধরে অধর সুধা করিল পান।—(কিমপি কথয়ামি: শ্লো: ৪৯)

"দুটি কদলীর তরু, দুটি পীন উরু-ভঙ্গিমায়
পূর্ণ কুম্ভ দুটি লাবণ্য মাধুরী ভরা স্তনে।
অযত্ন-প্রসার ওই হরিনাক্ষী দেহী রচনায়
হইয়াছে মনোভব অভিষেক উৎসব কল্পনে।"

—(মনোভব অভিষেকোৎসব : শ্লোক ৯৪)

(ক্রমশঃ)

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

[আট]

মন্দিরের গোপুরমের সামনে এসে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। অন্ধ্রযাত্রা থেকে আর একটি পথ সোজা উঠে এসেছে। তার দুধারে নানা পণ্য সম্ভার। এইটেই যে মন্দিরে আসবার প্রধান পথ তাতে আমাদের সন্দেহ রইলনা। প্রশ্ন করে জানা গেল যে সামনের এই পথ ধরে এগোলে আমরা পাহাড়ের নিচে নামবার সিঁড়ি পাব। যাত্রীদের যাতায়াত এই পথেই অব্যাহত, তাই দোকান পাট বসে এই পথের ধারেই।

দক্ষিণভারতের গোপুরম বলতে চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠে, এ সে রকমের গোপুরম নয়। এ একটি ফটক। সিংহহীন সিংহদ্বার, অপ্রশস্ত দরজা। তারই নিচে দিয়ে আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলুম।

একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের মধ্যে এই নৃসিংহ দেবের মন্দির। সামনে সোনার তালগাছ, পিছনে নাট মন্দির। চারিদিকের প্রাকারের গায়ে সুদৃশ্য বারান্দা। ইটের নয়, মার্বল বা কষ্টি পাথরেরও নয়, এ গ্র্যানাইট পাথর। মন্দিরের চত্বরও এই পাথরে বাঁধানো।

যাত্রীর ভিড় নেই মন্দিরে। দু একজন মাথা মুড়িয়ে স্নান করে এসেছে, ভিজে কাপড়ে পুজো করছে তালগাছের সামনে। প্রদীপ জ্বেলেছে, ধূপধুনো জ্বলছে, মন্ত্র পড়াচ্ছে ব্রাহ্মণ। দু'একজনের পুজো হয়ে গেছে। তারা পাথরের চত্বরে বসে ভোগের প্রসাদ খাচ্ছে। সকলের হাতেই নারকেল আছে। পরে দেখেছিলুম যে দেবতার সামনে নারকেল কাটিয়ে নিবেদন করা হয়। এরা সেই নারকেল কুরে কুরে খায় বাইরে বসে।

মামা মামীকে আমরা দেখতে পেলুমনা। তারা নিশ্চয়ই এখন মন্দিরের ভিতরে ব্যস্ত আছেন। স্বাতি বলল, এস গোপালদা, বাইরে থেকে মন্দিরটা আগে আমরা ভাল করে দেখে নেই।

আমি বললুম : ছবিও তো নেবে!

স্বাতি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তারপরেই বলে উঠল : কি সুন্দর মন্দিরের চূড়ো দেখেছ গোপালদা?

আমিও মুখ তুলে তাকালুম। অপরূপ কারুকার্য মণ্ডিত মন্দিরের শিখর। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে। মন্দিরের প্রাঙ্গনে এখনও রোদ পড়েনি। পাথর শীতল আছে। আমাদের পায়ের চটি মন্দিরের সামনের একটা দোকানে খুলে রেখে আমরা ভিতরে ঢুকেছি, তাই রোদের

অভাবটা অনুভব করতে পারছি। স্বাতি আমার উত্তরের অপেক্ষা করলনা, বলল : পাহাড়ের উপর থেকে এই মন্দিরের ছবি নিতে হবে।

সত্যিই তাই। তিন দিকেই উঁচু পাহাড়, তারই কোলে এই মন্দির। প্রাঙ্গন খুব বিস্তৃত হলে দূর থেকে এই শিখরের ছবি নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু দূরে যাবার উপায় নেই। প্রাকারের গা ঘেঁষে দাঁড়াবারও উপায় নেই। উঁচু বারান্দা আছে। এই বারান্দার উপর দাঁড়ালে মন্দিরের শিখরটি সম্পূর্ণ দেখা যাবেনা। তাই বললুম : সেই চেষ্টাই করতে হবে।

ডানদিকের দেওয়ালে একটি দরজা ছিল। স্বাতি সেই দিকে এগিয়ে গেল। আমি বললুম : দাঁড়াও, আমি আগে দেখে নেই বাইরেটা।

স্বাতি হাসল, ভারি কৌতুকের হাসি। তারপরে আমার সঙ্গেই বাইরে বেরুল।

একটা সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে আমরা উপরে উঠে গেলুম। তারপরে পাহাড়ের একটা ধারে চলে এলুম। অনেক আবর্জনা ছিল এইখানে, ভাঙা কাচের টুকরো আছে ছড়িয়ে। স্বাতির খুশি উপচে উঠল, বলল : এখান থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে গোপালদা।

বলেই এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলুম তাকে, বললুম : পায়ে চটি নেই, নিচের দিকে চোখ রেখে চল।

কিন্তু স্বাতি শুনলনা, পা টিপে এগিয়ে গেল সামনে। আর মনের আনন্দে ছবি নিল দু-তিনখানা।

নিচে নামবার সময় বলল : বুঝলে গোপালদা, দূর থেকে কারুকার্যের ছবি ভাল উঠবেনা, কাছে থেকে নিতে হবে।

আমি বললুম : নিচেও মন্দিরের গায়ে অনেক কারুকার্য আছে।

কিন্তু নিচে যে এখনও সূর্যের আলো পৌঁছয়নি।

তার আর দেরি নেই। আর না পৌঁছলেও ক্ষতি নেই।

কেন?

আমি বললুম : এক্সপোজার একটু বেশি লাগবে। আধখানা রোদ আর বাকি আধখানা ছায়ার চেয়ে সে ঢের ভাল।

সহসা মায়ীর কথা শুনতে পেলুম। মায়ী বললেন : ওরা তোমরা এলে কোনখান দিয়ে?

স্বাতি বলে উঠল : ছবি তুলতে পাহাড়ে উঠেছিলাম।

পাহাড়ে! পাহাড়ে ওঠার পথ আছে নাকি! বলে ধামের আড়াল থেকে মায়ীও বেরিয়ে এলেন।

আমি বললুম : পথ না থাকলেও উঠতে হত। ছবি স্বাতি নেবেই। আপনাদের পুজো হয়েছে তো?

পুজো যে হয়েছে তা বুঝতেই পারছিলুম। মায়ী পুজার নির্মাল্য ও প্রসাদ দিচ্ছিলেন স্বাতিকে, তার পর আমাকে ডাকলেন। আমিও নির্মাল্য ও প্রসাদ নিলুম।

মায়ী বললেন : ঠাকুর দেখেছ তোমরা?

আমি বললুম : না, মন্দিরের ভিতরে এখনও যাইনি।

সমান ভক্তিমান দেখছি।

বলে মায়ী স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি লজ্জা পেলনা একটুও, বলল : আগে বাইরেটা দেখেছি, তারপর ভেতরটা দেখব।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বলে মন্দিরের দেওয়ালের কারুকার্য দেখতে লাগল ঘুরে ঘুরে।

মামা আমাকে বললেন : বুঝলে গোপাল, দেবতার মূর্তি এখানে দেখা গেলেও চন্দন আর কাপড়ে সব ঢাকা আছে।

আমি বললুম : আমাকে একটু সময় দিন, আমি দেখে এসে আপনাকে বলছি।

তুমি কী বলবে! কিছু দেখতে পেলে তো আমিই বুঝতে পারতুম?

মামী বললেন : তোমার দেখা আমার জানা আছে। সব জিনিসটা যদি নজরে পড়ত—

বলে থেমে গেলেন। মামা কোন কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। তার আগে স্বাতি এসে বলল : এস গোপালদা, এই সময়ে আমরা ঠাকুর দেখে আসি। ভাল করে রোদ উঠলে মন্দিরের গায়ে ছবি তুলব।

মামা মামীর বিবাদ বাধবার আগেই স্বাতির সঙ্গে আমি পালিয়ে গেলুম।

মন্দিরে প্রবেশের পথ সামনের দিক থেকে। একটি মাত্র দরজা। আমরা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলুম।

ব্রাহ্মণেরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যাবার উপায় নেই, দূর থেকেই দর্শনের রীতি। যারা পুজো দেবেন, তাদের পুজার উপকরণ ব্রাহ্মণেরা হাতে নিয়ে উৎসর্গ করে, ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তার জন্যে অনুমতি লাগে, পয়সা দিয়ে বোধহয় টিকিট কিনতে হয়।

আমি দেবতার মূর্তি দেখবার চেষ্টা করলুম মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুমনা। এদিকে সেদিকে চেয়ে একজন ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলুম নিকটে। তিনি কোন কাজের জন্যই এইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথাটা আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মাছোড়বান্দার মতো আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম : এ কোন্ দেবতা?

আঙুল দিয়ে মূর্তিটিও দেখিয়েছিলুম।

তিনি বললেন : শ্রীবরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী।

এই উত্তরে আমার প্রশ্ন আরও জটিল হল। বরাহ লক্ষ্মী ও নরসিংহ এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া গেল। দেবতা তো তিনজন দেখছিনে, দেখছি একটি। স্বাতি বলল : বুঝতে পারলে কিছু?

এ কথার উত্তর দেবার আগেই ব্রাহ্মণ আবার বললেন : নিজস্ব রূপ—

তার পরের কথাগুলি বুঝতেই পারলুমনা। শুধু আর একটি শব্দ পরিচিত মনে হল। সেটি হল অক্ষয় তৃতীয়া।

স্বাতি সহাস্যে বলল : সব বুঝে ফেলেছ তো!

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : বুঝেছি। দেবতার নিজস্ব রূপ দেখা যাবে অক্ষয় তৃতীয়ায়।

পরম অবজ্ঞায় স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : তুমি ছবি তুলতে চাও। আমি সব খবর জেনে তোমাদের জানাব।

স্বাতি বলল : না না, আমি দেখতে চাই, তুমি কী করে সব বোঝ।

আমি বললুম : ভাষাটা বড় নয়, বড় হল মন। কোন কথা না বলেও মনের কথা আদান প্রদান করা যায়।

ব্রাহ্মণ আমাদের দিকে চেয়ে মাথা দোলালেন।

আমি বললুম : দেখলে তো!

স্বামি হেসে বলল : খুব ভাল। তোমরা তাহলে তাদের আহার-প্রহার কর। আমিও নিজের কাজ করি।

বলে বেরিয়ে গেল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে।

আমাকে ব্রাহ্মণ বাহিরে ডেকে আনলেন। একটি ঘরের ভিতর থেকে একখানা ইংরেজী পুস্তিকা বার করে আমার হাতে দিলেন। সীমাচলমের ক্ষেত্র মাহাত্ম, দাম আট আনা। আমি খুশী হলুম এই বইখানা হাতে পেতে পেয়ে, তখনি আট আনা পয়সা তাঁর হাতে দিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের ভাষাতে বোধহয় বললেন : এই বই-এই সব কথা আছে।

বলে নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি সেই বইএর পাতা উল্টে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলুম। প্রথম পাতাতেই বরাহ-লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামীর নিজস্ব রূপ আছে। বছরের একদিন তাঁর এই দর্শন। সে অক্ষয় তৃতীয়ায়। সেদিন দেবতার গা থেকে ঢাকা খোলা হয়। ঘুচে ফেলা হয় চন্দনের প্রলেপ। সিংহাসনের উপর সেদিন তাঁর নিরাবরণ রূপ, বক্রভাবে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বরাহ অবতার, চতুর্ভুজ নন। তাঁর মাত্র দুটি হাত মানুষের মতো আর মুখ বরাহের। লক্ষ্মী নেই তাঁর পাশে। বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারও নেই। ভারি আশ্চর্য হলুম এই নৃসিংহদেবের সিংহাসনে বরাহমূর্তি দেখে।

তাড়াতাড়ি আরও কয়েকখানা পাতা পড়ে দেখলুম, তাতে সমস্যা কিছুটা সরল হল। স্কন্দ পুরাণের তেলেগু অনুবাদ থেকে বত্রিশ অধ্যায়ের সারাংশ মুদ্রিত আছে। বেদব্যাসকৃত এই পুরাণ জৈমিনি মহর্ষির কথিত বলা হয়েছে। নৃসিংহ অবতারের ভয়ংকর রূপ এখানে নয়। সে রূপের পূজা অন্ধ্রেরই অহোবলম তীর্থে। এখানে যে রূপের পূজা সেই রূপ প্রহ্লাদ দেখেছিলেন তাঁর রক্ষাকর্তায়। বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ পুরীর দ্বারী জয় বিজয়ের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল সনকাদি ঋষির শাপে। মিত্রভাবে সাত জন্ম ও শত্রুভাবে তিনজন্ম হবে জেনে তারা শত্রুভাবেই জন্মাতে চেয়েছিল। প্রথম জন্মে তারা কশ্যপ ও দিতির পুত্ররূপে দৈত্য হয়ে জন্মাল হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন বরাহরূপে, আর নৃসিংহরূপে বধ করলেন হিরণ্যকশিপুকে। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণুভক্ত। রাজা তাই নানাভাবে প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, আর হরিকে স্মরণ করে বারেবারেই তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। নৃসিংহ অবতারের পূর্বেই প্রহ্লাদ বিষ্ণুর যে রূপ দেখেছিলেন। এখানে তিনি সেই মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়ে যে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন প্রহ্লাদের সামনে, সেই ভয়ংকর নৃসিংহ মূর্তির পূজা হয় অহোবলমে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় কেন নিজস্ব রূপের দর্শন পাওয়া যায়; সে কথাও আছে এই পুস্তিকায়। কলির আগমনে অধর্মে দেশ ভরে গিয়েছিল। তখন প্রহ্লাদ নেই, রোগে দুঃখে ভূত হয়ে গিয়েছিল প্রহ্লাদের সিংহগিরির পুরী, অরণ্যে আবৃত হয়ে গিয়েছিল সব কিছু, বল্মীক স্তূপে ঢেকে গিয়েছিল দেবতার মন্দির। নূতন সত্য যুগে চন্দ্রবংশের রাজা পুরূরবা আকাশ পথে বেড়াতে এলেন এইখানে, তাঁর সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী। এই স্থান তাঁদের ভাল লাগল। তাঁরাই আবার দেবতাকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁকে। পঞ্চতীর্থের জলে তাঁর অভিষেক হল, চন্দনে অনুলেপিত হল দেহ। সেইদিনের স্মরণে আজও

দেবতার চন্দনযাত্রা হয় প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায়। ভক্তরা সেদিন দলে দলে আসেন এই তীর্থে। নৃসিংহ-দেবের নিরাবরণ রূপ দেখলে মোক্ষ অনিবার্য। এই বিশ্বাস সকলের আজও আছে।

মুখ তুলে স্বাতিকে হঠাৎ এইদিকে আসতে দেখে পুস্তিকাটি আমি পকেটের মধ্যে পুরে ফেললুম। নির্বিকার ভাবে এগিয়ে গেলুম তার দিকে।

স্বাতি আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল : তোমাদের ভাব বিনিময় শেষ হল ?

আমি বললুম : তোমার কাজ কতদূর এগোল ?

স্বাতি বলল : দেখবে এস।

ওপর থেকে মন্দিরের প্রাঙ্গনে নামবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মামা আর মামীমা কোথায় ?

স্বাতি বলল : মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাহাড়ে উঠেছেন।

বারণ করলে না কেন ?

বারণ করলে তো বাবা শুনবেন না, কষ্ট হবে বললেও শেষ পর্যন্ত উঠবেন।

তাহলে বারণ না করাই ভাল।

তাইতেই কিছু বলিনি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে ঐ দিকে গেছেন, এবারে নামবার সময় হয়েছে।

স্বাতি আমাকে এই মন্দির প্রাঙ্গণেরই এককোণে একটি পাথরের রথ দেখাল, তার দুটি ঘোড়া, বলল : রথে চাপতে হলে ঐ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে রথের উপরে নামতে হবে।

বললুম : বুঝতে পেরেছি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : উঠবে না রথে ?

স্বাতি বলল : লক্ষীটি, একবার ওঠোনা। কেমন দেখায় দেখব।

আমি হাসলুম তার কথার ধরণে, বললুম : তোমার ক্যামেরাটা তাহলে আমার হাতে দাও।

স্বাতি বলল : তারি সুন্দর হত ছবিটা। মনে হত শুধু রথ নয়, সারথিও আছে। জীবন্ত সারথি।

মন্দির স্থাপত্যও আমি দেখে নিলুম। মূল মন্দিরকে এরা মুখমণ্ডপ বলে। আর তার সামনে ষোলটি স্তম্ভের নাট্যমণ্ডপ। মন্দির গাত্রে নানারকমের কারুকার্য আছে ফুল লতাপাতা মূর্তি ও বিষ্ণুপুরাণের নানা দৃশ্য। মুসলমান আক্রমণে নাকি অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে, আছেও অনেক কিছু। প্রবাদ আছে যে দেবতা এক ঝাঁক মৌমাছি সৃষ্টি করেছিলেন মন্দির রক্ষার জন্য। সেই মৌমাছির দল মুসলমানদের তাড়া করে অনেক দূরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল।

এইবারে আমি মনোযোগ দিয়ে মন্দিরের কারুকার্য দেখতে লাগলুম। ভিত্তির কিছু উপর থেকেই এই কারুকার্য শুরু হয়েছে। পাথরের ফলকের যতটুকু বাহিরে বেরিয়ে আছে, তার উপরে শুধু লতাপাতা আঁকা। স্তম্ভগুলির উপরে লতাপাতা আছে, নানারকমের মূর্তিও আছে। মাঝখানে বিরাট একটা কুলুঙ্গির মতো জায়গায় মস্ত বড় মূর্তি বিষ্ণুর অথবা নৃসিংহের, হিরণ্যকশিপুকে কোলের উপরে রেখে নখ দিয়ে তার উদর বিদীর্ণ করছেন। নানা ভঙ্গিতে নারী মূর্তিও আছে স্তম্ভের গায়ে। প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে বা দেওয়ালের গায়ে বারান্দার উপরে উঠে এই ছবিগুলি সহজে তোলা যায়। কিন্তু সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের শিখর সম্পূর্ণ দেখা যায় না। মনে হয় যে একটুখানি উঁচু হলেই শিখরটা দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু যতটুকু দেখা যায় তার রূপের অন্ত নেই। অপরূপ একটা নক্সা মন্দিরটি আগাগোড়া বেড় দিয়ে আছে। তার উপরের সারিতে

স্থানে স্থানে নানারকমের মূর্তি। কোথাও সিংহের মুখ, কোথাও নরনারী। ঠিক তারই পিছন দিয়ে চলেছে একসারি মানুষ। এরা সমগ্র মন্দিরটি বেষ্টন করে আছে। এর উপরে দু'তিন সারি ভিন্ন ধরনের নক্সা, তারপরে এক সারি ক্ষুদ্র জানোয়ার। এর উপরে যেসব মূর্তি কোদিত তার তুলনা নেই। প্রথম সারিতে জ্যামিতিক নক্সার ভিতরে ফুল লতাপাতা সিংহের মুখ ও নানা ভঙ্গির মূর্তি। তার পরের সারিতে ছবারে দুটি ফলক, পাশাপাশি অনেকগুলি স্তম্ভ উপরের সারিকে মাথায় করে রেখেছে। এই স্তম্ভগুলির গায়েও কত রকমের নক্সা ও মূর্তি। মাঝখানে একটা মস্ত ঝুলুঙ্গির ভিতরে কয়েকটি মূর্তি ভাল দেখা যায় না। শেষ নাগের ছত্রতলে বিষ্ণু বলেই মনে হয়, আর কে কে আছেন তা বোঝা যায় না। এর উপরেও এক সারি কারুকার্য আছে। তারপরে অলঙ্কারময় শিখর। তিন-চার সারি ফলক একেবারে চূড়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু এই সুন্দর শিখরটি দেখতে হলে পাহাড়ের গায়ে উঠতেই হবে। যেখান থেকে পিছনের পাহাড়েও দেখা যাবে, তাল আর নারিকেল গাছ। অন্য মন্দিরের ছোট চূড়াও দেখা যাবে, কিন্তু নিচের কারুকার্য ঢাকা পড়বে সামনের একটি উঁচু দেওয়ালে।

মামা ও মামী যখন আমার কাছে এসে পৌঁছেছিলেন আমি দেখতে পাইনি।

মামা বললেন : মন্দিরের ছবি কি মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছ গোপাল ?

চমকে উঠে বললুম : হাত দিয়ে আঁকতে পারিনে যে।

স্বাতি বলল : আমি তোমার ফটো গ্রাফ দেব।

আমি বললুম : অন্ধ্রের এই প্রথম মন্দির দেখছি, কিন্তু একে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

মামা বললেন : কেন ?

আমি বললুম : শুনেছি এই মন্দির ও প্রাকার নির্মাণ করেছেন কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গাবংশের রাজা প্রথম নরসিংহ প্রায় সাতশো বছর আগে। এই জন্যেই বোধহয় উড়িষ্যার মন্দিরের সঙ্গে এর বেশি সাদৃশ্য।

মামী বললেন : আর কোন ঠাকুর দেবতা নেই ?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : তাহলে এই মন্দিরের বাইরে কল্যাণ মণ্ডপে যেতে হবে।

স্বাতি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেয়াল করিনি। এইবারে এগিয়ে এসে বলল : এই দিকে এস।

এই প্রাঙ্গনের ঠিক বাহিরেই উত্তরদিকে অবস্থিত কল্যাণ মণ্ডপ। এক একদিকে তিনটি করে ছ'সারি স্তম্ভের উপর এই মণ্ডপ, প্রতিটি স্তম্ভই কারুকার্য মণ্ডিত। যে ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিলেন, তিনি ঠিক সময়মতো এসে জুটে গেলেন। ভাঙা হিন্দীতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে চৈত্রের শুক্ল একাদশীতে এখানে দেবতার বিবাহ উৎসব করা হয়। বিষ্ণুর মৎস্য অবতার কূর্ম ধন্বন্তরি ও বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের অনেক মূর্তি তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন : গঙ্গাধারার জল একটু মাথায় ছেটাবেন না ?

এই প্রশ্ন তিনি বোধহয় আগেও করেছিলেন। তাই মামা চটে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই মামী বললেন : চলনা।

মুহূর্তে মামার মুখ বদলে গেল। আমার দিকে চেয়ে বললেন : হতভাগার কাণ্ড দেখলে তো গোপাল।

স্বাতি সোৎসাহে বলে উঠল : এই সুযোগে চলনা গোপালদা, আমরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই।

মামা আঁৎকে উঠেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বললেন : ওঁরা ঠিক সময়মত পৌঁছে যাবে।

স্বামী আপত্তি করবার আগেই স্বাতি তরতর করে এগিয়ে গেল।

মামা আমাকে বললেন : দাঁড়িয়ে দেখছ কি তুমিও যাও।

স্বামী কী ভাবলেন তা বুঝতে পারলুম না।

[নয়]

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা আমাদের চটি পায়ে দিয়ে নিলুম। বললুম : চল এবারে সিধে সড়ক ধরে চলি।

স্বাতি অন্য পথ ধরে বলল : তাহলে আমাদের একটা দ্রষ্টব্য বাকি থেকে যাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : আরও কিছু দেখার আছে নাকি ?

স্বাতি হেসে বলল : একটা কিউরিওর দোকান। আসবার সময় দেখনি পথের ধারে !

আমি স্বীকার করলুম : দেখিনি।

স্বাতির কথা মিথ্যা নয়। বড় রাস্তায় পৌঁছবার আগে পথের বাঁ ধারে এই দোকান। ছিমছাম ছোট দোকানটিতে ক্রেতার ভিড় নেই। চারিদিকের জিনিষপত্র দেখে বুঝতে পারলুম যে এটি এদেশের কুটীর শিল্পের দোকান, হাতে তৈরি নানারকমের পৌখিন ও প্রয়োজনীয় জিনিস সাজানো আছে। ঝুড়ি, শাড়ি আছে, পর্দা, বেড-কভার, টেবল ক্লথ। স্বাতি কয়েকখানা সুতোর শাড়ি দেখল। বলল : মন্দ নয়, তাই না গোপালদা ?

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : তোমাকে বেশ মানাবে।

স্বাতি সরিয়ে দিল শাড়িগুলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করল : এ শাড়ির নাম কী ?

ভেঙ্কটগিরি।

সিংহগিরিতে ভেঙ্কটগিরি শাড়ি ! সে পাহাড় কোথায় ?

মাদ্রাজে যাবার পথে গুডুর জংশন থেকে যে লাইন রেনিগুন্টা গেছে, তারই উপরে ভেঙ্কটগিরি স্টেশন, কালাহস্তী তিরুপতির নাম শুনেছেন ?

বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : না।

শোনেন নি !

ভদ্রলোক খুবই আশ্চর্য হলেন। তারপরে বললেন : দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় তীর্থ হল তিরুপতি, উত্তর ভারতের লোক বলে বাবাজী। আপনারা টুরিস্ট ?

বললুম : হ্যাঁ।

এখন কি দক্ষিণে যাচ্ছেন ?

এ কথাও মেনে নিলুম।

তবে তিরুপতি না দেখে ফিরবেন না। একটা মন্দির বললে কী বোঝায়, তিরুপতি না দেখলে তা বোঝা যায় না। তিরুপতি স্টেশন থেকে মিনিটে মিনিটে বাস ছাড়ছে, হাজার হাজার যাত্রী সারাক্ষণ

উঠছে তিকমালাই পাহাড়ে, ভিরুটেশ্বরের দর্শনের জন্ত যাত্রীদের যে কিউ হয়, তার তুলনা এদেশে নেই। নিশ্চয়ই যাবেন।

তারপর স্বাতিকে বলল: আমাদের বড় দোকান আছে ওয়েলটেয়ারে, টার্মার বৌ ষ্ট্রীর কাছে। সেখানে আরও অনেক রকম রঙ ও ডিজাইন পাবেন। এইখানা দেব?

স্বাতি বলল: না।

আমি বললুম: নিয়ে নেওয়া যাক একখানা।

না।

বলে স্বাতি দোকানের বাহিরে বেরিয়ে এল।

আমিও বেরিয়ে এসে বললুম: আমার কথাতেই বোধহয় তুমি নিলে না।

স্বাতি বলল: এখানে তো শাড়ি কিনতে আসিনি, এসেছি চোখ মেলে সব কিছু দেখতে।

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এগিয়ে এল। স্বাতি তাকে জিজ্ঞাসা করল পায়ে হেঁটে নামবার সিঁড়ির কথা। রাস্তার উল্টোদিকেই সেই পথ। বড় গাছে ঢাকা ছায়াচ্ছন্ন শীতল পথ।

অন্ত দিকে বড় বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। হোটেল বা ধর্মশালা। প্রশস্ত লাইন মাঝখানে। এসব একেবারে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে বলে মনে হল।

ড্রাইভারকে স্বাতি বলল: আমরা পায়ে হেঁটে নামব। বাবা-মা আসছেন। তাঁদের নিয়ে নিচে আমাদের জন্ত অপেক্ষা কোরো।

বলে রাস্তা পেরিয়ে তরতর করে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

একটু খানি এগিয়ে যেতেই সেই হাজার সিঁড়ির প্রথম ধাপটি দেখতে পেলুম। নিচে থেকে উঠবার সময় এইটিই শেষ ধাপ। পাহাড়ের সিঁড়ি বলতে যা বোঝায়, এ সিঁড়ি ঠিক তেমন নয়। এ যেন কোন বড় বাড়ির সুন্দর বাঁধানো সিঁড়ি। দুধারে রেলিঙ দেওয়া। এমন চওড়া যে একসঙ্গে অনেক যাত্রী ওঠা নামা করতে পারে। স্বাতি বলল: এ সিঁড়ি কে তৈরি করে দিয়েছেন জানো?

বললুম: তুমি বল।

স্বাতি বলল: অহল্যাবাঈ।

আমি তাকে পরীক্ষা করবার জন্ত বললুম: অহল্যাবাঈ কে?

রাণী ছিলেন—

বলে সে ভাবতে লাগল।

বললুম: ইন্দোরের। বেশি দিনের পুরনো কথা নয়, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সত্তর বছর বয়সে। ভারতে এমন কোন তীর্থ নেই যেখানে গেলে তাঁর কথা মনে পড়ে না।

আমরা তখন নিচে নামছিলুম। নামতে নামতেই কথা হচ্ছিল। স্বাতি বলল: রাজার নাম হলনা, হল রাণীর নাম, এ কেমন কথা?

আমি বললুম: অহল্যাবাঈ-এর স্বামী তো রাজা ছিলেন না।

তবে তিনি রাণী হলেন কী করে?

তিনি রাজার রাণী ছিলেন না। ছিলেন রাজমাতা। তারপরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন বছর তিরিশেক। ইন্দোর রাজ্যের হোলকার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মলহর রাও। আমলরাও সিন্ধিয়ার

কন্যা অহল্যাবাঈকে তিনি ঘরে এনেছিলেন পুত্রবধূরূপে। কিন্তু সেই পুত্র খণ্ডেরাও-এর মৃত্যু হয় কুম্ভের দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে। পিতা মলহর রাও তখনও জীবিত। তাঁর মৃত্যুর পরে অহল্যাবাঈ-এর পুত্র মালেরাও রাজা হয়েছিলেন এক বছরের জন্য।

মাত্র এক বছর।

বললুম : ছোটবেলায় তিনি লঘুচিত্ত ও কিছু নির্বোধ ছিলেন। রাজা হবার পরে তাঁর মধ্যে পাগলামি দেখা দেয়। তারপর এক ব্যক্তিকে বিনাদোষে বধ করে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যান। তাঁর মৃত্যু হয় এর কিছু পরেই। অহল্যাবাঈ এর পর থেকে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিজের হাতে রাজকার্য পরিচালনা করেন।

স্বাতি বলল : ভদ্রমহিলার দেখছি খুবই দুঃখের জীবন।

আমি বললুম : মুক্তাবাঈ নামে তাঁর এক মেয়ে ছিল, কিন্তু তার কথা আমি জানিনে।

স্বাতি বলল : নিশ্চয়ই তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন। তা না হলে ধর্মের জন্য এমন অকাতরে ব্যয় করতেন না।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলুমনা, সহসা কোন ব্যতিক্রমের কথা মনে হলনা। বললুম : অহল্যাবাঈ-এর সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল কথা লিখেছেন তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক সার জন ম্যালকল্‌ম। একদিকে রাজকার্যে তাঁর অপরিসীম পরিশ্রম, অন্যদিকে তার অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রা ; একদিকে কঠোর দণ্ডবিধান, অন্যদিকে অকাতরে দান তাঁর অতুলনীয় চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। ম্যালকল্‌মের মতে অহল্যাবাঈ ছিলেন সুশাসকের আদর্শ। দেশে তিনি অনেক রাজপথ ও অগনিত মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করেছিলেন, উত্তরে কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর, পূর্বে পুরী থেকে পশ্চিমে দ্বারকা, কাশী গয়া হরিদ্বার সকল তীর্থেই ছিল তাঁর সমান দান। নর্মদা তীরে তাঁর প্রিয় স্থান মহেশ্বরের মতো সারা ভারতকে তিনি ভালবেসে ছিলেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ সব তীর্থেও কি তিনি এসেছিলেন ?

বললুম : জানিনে।

মনে হয় এসেছিলেন, তা নাহলে কোন্ তীর্থে কী প্রয়োজন তা জানলেন কী করে ?

হয়তো তাই।

হয়তো কেন ! কত বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন বলতে পার ?

বললুম, ত্রিশ হবার দু'এক বছর আগেই। এর পরেও তাঁর শ্বশুর রাজত্ব করেছেন দশ বারো বছর।

স্বাতি বলল : এই সময়েই তিনি বোধহয় সমস্ত তীর্থ ঘুরে এসেছেন।

আমি বললুম : জানিনে, তা নিয়ে আলোচনা করবনা।

ঠিক এই সময়েই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল। একটি খোঁড়া ছেলে তার বুকের উপর ভর করে তরতর করে উঠে এসে স্বাতির সামনে হাত বাড়াল। অদ্ভুত তার সিঁড়ি ওঠার দক্ষতা। তারদিকে না তাকিয়ে উপায় নেই। সিঁড়ির ধাপে ধাপে যে অনেক ভিখিরি বসে আছে, আর আমাদের দিকে হাত বাড়িয়েছে অনেক আশা নিয়ে, এতক্ষণ আমরা তা দেখতে পাইনি। এখানে আর তাদের এড়িয়ে যেতে পারা গেল না। সেই ছেলেটিই পয়সা না নিয়ে পথ ছাড়লনা। স্বাতি তার ব্যাগ খুলে আরও দু'একজনকে পয়সা দিল।

পাহাড় থেকে নামার সময় আর এক রকমের কষ্ট। বুকচাপ পড়েনা, পায়ের উপরে জোর পড়ে।

হাঁপাতে হয়না, টনটন করে পা। একজনও চিবিটি নেই, এক জায়গায় এসে স্বাতি দাঁড়াল, বলল : এইখান থেকে একবার নিচের দৃশ্য দেখ।

সত্যিই এই দৃশ্য উপভোগ্য। নিচের ছোট শহরটি দেখা যাচ্ছে ছবির মতো, আবার অরণ্যময় পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির দুধারে আছে নানা জাতির গাছ, ফলের গাছও আছে। এইসব গাছপালা যে এক সময় লাগানো হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকেনা। সিঁড়ির ধাপগুলি ছায়া শীতল, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নেও যাত্রীদের কষ্ট হয়না। ঝির ঝিরে হাওয়ায় আমাদের সারা শরীর শীতল হয়ে গেল।

স্বাতি আমাকে নীরব দেখে জিজ্ঞাসা করল : ভাল লাগছেনা গোপালদা ?

বললুম : এত ভাল লাগছে যে ইচ্ছে করছে, এইখানেই চিরকাল বসে থাকি।

এই মুহূর্তটিকে চিরন্তন করবার ইচ্ছা, এইতো ! তুমি বুঝি ব্রাউনিঙের ভক্ত ?

পরিষ্কার একটা ধাপের উপরে আমি বসে পড়েছিলুম, বললুম : এমন পরিবেশে সবাই ব্রাউনিঙ হয়।

ঠিক বলেছ।

বলে স্বাতিও আমার পাশে বসে পড়ল।

আমি নীরবে ছিলুম অনেকক্ষণ। তাই দেখে স্বাতি বলল : কী ভাবছ বলতো ?

বললুম-উর্বশীর কথা।

ঠাট্টা করছ !

ঠাট্টা নয়, সত্যি কথাই বলেছি। একদা পুরুরবার সঙ্গে উর্বশী এসেছিলেন এই পাহাড়ে। পুরুরবা চন্দ্রবংশের রাজা, আর নন্দনবাসিনী উর্বশী দেবরাজ ইন্দ্রের সভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা। দুজনের মিলন হল কেমন করে তাই ভাবছি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল : বল কেমন করে।

বললুম : উর্বশী পুরুরবার কাহিনী ঋগ্‌বেদে আছে প্রচ্ছন্ন ভাবে, বিশদভাবে আছে শতপথ ব্রাহ্মণে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী কাব্যে এই কাহিনী আমরা আর সুন্দর ভাবে পাই। কেশী দৈত্য হরণ করছে উর্বশীকে, পুরুরবা তাঁকে রক্ষা করলেন। দুজনে দুজনার দিকে তাকালেন গভীর ভাবে মন তাদের দুলে উঠল।

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপর উর্বশীর তালভঙ্গ হল দেবসভায়। অভিনয় কালে ভুলক্রমে পুরুরবার নাম উচ্চারণ করে ফেললেন। ক্রুদ্ধ হলেন দেবরাজ, বললেন : স্বর্গে তোমার স্থান নেই, তুমি মর্ত্যবাসিনী হও। মর্ত্যে এসে শাপগ্রস্তা উর্বশীর মিলন হল পুরুরবার সঙ্গে।

স্বাতি বলল : শাপ উর্বশীর বর হল বল !

বললুম : সে কথা উর্বশী বলতে পারে।

স্বাতি চমকে আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল, আমি হেসে বললুম : মেয়েদের মনের কথা কি পুরুষ কোনদিন বোঝে।

স্বাতি বলল : এতো দার্শনিকের কথা।

এ বই পড়া দর্শন, এ ঠেকে শেখা দর্শন।

সকৌতুকে স্বাতি : তোমারও কি অভিজ্ঞতার কথা ?

অভিজ্ঞতা হতে কি দেরি হবে ভাব ?

স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল : বসে থাকলে নিশ্চয়ই দেরি হবে।

তারপর আবার নামতে লাগল সযত্নসন্তর্পণে। আমিও উঠে আবার নামতে লাগলুম।

বেশীক্ষণ লাগলনা, খুব সামান্য সময়েই আমরা সমতলের উপরে নেমে এলুম। বাঁ হাতের সিঙ্কনে বাজারের একধার থেকে এই সিঁড়ি উঠেছে। ধার্মিক যাত্রীরা এখনও পায়ে হেঁটে এই মন্দিরে ওঠেন। অসঙ্গলতার জন্যও ওঠেন অনেকে। আমরা শপ করে এই সিঁড়ি দিয়ে নামলুম, তারপর সদর রাস্তায় এসে অপেক্ষা করতে লাগলুম গাড়ির জন্যে।

আকাশের সূর্য তখন অনেক উপরে উঠেছে, ঝকঝক করে হাসছে পৃথিবী।

[ক্রমশঃ

• • •

"একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বিশ্ব-মানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস পরায়ন। ধর্মই হোক, রাজশক্তিই হোক, যা কিছু ক্ষমতা-লুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান, সেই বিশ্ব কল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সকল দেশ, সকল কালের মানুষের জন্য যে এনেছিলো আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির মর্মস্থল বিদীর্ণকরে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিক মণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিশ্বয় বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থ সাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা তাদের ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠেছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজ ধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেই জন্যে এই যুদ্ধের যে দান, তা দানবের দান, তার চিত্ত কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলেনা, তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে - প্রত্যেক দেশই আপন ফৌজের আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয়, যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠবে, তারচেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে।

—রবীন্দ্রনাথ

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

আট বছর বয়সে সাঁতার শিখেছিল জার্মানীর মেয়ে উটা ক্রোমাটার। তার উচ্চতা একটু ১ইঞ্চি। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের ক্ষেত্রে নেমেছে বছর দুই কি তিন। কিন্তু নাম কিনে ফেলেছে এরমধ্যেই। অষ্ট্রিয়ার স্টেইল শহরে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার শেষে ওকে জানান হল যে, ১০০ মিটার ব্রেস্ট ষ্ট্রোকে ওর লেগেছে মাত্র ১মিঃ ১৭'৫ সেঃ, এবং এটা একটা জার্মাণ রেকর্ড হয়ে গিয়েছে, তখন উটা বললে, "বিশ্বাস হয়না। অন্তত আমার যায়।" অথচ ব্যাপারটা সত্যি। এর আগে ব্রাটিস্লাভার এক প্রতিযোগিতায় ঐ সাঁতারেই ওর সময় লেগেছিল ১মিঃ ১৮'৪ সেঃ। সময় সংক্ষেপের এই কৃতিত্বে উটা নিজেও আনন্দিত। সাঁতার জগতে নামকরাদের মধ্যে জায়গা ক'রে নিয়েছে উনিশ বছরের এই মেয়েটি। সাঁতারের ভঙ্গিটি ওর বেশ সুন্দর। এসম্বন্ধে ওর নিজের বক্তব্য: "অভিজ্ঞতার আরো দরকার আছে আমার। আমি দৃষ্টি স্থির রেখেছি সামনের ওলিম্পিক এর দিকে।" অভিজ্ঞতাও উন্নতির জন্যে উটা দৈনিক ৪,০০০ মিটার সাঁতার অভ্যাস করে থাকে।

• • •

ভারতের মেয়ে শ্রীমতী মেহেরু অর মুলল সম্প্রতি ফ্রান্সের একেক ক্যানসার পুরস্কার পেয়েছেন, পুরস্কারের মূল্য ১০,০০০ ফ্রাঁ। ইনি বিজ্ঞানে ডক্টরেট হবার জন্যে ক্যানসার রোগের ওপরে গবেষণা করেছিলেন। এবারে ইনি প্যারিস শহরের কুরী ফাউণ্ডেশনের প্রোফেসর ক্রালির অধীনে গবেষণা চালাবেন। শ্রীমতী মুলল ক্যানসার রোগী চতুষ্পদের ওপর পরীক্ষা চালাবার একটি বিশেষ উপায় বার করেছেন। প্যারিসে ইনি যে গবেষণা করবেন তার সকল সময়ত খরচ কুরী ফাউণ্ডেশনই দেবে।

• • •

ফ্রান্সের মার্সেলস্ শহরের দুটি মেয়ে ইলেইন আর অ্যান! দেখতে শুনতে সুশ্রী, বয়স দুইজনেরই তেইশ। মাথায় নানা পরিকল্পনা খেলে ওদের। ওরা দুজনে মিলে একটা নতুন ধরণের ব্যবসায়ে নেমেছে, যার নাম দিয়েছে 'আইডিয়া বিজনেস' বা পরিকল্পনা-সংস্থা। যেকোন সমস্যা নিয়ে ওদের দোকানে আপনি যান, দুচিটি টাকা দক্ষিণা দিন—ব্যস, সমাধান পেয়ে যাবেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। যে কোন মুস্কিল আসানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে ওরা। যেসব কাজ বা প্রস্তাব ওদের দিতে হয়, তার মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি:—দুঃসময়ের কান্না, শিশুদের নামকরণ, কোনও ভোজে কী 'মেনু' করা যায়, নতুন নতুন খাবার তৈরি···ইত্যাদি।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদও আসে, যেমন পুলিসের হুজ্জৎ। একবার কাকে বা কাদের যেন সমস্যার উত্তরে ওরা সমাধান দিয়েছিল: স্ত্রীরা যদি অরুচিকর হয়ে ওঠে কখনও, তাহলে কিভাবে স্বামীরা সেইসব

স্ত্রীদের হাত থেকে নিস্তারলাভ করতে পারেন। এর ফলে বেশ কয়েকজন স্ত্রী স্বেচ্ছায় দিয়ে পুলিশে নালিশ করে।

• • •

'মিস ব্রেজিল' বা 'ব্রেজিল-সুন্দরী' মিস্ মার্থা ডাল্লনসিল্‌স। ১৯৬৮ সালের জন্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সম্প্রতি ফোরিডার মিয়ামি বীচে 'মিস্ ইউনিভার্স' বা 'বিশ্বসুন্দরী' নির্বাচিত হলেন মার্থা। ফলাফল যখন ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন দারুণ বিস্ময়ে মুখব্যাদন করে ফেলেছিলেন ডাল্লনসিল্‌স—যদিও প্রথম স্থান পাবার প্রচ্ছন্ন বাসনা নিয়েই তাঁর ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান। সম্মানসূচক মুকুটটি যখন মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল, আনন্দে তখন মার্থার চোখদিয়ে জল গড়িয়ে এল। এরপরে যখন কিছু বলতে বলা হল, তখন মার্থা বললেন, 'আমার প্রীতি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ওপরেই'।

মার্থার বয়স কুড়ি। দেহসৌষ্ঠবের মাপ ৩৬—২৪—৩৬।

• • •

মেয়েদের জন্যে পশ্চিমবাংলায় এইবার একটা সংশোধনী বিদ্যালয় খোলা হবে। এই প্রদেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এই সর্বপ্রথম। এতে বাসোপযোগী ব্যবস্থা থাকবে, যেমন বোর্ডিং হাউস বা মেস্-এ থাকে। কৃষ্ণনগরে একটা ভাড়া বাড়িতে উদ্বোধন করা হবে স্কুলের। পঞ্চাশজন মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা রাখা হবে এখানে এবং এইসব মেয়েকে বিভিন্ন কাজ কারবারে শিক্ষা দেওয়া হবে।

• • •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানে নানারকমের অদ্ভুত নতুন নতুন প্রথার সৃষ্টি হয়। তেমন একটির বিষয়ে আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

"ডান্সিং গডেস্" বা নৃত্যশীলা দেবী বলে ওখানে যিনি পরিচিতা, তাঁর আসল নাম মিসেস সাচো কিটামুরা। ইনি অনেক কৃষিজীবির গৃহিনী। এর কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকষ্ট দূর করা যায় নাচের মাধ্যমে। এবং সেই কথা প্রচার শুরুর পর থেকে দেখা গেল, হাজারে হাজারে মানুষ তা অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে—তারা প্রতিদিন প্রার্থনাদির সময়ে আবিষ্টভাবে নাচ আরম্ভ করেছে। বর্তমানে সাচোর প্রতিষ্ঠিত 'চার্চের সদস্য সংখ্যা ৩,৫০,০০০ ছাড়া জাপানে এহেন চার্চ ১২০টি, এবং জাপানের বাইরে ৩৪টি দেশে মোট ১১০টি।

নৃত্যশীলা এই 'দেবী'র সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। অনুচরেরা তাঁর প্রদর্শিত ও পরিচালিত নাচ দিয়েই মৃত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

• • •

বিখ্যাত রুশ সংবাদপত্র 'প্রাভদার' জনৈকা লেখিকা সেদিন লিখলেন—রাশিয়ার মেয়েদের মেয়েলি ভাব ক্রমশ কমে আসছে, অর্থাৎ তারা 'মেয়েমদ' হয়ে উঠছে ক্রমেই। রুশ নারীদের 'মেয়েগিরি' শেখাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই—না বাপের বাড়িতে, না স্বামীগৃহে, না স্কুলকলেজে, না চাকরিস্থানে। এই করতে করতে ও-বস্তুটাই মেয়েদের মধ্যে থেকে উঠে যাবে, এটাই সম্ভাবনা।

পুরুষদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সমতার ঘুরো ঐ লেখিকার মতে একটা চৈয়ালি। কেননা, রুশ মেয়েরা গড়ে হপ্তায় ৩৭ ঘণ্টা দেয় ঘরের কাজে, আর ৪০ ঘণ্টা দেয় বাইরের কাজে। পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার ও নারীমুক্তির যে ফল, তা সোভিয়েট নারীর পক্ষে মঙ্গলকর নয়, তিনি বলেন।

• • •

মাদ্রাজ নিবাসী শ্রীমতী সুন্দরী স্বামীনাথন একজন ভাস্কর। বেলজিয়মে তাঁর ভাস্কর্যের এক প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমতী সুন্দরী বেলজিয়মস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিণী। সেইসব ঘাতের কাজ দেখে ওখানকার পত্রিকাগুলো তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুন্দরীর গড়া ৩৪খানি ভাস্কর্যকলা, সেরামিক ও ব্রাস-রিলিফ ঐ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

• • •

নরওয়ের গৃহিণী ইন্‌গ্রিড পেত্তারসেন প্লেন চালাতে জানেন। আর জানেন বলেই সেদিন উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে দিবা ১,০০০ মাইল পথ প্লেন চালিয়ে ফুরে এলেন। গ্রীণল্যাণ্ড থেকে যাত্রা শুরু হয়ে শেষ হল অস্লো শহরে।

আলাস্কার একজায়গা থেকে এক-ইঞ্জিনের 'সেস্না' প্লেন নিয়ে তিনি পাড়ি দেন। এই হচ্ছে প্রথম নারী বৈমানিক হিসেবে চিহ্নিত থাকার বাসনা ইন্‌গ্রিডের।

• • •

ওষুধের দোকানে কাজ করে সহকারিণী হিসেবে বিশ বছরের মেয়েটি। নাম এ ভেলীন জ্যাকোবী। পশ্চিম জার্মানীর একটি মহিলা পত্রিকা জনৈক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের (মনোবিজ্ঞান বিভাগীয়) সহযোগিতায় ৬ মাস ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালায়। সেই পরীক্ষায় এভেলীন পশ্চিম জার্মানীর সবচাইতে বুদ্ধিমতী মহিলা বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

• • •

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুবতী ডোরিস হোয়াইট 'ভিকার্স ভিমি' বিমানের জন্য হাজার হাজার 'ম্যাগনেটো' তৈরি করে ছিল। আজ পঞ্চাশ বছর পরে সেই জিনিস আবার তৈরী করতে হবে, তা সেদিনকার সেই যুবতী কি জানত!

ভেটারেন এয়ার ক্র্যাফ্‌ট প্লাইং অ্যাসোসিয়েশন সেদিনের সেই 'ভিকার্স ভিমি' বোমারু বিমানের একটি সংস্করণ তৈরি করতে চান। কিন্তু সেদিনকার ব্যবহৃত উপকরণাদি আজ আর কারো জানা নেই, কাগজপত্রও মিলছেনা। অতএব একমাত্র ডোরিস-এর ওপরই ভরসা। কিন্তু কোথায় ডোরিস? খোঁজ — খোঁজ। খুঁজে মিলল শেষ পর্যন্ত। শ্রীমতী ডোরিস এখন প্রবীণা— পুরানো প্রতিষ্ঠানে আবার তিনি 'ম্যাগনেটো কয়েল' করতে ফিরে এসেছেন। এই জিনিস নিয়ে কাজ করতে শিখেছিলেন তিনি তেরো বছর বয়সে।

• • •

অনাবৃতবক্ষা মেয়ে-চারটি পৃথিবীর প্রথম 'টপলেস' সঙ্গীত গোষ্ঠী। টরেন্টো শহরে ওদের পনের দিনের প্রোগ্রাম ছিল। সেই অনুষ্ঠানের শেষে ওরা বললে, টরেন্টোর নারীধাও ওদের প্রশস্তি দিয়েছে।

এই দলের একজন হচ্ছে রোবিন শেরউড। বয়স তেইশ। গীটার বাজিয়ে। সে বলে, 'সান ফ্রানসিস্‌কোতে আমরা চারজন শো-গার্ল হিসেবে কাজ করছিলাম, সেই সময়েই আমাদের ম্যানেজার মশাইয়ের মাথায় এই টপলেস-সঙ্গীতদলের মতলবটা আসে। উনিই দলটা গড়েন। তখন আমাদের মনে হয়েছিল, এ একটা তাকাতুকোর মত ব্যাপার।'

এই চারজন মেয়ের কথা অনুসারে, ওদের বাবা-মা'রা ওদের এই টপলেস প্রোগ্রামে কোন আপত্তি তোলেন না।

• •

বাঙ্গালোরের হোটেল ও প্রাইভেট গেস্ট হাউসগুলো সম্প্রতি যৌনচর্চা ও গণিকাবৃত্তির আড্ডা হয়ে উঠেছে। পুলিশ এদের অনেকগুলোতে হানা দিয়ে জানতে পেরেছে যে, আশপাশের রাজ্যগুলি থেকে মেয়েদের কিনে এনে বাঙ্গালোরে অসদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এই রকম এগারটি মেয়েকে তিনটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়। একটি প্রাইভেট গেস্ট হাউসে বাইশটি মেয়ে 'বেশ ভাল ব্যবসা' চালাচ্ছিল—সেখানে হানার উদ্যোগ হতেই ঐ বাইশজন গোপনে পালিয়ে যায়।

• • • •

বিহারের জনৈকা কৃতপুর মহিলা এম-এল-এ রাজ্যপাল শ্রীকাত্নগোকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নার্সের কাজ করতে চান। এক সময়ে ইনি নার্সগিরি করতেনও, এবং কিছুকাল ধারভাঙা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্স হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এঁর নাম শ্রীমতী শ্যামাকুমারী।

• • • •

বড় বোনের বয়স ছ'বছর, ছোটটির চার। ছোট বোন পেটভরে ভোজনপর্ব সমাধা করেছে, ফলে সাময়িক ভুঁড়ির সৃষ্টি। দিদিটি বললেন, 'ইস, কত খেয়েছিস রে—পেট কেটে ছোব নাকি?' বোন জবাব দেয়—'হ্যাঁ, দে না।' সেই না বলা, দিদিটি কোথা থেকে খুঁজেপেতে যোগাড় করে নিয়ে এল একখানা দাড়ি কামাবার ব্লেড। আর তাই দিয়ে সেই না ছোট বোনের পেটে বসিয়ে দিয়েছে,—আর যায় কোথা—'ভুঁড়ি' গেল চিরে। শুধু তাই নয়, সাংঘাতিক কথা—নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়ল পেট কেটে। হৈ হৈ কাণ্ড পড়ে গেল বাড়িতে; সঙ্গে সঙ্গে বোনকে পাঠান হল ওখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্রেও বাঁচান গেল না, ক'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ!

এটা সত্যি ঘটনা। ঘটনাস্থল নদীয়া জেলার করিমপুর। সময় বিকেল। মৃত্যুর পরক্ষণে ঐদিনই রাত্তিরে।

মেয়ে মজলিশ

আমাদের সমস্যা

বেলা দে

সারাদেশ জুড়ে আজ শুধুই পরিবর্তন আর পরিবর্তন, সমস্ত পৃথিবীটা যেন পরিবর্তনের দোলায় দোদুল্যমান। পরিবর্তন চিরদিনই ছিল আজো আছে কিন্তু সেদিনের তুলনায় আজকের পরিবর্তন দ্রুতগামী। আজকের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন কখন যে বদলে যাচ্ছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারছে না বিশেষ করে পরিবর্তন এসেছে আমাদের নারী মহলে। কিন্তু এই দ্রুত পরিবর্তন যে আমাদের নারী সমাজকে কোথায় নিয়ে যাবে কে বলতে পারে? আর এর পরিণাম যে কি ভয়াবহ দু'খানি চিঠি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। এঁরা দুজনেই নাম ঠিকানা জানাতে চান নি তাই শুধু আমাদের কাছে লেখা চিঠির বিষয় বস্তুটী তুলে ধরছি।

শ্রদ্ধেয় নতুনদি!

পদ্মভারতীর মেয়ে মজলিসে আপনারা যে 'আমাদের সমস্যা' বিভাগটীর প্রবর্তন করেছেন এতে আমাদের মা বোনেরা বিশেষ উপকৃত হবেন বলেই মনে করি। আমার একটি সমস্যার সমাধানের জন্য এই চিঠি লিখছি। আমি বাংলা দেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ। আমার স্বামী একজন শিক্ষিত এবং বড় চাকুরী করেন। আমি যখন এ বাড়ীর বৌ হয়ে এলাম তখন লক্ষ্য করলাম আমার স্বামী সম্পূর্ণ বিলাতী কায়দা-দুরস্ত মানুষ অথচ শ্বশুর শাশুড়ী সাধারণ হিন্দুঘরের আচার অনুষ্ঠানই বেশী পছন্দ করেন। তাইতে এই দোটানার মাঝে আমি নিজেকে যথাসম্ভব মানিয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। আমার স্বামী সন্তানাদি পছন্দ করতেন না তাই আমাদের কোনো সন্তান নেই। কিন্তু সংসারে আমার শান্তি ছিল না। শাশুড়ীর পুজোর জোগাড় করে দিতে দেখলে উনি ভীষণ রাগ করতেন এবং আমাকে নিষেধ করতেন। যদিও আমি দুদিক বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি বরাবর। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে একদিন লাগল ভীষণ অশান্তি। আমার স্বামী একদিন রাত্রে আমায় ডেকে বললেন তোমার এভাবে কুলবধূ সেজে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কাল আমার সঙ্গে যাবে আমি তোমায় সাজ পোষাক নতুন ধরনের কিনে দেব সেইভাবে সাজতে হবে। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পরদিন উনি আমায় সঙ্গে নিয়ে খুব দামী শাড়ী কিনে দিলেন। দর্জির দোকানে গিয়ে হালফ্যাসানের ব্লাউসের অর্ডার দিলেন। হিল ওঁলা জুতো কেনা হল। তারপর সেলুনে নিয়ে গিয়ে আমার সমস্ত চুল ছোট করে কেটে দেওয়া হল। মাথা সাবান জলে শ্যাম্পু করে একেবারে বিলাতী মেমসাহেব সাজিয়ে বাড়ী নিয়ে এলেন। লজ্জায় আমি শাশুড়ীর সামনে দাঁড়াতে পারলাম না। যদিও তিনি সবই বুঝতে পারলেন এবং পরদিন থেকে আমার হাতের কোনো জিনিস খেতেন না। আমি খুবই অশান্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু সব ছাড়িয়ে যা ঘটলো সেটি এবার বলি:

আমার স্বামী একদিন বললেন আমাদের অফিসের বড় সাহেবের বাড়ী তোমায় যেতে হবে একটু মেলামেশা করতে হবে না হলে আমার চাকুরীর উন্নতি হবেনা। আমি ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে না পেরে রাজী হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ একটি বিলাতী মেম সাজিয়ে আমাকে নিয়ে ওঁদের বড় সাহেবের বাড়ী গেলেন। সবই বিলাতী কায়দাকানুন। শুনলাম ভদ্রলোক বিবাহ করেননি! যাই হোক বেশ আদর আপ্যায়নের মধ্যে কদিন কাটল। একদিন আমার স্বামী আমাকে একাই বড়সাহেবের বাড়ী

রেখে চলে গেলেন। সেদিন কিন্তু ভদ্রলোকের হালচাল আমার ভাল লাগল না। এমনি করে দিনের পর দিন আমাকে সেখানে রেখে যেতেন আমার স্বামী। আমি বাড়ী ফিরে ওঁর পায়ে ধরে কত কেঁদেছি, এ অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না। উনি টাকার লোভে সেই বন্ধুর কাছে আমাকে প্রায় বিকিয়ে দিলেন। অসহ্য পরিবেশ সহ্য হল না একদিন আমি গৃহত্যাগ করলাম। কোথায় গেলাম কেউ জানল না। অনেক দুঃখে বাংলা দেশের একটা গ্রামের মহিলা সমিতিতে এসে ছদ্মনামে কাজ করি। বলুন তো এ অপরাধ কার? আর এ সমস্যার সমাধানই বা কি? আমার মত এমন অনেক মেয়েই এমনি ধারা মানসিক অশান্তিতে জলে পুড়ে গৃহত্যাগ করেছে তার দৃষ্টান্তও কম নয়। আমি জানি সবাই আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কত সমালোচনা করে যাচ্ছে। কিন্তু আমার গৃহত্যাগের ছোট্ট কাহিনী বললাম—'আমাদের সমস্যা' বিভাগে এই চিঠি ছাপিয়ে দেবেন যদি কিছু সুফল হয়।

ইতি—ভাগ্য বিড়ম্বিতা বোন।

সত্যিই তো এ কুৎসিৎ ভয়াবহ পরিস্থিতি আজ বহু সম্ভ্রান্ত ঘরেই দেখা দিয়েছে। মেয়েরা যদি এগিয়ে এসে এর প্রতিকার না করেন তাহলে এটা সমাজের একটা কলঙ্ক স্বরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে যাবে তার ফলে কত সংসার অশান্তি বহ্নিতে ছারখার হয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল নারী জাতির মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপে থাকবে।

আর একখানি চিঠি—

শ্রীচরণেষু বড়দি!

জানিনা এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছাবে কিনা তবুও লিখলাম। আমি এখন সুদূর বেনারসে বাস করছি। আপনি হয়তো বলবেন বাংলা দেশের মেয়ে হয়ে বেনারসে বাস করছি কেন? সেই কথাই বলব। আমার নিজের অতীত জীবনের কিছুই আমি জানি না। যখন জ্ঞান হল তখন থেকে দেখলাম বেনারসের এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর বাড়ীতেই আমি মানুষ! এঁরা আমায় মেয়ের মত মানুষ করছেন। আমি ভালই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা এক ভদ্রমহিলা কাশীর গঙ্গার ঘাটে আমায় দেখে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন আমি এঁদেরই পরিচয় দিলাম। ভদ্রমহিলা বার বার আমার মুখপানে চেয়ে দেখছিলেন। শেষে নিজেই বলতে সুরু করলেন (অবশ্য নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে) আমার একটি আত্মীয়া অবিবাহিতা অবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায় কাশীতে চলে আসে শুনেছি তার একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল তাকে সে কাশীর গঙ্গার ধারে ফেলে চলে যায়। ঠিক তোমার মত আমার আত্মীয়ার মুখ তাই বড় জানতে ইচ্ছে করল। সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কোথায় থাকেন? বললেন যে কলকাতার একটি বস্তিতে। ভদ্রমহিলার এখন বেশ বয়স হয়েছে। অবশ্য তাঁকে আর আমি কোনদিন বেনারসে দেখতে পাইনি। কিন্তু নিজেকে আমার বার বার প্রশ্ন কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে তাহলে সেই মেয়েই কি আমি! সত্যি কথা বলতে কি বড় যন্ত্রণায় জীবন কাটছে আমার! অথচ আমি তো কোনো পাপ করিনি? আর নিজের অতীত ইতিহাস কাউকে জিজ্ঞেস করিনি শুধু বাড়ীর পুরনো দাসীর কাছে শুনেছি এঁরা আমায় কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন। আমার কোনো ঐশ্বর্যের অভাব নেই। আমি এখন বি এ পড়ি। অবাধ স্বাধীনতা! তবু ও হঠাৎ এ ঝড় যেন আমাকে বড়ই উতলা করে দিয়েছে এ সমস্যার কি করে সমাধান করব বলুন তো? আমাকে কি সমাজ ভবিষ্যতে সম্মানের চোখে দেখবে! কিন্তু আমি তো নিরপরাধিনী!

ইতি—সবিতা তলাপাত্র।

একজনের পাপের বোঝা তার বংশধরেরাই ভোগ করে আসছে এই যেন জগতের নিয়ম! কিন্তু তবুও বলব, না সবিতাদের মত পরিত্যক্ত সন্তানরা অবহেলিত নয়, সমাজ তাদের সযত্নেই স্থান দেবে। আজকের সমাজ জীবনে বহু সমাজ নিপীড়িত মেয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সংসারে আত্মনিয়োগ করেছে। সবিতাও তাই করবে তাতে কেউ ওকে দোষ দেবে না। গীতায় আছে পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়।

ইতি—নতুনদি

পল্লী-ভারতীর 'আমাদের সমস্যা' এই বিভাগে অংশ গ্রহণকরে বাংলার সমস্যাজর্জরিত নারীজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসুন। ভুলবেন না এ সমস্যা আজ আপনার আমার ও প্রত্যেকের। আর মেয়েদের সমস্যার সমাধান না হলে জাতির ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন।

স্বাধীনতার পর

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সেই থেকে পরিবর্তন এলো ঘরে বাইরে সর্বত্র। দেশ নানাভাবে এগিয়ে চলল তার ছোঁয়া এসে পড়ল আমাদের অন্তঃপুরে। আমরা একটু বিদেশী ভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম! মেয়েদের সাজসজ্জা আদবকায়দা থেকে সুরু করে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও বিদেশীর ছাপ এলো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল এবং হয় তো কিছুটা উপকারিতাও আছে। তাই বলে ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা, ও রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নয়। অতীতের সব কিছু ভাল ছিল তা নয়, কিন্তু অতীতকে অস্বীকার করে নতুনের মোহে গা ভাসিয়ে দিলেই স্বাধীন হওয়া যায় না। বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই আমাদের সত্যিকার পথ খুঁজে নিতে হবে। অতীতকে অস্বীকার করার মধ্যে গৌরব কিছু নেই কিন্তু পদে পদে বিড়ম্বনা ঠিক আছে। অনেকে মনে করেন অতীতকে অবহেলার মধ্যেই বুঝি অতি আধুনিক হওয়া গেল। কিন্তু আমার মনে হয় নিজেদেরও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পরের অনুকরণ এবং অনুসরণ করার মধ্যে যাহবা থাকলেও অন্যের চোখে হাস্যাস্পদ হতে হয়।

আধুনিক জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হওয়ার জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রধান অঙ্গ রান্না খাওয়ার ব্যবস্থাটিরও অনেক অদলবদল হয়েছে। আজকাল বহু পরিবারে পিঁড়ি আসন ইত্যাদির বদলে টেবিলে খাওয়ার প্রচলন হয়েছে। এই বিকল্প ব্যবস্থায় পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে বসে হাসিগল্পের মধ্যে দিয়ে প্রত্যহ খাওয়ার পর্বটি সমাধান করে থাকেন। আপনার সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা গৃহিনী স্বচ্ছন্দে তার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হন। এমনকি যেহেতু টেবিলে খাওয়া, সেজন্য সম্ভব হলে দেশী বিলাতী জলখাবারও পরিবেশন করা হয় যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা হয় তো চপ, কাটলেট, মাংস, চাপাটী ও পরিবেশন করলেন। কারণ যেহেতু টেবিল চেয়ার সেই হেতু বিলাতী খানা অবশ্যই চাই। আমি বিদেশী খাওয়ার অপবাদ দিচ্ছি না, কিন্তু মনে হয় এই পরিবেশের সৃষ্টি করে আমাদের মা বোনেরা যেন দিন দিন পুরনো ধারা খাওয়ার কথা ভুলেই গেছেন। কিন্তু সেই চিত্রটিও একবার মনে করে দেখুন তো! বাড়ীর মেয়েদের হাতের কাজ করা সুন্দর সুন্দর আসন পাতা খাবার জায়গাটি তার মাঝখানে কাঁসার থালা, বাটী, গেলাস সাজানো, আর গৃহকর্ত্রীর হাতের

শুকো, শাকের ঘণ্ট, ডাল, নারকেল কুমড়ি, মাছের পাতুরী, বাটি চচ্চড়ি, মাছের অম্বল কি মধুর লাগে বলুন তো? যেন প্রতিটি রান্নার মধ্যে আদর যত্নের একটা আভাস ফুটে বেরুয়। আত্মীয় পরিজনেরাও চলি করে যান।

তাই আবার বলছি অতীত নারী চরিত্রের এই আদর্শ ছাড়া ইপ্সিত মর্যাদালাভ সম্ভব নয়। তাই আলোর রসনাতিতে বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের গড়ে তুলতে হবে অতীত আদর্শে পবিত্রতা সরলতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও মমতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাহলেই স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বাস্তব হবে, আকাংক্ষা সত্যরূপ পরিগ্রহ করবে।

বাংলার পূজাপার্বণ

শ্রীমতী শকুন্তলা

বাংলার প্রধান উৎসব পূজা ও পার্বণ। প্রাচীন যুগে সমাজ জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল ধর্ম। দেব দেবীর পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার আশা আকাংক্ষা প্রকাশ করতো এবং বিশ্বাস করতো যে দেব-দেবীর সাহায্যেই তার সবকিছু মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

সাধারণভাবে মঙ্গলবিধান ও অমঙ্গল বিনাশের উদ্দেশ্যেই দেবতার আরাধনা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ দেবতার রোষ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজার প্রথাও দেখতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে অবশ্য এমন সব ব্যবস্থার উল্লেখ নেই তবে এ বিষয়ে প্রচলিত আচারও একেবারে আধুনিক নয়। সর্পভয় ও কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য মনসার পূজা (শ্রাবণ মাসে) ওলাউঠা ও বসন্তের সময়ে যথাক্রমে কালী ও শীতলার পূজা, জ্বরের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য জ্বরাসুরের পূজা, অগ্নিভয়ে ব্রহ্মার পূজা দীর্ঘদিন যাবৎ একটা পর্বের মত হয়ে আসছে।

বিশেষ করে গ্রামদেশে বর্ষার সময় যখন সাপের ভয় বেশী হয় তখন মনসার পূজা এবং ঘরে ঘরে মনসার পাঁচালী পড়া হয়। পাড়ায় পাড়ায় মনসার ভাসান গান করা হয়, মাঝে মাঝে সাপের দেবতা মনসা দেবীকে সাপের প্রিয় খাদ্য দুধ নিবেদন করা হয়। এমন কি আজো বাংলাদেশের অনেক রক্ষণশীল পরিবারে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন উনুনে রান্না হয় না আগের দিনের রান্না খাওয়া হয়, এবং উনুনটিকে বিশ্রাম দিয়ে উনুনের গায়ে আলপনায় সাপে চিত্র আঁকা হয়। অনেকটা অরন্ধনের মত বাসি খাওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে বলা হয় 'ঢেলাকেলা' এটী শ্রাবণেই অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী ও শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশেষ মনসাপূজার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও লৌকিক প্রথা দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার মেয়েরা এই শ্রাবণমাসে কয়েকটি ষষ্ঠীব্রতও করেন। যেমন লোটন ষষ্ঠী ব্রত। চাপড়া ষষ্ঠীব্রত ইত্যাদি। এগুলি সবই যদিও পুত্রের কামনায় তবুও মনে হয় ধনেপুত্রে লক্ষীলাভের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এর মধ্যে বর্তমান।

যদিও কালের বিবর্তনে অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও উৎসবের পরিবর্তন ঘটছে। তাই লৌকিক পূজাপার্বণের মধ্যেও রূপান্তর দেখা যায়। তবুও মনে হয় বাংলাদেশের এই পূজাপার্বণের যে একটি ঐতিহ্য আছে তা চিরদিনই থাকবে।

বাংলার ঋতুভেদে খাদ্য ব্যবস্থা।

বর্ষাকালে বা শ্রাবণমাসে আমাদের দেশে খাবারেরও কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন শ্রাবণমাসে চাঁচি কুমড়োর তরকারী, ডেঙ্গোডাঁটা, মটরডালের বড়া, ঝিঙে আলু সহযোগে মিষ্টি তরকারী, চালতার অম্বল। কচুশাকের নানারকম উপাদেয় রান্না! সর্বোপরি এই সময় ইলিশ মাছের ঝোল, ভাজা, ভাপা ইলিশ প্রভৃতি বাংলাদেশের এক আভিজাত্য খাদ্য হিসাবে চলে আসছে। তাই এই শ্রাবণ মাসে বাংলাদেশে এখনো অনেক পরিবারে একটি শুভদিন দেখে গঙ্গার ইলিশ কিনেএনে সিঁদুর হলুদ সহযোগে শংখধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে তবে গৃহস্থ সেই মাছ মুখে দেন। আত্মীয় পরিজনকেও খাওয়ান। (অবশ্য এই উৎসবটী প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গীয় পরিবারেই চল আছে) আজকের দিনে এসব কল্পনারও আনা যায় না।

টুকিটাকি

যেসব ছেলেমেয়ে পুষ্টির অভাবজনিত পীড়ায় ভোগে অর্থাৎ রিকেটে ভুগছে তাদের যদি প্রত্যহ সকালে বিকেলে চা চামচের দু'চামচ করে ছাগল দুধের সঙ্গে থানকুনি পাতার রস খাওয়ানো যায় বেশ উপকার হবে।

কাঁকড়াবিছে, বোলতা প্রভৃতি কামড়ালে থানকুনি পাতা ঘসে দিলে বিষ নষ্ট হয় ও যন্ত্রনার উপশম ঘটে। এমন কি সাপে কামড়ালেও এই পাতা ঘসলে বিষ নষ্ট হয়।

টাপানী রোগে অনুপান হিসাবেও এই থানকুনি পাতার ব্যবহার দেখা যায়।

কৃমি হলে রোজ সকালে এক ছটাক চিরতার কাথ খেলে কৃমি নষ্ট হয়ে যায়।

কুরুচি বা কুচ্চি এই গাছটি বাগানে অথবা বাড়ীতে কোনো জায়গায় পুঁতে রাখলে আমাশয় অথবা পেটের অসুখে এর কাথ বেশ উপকারে আসে।

তুলসীপাতার রস মধুর সঙ্গে খেলে সর্দিকাশীর উপশম হয়। পুরনো জ্বরে শিউলিপাতার রস মধু দিয়ে খেলে বেশ উপকার হয়।

হরিবিশাখার পাতা নুন দিয়ে ঘসে তার রস আঁচিলে লাগালে আঁচিল খসে পড়বে।

নিমপাতার জল দিয়ে খোস পাঁচড়া ধুলে সেরে যায় অথবা নিমপাতা ও পুরণো ঘি গরম করে লাগালে ভাল হয়।

মাথায় খুসকি হলে শিউলি বীজের চূর্ণ মাথায় ঘসে দিলে খুস্কি সেরে যায়।

এই ধরনের বহু ছোটখাটো লতাপাতা আমাদের দেশে আছে যাদের গুণাগুণ জেনে, ঠিকমত ব্যবহার করলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

চতুর্বিংশতি বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সেদিন গুরুমার কাছে গিয়ে দেখি ঝুঁকোবাবু বসে আছেন।

বললাম, ঝুঁকোবাবু যে! কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

—যতক্ষণই এসে থাকি তাতে তোমার কি দরকার?

ঝুঁকোবাবুর কথা বলবার ধরণই এমনি।

অদ্ভুত মানুষ এই ঝুঁকোবাবু। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কোথায় কোন্ একটা হোটেলের বাল্‌কনি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঝাঁপাতে গিয়ে তাঁর কোমর ভেঙে গেছে। তখন থেকে হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে তিনি পথ চলেন। তাই সবাই তাঁকে বলে—ঝুঁকোবাবু।

পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই যা ঝুঁকোবাবু দেখেননি। এমন কোনও বিষয় নেই যা ঝুঁকোবাবু জানেন না।

সেদিন সবজান্তা এই ঝুঁকোবাবুকে পেয়ে আসরটা আমাদের জমেছিল ভাল। সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

ঝুঁকোবাবু বলে উঠলেন, আবার সাহিত্য কেন? সাহিত্য তো অধঃপাতে গেছে। দেশের দুর্গতি যখন সমাসন্ন, অন্ধকার কালো মেঘের মত দেশের সংস্কৃতির আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

—সংস্কৃতি আপনি কাকে বলছেন?

ঝুঁকোবাবু মুখটা বেঁকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, আ-মরণ! সংস্কৃতি কাকে বলে জানো না? আজ-কালকার ছোড়ারা তো সংস্কৃতি আর সার্বজনীন—এই দুটো কথাকে ভাত-ভাল করে ফেলেছে।—সংস্কৃতি মানে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, থিয়েটার, সিনেমা—যা দিয়ে মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যা দেখে দেশকে চিনতে পারি। তুমি কত বড়লোক, তোমার কত টাকা আছে, তুমি কত বড় বিদ্বান—এ-সব দেখে তোমাকে আমি চিনতে পারবো না। তোমাকে যদি চিনতে হয়—দেখতে হবে তুমি কিসে আনন্দ পাও। তাই দেশকে এবং দেশের মানুষকে চিনতে হলে দেখতে হবে তার সাহিত্য, সঙ্গীত, রঙ্গমঞ্চ, শিল্পকলা কতখানি উন্নত। দেখতে হবে কি পড়ে কি শুনে আর কি দেখে দেশের মানুষগুলি আনন্দলাভ করছে। আমি যখন ভাগিন আইল্যাণ্ডে গেলাম—

গুরুমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ্‌লে।

তার চোখের ইশারা আমি বুঝতে পারলাম।

অর্থাৎ এইবার আরম্ভ হলো ঝুঁকোবাবুর ভ্রমণবৃত্তান্ত।

গুরুমামা জিজ্ঞাসা করলে, ডাভিন আইল্যাণ্ডের নাম তো কখনও শুনিনি ঝুঁকোবাবু, সে আবার কোথায়?

ঝুঁকোবাবু বললেন, শুনবি কোত্থেকে? ইতিহাস ভূগোল তো পড়িসনি, বাড়ী থেকেও বেরোসনি কোনোদিন—শুনবি কোত্থেকে? ডাভিন আইল্যাণ্ড হলো গিয়ে ক্যারোবিয়ান সাগরে। তিনটে ছোট ছোট দ্বীপ। সেণ্ট টমাস, সেণ্ট জন আর সেণ্ট ক্রইক্স। দ্বীপ তিনটি ছিল আমেরিকার। যুদ্ধের সময় উনিশ কোটি টাকায় আমেরিকা বিক্রি করে দিয়েছিল ডেনমার্কের কাছে। ডেনমারেরা চিনি তৈরি করবার জন্যে সেখানে আখের চাষ করেছিল। দ্বীপ তিনটে ভারি সুন্দর দেখতে। মানুষগুলোও খুব সুন্দর।

সুন্দর দেশ—যাকে বলে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা। সেই সুন্দর দেশ দেখবার জন্যে গিয়েছিলাম সেখানে।

সত্যিই সুন্দর। কত দেশ বিদেশ থেকে টুরিষ্টরা গেছে। বড় বড় হোটেল। ভারি সুন্দর জায়গা। মানুষগুলোও যেমন সুন্দর, মেয়েগুলোও তেমনি সুন্দরী।

কিন্তু বাইরে থেকে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে তো চলবে না। আমি অন্তরঙ্গ ভাবে জানতে চাইলাম দেশটিকে।

একদিন গিয়ে বসলাম তাদের থিয়েটারে। ইংরেজিতে অভিনয় হচ্ছিল। আগাগোড়া বুঝতে না পারলেও মোটামুটি সবই বুঝলাম। গল্প একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা যেমন কুৎসিত তেমনি অশ্লীল। প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চের ওপর একজন যুবক একটি যুবতীকে বিবস্ত্রা করে দিয়ে উলঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করলে। হৈ হুল্লোড় মদ্যপান আর নৃত্যগীত। যেমন তার অঙ্গভঙ্গী, তেমনি গানের ভাষা। নাটকের অভিনয় যারা দেখছিল তারাও সেই হুল্লোড়ে সমানে শিস্ দিচ্ছে আর গান গাইছে। সবাই মাতাল। শুধু পুরুষ নয়, নারীর সংখ্যাও কম ছিল না। যুবকেরা যুবতীদের কোলে বসিয়ে ক্রমাগত চুম্বন করছে।

সহ্য করতে না পেরে আমি বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে এসে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করলাম। তিনি এসেছেন ডেনমার্ক থেকে। ইংরাজিও জানেন, ডাভিন আইল্যাণ্ডের ভাষাও বোঝেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এদের সাহিত্য কেমন?

ভদ্রলোক বললেন, যতদূর নোংরা হতে হয়। এরা শ্লীলতার ধার ধারে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার মানুষগুলো কি খুব আনন্দে আছে?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, নেশা ছুটে যাবার আগে পর্য্যন্ত মাতাল যেরকম আনন্দে থাকে সেইরকম আনন্দে আছে। সংসারে এদের সুখ শান্তি বলে কিছু নেই। মদ খেয়ে আর বেলেল্লাগিরি করে সেই দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা করে।

গুরুমামা বললে, আমাদের দেশটা সেরকম এখনও হয়নি।

ঝুঁকোবাবু বললেন, হতে আর দেরি নেই। সাহিত্যে তার আগমনীর বাজনা বেজেছে। আনন্দময়ী মা এবার এলেন বলে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রমথ চৌধুরী—শুধু কি একটি নাম?

সুশান্ত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

একশো বছর আগের কথা—ইতিহাস ডিঙিয়ে কালের বেড়া ভেঙে সুদূর যুগান্তরের গল্প নয়—প্রায় আজ কাল পরশুর কথা। বাংলার তথা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে একটি শিলমোহর ছাপ মারা ঘুম। সিপাহী বিদ্রোহের তাণ্ডব মিটে গেছে, ইংরেজ অবচার্নকের চৌকীতে বসে বাঙলার দেওয়া দেওয়ানী নিয়ে রঙের তুফানের খেলা শেষ করে এনেছে—পণ্যবাহী সওদাগর পুণ্যসুনাকায় তার পকেট তখন বেশ ভারী—মাটি ত পণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার। কিকে হয়ে এসেছে বোম্বেটে হার্মাদদের হল্লার খবর, আর্মেনিয়ান বণিকদের মেল্লার কাহিনী, মিরকীর চৌকীর গল্প, ভোরবাতে বাগানবাড়ীফেরতা নতুন ধনীদের পাল্কীর হুমহাম আর ঘোড়ার খুরের কদম কদম শব্দ। সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাদের আগমন তারা ভোগবতীর তৃষ্ণায় ভরে নিয়েছে ভাগীরথীর জলে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার শিহরণ লেগেছে, দিল্লীশ্বরের জগদীশ্বরের সিংহাসনে কাঁপন, রংমহল শীশ্‌মহলে সুরসুন্দরীদের নূপুর নিক্কণ বাজেনা, নাদির আবদালী দুরানী মারাঠা, শিখ জাঠ যেটুকু রেখে গিয়েছিলো সেটুকুরও শেষ রেশ সন্ধ্যার অন্ধকারে নিভে গেলো। হরহর মহাদেও, গুরুজী কি ওয়া বহুদিনই স্তব্ধ। সারা ভারত জুড়ে Pax Britannica-র যাদু ছড়ে বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত। এ জয় শুধু বহির্জগতে নয়, অন্তরঙ্গে। পশ্চিমের দুর্বার স্রোত বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের পসরা নিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, শুধু রেলওয়েটেলিগ্রাফে তাকধরা নয়, আনছে জীবন যাত্রার অভ্যস্ত উপকরণের বাইরের বহুজিনিস, শিক্ষার নতুন রীতি-নীতি। বাংলাদেশে এই সমীকরণের শুরু আরো পঞ্চাশ বছর আগে থেকে—ভারত পথ-পথিকরা এগিয়ে চলেছেন, শুধু ডিরোজিয়ো বিচার্ডসনের ছাত্ররা নয় রামকান্ত, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, তত্ত্ববোধিনীর দল, এরাই নয়—সারাদেশ জুড়ে—হয়তো তখনো সেটা উপরতলার আবদ্ধ—তবু নতুন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে। মধুসূদন এসে গেছেন, বঙ্কিমের পদক্ষেপ শুনছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পর্ব সামাজিক শান্ত জীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁয়েছে। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে তীব্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের আত্মকুলো ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন সভয়ঙ্গে টলমল করছে। ওদিকে অন্তর জীবনের আর এক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কোলে। দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণ পাণি তখনও অনাগত। তবে রাণী রাসমণির আয়োজনে বিগ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে। দেবী ভবতারিণী নামবেন আকাশ বেয়ে, মেঘালী বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী। নিবিড় আঁধার মাঝে অরূপ রাশি সবে চমকাতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় কথা যে দেশের দিকে দিকে নতুন স্বীকৃতির পথ খোঁজা হচ্ছে, নতুন বিশ্বদর্শন। ভারত-পথপথিক বাঙালী নতুন গল্প শোনাচ্ছে, নতুন কবিতা, নতুন চিন্তার ধারা এনে দিচ্ছে তারা, নতুন রহস্যে জেগে উঠছে প্রাণ। এক রূপ পরিবর্তনী প্রাণ-

বন্যার ঘুকুল ছাপিয়ে চলেছে—শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—a society electric with thought and loaded to the brim with passion 'পাশন' কথাটা এখানে দুরস্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—বিরাট বিপুল আবেগ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই কয়েকের ধরে যে সব লোকোত্তর পিতৃপুরুষদের আবির্ভাব লগ্ন স্মরণ করে আমরা শতবার্ষিকীর উৎসব করছি, তাঁরা অনেকেই এই কয়েকের আগেপিছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ যেন –মাটি তৈয়ারী, বীজ প্রস্তুত, আয়ুঃ সর্বতঃ স্বাহা—ওরে সবাই—তপস্বী-মনস্বীর দল। এলেন শুধু মধুমাখা কলম হাতে কবি নয়, বীর্যবান যোদ্ধা নয়, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক চিন্তাশীল ধীমানের দল—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রামানন্দ, আশুতোষ, নীলরতন এবং বাংলার বাইরে তিলক, গোখলে, রানাডে, লাজপত, মালব্য, গান্ধী, আরো কতো মহারথী রথী অর্ধরথী। শতবৎসর স্বামীজী শিক্ষা নিবেদিতার শতবার্ষিকী আমরা পালন করেছি। জাতির জনকের জন্মদিনও সমাগত।

আজ স্মরণ করছি এক সাহিত্য রসরসিক সারথিকে তাঁর শতবর্ষস্মৃতি উপলক্ষে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর নাম—'পেন্‌নেম' যিনি নিয়েছেন বীরবল। তিনি নাকি বাংলা সাহিত্যে একটি স্টাইল, একটি বুদ্ধি দীপ্ত নূতন যুগের পথপরিচয় দিয়েছেন, মিত্র বাক্‌চতুর্বেদরা 'ইন্টেলেকচুয়াল' ভঙ্গীর প্রবর্তক। তাঁর নিজের কথাতেই বলি "যদিচ আমরা ঘাদবানন্দ কীর্তনিয়ার বংশধর, আর আমাদের কুলদেবতা শ্যামরায়, তথাপি আমাদের পরিবার বৈষ্ণব নয়, কীর্তন-বিলাসীও নয়,—আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু, তার অর্থ এই যে হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিলনা"। একথাও তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী (যিনি ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে দেবদ্বিজে ভক্তি বিহীন হলেও খৃষ্টধর্মের প্রতি তার বিরাগ ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঐ ধর্ম গ্রহণ তাঁর মনকে বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কৈশোর যৌবনের শিক্ষাজীবনের প্রথম দিনগুলি কাটে কৃষ্ণনগরে। এবং শেষদিন পর্যন্ত এই কৃষ্ণনগরকে ভোলেননি এবং এই কৃষ্ণনগরী সভ্যতার একটু ছাপ তার মনে লেগেই ছিল। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার সুনাম। কলকাতায় ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন ("অমৃতে" উদ্ধৃত ১৭ই শ্রাবণ ১৩৭৪) "আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করিনি। সেই দুজনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধহয় ১৮৮৯ খৃঃ সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি ফুলুরীয়ল টাম্বলেন খেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সী কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণ প্রসাদ সেন সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমায় বললেন যে অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বললেন, চলনা রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই। আমি তার প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করলুম। নারায়ণ বললেন –'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও অন্ততঃ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী' --আমি উত্তর করলুম,—পরের বাড়ীর খুকী দেখবার লোভ আমার নেই।

এই ইন্দিরা দেবীর সঙ্গেই পনেরো বছর পরে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে। রবীন্দ্র শিল্প ও ভক্ত এই মানুষটি তার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, অথচ তাঁর ভিতরেই এমন একটি নির্লিপ্ততা ছিল, এমন একটা উজ্জ্বল

স্বকীয়তা ছিল যে তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী পার্ষদদের তিনি একজন ছিলেন না। নিজের মনের কষ্টিপাথরে সব কিছু ঘষে-মেজে যাচাই করে নিতেন তিনি। ব্যক্তিত্বটা অস্তিত্বের পরিতত্ত্ব নয়, আর মানুষটা অমর কোষের অমর নয়, যে অন্তঃস্বরে ধড়াশব্দের টঙ্কার পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন সেই ঘরের। পাঁচি মিলিয়ে যেমন মডার্নের সীমারেখা টানা যায় না, তেমনি সাহিত্যিক চেতনার কথাটা শুধু স্টাইল বা ভঙ্গী নয় বা Sex and sensation, rock and roll এর অনুভূতিতে নয়, ভাবের গভীর অনুভূতিতে। শরৎচন্দ্র বার বার এই কথাটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সত্যিকার অনুভূতিতে যা পাইনি তা নিয়ে কখনই লেখা আমাদের উচিত নয়। প্রমথ চৌধুরী স্মরণে গ্রন্থের শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন যে তাঁর এক আত্মীয় একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন—বেচারা প্রমথ জীবনে কিছুই করতে পারলনা—হ্যাঁ, ব্যবহারিক দিক থেকে তার জীবনে অর্থাগম হয়নি, তিনি বড় ব্যারিষ্টার হননি, কিন্তু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের মন তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। সবুজপত্র আর বীরবল এই দুটি নাম একটা সাংস্কৃতিক যুগের পরিচয় বহন করে আনে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই এর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার পর যখন শিলাইদহের কাছারীতে ছিলেন তখন প্রমথ চৌধুরী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে পাবনা সাহিত্য সম্মেলনে যাবার পথে উপস্থিত হন। কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথ নাকি ইঙ্গিত দেন যে তিনি আর লিখবেন না, অনেক লিখেছেন এখন ক্ষান্তি দেওয়াই উচিত। একদিন মণিলাল বললেন, যদি একটা নতুন মাসিকপত্র বের করা যায় রবীন্দ্রনাথ লিখতে রাজী আছেন এবং প্রমথ চৌধুরীকে তার সম্পাদক মনোনীত করেছেন। প্রমথ চৌধুরী হেসে বলেছিলেন কী বেনামদার—তিনিই প্রস্তাব করেন নাম হোক সবুজ পত্র। কবি অনুমতি দেন। এবং এই সবুজ পত্রেই এলো রবীন্দ্রনাথের এক অদ্ভুত পরিবর্তনের পালা। তার গদ্য রীতিই যেন রাতারাতি নবরূপায়নে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ প্রভৃতি লেখায় তার প্রকাশ। তাঁর কাব্য রীতিতেও তখন নেমেছে বন্যাকার যুগ।

'বীরবল' নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন কেন সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে শৈশবের একটি স্মৃতিই তাঁকে ঐ নামটি গ্রহণ করতে প্রবুদ্ধ করে। মজঃফরপুরে শীতকালে তাঁদের বাড়ীতে ভাইবোনদের বৈঠক হতো সন্ধ্যাকালে আগুন জ্বালিয়ে আর তাঁর বাবা গল্প বলতেন আকবরের সভাসদ বীরবলের। "আকবর বীরবল নে পুছা"—বীরবল বলছেন আকবর শুনছেন, যেন হরগৌরী সভায় গৌরী প্রশ্ন করছেন, মহাদেব উত্তর দিচ্ছেন মুখে মুখে আগমশাস্ত্র রচনা হয়ে গেল—শ্রোতা দেবগণ। এই গল্প বলার ভঙ্গীটি তাঁর কাছে মনের অবচেতনে লুক্কায়িত ছিল।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক নিদর্শনের প্রথম ফসল—"তেলনুন লকড়ি" ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধি দেখলে মনে হয় যে একটা বিশাল Seismographic mind কাজ করে চলেছে। বীরবলের হালখাতা থেকে ঘোষালের ত্রিকথা পর্যন্ত চলে যান দেখবেন তার বুদ্ধিদীপ্ত মননের বিচিত্র স্ফুলিঙ্গ শুধু ভাষার ভঙ্গীতে স্টাইলে নয়, গভীরতার দীপ্তিতে, স্বরূপে। এরি ভিতরে 'রায়তের কথা' লিখছেন তিনি, হিন্দু সঙ্গীতের কথা, প্রাচীন ভূবৃত্তান্তের কাহিনী—আর হিন্দুস্থান, আবার পড়ি পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলী খাঁর গল্প, কংগ্রেসের দলাদলির বিবরণ সাহিত্য বনাম পলিটিক্স্। ফরাসী সাহিত্য তার প্রাণ ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁর পত্রাবলীও উপভোগ্য, বিশেষ করে অতুল গুপ্ত, দিলীপ রায়ের সঙ্গে লেখা চিঠিগুলি।

কাব্যের পথেও তিনি পদচারণা করেছেন। তাঁর সনেট সর্বাংশে বিশ্যাত। তাঁর একটি সনেটের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

মুখরে প্রথম কভু হইনি কেলাসে
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর পরশে
কবিতা লিখিনি কভু সাধু আদিরসে
যৌবন জোয়ারে ভেসে ডুবিনি বিলাসে।
চাটপটু বক্তা নহি, বড় একলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ টানিয়া চরকে
পুত্র কন্যা হয় নাই বরষে বরষে
অশ্রুপাত করি নাই মরের সেলাসে।
পয়সা করিনি আমি পাইনি খেতাব
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।
অন্যে কভু দিই নাই নীতি উপদেশ
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি দেশে কি বিদেশে
বৃদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ
তপস্বী হবনা আমি জীবনের শেষে।

তিনি মারা যান ১৯৪৬ খৃঃ অব্দে। নানা দুঃখ কষ্ট ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যদিয়ে তাঁর সংসারের তরণী চলে—সেটি সোনার তরী হয়নি এটা ঠিক কিন্তু বাঙালীর মনে তিনি অনেকদিন ধরে আসীন থাকবেন—তাঁর সীতেশ, তাঁর সোহনলাল, তাঁর আনি, তাঁর রাম ও শ্যাম, তাঁর বড়বাবু, তাঁর ঘোষাল, তাঁর রত্নপুরের রাণী রত্নময়ী, তাঁর কাত্তি (মিস্টার্স) তাঁর 'বীণাবাই' চিরকাল বেঁচে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয়নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করছি। সাহিত্য বিচারে আরো বলেছিলেন—তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালক পদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। তাই প্রমথ চৌধুরী শুধু একটি নাম বা টাইটেল নয়, জীবন বীক্ষার একটি বিশিষ্ট মননদীপ্ত ভঙ্গী।

স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩১শে ভাদ্র ১২৮৩—২রা মাঘ ১৩৪৪

[এই মাসের শেষ তারিখে বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম। এই সংখ্যায় তাঁকে স্মরণ ক'রে কিছু অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত কথা পরিবেশন করা হল।—সম্পাদক, পল্লী-ভারতী।]

(সে বছরও ঠিক এমনি এবছরকার মত সর্বনাশা বন্যায় ভেসে গেছে বাংলার গ্রাম, লক্ষ লক্ষ নরনারী নিরাশ্রয় হয়েছে, হাহাকার শোনা যাচ্ছে বাংলার বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামের পথে পথে।

বিয়াল্লিশ বছর আগে (৩১শে ভাদ্র ১২৮৩) সেদিন এই বাংলায় জন্মেছিলেন এমন এক মানুষ যিনি সর্বপ্রাণ দিয়ে এই ভাগ্য বিড়ম্বিত দেশের নরনারীকে ভাল বেসেছিলেন আর হৃদয়-গলানো ভাষায় তা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ভালবাসা ছিল তাদের প্রতি, "এজগতে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই" যারা দুর্ভাগ্যে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, হৃতস্বত্ব নিঃসহায় তাদের কথাই তিনি বেশি করে বলেছেন অন্তরের অগাধ মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে। বাস্তবিকপক্ষে শরৎচন্দ্র যে বাঙালীর কাছে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে দরদী লেখক বলে চিরকাল সবচেয়ে বেশি ভালবাসা পেয়েছেন এবং চিরকাল পাবেনও, তার কারণই হল ওই, অর্থাৎ বাঙালীর প্রতি প্রাণের মমতা উজাড় করে দিয়ে (বিশেষ করে পল্লীবাংলার নরনারীরাই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি) তিনি বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন।

কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করে তার অন্তর্লোকের কথাকে উদ্‌ঘাটিত করবার কী অলৌকিক শক্তি আর কী মধুর বিন্যাস। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর নাটক অভিনয়ের সময়ে প্রচার পত্রে তাঁর সম্বন্ধে যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন তা সেদিনও যেমন সত্যি ছিল, আজো তেমনি সত্যি।

তাঁর রচনা নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। আজ তাঁকে আমরা স্মরণ করছি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে, তাঁর কথা আলোচনা করে পুণ্য অর্জন করছি।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরদী মানুষ, মানুষের দুঃখ দেখলে অস্থির হতেন। এমন অনেক ঘটনা আছে তাঁর জীবনে, যেখানে আমরা দেখি নিজের জীবন, স্বাস্থ্য বিপন্ন করেও তিনি আর্ত মানুষের সেবায় লেগেছেন। শুধু মানুষ কেন? জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর অসীম করুণা ছিল। সে পরিচয়ও প্রচুর পাওয়া যায় তাঁর জীবনে।

আজ এই স্মরণ-বাসরে আমরা তাঁর জীবনের কিছু টুকরো কথা এনে কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

* * *

একদিন কথায় কথায় বললেন, "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমায় একখানা চিঠি লিখেছেন, তার এক জায়গায় আছে, "আমি প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে আপনার পল্লীসমাজ বইএর দুতিন পাতা পড়ি।"

লোকে এই কথা শুনে বলবে আচার্য নিজে ব্রাহ্ম কি না, তাই ব্রাহ্মণদের নিন্দে তাঁর খুব মনোমত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। আমার মনে হয়, পল্লীসমাজের ক্যাঠাইমার মধ্যে দিয়ে আমি পল্লীর মুক্তির যে সন্ধান দিয়েছি, তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাল লেগেছে।"

• • •

"আমার লেখা পড়ে 'সমাজ গেল' রব উঠেছে। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের সমাজের বাঁধুনি কত আলগা হয়ে গেছে। সমাজ ভাঙার কোন কন্ধি আমার নেই, আমি দেখাতে চেয়েছি তার গলদগুলো, যাতে তার প্রতিকার হয়, আর সমাজের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। মানুষের শরীরে রোগ পুষে, মানুষ কতদিন সুস্থ থাকতে পারে? সমাজ সম্বন্ধেও একথা খাটে।"

• • •

অনেকে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছেন, "শ্রীকান্ত কী আপনার নিজের জীবন কাহিনী?" প্রশ্নটা শুনলেই বিরক্ত হতেন শরৎচন্দ্র। একদিন এই প্রসঙ্গে বললেন, "লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি করবার কোন মানে হয় না। লেখক হয়েছি বলেই যে নিজের জীবনের সব কথাই সবাইকে জানাতে হবে তার মানে কি আছে! লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের যেটুকু পরিচয় মেলে এ নিয়েই পাঠকের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। আর সেটাই তো লেখকের সত্যিকারের পরিচয়।"

• • •

১৯৩০ সাল। উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সমুজ সঙ্ঘের অন্যতম কর্মসচীব ও গল্প-ভারতীর পরিচিত লেখক অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং উত্তর কলকাতা যুব-সম্মিলনের অধিবেশনে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠেছিল যে বামুনের মেয়ে উপন্যাসে বাংলাদেশের কৌলিন্যপ্রথার সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর লিপিনৈপুণ্যের জোরে যে কাহিনী এবং যেসব চরিত্রসৃষ্টি করেছেন, তার আবেদন উপন্যাস হিসাবে গ্রহণীয় হলেও, নাটকের মধ্যে তা সর্বকালেরও নয় এবং বর্তমান যুগের উপযোগীও নয়। শরৎচন্দ্র সেই অভিনয় আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং অভিনয় দেখে খুসী হয়েছিলেন। এই সূত্রে যে কথাগুলি তিনি ঐ উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে।

"বামুনের মেয়েতে যে সমস্যা তা আজকের সমাজে নেই। যারা একথা বলে তাদের কথাকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাই না। কিন্তু কথাটার সবটাই ঠিক নয়। আমরা যে বংশ মর্যাদার গৌরব করি সেই বংশের কতটুকু আমরা জানি। যে ঘটনাটি আমাকে বামুনের মেয়ে লিখতে প্রণোদিত করেছে তা হচ্ছে এই: কোলাঘাট স্টেশনে একটি স্ত্রীলোক পান বেচতো। সচরাচর যে রকম স্ত্রীলোক এরকমভাবে পান বেচে, তাকে দেখলে তা মনে হত না। এই কারণে তার প্রতি আমার একটা ঔৎসুক্য জাগে। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আমার বামুনের মেয়েতে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের যা চরিত্র, তা আমি এ থেকেই পেয়েছি। অবশ্য এর ছেলে একজন সরকারী বড় চাকুরে আর এর আত্মীয়-স্বজনরা জানে যে এ পাগল হয়ে বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছে বা মারা গেছে। তাই বলি, সমস্যার সবটাই কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? এই যে সরকারী বড় চাকুরে, বংশমর্যাদার গৌরব কি সেই ভদ্রলোকের নেই? না থাকবেই বা কেন? কিন্তু সে তো জানে না যে কি দুঃখে তার মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে—আর ফিরে আসেনি।

• • •

শরৎচন্দ্রের একটি রিভলভার ছিল। প্রতিবৎসর তার লাইসেন্স বদলাতে হ'ত। এ কাজটি করতে তিনি নিজে পুলিশের কাছে যেতেন। এমনি একদিন তিনি যখন যাবার আয়োজন করছেন সেই সময় তাঁর এক অনুরাগী ভক্ত তাঁর কাছে গেছেন। কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বললেন, "শুধু লাইসেন্স বদলানো নয়, টেগার্ট সাহেবের (পুলিশ কমিশনর) সঙ্গেও আমাকে একবার দেখা করতে হবে। তার ধারণা আমি যখন 'পথের দাবী' লিখেছি তখন বাংলার বিপ্লবীদের নাড়ির খবর আমি জানি। গত বছরে আমি তার এই ভুলটা ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই লোকটা তার মত বদলাতে রাজী হয় নি। তখন আমি বললুম, তাহলে তুমি আমায় ধরছ না কেন? উত্তরে সাহেব খুব হেসেছিল।"

ভক্তটি বললেন, "দেখুন, আপনাকে ওরা ধরতে না পারে কিন্তু আপনার সব খবর যে ওরা জানে না, তা হতে পারে না। ওদের গুপ্ত বিভাগ খুব সজাগ।"

শরৎচন্দ্র হাসলেন, বললেন—"তাই নাকি! তাহলে বলি শোন। সেদিন হঠাৎ বিপিন (বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙুলী) স্ত্রীলোকের বেশে রাত্রে এসে উপস্থিত। সাতশো টাকার তার ভীষণ দরকার। ঘণ্টা কয়েক থেকে ভোর রাত্রে সে চলে গেল। ওদের পিছনে তো পুলিশ লেগেই আছে, এই দু'পাঁচদিন আমার একটু সন্দেহের মধ্যে কেটেছিল। আর যদি ধরেই নিয়ে যেতো কি আর করতুম। তবে এ বিশ্বাস আমার বিপিনের ওপর ছিল যে সে যদি নিজে ধরাও পড়ত, তাহলে পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে আমার টাকা দেবার খবরটা বার করতে পারতো না। ওর মতো একটা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী খুব কমই দেখা গেছে। তুমি যে বললে, পুলিশ আমার সব খবর রাখে, তাহলে, এ খবরটা তারা পেল না কেন? এবার পেলে তারা নিশ্চয় আমাকে ছাড়তো না।"

• • •

শরৎচন্দ্রের বিলাত যাত্রা নিয়ে এক সময়ে যেসব কিছু উত্তপ্ত বিদ্বেষ, লেখালেখি এবং মন কষাকষির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বিশেষ আত্মীয়জন অনুরাগী অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর যে কথাবার্তা হয় তা এই সূত্রে বলা যেতে পারে। এই নেপথ্য কাহিনী বোধ করি অনেকেরই জানা নেই।

১৯৩৪ সাল। 'বিজয়া' নাটকের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র 'নববিধানের' নাট্যরূপ দিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু হঠাৎ শিশিরকুমার অসুস্থ হওয়ায় সে কাজে বাধা পড়ে। এদিকে আবার আগস্ট মাসে ইউরোপ যাবার সব ঠিক হওয়ায় নাটক করার চিন্তা তিনি ত্যাগ করেন—কথাপ্রসঙ্গে এই কথা শোনা যায়।

এর কয়েকদিন পরেই যেসব ঘটনা ঘটে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ইউরোপ যাত্রার সংবাদ শুনে একখানি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক পত্রের প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাগজে এই মিথ্যা সংবাদটি প্রচার করেন যে শরৎচন্দ্র ইউরোপে যাচ্ছেন, নোবেল পুরস্কার পাবার জন্যে তদ্বির করতে।

এই সংবাদ যে সর্বৈব মিথ্যা, নিছক কুৎসা রটনা, এই কথাটাই শরৎচন্দ্র আর একটি ইংরেজি দৈনিক কাগজ মারফৎ দেশবাসীদের জানিয়ে দেন।

অবিনাশ ঘোষাল তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। "তাহলে নোবেল পুরস্কারের কথা মোটেই ওঠেনি বলুন?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "আদপেই না। কিছুদিন ধরে মণ্টু (দিলীপকুমার রায়), কানাই (ডঃ কানাই গাঙুলী) এবং আরও কয়েকজন আমাকে একবার ইউরোপটা দেখে আসবার জন্যে বলে, আমারও শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে হয়, এমন কি পাসপোর্ট পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে।"

ক্রমে জুলাই এসে গেল। শরৎচন্দ্রের ইউরোপ যাবার সময় আসন্ন হল। ইউনাইটেড প্রেস থানার যে সঙ্গনের বাঙালীরা তাঁর ইউরোপ যাত্রার কথা শুনে ঠিক করেছেন যে লণ্ডনে আসবার জন্যে তাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন এবং তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেবার জন্যে বিদেশস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি সমিতির সম্পাদক শ্রী বি. সি. রায়চৌধুরী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য শ্রী এন সি. দত্ত একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করবার ভার নিয়েছেন। আর যাতে এই সম্বর্ধনায় বার্নাড শ, এইচ. জি. ওয়েলস, আলডু হাকস্‌লি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগদান করেন তার জন্যেও বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু যাওয়া তাঁর হয়নি। বলেছিলেন, "যাবার জন্যে তো সবই ঠিক করেছিলুম, কিন্তু রোগটা এত বেড়েছে যে এখন বিদেশ যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তার ওপর, সেখানে গেলে তিনচার মাসের আগে ফিরতে পারবো বলে মনে হয় না, অথচ শীত পড়তেও দেরী নেই। এ অবস্থায় বাইরে যেতে মন চাইছে না। ও আইডিয়া আমি ত্যাগ করেছি। আসছে বারে যা হয় দেখা যাবে।"

এর পর অবশ্য তিনি আর বিদেশ যাবার কোন পরিকল্পনা কোনদিন করেন নি।

আলাপ করতেও যেমন, তেমনি তাঁর চিঠির মধ্যেও তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের অনেক কথাই প্রকাশ পেয়েছে। এমনি কয়েকটি চিঠি এখানে পরিবেশন করা হল :

১৯২৫ সালের ১০ই ও ১১ই এপ্রিল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় তার সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সম্মেলন শেষে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানে তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ওঠেন। চারুচন্দ্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ঢাকা থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র চারুবাবুকে কয়েকটি পত্র লেখেন, তার মধ্যে একটি পত্রে তাঁর মনের একটি বিশেষ দিকের একটি মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠেছে :

বাজে শিবপুর। ২১এপ্রিল, '২৫।

ভাই চারু,

আজ আমার চিঠিপত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়। তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে, একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তার পার্শ্বে একটা জবাই করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন?

তারপর তোমরা স্টেশন থেকে চলে গেলে, গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে এক পাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে, মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল, তা লেখা যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে 'সুপারষ্টিশন', তা আমার নেই, কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দিল না। বাড়ি এসে শুনলাম, ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

বাড়িতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার। পরের বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়—তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম, চারু, পৃথিবীতে অবজেক্টিভটা কিছুই নয়, সাবজেক্টিভটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বৈ ত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়। —তোমার শরৎ

১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. উপাধি দেন। সেই উপলক্ষে তিনি ঢাকায় যান এবং বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেন। সেই সংক্রান্ত চারুবাবুকে লেখা দুটি চিঠি নীচে দেওয়া হল। প্রথম পত্রটিতে বন্ধুদের প্রতি শরৎচন্দ্রের আন্তরিক অনুরাগের একটি সুন্দর চিত্র এবং সেই সঙ্গে তার মনের উদাস ভাবনা রূপ পেয়েছে।

২৮শে মাঘ ১৩৪২

প্রিয়বরেষু,

ভাই চারু, ইতিমধ্যে বাড়ী গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি নে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দেরী নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এই মাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধ সভায় যাবার আমন্ত্রণ পত্র। শিবপুরে কত বিকালবেলাই না একসঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছি। তুমি আছ একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না চারু। কেবলই সিঙ্গনের কথা ভাবি। সুমুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাকগে এসব কথা। তোমার মন খারাপ করে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসাই আমার সবচেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভরে যায়। ঢাকায় যদি যাওয়া হয় তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠবো তুমি নিমন্ত্রণ করে না রাখলেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সস্নেহ নমস্কার জানিয়ে বলো, তাঁর আহ্বান অবহেলা করব না। তোমাদের—

শরৎ

ভাই চারু,

তোমার ওখানে গিয়ে তোমার কাছে থাকবো না তো বিদেশে যাই কোথায়? ওখান থেকে যেসব সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান এসেছে তাদের সবাইকে জানিয়েছি যে আমি চারুর বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

আজ শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এসে বলছিলেন, শরৎদা আমি আপনার সেক্রেটারী হয়ে ঢাকায় যাব। আমাদের উপেন মামা (বিচিত্রা সম্পাদক) বলছিলেন তাঁরও ঢাকা যাবার ইচ্ছে। উপেন শেষ পর্যন্ত হয়ত যেতে পারবে না। কিন্তু তুলসী সম্ভবত যাবে। কোথায় তার থাকার ব্যবস্থা করা যায় বলত?

আর একটা কথা। আমাকে কি একটা গাউন তৈরী করিয়ে নিয়ে যেতে হবে?

(ডি-লিট উপাধি নেবার জন্যে) জীবনে আর কখনো প্রয়োজন হবে না শুধু একটা দিনের জন্যে একী বিপদ! সঙ্গে একটা তৈরী করিয়ে নিয়ে যাব? ইতি ২রা শ্রাবণ ১৩৪৩

তোমার স্নেহার্থী—শরৎ

শরৎচন্দ্রের জীবনে বহু অনাত্মীয় পুরুষ ও মহিলা তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, 'দিদি', 'শ্যামলী', প্রকৃতি উপন্যাসের লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। শরৎচন্দ্রের বহু পত্রে নিরুপমা দেবীর প্রতি যে গভীর স্নেহ ফুটে উঠেছে তার করুণা এবং আকুলতা মনকে রীতিমত অভিভূত করে।

নীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক কানপুর নিবাসী মহিলা তাঁকে দাদা সম্বোধন করে পত্র লিখতেন এবং শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে সে সব পত্রের জবাব দিতেন। তাঁকে লেখা ৭টি এবং রাধারাণী দেবীকে লেখা একটি পত্রের অংশ বিশেষ এই সূত্রে নীচে দেওয়া হল :

বাজে শিবপুর। হাওড়া

২১. ৭. ১৯

"পরমকল্যাণীয়াসু,

.....আমার সত্যকার শিক্ষা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে বোধকরি আপনার অপরিচিত নয়। 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'সিঁথিসিঁদি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ এই মেয়েটি একদিন যখন তাহার ষোলবৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে সান্ত্বনার করিয়া ওই কথাটাই বুঝাইয়া ছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারী জন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা, ইহার কোনটাই সত্য নয়"। তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই। তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়েমানুষ হইয়াই নাই। এটি আমার বড় গর্বের জিনিস।"

আর একটি চিঠিতে লিখছেন—　　(তারিখ, বাজে শিবপুর। ৭ই ভাদ্র ১৩২৬)

"বুড়ির ওপর ভারী আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জান? ব্রহ্মচর্য জপতপ ইত্যাদি ন্যাঠামীর আগুনে ভিতরে তার যা কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল।"

আর একটি পত্রে (তারিখ ২০শে বৈশাখ ১৩৩৭) পানিহাটি থেকে কবি রাধারাণী দেবীকে লিখছেন :

"একান্ত বাধ্য না হলে কখনো কোনো কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কী করে! সেই ইতিহাসটাই বলি। আমার একজন 'গার্জেন' ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেওনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। কিন্তু এখন তিনি সবচেয়ে ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনও খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি এবং তাড়া খাওয়া থেকে একেবারে মুক্তি পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে চঞ্চল হই, তখনই আবার মনে হয়, ঢের তো লিখেছি আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মেয়াদের বাকি ছ'চারটে বছর ভোগ করেই নিই না কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত ব'ড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।"

পুরাতন পাতা

ভারতীর খেয়াল খাতা

ভারতী পত্রিকার একটি বিভাগ ছিল। তার নাম খেয়াল খাতা। তার মধ্যে নামী লেখকরা চুটকি সরস ছোট ছোট রচনা লিখতেন। মনের খেয়ালে যা এলো তাই লিপিবদ্ধ করতেন বলে নাম দেওয়া হয়—খেয়াল খাতা। কিন্তু এই চুটকি লেখাগুলির মধ্যে চিন্তার অভাব ছিলনা। সময়ে সময়ে ছোট ছোট লেখাগুলি অনেক বড় বড় ভাবের বাহন হয়ে দেখা দিত। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতী থেকে আমরা সেই সময়কার দুজন বিখ্যাত লেখকের কিছু খেয়াল উদ্ধার করে দিলাম।

—সম্পাদক পত্রভারতী।

অসহিষ্ণু পত্নী

ভীরুধা রহস্যপটিয়সী, অভিমানিনী, অথবা রুক্ষ প্রকৃতির পত্নীর স্বামী বেচারা যেন বেলোলাইয়ের কারখানার কারিগর। পত্নীরূপিনী কলকব্জা লইয়াই বেচারার কারবার। কলকব্জা না ঘাঁটিলে তার সংসারযাত্রা নির্বাহ হওয়া কঠিন; আবার কলকব্জা হইতে জীবন সঙ্কট সর্বদাই। কলকব্জাকে তোষামোদ জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক সময়ে সোহাগ-চিমটায় ধরিয়া অতি সন্তর্পণে ব্যবহার না করিলে বিষম সংকট উপস্থিত হয়। কলকব্জা সর্বদাই অলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকে. একটু বাতাসেরও ভর সহ্য হয়না।

ওঠা আর নামা

অন্ধকারে অপরিচিত সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সিঁড়ি নিঃশেষ হইয়া গেলেও মনে হয় বুঝি আরও আছে। পদ উচ্চাশায় উত্থিত হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া নীচে পড়ে,—মাতা ধরণী যেন তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহেন না।

তেমনি নীচে নামিবার সময়েও সিঁড়ি নিঃশেষ হইয়া যাইবার পরেও নীচগামী পদ অপ্রস্তুত হইয়া ঠোকর খায়,—যেন মাতা ধরণী উঁচু হইয়া উঠিয়া বুক পাতিয়া তাহার অবনতির মধ্যপথে বাধা দিলেন।

এমনি যাহারা অন্তভাবে উচ্চাশা পোষণ করিয়া চলে, হঠাৎ একদিন তাহাদের আশা ভঙ্গ হইয়া যায়। চারিদিকে তখন কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। অতটা উঠিয়াও একবারের অকৃতকার্যতা বড়ই অপ্রস্তুত ও অপদস্থ করিয়া দেয়।

এমনি আবার যাহারা অন্তভাবে অধঃপাতের দিকে ছোটে, তাহাদের বিষম অবনতির শোক সত্ত্বেও অবস্থা ও ঘটনা তাহাদিগকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা দেয় যে তখন তাহাদিগকে সমতল পথে ফিরিতে পাইতে হয়।

দুই আর তিন

এ বিশ্বনিখিলে যত সংখ্যা আছে সবই দুই আর তিনের সংযোগে নিষ্পন্ন করা যায়, কেবল ১, ২, ৩, ৪ আর ৬ ছাড়া। ২ এবং ৩ স্বয়ং নায়ক-নায়িকা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ৪ শুধু ২-এর অপেক্ষা রাখে, এবং ৬, হয় ২ নয় ৩-এর কাছে ঋণী, উভয়ের কাছে নহে। ৩ হইতে ২-এর বিয়োগে ১ এর উৎপত্তি।

আমার মনে হয়, ২ বুঝি পুরুষ ও প্রকৃতির চিহ্ন এবং ৩ ত্রিগুণের চিহ্ন। ত্রিগুণান্বিত যে পুরুষ প্রকৃতি তাঁহারাই নিখিল জগতের স্রষ্টা। ৪ বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের চিহ্ন; ৪ পুরুষ প্রকৃতির চিৎশক্তি ৬ ঋতু অর্থাৎ কালের চিহ্ন; কালের নিত্যতার ব্যাপক পুরুষ প্রকৃতি (২) এবং ত্রিগুণ (৩) উভয়েই ত্রিগুণাতীত যে পুরুষ প্রকৃতি (৩-২) তিনিই এক (১) "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবুর আক্ষেপ

ইংরেজ আমলে ভারতীয়দের নামের আগে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হত—বাবু। যথা বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাবু বিপিন চন্দ্র, বাবু হরদয়াল ইত্যাদি। ক্রমে "মিস্টার" এলো। তার পর এল "শ্রীযুত"। 'বাবু'-ক্রমে বিদায় নিল। এই উপলক্ষে "বাবুর" লেখকের আক্ষেপ। —সম্পাদক গল্পভারতী।

ভাই বাঙালী, আমি আজ বহুকাল যাবৎ তোমাদের উপর রাজত্ব করিতেছি, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় আমার সিংহাসনচ্যুতির উপক্রম হইয়াছে।

ইংরাজের শিক্ষার গুণে আমার রাজত্ব বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভদ্রলোক মাত্রেই আমার প্রজা হইয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি বিলাত ফেরৎ ব্যক্তি আমার শাসন মানিলেন না। সমুদ্র পার হইতে আসিত 'মিস্টার' নামক এক বিদেশীয় রাজার অধীনতায় তাঁহারা আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহাদিগকে কেহ "বাবু" বলিলে তাঁহারা অত্যন্ত কষ্ট হইতেন—এবং অনেক সময়ে শাস্তিভঙ্গেরও উপক্রম করিয়াছেন শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কারণ সংখ্যায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

আমার এতদিনের রাজত্বের পর, এই বৃদ্ধ বয়সে আমার উপর তোমরা এমন বিরূপ হইলে কেন? "শ্রীযুত" নামক কোথাকার কে একটা পাষণ্ড ছোঁড়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে। ও শ্রীযুতটা কে? ও একটা upstart মাত্র,—কোন মোহিনী মায়ায় ও তোমাদের ভুলাইল? দেখিতেছি, আজকাল অনেক নব্যতন্ত্রের লোক পরস্পরকে চিঠি লিখিবার সময় "শ্রীযুত" লিখিতেছেন। অনেক সভাসমিতি ও সংবাদপত্র নিজ নিজ সভ্য ও গ্রাহকগণের ঠিকানা লিখিবার সময় "শ্রীযুত" শব্দই ব্যবহার করিতেছেন, কেন ভাই, আমি কি অপরাধ করিলাম? আমি তো ম্যানচেস্টর হইতে আসি নাই, লিভারপুল হইতেও আসি নাই। আমার বরখাস্ত করা কি তোমাদের সুবিচার হইতেছে?

তোমরা হয়ত বলিবে, সাহেবরা আমাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে তাই তোমাদের বড় অপমান হয়। স্বীকার করি, সাহেবরা যখন অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সহিত অত্যন্ত ঘৃণার স্বরে তোমাদিগকে বলে, Look here, Babu—তোমাদের প্রাণে বড় লাগে।

কিন্তু সে কি আমার দোষ, না তোমাদের দুর্ভাগ্য? ঐ শ্রীযুক্তটা কি তোমাদিগকে সে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যখন আমি আর থাকিব না, সকলেই যখন তোমরা শ্রীযুক্ত হইয়া উঠিবে—তখনও যদি তোমরা এখনকারই মত অপদার্থ থাকো তাহা হইলে তখনও তোমরা সাহেবদের তথা জগতের ঘৃণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

তোমাদের স্বভাবই এই, নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানো। তাহা আমি বহুকাল হইতেই জানি। তোমরা "বাবু" বলিয়াই যে সাহেবরা তোমাদের হেয়জ্ঞান করে তাহা নহে। তাহার অন্য কারণ আছে। সেই কারণটির প্রতিকার কর, তখন দেখিবে এই বাবু খেতাবই তোমাদের শিরোভূষণ স্বরূপ হইবে। সুতরাং আমাকে বিনাদোষে বহিষ্কৃত করিয়া তোমরা পাপের ভরা আরও ভারি করিও না।

আমি একদিন যাইব, আপনিই যাইব। সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইবে- সেদিন ভারতবাসী মাত্রের নামের শিরোভাগ এক হইবার সময় আসিবে। তখন আমার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য আর একজন আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে। সে শ্রীযুক্ত নহে, মিস্টার নহে, মৌলবী নহে, মুন্সী নহে, লালা নহে, পণ্ডিত নহে,—তাহার নামটি আমি এখনো জানি না। সে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেই—আমি তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিয়া স্বহস্তে তাহাকে আমার সিংহাসনে বসাইয়া ইতিহাসের অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিব। ততদিন তোমরা অপেক্ষা কর; এবং সে ততদিন যত শীঘ্র আগমন করিতে পার, তাহারই জন্য বদ্ধপরিকর হও।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

সমুদ্র বিহঙ্গ

হরিপ্রসাদ ভৌমিক

তখন আকাশে চাঁদ ছিল। নারিকেল পাতা ঝিলমিল ক'রে কাঁপছিল। চারদিক নিঃশব্দ। কার যেন আসবার কথা আছে। কিন্তু আসছে না।

উপাধানে মাথা রেখে বারবার এপাশ ওপাশ করল অতসী। সাত পাঁচ ভাবল। অর্থহীন সংলাপ পড়ল মনে মনে। অনেকক্ষণ জানালার কাছে রাস্তার ঘোলাটে লাইট পোস্টটার দিকে তাকিয়ে থাকল। চোখের পাতা জোড়া লাগছে না। টি. বি. ক্যানসার অথবা অন্য কোন রকম মারাত্মক রোগীর মতো হঠাৎ স্বগত স্বরে বলে ফেলল—ভালো লাগছে না।

সন্ধ্যার পরে দেয়াল ঘড়ির প্যাণ্ডুলাম অশ্লীলভাবে টিকটিক করছে। কানের কাছে যেন সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। বিকেলের এক টুকরো সোনার মতো রোদ্দুর অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে।

হঠাৎ কড়া নড়বার শব্দ হ'ল দরজায়।

অতসী চুপ ক'রে ছিল। চুপ ক'রে থাকল। আগে দু'বার ভুল হয়েছে। উঠানের ভিজে জুঁই ফুলের গন্ধ বুঝি অতসীকে বাচাল ক'রে তুলেছে!

—কে? শঙ্খচিলের মতো করুণ স্বরে কথাটা টেনে ধরে রাখল অতসী। ভয় ভয় করছে। যদি সে না হয়? মিহির যদি না আসে?

অদূরে খুটখাট শব্দ। অনেক দিনের পরিচিত।

অতসী অবিন্যস্ত কাপড় গুছিয়ে নিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। মুখ মুছল। অধরে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল তার।

কম্পিত হাত লাগিয়ে দরজার খিল খুলল অতসী।

—কি ব্যাপার! ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। মিথ্যাভাষণে অতসী অনভ্যস্ত। তাই ভাগর ভাগর দু'টি চোখ নিজেকেই শাসাল। অতসীর হাল্কা শাড়ির আঁচল মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

মিহির বসতে বসতে বলল,—ডিস্টার্ব করলাম?

সে কথার জবাব না দিয়ে অতসী ফ্যানের মিটার বাড়িয়ে দিল। মিহিরের চোখে চোখ রেখে চুপ ক'রে থাকল।

অনুভিযোগ করতে লাগল মিহির। দামী প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছল। নড়ে চড়ে বসল।

হঠাৎ পাহাড়ী ঝর্ণার মতো শব্দ ক'রে হেসে উঠল অতসী—তুমি বোধ হয় সব ভুলে গেছ ?

—কি রকম ? মিহির স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করল।

—অতসী নামে একটা মেয়ে ছিল। সে তোমাকে ভালবাসতো। তোমার জন্যে মেয়েটি কাঁদলিও পেয়েছিল।

মিহির অপ্রস্তুত হ'ল। একসঙ্গে অনেক—অনেক কথা ভাবল। একটি পুরানো ছইস্কতের উপর কতগুলি নোংরা কীট কিলবিল করছে। মিহিরের গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল।

—কিন্তু সে সব কথা এখন কেন অতসী ? সে নদী যে শুকিয়ে গেছে।

পাশেই রেডিওর রবীন্দ্র সঙ্গীত বেজে উঠল। মিষ্টি সুর। ওদের শ্রবণ শক্তির সম্পূর্ণ অংশ সে দিকে পড়ে রইল। চলচ্ছবির মতো পর্দার উপর ভেসে উঠল অতীত দিনের স্মৃতি।

খবর পেয়ে মিহির হসপিটালে ছুটে এল। অতসীর সব আত্মীয় বন্ধুদের শংকিত মুখ। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মানুষ। অভিজ্ঞ ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। নার্সরা ছুটোছুটি করছে।

— ডাক্তারবাবু, বেশি বাঁচবে তো ?

অতসীর মা ফুঁপিয়ে উঠলেন। হয়তো এখনি তাঁর মূর্ছাদের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়বে। অস্বাভাবিক ভেঙে পড়েছেন। বড়ো বয়সের মেয়ে। একটু আদর বেশি। একটু বেশি সোহাগ।

অদূরে ওয়েটিং রুমে বসে আছেন বিখ্যাত শিল্পপতি চৌধুরী সাহেব। সমুদ্রের মতো চুপ ক'রে আছেন। তাঁর বুকে পড়া ওষ্ঠ থেকে যে কোন মুহূর্তে আগ্নেয়গিরির লাভা বার হ'তে পারে। কারণ মিঃ উমাকান্ত চৌধুরীর জীবন আপোষহীন সংগ্রামের জীবন।

ডাক্তার বেরিয়ে আসছিলেন। চৌধুরী সাহেব গম্ভীরভাবে শুধালেন,—কি রকম দেখলেন ? এক্সপায়ার করবার সম্ভাবনা……

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।" ছি ছি, এখন ওসব বলতে নেই। ঈশ্বর…ঈশ্বর…ঈশ্বর।

আইনস্টাইনের থিওরি অফ্ রিলেটিভিটির সপক্ষে বক্তৃতা ক'রে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত কলার বিজ্ঞানের ছাত্র মিহির মজুমদার চারপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল।

—মৃত্যু ! তুমি যাবে যাবে আমার ভয় রেখিও। আমি দু'হাতে ঈশ্বরের দাড়িয়া শক্ত ক'রে ধরে রব।

—অতসী, কেন তুমি সুসাইড করতে গেলে ?

ইলেকট্রিকের আলো চৌরঙ্গীর দিকে চকচক ক'রে উঠল। নিভে গেল। কৃষ্ণচূড়া গাছে নীড়-হারা পাখীদের তীব্র চিৎকার। ময়দানে ভিজে ঘাসের সোঁদা গন্ধ। অন্ধকারে নরনারী। মিহির অতসীর হাত চেপে ধরল। স্পন্দিত বুকের শব্দ শুনতে লাগল বসে বসে।

—বাবা বলেছেন মরতে। যাও চান না যে আমি তোমাকে বিয়ে করি।

মিহির ছিটকে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল,—না অতসী তা হয় না।—আমি চাই তুমি বেঁচে থাক। তোমাকে বাঁচতেই হবে।

—কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায় ? অতসী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মিহির পাগলের মতো হো হো ক'রে হেসে উঠল। দূর্বাঘাসের ওপর পা ছেপে বসল। সিগারেট টেনে উত্তেজনা আনতে চেষ্টা করল। এমন এক গ্রাম্য স্বামী যদি হ'লে মন্দ হ'তো না। এরা মন নামক বস্তুকে পুড়িয়ে ফেলতে ভয়ংকর রকমে সাহায্য করে।

—ওয়েট এণ্ড সী—।

সুতরাং চৌধুরী সাহেবও আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। সময় মতো কেস কোর্টে উঠল। নোটিশ পেল মিহির। একটি শিক্ষিতা নাবালিকা মেয়ের আভিজাত্য, সম্ভ্রম নষ্ট করবার অভিযোগ।

কাঠগড়ায় মিহির। ফরিয়াদী পক্ষে লম্ব বিলাত ফেরৎ তরুণ ব্যারিস্টার-এট-ল সওয়াল করছে। আত্মপ্রত্যয়বান অভিনেতার মতো আপাদমস্তক নাড়িয়ে অভিনয় সুরু করেছে। মুখে তার সাত সমুদ্র তের নদীর উত্তালতা। চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। পায়ে পায়ে ছন্দ। যাদুকরের মতো প্রতিমুহূর্তে ভেল্কি দেখাচ্ছে। জুনিয়রের কাছ থেকে লাল নীল হলদে ফাইল খুলে প্রচুর কাগজ বার ক'রে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে। দু'এক লাইন পড়ছে। ঝড়ের মতো সেখানে তীব্র গতিবেগ।

অবশেষে অভিজ্ঞ বিচারক একখানি কাগজ টেনে নিলেন। পুরোন্যানেকর দম্পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বিড়বিড় করলেন। কাঁচাপাকা একমাথা চুল নাড়লেন। সবাই চুপ ক'রে ছিল। কি হয়—কি হয়? একটা অসহনীয় আতঙ্ক।

তখন হিজ মেজেষ্টি অনারেবেল জজ জুরীদের সঙ্গে এক মত হ'য়ে মিহিরের কারাদণ্ডের মেয়াদ ঘোষণা করলেন। কাঠগড়ার সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে মিহির এক দুই তিন চার—পা ফেলল।

চৌধুরী সাহেবের অনেক তাবক পালিয়েছিল অদূরে। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে তাদের মুখ কলরল করতে লাগল।

মিঃ উমাকান্ত চৌধুরী দীর্ঘদেহী বিজয়কান্ত ব্যারিষ্টারের পিঠ চাপড়ালেন। স্তাবকের দল সাবাস সাবাস ক'রে উঠল।

—জল দাও জল। একটি নীর্ব চীৎকারে চারদিক মুখরিত হ'য়ে উঠল।

মিহির গাড়ীতে উঠে বসেছে। নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকল সে। পৃথিবী ঘুসর লাগছে। কুয়াশার মতো। অস্পষ্ট লাগছে। নেপথ্যে সব স্মৃতি এলোমেলো প্রলাপ বকতে সুরু ক'রে দিয়েছে তখন।

কে যেন বলল,—মেয়েটি ফিট হ'য়ে পড়ে গেছে।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও মিহির তাদের জাল অতিক্রম ক'রে মুখ বাড়াতে পারল না। পারল না চোখ ফিরাতে। এই সব মুহূর্তে মানুষ বোধ হয় জড় পদার্থে পরিণত হয়।

কাবলিকে পুড়ে যাওয়া সেই দুপের দাগ অবিকল আজও রয়েছে। অতনী, সুন্দরী অতনী! তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি মুখ বয়সের চাপে ঝুলে পড়েছে। স্নো, পাউডার আর লিপষ্টিকের পালিশ লাগালে কি আর যৌবন ফিরে আসে? ফিরে আসে মুঠো মুঠো রক্তের রঙীন নেশা? অতএব অতীত ডেকে এনে বিষাদের রজনী গন্ধা নাই-বা ফোটালে। টবের মরা গাছে নাই-বা করলে দু'ফোঁটা বারি সিঞ্চন। মরুভূমির দাহ আপাতত মন্দ লাগছে না। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা অতীতের কথা ভুলে যাব। আমাদের প্রাপ্তির ঘরে থাক দু'য়ে আর দু'য়ে শূন্য।

—ব্যারিস্টার সাহেব কোথায়? এত কষ্ট ক'রে যিনি অতনী ফুল চয়ন করলেন?

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ছলে কিছু রসব্যঙ্গ করতে চাইল মিহির।

অতসী মিহিরের শ্লেষাত্মক কণ্ঠ লক্ষ্য করল। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে বলল,—রসংস্থলে গেছেন।

—কী ব্যাপার! অর্থ নারীঘটিত কোন অবৈধ কেস আছে নাকি?

মিহির মাত্রাধিক খোঁচা মারল। বয়স্থজনোচিত কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল মুখে।

অতসী চীৎকার ক'রে উঠল,—অস্বীকার করতে পার—আমার ওপর একদিন তোমারও লোভ ছিল? অস্বীকার করতে পার—হাত জোড় করেছিলে? পা ধরেছিলে?

মিহির শিশুর মতো সরল শব্দে হেসে উঠল। বিস্তস্ত চুলে হাত বুলাল। এক গাল সিগারেটের ধুয়ো ছাড়ল।

—অতসী, পা ধরলে যে মেয়েদের সম্মান আরও বেড়ে যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীমতী এর কংক্রিট অ্যাকজাম্পল।

অতসীর কণ্ঠস্বরও এবার খানিটা শোনাল।

—তুমি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। একদিন এই অতসীকে তুমি একান্তভাবে চেয়েছিলে কিনা?

—সে জন্যে তো শাস্তিও কম পাইনি অতসী। ছেলে কাজের গলতি হ'লে ওরা "মূলারকা বাচ্চা" বলে গালি দিতো।

অতসী জানালার দিকে তাকাল। কখন সাঁঝের চাঁদ অস্ত গেছে। মিহির কি অতসীকে বুঝবে না? অন্ততঃ এতটুকু বুঝতে চেষ্টা করবে না? এই আবরণ ঢাকা বুকে বড় ব্যাথা। বড় জ্বালা। দুষ্টক্ষতের মতো দগদগে ঘা। রাতদিন পুঁজ ছড়াচ্ছে। ভাবলে মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠে।

অতসীকে নিশ্চুপ দেখে মিহির কথা বলল,—তোমাদের ব্যারিস্টার সাহেব ফিরছেন কবে?

—দেরি হবে!

—মানে!

—ইলেকশান রয়েছে।

—ইলেকশান! প্রায় আকাশ থেকে পড়ল মিহির।—রাজাটাজা হবেন নাকি?

—না। পার্টির নিস্তার নাকি বলেছেন, ওরা জিতলে পূর্ণ মন্ত্রী ক'রে নেবেন ওকে।

—তুমি গেলে না ক্যানভাস করতে?

—অতসী গম্ভীর হ'য়ে থাকল। এ সুযোগে মিহির আবার ছেলে মানুষী সুরু করল,—তোমার অন্ততঃ যাওয়ার দরকার ছিল অতসী। মন্ত্রীর বৌ হবে এখন থেকে রিহার্সেল দিয়ে রাখ। পরে সব কায়দাকানুন শিখতে মন্ত্রীত্বের কাল কেটে যাবে যে।

মিহিরের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতসীর দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠল। মিহির নিজের মুঠোয় অতসীর হাত চেপে ধরল। নাম ধরে ডাকল বারবার।

দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। পাশে লণ্ডনে থাকাকালীন সপার্ষদ ব্যারিস্টার সাহেবের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ তোলা উজ্জ্বল ছবি। টেবিলের উপর দামী ফুলদানী ভরা বিভিন্ন রকম মরশুমী ফুল। বাতাসে মিহিমিহি গন্ধ ছড়াচ্ছে। বকের পাখার মতো ধবধবে এবং সাদা বিছানা। ড্রেসিং টেবিলের কাছে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী। এক আলমারী সোনালী কভারের পুস্তকে ভরা। সব আসবাব পরিপাটি ক'রে সাজান।

রুচিশীল পরিবেশনে যেন একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আহা, এসব দেখলে ভালো লাগার কথা মনে পড়ে। ঈর্ষা হয়। চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অতসীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ঝি-চাকরগুলি কী অপূর্ব সাজিয়ে রেখেছে! ঝকঝকে প্যাণ্ডের এক টুকরো কাপড় পর্যন্ত আভিজাত্যের গৌরবে ফেটে পড়ছে।

—বয়স হ'য়ে গেছে। মিহির স্বগতস্বরে কথাটা উচ্চারণ করে নীরবতা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করল।

ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে শূন্যহীন অরণ্যের ছায়া পড়ল। ধূধূ করছে প্রান্তরের অস্পষ্ট রেখা। এই সজ্জিত ঘরের নির্জনে কৈশোর মতো বুকের তল দিয়ে কালো কালো রাত অভিসারে চলেছে। খামচি মেরে মুখের থলথলে মাংসপিণ্ড হাতের মুঠীয়ে কামড়ে নিয়েছে। অবসন্ন বুকের আড়ালে হাড়, মাংস, রক্ত—অবসন্ন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কিছু মনে পড়ছে না। কোন কথা না। ঠিক এই মুহূর্তে—"মুরারি এ জীবনের সব লেনদেন।" বিষাদযোগের দু'একটি উজ্জ্বল শ্লোক মনে পড়ে। গাণ্ডীব হাতে ক'রে স্বর্ণচক্র রথে বসে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মতো চুপ ক'রে বসে থাকতে হয়।

—এল। অতসী মিহিরকে আকর্ষণ করল।

ঘরজোড়া গদিরেশ ভালো বুলান রয়েছে। অতসী মাথার মিলিয়ে চাবি লাগাল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। হঠাৎ রঙীন আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠল মিহির। উগ্র আলো। দু'চোখ যেন জ্বালা করছে।

অতসী এবং তার বর্তমান। ব্যারিস্টার সুধীতল চক্রবর্তী এবং বড় বড় মদের বোতল। রক্তের মতো লাল টকটক করছে। পাশ্চাত্য রমণীর লালসা পিচ্ছিল এক ঘর অর্ধনগ্ন ছবি। রামধনুর মতো সাত রঙে ঝলসে উঠছে। স্বপ্ন ভরা চোখ। অনাবৃত বক্ষ। আবলুস কাঠের দামী টেবিলের উপর কাশ্মীরী সিল্কের বেড-কভার। চারখানা চেয়ার চারদিকে। ঘরে অনেক আলোর বৈচিত্র্য। নৃত্যশীলা নটির মতো ক্ষণে ক্ষণে এ ঘর রং বদলায়। অতসী একসঙ্গে অনেকগুলি সুইচ টিপল। সম্প্রতি ঘরের ভেতর ব্যারিস্টার সাহেব—এ পর্যায়ে একটি করুণ কবিতা প্রকাশ করল।

তারপর ওরা অতসীর ঘরে ফিরে এল আবার। ওরা অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙেছিল। অনেক কথা বলেছিল। সুতরাং মাথা টিপে ধরে নিঃশ্বাস টানল। এই দেহ—এই মন চলন্ত ট্রাম বাস ট্যাক্সির মতো থর থর করে কাঁপছিল। এখন অবসাদ গ্রস্ত শরীর পরিচ্ছন্ন বিছানায় এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। বাইরে টুপটাপ জল পড়তে শুরু করছে। অতসী হাত বাড়িয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিল।

—আমি সুখী নই অতসী ফিস্‌ফিস ক'রে উঠল।

—আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি। মিহিরের কণ্ঠে যৌবনভরা আবেগ গভীর হয়ে নেমে এল।

—সিভিল সার্জন নন্দী বলেছেন, ড্রিঙ্ক না ছাড়লে ও জনক হবার শক্তি ফিরে পাবে না।

—আমি অসহায়। মিহির চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বলল। দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখল।—জেল থেকে বেরিয়ে তোমার বিয়ের সংবাদ পেলাম। ত্রাস হয়েছিল। দুঃখ হল—পরক্ষণেই আমি দার্শনিক হলাম।

—ওই বয়সে কি ভুল করা অন্যায়? অতসী মাথা তুলে বসল। শিরাপাখীর মতো রঙীন ঠোঁটের উপর আঙুল লাগাল।

—একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম—তোমার স্বামীকে গুলি ক'রে মারব।

অতসী চমকে উঠল,—তারপর?

—আমি পারিনি।

—কেন? অতসীর নাভীর স্পন্দন দ্রুত হ'তে লাগল।

মিহির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। এদিক চাইল। ওদিক চাইল। তারপর ভেঙে পড়ল। শীর্ণ আর্তনাদ ছড়িয়ে বলল,—বোধহয় তোমাকে ভালোবেসেছিলাম বলে।

—ভালোবাসা জঘন্য। অতসী চীৎকার ক'রে উঠল।

—এস, আজ রাতে আমরা কোথাও যাব না। পাখীর মতো এক সঙ্গে ঘুমব।

—না।

—কেন? কেন? কেন? মরণিয়াসী মাতালের মতো এক সঙ্গে কেবল একটি প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগল অতসী।

—অতসী, স্লিভ এক্সকিউজ মি! দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি মানুষের মন ভরাতে পারে না। আমরা অনেক বসন্ত পিছনে ফেলে এসেছি। আমরা ভাবতে শিখেছি।

অতসী শুধু অধর দংশন করল। জিহ্বা চেটে দেখল নোনা জলের স্বাদ। মাথা টিপে ধরে টেবিলের উপর পড়ে থাকল অতসী।

—পারবে তুমি স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ আনতে?

বলিষ্ঠকণ্ঠে শুধাল মিহির। লাফিয়ে উঠে সজোরে টেবিলে ঘুসি মারল। তার চুলের উপর প্রতিজ্ঞার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। বন্যার মতো তীব্র উত্তালতা মিহিরের চঞ্চল বাহুতে।

—আই মাস্ট। আমাকে পারতেই হবে। অতসী দৃঢ়স্বরে বলে উঠল।—এই নরক থেকে আমি মুক্তি চাই।

অতসী মিহিরের বাহুর উপর মাথা লুটিয়ে দিল। আলোয় অতসীর চোখের পলক বন্ধ হয়ে আসছে। মিহির অতসীর চুলে হাত লাগিয়ে তেমন ক'রে আদর করল।

—কিন্তু ব্যারিস্টার সাহেব যদি এরকম অনুগ্রহ প্রার্থী হ'য়ে আসেন?

অতসী আস্তে আস্তে বলল,—এলেই বা। দোষ কি?

কোন ক্ষতি নেই। মিহির ঘাস ফুলের স্বপ্ন দেখল। প্রজাপতি সন্ধানী কবির মতো রোমান্টিক হ'ল। গভীর তৃপ্তিতে নিঃশ্বাস টানল। ফুলের গন্ধ, প্রকৃতির গন্ধ বড় মধুর লাগছে। যেখানে গাং শালিক উড়ে, সবুজ ধানের উপর বাতাস ঢেউ খেলে, শালিক বাবুই বাসাবোনে—তেমন গ্রামে ঘর বাঁধব। চালে লাউলতা ছড়িয়ে দেব। ভিজে ফুল হলুদ রং ছড়াবে। এই কোলাহল ছেড়ে চলে যাব দূরে—অনেক দূরে। হোক না তা নির্জন দ্বীপ। সেখানে জল আলো বাতাসের মুখে ভাষা দেব। মনের মানুষ কাছে থাকলে কিসের ভয়—কিসের কুণ্ঠা? আমি কালের ঘড়ি বুড়ির মতো চাঁদে বসে রূপকথার গল্প করব। বয়স বেড়েছে—বাড়ুক না। মন বুড়ো হয় না কখনো।

মিহির অন্ধকারে অতসীর কম্পিত হাত চেপে রাখল নিজের অস্তিত্ব জানাবার জন্যে ফুলফুল ক'রে শব্দ করল। অথচ তখনি মিহির কান পেতে শুনল কিসের উত্তাল ধ্বনি। গর্জন করছে। অবিরাম। ফুলে ফেঁপে উঠছে। নির্বাক। অতল।

আমি বাঁচব। আমি বাঁচতে চাই। আমি যাযাবর। প্যারিস, লণ্ডন নিউইয়র্ক ঘুরে ঘুরে বেড়াব। থামব না কখনো। কোথাও থেমে যাওয়াই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের মৃত্যু।

অমর কে কোথা করে? শিরপতি উমাকান্ত চৌধুরী, তার সুলকায়া পত্নী, ব্যারিস্টার সুশীতল, অতসী—সবাই চলে যাবে। কেউ থাকবে না চিরকাল।

কিন্তু সমুদ্র, তুমি অমর অক্ষয় অবায়। নিত্য বৃদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত। সমুদ্র! তুমি আমার ঈশ্বর।

মিহির বলল,—অতসী, এই আলোবহীন সংগ্রামে বৃদ্ধ করার জন্যে মনে প্রাণে শক্তি রেখো। তৈরী থাকবে।

অতসী বলল,—আমি তৈরি।

অতসীর হাতে উষ্ণ চাপ দিয়ে মিহির বেরিয়ে গেল।

তারপর মিহির আর আসেনি। অতসীর মন মেজাজ খুব খারাপ। ইন্সিওরেন্স নিয়ে সুশীতল অত্যন্ত ব্যস্ত। ডাইভোর্সের কথাটা সরাসরি অতসীই পাড়বে। আদালতে তখন আবার আইনের তুপ্ কপচানো সুরু হবে। দু'জন দু'দিকে যাবে ওরা।···ক্রিং ক্রিং ক্রিং ··

—হ্যালো, চক্রবর্তী কিংবা চক্রবর্টি সাহেব আছেন নাকি? এরকমের কিছু কথা ফোনে ভেসে আসে। সাহেবের ফোনে সাহেবরা কথা বলে। অতসীর কথা কেউ বলে না। ইচ্ছা হ'লে অতসী ফোন ধরে। আবার অতিরিক্ত বিরক্ত করলে অতসী রিসিভার নামিয়ে রাখে। কখনো কানের কাছে আনে।

—হ্যালো, অতসী আছ?

—কে? অতসী নেচে উঠল।

—আমি মিহির কথা বলছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বল, বল। অতসী মাথা নাড়তে লাগল।—কি বললে! চলে যাচ্ছ? কি আপত্তিকর? কিস্সু বোঝা যাচ্ছে না। আরেকটু জোরে বল প্রিজ—কি বললে? কোথা থেকে বলছ তুমি?

মিহিরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—কিং গর্ড ডকের লকগেট থেকে কথা বলছি। জাহাজ হুগলীতে পড়বে এবার। সময় বড় কম।

—কি ব্যাপার বলতো?

—যত দিন থেকে ভাবছি। কেবল ভাবছি। সে রাতটা কি বিশ্রী রকমে কাটল। যা হবার নয়—যা পারি না, তা কেন করব?—অতসী সোন—কেঁদো না। মন মরে গেলে যত কিছু ইন্সুরেন্স থাক না কেন—বাঁচাতে পারবে না কখনো। মিলনের মধ্যি আর আমার মধ্যে কোন তফাৎ নেই এখন।—যাক্‌গে, জাহাজের চাকরীটা ছাড়বার কোন দরকার নেই আর। যতদিন সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে কাটে মন্দ কি!

অতসী কান্নায় ভেঙে পড়ল।—তুমি কি আমার কথাটা ভাববে না একবার! এই কদিন থেকে কত প্রার্থনা করছি—

—কি বললে প্রার্থনা? কাইন—কাইন! আজ থেকে প্রার্থনা করো—আমাদের জাহাজটা যেন এবারই ইণ্ডিয়ান ওশেনে ডুবে যায়।···অতসী, সমুদ্রের জল নোনা। মারাত্মক রকমের নোনা। কিন্তু নারীর ভালোবাসা তার চেয়েও নোনা—তার চেয়েও বিস্বাদ। ·· গুড্ নাইট এণ্ড গুড বাই···

যন্ত্রটির লাইন কেটে গেল। বাইরে মুষলধারে বর্ষা নেমেছে। ব্যারিস্টার সুশীতল চক্রবর্তীর গাড়ী দরজায় এসে দীর্ঘস্বরে হর্ণ বাজাল।

সুশীতলের জামা কাপড় সব ভিজে। আপোছাল। বৃষ্টে ফুলফুটিত বনস্পতির মতো সুশীতল অতসীর

হাত ধরে কেঁদে উঠল,—বেবি, আমি টেলেফাথে হেরে গেছি। জিতব বলে কত টাকা জল ক'রে আমি দুহাতে ছড়িয়েছি। আজ দেউলিয়া।

অতসী চুপ ক'রে থাকতে চেষ্টা করল।

সুশীতল ভেঙে পড়ল।—আজ আমার কেউ নেই। কিছু নেই।

হঠাৎ অতসী স্বামীর ক্লান্ত মাথা কোলে ক'রে আস্তে আস্তে বলল,—কেন? আমি তো আছি।

সুশীতল অনেক দিন পরে একটি ছোমান শিশুর মতো স্নেহ, প্রীতি এবং সোহাগে সিক্ত হ'ল। এক ঘর ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুশীতল অতসীর কোলে মাথা রেখে শীতল হ'ল—ঘুমিয়ে পড়ল।

• • •

সংসার যাত্র করে···বন্ধুরা সন্দেহ করে···

একদিন নরেন্দ্রের কয়েকজন বন্ধু গোপনে ষড়যন্ত্র করে···সকলে এসে নরেন্দ্রকে ধরে তাদের সঙ্গে বাগানে যেতে হবে···

সরল মনে নরেন্দ্র রাজী হয়···

সব বন্ধু মিলে গাড়ী করে কলকাতা থেকে কিছুদূরে এক বাগান-বাড়ীতে এসে হাজির হলেন···খাওয়া-দাওয়া···গান-বাজনা প্রচুর হলো···

নরেন্দ্র একটার পর একটা গান গেয়ে যান···বন্ধুরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শোনেন···

হঠাৎ একজন বলে উঠে, নরেন তুই একটু ভিবো···

নরেন্দ্র চাঙ্গাও হয়ে পড়েছিলেন···

···বারান্দার ঐ ঘরে তুই একটু বিশ্রাম করগে যা···তোর দরকার বিশ্রাম।

সত্যই বিশ্রামের প্রয়োজনবোধ হওয়ায় নরেন্দ্র উঠে বারান্দার ঘরে যান···

তারপরেই দেখেন সেই ঘরে এক তরুণী নারী সুন্দরী···সুবেশা তাঁর কাছে এসে বসলো

নরেন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না সহজভাবে সহধরা জানে তরুণীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন···কে সে তরুণী? কি পরিচয়?

তরুণী তার জীবনের সব কথা বলে যায়···কত দুঃখ···কত যন্ত্রণা···কত অভাব ··

নরেন্দ্রের মন তরুণীর করুণ কাহিনীতে ব্যথিত হয়ে উঠে। সেই সময় তরুণী তাঁর মনস্কামনার ইঙ্গিত জানান···সর্প আহত ব্যক্তির মত নরেন্দ্র উঠে দাঁড়ান, বলেন কথা করবেন এই বলে নরেন্দ্র ছুটে বেরিয়ে পড়েন···

দরজার সামনে বন্ধুদের দেখে বলেন···একজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে এই রকম খেলা করা কি ঠিক ভাই।

গরল

হিরণ্ময়ী বসু

পাহাড়ের কোলে আনন্দ-ভিলাটা দূর থেকে একটা ছবির মত দেখায়। এই ছবির মত দেখতে বাড়ীটার বাসিন্দা মাত্র দুজন। প্রতিমা দেবী আর তাঁর মানুষ করা বোনঝি চম্পা। এরাও ঠিক ছবির মতই বাড়ীটা সাজিয়ে রেখেছে যদিও দুজনের ভাল রং কোথাও গাঢ় কোথাও ফিকে।

ভারতের উত্তর প্রান্তের এই নিরালা পরিবেশে প্রতিমার থাকার কথা নয় কারণ সোসাইটি ছাড়া তিনি থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন না কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আবিষ্কার করলেন বিশাল এক অঙ্কের অর্থ সম্পত্তির সঙ্গে স্বামীর পৈত্রিক ব্যাধির জীবাণুও সংক্রামিত হয়েছে প্রতিমার প্রতি ধমনিতে। সম্পত্তিটাই শুধু পাননি সেই সঙ্গে ক্ষয়রোগেরও মালিক হয়েছেন। সেই থেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

ওদিকে প্রতিমার দিদি অকালেই তার আটপৌরে সংসারের মায়া কাটাতে তার একটি মাত্র মেয়ে চম্পাকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নিলো প্রতিমা। একেবারে লেখাপড়া করে পাকা পোক্ত দলিলে সই করে চম্পাকে তিনি গ্রহণ করলেন। চম্পার বাবা প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন কিন্তু চম্পার ঠাকুমা বললেন 'ছেঁড়া কাঁথায় কোঁড় তুলে আর নক্সার প্রয়োজন নেই, তবু ছেলে হলেও কথা ছিল। বড়লোক মাসি যখন নিতে চাইছে দিয়ে দাও বাপু, খেয়ে পরে বাঁচবে।

সত্যিই বেঁচে গেল চম্পা। ওর পেছনে অঢেল পয়সা খরচের একটা পথ পেলেন প্রতিমা। মেয়েটার গায়ের রং যেন আধফোটা গোলাপের মত। পুরোপুরি যে ফুল ফোটেনি আর বক্ষপুটে জমে আছে মিষ্টি সৌরভ ঠিক সেই রকম একটা আধফোটা গোলাপের মত চম্পাকে মনে হত প্রতিমার। একটা ভরসা অবশ্য রাখলেন। সেই কাকি! কাজ হল চম্পার পরিচর্যার আর প্রতিমার কাজ হল চম্পাকে সাহচর্য দেওয়ার। পাহাড়তলীর বাসিন্দারা বলল চম্পা প্রতিমাদেবীর একমাত্র সন্তান। নিজে যেমন সৌখিন ছিলেন প্রতিমা তেমনি মেয়েকেও তিনি মনের মত করে গড়তে সুরু করলেন। চম্পা বড় হবে লেখা-পড়া গান বাজনা ছবি আঁকায় নাম করবে। সকলের মুখে মুখে শোনা যাবে প্রতিমা দেবীর মেয়ে চম্পা। চম্পার নামের সঙ্গে আর একটি মাধুরী হয়ে বেঁচে থাকবে প্রতিমা।

সার্থক কল্পনা প্রতিমার। চম্পা যেন প্রতিমার কল্পনার ছায়া। যা চেয়েছিল প্রতিমা, সবই দিল চম্পা। সবাই বলে কেমন মায়ের মেয়ে দেখতে হবে তো? সবাই বলতে অবশ্য প্রতিমা পাহাড়তলীর মানুষদের ধরেন না। স্বামীর জীবিতাবস্থায় যেসব উঁচুদরের মানুষ জনের সঙ্গে মেলামেশা ছিল; তাঁদের ভেতরেই মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস গোয়েঙ্কা, মিসেস বুলা মুস্তাফি, রাসবিহারী দত্ত, এদের তারিফটাই ধরেন। কিন্তু তাঁরা তো মৌতাত ফুল। বছরে একবার করে নিজেদের পার্বত্য নিবাসে গ্রীষ্মের প্রকোপ কাটাতে এলে দেখা করেন প্রতিমার সঙ্গে। প্রতিমাও তাদের চায়ে, ডিনারে আপ্যায়িত করেন।

সেবার মিঃ এণ্ড মিসেস গোয়েঙ্কা এসে চম্পার গান আর পিটার শুনে এতদূর মুগ্ধ হলেন যে শেষ পর্যন্ত মি গোয়েঙ্কা বলেই ফেললেন হামি চম্পা মা কো বহুৎ পসন্দ করি। পরটিমা ডেবি আপনার ওবজেকসন নেহি হোনেসে আমার ওনলি গান এর বহু করিয়ে চম্পা মাকো হামি রামজয়াল কো সাথ বিলেত ভেজ দিবে।

প্রতিমাদেবী চমকে উঠে চম্পার দিকে তাকিয়েছিলেন। মেয়ের বিয়ের কথা তো তাঁর একবারও মনে আসেনি। সলজ্জ হেসে চম্পা উঠে গেল। প্রতিমা শুকনো গলায় বললেন, না মেয়ের বিয়ের কথা এখনও কিছু ভাবিনি আর মেয়ে তো আপনাদেরই তবে এত শিগগির বিয়ে দেবার ইচ্ছা নেই। বয়েস তো মোটে উনিশ বছর।

গোয়েঙ্কা দম্পতি চলে যাওয়ার পর প্রতিমা যেন নতুন চোখে মেয়েকে দেখলেন। সত্যিই তো মেয়ে তাঁর বড় হয়েছে। কিন্তু বড় হলেই যে পরের হাতে তুলে দিতে হবে তার কি মানে? সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে এখন গান বাজনা ছবি আঁকা নিয়ে আছে। নিজের হাতে বাগান করে বাগানের সেরা গোলাপটা আজও তুলে এনে প্রতিমার খোঁপায় গুঁজে দেয়। কতবার বলেছেন প্রতিমা বিধবা মানুষের মাথায় ফুল দিতে নেই চম্পা, কিন্তু কে কার কথা শোনে? অমনি চম্পার মুখ ভার হবে নয়তো প্রতিমার গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে আদর করে ব্যতিব্যস্ত করে ফুল পরিয়ে তবে ছাড়বে।

এই মেয়েকে পরের হাতে তুলে দেওয়া আর নিজের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দেওয়া একই কথা। তবে হাঁ দিয়ে একটা আইবুড়ো নাম খণ্ডনের জন্য দিতে পারেন কিন্তু সে পাত্রকে রীতিমত সই করে ঘরজামাই থাকতে হবে। চম্পাকে নিয়ে কোনদিনই সে অন্যত্র যেতে পাবে না। একদিন একরাতের জন্যেও নয়। এমন পাত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে প্রতিমার আপত্তি নেই।

মেয়েকে সেদিন থেকে প্রতিমা আরও কাছে কাছে রাখতে সুরু করলেন যেন সেই মুহূর্তে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাগানে একটা ফুলের ডাল ছাঁটছিল চম্পা প্রতিমা গিয়ে ওর পেছনে দাঁড়ালেন। গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমের মত চুল পিঠ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে দু এক বিন্দু ঘাম টল টল করছে থুতনি আর নাকের পাশে। রোদটা সোজাসুজি পড়েছে মুখের ওপর। ঈষৎ শীতেতে গায়ের রংটা যেন সিঁদুরে হয়ে উঠেছে। প্রতিমা অপলকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর ডাকলেন চম্পা চুল বাঁধবে চল। অনেক পরিশ্রম করেছ, আজ আবার মিসেস মুস্তাফি আসবেন। সে কথায় কান না দিয়ে চম্পা প্রায় ধমকে উঠল। তুমি কেন বাগানে এলে মামণি। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে ভিজে মাটি। না: তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না, যদি ঠাণ্ডা লাগে?

প্রতিমা হেসে ফেললেন। আমি এলাম কোথায় তোমাকে বকতে, বেলা পড়ে এল এখনও স্নানগোছ কিছুই করলে না আর উল্টে তুমি আমায় বকছ?

চম্পা লাফিয়ে উঠে হাতে কাঁচিটা মালির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

আফরি দেওয়া বেরা বারান্দায় একটা বরফ সোফায় গিয়ে বসলেন প্রতিমা। পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় আদির মতো মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস মুস্তাফি আর এলেন না বোধ হয়। মুখের কথাটা শেষ হওয়া মাত্র হর্ণের আওয়াজ এল।

চম্পা বলল 'ওঁরা, এলেন আমি পালাই মা মণি।'

প্রতিমা বললেন কেন পালাবার কি হল? শুধু চুলটাই বাঁধা হয়নি কাপড় জামা তো ভালই আছে।

মিসেস মুস্তাফি আর তাঁর দুই মেয়ে এসে গেল। আইরিন আর আইভি কলহাস্যে বাগান মুখরিত করে চীৎকার করে উঠল, হ্যালো চম্পা, ইউ আর লুকিং দো চারমিং, কি ব্যাপার? এলোচুলে তোমায় কি অদ্ভুত মানিয়েছে।

চম্পা মৃদু হেসে বলল, ধন্যবাদ, তোমাদের চোখ দুটো সুন্দর তাই সবই সুন্দর দেখছ। তিনজনেই হেসে উঠল ভেতরে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে গিয়ে বসল ওরা।

চায়ের আয়োজন প্রচুর করেছিলেন প্রতিমা, চা খাওয়া গান বাজনা গল্পে আসর জমে উঠল। মিসেস মুস্তাফি বার বার বললেন, তুমি দিন দিন সুন্দর হচ্ছ প্রতিমা, তোমাদের মা মেয়েকে দেখলে দুই বোন মনে হয়। আমার চেয়ে তুমি কত আর ছোট বলো, কিন্তু তোমাকে আমার মেয়েদের বয়সী লাগে এতে কার না হিংসা হয় বলো? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হয় ছাড়লেন মিসেস মুস্তাফি। মাংসল ঘাড়টা কমালে মুছে কন্যির কাপে চুমুক দিলেন। একথা সেকথার পর মিসেস মুস্তাফি এবার বলে ফেললেন মেয়েকে তো হাই সোসাইটির উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছ প্রতিমা, এবার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল।

আবার চমকে উঠলেন প্রতিমা। বিয়ে? না দেব বৈকি তবে এখনও কিছু স্থির করিনি।

করে ফেল, করে ফেল, বয়েস পালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের বয়েস বেশী হলে আসল শ্রীটা নষ্ট হয়ে যায়। কথায় বলে ব্রুমিং ইউথ। আমি তো রাতদিন পাত্র খুঁজছি'।

নরম গলায় বলল প্রতিমা, ওদের ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না বুলাদি?

ঠোঁট উলটিয়ে জবাব দিলেন মিসেস মুস্তাফি, কষ্ট? দু একদিন হবে নিশ্চয় কিন্তু দেখো মেয়েরাই তখন আর আসতে চাইবে না। সে কথা যাক তুমি যদি বলো তো স্যার নারায়ণের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই বেহিসেবি খরচ করবে তাছাড়া ওঁর ডিমাণ্ড'ও কিছু নেই শুধু একটি কুটকুটে ওয়েল এডুকেটেড পুত্রবধূ চাই। তুমি ভেবে দেখ আমি তো এখন মাসখানেক আছি।

প্রতিমা গাঢ় স্বরে বললেন, কিন্তু বুলাদি ঘরজামাই না থাকলে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

মিসেস মুস্তাফি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘরজামাই আবার মানুষে পোষে? তোমার কি ভিমরতি ধরেছে নাকি? নাঃ তুমি দেখছি মেয়েটার সর্বনাশ করে ছাড়বে। চব্বিশ ঘণ্টা তোমার চোখে চোখে থাকলে মেয়ে জামাইয়ের মন বিগড়ে যাবে। ওদের স্বাভাবিক টানটা জোয়ালো হবে না, সে এক বিশ্রী ব্যাপার, খবরদার ঘরজামাই রেখো না প্রতিমা, শেষে তুমিও অশান্তি ভোগ করবে।

প্রতিমা নীচু গলায় বলল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

এতক্ষণ মেয়েরা বাগানে ছিল ফিরে আসতেই আলোচনা বন্ধ হল। মিসেস মুস্তাফিও বিদায় নিলেন।

ওরা চলে যাবার পর প্রতিমাকে চুপচাপ বসে থেকে চম্পা তাঁর কোল ঘেঁষে বসল। কি এত ভাবছ মা-মণি? প্রতিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার বিয়ের কথা, তুমি গেলে আমি কি নিয়ে থাকব চম্পা?

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না প্রতিমা, মেয়ের কোলে মাথা রেখেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

চম্পা সান্ত্বনা দিয়ে বলল তুমিও যেমন পাগল হয়েছ মা-মণি, আমি কিছুতেই বিয়ে করব না, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

প্রতিমা এবার একটু মনে জোর পেলেন না: মেয়ে তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না।

সোজা হয়ে বসে বললেন, কিন্তু সারাজীবন কি নিয়ে থাকবি বল? আমি আর কদিন? তবে আমার ইচ্ছা একটা মনোমত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান পাত্র যদি পেতাম ঘরজামাই থাকতে রাজী, তাহলে আমার ছেলের অভাবটাও পূরণ হোতো।

এরপর থেকে কিন্তু প্রতিমার প্রায়ই মনে হতে লাগল চম্পার বিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই তা না হলে প্রতিমাকে স্বার্থপর ভাববে। কে জানে বেশী বয়েস হলে চম্পাও কিছু ভাবতে পারে। বেশীদিন গেল না মনোমত পাত্রের খোঁজ মিলেস মুস্তাফি নিজেই আনলেন।

ছেলেটির বাপ-মা ভাইবোন কিছুই নেই, কাকার কাছে মানুষ। স্থাপত্য শিল্প নিয়ে এখন গবেষণা করছে। দেখতে যেমন সুন্দর ছবিও আঁকে সুন্দর। এই ছেলে শিল্পে সৌন্দর্যে শিক্ষায় চম্পার যোগ্য আর সবচেয়ে বড় কথা ঘরজামাই থাকতে সে রাজী। মিসেস মুস্তাফির ভাসুরপো, অমিয়র বন্ধু। কথায় কথায় অমিয় এই ছেলেটির সন্ধান দিয়েছে।

সব শুনে প্রতিমা বললেন, বেশ ছেলেকে আমাও আমি দেখি যদি পছন্দ হয় তো কাজ হবে।

মিসেস মুস্তাফি বললেন, ছেলেকে আনতে হবে না। অমিয় থাকবে হপ্তা দুই; তার ভেতর সে'ও এখানে চলে আসবে।

কৌশিক মিত্র সত্যিই এল বেড়াতে। চমৎকার চেহারা মার্জিত কথাবার্তা, ছেলে দেখেই প্রতিমার পছন্দ হয়ে গেল।

মিসেস মুস্তাফি বললেন, দেখো প্রতিমা এখন সিজিন চলছে, চেনাজনের ভিড় আছে আমরা অনেকেই এসেছি, শুভকাজটা তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেল এই সময় আনন্দটা জমবে ভাল।

প্রতিমা বললেন পাকা ব্যবস্থা করার আগে পাত্র-পাত্রীর চাক্ষুষ দেখা হওয়া দরকার, ওদের যদি দুজনের দুজনকে পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আর দেরী কিসের?

সেইমত ব্যবস্থা হল টি পার্টি দিলেন প্রতিমা সেখানেই দেখাশোনার কাজ মিটে গেল। সব শেষে সকলের অনুরোধে এপ্রাজের সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল চম্পা: 'এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল-শুধে, দেখা পেলেম কাল্গুনে'। গানের শেষে দুজনের মুগ্ধ দৃষ্টি দুজনকে বিহ্বল করে তুলল। তার বেশী দরকারও ছিল না। প্রতিমা দিনক্ষণ দেখে বিয়ের আয়োজন করলেন। খবর পৌঁছাল কৌশিকের সেই দার্শনিক কাকার কাছে। খবর গেল চম্পার বাবার কাছে কিন্তু দুজনের কেউই এলেন না। না এলেও আশীর্বাদ করে চিঠি আর উপহারের টাকা পাঠালেন। বিয়ের পর্বটা সমারোহের সঙ্গে চুকে গেল। সারারাত হৈ-হুল্লোড় করে যে যার বাড়ী ফিরে গেল। বাসরে আর রাত জাগার লোক রইল না।

প্রতিমার জীবনে এই প্রথম রাত মেয়েকে ছেড়ে থাকা। চম্পার মনেও সে কথা বার বার উঁকি দিল। ভোর না হতেই কিন্তু উঠে পড়ল চম্পা। স্নান সেরে ছুটে গেল প্রতিমার কাছে। প্রতিমা দুই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে চম্পাকে বুকে টেনে নিলেন। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন ওর মসৃণ চিবুক আর রোদের মত গালটা।

সকালের চায়ের টেবিলে আজ তৃতীয় ব্যক্তি কৌশিককে কেমন যেন বেমানান মনে হল প্রতিমার। এতদিন মা মেয়ের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হত আজ কৌশিকের উপস্থিতিতে সেটা

আর চলল না। নেহাৎ মামুলি কথা এটা খাও ওটা খাও, কেমন লাগছে জায়গাটা, ওষুধটা ভাল এই পর্যন্ত এগুলো।

কৌশিকও মেপে মেপে উত্তর দিল। চম্পা একটু অবাক হল। রাতের মানুষটার সঙ্গে এর যেন কোন মিল নেই।

সকালটা দুজনে বাগানে কাটাল, মাঝে মাঝে প্রতিমাও সেখানে ঘুরে এলেন। নাওয়া খাওয়ার তাড়া দিলেন। খাওয়ার পাট চুকলে কৌশিক নিজের ঘরে গেছে বিশ্রাম করতে। চম্পা দুচার মিনিট প্রতিমার কাছে ঘোরাঘুরি করে বলল 'মা মণি তুমি' একটু ঘুমোও মা বাটুনি গেছে কদিন ধরে আমি ওকে দু একটা বই দিয়ে আসি। প্রতিমা বললেন, 'চোখের পাতা বুঁজতে পারিনা চম্পা, তুই আয় তারপর ঘুমোবো।

চম্পা বলল 'হাঁ মা মণি আমি এক্ষুনি চলে আসব, আমারও খুব ঘুম পেয়েছে, তোমার কাছে না শুলে ঘুমুতে পারব না'।

বড় খুশি হলেন প্রতিমা, বললেন 'সে আমি জানি মা'।

শোবার ঘরে ঢুকে চম্পা দেখল কৌশিক সিলিংয়ের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে। অনেক কষ্টে কৌশিকের অভিমান ভাঙাবার পর ওকে কাছে টেনে নিল কৌশিক মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল 'দরজাটা দিয়ে এসো'।

ভয়ে ভয়ে তাকাল চম্পা, ধরা গলায় বলল, একটু পরে দেব মানে আমি একবার বাইরে যাব'। কৌশিক সে কথায় কানই দিল না নিজে উঠে গিয়ে খিলটা তুলে দিয়ে এল। চম্পাও তার নতুন পাওয়া আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল। কৌশিকের বলিষ্ঠ বাহু বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিল চম্পা। ওর সমস্ত সত্তাটা যেন ভিজে ভিজে করে নেহন করে নিল যৌবনে দীপ্ত কাঠামোটা।

বড় ঘড়িটায় যখন চারটের ঘা পড়ল তখন চম্পার মনে পড়ল প্রতিমার কাছে শুতে যাবার কথা। কৌশিক তবু ছাড়তে চায় না—বলল 'এত তাড়া কিসের ? চা তো আমরা ঘরেই খেতে পারি, আবার টেবিল সাজিয়ে বসার কি দরকার ? অনেক কষ্টে ওকে বুঝিয়ে লজ্জারক্ত মুখে প্রতিমার ঘরে গেল চম্পা।

ঘরে ছিলেন না প্রতিমা। বাগানে ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। বড় করুণ দেখাচ্ছিল প্রতিমাকে। চম্পার বুকটা টন টন করে উঠল। প্রতিমার কাছে যেতে কোনদিন এত সঙ্কোচ বোধ করেনি চম্পা আজ যেন অপরাধীর মত সামনে এগিয়ে গেল।

প্রতিমা মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন—পায়ের শব্দে বললেন—'রঘুবীর চায়ের টেবিল সাজিয়ে চম্পাকে ডেকে দাও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে'।

চম্পা কোন রকমে বলল 'আমি মা মণি'। প্রতিমা মুখটা ঘুরিয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন 'ঘুম ভাঙল ? যাও কাপড় জামা বদলে চা খেতে এসো'।

তিনজনের চা খাওয়া। প্রতিমা কেমন নিশ্চুপ, কৌশিক অন্যমনস্ক, চম্পা লজ্জিত। দু একটা টুকরো কথা হল তারপর তিনজনেই নির্বাক।

শুধু চায়ের টেবিলই নয় শোয়া বসা খাওয়া ছোট খাট দৈনন্দিন কাজের ভেতরেও মা মেয়ের ভেতর একটা দূরত্ব এসে গেল।

প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রতিমা, চম্পা আর কৌশিকের অন্তরঙ্গ সাহচর্যটা প্রসন্ন চোখে প্রশ্রয় দিলেন কিন্তু সেটা বেশীদিন চলল না।

প্রতিমা ভেবেই পান না চব্বিশ ঘণ্টা ওরা অকারণে হাসে কেন? আগে তো চম্পার গলার স্বরই শোনা যেত না। আর এখন ভোরে ভোরে কথা বলে হেসে লুটিয়ে পড়ে, বাগানময় দুটিতে মিলিত ছোটাছুটি করে বেড়ায়। বিশ্রী লাগে প্রতিমার। কোন কাজের ভার চম্পাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না আর কৌশিকই বা কেমন পুরুষ? সারাদিন বউয়ের আঁচলের তলায় ঘুরঘুর করছে? এখানে ক্লাব আছে, বন্ধু-বান্ধবও দুচারজন হয়েছে, শ্বশুরবাড়ী বলে ঘর ছেড়ে এক পা নড়বে না এমন হাবাগবা কি প্রতিমা লিখিয়ে নিয়েছেন?

চম্পা প্রথম প্রথম সঙ্কুচিত হত লজ্জা পেত কিন্তু এখন সে সব বালাই কাটিয়ে উঠেছে। প্রতিমার খাওয়ার সময়টুকু কোন রকমে বসে কিন্তু বাকি সময় কৌশিকের মন রাখতেই কেটে যায়। এই শুনলেন কবিতা পড়া চলছে, পরমুহূর্তেই শুনলেন চম্পা গান ধরেছে তার সঙ্গে কৌশিকও গলা মিলিয়েছে। কতক্ষণই বা গান হল, শুনতে পেলেন ঠকাস ঠকাস শব্দ, বুঝলেন এবার ক্যারাম চলছে।

প্রতিমা একটু হেসে লেপ বুনতে বসলেন। ওরা বাগানে গেল কখন? রেলিংয়ের ধারে এলেন প্রতিমা। চম্পা খিল খিল করে হাসছে আর ছুটছে, কৌশিক দু আঙুলে একটা গন্ধা ফড়িং ধরে ওর গায়ে দেবার জন্যে পেছনে ছুটছে।

প্রতিমার বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মেয়ে তাঁর পরের ঘরে না গিয়েও পর হয়ে গেছে। এতদিনের এত আদর যত্ন স্নেহ অর্ঘ সব বৃথা নষ্ট করেছেন প্রতিমা। এই মুহূর্তে কৌশিক যদি চম্পার হাত ধরে বলে, চলো আমরা চলে যাই চম্পা বিনা দ্বিরুক্তিতে চলে যাবে। একটিবারও প্রতিমার মূক অন্তরের বেদনা কাতর প্রার্থনা শুনবে না।

এখন প্রতিমার মনে হয় কৌশিক যদি কয়েকটা দিন কলকাতায় ওর কাকার কাছে যায় তো মন্দ হয় না। মা মেয়ের জোড়া তালিটা তাহলে আবার মিশ খেয়ে যাবে কিন্তু নিজে থেকে বলেন কি করে? সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আর একটা চিন্তা দলিল পাকিয়ে কাজ আরম্ভ করে।

অতিরিক্ত ভাবনা চিন্তায় প্রতিমার শরীর ভাঙনে আবার অল্প অল্প করে জ্বর দেখা দিল। চম্পা সব ভুলে প্রতিমাকে নিয়ে পড়ল। এতটা বাড়াবাড়ি কৌশিকের পছন্দ না হলেও মুখে কিছু বলল না।

এদিকে প্রতিমার কদিনের অসুখে চম্পার শরীরটাও খারাপ হল তার ওপর প্রতিমা সুস্থ হওয়ার দিন দুই পরে দুজনে বেড়িয়ে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে চম্পারও জ্বর হল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা মেয়েকে নিজের ঘরে আনলেন। কৌশিক বিনীত ভাবে বলল 'আমি থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন?' প্রতিমা দৃঢ় গলায় বললেন 'চিরকাল আমিই করেছি এখনও করব, তাছাড়া অসুখটা সোজা নয়, তোমার এখন বেশী ও ঘরে না থাকাই ভাল।'

সেই সলিল চিন্তাটা যেন পেয়ে বসল প্রতিমাকে। এতদিনে নিজের অস্তিত্বটাকে সার্থক মনে হল, এতদিনে সেটা যে এমন ভাবে কাজে লাগাতে পারবে, কোনদিনই সে কথা মনে আসেনি প্রতিমার।

কৌশিক কিছুই বুঝল না। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করল 'কি ব্যাপার'? তিনি মহা বিব্রত হয়ে উঠলেন 'না, না, কিছু না তেমন কিছু নয়, সেরে যাবে, ভাববেন না।'

এত বেশী বললেন যে কৌশিক আরও চিন্তায় পড়ল। চম্পার নিটোল স্বাস্থ্যে কোন রোগই ছিলনা কাজেই দু'চারদিনে ও সুস্থ হয়ে উঠল। জ্বর ছাড়ার পরেও বেশ কয়েকদিন নিজের ঘরে মেয়েকে আটকে রাখলেন প্রতিমা। কৌশিক সকাল বিকাল ঘরে যায় চম্পার সঙ্গে গল্প করে কিন্তু মন ভরেনা। সামনের লবিতে বসে থাকেন প্রতিমা।

চম্পাও অধৈর্য হয়ে ওঠে সামান্য সর্দি জ্বরে চব্বিশ ঘন্টা, হরলিক্স ফলের রস খেতে কার ভাললাগে! যাইহোক জ্বর ছাড়ার দিন দুই পর প্রতিমা বললেন, বেশ করে স্নান করে ফেল চম্পা, শরীরটা হাল্কা হয়ে যাবে। কতকটা রাগে কতকটা জিদে কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করল চম্পা। প্রতিমা যা আশা করেছিলেন তাই হল। রাত থেকে আবার জ্বর এল চম্পার বুকেও সামান্য ব্যথা অনুভব করল।

দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিমা মেয়ের সেবা করতে লাগলেন। এদিকে মহা হ্যাঙ্গামে পড়ল কৌশিক। সময় যেন কাটেনা। একটা সচল যন্ত্র যেন হঠাৎ দম ফুরিয়ে মরচে ধরতে সুরু করেছে।

একবার কলকাতায় এই ফাঁকে ঘুরে আসার কথাও ভাবে, কিন্তু চম্পা যদি কিছু মনে করে? কথাটা বলবে কিনা স্থির করতে পারছেনা ইতিমধ্যে প্রতিমাই তুললেন। কৌশিককে বলে যাওয়াচ্ছিলেন প্রতিমা। এত যত্ন কৌশিক কোনদিন পায়নি। প্রতিমাকে কেমন যেন বিচলিত দেখাচ্ছিল কিছু যেন বলতে চান অথচ পারছেন না।

কৌশিক বলল চম্পার জ্বরটা আবার এল কেন বলুন তো? চেহারাটা একেবারে কাহিল দেখাচ্ছে। প্রতিমা এক মিনিট চুপ করে রইলেন তারপর ধরা গলায় বললেন। এমন যে হবে আমি আশাকরিনি— কৌশিক বিশ্বাস কর আমি ভাবতেও পারিনি।

কৌশিক থতমত খেয়ে বলল কি বলছেন? চম্পার এটা সর্দিজ্বরই রিল্যাপ্স করেছে ভাববার কিছু নেই।

প্রতিমার সুন্দর মুখটা যেন ভীষণ কুৎসিত দেখাল, চোখ দুটো যেন চকচক করে উঠল, ধূর্ত অভিসন্ধি খেলে গেল নির্লিপ্ত চাহনিতে।

চোখের জলে মুছে ধরা গলায় বললো প্রতিমা 'আছে'। খুব ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন প্রতিমা তুমি জানো চম্পা আমার দিদির মেয়ে। তিন মাস বয়েস থেকে ওকে আমি মানুষ করি। আমার স্বামী মারা যান বন্ধায় তারপর আমাকেও ঐ কাল রোগে ধরে। তবে চম্পাকে আমি সাবধানে রেখেছি চিরকাল। তবু বছর কয়েক আগে ওর ভাই খুরেশি হয় কিন্তু ডাক্তার বলেন ভয়ের কোন কারণ নেই, চম্পা সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত। তা না হলে আমি ওর কিছুতেই বিয়ে দিতাম না কৌশিক, কিছুতেই তোমার মত একটি গুণবান স্বাস্থ্যবান ছেলের জীবন নষ্ট করতাম না, তুমি বিশ্বাস করো।

কেঁদে ফেললেন প্রতিমা। কৌশিক যেন হরপ্পার শিলা পুত্তলি। না আছে মুখে কথা না কোন অনুভূতি।

অনেকক্ষণ পর কৌশিক বলল 'হুঁ. তারপর?'

প্রতিমা কান্না জড়ান গলায় বললেন—সতর্ক না হলে এবার আর চম্পাকে বাঁচাতে পারব না কৌশিক। একটু সময় নেবে তবে সেরে যাবে। কিন্তু বাবা তোমাকে এখন একটু শক্ত হতে হবে, মানে কয়েকটা মাস দূরে থাকতে হবে। তারপর আমি তোমায় চিঠি দিলেই তুমি চলে আসবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন প্রতিমা।

কৌশিক দাঁত টিপে বলল যেন 'তাই হবে। কবে যাব ?'

'আজ রাতেই রওনা হতে পার, কিন্তু চম্পাকে এসব কথা ঘুণাক্ষরেও জানিও না তাহলে ও একেবারে ভেঙে পড়বে, তুমি শুধু বোলো তোমার কাকার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে যেতে হচ্ছে, দুচার দিন পরেই ফিরবে।

বাকি সময়টা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করল কৌশিক। একবার ভাবল চম্পার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে যাবে। চম্পার কি উচিত ছিল না সব খুলে বলা। কৌশিককে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারেনি চম্পা। আর সেই কারণেই জয় হওয়া মাত্র প্রতিমার ঘরে দুবারই আস্তানা গেড়েছে। কৌশিকের স্বাস্থ্যের কথা একটি বারও চিন্তা করেনি চম্পা শুধু নিজের আত্মতৃপ্তি আর লালসায় উন্মত্ত হয়ে ছিল। কি জঘন্য মনোবৃত্তি। চম্পার সমস্ত সৌন্দর্য যেন একটা হিংস্র সরীসৃপে রূপান্তরিত হল। তবু, তবু বিবাহিত জীবনের এই সময়টুকু কোনদিনই ভুলতে পারবে না কৌশিক। ফুলের মত সুন্দর জীবন একটা যদি কীটদষ্ট হয়েই থাকে তাকে নিরাময় করে তোলাটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। কৌশিকের সাহচর্যে যদি চম্পার ক্ষতি হয় সে ক্ষতে কোনদিনই প্রলেপ পড়বেনা, তার চেয়ে সারা জীবন ও পৃথক থাকতে প্রস্তুত। বিপরীত ধর্মী এই চিন্তায় কতকটা শান্তি পেল কৌশিক। মনকে শক্ত করে চম্পার কাছে বিদায় নিল, একটি মিষ্ট সম্ভাষণও আজই জিজ্ঞাসা উচ্চারণ করতে পারল না, শুধু বলল 'কাকা অসুস্থ, আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি, চলি।

পেছন থেকে প্রতিমা ডাকা দিলেন ট্রেনের আর সময় নেই কৌশিক। কৌশিক বার হয়ে এল আর বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল চম্পা। আর প্রতিমা? যেখানে নয় আর বিতৃষ্ণা সব চাওয়া মানুষ অকপটে চায় সেই চাওয়ার সফলতায় দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

• • • •

সেকালে আনন্দচন্দ্র নামে ছিলেন এক রাজা; তিনি নাকি দুঃখের মুখ কখনও দেখেন নি। বিশাল রাজবাড়ী, চারিদিক তার উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। সেখানে চলেছে অবিশ্রান্ত হাসি-গল্প, বাঁশি-গান। দুলছে উঠে সুখ সাগরের বুকে সুখের ঢেউ! বাইরে থেকে অন্ধ-রন্ধ্র সব বন্ধ করা পাছে কোন ছিদ্রে শনির মত দুঃখ ঢুকে বাটি করে দেয় সেই সুখের স্বর্গটি তবুও।

আনন্দচন্দ্রকে একদিন মারা যেতে হ'ল।

ছাত্রী

রবীন্দ্র নারায়ণ দে

যোগাযোগটা অনেক হাত ঘুরে তবে এসেছিল। প্রথম ভবতোষ বাবুর ছাত্র নিখিল তারপর তার বৌদি অনিমা তারপর অনিমার দূর সম্পর্কের দেওর মনীষ তারপর তার বন্ধু সুবিমল।

একটি প্রি-ইউনিভার্সিটির ছাত্রীকে সপ্তাহে মাত্র দুদিন ম্যাথেমেটিকস্ কোচ্ করতে হবে।

ঠিকানা দেখে সুবিমল হিসেব করে দেখলে হেঁটে গেলে প্রায় কুড়ি মিনিটের রাস্তা। সুবিমল আয়নার দিকে চেয়ে গালে দুবার হাত বুলালে—কোন রকমে চলতে পারে·· কিন্তু না। হলেই বা টিউশনি, তবু ত ইন্টারভিউ।

এদিকে হাতে সময় কম। দাড়ি কামিয়ে জামা কাপড় পালটে লক্ষ্মণের দোকান থেকে এককাপ চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতেই কমপক্ষে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই পৌছন চাই।

বাড়ীটা একটু গলির মধ্যে। তবু খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। কড়া নাড়তেই এক বৃদ্ধা দরজা খুললে—কাকে চান ?

—আজ্ঞে এই বাড়ীতে একজন প্রি-ইউনিভার্সিটীর ক্যান্ডিডেট্‌কে প্রাইভেট্ কোচ্ করার কথা শুনলাম···। বৃদ্ধের মুখের বিশেষ ভাবান্তর হল না। একদৃষ্টে বেশ খানিক্ষণ সুবিমলের দিকে চেয়ে যেন একটু নিস্পৃহ ভাবেই বললেন—বসুন।

সুবিমল অনেকটা হতাশ হয়ে ঘরের মধ্যে চৌকির ওপর এসে বসল।

এটা অবশ্য সুবিমল আগেই আশঙ্কা করেছিল। একটি প্রি-ইউনিভার্সিটীর ছাত্রীকে পড়ানর জন্যে কোন ছাব্বিশ বছরের গৃহশিক্ষককে কোন বৃদ্ধের পক্ষে প্রসন্ন বদনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ঘরে একটা নড়বড়ে কাঠের চৌকি। তারওপর একটা ছেঁড়া মাদুর। একটা সতরঞ্চ জড়ানো বোধহয় বিছানা। সব মিলিয়ে একটা দারিদ্র্যের ছাপ। কিন্তু বৃদ্ধ সেই যে গেল আর ফেরবার নাম নেই। সুবিমল একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। ভাবল—নাঃ, পয়সা খরচ করে দাড়ি তাড়াতাড়ি দাড়িটা না কামালেই হত।

প্রায় মিনিট পনের পরে যার আবির্ভাব ঘটল সে কিন্তু বৃদ্ধ নয়। সুবিমল বেশ বুঝল ইনিই স্বয়ং ছাত্রী।

একটি সতের আঠার বছরের তন্বী মেয়ে। খুঁটিয়ে দেখলে গায়ের রংটা একটু ময়লা। কিন্তু মুখখানি মিষ্টি। আয়ত দুটি চোখে কেমন যেন একটু করুণ ছাপ·····।

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে একধারে দাঁড়িয়ে রইল। সুবিমলের কাছে সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকেই খাপছাড়া। তাহলে বৃদ্ধ হয়ত সরাসরি সুবিমলকে প্রত্যাখ্যান না করে কন্যার মুখ দিয়েই এই

অপ্রিয় অভিযতটা প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তারজন্যে একটি নিরীহ মেয়েকে মুখ নীচু করে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা দায়ক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা বুদ্ধের উচিত হয়নি।

শেষে সুবিমলকেই বলতে হল।

—শুনেছিলাম এই বাড়ীতে একজন গ্রি-ইউ. ক্যান্ডিডেটকে কোচ্ করতে হবে···তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম ·····।

মেয়েটি তেমনি মুখ নীচু করেই বললে,

—হাঁ, কেবল ম্যাথেমেটিক্স পড়ার জন্যেই টিউটর দরকার।

সুবিমল বললে—আমার পিওর ম্যাথেমেটিক্স, কাইন্ডাল ইয়ার।

এবার মেয়েটি মুখ তুলে সুবিমলের পানে চাইল। তারপর একটু দ্বিধা জড়িত ভাবে বললে,

—সপ্তাহে দুদিন পড়ালে কত নেবেন? সুবিমলের মনে এতক্ষণে যেন একটু ক্ষীণ আশা উঁকি মারল। যাক্, সুবিমলের বয়েসটাই তা হলে প্রধান অন্তরায় নয়।

সুবিমল একটু বিজ্ঞের মত ভাব করে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললে,

—আমার কাছে মাইনেটাই একমাত্র বিবেচ্য নয়। যে পড়বে তার স্টাণ্ডার্ড, কনসেপ্‌শন্ আর এ্যাপটিচুডের ওপরেই সব নির্ভর করছে।

মেয়েটির করুণ চোখ দুটি যেন একটু চকল হয়ে উঠল। মৃদু স্বরে বললে,

—আমিই পড়ব। আপনি কি দেখবেন আমার স্টাণ্ডার্ড?

সুবিমল উৎসাহিত হয়ে বললে—বেশ, বইখাতা নিয়ে আসুন।

মেয়েটি নিমেষের মধ্যে অঙ্কের বই আর খাতা নিয়ে এল।

সুবিমল এ্যালজেবরা থেকে বেছে দুটো ইকুইয়েশন করতে দিলে।

নির্ভুল ভাবে অত তাড়াতাড়ি অঙ্কগুলো করতে দেখে সুবিমল একটু অবাক না হয়ে পারল না। সুবিমলের মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে মেয়েটির খাতাখানা উলটে পালটে দেখতে লাগল। একটি গ্রি-ইউ. ছাত্রীর খাতায় কত কি লেখা থাকতে পারে·····টুকরো টুকরো কবিতা, গান, হয়ত একটা চিঠি ··আরো কত কি। একটা পাতায় এসে সুবিমলের দৃষ্টি থেমে গেল—। একটা অঙ্ক অনেকবার করবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু পদ্ধতিতে একটু ত্রুটি আছে। সুবিমল অঙ্কটা দেখিয়ে দিতেই মেয়েটি খুশী হল কিন্তু সে পরিচ্ছদের প্রায় সবকটা অঙ্কই সুবিমলকে দিয়ে করিয়ে নিল।

যাক্, এখন দুজনের স্টাণ্ডার্ড দুজনের কাছেই জানা হয়ে গেছে।

পরম উৎসাহে সুবিমল পরের দিন একটু সকাল সকাল গিয়ে পৌছল। তার মনে আর সন্দেহ রইল না যে মেয়েটির অঙ্কে মাথা অত্যন্ত প্রখর। মনে মনে সে ঠিক এই রকমই একটি ছাত্রী খুঁজছিল। তা ছাড়া নামটিও বেশ—সুচরিতা। দুজনের নামের প্রথম অক্ষরে একটা মিল আছে। হয়ত কোন শুভ ইঙ্গিত·····।

তৃতীয় দিন কিন্তু সুচরিতা খালি হাতে এল। সুবিমল লক্ষ্য করলে সুচরিতার মুখে সেই করুণ ছাপ, প্রথম দিন যেটা তার চোখে এড়ায়নি।

একটু জড়তার সঙ্গে সুচরিতা বললে—মাপ করবেন, কাল থেকে আমি আর পড়ব না।

সুবিমলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এর থেকে ঢের ভাল ছিল প্রথম দিনই যদি তাকে বিদায় দে ওয়া হত। সুবিমল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

—আমি বোধ হয় ঠিক···কমপিটেন্ট নই···।

মেয়েটি চমকে উঠল—না না তা মোটেই নয়। আমরা অত মাইনে দিতে পারব না তাই···।

ভণিতা কাটিয়ে সুবিমল স্পষ্ট করে বললে—যারা টিউশনি করে তারা সবরকম অবস্থা শুনতেই প্রস্তুত। তবু আমার আগের কথাগুলো আমি আবার পুনরাবৃত্তি করছি, মাইনেটাই আমার কাছে প্রধান বিবেচ্য নয়। অবশ্য যদি অন্য কোন কারণ থাকে ··

সুচরিতা শাড়ীর আঁচলের একটা প্রান্ত আঙুল পাকাতে পাকাতে সুবিমলের দিকে মুখ তুলে চাইল। মিনতি মাখান দৃষ্টি, চোখের কোণ দুটো কেমন যেন ছল ছল করছে··· ।

সুবিমল বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হল—আচ্ছা তা হলে উঠি···, কিছু মনে করবেন না···যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে··· ···।

মনে হল সুচরিতা হয়ত অনেক কিছুই বলতে চায়···কিন্তু থাক। ওর যদি অভিভাবকের মত না থাকে তবে বেচারি সুচরিতা আর কি বা করতে পারে···

সুবিমল ধীরে ধীরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভাবল শেষ বিদায়টা আর একটু মর্মস্পর্শী করে তুলতে পারলেই ভাল হত। যে চোখদুটো ছলছল করছিল তার থেকে যদি দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ত·····।

প্রথম দু'চারদিন সুচরিতার মুখখানা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেত; তারপর প্রায় একরকম ভুলেই গেছল। প্রায় দিন দশেক পরে একদিন সকালে মেসের চাকরটা এসে খবর দিল একজন মহিলা সুবিমলকে ডাকছে।

কাঁধে একটা সাইডব্যাগ ঝোলানো যে মেয়েটি সুবিমলকে হাত তুলে নমস্কার করলে সে সুচরিতা সুবিমল ভাবতেই পারেনি আবার কোনদিন সুচরিতার সঙ্গে দেখা হবে।

মেস বোর্ডিং-এ একটি কুমারী মেয়ের সঙ্গে কথাবলায় অনেক অসুবিধে, তাই সুবিমল তাড়াতাড়ি গায়ে জামাটা গলিয়ে এল। তারপর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা ঘুরে যেন রোডে একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকল।

সুবিমলের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না তার অন্তর্ধানের পাণ্ডিত্যের বিষয়ে। হাসতে হাসতে বললে—আমি মনে করেছিলাম আপনার গার্জেন বোধহয় কোন ইয়ংম্যানকে রাখতে চান না।

সুচরিতা মৃদু হেসে বললে—সেটাও একটা কারণ, কিন্তু আসল কারণ আমাদের আর্থিক অক্ষমতা।

—তাতে কি হয়েছে? আমি কত ছাত্রছাত্রীকে এমনিই পড়াই···আপনি ত সপ্তাহে মাত্র দুদিন পড়বেন··· ।

চা খেতে খেতে শেষপর্যন্ত ঠিক হল সুচরিতাকে সপ্তাহে একদিন একটু দেখিয়ে দিলেই চলবে, তবে সুচরিতাদের বাড়ীতে নয়। সুবিমল রোজ যেখানে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়াতে বসে, সেই ঘরে···আর সময়টা কিন্তু বিকেল বেলা।

চারিদিকে ঘেরা কেবিনের মধ্যে চা খেতে খেতে সুবিমলের খুব ইচ্ছে করছিল আরো খানিকক্ষণ

সুচরিতার সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু সুচরিতা এক আশ্চর্য মেয়ে। সে যে এখানেও সাইডব্যাগ থেকে একটা খাতা আর ট্রিপনোমেট্রি বার করে বসবে এটা সুবিমল আশা করেনি।

সুচরিতা একটু অনুনয় করে বললে—এখানটা কিছুতেই মিলছে না। কাইণ্ডলি একটু দেখিয়ে দেবেন?

এই নিরিবিলিতে কোথায় এতদিন পরে বসে একটু গল্প করবে তা নয় সলিউসন্ অফ ট্র্যাঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে···কিন্তু কিই বা করা যায়?

সুবিমল সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে বুধবার বিকেলটার জন্যে। সত্যিই, সে অনেক ছাত্র দেখেছে কিন্তু এমন অঙ্কে মাথা সুবিমলের চোখে পড়েনি ··।

সুচরিতা খাদ্যের বই আর খাতা সাইড ব্যাগে ভরে নিয়ে আসে: অতটা পথ তাকে হেঁটে আসতে বেশ পরিশ্রান্ত দেখায়, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে!

সুবিমল হাতপাখাটা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে আরম্ভ করে, কিন্তু সুচরিতা ওর হাতথেকে জোর করে পাখাটা কেড়ে নেয়।

কিন্তু যতদিন যায় সুচরিতা সুবিমলের কাছে ততই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যতক্ষণ থাকে খালি একমনে অঙ্ক করে যায়। সুবিমল ভাবে···কি বিচিত্র মেয়ে! এই বয়েসে অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে এত রস পেল কি করে? সেও ত অঙ্কে ভাল ছাত্র ছিল কিন্তু সারাক্ষণ এমন বই নিয়ে পড়ে থাকত না।

সুবিমল সুচরিতাকে যতই নিবিড় করে পেতে চায়, দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যেন ততই বেড়ে ওঠে। সুবিমল ভাবে সুচরিতার নির্লিপ্ততাই কি এর জন্যে দায়ী নয়?···একটা দুর্বিসহ জ্বালা কি কেবল সুবিমলকেই অহরহ দগ্ধ করবে? সুকঠিন অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও কেন সুচরিতার চোখে তার প্রতিফলন হয় না, বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তির কোন ছায়া পড়ে না?

একদিন সুবিমল প্রশ্ন করে—আপনি আর কোন সাবজেক্ট পড়েন না?

—পড়ি, তবে তার জন্যে কারু ওপর নির্ভর করতে হয় না।

প্রসঙ্গের একটু পরিবর্তন দরকার, তাই সুবিমল বলেছিল—আমার কিন্তু অঙ্কের চাইতে সাহিত্য পড়াতেই ভাল লাগে···রবীন্দ্রনাথ, বায়রন, কীটস।

মৃদু হেসে সুচরিতা উত্তর দিয়েছিল—আর কবের বোঝা নাইবা বাড়ালাম ?

—আমি কিন্তু শুধু শুধু দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছি না। বিয়ের পর আপনার বরের কাছ থেকে সমস্ত বকেয়া পাওনা আদায় করব। কেমন রাজী···?

সুচরিতা হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

সুবিমলের ইচ্ছে করছিল সুচরিতার চিবুক ধরে মুখ খানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে—সুচরিতা, তুমি এতদিন পরে এটুকু রসিকতাও বুঝতে পারলে না?

কিন্তু একদিনের জন্যেও কি সুচরিতার মনে প্রশ্ন জাগে না কেন সুবিমল তাকে এই অকারণ দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে?

একদিন অঙ্কের খাতাখানা সুবিমলের দিকে এগিয়ে দেবার পর খেয়াল হল খাতাখানা হাতে নিয়ে সুবিমল একদৃষ্টে সুচরিতার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। সুচরিতার চমক ভাঙতেই তাড়াতাড়ি মুখখানা নামিয়ে নিলে। নিমেষে সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখে এসে জমা হল।

—কি দেখছেন ? মৃদু স্বরে বললে সুচরিতা।

—দেখছি ও দুখও মাঝে মাঝে রক্তিম হয় কি না ?

সুবিমল অপেক্ষা করছিল, সুচরিতা কিন্তু মুখ নীচু করে খাতার পাতায় হিজিবিজি কাটতে লাগল। একটু অপেক্ষা করে থেকে সুবিমল আবার বললে—কি দেখছিলাম জানেন ?···আজই আপনাকে প্রথম চোখে কাজল পরতে দেখলাম, তাই ভাবলাম আমারই চোখের ভুল।

এবারেও সুচরিতা নিশ্চুপ। সমস্ত ঘরখানা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না।

মনে হল সুচরিতার চোখদুটো যেন একটু চকল হয়ে উঠল, তারপর মুখ নীচু করেই বললে—পাশের বাড়ীর বৌদি জোর করে পরিয়ে দিয়েছে··· ।

সুবিমলের একটু সাহস বাড়ল—

—পাশের বাড়ীর বৌদিও জানেন না যে এমন চোখও আছে, যা কাজল বিহীন সজল নয়নেই হৃদয় দুয়ারে ঘা দিতে সক্ষম।

কথাটা সুচরিতা উপভোগ করেছিল কিনা বোঝা গেলনা কিন্তু আর কোন কথা বলেনি।

সুবিমল মনে মনে ভাবলে—না, অনেকখানি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সুচরিতা গরীব, পড়াবার খরচ দিতে অক্ষম বলেই যেন সুবিমল এই সুযোগ নিচ্ছে। হয়ত নিজেকে খানিকটা খেলো করে ফেলেছে। এরপর থেকে সুচরিতা নিজেকে আরো সঙ্কুচিত করে রাখবে···হয়ত বা সুবিমলের এই সাহাস ঔদ্ধত্যের জবাবও দেবে।

কিন্তু না। এই নিভৃত পরিবেশে সুচরিতা আর সুবিমল কত কাছাকাছি অথচ কোনদিন সুচরিতার সামান্য একটি উত্তপ্ত নিঃশ্বাসও এসে পড়ল না সুবিমলের গায়ে।

শনিবার সুচরিতা আসতেই সুবিমল পকেট থেকে ভাঁজ করা দুখানা গোলাপি রং এর কাগজ সামনে মেলে ধরল।

সুচরিতা স্বভাব মত একটু মৃদু হাসল।

—রাজী ?

উত্তরে আবার একটু হাসি।

যাইহোক, সুচরিতা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে। সুবিমল ভেবেছিল সুচরিতা রাজী না হলে সিনেমার টিকিট দুখানা ওর সামনেই ছিঁড়ে ফেলবে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে—কটায় শো আরম্ভ ?

—সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটায়।

সুচরিতা সময় হিসেব করে বললে,

—হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে, এর মধ্যে এই অঙ্ক কটা একটু দেখিয়ে দেবেন ?

সুবিমল যতখানি উৎসাহিত হয়েছিল ঠিক ততখানি নিরুৎসাহিত হয়ে মনে মনে ভাবলে।

·····এই সব মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করার অনেক বিপদ। হয়ত ফুলশয্যার রাত্রেই সারারাত ধরে অঙ্ক কষাবে····· ।

কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সুচরিতা ভালই পরীক্ষা দিয়েছে।

পরীক্ষার পর সবাইকারই পড়াশোনায় একটু বিরতি আসে। কিন্তু সুচরিতার কোন ব্যতিক্রম নেই।

সেদিন সুবিমলের হঠাৎ কি হল···পেন্সিল শুদ্ধ সুচরিতার হাতটা চেপে ধরেছিল—সমস্ত জীবনটাই ডিফারেন্সিয়াল্ ক্যালকুলাস্ নয়···এর বাইরেও একটা জীবন আছে·····। সুবিমলের শক্ত মুঠোর মধ্যে সুচরিতার নরম হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। সে সেইভাবেই বসে বসে ঘামতে লাগল।

এই প্রথম ব্যতিক্রম। পরের দিন আর সুচরিতা এল না। তারপরের দিনও না।···তার পরের দিনও না।

সুবিমলের একটু অভিমান হল। সে কি এমন কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে? সুচরিতা কি এত দিনেও সুবিমলের মনের কথা বুঝতে পারে নি? সুবিমল ঠিক করলে সে নিজে থেকে কোন খবর নেবে না।

একটা, দুটো করে পাঁচটা দিন পার হয়ে গেল। তবুও সুচরিতা এল না।

এই দুটো বছর ধরে সুচরিতা তিলে তিলে তার মনের যে কতখানি অধিকার করে নিয়েছিল সুবিমল তা নিজেও জানতে পারেনি। মাত্র পাঁচ দিনের বিচ্ছেদেই মনে হল যেন একটা দীর্ঘ যুগ সুচরিতার সঙ্গে দেখা হয়নি।

এমনও ত হতে পারে সুচরিতার অসুখ করেছে। সন্ধ্যে বেলা হাঁটতে হাঁটতে সুবিমল কখন যে সুচরিতাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই।

হয়ত আবার সেই দীর্ঘকায় বৃদ্ধের সামনে পড়তে হবে·····কিন্তু আজ সে কি উত্তর দেবে?

সুচরিতার এই দীর্ঘ দিনের গোপন অভিসার কিম্বা অন্ত দেখার আগ্রহ ত এই বৃদ্ধের কাছে জ্ঞাত নয়।

অনেক ইতস্ততঃ করে সুবিমল দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু দরজা খুলল সুচরিতা নিজেই।

হঠাৎ সামনে সুবিমলকে দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা মুহূর্ত।

সুবিমলের মাথায় যেন বজ্রপাত হল!

সুচরিতাও যেন সুবিমলের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। কোন রকমে সুবিমলের সামনে থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল।

যাইহোক, সব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

সুবিমল ধীরে ধীরে ফিরে চলল।

ঘরের স্তিমিত আলোয় স্পষ্ট না দেখা গেলেও মাথায় লাল সিঁদুর দেখবার জন্যে যতটুকু আলো থাকার প্রয়োজন, তাই ছিল। সুবিমল ভাবলে, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—সে অনেক পরিশ্রম করে অঙ্ক শিখেছে, প্রথম শ্রেণী পেয়েছে···কিন্তু রহস্যময়ী নারী চরিত্রের কিছুই শেখেনি। কিন্তু সুচরিতা তাকে প্রতারণা করবে···এটা কি করে সম্ভব?

চলতে চলতে বিগত দুটো বছরের অনেক ঘটনাই চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল।

—মাষ্টার মশাই!

ডাকটা নতুন নয়, তবু সুবিমলকে ঘুরে দাঁড়াতে হল।

—আপনি চলে যাচ্ছেন?

সুবিমল উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে সুচরিতার মুখের দিকে চাইল।

রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের আলোয় সুবিমল আবার দেখলে·····কিন্তু আশ্চর্য! সুচরিতার সিঁথিতে সিঁদুর·····কিন্তু বড় ক্ষীণ···বড় ম্লান।

মাত্র দুদিন আগে যাদের কপালে সিঁদুর ওঠে, এত ঠিক সে রকম নয় ?

নির্জন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই সুচরিতা সুবিমলের একটা হাত চেপে ধরল—আপনি আমায় ক্ষমা করুন···আমার জীবন বড় দুঃখের··· ।

নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে সুবিমল বললে,

—তুমি সুখী হও সুচরিতা, আমি তোমার জীবনে আর কখন আসব না ।

রাস্তার সেই আবছা আলোতেই সুবিমল দেখলে সুচরিতার চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে । সুবিমলের সব গোলমাল হয়ে গেল নিজের কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে,

—আজ আমার একটু তাড়া আছে,···আর একদিন এসে তোমার বরের সঙ্গে আলাপ করে যাব ।

চলতে চলতে তেমনি নিস্পৃহ ভাবেই সুচরিতা বললে,

—আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন··· ।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুবিমল—ত্যাগ করেছেন ? এর মধ্যে বিয়েই বা হল কবে আর ত্যাগ করলেই বা কবে ?

সুচরিতা আস্তে আস্তে বললে—আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে··· । আমি ইচ্ছে করেই আমার বিয়ের কথা আপনার কাছে গোপন করেছিলাম ।

সুবিমল আর একবার চমকে উঠল,

—একজন অবিবাহিত যুবকের কাছে নিজের বিবাহিত জীবনের কথা কেন গোপন করেছিলে এর কৈফিয়ত চাইবার প্রবৃত্তি আমার নেই ।···কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে পুরুষ আর নারীর নিবিড় সান্নিধ্যে যদি ধীরে ধীরে অদৃশ্য কোন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সমাজের চোখে তার কোন মূল্য না থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে সেটা খুব তুচ্ছ জিনিস নয় ।

সুচরিতার দু চোখ বেয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ।

—কিন্তু যার জীবনের কোন অবলম্বন নেই, কেবল বেঁচে থাকার জন্যে···কেবল জীবিকার সন্ধান পাবার জন্যে···তাকে যদি একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয় তবে কি সেটা এতই অমার্জনীয় ?

—কিন্তু তুমি বিবাহিতা, এটা গোপন না করলে আমি পত্রাতাম না এত হীন আমাকে কেন মনে করলে ?

—হীন নয়, তবে সব সত্যকেই মানুষ গ্রহণ করতে পারে না । অনেক সঙ্কোচ, অনেক বাধা আপনার পথ রোধ করত ।

—কি করে জানলে ?

—এর আগে আর একজন এসেছিলেন । সব জেনে তাঁর পক্ষে আমাকে পত্রান সম্ভব হয়নি···আর আপনার পক্ষেও হয়ত হত না··· ।

সুবিমলের মুখ থেকেও হঠাৎ কথা বেরল না । হয়ত তাই । স্বামী পরিত্যক্তা, মাইনে দিতে অক্ষম একটি মেয়েকে দিনরাত অন্ন কষাতে কার আর মাথা ব্যথা হয়েছে ?

সুচরিতা হয়ত নির্দোষী নয় । একটি পুরুষের দুর্বলতার সুযোগে তার জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে সে তার স্বার্থ সিদ্ধি করেছে । তবু এই রহস্যময়ী মেয়েটির যত অপরাধই থাক সুবিমলের মনের মধ্যে একটু সামান্য করুণা পাবার স্থান তার অবশ্যই আছে । সে ত সুবিমলের সত্যই কোন ক্ষতি করেনি ?

কত নিভৃত মুহূর্তের সামান্যতম প্রয়াসে সে ত সুবিমলের জীবনকে ওলট পালট করে দিতে পারত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্নভাবে সেত কেবল নিজেকেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে ··· ··· ।

সুচরিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুবিমলের মনে হল—অর্থকরী বিদ্যের বিনিময়ে সে একদিন সামান্য কানাকড়ির পর্যন্ত হিসেব করেছে, কিন্তু যে সমাজে স্বামীর থেকে স্বামীত্বটাই বড় সেখানে আজ নিরুপায় হয়ে নিজের জীবনের অবলম্বন খুঁজে বার করতে কেউ যদি সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েই থাকে ত তাতে কিই বা এসে যায়।

• • •

ইউরোপে একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরস্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "হায়! চারিধারের উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গান গীত হইতেছে আমার গান শুনিয়া শ্রোতারা আনন্দে আটখানা হইতেছে। আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই, ক্ষুধা মিটাইবার একখানি রুটি নাই।"

সমস্ত সভ্য দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত হাজার হাজার পাওয়া যায়।

ডাকাত কেষ্ট চৌধুরী

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[প্রায় শতবর্ষ আগেকার দারোগার দপ্তর প্রণেতা স্বনামধন্য
গোয়েন্দার সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনী।
কাহিনীটি বর্তমান কালের উপযোগী ভাষায় পুনর্লিখিত।]

ইংরেজি ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসের শেষে মেদিনীপুর সদর থানার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের একটি চিঠি আমাদের আই, বি ডিপার্টমেন্টে এলো। চিঠিখানা এই রকম :

মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার মধ্যে আজকাল ভয়ানক ডাকাতি শুরু হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে লোমহর্ষকর পনেরোটি ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতি প্রায়ই একই ধরণের। সব গুলোতেই মশাল ব্যবহার করা হয়েছে। চেঁকী দিয়ে বাড়ির দরজা ভাঙা হয়েছে। বাড়ির পুরুষদের মারধর করা হয়েছে, এবং মেয়েদের সবাইকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আরও জানা গেছে যে, যার বাড়ীতে যখন ডাকাতি হয়েছে তার দুই একদিন আগে বৈষ্ণববেশধারী কোন লোক ভিক্ষা করবার জন্যে সেই বাড়িতে গেছে, সুযোগমত আতিথ্য গ্রহণ ও রাত্রি বাস করেছে এবং পরদিন ভোর বেলা কাউকে কিছু না বলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যেদিন সে এইভাবে চলে গেছে সেই দিনই অথবা তার দু একদিনের মধ্যেই সেই বাড়িতে রাত্রে ডাকাত পড়েছে।

যে যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে সেই সেই বাড়ির পুরুষদের মশলন্ত মশালের ছেঁকা সহ্য করতে হয়েছে, বেদম মার খেতে হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের গায়ে হাত দেওয়া বা তাদের কোনরকম বেইজ্জত করা হয়নি। অবশ্য তারা স্বেচ্ছায় গায়ের গহনা যখন খুলে দিতে নারাজ হয়েছে তখন জোর করে সেসব কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

লক্ষণ গুলি দেখে শুনে মেদিনীপুরের পুলিশ সিদ্ধান্ত করেছে যে একটা দলই এই সমস্ত ডাকাতির পিছনে আছে। কিন্তু দলের নেতা কে বা কারা কারা সেই দলে আছে। সেখানকার পুলিশ অনেক সন্ধানেও তা জানতে পারে নি।

এই সূত্রে—মেদিনীপুরের পুলিশ জানিয়েছে যে, আগে ঐ জেলায় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী নামে এক ডাকাত সর্দার বাস করত। সে যেভাবে ডাকাতি করত, বর্তমান ডাকাতিগুলো সেই একই ধরণের। সেই সময় কয়েকটা ডাকাতির পর কেষ্ট চৌধুরী ধরা পড়ে এবং তার জেল হয়। সে জেলে থাকার পর ঐ সব অঞ্চলে ঐ ধরণের দলবদ্ধ ডাকাতি প্রায় বন্ধ হয়েছিল বললেই হয়।

কয়েক বছর হল কেষ্ট চৌধুরী জেল থেকে খালাস পেয়েছে এবং আবার সেই রকম ডাকাতি শুরু হয়েছে, সেই কারণে মেদিনীপুরের পুলিশ মনে করে, এই সব ডাকাতির নায়ক হচ্ছে কেষ্ট চৌধুরী। তার কোন সন্ধান নেই। তাকে তল্লাস করা হয়েছে কিন্তু এ অঞ্চলে তার দেখা পাওয়া যায় নি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে যে তার বাড়িতে এসেছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। লোক পরম্পরায় জানা গেছে যে সে

আজকাল বৈষ্ণবের ভেক নিয়ে কলকাতার কোন জায়গায় বাস করছে আর মাসে মাসে সেখান থেকে সদলবলে এই অঞ্চলে এসে ডাকাতি করে চলে যাচ্ছে।

কেষ্ট চৌধুরীর বয়স এখন হবে প্রায় পঞ্চাশ, তার বলিষ্ঠ গড়ন, মোহরা চেহারা, লম্বায় দু'ফুটের উপর, কালো রঙ। কদম ছাঁট চুল।

এ যেন কেষ্ট চৌধুরীকে খুঁজে বার করবার ভার পড়ল আমার ওপর। কোনদিন তাকে চোখে দেখি নি। এত বড় শহরে সে কোথায় আছে, তাই বা জানা কি করে সম্ভব? কলকাতা কি একটুখানি জায়গা? তা ছাড়া এখানে কেউ কারুর খোঁজ রাখে না, পাশের বাড়ির বাসিন্দাকে চেনে না।

আমার উপরওয়ালা ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্টর জনস্টন সাহেব আমায় ডেকে তদন্তের ভার দিলেন এবং আমার খুব খানিকটা প্রশংসা করে আমার গায়ে তুলে দিয়ে বললেন, যেমন করে হোক, কেষ্ট চৌধুরীকে খুঁজে বার করতেই হবে। মেদিনীপুরের পুলিশ আমাদের যে অনুরোধ করেছে তা আমাদের রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সুনাম বজায় রাখতে হবে।

বললাম, চেষ্টার ত্রুটি করব না, সাহেব। কিন্তু কি ভাবে যে কাজ শুরু করব তা তো বুঝতে পারছি না। যাই হোক, কাল থেকেই আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করব।

—কি ভাবে আরম্ভ করবে?

—আমি প্রথমে শহরের বাবাজীদের আড্ডাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবো। ওরা যখন বলেছে যে কেষ্ট চৌধুরী বৈষ্ণব সেজে এখানে আছে এই রকমের পাকা খবর ওরা পেয়েছে সেই খবরটাই প্রথমে যাচাই করে দেখা দরকার বলে মনে করি। একটা কথা বলবার আছে, স্যার।

—কি বল?

—আমার একটি প্রার্থনা এই যে আপনি মেদিনীপুরের সুপারিনটেনডেন্টকে দয়া করে লিখে দিন, তিনি যেন অবিলম্বে এমন কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিন, যে কেষ্ট চৌধুরীকে দেখেছে এবং তাকে দেখলেই চিনতে পারবে। কারণ কলকাতায় কেউ তাকে দেখেও নি, চেনেও না, এমন অবস্থায় তার সন্ধান পেলেও তাকে ধরা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে সনাক্ত না করছে।

সাহেব বললেন—এ ভাল প্রস্তাব। আজই লিখে দিচ্ছি।

* * * * * * * *

কাজের ভার তো নিলাম, কিন্তু কোথায় কেষ্ট চৌধুরীকে খুঁজবো। ভাবতে ভাবতে স্থির করলাম, প্রথমে যে প্ল্যান মাথায় এসেছে সেটাই অনুসরণ করি, অর্থাৎ বৈষ্ণবদের আখড়াগুলো ঘুরে দেখি। লম্বা চওড়া কলকায় কোন লোককে দেখা যায় কি না। কিন্তু সাদাসিদে পোষাকে গেলে কাজ হবে না, পুলিশের বেশে তো নয়ই। কাজেই বৈষ্ণব সাজতে হল। কৌপীন পরে তিলক কেটে, কাঁধে ঝুলি নিয়ে রীতিমত বাবাজী সেজে খালি পায়ে শহরের এ পাড়া ও পাড়া চক্কর দিতে লাগলাম।

এ ঘাঁটি থেকে সে ঘাঁটি। কিন্তু কোথায় সেরকম লম্বাচওড়া লোক? বৈষ্ণবরা তো দেখছি সাধারণত বেঁটেই হয়। ডাকাত সর্দারের মত চেহারা তো কারুরই দেখলাম না।

দু চার দিন পরে খবর পেলাম, বাগবাজারের মদনমোহন তলার কাছে আছে লাল বাগান নামে একটা বস্তী। তার মধ্যে ভব নামে একটি স্ত্রীলোক বাস করে। আগে ভব ছিল একজন সাধারণ বেশ্যা। এখন যৌবন যাবার পর বৈষ্ণবী হয়েছে এবং একজন বৈষ্ণবের আশ্রয়ে বাস করছে। বৈষ্ণবটির

নাম গোপালদাস মোহান্ত। গোপালদাস লম্বা ধরনের লোক, তার চেহারার সঙ্গে কেষ্ট চৌধুরীর চেহারার বর্ণনার মিল আছে। কিন্তু গোপালদাসই যে কেষ্ট চৌধুরী তা এখনি বলা সম্ভব কি করে?

যাই হোক, খোঁজ নিতে বেরুলাম। জানতে পারলাম, প্রায় একমাস হল, গোপালদাস আর তার তীর্থ করতে বেরিয়ে বৃন্দাবন গেছে, বলে গেছে, একমাস পরে ফিরবে।

প্রতিবেশীদের কাছে আরও খবর পেলাম, গোপালদাস বছরখানেক হল তার সঙ্গে লাল বাগানে বাস করছে। সে কোথা থেকে এসেছে, কোন্ দেশের লোক, তার আদি নিবাস কোথায় এসব কোন খবরই পেলাম না। শুনলাম, তার অনেকগুলি শিষ্য আছে এবং শিষ্যদের নিয়ে মাঝে মাঝে সে ভিক্ষের বেরিয়ে কলকাতা থেকে অন্তত যায় এবং আট দশ দিন পরে ফিরে আসে। তার শিষ্যরা কে বা কোথায় থাকে তা কেউ বলতে পারলো না। কিন্তু সকলেই এক বাক্যে বলল যে গোপালদাস মোহান্ত একজন ধার্মিক পুরুষ, ধর্মকর্ম আর তীর্থ ভ্রমণ করেই সে দিন যাপন করে। তুলসী বৃক্ষের উপর তার ভীষণ ভক্তি, নিজেদের বাড়ির তুলসী তলাতেই সে প্রায় সর্বক্ষণ পড়ে থাকে আর কৃষ্ণনাম করে।

• • • • • • • • •

ইতিমধ্যে মেদিনীপুর থেকে একজন পুলিশের ইনফরমার এসে উপস্থিত হল। সে অনেকবার কেষ্ট চৌধুরীকে দেখেছে। তাই তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

দু'তিনদিনের মধ্যেই খবর পেলাম, গোপালদাস আর তার বৃন্দাবন থেকে ফিরেছে।

পরের দিনই বৈষ্ণব সেজে আমি তার বাড়ি গেলাম। একাই গেলাম। প্রথম দিনেই ইনফরমারকে সঙ্গে নিলাম না।

আমাকে ভক্ত বৈষ্ণব মনে করে এবং আমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে তার খুব খুশী হল, আমাকে বসালো এবং আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। অনেক তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল।

গোপালদাস সে সময় বাড়ি ছিল না, একটু পরে সে এলো। আমাকে দেখে এবং আমার কৃষ্ণ ভক্তির পরিচয় পেয়ে গোপালদাসও খুশী হয়ে, আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

দেখলাম মেদিনীপুরের ইনফরমার কলকাতায় এসে কেষ্ট চৌধুরীর চেহারার যে বিশদ বর্ণনা আমার কাছে দিয়েছিল, গোপালদাস মোহান্তর সঙ্গে তার খুবই মিল। মনে হল, আমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় নি—কেষ্ট চৌধুরীকে হাতের কাছেই পেয়ে গেছি। কিন্তু খুব সাবধানে অগ্রসর হওয়া দরকার।

• • • • • • • • •

পরদিন আবার গোপালদাস মোহান্তর বাড়ী হাজির হলাম। আজ আমি একা নই। যে ইনফরমারটি কেষ্ট চৌধুরীকে চিনিয়ে দেবার জন্যে মেদিনীপুর থেকে এসেছিল আজ তাকেও বৈষ্ণব সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

সঙ্গে কয়েকজন সেপাইকেও নিলাম। গোপালদাসের বাড়ির কাছে গিয়ে তাদের কিছুদূরে লুকিয়ে থাকতে বলে আমরা গোপালদাসের বাড়িতে ঢুকলাম। সেপাইদের সঙ্গে বন্দোবস্ত রইল যে, আমার সঙ্গী ইনফরমার একটু পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাদের খবর দেবা মাত্র তারা সকলে গোপালদাসের বাড়ি ঢুকবে এবং আমার নির্দেশমত গোপালদাসকে গ্রেপ্তার করবে। আর আমরা দুজনেই যদি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাই তাহলে তারাও সেখান থেকে চলে যাবে, গোপালদাসের বাড়ি ঢুকবে না।

এইভাবে প্ল্যান করে আমরা দুজনে গোপালদাসের বাড়ি ঢুকলাম। গোপালদাস আর তবই দু'জনে বাড়িতে ছিল। দালানের পাশের তুলসী তলায় বসে আমাদের আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। আমার সঙ্গীর বৈষ্ণবোচিত বিনয় নম্র কথা আর ভক্তিভাব দেখে গোপালদাস আর তব দু'জনেই খুব খুশী হল।

কথা বলতে বলতে এক সময়ে আমার সঙ্গী ইনকরমারটি, যে ইসারার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম সেই রকম ইসারা অনুযায়ী, আমার সঙ্কেতে জানাল যে সে কেষ্ট চৌধুরীকে চিনতে পেরেছে, অর্থাৎ গোপালদাস মোহান্তই হচ্ছে কেষ্ট চৌধুরী।

কিছুক্ষণ পরে আমি সঙ্গীকে গোপনে ইসারা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কর্তা! আমার একটি জরুরি সেবা করবার জন্তে যেতে হবে। আজ আসি, প্রণাম সকলকে।"

এই বলে সে বেরিয়ে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেপাইদের নিয়ে বাড়িতে ঢুকল।

আমার আদেশে সেপাইরা গোপালদাস মোহান্তকে গ্রেপ্তার করল।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে গোপালদাস এমনই অবাক আর বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তার মুখখানা শুধু ভয়ঙ্কর বীভৎস আকার ধারণ করল এবং সে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * * * * * * *

ধরলাম তো কেষ্ট চৌধুরীকে। কিন্তু আরও নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ দরকার। ইনকরমারটিকে সেই দিনই মেদিনীপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল। সম্প্রতি যাদের বাড়ী কেষ্ট চৌধুরী ডাকাতি করেছে সেই দুই ব্যক্তিকে, কথা ভাজনপুর গ্রামের পার্বতী বেওয়া আর শিবানীপুর গ্রামের রাম দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই সঙ্গে আরও যেসব পুলিশ কর্মচারী কেষ্ট চৌধুরীকে চেনে তাদের নিয়ে আসতে।

কেষ্ট চৌধুরী আর তব হাজত বাস করতে লাগল। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কেস সাজাতে লাগলাম।

দু'তিন দিনের মধ্যে মেদিনীপুর থেকে সকলে এসে উপস্থিত হল এবং সকলেই গোপালদাস মোহান্তকে কেষ্ট চৌধুরী বলে সনাক্ত করল।

কেষ্ট চৌধুরী কল্পনা করতে পারেনি যে সেভাবে কলকাতায় ধরা পড়বে। যখন বুঝল যে এ যাত্রা তার আর নিস্তার নেই তখন সব কথাই স্বীকার করল।

তবর কাছে থেকে যে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল সেই অনুসারে তার ঘর তল্লাস করে ঘরের মেঝের পোতা একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি থেকে আর তুলসীমঞ্চ ভেঙে তার গহ্বর থেকে অনেক লুটের মাল পাওয়া গেল। তার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল পার্বতী বেওয়া আর রাম দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিনিষ। তারা সেগুলি সনাক্ত করল।

মাল সমেত কেষ্ট চৌধুরীকে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানকার আদালতেও কেষ্ট চৌধুরী সব কথা স্বীকার করল। বিচারে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল।

তবর বিচার হল কলকাতায়। চোরাই মাল রাখার অপরাধে সেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল, অবশ্য অল্প মেয়াদে।

* * * * * * * * *

কেষ্ট চৌধুরী যখন হাজত বাস করছিল সেই সময় দু তিন দিন তার কাছে বসে আমি তার একটি জবানবন্দী নিতে গিয়াছিলাম। সেই জবানবন্দী এইখানে পাঠকদের পরিবেশন করছি। এই জবানবন্দী

থেকে পাঠকগণ দেখবেন, কী ভাবে সে সময় বাংলার গ্রামে ডাকাতি হত, কী ভাবে সৎ গ্রামবাসী প্রলোভনে পড়ে ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিত এবং কী ভাবে গ্রামে ডাকাতের দল গড়ে উঠত।

এই মামলার পর বাংলা সরকার গ্রাম বাংলায় ডাকাতি নিবারণের জন্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন আর তারই ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে বেপরোয়া ডাকাতি অনেক কমে গিয়েছিল।

কেষ্ট চৌধুরী বলেছিল—"আমার নাম কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী। থানা—, মেদিনীপুর জেলার সালবনি গ্রামে। আমার বিয়ে হবার অল্পদিন পরেই আমার বাবা মারা যান। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন আমি সংসারের কোন কাজে কখনো হাত দিই নি, সবই বাবা করতেন। আমি নিজের খেয়াল খুশীমত দিন কাটাতাম। আমার সখের মধ্যে ছিল কুস্তি করা আর লাঠি খেলা। ছেলে বয়সেই লাঠি খেলায় আমি এমন পাকা হয়েছিলাম যে গ্রামের মধ্যে যারা ভাল লাঠি খেলতে জানতেন তাঁদের সবাইকে হারিয়ে দিতাম।

বাবা বেঁচে থাকার সময় আমি এমন কোন কাজকর্ম শিখিনি যাতে করে বাবার অবর্তমানে সংসার চালাতে পারি। অন্য কোন উপায় না পেয়ে আমাকে লাঠির আশ্রয় নিতে হল। অর্থাৎ আমি ভাড়াটে লাঠিয়াল হিসেবে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগলাম।

আমাদের দেশের জমিদার, মহাজন বা ঐ ধরনের বড় লোকদের মাঝে মাঝে লাঠিয়ালের দরকার হত। এবং তাঁরা মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তাঁদের কাজ করে দিয়ে উপার্জন হত সামান্যই। তাতে ভাল ভাবে সংসার চালানো যেতো না। তার উপর ছেলে বেলা থেকেই আমি দরাজ হাতে খরচ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। এখন সে ভাবে খরচ করতে না পেরে মনে বড় কষ্ট হত। তাই, অন্য পথ না পেয়ে পয়সার জন্যে আমাকে নতুন পথ ধরতে হল।

যে সময়ে আমি এক জমিদারের কাছে ঐকা কাজে নিযুক্ত ছিলাম সেই সময় সেই জমিদারের অপর একজনের একখণ্ড জমি জোর করে দখল নেবার প্রয়োজন হয়। বাংলার গ্রামে এ ধরনের জবরদস্তি লাঠিয়াল দিয়ে জমি দখল করার ব্যাপার নতুন কিছু নয়। সে সময়ে লোকের মুখের কথাই ছিল, লাঠি যার জমি তার। জমি কাড়াকাড়ি নিয়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে কত রক্তপাত হয়েছে তার হিসেব নেই।

আমার মনিব জমিদার মশায় যে কাজে হাত দিয়েছিলেন সে কাজ একা আমার দ্বারা নিষ্পন্ন হবার আশা না থাকায়, তিনি অন্যান্য জায়গা থেকে আরও কয়েকজন লেঠেল আনিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গোপাল। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়।

তারপর থেকে গোপাল মাঝে মাঝে আমার বাড়ী আসতো। আমিও তার বাড়ী যেতাম। আমার অবস্থা দেখে গোপাল বলত তোমার তো দেখছি খুবই অভাব। অথচ তোমার মতো গুণী লোকের এত অনটন হবার তো কথা নয়। যাই হোক, সুবিধামতো আমি তোমাকে একটা কাজে নিয়ে যাব। দেখি তোমার কষ্ট দূর করতে পারি কি না!

এইভাবে কিছুদিন যাবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলায় গোপাল আমার বাড়ী এলো এবং আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল আমরা একটা কাজে যাচ্ছি, তাতে বিলক্ষণ দু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

কী কাজ, কোথায় যেতে হবে। সে সব গোপাল কিছুই বলল না। যাই হোক, আমি তার সঙ্গে গেলাম। রাত বারোটার পর আমি জানতে পারলাম, কি কাজে গিয়েছি। সেই সময় একবার মনে হল, না, এ কাজে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। ফিরে যাই। কিন্তু গোপালের কথায় আর নিজের অভাবের কথা ভেবে ফেরা হল না।

আপনারা নিশ্চয় বুঝেছেন, কি কাজে গোপাল আমাকে সঙ্গে এনেছিল। ডাকাতি।

আমরা পঁচিশজন লোক দলবদ্ধ হয়ে সেই রাত্রে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলাম।

কি ভাবে ডাকাতি করতে হয়, তার কিছুই জানতাম না। এই আমার ডাকাতি কাজে হাতে খড়ি।

মশাল গুলো জেলে, বাড়ীর দরজা জানলা ভেঙে ভয়ানক বিকট চিৎকার করতে করতে আমাদের অনেকেই বাড়ির ভিতর ঢুকল। কয়েকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাইরে পাহারা দিতে লাগল। আমার হাতে অস্ত্রের মধ্যে ছিল লাঠি গাছটি। আমার ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না। বাড়ির বাইরে আলাদা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ভীষণ ভয় করছিল। যদি লোকজন তাড়া করে তাহলে যাতে পালিয়ে যেতে পারি তাই সুবিধামতো জায়গা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু কেউ এলো না আমাদের দলের লোকজনদের ভয়ঙ্কর 'হারে রে রে' চিৎকার এবং আরও নানা রকম শব্দে গ্রামবাসীরা ভয়ে কেউ বেরুলো না।

যারা লুঠ করতে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল, অনুমান আধঘণ্টা পরে তারা বেরিয়ে এলো। আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে জোর কদমে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম।

ঘণ্টা দুই চলার পর একটা পুকুরের ধারে গিয়ে আমরা বসলাম। লুঠের মাল সেখানেই ভাগ বাটোয়ারা হল। কে কি পেল, জানতে পারলাম না। গোপাল আমার হাতে পঁচিশ টাকা দিয়ে বললে, "তোমার ভাগের টাকা নাও। কাউকে যেন কিছু বলো না। খুব সাবধানে থেকো। এর পরের বারেও তোমাকে সঙ্গে নেব।"

হঠাৎ এতগুলো, টাকা পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হল। গোপালদাসকে বললাম, "আমি তো তোমাদেরই দলের হয়ে গেলাম। এখন যেখানে যেতে বলবে, যাব।"

তারপর আমরা সবাই যে যার বাড়ির রাস্তা ধরলাম। ভোর হবার আগেই আমি আমার বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

এইভাবে আমার নতুন জীবনের সূত্রপাত হল। পরে পরে অনেকগুলো ডাকাতিতে যোগ দিলাম। এবং অনেক টাকা আর গয়না পেলাম।

জোর পুলিশ তদন্তের পর আমাদের কয়েকজন ধরা পড়ল এবং তাদের জেল হয়ে গেল। গোপালও তাদের মধ্যে ছিল। এক বছরের মধ্যেই গোপাল জেলে মারা যায়।

আমার নাম কেউ বলে নি। পুলিশও আমাকে কোন রকম সন্দেহ করেনি। আমি তখন গোপালের অভাবে দলে না গিয়ে নিজেই দল তৈরী করলাম আর ডাকাতি চালাতে লাগলাম। আট দশটা ডাকাতি করবার পর দল ভেঙে আবার নতুন দল গড়লাম আর আমি হলাম তার দলপতি। আমি তখন এক পাকা ডাকাতে পরিণত হয়েছি।

আমি যখন যে বাড়িতে ডাকাতি করতাম, তখন কয়েকদিন আগে সেই বাড়িতে যেতাম, হয় ভিখারী সেজে, না হয় বাউল বা বৈষ্ণব সেজে, যেন ভিক্ষা করতে গেছি এই ভাবে সেই বাড়িতে যতটা পারি ঢুকে চারিদিক লক্ষ্য করে দেখে নিতাম। কখনো বা গর্ভবতী সেজে মেয়েদের মহলেও সেঁধিয়ে যেতাম। অভিধি

সেজে মাঝে মাঝে কারুর কারুর বাড়িতে রাত্রিবাসও করেছি। এইভাবে প্রথমে সেই বাড়ির কোন্ দিকে কোন্ কোন্ দরজা, পাঁচিল কোন দিকে কতটুকু উঁচু, ক'খানা ঘর, কোন্ ঘরে দামী জিনিস পত্তর থাকবার সম্ভাবনা, বাড়িতে কতজন পুরুষ, কতজন স্ত্রীলোক থাকে, ক'জন সধবা ক'জন বিধবা, পুরুষেরা কি কাজ করে, তাদের কাছে বিশেষ রকম অস্ত্র-শস্ত্র থাকে কিনা, এই সব জেনে নিয়ে দু'চার দিনের মধ্যেই রাত্তের বেলায় দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে হানা দিতাম।

আমি যতদিন দলপতির কাজ করেছি তার মধ্যে কোন স্ত্রীলোককে কখনো কোন যন্ত্রণা দিই নি বা বেইজ্জত করিনি। শুধু তাদের সকলকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রেখেছি। ছোট ছেলেদেরও কখনো মারধর করিনি। হ্যাঁ তবে, যুবক বা বয়স্ক লোকদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার করেছি, মায়া দয়া করিনি।

পরপর কয়েকটা ডাকাতি করবার পর আমার নাম জানাজানি হয়ে পড়ল। পুলিশের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। আমার বাড়ি খানা তল্লাসী হল। কিন্তু আমি কখনো কোন কাঁচা কাজ করতাম না। লুটের মাল এমন লুকিয়ে রাখতাম যে পুলিশের সাধ্যি ছিল না তার খোঁজ পায়।

এদিকে আমার দলের কয়েকজন ধরা পড়ল। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদও পাওয়া গেল। ফলে তাদের জেলে যেতে হল। আমার বিরুদ্ধে শত চেষ্টা করেও কোন প্রমাণ না পাওয়ায় পুলিশ আমার কিছু করতে পারল না। তবে তাকে তাকে রইল।

গোলযোগ কমলে, সুযোগ বুঝে আমি আবার একটা দল তৈরী করলাম। পুরনো দু'চারজন আর তার সঙ্গে নতুন কয়েকজনকে নিয়ে নতুন দল হল।

কয়েকদিনের মধ্যে ছুটো ডাকাতি করলাম। বেশ টাকা আর গয়না গাঁটি পাওয়া গেল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ী আবার থানা তল্লাস করল। কিন্তু কিছুই পেল না।

এবারও আমার দলের দু'চারজন ধরা পড়ল। এবং তাদের কাছ থেকে লুটের মালও কিছু পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে একজন আমার নাম প্রকাশ করে দিল।

ফলে পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করল। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া গেল না। ফলে জজ সাহেব আমায় খালাস দিলেন। অন্য আসামীদের তিন বছর করে শ্রীঘর বাসের হুকুম হল।

বাড়ি ফিরে এসে আমার বুকের পাটা যেন আরও বেড়ে গেল। এতগুলো ডাকাতি করবার পর ধরা পড়েও ছাড়ান পেয়ে গেলাম দেখে আমার মনে হল আমি বুঝি কোনদিনই ধরা পড়ব না। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার দলবল নিয়ে কাজে নামলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন গ্রেপ্তার হলাম। কোথায় কোন্ গ্রামে ডাকাতি হয়েছে, তার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, অথচ পুলিশ বলল, সে ডাকাতি নাকি আমার দলেরই কাজ।

ভাবলাম, প্রকৃত মামলায় যখন অব্যাহতি পেয়েছি তখন এই মিথ্যে মামলায় আমার কিছু হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই মিথ্যে মামলায় আমার পাঁচ বছরের জন্যে জেল হয়ে গেল। পুলিশ এমন ভাবে মামলাটা সাজিয়েছিল যাতে জজ সাহেব সত্যিই মনে করলেন যে—ডাকাতি আমারই কাজ!

জেলের মধ্যে অত্যন্ত মনোকষ্টে দিন কেটেছিল। যাইহোক, ১৮৮৫ সালে আমার মেয়াদ শেষ হল এবং আমি জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি গেলাম। আগে ডাকাতি করে যে টাকা জমিয়েছিলাম, দেখলাম, আমার স্ত্রী তা শেষ করতে পারেনি, বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে। সেই টাকায় আমি দিন গুজরান করতে লাগলাম আর নানা উপায় চিন্তা করতে লাগলাম।

কিন্তু পুলিশ আমায় শান্তিতে থাকতে দিল না। আমার উপর নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করল। কোথায় কোন চুরি বা ডাকাতি হলেই তারা আমার বাড়ী তল্লাস করত, আমায় থানায় টেনে নিয়ে যেত, নানা

ভাবে কষ্ট দিত। এমন কি রাতের বেলাতেও বেহাই ছিল না। ২'তিনবার ঘুম থেকে উঠে তাদের ডাকে থানায় দিতে হ'ত যে আমি বাড়িতেই আছি, ডাকাতি করতে বেরুই নি।

পুলিশের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি একদিন কাউকে কিছু না বলে গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম। ঘরে আমার স্ত্রী, আর দুটি ছেলে মেয়ে। তাদের ছেড়ে আসতে খুবই কষ্ট হল! তবে তাদের আমি কষ্ট দিইনি। এখান থেকে মাঝে মাঝেই লুকিয়ে গ্রামে গিয়ে তাদের দেখে এসেছি আর স্ত্রীর হাতে খরচ পত্রের টাকা দিয়ে এসেছি।

কলকাতায় এসে আমি প্রথমে ভবর বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করি। আমার আসল নাম গোপন রেখে গোপালদাস মোহান্ত বলে আমার পরিচয় দিই। ভবর বাড়িতে থাকতে থাকতে তার সঙ্গে আমার ভালবাসা জন্মাল। গত দু'বছর আমরা স্বামীস্ত্রীর মতোই বাস করছি।

কলকাতায় এসেই আমি একটি দল তৈরী করি। গত ফাল্গুন মাসের আগের ফাল্গুনে মানিকবন গ্রামের সদাই মহাদেস্থ, মোহন মহাদেস্থ, গোপীনাথপুরের কালা মহাদেস্থ, গোকুলডাবেতের পীতু গোয়ালা, কৃত্তিবাস নাপিত, মহাদেশ গ্রামের গোবিন্দ গোয়ালা এবং আরও পাঁচ ছ'জনকে নিয়ে হুগলীর ধনেখালি থানার খানপুর গ্রামে ডাকাতি করি। গত পৌষ মাসে হুগলা গ্রামের উমা নাপিত, গোকুল গঞ্জের কৃত্তিবাস নাপিত আর কান্তি দুলই, বড়ইবেদি গ্রামের গোপাল আর কত্তির দলুই এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে শিবানীপুরের রামদয়াল বাড়ুয্যের বাড়ি ডাকাতি করি। এই ভাবে হুগলী আর মেদিনীপুরের আরও পাঁচ সাতটা গ্রামে ডাকাতি করে বিস্তর টাকা সংগ্রহ করি।

আমি কি উপায়ে টাকা রোজগার করতাম ভব প্রথমটা তা জানতে পারেনি। পরে যখন জানল তখন আমার যোগ্য সঙ্গিনীর মতো সেই সব টাকা আর গয়নাগাটি খুব সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখতো।

কলকাতায় আমি একজন পরম বৈষ্ণব। অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ নাম নিয়ে আছি। মাঝে মাঝে আমার বৈষ্ণব শিষ্যেরা আমার বাড়িতে এসে রাত্রে থাকে। এখন তাদের সঙ্গে ডাকাতির ফন্দিফিকির আঁটি। বাইরে থেকে দেখে কে বলবে, আমরা একটা ডাকাতের দল।

ডাকাতি ব্যবসায়ে আমি যে টাকা পেয়েছি তা যদি রাখতে পারতাম তাহলে কলকাতা শহরের মধ্যে আমি একজন ধনী লোক বলে গণ্য হতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল—নানা দেশ ঘুরে বেড়ানো। ডাকাতি করে যে টাকা পেতাম, তার কিছু ভবকে আর কিছু স্ত্রীকে দিয়ে, বাকি টাকা নিয়ে আমি দেশ ভ্রমণে বেরুতাম। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন তীর্থ নেই যেখানে আমি না গিয়েছি। তীর্থে তীর্থে আমি দু'হাতে টাকা খরচ করেছি। দেশসেবা, অতিথি-সেবা, সাধুসেবা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা—এই সব কাজে আমি যে কত টাকা খরচ করেছি তার হিসেব নেই। আমি বৈষ্ণব সেজে থাকতাম। তাই অনেক বৈষ্ণবই আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসতো। আমি কাউকে কখনো বিমুখ করিনি। বৈষ্ণবদের মোচ্ছবে আমি অকাতরে টাকা দিয়েছি, অনেক অনেক টাকা। তাছাড়া অনেক গরীব গৃহস্থকে আমি সাহায্য করেছি। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত মানুষের দায় উদ্ধার করে দিয়েছি। আমি গরীবদের ঘরে কখনো ডাকাতি করিনি। বড়লোক এবং বিশেষ করে যেসব বড়লোকদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে না, তাদের টাকার ওপরেই আমার বরাবর লক্ষ্য ছিল বেশী।

আমার বয়স অনেক হল যে ভাবে ধরা পড়েছি, তাতে আর নিস্তার নেই, তাই আজ আপনাকে অকপটে এত কথা বললাম। নইলে একটি কথাও আমার মুখ থেকে আপনারা শুনতে পেতেন না।

আমি তো যেতে বসেছি। কিন্তু আপনাকে একটি কথা না বলে যেতে পারছি না। আমি ডাকাত বটে, কিন্তু আপনি বিশ্বাসঘাতক। ধর্মের ভান করে আপনি যে রকম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করলেন, যতদিন বাঁচবো, ততদিন তা ভুলতে পারব না।"

মানতের পূজা

(স্মৃতি চিত্র)

শ্রীগিরি বালা দেবী

অনেক রাতে ভিন্ন গ্রাম হতে ঘরে ফিরলেন হরিহর আচার্য। তিনি গিয়েছিলেন গ্রামান্তরে বড় মেয়ে শৈলবালার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। হুত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তিনটি ছেলে মেয়ের জনক। এমনি দিন কাটে না। তার ওপরে আবার কন্যাদায়। 'সোনার সোহাগা যেন।

আচার্য গৃহিনী সন্ধ্যা থেকে স্বামীর প্রতীক্ষায় ঘর বার করছিলেন। এতক্ষণ স্বামীকে আসতে দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করলেন।

হরিহর রান্নাঘরের মাদুরে বসলে গৃহিণী পরিশ্রান্ত স্বামীকে তাল পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এত রাত হল কেন? ছেলের বাপ ধারের সাথে দেখা করতে পেরেছ?"

"তা পেরেছি ছোট বৌ, কথাবার্তাও হয়েছে। বরটিকেও দেখলাম। দিব্যি ছেলে, হীরার টুকরো। যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুই ভাই পাশ করে গাঁয়ের ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার। ওদের গাঁখানাও শহরের মতো। আমাদের এখানকার মতন পচা ডোবার এঁদো নয়। আমার মতো যজন-যাজন-করা গরীব বামুনের মেয়ে, যে ছেলের বাপের নজরে পড়ে গেছে। একি কম সৌভাগ্য? কিন্তু ভাগ্যে তা হবার নয়। শৈল কোথায়?" বলে হরিহর স্ত্রীর হাত থেকে পাখা নিয়ে নিজেই হাওয়া খেতে লাগলেন।

ভাদ্রের গুমোটে চারদিক থম্ থম্ করছে। গুরু পাড়া, বাতাসের লেশ মাত্রও নেই। অন্ধকার আগাছার জঙ্গলে সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙের সকরুণ আর্তনাদে নিশীথের নীরবতা খান্-খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

ছোট বৌ বলে, "ওরা সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তোমার ভাত উনুনের মুখে রেখে দিয়ে বসে রয়েছি। তা শৈলি আমার কি কম সুন্দর? কেউ পছন্দ না করে পারে? গোটা গাঁ খুঁজে বের করনা, আমার মেয়ের মতন আর একটা মেয়ে?"

হরিহর একটুখানি মলিন হাসি হেসে আঙ্গুল তুলে বলেন, "এ গাঁয়ে মেয়ে না থাকুক, তোমার মেয়ের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু বৌ আছে তো?"

ছোট বৌ আরক্ত হয়ে বলে ওঠে, "তোমার কষ্টি-নষ্টির কথা এখন রেখে দাও। ওদের চাহিদা যে কি সেটা বোঝ না।"

"বলছি," তাদের পক্ষে সেটা কিছুই নয়। মাত্র পাঁচ ভরি সোনা, আর দুশো টাকা বর খরচ। এর কমে কেউ কি মেয়ে পার করতে পারে? ধানের জমিটুকু বেচে আমি না হয় দুশো টাকা

যোগাড় করবো, কিন্তু পাঁচ ভরি সোনা? এক রত্তি সোনা তোমায় দিতে পারিনি ছোট বৌ, কোথায় পাব পাঁচ ভরি সোনা?"

ছোট বৌ এত দুখের আশার আলো দমকা বাতাসে যেন নিভে গেল। তবু সে স্বামীকে আশ্বাস দিতে উত্তর দিলে, "এখন থাকুক ও কথা, কাল শুনবো ভাল করে। এবার তুমি হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নাও। আমি ভাত বাড়িগে।" ছোট বৌ উঠে গেলেন।

বোড়শী শৈলবালা কিন্তু ঘুমোয়নি। ভাই বোনদের মধ্যে শুয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সে বাপ মায়ের আলাপ আলোচনা। সে বাংলা দেশের কুমারী মেয়ে। পিতা মাতার অভাবের সংসারে একটা পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা। বিনা মাশুলে তার কেউ বইতে চায় না।

শৈল দুই হাত জোড় করে ডাকে, "হে মা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী, আর ক'দিন পরেইত তুমি আসবে। জগৎ আনন্দে হাসবে। হাসবে না শুধু আমার মা বাবা। তাদের দুঃখ দূর করে তুমি আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও। আমাকে তোমার কোলে তুলে নাও। আমার দুঃখের, লজ্জার পরিত্রাণ করো।"

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শৈলর দুই চোখের জলে বালিশ ভিজে যেতে লাগলো। এমনি নীরব অশ্রুজলে বাংলার কত কুমারীর উপাধান সিক্ত হয়ে যায়, কে খবর রাখে। এক মাত্র বাকী থাকে অন্ধকার নিশাধিনী, মলিন উপাধান।

এ গ্রামে পোষ্টাফিস নেই। পাশের গাঁয়ে পোষ্টাফিস আছে। সেখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। হাটের লোকেরা নিয়ে আসে এখানকার চিঠি পত্র। হাটুরিয়া লোকেরা রাতে হাট হতে ফিরে পরের দিন প্রভাতে চিঠি দেয় চিঠির মালিককে।

হরিহরের ঘরে মা চণ্ডীর ঘট বসানো আছে। ভোরে স্নান সেরে ফুল তুলে ঘটে পুজো করে চণ্ডী পাঠ করেন। তার পরে আরম্ভ হয় জীবনযাত্রা।

চণ্ডী পাঠ শেষ করে বাইরে বেরোতেই সনাতন তাঁর হাতে আনে বহু একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। হস্তাক্ষর তাঁর পুরানো যজমান মজুমদার মশায়ের। কি কুক্ষণে হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে মজুমদারের পায়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। কি কুক্ষণে তিনি তাঁর উপযুক্ত ছেলেদের কাছে পা সারাতে শহরে চলে গিয়েছিলেন। তার পরেই তাঁর বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ হয়ে হরিহর চরম দুর্দ্দশায় পড়েছেন।

চাষী-প্রধান ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এক লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠী পাওনাই ভিন্ন কারোর কিছু করবার সঙ্গতি নেই।

সুদীর্ঘ তিনটি বছর পরে মজুমদার মশাই কি লিখেছেন?

চিঠি খুলে পড়তে পড়তে আনন্দে বিগলিত হয়ে হরিহর ডাকেন, "ও শৈল, নিবারণ, তোর মাকে ডেকে নিয়ে এদিকে এসে শোন মজুমদার মশাই পত্র লিখেছেন। অনেক চেষ্টা চরিত্রে ওঁর পায়ের ভাঙ্গা হাড় জোড়া লেগে ভাল হয়ে গেছেন। তাই গিন্নীমা মানত করেছেন দুর্গাপুজোর। মানতের পুজো করতে ওঁরা শীগ্‌গিরি আসেন। আর শহরে ফিরে যাবেন না। গাঁয়ে থেকে এখানকার উন্নতি করবেন। আমার ঠাকুরদা বাবার আমলে কি ঘটাপটা করে ওঁদের দুর্গোৎসব হতো, মার কাছে গল্প শুনেছি। তার পরে মাঝখানে সব বন্ধ হয়ে যায়। কত কাল পরে আবার ওঁদের সুমতি হয়েছে,

দেখে আসছেন যাকে আনছেন। আমরা মজুমদারদের কত কালের কুলপুরোহিত, তাই আমাকে লিখেছেন সব।"

আনন্দে সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। মজুমদারদের পরে এ গাঁয়ে আর দুর্গোৎসব হয় নাই। খবরে দিয়ে সকলে মা দুর্গার চরণদর্শন করে এসেছে।

ছোট বৌ পুলকিত হয়ে বলেন, "ওঁরা গাঁ আঁধার করে কতকাল হল চলে গিয়েছেন। তাদের আবার ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে আসুন। আমরা-ও একটু বল ভরসা পাই।"

ছোট মেয়ে নবীবালার বছর বার বয়েস, কিন্তু বুদ্ধি ও বাচালতায় বেশ খর, খরে। সে হাসি মুখে বলে ওঠে, "এবার পূজো করে বাবা কত জিনিস পাবেন, আমাদের ঘর ভরে যাবে।"

'ঘর ভরা আমি চাই না। মজুমদাররা আমাদের যজমান। তাদের শ্রীবৃদ্ধি ভাল থাকা এই আমি চাই। ভাদ্রমাস শেষ হয়ে এসেছে। পূজোর আর দেরী নাই। এর ভেতরে সমস্ত আয়োজন করতে হবে। ওঁরা আশ্বিন মাসের প্রথমেই আসবেন। আমি এক্ষুনি চলি মজুমদার বাড়ী, সহকার রয়েছে বড়ো আগলে, তাকে বলি তো। পূজোর দালানে পোবার কোঠায় কালি দিতে প্রতিমা তৈরির জন্য পালদের খবর দিতে হবে. বাগান-বাগিচা পরিষ্কার করাতে হবে। তার পরে পূজোর জিনিস পত্রের যোগাড়।"

বলতে বলতে বেড়ার গায় থেকে মলিন উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলে হরিহর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেড়িয়ে গেলেন।

মজুমদার-ভবন কোলাহল আনন্দে মুখর। কর্তা গিন্নী, দুই পুত্র বধূ, দুই বিবাহিতা, কন্যা দুই দলের তখন অনেক ছেলে-মেয়ে আশ্বিনের প্রথমেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দুই ছেলে আসবে পঞ্চমী বা ষষ্ঠীতে। শহরে তাদের বিরাট কারবার কারখানা, তাদের সঙ্গে জামাতারাও আসবে। সকলের কাজ কর্মের ডুবে আছে সারাদিন। পল্লী গ্রামে থেকে অকারণ সময় নষ্ট করবার প্রবৃত্তি নেই কারো। তারা নগরজীবনের চপল চাপল্যে মোহিত হয়ে ভুলে গেছে অনাদৃত অবহেলিত পল্লীকে। সেখানে লুকানো রয়েছে বাংলার ঐশ্বর্য, বাঙালীর মূল মন্ত্র।

মজুমদারকর্তা ও গৃহিনী সুদীর্ঘ কাল নগরে বাস করে সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই ফিরে এসেছেন তাঁদের জন্মভূমিতে পল্লীর মাটিতে-মায়ের কোলে। তাঁরা মুক্ত হস্তে খরচ করেছেন পথ ঘাট মেরামত করতে, পচা ডোবা নালা বন্ধ করতে। দরিদ্র গ্রাম বাসীরা আশ্বাস পেয়েছে—তাদের নূতন পোটাফিস হবে। দৈনিক বাজার বসবে। বন্দরের মতো হাট হবে সপ্তাহে দুইদিন।

চাষী মহলে প্রচার হয়েছে যে, কর্তা লটারীর টিকিট কিনে একলক্ষ টাকা পেয়েছেন; সেই টাকায় গাঁয়ের উন্নতি হবে। মেয়ে মহলে প্রচার যে, মজুমদারগৃহিনী স্বপ্ন প্রায় পিতৃভবনের অধিকারিনী হয়ে ফিরেছেন. তাই এত জাঁক জমক।

লোকে কথায় বলে দুর্গোৎসব যেমন আড়ম্বর তেমনি আয়োজন। তার পরে মজুমদার গৃহিনীর হুকুম ভাজা পর পূজার তিনদিন গাঁয়ের কারো ঘরে হাঁড়ি চড়তে পাবে না। তিনি মহামায়ার মহা প্রসাদ সকলকে বিতরণ করবেন। এতো লোকের অন্তে খাদ্য সংগ্রহ যোগাড়-যন্ত্র কম নয়।
কর্তা পূজোর উপকরণের ও ভোগের উপাদানের ভার দিয়েছেন হরিহরকে। গৃহিনী আদরের ভার দিয়েছেন ছোটবৌকে। ফলে দুই স্বামী স্ত্রী এখানেই কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন।

দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল, মাঠে ঘাটে রাখালের বাঁশের বাঁশীতে মেঠো সুরের মূর্ছনা ধ্বনিত হতে লাগলো,—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার কত কেঁদেছে।"

এই চিরন্তনী তনয়া বিচ্ছেদকাতরা জননীর খেদোক্তি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। বৈরাগী বোষ্টমীর খঞ্জনীতে বেজে চলছিল—"কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই,

কতলোকে কত বলে, শুনে লাজে মরে যাই।"

পঞ্চমীতে ঢাকের গুরুগম্ভীর সাজ পরে মা দুর্গা ঘটে উঠে বসলেন।

কাতারে কাতারে লোক আসে প্রতিমা দর্শন করতে। মায়ের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখের দীপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভুবনে। তার ছায়া পড়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা দর্শকদের প্রফুল্ল আননে। এবার তাদের দূরে যেতে হবে না। বছরের পথ ঘুরতে হবে না। কত কাল পরে গ্রামের ঘরে নিধি আবার ফিরে এসেছেন।

ভক্তিমতী বসুমজুমদার গৃহিনী আড়ালে লুকিয়ে প্রতিমার মুখ দেখেন, জনতার মুখ দেখেন, আর করজোড়ে মনে মনে বলেন, "মা, আমাদের পানে অনাদরে তুমি এ ভিটে ছেড়ে গিয়েছিলে এই যে ফিরে এসেছ, এমনি দয়া করে বছরে বছরে চরণের ধুলো দিও।"

মাঝখানে ষষ্ঠী গেল, বেলতলায় মহাসমারোহে মায়ের বোধন হইল।

সপ্তমীর প্রভাতের সোনার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে গ্রাম সচকিত করে ঢাক ঢোল কাঁসারীর সুউচ্চ নিনাদে বাজতে লাগলো। সানাই উঠিয়ে বিনিয়ে তান ধরলো।

"গা তোল, গা তোল বাঁধনা কুন্তল

ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।"

পূজো মণ্ডপে বিপুল আয়োজন। হরিহর পূজোয় বসলেন, শঙ্খ বাজছে ঘন ঘন, মেয়েরা উলুধ্বনিতে বাড়ী সর গরম করে তুলেছে।

ভোগশালায় বিরাট কাণ্ড। গৃহিনী মেয়েদের নিয়ে বধূদের নিয়ে ভোগশালায় ঢুকেছেন। মায়ের ভোগ পাচক ব্রাহ্মণরা ছোঁবে না। ছোটবৌ রয়েছেন সব দিকেই।

বেলা তখনো বেশী হয় নাই। দলে দলে লোক এসেছে পূজো দেখতে।

মায়ের আদেশে শৈলবালা এসেছে ছোট বোন ননীবালাকে নিয়ে মহামায়ার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে।

সেই ভিন্ন গ্রামের সুদর্শন ইস্কুলের হেড মাষ্টার ছেলেটির সঙ্গেই তার বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ।

বিবাহ স্থির হবার পর থেকে শৈলর লজ্জার সীমা নেই। সে ভিড়ের ভেতরে প্রথমে আসতেই চায়নি, কিন্তু মাতৃ আদেশ।

মণ্ডপের এক কোনে ছোট বৌ দুই বোনকে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। অঞ্জলির সময় হলেই তারা সকলের সঙ্গে অঞ্জলি দেবে।

বাচাল মেয়ে ননী চুপ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। অনিমিষনয়নে প্রতিমার সর্বাঙ্গ লক্ষ করছিল।

মানতের পুজায় গৃহিনী মায়ের অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার দিয়েছেন, দুই বাহু মূলে বিলাস করা কঙ্কন;

গলায় চেনহার ঠিক। কানে কানবালা, কপালে কপালটিকা, নাকে নথ, আঙুলে আংটী চরণে রূপোর মল।

প্রতিমার দুই হাতে কঙ্কন, আর আট হাত, দুই মেয়ে দুই বৌ স্বর্ণলঙ্কার শূন্য করে রাখেনি, বাঙ্গা হুকোর গাঁথা নারকেল ফুল, পলাকাঠি, বাঁশ শোলা বানাকাটা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে।

সিংহের পেটের নীচে কাঠামোর ওপরে থরে থরে শাড়ী, বেনারসী, বালুচী, গরদ, তসর, মটকা ইত্যাদি।

পূজোয় যাবতীয় জিনিসই পুরোহিতের পাওনা। ননী সেটা বিলক্ষণ রূপেই জানতো। দিদির কানের কাছে মুখ তুলে সে চুপে চুপে বলে, "দেখ দিদি; সোণ র হার গলায় প্রতিমা কেমন হাসছেন? পাঁচ ভরি সোনার জন্য বাবা ভাবনায় সারা হয়ে গিয়েছিলেন; মা দুর্গা দিলেন রাশি রাশি সোনা।"

হৈম সচকিতে একবার চারদিক চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে জবাব দেয়, "চুপ করে থাক ননী, এখানে কোন কথা বলিস নে। কেউ শুনবে "শুনবে আবার কে? এই মিত্তি মিত্তি চণ্ডীর ঘটে ভুল জল দিতিস, দিদি। মা চণ্ডী তোকে কত দিলেন। এবার থেকে আমি ও ঘটে ভুল জল দেব।"

এই সেকালের পূজা ও সেকালের বিশ্বাস।

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এটা স্রেফ্ আড্ডার কাহিনী। অনেকেই এটাকে আমার "জীবনস্মৃতি" বলে ভুল করবেন। এই ভ্রান্তির কারণ আর কিছুই নয় গল্প-ভারতীর কর্তৃপক্ষ এটিকে "স্মৃতিচারণ" বলে বিজ্ঞাপিত করেন বলে। অবশ্য এ জন্য গল্প-ভারতীর পরিচালক মণ্ডলীকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এটা "জীবন-স্মৃতি" না হলেও 'স্মৃতিচারণ' তো বটেই! কোথায় কবে কোন বয়সে কোন আড্ডায় ভিড়েছিলুম সেই গুলো স্মরণ করে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যখন তখন স্মৃতিচারণ তো এটা নিশ্চয়ই। যাঁরা লেখাটা পড়েন তাঁরা কখনই একে আমার 'জীবনস্মৃতি' বলে ভুল করতে পারেন না। এ ভুল করা তাঁদেরই পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা কেবল মাত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির সূচীপত্র পড়েই শেষ করেন তাঁদের পড়া। ভিতরের পাতা গুলো আর উল্টে দেখেন না। অবশ্য সে অনুযোগ করব না তাঁদের। কারণ তাঁদের সময় হয়ত মূল্যবান। আড্ডা দেবার অথবা আড্ডার ইতিকথা পড়বার মতো বাড়তি সময় হয়ত তাঁদের হাতে নেই। সুতরাং এ নিয়ে অনুযোগ করাও অসঙ্গত বলে মনে করি।

সকলেই এ কথা জানেন যে জীবনস্মৃতি' হল একটি মানুষের সারাজীবনের সম্পূর্ণ কাহিনী। কিন্তু 'স্মৃতিচরণ' তা নয়। জীবনের টুকরো টুকরো সব হাসি কান্নার ছোট খাটো খবর যা মাঝে মাঝে মনে পড়লে মনটা আনন্দ ও বেদনায় সমভাবেই টন্ টন্ করে ওঠে। আনন্দ দেয় সেই বে-পরোওয়া যৌবন উপভোগ করার উদ্দাম সুখ-স্মৃতির টুকরোগুলোর আস্বাদ যা আজও ভাবলে রসনা সরস হয়ে ওঠে সে আনন্দ ভুলতে পারিনি! আর বেদনা পাই যখন বুঝি রাত্রি জাগরণ আর শরীরে সইছে না। যা কিছু খাদ্যাখাদ্য অবিবেচনা ভোজন দুর্বল পাকস্থলী আর হজম করতে রাজী নয়। বাসে ট্রামে ওঠা-নামা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দলে ভিড়ে ট্রেনে চড়ে চাল চিঁড়ে না বেঁধেছেই খেয়ালখুশী মতো বিনাদ্বিধায় উধাও হয়ে যাওয়ার দুঃসাহস আর নেই। যে থিয়েটার দেখতে এত ভাল বাসতুম সেখানেও বাত হয়েছে—খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে'—ভাবতে ভাবতে দ্বিতীয় অংকেই উঠে পড়তে হয়। যবনিকা পতন ও জাতীয় সঙ্গীত শোনা পর্যন্ত থাকার সাহস নেই। শরীরের উপর ভরসা কমে গেছে।

তাই ভরা পেট খেয়ে গো-জাতীয় পশুদের মতো শুয়ে পড়ে জাবর কাটার মতো বৃদ্ধ বয়সে মানুষের স্মৃতির টুকরো মন্থন করতে বেশ ভালই লাগে। সারাজীবনই প্রায় আড্ডা দিয়েই কাটিয়েছি। আজও দিতুম যদি শরীর না বিদ্রোহ করতো! তাই, জীবনে কিছু হলর্ভ সৎসঙ্গ ছাড়া আর কিছু সৎ কাজ করবার সৌভাগ্য হয়নি। আমাদের উঠতি বয়সের সব আড্ডাই বহু আড্ডাধারীর সঙ্গে সঙ্গেই আজ বিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল শিবরাত্রির সলতের মত টিম্‌টিম্ করে একটি মাত্র আড্ডা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সেটি হল সর্বজনবিদিত বউবাজারের "ওল্ড ক্লাব"। নামেও 'ওল্ড' বয়েসেও সব আড্ডার চেয়ে 'ওল্ড'। আজ সেই 'ওল্ড ক্লাবের' কাহিনীই বলি শুনুন।

অনেকদিনের পুরোনো কাসুন্দি। প্রায় ষাট বছর হয়ে এলো আজ। বোধকরি ওল্ড ক্লাবের নাম, ক্লাব, সমাজে কারুই অবিদিত নয়। 'ওল্ড ক্লাব' এই নামটি এই প্রতিষ্ঠান এতদিনে সার্থক করে তুলতে পেরেছেন। একদা এ ক্লাবের পত্তন হয়েছিল খুব সামান্য ভাবে ছোট করে। যেমন সব প্রতিষ্ঠানেরই হয়ে থাকে। বৌবাজারের মোড়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের কোণের একখানি বাড়ির দোতলার ঘরে ইংরিজি ১৯০৬ সালে এই আড্ডার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সেদিন আমার সৌভাগ্য হয়নি সে দলে ভিড়ে যাবার। প্রায় বছর দুই তিন পরে এঁদের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল।

নাট্যাচার্য বন্ধুবর শিশির কুমার ভাদুড়ি যিনি রঙ্গমঞ্চে এক যুগান্তর নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই আমাকে একদিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে টেনে নিয়ে গিয়ে সভ্য করেছিলেন। আবার তিনিই ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে বউবাজারের মোড়ের এই 'ওল্ড ক্লাবে'। নিচের একটা সন্দেশের দোকান না রেষ্টুরেন্ট কি ছিল ঠিক মনে নেই। পাশের দিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একখানি প্রশস্ত ঘর সামনে গাড়ি বারান্দা। ঘরে সতরঞ্চি পাতা। চালের আচ্ছাদন ও তাকিয়ার ব্যবস্থাও ছিল। আর ছিল তামাকের সরঞ্জাম।

এই তামাকের ব্যবস্থা আমি ইতিপূর্বে আর কোনও আড্ডায় আছে দেখিনি। ইভনিং ক্লাবের আড্ডায় তাকিয়াছিল কিন্তু তামাক ছিল না। গুরুদেব নির্বন্ধ চক্র এটি প্রবর্তন করেছিলেন। আমিও তখন তামাকের বেশ ভক্ত হয়েপড়েছি। শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন আপনারা তামাক ধরিয়েছিলেন আমাকে আমার পূজ্যপাদ শিক্ষকদের। তাঁর হরদম্ তালা গড়গড়া ছিল এবং হরদম তিনি তামাকই টানতেন। কৌতূহলী বালাখানা থেকে তাঁর তামাক আসতো। জানিনা তা 'অম্বুরী' না 'ভ্যালসা' 'দা-কাটা'-না 'মিঠে কড়া', 'মিষ্টুপুরী', না 'আনার পুরী', অথবা 'গয়া'! একদিন পথে তিনি আমায় দেখতে পেয়েছিলেন আমি সিগারেট টানতে টানতে যাচ্ছি। বাড়ে বাঁড় ফিরতেই আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন ওগুলো ছেড়ে দাও। ফেশনাই ধোঁয়া টানলেই ধোঁয়া পাওয়া যায় বটে, টিকে ধরাবার ঝামেলা নেই। তাও অপেক্ষা করতে হবেনা। কিন্তু এতে ল্যাঙ্গ জখম হয়। টোবাকোরপাটিক্লিয়স্ ধোঁয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়ে ফুকে। সিগারেট ছেড়ে দিয়ে তামাক টানা অভ্যাস করো। বুঝলে! এতে নিকোটিন জলের ভিতর দিয়ে পিউরিফায়েড হয়ে এসে নির্দোষ ধোঁয়া টুকু উপভোগ করতে পারবে। অপরাধীর মতো নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করে চলে এলুম।

পরদিন দেখি 'বৈকুণ্ঠ' চাকরটাকে দিয়ে বাবা আমার ঘরে একেবারে সাজা হুকো-গড়গড়া সব কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরাজী ১৯১৩ সালে সেই যে তামাক ধরেছিলুম ১৯৩৪ সালে -অর্থাৎ বিশ বাইশ বছর পরে ধূমপান আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি শুনে ঠাট্টা করে বললেন— এতকালের অভ্যেস তুমি একদিনে ছেড়ে দিলে? তুমিত বড় ভয়ানক লোক। কোনদিন আমাকেও ছেড়ে দেবে দেখছি!

হেসে বললুম—ভয় নেই দেবী। তোমাকে তো অভ্যাস করিনি। সুতরাং, ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ওল্ড ক্লাবের আড্ডায় থিয়েটারের আকর্ষণ ছাড়াও তামাকের আকর্ষণ ও আমাকে বহুবার ওপথে যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলেছে ওপরে।

আমি যদিও ওল্ড ক্লাবের পাওনীয়রদের মধ্যে একজন বলে দাবি করতে পারিনি, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার পুরাতন বন্ধু ছিলেন এ কথা বলে অবশ্যই গর্ব করতে পারি। কিন্তু তাঁরা

আজ কোথায়? কোন ইন্দ্রলোকের দেবকুমারদের নিয়ে অমরাবতীতে আনন্দময় ওল্ড ক্লাব পরিচালনা করছেন! সেখানে আজ ঘরের দরকার হয় না, মেক-আপ ম্যান চাই না, স্ত্রী ভূমিকা ভাবিয়ে তোলে না।

দোষ দেব না আমি তাঁদের। কীর্তিত কালে কে কবে একথা ভাবে যে পৃথিবীর কোনও কিছুই যখন চিরস্থায়ী নয়, মানুষ মাত্রেরই জীবন যৌবন যেখানে অস্তিমশয়ন গ্রহণ করে, সেখানে 'ওল্ড ক্লাব' তাঁর সৃষ্টি কর্তাদের দেওয়া নামটি সার্থক করে তোলবার জন্য সত্য সত্যই বুড়ো হয়েও বেঁচে থাকবে?

ওল্ড ক্লাবের সমবয়সী ঐটি সৌধিন অবসর বিনোদনের প্রতিষ্ঠান এখন দীর্ঘায়ু নিয়ে আজও বেঁচে আছে আমার জানা নেই। অবশ্য যৌবনের সে ঐশ্বর্যের তেজ ও দীপ্তি আজ আর তার নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ বয়সের একটা ছাপ ঠিক মানুষের মতোই কোনও প্রতিষ্ঠানও এড়াতে পারেনা। পুরুষানুক্রমে কোনও বনেদী কালের ঐশ্বর্যও যেমন অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকে না, 'দেবত্র সম্পত্তি' বলে ঠাকুরের নামে 'কবচ' পয়সাতেও তার সে উৎসবময় যৌবনের আয়ুকে চিরদিন উজ্জ্বল রাখা যায় না অবস্থার পরিবর্তন কালের প্রভাবে অনিবার্য। ধনীর অপর্যাপ্ত দান ধ্যান একদা বন্ধ হয়ে এলেও তার সুনামের সৌরভ শুষ্ক গোলাপের পাপড়ির মতো একটু লেগে থাকেই। ওল্ড ক্লাবের সমুজ্জ্বল সুদিনের কথা আমাদের জীবনের অবসর ক্ষণে তার অপরিমেয় আনন্দ দানের কথা অন্তত: আমার মতো নাট্য পাগল বৃদ্ধেরা কেউ বিস্মৃত হতে পারেন না। জাতির ইতিহাসে যেমন উত্থান-পতনের একটা ধারাবাহিকতা আছে, সামাজিক জীবনেও তার অন্যথা ঘটে না। কারণ এর মূল উপকরণই যে মানুষ সে নিজেই যে চিরবর্তনশীল! তাই "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানিচ দুখানিচ!"

ওল্ড ক্লাবের কথা বলতে বসে সর্বাগ্রে যাঁদের কথা মনে পড়ছে সে হল সুকান্ত প্রিয় ধর্ম প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, মানসী ও মর্মবাণীর প্রভাত কুমার নয়, বোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রভাত কুমার নয়, ইনি ছিলেন তদানিন্তন ব্রিটীশ গভর্নমেণ্টের অধীনে কলিকাতা পুলিসের একজন সুদক্ষ ডেপুটি কমিশনার। আমাদের ইউনিভার্সিটি অনেক মূর্তিই ওল্ড ক্লাবে এসে জুটেছিলেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেশ, চন্দ্র মিত্র, কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগা ঘোষ, স্বর্গত প্রীশ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র এবং স্বর্গত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়। বুঝতেই পারছেন ঘোষ হয় বসুবর শিশির কুমার ভাদুড়ীই আড় কাঠির মতো ইনস্টিটিউট থেকে এদের ছিনিয়ে এনেছিলেন। বউবাজার অঞ্চলের একাধিক প্রতিভাবান যুবাও ওল্ড ক্লাবে প্রবেশ করে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। হরিদাস নীরোগীকে আর জীবন কৃষ্ণ চৌধুরীকে কেউ ভুলবে না। 'নারায়ণ ভাষা আজও লেগে আছে এর পিছনে। আগেই বলেছি ওল্ড ক্লাব হয়ে উঠেছিল একটি সংস্কৃতি সম্পন্ন শিক্ষিত বাঙালীদের প্রমোদ প্রতিষ্ঠান। এর বৈশিষ্ট্য মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মার্জিত যৌবনকে আকৃষ্ট করেছিল। এই ক্লাবের তখনকার যে আবহাওয়া দেখেছি তা ঠিক তদানিন্তন কোনও একটি ধনিকী বাড়ির 'বৈঠকী আড্ডার হুবহু প্রতিচ্ছবি বলা চলে। কলকাতা শহরের একাধিক নামকরা সেরা মানুষ এই ওল্ড-ক্লাবের কর্নধার হতে সেদিন গৌরব বোধ করতেন। প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ ছিলেন তাঁরা। জনে জনে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বলা চলে। এঁদের কয়েকজনের অবিস্মরণীয় নাম আজও মনে আছে আমার—যেমন বিচারক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারক আশুতোষ চৌধুরী, বিচারক মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বউবাজার বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। এঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার ঘোষ আজও এই ওল্ড ক্লাবের কর্মবীর হয়ে আছেন। আমাদের ইনস্টিটিউটের স্বর্গত শৈলপতি চাটুর্য্যে দেওয়ান বাহাদুর ডা: হীরালাল ঘোষও 'ওল্ড ক্লাবরের'

গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। আজ আর তাঁরা ইহলোকে নেই।

ওল্ড ক্লাবের সদস্যরা কেবল 'নাটুকে দলই' ছিলেন না। এটা ছিল প্রকৃত পক্ষে একটি উচ্চাঙ্গের সামাজিক বৈঠক। হরেক রকম মজলিশি আড্ডার সঙ্গে 'তাশ' 'দাবা' 'পাশা' 'ক্যারম' এসব খেলা গুলোও জমে উঠতো এক এক কোনে। সারাদিনের কর্ম ক্লান্ত সন্ধ্যাটি মনোরম আনন্দে কাটাবার লোভনীয় স্থান হয়ে উঠেছিল একদিন এই দীর্ঘজীবী 'ওল্ড ক্লাব'। মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় এঁরা 'উদ্যান সম্মেলনের' ব্যবস্থা করতেন। কখনও বা "স্টীমার পার্টি" হতো। বড় গাইয়ে বাজিয়েরা এসে জমনী বীণাপাণির পুণ্যমণ্ডপকে সুর মুখরিত করে তুলতেন। ভরপুর আনন্দ!

একথা বলাই বাহুল্য দশজন বাঙালী একজায়গায় একত্র হলেই সেখানে রকমারি চর্চা আরম্ভ হবেই। 'ওল্ড ক্লাব' তো কানা গরু নয় যে তার শুধু ডিম সোহাগ হবে? রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে যোরতর আলোচনা চলতো. কাব্য, নাট্য ও সাহিত্য চর্চাও বাদ যেতো না। ফুটবল ক্রিকেট সাঁতার বক্সিং জিমন্যাস্টিক্, দার্কাস কিছুই বাদ যেতো না। সন্ধ্যে বেলা ক্লাবে এলে অনেক রকম খবর নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতেন সদস্যরা। এই সব ক্লাবকে বলা চলে—এক্রকম "Adults Educational Institution!"

তামাক সিগারেট ছাড়া আরও একটি তরল নেশার আয়োজন ছিল এখানে—না না যা ভাবছেন তা নয়। পানীয় বটে, কিন্তু সুরা নয়—'গরম চা'! মুখোরচক খুচরো খাওয়া দাওয়াও চলতো মাঝে মাঝে —যেমন চপ কাটলেট, আবার পাঁপড় ভাজা, মুড়ি, বর্ষার টাটকা বেগুনী ;মুলড়া গরমের দিন —'কুল্পী বরফ' পছন্দ করতেন—মালাই বরফের চেয়ে। মাঝে মাঝে আলু-কাবলি আর ঘুগনী দানা নিয়েও কাড়াকাড়ি চলতো।

এসব কিন্তু ক্লাবের খরচে নয়। বিত্তবান সদস্যদেরই এ ব্যাপারে বদ করা হত বেশি। তাঁরাও খুশী হয়েই বন্ধু বান্ধবদের ইচ্ছা পূর্ণ করতেন। এসব ব্যাপারে হৈ-হল্লা একটু হতই। তা সুসভ্য ইংরেজ প্রভুদের ক্লাবে হুল্লোড়ের চেয়ে ঢের বেশী হত। কারণ সেখানে মদিরার মত্ততায় অনেকেরই ভারসাম্য বজায় থকতো না। অবশ্য ওল্ড ক্লাব বরাবরই ও রসে বঞ্চিত তবে বাইরে থেকে কেউ টেনে এলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু, মাতলামো করা চলতো না। বে-এক্তার দেখলে লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত।

জীবনের একাধিক অবিস্মরনীয় সন্ধ্যা এই আড্ডায় কেটেছিল আমার। এখনও পালাপার্বণে মাঝে মাঝে যাই। তবে সে পুরোনো বাড়িতে আর ওল্ড ক্লাব নেই। অনেকদিন হল উঠে এসেছে খাস বৌবাজারেরই ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে—বর্তমানে নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীটের ওপর প্রকাণ্ড প্রশস্ত গাড়ি বারান্দার একেবারে দক্ষিণ কোনের দুখানি ঘরে। গান বাজনার মজলিশ বসলে দুখানি ঘরকে এক করে নেওয়া যায়। এ ছাড়া পৃথক একটি অফিস ঘরও আছে এবং মস্তবড় সুবিধা যে ওল্ড ক্লাবে 'টেলিফোন' আছে। সদস্যদের কারুর বাড়িতে বিপদ আপদ ঘটলে বা কেউ জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে এলে তৎক্ষণাৎ ফোনে খবর দিয়ে তাকে ডেকে আনা চলে। 'ক্লাব' মাত্রেই একটা 'ফোন' থাকা যে বিশেষ জরুরী প্রয়োজন এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তাশ-দাবা-পাশা এই তিন কর্ম নাশার নেশায়

পড়লে রাত কত হল বা বাড়ি ফেরার কথা কারুরই মনে থাকে না। অবশ্য নব বিবাহিতরা ছাড়া।

আমাদের যৌবন যুগে পাড়ায় পাড়ায় কনসার্ট পার্টি যাত্রার দল সখের থিয়েটারের সঙ্গে অনেক বাড়িতেই প্রায় বৈঠকী গানের মজলিশ বসতো। আমাদের বাড়িতেও দেখেছি, কানা পরং, বিষ্ণু চাটুর্যে, অঘোর পাঠক, বিশ্বনাথ দ্রুপদী, রাধিকা গোসাঁই প্রভৃতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসর বসতো। বাবা নগেন্দ্র চন্দ্র ও সেজ ন্যাঠামশাই যোগেন্দ্র চন্দ্র ঢোল, খোল, বাঁয়া-তবলা ও পাখোয়াজ নিয়ে গাইয়েদের সঙ্গে সঙ্গৎ করতেন। কত্তাদের যাত্রার দলও ছিল। 'শকুন্তলা' গীতি নাট্য অভিনয় হত। তাছাড়া আমাদের কিশোর বয়সে 'কবির লড়াই' 'তরজা' হাফ্ আখড়াই প্রভৃতি গ্রাম্য আমোদ প্রমোদও কলকাতা শহরে বাগবাজার শোভাবাজার, চোরবাগান, বউবাজার, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে তখনও কিছু কিছু মাঝে মাঝে চলতো।

'ওল্ড ক্লাব' এই সব 'ওল্ড' আর্টকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উৎসাহ দিতেন। বহুকাল পরে অমৃতলাল বসুর শেষ বয়সে একবার এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে 'গরাণ হাটি' আর 'মনোহর শাহী' সুরের ওস্তাদ খুঁজে না পাওয়ায় দু'এক আসর হবার পরই বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে দেখা যায় গান-বাজনার আসরের চেয়ে রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণটাই তরুণ সমাজকে আকর্ষণ করছে বেশি। আমাদের পাড়ায় চোরবাগানের গলিতে একটা কনসার্ট পার্টি ছিল। তারা দলবল নিয়ে বাঁশী, ক্ল্যারিয়োনেট, পিকলু, বিউগিল, হারমোনিয়াম, বেহালা এবং ঢোল বা পাখোয়াজের সঙ্গীতের সঙ্গে সময়োচিত কোরাস গান গাইতে গাইতে আগমনির সময় অষ্টমীতে, দোলের দিন পথ পরিক্রমা করতেন। সুন্দর সুবেশে গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে চন্দনের টিপে ললাট রঞ্জিত করে গোলাপ জলের পিচকিরি দিয়ে পথচারীদের আনন্দে মুখরিত করে তাঁদের মিছিল যেতো পথের দুধারের গৃহস্থদের মনে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দিয়ে। ক্রমে অন্যান্য ক্লাবও এদের অনুসরণ করতো।

আর ভাবি—সেদিন কোথায় গেল, আজও মিছিল বেরোয়। কিন্তু কণ্ঠে গর্জে উঠে—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" "আমাদের দাবি মানতে হবে।" যাক্ এসব অবান্তর কথা। আজ্ঞার চর্চাতেই ফিরে আসা যাক্। হ্যাঁ বলছিলুম না রঙ্গালয়ের ছোঁয়াচে রোগে পেয়ে বসেছিল সেদিন আমাদের। সুনীতি চাটুর্যে, শিশির ভাদুড়ী, প্রভাত মুখুয্যে, নরেশ মিত্তিরের মতো উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরাও থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছিল। অবশ্য এতে ফল খুব ভালই হয়েছিল। রঙ্গালয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড বেশ উঁচু হয়ে উঠেছিল। নইলে পেশাদার অভিনেতার দল মঞ্চে প্রায় যথেচ্ছাচার করতেন।

মহাকবি "গিরিশ চন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস" সেকালের একখানি জনপ্রিয় নাটক। আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ে একাধিকবার এর অভিনয় দেখেছি। এ নাটকের প্রধান নট হলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন। তাই নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ নটেরাই বরাবর এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। আমরা অমরেন্দ্র নাথ দত্তকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি, দানীবাবু বা গিরিশাত্মজ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পরে ক্ষেত্র মিত্র, চুনীলাল দেবকেও সাহস করে এ ভূমিকায় নামতে দেখেছি। তাঁদের অভিনয়ের তুলনা করব না। অবশ্য একথা স্বীকার করব এঁদের মধ্যে দানীবাবুরই 'ভীমের' ভূমিকায় সুনাম হয়েছিল বেশী।

স্বর্গীয় ডেপুটিকমিশনার অব পুলিশ বন্ধুবর প্রভাত মুখার্জির একান্ত ইচ্ছায় 'ওল্ড ক্লাব' "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বলা বাহুল্য যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ভূমিকার জন্য বন্ধুবর শিশির কুমার ভাদুড়ীই নির্বাচিত হলেন। দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনীর কুটিল ও অসৎ কৌশলে পাণ্ডবেরা পরাজিত হয়ে বারশ বর্ষকাল অজ্ঞাত বাস যাপন করতে বাধ্য হয়। সেই সময়ের মধ্যে

বর্ষকাল তাঁরা বিরাট রাজার গৃহে নানা ছদ্ম নামে বিরাট কর্মে নিযুক্ত হন। এই অজ্ঞাত বাসের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এর মধ্যে যে অপূর্ব নাটকীয় রস আছে, সেটা নটগুরু চন্দ্রশেখর গিরিশ চন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারই ফলে তাঁর লেখনী থেকে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মতো একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক বেরিয়েছিল।

সেই সুবাকালে ওল্ড ক্লাবের নাট্যকলা নিপুণ সদস্যেরা গিরিশ চন্দ্রের এই পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকখানির যে সবাক সুন্দর অভিনয় করেছিলেন আজও তা ভুলতে পারিনি। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ প্রিয় দর্শন প্রভাত কুমারই ছিলেন এই ওল্ড-ক্লাবের প্রাণ পুরুষ। অতি সুবক্তা, আনন্দময় সদা হাস্যোজ্জ্বল অথচ সুদৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠ কঠোর নিয়মানুগ মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবিত কালে ওল্ড ক্লাবে ছিল—যেন পুলিশ ডিসিপ্লীন!

প্রভাত কুমার নিজেও একজন সুদক্ষ নট ছিলেন. তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে শিশির কুমার এজন্য তাঁর অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে এহেন একজন সর্বগুণান্বিত বন্ধুকে আমরা অকালে হারালাম।

এঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'ওল্ড ক্লাব' সেদিন এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বোধ করি আজ ত্রিদিবে ইন্দ্র সভায় নাট্য স্বর্গে তিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এতদিনে হয়ত শিশির কুমারও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ওল্ড ক্লাবের সঙ্গে আরও একজনের স্মৃতি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে—সে আমাদের পরম প্রীতিভাজন অকপট বন্ধু "জীবন ভায়া" জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী। হাঁ, এমন প্রাণ-চঞ্চল, কর্ম কুশল সর্বজন প্রিয় মানুষ আজই দেখা যায়। তাকে আজ বার বার মনে পড়ছে। অত্যন্ত রগ চটা অথচ রসিক. কঠোর কাঠখোট্টা অথচ দয়ার্দ্র কোমল মানুষ ছিল এই জীবন। কিছুদিন হল জীবনকে আমরা হারিয়েছি। জীবনের লোকান্তরের পর ওল্ড ক্লাবও যেন জীবন হীন হয়ে পড়েছে।

তবু সে বৃদ্ধ ওল্ড ক্লাবও আজও বেঁচে আছে। ইংরিজীতে একটা কথা আছে—The King is dead, Long long live the King! ওল্ড ক্লাবের শেষ কর্ণধার হীরালাল বিয়োগীকে হারিয়ে আমরা আজ প্রায় বিয়োগী! তবে দেবনর নারায়ণের কৃপা থেকে আমরা এখনও বঞ্চিত হইনি। আর তাঁর সঙ্গে আছেন স্বয়ং নারায়ণ। যাঁর নাট্য কুশলতার গুণে মৃত প্রায় ওল্ড ক্লাব সেদিন 'সাহেব-বিবি-গোলাম' অভিনয় করে নাট্য জগতে যে 'তুরুপ' ঠুকে দিয়েছেন তার রশ সৌরভ আজও ম্লান হয়নি।

'ওল্ড ক্লাব' তার এই ষাট বাষট্টি বছরের সুদীর্ঘ জীবনে যতগুলি নাটক অভিনয় করেছেন আর কোনও ক্লাব তা পেরেছে কিনা জানিনা। আমি একজন নাট্য প্রিয় পাগল হওয়া সত্ত্বেও এঁদের সকল অভিনয়ে হাজির থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ বহু কলিকাতা ছেড়ে আমার দক্ষিণ কলিকাতায় এসে বসবাস করা।

সাহেব বিবি গোলাম এঁরা একাধিক বার অভিনয় করেছেন। বন্ধুবর সত্যব্রত একজন সুদক্ষ অভিনেতা। ওল্ড ক্লাবের নাট্য নৈপুণ্যের সম্মান ইনিই এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অবশ্য 'নারায়ণের' কৃপাও উল্লেখ করতেই হবে। 'অমরদেব' 'দুই পুরুষ' 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রভৃতি যে নাটকই 'ওল্ড ক্লাব' অভিনয় করেছেন কোনটাতেই তাঁদের পূর্ব সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়নি। একথা বলাই বাহুল্য যে আগে এখানে ছেলেরাই মেয়ের ভূমিকা নিতেন। কিন্তু কালের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওল্ড ক্লাবের অভিনয়েও নাট্য-নিপুণ সুদক্ষ অভিনেত্রীরা অবতীর্ণ হচ্ছেন। আমি এই দীর্ঘায়ু ওল্ড ক্লাবের দীর্ঘতর আয়ু কামনা করি।

(ক্রমশ)

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

The co-operation of the art of acting is indispensable to that of drama. The dramatic writer may have reasons for preferring to leave the imagination of his reader to supply the absence of this co-operation : but though the term 'Literary Drama' is freely used of works kept away from the stage, it is, in truth, either a misnomer or a self condemnation. *Encyclopedia Brittanica.*

আলোচনা

আধুনিক নাটক

কতকগুলি সামাজিক হেতু আর তার সঙ্গে ব্যক্তি মনের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক যে নাট্যসাহিত্যের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে তাতে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে নতুন নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শকদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ফলে এ বিভাগে বিশেষ জীবনচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। তিন চার দশক পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নানাধরণের উন্নতি ও ক্রিয়াকর্মের প্রভূত আয়োজন হলেও নাটক ছিল পেশাদারী অভিনেতা এবং বণিক-বুদ্ধি সম্পন্ন স্বত্বাধিকারীদের একক্রিয়াবদ্ধ। রুচিবান ব্যক্তি এগুলিকে মনে করতেন জনমনোরঞ্জনের সুলভতম উপাদান এবং এর প্রতি কেমন একটা উন্নাসিক তাচ্ছিল্য বোধ করতেন। তাঁরা শান্তি পেতেন শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর আভিজাত্যমণ্ডিত নৃত্যনাট্য ও নাটকাভিনয় দর্শন করে—যার নায়কাধ ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ইদানীং নাটকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিল্প-সংস্কৃতি, লোকশিক্ষা, সমাজসমীক্ষণ, ব্যক্তির চিত্তসঙ্কট, রাজনৈতিক আন্দোলন, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রত্যেক বিভাগেই নাটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ একে সমাজ সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে বেছে নিয়েছেন, কেউ এর মধ্যে ব্যক্তিত্বের নানা কূটৈষণার ইঙ্গিত দিতে প্রস্তুত, কেউ বা চেতনার গভীরে বৃত্তাকারে স্ফুটমান নানা ভাবানুষঙ্গকে আভাসে ইঙ্গিতে প্রতীকে অবধারণ করতে সমুৎসুক, কেউ কেউ নাটকলাগত ঐক্যবন্ধন, ঘনসন্নিবদ্ধ আবেগপ্রবাহ এবং স্থান-কাল-পরিবেশের বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্বিতার নিঃসঙ্গতাকে এমন একটা রূপ দান করতে চান, যা আপাতঃ উদ্ভট, অসঙ্গত ও অর্থহীন মনে হয়। যাই হোক, এখন নাটক যে উপেক্ষিত নয়, 'ডিলাটেন্ট' রসবিলাসীর 'থীসিস ড্রামা' নয় বা মরমীয়াবাদীদের প্রতীকতাও নয়, পরন্তু প্রতিদিনের সমাজগোষ্ঠীর দ্বারাই এর গোত্রকুল নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এ আশার কথা সন্দেহ নেই।

তবু এই প্রসঙ্গে একটা আশঙ্কার কথা বলি। এখনও সাম্প্রতিক গোষ্ঠীর মধ্যে যুগপ্রষ্টা নাট্যকার এবং শিল্পের দিকনির্দেশক অভিনেতার আবির্ভাব হয় নি। অঢেল প্রচুর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে। কিন্তু অসংখ্যের মধ্য থেকে এমনি দুটি একটি নাটক সৃষ্টি হচ্ছে না, যা সমগ্র জাতি-মানসকে, সম্প্রদায়

নির্বিশেষে সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে। অভিনয় কলাও গোষ্ঠীগতভাবে বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে বটে, কিন্তু একক অভিনয়ের দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় এটা গণতন্ত্রেরই প্রতিক্রিয়া। প্যাটিক, শিশির ঘোষ, শিশিরকুমারের দিন চলে যাচ্ছে। এখন অভিনয় নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রিক না হয়ে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হচ্ছে। কারণ জীবনেও যেমন একক নেতৃত্বের অবসান হচ্ছে, শিল্পেও তার প্রভাব পড়ছে। সে যুগে অপ্রধানচরিত্র গুলিকে যেন তেন প্রকারেন শেষ করে প্রধান চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, একজনের অভিনয়ের উৎকর্ষের চেয়ে ছোট বড়ো সব চরিত্র মিলিয়ে যৌথ অভিনয়ের দিকেই বেশি দৃষ্টি পড়েছে। এমন একদিন আসবে বলে অনুমান হচ্ছে যেদিন কি কথাসাহিত্য, আর কি নাটক - কোনটাতেই নায়ক চরিত্রের প্রাধান্য থাকবে না, গোটা সমাজমানসই তখন নায়কের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব লক্ষণের আভাস দেখা যাচ্ছে। সে যাই হোক— নাটক যে জীবনের একটা শিল্পরূপ, নিছক বাস্তব 'রিপোর্টাজ' বা দৈনন্দিন লোকচরিত্র বৃত্তান্ত নয় তা অস্বীকার করা যায় না। সেই শিল্পাদর্শ রচনা ও অভিনয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত না হলে শুধু বিষয়ের গুরুত্বে নাট্যসাহিত্যকে দীর্ঘজীবী করা যাবে না। আধুনিক নাট্যগোষ্ঠীর অনেকেই এই শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছেন —এটাই আশার কথা।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

১৯২৭ সালে শরৎচন্দ্র তাঁর দেনাপাওনা উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন এবং নাটকের নাম দেন "ষোড়শী"। নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ নীচে দেওয়া হল।

"তোমার ষোড়শী পড়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মতো নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেন না নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এ দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্রখানি হয় আমার বিশ্বাস, তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পড়বে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেটির সঙ্গে পরিমাপ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশী করতে চেয়েছো এবং তার দামও পেয়েছো। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছো। যে ষোড়শীকে এঁকেছো সে এখনকার কালের করমাসের ফরমাশ দিনিল,

সে অন্তরে বাইরে সত্য নয়।... সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার উপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের।"—৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৪।

এই পত্রের উত্তরে ২৬শে ফাল্গুন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ পত্র দেন, তার একস্থানে তিনি লিখেছেন— "আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকার ব্যাপারে সেটা খাটে, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় তো এর তেমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি আর বিচার বুদ্ধির পরে।...তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যতবড় সত্য, ভবিষ্যত কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নরনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষ এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্তত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু'একটা লেখবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রসর ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে, চেনা কঠিন। থিয়েটারওয়ালারা না বোকা দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত বা টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়। পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভাগ্নী ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিকমত জেনে আসি। কারণ, উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।"

এই পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ ১১ই মার্চ ১৯২৮ সালে শরৎচন্দ্রকে একটি নাতিদীর্ঘ পত্র লেখেন, তার একস্থানে বলেছেন—"তোমার নাটকে যে Perspective-এর কথা বলেছি সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েছো তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত— মূল কথাটা বজায় থাকত, কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।"

পুরানো প্রসঙ্গ

অভিনয়ের প্রতি পদক্ষেপে

নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কমন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে হয়—অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ইহা বিশেষ রকম শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সময় বাহির হইতে হইবে, অন্ততঃ তাহার দশ মিনিট পূর্বে—তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া wings এর ধারে আসিয়া উপস্থিত থাকা কর্তব্য, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি, এবং যে চরিত্র অভিনয়

করিতে হইবে, সেই চরিত্রানুযায়ী ভাব (feelings) হৃদয়ে ধারণ করিয়া—তবে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়া বিধেয়। প্রায় এইরূপ সোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়,— রঙ্গমঞ্চে যিনি অভিনয় করিতেছেন—তাঁহার শেষের কথাটি ধরিয়া অথবা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া—অথবা তাঁহার উত্তর দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে হইবে। যিনি এইভাবে বাহির হইবেন তিনি হয়ত সে সময় নিশ্চিন্ত মনে বেশ বদল হইয়া সাজঘরে কাহারও সহিত গল্প করিতেছেন,—অথবা তামাক খাইতেছেন। একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া খবর দিল।—শিগ্‌গির এসো, শিগ্‌গির এসো, তোমাকে যে এইবার বাহির (appear) হইতে হইবে! অভিনেতা বা অভিনেত্রীর তখন হুঁস হইল। তিনি ছুটিতে ছুটিতে মাথায় পরচুলা আঁটিতে আঁটিতে অথবা একমুখ তামাক বা সিগারেটের ধূম নির্গত করিতে করিতে—কিম্বা পান চিবাইতে চিবাইতে দুইপাঁচ মিনিট পরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই; অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে—

"যশোবন্ত।—কে ভারতের সম্রাট?

সারেস্তা। ভারতের সম্রাট বাদশাহ্ গাজী ঔরঙ্গজীব। সারেস্তা খাঁর কথা শেষ হইবা মাত্রই তাহারা আসিয়া বলিলেন—'মিথ্যাকথা'। ভারতের সম্রাট ঔরঙ্গজীব নয়। ভারতের সম্রাট সাজাহান বা সাজাহান। এই অবস্থায় এমন বৈচিত্র্যময় দৃশ্যে—তাহাদিগের আবির্ভাবের যদি তিলমাত্রও বিলম্ব হয় তাহা হইলে এই দৃশ্যটি নষ্ট হইয়া গেল।

কোনও একটি অপেশাদারি সম্প্রদায়ে একবার এইরূপ ভয়ঙ্কর খেলোয়াড়ী দেখিয়াছিলাম। সম্প্রদায়, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক অভিনয় করিতেছিলেন। উক্তনাটকে 'কুমার সেন' নামক চরিত্র অভিনয় করিবেন যিনি তিনি প্রথম হইতে বক্সে বসিয়া, নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গের সহিত কেমন অভিনয় হইতেছে তাহা তদারক করিতেছিলেন। তৃতীয় অঙ্কে যে তাঁহাকে 'ইলার' সহিত অভিনয় করিতে হইবে সে কথা তাঁহার ত মনে নাই। এখন দলের যিনি ম্যানেজার বা সেক্রেটারী অথবা পাণ্ডা তিনিও একবার খবর রাখিলেন না যে, কুমার সেন সাজিল কিনা। পর পর দৃশ্য যেমন অভিনীত হইতেছে—সিফটার অথবা ষ্টেজ ম্যানেজার প্রোগ্রাম দেখিয়া সেইরূপ দৃশ্যপট দেখাইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ইলা ও কুমার সেনের দৃশ্য আসিল। ইলা সহচরী পরিবৃতা হইয়া বাহির হইয়াছেন কিন্তু হায়! কি বক্তৃতা করিবেন? কুমার সেন ত' নাই—তিনি যে তখন বক্সে বসিয়া সিগারেট খাইতেছেন,—এবং দলের লোক কে কেমন বক্তৃতা করিতেছে—কাহাকে কেমন মানাইয়াছে—তাহাই দেখিতেছেন। গ্রীণরুমের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে রঙ্গমঞ্চবিহারিনী ইলাকে বলিতেছেন, "বলনা—যেতে হবে? কেন যেতে হবে—যুবরাজ?—আরে ছাই বলনা! ইলাও মহা ফাপরেই পড়িলেন। দর্শকের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন "ওরে। কুমার সেন কোথায় পালিয়েছে রে! "বন্ধু বিহারী কুমার সেনের তখন চৈতন্য হইল। চারিদিকে হৈ হৈ শব্দে তখন কুমার সেনের খোঁজ পড়িয়া গেল, কুমার সেন তখন বক্স হইতে লাফাইতে লাফাইতে সাজঘরের দিকে ছুটিতেছেন। দলস্থ সকলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্যোগ করিল। তিনিও পাইজামা আঁটিতে আঁটিতে ম্যানেজার ষ্টেজ ম্যানেজারকে দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিলেন। ইলা অভাগিনী, প্রিয়তম কুমার সেন বিরহে—দর্শকবৃন্দের বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও এরূপ সোলযোগ বিরল নহে।

রঙ্গমঞ্চে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে অভিনেতা ও কর্তৃপক্ষগণের কিঞ্চিৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে কোন কোন স্থলে নিস্তার পাওয়া যায়—কোনও একটি নাট্য সম্প্রদায় একবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রমর' নাটক অভিনয় করিতেছিলেন। যে দৃশ্যে রোহিণী উইলখানি চুরি

করিবে—সেই দৃশ্যারম্ভে দর্শকবৃন্দ দেখিলেন— কক্ষমধ্যে "পালঙ্কোপরি কৃষ্ণকান্ত নিদ্রিত নাই এবং যাহার ভিতর হইতে রোহিনী উইল বাহির করিয়া লইবে সে আলমারি বা সিন্দুক কিছুই নাই। ইহারই পূর্বদৃশ্যে যখন রোহিনী কৃষ্ণকান্তের নিকট দিয়া উইল হস্তগত হইয়াছে কিনা দেখিবার ছলে সন্ধান সুলভ জানিতে গিয়াছিল— তখন সেই কক্ষে পালঙ্ক এবং আলমারি দুয়েরই ঠিক সরঞ্জাম ছিল। সিন্‌সিফটার যথা সময়ে সেই কক্ষ বাহির করিয়াছে। তখন ষ্টেজ ম্যানেজার এবং কর্তৃপক্ষগণের হুঁস হইল। কৃষ্ণকান্ত বেচারী মহামুস্কিলে পড়িলেন; তাঁহার সেই দৃশ্যে পালঙ্কে নিদ্রিত থাকিবার কথা। রোহিনীরও সমান বিপদ; কেমন করিয়া উইল চুরি করিবে? এমন সময় "কৃষ্ণকান্ত রায়ের" দেয়ালের ভৃত্য 'হ'রে' সেই দৃশ্যে বাহির হইয়া বলিল— আঃ বাবা আজ ঘরটায় একটু হাওয়া খেলতে পাচ্ছে জমিদারের বাড়ী—এত বড় বড় ঘর জিনিসপত্র এত ঘেসাঘেঁসি ক'রে রাখবার দরকার কি? কর্তার কেমন ঝোঁক শোবার খাটের পাসে এক আলমারি খাড়া করে রেখেছিলেন। সমস্ত সরিয়ে সাজিয়ে রেখে ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে বল দিকি, —ঐ ও কাণে রেখেছি সেই আলমারিটা। (বলিয়া বামদিকে নেপথ্যাভিমুখে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল) ঐ সেদিকে রেখেছি কর্তার শোবার খাটখানা! (বলিয়া ডানদিকে নেপথ্যাভিমুখে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল) খোলা জানলার হাওয়া খেয়ে কর্তা কিরকম আরামে নাক ডাকাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছ?' হরে চাকরের এই কথায় নেপথ্য হইতে কৃষ্ণকান্ত রায় খুব জোরে জোরে নাক ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। রোহিনী রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া বক্তব্যটুকু বলিয়া উইল চুরি করিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত ভিতর হইতে বার কতক "হ'রে' 'হ'রে" বলিয়া ডাকিয়া বাতি জ্বালিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে সকল দিক রক্ষা হইল।

সামাজিক নাটকাভিনয়ে কোনও দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে যদি ভুল হয় তাহা হইলে 'আনিতে ভুলিয়াছি", "এখুনিই আনিয়া দিতেছি"—কিম্বা একজনকে নেপথ্য হইতে ডাকিয়া—"অমুক জিনিসটা আনিয়া দাওত" অথবা—'চল ভিতরে গিয়া দিতেছি'—কিম্বা 'লোকের সাক্ষাতে দিবনা'—একটু অন্তরালে দিতেছি' ইত্যাদি করায় সে দোষ ঢাকিয়া লইতে পারা যায়। কোনও দৃশ্যে কাহাকে ছুরিকাঘাতে বা পিস্তলের গুলিতে অথবা তরবারির আঘাতে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হত্যাকারী ছুরি, পিস্তল বা তরবারি লইতে ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা পিস্তলের আওয়াজ হইল না কিম্বা অভিনেতা গাপ হইতে তরবারি খুলিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। সে অবস্থায় অন্য কোনও উপায় না থাকিলে হত্যাকারী অভিনেতার শিকারকে (অর্থাৎ যাহাকে হত্যা করিতে হইবে সেই অভিনেতাকে) তৎক্ষণাৎ উগ্রভাবে ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া মুখ চাপিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়া হত্যাভিনয় করাই যুক্তিসিদ্ধ। পিস্তলের শব্দ হইল না, দর্শকবৃন্দ হত্যাকারীর হস্তে ছুরিকা অথবা তরবারি দেখিলেন না এবং কোনরূপ রক্তের চিহ্নমাত্র দেখাইতে পারা গেল না, অথচ যিনি হত হইবেন সেই অভিনেতা—নাটকের লেখা অনুযায়ী হত্যাকারী সম্মুখে যাইতে না যাইতেই ধড়াস করিয়া পড়িয়া মরিলেন ইহা অত্যন্ত হাস্যজনক।

বিগত যুগের নাট্যকার কৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'কেলোর কীর্তি,' 'পেলারামের স্বদেশিকতা', 'বাঙালী,' 'শঙ্খধ্বনি,' এবং আরও অনেক নাটক বিগতদিনের সহস্র সহস্র নাট্যামোদীদের আনন্দ দিয়েছে। "অভিনয় শিক্ষা" নামক তাঁর দুইটি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যে ও মতামতে সমৃদ্ধ। সেই গ্রন্থ থেকে উপরোক্ত বিষয়টি সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হ'ল।

জীবনী

বিগত যুগের মঞ্চনায়ক

যাদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

তিনকড়ি চক্রবর্তী

(১৮৭৭-১৯৫৪)

বাংলার রঙ্গমঞ্চের নবযুগের সূচনা। স্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন নাটকে অভিনয়ে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সেই অভিনয়ে দেখা গেল কর্ণের ভূমিকায় সুঠাম দেহের অধিকারী, দীর্ঘকান্তি, ললিতকণ্ঠ এক অভিনেতা। তাঁর নাম তিনকড়ি চক্রবর্তী। 'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, বিদ্ধ পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর'—লক্ষ্য ভেদের দৃপ্তে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষণা এখনো যেন কানে বাজছে। তারপর কী আনন্দই পেলাম তাঁকে চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায় দেখে। কী সাবলীল অভিনয়, গানে আলাপে রহস্য রসিকতায় সারা স্টেজ মাতিয়ে রাখতেন তিনি। সেই অক্ষয়কেই দেখলাম এক গ্রাম্য ভূতের ভূমিকায়—মহা শক্তিতে 'মৎ্‌রো' এই মধ্যে যেন তারই জন্যে অপরেশচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন! সত্যিই বহুমুখী শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী।

১৮৭৭ সালের ১০ই অক্টোবর তাঁর জন্ম। আদি নিবাস ভবানীপুর। কর্মজীবনে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলে কাজ করতেন। পরে নিজে একটি ইনজিনীয়ারিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভবানীপুরের একটি সৌখিন ক্লাবে বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯২৩ সালে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণার্জুন নাটকে কর্ণরূপে তাঁর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ। তারপর একের পর একে একে বহু নাটকের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যথা—চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, গোলকুণ্ডায় মিরজুমলা, সরলায় বিধুভূষণ, চিরকুমার সভায় অক্ষয়, গৃহপ্রবেশে ভাক্তার, বিল্বমঙ্গলে ভিক্ষুক, শ্রীকৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডীদাসে চণ্ডীদাস, পরিত্রাণে ধনঞ্জয় বৈরাগী, শকুন্তলায় কণ্ব, শ্রীগৌরাঙ্গে গৌরাঙ্গ, মহাশক্তিতে মধ্যে, ইত্যাদি! ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

নির্বাক এবং সবাক যুগে বহু চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নির্বিবাদী, বন্ধুবৎসল মানুষ। গম্ভীর প্রকৃতির হলেও তাঁর মধ্যে একটি প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ছিল।

১৯৫৪ সালের ২রা জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় ভবানীপুরের বকুলবাগানের বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নাট্য প্রবাহ

গতমাসের নানা অভিনয়

শিশারী (জামসেদপুর)। এই অপেশাদার নাট্যসংস্থার কার্যক্রমের কিছু পরিচয় আর আগেও দিয়েছি। সম্প্রতি এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন দুটি একাঙ্ক—'আলো নেই' এবং 'পাপ-পুণ্য'। প্রথম নাটকটি রচনা করেছেন স্থানীয় মহিলা কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক প্রণব মিত্র। স্থানীয় নাট্যকারের মৌলিক রচনার অভিনয় জামসেদপুরে এই প্রথম। এই নাটকে একটি গুরুতর সামাজিক

সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে এবং শেষ দৃশ্যে আশাবাদের সুরে দর্শকদের রীতিমতো অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এই নাটকে দুটি স্টীল-এর পরিবেশন এত সুন্দর হয়েছে যে দর্শকমনে গুরুতার গভীরতার এক অনবদ্য মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। নির্দেশক অজন দাশগুপ্তের দক্ষ পরিচালনায় নাটকটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অভিনয়ে প্রথমেই বলতে হয় ছ' বছরের মেয়ে সোনা বাগচীর অপূর্ব অভিব্যক্তির কথা যা দর্শকদের রীতিমত বিহ্বল করে দেয়। অন্যান্য শিল্পীরা যথা বিমলেন্দু রায়সরকার, অরুন্ধতী বাগচী, চিত্ত চৌধুরী, অজন দাশগুপ্ত, শ্যামকুমার বাগচী, শিশির সেন, অশোক মৈত্র, বীরেন দাস, রমেন চ্যাটার্জি, তাপস দাস, এবং নাট্যকার প্রণব মিত্র তাঁদের চরিত্রানুযায়ী যথাযথ অভিনয় করেছেন। নাটকের নেপথ্যাভিনয় মঞ্চ-সজ্জার দক্ষে অজন দাশগুপ্ত, দিলীপ বাগচী, তাপস দাস ও রমেন চ্যাটার্জি বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারেন। আলোক সম্পাতের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন সৌমেন পাণ্ডুলি। উদাত্ত কণ্ঠে "জ্যোতির্ময়" স্তোত্রটি পাঠ করেন নাট্যকার ও সাহিত্যিক রতনকুমার ঘোষ।

দ্বিতীয় নাটকটি রতনকুমার ঘোষ রচিত 'পাপপুণ্য' নাটকটি ক্রাইম ড্রামা নয়, রূপক। নাট্যকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অমল, নীলা, বৃদ্ধ, বুবুল ও দরওয়ান—এরা কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়, এরা প্রত্যেকে জীবনধর্মের এক একটি দিকের প্রতীক। বলিষ্ঠ সংলাপ নাটকের বিশেষ সম্পদ। অভিনয়ে অমলের চরিত্রে অজন দাশগুপ্ত অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশির সেন-এর বৃদ্ধ একটি সার্থক চরিত্র রূপায়ণ। দরওয়ানের ভূমিকায় মাখন দাস, বুবুনের ভূমিকায় রঞ্জিত সেন রায়, নীলার ভূমিকায় শিপ্রা চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছে। নির্দেশনায় ছিলেন শিশির সেন।

অন্বেষা। গত স্বাধীনতা দিবসে 'প্রতাপ' মেমোরিয়াল হলে এরা মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের গল্প "অতিথির" নাট্যরূপ। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা স্বদেশ বসুর। তাঁর কর্মকৃতি প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন, সুধাংশু ভট্টাচার্য, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, শেলী বসু, প্রণতা নন্দী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দীপ রায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, নিমাই দে, গঙ্গাপদ বসু।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (কলেজ স্ট্রীট)। স্টার থিয়েটারে এঁরা অভিনয় করলেন "বন্দর"। অভিনয়ে এবং আংগিকে এই নাট্যপরিবেশন দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় সার্থক রূপায়নে ছিলেন, দীপক মজুমদার, অনিল দত্ত, অমর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ বড়াল, শিশির দাস, গোবিন্দ সাহা, মধুসূদন গোস্বামী, মোহন মণ্ডল, অশোক দাশগুপ্ত, অনন্তা চৌধুরী, প্রতিমা পাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

রাজপথ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। গল্প ভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর প্রথম সংখ্যা থেকেই।

বহু গল্প, উপন্যাস তিনি গল্প-ভারতীতে লিখে সাহিত্য রসিকদের প্রচুর আনন্দদান করেছেন। আজ যখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, তখন তাঁর লেখনী স্তব্ধ—তাঁর একটি পুরাতন গল্পের পুনর্মুদ্রন করে আমরা আজকের দিনের পাঠকদের শোনাবার ব্যবস্থা করলাম।

গল্প-ভারতী সম্পাদক

মতির মা

—রাজপথ মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলাম মতির মাকে। ধলাসট রঙের মানুষটি—অনবরত পান খেয়ে চিবিয়ে ঠোঁট আর দাঁতগুলি কালচে মেরে গেছে, মাথার আধপাকা চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা, পরণে খান কাপড় আর হাতে একগাছি লাঠি। লাঠিটা অবশ্য শেষ জীবনে নিয়েছিলেন কোমরটা হেলে যাওয়াতে। খাওয়া দাওয়া সারা হ'লে একদণ্ডও বিশ্রাম করতেন না, পাড়া টহল দিতে বার হতেন। অনেকে ঠাট্টা করে বলত—টহলদার। এইবার প্রত্যেক বাড়ির হাঁড়ির খবর নেওয়া নেওয়া চলবে, না হলে পেটের ভাত তো হজম হবে না।

ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আমাদের বাড়ি পড়ে না, তবু আমাদের বাড়িতেই আসতেন প্রথমে। এসেই বলতেন, ছোটবৌ চুলখানা এগিয়ে দে। কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত যেন খসে পড়ছে! কাল আবার পুন্নিমে তো।

নীচের বসতে পারতেন না—বাতের ব্যথায় কোমর আড়ষ্ট হয়ে থাকতো বলে। একটা পা অল্প নেংচে চলতেন, সেটার পাতাও ফুলো ফুলো, বাতের জন্যই হয়ত বা। কোমরে আর বাঁ হাতে লাল ও কালো সুতোর ঘুন্সি—তাতে যত রাজ্যের ছোট বড় মাকারি মাদুলি আর নাভিনখের সোহা। যদি কেউ বলত, এত মাদুলি বেঁধেছেন কেন পিসিমা, একটা রাখলেই তো হয়।

জবাব দিতেন হেসে, বোবা বইবার কপাল, না হয়ে পার পাবার যো কি! কোন্‌টার কি গুণ—কে জানে মা, ফেলে দিয়ে কি পরের মাথা খেয়ে বসব!

অতঃপর আরম্ভ হত মাদুলি-পরিচিতি :

এইটি বেলের কালীর। মাদুলি ধারণ করে দই খাওয়া বারণ ছিল। তা ও জবাটি ত্রিদীয়ানার

ঢুকতে দিতাম না। কিন্তু যা ললাটের লেখন—দইএর বাটি না ধুয়ে আবাগীর বেটী সেজবৌ যে অমল দিয়েছে তা কে জানে! যেদিন মুখে দেয়া, সেইদিনই অষ্ট অঙ্গে কেঁপে ধরল বাত। কত ডাক্তারী, কোবরেজী, সেঁকতাপ মালিশ জরিবুটি · তবে তো চাঙ্গা হয়ে উঠি। তারপরে নিলাম বর্ষরাজের মাদুলি, শাক অমল কড়াইএর ডাল—সাতদিন বারণ। গ্রহের ফের আর কাকে বলে! কচি আমের অম্বলের ওপর কোঁকটা চিরকালই, মুখে ঠেকিয়েই হুঁস হ'লো, যাঃ, করলাম কি! চোকও গিলিনি, পরশোতেই হাতে হাতে ফল। তারপর নাকাশীপাড়া থেকে এই মাদুলিটা আনিয়ে দিলেন ন'খুড়িমা। জাগ্রত সিদ্ধেশ্বরী, তাঁর দয়ায় উঠে হেঁটে চলতে পারছি। বাদুবিচার করলাম সাত দিন। মিত্যু কি আনন্দ অশৌচের বাড়িতে গেলে মাদুলি খুলে রেখে যেতে হয়, যেতামও তাই কিন্তু সেই যে সেবার উমার মা এখন যায় তখন যায় শুনে ছুটে গেলাম না—তাই হ'লো কাল। এক প্রাণীও তো উঁকি দিল না, কি না—তার নাকি স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। কিন্তু মানুষটা যে এক কোঁটা ওষুধ—একবিন্দু জল না পেয়ে অপমিত্যু হবে—সেইটে কি ভাল? যে যাই বলুক গে, থাকতে পারলাম না, গিয়ে বসলাম তার শিয়রে। পুরো একটা দিন বসে রইলাম। তখন আমার সেজছেলে রাত এলো, সেজবৌ এলেন, পাড়ারও দু'চারজন উঁকিঝুঁকি মারলেন। তবু যাহোক এক শিশি ওষুধ পড়লো, গঙ্গাজল আমিই দিলাম, তারকব্রহ্ম নাম শোনালাম।

কালকর্ণ ঢুকে গেলে সেজবৌমা বললেন, মা, মাদুলিটা খুলে ফেলুন—ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।

সেইদিন রাত্তিরে অষ্ট অঙ্গে টাটানি, জ্বর। শয্যাগত রইলাম তিনদিন। ডাক্তার এসে ছুঁড়ে দিলে, উঠলাম। কিন্তু ঠাকুরের নাম করে ধারণ করেছি যা—ফেলতে মন সরল না। কি জানি, কোন দেবতার কেমন কোপ! একেই তো বারোমাস ভুগে ভুগে পাপের প্রায়শ্চিত্তি করছি—আবার···

হাপ ছেড়ে বলতেন, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকি, এক চিমু পান আর দোক্তা এক চিমটি।

জল পান করে, পান মুখে দিয়ে গল্প জুড়তেন মতির মা। সে গল্প আমার ভাল লাগত না, বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা ঘিরে বসতো মতির মাকে। দুপুর বেলায় পাঁচ বাড়ির নিন্দা অখ্যাতির মণিমুক্তো ছড়িয়ে আসর জমজমিয়ে তুলতেন মতির মা। সে বলার ভঙ্গি কি, হাত নাড়ার ঘটা কত, ছড়া কাটার বাহারও কম নয়। এতও মনে থাকত মনে! কোথায় কে এঁটো হাত না ধুয়ে কাপড়ে হাত ঠেকালে, কে ভাসুরের সামনে ঘোমটা খাটো করে আর গলা চড়িয়ে অসভ্যতার সৃষ্টি করল, কোন মেয়েটা চোরা চাউনি ফেলে পরের ছেলেদের দেখে নিলে, কোন ছেলেটা বা বাড়ির কানাচে শিস্ দিয়ে ফিরল, কার সঙ্গে কার কি সুবাদ বা অপবাদ—গ্লানি, কলঙ্ক, অখ্যাতি, লজ্জাহীনতা সবকিছু কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করতেন মতির মা, তারপর সারা দুপুর, বিকেল আর সন্ধ্যার প্রদীপ না জ্বলা পর্যন্ত সেইগুলি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিলিয়ে বেড়াতেন।

আমাদের এসব ভাল লাগত না। আমরা ছেলের দল ওঁর নাম করণ করেছিলাম—গেজেট। অবশ্য প্রকাশ্যে বলতাম না, পরস্পর গা টেপাটিপি করতাম আর হাসতাম; মতির মা হয়তো মনে মনে বুঝতেন এসব, মুখ ফুটে কিছু বলতেন না।

নিজের সংসারের লোকও মতির মার প্রতি প্রসন্ন ছিল না।

সেজবৌ প্রায়ই বলত, এদিকে নিজের সংসারে কুটো গাছি ভেঙে দু'খানা করেন না, পরের বাড়িতে সাতটা গতর খা'র চর। কার জ্বর হয়েছে, মাথায় জলপটি লাগিয়ে পাখার বাতাস করেছেন, পথ্যির সাবু বার্লি তৈরী করছেন, কারও বা ডাল বেছে দিচ্ছেন, কারও বাড়িতে কুটছেন কুটনো। কারও ছেলের তাতে উনকোটি চৌষট্টি রকমের জোগাড় করছেন। এদিকে আবার লক্ষ্মী পুজোর আলপনা দেওয়া, নৈবিদ্যি করা,

ফুল দুর্বো তুলে, সিঁদুর চন্দন ঘষে পারিপাট্যে পরকাল ভরে ঘর আয়োজনই করে দিচ্ছেন, ঘরের বেলায় যা পরের বাবা! সাধ করে কি মানুষে বলে, ঘর জ্বালানী—পর ভোলানী!

কথাটা মতির মার কানে যায়। চাপা ক্রোধে অন্ধটা থর থর করে ওঠে, মুখে কিন্তু হাসি ফুটিয়ে বলেন, করি, বেশ করি। পরের সেবা করলে পরকালের কাজ হয়—তাই করি। আর জন্মে কত পাপ করেছিলাম তাই ভুগছি—আবার এ জন্মে সংসার-নরকে ডুবে না থাকলে সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না তো—তাই তো বেঘটেস দিয়ে রয়েছি! যখন বয়স ছিল, পরের জন্য করে সংসারে খেটেছি। তোরা তখন ছিলি কোথায় শুনি? খেটেছি যাদের জন্যে তাদের একে একে বিয়ে করে নিশ্চিন্দি হয়েছি - আবারও খাটুনি! খাটা যার—খাটা যার! কথায় বলে না—

মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে সংসারেতে বৈসু। কিসের মায়া! ঘরে খাটলে নাম-যশ নেই—না খাটলে ছি-ছাত্তার। কথায় বলে,

ঘর চেয়ে পর ভালো,
পর চেয়ে বন ভাল।

—পরে তবু খুড়ি-জেঠি বলে ছেদ্ধা-ভক্তি করে, আসনখানা পেতে দেয়, এক গেলাস জল গড়িয়ে দেয়, দুটো বা পান-দোক্তা দিলে। এইটুকু না হলে যে প্রাণ আইঢাই করে। উঃ, কি নেশার জিনিসই না বসিয়েছ প্রভু জগবন্ধু!

হাইস্কুলে পোটা দুই-তিন তুড়ি দিয়ে আরম্ভ করেন, লোকে সিং ধরলা দেখে সিঙ্গি মাছ খাওয়া ত্যাগ করে, একটা ভাল ফল দেবতাকে দিয়ে সে ফল আর খায় না—আর আমি আবাগী করলাম কি!

তা আপনি কোন একটা ভাল ফল ঠাকুরকে দিলেন না কেন পিসিমা?

দেবার যো কি মা, কপালে নেইক যে। আর এক কথা বলতে কি ভাল ফল দিচ্ছেই বা কোন্ আবাগী? কোথায় কামরাঙা, চালতা, তেলাকুচো—দুনিয়ার ওঁচা ফলগুলো ঠাকুরকে দিয়ে হাত পা নেড়ে বড়াই করে কেন যে, কে জানে! ভাবলাম আম দেব, তা তাতের দিনে কচি আমের অম্বল না হলে মনটা ছোক ছোক করে, দিতে পারলাম না। আনারস, কাঁঠাল? পেল বার জ্বর হয়ে এমন অরুচি হল যে আনারস খেয়ে তবে মুখ ছাড়ে! আর কাঁঠাল নইলে জ্বর-যন্ত্রণায় কলার করবো কি দিয়ে। আম—সত্যি বলতে কি—বড্ড ভালবাসি, পেলে-কলা তো ডাক্তার রোজ খেতে বলে। এমনি বাছবিচার করতে করতে কিছুই আর দেওয়া হ'লো না—উল্টে পান পত্তা খেয়ে ছিকেত্তর থেকেই পানের নেশা জমল! ঝাঁটা মার আমার কপালে।

ওঁর কথা শুনে সকলের মুখেই চাপা হাসি খেলে যায়—উনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলে যান, কিছুই সহি করতে পারি না মা। মায়ার বাঁধন যতই খুলে দিচ্ছেন প্রভু, নেশার খোঁটায় ততই জড়াচ্ছেন শক্ত করে। না হলে এয়োবাণী ভাগ্যিমানী মতি তিন ছেলে রেখে সগ্‌গে চলে গেল, আর বুক চাপড়াতে বেঁচে রইলাম আমি আবাগী?

চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে উঠে দাঁড়ান মতির মা। বলেন, ও সব কথা আর তুলিস নে মা, ছাইচাপা আগুন, একবার বাতাস পেলেই হল। কিনা ছিল সংসারে, চার ছেলে—তিন মেয়ে—জামাই বেয়াই নাতি-নাতনীর বিস্তারন। সব চলে গেছে একে একে। এখন শিব-রাত্তিরের সলতে ওই রাজু—সেজ ব্যাটা—তার বৌ—আর তিনটি ওঁড়ো নাতি-নাতনী—আর বিধবা মেয়ে বিমলা। যখনই ভাবি—

হাবটার মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে—হু-হু করে—বাড়ি থাকবার যো কি। তা কি বোঝে আবাগীরা? ওরা দেখে, সাপে ছুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষটা—হাসছে গল্প করছে—না জানি কি সুখেই আছে।

* * *

এমনি করে দিন যায়—হঠাৎ একদিন মতির মা আমাদের বাড়ি এসে আছড়ে পড়লেন উঠোনে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ছোট বৌমা, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়। আমার রাঙা জ্বর নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে—গায়ে-হাতে ব্যথা—সময়কাল তো ভাল নয়, কি হবে ছোটবৌ?

মা আশ্বাস দিলেন, জ্বর হয়েছে ভাল হয়ে যাবে, কু গাইছ কেন ঠাকুরঝি?

সাধ করে কি কু গাই—আমি যে ঘর-পোড়া গরু! ওই ভয়ে কারও পানে ছেলের দিষ্টিতে চাইনে—দিষ্টিতে যে বিষ আছে। যাকে যা'কে আপন মনে করে আদর-যত্ন করেছি তারাই ঘা দিয়ে গেছে! বুকখানা পাথর হয়ে গেছে ছোটবৌ। তাই সংসারের পানে ফিরেও চাইনে—নাতি-নাতনীকে তুলেও কোলে নিইনে—একবার জিগ্‌গেস করিনে রাঙা কেমন আছে? ওমা, এত করেও বিষ-দিষ্টির ফল ফলল ছোটবৌ।

চুপ কর ঠাকুরঝি—লোকে শুনলে কি ভাববে। এ সব কথা তো ভাল নয়। ভগবানকে ডাক—তিনিই ভাল করে দেবেন।

বুকে যে বল নেই ছোটবৌ—এমন রূপ ভাঙা করে দিয়েছেন তিনি—তাঁকে ডাকব কোন মুখে!

অনেক বুঝিয়ে ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন মা।

ক'দিন এদিকে এলেন না মতির মা।

মা খবর নিয়ে এলেন—রাসবিহারীদা আর তার এক ছেলের মায়ের অনুগ্রহ হয়েছিল। তা ওরা ভালই আছে—কাল নিম-হলুদ ছোঁয়ানো হয়েছে কপালে—আজ অন্ন-পথ্যি করবে। মতির মা পুজো দিতে গেছেন শীতলা মন্দিরে। এ ক'দিন বুড়িও নাকি অন্ন-জল ত্যাগ করে মা-শীতলাকে দিনরাত ডেকেছেন। তা মুখ তুলে চেয়েছেন মা।

সব ভাল যার শেষ ভাল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ঘরে যদি বা মুখ রাখলেন ভগবান—বাইরে মতির মাকে আর একটি প্রবল ধাক্কা দিলেন। মাত্র তিনটি বাড়িতে শীতলার প্রসাদ দিয়ে এসেছিলেন উনি—আমাদের বাড়ি ছাড়া আর দুটি বাড়িতে মায়ের অনুগ্রহ হল। কথা রটল, এর মূলে মতির মার বিষ-নিশ্বাস। ওই যে উনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন আমার নিশ্বাসে বিষ আছে—সেটা বেশ করেই প্রচার লাভ করেছে। এরপর উনি পথ দিয়ে চললেই পথের লোক দূরে সরে যায়, বাড়ির কাছে এলে সদর দরজায় খিল বন্ধ হয়, যাদের সদর দরজা নেই তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমের ভান করে।

এ সব প্রথমটা বুঝতে পারতেন না মতির মা। ভাবতেন সত্যি ওরা ঘুমুচ্ছে কিংবা কোন কাজে ব্যস্ত আছে। একদিন আমারই সামনে যা ঘটল, তাতে দিনের আলোর মত সব স্পষ্ট হয়ে গেল ওঁর কাছে।

দুপুর বেলায় চলেছিলাম পাশের বাড়িতে তাস খেলতে—মতির মাও চলেছিলেন পাড়া বেড়াতে। আজকাল প্রায় সব দুয়োরই বন্ধ থাকে—ওঁকে এড়াতে চায় সকলে। সেদিন কিন্তু অন্নর মার দরজা ছিল খোলা—খোলা দরজা দেখে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন মতির মা। প্রায় চৌকাঠের কাছাকাছি পৌঁছেছেন—দরাম করে খিল বন্ধ করে দিলে অন্নর মা।

মতির মা বললেন, ও বৌ আমি, দোরটা খোল।

অন্নর মা ভিতর থেকে জবাব দিল, এখন এসো ঠাকুরঝি, দুপুর বেলায় একটু গড়িয়ে না নিলে শরীরে ঘুত পাইনে।

ও মা, তা দু'দণ্ড গল্পগাছা করলে কি পরীর ক্ষয় হয়ে যায়!

এক ঝটকায় দরজা খুলে অমর মা ঝাঁজালো গলায় বললে, পরীর ক্ষয় হয় বই কি—নিশ্বাসের বিষ তো বড় কম নয়।

কি—কি বললি?

যাও ঠাকুরঝি—শোওগে। দুপুর বেলায় ঝগড়া করবার ইচ্ছে আমার নেই।

ঝরাম করে দরজাটা জোর বন্ধ করে দিলে।

আমি তখন মতির মার কাছাকাছি পৌঁছেচি। ওর দু'চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছিল। আমাকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, শুনলি বিন্দু, আমার নিশ্বাসে নাকি বিষ আছে—গায়ে লাগলে দেহ ক্ষয় হয়ে যায়! হারে, তোদের তো এই এতটুকু বেলা থেকে কাঁকে কোলে করেছি—ক্ষতি হয়েছে কিন্তু! আমারই অদেষ্ট! নিজের বেলায় বঞ্চিত করেছেন ভগবান—পরে তা শুনবে কেন। তবু বিন্দু—স্বপনেও কারও অনিষ্ট চিন্তা করিনি। ভগবানকে নিত্যি বলি, হে ভগবান, সবাইকে ভাল রাখ—সুখে রাখ। আমার মত কপাল যেন কারও না হয়!

• • •

এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক করছিলাম।

মা বললেন, এক একজনের দৃষ্টি খারাপ একথা মিথ্যে নয় খোকা।

বললাম, ওটা মনের ভুল, কুসংস্কার। যেমন কাকতালীয়—কাকও উড়লো তালটাও পড়লো, লোকে ভাবে কাকই বুঝি তাল ফেললে।

মা বললেন, সে এক আধটা ঘটনা হয়—সবগুলিই তো এক রকম হয় না।

না মা, ওকে ডাকব আমাদের বাড়িতে। মন্টুর অসুখ—তুমি একা ক'দিক সামলাবে। বেশ তো, একটা পরীক্ষা হয়ে যাক!

মা শিউরে উঠলেন। বললেন, বালাই ষাট, পরীক্ষা দেবার সময়ই বটে! ছেলেটা সেরে উঠুক, একাই সামলাতে পারব আমি।

বললাম, মা, একটা গল্প শোন। কুসংস্কার শুধু আমাদের দেশেই নয়, য়ুরোপেও আছে। করাসী দেশের একটি কুমারী মেয়ে দেশের হয়ে লড়াই করে বিদেশী শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই মেয়েটির অলৌকিক শক্তির একটা খারাপ মানে করে দেশের লোকই তাকে পুড়িয়ে মেরেছিল ডাইনী বলে। সে যে কত বড় ভুল আজ আমরা বুঝতে পেরেছি।

মা বললেন, আমরা বেশী দূর দেখতে পাই নে খোকা, তাই হয়তো ভুল করি। কিন্তু মায়ের মন নিয়ে যদি জন্মাতিস তাহলে বুঝতে পারতিস—সত্যি জানলেও এমন ভুল আমরা করবই। এখন থাক—মন্টু ভাল হয়ে উঠুক, তারপর একদিন মতির মাকে আনিই ডেকে আনব।

সত্য বলতে কি এ কথায় আশ্বস্ত হইনি।

• • •

মতির মাকে ডাকবার আগেই দৈব ওর ওপর শেষ আঘাত হানলে। রাসবিহারীরা দুজন পরীর নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল চাকরি করতে; মাসখানেক বাদে আবার জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। এবার ডাক্তারী ওষুধ, পুজো আসত কিছুতেই কিছু হলো না, রাসবিহারীরা চলে গেলেন।

মতির মা চেঁচিয়ে কাঁদলেন না, কারো কাছে গেলেন না শোক জানিয়ে দুঃখভার লাঘব করতে।

রাসবিহারীদা'র একটী ছেলে উপার্জ্জনক্ষম। সেই সংসার চালাচ্ছিল কায়ক্লেশে। কায়ক্লেশে যে সংসার চলে—সেখানে প্রতি পদে অনৈক্যের সুর বাজে। এখানেও বাজছিল। তবে সেটা সংসারের মধ্যেই অল্প বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করছিল—কোলাহল তোলেনি কোনদিন। একদিন কোলাহল উঠল। তুমুল কোলাহল। সেজবৌয়ের ঘরেও যে তীব্র হলাহল সঞ্চিত ছিল তা কেউ বা কল্পনা করেছিল।

তুমি মর—মর, যমের অরুচি! তোমার নিশ্বাসে বিষ, চাউনিতে বিষ, আদর সোহাগে বিষ! নিজের বলতে কাউকে তো রাখলে না—এবার পাড়া-পড়শীর মাথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। আমার যে দু-তিনটে গুঁড়ো আছে সেগুলিকে শেষ কর। উঃ এমন যমও ঘরে পুষে রেখেছি গো! আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিলে।

একটা চাপা কান্না গুমরে উঠল বাড়ির মধ্যে। পাঁচ দশ বিশ মিনিট কাটল—কান্না আর থামে না। সে বুক ফাটা কান্না যে শুনল তারই বুকে কান্নার স্রোত উত্তাল হয়ে উঠল।

আমরা পথে দাঁড়িয়ে এই বুক ফাটা কান্না শুনছিলাম।

হঠাৎ লাঠির শব্দটা এগিয়ে এলো সদর দরজার দিকে। দরজা খুলে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন মতির মা। তাঁকে দেখে পাড়ার ছেলেমেয়েদের দল যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। তাড়াতাড়ি বাড়িগুলোর সদর দরজায় খিল পড়ল দমাদম। রাস্তায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মতির মা। মতির মা পথে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রাম যেন জনশূন্য হয়ে গেল—গৃহস্থেরা সবাই কি ঘুমের মেশায় অচেতন হয়েছে?

মতির মা ভুল বুঝলেন না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলতে লাগলেন মতির মা। পায়ের গতি মন্থর, লাঠির আওয়াজ ক্ষীণ; অতিশয় ক্লান্তিভারে সারা দেহ টেনে টেনে এক দুয়োর থেকে আর এক দুয়োরে ফিরতে লাগলেন তখন সব দুয়োরই বন্ধ হয়ে গেছে।

এগিয়ে এসে বললাম, আমাদের বাড়িতে আসবেন পিসীমা?

ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে মতির মা বললেন, কোথায় যাব?

আমাদের বাড়িতে।

হঠাৎ লাঠিতে ভর দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন উনি। বার্দ্ধক্যান চোখ দুটি চক্ চক্ করে উঠল—কেঁপে উঠল সারা দেহ। কাঁপা গলায় বললেন, যাব? তুই বলছিস বিষ্ণু, তোদের বাড়িতে যাব? চ—বাবা—তাই চ। নিশ্চিন্ত নিশ্চরতায় ঠুক্ ঠুক্ লাঠির শব্দ তুলে উনি এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার সঙ্গে।

বাড়ির দুয়োরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ডান হাতে লাঠি ধরে বাঁ হাতখানি কোমরে রেখে ঈষৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, খানিক কি ভাবলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, না বাবা, থাক।

বলেই দু'হাত দিয়ে লাঠিখানা চেপে ধরে যেন মনস্থির করে ফেললেন। একটু হেসে বললেন, আজ থাক বিষ্ণু, আর একদিন আসব। তুই যে মনে রেখেছিস বুড়ি পিসীকে—দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলিনে—এ কথা কোনদিন ভুলব না বাবা। আহা গোপাল আমার—ধন আমার—সুখে থাক, শান্তিতে থাক। নীরোগ হও—দীর্ঘজীবী হও। আমার মাথার যত চুল তত পেরমাই হোক তোমার। তোদের সব আপদ বালাই নিয়ে আমি যেন দূর হয়ে যেতে পারি বাবা।…

লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে চলে গেলেন মতির মা। একটু দ্রুতই চলে গেলেন।

———

এই প্রথম

[পত্র-ভারতী 'এই প্রথম' এই পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি এবং এতে কাগজের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বেড়েছে। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। যাদের ভেতরে প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যারা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে তাদের রচনা পাঠকদের সামনে ধরে তাদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এই করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা প্রথম সারিতে স্থান পাবে না কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একটু জানিয়েদেন কেন না পাঠকদের এইসব জানার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

নবাব

নীহার পাকড়াশী

এখনও মনে পড়ে নবাবের কথা। চাল-চলনে, আদব-কায়দায়, কথা-বার্তায় সত্যিই নবাবী মেজাজটা পুরোমাত্রায় বজায় ছিল তার। মনে হতো লক্ষ্ণৌর যেন শেষ নবাব সে। একদল নবাবদেরই ছিল বটে এই লক্ষ্ণৌ শহর। আদব-কায়দা, আইন-কানুন, ব্যবহার সবই ছিল অন্য এক ধরণের। আচারে, আচরণে সব সময়েই একটি বিনয় নম্র ভাব বজায় থাকতো পূর্ণ মাত্রায়।

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটার অনেক আগে গিয়েছিলাম একবার সফর করতে লক্ষ্ণৌ শহরে। উঠলাম গিয়ে আমারই এক আত্মীয়ের বাড়ী। যতদূর মনে পড়ে গিয়েছিলাম শীত পড়ার মুখেই।

বাড়ীটি দোতলা। সামনে প্রশস্ত রাস্তা। সরকারি বাস্ চলাচল কেন, সাইকেল-রিক্সা চলাচলের কথাও ভাবতে পারেনি কেউ তখন। সাধারণ যান-বাহনের ভেতর ছিল তখন ছাউনী বা বেছাউনীওয়ালা এক্কা আর টঙ্গা।

ভোর সকালে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম রাস্তার ওদিকটা। দেখতাম একদিকে গোটা কতক টঙ্গা আর তারই কিছু দূরে কতগুলি এক্কা দাঁড়াতো এসে সোয়ারির আশায়। এক কথায় যাকে বলে এক্কা-টঙ্গার আড্ডা।

বেশির ভাগ একা সোয়ারি নিয়ে যেতো 'শেয়ারে'। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতো তারা—'কাছারি, কাছারি! আহিনাবাদ!' কেউবা হাঁকতো—'স্টেশন, স্টেশন।'

সময় সময় সোয়ারির হাত ধরে টানাটানিও করতো তারা। তারপর যা হয়—বচসা, গাল-মন্দ, আরও কতকি!

দোতলা বারান্দা থেকে রোজই দেখতাম এই সব দৃশ্য। ভালই লাগতো। তবে ওদের ভেতর খুব বেশি করে নজর পড়তো একজনের ওপর। আধা-বয়সী এক টঙাওয়ালা। রুচি বোধছিল লোকটির।

মোটা গাঢ়হা কাপড়ের চুস্ত পায়জামা, আর ছোট-হাতা শিরাণ, ওই বেশীর বাঁকা টুপি মাথায়, পায়ে দেশী মোটা শক্ত জুতো। এই ছিল তার বেশ।

হাল চাল অবশ্য সকলকারই লক্ষ্য করতাম, কিন্তু নজরটা পড়তো যেন ওর দিকেই বেশি। কারণ জামা কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সময় সময় আতরের টোকা মেরে জামা আর চুস্তের ঘুলো ঝাড়তে দেখেছি তাকে। এর ওপর টঙা নিয়ে যতক্ষণ সে সোয়ারির আশায় দাঁড়িয়ে থাকতো তার ভেতর অন্তত বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর টঙার গদির তলা থেকে ছেঁড়া এক টুকরো ন্যাকড়া বের করে আগাগোড়া ভালো করে মুছে ফেলতো টঙাটী। সব সময় ঝক্-ঝক করতো তার ঘোড়ার সাজ-পোষাক।

সব থেকে আশ্চর্য্য হতাম তার সোয়ারি বাছাবাছির ধরণ দেখে! ময়লা জামাকাপড় পরা কোনো সোয়ারি কিছুতেই সে তুলতো না তার টঙায়। এখন কি বেশি ভাড়া কবুল করলেও নয়। কত সময় এই নিয়ে সোয়ারির সঙ্গে তার বচসা হতে দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে সোয়ারির আশায়, তবু নেবে না ময়লা কাপড় জামা পরা কোনো সোয়ারিকে। বোধ হয়ত কেউ এসেছে কি—একগাল হেসে যেন খাতির করেই দুহাত বাড়িয়ে বলতো—'তাশরিফ্ লি য়িয়ে বাবুজি।'

এই সব দেখেই আমি তার একটা নামকরণ করেছিলাম, বলতাম—নবাব। আসল নামটী যে তার কী তা তখনও যেমন জানতাম না এখনও জানিনা। জানার প্রয়োজন বোধ করিনি কোনোদিন।

সেদিন দেখি কি না এক অদ্ভুত ব্যাপার।

আশে পাশে কোনও টঙা নেই, সবাই সোয়ারি নিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ কানে এলো নবাবের গলার আওয়াজ। লোকজন নেই, কার সঙ্গে কথা বলছে নবাব! দেখি না ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়াতে খাওয়াতে সেই ঘোড়ার সঙ্গে বলছে কথা! বলছ—পেট ভরে খেয়ে নে দুলারি, সে রকম সোয়ারি এসে যেতে হবে আমাদের। না মালুম যেতে হবে কত দূরে! আদর করে ঘোড়ার গায়ে গলায় হাত বুলোচ্ছে নবাব। ঘোড়াটীও তেমনি। সোহাগে ঘাড়ের চুল দুলিয়ে গলা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সে। খিচ্ছ যখন তখন দাও ভাল করেই হাত বুলিয়ে। ভাল করেই হাত বুলোতো নবাব। আনন্দে যেন নেচে উঠতো দুলারি। ত্রেষা-ধ্বনিতে মনের আনন্দের কথা জানাতো সে তার মনিবকে। সতেজ নধর কান্তি গাঢ় খয়েরি রঙের গা। মোটা লেজের গোছা।

বাড়ী থেকে বেরতাম যখনই, আস্তাবল থাকলে নবাব হাঁক মারতো—আইয়ে আইয়ে মেহেরবান বাড়া হুঁ ম্যায় ঠিক আপকি লিয়ে।

কাছে পিঠে গেলে কোথাও হেঁটেই যেতাম, বলতাম—না এখন আর টঙার দরকার নাই।

দূরে কোথাও যেতে হলে উঠতাম গিয়ে নবাবের টঙায়। এমনি করেই পরিচয় হয়েছিল আমার তার সঙ্গে।

একদিন সকালে দেখলাম সে টঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই রাস্তার উলটো দিকে। ভাবলাম ঘর থেকে বেরবার সময়ই বোধ হয় পেয়েছিল তার মনের মত শোয়ারি, তাই আসেনি এদিকে!

দুপুরে খাওয়া সেরে বেরিয়েই রাস্তায়। আমিনাবাদ যাব কয়েকটি জিনিস কিনতে। সামনে তাকিয়ে দেখি আস্তা কাঁকা, দাঁড়িয়ে আছে মাত্র সে-ছাউনী ওয়ালা একটি এক্কা। এমন সময় দূর থেকে সেই পরিচিত ডাক কানে এলো—মায় আ রাজা জী মেহেরবান। ঘোড়া ছুটিয়ে টঙা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল নবাব। একপাল হেসে বললে সে—এলাম হুজুর, নয়তো ও লক্কড় এক্কায় চড়ে নাচতে নাচতে যেতে হতো জাঁহাপানাকে!

জবাব দিলাম না কথাটার। এটা নবাবের লক্ষ্য করেছিলাম এক্কা ওয়ালাদের সে মানুষ বলেই মনে করতো না।

নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। ঠোঁট দুটী লাল। পান চিবুচ্ছে সে।

জিজ্ঞাসা করলাম—দিয়েছিলে কোথায় সকালে?

জবাবে বললে—সকালে টঙার প্রয়োজন ছিল বুঝি হুজুরের?

—না। দেখতে পাইনি কি না সকালে, তাই···।

—আজ সকালে বেরইনি বাবু। ঘোড়াটীকে হেঁকিয়ে বললে- দুলারির পায়ের নাল বদলে দিলাম আজ। ওই নালের জন্যে কদিন বেশ কষ্ট হচ্ছিল ওর। অবলা জীব, কথা তো বলতে পারে না হুজুর।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে বসলাম ওর টঙায়। গন্তব্য স্থান বলে দিতেই চলতে লাগলো টঙা।

টঙা চলেছে, হঠাৎ বিশ্রি রকম একটা ঢেঁকুর তুললো নবাব। বোধহয় সেটা সে চাপতে পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে বললে—গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে হুজুর!

জিজ্ঞাসা করলাম—কী খেয়েছ আজ?

বেশ গম্ভীর ভাবেই জবাব দিল সে—জেয়াদা কুছ পায় নেহি জনাব। থোড়িসি ঠাণ্ডি পুলাও আওর কাবাব ব্রিজি খায়ে হুঁ।

ভাবলাম সার্থক হয়েছে তার নবাব নাম দেওয়া পোলাও আর কাবাব খায় তো নবাবরাই!

বাড়ী ফিরে জানালাম নবাবের খাওয়ার ফিরিস্তি। শুনে সবাই হেসেই খুন। ওদের হাসি দেখে নিজেকে কী রকম বোকা বোকা মনে হচ্ছিল আমার! তাহলে কি শুনতে ভুল করলাম নবাবের কথা!

এমন সময় আমার আত্মীয়টী জিজ্ঞাসা করলেন—যাবে না কি হে, ওই রকম পোলাও একদিন?

বললাম—না থাক্। খরচ পত্র করে দরকার নেই।

কথায় বাধাদিয়ে তিনি বললেন—আরে নানা, খরচপত্র মোটেই বেশী নয়। তবে ঠাণ্ডা পড়েছে, ভাবছি খেয়ে লঙ্কা হবে কিনা। গরমের সময় হলে অবশ্য দেরু দিয়ে মেখে খেতে মন্দ লাগে না।

পরে ঠাণ্ডি পোলাওয়ের ব্যাখ্যা করলেন যখন, বুঝলাম ব্যাপারটা—ঠাণ্ডি পোলাও অর্থে পাতাভাত আর কাবাব ব্রিজি—বেগুন পোড়া। কাবাব হয় আগুনে বললে।

বাঃ! কথায় ওদের চটক্ আছে!

চলেছি আর একদিনে হুজুরৎগঞ্জে। নবাবের টঙায় চেপে চলেছি। পথে হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো আমার—দাঁড় করাও তো টঙাটা একটু নবাব।

শুনে পিছন ফিরে বাঁকা চোখে চেয়ে বললে সে—লজ্জা দেবেন না ওই নামে ডেকে হুজুর। সত্যিই

নবাব-বংশের ছেলে আমি। আজ ঐশ্বর্যের দোষে টঁটা চালাচ্ছি। তবে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মাসে মাসে মাসোহারা পাই এখনও যদিও সে খুব কম।

—কম? কত?

ভেবেছিলাম দু'একশো টাকার কথা বলবে। কিন্তু সে যা বললে, তা শুনে আমার গাড়ী থেকে পড়ে যাবার মতো অবস্থা!

বললে—এক রুপেয়া বারো আনা।

আমার আত্মীয়টীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বেশ সহজ সুরেই জবাব দিয়েছিলেন তিনি—ওরকম মাসো হারা পায় অনেকেই এখানে। আশ্চর্য্যের কিছু নেই এতে!

এরপর নিজেকে প্রশংসা না করে থাকা যায়—না! সার্থক হয়েছে নবাব নাম রাখা আমার।

এরও কিছুদিন পরে একদিন আমার সেই আত্মীয়টীর সঙ্গে আবিনাশের যাচ্ছিলাম এক সভায়। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো একটী লোককে আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে বললেন আমার আত্মীয়টি—ওই যে দাঁড়িয়ে আছে তোমার নবাব বাহাদুর।

দূর থেকে প্রথম নজরে চিনতে পারিনি তাকে। কাছে একটু এগিয়ে যেতে দেখলাম, অন্যরকম সেজেছে সে আজ। আশ্চর্য্য একটু হয়েছিলাম বই কি!

পাতলা কাপড়ের চুস্ত পায়জামা, গিলে করা কামদার বলমলের কুর্ত্তা, ফুল তোলা দাঁকা টুপি মাথায়, অরির কাজ করা নাগরা জুতো পায়ে, কানের দু'পাশে ঝুলকি বেয়ে গড়াচ্ছে ফুলেল তেল। মনে হলো কানে গুঁজেছে আতর মাখানো তুলো। গোঁফদাড়িও চমকাচ্ছে একটু যেন। পান চিবুচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর সেই সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়া ঠুংরির দু'এক কলি গুঁজছে আস্তে আস্তে।

আমাকে ওই অবস্থায় দেখে নবাবও কেমন যেন একটু চমকে উঠলো। কুর্নিশের ভঙ্গীতে তান হাতটা পাশাপাশি বেঁকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সেই হাতটা বার দু'তিন কপালে ঠেকালো। বাঁ হাতটী ছিল তার বুকের ওপর। লম্বা কলমায় চোখদুটী ঈষৎ রক্তবর্ণ। গলায় আওয়াজ জড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হলো যেন মদ খেয়েছে নবাব। কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। কথাটা জড়িয়ে গেল। আর আমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এলাম সেখান থেকে।

মনে মনে ভাবলাম—যে যাই বলুক, কিছু টাকা-পয়সা হয়ত আছে নবাবের। কথাটা বলেই ফেললাম আমার আত্মীয়কে। শুনে তিনি বললেন,—কি করে বুঝলে? ওর ওই সাজ পোষাক দেখে?

বললাম'—হ্যাঁ।

হেসে তিনি বললেন,—কত পয়সা লাগে পই রকমের সাজগোজে?

খরচে মেলায় প্রশ্ন শুনে তাঁর। নিজেই প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি বললেন,—মাত্র মাসে পাঁচ পয়সা।

—মাসে পাঁচ পয়সা। বলছেন কী?

ভাবলাম হয়তো রসিকতা করছেন তিনি। কিন্তু না, রসিকতা নয়। তিনি বুঝিয়ে বললেন আমায়, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এই রকম সাজে পাঁচ পয়সার নবাব তুমি অনেক দেখতে পাবে এখানে, যা কিছু পরেছে ও সব ভাড়া পাওয়া যায়। একখিলি পান জর্দা, একটু আতর—সর্বসাকুল্যে মাসে পাঁচ পয়সা। আজ বোধহয় মাসোহারা পাবার দিন ছিল তোমার নবাবের। তাই ওই ভাড়া করা সাজ পোষাকে বাহার। জুটো অবশ্য মাসোহারার পয়সায় যেয়েছে।

তারপর একদিন অফ্রো বাসের মেয়াদ ফুরোলো আমার। নবাবের টাকা চুকেই এলাম ট্রেনমে। ভাড়া ঠিক হয়েছিল চার আনা। একটা আধুলি নবাবকে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। বাকি চার আনা পয়সা ফেরৎ দেবার জন্যে নবাব আমার পিছু পিছু ছুটে এসে ডাকলে,—বাবুজি! কিরে দাঁতাতেই চার বাড়িয়ে নবাব বললে,—চার আনা পয়সা ওয়াপস নিজিয়ে।

বললাম—না ওটা তোমায় দিয়েছি। বখশিস ওটা!

কানে হাত ছুঁইয়ে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে নবাব বলে উঠলো,—আরে তোবা! তোবা! কী বলছেন হুজুর! খানদান বংশের ছেলে আমি। বখশিস তো নিতে পারবো না।

জোর করে ফিরিয়ে দিলে বাকী চার আনা পয়সা। শুনলোনা কোন ওজর আপত্তি। পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে একটি কুর্নিশ ঠুকে ফিরে গেল তার উবায়। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাকেও ছুটতে হলো তাড়াতাড়ি ট্রেনমে। কিন্তু এই মানুষটাকে আমি আজও ভুলতে পারলাম না।

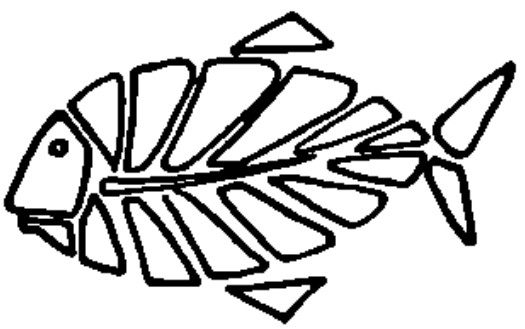

অঙ্গনা-সংবাদ

—দেবযানী

লণ্ডনের 'উইমেন অ্যাডভারটাইজিং ক্লাব'-এর এক ডিনারে শ্রীমতী আইলসা গারল্যাণ্ড বললেন, "মেয়েরা পুরুষদের কাছে যেসব বস্তুগুলি প্রত্যাশা করে, বিজ্ঞাপন সম্পর্কেও তাদের সেই একই প্রত্যাশা—অর্থাৎ সাহায্যকারিতা, আকর্ষনীয়তা এবং বিশ্বস্ততা।"

আইলসা গারল্যাণ্ড 'অ্যাসন' পত্রিকার সম্পাদিকা। এঁর মতে, বিজ্ঞাপন আর সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের কাজ প্রায় একই : মেয়েদের পয়সা খরচ করতে প্ররোচনা দেওয়া। তবে সেই অর্থব্যয় প্ল্যানমাফিক এবং বিজ্ঞজনোচিত হওয়া দরকার। গারল্যাণ্ড বলেন, সম্পাদকীয়তা এবং বিজ্ঞাপন সমান তালে পা ফেলে চলবে, এটাই কাম্য হওয়া উচিত।

• • •

এক যান-দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন শ্রীমতী ভলিয়া হোয়াইট। ইনি ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। ঐ দুর্ঘটনায় তাঁর ডানহাতখানা শরীর থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। হাতখানিকে কিন্তু সযত্নে রক্ষা করা হয় এবং মালিকসমেত সেটিকে তাড়াতাড়ি লস্ এঞ্জেলসের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একদল অস্ত্রচিকিৎসক আটঘণ্টাব্যাপী এক 'লড়াই'-এ নামেন। ফলে ভলিয়ার শরীরের সঙ্গে হাতখানি জোড়া লাগান সম্ভব হয়। এরপরে কিছুদিন বাদ দিয়ে আরেকবার অস্ত্রযুদ্ধ। এবারে বিচ্ছিন্ন স্নায়ু বা নার্ভগুলোর জোড় মেলানো হল, সময় লাগল তিনঘণ্টা। ডাক্তাররা মত দিলেন, বিশেষ আর কোন অসুবিধে হবেনা মনে হয়, কারণ চিকিৎসা সফল।

শ্রীমতী ভলিয়া এখন সেই ভূতপূর্ব কাটা ডানহাত দিয়ে কিছু কিছু গেরস্থালীর কাজকর্ম করতে পারছেন। যেমন, লেখাপড়া, বাসন পত্র ধোওয়া মোছা, রান্নাঘরের কতক কতক কাজ ইত্যাদি।

• • •

বাংলাদেশের চিটাগঙ্গের মেয়েটি। নামটা আপাতত গোপনই রাখছি আমরা তবে বয়সটা বলি—ছেচ্ছো। সাত—আটবার আগে চুরি গিয়েছিল বাপের বাড়ি থেকে হদিশ পাওয়া গেল হালে। বাড়ি ফিরে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিল।

চিটাগঙ্গের পুলিশ বিভাগ মেয়েটি সন্ধানে খাওয়া করেছিলেন উত্তর প্রদেশে অন্তর্গত ইন্দ্রপুর গ্রামে। সেখানেই খোঁজ পাওয়া গেল তার। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'বার হাতবদল হয়েছে মেয়েটি, অর্থাৎ বিক্রীত হয়েছে। প্রথম ওস্তাদের হাতে চুরি যাবার পর তাকে বাংলাদেশের বাইরে চালান করা হয় গোরখপুর জেলায়। সেখানে বিক্রী করে দেওয়া হয় একজনকে। সাতদিন বাদে এ-ব্যক্তি আরেকজনের কাছে তাকে বেচে দেয়। এই দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে একটা সিভিল ম্যারেজ সারা হয় ও অতঃপর তারা স্বামী-স্ত্রী

হিসেবে বাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে পুলিশ খোঁজ করতে করতে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনে।

এরকম কতই চুরি ঘটছে। কাউকে ফিরে পাওয়া যায় কাউকে বা যায়না।

• • •

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগির যে নতুন অধ্যাপিকাটি যোগ দিতে চলেছেন, জানা চেনা না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা হয়ত প্রথমে কাঁধে হাত দিয়ে ওকে বলে বসবে, তোমার নাম কী ভাই, কোন বিভাগে ভর্তি হলে?' পুরুষ ছাত্রদের কেউ কেউ হয়ত বা প্রেম নিবেদনই ক'রে বসবে। যদি করে তবে তাদের দোষ দেওয়া যাবেনা কিন্তু।

কারণ—অধ্যাপিকার উপযুক্ত মানানসই চেহারা বা বয়স কোনটাই ওর নয়। সত্যি বলতে কী, এডিথ স্টার্ণ এই মুহূর্তে নিজেই একজন ছাত্রী। ফ্লোরিডার আটলান্টিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে এখনো। তবে খুব শিগগির ওখান থেকে পাশ ক'রে বেরোচ্ছে এডিথ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ও মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজে লেগে যাবে—বয়স? ৫. হ্যাঁ, ওটা এখনো বলা হয়নি—তবে মনে হয়, মিশিগানে যারা ওর ছাত্র ও ছাত্রী হবে, তারা সবাই ওর চাইতে বয়সে বড় হবে। অতএব সেখানে প্রথম প্রথম না চিনে কেউ যদি—।

এডিথের বয়স এখন পনের ষোলসীও হয়নি! ওর আশা, আর তিন বছরেই ও পি-এইচ-ডি হতে পারবে।

• • •

ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই সাধারণত পুরুষেরাই ক'রে থাকে। তবে মেয়েরা কেউ কখনো এ-লাইনে আসেনি তা নয়। উদাহরণ, আন্তোনিতা লিনারেস। বয়স পঁচিশ। মাদ্রিদের মেয়ে। ষাঁড়-লড়ুয়ে বলে অনেকের কাছেই সুপরিচিত। বিপদের ঝুঁকি আছে সব সময়েই এ খেলায়, কিন্তু লিনারেস তার ভয়ে পিছু হটবার মেয়ে নয়।

এই সেদিন মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল ওর। অবশ্য অক্ষত থাকেনি, খুবই জখম হয়েছে, তবে প্রাণে বেঁচে গেছে। ঐ ষাঁড়ের সঙ্গে গুঁতোগুতি করতে গিয়েই বিপত্তি।

ভাল সামলাতে পারেনি আন্তোনিতা। ষাঁড়টা ওকে উল্টে ফেলে দেয় চিৎপাত করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শিং দিয়ে উরুদেশের মাংস দেয় ফালা ফালা ক'রে চিরে। একেবারে ভিতরের হাড় বেরিয়ে পড়ে। তারপর আর কী। ছুটোছুটি, হাসপাতাল ডাক্তার বদ্যি। ষাঁড়টাকে অবশ্য মেরে ফেলা হল।

• • •

জার্মানীতে ভারতীয় নৃত্যকলার খুব আদর। ভরত নাট্যমকে বিশেষ ক'রে ওঁরা প্রশংসা ক'রে থাকেন। এর ছন্দ, সুষমা, লালিত্য, মনোহারিত্বায় জার্মানরা মুগ্ধ। তন্ময় হয়ে ওঁরা দেখেন ও শোনেন, যখনই কোথাও কোন ভারতীয় নাচের আসর পড়ে। যেসব ভারতীয় মেয়েরা ওখানে থাকেন অথবা গিয়েছেন কোন ব্যাপারে, তাঁরা যদি নাচে পারদর্শিনী হন তবে আর নিস্তার পাওয়া ভার। ভারতের মেয়েদের নাচের লীলাভঙ্গী জার্মান মেয়ে পুরুষ উভয়কেই মোহমুগ্ধ ক'রে ফেলে।

• • •

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এক সমীক্ষায় জানা গেল, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা

সম্প্রতি বেশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। এই সম্পর্কে মোট যাদের ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই বালিকা বা কিশোরী। এইসব ধরাপড়া অপরাধিনীরা যেসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—চুরি ও ডাকাতি, অবৈধ সম্পর্কে ও অন্যান্য যৌন দুষ্কর্ম ইত্যাদি। এদের বয়স সাধারণত ১৬ থেকে ২১ এর মধ্যে। কিন্তু সংখ্যক আছে যাদের বয়স ১২ থেকে ১৬র মধ্যে।

• • •

রাশিয়ার মেয়েরা ব্যাডমিন্টনে বেশ কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। ইতিপূর্বে এঁরা তিনবার বিশ্বপ্রতিযোগিতায় বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছেন। আর আটবার হয়েছেন ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। এবারের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাতেও এঁদের সাফল্য দেখা যাচ্ছে। গড়ে এবারকার জন প্রতিযোগিনীদের বয়স পঁচিশ আর উচ্চতা ১৮৩'৭ সেন্টিমিটার। দলের মধ্যে সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ষোল বছরের মেয়ে ঊলিয়ানা দেমিওনোভা। দুতো না পরে এর উচ্চতা ২ মিটার ৭ সেন্টিমিটার। আগামী তিনবছরে ও একজন পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠবে, এই হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের মত।

• • •

লণ্ডনের জনৈকা ভদ্রমহিলা একটি বীমা 'পলিসি' করিয়েছেন। এই বাবদে তাঁকে দিয়ে যেতে হবে প্রতি সপ্তাহে এক পেনির মত। বীমার উদ্দেশ্যে—১০,০০০,০০০ : ১ অনুপাতে তাঁর সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা।

কারণও আছে। মাটির নীচে দিয়ে ময়লা জল ও আবর্জনাবাহী পাইপ—সেই সব পাইপের ওপর অবস্থিত রয়েছে মহিলাটির বাড়ি। আজব বাড়ি, সন্দেহ নেই। মহিলাটি নাকি এরকমটা ঘটতে শুনেছিলেন, যেখানে কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ির মধ্যে একটা মোটরগাড়ি ঢুকে পড়ে ছাড়া যায় এবং তার ফলে সেই বাড়ির নীচেকার ময়লা পাইপ জখম হয়ে ভদ্রলোককে আর্থিক দিক থেকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়ে দেয়। এই থেকেই ভদ্রমহিলার মাথায় নিজের বাড়িটির বীমা করাবার কথা আসে।

• • • •

ছাব্বিশ বছরের যুবতী নর্মা কিল্ডিং। লণ্ডন শহর থেকে বাবাকে টেলিফোন করতে গেলেন। বাবা থাকেন ভার্টকোর্ড শহরতলীতে। কিন্তু ডায়ালিংএ একটু গোলমাল হয়ে গিয়ে ভুল নম্বরে যোগাযোগ হয়ে গেল। আসলে ওটা দৈব যোগাযোগ, যাকে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। ফোনের ওধার থেকে সাড়া দিলেন জনৈক অপরিচিত ভেভিড মিলার। বাড়ি লিভারপুল, বয়স ৩৪। নর্মার কণ্ঠস্বর ফোনের কানে শুনে মিলার সাহেবের প্রাণ আনচান করে উঠল—আহা, কী মধুর! কী মধুর কথা কওয়ার ভঙ্গি! কে মেয়েটি! পরের সপ্তাহেই মিলারের লণ্ডন যাবার কথা, সেই অনুসারে তক্ষুণি একটা রিনঝির হয়ে গেল সুর-ভাবিনীর সঙ্গে ডিনারে মিলিত হবার। তারপরে ঘটনার যথাযোগ্য গতি। পরিণতি বিয়ে। নতুন মিসেস মিলার বললেন, "ভুল নম্বরে যোগাযোগ সবক্ষেত্রেই যে বিরক্তিকর বা অবাঞ্ছিত, তা নয়। ভাগ্যিস্ ভার্টকোর্ডের লাইন না পেয়ে লিভারপুলের লাইন পেয়েছিলাম, তাই তো—।"

• • • •

হরিৎ-নয়না সুসান হেওয়ার্ড। হলিউডী মহলে ও ছবিতে অতিপরিচিত নায়িকা। সিল্কের পরম ভক্ত। প্রচুর ব্যবহার করেন সিল্কের তৈরি জামাকাপড়। সিল্কের গাউন, সিল্কের অধোবাস, সিল্কের পায়জামা, সিল্কের বিছানার চাদর। এঁর একটি নৈশ শখ—বা বিলাসিতা, যাই বলুন—গরমজলে স্নান ও সেই সঙ্গে সুগন্ধি তেল দেহে মালিশ। এটি বারমাস করা চাইই। শোবার ঘরের চেহারাটা দেখাই—রাজযন্ত্রর সাতটি

এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জিনিসপত্রে। মেকাপ অতুলনীয়ে সেই বর্ণ সন্নিবেশের অদলবদল ঘটে। আর আছে ঘুমে প্রীতি—চারদিকে গোলাপ আর লাইলাক ছড়িয়ে রেখে সুগান ঘুমোতে যান।

• • • •

ফরাসিনী মাদাম গুদা রেন যারা যাবার আগে ১২০,০০০ ফ্রাঁ আলাদা করে রেখে যান এক আজব উদ্দেশ্যে। যেসব লোক বরফ সরান কাজ করে থাকে, তারা ঐ পয়সায় নিজেদের একটু ফিটফাট রাখবে।

আরেকজন ফরাসী মহিলার খেয়াল। উইলে প্রচুর টাকাকড়ি বরাদ্দ করে গেলেন। কী হবে ঐ টাকায়? না—মঙ্গলগ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের কোন অধিবাসীর সঙ্গে পৃথিবীর যে মানুষ প্রথম আলাপ করবেন বা তার কাছ থেকে কোন নিশানা পাবেন, ঐ মোটা টাকাটা তিনি পাবেন পুরস্কার হিসাবে। বলা-বাহুল্য, এ পুরস্কার এখনও পর্যন্ত কারো বরাতে জোটেনি। ভদ্রমহিলার নাম মাদাম এ, ক্লারা গুজমান।

• • • •

কিউবায় পুরুষ শ্রমিকের অভাব ঘটেছে। তাই ডাক পড়েছে মেয়েদের। ওখানকার কর্তৃপক্ষ ৪৩০টি বিশেষ শ্রেণীর কাজ মার্কা করে দিয়েছেন—এবার থেকে এই সব কাজে মেয়েরা ছাড়া কোন পুরুষকে নিয়োগ করা হবেনা। এই ৪৩০টির মধ্যে আছে লাইব্রেরিয়ানের কাজ, টেলিফোন অপারেটর, কিছু শ্রেণীর হাসপাতালের কাজ, ইত্যাদি। বর্তমানে এই ধরণের কাজে নিযুক্ত আছে বাট হাজার পুরুষ—এরা এসব জায়গা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষেতখামার ও অন্যান্য বেশি পরিশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। এই হল আইন।

• • • •

মালাউই থেকে এক খবরে জানা যায়, সেখানে মিনিস্কার্ট ও অন্যান্য 'মিনি'-পোষাক আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়েছে। যেসব মেয়েরা মিনি প্রেমিক (কা!), তারা ঐ দেশে থাকতে পাবেনা। যেসব দোকানে 'মিনি'-পোষাক বেচাকেনা হত এযাবৎ, সেগুলো বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।

• • • •

বাইশ বছরের রুকা যুবতী এস্থার অ্যানিয়েলস্ ক্রাকোর্ট ফিল্ম ও প্রেমবল অনুষ্ঠান 'মিস্ সিনেমা' নির্বাচিত হয়। ইসরুর্গ হচ্ছে এস্থারের প্রিয় শহর, এখানেই সে গত ৪।৫ বছর যাবৎ বাস করছে। বর্তমানে সে অভিনয় শিখেছে। ওর ইচ্ছে, ভবিষ্যতে সিনেমায় নামবে।

• • • •

সমাজ সেবা সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল কলকাতা তথাকেন্দ্রে এই সেদিন। এই অনুষ্ঠানে কিছু বলতে উঠে ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ অ্যাণ্ড হাইজিনের অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর) ডঃ (শ্রীমতী) মুক্তা সেন পরিষ্কারই বললেন, বাংলা ভাষায় নিজের বক্তব্য তথা মনোভাব প্রকাশ করা তাঁর ঠিক আসেনা, ইংরেজিতে বলতে পারলে তবেই তিনি স্বচ্ছন্দ হতে পারেন। অতএব বাঙালি হয়েও স্বচ্ছন্দতাবশের জন্যে ডঃ সেনকে ইংরেজিতেই বক্তৃতা দিতে হল।

মেয়ে মজলিশ

"এ জগতে পাওয়ার মত পাওয়া তাহাকেই বলা যায়, যাহার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। মানুষ সচরাচর পাইলেই সুখী হয়। কিন্তু যেটা সে সহজেই পায়, সেই ক্ষুদ্র প্রাপ্তির যে সুখ, সে সুখের মধ্যে আমার স্বার্থ সিদ্ধির অহঙ্কার পুঞ্জীভূত হইতে পারে। সে আমার গর্বের জিনিস হইতে পারে। কিন্তু সেই প্রয়োজন সিদ্ধির সংকীর্ণ সুখে আমার অন্তরাত্মা কখনই ভরিতে পারে না। সে চাহে কোন মহত্তর আনন্দ। আমার চেয়ে যে বড়, তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনে যে সুখ, যে তৃপ্তি, তার মধ্যে সেই অখণ্ড আনন্দের সুরটী চিরন্তনের বীণার তারের মত অহরহ বাজিয়া আছে। তাই এই আনন্দযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া ভক্ত নিজের আনন্দকে অক্ষয় করিয়া লইতে পারেন।

অনুরূপা দেবী

পূজো এলো

—বেলা দে

ভাদ্রমাস পড়লেই বাঙালী হিন্দুর জীবনে নানা দিক দিয়ে একটি কেমন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। অনেকে ভাদ্রমাসকে তাই সোনার মাস, লক্ষ্মী মাস বলেন। শ্রাবণের মাসেই মা দুর্গা আগমনের কাজেই সারা বছরের নানা দুঃখ কষ্ট অভিযোগ অনুযোগ ভুলে একটু আমোদ আহ্লাদে কাটাতে চায়। এই সময় তার ঘর বাড়ী পরিষ্কার করা, ছেলেমেয়েদের নতুন কাপড় জামা জুতো কিনে দেবার তাড়া, গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষপত্র, বাসন কোসন, ঘরা কুলো, চৌকী আলমারী, সব ঘুরে মুছে পরিষ্কার করবার জন্য একটা ব্যস্ততা দেখা যায়। এক কথায় সর্বত্র একটা অপূর্ব সুন্দর শুচিতা, প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায়।

এইসময় বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অপরূপ। নির্মেঘ সুনীল আকাশ তলে নদী নালা স্বচ্ছ সলীলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাঠে মাঠে নবযুব ধানের ক্ষেতে নদীর কাশবনে হিল্লোল জাগে, আলো ছায়ায় লুকোচুরি চলে; জলে স্থলে শিউলি কি এক প্রাণ মাতানো সুগন্ধই না ছড়ায়।

"মাতার কণ্ঠে শেফালি মালা গন্ধে ভরিছে অবনী।
অম্লহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র ফেন সে নবনী।
পড়েছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে দাঁড়ায়েছে মোর অবনী,
আলোকে শিশিরে কুসুমে মাখা হাসিছে নিখিল অবনী॥

বাঙালী প্রকৃতির এই মনোরম পরিবেশের মাঝে তার সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়।

সহরে পাড়ায় পাড়ায় এই সময় পূজোর ধুমধাম লেগে যায়। আর গ্রামের দুর্গোৎসব আনন্দঘন, প্রীতিঘন বৃহৎ এক সামাজিক সম্মেলন। এ পূজায় সত্যিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

আশ্বিন মানে পূজার পূর্বে বাঙালী মাত্রা পিতার চিত্তে আর একটি বাসনা প্রবল আকারে দেখা দেয়। সেটী হ'ল কন্যাকে স্বামীগৃহ থেকে বছরে অন্ততঃ একটি বার পিত্রালয়ে আনবার এই বাসনা। বাঙালী কবি শিব, দুর্গা, উমা, গৌরি, মেনকা প্রভৃতি পৌরাণিক নামের অন্তরালে বাঙালীর ঘরের বাস্তব চিত্রটিই রূপায়িত করে তুলেছেন। উমা জননী মেনকা কন্যা বিরহকাতরা সমস্ত বঙ্গজননীর স্নেহ ও বাসনা ব্যাকুলতার প্রতিমূর্তিরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আশ্বিনের আহ্বান তাই মনে পড়িয়ে দেয়—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী উমা কেমন রয়েছে
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে মা মা বলে উমা কেঁদেছে।

এই সব চিরপরিচিত আগমনী গান তাদের স্নেহরস দূরে পরিহার করে আমাদের একান্ত আপনের ঘর আমাদের ও কন্যারূপে দেখা দিয়েছেন। আর উমা জননী মেনকা কন্যা বিরহকাতরা সমস্ত বঙ্গজননীর স্নেহ ও বাসনা ব্যাকুলতার প্রতিমূর্তি রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন।

তাই আশ্বিনের আগমনে বাঙালী একবার ভুলতে চেষ্টা করে তার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দৈন্য; একবার খেড়ে মুছে ফেলতে চায় তার লাঞ্ছনা বছরের অশান্তি দুঃখ বেদনার কথা। মায়ের কাছে সে প্রার্থনা জানায় ধন জন ঐশ্বর্য্য সম্মান, প্রতিপত্তি, স্বাস্থ্য, সুখ, আনন্দ। মায়ের কাছে সে মোক্ষ চায় না—চায় সত্যিকার মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে।

এ তো গেল আসল দুর্গাপূজাকে আমরা কেমন করে আহ্বান জানাব তারই কথা কিন্তু আশপাশে চেয়ে দেখুন, ছাত্র মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও অন্যান্য সহরের দোকান পত্র গুলো আলোয় ঝলমল করছে কেনাকাটার ধুমও লেগেছে। বিশেষ করে কাপড়জামা তৈরী পোষাক আর জুতো কেনার সবচেয়ে বড় উপলক্ষ এই সময়। কত রকমের শাড়ীর নামকরণ হয়েছে, ছেলেদের ও জামা প্যান্টের কত নতুন নতুন নাম। যার যা সাধ্য তাই সম্বল করে ছেলে মেয়ের হাত ধরে একটির পর একটি দোকান ঘুরে কিনিস কিনতে সুরু করে দিয়েছেন। অনেকের পক্ষে সাধ্যির সঙ্গতির মধ্যে থেকেও পূজায় করতে হচ্ছে। উপায় নেই দীর্ঘকালের ঐতিহ্য পরম্পরায় এই রকমই চলে আসছে। বাজার হয় চড়াই থাকুক, নরমই হোক এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা কোন বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই তো কয়েকদিন আগের কথা ফুটপাত দিয়ে চলেছি বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাদের বাবা পুজোর জামা কাপড় কিনতে বেরিয়েছেন—কানে ভেসে এলো আট নয় বছরের একটি ছেলের কথা বাবা আমাকে টেরিলিনের একটা সার্ট কিনে দাও না সবাই পরছে। ভদ্রলোক হন্ হন্ করে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এগিয়ে যেতে বললেন আর টেরিলিন পরতে হবে না গেরস্থ ঘরে আবার ও সব কি? ছেলেটি তখনো কাঁদতে কাঁদতে বায়না করতে করতে চলেছে দাও না বাবা একটা কিনে। বুঝলাম সত্যিই ভদ্রলোকের সঙ্গতি থাকলে কিনেই দিতেন। পুজোর আগে এমন কত আদর আবদারই তো ছেলেমেয়েরা করে থাকে, পক্ষে সম্ভব তিনি অবশ্যই সে সব পূরণ করেন আর বাকীদের অবস্থা বেশীর ভাগই এমনি।

আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সুজলা আর সুফলারূপে, শস্যশ্যামলা আর মলয়জশীতলারূপে। এই রূপ ও উৎসবের রূপ। পরিপূর্ণতাই উৎসব। দুর্গোৎসব সেই পূর্ণেরই প্রকাশ। যাঁরা ধার্মিক তাঁদের কাছে এই উৎসব গভীর ধর্মপ্রেরণার উৎস। আর যাঁরা শুধু সামাজিক মানুষ তাঁদের কাছে এই উৎসব, আনন্দের তাঁদের বন্ধনা মানব বন্ধনাতেই সুন্দর। এই দুই রূপেই দুর্গাপূজা আবহমান কাল থেকে মানুষের কাছে নন্দিত।

এই অভাব অনটন জর্জরিত দেশের মানুষের মুখে আবার হাসি ফুটুক। বাংলার ঘরে ঘরে শারদোৎসবের আনন্দ চিরস্থায়ী হোক॥

আমাদের সমস্যা

আমার মনে পুরনো চিন্তাধারা ছাড়া কখনও বৃহত্তর সাফল্য সম্ভব নয়। ছোট ছোট চিন্তাগুলোকে এক করা গেলেও পূর্ণতর উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায় না। চিরকাল কিন্তু এমনটা ছিল না—বরং পুরনো চিন্তাধারার বিকাশে আমাদের আত্মিক সম্পূর্ণতা ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যুগ বদলেছে। তাই পরিবর্তনের এই স্বাক্ষরটুকু ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সর্বাঙ্গে। আজ আমরা যা ও দেখছি, কালের বিধানে হয়তো ততটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ নতুন পরিবর্তনের ধাক্কাটা যে বাবা দিক থেকে এসেছে। সবকিছু জানিয়ে আজ শুধু আমরা ভাবছি যে কি ছিলাম কি হয়েছি। এবে কত বড় আপশোষ তা ভুক্তভোগীরাই বুঝবেন। অবশ্য ঠিক পরিতাপ করে লাভ নেই—সুস্থ মন নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গণতন্ত্রতীর মহিলা মজলিসে আমরা যে আমাদের সমস্যা বিভাগটীর প্রবর্তন করেছি। তাতে ইতিমধ্যে বহু সমস্যা জড়িত চিঠিপত্র আমরা পাচ্ছি—কারুর কারুর চিঠি পড়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—আবার কারুর কারুর চিঠি পড়ে তাঁদের অভিভাবকদের উপর দুঃখ অভিমানও আসে। এই যে অসময়ে এইসব ছোট ছোট ফুলগুলি প্রকৃত শিক্ষা ও শালীনতার অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে এর জন্য দায়ী কে? সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, না গৃহের পরিবেশ? এই সংখ্যায় যে দুখানি চিঠি প্রকাশ করছি তা থেকে সেই ধারণাই হচ্ছে—

শ্রদ্ধেয়া বকুলদি—

কি ভালই লাগে যখন গণতন্ত্রীতে মেয়েদের নানা রকম সমস্যা নিয়ে আপনারা আলোচনা করেন। কি জানি কেন আজ আমার বহুদিনের এক গোপন সমস্যার কথা উল্লেখ করছি—একদিন যার জন্যে গৃহত্যাগ করেছিলাম। আজ সমাজের বুকে যখন দেখি কত পাপ নীরবে মানুষ মেনে নিচ্ছে, প্রতিবাদ এলেও তাকে দাবিয়ে দিচ্ছে যুগের হাওয়া বলে, তাঁরা অনেকেই আজ সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এতটুকুও ভয় পায় না! কিন্তু আমার কেন এমন হল? আমি কেন এ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলাম না আজ তাই ভাবি! আমার এখন প্রায় বাহান্ন বছর বয়স, আজ এই বয়সে নিজের জন্য কোনো আবেদন নিয়ে আসিনি—পরবর্তী জীবনে আমার মত যারা ভুল করবে, সমাজ যেন তাদের দূরে সরিয়ে না দেয়। আমার তখন বয়স মাত্র পনেরো বছর। আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ: সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব—বাবা একজন মাষ্টার রাখলেন যাতে আমি একবারে পাশ করতে পারি। মাষ্টারমশাইয়ের বয়স তখন খুবই অল্প, বোধহয় তিরিশ হবে। খুব যত্ন করে পড়াতেন আমায়। প্রায়ই দেখতাম পড়ার পর উনি আমায় নানা রকম ভালবাসার কথা শোনাতেন। একদিন আমায় বললেন, চল মাঠে বেড়াতে যাই, যাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি রাজী হয়ে আমাদের নেতে

বললেন। এইরকম প্রায়ই যেতাম—এমনিকরে আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এসে পড়লো—পড়াশুনার চেয়ে নানারকম গল্পগুজব করতেই আমার বেশী ভাল লাগত। যাই হোক্ একদিন মাষ্টারমশাই আমায় বললেন, চল আমাদের দেশের বাড়ীতে বেড়িয়ে নিয়ে আসি—বাবা মাকে কিছু বলোনা—সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। কিন্তু সে কি ভয়ানক ব্যাপার! মাষ্টার মশাই হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনের টিকিট কেটে কোথায় যে আমায় নিয়ে চললেন জানতেও পারলামনা—ট্রেন ঝ ঝ শব্দে ছুটে চলেছে! দুজনে নীরব। তারপর পশ্চিমের একটা ছোট্ট স্টেশনে নামলাম—একখানা একতলা বাড়ীর অন্তরায় একটা ঘরে আমাদের বাকি থাকতে হবে এবং পরিচয় স্বামী স্ত্রী। কি জানি কেন, অল্প বয়সের চিন্তা এতই ক্ষণস্থায়ী যে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। কিছুদিন এই ভাবেই বেশ কাটল। কিন্তু একদিন জানতে পারলাম আমি সন্তান সম্ভবা। উনি আমায় খুব ভালভাবে দেখাশোনা এবং যথা সময়ে আমাকে ওখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। আমি একটি সন্তান প্রসব করলাম। সেইদিন বাবুর মত অশান্তি। উনি বললেন, আমাদের এ সন্তান অবৈধ—কাজেই তুমি যদি একে নিয়ে থাকতে চাও তাহলে আলাদা থাকতে হবে। আমি তো অবাক! কোনো উপায় নেই দেখে পশ্চিমের একটি বাড়ীতে সামান্য চাকুরী নিয়ে সেখানে রয়ে গেলাম। উনি প্রথমটা খোঁজ খবর নিতেন তারপর কোথায় গেলেন কিছুই জানতে পারলাম না। —আমার ছেলেটি বড় হতে লাগল, কাজেই তাকে নিয়ে বড় গোলমাল বাধল। নিজেকে বিধবা সাজিয়ে সংসারে চলাফেরা করতে লাগলাম। অসহায় আমি! সমাজের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলাম না, সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আজো বেঁচে আছি। আমার যখন কোন পরিচয় নেই, তখন আমার সন্তানেরও পরিচয় কোথায়? লেখাপড়া শিখেছে, নিজের সামর্থ্য দিয়ে ওকে মানুষ করে তুলছি—বেঁচে আছি ঠিকই কিন্তু কেমন করে আছি সে কথা লিখে জানাবার নয়। আমি ভুল করেছিলাম আজো তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। আমার মতো ভুল যারা এখন করবে তারা হয়তো আমার মত কষ্ট পাবে না, কারণ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখতে পাচ্ছি সমাজের রূপ অনেক বদলে গেছে—ভাল কি মন্দ জানিনা তবুও বলব যারা আমার মত ভুল এখন করছে তারা বেশ সহজেই সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।—তবুও বলব ভুল করলেও আমার মত আর একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেন তারা সংসারে না আনে এই মিনতি করি।—

ইতি—

সুজাতা।—

সুজাতার মত বহু মেয়েই একদিন অপরিণত বয়সে এমন ভুল করছে। তখন সমাজ তাদের ক্ষমা করত না—সেই ভয়ে তারা সমাজের আড়ালে থাকত। কিন্তু আজকের সমাজের রূপ যে ভাবে বদলে যাচ্ছে তাতে এমন সব ভুল হামেশাই হচ্ছে—আর সে ভুল ইচ্ছাকৃত—তারা সমাজ মানে না। কিন্তু একটি কথাই শুধু বলি—আজকের শিক্ষা জীবনের উন্নতি না হলে সমাজকে কেউ মানবে না —শিক্ষাই মানুষের মনকে উন্নত ও পবিত্র করে। শুধু হাতে ক'খানা বই নিয়ে কলেজের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেই শিক্ষালাভ করা যায় না। সুশিক্ষাই মানুষের রুচিকে বদলে দেয়:—আজ যখন চারিদিকে চেয়ে দেখি তখন বার বার মনে হয় আমরা যেন কোন অজানার পিছনে ছুটে চলেছি—এর শেষ কোথায় কে বলবে?

নতুনদি

দায়ী কে ?

বেলা দেবী

একই পাড়ায় থাকতাম আমরা, আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলির মুখ যেখানে বড় রাস্তায় মিশেছে তারই সংযোগস্থলে অঞ্জনাদের বাড়ীটা। আমরা দুজনেই কলেজে পড়তাম কিন্তু এক কলেজে পড়তাম না। আমি পড়তাম ভিক্টোরিয়াতে, অঞ্জনা লেডি ব্রাবোর্ন-এ। আমার এবং অঞ্জনার মধ্যে অবস্থাগত ব্যবধান অনেক ছিল। অঞ্জনাদের নিজস্ব বিরাট বাড়ী। আমাদের ছিল আড়াই খুপরির ভাড়া বাড়ী, অঞ্জনার বাবা বড় এক ইঞ্জিনিয়ারিং কার্মের মালিক, আর আমার বাবা নিতান্তই একজন আপার ডিভিসন ক্লার্ক। অঞ্জনারা দুইভাই এবং একমাত্র বোন অঞ্জনা। ওর দাদারা দুজনেই কৃতী। আর আমরা ভাই বোন সর্বশাকুল্যে সাতজন, চার ভাই তিন বোন। সবাই এখন ও ইস্কুল কলেজের চৌহদ্দিতেই ঘুরছে। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্বেও অঞ্জনার সঙ্গে হৃদ্যতা হতে আমার বাধেনি; তার কারণ অঞ্জনার মনে অহঙ্কার বস্তুটি মোটেই ছিল না। তার ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিক, আসতে যেতে দেখতে পেতাম অঞ্জনা হয়তো তাদের বাড়ীর জানালায় বা বাইরের বারান্দায় দাঁড়ানো। দেখলেই হাসিমুখে দুটো কথা বলা চাইই, কোনদিন তার ব্যতিক্রম হতো না।

বোনেদের মধ্যে আমি-ই ছিলাম বড়, কাজেই মা বাবা একটু তাড়াহুড়ো করেই আমার বিয়েটা দিয়ে দিলেন, তাদের যুক্তি—পরে আরও দু'টিকে পার করতে হবে তো।

মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসতাম, গলির মুখে অঞ্জনার সঙ্গে তেমনি দেখা হতো। সে হেসে বলত—কেমন টুক্ করে তোমার বিয়েটা হয়ে গেল বুঝা। আগেভাগে একবিন্দুও জানতে পারলাম না। আমি ও হেসে জবাব দিতাম—কি করে জানবে বল। বেহাৎ সাদামাঠা বিয়ে, তিনি বার শাঁখে ফুঁ দিয়ে—ব্যাস্—হয়ে গেল বিয়ে, এ কি তোমার বিয়ে! সে যে কি একখানা ব্যাপার হবে তা আমি এখন থেকেই কল্পনা করতে পারছি, সানাই বাজি বাজনা, সারা কলকাতা সরগরম। আকাশ অবধি রোসনাই।

অঞ্জনা হাসিমুখে চুপ করে থাকত। কারণ সে জানত আমি যদিও তাকে ঠাট্টা করে বলছি তবু কথাগুলো ঠিক, তার বিয়েতে এমনি আড়ম্বরই হবে।

তারপর দিনের পর দিন গড়িয়ে গেছে, বছরের পর বছর, আমার তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, অঞ্জনা এম, এ, পাশ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। যখনই বাপের বাড়ী এসেছি শুনেছি অঞ্জনার বিয়ের খুব তোড়াজোড় চলেছে, অনেক পাত্র আসছে আবার বাতিলও হয়ে যাচ্ছে, আমি মা'কে একটু আড়ালেই শুনিয়ে দিয়েছি—হবেনা।

দশটা দেখবে শুনবে যাচাই করবে তবে তো মেয়ের বিয়ে দেবে। এ কি তোমাদের মেয়ে বিয়ে দেওয়া! যাকে হোক টুক করে ধরে দিলুম ঝুলিয়ে। অঞ্জনাকে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি টানা টানা দু'চোখের নরম দৃষ্টি মেলে, কোঁকড়া চুলের রাশ পিঠের উপর এলিয়ে। কর্মা কপালে কুমকুমের টিপ এঁকে, দেখা হলেই মুখখানিতে স্নিগ্ধ হাসির কুঁড়ি ফুটিয়ে আন্তরিকতা দেখিয়েছে অঞ্জনা বরাবরের মতই।

তারপর নিজের সংসারের জালে ক্রমেই জড়িয়ে পড়েছি, ছোটখাট নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নানা সাফল্যের মধ্য দিয়ে জীবনের অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছি, আশেপাশের নানা ঘটনা নানা দৃশ্য হয়ত চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে কিন্তু তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম আমার বড় মেয়ের সেটা ফুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার বছর—আর অঞ্জনা তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে উদাস চোখে গলির আকাশ দাঁড়িয়ে দেখছে।

অনেকদিন পর সেদিন অঞ্জনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। অঞ্জনা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম দু'জনে। একথা সেকথার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অঞ্জনা কিছু মনে করো না, বলত, এখনও বিয়ে করলেনা কেন?

অঞ্জনা হেসে বললে—হলো না, কি করব।

যা, হলনা কি রকম। তোমার মত মেয়ের পাত্রের অভাব, মা বাবার একমাত্র মেয়ে। এমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ, অত বিদ্যে; বাবার প্রচুর পয়সা, পারিবারিক গৌরব, কোনটার অভাব তোমার, যার জন্য বিয়ে হলো না।

অঞ্জনা মৃদু হেসে বলল ঐজন্যেই তো মুস্কিল হলো—এমন মেয়ের উপযুক্ত পাত্র না বাবা বাংলা দেশে খুঁজেই পেলেন না। মনের মত এমন কাউকে পেলেন না প্রাণ ধরে যার হাতে মেয়ে তুলে দিতে পারেন।

কেন ভাই, তোমার তো ভাল সম্বন্ধ এসেছিল বলে শুনেছি। সেইযে টালিগঞ্জের ডাক্তার পাত্রটি।

তার মাথায় টাক ছিল বলে মা'র পছন্দ হল না।

আর সেই যে শ্যামবাজারের ইঞ্জিনিয়র পাত্র?

ভদ্রলোকের মাথার উপর চার চারটে অবিবাহিতা বোনের দায়িত্ব ছিল বলে বাবা কিছুতেই মত দিলেন না।

আর বরানগরের সেই পাত্র। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করত।

কলকাতার বাইরে থাকা মা বাবা পছন্দ করেন না, তাছাড়া তাদের নিজেদের বাড়ী ছিল না, ফ্ল্যাট-বাড়ীতে থাকত।

একবার যেন শুনেছিলাম—কানপুর থেকে একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছিল।

এতদূরে আমাকে দিয়ে মা বাবা থাকতে পারবেন কেন? আমি যে তাদের একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া অতদূর থেকে পাত্র সম্বন্ধে সবরকম খবরাখবর করাও তো মুস্কিল, শেষকালে কি না কি গলদ বেরোয়।

তবে টালার সেই মদন সেনের সঙ্গে হলো না কেন? ওদের তো বাড়ী ছিল গাড়ী ছিল, পাত্রও খুব উপযুক্ত, বিলেত ফেরৎ—আর তোমাকে খুব পছন্দও করেছিলেন। খুব ঝুঁকেছিলেন তোমাকে বিয়ে করার জন্য।

সবই ঠিক, কিন্তু কি একটা শোনা গেল—ভদ্রলোক বিলেত থাকতে নাকি এক মেম বিয়ে-টিয়ে সব—তাই মা বাবা পিছিয়ে গেলেন।

বল কি অঞ্জনা, এযে রোমাঞ্চকর খানি। আচ্ছা, তোমার ও কি এর মধ্যে কাউকে পছন্দ হয়নি?

কই, কাউকে তো তেমন খারাপও লাগেনি। এমন কি, সেই টাক মাথাকেও না।—অঞ্জনা একটু হাসল।

তা তুমি জোরজার করে ওদের মধ্যে একজনকে বিয়ে করে নিলেই পারতে।

বল কি! মা বাবার অমতে যা বাবাকে দুঃখ দিয়ে! তাদের যদি আরও দু'একটি মেয়ে থাকত তবুও না নয় কথা ছিল, কিন্তু এক মেয়ে হওয়ার দায়িত্ব অনেক বড়। এতখানি ভালবাসাকে আঘাত করা যায় না।

তাই বলে এমনি করে জীবন কাটাবে।

উদাস হাসল অঞ্জনা—একটাই তো জীবন। ঠিক কেটে যাবে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। একটু পরে বললাম—না অঞ্জনা, সে কোন কাজের কথা নয়। এবার তুমি বিয়ে কর।

সে হাসল—ঠাট্টা করছো।

আমি ব্যাকুল হয়ে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললুম—না না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। হলোই বা একটু দেরী, বাংলাদেশে বরস্থ পাত্রও অনেক মেলে।

অঞ্জনা আমার মুখের উপর করুণ দৃষ্টি ফেলে আস্তে বললে—আমার দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখো তো ভাই। তাহলে কি জীবনটাকে নিয়ে চরম বিদ্রূপ করা হবে না?

আসতে যেতে দূর থেকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে অঞ্জনাকে দেখেছি। এবার কাছে বসে যেন ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম—মেখে মেখে অনেক বেলা হয়ে গেছে। অঞ্জনার মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সর্বাঙ্গে মোটার আধিপত্য।

বাড়ী ফেরার পথে মনে মনে ভাবলুম—অঞ্জনার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? একটা সম্ভাবনাময় বসন্তকে ফুলে ফলে বিকশিত হতে না দিয়ে, সার্থক হতে না দিয়ে কে তাকে ঠেলে ঠেলে ধূসর চৈত্রের মধ্যে পৌঁছে দিল? অন্ধ স্নেহ? অতিরিক্ত উদ্বাসিকতা? অর্থহীন আত্মম্ভরিতা? কি সে? কি?

অন্ধের মন্দির

পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

—দশ—

ওয়ালটেয়ার থেকে আবার আমরা মাদ্রাজ মেল ধরলুম। মামা আমাকে তাঁদের গাড়িতে উঠতে বলেছিলেন। আমি রাজী হইনি। বলেছিলুম এ বিলাস আমার সাজে না।

মামা বলেছিলেন এতো বিলাস নয়, শুধু শুধু কেন কষ্ট করবে।

আমি আর অপেক্ষা করিনি। সরে এসেছিলুম দরজার সামনে থেকে।

প্লাটফর্মে ভিড় বেশি ছিলনা। যে যাত্রীরা ওয়ালটেয়ারে নেমেছে, তারা বেরিয়ে গেছে বাইরে। আর যারা এই ট্রেনে যাবার জন্যে এসেছে ইতিমধ্যেই তারা স্থান করে নিয়েছে ভিতরে। শুধু কিছু দূরের যাত্রী প্লাটফর্মে বসে ইতস্তত ঘুরে, বেড়াচ্ছে কোন প্রয়োজনে অথবা শুধু ঘুরে বেড়াবার জন্য। আর কিছু রেলের কর্মচারী ও রিফ্রেশমেন্ট রুমের বেয়ারা ছুটাছুটি করছে। নিজের জন্যে একটু জায়গা খুঁজে নিতে আমি এগিয়ে গেলুম।

এই যে, গোপালবাবুও যাচ্ছেন এই গাড়িতে?

বলে শ্রীনিবাসুলু এলেন এগিয়ে।

প্রথমটায় আমি চমকে উঠেছিলুম, তারপরে একটা নমস্কার করলুম।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: মৈত্র মশাই এই গাড়িতে উঠেছেন, আসুন। বলে একটা তৃতীয় শ্রেণীতে আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন।

মৈত্র মশাই এবারেও একটা কোণ অধিকার করে বসেছিলেন। গভীর মনোযোগে লাগাচ্ছিলেন মুখের পাম। চুনের মাপটা ঠিক হবার পর অতিরিক্ত চুনটা বাইরে ফেললেন, আর দেখলেন একগাল পিক্—চুণ খয়ের আর জর্দার মেশা লালচকটকে নির্যাস খানিকটা। মুখটা একটু হাল্কা হতেই বললেন: আসুন আসুন, আপনার কথাই আমি ভাবছিলুম।

বলে নিজের পাশে একটু জায়গা দিলেন বসতে।

গাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। বেশী যাত্রী নেই বলে সবাই বসছে পা ছড়িয়ে খুব ঘুরে। আমিও বসলুম জানালার ধারে।

শ্রীনিবাসুলু বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বললুম: আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?

শ্রীনিবাসুলু হেসে বললেন: সঙ্গীতো জুটিয়ে দিলুম আপনাকে।

বললুম: তা দিলেন ঠিকই। কিন্তু সবাই তো আপনার মতো সঙ্গী নন। আপনার মতো ভূগোল আর ইতিহাস জানেন কজনে!

মৈত্র মশাই বললেন: ঠিক বলেছেন আপনি। উনি না বললে এমন একটি সুন্দর মন্দির আমাদের দেখাই হ'ত না।

আমি বললুম : এই রকমের মন্দির আর কোথায় আছে, তাই কি জানা যাবে।

শ্রীনিবাসলু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল ট্রেনের। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল। যে দিক থেকে আমরা স্টেশনে ঢুকেছিলুম সন্তকাল, সেইদিকেই বেরিয়ে এলুম। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিদায় নিলুম শ্রীনিবাসলুর কাছে।

মৈত্র মশায়ের অন্য ধারে এধারে একজন ছিপছিপে অল্প বয়সের ভদ্রলোক বসেছিলেন। ওয়ালটেয়ার থেকেই তিনি উঠেছেন মনে হল। জিনিসপত্র ওদিকে রেখে পকেট থেকে তিনি একখানা বই বার করলেন।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল অনেক পরে। পিঠাপুরম নামে একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই মৈত্র মশাই জিজ্ঞাসা করলেন : এই সেই জায়গায় নাকি ?

আমি বললুম : জানিনে।

ভদ্রলোক এই কথারই উত্তর দিলেন ইংরেজীতে, বললেন : পিঠাপুরমই পাদগয়া। গয়াসুরের গল্প জানেন তো ?

মৈত্র মশাই আমার দিকে চেয়ে বাংলায় বললেন শ্রীনিবাসলুর কাছে শুনেছি।

ভদ্রলোক তাই তার সে গল্প আমাদের বললেন না, কিন্তু আরও কয়েকটি তীর্থ স্থানের কথা শুনলুম তাঁর কাছে। ভদ্রলোকের নাম রাজলু, তিনি রাজমন্ত্রী যাচ্ছিলেন। বললেন, আপনারা তীর্থযাত্রী বলেই বলছি' রাজমন্ত্রীতে নেমে কয়েকটা তীর্থ স্থান দেখে যান।

মৈত্র মশাই বললেন : একটা তীর্থেও তো নামা শুনিনি।

আমি বললুম : আমরা তো নামতে পারবনা, আপনার কাছেই কিছু জেনে নিই।

রাজলু বললেন : মন্দির নেই এমন স্থান অল্প কম আছে। রাজমন্ত্রীতেই আছে মার্কণ্ডেয় ও কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির। কিন্তু তার চেয়েও বিখ্যাত মন্দির আছে কাছে—কোটিপল্লী দ্রাক্ষারাম ও ভদ্রাচলমে। গোদাবরী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেইখানেই কোটি পল্লী। কেউ রাজমন্ত্রী থেকে যায়, কেউ যায় কাকিনাডা থেকে। শিবরাত্রির দিনই সবচেয়ে বেশি যাত্রী সেখানে যায়।

আমি বললুম। নিশ্চয়ই শিবের মন্দির ?

রাজলু বললেন : সোমেশ্বর স্বামী শিব, পার্বতীর নাম রাজরাজেশ্বরী আম্মাভরু। অতি প্রাচীন কালেও কোটিতীর্থ নামে এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। গোদাবরী ও কোটিতীর্থের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই তীর্থে শাপমুক্ত হয়েছেন এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অনেক মানুষও নিরাময় হয়েছে।

আমি প্রশ্ন করলুম : কোটিতীর্থ নাম কেন হল ? একি অনেকগুলি পল্লীর সমষ্টি ?

রাজলু বললেন : পল্লীর মানে এখানে গ্রাম নয়, পল্লী ধ্বনি শব্দের রূপান্তর। ধ্বন থেকে ধ্বনি। একটি পুণ্যের এখানে এককোটি ধ্বন হয়, নাম তাই কোটি ধ্বনি।

রাজলু বললেন : দ্রাক্ষারাম শব্দেরও এমনি একটি মানে আছে। দ্রাক্ষা মানে আঙুর নয়, দক্ষ আরাম মানে বাগান। পুরাকালে এইখানে দক্ষ প্রজাপতির বাগান ছিল বলে এই স্থানকে দক্ষ তপোবন বা দক্ষ বাটিকা বলত। দক্ষ প্রজাপতি কে জানেন তো ?

বলে রাজলু মৈত্র মহাশয়ের দিকে তাকালেন।

মৈত্র মশাই আমার দিকে চেয়ে বললেন : দক্ষযজ্ঞের কথা শুনছি। কিন্তু দক্ষযজ্ঞতো হরিদ্বারে হয়েছিল।

রাজলু বললেন : একদিন মানুষের বিশ্বাস যে ভক্তরক্ত এইখানে ঝরেছিল। দ্রাক্ষারামে গেলেও আমি দক্ষের তপোবন দেখতে পাবো। অনেকে আবার এই জায়গাকে দক্ষিণ কাশী বলেন। ভীমেশ্বর স্বামীর যে মন্দিরের জন্য দ্রাক্ষারাম এখন বিখ্যাত, অনেকের ধারণা যে বেদব্যাস স্বয়ং এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আর সাধারণ লোকের ধারণা যে সূর্য নিজে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শিব এখানে স্বয়ম্ভূ। লিঙ্গমূর্তিতে ভীমেশ্বর নামে প্রকাশিত হন। সপ্তশাখায় বিভক্ত হয়ে গোদাবরী বয়ে পড়েছে সপ্ত গোদাবরীতে সপ্ত ঋষির বাস—কশ্যপ অত্রি গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্য ও বশিষ্ঠ। সপ্ত গোদাবরীর জলে শিবের অভিষেক করবেন বলে এই ঋষিরা স্থির করলেন ও জল আনতে গেলেন। কেবার পথে তাঁরা কৃশ্য মহর্ষির দেখা পেলেন। তিনি তাঁর আশ্রমে যজ্ঞ করছিলেন। তিনি বললেন যে সপ্ত গোদাবরীর জলে তাঁর আশ্রম ভেসে যাবে ও যজ্ঞ নষ্ট হবে। সেই জন্যে তিনি সমস্ত ঋষিকে বাধা দিলেন। এই সময়ে বেদব্যাস এসে উপস্থিত। তিনি বললেন যে, কোন ভয় নেই, দ্রাক্ষারাম সপ্তগোদাবরী অন্তর্বাহিনী হয়ে আসবে। মাটির নিচে দিয়ে হবে প্রবাহিত। এই কথায় বিবাদ মিটল। সপ্তগোদাবরী হল একটি পুষ্করিনী। কিন্তু ঋষিরা সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌঁছতে পারলেন না। তখন সূর্য নিজেই শিবের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

এই লিঙ্গমূর্তি সম্বন্ধে আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে। সূর্য যে লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন, তা অতি বিরাট ছিল। সপ্ত ঋষি তাঁর পূজো করতেন। একদা এই লিঙ্গটি ভেঙ্গে পাঁচ টুকরো হয়ে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই পাঁচটি জায়গাতেই শিবের পূজো হচ্ছে—ভীমা ভরম পালকর, অমরাবতী কোটিপল্লী ও দ্রাক্ষারামে।

আমি বললুম : অদ্ভুত গল্প।

রাজলু বললেন : ঐতিহাসিকেরা কিন্তু এই গল্পের একটা অর্থ খুঁজে বার করেছেন। একদা এই অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল এবং অনেক জায়গাতেই এখনও চৈত্য ও স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই এই সব স্তূপের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এতে বুদ্ধের জীবনের পাঁচটি ঘটনা বোঝাবার জন্য পাঁচটি স্তম্ভ থাকত। প্রথম ঘটনা হল জন্ম দ্বিতীয় মহা নিষ্ক্রমণ, তার মানে সংসার ত্যাগ। তৃতীয় ঘটনা সম্বোধি, তার মানে পূর্ণ জ্ঞানলাভ। চতুর্থ ধর্মচক্র প্রবর্তন, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের আরম্ভ। আর পঞ্চম মহাপরিনির্বাণ। আমরা যাকে মৃত্যু বলি।

আমি আশ্চর্য হলুম এই যুক্তি শুনে। আর মৈত্রমশাই বিহ্বল ভাবে তাকালেন রাজলুর দিকে। রাজলু বললেন : হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভের সময় অনেক বৌদ্ধ চৈত্য হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়েছে এবং অনেক বৌদ্ধ স্তম্ভ হয়তো শিবলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। শিবের লিঙ্গ মূর্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবার অর্থ বোধহয় কোন চৈত্যের পাঁচটি স্তম্ভ পাঁচ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবার ফলক।

একথা আমার কাছে একেবারে নূতন হলেও বললুম : অসম্ভব নয়।

মৈত্রমশাই এবারে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্রাক্ষারাম কোথায় ?

রাজলু খুশী হলেন, বললেন, রাজমন্ত্রী, কাকিনাডা কোটিপল্লী আর দ্রাক্ষারাম সবই কাছাকাছি। লোকে বাসে যাতায়াত করে। ঘুরে হল ভরাবলম।

আমি প্রশ্ন করলুম : আপনি দ্রাক্ষারামে গেছেন ?

রাজলু হেসে বললেন : দ্রাক্ষারামে গেলে শুধু ভীমেশ্বর মন্দির দেখেই ফিরে আসবে না, ঘুরে ঘুরে আরও মন্দির দেখবেন। শঙ্কর নারায়ণের মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, নব গ্রহ ও অষ্টদিকপালের মন্দির। দ্রাক্ষারামের মন্দিরে যত শিলালিপি আছে তত আর কোথাও নেই। একজন নাকি গুণে দেখেছেন যে সবশুদ্ধ

ভিতরে একটি শিলালিপি আছে। তার থেকেও জানা যায় যে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। মন্দির, স্থাপত্যে চোল ও চালুক্য শৈলী আংশিক সুন্দর ভাবে মিলিত হয়েছে।

আমি বললুম: আর কিছু দেখবার নেই?

রাজলু বললেন: আছে। একজায়গায় ওলন্দাজের ছটো কবর ওলাও ভিক্ষা দেখবেন। আর দেখবেন সৈয়দ শাহ তাজি আউলিয়ার কবর ও মসজিদ। এই মুসলমান ফকিরকে নিয়েও একটি গল্প আছে।

রাজলু আমাদের এই গল্পটিও বললেন।

পাঁচশো বছর আগে এই মুসলমান ফকির কিছু শিষ্য নিয়ে মদিনা থেকে এদেশে এসেছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণাবাদে ক্ষুধার জ্বালায় তাঁরা একটি শিব মন্দিরের ষাঁড় কেটে খেয়ে ফেলেন। এই নিয়ে সেই শৈব মঠের লোকজনের সঙ্গে প্রবল বিবাদ বাধল। তার পরে কে বড় কে ছোট তার পরীক্ষা—সেই ফকির বা মঠাধিপতি। সবাই মিলে একটা শিবলিঙ্গ পুকুরে ফেলে দিয়ে বলল, যে দৈববলে ঐ শিবলিঙ্গ আনতে পারবে সেই বড়। শোনা যায় যে সেই ফকির সমাধিস্থ হয়ে একাগ্রমনে ভগবানকে ডেকে শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে সেই মঠেই বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন। মুসলমানরা এখন তাঁর কবর দেখতে যায়।

রাজলু তার পরে আন্নাভরম নামে তাঁর একটি তীর্থস্থানের কথা বললেন। সেও নিকটে। কিন্তু তার খুব নাম নেই। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে বেল্লিপি নামে একটি পাহাড়ের কোলে সত্যনারায়ণের মন্দির। জায়গাটি সুন্দর এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্যে বহু যাত্রী সেখানে যায়।

আর এর উল্টো হল ভদ্রাচলম। গোদাবরীতে বাঁধ দিয়ে সেখানে পৌঁছবার উপায় নেই। রাজমন্ত্রী থেকে প্রায় একশো মাইল পথ, স্টীমারে গেলে নাকি মাইল চল্লিশেক। উত্তর দিক থেকে খরস্রোতা গোদাবরী নৌকায় পেরিয়েও আসা যায়। সীতাহরণের পর কিষ্কিন্ধ্যা যাবার পথে রামচন্দ্র এখানেই গোদাবরী অতিক্রম করেছিলেন। কেউ বলেন, বা, রামচন্দ্র এখানে এসেছিলেন সীতা হরণের আগেই। ভদ্র নামে এক ঋষি এই পাহাড়ে বাস করতেন, তাঁর আশ্রমে কাটিয়েছিলেন কিছুদিন। ভদ্র ঋষির নামেই ভদ্রাচলম নাম।

যাত্রীরা ভদ্রাচলম যাত্রা করে বৈশাখ মাসে। অসংখ্য যাত্রী হেঁটে দণ্ডকারণ্যের ভিতর দিয়ে ভদ্রাচলমে যায়। মুলগম পাহাড় নামে এক জায়গায় গোদাবরী নদী নৌকোয় পার হয়ে ভদ্রাচলম। একটা বিশাল গোপুর দেখা যায় দূর থেকে। নদীর ধারেই মন্দির। গোটা চল্লিশেক ধাপ উঠে মন্দিরের প্রাঙ্গণ। মূল মন্দিরের চারি দিকে আরও গোটা চল্লিশেক মন্দির।

মন্দিরের স্থাপত্য দেখতে এখানে কেউ আসে না। কেননা মন্দির তত বলশূন্য তত সুন্দর নয়। সুন্দর হল বিগ্রহ। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ। বহুখানি হাতে চতুর্ভুজ রাম ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে, পাশ্বহাতে সীতারও ত্রিভঙ্গ মূর্তি। এমন সুন্দর মূর্তি সচরাচর চোখে পড়েনা, যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আমি রাজলুকে বললুম, আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই।

রাজলু বললেন: না। শুনেছি এক আত্মীয়ের মুখে। গত বছর তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে সেখানে গিয়েছিলেন।

আপনার সেখানে যেতে ইচ্ছা হলনা?

রাজলু এবারেও বললেন না। আমার দুর্গম তীর্থে যাবার বাসনা এখনও মনে আসেনা।

তারপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠার গল্প শোনালেন আমাকে।

এই অঞ্চলের একজন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখেছিল যে, বিগ্রহ মূর্তিগুলি পাহাড়ের উপরে অযত্নে পড়ে আছে। পরদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে সেগুলি দেখতে পায়। সেই প্রতিষ্ঠা করে মূর্তি। আস্তে আস্তে যাত্রীরা আসতে থাকে। একবার কবীর নামে একজন মুসলমানও আসে যাত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু পুরোহিতেরা তাকে মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা মন্দিরে ঢুকে দেখে যে মন্দিরে আর মূর্তি নেই। এই দৃশ্য যারা দেখলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন গোলকুণ্ডার নবাবের একজন কর্মচারী, নাম তার রামদাস। তিনি পুরোহিতদের বললেন, আজ ঘরের বিচার এখানে করোনা। তাঁর কথা মতো কবীরকে মন্দিরে ঢুকতে দিতেই বিগ্রহ আবার দেখা গেল।

রামদাস এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। নবাবের টাকা গোলকুণ্ডায় না পাঠিয়ে সেই টাকায় এখানে মন্দির তৈরি করে দিলেন। তারপর ধরা পড়ে তাঁর জেল হয়ে গেল। কিন্তু ভক্তের ভগবান রামদাসকে জেল খাটতে দিলেন না। রামদাসের মুক্তি ধরে গেলেন নবাবের কাছে, ফিরিয়ে দিলেন তার টাকা। রামদাস মুক্তি পেয়ে গেলেন।

রাজু বললেন : এই গল্প হয়তো আপনার বিশ্বাস হবেনা, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন যে, সেই থেকে এই মন্দিরের জন্য হায়দ্রাবাদের রাজকোষ থেকে খরচ আসত সেদিন পর্যন্ত যখন কুড়ি হাজার টাকা হায়দ্রাবাদের নিজাম দিয়ে গেছেন। মুসলমানের টাকায় হিন্দুর মন্দির পরিচালনার নজির আর আছে কিনা আমি জানিনে।

আমিও জানিনা।

রাজমন্ত্রীতে রাজু নেমে গেলেন। আর ভুরোগ বিস্ফারিত করে মৈত্র মশাই বললেন, আশ্চর্য!

কোন প্রশ্ন না করে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মৈত্র মশাই বললেন : অন্ধ্রের মানুষগুলো কত ভালো দেখলেন! ইতিহাস ভূগোল সব গুলে খেয়ে রাখে দেখছি।

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই স্বাতিকে দেখতে পেলুম জানালায় দাঁড়িয়ে। নেমে পড়লুম তখনই।

স্বাতি বলল : ভাল আতা খেতে চাও তো চলে এস গোপালদা।

বলে দুহাতের দুটো আতা এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি বললুম : একটা হাত।

স্বাতি বলল : এখন খেয়োনা কিন্তু। চা আসছে।

বলে আমাকে তাদের গাড়ির দিকে ডেকে নিয়ে গেল।

মাকে আমি বড় চিন্তিতাগ্রস্ত দেখলুম। স্বাতির দিকে তাকাতেই সে বলল : বেজওয়াডায় বোধহয় নামতে হবে। সেই থেকে ঐ ভদ্রলোক পটাচ্ছেন। বোধহয় রেলের অফিসার।

বলে হাত দিয়ে গাড়ির ভিতরের এক ভদ্রলোককে দেখাল।

আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম : মামা কী বলছেন?

সময়ের অনুরোধ দিয়ে এটে উঠছেন না। বেজওয়াডার কাছে এক মুনিরে যেবের নাম করেছেন ভদ্রলোক। তিনি সবরকম খান। যে যা খাওয়াবে তার আধখানা খেয়ে দেবেন।

সত্যি মামি।

বলছেন তো সত্যি। মারও শখ হয়েছে দেখবার।

আমি বললুম : তাহলে অমরাবতী আর নাগার্জুনকোণ্ডা বাদ যায় কেন।

সকৌতুকে স্মিতি বলল সেই কথা, বেড়াতে বেরিয়েছি, বেপরোয়া ভাবে বেড়ানো যাবে।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হলনা। মামা আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—গোপাল কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। এসোনা একটু ভিতরে।

আমি নিঃশব্দে গাড়ির ভিতরে ঢুকলুম।

মামা আমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম তাঁর নাইডু, বিজয়ওয়াডার রেল দপ্তরে কাজ করেন। তার পরে তাঁর সঙ্কটের কথা বললেন: তাবি মুস্কিলে পড়েছি। এর কথামতো বেজওয়াডার নেমে পড়লে নাস্তানাবুদ হতে হবে। শুধু তো মঙ্গলগিরি নয়, অমরাবতী নাগার্জুনসাগর। তার মানে কয়েক দিনের ধাক্কা।

এবারে আমি কোন কথা বললুম না! কথা বললেই তিনি আমাকে সন্দেহ করবেন। কিন্তু তাতেও অব্যাহতি পেলুম না। বললেন চুপ করে রইলে যে!

আমি বিনীত ভাবে বললুম: আপনি যা ভাল বোঝেন।

কেন, তোমাদের কোন মতামত নেই নাকি!

এবারে আমি আস্তে আস্তে বললুম: আমরা তীর্থ করতে বেরিয়েছি। নানা জায়গায় গেলে আমাদের রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই হবে।

স্মিতি হাসছিল সকৌতুকে, বলে উঠল: এই যে মামা, আমাদের চা এসে গেছে।

মামা বললেন: চা তো এল, কিন্তু আমি কী করি বল।

স্মিতি বলল: কী আর করবে, নামতে যদি ইচ্ছে হয় তো সবাই নেমে পড়ব!

অত রাতে কি আর থাকবার জায়গা পাব?

হিন্দীতে নাইডুকে আমি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলুম: রাত কাটাবার জায়গা পাব তো পছন্দমতো?

ভদ্রলোক সোৎসাহে বললেন: নিশ্চয়ই। স্টেশনের উপর তলায় আছে সারি সারি রিটায়ারিং রুম। আমি নিজে আপনাদের ভাল ব্যবস্থা করে দেব।

আপত্তির আর কোন কারণ নেই। তাই বিজয়ওয়াডাতেই নামা স্থির হয়ে গেল।

সবার সঙ্গে চা খেয়ে আমি নিজের কামরায় ফিরে এলুম।

মৈত্র মশাই তখন এক নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আধাবয়সী বলা যায়না, বয়সটা বার্ধক্যের দিকে হেলেছে। বাঙালী বলেই এত অল্প সময়ে জমে উঠেছে। আমাকে ফিরতে দেখেই মৈত্র মশাই বলে উঠলেন: আসুন গোপালবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই হালদার মশায়ের। কোথাকার হালদার বললেন?

বলে আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন।

হালদার মশাই বললেন: কালীঘাটের।

আমি তাঁকে হাতজুড়ে নমস্কার করলুম। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন একটুখানি মাথা নেড়ে। তারপরেই তাঁর পুরানো প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠলেন। অবিশ্রাম বকতে পারেন তিনি। গোদাবরীর একটা বিয়ের গল্প শোনাতে লাগলেন প্রবল উদ্যমে। [ক্রমশ

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

ফুটবল

সেকালের প্রতিযোগিতা : স্মরণীয় খেলোয়াড়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত কলিকাতার মাঠে যে ফুটবল দর্শকরা দেখেছেন তার স্মৃতি রোমকরি তাঁরা ভুলতে পারবেন না।

আজ শুনি দলীয় চীৎকার আর দেখি খেলার মাঠে অহেতুক উত্তেজনতা।

তখন ছিল জাতীয় উন্মাদনা আর দুর্জয় পণ। প্রবল দুর্ধর্ষ শ্বেতাংগ দলকে হারাবার অনমনীয় দৃঢ়তা। সে সময়কার কলকাতার মাঠের ফুটবলের চরিত্র ছিল একেবারে আলাদা।

তখন দর্শকরা ভাল খেলার কদর করতে জানতেন। প্রতিপক্ষের কেউ যদি ভাল খেলে জাতীয় দলকে হারিয়ে দিত তাকে বাহবা দিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। আর আজ? বাহবার বদলে ইট!

সে সময়কার আই. এফ. এ শীল্ডের প্রতিযোগিতা ছিল এক সর্বভারতীয় ব্যাপার। কলকাতার তো দুই গোরাদল আর তার সঙ্গে প্রতাপশালী অসামরিক শ্বেতাঙ্গদল থাকতোই তার সঙ্গে যুক্ত হত ভারতের বাকী স্থানের মিলিটারিদল। শীল্ডের খেলা গুলোতে যেন আগুন ছুটতো।

কয়েক খেলোয়াড়ের খেলা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। ডবলু বর্ডাস-এর চলকার, ইষ্ট ইয়র্কস-এর পটার, রয়ে স্টাফোর্ডের ইল, ডারহামসের, ওয়েদারঅল এইচ. এল. আইএর ডেভিস, ক্যামেরনিয়ান নাইট, ম্যানেট, কলভিন, আর্মফুট, ডালহৌসির ডেভিডসন, ডান্‌কান ম্যাগনটা, ডেভিস, কামটমসএর গ্যালব্রেথ, ম্যাকরেডি, স্মিথ, মোহনবাগানের গোষ্ঠ পাল, কলমুর রহমান, কুমার, বাঘা সোম, মোনাদত্ত, রবি পাকুলি, সেতু চৌধুরী, সুশীল চ্যাটার্জি, এরিয়ানসের ছোনে মজুমদার, বাহাদুর, পন্টু, পাণ্ডেলি, কে প্রসাদ, বীরেন ঘোষ, ইষ্ট য়েস্কলের দিনেশ গুহ, রবি ভাদুকদার, নবী গোস্বামী, সূর্য চক্রবর্তী, দুলাল, ই, বি রেলের ডি সিনহা, সমাদ, শংকর সিংহ। আরও অনেক নাম বলতে পারা যায় যাদের খেলাও ছিল এই সব সেরা খেলোয়াড়দের সমতুল্য।

মনে পড়ছে, ১৯৩১ সালের শীল্ড ফাইনাল। একদিকে ডারহামস অপরদিকে এইচ. এল. আই। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সামরিকদল। ডারহামসের সেন্টার হাফ ওয়েদার অল আর এইচ. এল. আইএর সেন্টার ফরওয়ার্ড প্রেসন; খেলা তো এদের দু'জনকে নিয়েই, কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। প্রথমে প্রেসন গোল করল। ওয়েদারঅল সেন্টার হাফ থেকে সে গোল শোধ করল। তারপর প্রেসন আবার গোল করল এবং ২-১ গোলে এইচ. এল. আই জিতল।

প্রথম প্রথম কার্সন্ট ডিভিসন লীগে ছিল মাত্র ছটি বাঙালী দল, মোহন বাগান আর এরিয়ানস। পরে অনেকগুলি বাঙালী ক্লাবে প্রথম ডিভিসনে খেলতে থাকে, যথা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, হাওড়া ইউনিয়ন, কালীঘাট,

ওয়ারীপুর, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্ট বেঙ্গল। এবং ইস্ট বেঙ্গলই প্রথম বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় এনে তাদের দলকে পুষ্ট করে। তারপর অবশ্য মহমেডান স্পোর্টিং সারা ভারত থেকে খেলোয়াড় এনে তাদের দলকে কলকাতা ফুটবলের সর্বস্থানে উন্নীত করে।

১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম লীগ জয় করল। শুধু তাই নয় এবং অবশ্যম্ভাবী তারা পরপর পাঁচবছর অব্যাহত রেখেছিল। কলকাতার ফুটবলের ইতিহাসে এটা রেকর্ড।

ওই সময় লীগে মহমেডানের সঙ্গে গোরা দলও পেরে উঠত না। একমাত্র ইস্ট বেঙ্গল তাদের সঙ্গে জোর লড়াই চালাত। ১৯৩৫ সালে মাত্র এক পয়েন্টের জন্যে ইস্ট বেঙ্গল লীগ পায়নি। ঐ বছরে মহমেডান ইস্টবেঙ্গলের একটি খেলা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহমেডানের রসিদ এবং ও রহিমের মিলিত আক্রমণের ধার যেমন অপ্রতিরোধ্য ছিল ইষ্ট বেঙ্গলে তেমনি দুজন অপ্রতিরোধ্য খেলোয়াড় ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুর্গেশ। সেই খেলাটি এমনি দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চার হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না কোন পক্ষ জয়ী হবে। এক পক্ষ গোল করে তো অপর পক্ষ তা শোধ দেয়। কী উত্তাপ! কী চমৎকার! খেলার শেষ মুহূর্তে মুর্গেশের এক অসাধারণ তীব্র শট আটকাতে গিয়ে মহমেডানের গোলকীপার ভূতলশায়ী হল। বল চলে গেল নেটের মধ্যে। মুর্গেশের সেই গোল সত্যিই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল সেই খেলায় ৪-৩ গোলে জিতেছিল। খেলার শেষে কেউ কেউ বা উল্লাস করতে করতে বাড়ি ফিরল, কেউ বা ঘাড় নীচু করে। কিন্তু ইষ্টক বৃষ্টি হয় নি, লাল যায়নি, ঘোড়া ছোটে নি, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়নি।

১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং শীল্ড ফাইনালে ক্যালকাটাকে হারিয়েছিল। ক্যালকাটা ক্লাবের তখন পড়তি দশা। তাহলেও শীল্ডে তারা অল্প মেজাজ নিয়ে খেলতো, ফলে ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু মহমেডান তখন সর্বভারতীয় দুর্জয় দল। তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সাধ্য কার। কিন্তুতবু তারা যে তিনদিন হার স্বীকার করেনি তার কারণ হল,ক্যালকাটা ক্লাবের গোল কীপার আর্মস্ট্রংয়ের অদ্ভুত খেলা। তিনদিন মহমেডান দলের অধিনায়ক গোলাবর্ষণকে তিনি একাই প্রতিহত করে শেষ দিনে মাত্র একবার পরাজিত হয়েছিল। সে এক অবিস্মরণীয় খেলা।

১৯৩৮ সালের ফাইনালে মহমেডান ইস্ট ইয়র্কের কাছে হেরে যায়। ওই হেরে যাওয়ার মূলেও ছিল আর এক আশ্চর্য গোল কিপার। ইস্ট ইয়র্ক কোন অংশেই মহমেডানের চেয়ে ভাল দল ছিল না। মহমেডান বরাবর তাদের চেয়ে অনেক ভাল খেলে ছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা শেষ মুহূর্তে নিষ্ফল প্রতিহত, নিষ্ফল হয়েছিল। সেখানে ইয়র্কের শেষ ঘাঁটি রক্ষা করছিল গোলকিপার পটার; পটার এক আশ্চর্য গোলকিপার। যেন যাদু জানতেন তিনি! জানহেঁড়া শট মারো, দড়ানো বার মেরা শট মারো, উঁচু শট মারো, অব্যর্থ হেড করো—পটার সব সময়েই সবটাতেই প্রস্তুত। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮—এই দু'বছর ইস্ট ইয়র্ক যে শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল তার মূলে ছিল পটারের অসাধারণ অবিশ্বাস্য ক্রীড়াচাতুর্য।

১৯৩৬-১৯৩৮ এর মধ্যে দুটি অবিস্মরণীয় ফুটবল দলের খেলা দেখে কলকাতার দর্শক আনন্দ পেয়েছেন। একটি হল চাইনিজ ফুটবল দল। অপরটি হল লণ্ডনের খ্যাতনামা ফুটবল দল ইসলিংটন কোরিনথিয়ানস। চীনা দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড লি ওয়াই টং বিস্ময়কর ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন কলকাতার মাঠে। লণ্ডনের দলটির ছিল দলগত পরাক্রম। যেমনি এক ধাঁচে গাঁথা গোটা দল চেহারা, খেলারও তেমনি ছাপট। পাস, দৌড়, হেড, পরস্পরের সঙ্গে বোঝা পড়া ছিল নিখুঁত। দলটি কলকাতায় দুটি ম্যাচ জিতলেও, ঢাকায় একটি ম্যাচে এক গোলে হারে এবং সেই খেলায় গোল করেন অদ্ভুত নৈপুণ্য—প্যাট্রি সেন, তখনকার দিনের এক শ্রেষ্ঠ ফরওয়ার্ড, প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল, পরে ই বি রেলে খেলেন।

শারদীয়

গল্প-ভারতী

আশ্বিন, ১৩৭৫

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য চার টাকা

শ্রীদোলবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৩বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

—এদেশ এই প্রথম—

❋ এ দেশের মেয়ে ❋

মেয়েদের কল্যাণব্রতী-মেয়েদের পরিচালনায়
একমাত্র পত্রিকার

শারদ অর্ঘ

এই অর্ঘ সাজিয়েছেন বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর লেখিকাগণ, তাঁদের মধ্যে আছেন :

বাসন্তী দেবী, প্রতিমা দেবী (ঠাকুর), মায়া দেবী, মহারাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী (নদীয়া), গিরিবালা দেবী, রাধারাণী দেবী, সুরুচিবালা সেনগুপ্ত, ননীবালা ব্রহ্মচারী, অপর্ণা দেবী, শান্তা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, জয়ন্তি সেন, হাসিরাশি দেবী, চিত্রিতা দেবী, মায়া বসু, উষা ভট্টাচার্য, ডঃ উমা রায়, রূপপ্রভা ভাদুড়ী, কবিতা সিংহ, হাসি ভট্টাচার্য, অমলা শঙ্কর, গৌরী ভঞ্জ, সুচিত্রা মিত্র, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, শান্তিশ্রী নাগ, অঞ্জলী বসু, পারমিতা বিশ্বনাথ, ডঃ রমা চৌধুরী, অমিতা রায় প্রভৃতি।

গল্পে, প্রবন্ধে, স্মৃতিচারণে অতুলনীয়

এই পত্রিকার মূল্য মাত্র—৩'০০ (তিন টাকা)
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

সত্বর সংগ্রহ করুন। পূজার পূর্ব্বেই বেরুবে।

ফোন নং—৪৪-৩২৬৪

সম্পাদিকা—বেলা দে
২১৯ বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-৬

এই সংখ্যায়

আগমনী	—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
বাংলার সংস্কৃতি : দুর্গোৎসব	—কালীপ্রসন্ন সিংহ	৭
উন্মোচন (পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস)	—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১১
অন্তরীক্ষে (ব্যঙ্গচিত্র)		৪৫
ঘর বাঁধা ঘর ভাঙা (উপন্যাসোপম বড় গল্প)	—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৯
পায়রা	—মহাশ্বেতা দেবী	৭৪
বলি	—বিভূতি ভূষণ গুপ্ত	৮০
শেষ-তীর্থ	—শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী	৮৫
পথের ধারে রাণীর বাসা (ইতিহাসের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী)	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯৪
বিদ্ধ মৃগ (পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস)	—আশাপূর্ণা দেবী	৯৭
গ্রহণনের পর	—প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৪০
তেসরা আষাঢ়	—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	১৫৫
মেয়ে কেরাণী	—সুমথনাথ ঘোষ	১৫৯
কিশোর যৌবন	—প্রভাত দেবসরকার	১৬৫
মাঠ	—মানবেন্দ্র পাল	১৭১
মন্ত্রীর মন্ত্রণা বাজে (প্রাচীন তামিল কাহিনী অবলম্বনে)	—শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৫
ধাত্রী পান্না	—অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য	১৮১
সেকালের কথা	নাটোর—রাজমাতা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী অনুলিখন—বাসন্তী বাগচী	১৮৫
ফরমায়েসী গল্প	—বিমল মিত্র	১৮৯
ছায়াবড়	—দক্ষিণারঞ্জন বসু	১৯৭
নিত্য আসা যাওয়া	—শক্তিপদ রাজগুরু	২০৯
বন্দরমালিকার ঠিকানা	—বাণী রায়	২১৭

এই সংখ্যায়

উত্তাপ	—চিত্তরঞ্জন মাইতি	২২৩
মাপের চেয়ে বড়ো	—কবিতা সিংহ	২২৭
রক্ত গোলাপ	—পার্থ চট্টোপাধ্যায়	২৩৩
প্রহরা	—সুবোধ বসু	২৩৯
ছায়া	—চিত্রিতা দেবী	২৪৫
আকাশ তারা মন	—সমর বসু	২৪৯
চন্দ্রাবতী লাহুল	—শম্ভু মহারাজ	২৫৫
অব্যর্থ	—নমিতা চক্রবর্তী	২৫৮
শতাব্দীর পটে বাঙালীর বীরত্ব	—মণি বাগচি	২৬৭
চোখে যার চোখ পড়ে (পূর্ণাঙ্গ নাটক)	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৭৩
মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিকথা)	—নরেন্দ্র দেব	৩১৭
সাহিত্য জীবনের খণ্ড স্মৃতি	—রাধারাণী দেবী	৩২৩
ঝরা মাধুরী (পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩২৭
লোমহর্ষক	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	৩৬৯
শিল্পী	—গজেন্দ্র মিত্র	৩৭৫
সিনেমার প্রভাব (অপ্রকাশিত রচনা)	—নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৫
রবীন্দ্র যুগ	—ডঃ কালিদাস নাগ	৩৮৭

সংযোজন

বাংলা

বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতি	—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	৩
বাংলার দেব দেউল	—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৮
বাংলার দারু ও মৃৎশিল্প	—গৌরীশংকর দে	১২
বঙ্গ সংস্কৃতিতে পট ও পটুয়া	—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৬
বাংলার লোক নৃত্য	—বেলা অর্ণব	২০
বাংলার কুটীর শিল্প	—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	২২

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১ অ।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আগমনী

গল্প-ভারতী

শ্রীরাধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

সেই আদিযুগ থেকে মানুষ মহামায়ার পদ বন্দনা করে আসছে। জগতের কল্যাণ-কামনায় মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে। সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বশক্তিময়ী, অনন্তরূপিণী মায়ের প্রসাদ লাভে কত ভক্ত ধন্য হয়েছেন। মায়ের চরণে গীতি অর্ঘ নিবেদন করে বাংলার সাধক কবিকুল চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ভক্তের কল্পনা সার্থক রূপ পেয়েছে কথায়, ভাবে, সুরে।

মহাকাব্যে বর্ণিত আছে শ্রীরামচন্দ্র জগতের কল্যাণ, ইষ্টের জ্ঞান এবং পাপের নিধনে, শরৎকালে দেবীর আরাধনা করে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক করেছিলেন। পাপ, পুণ্য, সুকৃতি, দুষ্কৃতি এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অনেক সময় আলোক অস্পষ্ট হয়ে উঠে। যা' কিছু ভালো, যা' কিছু মঙ্গল, মানুষের তাই কাম্য এবং তাকে পেতে হলে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করতে হয়। শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সমস্ত যন্ত্রণা ভোলে, মানুষও তেমনি সমস্ত দুঃখ কষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পায় মায়ের চরণে নিজেকে নিবেদন করে।

মহামায়াকে মাতৃরূপে, কন্যারূপে কল্পনা করেছেন—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাথরথি রায়, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তগণ। আগমনী গান বাংলা সংগীতের একটি বিশেষ পর্যায়। এই গানগুলি গীতিকাব্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কমলাকান্ত গেয়েছেন—

"যাও গিরি আন প্রাণ গৌরীরে আমার—"

... ...

"কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা, বল্ মা তাই।

... ...

রাথরথি রায় গেয়েছেন—

"ঘরে বেথা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে—

চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকান"

আমাদের দেশে মহামায়ার পূজা পারিবারিক পূজা ছিল। সে পূজায় ছিল আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, আনন্দ। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই পূজা ক্রমান্বয়ে সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু আন্তরিকতা, নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়। পূজার মন্ত্রে, ছন্দে তন্ত্রী মন্ত্রিত হয়ে উঠে না। আগমনী গান শোনা যায় না। এই নানাবিধ সামাজিক ঘাত, প্রতিঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও, ভক্ত কবির একটি গান অর্ঘ স্বরূপ নিবেদন করে নিজেকে ধন্য মনে করি।

আগমনী

কলিঙ্গড়া—ত্রিতাল

কিরূপ অনুপমা মহেশমনমোহিনী
কলঙ্ক-রহিত শত বিধু জিনি বদনী ॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি, রত্ন ভূষণে ভূষণী
মঞ্জীর চরণে বাজে রণু রুনু রণুরুনু মাণ মুকুতা গাঁথনি ॥
দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, সদলে দনুজ বিনাশকরা
পদভরে কাঁপে ধরা জেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি ॥
আদ্যাশক্তি তুমি কে জানে মা তব স্তুতি
অকিঞ্চন প্রতি প্রসীদ জননী ॥

কথা—দেওয়ান অকিঞ্চন

সুর ও স্বরলিপি

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ৩ ১´ ২
পদা মপা মগা গা | মা । পা পা I পা দা দর্সা র্সা | না দনা দা পা |
কি০ র০ প০ অ | ছ ০ প মা ম হে শ০ ম | ন মো০ হি নী |

০ ৩ ১´ ২
মা পা মগা গা | গা গা মা গমপা I মা মগা মা পা | গা মগা ঋা সা II
ক ল ঙ্ক র | হি ত শ ত০০ বি ধু০ জি নি | ব ০০ দ নী

০ ৩ ১´ ২
দা দা দা দা | দনা না র্সা । | দা দনা র্সর্ঋা । | র্সনা না র্সা । |
বে রূ প কি | র০ ণে ত র | হী র০ ০০ ০ | কা০ ০ দি ০ |

০ ৩ ১´ ২
র্সা র্গা র্গা র্গর্মা | পা পর্মা র্গা । I র্গা ঋর্গা ঋা র্সা | দর্সা নর্ঋা না । |
র ত ন ভূ০ | ০ ষ০ ণে ০ ভূ ০ ০ ০ | ষ০ ০০ ণী ০ |

০　　৩　　১´　　২
না দা পা পদা | মপা পা মা গা I গা গা মা পা | গমা মপা সন্তা সা |
ম ভী ব ত০ | ব০ পে সা ছে ক গু ন্থ ন | ক০ গু০ স্থ০ ন |

০　　৩　　১´　　২
সনা সা গা গা | গমা পদা না ৷ I পদা নর্সা র্ঝা র্সা | দা র্সনা দা পা II
ম০ শি ষু ক | ভা০ ০০ ০ ০ গী০ ০০ ০ ০ | ০ ০ ০ ব ঐ

১´　　২　　০　　৩　　১´
। দা দা না | দনা । না না | নর্সা র্ঝা র্সা র্ঝা | র্সনা । র্স । I দা না না না |
০ ব প ক | রা০ ০ বি বি | ধা০ ০ ০ ন | ব০ ০ রা০ স প ল ব |

২　　০　　১´　　২
না । না র্সা | দনা র্সর্গা র্ঝর্সা র্ঝা | র্স । । । I র্সর্ঝ র্সনা দা পা |
ন ০ ভ বি | না০০০ প০ ক | রা ০ ০ ০ প০ ব০ ভ মে |

২　　০　　২
পদা মপা মা পা I গা গা । মপা | গমা গা ঝা সা |
কাঁ০ পে০ ব রা মে ব ০ মে | বী ০ মে ন |

১´　　২
সা নসা গমপা দা | সা নর্সা নদা পমগা II |
ভ ন০ ০০০ ঝ | নি ০০ ০০ ০ ০০ |

০　　০　　১´　　২
দা দা । দা | দনা । র্সা র্সা I দা র্ঝা র্সা র্ঝা | নর্সা নদা না না |
ঝা ভা ০ শ | ক্তি০০ ভু মি কে ঝা মে রা | ত০ ব০ ভ ক্তি |

০　　৩　　১´　　২
র্ঝা র্সনা । দা | পদা মপা মা গা I গা গমা পা মগা | মা মগা ঝা সা II II |
ঝ কি০ ০ ক | ন০ ০০ প্র তি প্র সী০ ০ ব০ | ঝ ০০ ন নী |

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

[বাঙালীর সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে বাংলাদেশের লোক-উৎসবের প্রসঙ্গ খুবই এসে পড়ে। বাংলার সর্বপ্রধান লোক-উৎসব—দুর্গাপূজা। দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের সময় বাঙালীর হৃদয়মন যে-ভাবে উদ্বেলিত হয় এমন আর কোন উৎসবেই হয় না। শুধু তাই নয়, যুগ যুগ ধরে এই উৎসবের মাধ্যমে বাংলা সমাজের বাংলা দেশের মানুষের, তার সংস্কৃতি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে নানা ভাবে, নানা রঙে। তাই বাংলা দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির আলোচনায় দুর্গোৎসবের উল্লেখ অপরিহার্য। এখনকার উৎসবের চরিত্র আমরা দেখছি, একশ' দেড়শ' বছর আগে বাঙালী কেমন ভাবে এই উৎসব পালন করত তা জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকসায় আদিকালের কলকাতায় এই উৎসব কেমন হত তার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। শতাধিক বছর আগে লেখা এই রচনাটির মধ্যে ঠিক তখনকার দিনের সমাজের একটি আলেখ্য দেখতে পাবেন, যে সমাজ আজ নিশ্চিহ্ন। রচনাটির লিখনভঙ্গী ও বানান ও পঙ্‌ক্তিও লক্ষণীয়। আমরা এই দুষ্প্রাপ্য রচনাটি এই সংখ্যায় সংকলন করে দেবার সুযোগ পেয়ে আনন্দ বোধ করছি।

—সম্পাদক, গল্প-ভারতী]

বাঙলার সংস্কৃতি ঃ দুর্গোৎসব

দেড়শ' বছর আগেকার আদি কলকাতার একটি চিত্র

কালীপ্রসন্ন সিংহ

দুর্গোৎসব বাঙলাদেশের পরব। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নেই। বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্বে রাজা-রাজড়া ও ধনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হত, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলিকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্বেকার দুর্গোৎসবে ও আধুনিকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।.....

এবার অমুকবাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধুম! প্রতিপদাদি ঘটের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েছে, আজো চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু বেড় ফিট উচ্চ গদির উপোর তেসর কাপড় পরে বাম দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হরীশ্বর ন্যায়রত্নের সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গিন কফগুল নাশিয়ে পুঁচ্চেন। এদিকে বহরী অড়ওয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই সাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সীমোসাই, জামাই ও ভাগনে বাবুরা কর্ম কচ্চেন, সামনে কতকগুলি প্রিতিমে কাদা দুর্গাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইরের দালান, বাজার অধিকারী ও সাইসে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা', 'ধর্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও আক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোস গল্প ও অন্য বড় মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমিকা কচ্চেন,—আসল মহোৎসব বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে।

আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, পানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্ছে। সকলেই শশব্যস্ত, পূজার তারি ধুম!.....

মহমির দিন সকালে সহরের সকল কলাবউএরা বাজনা-বাদ্যি করে স্নান কত্তে বেরুলেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে কলাবউয়েরাও স্নানের সরঞ্জামে বেরুলো, আগে আগে কাড়া-নাগরা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো, তার পেছনে নতুন কাপড় পোরে

আসা সোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁতি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু; বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের জরোয় রামছাতা ধরেছে। আশে পাশে ভাগনে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা-ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভরিপতিরা, মোসাহেব ও বাজে দল; তার শেষে নৈবিদ্য, লাটিম ও পুষ্পপাত্র, শাঁক ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন; ক্রমে ঘাটে পৌঁছলে কলাবউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হুজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে অত্তে অনুরূপ বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে বাড়িমুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দুচার এডুকেটেড ইয়ং বেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজোআচ্চা করে থাকেন; ব্রাহ্মণভোজনের বদলে কতগুলি মিলমোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান; আদপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরো কিন্তু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, কিন্তু এঁদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়; প্রতিমের সামনে বিলিতী চকরীর বাতী জ্বলে ও পূজোর দালানে হুতো নিয়ে ওঠবার অ্যালাওরেন্স্ থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা দুর্গা ঘুংটের পরিবর্ত্তে বনেট পরেন, স্যাণ্ডউইচের যোড়শ খান আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলী করা গরম জলে স্নান করে থাকেন। শেষে সেই প্রণালী গরম জলে কর্ত্তাকর্ত্তার প্রাতঃস্নানের টি ও কফি প্রস্তুত হয়।...

আমাদের বাবু বনেদী বড় মানুষ, চাইল স্বতন্তর, আরতীর পর বানারসী জোড় পরে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অমনি তত্ত্বাপরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগল; ধরকরা, ছাঁকো বরদার, বিবির বাড়ির বেহারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সামনে অ্যাকটা সোনার আলবোলা, ডাইনে অ্যাকটা পান্নাবসান ফুল্‌সি, বাঁয়ে অ্যাকটা হীরে

বসান চৌপদার গুড়গুড়ি ও পেছনে অ্যাকটা হুক্কো বসান পেচুয়া পড়লো। বাবু আস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্ছেন ও আড়ে আড়ে সামনে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখছেন—লোকে কোন্‌টার কারীগরীর প্রশংসা কচ্ছে; যে রকমে হোক লোককে তাখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অঢেল; অ্যামন কি বসাবার স্থান থাকলে আরও দুটো হুরদি বা গুড়গুড়ি তাখান যেতো।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল; ছেলেরা 'বোম্‌কালী কলকেত্তাওয়ালী' বোলে চেঁচিয়ে উঠল। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বোসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গ্যালেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জেলে দিয়ে মজলিসের উদ্যোগ হতে লাগল। তারেরা টাসল দেওয়া টুপী ও পেটী পোরে রূপরঙ্গালালী কত্তে লাগলেন। এদিকে দুই একজন নাচের মজলিসি নেমন্তনে আসতে লাগলেন। মজলিসে তরফা নাচিয়ে দেওয়া হল। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জওয়াহরনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি 'ইজিপসন মমী' সেজে মজলিসে বার দিলেন —বাই সারেঙ্গের সঙ্গে গান করে সভার সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগলেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু দুরা দিন ও লাল চোকে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানাপ্রকার রং তামাসা আরম্ভ হয়েচে; লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বেজায় ভীড়! মাড়ওয়ারি খোট্টার পাল, মাগির খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাতলণ্ঠনওয়ালা, বড় বড় গাড়ীর সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্ছে, অথচ গাড়ী চালাবার বড় বেগতিক! কোথায় সকের কবি হচ্ছে, চোলের চাটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তালে ঘুমন্তো ছেলেরা মায় কোলে কথে কথে চমকে উঠচে। কোথাও পাঁচালী আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরারা তরপুর নেসায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটচেন ও আপনা আপনি বাহোবা দিচ্ছেন; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিশে দক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্ছে, মণি গোঁসাই সং এসেচে, ছেলেরা মণি গোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে, আশেপাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্ছে. মজলিসে গাঁজাগুল জলছে, বাজে বর্ণকদের বাতকর্ম ও মসালের দুর্গন্ধে পুজো বাড়িতে তিষ্ঠন ভার। ধূপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পুজো বাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিস রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাচো ইয়ার জুটে নেড়ল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর অভিনয় কচ্ছেন। অ্যাক অ্যাকবারের হাসির গররায় সিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তাপে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিদ্ধি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে লাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখচে, লক্ষ্মী-সরস্বতী শশব্যস্ত!

নিরঞ্জনের দিন বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলোকিতে পূর্ণ গ্যাস, ইংরাজি বাজনা, নিশেন, তুরকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে ব্যাড়াতে

লাগলেন—তখন, 'কার প্রতিমা উত্তম', 'কার সাজ ভাল', 'কার সরঞ্জাম সরেস', প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্ছে; কিন্তু হায়! 'কার ভক্তি সরেস' কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এদিকে প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট শুদ্ধ লোক গোচের দর্শক, খুসে খুসে পোষাক পরা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুল বয়ে শুদ্ধ গাল? কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ্ খেলিয়ে ব্যাড়াতে লাগলেন—আমুদে মিনষে ও ছোঁড়ারা নৌকার ওপর ঢোলের সঙ্গেতে নাচতে লাগলো; দৌড়ীন বাবুরা শ্যামটা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বসলেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু-অ্যাকটা সংস্কার গান গাইতে লাগল।

বিদায় হও মা ভগবতী এ সহরে এসো
নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার ধর্ম্ম দেখি চমৎকার।
খ্রীষ্টেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে বচ্চেন
সুবিচার।
এদিকে ধুলোর ওরে রাজপথেতে টেঁচিয়ে
চেয়ে চলা ভার।

পথে হাগা মোতা চলবে না, সহোরের জল তুলতে মানা;
লাইসেন্সটেকস মাথট চাঁদা, পাইখানায় বাসি ময়লা রবে না।
হেলথ অফিসর, সেওখানার মেজেষ্টর,
ইনকমের আসেসর সারে সবারে;
আবার গভর্ণরের ওরে দৃষ্টি সৃষ্টি ছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মাগো। অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই তো জ্বালা মাগো!—
মলেও শান্তি পাবে না;
মৃণ্ময়ির রক্ষা রক্ষা কল্লেতে কল্লে সংস্কার।
হুতোমদাস তাই সহর ছেড়ে আসমানে করেন বিহার।

উন্মাদন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৫ জুলাই, ১৯৫৮।

আশ্চর্য, ওরা শেষপর্যন্ত আমাকে পাগলা গারদে এনে ছেড়ে দিল! আমি কি এমনই উন্মাদের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম? কই মনে পড়ে না তো আমি কাউকে মারধোর করেছি, কি কোন জিনিস পত্র নষ্ট করেছি। কিছুই আমার মনে নেই। উন্মাদ হলে লোকে আর কী কী করে? বিড় বিড় করে কথা বলে নিজের মনে হাসে কাঁদে, তারা অন্য কারো ওপর অত্যাচার করে না। অন্য ধরনের পাগলও দেখেছি তারা হিংস্র। তারা অন্যকে মারে কামড়ায়। আমি সে ধরনের উন্মাদও দেখেছি। নিজের অজ্ঞাতসারে আমি কি তেমন উন্মত্ত হয়েছিলাম? যারা আমাকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেল আমার দাদা বউদি আর পুরোন বন্ধু দেখা হলে কালই আমি একথা জিজ্ঞেস করব, 'কেন তোমরা আমাকে এই শাস্তি দিলে? আমি কি তোমাদের খাঁচড়েছি, না কামড়েছি, না মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছি?'

কিন্তু ওরা কি কাল আমার খোঁজ নিতে আসবে?

আমার পাশের কমবেট ভদ্রলোক কথায় কথায় বললেন, 'কেউ আসবেনা মশাই। ছ'মাসের মধ্যে আপনার মুখ কেউ দেখতে আসবেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

উনিও পাগল, ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশিই হবে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। পরণে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। সবাই ওঁকে উকিলবাবু বলে ডাকছেন। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সত্যিই কি আপনি উকিল ছিলেন?'

তিনি বক্তৃগর্ভনে বললেন, 'তিরিশ বছর।'

ওরে বাবা! গলার কী আওয়াজ। কী রাগ। আমি ভয়ে ভয়ে ওঁর চোখের দিকে তাকালাম। চোখ দুটো ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন লালচে লালচে। তিনিও আমার চোখের দিকে তাকালেন। আমার চোখের রং কী রকম দেখতে তা আমি জানি নে। উকিলবাবু হয়তো লাল কি কটা দেখে থাকবেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসে অবধি কী লিখছেন? 'নাটক না নভেল?' আপনি কি লেখক নাকি?'

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'না মুহুরী।'

উকিলবাবু বিশ্বাস করলেন না। অপ্রসন্নভাবে বললেন, 'ইস আবার রসিকতাও আছে দেখছি।'

যেন পাগলের রসবোধ থাকে না। যেন পাগল বলে রসিকতা করা যায় না। মত্ততা আর উন্মত্ততা দুইই তো রসের বস্তু।

উকিলবাবু বললেন, 'কবে থেকে মুহুরী গিরি করছেন শুনি?'

মুখে এসে পড়েছিল, 'তিরিশ বছর।'

কিন্তু ভরসা পেলাম না। ভদ্রলোক যা খেপে আছেন তাতে এইটুকু রসিকতায় উনি আমার ওপর

ফাঁসিয়ে পড়তেও পারেন। হয়তো ভিতরের সব রস নিংড়ে নিয়ে আখের ছিবড়ে করে ছেড়ে দেবেন। চেহারা দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের গায়ে বেশ জোর আছে। আর সত্যিই যদি পাগলামি না সেরে থাকে তাহলে তো গায়ের জোর আরো বেড়েছে। পাগল বলে গায়ের জোর বাড়ে তা আমি দেখেছি। মনের জোরও বাড়ে কি না কে জানে। হয়তো কোন কোন দিক থেকে বাড়ে। গায়ের জোর কি মনের জোর ছাড়া আসে? কিন্তু আমার মনে কোন জোর নেই। আগে যেমন দুর্বল মনের অধিকারী ছিলাম এখনো তেমনি আছি। তাই মনে হচ্ছে পুরোপুরি পাগল বোধ হয় হইনি।

উকিল বাবুকে কিন্তু একেবারে সাদা মাঠা জবাব আমি দিতে পারিনি। তিনি যখন ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে থেকে লিখছেন?'

আমি তাঁকে বললাম, 'হাতে খড়ির দিন থেকে।'

একথায় তিনি আবার রেগে উঠলেন, 'রসিকতা করবেন না বুঝলেন? ও বস্তু আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে।'

তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখি, কী লিখছেন দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার লেখা কাগজগুলি সরিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়ালাম, 'আমার ডায়েরি আপনাকে কেন দেখতে দেব?'

এবার ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। রীতিমত অট্টহাসি আমার মনে হল তাঁর হাসির মধ্যে পাগলামি আছে।

তিনি বললেন, 'হরি হরি! এই বুঝি আপনার ডায়েরি। পাগল আর কাকে বলে! হারোয়ানকে দিয়ে দোকান থেকে দিস্তাখানেক কাগজ আনলেন। বসে বসে ভাজ করলেন তারপর হিজি বিজি মাথামুণ্ডু কী লিখছেন আপনিই জানেন। এই আপনার ডায়েরি?'

আমি বললাম, 'হুঁ, খবরদার আপনি আমার লেখা দেখতে চাইবেন না।'

তিনি হেসে বললেন, 'লিখুন মশাই প্রাণের আনন্দে লিখুন। আপনার লেখা আমি দেখলেও পড়তে পারবো না। আমি লেখাপড়া ভুলে গেছি। আমার এখন ক অক্ষর গো-মাংস। কিন্তু ভয় নেই আপনার?'

বুঝতে পারছি উনি নিজেই ভয় পেয়েছেন। হয়তো ভাবছেন আমি যে কোন মুহূর্তে ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতে পারি। একটু আগে আমি যেমন ওর ভায়োলেনসের আশঙ্কা করছিলাম। ভয়ঙ্কর হবার পালায় এখনকার মত আমারই জিৎ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার যদি আমাকে পাগল সাজাতে পারেন আমিই বা সুবিধা মত পাগল সাজব না কেন? কঠোর আর ভয়ঙ্কর হব না কেন?

আমি যদি শিপ্রার সম্বন্ধেও এমনি কঠোর আর ভয়ঙ্কর হতে পারতাম। যথা সময়ে নিজের পৌরুষের পরিচয় দিতে পারতাম, শক্ত করে ওর কবজী চেপে ধরে বলতে পারতাম 'তুমি একান্তভাবে আমার। যদি ওকে সবল বাহুতে বুকে চেপে রাখতে পারতাম যতক্ষণ পর্যন্ত ওর শ্বাস রুদ্ধ না হয়ে যায়—

কিন্তু একি। ছিঃ ছিঃ, আমি আবার শিপ্রার কথা লিখছি? তার কথা ভাবছি। এই না আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি ওর কথা আমি আর ভাববো না, লিখবনা। আমার স্মৃতি থেকে ওকে নিশ্চিহ্ন করে

মুছে ফেলব। ছেলেবেলায় যেমন প্রবোধ দিয়ে পেনসিলের দাগ তুলে ফেলতাম তেমনি করে তুলে ফেলব। ও আমার জীবনের পাওয়া একটি তুল আর একটি অশুদ্ধ বানান। ফেরার করে দেবার সময় ওই অংশটি বাদ দিতে হবে।

আমার এই ডায়েরিতে আমি শিপ্রার কথা লিখব না। ওর কথা ছাড়া কি আমার আর কিছু লেখার নেই? এই হাসপাতালে এসে দু'দিনের মধ্যেই আমি কত কি দেখেছি, কতজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আমি সেই সব কথা লিখব। আকাশে পাখির ঝাঁকের মত ঝাঁকে ঝাঁকে কত চিন্তা আমার মনের অনুচ্চ আকাশ দিয়ে উড়ে চলে যায় আমি তাদের না পারি ধরতে না পারি ছুঁতে। আমার এই ডায়েরির পাতায় সেইসব পাখির পালক যদি ঝরে ঝরে পড়ে, বেশ হয়।

আমি একবার একটি নীলকণ্ঠ পাখির পালক শিপ্রার খোপায় গুঁজে দিয়েছিলাম। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ও বলেছিল, নীলকণ্ঠ পাখি না আরো কিছু।

'তুমি যেন কত পাখি চেন। কত বড় একজন জুলজিষ্ট।'

আমি বলেছিলাম 'পাখার রঙটি দেখেছ? মরকতমণির মত নীল, এ পাখির নাম নীলকণ্ঠ হবে না তো কী হবে?'

ও বলেছিল, 'তুমি দেখেছ মরকতমণি?'

আর একবার ওকে দাঁড়া হাঁসের পালক কেটে কলম তৈরি করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'এই কলম দিয়ে তুমি আমাকে চিঠি লিখবে।'

ও হেসে বলেছিল, 'এই কলম দিয়ে বুঝি লেখা যায়?'

'এক সময় কিন্তু যেত। ছেলেবেলায় আমিও লিখেছি। খাগের কলম দিয়ে, পাখার কলম দিয়ে লিখেছি।'

ও বলেছিল, 'তুমি সব পারো। তুমি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। বয়সের দিক থেকে নয় মনের দিক থেকে।'

আমি বলেছিলাম, 'তুমি আমাকে ইচ্ছে করলে আরো দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে—'

ও সেই কলমের পালক আমার গালে বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'তাহলে আমার কি উপায় হবে। আমি যে অত পিছু হটতে পারবনা।'

কিন্তু কেন এসব আমি কী শুরু করেছি কী লিখতে কী লিখে চলেছি আমি যা শপথ করেছি আমি তার কথা আর ভাবব না, তার নাম আর মুখে আনব না তাকে আর মনের কোণেও স্থান দেবনা?

আমি অন্য কথা লিখব, অন্য কথা লিখব, অন্য কথা লিখব। কিন্তু at all লিখব কেন? লিখব এইজন্যে আমি পাগল নই সে কথা নিজের কাছে প্রমাণ করব বলে। পাগলে কি অর্থবোধক বাক্য লিখতে পারে? নিশ্চয়ই পারেনা। কিন্তু আমি যা লিখছি তার যে সত্যিই কোন অর্থ আছে নিজের কাছে ছাড়া তার কোন প্রমাণ নেই। মজার কথা এই এখানে আমাদের সবাইর কপালে বিকৃত মস্তিষ্কের লেবেল আঁটা। এদের কারো সাক্ষই গ্রহণ যোগ্য নয়। এরা হাঁ বললেও যা না বললেও তাই।

লিখছি নিজের কাছে নিজের প্রকৃতিস্থতা প্রমাণ করি কিন্তু সবাইতো নিজেকে প্রকৃতিস্থ বলেই ভাবে। শুধু আমার পাশের উকিলবাবু নন—হাইনে যাঁরা দু'দিনের ঘরগুলিতে আরো যে চার পাঁচজন পেশেন্ট আছেন তাঁরাও আমাকে বলেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ তাঁদের কোন মনের রোগ নেই। তাঁদের জোর করে এখানে ধরে রাখা হয়েছে। সুতরাং নিজেকে নিজে সুস্থ মনে করাটাই যথেষ্ট নয়। আরো পাঁচজনেরও তা মনে করা চাই। তাহলে আমি হলাম আমাকে আর পাঁচজন, যা বলে মনে করে বা আর আমাকে আমি যা বলে মনে করি তার সমষ্টি। কিন্তু আর পাঁচজনের ধারণার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা নাও মিলতে পারে। তাছাড়া পাঁচজনের ধারণাই যে এক রকম তাই বা কে বললে?

আমি তা হলে কী? এক না অনেক? বিভাজ্য না অবিভাজ্য? অখণ্ড? না বহু সহস্র লক্ষ কোটি কোটি খণ্ডের আমি জোড়াতালি?

আর ভাবতে পারছিনে। আর লিখতে ইচ্ছা করছে না: আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। মাথা ধরেছে।

মন্দ মন্দ নয়। বিশ্রীর চিন্তা আমি নিজের কাছে নিজে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। এদিকে আত্মচিন্তা করতে গেলে মাথা ঘোরে। আমি তা হলে কী নিয়ে ভাবব, আমি তো আর যা তা নিয়ে থাকে তাকে নিয়ে ভাবতে পারিনে। ওই যে পাশের ঘাটে শুয়ে শুয়ে বুড়ো উকিলবাবু নাক ডাকছেন তা নিয়ে আমি কেন লিখব? লোকে যা ভালোবাসে তাই নিয়ে লেখে। যাকে ভালোবাসে তাকে নিয়ে লেখে। তাই তো লেখার কষ্টের কথা আর মনে থাকে না। লেখাটাও ভালোবাসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভালোবাসাতেও যে কষ্ট।

১৭ই জুলাই—

কাল অনেকখানি লিখেছি। আরো লিখতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। কেমন একটা অবসাদ বোধ করতে লাগলাম। এখন একটা সিগারেট খেলে হোতো। প্যাকেটে দু'তিনটে সিগারেট তো আছে। কিন্তু দেশলাই কোথায় পাবো? যখন ওরা আমাকে এখানে নিয়ে আসে এখানকার স্টাফ আমার পকেটের সব জিনিস নিয়ে নিয়েছিল। অবশ্য সব আর কি? আমার মানিব্যাগ আর পকেট থেকে ডায়েরি এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই। ডঃ মুখার্জিকে বলে আমি আমার ব্যাগ-ডায়েরি আর সিগারেটের প্যাকেটটি ফেরৎ পেয়েছি। কিন্তু দেশলাইটি আর ফেরৎ আসেনি। দেশলাই পেসেন্টদের কাছে রাখা নিষেধ, কে জানে অবোধ জ্ঞানহীন আমাদের মধ্যে কেউ যদি আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দেয়। কিন্তু আর যেই বাধাক আমি বাধাবনা। আগুন নিয়ে খেলার সাধ আমার মিটেছে।

দেশলাই নেই বলে আমরা যে রাত্রে তোমাদের মত মুখ বুজে বসে থাকি তা নয়। রাতের কেউ না কেউ এসে প্রত্যেকের মুখে সিগারেট জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। একজনের সিগারেট নিভে গেলে সে আবার আর একজনের সিগারেট থেকে সিগারেট ধরায়। অন্ধকারে প্রত্যেকের মুখে মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে। কাল বেশ লাগছিল দেখতে। আর দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল আমরা নিজেরাও এক একটি স্ফুলিঙ্গ। ক্ষণদ্যুতি নিয়ে জন্মেছি। 'স্ফুলিঙ্গ' তার পাখার ধেকে ক্ষণকালের ছন্দ।' কিন্তু সেই ক্ষণকালের মধ্যেও যে বারবার ছন্দ পতন হয় সেই তো দুঃখ।

কাল কিন্তু বেশ লাগছিল। আমার বাবার বয়সী না হলেও কাকার বয়সী আমার কলেজের উকিল প্রিয়তোষ মল্লিক আমার মুখে সিগারেট গুঁজিয়ে দিতে দিতে যখন বললেন, 'ধরাও হে সুব্রত ধরাও। লজ্জা কোরোনা। এখানে আমরা সবাই সমান।' তখন পিতৃতুল্য এই প্রৌঢ়ের ব্যবহারে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। কাল দুপুরেও ওঁর সঙ্গে আমার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি একী পরিবর্তন। আমার মনে হচ্ছিল এতো শুধু সিগারেট থেকে সিগারেট জ্বালানো নয় এ যেন দ্বীপ থেকে দ্বীপ জ্বালানো। একটি হৃদয়দ্বীপ থেকে আর একটি হৃদয় শিখা জ্বালিয়ে নেওয়া। শুনেছি উন্মাদের জগৎ একান্ত ভাবেই তার নিজস্ব। সে তো জগৎ নয় এক একটি দ্বীপ। চারদিকে কেবিল নীল দুস্তর সমুদ্র। কারো সঙ্গে কারো সংযোগ নেই, সংযোগ সাধনের চেষ্টা ও নেই।

আমি অবশ্য বদ্ধ উন্মাদ নই। আমাদের এই ব্লকে যারা আছে তারা কেউ তা নয়। আমরা সবাই অল্পস্বল্প মনোবিকারের শিকার। আমরা কেউ লিখি কেউ ছবি আঁকি, কেউ গান গাই। বদ্ধ পাগল হাতে পায়ে যাদের শিকল বাঁধা তাদেরও ওয়ার্ডের মুখ দিয়ে আমি কাল ঘুরে এসেছি। আমাদের অবস্থা তেমন নয়। আমাদের হাত পা খোলা, বাঁধা শুধু মন। কিসের জন্যে বাঁধা কে জানে। এই মন দিয়ে আমরা কত কীর্তনা করতে পারি। স্যুটনিকের সাহায্য ছাড়াই তারায় তারায় ঘুরতে পারি। স্বর্গরসাতল কোথাও আমাদের যেতে বাধা নেই। এই মন দিয়ে কেউ আমরা ঈশ্বরকে গড়েছি কেউ বা তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছি। আমার তো মনে হয় মানুষের এই মনের ঐশ্বর্য এভারেষ্টের চেয়েও উঁচু। কিন্তু এই মনকে আমি কিসের জন্যে বেঁধে রেখেছি? শিপ্রার জন্যে? একটি নারীর সান্নিধ্য সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা কখনো কখনো বৈরাগ্যের বিষয়কেই কি আমার মন ঘুরপাক খাচ্ছে? শিপ্রা। শিপ্রাই কি আমাকে এক বিষম ধাক্কা দিয়ে এই পাগলা গারদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে? একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারবনা। কিন্তু আমি স্বীকার না করলে কি হবে আমার—আশেপাশের আত্মীয় বন্ধুরা এই কথাই সার সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তাদের ধারণা ভাঙবার জন্যে আমার মাথা ব্যথা নেই। মাথাব্যথা নেই, কিন্তু ওদের পাঁচজনের অনুকম্পার দৃষ্টি কি আমি অগ্রাহ্য করতে পারি? সেই সব দৃষ্টির ওপরেই কি আমি এখানে আশ্রয় নিয়েছি? এখানে আমি নিজেকে চিরে চিরে দেখব, নিজের কথা ভাবব, নিজের কথা লিখব, আমি আর কারো কথা লিখবনা। ডঃ মুখার্জিই বুঝি একমাত্র মনোবিজ্ঞানী? আর বুঝি কেউ মনের খবর জানেনা? আমার মনকে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

সকালে এই পর্যন্ত লিখে উঠে গিয়েছিলাম। তখন লিখেছিলাম নিজের কথা ছাড়া আর আমি কিছু লিখব না। কিন্তু দুপুরের মধ্যে অবস্থা বদলে গেল।

ঘর থেকে কেবল বারান্দায় বেরিয়েছি আমাদের চীফ নার্স অজয়বাবু বললেন 'সুব্রতবাবু আপনি নাকি একজন লেখক?'

হেসে বললাম, 'কে বলল আপনাকে?'

তিনি বললেন, 'ডঃ মুখার্জি বলেছেন।'

বললাম 'আমি শুধু পত্র লেখক ঘরে নিজের দিনপঞ্জীর লেখক। তাছাড়া আর কিছু লিখতে পারিনে!'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনি বিনয় করছেন না কি গোপন করছেন আপনিই জানেন, আমি তো শুনেছি আপনি একজন ঔপন্যাসিক।'

আমি প্রতিবাদ করলাম না। তবে কোন লাভ নেই, অজয়বাবু বললেন, 'আপনি উপন্যাসের মাল মশলা সংগ্রহের জন্যে ছদ্মবেশে এখানে এসেছেন?'

আমি চমৎকৃত হয়ে চুপ করে রইলাম। ব্যাপারটা সত্যি হলে কী সুখেরই না হত।

অজয়বাবু আমার আরো কাছে সরে এলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আমিও আপনাকে একটা প্লট দেব। লিখবেন আমার কথা?'

বললাম, আপনার নিজের জীবনের কাহিনী?'

অজয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, গুছিয়ে লিখলে বেশ বড় একখানা উপন্যাস হবে? জানেন আমিও এখানে পেশেন্ট হয়ে ঢুকেছিলাম, একটানা দুবছর ভুগেছি।'

বললাম, 'তারপর?'

তিনি বললেন, 'তারপর সুস্থ হয়ে এখন পেশেন্টদের সেবা করি।'

বললাম, 'বাড়ি ফিরে যাননি?'

তিনি বললেন, 'গিয়েছিলাম। আপনার উপন্যাস তো তাই নিয়েই হবে। ধীরে ধীরে বলব আপনাকে। এখন যাই, ডিউটি সেরে আসি।'

মিনিট কয়েক বাদে আরো একজন প্লট দিতে এলেন। আমার পাশের ঘরের প্রবাল চৌধুরী। বেশ সুপুরুষ দেখতে। সাধারণতঃ অপজিট সেক্স বলে মেয়েদের রূপই আমাদের চোখে পড়ে। পুরুষের রূপের দিকে বড় একটা তাকাইনে আমরা। ও তার মেয়েদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। মেয়েদের ওপর আমার পক্ষপাত বেশি বলিও ওদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার আমি কম পাইনি? আমি কেমিনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একথা না বলে পারিনে রূপের প্রতিযোগিতায় পুরুষের জিৎ। রূপের প্রতিযোগিতায় তো কথাই ওঠেনা। প্রবাল বাবুকে দেখে আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল। যেমন লাল টুকটুকে গায়ের রং তেমনি দৈর্ঘ্য তেমনি তীক্ষ্ণ গড়ন নাক চোখের। এখানে সবাই ওঁকে রাজাবাবু বলে ডাকেন। বয়স কত হবে ভদ্রলোকের? ত্রিশ বত্রিশ? কি দাবাড় বেশিও হতে পারে। হয়তো আমারই সমবয়সী, কিন্তু আর সব দিক থেকেই অসম। চালচলন দেখে মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। প্রবালবাবু 'এ' ক্লাসের পেশেন্ট হলেও হতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমাদের মত 'বি' তে নেমে এসেছেন। এটা কি তাঁরই খেয়াল না কি তাঁর বাড়ির আত্মীয় স্বজনের অভিপ্রায় ঠিক জানিনে।

বারান্দায় আমাকে দেখতে পেয়ে তিনিও আমাকে পাকড়াও করলেন, 'আরে শুনুন শুনুন আপনি নাকি একজন রাইটার-ইন ডিসগাইস্?

যথারীতি প্রতিবাদ করে বললাম, 'কে বললে আপনাকে?'

প্রবালবাবু বললেন, 'যেই বলুক সাক্ষী সাবুদ দিয়ে কী হবে আপনার? শুনুন, আমার কথা লিখতে হবে আপনাকে।'

হেসে বললাম, 'লিখতেই হবে?'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই। না লিখলে আপনাকে আমি মেরেই ফেলব।'

বললাম, 'তা হলে তো বেঁচে যাই।'

প্রবালবাবু বললেন, 'আপনি নতুন এসেছেন তাই জানেন না। আমি মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠি। অবশ্য হাত পা বাঁধবার মত অবস্থা ঠিক হয় না। তবু ওই সব সময় কেমন যেন বড় হয়ে যায় মনের ভিতর দিয়ে। না কি ভূমিকম্প! নাকি একসঙ্গে দুইই? সব ভেঙে চুরে তছনছ। ফেটে চৌচির বড় বড় বাড়িগুলি সব মুখ থুবড়ে ধসে পড়ে।'

এই মানসিক প্রলয়ের অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও আছে? আমি চুপ করে রইলাম।

প্রবালবাবু বলতে লাগলেন, 'আমার কথা শুনলে আপনার বুক ফেটে যাবে। তাই বলে মানুষের ওপর মানুষ এত অত্যাচার করে। মানুষ মানুষকে এমন ঘৃণা করে? আমার কথা লিখুন সুব্রতবাবু। যার সবই ছিল অথচ কিছুই নেই, যে অনেক বড় হতে পারত, অসাধারণ হতে পারত অথচ হয়ে রইল নিতান্ত সাধারণ। তার ব্যর্থতার করুণ কাহিনী আপনি লিখে রাখুন।'

আমাকে বলতে হল 'লিখবো' নইলে ওঁর হাত থেকে তখনকার মত ছাড়া পেতাম না।

এ কী কাণ্ড! আমি শুধু আমার কথা লিখব বলে কলম ধরেছিলাম। কিন্তু সবাই চাপ দিচ্ছে।

'আমাদের কথাও লিখতে হবে।'

কারো অনুনয়, কারো দাবি, কেউ বা জোর খাটাবার ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার কি সেই ক্ষমতা আছে যে আমি সবাইর কথা লিখব? অন্ততঃ অনেকজনের কথা লিখব? যদি থাকত সেই ক্ষমতা কী চমৎকারই না হত। আমার লেখার মধ্যে সবাই নিজের মুখ দেখতে পেত, নিজের গলা শুনতে পেত, নিজের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করতে পারত। পৃথিবীতে কত রকমের শক্তি আছে এও এক শক্তি। নিজের মধ্যে সবাইকে বহন করার নাম মহাশক্তি।

একটু আগেও আমার মনে হয়েছিল প্রতিটি মানুষ এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, নিঃসঙ্গ একক। যারা উন্মাদ তারা তা বটেই, যারা সুস্থ তাদেরও ওই একই অবস্থা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কথাটা পুরোপুরি সত্য নয় অর্ধসত্য। আমি একক হলেও মনে মনে অনেকের সঙ্গে বাস করি। অনেকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই। যুক্ত হতে পারলে আনন্দ পাই। এই সংযুক্তির মধ্যেই আমাদের মুক্তি।

এই ব্লকে আমরা যারা আছি তারা পুরো উন্মাদ না হলেও প্রায় উন্মাদ। কিন্তু আমাদেরও যেন এক সমিতি আছে। তার নিয়ম কানুন কোথাও লেখা নেই। সভ্যদের কোন রেজিষ্টার খাতা নেই। তবু কিসের যেন একটা সহযোগিতা আছে সহানুভূতি আছে একটা ঐক্যবোধ আমার সবার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সেই বোধ আমাকে বলে-আমি কোন কোন সময় একা হলেও সব সময় একা নই। আরো কয়েকজনকে আমার চাই। তারা কখনো আমার শারীরিক সান্নিধ্যে আছে কখনো স্মৃতিতে কখনো বা সাধে স্বপ্নে। তাদের ছাড়া আমার চলে না। আমি যদি এক নগর হই তারা হল সেই নগরের বাসিন্দা।

তারা ছাড়া আমার অস্তিত্ব অর্থহীন।

১৮ই জুলাই—

ডঃ মুখার্জি আজ সকালে রাউণ্ড দিতে এলেন। রোজই আসেন। কিন্তু রোজ আমি ওঁর কথা

লিখিনে। ডঃ মুখার্জিকে আমার ভালোই লাগে। সুদর্শন প্রসন্নমুখ ভদ্রলোক। সাদা ট্রাউজার আর সাদা হাফশার্ট পরতে উনি ভালোবাসেন। আমার মনে হয় উনিও আমার সমবয়সীই হবেন। কি দু এক বছরের বড়। উনিও মধ্য ত্রিশের। আমরা হয়তো একই কালে এই পৃথিবীতে জন্মেছি—একই সময়ে এই গ্রহে বাস করছি কিন্তু আজ ওর আর আমার মধ্যে তফাৎ অনেক। উনি ডাক্তার আমি রোগী। অনেক ব্যাপারে ওঁর শাসন অনুশাসন আমাকে মেনে নিতে হবে। আমি ওঁর অধীন। শুধু একটি ক্ষেত্রে আমার স্বাধীনতা আছে। আমার এই ডায়েরিতে ওঁর কথা আমি লিখতেও পারি, নাও লিখতে পারি।

ডঃ মুখার্জি আজ আমার বেডের সামনের চেয়ারটায় বসলেন। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন সুব্রতবাবু?'

আমি বললাম, 'সে তো আপনি বলবেন। আমি কেমন আছি না আছি সে তো আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'আপনি, আমার ওপর এখনো রাগ করে আছেন দেখছি।'

বললাম, 'না ঠিক রাগ নয়! তবে কেউ যদি কোন সুস্থ মানুষকে ছলে বলে কৌশলে গারদে ভরে রাখে—'

ডাক্তার বললেন, 'গারদ কেন ভাবছেন? আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে বলা হয় অ্যাসাইলাম। আশ্রম। আপনাদের বিশ্রামের জায়গা।'

আমি বললাম, 'বিশ্রামের বুঝি আমার আর জায়গা ছিল না? গারদই যদি না হবে তাহলে জানালাগুলিতে অমন মোটা মোটা গরাদ কেন? বাইরের দিকটা অমন তার দিয়ে ঘেরাই বা কেন? আপনাদের কি ধারণা আমরা জানালা ভেঙে পালিয়ে যাব?'

ডাক্তার এ কথার কোন জবাব দিলেন না। হাসিমুখে একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? খাওয়া-দাওয়া—'

হেসে বললাম, 'যেসে যা খেতাম তার তুলনায় তো রাজভোগ খাচ্ছি। হেভি ব্রেক ফাই—'

ডাক্তারও হাসলেন 'যাক। ভোজনের ব্যাপারে আপনি তাহলে খুশি। এবার শয়নের কথা বলুন। ঘুমটুম বেশ হচ্ছে তো?'

বললাম, 'ঘুম এর আগে হত না। রাতের পর রাত জেগে কাটাতাম। কিন্তু এখানে বোধ হয় ঘুম আমাকে পাড়ানো হচ্ছে।'

ডঃ মুখার্জি বললেন, 'কীভাবে হচ্ছে সে আমরা দেখব। আপনি বলুন আপনার sound sleep হয় কিনা। রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুমটুম ভেঙে যায় না তো?'

বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তবে আর কি! এতো একটা বড় ইমপ্রুভমেণ্ট। খেতে পারতেন না খাচ্ছেন। ঘুমুতে পারতেন না ঘুমুচ্ছেন। আর সারাদিন বসে বসে লিখছেন। মানুষ আর কী চায়। আহার নিদ্রা আর পদ্মদল মত কাজ।'

মানুষের আরো একটা বড় জিনিস চাইবার আছে। সে কথা ডঃ মুখার্জি চেপে গেলেন। আমিও আর খুঁচিয়ে তুললাম না।

বললাম, 'কবে ছাড়া পাব ডঃ মুখার্জি?'

ডঃ মুখার্জি হাসলেন, 'আপনি তো ছাড়াই রয়েছেন সুব্রতবাবু। আপনি যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারছেন। যে কোন ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখতে পারছেন! সবাইর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছেন। দোতলায় আমাদের লাইব্রেরী আছে, রিক্রিয়েশন আছে আপনি ইচ্ছা করলে সেখানে গিয়ে পড়াশুনো করতে পারেন। কটা দিন রেষ্ট নিন। তারপর সুবিধে মত একদিন চলে গেলেই হবে।'

আলগোছে একটু কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ডঃ মুখার্জি সরে গেলেন।

কিন্তু স্পষ্ট করে বলে গেলেন না আমার অসুখটা কী। কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে। উন্মত্তের কোন লক্ষণ আমার মধ্যে প্রকট।

আমার দাদা বউদি আর বন্ধু নিত্যগোপাল যে দিন আমাকে এখানে রেখে গেল সেদিনও আমি কিছু জানতে পারিনি। সেদিনও প্রকারান্তরে ওরা ছলনাই করেছে আমার সঙ্গে।

আমি কেমন একটা আচ্ছন্নের মত ওদের পিছনে পিছনে আসছিলাম।

গেট পার হয়ে অ্যাম্বাসাডারের ভিতরে ঢুকলাম। একটা ঘরে এনে ওরা আমাকে বসাল।

হসপিটালের একজন ষ্টাফ আমাকে বললেন 'আসুন।'

আমি দাদার দিকে তাকালাম 'দাদা ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।'

দাদা বলল, 'কিছু ভাবিসনে। ওরা তোর প্রেসারটা একটু দেখবে। আর রাত্রে তো তোর ঘুম হয় না, সেই ঘুমটা যাতে ভালো হয়—'

আমি বন্ধুর দিকে তাকালাম!

নিত্যগোপাল হেসে বলল, 'কোন ভয় নেই যাওনা ভিতরে।'

ভিতরে এসে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। বিকৃত মস্তিষ্কের মধ্যে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। দুঃখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আমার ভাই বন্ধু দুজনেই বিশ্বাসঘাতী। তাহলে আমি বাস করব কাদের নিয়ে।

কেউ আমাকে বলছে না আমার অজ্ঞাতসারে আমি কী করেছি। কাকে আঘাত করেছি কার জিনিসপত্র নষ্ট করেছি। আমার জানবার উপায় নেই আমি উন্মত্ততার কোন পর্যায়ে আছি।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখানে অনন্তকাল আমাকে থাকতে হবে কাল অবশ্য আপেক্ষিক। কোন কোন মুহূর্ত যেন অনন্তভার বয়ে নিয়ে আসে। সময় আর শেষ হতে চায় না। অথচ প্রীতিকর সুখপ্রদ ক্ষণটুকু যেন হাউই বাজির মত হুঁস করে চলে যায়। কোন একটি সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিলাম 'গ্রীষ্মকালে দিবা দীর্ঘ—শীতকালে শর্বরী।' তেমনি মানুষের জীবনে সুখের সময় স্বল্প, দুঃখের কাল দীর্ঘ।

শিপ্রার সঙ্গে যে আট বছর আমার বন্ধুত্বের মধ্যে কেটেছে সেই বছরগুলি কী দ্রুত বেগেই না চলে গেল। অথচ এই হাসপাতালে দুটো দিনই কী দুঃসহ লাগছে। কিছুতেই এই চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারছিনে আমি এখানে বন্দী, আমি এখানে অসুস্থ। রোগটা এমন যার কথা শুনলে মানুষ হাসে। যেমন কাউকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলে লোকে হাসে, প্রেমে পড়ে নাকাল হতে দেখলে হাসে। তেমনি অন্যকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগের বদলে কারো মাথার রোগের কথা শুনলেও অন্য মানুষের হাসি পায়। অথচ মাথাকেই উত্তমাঙ্গ বলা হয়। বহু অসুখ-বিসুখ যেমন মানুষের অনিচ্ছাকৃত নানা ধরণের বিকৃতি-বিকৃতিও তেমনি। তবু মস্তিষ্কের ব্যাধি মানুষের মনে কেন এমন হাস্যরসের উদ্রেক করে জানিনে। এই হাসির মধ্যে মানুষের ভয়হীনতা, তার সহানুভূতির বৈভবই ফুটে ওঠে।

এখানে এসে এই বিকৃত মস্তিষ্কের দেখে আমার তো মমতাই লাগে।

যে সব বিচিত্র অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এই মানসিক ব্যাধির মূলে রয়েছে আমি তা অনুভব করবার চেষ্টা করি। আজ আমি এদেরই একজন। যাঁরা সুস্থ তাঁরা আমার কেউ নন। এই অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্তরাই আজ আমার পরমাত্মীয়।

পরমাত্মীয়। তাই এরা আমার কাছে এদের মনের কথা বলতে আসছে। এরা প্রত্যেকেই বলবার জন্য উদ্গ্রীব। আমি এদের সবাইর শ্রোতা। আমারও যে অনেক বলবার কথা আছে। আমি শোনাব কাকে? আমি শোনাব আমার এই খাতাকে। এই খাতা ছাড়া আজ আর আমার কেউ নেই। আর কারো কাছে আমার নিগূঢ় মনের কথা আমি খুলে বলতে পারব না। বললে কেউ বুঝবেও না। তার চেয়ে এই খাতার মধ্যেই মনের কথা ভরে রাখো ভালো। কেউ শুনুক না শুনুক, বুঝুক না বুঝুক আমার কিন্তু এসে যায় না।

কতকাল ধরে ডায়েরি লিখছি কখনো অনিয়মিত কখনো সুনিয়মিত। কেউ আমার ডায়েরি কখনো দেখেনি। আমি দু'একজন বন্ধুকে পড়ে শুনিয়েছি। তাদের মধ্যে একজনের নাম নিত্যগোপাল. আর একজন আশুতোষ, আর একজন বন্ধুর নাম আর মনে পড়ছে না। যার নাম মনে পড়ছে আমি তার কথা লিখতে চাইনে। হ্যাঁ তাঁকে শুনিয়েছি মাঝে মাঝে। তারপর শেষ দিকে এমন হয়েছিল সে জোর করে শুনত, আমার ডায়েরি কেড়ে নিয়ে পড়ত।

আমি একদিন বলেছিলাম জানো, অন্যের ডায়েরি চুরি করে পড়া পাপ?

সে জবাব দিয়েছিল, অন্যের কথা চুরি করে লেখা বুঝি পাপ নয়?

তখন তার কথাই আমার ডায়েরিতে বেশি থাকত। আমার ইচ্ছা হত আরো বেশি করে লিখি আরো বেশি করে। সারাদিন তার সঙ্গে আমি যেভাবে কাটিয়েছি, যত কথা সে আমার সঙ্গে বলেছে যতবার মুখ তুলে হেসেছে, চোখ তুলে তাকিয়েছে আমার ইচ্ছা হত সব আমি ডায়েরিতে লিখে রাখি। কিন্তু কী করে লিখব? এ তো শুধু সংখ্যা গণনা নয়, এ যে রূপ বর্ণনা। তার প্রতিটি ইঙ্গিত আর ভঙ্গির বর্ণনা লেখার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠতাম। কিন্তু পারতাম না, কিছুতেই পারতাম না। কলমকে যারা তুলি করে তুলতে পারে তারাই লেখক। কিন্তু আমার কলম শুধু টেপ রেকর্ডারের মত করে শুধু কণ্ঠস্বরটুকু ধরে রাখে আর কিছু করতে পারে না। কণ্ঠস্বর! কিন্তু আমার কলম কি কারো গলার স্বর ধরে রাখতে পারে? মিষ্ট কর্কশ তরল গভীর কত রকমের গলাই তো আমি শুনেছি! আমি কি পারি তার কোন একটি কণ্ঠকে ধরে রাখতে? আমি তো আমি কোন লেখকই কি তা পারেন? যত বড় বড় লেখকই হন তিনিও তা পারেন না। শুধু মুখের ভাষাটুকু ধরে রাখা যায় তাও সবখানি নয়, খানিকটা। কিন্তু গলার স্বর? তাও কি কলমে ফোটানো সম্ভব? তা শুধু কানে ধরে রাখা যায় মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা যায়। কাগজে কলমে নৈব চ নৈব চ।

নিপ্রার গলার স্বর যে খুব মিষ্টি তা নয়। ওর চেয়েও মিষ্টি গলা মেয়েদের আমি অনেক শুনেছি বরং একটু যেন ভাঙা ভাঙা গলার স্বর। তাতে যে ওর স্বকীয়তা বেড়েছে।

তাই কি? না কি আমি যাকে ভালোবাসি তার গলাই আমার কাছে স্বকীয়, অতিপ্রিয়।

ভালোবাসি? আজও কি ওকে আমি ভালোবাসি। না না না। ওকে আজ আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

১৮ই জুলাই—

রোজই আমি ডায়েরি লিখতে বসি। কিন্তু রোজই কি লেখার মত ঘটনা ঘটে? ঘটনা এখানে একটি মাত্র একদিন মাত্রই ঘটেছে। যে দিন এখানে এলাম। সেদিন থেকে এখানে আমাকে জোর করে ধরে রাখা হল। আমি উন্মাদ—অন্তত মানসিক রোগগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হলাম। মানসিক ব্যাধি? ডঃ মুখার্জি সেদিন বলছিলেন মনের রোগ কার না আছে সুব্রতবাবু? অল্পস্বল্প ব্যাধি নিয়ে আমরা সবাই বাঁচি। আপনি নিজেকে রোগগ্রস্ত বলে ভাববেন না। আপনাকে শুধু বেস্টের জন্যেই এখানে রাখা হয়েছে।

জানিনে ডাক্তারের একথা কতখানি সত্য, কতখানিই বা আমাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে।

রোগ নেই, তবুতো দিনে তিন চার দফা করে ঔষুধ খেতে হয়। সবাই যেমন খায় আমিও তেমনি খাই। যারা স্বেচ্ছায় খায় না তাদের জোর করে খাইয়ে দেওয়া হয়। অন্তত দু'চারটে ধমক চমক তো তারা খায়ই। আমি আর প্রিয়তোষবাবু নির্বিবাদে ওষুধ খাই। সব সময় নার্সরা যে খাইয়ে দেয় তা নয় বরং তারা আমাদের ঘরে ওষুধ খাওয়াতে কমই আসে। ওষুধ খাওয়ায় বাকিপরা হারোয়ান জমাদারেরা। ওরা যখন রুক্ষ রুঢ় গলায় বলে খেয়ে নিন বাবু রোগটা শক্ত কড়া পড়ে যাওয়া হাতে একএকটা টেবলেট মুখের মধ্যে ছেড়ে দেয় তখন ওষুধ তো ভালো অমৃত এনে দিলেও খাওয়ার ইচ্ছা হয় না।

এতকাল আমার তো ধারণা ছিল নার্স মানেই মেয়ে। যদিও বিভিন্ন হাসপাতালে আমি পুরুষ নার্সদের দেখেছি তবু তাদের নার্স বলে আমি মনে মনে স্বীকার করিনি। সব সময়ই মনে হয়েছে নার্সিংটা মেয়েদেরই মানায়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম পুরুষদের ওয়ার্ডে মহিলাদের নামগন্ধ নেই। যারা সেবা করতে আসে তারা প্রহার করবারও শক্তি রাখে। বেছে বেছে সেবকদের সেইভাবেই নিয়োগ করা হয়।

এখানে বাইরে মেয়েদের নামগন্ধ নেই। কিন্তু তারা সব রোগীদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। পকপরে ছক করে করেছ একী সন্ন্যাসী?' ছক করলেও জালা না করলেও জালা। কথাবার্তায় মনে হয় এখানে বেশির ভাগ রোগীরই রোগের মূলে প্রণয়, হতাশ, নৈরাশ্য ব্যর্থতা থেকে নানা ধরণের যৌন বিকার। সে বিকার যদি বেশির ভাগ লোকেরই থাকে তাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

আমি নিজেই এক রোগী অথচ আমিই অপর পাঁচজনের রোগ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি। নিজের রোগকেও বাদ দিইনে। তখন আমি নিজেই যেন একজন ডঃ মুখার্জি। আমি একই সঙ্গে এখানে রোগী আর ডাক্তার, বন্দী এবং মুক্ত। এমন বৈপরীত্য আরো আছে। কোন কোন ব্যাপারে আমি অপরাধী হাতকড়া পরা ফৌজদারী মামলার আসামী আবার অন্যের অপরাধ বিচারের সময় আমিই হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস।

সকাল বেলায় চায়ের পর নার্স অজয় বিশ্বাস খোঁজ নিতে এলেন।

অজয়বাবু বললেন 'ওষুধটা খেয়েছেন সুব্রতবাবু।'

আমি বললাম 'না। রোজ রোজ তিনবেলা ওষুধ খেতে ভালো লাগে না।'

অজয়বাবু হাসলেন 'এ ওষুধ তো তেতো নয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওষুধতো। এসোসিয়েশনটাই খারাপ।'

অজয়বাবু বললেন, 'পরিণামে কিন্তু ভালো। ওষুধ খেয়ে আপনার ভালোই হচ্ছে। টেবলেটটা জল দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। খেতে তো কোন কষ্ট নেই।'

তা নেই। সকাল বেলায় ওষুধ আমরা যে যার নিবিবাদে ঘরে বসেই পাই। কিন্তু দুপুরবেলায় ওষুধ খেতে হয় মধ্যাহ্নভোজনে বসে।

খাবার ঘরের মেঝেয় আমরা সারি সারি রোগীরা বসে যাই। জায়গাটাকে ঘর বলব কি উঠোন বলব ঠিক বুঝতে পারছিনে। খাবার জায়গার ওপরটা অবশ্য ঢাকা। ছাদ আছে। কিন্তু চারদিকটা ফাঁকা। দেয়াল নেই। মেঝেটা ঘরের মেঝেটা অবশ্য বেশ পরিষ্কার। ঝকঝকে তকতকে। খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর লাইজল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। লাইজলের গন্ধ আমার ভারি খারাপ লাগে। কারো কারো ভালো লাগে শুনেছি।

আমরা সারি সারি খেতে বসি। যারা পরিবেশন করতে আসে তাদের কী সব চেহারা। জল দিতে জল্লাদ আসে। ওষুধ খাওয়াতে আসে স্বয়ং যম।

ভাতের গ্রাস মুখে দেবার আগেই হাঁ করে ওষুধ খেতে হয়। প্রত্যেকের মুখে একটি করে টেবলেট ওরা ছেড়ে দিয়ে যায়। গর্তের মধ্যে ঢুকে যেন। আমি অবশ্য বিনা আপত্তিতেই খাই। যারা আপত্তি করে তারা ধমক খায়। জমাদার বলে, 'এই খেয়ে নে খেয়ে নে।'

একটু বেয়াড়াপনা করলেই রোগীদের সঙ্গে ওরা তুই তোকারি আরম্ভ করে দেয়। আমাকে অবশ্য ওরা আপনিই বলে। কিন্তু যাদের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসেছি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার আমার নিজের গায়ে লাগে। মনে হয় আমিও তো ওদের একজন।

অজয়বাবুকে আমি সব বললাম। তারপর অভিযোগ জানিয়ে বললাম 'এ আপনাদের কি ওষুধ খাওয়াবার ধরণ? এ ভাবে ওষুধ খাওয়ালে কি লোকে ভালো হয়? পাগলরা কি আর মানুষ নয়?'

অজয়বাবু বললেন 'এ নিয়ম অনেকদিন ধরে চলে আসছে, আরো অনেক নিয়ম অনেকদিন ধরে চলে আসছে। কে বদলাবে। এখন এখানে কিছু বদলাতে যাওয়া আর এক পাগলামি।'

হেসে বললাম, 'বেশ বলেছেন। এখানে সব কিছুই পাগলামি। দেখে দেখে আপনার কি মনে হয় না অজয়বাবু সারা দেশটাই একটা মস্ত বড় পাগলা গারদ? আমরা কয়েকজন বাঁধা আছি আর বাকি ওরা সব ছাড়া আছে এই যা তফাৎ।'

অজয়বাবু একথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাসলেন। একটু বাদে বললেন, 'আপনার লেখা-টেখা কেমন হয়েছে?'

বললাম, 'সেও তো এক পাগলামি।'

অজয়বাবু বললেন, 'কোথায় যেন পড়েছিলাম কবি, প্রেমিক আর পাগল সব এক ক্যাটেগরি।'

হেসে বললাম, 'আর একটি প'কারাও সঙ্গে বাদ দিচ্ছেন কেন?'

অজয়বাবু বললেন, 'সেটা কী?'

আমি বললাম, 'প্রতিভা।'

অজয়বাবুর হেসে উঠে বললেন, 'ঠিক বলেছেন।'

প্রিয়তোষবাবু নাইতে গিয়েছিলেন। নাওয়ার জন্যে বাথরুমের সামনে গিয়ে লাইন দিতে হয়। গামছা কি তোয়ালে কাঁধে নিয়ে সেখানে গিয়ে সবাই তেল মাখে। জমাদার বড় একটি বালতি থেকে হাতে তেল ঢেলে দেয়। এক টুকরো জবে সাবানও পাওয়া যায়, যদি দরকার হয়। তারপর কমিউনিটি বাথ। বিরাট এক বাথরুমে ঢুকে বড় একটি চৌবাচ্চা থেকে প্রত্যেকে যে যার গায়ে জল ঢালে। অন্যের গায়ে মাথায়ও যে দু-এক মগ না পড়ে তা নয়। একসঙ্গে পাঁচ সাতজন করে স্নান করে নিতে হয়। নইলে সময় বেশি লাগে।

আমি এখানকার নিয়মমত করেছি। সকালে স্নান করে নিই। তখন এত ভিড় থাকে না। দরজা দিয়ে একা স্নান করা যায়। এই প্রাইভেসিটুকু রক্ষার অধিকার আমি পেয়েছি। আমরা একটু সঙ্গ ভালোবাসি আবার নির্জনতাও ভালোবাসি। আমরা প্রকাশ করতে চাই আবার গোপন করতেও চাই।

এই গোপনীয়তা আমার কাছে ভারি প্রিয়। ভারি মধুর। Clandestine কথাটারই যেন আমি প্রেমে পড়ে গেছি। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে ভালোবাসি, লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতে ভালোবাসি আর লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসতে ভালোবাসি। গোপন সম্পর্কের মত এমন মধুরসম্পর্ক আর কী আছে? ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসার কথা লেখা—এই দুটি কাজ যদি আমি পছন্দমত করে যেতে পারতাম আমি যেন আর কিছু চাইতাম না। সবচেয়ে গোপন ভালোবাসা হল যাকে ভালোবাসি তাকেও জানতে না দেওয়া! কিন্তু অতখানি গুপ্ত থাকতে আমার মন চায় না। সে যেন লুপ্ত হওয়ার সমান। যাকে ভালোবাসি সে জানুক এবং জানাক। যাকে দিলাম সে হাত পেতে নিক আমার হাত তুলে দিক। এই দেওয়া নেওয়ার বৃত্ত সম্পূর্ণ। নইলে আধখানা যায় ছোটে। আধা দিয়ে কী হবে। আমি ষোলকলার পূর্ণ যাযাকে চাই?

অজয়বাবু আমার সঙ্গে বিকৃত আলাপ পছন্দ করেন। তা আমি লক্ষ্য করেছি। এও এক ধরণের clandestine relationship. ঘরে যখন আর কেউ থাকে না বাইরে যখন আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসেন।

অজয়বাবু বললেন, 'লিখছেন?'

কী লিখছি সে কথা আর বললাম না।

বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'আমার কথা শুরু করেছেন?'

একথা ওঁকে বলা বৃথা আমি শুধু আমার কথাই লিখতে পারি। আমার কথা আর আমার সঙ্গে যারা একান্তভাবে সম্পৃক্ত তাদের কথা। যারা আমাকে ভালোবেসেছে ঘৃণা করেছে, আদর করেছে, আঘাত দিয়েছে যাদের সঙ্গে আমি সুখ দুঃখে শুধু তাদের কথাই আমার কলমের ডগায় উঠে আসে। সেই তুলনায় অজয়বাবু নিতান্তই একজন বাইরের মানুষ। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু?

তবু অজয়বাবুকে আমার ভালো লাগে। কেমন যেন মনে হয় এই নিরীহ ভদ্র মানুষটির সঙ্গে আমার যেন কোথায় মিল আছে। ওঁর নিঃশব্দ যন্ত্রণা বোধের সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে এক হয়ে যাই। যদিও জানিনে সেই যন্ত্রণাটা কিসের। শুধু মাঝে মাঝে আভাস পাই, অনুমান করতে চেষ্টা করি।

অজয়বাবুকে বললাম, 'আমি আপনার সম্বন্ধে কী জানি যে লিখব। আপনি তো আমাকে কিছু বলেন নি। শুধু বলি বলি করেছেন।'

অজয়বাবু বললেন, 'যাঁরা লেখক তাঁদের কাছে আবার কিছু বলতে হয় নাকি? তাঁরা মুখ দেখেই মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন।'

হেসে বললাম, 'আমি জ্যোতিষীও নই আর লেখকও নই। আমি যদি পেইন্টার হতাম আপনাকে সামনে বসিয়ে আপনার পোর্ট্রেট আঁকতে পারতাম। কিন্তু আমি তো তা নই। আপনি মন না খুললে আমি বুঝব কী করে?'

অজয়বাবু বললেন, 'মন মানে এখানে কি মুখ?'

বললাম, 'তাছাড়া কী?'

অজয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'জানেন তো, নিজের মুখে নিজের কথা সব সময় বলা যায় না।'

হেসে বললাম, 'তাহলে অলসোমার ভাবুন।'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনিই তো আমার সেই অলসোমার।'

'কিন্তু আপনার বক্তব্যটা কি তা তো আমাকে জানতে হবে।'

অজয়বাবু বললেন, 'আচ্ছা জানাব।'

এর মধ্যে প্রিয়তোষবাবু স্নান সেরে এসে ঘরে ঢুকলেন।

অজয়বাবু চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

প্রিয়তোষবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন সেদিকে। তারপর আমার দিকে ফিরলেন, 'মার্ডার বেটা

নিখুঁত ব্লক ও ছাপার
কাজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

**
*

ষ্টিরিও ক্র্যাফ্‌ট্

৪১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আপনাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে।

কী অত গুজ গুজ ফিস ফিস করে তোমার সঙ্গে। সময় নেই অসময় নেই? ওকে অত আস্কারা দিয়ো না।'

আমি মনে মনে হাসলাম। আমার সঙ্গে কাউকে কথা বলতে দেখলেই প্রিয়তোষবাবুর এক ধরণের রাগ হয়, হিংসা হয় আমি তা বুঝতে পারি। যেহেতু আমি ওঁর কমপেট, আমার ওপর যেন ওঁরই একাধিপত্য। আর কেউ আমার ত্রিসীমানাতেও আসতে পারবে না।

প্রেমের সঙ্গে একাধিপত্যের স্পৃহা মিশে থাকে। কিন্তু সে তো যৌনপ্রেমের বেলায় বিপরীত যৌনির ক্ষেত্রে। অন্য ধরণের সম্পর্কেও কি এসব আছে?

প্রিয়তোষবাবু আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় দিন থেকেই আমাকে তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি বয়সে অনেক ছোট। তোমাকে আপনি বলতে আমার নিজেরই কানে লাগে। ভেবেছিলাম তোমার কানেও প্রতিকটু শোনাবে! তুমি নিজে থেকেই বলবে—'

হেসে বলেছিলাম, 'আমি আমার কানে একটু কম শুনি। তাই অনেক প্রতিকটু শব্দও আমার কান এড়িয়ে যায়।'

আমার দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলেছিলেন। তারপর স্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, ফকড় কম নও। মিটমিটে শয়তান।'

ওঁর সেই স্নেহটুকু আমি সেদিন খুব উপভোগ করেছিলাম। কিন্তু তাই বলে এ কী কাণ্ড। তিনি স্নেহ করেন বলে আর কারো সঙ্গে আমি কথা বলতে পারব না? আর কেউ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারবে না?

প্রিয়তোষবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নার্স কী বলছিল? কার নামে লাগাচ্ছিল বলতো?'

বললাম, 'কার নামে আবার লাগাবেন? উনি নিজের জীবনের কথাই বলছিলেন।'

প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। ওই মেনিমুখো পুরুষের আবার জীবন তার আবার একটা কথা। ওর কথা তুমি আমার কাছে বলবে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আপনার কাছে?'

প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। শুধু আমি কেন? এখানকার অনেকেই সেই ফেলেভারীর কথা জানে।'

আমি বললাম, 'যাকগে। ওসব কথায় আমাদের দরকার কি।'

প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'দরকার নেই। নিতান্ত তুচ্ছ বাজে একটা ঘটনা। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। তবু ওই লোকটা তোমাকে শুনাবে এমন ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটেনি। এই নিয়ে একখানা মহাকাব্য লিখতে হবে।'

হেসে বললাম, 'না না, তিনি সে কথা আমাকে বলেন নি।'

প্রিয়তোষবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'বলেনি মানে? আলবৎ বলেছে। তুমি আমার কাছে লুকোলেই হবে?'

ভদ্রলোক যত উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তত আমি ভয় পেয়ে দুপা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। কেমন যেন আমার একটা ভয় হচ্ছিল। ওঁর চোখ দুটো এখন আর স্বাভাবিক নয়। ওঁর চোখের রং বদলে গেছে। দুটি চোখ তো নয় উজ্জ্বল আরক্ত দুটি ধাতু খণ্ড। পরদিনে ক্রোধে, ক্ষোভে নিষ্পেষিত বাসনাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আমার চোখ দুটিও অমন অর্থহীন দুটি বৈদ্যুতির পুঞ্জ হয়ে ওঠে কিনা।

প্রিয়তোষবাবু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'বউ পালাবার গল্প আমার একটা গল্প? তা আমার তুমি লিখবে?'

হঠাৎ তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন, 'তুমি লিখতে পারবে না।'

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বললাম, 'আমি লিখব না। সত্যি বলছি আপনাকে ওর কথা আমি লিখব না। ছেড়ে দিন আমাকে।'

প্রিয়তোষবাবুর উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। তিনি বলতে লাগলেন, 'ছেড়ে দেব? খিটখিটে শয়তান তোমাকে আমি ছেড়ে দেব? তিরিশ বছরের ওকালতী জীবনে তোমার মত অনেক শয়তান দেখেছি আমি। অনেক বাছাধনকে শ্রীঘর দেখিয়ে ছেড়েছি। তোমাকে আমি অমনিতে ছেড়ে দেব?'

হঠাৎ দারোয়ান ছুটে এল। প্রিয়তোষবাবুর গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এই উল্লুক বেয়াদপ কাঁহাকা।'

তারপর টানতে টানতে তাঁকে অন্য এক ঘরে নিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ যে এমন একটি কাণ্ড ঘটবে এক মুহূর্ত আগেও আমি তা ভাবতে পারিনি। আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু আগে আমি ঘটনার কথা ভাবছিলাম। ঘটনার অভাব নিয়ে আক্ষেপ করছিলাম। এই তো একটি ঘটনা ঘটল। এমন অর্থহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা কতই না ঘটে। সেগুলি আমরা কেউ মনে করে রাখিনে। আবার এমন কত ঘটনাই না আছে কত অঘটন। চেষ্টা করলেও সেগুলি সব থেকে মুছে ফেলা কঠিন।

প্রিয়তোষবাবু আজ আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তাঁর জন্যে শুনতে পেলাম আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশে অন্য ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করা হল। কে যেন বলল তাঁর মধ্যে ভায়োলেন্সের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাঁর সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছেন।

আজ আমি সারারাত একা এক ঘরে রইলাম। রাত্রে ঘরের আলো কখনো নেভেনা। হাসপাতালের স্টাফ এসে জেলে দিয়ে যায়। তারাই ভোরবেলায় নিবিয়ে দেয়। অনেক উঁচুতে স্যুইচ বোর্ড। আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। রাতভর পাহারাওয়ালা ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। কোন পেসেন্ট আকস্মিক উন্মত্ততায় কোন অঘটন ঘটিয়ে না বসে সেই জন্যেই বোধ হয় এই সতর্কতা।

আজ অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এল না। শোয়ার আগে রোজই তো আমাদের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়। আজ হয়তো ডোজটা একটু কম হয়েছে। অনেকক্ষণ অবধি আমি জেগে জেগে পাহারা-ওয়ালার পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম।

কেন যেন প্রিয়তোষবাবুর জন্যে আজ আমার মনটা ভারি খারাপ লাগতে লাগল। আজ অন্য একজন পেসেন্টের মুখ থেকে আমি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

আত্মীয়স্বজন কেউ যে আমার কাছে নেই সেজন্যে দুঃখবোধ এরই মধ্যে কমে গেছে। কোথাকার কে প্রিয়তোষবাবু তার কথাই বার বার মনে পড়ছে। আশ্চর্য এই মন। আরো আশ্চর্য তার ব্যাধি।

১৯শে জুলাই,

—আমার পাশের বেডে প্রিয়তোষবাবুর জায়গায় আর একজন নতুন পেসেন্ট এসেছেন।

নতুন মানে হাসপাতালে নতুন নয় আমার ঘরে নতুন। ইনি খুব চুপচাপ থাকেন। দুটি অভ্যাস

ওঁর আমি সঙ্গ করেছি। কোত্থেকে ছোট একখানি আয়না জোগাড় করেছেন। তাতে তিনি কী দেখতে পান কে জানে। যা দেখতে চান তাই পান কি? হয়তো পান। কারণ প্রায়ই দেখি তিনি নিজের মনে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। কার কাণ্ড দেখে হাসছেন জানিনে। নিজের কাণ্ডকারখানায় নাকি জগৎ সুদ্ধ লোকের বোকামি।

যাই হোক ওঁর এই হাসি মুখ দেখে আমার ভারি অস্বস্তি লাগে। অমনিতে মানুষের হাসিমুখ সুন্দর। তবে সেই হাসি প্রসন্ন নির্মল হওয়া চাই। এক ফোঁটা হাসিতে একজন আর একজনকে একটি গোটা পৃথিবী উপহার দিতে পারে। প্রিয়ার কাছ থেকে তো উপহার আমি অনেকবার পেয়েছি। নারীর মুখের একফোঁটা হাসিতে সারা পৃথিবী সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। আমি সেই অতুল অপরূপ সুষমা দু'চোখ ভরে দেখেছি। আবার সেই হাসি যে কী ক্রুর কী নিষ্ঠুর হতে পারে তাও জানি।

কিন্তু আমার এই নতুন রুম মেটের হাসির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর হাসির মধ্যে কোন অর্থ থাকুক আর না থাকুক বলতে আমার কিছু এসে যায়না। এসে যায়না তবু এই হাসি দেখতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। কারণ এই হাসি কোন সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ ব্যাধির অর্থহীন হাসি, অসুস্থতা সংক্রামক। যে এই হাসি দেখে সেও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অজয়বাবু এলেন রাত্রে। ওষুধ খাওয়ানো, শুশ্রূষা পরিচর্যার কাজ যথাবিধি শেষ করলেন। তারপর আমার কাছে এসে চুপচুপে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাল খুব ভয় পেয়েছিলেন তাই না?'

আমি স্বীকার করে বললাম, 'খুব না, তবে ভয় খানিকটা পেয়েছিলাম। উনি যে তখন হঠাৎ—'

অজয়বাবু বললেন 'হঠাৎ নয়, কিছুদিন ধরেই ওঁর একটু বাড়াবাড়ি চলছে। রাত্রে ঘুম হয় না। আরো নানা রকমের উপসর্গ আছে। ইলেকট্রিক শক কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। আজ কি কাল আর একবার দেওয়া হবে। কিন্তু ট্রিটমেন্টে সুবিধে হচ্ছে না। এর মধ্যে দুবার ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছিলেন, আবার সেই লক্ষণ দেখা দিয়াছে।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেসটা কি?'

অজয়বাবু বললেন, 'কেস হিষ্টরি এখানকার রেকর্ড বুকে অবশ্য আমি ভালো করে জানিনে, যতদূর শুনেছি একটা খুনের মামলার সঙ্গে উনি জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

হেসে বললাম, 'উনি নিজেও তো উকিল।'

অজয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ হয়তো কোন কোন খুনীকে উনি বাঁচিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেও জড়িয়ে পড়লেন। সেই ঘট ছাড়াতে ওঁর নাকি সর্বস্ব গেছে অবশেষে মাথাটি পর্যন্ত।'

আমরা দুইজনই মাথার রোগী। কিন্তু অন্য একজনের মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপারটুকু বেশ উপভোগ করলাম। নিজেদের রোগ নিজেদের প্রেম আমাদের কাছে ওজনে যত ভারি অন্যের রোগ অন্যের প্রেম ঠিক তত হালকা।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এবার আপনার কথা বলুন। আপনি কদিন ধরেই কী যেন বলি বলি করছেন, কিন্তু বলছেন না। আজ বলুন।

অজয়বাবু বললেন, 'কখনো বকার ঝোঁক আসে, কখনো শোনার ঝোঁকে পেয়ে বসে। আমার আপাতত বলার ঝোঁক চলে গেছে। এবার আপনি বলুন আমি শুনি।'

ওঁর কথা কটির মধ্যে অন্তরঙ্গ সুর বেজে উঠল। আমি একটুকাল চুপ করে রইলাম। এখানে কদিন ধরে দেখছি সবাই বলবার জন্যে ব্যস্ত আছের কথা শোনার গরজ কারো নেই। একমাত্র অজয়বাবুই আমার কথা শুনতে চাইলেন। সেখাও তো এক ধরণের বলা। কলমের মুখে বলা, তবু শ্রোতাকে কাছে বসিয়ে মনের কথা বলে যাওয়ার মধ্যে এক ধরণের তৃপ্তি আছে। সেই তৃপ্তির স্বাদ আমি যে একেবারে পাইনি তা নয় অনেকবার পেয়েছি। আর কি তেমন করে পাব?

অজয়বাবুকে তখনকার মত এড়িয়ে গিয়ে বললাম 'আমাদের কথা তো ঠিক তোড়জোড় করে আসর জমিয়ে বলবার মত নয়। অল্প অল্প করে শুনবেন। আপনারা বোধহয় শিগগির এখান থেকে আমাকে ছেড়ে দেবেন না।'

অজয়বাবু হেসে বললেন, 'সে কথা কেন ভাবছেন। আপনার তো তেমন কোন শক্ত অসুখ নয়। আপনি হয়তো শিগগিরই ছাড়া পাবেন।'

বললাম, 'পেলে তো ভালোই, যাই হোক, আপনাকে যাওয়ার আগে সব বলে যাব।'

অজয়বাবু বললেন, 'আমি জোর করবনা। আপনার যদি বলতে ভালোলাগে, এখানকার পেসেন্টরা না জিজ্ঞেস করতেই কত কি বলে। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়।'

বললাম, 'আমাকে যদি এখানে বেশিদিন থাকতে হয় আমিও হয়তো আপনাদের কান ঝালাপালা করে তুলব। তখন পরীক্ষা করা যাবে আপনাদের—কানে কত সয়।'

অজয়বাবু বললেন, 'বেশ তো করবেন।'

এড়িয়ে গেলাম অজয়বাবুকে। খাওয়া খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুমের জন্যে এখন আর দাবা দাবনা করতে হয়না। ডাক্তারদাই এখানকার ঘুম পাড়াবার মাসী পিসী। তাঁরাই প্রেসক্রিপসনে সব ব্যবস্থা করে রাখেন।

ঘুম থেকে উঠে দোতলায় গেলাম। সেখানে একটি লাইব্রেরী আছে। সেই সঙ্গে রিডিংরুম, তারই লাগা আর একটি ঘরে ঘুলোঘুলি খেলার ব্যবস্থা। ক্যারম আছে তাস আছে টেবল টেনিস আছে। যার যাতে অভিরুচি।

হাসপাতালের বাইরে আমি তাসটাস খেলেছি কিন্তু এখানে এসে আমার খেলার প্রবৃত্তি হয়নি। এমন কি পড়তেও তেমন ইচ্ছা করেনা। খবরের কাগজের হেড লাইন দেখি। তেমন যেন স্পৃহা বোধ করিনে। আমার দৃষ্টির অড়ালে এই পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তাতে আমার কি এসে যায়। আমার বাইরে যে জগৎ সে জগৎ শুধু কাগজ দিয়ে গড়া। শুধু হাজার হাজার ছাপার অক্ষরের সমষ্টি। তার চেয়ে যা আমার দৃষ্টি গ্রাহ্য তাই আমার কাছে সত্য। আমি যাকে ছুঁতে পারি ধরতে পারি, যার ওপর আমি কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারি, যা আমাকেও প্রভাবিত করে সেই জগৎই আমার জগৎ। না আরো একটি জগৎ আছে তা আরো ভিতরের। world within the world. আমি শুধু আমার সেই আভ্যন্তরীন জগৎকেই স্বীকার করি। সেখানে কত ইচ্ছা অনিচ্ছা, কত বিচিত্র বাসনা কামনা। কত ধস্তাধস্তি গলাগলি কত ঠেলাঠেলি মারামারি। আমার বহু বাসনা সেই জগতের বাসিন্দা। সেখানে লোক গণনা হয়না, কারণ তারা অগণিত। আমার বহুদিনের ইচ্ছা সেই জগতের ইতিবৃত্ত লিখি। কিন্তু বড় শক্ত, সেই খেলার মাঠের ধারা বিবরণী দেওয়া যায়না।

দৈনিক কাগজ ছাড়াও এখানে সপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা আছে। ছেলেবেলায় এই সব কাগজ কত কাড়াকাড়ি করে পড়তাম, এখন আর রুচি নেই। লাইব্রেরী খোলে সকাল সন্ধ্যায়, এখন কাঁচের আলমারিগুলি তালাবন্ধ, বাইরে থেকে বইয়ের চেহারাগুলি দেখা যায়, নামগুলি পড়া যায়, কত বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকের বইসব এখানে রয়েছে। কত গল্প উপন্যাস কাব্য নাটক প্রবন্ধ জীবনী আত্ম জীবনী। এখানকার কোন সেলেক্টের লেখা বই কি আছে জিজ্ঞাসা করতে হবে লাইব্রেরীয়ানকে। না কি সব লেখকই কোন না কোন মেন্টাল হসপিটালের পেসেন্ট? তাই যদি হয় আমার লেখা একখানা বইই বা এখানে থাকবে না কেন? সেলফে আমার জন্যেও জায়গা করে দিতে হবে। আমিও লিখে রেখে যাব একখানি আত্মচরিত।

আইডিয়াটা মন্দ না। It's a good occupation. To write about oonself. একা একা পেশেন্স খেলার মত এই একা একা লেখা। নিজেকে নিয়ে লেখা। লেখা মানেই আত্মচরিত, লেখা মানেই আত্মরতি।

ডায়েরি লেখার চেয়ে আত্মজীবনী লেখা মন্দ নয়। প্রতিদিন কি ঘটল তার পুঙ্খানুপুঙ্খে বিবরণ, না দিয়ে সারাজীবনের বড় বড় ঘটনা আর অঘটনের বিবরণ লিখে রাখা।

আমার জীবনের বড় বড় ঘটনা তাহলে কী। প্রশ্ন। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে অমুকের ঔরসে অমুকের গর্ভে—দূর দূর এ আবার একটা ঘটনা নাকি? শৈশব বাল্য কৈশোর প্রথম তারুণ্য সেইসব দিনগুলির বিবরণ লিখেই বা কী হবে। স্কুল কলেজের শিক্ষক আর অধ্যাপক পাঠ্য তালিকা আর পরীক্ষার খাতায় গাঁথা দিনগুলির মধ্যে এমন কি লেখবার আছে? কিংবা বি.এ. পাশ করবার পর দূর সম্পর্কের দিদি আর জামাইবাবুর বাড়িতে থেকে 'অফিসে অফিসে ফিরি করে বেড়ানোর আমার চাকরি রাখো নি। না এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যে কোন অপূর্বতা নেই, কোন নিগূঢ় রহস্য নেই। আমার আত্মজীবনী থেকে এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা বাদ দেব। শুরু করব সেইদিন থেকে যেদিন দোনাদির সেই চেৎলার বাসায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল। জীবন স্মৃতি সেই স্বর্ণস্মৃতি দিয়ে শুরু করি।

স্মৃতিচারণে হঠাৎ বাধা পড়ল। দশ বছর আগের অতীত থেকে বর্তমানে চলে আসতে হল।

বিকালের দিকে তিজিটিং আওয়ার্সে দাদা আর বৌদি দেখা করতে এলেন।

বউদি ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছেন। লুচি মাংসের ঝোল আর মিষ্টি।

খেতে আমি ভালোবাসি। আমি যা যা খেতে ভালোবাসি সেই সবই নিয়ে এসেছে বউদি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাত বাড়িয়ে খাবারগুলি নিলাম না। বরং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে না দেখার ভান করে বললাম 'কেন এসেছ তোমরা? তোমাদের তো আমি চিনিনে।'

দাদা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর সব বুঝতে পেরে হেসে ফেলে বলল 'হতভাগা কোথাকার। দুষ্টুমি হচ্ছে।'

আমার ভারি অভিমান হল। বললাম, বলল, 'দুষ্টুমি বুঝি তোমরা করনি? ছলে বলে আমাকে এই পাগলে ঠেলে দিয়ে গেছ?'

বউদি বললেন 'ছি ছি ছি। কী বলছ তুমি? এতে ছলে বলের কী দেখলে? এখানে তোমার পারফেক্ট রেষ্ট হবে সেই জন্যেই তো—কদিনের জন্যেই যা। লক্ষ্মী সোনা অমন করোনা আগে খেয়ে নাও।'

ক্যারিয়ারের বাটিগুলি খুলে বউদি নিজের হাতে আমার দিকে সব এগিয়ে দিতে লাগল। মনে

সঙ্গে আমার রাগ জল হয়ে গেল। এখানে এসে নিজেকে ভেবেছিলাম নির্বান্ধব নিঃসহায়। মনে হয়েছিল কেউ আমার খোঁজ খবর নিতে আসবেনা। আমাকে সবাই ত্যাগ করে গেছে। কিন্তু বউদির এই সামান্য স্নেহে আমার আমি সেই স্বজনদের জগৎ ফিরে পেলাম। কী যে আমার মনের এই তীব্র স্পর্শকাতরতা। কারো সামান্য একটু ঔদাসীন্য সহ্য করতে পারিনে। মনে হয় আমাকে বুঝি সবাই অবজ্ঞা করল অস্বীকার করল। আর সেই অস্বীকারের ভিতর দিয়ে আমি একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেলাম। আমার অস্তিত্ব কোথাও আর কিছুমাত্র রইলনা। নিজেকে নিয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে যে স্বয়ং সম্পূর্ণ জগতের কথা আমি মাঝে মাঝে কল্পনা করি তাকে স্থায়িত্ব দিতে পারিনে কেন।

দাদা এর আগে কেন আমার খোঁজ নিতে আসেনি আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। দাদা বলল, বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেনি। বৃষ্টিতে নাকি কলকাতা ডুবে গেছে। তাই নাকি? অত বৃষ্টি হয়েছে। টের পাইনি তো। আমি তাকে দেয়া জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়া দেখেছি। এই অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত আমার ভালোই লেগেছে। যেমন রাজনৈতিক গুলটপালটে সমগ্র জগতের কিছু এসে যায়না তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিও আমার এই জগৎ সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে। গল্প আছে আমার জন্মস্থান বারাণসীকে নাকি শিব তাঁর গাঁজার কলকির মধ্যে ভরে রেখেছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হলেও সেই নগরীর কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কি তেমনি দুর্ভেদ্য প্রাকারে ঘেরা একটি করে নগরী রয়েছে? প্রত্যেকের আছে কিনা জানিনে। আমার মধ্যে আছে সেই নগরীকে আরো সুরক্ষিত করে তুলতে চাই।

২০শে জুলাই—

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। হাসপাতালের ঘণ্টা বেজে চলেছে। সারাদিনে এখন অনেকবার ঘণ্টা বাজে। নাওয়ার ঘণ্টা খাবার ঘণ্টা দেখাশাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ঘণ্টা কত রকমের ঘণ্টাই না আছে ঘণ্টাধ্বনি আমাদের ওঠার বসার নাওয়ার খাওয়ার ঘুমোতে পাঠায়। হাসপাতাল জুড়ে নিয়মের রাজত্ব অনিয়ম শুধু পেসেন্টদের মাথার মধ্যে।

কত ঘণ্টাধ্বনিই না এ জীবনে শুনলাম। আজ মনে পড়ছে ছেলেবেলায় পুরোহিতের ঘণ্টার শব্দ আমার খুব ভালো লাগত। আজ আমি দেব দ্বিজ মানিনে মন্দিরটন্দিরের ছায়া মাড়াইনে কিন্তু একটি মুগ্ধ বালককে মাঝে মাঝে এখনো দেখতে পাই। সে ফুল বেলপাতা দুর্বা শ্বেতচন্দন রক্তচন্দনের দ্রাণে গন্ধে মুগ্ধ হত। নমাবলী গায়ে জড়ানো পুরোহিতের ঘণ্টানাদে উৎকর্ণ হয়ে থাকত। তারপর নিজেও বসত তার খেলার পূজার ঘরে রাধাশ্যামের মূর্তির সামনে স্থূলে একটি পুরোহিত হয়ে। অত অল্প বয়সে যুগল মূর্তি তাকে কেন মুগ্ধ করেছিল কে জানে। সারাজীবন নিজের রাধাকে খুঁজে পাবার ব্যর্থ সাধনায় কাটাতে হবে বলেই কি?

মুগ্ধ হবার মত ঘণ্টাধ্বনি তারপর আরো অনেক শুনেছি। স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা—তার চেয়েও মধুরতর ছিল স্কুলের ছুটির ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ শোনার জন্যে ক্লাসের ফার্স্ট বা লাস্ট বয় পর্যন্ত সেই ঘণ্টার শব্দের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকত।

আর ভালো লাগত আমার গীর্জার ঘণ্টা, এখনো ভালো লাগে। কে জানে ভালো লাগার মূলে

কে আছে? মনোজিনী ডাঃ মুখার্জি হয়তো বলতে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে আসেন আমাকে সঙ্গ দিতে। আসলে আমার রোগ নিরাকরণের জন্যে হয়তো বা নিরাময়ের জন্যেও অবাধ ভাবানুষঙ্গই ওঁর উদ্দেশ্য।

ডাঃ মুখার্জি মাঝে মাঝে এসে বলেন, 'আপনার মনে যা আসে তাই বলে যান। শোভন অশোভন সঙ্গত অসঙ্গত প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কিছু আপনার ভেবে বলবার নেই।'

আমি বলি, 'কিছুই আমার মনে আসে না ডঃ মুখার্জি।'

তিনি একটু কান যেন হতাশ হয়ে থাকেন। তারপর হেসে বলেন, 'ঠিক আছে। আপনি বরং লিখুন। যেমন লিখছিলেন তেমনি লিখে যান।'

তিনি হয়তো ভাবেন এই ডায়েরিই আমার সেই অবাধ ভাবানুষঙ্গ। মন অনুষঙ্গ বুঝিনে। মাঝে মাঝে লিখতে লিখতে আমার ভালো লাগে তাই লিখি। এই লেখা আমি তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখিনে। তেমন দরকারও আমার নেই। লেখাগুলি আমার বিছানার পাশেই পড়ে থাকে। জানিনে ডঃ মুখার্জি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার এই লেখা দেখে যান কিনা। দেখেন তো বলেই মনে।

চেতলায় দিদির বাসা থেকে খানিকটা দূরে ছোট একটি গীর্জা ছিল। সেখানেও ঘণ্টা বাজত। আমার ঘরের জানলা থেকে সেই গীর্জার চূড়া দেখা যেত। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। আর গীর্জার লাগা বেড়া ঘেরা সেই ফুলের বাগানটুকুকে আমার মনে হত একখণ্ড কাব্যগ্রন্থের মত।

সেই নিরিবিলি পাড়ায় চার্চের ছায়ায় সোমাদি একটি সদ্য ষোল বছরের মেয়েকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'জানিস এ কে?'

আমি বললাম, 'না বললে কী করে জানব?'

দিদি বললেন, 'আমার ননদিনী রাঙ্গা বাঘিনী।'

হেসে বললাম, 'হরিণীকে বাঘিনী বলছ কেন দিদি?'

দিদি বললেন, 'দেখছিস শিপ্রা, দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য। অত কাব্য করতে হবে না ভাই। কাব্যে আমাদের বড় ভয়। এই কবির নাম জানিস শিপ্রা? শ্রীমান সুব্রত সেনগুপ্ত। সুবু কাব্যটাব্য রেখে শিপ্রাকে একটু পরীক্ষা ব্যাপারে সাহায্য করো। তাতে কাজ দেবে।'

দিদির কাছেই শুনলাম শিপ্রা সেন্টার বদলে এখানে এসেছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষার্থিনীকে আমি সাহায্য করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কিন্তু কাকে সাহায্য করব? ও আমাকে দেখলেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। এই খান তিনেক ঘর বারান্দাওয়ালা ছোট বাসাটুকুর মধ্যে যে এত লুকোনোর জায়গা ছিল তা কে জানত। ও যত লুকোয় আমি তত ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। চাকরি খোঁজাই যেন আমার বড় কাজ হয়ে উঠল।

তারপর ওকে আমি একদিন ধরে ফেললাম। বললাম। 'তুমি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন।'

শিপ্রা বলল, 'তবে কী করব?'

বললাম, 'আমার সামনে এসে পড়বে।'

ও বলল, 'আপনাকে পড়াতে হবে না। আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।'

হেসে বললাম, 'মানে আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর তোমার বিশ্বাস নেই।'

শিপ্রা বলল, 'তা কেন! আপনি আমার জন্যে কেন কষ্ট করবেন। পিলু আর টিকলিকে তো পড়াচ্ছেনই।'

আমি বললাম, 'না হয় আরো একটি কাউ ব্রাইল।'

ও বলল, 'কী দরকার।'

তারপর ও যখন আমার জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এল, আমি অভিমান করে বললাম, 'কী দরকার তোমার অত কষ্ট করে।'

ও হেসে বলল, 'শোধ নেওয়া হচ্ছে বুঝি।'

এমনি করে শোধবোধের ভিতর দিয়ে ওর পরীক্ষার দিন এসে গেল।

জামাইবাবু রেলে গার্ডের কাজ করেন। ডিউটির জন্যে যাবেন বাইরে বাইরে। শিপ্রার খোঁজখবর নেওয়ার ভার আমার ওপর পড়ল। আমি সেই মধুর কর্তব্যের ভার আনন্দে গ্রহণ করলাম।

পরীক্ষাকেন্দ্র বেশ দূরে। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা স্কুলে। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসি। টিফিনের সময় খাবার নিয়ে যাই বাড়ি থেকে। শিপ্রা কলকাতায় নতুন এসেছে। রাস্তাটাস্তা চেনে না। একজন সাইড না হলে কি ওর চলে?

ও একদিন বলল, 'বোজ তো আপনার মুখ দেখে পরীক্ষা দিচ্ছি। দেখব আপনার পর। পাশ না করতে পারলে সবদোষ আপনার।'

হেসে বললাম, 'আর পাশ করতে পারলে—'

ও বলল, 'তা হলে আর কী। তাহলে বুঝব খেটেখুটে পড়েছি বলেই পাশ করে গেলাম।'

তখন পর্যন্ত আমার পর ভালো ছিল। শিপ্রা ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করল। লেটার পেল ইতিহাসে আর সংস্কৃতে। আমার এতে কৃতিত্ব কিছু নেই। আমি শুধু ওকে সঙ্গ দিয়েছি সাহসে দিয়েছি। কিন্তু ও চিঠিতে জানাল 'তুমি সাহস ভরসা না দিলে আমার রেজাল্ট এত ভালো হত না। যা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

কৃতজ্ঞতাটুকু কী মধুর। একেক সময় মনে হয় আমি যদি এরচেয়ে বেশি কিছু না চাইতাম। সারাজীবন ওই মধুবিন্দুটুকুতেই যদি পরিতৃপ্ত থাকতাম বেশ হত।

শিপ্রা সেবার বেশিদিন দিদির বাসায় থাকে নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কলকাতার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে যেতে ভোলেনি। মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন। কোন কোনদিন আবার ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে দিদিও সঙ্গে আসতেন। কোনদিন বা শিপ্রা শুধু একাই সঙ্গিনী হত। কিন্তু শুধুই সঙ্গসুখ। শুধু একসঙ্গে ভ্রমণের আনন্দ। তারচেয়ে বেশি কিছু না। যখন লোভ করার বয়স তখনো আমি কী সংযতই না ছিলাম। আমার সেই সংযমকে শিপ্রা ভীরুতা বলে মনে করেছিল। কয়েক বছর পরে ঠাট্টা করে বলেছিল 'তোমার মত ভীরু আর দুটি নেই।'

ক'দিনেরই বা আলাপ। তবু যাবার আগে ও আমাকে তুমি বলে গিয়েছিল। অবশ্য আমিই জোর করেছিলাম। চিঠিতেও আমার সেই জবরদস্তি ও মেনে নিয়েছিল।

দিনের পর দিন যেত। মাসের পর মাস। আমাদের দেখা হত না। শুধু লেখালেখি। আজ ভাবি এই চিঠির সম্পর্কই ভালো ছিল। চিঠি এক ধরণের পরোক্ষ সম্পর্ক। ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না। তবু যেন সবই পাওয়া যায়। শিল্প-সাহিত্যের ভিতরে আমরা যেমন জীবনের স্বাদ পাই।

কিন্তু সারাজীবন যদি এই পরোক্ষ প্রাপ্তি নিয়েই ভুলে থাকা যেত তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। মানুষের পরোক্ষ প্রাপ্তিও চাই প্রত্যক্ষ প্রাপ্তিও চাই। যে যাকে পেতে চায় তাকে একান্ত ভাবে পেতে চায়। অল্প-স্বল্প পাওয়ায় তার মন ভরে না।

কিন্তু তখন আমরা কি পরস্পরকে শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত থাকতাম? চিঠির ভিতর দিয়ে আমরা কি কি পরস্পরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা জানতাম না?

ওর খুব ইচ্ছা ছিল কলকাতার কোন কলেজে এসেই ও পড়বে। কিন্তু ওর বাবার সেই সঙ্গতি নেই। দূর সম্পর্কে দাদার বাসায় দীর্ঘদিন থাকাটাও সম্ভব নয়। ও একবার লিখেছিল 'আমি অবশ্য শিলু আর টিকলির প্রাইভেট টিউটর হয়ে দাদা বউদির কাছে থেকে পারি। কিন্তু তা হলে তোমার চাকরিটি যাবে।' আমি তার জবাবে লিখেছিলাম, 'আমার এধরণের চাকরি আরো জুটবে। তুমি চলে এসো। তাতে আমার লোকসান পুষিয়ে যাবে।' কিন্তু ওকে সেই বাসাতেই পড়ে থাকতে হল। ওর বাবা ওকে কিছুতেই কাছ ছাড়া করলেন না। মেয়েকে কলকাতায় রেখে পড়াবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি হিসাব করে দেখলেন বাসে করে মাসিক শহরে যাতায়াত অনেক সস্তায় হবে। মফঃস্বল কলেজে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পড়ে। তাদের কি আর বিদ্যা হয় না? তাছাড়া শিপ্রা তো একা নয়। তার আরো চারটি ভাইবোন আছে। তাদের কথাও তো তাঁকে ভাবতে হবে।

চার বছরের মধ্যে বার তিনেক আমাদের মধ্যে দেখা হয়েছিল। সময়ের ব্যবধান কালের ব্যবধান ওকে দূরে সরিয়ে নেয়নি দেখে আমার আনন্দ হল। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করে ও এসে ভর্তি হয় কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে, হোস্টেলে বাসায় রইল না। সোশ্যাল গ্রাজুয়েট হয়েও সীট পেয়ে গেল।

আমি বললাম 'এত খরচ চালাবে কী করে।'

ও বলল, 'টিউশনি করে পড়ব। দাদাকে বিব্রত করতে ভালো লাগেনা। আর যদি ঠেকেই পড়ি তুমি দু-এক মাসের খরচ চালিয়ে দিয়ো। পারবেনা চালাতে? তুমি তো আজকাল চাকরি করো।'

মার্কেন্টাইল অফিসে চাকরি তখনদিনে আমার জুটেছে। যেন খরচা বাদে যা বাঁচে দুটো বাবা-মাকে পাঠিয়ে দেই। দাদা যে ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে এসেছে আমি তা পারিনি।

সেদিন শিপ্রাকে আর্থিক সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার সত্যিই তেমন ছিলনা, কিন্তু 'দরকার হলে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব' ওর এই কথায় আমি সেদিন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলাম, অবশ্য অল্প স্বল্প উপহার ছাড়া বেশি টাকাও আমার কাছে চায়নি। জানত ও আমার আর্থিক অবস্থা।

জানত কিন্তু মানতে চাইত না।

ওর একমাত্র যুলময় ছিল, 'বড় হতে হবে।'

আমি বলতাম, 'বড়হওয়া মানে কি' বড়লোক হওয়া?'

ও বলত, 'সে কথা কে বলছে? কিন্তু কিছু একটা তোমাকে হতেই হবে। তুমি সাধারণ কেরানী-গিরি আর সঙ্গে একটা দুটো টুইশন করবার জন্যে জন্মাওনি।'

হেসে বলতাম, 'আমি রাজ চক্রবর্তী হওয়ার জন্যে জন্মেছি। তবে হাতী এসে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আমাকে পিঠে বসাবে সেই অপেক্ষায় আছি।'

ও বলল, 'ঠাট্টার কথা নয়। তোমাকে কিছুনা কিছু হতেই হবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো কিছুনা কিছু হয়েই আছি। এই সমাজে হোমড়া চোমড়া হতে হলে বৃহত্তর হোমড়া চোমড়াদের পায়ে যে পরিমাণ তেল দিতে হয়, সেই তেল কিনবার ক্ষমতা আমার নেই, প্রবৃত্তিও নেই।'

শিপ্রা অসহিষ্ণু ভাবে বলেছিল, 'এটা তোমার বাজে কথা। এই সমাজেও আমি আদর্শ সমাজ বলিনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা এখানে রয়েছে। এই সমাজেও যারা যোগ্য যারা গুণী তারা কোন না কোন ভাবে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। হয়তো তারা চতুর হক নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারে। তাদের সেই দক্ষতাকে তুমি দোষের বলতে পারনা।'

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। আমার যোগ্যতায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে শিপ্রা। সেই পাড়া গেঁয়ে মফঃস্বল শহরের সোজা মাষ্টারের মেয়ে, কিন্তু এই কলকাতায় এসে ওর চোখ ফুটেছে, মুখ ফুটেছে, এখানে এসে হয়তো অনেক ক্ষতী হাতের সংস্পর্শে এসেছে শিপ্রা অনেক কৃতী পুরুষকে দূর থেকে দেখেছে দেখেও থেকে সেই সব জ্যোতিষ্কদের তুলনায় আমাকে নিশ্চয়ই ওর খদ্যোৎ বলে মনে হচ্ছে।

এম. এ. পাশ করবার পর ওর এই ধরণের বক্তৃতা আরও বেড়ে গেল। ও জিদ ধরল, 'তোমাকেও এম. এ. দিতে হবে।'

হেসে বললাম, 'তোমার সাবজেকটে ? ইকনমিক্স ?'

শিপ্রা বলল 'ইকনমিক্স হোক বাংলা হোক অ্যানসিয়েন্ট হিষ্ট্রী হোক যে কোন বিষয়ে—'

বললাম, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে শিপ্রা। কিছুদিন আগে যদি এভাবে ইন্‌স্পায়ার করতে তাহলেও হত। এখন আর নতুন করে বিদ্যার্জন সম্ভব হবে না।'

শিপ্রা বলল, 'তা হলে অর্থ অর্জনের দিকে মন দাও। ব্যবসা বানিজ্য শুরু কর।'

হেসে বললাম, 'এবার পথে এসো। তোমার অর্থনীতি পড়া সার্থক। আরো পাঁচটি মেয়ে যা চায় তুমিও তাই চাও। শাড়ি গয়না গাড়ি বাড়ি—।'

শিপ্রা বলল, 'নিশ্চয়ই চাই, কেন চাইবনা। কিন্তু আমি যে শুধু ওই সবই চাইনে আরো কিছু চাই, তার প্রমাণ দিয়েছি। তুমি কিন্তু কোন প্রমাণই দিতে পারনি। নিজের সমর্থনে তোমার কিছু বলবার নেই।

কী হল। আমি ভাবলাম এত দর্প ওর কোত্থেকে এল। ইকনমিক্সে মাঝারি ধরণের একটা সেকেণ্ডক্লাস পেয়েছে আর মফঃস্বল কলেজে একটা মাষ্টারিও জুটে গেছে। তার জন্যে এত ?

বললাম, 'আমার কিছু বলবার নেই একথা তুমি কী করে জানলে ?'

শিপ্রা বলল, 'এর আবার জানাজানির কী আছে ? তুমি কোন দিক থেকেই নিজেকে ডিসটিঙ্গুইশ্ করতে পারনি।'

বললাম, 'I have distinguished myself in my feelings.'

শিপ্রা হেসে বলল, 'তা সবাই পারে। কাজ করাটাই আসল, তোমার ঘৃণা আছে। সমাজের অনেককে তুমি ঘৃণা কর, অনেক প্রথা পদ্ধতি বিধি নিষেধকে তুমি অবজ্ঞা আর উপহাস কর, কিন্তু তোমার সেই নিষ্ক্রিয় ঘৃণায় কার কি এসে যায় ? ঘড়ে আঙুলটি নাড়বারও তোমার ক্ষমতা নেই। তেমনি তুমি হয়তো কাউকে কাউকে শ্রদ্ধা কর ভালোবাস কিন্তু তোমার সেই নীরব অ্যাডমিরেশন কোন কাজে লাগে ?'

কে জানে এসব শিপ্রার নিজের কথা কিনা। না কি অন্য কোন বন্ধু বান্ধবের কথা মুখস্থ করেছে। যেমন নোট মুখস্থ করে পাশ করেছে এও হয়তো তেমনি সেই মুখস্থ করা বুলি।

ওর এক পত্রবন্ধু আছেন প্রৌঢ় সাংবাদিক, তাঁর লেখা তাঁর চিঠিপত্র আমি দেখেছি। তাতে প্রচুর প্রীতিস্নেহ থাকে আবার কিছু কিছু তত্ত্ব টত্ত্বের আলোচনাও দেখা যায়।

যাই হোক আমি ভাবতে লাগলাম। কিছুদিন ওর সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ করলাম না, চিঠিপত্র ও বন্ধ রইল।

আমার সম্বন্ধে ওর মনে যে অশ্রদ্ধার ভাব এসেছে তা আমি লক্ষ্য করে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এই ভাব মোটেই সদ্ভাব বাচক নয় নিতান্ত অভাব ব্যঞ্জক। অবশ্য এই কয়েক বছরে আমি ওর খানিই সান্নিধ্যে এসেছি। আগে আগে ভাবতাম দৈহিক ঘনিষ্ঠতাই বুঝি সব। যে মেয়ে আমাকে চুমু খেতে দিল সে সব দেবে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রাখল। এখন দেখছি তা নয়, চুম্বন আলিঙ্গন যৌন সম্ভোগ সবই বিনা ভালোবাসায় ঘটতে পারে। ও সব নিতান্তই দৈহিক তাগিদ। দুজনের তাগিদের মুহূর্ত যদি মিলে যায় ওসব ঘটতে দেরি লাগেনা। এমন কি পরস্পরকে ভালো না বেসেও পরস্পরের সম্বন্ধে মনের মধ্যে ঘৃণা অবজ্ঞা এমন কি শত্রুতার ভাব পোষণ করেও বোধ হয় নরনারীর দৈহিক মিলন সম্ভব। কিন্তু মনের স্থায়ী অনুরাগ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস ছাড়া বাঁচেনা। একটি নারীর মনে কী করে সেই সম্রদ্ধ প্রেমের অনুভূতি আনা যায় আমি সেইজন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম নতুন করে কিছুই আর আমার হবার ক্ষমতা নেই। আমি না পারব লেখক হতে, না পারব চিত্রকর হতে, না পারব গায়ক হতে, না পারব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কি শিক্ষক হতে। এমন কি রাজনৈতিক কর্মী হওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমার যেমন ধর্ম বিশ্বাস নেই, তেমনি রাজনৈতিক বিশ্বাসও নেই, দুইই আমার কাছে চূড়ান্ত অর্থহীন, গোঁড়ামি। ভেবে দেখলাম আমি যা আছি শুধু তাই থাকতে পারি। এর চেয়ে এক চুল এদিক ওদিক যাবার ক্ষমতা আমার নেই, বিয়ে যা করলে বড়জোর একটি নিরুপদ্রব গৃহস্থ হতে পারি। কিন্তু সেই গৃহ কি আমাকে বেশিদিন স্থির থাকতে দেবে? কী লাভ সেই অস্থিরতা অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে? শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে আমি শিপ্রাকে লিখে দিলাম 'তুমি মুক্ত। তুমি যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পার।'

২১শে জুলাই—

কালকের ডায়েরি ঠিক ডায়েরি নয় স্মৃতিচারণই হয়েছে। কাল কি ঘটেছে তা না লিখে তিনমাস আগে যা ঘটেছিল আমি তাই লিখেছি। এই অতীত বর্ণনায় কী লাভ আমি জানিনে। তার চেয়ে কালকের দিনটির বাইরের ঘটনা লিখলে হত। বাইরের মানে একেবারে বাইরের নয় এই হাসপাতালের ভিতরের। প্রিয়তোষবাবুকে কাল আবার আমার ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে যে সদা হাস্যময় পেসেন্টটি আমার পাশে ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন জানিনে তাঁর জায়গায় প্রিয়তোষবাবুকে দেখে খুশিই হলাম।

প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'কী সুব্রত কেমন আছ?'

বললাম, 'ভালো। আপনি ভালো আছেন তো?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। পক দেওয়ার পর বেশ খিদে পায়।'

বললাম, 'ট্রিটমেন্টটা কী রকম ?'

তিনি বললেন, 'চিন্তা কি। এখানে যখন আছ নিজেরই একদিন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হবে। মাথায় হেডকোনের মত একটা জিনিস পরিয়ে দেয়। খানিকটা টুপির মত দেখতে। মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয় যে ? রাজমুকুট। বিয়ে করেছ ?'

বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তা হলে তো আর মুকুট-টুকুট পরতে হয়নি। এবার পরবে। সেই মুকুটের ওপর দিয়ে শক চালায়। মুকুটের অনেক জ'লা বুঝতে পেরেছ। বিয়ের মুকুটই হোক রাজমুকুটই হোক আর শক থেরাপির মুকুটই হোক।'

বললাম, 'আপনাকে কি জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ?'

প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'না আমি স্বেচ্ছায় হেঁটে গিয়েছি। অনেককেই ধরে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। আমি বীরের মত মাথা উঁচু করে হেঁটে গিয়েছি।'

তাকে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে বললাম, 'সত্যি, আপনার সাহস আছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ভীষণভাবে নাটক হাসপাতালের মধ্যে অভিনীত হচ্ছিল।

শোরগোল শুনে আমরা দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখি একজন লোক খোলা গেট দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আর দু-তিন জন দারোয়ান হৈ-হৈ করতে ছুটছে 'পালাল, পালাল।'

খানিকদূর যেতেই ব্যাটাল। বিরাটাকার কালো কালো সব মোষ শিং নাড়ছে। লোকটি মোষের গুঁতো এড়াতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেল। আর দারোয়ান ছুটে তাকে চেপে ধরল। তারপর মারতে মারতে ফিরিয়ে নিয়ে এল এই বন্দীশালায়। কাছাকাছি আসতে লোকটিকে চিনতে পারলাম। আমাদের প্রকাশবাবু। অমন সুপুরুষ, সুদর্শন ভদ্রলোক মারধোরের পর তাঁর কী চেহারাই না হয়েছে।

প্রিয়নাথবাবু আমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াতে লাগলেন, 'এখান থেকে কি আর পালাবার জো আছে বাবা ? যতই চেষ্টা কর, হাত পা বাঁধা। পালাতে পারবে না। কতদূর যাবে ? আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে। ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। It is a must for you জন্মের পর মৃত্যু। মৃত্যুর পর আবার জন্ম। চলল এই ভেসিসেল রেকারিং।'

প্রিয়তোষবাবু বলে যেতে লাগলেন :

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। গভীর কোন তত্ত্বের কথা নয়, একেবারেই নিজের কথা। ভাবছিলাম কিছুদিন এখানে বাস করার পর আমারও কি এই দশা হবে ? আমি বারবার পালাতে চাইব আর ওরা ধরে ধরে আনবে ? অমনি করে ধরে ধরে মারবে ?

মৃত্যুর পরে কোন অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই। সবাই যেমন একমুঠো ছাই হয়ে যায় আমিও তেমন এক মুঠো ছাই হয়ে যাব। তার কমও না, তার বেশিও না। মৃত্যুর পরে কী হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। মৃত্যুর আগের দিনগুলি নিয়েই ভাবনা। বলা যায় না, হয়তো আমৃত্যু আমাকে এখানে থাকতেই হবে। কেউ কেউ তো তাও থাকে। এই উন্মাদদের দেখে দেখে আমিও হয়তো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাব। পালানো অসম্ভব জেনেও আমি এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করব। আর এখানকার রক্ষীরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে আসবে এ বর্ণনা অন্যের কাছে কতখানি কষ্টকর জানিনে, কিন্তু আমাকে ভারি কষ্ট দিতে লাগল।

বিকালের দিকে এলেন অজয়বাবু। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'একটা সুখবর আছে আপনার জন্যে।'

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি হেসে বললেন, 'আপনাকে বোধ হয় দু'এক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আমি মুহূর্তকাল স্তব্ধশ্বাস হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'সত্যি?'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনার সঙ্গে আরো একটি দুটি কথা আছে। চলে যাবেন?'

ছাদ আমার খুব প্রিয়। কিন্তু এখানকার ছাদে উঠতে ইচ্ছা করে না। এখানকার ছাদে মুক্তির আনন্দ নেই। চারদিকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা। একজন পেসেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ ব্যবস্থা কেন?'

তিনি একটু হেসে বলেছিলেন, 'পাছে আমরা লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি সেই ভয়ে। দেখুন দেখি কাণ্ড, আমাদের সামান্য একটু আত্মহত্যার অধিকার। তাও এরা দেবে না।'

তাঁর কথা শুনে আমিও প্রথমে হেসে ফেলে তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি, আত্মহননের ইচ্ছা আমার মধ্যেও কি নেই? নিজেকে বিলোপ করবার বিলাস আমার মধ্যেই কি কম? ইচ্ছা মৃত্যুর মত সুখের মৃত্যু আর কী আছে? যথেষ্ট সাহস নেই বলে পেরে উঠিনে। নইলে কবে মরে যেতাম।

অজয়বাবুর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ একটি মধুর নারীকণ্ঠ শুনে সভয়ে দাঁড়ালাম, কী ব্যাপার। রক্ত মাংসের কোন মেয়েকে তো এখানে দেখিনি। নারীরা এখানে শুধু চিন্ময়ী, মনোময়ী। এখানে নারী পুরুষের সব সম্বেদনই শুধু ভাব সম্বেদন।

এক নারী আমার জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে। তবু আর একটি নারীর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। দেখলাম বাইশ তেইশ বছরের একটি তন্বী সুশ্রী মেয়ের উলটো দিকের চেয়ারে বসে আমাদের ডঃ মুখার্জি গভীর আলোচনায় মগ্ন।

মুখ মুচকে হাসলাম। আমি কিন্তু সেখানে আর দাঁড়ালাম না। কয়েক ধাপ ওপরে উঠে অজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রসাতলে হঠাৎ যে এমন দেবকন্যার আবির্ভাব হল। কী ব্যাপার বলুন তো।'

অজয়বাবু বললেন, 'উনি একজন সাইকিষ্ট। মনোবিজ্ঞানী, এক্সপেরিয়েন্টাল সাইকোলজি শোল্ড মেডালিষ্ট। ডঃ মুখার্জির সঙ্গে জানাশোনা আছে।'

হেসে বললাম, 'ভালোই তো। এঁদের যত আনাগোনা হয় ততই ভালো। আপনাদের কঠোর কর্তব্য অনেক কোমল আর নরম হয়ে যাবে। এরপর হয়তো পেসেন্টরা মেয়ে নার্সের কোমল হাতের সেবা পাবে।'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনি কি সেই আশায় আরো কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন নাকি?'

বললাম, 'না মশাই। আমার আর কোন আশা ভরসা নেই।'

দুজনে গিয়ে সেই বেড়াজাল ঘেরা ছাদের এক কোণে দাঁড়ালাম।

অজয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনাকে তো একটি সুখবর দিলাম। এবার আপনি যা বলবেন বলেছিলেন তা বলুন। আর হয়তো শোনার সময় হয়ে উঠবে না।'

বললাম, 'আপনি কী শুনতে চান?'

তিনি বললেন, 'আপনার নিজের কথা।'

আমি হাসপাতালের এই কর্মিটির কাণ্ড দেখে অবাক হলাম। এতদিন ধরে এখানে আছেন। নিশ্চয়ই বহু পেসেন্টের অনেক কেস হিস্ট্রী এঁর মুখস্ত। তবু আমার ইতিহাস উনি বিশেষ করে জানতে চাইছেন। একি কৌতূহল না সহানুভূতি? শেষ শুশ্রূষার কথাই ভাবতে আমার ভালো লাগল।

বললাম, 'অজয়বাবু, আমার কথা এমন কিছু বলবার মত নয়। মুখে আমি ভালো করে বলতেও পারিনে। অল্প-স্বল্প তা লিখে লিখেছি। যাওয়ার সময় আপনাকে দিয়ে যাব। কিন্তু আপনার কথা তো শোনা হল না। আপনার কথা বলুন।'

কে জানে অজয়বাবু হয়তো বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। শোনবার প্রস্তাবটা তারই প্রস্তাবনা।

তবু অজয়বাবু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ খুললেন না। চুপ করে রইলেন।

আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠেছে। এই নক্ষত্রলোকই আমাদের মুক্তি লোক? মাঝে মাঝে এই তারা আমাকে বড় পীড়িত করে। দীপ্ত শিখার আগুন জ্বলা আমি ঠিক দেখতে পাইনে। আমার যে কটি তারা তারা শান্ত 'বিষণ্ণ মধুর'। কে জানে হয়তো তারা আমারই মত মৃত কি মুমূর্ষু। কিন্তু তবু তারা আমাকে দূর রহস্যলোকের হাতছানি দেয়।

'নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।'

সেই ধন আমার কোনদিন হবে না। দিনে আমি কোনদিন তারা দেখবো না, দেখতে চাইবও না। কিন্তু আমি যেন রাত্রির তারা দেখতে ভুলে না যাই।

অজয়বাবুর চোখ আকাশের দিকে ছিল না ছিল মাটির দিকে। তিনি কী দেখছিলেন কে জানে।

আমি তাঁকে আর একবার তাগিদ দিলাম, 'বলুন অজয়বাবু।'

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনাকে ঠিক যেমন করে বলব ভেবেছিলাম তা হবে না। একটু বাদেই ভিউটিতে যেতে হবে। আর বলবার তেমন আছেই বা কী। এই শহরের দক্ষিণপ্রান্তে আমার একটি ছোট বাড়ি ছিল। এখনো আছে। নিজের করা নয় পৈতৃক। বাবা মা মারা যাওয়ার পর আমি একাই কিছুদিন সেই বাড়িতে বাস করলাম। তারপর সুন্দরী দেখে একটি মেয়েকে বিয়ে করলাম। একটি মার্চেন্ট অফিসের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে যৎসামান্য একটি চাকরি তার আগে জোগাড় করে নিয়েছি। বউ বেশি লেখাপড়া জানে না। আমি সেদিকে তেমন তাকাইওনি আমি ভেবেছিলাম স্ত্রীর বিদ্যা যদি আমাকে ছাপিয়ে যায় আমি তার কাছে ঠাঁই পাব না। কিন্তু দেখলাম হিসাবে ভুল হয়েছে। বিদ্যা অল্প হলে কী হবে সে নিজেকে ভারি বুদ্ধিমতী মনে করে। তা ছাড়া রূপের জন্যে অহঙ্কারও আছে। আমার এমন গুণ নেই সেই রূপকে ছাপিয়ে যেতে পারে। অন্ততঃ তাই সে মনে করত।

তারপর তার সেই অহঙ্কারের আগুনে হাওয়া দেবার জন্যে এল এক আটিষ্ট বন্ধু। সে বলতে লাগল এমন রূপসী আমি আর দেখিনি। শুধু মুখে না। তুলিতেও সে তা ফুটিয়ে তুলল। আমার স্ত্রী আমাকে বলতে লাগল 'তুমি কী এমন পারো? তুমি শুধু জানো হিসেব নিকেশ। একদিনের জন্যেও এমন কি এক রাত্রির জন্যেও বেহিসেবী হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই।'

অথচ সেই ক্ষমতা আমার বন্ধুর পুরোমাত্রায় আছে। সে দারুণ খরচে। আমার স্ত্রীকেও সে তার মত অমিতব্যয়ী করে তুলল। টাকাটাকে সে মনে করে পয়সার মত। আর আমার রক্তজল করা প্রতিটি

পয়সা এক একটি স্বর্ণমুদ্রা। এই নিয়ে নিত্য ঝগড়াঝাটি। তারপর একদিন ব্যাঙ্কের হিসাবেও গোলমাল হয়ে গেল। মান-সম্মানের ভয় আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। পারছে না গিয়ে আমি এলাম এই পাগলা গারদে।

প্রথম প্রথম ওরা দুজনেই আমাকে দেখতে আসত। আমার স্ত্রী আর আমার সেই বন্ধু। রাশ রাশ ফলমূল নিয়ে আসত। এখানেও অমিতব্যয়িতা। আমি একদিন আমার স্ত্রীকে বললাম, 'ওকে আর এনো না। তুমি একাই এসো।' আমার স্ত্রী তাতে যেন প্রসন্ন হল না। সঙ্গী না থাকলে পথের কষ্ট সহ্য হবে কী করে? তবু প্রথম কিছুদিন আমার স্ত্রী একা একাই এল। তারপর আর এল না। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই অসুখ বিসুখ হয়েছে। কিছুদিন বাদে ছাড়া পেয়ে গেলাম। মুক্তির আনন্দে ছুটে চলে গেলাম বাড়িতে। গিয়ে দেখি ঘরদোর তালাবন্ধ। তারা কেউ নেই। পড়শীরা পরিহাস করে বলল, 'আর দেখছ কি। পাখি পালিয়েছে।'

আমি আবার পাগল সেজে এখানে চলে এলাম। কিন্তু সাজটা খুলেও ফেললাম তাড়াতাড়ি নইলে শুধু ওষুধ না, মারধোরও খেতে হয়।'

যাই হোক এই শক খেরাপি আমার খুব কাজে লাগল। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলামও। দ্বিতীয়বার আর বোধহয় পাগল হব না।'

অজয়বাবু তাঁর কাহিনী শেষ করে ঘরে দাঁড়ালেন না। ডিউটি আছে বলে চলে গেলেন। বোধহয় পালিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে। আমি সেই বেতাতালের ভিতর দিয়ে তারাগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

তারপর এসে আমার এই কাহিনী শেষ করতে বসলাম।

আমার চিঠি পেয়ে পশ্চিমপ্রান্তের সেই মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করল শিপ্রা। বলল, 'এ চিঠির মানে কী?'

বললাম, 'মানে যা বোঝা যায় তাই। এর মধ্যে তো শক্ত কিছু নেই।'

শিপ্রা আমার বুকে অঙ্গুলের উষ্ণতা রেখে বলল, 'শক্ত বস্তু আছে ওইখানে তুমি তো না একখানি পাখর। আমি কি আর কাউকে ভালোবাসি বলে তোমার সন্দেহ?'

আমি বললাম, 'বাসতেও পার। আমার চেয়ে যোগ্যলোকের তো অভাব নেই। তারা তবু অনুভব করে না, কাজ করে এবং কৃতী হয়।' শিপ্রা আমার বুকে মাথা রেখে বলল, 'সেই সব কৃতী পুরুষ আমার নমস্য। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই অকৃতী অভিমানী মানুষটির মত আমি আর কাউকেই ভালোবাসিনে।'

মাসিনে এর মধ্যে সেদিন কতখানি দত্তা ছিল কতখানি ছলনা। কিন্তু আমি সেই ছলনার মধ্যে সেদিন স্বর্গ সুখের স্বাদ পেয়েছিলাম।

আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে শিপ্রা বলল, 'আমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেল। বিয়েটা সেরে ফেলো তাড়াতাড়ি। নইলে যা দেখছি তাতে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'তুমি এখনো ভেবে দেখ। যতদূর জানি তোমার বাবার এতে মত নেই। মা আর ভাই বোনদেরও অমত আছে।'

শিপ্রা বলল, 'তা নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা কিসের? তুমি তো আর আমাদের গোটা

পরিবারটাকে বিয়ে করছ না আমাকেই বিয়ে করছ। বাবাকে আমি রাজি করাতে পারব। সংসার খরচের বারআনি আমিই তাঁকে দিয়ে থাকি। বাবা আমার কথা মানতে বাধ্য।'

বাবার ওপর ওর কতখানি হাত আছে জানিনে কিন্তু বাবার ভাবী জামাতাবাবাজী ওর হাতের মুঠোয়। আমি রাজি হয়ে গেলাম। মাসখানেক মাত্র দুই সময় মিলাম টাকা পয়সার সংস্থার জন্যে।

বাবা মাকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকে মোটামুটি জানিয়ে দিলাম এই সুখসংবাদ। যারা ভেবেছিল আমি বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াই তারা অন্ত খবরটিও শুনুক। আলিপুরের দুখানি ঘরের ছোট একটি ফ্লাট আগে থেকেই বুক করে রাখলাম। বিয়ের পরতো আর মেসে হোটেলে থাকা যাবে না।

মনে মনে ভাবতাম বিয়ের পরে কোন না কোন দিকে আমাকে স্পেশালাইজ করতেই হবে। অধ্যাপিকার যোগ্য স্বামী আমার হওয়া চাই। আকাডেমিক পড়াশুনো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। একটু আধটু গানবাজনা জানি। সুরবোধটা বাড়ানো যেতে পারে! সেতারী বন্ধু নিত্যগোপালের সাগরেদ হয়ে না হয় কিছুদিন থাকব। লেখাটেকার অভ্যাস যেটুকু আছে তাকেও বাড়ানো যায়। কিছু যদি নাও হতে পারি একটি সৎ বিশ্বস্ত সহানুভূতিশীল চিরমুগ্ধ প্রণয়ীকে আমার কবিতা আমার কাছ থেকে উপহার পাবে।

ছুটির জন্যে দরখাস্ত করে দিলাম। টাকাকড়ির ব্যবস্থাটাও করে ফেললাম। শুরু হল উদ্যোগ পর্ব।

মাসখানেক মাত্র বাকি। চিঠিপত্র এবার প্রেসে ছাপাতে দেব। আমার ভাইপো ভাইঝির। বিয়ের ছড়া ছাপাতে চায়। খসড়াটা আমাকে দেখাল। ছন্দটা আমিই ঠিক করে দিলাম।

হঠাৎ নিদারুণ এক দুঃসংবাদ। শিপ্রার বাবা তাঁর সেই মালদহের গ্রাম থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করলেন 'সব বন্ধ কর। বিয়ে বাতিল।'

আমি একবার ভাবলাম পালটা টেলিগ্রাম করি 'এ হুকুম দেওয়ার তুমি কে হে?'

কিন্তু পরমুহূর্তে আমি ভাবলাম এই কাণ্ডেলায় মধ্যে গিয়ে কী দরকার। মেয়ের বাপের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? তিনি তো নামে মাত্র সম্প্রদান কর্তা। আমার ভাবী স্ত্রী স্বয়ংবরা। আমি স্বয়ং তার কাছে চলে যাব। গিয়ে নিয়ে আসব তাকে সঙ্গে করে।

ষ্টেশন থেকে ট্যাকসি করলাম। এর আগে এই পথটুকু রিক্সা-টিকসায় গিয়েছি। কখনো বা হেঁটে। কিন্তু আজ একটি হেলিকোপটার পেলে আমার সুবিধে হত।

পাখা ছোট সুন্দর লেডিজ হষ্টেলটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আশা করেছিলাম ও ষ্টেশনে থাকবে যাওয়ার আগে ওকে আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু ও ষ্টেশনে যায়নি। হষ্টেলের গেটের সামনেও ওকে দেখলাম না ওর ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম ভিতর থেকে বন্ধ। দু'তিনটি টোকা দেবার পর দরজা খুলল।

ও এসে সামনে দাঁড়াল।

আমি দেখলাম আমার সেই প্রণয় প্রতিমা। কিন্তু পাথরে গড়া।

হোষ্টেলের ডানদিকে একটি বোগনভেলিয়ার গাছ সারা লাল হয়ে রয়েছে। আকাশে গোধূলির রং। এই আলোকেই কি কনে দেখা আলো বলে?

ও আমাকে ভিতরে ডাকল না। বরং দোর আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'তোমার কি অসুখ-টসুখ হয়েছে কিছু ?'

ও সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল 'তুমি কেন এলে ?'

আমি বললাম, 'তোমার বাবা এ বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।'

শিপ্রা বলল, 'ঠিকই করেছেন।'

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। তারপর বললাম 'বাইরে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। চল ভিতরে চল।'

ওর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি জোর করেই ভিতরে ঢুকলাম।

বললাম 'ঠিকই করেছেন মানে ?'

শিপ্রা বলল, 'তুমি একটি চীট। তুমি একটি লম্পট।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে ?'

শিপ্রা তখন একগাদা মেয়ের নাম মুখস্থ বলে গেল 'অমুককে চেন ? অমুককে চেন ?'

চিনি যে না অস্বীকার করি কি করে ? এদের কেউ কেউ বারাণসীর মেয়ে, কেউ বা কলকাতার। কিন্তু পরিচয় কি আর এক রকমের ? কেউ বন্ধুর বোন। কেউ বা বোনের বন্ধু।

আমি সে কথা শিপ্রাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে বুঝবে না বলে পণ করে রইল। ওর বাবা নাকি এই দুমাস ধরে গোপনে গোপনে কাশী আর কলকাতার মধ্যে শাটল ট্রেনের মত যাতায়াত করেছেন! আমার এই বোহেমিয়ান লাইফের অন্তরালে কী আছে তা জানবার জন্যে একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা কোম্পানীকে নাকি নিযুক্ত করা হয়েছিল! আমার বিরুদ্ধে অনেক নথিপত্র নাকি তাঁদের হাতে এসেছে।

আমি বললাম 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে, না ওই সব জাল নথিপত্র বিশ্বাস করবে ?'

শিপ্রা বলল, 'আমি বাবাকে অবিশ্বাস করতে পারিনে। তার চেয়ে শুভাকাংক্ষী আমার আর কে আছে ?'

বললাম, 'এই তোমার শেষ কথা ?'

ও বলল, 'এই শেষ।'

আমি পরের ট্রেনেই কলকাতা চলে চলে এলাম। সেই অকৃতজ্ঞ মফঃস্বল শহরের অন্নজল আর গ্রহণ করিনি।

ট্রেনে আমার ঘুম হল না। মেসের ঘরে অনিদ্রা আমার সঙ্গিনী হয়ে রইল।

আমাকে যা আঘাত করেছে তা ব্যর্থ প্রেম নয়, কোন নারীর প্রত্যাখ্যানের বেদনা নয়। আমার সত্তাকে—আমার প্রত্যেকটি স্নায়ুকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে একটি নারীর নীচতা ক্ষুদ্রতা কাপট্য। যাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত কোমলতা, লালিত্য, লাবণ্য পৃথিবীর সমস্ত কাব্য আর সঙ্গীত দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম তার ক্রূরতা আমার মাথার মধ্যে বিষাক্ত কীটের মত কামড়াতে লাগল।

মজহু লায়লীর জন্যে পাগল হয়েছিল। সেই উন্মত্ততাকে যদিও এযুগ পুরো বাস দেবেনা তবু তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মহত্ত্ব আছে। কিন্তু আমি যে বঞ্চিত হলাম, প্রতারিত হলাম তার মধ্যে সান্ত্বনা কোথায় ?

আমি ভাবতে লাগলাম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যে এমন একটা তুচ্ছ মিথ্যা অজুহাত পিপ্রা না দেখালেও পারত. ও সরল ভাবে বলল না কেন, 'আমি মত বদলেছি, তোমার যোগ্যতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

আমাকে আরও অযোগ্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কেন কতকগুলি জাল দলিল দস্তাবেজ এনে হাজির করল ?

আমি বুঝতে পারলাম আমি প্রকৃতিস্থতা হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু আমি প্রাণপণে তা প্রতিরোধ করারও চেষ্টা করেছি।

নিশ্চয়ই পারিনি, পারলে এখানে আমাকে আসতে হতনা।

আমার আত্মীয় বন্ধুদের দোষ দিয়ে লাভ নেই ? সত্যিই তারা আমার হিতাকাংক্ষী।

২২শে জুলাই—

আজ আমার মুক্তির দিন। আমি ভেবেছিলাম আরো দুএকদিন বুঝি দেরি হবে, কিন্তু ডঃ মুখার্জি আজই ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন, সহাস্যে জোরে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন আমার। এত জোর কোন অবলা তাঁকে জুগিয়েছে কে জানে ? যার যেমন ভাগ্য ! কেউ বল হরণ করে, কেউ বল জোগায়।

প্রকাশবাবু প্রিয়তোষবাবু আগে পাশের অন্য পেসেন্টরা আমাকে বিদায় কালীন শুভেচ্ছা জানালেন। কারো কারো চোখ ছল ছল করে উঠল। শুধু সেই চির হাস্যময় রোগীটি এই মুহূর্তেও আমার মুখের দিকে তেমনি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন।'

টেলিফোন পেয়ে আমার ভাই বন্ধুরা এসে হাজির। তারা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র গুছাতে লাগল, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় অজয়বাবুকে আমি একান্তে ডেকে নিয়ে বললাম, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

তিনি বললেন, 'কী কথা বলুন।'

বললাম, 'আপনি এত বড় ঘা খেয়েছেন তবু অঙ্গের ক্ষতে এমন কোমল হাতে প্রলেপ লাগান কী করে। এত জ্বালা নিয়েও এমন যত্ন নিয়ে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা কী করে করেন ?'

অজয়বাবু একটুকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'বললে বিশ্বাস যাবেন না আমার স্ত্রীর সুন্দর মুখখানা এখনো আমি যাকে মাঝে স্বপ্নে দেখি, সে মুখ বিশ্বাসঘাতিনীর নয়। তারপর ঘুম ভেঙে গেলে আমি আমাদের সুখের দিনগুলি নিয়ে মনে মনে নাড়া চাড়া করি, কল্পনা করি শেষের ঘটনাগুলি যেন সত্যিই সত্যিই ঘটেনি ও সব আমার দুঃস্বপ্ন। 'এও এক ধরণের পাগলামি, কী বলেন ?'

জানিনে এ পাগলামি আমার কাছেও প্রশ্রয় পাবে কিনা।

অন্তরীক্ষে

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ॥

বিশ্বের অস্ত্র প্রতিযোগিতায়

আমাদের প্রস্তুতি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ!

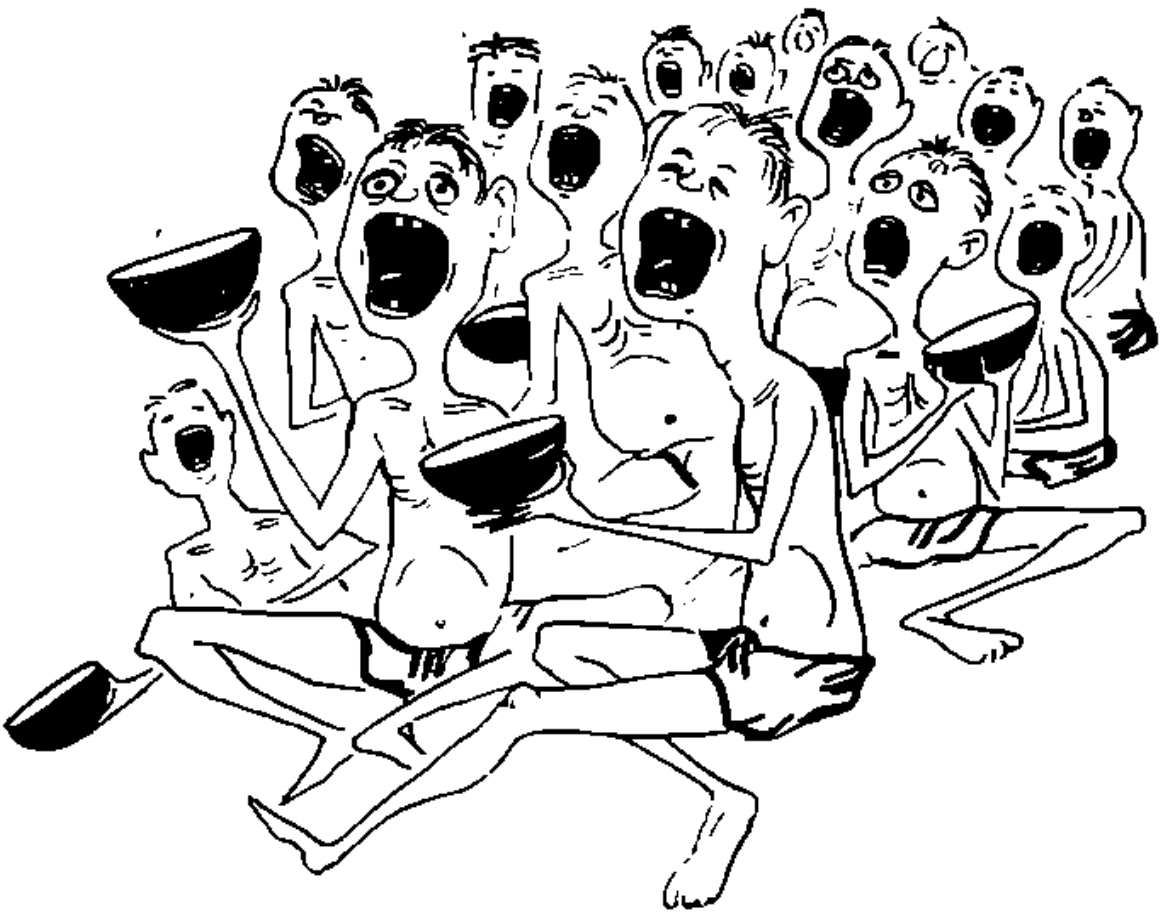

আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে
কেবলি ধ্বনিত হচ্ছে
"মঁয় ভূখা হুঁ"
—হায়রে সুজলা সুফলা!

হিসাবের খাতার বহ্ন্যুৎসব।
কার হিসাব কে দেয় ও কে নেয়।
ভিখারীর দেশ তার আবার হিসাব কি ?

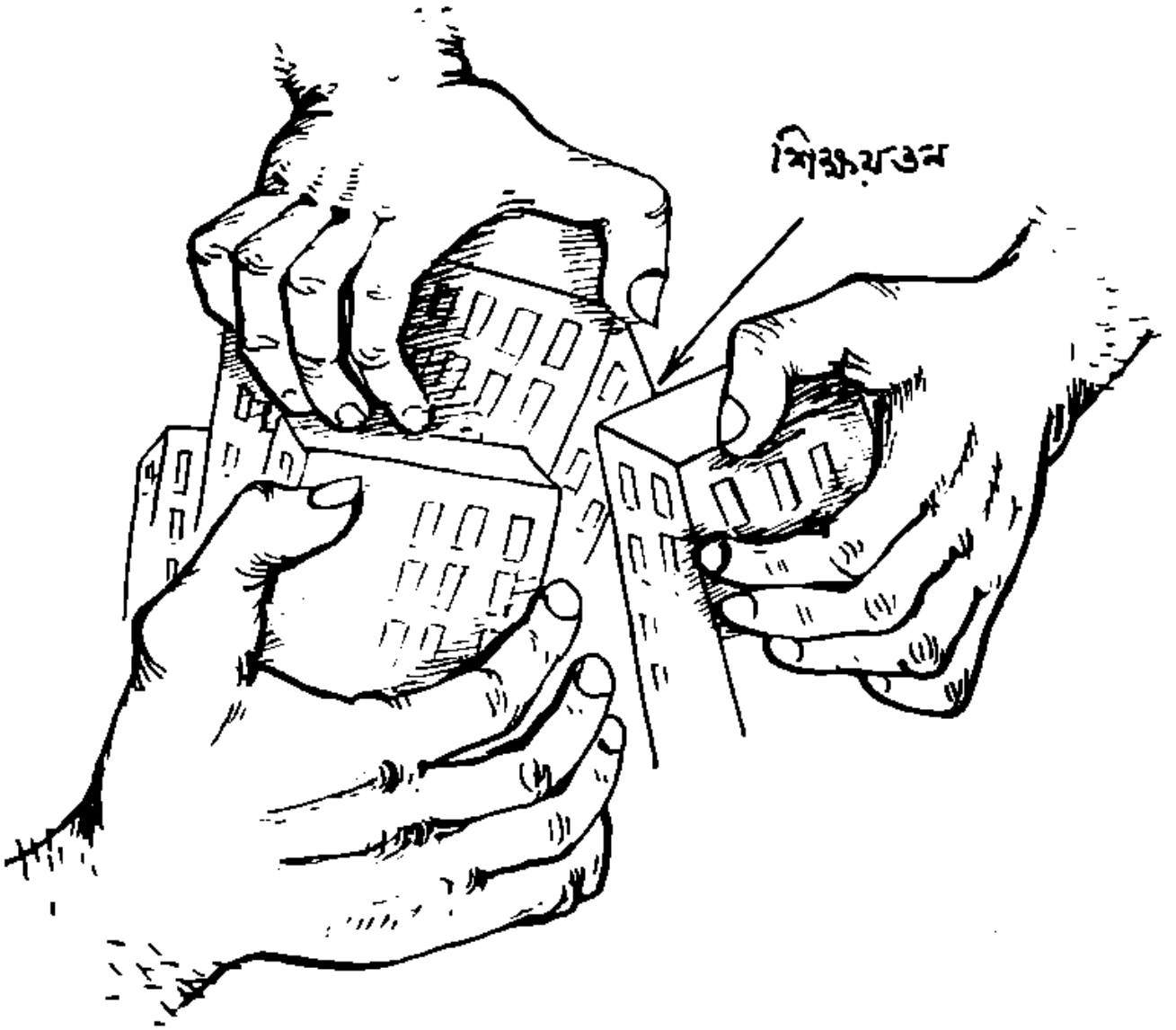

রাজনীতির এই করাল মুষ্টির কবল থেকে
দেশের শিক্ষাকে কে রক্ষা করবে।

ঘর বাঁধা ঘর ভাঙা

// ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় //

রেস্তরাঁর পর্দাটানা কেবিনের নিভৃত কোণটিতে তুমি যে কথাগুলো বলেছিলে সুমিতা, তা আজো আমার দুকানে গুঞ্জরণ করে। শুধু কি কানের পাশেই গুঞ্জরণ, তোমার সেদিনের সে কামনাতুর কথাগুলো আমার রক্তের সমুদ্রে আলোড়ন তুলে আমাকে মাতাল করে তোলে।

তোমার সেদিনের সে ক্ষুধা যে আমারও, তা কি তুমি বুঝতে পারনি?

তোমার সঙ্গে আলাপ আমার এত আকস্মিক যে সাধারণত উঠতি লেখকের গল্পে কিংবা ফিল্মী সিনেমায় নায়ক নায়িকার এভাবে দেখা হয়।

বর্ষণস্নাবিত কলকাতার এক সন্ধ্যা। খুব সাবধানে নতুন মডেলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ীটা নিয়ে চলেছি জল কাটতে কাটতে, হঠাৎ তোমার ওপর নজর পড়ল!

অবশ্য তোমার ওপর নজর না পড়ে উপায়ও ছিল না। একটা দোকানের স্বল্প-প্রস্থ সিঁড়িতে আড়ষ্টভাবে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ। তীরের ফলার মতন বৃষ্টির ফোঁটা তোমার সর্বাঙ্গে বিঁধছে। দোকানে ঢুকে আশ্রয় নেবে সে সাহসটুকু তোমার নেই, অথচ এই ধারাবর্ষণের মধ্যে পথে নামতেও ইতস্ততঃ করছ।

তোমার অসহায় দুটি চোখের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

জানালার কাঁচ একটু নামিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম,

কোন দিকে যাবেন?

উত্তরে এক রকম ছুটে তুমি মোটরের কাছে এসেছিলে।

আমি দরজা খুলে পাশের সীটে তোমাকে বসিয়েছিলাম।

প্রথমে দেখেছিলাম তোমার অসহায় চোখ, এবার দেখলাম তোমার অফুরন্ত যৌবন। চোখে চশমা, একমাথা কোঁকড়ানো চুলের রাশ, কপালে আধুলি সাইজের টিপ। দু ঠোঁটে বোধ হয় খুব হালকা লিপষ্টিকের স্পর্শ ছিল। রং উজ্জ্বল গৌর।

কোন দিকে যাবেন?

আবার প্রশ্ন করেছিলাম।

জানিয়ে দেব।

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তুমি উত্তর দিয়েছিলে।

আমি অবশ্য অতটা যাব না। আমার গন্তব্যস্থান হিন্দুস্থান পার্ক, কিন্তু ডেকে তোমায় পাশে বসিয়ে এমন কথা বলা যায় না।

চৌরঙ্গী পার হতে হতে বললাম, অনেকটা স্বগতোক্তির মতন।

এমন বৃষ্টি, বহুদিন হয় নি।

তুমি তখন মাথা মোছা শেষ করে চশমা মুছছিলে। বললে, বছর তিনেক আগে একবার হয়েছিল। উনিশশো পঁয়ষট্টির তেসরা আগষ্ট।

বিস্মিত হলাম। বললাম,

আপনি কি খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন?

কেন বলুন তো?

বৃষ্টির রেকর্ড সম্বন্ধে এত খুঁটি নাটি আপনার নখদর্পণে।

তুমি হাসলে। বীণার তারে তারে যেন ঝঙ্কার উঠল।

না, না, কাগজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু আমি সেখানে কাজ করি না।

তবে?

এবার তুমি আপাদে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিছুটা কৃপা দৃষ্টিপাত হয়তো।

বাংলা সাহিত্যে আপনার অনুরাগ আছে?

সাহিত্যে অনুরাগ! মনে মনে হোঁচট খেলাম। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে আমার আসবাবের দোকান। ইস্পাতের নয় কাঠের। বর্ষার সেগুন এখন দুর্লভ তাই আসাম আর মধ্যপ্রদেশ থেকে কাঠ আমদানী করতে হয়। অফিস পাড়ায় কিছু বাঁধা খদ্দের আছে। মোটামুটি চলে যায়। কাঠ চিনি, শাল, মেহগনি, জারুল, কিন্তু, কিছু সস্তা ডিটেকটিভ নভেল ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আর কিছু জানি বললে সত্যের অপলাপ করা হয়।

তাই ঘাড় নেড়েছিলাম। নেতিবাচক।

তুমি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, তাহলে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

কেন?

আমি মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখি।

প্রবন্ধ! হতাশ হলাম। হয়তো গল্প উপন্যাস বললে খুঁজে খুঁজে পড়বার চেষ্টা করতাম, কিন্তু প্রবন্ধ পড়ার ধৈর্য আর উৎসাহ দুইই আমার কম।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম,

মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করা শালীনতা বিরুদ্ধ, কিন্তু আপনার নাম জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আমার উপায় নেই।

আমার নাম সুমিতা রায়।

নামটা ছোট। মনে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক। প্রবন্ধ লেখিকার কথা হয়তো মনে থাকবে না। কিন্তু এটুকু চিরদিন স্মরণে থাকবে যে সুমিতা নামে এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা কিছুক্ষণের জন্য আমার সান্নিধ্যে এসেছিল।

ট্রামের লেনের কাছাকাছি আসতেই সুমিতা বলেছিল,

মোটর থামান, আমি এখানে নেমে যাব।

আমি ভেবেছিলাম নিছক ভদ্রতার খাতিরে তুমি হয়তো আমাকে ছোট গলির মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছ না, তাই বলেছিলাম, এতটা যখন এলাম, তখন আপনাকে একেবারে বাড়ীর সামনেই নামিয়ে দিই।

না, না, তুমি প্রবল আপত্তি তুলেছিলে। তোমার সারা মুখ আরক্ত, বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়েও তোমার এমন অসহায় ভাব লক্ষ্য করিনি।

আমি বলছি আমার কোন অসুবিধা হবে না।

কিন্তু আমার হবে।

তোমার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় চমকে উঠেছিলাম।

কথাটা বলেই তুমি বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েছিলে, তাড়াতাড়ি কণ্ঠ মোলায়েম করে বলেছিলে, আমার স্বামী খুব পছন্দ করবে না।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এবার ভাল করে দেখলাম। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। যদিও খুব অস্পষ্টভাবে।

পছন্দ করবেন না? কি পছন্দ করবেন না।

তুমি নামবার চেষ্টায় দরজার হাতল ঘোরাচ্ছ দেখে আমি গাড়ীর ব্রিউট্রাল করে মোটর থামিয়ে ছিলাম।

নামতে নামতে তুমি বলেছিলে,

আপনার মতন এমন সুন্দর পুরুষের পাশ থেকে নামছি এ দৃশ্য আমার স্বামী সহ্য করতে পারবে না।

তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। পথের কোণে কোণে জল জমেছে।

একহাতে শাড়ীটা সামান্য তুলে ধরে রাজেন্দ্রাণীর মতন ভঙ্গীতে তুমি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লে। একটু পরে তোমায় আর দেখা গেল না।

তুমি অদৃশ্য হবার পর অনেকক্ষণ আমি স্টিয়ারীং-এ হাত রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। সামান্য কথার একটু টুকরো কিন্তু সেই টুকরোয় তোমার বৈধব্যময় জীবনের একটা অধ্যায় যেন তুমি উদ্ঘাটিত করে গেলে।

সে রাতে বাড়ী ফিরে বেশ কিছুক্ষণ তোমার কথা ভেবেছি। আমার একটা সুবিধা গৃহিনীর কাছে এ অন্যমনস্কতার জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ আমার মনোরাজ্যে এখনও তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি।

অবশ্য প্রশ্ন করলেও অসুবিধার কিছু ছিল না।

ব্যবসা মন্দা, চিন্তিত হওয়া যে স্বাভাবিক এটা অস্বীকার করার উপায় থাকত না।

একেই বলে অদৃষ্ট।

দিন সাতেকের মধ্যে দেখা হয়ে গেল।

একটা বইয়ের দোকানে আলমারি আর র‍্যাক তৈরির কিছু অর্ডার ছিল। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আমার কর্মচারীই যায়, কিন্তু আমি গিয়েছিলাম কারণ দোকানের মালিক রীতিমত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা শুধু বইয়ের দোকানের মধ্যেই সীমিত নয়, বড় বাজারে বেশ বড় একটা কাপড়ের দোকানও ছিল। সে দোকানের আসবাবও আমিই সরবরাহ করেছিলাম।

বাইরে বসা কর্মচারীদের কাছে খবর পেলাম মালিক ভিতরেই আছে। ঘষা কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকেই অপ্রস্তুত হলাম।

মালিকের সামনের চেয়ারে তুমি।

হাত মুখ নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছ :

বের হয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মালিক বাধা দিল।

আরে আসুন, আসুন চলে যাচ্ছেন কেন ?

বললাম, আপনি ব্যস্ত রয়েছেন। অন্য সময়ে আসব।

কিছু ব্যস্ত নয়। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।

অগত্যা বসতে হল। তোমার পাশের চেয়ারে।

মালিক বলল, সাহিত্যের খবর রাখেন ? ইনিই সুমিতা রায়। ভূদেব মুখার্জীর ওপর এঁর একটা বই আমরা সম্প্রতি প্রকাশ করেছি।

আমি ভেবেছিলাম একেবারে অপরিচয়ের অভিনয়ই করে যাব কিন্তু তুমি তা দিলে না।

বললে, আরে আপনি ? সেদিন যা উপকার করেছিলেন, জীবনে ভুলব না।

মালিকের বিস্ফারিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললাম,

ওটুকু যে কোন ভদ্রলোকেই করত। ও ভাবে বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।

তুমি ছাড়লে না। তবু বললে, তাই যদি হয় তবে এ শহরে ভদ্রলোকের সংখ্যা বোধ হয় কম, কারণ এই রকম পরিবেশে বহু মোটর বিহারী শুধু জল ছিটিয়েই গেছেন, কৃপাকণা বর্ষণ করেন নি।

এইবার মালিক কথা বলল,

আপনারা তাহলে পরস্পরের পরিচিত

আমি হাসলাম।

এক সন্ধ্যার পরিচয়।

তুমি মালিককে সব ঘটনা বিবৃত করলে। এমন রং ফলিয়ে, মনে হল আমি তোমায় চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করেছি।

একটু পরে আমি উঠলাম। তোমার বোধ হয় কাজ শেষ হয়েছিল, তুমিও উঠলে।

বাইরে এসে বললে,

আজ আকাশে এক ছিটে কোঁটাও মেঘ নেই। কি অজুহাতে আপনার গাড়ীতে উঠি বলুন তো ?

মোটরের দরজা খুলে হেসে বললাম,

কোন ছলনার দরকার হবেনা। উঠে আসুন আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুমি উঠে বসলে।

বইয়ের পাড়া ছাড়িয়ে শিক্ষাভবনের এলাকা পার হয়ে মোটর যখন চিত্তরঞ্জনের প্রশস্ত সড়কে এসে পৌছাল, তখন কথাটা বললাম,

আচ্ছা সেদিনের শেষ কথাটার মানে কি ?

তুমি পথের দিকে চেয়ে কি ভাবছিলে, মুখ না ফিরিয়েই বললে,

কোন কথা ?

আমি আবার কথাটা বললাম।

তুমি হেসে উত্তর দিলে, তাই তো বলতে হয়। জানেন না, যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে।

আমি ছাড়লাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,

বিপন্না স্ত্রী যদি অন্য কারো মোটর থেকে নামেন, তাহলে স্বামীদেবতার কষ্ট হবার কি থাকতে পারে ?

তোমার মুখের হাসি তখনও মিলায় নি। আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরিধি কতটুকু ? এত অল্প আলাপে আমার জীবনের সব কথা আপনাকে জানাব কেন ?

অস্বীকার করব না, একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলাম।

বিব্রতভাব ঢাকতে ঢাকতে বলেছিলাম, অবশ্য আপনি বলতে না চাইলে আমি জোর করতে পারি না। স্বাভাবিক একটা কৌতূহল।

তুমি কি ভাবলে তারপর বললে, কোথাও একটু বসতে পারলে হত।

দোকানের সামনে এসে গিয়েছিলাম।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে গরীবের চেকানে পায়ের ধুলো দিয়ে যান। এখন লোকের ভীড় নেই। কথা বলবার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

মোটর থামিয়ে আপ্যায়ন করে তোমাকে দোকানে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম সোজা তুমি চেম্বারে ঢুকবে, কিন্তু তুমি তা ঢুকলে না। ঘুরে ঘুরে দোকানের চারদিকে রাখা আসবাব পত্র দেখতে লাগলে।

সব দেখা শেষ হলে আমার নির্দেশে ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসলে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে,

আমার স্বামী ইঞ্জিনীয়র। খুব নামকরা নন, তাহলে আর আপনার মোটরে আশ্রয় নিতে হবে কেন ; নিজেরই গাড়ী থাকত। ধরুন ছাপোষা ইঞ্জিনীয়র। পাশটাশ করা কিছু নয় হাতে কলমে শেখা। ঠিকাদারী সোপান বেয়ে বেয়ে ইঞ্জিনীয়র। মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীঘর তৈরার কণ্ট্রাক্ট নেয়। বিশ হাজারে বাড়ী করে দেব এমন আশা দিয়ে চল্লিশ হাজারের মতন শুদে তোবায়। লোকে অভিশাপ দিতে দিতে বাকি টাকার ব্যবস্থা করে।

অবশ্য অভিযোগ আমার এ নিয়ে নয়।

মানুষটার অন্তঃকরণের মতন বাইরেটাও কুৎসিত। রোদে পুড়ে জলে ভিজে যে এমন চেহারা হয়েছে তা নয়, আমার বিয়ের সময় যখন আমার বাবার কাছে বিলাত থেকে আহরণ করে আনা ডিগ্রির মিথ্যা ফিরিস্তি দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করেছিল, তখন থেকেই তার চেহারার চটক এরকমই ছিল। আমার বাসর ঘরে বান্ধবীরা আমাকে মুক্তার মালা আর্থা কেন দিয়েছিল, আশা করি বুঝতেপারবেন।

তা বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু এটাই শুধু বোঝা সম্ভব হয় নি তোমার সঙ্গে আলাপের পরমায়ু মাত্র দুটি সন্ধ্যা এই অল্প সময়ে এত কথা কেন তুমি আমাকে বলছ।

এ কথাটা বোধ হয় তোমারও মনে হয়েছিল।

তাই তুমি বলেছিলে আপনাকে এত কথা কেন যে বলছি তা আমি নিজেই জানি না। সম্ভবত নামবার সময় অমন একটা কথা আপনাকে বলে ফেলেছিলাম সেই জন্যই।

কিন্তু আমার পাশ থেকে আপনাকে নামতে দেখলেই আপনার স্বামী চটে যাবেন এমন কথা কেন বললেন।

তার কারণ আমার স্বামীকে আমি আপনার চেয়েও বেশী চিনি।

তুমি মুচকি হাসতে হাসতে বললে।

আমি কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।

বেশ আপনাকে আলোয় আনার চেষ্টা করছি। আমার স্বামীর ইচ্ছা যে সব হতভাগ্য মধ্যবিত্তদের সে ঘায়েল করার জন্য বাড়ীতে নিয়ে আসে, আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, মিষ্টিস্বরে কথা বলি। এককথায় আমার দেহসৌষ্ঠবকে স্বামীর ব্যবসার প্রয়োজনে নিয়োগ করি। দরকার হ'লে নির্মীয়মান বাড়ীর আলমারীতেও যাই স্বামীর সঙ্গে, যাতে বাড়ীর মালিক দরাজ হাতে খরচ করে। বুঝতে পারলেন এইবার। তা না করে আমি সম্পাদক আর প্রকাশকদের দরজায় ঘুরি, আমার স্বামীর কথায় যৌবন ফেরি করে বেড়াই, এটা তার মোটেই পছন্দ নয়।

কিন্তু আমিও তো আপনার স্বামীর মডেল হতে পারি। ভবিষ্যত বাড়ীর মালিক।

উহুঁ, তুমি ঘাড় নেড়েছিলে, আমার স্বামীর ধারণা প্রকাশক আর সম্পাদক ছাড়া আমি কাউকে বিশেষ পাত্তা দিই না। আর খ্যাতনামা অর্থবান প্রকাশক আর সম্পাদকেরা আমার স্বামীর মতন ইঞ্জিনীয়রের প্রত্যাশী নয়।

অস্বীকার করব না, কথাগুলোর যৌক্তিকতা বিশেষ হৃদয় স্পর্শ করল না। বুঝতে পারলাম তুমি কিছু লুকাচ্ছ। মনের গোপন কোন ক্ষত। যেমন আমরা পুটিংয়ের প্লেটের আড়ালে কাঠের ভাঙ লুকাই।

আপনার স্বামীর সঙ্গে একবার আলাপ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে হঠাৎই বলে ফেললাম।

ঠকবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন। আপনাকে নক্সার জালে আবদ্ধ করে ফেলবে। অল্প খরচে সৌধ নির্মানের প্রস্তুতি, তারপর যখন চেতনা হবে দেখবেন সর্বনাশের কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনার স্বামী কি সবাইকেই কেবল ঠকান?

হ্যাঁ, সকলকেই। আমাকে পর্যন্ত।

শেষের কথাটা তুমি বলতে চাওনি, কিন্তু অনেক কথা আমরা বলতে না চাইলেও মুখের ডগায় এসে যায়। চেপে রাখা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে অন্তরের বাধার ফল্গুধারা। বালি সরে গেলেই চিকচিকে জলের রেখা প্রকট হয়ে পড়ে।

তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলে এতটা বলা উচিত হয় নি। বিশেষ করে স্বল্প পরিচিত কোন লোকের সামনে।

চেয়ার ঠেলে তুমি উঠে পড়েছিলে,

এবার উঠি। রাত হ'ল।

রাত্রি তখনও কিশোরী, দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে সেটা বুঝতে পারলাম।

তবু আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।

তুমি বিব্রত হলে।

না, না, আপনাকে যেতেহবে না। আমি একলাই যেতে পারব।

মাঝপথ থেকে বাসে ওঠার অনেক অসুবিধা। তা ছাড়া আমাকে ওপথে যেতেই হবে।

কোন পথে?

তোমার কুঞ্চিত ভ্রু দেখেই বোধ হয় মনে কবিত্ব জেগে উঠল।

বললাম, আপনার পথই আমার পথ।

তুমি হেসে ফেললে,

কি ব্যাপার, কবিতা লেখেন নাকি? কাঠের ব্যবসাটা তাহলে ছাড়বেন।

কোনটা ছাড়বেন বলা মুস্কিল। চলুন বের হই।

দুজনে বের হলাম।

পার্ক ষ্ট্রীটের কাছে এসে মোটর থামালাম।

কি হ'ল যন্ত্র বিকল নাকি?

হাসতে হাসতে বললাম, কোন যন্ত্র?

তুমি কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ না বোঝার ভান করে বললে, ইঞ্জিন যন্ত্র, তাছাড়া আর কি!

নামুন, কিছু মুখে দিয়ে যাই।

তুমি বিস্মিত হবার প্রয়াস করলে।

এখন?

হ্যাঁ, সকাল থেকে আমি অভুক্ত।

তোমার মুখের রং বদলাল।

অভুক্ত? কেন!

বাড়ীতে যে কথাইও ছাওটি ছিল, সেটি প্রত্যুষেই পলাতক। কাজেই গোটা পাঁচ কাপ চা ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি।

তুমি কিছু বললে না। অনুসরণ করে রেস্তরাঁয় এসে ঢুকলে।

কথা বললে কেবিনে আমার মুখোমুখি বসে,

ভৃত্যতন্ত্র থেকে উদ্ধার পাবার ব্যবস্থা করুন। পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

বা, এই তো আপনি পতির বেশ অনুগামিনী।

কেন?

প্রথমে আমাকে গার্হস্থ্যধর্মে দীক্ষিত করতে চান। আপনি জানেন গৃহিনী এলেই গৃহের প্রয়োজন হবে।

টেবিলের ওপর রাখা গোলাপের গুচ্ছ হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তুমি বললে, আপনি কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান।

তোমার বাক্যের শলাকা আমার বুকে বিঁধল।

তুমি শুধু এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিলে। আমার অনেক পীড়াপীড়িতেও কিছু স্পর্শ করলে না। বললে, অসময়ে খাওয়ার অভ্যাস তোমার নেই।

সেদিনও তোমাকে গলির মোড়ে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তুমি বললে, আজ আর এখানে নয়। বাড়ী পর্যন্ত যাব।

কিন্তু—

কিন্তু-র চোরকাঁটা সাড়াতে অনেক আটকেছি। আর নয়। চলুন।

গলির মধ্যে ঢুকলাম।

লাল রংয়ের দোতলা একটা বাড়ী। তোমার নির্দেশে মোটর থামালাম।

এই বাড়ীর একতলায় থাকি।

ভাড়া?

হ্যাঁ, আমার স্বামী বহু বিপন্ন লোকের বাড়ী করে দিয়েছেন বটে, কিংবা বলা যায় বহুলোককে বাড়ী করে বিপন্ন করেছেন, কিন্তু নিজের মাথা গোঁজবার আটচালা করার সম্পত্তি অর্জন করেন নি।

তুমি নামতে আমি চালনচক্রে হাত রাখতে গিয়েই বাধা পেলাম।

কি, পালাচ্ছেন যে? নামুন।

আমি?

আর কে আছে এখানে? নামুন, নামুন।

নামলাম। গাড়ীর দরজা বন্ধ করে তোমার পিছন পিছন চৌকাঠে গিয়েই হোঁচট খেলাম।

দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা খোলা। পর্দার বালাইও নেই।

ঘরের মাঝখানে গোল একটা টেবিল। তার ওপর চোঙটা বোতলে রক্তাভ পানীয়। পাশে গ্লাস নেই, কারণ গ্লাসটি ভদ্রলোকের হাতে।

পরণে গেঞ্জী আর লুঙ্গী। মসী কৃষ্ণ বর্ণ, অমাবস্যা-লাঞ্ছিত, সজারুর কাঁটা সদৃশ খোঁচা চুল। চোখদুটী আবেশে অর্ধনিমীলিত।

আপনার স্বামী?

কণ্ঠে বোধ হয় একটু অবিশ্বাসের ছিটে ছিল।

তুমি তারই সূত্র ধরে বললে, আমার স্বামী যে স্বামীজী নয় এ কথা তো অনেকই আগেই আপনাকে বলেছি।

তুমি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালে।

দরজা খোল।

তারপরই চাপা গলায় আমায় বললে।

সঙ্গে লোক আছে।

অনুমান করলাম তোমার স্বামী কিঞ্চিৎ অসংবৃত অবস্থায় দরজা খুলতে আসছিল, তাই এই সাবধান বাণী।

দরজা খুলে গেল। তুমি সামনে। তোমার বেশ কিছু পিছনে আমি। তোমার স্বামী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল, জরিপ করার ভঙ্গীতে তারপর বলল, ক' কাঠা জমি?

সুমিতা, তোমার স্বামীর পেশা সম্বন্ধে তোমার কাছে আগে শোনা না থাকলে আমি চমকে উঠতাম। রীতিমত অপ্রস্তুত।

বললাম, জমির ব্যাপার নয়, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

আলাপ? আমার সঙ্গে?

তোমার স্বামী যুগপৎ বিস্মিত এবং বিরক্ত।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল কোথায়? মশাই কি লেখেন টেখেন নাকি?

কথার ফাঁকে ফাঁকে তুকা নিবারণের কিন্তু বিরতি ছিল না। আমাকে দেখে কোন রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ, কিছুই নয়।

হেসে বললাম, লিখি। নিজের কারবারের হিসাব।

কিসের কারবার আপনার?

ফার্নিচারের একটা দোকান আছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে।

বা, বা ভাই বলি, আমার স্ত্রী তো চুনো পুঁটি ছোঁয় না। বাড়ী পর্যন্ত যখন নিয়ে এসেছে তখন নিশ্চয় রাঘব বোয়াল।

তোমার স্বামী দেবতা যেভাবে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করল, তাতে ভদ্রতার ছিটেফোঁটা আছে বলে মনে হ'ল না।

তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে। দেয়ালে হেলান দিয়ে। পাংশু বিবর্ণ মুখ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় নিজের অবিবেচকারিতার জন্য অনুতাপ করছিলে। আমাকে এভাবে বাড়ীতে আনার ব্যাপারে।

আলাপটা হ'ল কোথায়? নিশ্চয় আমার স্ত্রী ফার্নিচার কিনতে আপনার দোকানে যায় নি। দেখছেন তো বাড়ীর অবস্থা। আধুনিক ফার্নিচার বলতে ওই স্ত্রীটিই সম্বল।

দুর্দম বাসনা হ'ল খোলা দরজা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বাইরে যাই তারপর মোটরে উঠে এ গলি পার হয়ে যেতে বিশেষ সময় নেবে না। নেবার কথা নয়।

কিন্তু দুমিতা তোমার মুখ চেয়ে এই গ্লানিকর পরিবেশেও দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন কৈফিয়ত না দিয়ে আচমকা এ ভাবে চলে গেলে তোমার ওপর একটা কুৎসিত সন্দেহের বোঝা চাপিয়ে যেতে হয়। সেটা শুধু অশালীনই নয়, অভদ্রজনোচিত।

তুমি এগিয়ে এলে।

কোণ থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে বললে, একি, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন আপনি।

তারপর স্বামীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, তখন থেকে নিজেই তো কথা বলে যাচ্ছ, আমাকে কথা বলার অবকাশ দিলে কোথায়?

তোমার স্বামী কিছু বলল না। বলার মুরসৎ তার ছিল না। বোতল উঁচিয়ে তলানীটুকু পরীক্ষা করছিল। আর গোটা দুই চোঁকের অপেক্ষা।

ইনি নীরেনবাবুর বন্ধু। সাহিত্য প্রকাশের নীরেনবাবু। সেখানেই আলাপ।

অ। তা আলাপটিকে উজান বেয়ে একেবারে বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে এসে যে? চোখ না তুলে, বোতলের দিকে দেখতে দেখতে ভদ্রলোক কথাগুলো বলল।

ট্রামের গোলমাল। বাসে ওঠা অসম্ভব। উনি দয়া করে গাড়ীতে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

বলেন কি? গাড়ী আছে। বাড়ী।

পিতা একটা করে গেছেন, সেটাই ভোগ করছি।

ক'তলা?

ছই

আরো উঁচু করুন। অন্তত আর একতলা। খুব কম খরচে করে দেব। একতলা ভাড়া দেবেন। ওপরে থাকবেন। খরচের একটা এষ্টিমেট করে দেব ?

দেবেন। আজ উঠি।

উঠে দাঁড়াতেই তুমি বাধা দিলে।

সেকি, একটু চা খেয়ে যাবেন না ?

ভদ্রলোক মুচকি হাসল,

হ্যাঁ চা-ই হোক বোতল একেবারে খালি, নইলে একটু সুধার অংশ দিতে পারতাম।

কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না। এমন একটা পরিবেশে থাকতে ইচ্ছা করল না। ওখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

বললাম, আজ চলি। একটি ভদ্রলোকের আমার কাছে আসার কথা।

উত্তরের অপেক্ষা না করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

ইঞ্জিন চালু করার মুখে দেখলাম তুমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। কখন আমার পিছন পিছন বাইরে এসেছিলে লক্ষ্য করিনি।

ভেবেছিলাম, তুমি আমায় আর একটু থাকতে বলবে। তোমার লেখা ছাপা কোন পত্রিকা দেখাবে।

কিন্তু তুমি সে সব কিছু বললে না।

মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে গলাটা চড়ালে। খুব মৃদু কণ্ঠস্বর।

যেখানে একটু থাকতেই আপনি হাঁপিয়ে উঠছেন, আমাকে সেখানে সারাজীবন থাকতে হবে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

কণ্ঠ নয়, যেন দীর্ঘশ্বাস।

প্রথম যেদিন স্বামীর কথা বলেছিলে, সে অভিযোগটুকু মামুলী বলেই ধরে নিয়েছিলাম। স্বামীর স্বাভাবিক ঈর্ষা, কিন্তু আজ তোমার স্বামীর সান্নিধ্যে এসে তার আচার আর আচরণের পঙ্কিল পরিমণ্ডলে কিছুক্ষণ থেকে তোমার অভিযোগ কতটা বাস্তব সেটা উপলব্ধি করতে পারলাম।

একটা ক্লান্তি, একটা বিরক্তির বলয় তোমাকে কেন্দ্র করে, যা থেকে তোমার মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভবের সগোত্র।

সে রাতে সোজা বাড়ী ফিরিনি। লেকের পাশে গাড়ী রেখে হেঁটে হেঁটে জলের সীমানার কাছে চলে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে চেয়েছিলাম জলতরঙ্গের দিকে।

ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোমার সংসারের, সংসারের মানুষটার নগ্ন রূপ দেখতে পাবার পর, আমার সামনে এসে দাঁড়াতে তুমি ইতস্ততঃ করবে।

সাতজন্মে পত্রপত্রিকার প্রবন্ধ পড়ার অভ্যাস আমার ছিলনা। অবসর সময়ে হালকা উপন্যাস কিংবা সিনেমাধর্মী গল্পের ওপর চোখ বুলাতাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হবার, তোমার লেখিকা পরিচিতি জানবার পর থেকে প্রবন্ধের মধ্যেও প্রবেশ করার চেষ্টা করতাম, অবশ্য সে প্রবন্ধ যদি তোমার নামাঙ্কিত হত।

একটি প্রবন্ধ ভাল লেগে গেল। মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে। মাইকেলের বিদ্রোহ, তাঁর

অমিত্রাক্ষর ছন্দের কৃতিত্ব, তাঁর মনীষা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ যাত সম্প্রতি প্রবন্ধকারদের রচনা পড়েছি, কিন্তু তোমার এ লেখাটির চরিত্র আর স্বাদ দুইই আলাদা।

তুমি লিখেছ মাইকেলের সর্বনাশ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। জীবনের পরিমিতি বোধের অভাবের জন্য, চারিত্রিক সংযম না থাকায়, তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা, বিদ্যাসাগরের অমিত দাক্ষিণ্য পেয়েও অকালে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যদি সুস্থভাবে জীবন যাপন করতেন তাহলে দেশকে, দেশের সাহিত্যকে আরো অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। বলিষ্ঠতর রচনা, যে রচনা অভাবের তাড়নায় পশু নয়, দুর্দশাজাত নয়।

মাইকেলের রচনায় সৎ সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা বাহাদুরি নেবার একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। পণ্ডিতদের সংস্কৃত বহুল নাটকগুলি নস্যাৎ করে নিজের নাটক রচনা, সকলে সুশৃঙ্খল মিলের পক্ষপাতী, তাই ভাঙ মিলের আগল। অভিধান খুঁজে খুঁজে দুরূহ শব্দ চয়ন করে দুর্বোধ্যতম লেখার সৃষ্টি করে বাহবা পাবার প্রয়াস। তাই মাইকেলের সাহিত্যে বৈচিত্র্য আছে, গভীরতা নেই।

হয়তো তোমার সব মতের সঙ্গে আমার মিল নেই, কিন্তু মাইকেলের সম্বন্ধে তোমার এই নতুন চিন্তাধারা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল।

একবার ভেবেছিলাম তোমাকে একটা পত্র লিখে প্রশংসাটুকু জানাব। তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে খুব অসুবিধাজনক ছিলনা। প্রকাশক বন্ধুর কাছ থেকে জোগাড় করতে পারতাম, কিন্তু তোমার স্বামীদেবতার সে রাত্রের দেখা মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সাবধান হয়ে গেলাম। আমার এই লিপির জন্য তোমার বাড়তি লাঞ্ছনা ভোগ হওয়া বিচিত্র নয়।

মনে আশা ছিল শহরের কোন বাঁকে হঠাৎ একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু মাস তিন চার কেটে গেল। দেখা হল না।

তারপর আর একটা পত্রিকা হাতে এল। তাতেও তোমার একটা প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে চমকে উঠলাম।

সুলভে গৃহ নির্মাণ। মধ্যবিত্ত আয়ের উপর নির্ভর করে কিভাবে মাঝারি খরচে ছোট খাট বাড়ী তৈরি হতে পারে তার বিবরণ। প্রবন্ধের সঙ্গে একটা নক্সাও ছিল। দুতলা বাড়ীর একটা নক্সা।

বুঝতে পারলাম, নামটা তোমার হলেও মনটা তোমার স্বামীর। এ প্রবন্ধ রচনায় লেখা নির্দেশ তার।

জানি না কেন, মনটা বিরূপ হয়ে গেল। তোমার ওপর, তোমার রচনা শক্তির ওপর। তোমার প্রতিভাকে এভাবে পণ্য করে তোলার কি প্রয়োজন ছিল।

এক সন্ধ্যায় চেম্বারে বসে সে মাসের আয়ব্যয়ের হিসাব করছি বেয়ারা একটা স্লিপ দিয়ে গেল। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা, সুমিতা রায়।

বুঝলাম, শুধু মাসের কেন, সারা জীবনের হিসাব বানচাল করে দেবার পক্ষে এই একটা নামই যথেষ্ট।

কাগজের এ জঞ্জাল সরিয়ে সোজা হয়ে বসে বললাম, নিয়ে আয়।

কণ্ঠে যথাসম্ভব নিস্পৃহতার সুর ফোটাবার চেষ্টা করেও সফল হই নি।

তুমি এলে। যেন একটু মলিন। বাসি রজনীগন্ধার মতন।

কেমন আছেন ?

প্রশ্নটা আমার করার কথা, কিন্তু তুমি করলে।

বললাম, চলে যাচ্ছে। আপনি কেমন ?

কোন উত্তর দিলে না। চেয়ার টেনে বসে পড়লে।

আপনার একটা প্রবন্ধ পড়লাম।

তুমি কিছু বললে না। ভ্রূযুগ তুলে একদৃষ্টে দেখলে আমাকে।

ইচ্ছা করেই বললাম, আপনার সস্তায় গৃহ নির্মাণ কৌশলের প্রবন্ধটা।

চকিতের জন্ত মুখের ওপর ম্লান একটা ছায়া ভেসে গেল। তবে ওই চকিতের জন্ত।

বললে, ওটাই আমার জীবনের ট্রাজেডী।

কোনটা ?

লোককে সস্তায় গৃহ তৈরি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অথচ আমার নিজের একটা গৃহের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন।

আমার কিন্তু অন্ত কথা মনে হ'ল।

কি ?

এ প্রবন্ধে আপনার স্বামীর ছায়া রয়েছে। কলম হয়তো আপনার, কিন্তু কথাগুলো তার।

তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলে। নতমুখে। টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁক কাটলে; তারপর মাথা তুলে একসময়ে বললে,

আমি আর আমার স্বামীর সঙ্গে থাকি না।

চমকে উঠলাম, সেকি ? ডিভোর্স ?

না, অতটা হয় নি ? তবে শেষ বোঝাপড়া হয়ে গেছে। আমরা আলাদা থাকি, সে সেই বাড়ীতেই আছে, আমি থাকি একটা মেয়ে হোষ্টেলে।

তাহলে আপনি এ প্রবন্ধ লিখেছেন কেন ? স্বামীর ব্যবসার সুবিধার জন্ত ? এতদিন একসঙ্গে ছিলেন, সেইজন্ত অনুকম্পাবশত ?

না, তুমি ঘাড় নাড়লে, সে সবের জন্ত নয়। আমার স্বামী লোকদের সচরাচর যে খরচ বলে তার চেয়ে যে অনেক কম খরচে বাড়ী করা সম্ভব সে কথাই প্রবন্ধে লিখেছি।

এতে লাভ ?

লাভ হয়েছে। স্বামী দুদিন হোষ্টেলে এসে শাসিয়ে গেছে।

এ সর্বনেশে খেলায় যেতে তোমার কি লাভ বুঝতে পারলাম না। সব স্বামীর সঙ্গে সব স্ত্রীর বনিবনা না হতে পারে। তার জন্ত দুজনের আলাদা জীবন বেছে নেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু এভাবে অযথা অশান্তির সৃষ্টি করা অর্থহীন। তোমার স্বামীর অযথা উত্তেজিত হওয়ারও কোন মানে হয় না। যারা বাড়ী ঘর করে তারা প্রবন্ধ পড়ে এগোয় না। তাদের উপদেশ দেবার বহুলোক থাকে। অনেক পরামর্শ কানে বর্ষিত হয়।

এ সব কথা কিছু বললাম না। আর এক বাড়ীর মনকষাকষির জঞ্জাল আমার দোকানে হাজির করার কোন সার্থকতা নেই।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মনে হ'ল এতক্ষণ পরে তুমি আসল কথাটা পাড়বে।

কি বলুন?

আপনার তো অনেক জানাশোনা। প্রতিপত্তিশালী মহলে ঘোরাফেরা করেন, আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন। ঝগড়াঝাটি করে স্বামীর কাছ থেকে যা সামান্য আদায় করতে পেরেছি, তাতে অনেক দিন চলবে, এমন ভরসা কম।

মনে মনে খুব আশা পোষণ করি নি, তবুও মুখে ভরসা দিলাম,

চেষ্টা করব।

এই নিন হোটেলের ফোন নম্বর। কিছু সন্ধান পেলে দয়া করে জানাবেন।

তুমি চলে যাবার পর যখন দুইং দরজাটা থর থর করে কাঁপছিল, তখন মনে হল, তোমাকে কিছু একটা দেওয়া উচিত ছিল। চা কিংবা শীতল পানীয়।

জানি না, তুমি আরো বেশী প্রত্যাশা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে কিনা।

সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চাকরির ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারি নি। কাউকে মুখ ফুটে বলাই সম্ভব হয় নি।

আমি স্বভাব-ভীরু। নিজের কারবারের কথাই কাউকে জোর গলায় প্রচার করতে সঙ্কুচিত হই। এ জগতে নিজেকে জমজমাট হতে হয়, তা না হলে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

দু একটি পদস্থ বন্ধুকে তোমার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেছি। কি জানি, তারা যদি বাঁকা চোখে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে তোমার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা নিরিখ করতে চায়। অনাত্মীয়া, সুন্দরী, বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে পৃথক থাকা মেয়ের জন্য দরদের এই উৎস সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়!

তাহলে, কি বলব তাদের?

বলব, কোন এক বর্ষণ মুখর বেদুর সন্ধ্যায় নিজের মোটরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আলাপের সূত্রপাত সেই থেকেই।

সেটা তো সূত্রপাত। তার পরিণতি? তারা জানতে চাইবে, তোমার রূপের এ আগুন আমার বুকের কড়িকাঠ পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা?

তবে একদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ভেবেছিলাম, তুমি নিজেই ফোন করে খবর নেবে, কিন্তু তা তুমি করনি।

এমনও হতে পারে, অন্য কারো আনুকূল্যে হয়তো তুমি চাকরি পেয়ে গেছ। সুন্দরী তরুণীকে অনুগ্রহীত করার লোকের অভাব পৃথিবীতে, নেই। অন্তত আজকের পৃথিবীতে।

ও কথা ভেবে আমার ব্যথা অনুভব করার কথা, কিন্তু বুকের মাঝখানে একটা কাঁটা বিঁধে থাকার মতন যন্ত্রণা।

নিষ্কৃতে আমার মনের চেহারা দেখে তুমি পেলাম। এত সামান্য আলাপের ওপর ভিত্তি করে আকিঞ্চনের সৌধ নির্মাণ করার মতন মূর্খতা আর নেই।

মাস তিনেক কেটে গেছে।

মিথ্যা বলব না, মোটর চালাতে পথে ঘাটে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। যেখানে অফিস ফেরত মেয়ের ঝাঁক দেখেছি, সেখানেই খুঁজেছি।

না, তুমি নেই। হয়তো তুমি আর এ শহরেই নেই। দূরে কোথাও চলে গেছ। এ শহরে তোমার অনেক অসুবিধা। স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। নিতান্ত মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে কথা বলার চেষ্টাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কথা মানে কথা কাটাকাটি তাও তো হতে পারে।

এক রাতে চৌরঙ্গীর এক সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে মোটরের দিকে যেতে গিয়েই থেমে গেলাম।

কেমন আছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হল।

একেবারে ফুটপাথের সীমানা ঘেঁষে তুমি।

একটু যেন কৃশ, একটু ম্লান মনে হ'ল। কিংবা এ আমার চোখের ভুলও হতে পারে।

ফিরে এলাম।

প্রতি-প্রশ্ন করলাম,

আপনি কেমন?

খুব খারাপ। আমার চাকরির কি হ'ল?

তোমার কথায় আকৃষ্ট হয়ে দু' একজন পথচারী মুখ তুলে দেখল।

শুধু তোমার দিকে নয়, আমার দিকেও।

নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললাম,

চলুন কোথাও একটু বসা যাক।

দু'জনে এক রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। রেস্তরাঁটি ছোটখাটো। কিন্তুটা নিরিবিলি।

কেবিনে ঢুকেই আমার মুখোমুখি বসে তুমি বললে,

বলুন আমার চাকরির কি করলেন?

উত্তর দিতে গিয়ে থামতে হল। বয় এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজের জন্য চা আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে তোমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম,

আপনার জন্য কি বলব?

তুমি যা বললে তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

বললে রেস্তরাঁয় ভাল জিনিস যা আছে সব অর্ডার দিতে পারেন। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি।

রীতিমত লজ্জায় পড়লাম বয়ের সামনে তোমার এ ধরণের কথায়।

আস্তে আস্তে বললাম, অবশ্য বয়কে অর্ডার দেওয়া শেষ করে।

অনেকদিন আপনার দেখা না পেয়ে আমার ধারণা হয়েছিল আপনি কোন কাজে লেগে গেছেন।

কিছু কিছু কাজ করেছি। যেমন ধরুন নিস্তারিনী বালিকা বিদ্যালয়ে পনেরো দিনের মাস্টারি একজন শিক্ষিকার বদলী, তারপর এক পারফিউমারীর কারখানায় মেয়ে কেরানী।

সেটাও কি সাময়িক? কারও বদলী?

না তা নয়, কিন্তু আশপাশের বাবুরা যে ভাবে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করতে লাগলেন, সেখানে থাকতে আর সাহস হল না। তাও থাকতাম, পেটে খেলে পিঠে সয়, যদি মাইনেটা ভদ্রগোছের হত।

কিন্তু এ ভয় তো আপনার সব ডাক্তারেতেই রয়েছে। অফিসেও কি নিস্তার পাবেন।

তুমি মাথা নাড়লে, না, অফিসে সবাই শিক্ষিত। তারা এ ধরণের আচরণ করবে মনে হয় না।

তর্ক করলাম না বললাম না এ ব্যাপারে শিক্ষা অশিক্ষার প্রশ্ন নেই। এ অন্ধকার সকলের মধ্যেই আশ্রয় নিতে পারে।

খাবার এসে গেল।

তোমার খাওয়ার ধরণ দেখেই বুঝতে পারলাম কতক্ষণ তুমি অভুক্ত।

খেতে খেতেই আমার কি জিজ্ঞাসা করলে।

আমার চাকরির জন্য আপনি কোন চেষ্টা করেন নি, তাই না?

বিব্রত হলাম, কিন্তু বিব্রত ভাবটা চাপিয়ে বললাম,

চেষ্টা করিনি কে বললে, ঠিক মনের মতন কিছু পাচ্ছি না।

কার মনের মতন? আপনার না আমার?

প্রশ্নের খোঁচাটা কৌশলে এড়িয়ে গেলাম।

চাকরি যখন আপনি করবেন, তখন আপনার মনের মত নিশ্চয়।

আমার মনের খবর আপনি পেলেন কি করে?

খেয়ে নিন। রাত বাড়ছে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই, তারপর তুমি বললে।

আপনার দোকানেই একটা চাকরি দিন না।

আমার দোকানে? আমার দোকানে কি চাকরি করবেন? তাছাড়া ওই তো আমার ছোট দোকান। ওখানে আপনার মতন মেয়ের চাকরি কোথায়?

আসল কথা তা নয়।

মানে?

মানে, আমাকে কাছে রেখে আপনি ভরসা পাচ্ছেন না। নিজের ওপর আপনার বিশ্বাস নেই, বেশ তো একটা কাজ করুন।

অনুভব করতে পারলাম, তালু শুকিয়ে কাঠ। দুটো গালে নিশ্চয় রক্তিম আভা ফুটে থাকবে। ঠোঁটদুটো এত কাঁপতে শুরু করেছে, যে তোমার কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর।

খুব মৃদুকণ্ঠে, মুমূর্ষু রোগীর কণ্ঠে বললাম,

কি?

আমাকে হয় একটা চাকরি দাও, কিংবা একটা সংসার দাও। দুটোই তোমার হাতে।

আচমকা এমন একটা অনুরণন সম্বোধনে রক্তের সমুদ্রে জোয়ার জাগাল। এত তীব্রতার বেগ মনে হ'ল দেহের তটের বাধা, ভেঙে বন্যার মতন আমার সত্তাকে ডুবিয়ে দেবে।

অস্বীকার করব না, ভয়ে লাভ নেই, দুর্বল মুহূর্তে এমন একটা চিন্তা, এমন একটা স্পৃহা আমাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। মুখ ফুটে বলার সাহস হয় নি।

আজ তুমি বললে মুখ ফুটে, কিন্তু উত্তর দেবার সাহস পেলাম না।

কি হ'ল তুমি তো বিয়ে থা কর নি। কোন অসুবিধা নেই কোথাও। আমাকে একটা ঘর দাও, একটা আচ্ছাদন। এমন অবাঞ্ছিত, আশ্রয়হীন অবস্থায় আমার বাঁচা অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার দুটো হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে। নিজেকে সমর্পণ করছ এমন একটা ভঙ্গী।

উত্তর দেবার দুর্বার একটা ইচ্ছা হ'ল কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করলাম। করতে হ'ল, কারণ তোমার এই পিপাসার্ত ক্লান্ত ছবির পাশাপাশি আরো কয়েকটা ছবি ফুটে উঠল।

প্রথম ছবিতে সাত্ত্বিক চেহারার প্রশস্ত ললাট সুগৌরবর্ণ, উপবীতধারী শিখাযুক্ত যে রূপ ভেসে উঠল, তা আমার পিতৃদেবের।

বর্তমানে তিনি কাশীবাসী, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দু মাসে একবার, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুখানা চিঠি আসে। সে চিঠি আসে উপদেশের মালাবলী জড়িয়ে। সংপথে বিবেক বিধৃত জীবন অবলম্বন করার নির্দেশ। কারবারের প্রতিটি পাই পয়সার হিসাব পাঠাতে হয়। দৈনিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ।

বয়স যে সব সময়ে সাবালকত্বের প্রমাণ নয়, আমিই তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

তারপর যাঁর ছবি মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তিনি আমার মা। গোঁড়া, ঈশ্বর বিশ্বাসী কঠোরভাষী! যার অভিধানে ক্ষমা বলে কোন শব্দ নেই।

আমি অব্রাহ্মণ কন্যা, বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা একজনের পাণি গ্রহণ প্রয়াসী এমন কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁদের কানে গেলে আমার কি অবস্থা হবে, ভাবতে শিউরে উঠলাম।

কোনরকমে আড়ষ্টকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম,

আমাকে অন্তত তিনদিন ভাবতে সময় দাও।

তিনদিন কেন? অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করবে? তোমার মা বাবা কে আছেন?

নিষ্প্রভ গলায় বললাম,

বাবা মা দুজনেই আছেন। তাঁরা কাশীতে।

অঃ।

তুমি উঠে দাঁড়ালে।

যাবেন তো চলুন।

অন্তরঙ্গতা পরিহার করলে সেটুকু মান বাঁচাল না।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। পাশাপাশি হেঁটে নয়। তুমি আগে আমি পিছনে। প্রথমদিকে মোটরে একটি কথাও হ'ল না।

আমি দু একবার নিস্তব্ধতা ভাঙবার চেষ্টা করেছিলাম, সফল হই নি। মনে হ'ল, তুমি কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

অবশ্য চিন্তার তোমার কূলকিনারা নেই। কলকাতা শহরে, যেখানে পথের বাঁকে বাঁকে

সর্বনাশের গহ্বর, ঘরে ঘরের বাইরে পাপের অন্তহীন বন্যা, হোটেলে রেস্তরাঁয় লোভার্ত হাতছানি সেখানে ভর্তৃহীনা স্তনপা নারীর বিপদ প্রচুর।

কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, ক্ষেমমুক্ত করার আশ্বাস এ সম্বল আমার নেই।

কিছুটা এগিয়ে তোমার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলাম।

গম্ভীর নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর এল,

সোজা চলুন। আমি বলব।

তোমার নির্দেশে এক গলির মোড়ে মোটর থামালাম।

বললাম, কোন বাড়ী ?

তুমি দরজা খুলতে খুলতে বললে, গলির মধ্যে।

গলিতো বেশ প্রশস্ত, মোটর যেতে পারে।

তুমি ফিরে দাঁড়ালে।

এখানে আলোর প্রাচুর্য নেই। দীপগুও বেশ একটু দূরে। আকাশেও কোন নক্ষত্রের বাহার নেই।

আকাশে নেই, কিন্তু নক্ষত্রের ঝিলিক দেখলাম তোমার দুটি চোখে।

গলি প্রশস্ত হতে পারে কিন্তু নিজের কলঙ্কের পথটা আর প্রশস্ত করতে পারি না। অবশ্য আপত্তি ছিল না, যদি বুকভরা কলঙ্ক ভঞ্জন করার মত পুরুষোত্তম পিছনে আছে, কিন্তু ভীরুর ওপর নির্ভর করলে ভরাডুবির সম্ভাবনা।

চালকযন্ত্রে হাত রেখে জড়ের মতন বসে রইলাম। বসে বসেই দেখলাম, এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে।

বুঝতে পারলাম, শুধু আমার সামনে থেকেই নয়, আমার জীবন থেকেও তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে।

ফিরে এলাম।

খুব ধীর গতিতে, ভারবাহী গর্দভের মেজাজে।

অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় বসে রইলাম। রাতের ট্রেনের আনাগোনার শব্দ শুনলাম। রাত জেগে জেগা মফস্বলের অর্থহীন গান।

এটা ভাল করেই জানি যখন প্রয়োজন বোধ করবেন আমার পিতা নিজের পছন্দমত পাত্রী ঠিক করবেন আমার জন্য। মা তাতে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবেন। আমার মতামতের কোন মূল্য আছে এটা তারা কোনদিনই স্বীকার করেন নি। আজও করবেন না।

অথচ বিদ্রোহ করব এমন সাহস আমার নেই। বাপের রক্তচক্ষু আর মায়ের ভ্রূকুটির মাঝখানে দিয়ে আমার চলার পথ চিহ্নিত হয়েছে। সে পথ ধরেই চলতে হবে আমাকে। বয়স বাড়লে কি হবে সেই অনুপাতে সাহস এক তিল বাড়ে নি।

কিন্তু নিশীথের এই নিস্তব্ধ প্রহরে যখন শাসনের রজ্জু শিথিল, যখন নিজের মন একমাত্র অভিভাবক, তখন তোমার সান্নিধ্য কামনা করেছি। ভেবেছি, তোমাকে কাছে টানতে কিসের বাধা।

আইন আজ অনেক আধুনিক, অনেক উদার। তোমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করতে বিশেষ দেরী হবার কথা নয়। তার পর তুমি আমার। পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

যখন উপাধানে মাথা রাখলাম তখন আমি শান্ত, স্থিরচিত্ত।

তোমার টেলিফোন নম্বর আমার কাছেই আছে। কালই যোগাযোগ করব।

সকাল হতেই রাত্রের দৃঢ়তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে চা পান শেষ করে বাজারে চলে গেলাম। এই আমার এক বিলাসিতা। জিনিস কেনার চেয়ে ঘুরে ঘুরে জিনিস দেখার শখ আমার বেশী।

বাজারের থলি হাতে বাড়ী ফিরেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

পরনে গেরুয়া ধুতি, অবারিত ঊর্ধাঙ্গ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পায়ে খড়ম।

আমার পিতৃদেব একেবারে সামনে।

একি বাবা, আপনি কখন এলেন?

হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েই বাধা পেলাম।

এখন ছুঁয়ো না। বাজারের থলি রেখে আগে হাত মুখ ধুয়ে এসো।

আসার কারণ শুনলাম।

বাবার এক সতীর্থ রোগশয্যায়। কঠিন ব্যাধি! সেই খবর পেয়েই এসেছেন। বললেন, তুমি দোকানে যাবার পথে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। তারপর তোমার খবর কি বল? দোকান চলছে তো ঠিকমত? বাজে আড্ডায় মাতো নি?

হিসাব করে দেখলাম আমার বয়স আঠাশের শেষ প্রান্তে। অথচ বাবার কথার ধরণ ধারণ দেখে মনে হয় এখনও বুঝি উনিশের গণ্ডী পার হই নি।

বাবাকে শ্যামবাজারে নামিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ফেরার পথে কথাটা আচমকা মনে হল।

এমন তো নয়, বাবা আমার সম্বন্ধেই কোন উড়ো খবর পেয়ে চলে এসেছেন। উড়ো খবর পাঠাবার লোকের অভাব নেই। জ্ঞাতিকুটুম্বের এই শহরেই বাস। তোমার সঙ্গে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরার দৃশ্যটা তাদের কারো চোখে পড়া আশ্চর্য নয়।

শাসনের কি কঠিন নিগড়ে আমি বাঁধা তাও তারা জানে। বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিলে, সে চিঠি যে ডিনামাইটের কাজ করবে তাও তাদের অবিদিত নয়।

নিজের চেয়ারে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

কাল রাত্রে ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার যে দুর্দম ইচ্ছা হয়েছিল তার সমাধি হতে একটুও দেরী হল না।

নিজের মনকে বোঝালাম, যে একটা ঘর ভেঙে আসছে সে যে আর একটা সংসার গড়ে তুলতে পারবে তার স্থিরতা কোথায়! শুধু মাত্র সৌন্দর্যনির্ভর একটা মেয়েকে নিয়ে জীবনযাপন করার অসুবিধা অনেক। সৌন্দর্য স্তিমিত হলে ভালবাসাতেও হয়তো ভাঁটা পড়বে।

এত কথা ভাবলাম বটে কিন্তু মনে মনে ঠিক জানতে পারলাম এসব আমার মনের কথা নয়। পৈত্রিক বাস পরিহিত কঠিন হৃদয় এক প্রৌঢ়ের নেপথ্য ভাষণ।

সারাটা দিন কিছুটা ভয়ে ভয়ে রইলাম।

কিছু বলা যায় না, বাবার পক্ষে দোকান কেমন চলছে দেখতে আসা খুবই স্বাভাবিক, আর আচমকা

বর্ষণের মতন সেই সময় তুমিও যদি দোকানে এসে ঢোক, তাহলে এই অনিবার্য বিপদের রোধ করার শক্তি কারো নেই।

একমাত্র আশার কথা কাল রাতের অতটা স্নেহ যাবোর পরে আমাকে দেখতে আসার আগ্রহ হয়তো তোমার থাকবে না। কপোত হৃদয় এক ভীরু পুরুষের সান্নিধ্য না কামনা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

দোকান বন্ধ হতেই সোজা বাড়ী ফিরলাম।

দেখলাম বাবা ছাদা প্রায় শেষ। বাবা রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যাবেন।

তার পীড়িত বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, দুপুরেই শান্তিলাভ করেছে। শোন তোমার সঙ্গে কথা আছে।

উঠস্থ হয়ে দাঁড়ালাম।

তোমার উনত্রিশ বছরে একটি কাঁড়া আছে, সেই জন্যই এতদিন তোমার বিবাহ দিই নি। পাত্রী একরকম ঠিক করাই আছে। তোমার গর্ভধারিনীও দেখেছেন। সময় হলেই তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছু করনীয় ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাবা থামতে বললাম, চলুন আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাবা হাত নেড়ে বারণ করলেন।

দরকার হবে না তোমার ভৃত্যকে বরং একটা ট্যাক্সি আনতে পাঠাও। তুমি ক্লান্ত তোমার সঙ্গে যাবারও প্রয়োজন নেই। একলা যাওয়া আসা আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে।

প্রতিবাদ বৃথা, তাই চুপ করে রইলাম।

বুকের দ্রুত স্পন্দন থামল বাবার ট্যাক্সি গলি পার হয়ে যাবার পর।

ধীরে ধীরে আগের রাতের মোহভঙ্গ স্বপ্ন ফিরে এল। মনে হ'ল, সঙ্গোপনে তোমাকে কয়েকটা কথা বলার জন্য হৃদয় উন্মুখ।

আবার দেখা হল, কিন্তু সে ভাবে দেখা না হলেই যেন ভাল ছিল।

ছুটির দিন। সারা দুপুর আলস্যে নষ্ট করে বিকাল বেলা খেয়াল হল সময়টা সিনেমায় কাটিয়ে এলে হয়।

উঠে পড়লাম। চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক সিনেমায় গিয়ে ঢুকলাম। না, ঢুকিনি। ঢোকবার আগেই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

ঝলমলে শাড়ী পরণে। প্রসাধিত মুখ। কবরীতে বেলফুলের মালা। তুমি নিঃসন্দেহে সুন্দরী কিন্তু মহার্ঘ আবরণ আর অলঙ্কারে তুমি যেন তুলনারহিত।

তুমি একলা নয়। পাশে একটি তরুণ। তরুণটা সুশ্রী নয়, যতটা সুবেশ, কিংবা তোমার সৌন্দর্যের পাশে আর সকলের রূপই যেন হীনপ্রভ ঠেকে।

চোখে চোখ পড়ল। তোমার চোখে আমার চোখ।

আশ্চর্য তুমি চমকালে না পরিচিত বাচক স্মিতহাস্য নয়, আমি যেন অচেনা, কোন পুরুষে আমাকে দেখ নি, এমনই ভাব।

পাশ দিয়ে গেলে। খুব পাশ দিয়ে। তোমার শাড়ীর আঁচল আমার শরীরে ঠেকল। উগ্র সুবাসে বাতাস ভারী।

হাতের টিকেটটা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

ফিরে এসে মনের মুখোমুখি বসলাম।

তর্জনী তুলে প্রশ্ন করলাম। একটা নয়, প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

তুমি যখন নিঃশেষে নিবেদন করতে চেয়েছিলে আমাকে, তখন আমি সভয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম। তোমাকে নেবার সামর্থ আমার ছিল না। আর আজ তুমি অন্যের বাহুলগ্না সেজন্য আমার আক্ষেপের নিশ্বাস কেন পড়বে! এত মনোক্ষুণ্ন কেন হব যে প্রমোদে কাটাবার আড়াই ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিকে নিজের হাতে নিশ্চিহ্ন করে দুঃখের আগারে ফিরে আসব।

অবাক্ত একটা যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণার উৎস বুঝতেও অসুবিধা হ'ল না। আমার মন বোধ হয় চেয়েছিল তুমি শুধু আমাকেই কামনা করবে। আমি তোমার ঘনিষ্ঠ না হতে তুমি দুজন একাকিত্বের সাধনায় নিজেকে ক্ষয়িত করবে।

কিন্তু সাগ্রহোদ্যত করে, তাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তুমি অন্য কাউকে সাহচর্য দেবে এটা বোধ হয় আমার সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছিল।

পরের সপ্তাহেই চিঠি এল। বাবার কাছ থেকে।

এমন একটা চিঠির অবশ্য আমি প্রত্যাশা করছিলাম।

পত্রপাঠ কাশী রওনা হতে হবে। মেয়ে দেখার ব্যাপারে।

প্রথমটা একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

তা কি সম্ভব!

তোমার চেয়েও বহুগুণে সুন্দরী কোন মেয়ের সঙ্গে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, আর সেই মেয়েকে মূল্যবান সজ্জায় সাজিয়ে আমার পাশে নিয়ে চলতে চলতে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? তোমার দু'চোখের তারায় যতটা অবজ্ঞা ছিটিয়েছ, ঠিক ততটা উপেক্ষা দেখিয়ে তোমার পাশ কাটিয়ে আমি চলে যাব।

কিছুক্ষণ খুব ভাল লাগল। তোমার অস্ত্রেই তোমাকে ঘায়েল করেছি ভাবতে পেরে মন খুশীতে ভরে গেল।

তারপরই সব কিছুর অযৌক্তিকতা প্রকট হল মনের সামনে। এ বয়সে এই ছেলেমানুষি চিন্তা অর্থহীন। তুমি আমার পুতুল ভেঙেছ বলে, আমিও যেব তোমার পুতুল ভেঙে এ বেচারেরির বয়স যে পার হয়ে এসেছি, মনের কোণে সেটাই ঝুলতে বসেছি।

পরের দিনই রওনা হয়ে গেলাম।

বাবা স্টেশনেই অপেক্ষা করছিলেন।

দেখা হতেই বললেন, তোমাকে মিছামিছি কষ্ট দিলাম।

থমকে দাঁড়ালাম। বাবার কণ্ঠে এ ধরণের সুর শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

কথাটা বললেন টাঙ্গায় বসে।

গতকাল মেয়েটির কোষ্ঠি আমার হাতে এল। দেখলাম এ মেয়ে সংসারে অশান্তি আনবে। অত্যন্ত চড়া রাশি। গ্রহ সন্নিবেশও অনুকূল নয়।

কিছু বললাম না। বলবার কথাও অবশ্য নয়।

মা বললেন, এসেছিস যখন দু'একদিন থাক। কর্তা যেভাবে মেয়ে দেখছেন, এ জন্মে যে তোর বিয়ে হবে এমন সম্ভাবনা কম।

কথাগুলো বললেন বাবার অলক্ষ্যে।

একটু সাহস করেই বলে ফেললাম, কেন?

চৌদ্দপুরুষের কুলুজী ঘাঁটছেন, মেয়ের করবেখা, তার মা বাপের করবেখা কিছু আর বাদ দিচ্ছেন না। এ পরীক্ষায় পাশ করবে এমন মেয়ে পাওয়া দুষ্কর।

মনে মনে ভাবলাম, আপনাদের পরীক্ষা কিছুতেই পাশ করবে না, এমন মেয়ে যদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসি, বিয়ে দেবেন আমার সঙ্গে? যে মেয়ের করবেখার পরিচয় জানি না, কিন্তু বিদ্যুৎবর্ণা তেজস্বিনী কোন তরুণী যে অন্যায়ের সঙ্গে আপোসে অক্ষম বলে স্বামীকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে এসেছে।

কিছু বললাম না। একটা অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার ইচ্ছা ছিল না। নিরালায় একটু শান্তির সন্ধান চাইলাম।

কিন্তু কর্মচারীদের হাতে দোকানের ভার ছেড়ে বেশীদিন কলকাতা থেকে বাইরে থাকাও সম্ভব নয়। আকর্ষণ কি শুধু দোকানের লাভ লোকসানের।

ফিরে এলাম।

ফিরে আসার দিন সাতেক পরেই।

বসে বসে কতকগুলো বিল সই করছিলাম, দমকা ঝড়ে দুইংডোর ধরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

চমকে মুখ তুললাম।

না ঝড় নয়, তুমি এসে ঢুকলে।

আজকে তোমার সাজ আরো বিচিত্র। সর্বাঙ্গে জড়োয়ার অলঙ্কার। সারা শরীর জুড়ে কেবল দীপ্তি। দীপ্তি না দাহ!

পিছনে ফিরে দেখে কাকে আহ্বান জানালে,

এস, ভিতরে চলে এস।

তোমার পাশাপাশি সে রাতে দেখা সেই তরুণটিকে আশা করছিলাম, কিন্তু আমার আশাকে ধূলিসাৎ করে যে প্রবেশ করল সে রীতিমত প্রৌঢ়।

কানের দু'পাশের চুলে রুপোর স্পর্শ। অঙ্গে দামী স্যুট। বর্ণ স্যাম্পেন-সন্নিভ। মনে হল অভিজাত পরিবারের।

আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মিস্টার সোম। সুশোভন সোম। অ্যাসিস্টাণ্ট ডিরেক্টর অফ ইম্পোর্টস ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে তুলসীরাম আগরওয়ালা কার্মে অ্যাডভাইসর হয়েছেন।

দুটো হাতজোড় করে কপালে ঠেকালাম। উত্তরে মিস্টার সোম ঘাড়ের সামান্য কসরত করল।

কিন্তু একে হঠাৎ কাঠের কারবারীর সম্মুখীন করার কি মানে?

কতকগুলো কানিচারের অর্ডার দেব আপনার দোকানে। ক্যাটলগ আছে ?

ক্যাটলগ একটা ছিল। এগিয়ে দিলাম। তোমার দিকে নয়, মিস্টার সোমের হাতে। কারণ যতদূর জানতাম তুমি চাকরির প্রত্যাশী। ভদ্রহীনা। আসবাব কিনে ঘর সাজাবার মতন অবস্থা তোমার নয়।

কিন্তু আমাকে পুরোমাত্রায় বিস্মিত করে মিস্টার সোম ক্যাটলগটা তোমার হাতে তুলে দিল।

তোমার জিনিস তুমিই বাছ।

আমার বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থা সম্ভবত তোমার নজর এড়ায় নি।

তুমি লাজুক দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পরিমাপ করতে করতে বললে,

আপনাকে একটা কথা বলা হয় নি।

গ্রীবা যথাসম্ভব প্রসারিত করলাম।

আমি মিস্টার সোমের ঘরে যাচ্ছি।

তুমি একটা ব্যাপার ভুলে গিয়েছ। আমি তোমার মতন সাহিত্যিক নই। কাব্যিক উপমা দিয়ে কথা বললে আমার বুঝতে পারার কথা নয়। তোমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিক বোধগম্য হ'ল না।

বোধগম্য যে হয়নি সেটা নিশ্চয় আমার মুখ চোখের ভাবে প্রকট হয়েছিল, তাই তুমি আরো সহজ হবার চেষ্টায় বললে, উনি আমাকে নিজের ক'রে নিচ্ছেন।

এবার বুঝতে পারলাম। এতক্ষণে বুঝতে যেটুকু অসুবিধা হচ্ছিল, সেটা তোমার আরক্তিম গণ্ড দেখে আর মিস্টার সোমের সলজ্জ ভঙ্গী দেখে বুঝে নিলাম।

হয়তো আমার উচিত ছিল, মিস্টার সোমের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে বলা, কনগ্র্যাচুলেশন।

কেন জানিনা, এতটা উচ্ছ্বাস দেখাবার ভিতর থেকে কোন তাগিদ অনুভব করলাম না।

এর কারণ কি এই যে আমার সামনে অন্য কেউ তোমার ওপর দখল নেবে এটা আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব ? কিন্তু তুমি তো প্রথমেই আমাকে নিবেদন করেছিলে। ভীরু আমি, তোমাকে গ্রহণ করার সাহস হয় নি।

সেই জন্যই বোধ হয় আমার সামনে তুমি নবলব্ধ মানুষটাকে নিয়ে এসেছ। দেখাবার জন্য যে পৃথিবীর সবাই আমার মতন কাপুরুষ নয়। আসবাব কেনা একটা ছল।

নিজেকে সামলে নিয়ে মিস্টার সোমকে বললাম, ভারি খুশী হলাম শুনে।

মিস্টার সোম শুধু টাইয়ের গিটটা একটু আলগা করে দিল। কোন কথা বলল না।

তুমি বাইরের আসবাবগুলো দেখে গেলে যদি পছন্দ সই কিছু থাকে। আমি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নি।

সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার সোম বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, ভদ্রলোক ভাগ্যবান! আপনার জন্য এত বছর পর্যন্ত অবিবাহিত জীবন যাপন করছিলেন।

তুমি ভ্রূ কুঞ্চিত করলে। আড়চোখে দেখলে আমাকে। বোধ হয় যাচাই করার চেষ্টা করলে, আমি পরিহাস করছি কিনা।

যখন নিশ্চিত হলে যে না, পরিহাস নয়, তখন বললে, অবিবাহিত থাকতে যাবে কোন দুঃখে।

আপনার মতন আর কে আছে। ধারিত্ব নিতে হলেই পাশ কাটাবার চেষ্টা। সুশোভনের এক ঘর ছেলে মেয়ে। খোঁজ করলে বোধ হয় দু একটা নাতি নাতনীও পাওয়া যাবে।

তাহলে?

কি তাহ'লে?

আপনাকে উনি নেবেন কি করে?

তুমি হাসলে। ব্যাঙ্গের ঝিলিক দেওয়া নির্মল হাসি।

সবাই আপনার মতন পারাবতবক্ষ নয়। সুশোভনের প্রশস্ত বুকে আমার ঠাঁইয়ের অভাব হবে না।

একটু থেমে অন্য দিকে চেয়ে খুব মৃদু কণ্ঠে বললে, স্ত্রীকে সুশোভোন ডাইভোর্স করবে। পুরোনো আসবাবের ডিজাইন তার পছন্দ নয়।

বয়সের তুলনায় আমার মন রীতিমত প্রাচীন। সেই মন শিউরে উঠল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর তোমরা উঠে গেলে। ভেবে চিন্তে পরে পছন্দ মাফিক অর্ডার দেবে আমাকে এমন একটা আশ্বাস দিয়ে।

আমি জানি তুমি আমাকে আসবাব পত্রের অর্ডার দিতে আস নি, বরং যে দামী আসবাবটি তুমি সংগ্রহ করেছ, সেটাই দেখাতে এসেছিলে।

কথাটা তোমার কানে গেলে নিশ্চয় খুবই অপ্রিয় মনে হ'ত কিন্তু আসবাব ছাড়া আর কি। যদি ভদ্রলোকের পুরোনো স্ত্রী বাতিল করার একমাত্র কারণ হয় তার ডিজাইনের প্রাচীনত্ব, তাহলে উপমাটা আমার লাগসই বই কি।

কিন্তু তুমি এ কথাটা কেন ভাবলে না যে একদিন তুমিও পুরোনো হবে। তোমার পালিশ, ত্বকের মসৃনতা সব নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। লোকের কাছে তোমার আকর্ষণের মূল্য হবে কানাকড়ি।

যখন নিমন্ত্রণের একটা সুদৃশ্য কার্ড প্রত্যাশা করছিলাম ঠিক তেমনই সময়ে তোমাদের বিয়ের খবর পেলাম, সংবাদপত্রে। শুধু খবরই নয়, সুশোভনের পাশে তোমার ফটোও প্রকাশিত হয়েছিল।

কি আশ্চর্য্য, খবরটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুশোভন সোমের স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবতে লাগলাম তারা তোমার প্রতি কি মনোভাব পোষন করছে।

প্রায় বছর খানেক পর।

ইতিমধ্যে বিয়ে করেছি। মা বাপের মনোনীত এক শান্ত সুলক্ষণা মেয়েকে। একটানা নিস্তরঙ্গ জীবন। সুখের উল্লাস বান যেমন আসেনি দুঃখের ভাঁটার টানে উজান বাইবারও প্রয়োজন হয় নি।

এমন সময় তোমার দেখা পেলাম।

ইতিমধ্যে তোমার কথা যে একেবারে মনে হয় নি, এমন নয়। পথে ঘাটে ভীড়ের ফাঁকে চোখ তোমাকে খুঁজেছে।

সেদিন দেখা হ'ল অভিঘাত এক হোটেলের সামনে।

হোটেলের তলায় এক বনেদী কাপড়ের দোকান। আমার আসবাবপত্রের দাম বাকি ছিল সেই জায়গায় গিয়েছিলাম বেরিয়ে আসতেই দেখলাম তুমি।

একলা নয়, এক পলকেই দেখে নিলাম তোমার বাহুলগ্ন হয়ে যে নামছে সে সুশোভন সোম নয়।

জায়গাটায় আলোর অভাব ছিল না। তুমি আমাকে চিনতে পারলে। এগিয়ে এলে।

আসুন আলাপ করিয়ে দিই ইনি মণীশ বসাক চিত্রশিল্পী। সম্প্রতি প্যারিসে একটা একজিবিশন করে এলেন।

তুমি কথাগুলো বলে আমার আরো কাছে এসে দাঁড়ালে।

মণীশ বসাকের প্রতি সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে,

পীয় মিসেস বসাক হচ্ছি। অভিনন্দন জানাবেন না?

বলে ফেললাম, কিন্তু মিস্টার সুশোভন সোম?

তোমার মুখে চোখে বিরক্তির চিহ্ন। তিক্ত কণ্ঠে বললে, বুড়ো শকুনের স্বগোত্র। খরচ করতে হলেই মেজাজ খারাপ হয়। তারপর দুজনের বয়সের এত ব্যবধান, এতে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না।

কিছু বললাম না। বলার মত ছিলও না কিছু। নমস্কার করে সরে এলাম। এই প্রথম তুমি যে আমার জীবনে আসনি সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম নিজেকে।

তারপরও কয়েকবার তোমাকে দেখেছি। কথা হয়নি। কথার অবকাশ নয়। সব সময়ে যে মণীশ বসাকের সঙ্গে এমন নয়। নানা বয়সের নানা জাতের পুরুষ ছিল তোমার পাশে।

শেষ দেখা হয় কিছুদিন আগে।

শেষ দেখাই; কারণ, এরপর তোমার সঙ্গে দেখা হোক এটা আমার অভিপ্রেত নয়।

একটা কাজে ভোরবেলা বাড়ী থেকে বের হয়েছিলাম। আহারের অবসর হয়নি। দুপুরের ক্ষুধা মেটাতে এক মধ্যবিত্ত রেস্তরাঁয় ঢুকলাম।

প্রথম কেবিনের পর্দা একটু সরে যেতেই দেখলাম ভিতরে তুমি। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে একলা বসে আছ।

তুমিও আমাকে দেখেছিলে। বেরিয়ে এসে ডাকলে।

তোমার মুখোমুখি বসে প্রথমেই যে প্রশ্ন করলাম তাতে তুমি একটু বিব্রত হলে।

আজ যে একলা?

তুমি মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বললে, একজনের অপেক্ষায় রয়েছি। মিস্টার দেবব্রত বাগচী। সিভিল ইঞ্জিনীয়র।

লক্ষ্য করলাম, হাজার প্রসাধনের কেরামতিতেও তুমি মুখের ক্লান্ত ভাব ঢাকতে পারনি। অনেক গুলো বাড়তি আঁচড় সারা মুখে। একদা ঘন কৃষ্ণ কেশ কিছু পরিমাণে পিঙ্গল।

এবার কি মিসেস বাগচী হবার চেষ্টা করছেন?

প্রশ্নটা নিতান্ত নিরীহ ছিল না। ভেবেছিলাম তুমি আপত্তি করবে. কিন্তু অন্যমনস্কতার দরুণ খেয়াল করনি। মৃদুকণ্ঠে শুধু বললে, সেরকম কথা হচ্ছে।

জানি না, এত সাহস কোথা থেকে সংগ্রহ করলাম। তোমার সঙ্গে এ ধরণের কথা বলা আমার পক্ষে হয়েছে ধৃষ্টতা। তবু বললাম,

এভাবে মানুষের ঘর ভেঙে শান্তি পান?

এবার তুমি জ্বলে উঠলে। সোজা হয়ে বসে রুক্ষ কঠোর দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে জরিপ করলে.

তারপর বললে, আমি কি অন্যায় করেছিলাম বলতে পারেন? আমার ঘর কেন ভাঙল? কি অপরাধে। স্বামীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। সাধারণ একটি ঘরণীর কাছে পুরুষ যা প্রত্যাশা করে সব কিছুই আমার ছিল। বরং একটু বেশীই ছিল। রূপে, গুণে আমি সাধারণের উর্ধে এটুকু স্বীকার করতে আশা করি দ্বিধা করবেন না।

কোন উত্তর দিলাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না।

অথচ সে ঘর আমার কেন ভাঙল? স্বামীর জীবিকায় নিজের দেহজ সৌন্দর্য বিনিয়োগ করতে পারলাম না বলেই তো? স্বামী-দেবতা অসন্তুষ্ট হলেন। অশান্তির ঝড় শুরু হ'ল। ঘর ভাঙল। তাই শপথ নিলাম!

কি শপথ?

উত্তর শোনবার সময় পেলাম না। পর্দা সরিয়ে একটি ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকল। বোধহয় দেবব্রত বাগচী।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কিছু আর খেতে ইচ্ছা করল না। ভাবলাম, একেবারে বাড়ীতে গিয়ে খাব সকাল সকাল দোকান থেকে বেরিয়ে।

জনতার ফাঁক দিয়ে মোটর চালাতে চালাতে মনে হ'ল,

নিজের ঘর বাঁধা স্থায়ী হয় নি বলেই তুমি এই ঘর ভাঙার খেলায় মেতেছ। মানুষের সান্নিধ্য কামনা করেছ কেবল তাদের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করার জন্য। তাদের সুখ, শান্তি, দাম্পত্য জীবনের গ্রন্থি নির্মূল করেছ নিজের সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে।

কিন্তু এ খেলায় তুমি কি শান্তি পেয়েছ সুমিতা?

যে আগুনে সকলের সব কিছু তুমি পোড়াচ্ছ, সে আগুন কি তোমাকে ক্ষমা করেছে?

———

পায়রা

মহাশ্বেতা দেবী

পটলবাবুর অনেকদিন থেকেই মনে মনে ইচ্ছে যে তরলাকে পাঁচতলার ওপর থেকে নিচে ঠেলে ফেলে দেন। কোমর আর শিরদাঁড়া অথম হবার পর থেকে তরলার ওপরই ওঁর নির্ভর। মানে এই রকম ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছে নিবারণ, পটলবাবুর ভাইপো।

আপনাকে দেখবে শুনবে, শুধু খাওয়াবে, 'আপনার কাছে এখন সবসময়ে লোক থাকা দরকার।'

মানে, নিবারণের হাতের লোক থাকা দরকার। পটলবাবু বিছানাসই হবার পর থেকে নিবারণই তো সব দেখবে শুনবে বলে এসে দাঁড়িয়েছিল কি না। এত দিন কাকাবাবুর কোন খোঁজ তাঁত নেয়নি বলে সে কি দুঃখ।

দুঃখ জানাতে জানাতে চারদিকে লোভী লোভী চোখে দেখছিল নিবারণ। ঘর, দোর দেওয়ালঘড়ি রূপোর সিংহ একটা। যেন সবকিছু এখনি পারলে নিয়ে নেয়।

অথচ এত দিন শুধু নিবারণ কেন, বাড়ীর সকলে পটলবাবুকে এড়িয়ে চলত। ব্যাঙ্কে ডাকাতি করেছিলেন, টাকাপয়সা সরিয়ে রেখেছিলেন আবার জেলও খেটেছিলেন। বাড়ীর কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি কোনদিন। নিজের মত নিজে থাকেন, রান্নাঘরে খান। টেবিল সাজিয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে একলা খান, তারপর রেডিও শোনেন বিকেলে সন্তুর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যান পার্কে।

সন্তু ওঁর ঠিকে কি শৈলর ছোট ছেলে। বছর খানেক ধরে ও পটলবাবুর বন্ধু হয়েছে। দশবছর বয়স হলে কি হয়। এখনি ও পটলবাবুর মত ভালো ঘুলতে পারে, কাঁদো কাঁদো মুখে তাহা মিথ্যে কথা বলতে পারে। রাস্তার বয়সে বড় ছেলেদের পর্যন্ত মেরে ভক্তা করে হাওয়া হয়ে যায়। পটলবাবু সেদিনই মনে মনে ঠিক করেছেন ওঁর খাটের নিচে মেঝের টালির ভেতর গাঁথা ফোকরে যা আছে ওকে সব দিয়ে যাবেন।

ঠিক করবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল আর সেই সময়েই হঠাৎ পিছলে পড়ে শিরদাঁড়ার হাড় ভাঙলেন।

নিবারণ কোথায় খবর পেল কে জানে। এ বাড়ীতে এসে প্রথমেই ডাক্তারের হাত-পা ধরে বললে,

'হাসপাতালে দিয়ে কি হবে? সেখানে কি বাড়ীর মত সেবাযত্ন হবে?'

কোত্থেকে তরলাকে নিয়ে এল কে জানে। তরলা এসেই শৈলকে ডাকালে সন্তুকে বললে, 'আসতে হবে না।'

সন্তু শুধু দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে, 'আমার বন্ধুরা আছে, তারা যদি শোনে আমায় আসতে দিচ্ছনা তাহলে রাস্তায় বেরোলে পরে পটকা ছুঁড়বে।'

'তোর বন্ধুরা কত বড় শুনি ?'

'নানা বয়সের আছে। বয়স বুঝে কি আর বন্ধু হয় ?'

তরলা আর নিবারণ তখন বারান্দায় গিয়ে ফিসফিস করে কি বলাবলি করলে।

'খুঁচিয়ে লাভ নেই· ···'

'সময় যখন আছে·····'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসখানেক তো বটেই···'

এই সব কি বলাবলি করে তরলা ঘরে এসে একগাল হেসে সন্তুকে বললে 'এসো রোজ বিকেলে এসো। বেশীক্ষণ কথা বোল না কিন্তু। ওঁর শরীরে এখন বিশ্রাম দরকার।'

সন্তু আসে বটে, কিন্তু পটলবাবু দেখতে পান তরলা তখন এ ঘর ছেড়ে এক পা নড়ে না। তা ছাড়া, এখন ওঁর মনে হয় ও আর নিবারণ ওঁকে ওষুধের সঙ্গে কি যেন দিচ্ছে। নইলে খালি খালি ঘুম পায় কেন, আর রাতে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেন।

সেদিন বলেছিলেন।

'ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।'

'কেন ?'

'দিচ্ছে তো শুধু টনিক, তাতে এত ঘুম কেন পায় ? খিদেও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।'

'শুধু শুয়ে শুয়ে কি হাতী ঘোড়া খাবেন ? খিদেটা হবে কোত্থেকে ? ঘুম পায় শরীর দুর্বল বলে।'

কিন্তু পরদিন থেকেই দু'তিনদিন ওষুধ যেন অন্যরকম। আর সে রকম ঘুমটুম নেই। তাতেই পটলবাবুর সন্দেহ হল।

এখন আর সন্দেহ নয়, উনি স্থির বুঝতে পারছেন তরলা আর নিবারণ ওঁকে কিছু একটা দিচ্ছে। যাতে আস্তে আস্তে উনি মরে যান। খুব বলকরে কিছু করতে পারছে না। কেন না এখনো ডাক্তার আসে, পার্কের চেনা বুড়োদের মধ্যে কয়েকজন খোঁজ খবর নিতে আসে।

সবাই জানে পটলবাবুর স্বাস্থ্য বেজায় মজবুত। আটষট্টি বছর বয়সে ওঁর শরীরে এখনো খুব জোর। হঠাৎ মরে যাবার মত ওঁর কিছু হয়ও নি। শিরদাঁড়া ভেঙে গেলে মানুষ পিঠে পলেস্তারার পট্টি বেঁধে শুয়ে থাকে। বুড়োমানুষ বেশীদিন শুয়ে থাকে ছেলেমানুষ একমাসের মাথায় আবার নেচে বেড়ায়। কিন্তু বলকরে মরে যায় না কেউ।

সেইজন্যেই কি ওরা আস্তে আস্তে ওঁকে মেরে ফেলতে চায় ? নিবারণটা কি বোকা। ও নিশ্চয় ভাবছে কাকা মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। ও তো জানে না পটলবাবু এখন বিছানাসই হলে কি হবে, এখনো কত বুদ্ধি ধরেন। নিবারণের বাবা তো বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতেন আমার ও তিন ভাই।

বলত পটল নামে আমাদের কোন ভাইটাই নেই। ছোটবেলা তো পটলবাবুকে মানুষ বলেই মনে করত না। রোগাপটকা মিচকেপটাল বলে ক্ষ্যাপাত। বলত রাতনেই দিননেই নাক জ্যাচ জ্যাচ-পেটে বাথা-তালপাতার সেপাই যেন। খেলায় নিত না বলত তুই মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে রান্নাবাড়ি খেলতে পারিস না ?

ওদের সকলকে তো পটলবাবু দেখিয়ে দিয়েছেন। তোমারা কেউ পেরেছ পটলবাবুর মত সাহস দেখাতে ? কি সাহস কি বুদ্ধি। পাঁচবছর ধরে ছিটকাপড়ের কোট পরে ব্যাঙ্কের কেরানীগিরি করা তারপর সেই

ব্যাঙ্কেরই ক্যাশ ভেঙে ঠিক জায়গায় লুকিয়ে রেখে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া। গোপাল অধিকি খুব সাহায্য করেছিল। উকীল দেওয়া, চেষ্টাকরে আইনের গলি খুঁজে খুঁজে শাস্তির মেয়াদ কমানো, সব করেছিল। করবে না কেন, ওকে তো ঠকাননি পটলবাবু।

সেই গোপাল ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ঝগড়া করতে করতে উত্তেজিত হয়ে 'তবে আমি চল্লুম' বলে চলন্ত গাড়ীর দোর খুলে পুলের উপর হাঁটতে গিয়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে মরে গেল। কোন মানে হয়?

পটলবাবু শরীর ভাল করেছেন, জেলে থাকতে অনেক পড়াশোনা করেছেন, তারপর ঠিক সময়ে বেরিয়ে এসে ভাল লোক হয়ে গুছিয়ে বসেছেন। নিবারণের বাবাদের উনি খোড়াই কেয়ার করেন। পটলবাবু এখনো কাঁকড়ার চীনেকাবাব খেতে পারেন। কানের লতি চুলকোয় না। রাজহাঁসের ডিম খেলেও বাতের ব্যথা করে না। কিন্তু তরলা ওকে ভীষণ কম খেতে দেয় আজকাল। নিজে অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ করে করে খায়।

জিগ্যেস করলে বলল 'না না, এই তো দুটো সেদ্ধ ভাত খাচ্ছিলাম।'

কিন্তু পটলবাবু জানেন ও আনারস দিয়ে ইলিশমাছ, বটরডাল দিয়ে ডালকেলা তরকারী, আরো কত কি খায়। রান্নার গন্ধ নিয়ে তো চালাকি নয়। ঘরের কোণে কোণে লেগে থাকবেই থাকবে।

এই সব নানাকারণেই ওর ইচ্ছে করে তরলাকে পাঁচ তলার বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দেন। এত পাপেরই বা কি আছে কে জানে। ওর তো সাতকুলে কেউ নেই। নিবারণকে এমনিই 'দাদা' বলে ডাকে। ওর মত পাজি লোক মরে গেলে কার কি এমন ক্ষতি হবে কে জানে।

ক্ষতি কেন, ভালও হতে পারে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি করে তরলার মত শক্তসমর্থ, ওপর হাতের খাসলা বাগানো মেয়েছেলেকে ফেলে দিতে পার?

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই তরলা ওঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

'খেয়ে নিন।' হাতে নিশ্চয় দুধের গেলাস। পটলবাবু চোখ বুজে রইলেন।

'খেয়ে নিন না।'

'কে, ও, মিসেস দত্ত?'

'আজ্ঞে!' কি উদ্ধত জবাব দেবার ভঙ্গী।

'দুধ আমি খাব না।'

'কেন?'

'ওটা, ওটা আপনিই খেয়ে নিন। আমার যেন শরীরটা অসম্ভব খারাপ লাগছে আজ।'

'খারাপ। কি রকম!' তরলার কি আনন্দটাই না হয়েছে।

'সব যেন ভেতর থেকে···' পটলবাবু হাত চিংকরে দেখালেন।···

···'তাই তো! নিবারণ দাদাও তো এখন আসবেন না!' ভীষণ চিন্তা চিন্তা মুখ করে তরলা দুধটা মুখে তুলতে গেল।

গেলাসটা পড়ে গেল। মেঝেতে কাচের টুকরো, দুধ গড়িয়ে যাচ্ছে। পটলবাবু তরলার চোখের দিকে তাকালেন। তরলার চোখে হাসি। হ্যাঁ তোমাকে যে দুধ দেওয়া হয় তা অন্যকে দেওয়া সম্ভব নয় কেন না তাতে দুধ আর চিনির বাইরেও অন্যকিছু আছে। কিন্তু তোমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।···

…পটলবাবু নিঃশ্বাস ফেললেন। আর উপায় নেই। যা চাননি তাই করতে হবে। রমেশকে খবর দিতে হবে। ভাবতে গেলেও নিজেকে মীরজাফর মনে হয়। রমেশদের সঙ্গে ভাব সাব রাখা তো অপমানের কথা। এখন রিটায়ার করেছেন বলে কি সব ভুলে গেছেন নাকি? ওরা একদলে পটলবাবুরা অন্যদলে। দুদলের মধ্যে কোন রকম ভাব সাব থাকা সম্ভব নয়, এ হল বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ।

তরলা, তরলা, তুমি আমাকে দিয়ে এই কাজ করালে। পটলবাবু নিঃশ্বাস ফেললেন। তরলা রাগী বেড়ালের মত ফ্যাস ফ্যাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? পটলবাবু সব বুঝে ফেলছেন বলে?

'তরলা আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুমোন। আমি আপনার জন্যে একটু সুজির পায়েস বানাই।…'

'সন্তুকেও একটু দিও। আচ্ছা, আমার থেকেই দেব না হয়।' কথাটা বলেই নিশ্চিন্ত লাগল, পটলবাবু চোখ বুঁজলেন। সন্তু যাবে যখন, তখন কি আর তরলা সাহস করবে কিছু মেশাতে? পাপীর মন তো সকলকেই ভয় পায়। পটলবাবু আর যেন কি কি পড়েছিলেন? পাপীরা আর খুনেরা সময়কালেও কম্বলচাপা দিয়ে ঘুমোয়, সহজে ঘামে না, হাতের বুড়োআঙুলের মাথাটা থ্যাবড়া হয়।

ঘুমিয়ে সেই স্বপ্নটা দেখলেন। যেন পটলবাবুও শুয়ে আছেন আর ওঁর বুকের উপর কালো বেড়ালটা বসে আছে। মস্ত বড় বেড়াল, সবুজ চোখ, গোলাপী জিভ, ওঁর বুকের উপর বসে বসে ঘর ঘর শব্দ করছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, ব্যথা ব্যথা, বুকে। যখন নিঃশ্বাসের বাতাস প্রায় ফুরিয়ে গেল তখনই বেড়ালটা ওঁর বুক থেকে উঠে জানলা দিয়ে বেরিয়ে চাঁদের কাছে চলে গেল এক লাফে। প্রায়ই এ রকম হয়। পটলবাবুর তো মনে হয় কবে খালি চোখে দেখতে পাবেন নিশুত জ্যোছনায় একটা বেড়াল চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে লাফ মেরে। এমন যদি একদিন হয় যে বেড়ালটা আর উঠতে চাইল না, তখন কি হবে? পটলবাবু কি মরে যাবেন? সন্তুকে তো এখনো সব শেখানোই হল না।…

রমেশ সরকারকে সন্তু খবর দেবার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে: রমেশবাবুর বাড়িতে সন্তুকে নিয়ে দোকান থেকে বড় ডিমভাজা, বারোমা টোস্ট আর কড়া চা আনানো হয়েছিল। পটলবাবুও খেয়েছেন। তরলা অগত্যা, ওদিকের বারান্দায় বসে কি যেন বুনছে। নিশ্চয় নিবারণের জন্যে টুপী। নিবারণটাও পাপী। কিন্তু ওর সন্ধির ধাত একটুতে ঠাণ্ডা লাগে।

রমেশ সরকারের অনেকদিন থেকেই পটলবাবুর বিষয়ে অসম্ভব কৌতূহল। সমস্ত জীবনে একটাই পাপ করে কেউ ঠাণ্ডামেরে বসে থাকতে পারে? ঘরে পড়ার বই, কলের গান, রেডিও, বাড়ীতে পরবার চটি, বর্ষাতি, ব্যাঙ্কের ডাকাত এ রকম হয়!

'অবাক হবার কিছু নেই।' পটলবাবু ওঁর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন।

'নেই?'

'না। আপনি রিটায়ার করা দারোগা, আমি রিটায়ার করা ডাকাত। আপনি কি কি চেয়ে ছিলেন জানিনা, আমি কিন্তু ঠিক এই টুকুই চেয়েছিলাম। এই একলা থাকবার সুখ, শান্তি, সাজানো ঘর। এগুলোর আগে ডাকাতি বাটপাড়ি, রিভালি।'

'আপনার জীবনে তাহলে একটা দর্শন আছে?'

'নিশ্চয়। বড়বড় দার্শনিক তো জেলখানায় থাকেই মশায়।…

...রমেশ সরকারের মুখটা হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'আপনার সম্পর্কে কৌতূহল আমার অনেক দিনের।'

'জানি।'

'আমি তাহলে উঠি। আপনি সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন আপনি একা।... রাতে রাতে অবশ্য আমি খোঁজ নিতে আসব।'

রমেশ সরকার উঠে পড়ল। এখন শুধু যাবার সময় নয়। সকালের আগে তরলা কি শিশিটা খুঁজবে? রমেশ বলে গেল ওর মনে হচ্ছে তরলা আসলে হেমাঙ্গিনী নার্স। চার বছর আগে হেমাঙ্গিনীর তিনজন রুগী পরপর মারা যাওয়া নিয়ে খুব কেচ্ছা হয় তারপর বোধহয় গা ঢাকা দিয়ে কোথাও ছিল। তাই যদি হয় তাহলে রমেশ তরলাকে ধরতে পারবে। আর নিবারণকেও। পটলবাবু তো আর থানা পুলিশ করতে চান না, ওদের ধাবড়ানি দিয়ে বের করে দিলেই হবে এখন।

'সন্তু, বাড়ী যাবে না?' তরলার গলা কি মোলায়েম। সন্তু কি এখনো যায়নি?

'যাব।'

'একটু বসবে সোনা? আমি দু'পা হেঁটে একটা পান খেয়ে আসি?' তরলা বেরিয়ে গেল। পটলবাবু বুঝতে পারলেন নিবারণকে দোকান থেকে ফোন করতে গেল। মেঝেতে সূর্যাস্তের আলো। রুপোর সিংহটার ওপর রক্ত ঢেলে দিচ্ছে কে। মেঝের রংটা লাল টকটকে কেন কে জানে।

'তুমিও ইচ্ছে করলে পার।'

'কি পারি সন্তু?'

'পায়রা ধরতে।'

হ্যাঁ। সন্তু সুতোয় ফাঁদ পেতে পায়রা ধরতে চেষ্টা করছিল বটে। এখন এ বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকা যখন বারণ, তখন আর কি হবে! কিন্তু বারান্দায় গম ছড়িয়ে ফাঁদ পেতে পায়রা সত্যিই ধরা যায়।

'যেখানে গম দেব, সেখানে ভেসলিন দিয়ে দিলে পায়রার ঠ্যাং পিছলে যাবে, এখান থেকে সুতো টানলেই।'

ভেসলিন, পেছল মেঝে, সুতোর টান। পটলবাবু চোখ বুজলেন। হরি হে, মনে কুচিন্তা দিও না। পটলবাবু তো বেশী কিছু চাননা, নিজে বেঁধেছেড়ে ডিমের পরোটা খাবেন আর বিকেলে একটু ঘুড়ি ওড়ানো! সন্তু কি ওর মন দেখতে পাচ্ছে? বেশতো, এখনই ফাঁদটায় যা পাতার পেতে দিয়ে চলে যা। সুতোটা আমার হাতে দে আমি টেবিলে পেঁচিয়ে রাখব। তোর তরলামাসী দেখতে পেলে.....'

সন্তু ফাঁদ পাতল। গমের দানা, ভেসলিন, সন্ধ্যের মুখে ঘরমুখো পায়রার ঝাঁক। 'সন্তু, জল দিয়ে যা একগেলাস', পটলবাবুর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একবার ব্যাঙ ডাকাতি করেছিলেন, একবার মাত্র পায়রা ধরবেন। তারপর বারান্দার রেলিং উঁচু করে, গ্রীল দিয়ে ঢেকে.....। সন্তু চলে গেল। তরলা আসছে। তরলা এল। তরলা তুমি আমার ঘরে এসোনা। 'তরলা তুমি রক্তের মত লাল মেঝে দিয়ে হেঁটে সূর্যাস্তের বারান্দায় যেওনা। ওখানে আকাশে ঘুড়ি ওড়ে রাস্তায় কেরিওলা হাঁকে, মোটরের হর্ণ বাজে, পার্কে শিশুদের কোলাহল, তোমার যে বড় কৌতূহল তরলা, সব যে ঝুঁকে দেখতে যাও।' তরলা ওর দিকে হিসহিস চোখে তাকিয়ে হিলতোলা চটি পরে খটখট করে হেঁটে বারান্দার দিকে চলেগেল। 'এখানে পায়রা নামছে কেন? গম দিল কে?'

বলি

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

জুয়া খেলায় যথাসর্বস্ব হারিয়ে যে ভাবে মানুষ বাড়ী ফিরে আসে অমিত সেই ভাবেই টলতে টলতে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। অথচ সে খেলায় অংশ গ্রহণ করে নি। তবুও সে শিকার হ'ল। দেশের একজন সুস্থ নাগরিক সে। বাড়ীতে তার দুটি মাতৃহীন সন্তান রয়েছে। যাদের সুখ-দুঃখ ভাল মন্দ নিয়ে অমিত চিন্তা করে। তাদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ওদের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখলে উজ্জীবিত হয়ে উঠে।

সকালে নাকে মুখে সামান্য কিছু গুঁজে সে দোকান খুলতে যায়। দুপুরে ফিরে আসে খাওয়া দাওয়ার জন্য। ঘন্টা দুই পরে আবার চলে যায় ফিরে আসে রাত নটায়।

বাড়ীর কাজ কর্ম এবং ছেলে দুটির দেখা শুনা করে শ্যামা। স্ত্রীবিয়োগের পর এক বন্ধু তাদের গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। গরিবের ঘরের বিধবা। মানুষটি বড় ভাল।

বন্ধু বান্ধবরা তাকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। অমিত করে নি—ছেলে দুটির কথা ভেবেই করেনি। অথচ তারা বলে ওদের জন্যই করা উচিত। অমিত অন্য কথা বলে। ছেলে পিলেদের নাম করে যারা বিয়ে করে তারা নিজেদের কথা ভেবেই করে। ছেলে মেয়ে নিছক উপলক্ষ্য।

প্রতিদিনের মত আজও খাওয়া দাওয়ার পর অমিত দোকানে গিয়েছিল। ফিরে এল সর্বস্বান্ত হ'য়ে। কেন গেল? কোন অপরাধে তাকে এত খানি মূল্য দিতে হল এ প্রশ্নের কে জবাব দেবে? অথচ সে আজ পথের ভিখারী। পায়ের তলার মাটি সরে গেছে।

বাড়ীতে প্রবেশ করতেই ছোট ছেলে শম্ভু ছুটে এল, বাবা দাও—

কোনদিন চাইতে হয়নি। প্রবেশ পথ থেকেই তার গলা শোনা যেত, শম্ভু বাবু তোমার সন্দেশ।

ছোটর সঙ্গে বড়ও এসে পাশে দাঁড়ায়। ছোটর নাম ধরে ডাকা হলেও প্রাপ্তিটা দুজনেরই তা ওরা জানে।

চমকে উঠল অমিত।

ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাও এসে উপস্থিত হল। এমন অসময় ত বাবাবাবু কোনদিন ফিরে আসে না। অসুখ বিসুখ করল নাত?

অমিতের মুখের পানে তাকিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল শ্যামা। তোমার হয়েছে কিগো বাবাবাবু? চেহারাটা অমন···

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ক্লান্ত গলায় অমিত বলল, বলছি শ্যামাদি, আগে তুমি এক গ্লাস জল নিয়ে এস।

শ্যামা ছুটে গেল। বন্ধু আর শঙ্কু কিছু না বুঝেও ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গেছে। সন্দেশের আশায় যে দুখানি হাত ব্যগ্র ভাবে এগিয়ে এসেছিল তা অনেকক্ষণ পূর্বেই গুটিয়ে নিয়েছে।

অমিতের মাথার মধ্যে অজস্র এলো মেলো চিন্তা। চিন্তা সন্দেশের না, চিন্তা আরও ঢের বড় জিনিসের। পেটের। অথচ সে বুঝতে পারছে না এতবড় শাস্তি কেন তার মাথার উপর নেমে এল। এই একটা প্রশ্নই তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

শ্যামা জল নিয়ে এসেছে। বড্ড পিপাসা। এক চুমুকে গ্লাসের শেষ বিন্দু জলটুকুও সে শেষ করে ফেলল।

গ্লাসটি ফিরিয়ে নিয়ে শ্যামা বলল, ঘরে চল দাদাবাবু।

একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অমিত। ঘর···ভাড়াটে বাড়ীর ও দুখানিও আর কতদিন তার অধিকারে থাকবে তা সব ভাগ্য বিধাতাই জানেন।

ভেঙে পড়লে তার চলবে না একথা সে জানে। বন্ধু আর শঙ্কুর জন্ত আবার তাকে নতুন করে উঠে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু পথ কোথায়? সম্বল কোথায়? শ্যামা আবার ডাকল, কই গো দাদাবাবু কথাটা কি তোমার কানে গেলনি? ঘরে এসে চুপ করে বসেছে অমিত। ছেলে দুটিও যেন অকারণে ভয় পেয়ে বাপের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

শ্যামাও সঙ্গে এসেছে। সে আবার একই প্রশ্ন করল, কি হয়েছে বললে না ত দাদাবাবু।

অমিত একটুখানি হাসল। এ হাসি কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক। কেমন ক'রে সে ওকে বুঝাবে যে, সে আজ একদল জুয়ারীর শিকার হয়েছে। সুস্থ জীবনযাত্রা অসুস্থ আর উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ট্রাম পুড়ছে, বাস জ্বলছে, বোমা ফাটছে, গুলি চলছে, লুটপাট হচ্ছে, আগুন জ্বলছে। কার জন্ত কিসের জন্ত এই একটি জিজ্ঞাসাই তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে চলেছে। ইচ্ছে হয়েছিল, চীৎকার করে বলে, কার ভালর জন্ত অগণিতের এতবড় সর্বনাশ তোমরা করছ? কিন্তু পারেনি। অমিতের কণ্ঠ বুজে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সর্বনাশ সে বিহ্বল হয়ে দেখেছে। দশবছরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা দোকানটি তারই চোখের সম্মুখে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে ওরা কোন মোক্ষ লাভ করল অমিত কিছুতেই তা বুঝতে পারেনি।

শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

অমিত ধরা গলায় তার সর্বনাশের কাহিনী ওকে শোনাল। তারপর ভেঙে পড়ে বলল, আবার যে কালকের মত চালাবার সংস্থানও নেই শ্যামাদি।

আশ্চর্য শ্যামা একটুও বিচলিত হল না। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এত ভাবচ কেন? তুমি না পুরুষ মানুষ? দিন কি কারুর জন্তে আটকে থাকে?

তা থাকে না সত্যি কিন্তু···

শ্যামা বলে, আজ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। কাল তখন ভেবে চিন্তে যা হয় করবে।

শ্যামার মত ক'রে ভাবতে পারলে হয়ত দুশ্চিন্তার হাত থেকে খানিকটা অব্যাহতি পাওয়া যেত, কিন্তু অমিতের সম্মুখে বর্তমান তার পুত্রদ্বয়ের দুখানি কচি মুখ তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না।

নগদ সঞ্চয় সে কোনদিন করেনি। ব্যবসায় বিনিয়োগ ক'রে দোকানটিকে বড় ক'রে তুলেছিল অমিত। বর্তমানে একেবারে রিক্ত সে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গহ্বরে।

তবুও তাকে ভাতের থালার সম্মুখে গিয়ে বসতে হল। পেট তার দাবি ছাড়বে কেন? এই পেটের জন্যই আবার নতুন করে উদ্যোগী হতে হল, কিন্তু ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে অমিত আর সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারল না।

শ্যামাকে সে চলে যেতে বলেছে। মাইনে দেবার সামর্থ্য তার নেই। তাছাড়া এই বাজারে একটা লোকের খাওয়া পরার খরচও তার কাছে সহজ সাধ্য নয়।

শ্যামা কেঁদে কেটে অনর্থ ক'রেছে। মাইনের উপর তার লোভ নেই। ছেলে দুটোকে ফেলে কিছুতেই সে যাবে না।

এর উপর নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে বাড়ীওয়ালাকে নিয়ে। অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক পিছনে লেগে ছিলেন। নেহাৎ পুরান ভাড়াটে তার উপর নিয়মিত ভাড়া পেয়েছেন তাই কিছু করা সম্ভব হয়নি। এতদিনে সুযোগ পেয়েছেন।

মাথার উপরের আচ্ছাদনটুকুও শেষ পর্যন্ত হয়ত থাকবে না। অমিত বাড়ীওয়ালার কাছে ছুটে গেল। হাত জোড় করে সময় প্রার্থনা করল।

কথাটা যেন বুঝতে পারেননি এমনিভাবে চেয়ে রইলেন বাড়ীওয়ালা। অমিত পুনরায় সবাতত্ত্বে একই কথার পুনরুক্তি করল।

বাড়ীওয়ালা বললেন, আমিও ছাপোষা মানুষ মশাই তাই বলে নিজের ভাল মন্দ বুঝব না এত আহাম্মক আমি নই। সময় আপনি নিশ্চয় পাবেন তবে তা ভাড়া মেটাবার জন্য নয় বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্য। আমার কাছে আসার দরকার ছিল না আদালত থেকেই সময় পাচ্ছেন আপনি।

ফিরে এল অমিত। গত ছমাস একটি পয়সাও সে দিতে পারেনি। কবে পারবে তারও নিশ্চয়তা নেই। দুবেলার ভাত জোটানও আর সম্ভব হ'চ্ছে না। ধার দেনায় মাথার চুল বিক্রী হ'য়ে গেছে। শ্যামার সঞ্চিত তহবিলেও হাত পড়ে গেছে। কেউ কিছু না ব'ললেও অমিত টের পেয়েছে।

বন্ধু আর শঙ্কু আজকাল কোন আব্দার করে না। ওরা বাপকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। কাছে যেতে ভয় পায়। ও লোকটি যেন তাদের পরিচিত বাপ নয়। বাবার রূপ ধরে অপর কোন লোক যেন আসা যাওয়া ক'রছে। শ্যামার কাছে যদিও বা কখনও বায়না করে বাবার কাছে একেবারে বোবা। অমিতের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও যেন হাসতে ভুলে গেছে।

শঙ্কু সেদিন চুপি চুপি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, আর বুঝি কোনদিন সন্দেশ খেতে পাব না দাদা? বাবা খুব গরীব হয়ে গেছে তাই না?

বন্ধু বিজ্ঞের মত মাথা নেড়েছে। শঙ্কুর চোখ দুটো ছলিয়ে উঠেছিল। আড়াল থেকে অমিত দেখেছে ও শুনেছে! কিন্তু ক'রবার তার কিছু নেই শুধু দুঃখ পাওয়া ছাড়া। নিজের শরীর আর বইছে না। বিগত কয়েক মাস ধরে তার দেহের আর মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে চলেছে তাতে এখনও যে তারা বেঁচে আছে এই ঢের।

বাড়ীওয়ালা মামলা জিতেছেন। আদালত কিছু সময় দিয়েছে। সময় শেষে ফুট পাথ। শ্যামাকে পুনরায় চলে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে অমিত। ওর ত তবু মাথা গুজবার একটা আস্তানা আছে। তার কিছুই নেই। যা ছিল বর্তমানে তা বিদেশী রাজত্বে। এক সময়ের স্বদেশ আজ বিদেশ হ'য়েছে।

বলবার কিছুই নেই। বলবে সে কাকে? কে তার কথা শুনবে? শুনবার মত ধৈর্য কি

তাদের আছে? কয়েকজনের খেলা যে অগণিতের জীবনের ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছে সে কথা বুঝবার এবং বোঝাবার মানুষ আজ কোথায়?

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অমিত। আলো নেই, বিশুদ্ধ বাতাস নেই, চোখের সম্মুখে শুধু সীমাহীন অন্ধকারের মহাসমুদ্র—যা তাকে একটু একটু ক'রে টানছে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবার জন্য। পরিত্রাণের বুঝি কোন পথই আর খুঁজে পাবে না। নিজে সে হাসতে ভুলে গেছে, প্রতিবাদ ক'রতে ভয় পাচ্ছে, কাঁদতে লজ্জা পাচ্ছে।

একটা কিছু অমিতের করা দরকার নইলে সে পাগল হ'য়ে যাবে।

শ্যামা কিছুদিন ধরে অমিতের অভিভাবকের স্থান নিয়েছে। কখনও অনুযোগ দিচ্ছে, কখনও ধমকাচ্ছে।

বলে, তোমার কি একলা গেছে? একবার গেছে বলে কি আবার হ'তে পারে না? তুমি ত আর নিজে হাতে নষ্ট করোনি দাদা।

শ্যামার ধমকের মধ্যে স্নেহের প্রচ্ছন্ন সুর। অমিতকে মাড়া দিলেও ভুল কিছুই দিতে পারে না। অনেকের কথা সে জানে না। নিজেকে দিয়েই বিচার ক'রে দেখে।

জবাব না পেয়ে শ্যামা রাগ ক'রে পুনরায় বলে, ছেলে দুটোর কথাও কি একবার ভেবে দেখছ না। চিন্তায় চিন্তায় নিজের শরীরটা কি ক'রেছ তা জান তুমি?

জানে বইকি। ভাল ক'রেই জানে। ওদের ভবিষ্যৎ চিন্তাই যে তাকে পাগল ক'রে তুলেছে একথা সে শ্যামাকে কেমন ক'রে বোঝাবে।

জবাব না পেয়ে শ্যামা গজগজ করতে করতে চলে যায়। আমার হয়েছে ভাল জ্বালা। যাব একদিন চলে তখন মজাখানা বুঝো।

ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে অমিতের। শ্যামা যে কি ব'লতে চায় ও তা ভাল ক'রেই জানে—

হঠাৎ চমকে উঠল অমিত। দেওয়াল পঞ্জীর একটি বিশেষ তারিখের উপর ওর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল। লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করে রাখা হ'য়েছে। এই বাড়ীতে বাস ক'রবার অধিকার ঐ দিনটি পর্যন্ত। তারপর……

আকাশে অনেক গুলি তারা ঝিল মিল ক'রছে। জানালা পথে একরাশ জ্যোৎস্না এসে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তার রংটা অমিতের চোখে সাদা লাগছে না। আশ্চর্য ওর অনুভূতি আর দৃষ্টির রংও বদলে গেছে এই সামান্য কটা মাসের ব্যবধানে। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে অমিতের।

ওর হাতের আংটির পাথরটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। এক টুকরো হাসির মত। এই আংটিটি অমিতের স্ত্রী তাদের ফুল শয্যার রাত্রে নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। একটি মধুর রাতের সুমধুর স্মৃতি। তার পর কত বছর একটি একটি ক'রে অতীতে মিশে গেছে। কত সুখ দুঃখের ইতিহাস লেখা হ'য়েছে তার জীবনের খাতায়। কিন্তু এই স্মৃতিটুকু সে সযত্নে ধরে রেখেছিল। আঙুল থেকে খুলতে পারে নি। আজ হঠাৎ তার আঙুলটা জ্বালা ক'রে উঠল। এতদিন কেমন ক'রে সে এটা ধারণ ক'রে ছিল ভাবতেও লজ্জা পেল।

আংটিটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক বিচিত্র বীভৎস ভাবনা তার মাথার মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে।

আর মাত্র দুটি দিনের ব্যবধানে এই বাড়ী তাদের ছেড়ে দিতে হবে। কোথায় যাবে তা অমিত জানে না। যদি না যায় জোর ক'রে তাদের উৎখাৎ করা হবে। একটা অক্ষম ক্রোধে নিজেকেই নিজে ক্ষত বিক্ষত ক'রতে থাকে।···

পরদিন সকালেই আংটিটি বিক্রি করে দিল অমিত। অনেক দিন পরে কয়েকটা টাকা একসঙ্গে সে হাতে পেয়েছে। তার আজকের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও সে প্রাণ ভরে তার বন্ধু আর শম্ভুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারবে। যে হাসি হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা ক'রেও যে হাসিটুকু সে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

অমিত আজ আবার ওদের হাসি মুখ দেখবে। বুক ভরে অনুভব ক'রবে। অনেকদিন পরে সে বাজারে গেল। মাংস কিনল। ভাল ভাল মাছ নিল। ইলিশ আর চিংড়ি। শম্ভুর পছন্দ ইলিশ বন্ধুর চিংড়ি। ভীম নাগের দোকান থেকে সন্দেশ কিনতেও ভুল হ'ল না।

বন্ধু আর শম্ভু অনেক দিন পরে যেন ওদের বাবাকে আবার ফিরে পেল। ওদের আনন্দ উপচে পড়ছে। শম্ভু চুপি চুপি তার দাদাকে বলে, আমরা বুঝি আবার বড় লোক হয়েছি দাদা?

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সায় দেয় বন্ধু।

মামা মুখে কিছু বলছে না বটে কিন্তু অমিতের ধরণ ধারণ মোটেই স্বাভাবিক লাগছে না তার কাছে। খানিক ভয় খানিকটা সন্দেহ থেকে থেকে তার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

সারাদিনে এক মুহূর্তের জন্যও ছেলেদের চোখের আড়াল করে নি অমিত লুব্ধ দৃষ্টিতে ওদের দেখছে। দেখছে ওদের আনন্দ উজ্জ্বল হাসি।

এই হাসিটুকু হারিয়ে গিয়েছিল। একে সে ধরে রাখবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।···

রাতের আহার পর্ব শেষ হ'য়েছে। ছেলেদের নিয়ে শোবার ঘরে এসেছে অমিত। সন্দেশের বাক্সটি এতক্ষণ সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। এই বারে তা বার করে আনবে। ওরা খুশী হয়ে বাপের হাত থেকে সন্দেশ নেবে। হাসতে হাসতে পরম উৎসাহ ভরে খাবে। তারপর···তারপর চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়বে। ওদের মুখে লেগে থাকবে পরিতৃপ্ত হাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা। অমিতও ওদের পথেই জীবনের শেষ হিসেব নিকেস করে যাবে কিন্তু তার মুখ বিষ আর বেদনায় নীল হ'য়ে থাকবে।···

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল অমিতের পরিকল্পনার ভিত্তি মূলে। নিজেকে সে ধিক্কার দিল। এখনও তার পকেটে অনেকগুলি টাকা অবশিষ্ট আছে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার মূলধন।

ফুটপাথ···ওখানে আশ্রয় নিয়েও কত অগণিত মানুষ বাঁচার জন্য লড়াই করছে।

সন্দেশের বাক্স শেষ পর্যন্ত, বার ক'রতে পারে না। ছেলেদের ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা ক'রতে হয়। তারপর একসময় চোরের মত বাক্স হাতে বার হ'য়ে আসে অমিত। ফেলে দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে সে।

এবারে সেও ঘুমুবে। ছেলেদের পাশে। কিন্তু এ ঘুম তার আবার ভাঙবে। নতুন ক'রে এগিয়ে চলার এক দুর্জয় প্রেরণা নিয়ে।

শেষ তীর্থ

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

রামেশ্বরের পরনাথতি দেখে এসে মহিমবাবু বললেন : এইবারে সোজা কন্যাকুমারী।

ঘোমটার নিচে থেকে মহিমবাবুর স্ত্রী বললেন : এইতো যথেষ্ট হল, আবার কন্যাকুমারী কেন!

বিজ্ঞের মতো মহিমবাবু বললেন : তুমি জাননা গিন্নী, অতবড় তীর্থ ভারতে আর নেই। মাতৃহত্যার পরে সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করেছিলেন পরশুরাম, কিন্তু যে কুঠারে মাকে কেটেছিলেন সে কুঠার তার হাতে আটকে ছিল, কোন ও তীর্থে ত খসে পড়েনি। কন্যাকুমারীর মাতৃতীর্থে স্নান করেই তাঁর হাতের কুঠার খসে পড়ল, পাপমুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

আমি হেসে বললাম : আমাদের তো মাতৃহত্যার পাপ নেই!

হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন মহিমবাবু, কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। তারপর বললেন : এত দূরে এসে এত বড় তীর্থ না দেখে যাওয়া কি উচিত হবে! বারে বারে, তো এত পয়সা খরচ করা সম্ভব নয়।

এ যুক্তি মেনে নিলাম, বললাম : তা সত্যি।

ভারতের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এসে আমরা পৌঁছেছি। দুএকদিনের পথ নয়, কয়েকটা দিন সময় লেগেছে এখানে পৌঁছতে। হাওড়া থেকে বিকেল ছটার পরে আমরা মাদ্রাজ মেল ধরেছিলাম। সারারাত ট্রেনে কেটেছে। সকালবেলায় দেখেছি, বাঙলা দেশ ছেড়ে আমরা উড়িষ্যার উপর দিয়ে চলেছি। সারাদিন ধরেও অন্ধ্রদেশ ছাড়াতে পারিনি। রাতে বিজয়ওয়াড়ায় খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছেছিলাম মাদ্রাজে। কিন্তু রামেশ্বর তো মাদ্রাজের কাছে নয়, সে একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। বড় লাইনের ষ্টেশন মাদ্রাজ সেন্ট্রাল থেকে ছোট লাইনের ষ্টেশনে আমাদের আসতে হয়েছে ট্যাক্সিতে করে। সেখান থেকে রামেশ্বরের গাড়ী সন্ধ্যা সোয়া সাতটার পরে। দুপুর প্রায় পৌনে দুটোয় এই গাড়ী রামেশ্বরে পৌঁছায়।

আগে পাম্বান জংশনে গাড়ী বদল করে রামেশ্বরে আসতে হত। সেখানে না নামলে যাত্রীরা ধনুষ্কোডি পৌঁছে যেত। সিংহলের যাত্রীরা যেত সেখানে। সমুদ্রগামী জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকত ধনুষ্কোডি পিয়ারে। ট্রেনথেকে নেমে যাত্রীরা জাহাজে উঠত। সেই জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে যেত তালাইমন্নার পিয়ারে। সেখান থেকে আবার ট্রেন। সে ট্রেন সিংহল দেশের। সেখানে যাবার জন্য ছাড়পত্র চাই, নানা বিধি নিষেধ আছে সিংহলে যাবার। স্বাধীন দেশতো!

ধনুষ্কোডিও সুন্দর জায়গা ছিল বলে শুনেছি। সমুদ্রের জল এসে রেল লাইনের ধার পর্যন্ত দোলা

দিত। ভেলোদের গ্রাম, মনে হয় দ্বীপের মতো, তাল ও নারকেল পাতার কুঁড়েগুলি গায়ে গায়ে লেগেছিল। ঘরের বাহিরেই জল। এখন শুনেছি এ জায়গা আর নেই, বন্যার জলে সব ভেসে গেছে। রামেশ্বর একটি দ্বীপ। পাম্বনের পুল দিয়ে এই দ্বীপটি ভারতের সঙ্গে যুক্ত। রেল কোম্পানী নাকি রামচন্দ্রের সেতু-বন্ধের উপরেই এ পুল তৈরি করেছে। জলের ভিতর বড় বড় পাথর এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

রামেশ্বর আমাদের দেখা হয়ে গেছে। দেবতার দর্শন পেয়েছি, পবিত্র হয়েছে মন। এবার তাই কেরার কথা ভাবছি। দলে আমাদের উৎসাহী যাত্রী আছেন ভিড়ে, সকলের সঙ্গেই ভাব করেছেন তিনি। কথায় কথায় বলেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারেনা, পথের শাসন সবাইকে মানতে হবে।

আমি হেসে বলেছিলাম : আপনি কি আমাদের দলের নেতা ?

তিনিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন : নেতা নই, চড়িদার।

অন্য একজন বলেছিলেন : দূর দেশে আমরা যাত্রীরাইতো পরস্পরের সাহস।

কথাটা মিথ্যা নয়। পরিচয় আমাদের স্বল্পকালের হতে পারে, কিন্তু এই নির্বান্ধব দেশে তা ঘনিষ্ঠ হয়েছে খুব সহজ। আবার সুখ দুঃখ আমরা বুঝতে শিখেছি, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে শিখেছি পরের জন্য। এ আমাদের পথের শিক্ষা। এরই নাম তীর্থ ফল।

দলে আমাদের দুটো ভাগ হয়েছিল। রামেশ্বর দর্শন করে যাদের পুণ্যের ভাণ্ড পূর্ণ হয়েছে, তারা দেশে ফিরবার জন্যে উৎসুক। আবার কেউ ভাবছে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের কথা বা কন্যাকুমারীর কথা। মাদুরা তো ফিরবার পথে পড়বে, ইচ্ছাকরলেই নেমে দেখা যায়। কিন্তু কন্যাকুমারী যেতে হলে নতুন উদ্যম চাই।

ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে মনে হয় যে রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী দুটি পাশাপাশি গ্রাম। কিন্তু রেলওয়ের টাইমটেবেল দেখলেই দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। সরাসরি যাবার কোন পথ নেই। প্রথমে মাদুরায় ফিরতে হবে উত্তর মুখে, মাদুরা থেকে দুটি পথ। একটা তিরুনেলভেলি হয়ে, আর একটা ত্রিবেন্দ্রম হয়ে। কন্যাকুমারী পর্যন্ত ট্রেন নেই, বাসে করে যেতে হয় কন্যাকুমারী। তিরুনেলভেলি থেকে বাস আছে, বাস আছে ত্রিবেন্দ্রম থেকেও। তিরুনেলভেলি হয়ে গেলে রেলের পথ কিছু সংক্ষেপ হয় প্রায় আধাআধি তাই অনেক যাত্রী যায় সেদিক দিয়ে। তাম্রপর্ণীর তীরে এই শহরটিতে হরপার্বতীর মন্দিরও আছে। কিন্তু ত্রিবেন্দ্রম হয়ে আমাদের যাওয়া স্থির হল। সে পথে কেরালা রাজ্যের রাজধানী দেখা হবে, আর দর্শন পাওয়া যাবে পদ্মনাভ স্বামীর।

এই প্রসঙ্গে একটি নতুন কথা জানা গেল। কন্যাকুমারী নাকি কেরালা রাজ্যে নয়, এই তীর্থটি যাত্রাজের সম্পত্তি। প্রবলভাবে আপত্তি করেছিলেন একজন। তিনি বলেছিলেন যে পুরনো ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য নিয়ে স্বাধীন ভারতে কেরালার জন্ম হয়েছে। কন্যাকুমারী ত্রিবাঙ্কুর রাজের সম্পত্তি ছিল। এখন কেরালার। অন্যজন তর্ক করেনি, ব্যাগ থেকে একখানা মানচিত্র বার করে তার সামনে খুলে ধরেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যে এই মানচিত্রগুলি আজকাল বইএর আকারে বিক্রি হচ্ছে ষ্টেশনের বুকষ্টলে। দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনাও কিছু আছে। কাজেই উৎসাহী যাত্রীরা আজকাল এই সব মানচিত্র সংগ্রহ করছেন যাত্রার প্রারম্ভে।

বিবাদ মিটে গেল। ভদ্রলোক শুধু মন্তব্য করলেন : আশ্চর্য !

আশ্চর্য হবারই কথা। তবে কী করে যে এই কন্যাকুমারীকে কেরালার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া

হয়েছে, আমাদের তা জানা ছিলনা। বোধহয় এ ভাষা আন্দোলনের ফল। তামিল ভাষাভাষীরা বোধহয় এই যুক্তি নিয়েই ভারতের একটি সুন্দর স্থান আপন এলাকাভুক্ত করেছে।

সকালের ট্রেনে আমরা মাদুরায় গিয়ে এলাম। দেখলাম মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। ষ্টেশনের খুব কাছে বলে যান বাহনের দরকার হয়না, এ পথটুকু হাঁটতেই ভাল লাগে। দক্ষিণ ভারতে এই মিনাক্ষী মন্দির হল শিল্প নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলায় যখন লক্ষ প্রদীপের আলো সারা মন্দির ঝলমল করে, তখন একে সুন্দরতম মন্দির বলে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা হয়না। বিকালের ট্রেনে আমরা ত্রিবেন্দ্রাম যাত্রা করলাম বলে সে রূপ আমাদের দেখা হল না।

আমরা হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ দেখলাম, আর দেখলাম অষ্টলক্ষ্মীর মণ্ডপে মীনাক্ষী দেবীর চিত্রায়িত কাহিনী। পুত্র সন্তানের জন্য শিবের আরাধনা করে বিজয়নগরের রাজা কন্যালাভ করেছিলেন। মীনাক্ষী মানুষ হলেন মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো। রণসাজে সজ্জিতা হয়ে অশপৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করেন, রাজ্য পরিচালনা করেন নিজের হাতে। একদিন সুন্দরেশ্বর শিব এলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, বিহ্বল হলেন দেবী মীনাক্ষী, যথা সময়ে তাদের পরিণয় হল, মন্ত্র পড়লেন ব্রহ্মা ও নারদ, স্বয়ং বিষ্ণু কন্যা সম্প্রদান করলেন। গল্পের শেষ এইখানে হয়নি। পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে দেবী যে শিবলোকে গেলেন, সে কথাও চিত্রিত আছে।

অনেকে আমাদের রাতটা মাদুরায় কাটিয়ে সকালের গাড়িতে তিরুনেলভেলি যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পথ সংক্ষেপ হবে, ভাড়া কম লাগবে, আবার একদিনেই কন্যাকুমারী পৌছনো যাবে। কিন্তু শেষ আশ্বাসটি বিশ্বাস যোগ্য বলে অনেকের মনে হলনা। তাঁরা বললেন রাতে যে মশায় খেয়ে ফেলবে। মাদুরায় মশা শুনেছি বিখ্যাত।

কিন্তু মশার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি। মাদুরায় আমরা রাত্রিবাস করিনি। বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই আমরা রওনা হয়েছিলাম। আর একটা কথা শুনলাম ট্রেনে চাপবার পরে ত্রিবেন্দ্রাম এক্সপ্রেসে ত্রিবেন্দ্রামে যাবার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। এ ট্রেনটি সকালবেলায় ছেড়ে সন্ধ্যার বেলায় পৌছায় ত্রিবেন্দ্রাম। দিনের বেলায় পার হয় ঘাট সেক্সন। তার সৌন্দর্য অপরূপ। সে উপরিলাভ।

ভিক্তেও অনেক খবর সংগ্রহ করেছিলেন। বললেন: ত্রিবেন্দ্রামে পৌছেই আমরা কন্যাকুমারী দৌড়াই, কিন্তু সাহেবরা এদেশকে কেন পিকনিকের আদর্শ জায়গা বলত আমরা তা ভেবে দেখিনা। কেরালার আসল রূপ হল কোচিনে। মাস খানেকের ছুটি পেলেই তারা কোচিনে ছুটে আসত, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে উঠত একখানা নৌকোয়। ব্যাকওয়াটার্স ক্যানাল ধরে তারা এরনাকুলম থেকে কুইলন আসবে। কলা আর নারকেলের ঘনছায়া ঢাকা নালার স্রোত মন্থর। মাঝে মাঝে গায়ে নৌকো ভিড়িয়ে গ্রামবাসীর কাছে কিনবে শাক সব্জী ফল দুধ মাছ। সঙ্গে যদি কিছু ভাল বই ট্রানজিসটার আর বীনাবাদিনী সঙ্গী থাকে একটি, তাহলে আজও এই পিকনিক অসাধারণ মনে হবে।

ভোর ছটার পরই আমরা ত্রিবেন্দ্রামে এসে নামলাম। রাতে কেউ ঘুমিয়েছেন, কেউ ঘুমোতে পারেন নি। যাঁরা ঘুমিয়ে আরাম পেয়েছেন, মন তাদের প্রসন্ন ছিল। আবার ঘুমোতে না পেরেও উৎসাহ কমেনি, এমন লোকের অভাব নেই বলে। ভিক্তে বললেন: আসুন আসুন সমুদ্রে একটা ডুব দিয়ে আসা যাক, লোনাজলে গায়ের ব্যথা মরবে।

আর একজন বললেন, আর মনটাও হাল্কা হবে বলুন।

কিন্তু সকলে রাজী হলেন না। যাঁরা এগিয়ে আসছিলেন, আমি তাঁদের দলে ভিড়ে গেলাম। অন্যান্য যাত্রীদের কাছে মালপত্র জমা রেখে শুধু একখানা কাপড় আর গামছা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সির অভাব নেই ত্রিবেন্দ্রামে। ভিড়ের হেটে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অন্য কেউ রাজী হলেন না, বললেন: নতুন জায়গায় পথ ঘাট চিনিনে, আর হাতে যখন অফুরন্ত সময় নেই তখন কোথাও রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। বরং সময় বাঁচলে মন্দিরটাও ঘুরে আসা যাবে।

কাজেই একটা ট্যাক্সি ঠিক করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে যে মেঘ ছিল আমরা তা দেখতে পাইনি। রোদ না দেখে ভেবেছিলাম যে সূর্য তখনও উঠেনি। সমুদ্রের ধারে পৌঁছবার আগেই ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি নামল, আর বাতাস এল হুড়মুড় করে। জানালার কাচ আমরা তুলে দিয়েছিলাম। ড্রাইভার বলল: এখানে তো স্নান করতে পারবেন না, কোভালম নিয়ে যাব?

সে তো অনেক দূর এখান থেকে!

মোটরে আর দূর কি! মাইল আষ্টেক পথ পনের মিনিটেই পৌঁছে যাব।

আর একজন বললেন: থাক, সমুদ্রে স্নান। মন্দিরে নিশ্চয়ই পুকুর আছে। আজ সেখানেই স্নান করব।

একটা জায়গায় পৌঁছে ড্রাইভার গাড়ি থামাল। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিদিক, আর ঝড়ের মতো বাতাস বইছে সেখানে। সেটার শব্দে বুঝতে পাচ্ছিলাম যে আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছি। অন্ধকার নেই, দিনের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সামনের কুয়াশা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আর একটু পরে বোধহয় আলোর বৃষ্টি শুরু হবে।

ভিড়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। মাথায় গামছা দিয়ে ছুটে গেলেন সমুদ্রের ধারে। তারপরে ফিরে এসে গাড়িতে উঠে পড়লেন। বললেন: ঘোটেই নিরাপদ নয়।

আমরাও তা দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি গাড়িতে বসে। ভিড়ের কথা শুনে একজন বললেন: তবে কি ষ্টেশনেই ফিরতে হবে নাকি?···

·· ভিড়ে বললেন: না, কলের জলে আজ স্নান করব না। চল পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির। কিন্তু কী আশ্চর্য! মন্দিরে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি থেমে গেল, পৃথিবী ঝলমল করে উঠল প্রভাতের প্রসন্ন রৌদ্রে। আমাদের মনও প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

পদ্মনাভ স্বামীর দর্শন এক নজরে হয় না।

অনন্ত শয়ন বিষ্ণুর বিশাল মূর্তি মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে। প্রদীপের আলোয় সে মূর্তি দেখা যায় না। দেখা যায় কর্পূর আরতির সময়। তাও একটি দরজা দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তি দেখার উপায় নেই। এক দরজা দিয়ে শুধু পায় পদ্ম দেখা যায়, মাঝখানের দরজার দিয়ে দেখতে হয় বক্ষ ও নাভিকমল; মুখমণ্ডল দেখতে তৃতীয় দরজায় আসতে হয়। মন্দিরে প্রবেশেরও বিধিনিষেধ আছে। জামা খুলে খালি গায়ে আসতে হয় পুরুষদের।

ষ্টেশনে ফিরে এসে আমরা দেখলাম যে এক্সপ্রেস বাসে কন্যাকুমারী যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ত্রিবেন্দ্রাম শহর দেখা হবে ফেরার পথে। অনেক কিছু নাকি দেখবার আছে। তার জন্য একটা দিন সময় দরকার। এ রাজ্যের চিড়িয়াখানা জাদুঘর জেনটাইল্ হাউস ও চিত্রালয় প্রভৃতি সংগ্রহশালা একই এলাকায়। বাচের

আকারেরিয়ার কিছু দূরে। সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলি না দেখলেও এখানকার শিল্পকর্মের নমুনা দেখে যাওয়া খুবই উচিত। ইচ্ছা করলে আমরা এসব দেখেই বিকেলে যাত্রা করতে পারতাম। কিন্তু কন্যাকুমারীর জন্যে মন সবারই অধীর হয়ে উঠেছিল। তাই সকালের বাসেই আমাদের যাত্রা করতে হল।

পরিষ্কার ঝকঝকে বাঁধানো রাস্তা। শহরের যেন শেষ নেই। পথের দুধারে ছোট বড় কাঁচা পাকা বাড়ির সারি, তার পিছনে নারকেল ও কলার চাষ। শহর ছেড়ে কখন আমরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলতে শুরু করেছি, তা বুঝতে পারিনি। এই পথটাই পুরনো ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান নাড়ি, একে অবলম্বন করেই এদেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

একচল্লিশ মাইল পথ পেরিয়ে আমরা নাগের কয়েল নামে একটা জায়গায় পৌঁছলুম। তিরুনেলভেলির পথ এইখানে এসে মিলেছে। লোকজন হাটবাজার কোলাহল আর মাইক্রোফোনের আওয়াজে সরগরম হয়ে আছে জায়গাটা।

সাধারণ বাসে এখানে বাস বদলের দরকার হয়। এক বাস থেকে নেমে উঠতে হয় আর এক বাসে। যাত্রীরা কেউ চা খায়, কেউ খায় কলা। লাল ও হলদে দুইরকমের কলা পাওয়া যায় এখানে। দামও সস্তা।

শুচীন্দ্রমের মন্দির এখান থেকে মাইল দুই দূরে। সদর রাস্তার উপরে নয়, দূরও নয় সদর রাস্তা থেকে। পুরাকালে এ জায়গার নাম ছিল জ্ঞানারণ্য। তখন মহর্ষি অত্রিরও আশ্রম ছিল এইখানে। গৌতম ঋষির শাপে অশুচি ইন্দ্র এই জ্ঞানারণ্যে তপস্যা করে শুচি হয়েছিলেন। এই জায়গার নাম তাই শুচীন্দ্রম হয়েছে।

যাবার পথে আমরা শুচীন্দ্রম দেখব না বলে ঠিক হয়েছিল, দেখব ফেরার পথে। একজন যাত্রী বলে উঠলেন: সবই যদি ফেরার পথে দেখি তো যাবার পথে দেখব কী?

কথাটা মিথ্যা নয়। ফেরার পথে শুচীন্দ্রম দেখতে হলে বিবেন্দ্রাম পৌঁছব এমন সময় যে সে শহরটা দেখবার জন্য আর একটা দিন থাকতে হবে। যাবার পথে তাই শুচীন্দ্রম দেখে গেলে মন্দ হত না।

শুচীন্দ্রমের কথা আমি যাত্রীদের কাছেই জেনে নিলাম। শিবের মন্দির সেখানে। কন্যাকুমারীতে শিব নেই, শিব আছেন শুচীন্দ্রমে। সেখানকার স্থানপুরাণে একটি সুন্দর গল্প আছে। কঠোর তপস্যা করে বাণাসুর ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে দেব দানব যক্ষ নরনারী গন্ধর্ব কিন্নর কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। বাণাসুর তারপর ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাড়ালেন অমরাবতী থেকে। নির্বাসিত ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন বিষ্ণুর পরামর্শে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। এই কন্যাই বধ করবেন বাণাসুরকে। কিন্তু তার আগেই দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রমাদ গণলেন, এই কুমারী কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে বাণাসুরকে বধ করবে কে! ইন্দ্র তাই দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হলেন, বললেন, এ বিবাহ পণ্ড করতেই হবে। নির্দিষ্ট দিনে শিব কৈলাস থেকে যাত্রা করলেন সেজেগুজে ষাঁড়ের পিঠে চেপে। লগ্ন উত্তীর্ণ হবার আগে তাঁকে কন্যাকুমারী পৌঁছতেই হবে, তা না হলে শর্ত মাফিক এ বিয়ে আর হবেনা। কিন্তু জ্ঞানারণ্যে অত্রির আশ্রমের কাছে এসেই তিনি নারদের সাক্ষাৎ পেলেন। নারদ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন। সে আলোচনা শেষ হবার আগেই লগ্ন পার হয়ে গেল। শিব তাই শুচীন্দ্রমেই রয়ে গেলেন। আর কন্যাকুমারীতে আজও অপেক্ষা করছেন সেই কুমারী কন্যা।

নাগের কয়েল থেকে কন্যাকুমারীর দূরত্ব বড়জোর মাইলের বেশী নয়। বাস সেই দিকেই ছুটছিল।

দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমরা এগোচ্ছিলাম। এতক্ষণ পাহাড় ছিল পথের দুধারে, সেই পাহাড় ক্রমেই নিচু হয়ে আসছিল। হঠাৎ একসময় ডানদিকের পাহাড় গেল শেষ হয়ে, আর বাঁদিকের পাহাড় এল আরও কাছে সরে। মনে হল যে সমুদ্রে পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই।

বাস এসে লোকালয়ে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লাম।

থাকবার আস্তানার অভাব নেই কন্যাকুমারীতে। ধর্মশালা আছে দুরকমের। বিনি পয়সার ধর্মশালায় আসবাব নেই, বাথরুমেরও অসুবিধা আছে। অন্য ধর্মশালায় এ সবের সুবিধা আছে বটে, তবে সামান্য ভাড়া দিতে হয়। যাদের সঙ্গতি আছে তারা ভাল হোটেলে বা রেষ্টহাউসে থাকতে পারেন।

আমরা এসেছি একটি রাত যাপনের জন্যে। তাই মালপত্র নিয়ে ধর্মশালাতেই চলে এলাম। এখানে স্থানাভাব নেই। স্থানাভাব কাকে বলে ধর্মশালার যাত্রীরা তা জানে না। একটা ঘর পেলে এক দঙ্গল নরনারীর ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঘর কাঁট দিয়ে এক একখানা শতরঞ্চি বা বস্তা বেছানেই হল।

ধর্মশালার যাত্রীদের কাছে আহারের সমস্যাও বড় নয়। যারা কয়েকদিন বাস করতে আসে, তাদের নিজেদের ব্যবস্থা আছে। আমাদের মতো যাত্রীদের জন্যে আছে খাবারের দোকান। ডোসা আছে, তাই খাও। সম্বর আর চাটনি দিয়ে ইড্‌লি খেতেও শিখেছি। কিছু নেই তো বড়া খাও কফির সঙ্গে। যেখানে ভাত পাওয়া যায়, সেখানে তো সুখের সুরুনি।

ভিতে বললেন : দক্ষিণ হাতের কাজটা আগে সেরে নেওয়া যাক, তারপরে অন্য কাজ।

তাঁর পরামর্শের প্রশংসা করে কয়েকজন এগোলেন, কিন্তু মহিমবাবুকে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখতে পেলাম না। মহিলারা একটা স্বতন্ত্র ঘর পেয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেলাম। মাথার ঘোমটা সরিয়ে তিনি তেল মাখছিলেন, কাঁধে তাঁর কাপড় গামছা। মাথায় আবার ঘোমটা টেনে তিনি যখন ঘরের বাইরে বেরলেন, আমি তাঁকে মহিমবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

ভদ্রমহিলা তাঁর ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে বললেন : আর বলবেন না, কাপড় গামছা নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হলেন তিনিই জানেন।

বুঝতে পারলুম যে খেতে খেতে এঁদের দেরি হবে। আমি তাই ভিতের দলের সঙ্গেই মিলে গেলাম।

খেয়ে দেয়ে আমরা যখন ফিরছি, তখন আমি দুজনকে দেখতে পেলাম। স্নানের পর্ব শেষ করে মহিমবাবু এবারে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে খেতে আসছেন। আনন্দে উজ্জ্বল তাঁর চোখ মুখ, যেন দিগ্বিজয় করে আসছেন এমনি ভাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ?

মহিমবাবু সগর্বে বললেন : মাতৃতীর্থে স্নান করে এলাম।

আমি আশ্চর্য হলাম তাঁর কথা শুনে। বললাম : এসেই সমুদ্রে গিয়েছিলেন ?

সেকথার উত্তর না দিয়ে মহিমবাবু বললেন : শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম : মনও জুড়িয়েছে দেখছি।

ভদ্রলোক গদগদ ভাবে বললেন : তা জুড়োবেনা, কতদিনের শখ বলুন।

একথা বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর যে ভারি হয়ে গেল, আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই বললাম : যান খেয়ে আসুন, পরে আপনার স্নানের গল্প শুনব।

ধর্মশালার ঘরে ফিরতে আমার মন চাইল না। আমি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরে

দোকার বাসনা আমার হলনা, তার দেওয়াল ঘেঁষে যে পথটি সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে, সেই পথে আমি পা বাড়িয়ে দিলাম। এইটিই নাকি মাতৃতীর্থের পথ, বড়বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘাট আছে কিছু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটা চত্বর থেকে ধাপ নেমেছে সমুদ্রের জলে। ঢেউ এসে পাথরের উপরে আছড়ে পড়ছে, আর ঘাটে জল চুকছে কলকল করে। মনে কেনা আছে, কিন্তু টান নেই। অকূল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অবাধে স্নান করতে কারও ভয় করে না।

একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েক জন সমুদ্রের শোভা দেখছিল। আমারও ইচ্ছা হল সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানে উঠে দাঁড়াতেই চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। কী অপরূপ দৃশ্য! সামনে অসীম জলরাশি, সেই জল যেন দিগন্তের আকাশের সঙ্গে মিলেছে। এক দিকে গান্ধীস্মারক মন্দির, অন্য দিকে কন্যাকুমারীর মন্দিরের পিছনে সমুদ্রের জলে দুটি ছোট পাহাড়। নাম তার বিবেকানন্দ রক্স্। তিন সমুদ্রের মিলন হয়েছে এইখানে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর এখানে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে মিলেছে। না, তা, নয়। পৃথিবীর মতো সাগরও একটাই। এক এক স্থানে তার এক এক নাম।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা সবার সঙ্গে মন্দির দর্শনে বেরুলাম। মন্দিরের পথটি বোধ হয় শহরেরও প্রধান পথ। দোকানপাট ও লোকজনে সরগরম। একটা একটা করে বাতি জ্বলে উঠছে। ভিড়ে আগে আগে চলেছেন, আমরা পিছনে। একজন বললেন: কাল সূর্যোদয় দেখতে হলে আজ একটু তাড়াতাড়ি শুতে হবে।

সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই মনোরম। কিন্তু আজ আমরা সূর্যাস্ত দেখতে পাইনি। পশ্চিমের আকাশে দেখেছি রঙের খেলা। প্রতিদিনের মতো প্রসাধন করেছে পশ্চিমের আকাশ। সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গে তার প্রতিবিম্ব দেখেছি। কিন্তু আকাশে যে সামান্য মেঘ ছিল, তা আমাদের চোখে পড়েনি। কোন অসতর্ক মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়েছিল সূর্য।

আর একজন বললেন: সূর্যোদয় আমাদের দেখতেই হবে।

ভিড়কে দাঁড়াতে দেখা গেল। তিনি যে আমাদের আলাপটা শুনতে শুনতেই চলছিলেন তা বোঝা গেল তার মন্তব্য শুনে। পিছন ফিরে বললেন: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার শখ থাকলে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন আসবেন।

কেন?

সেদিন একই সঙ্গে চন্দ্র সূর্য দেখতে পাবেন। বিকেল বেলায় সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালে কে ডুবছে আর উঠছে কে তা বুঝতে পারবেন না।

সত্যি নাকি!

বলে আশ্চর্য প্রকাশ করলেন অনেকে। আর ভিড়ে সগৌরবে এগিয়ে গেলেন।

ছবি ও ফুলের দোকান পেরিয়ে তোরণের নিচে দিয়ে আমরা মন্দিরের দরজায় এলাম। প্রহরী বলল, পুরুষদের জামা খুলতে হবে।

এ নিয়ম আমরা মেনে এসেছি। দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করে মন্দিরে প্রবেশের এই নিয়ম সারা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। যাঁরা জানেন না, তাঁরা আশ্চর্য হলেন। কেন এমন নিয়ম হলো তা নিয়ে আলোচনা করলেন খানিকক্ষণ, তারপরে জামা খুলে সকলের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন।

একজন ব্রাহ্মণ আমাদের মন্দির দেখাবার ভার নিয়েছিলেন। সোজা পথে না গিয়ে তিনি একটু

ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। একজায়গায় বললেন : এইটিই এর মূল দ্বার, বছরে একদিন এই দ্বার খোলা হয়। দ্বার পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গন। তারপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে সমুদ্রের জলে। সামনে সেই দুটি পাহাড়। যার চূড়ায় বসে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ দেখেছিলেন সমুদ্র থেকে। তারপরেই অনন্ত অসীম বঙ্গোপসাগর।

ভিতরে যেতে যেতে ব্রাহ্মণ বললেন যে এই দ্বার বন্ধ করে রাখবার একটা কারণ আছে। দেবীর কপালে আছে একখণ্ড হীরে, তার দ্যুতি শতযোজন পরিব্যাপ্ত হয়। পূর্বকালে নাকি এই দ্যুতিকে লাইট হাউস মনে করে অনেক নাবিক ভুলপথে জাহাজ চালিয়ে মরেছে।

প্রদীপে আর ফুলের মালায় মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ সাজানো হয়েছিল। ধূপ দীপ বাদ্য ও উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে আমরা কন্যাকুমারীকে দেখলাম। চন্দনচর্চিতা কুঙ্কুম রঞ্জিতা বালিকা মূর্তি। বসনে ভূষণে মালো ও সুগন্ধে তাঁর অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর মোহিনীমূর্তি।

দেবীর কাছে যাবার রীতি এখানে নেই। দূর থেকে আমরা দেবীকে দেখলাম। আর প্রণাম করলাম পিতলের রেলিঙে মাথা রেখে।

ব্রাহ্মণ বললেন যে, সকালের দর্শন অন্য রকম। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু শিব এলোনা। ক্ষোভে দুঃখে দেবী ছিঁড়ে ফেলেন তার গলার মালা আর পুষ্পাভরণ, খুলে ফেলেন মহার্ঘ বসন ভূষণ প্রেম যার ব্যর্থ হল, বাহিরের আড়ম্বরে তার আর কী প্রয়োজন! দেবীর সেই অরক্ষণীয় কুমারী মূর্তি দেখি সকালের দর্শনে।

মন্দির ছেড়ে চলে আসতে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছিলনা। ব্রাহ্মণ আমাদের আবার আসতে বললেন। মন্দিরে কোন উৎসব আছে রাতে।

ফেরার পথে আমরা বিবেকানন্দ লাইব্রেরিতে এলাম খানিকক্ষণের জন্য। স্থানীয় লোকেরা সযত্নে ধরে রেখেছে স্বামীজীর স্মৃতি। একদিন তিনি অনেক কষ্ট করে এসেছিলেন কন্যাকুমারী। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন মাদুরায়। শিকাগোর সর্ব-ধর্মমহাসভায় গুরুকে পাঠাবার ব্যয় ভার বহন করতে তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু তিনি ভিক্ষা করে পাথেয় সংগ্রহ করে এসেছিলেন এইখানে। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে সমুদ্র থেকে ভারতকে দেখবেন। সাঁতরে সমুদ্র পার হয়ে ঐ পাহাড় দুটির একটিতে গিয়ে উঠেছিলেন!

কিন্তু ঐ পাহাড়ের উপর ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি ভারতের অন্যরূপ দেখলেন। ক্ষুধা মূর্খ ভারতবাসী এখন পশুর মতো জীবন যাপন করছে। সভ্য মানুষ যুগ যুগ ধরে ওদেরই রক্তখেয়ে ওদেরই ঘৃণা দিয়ে পদদলিত করছে। বুঝতে পারলেন যে ওদের ধর্ম শেখাবার চেষ্টা পাগলামি মাত্র। খালি পেটে কি ধর্মের কথা ভাল লাগে। বিবেকানন্দ বুদ্ধ হয়েছিলেন ঐ পাহাড়ে বসে। তাই ঐ পাহাড়ে আজ তাঁর স্মৃতি মন্দির গড়বার আয়োজন করা হয়েছে।

ভিড়ে এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এইবারে বললেন : গান্ধীজীর স্মৃতি মন্দির দেখেছেন? একজন উত্তর দিলেন : দেখেছি।

ভারতসরকার গান্ধীজীকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন সর্বত্র। কিন্তু—

কিন্তু কী?

…স্বামী বিবেকানন্দ নিজের মহিমায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

রাতের আহার সেরে আমরা যখন ধর্মশালায় ফিরছিলাম। তখন মহিম বাবু আমাকে বললেন: কাল আর একবার মাতৃতীর্থে স্নান করব।

আমি বললাম: খুব ভাল লেগেছে বুঝি আপনার?

ভাল!

বলে তিনি তার স্ত্রীর দিকে তাকান একবার। তারপর সংযতভাবে বললেন: অমন সুন্দর ঘাটে স্নান কার না ভাল লাগে বলুন।

কথায় কথায় আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেলাম। মহিমবাবু তার স্ত্রীকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন। বললেন: আসুন একবার এধারে, ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

বলে আমাকে আর ধর্মশালার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপরে চুপিচুপি বললেন: আমার মাতৃহত্যার পাপ ছিল, তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে এখানে এসেছি।

আমি অবাক হলাম তার কথা শুনে, বললাম: এ আপনি কী বলছেন!

ভদ্রলোক বললেন, মিথ্যে বলছিনা ভাই, সত্যি কথাই আমি বলছি। পরশুরামের মতো কুড়ুল দিয়ে মাকে কাটিনি। মেরেছি দুর্ব্যবহার করে।

মহিমবাবু একমুহূর্ত থেমে নিজের চারিধারটা দেখে নিলেন, তারপরে গলাটা আরও নামিয়ে বললেন: সংসারে অশান্তির জন্য মাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অনেক দুঃখ পেয়ে তিনি মারা গেছেন।

অন্ধকারেও আমি তার দু'চোখের দৃষ্টি দেখতে পেলাম ছলছল করছে বেদনায়।

বুকের ভিতরে বোধহয় একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। তাই আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটু সামলে নিয়ে বললাম: এতো আপনার একার নয় মহিমবাবু, এ আমাদের সকলের কথা। কাল সবাইকে আপনি মাতৃতীর্থে স্নানের জন্যে টেনে নিয়ে যাবেন।

সমুদ্রের গর্জন শোনা গেলো দূরে, আর তার জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। সমুদ্র এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

———

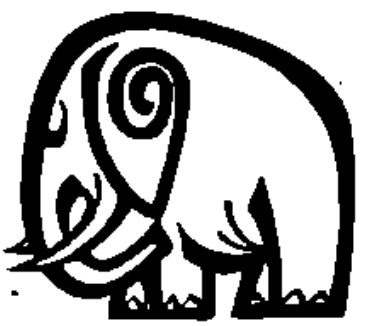

পথের ধারে রাণীর বাসা

(ইতিহাসের এক রহস্যময়ী কাহিনী)

সমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। রাজকীয় ব্যাপার। গণ্য নগণ্য লাখো লোকের ভীড়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্যে সম্রাট উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় পিস্তল গর্জে উঠল খুব কাছ থেকেই। জনতার মধ্যে থেকে এক রাজদ্রোহী সম্রাটকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়ল। একবার, দুবার, তিনবার।

একটা গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, দুটো গুলি তাঁর মাথার টুপি ভেদ করল। টুপিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

চারিদিকে হৈ হৈ চীৎকার। সৈন্য সামন্তদের ছুটোছুটি। সম্রাট ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত, কিন্তু স্বভাবতই ত্রস্ত বিহ্বল। সম্রাজ্ঞী তরিৎপদে সম্রাটের কাছে গিয়ে সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে তাকে নিজের আসনে বসিয়ে দিলেন।

তারপর সেই বিধ্বস্ত টুপিটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে একজন সেনানায়কের হাতে দিয়ে হেসে বললেন, "এই টুপিটা যাদুঘরে পাঠিয়ে দাও। এর দাম অনেক।"

সম্রাজ্ঞী সম্পূর্ণ অবিচলিত। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাব। আদেশ করলেন, অনুষ্ঠান চলুক, সম্রাটের হয়ে তিনিই ভাষণ দেবেন।

ভাষণ দিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিপুণভাবে পরিচালনা করলেন। তারপর উৎসব শেষে হাসি মুখে জনতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে জানাতে সম্রাটকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

এমন অসাধারণ মনের জোর দুর্লভ বৈকি। ফরাসী দেশের অতীতে ইতিহাসের রাণী ইউজিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ মানসিক শক্তির তেমনি এক বিরল নজীর। উপরে যে ঘটনাটি বিবৃত করা হল তা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্পেন দেশের মালাগা নগরে একদিন এক বেদেনী একটি ছোট কোঁকড়া চুল মেয়ের হাত দেখে গুণে বলেছিল—"এ মেয়ে রাজরাণী হবে। পৃথিবীতে এর তুল্য সম্মান আর সম্পদ আর কেউ পাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশী সুখ এর কপালে নেই।"

যারা সেই ভবিষ্যৎবাণী শুনেছিল, তারা সেদিন অবিশ্বাসের হাসি হেসে সেই বেদেনীকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু ফরাসী দেশের অসামান্যা সুন্দরী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শালিনী সাম্রাজ্ঞী ইউজিনির জীবনের পাতা ওল্টালে স্পষ্টই দেখা যাবে যে সেই বেদেনীর কথা মিথ্যা হয়নি।

স্পেনের এক হত গৌরব ভাসুকদারের দরিদ্র মেয়ে ইউজিনি কিশোর বয়সেই তার অলোক সামান্য রূপের প্রভায় সহরের ছেলেদের বুকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল, যৌবন বয়সে এই মেয়ে রূপে পৃথিবীর মধ্যে দুর্লভ হবে। হয়েছিলও তাই। ইতিহাসে বলে, পৃথিবীতে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের মধ্যে ইউজিনি অন্যতমা।

এই সামান্য অবস্থার মেয়ে, কেমন করে ফরাসীদেশের রাণী হল, তা এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

যৌবন উন্মেষের সংগে সংগে বহু যুবক ইউজিনিকে নিত্য তাদের প্রেম নিবেদন করতে লাগল। তরুণীর লীলা চাঞ্চল্য তখন নবনব রূপে প্রকাশ পাচ্ছে সে তাদের কাউকেই গ্রহণ করতে পারল না। এক দুর্নিবার খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সে তখন তার এক বন্ধুর সাহায্যে ফরাসী দেশের রাজকুমার লুই নেপোলিয়নের সংগে চিঠিতে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, এবং নিয়মিত তার সংগে পত্র ব্যবহার করছে। লুই নেপোলিয়ন তখন রাজনৈতিক বন্দী, কারাগারে একান্ত দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তার দিন কাটছে।

দুজনের দেখা অনেকদিন পরে, লুই ফিলিপের পলায়নের পর কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে লুই নেপোলিয়ন তখন নতুন রাষ্ট্র-সভায় সভ্যের পদ লাভ করেছেন। ইউজিনি ও তাঁর মা তখন প্যারিসে এসেছেন বেড়াতে।

দুজনের সাক্ষাতের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে বিলম্ব হল না, তরুণীর মনে প্রথম প্রেমের শিহরণ জাগলো। যুবক লুইও ইউজিনির রূপ দেখে অভিভূত হলেন।

ক্রমে লুই নেপোলিয়ন সভাপতির পদ থেকে ফরাসী দেশের সম্রাটের আসন অলঙ্কৃত করলেন। সারা দেশ তাঁকে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ব'লে মেনে নিল। কিন্তু সেই সংগে সারা দেশময় ভুমুল আন্দোলনও আরম্ভ হল। স্পেন দেশীয় এক সামান্য মেয়েকে তারা সম্রাজ্ঞীর আসনে দেখতে চায় না।

জনসাধারণের চেয়ে মন্ত্রী মণ্ডলীই রৈকে বসলেন বেশী। এদিকে লুই নেপোলিয়ন তখন ইউজিনিকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প প্রকাশে ঘোষণা করেছেন। দেশময় এবং বিশেষ ক'রে কূট-নৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য জেগে উঠল। অনেকেই রাজাকে এসঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করল। ইউজিনিকেও অনেকে নানারূপ ভয় দেখাতে লাগল।

উচ্চাভিলাষিণী ইউজিনি কিন্তু তাঁর অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে তা'দের উপেক্ষা করলেন। এবং ১৮৫৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী ফরাসী দেশের সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষিত হলেন।

অভিষেকের সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। প্রথম নেপোলিয়ন এবং জোসেফাইন যে স্বর্ণ রথে চেপে অভিষেক-সভায় গিয়েছিলেন, ইউজিনিও স্বামীর সঙ্গে সেই গাড়ীতে ক'রে সভায় চলেছিলেন। কথিত আছে যে, প্রথম নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন যখন অভিষেক-সভায় যাচ্ছিলেন তখন পথের মধ্যে অকস্মাৎ জোসেফাইনের মাথা থেকে মুকুট খুলে রাস্তায় পড়ে যায়। সকলে সেই ঘটনাকে অতিশয় অমঙ্গলসূচক ব'লে মনে করেছিল, এবং ঘটনাটি সকলেরই মনে ছিল।

এবারও ঠিক তাই ঘটল অর্থাৎ এবারও পথের মধ্যে হঠাৎ ইউজিনির মুকুট স্থানচ্যুত হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেল। জনতা পূর্ব ঘটনা স্মরণ ক'রে হায় হায় ক'রে উঠল। ফরাসী দেশে যে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রবাদের দিন এগিয়ে আসছে এ কি তার পূর্বলক্ষণ?

সম্রাটেরও বোধ করি সেই সব কথা মনে পড়ল। তিনি অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। কিন্তু আশ্চর্য ইউজিনির অবিচল দৃঢ় চিত্ততা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। একটুও চঞ্চল না হয়ে, গাড়ী থামিয়ে তিনি

জনতার পানে চাইলেন। পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল একটা টানাপরা ছোট ছেলে, তিনি তাকে ডেকে মুকুটটা কুড়িয়ে নিতে বললেন। অনেক সান্ত্রী-পাহারা ছুটে এলো কিন্তু তিনি বললেন, সেই ছেলেটিই যেন তাঁর মুকুট তুলে। মুকুট হাতে নিয়ে জনতাকে উদ্দেশ করে বল্লেন—"এ দেশের রাজা বা রাণী দেশের জনসাধারণের হাত থেকেই রাজমুকুট গ্রহণ করে।"

তাঁর এই কথা শোনার পর সেই বিপুল জনতার মধ্যে যে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি উঠেছিল রাজার পক্ষে তেমনতর জয়ধ্বনি ফ্রান্সে বড় বেশী শোনা যায়নি। এতদিন যারা ইউজিনিকে মন্দ চোখে দেখতো তারাও সেই মুহূর্তে তার ভক্ত হয়ে উঠলো। দেশময় রাণী ইউজিনের নামে ধন্য ধন্য রব শোনা যেতে লাগলো। অচিরকালের মধ্যে সারা ইউরোপে সম্রাজ্ঞী ইউজিনি বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করলেন।

অতুলনীয় বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি রাজকার্য চালাতেন। রাজ্যের শাসন পরিষদে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীদলের অভাব ছিল না। কিন্তু ইউজিনির কাছে তারা মাথা তুলতে পারেনি অনেকদিন।

কিন্তু তাঁর সুখ সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হল না। প্রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো। রাজা রণক্ষেত্রে চলে গেলেন, এবং ইউজিনি রাজ্যের ভার নিলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যেও তখন প্রবল অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে।

অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শাসন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফরাসীদেশে গণতন্ত্রবাদকে বরণ করেনিল।

একদিন যে রাজপ্রাসাদ থেকে রাণী ইউজিনি অবাধে তাঁর হুকুম জারী ক'রে এসেছেন, সেই রাজ-প্রাসাদ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হ'ল।

দুর্ভাগ্য একা আসে না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের রাজা গেলেন মারা, তারপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রাজকুমারও জুলু যুদ্ধে নিহত হলেন।

এরপর ইউজিনি তখন নিয়ে বেশী দিন কোথাও থাকতে পারেন নি। বছরের পর বছর ধরে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিন যে নারীর বিলাসিতা, সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নানা গল্পে ইউরোপের দেশগুলি মুখর হয়ে থাকত, তাঁকেই সে সময়ে লোকে আর চিনতে পারল না। অজ্ঞাতভাবে বিদীর্ঘ বিশবছরের আর স্বল্প সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তিনি দেশের পর দেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়ালেন।

অবশেষে, বার্ধক্য আর ভগ্ন স্বাস্থ্য যখন তাঁর পরমায়ুকে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে, সেই সময় ইউজিনি শেষবারের জন্য তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর যৌবনের লীলা নিকেতন, ফরাসীদেশে এলেন। টুলেরিস শহরের ভিতর প্রবেশ করে, যে প্রাসাদে তিনি একদিন বাস করে গেছেন সেই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে ঢুকলেন। রক্ষী তাঁকে চিনতে পারলো না। দেশ বিদেশের বহু টুরিস্ট ত এখানে আসে, এ বৃদ্ধাও বোধ করি তাদের মধ্যে একজন হবে।

বাগানের মধ্যে ইউজিনির নিজের হাতে রোপণ করা কতকগুলি ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখে জল এল। পরম মমতাভরে তিনি একটি গাছের মাথায় ফুটে ওঠা এক গোছা ফুলের গায়ে হাত রাখলেন। অমনি হা হা করে মালী ছুটে এল, এসব ফুলের গাছ ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীর নিজের হাতে রোপণ করা, এ সবগাছে হাত দেওয়া বা ফুল তোলা নিষেধ।

রক্ষীর কথা শুনে ইউজিনির মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। রক্ষী সে হাসির অর্থ বুঝতে পারল না। ধীরে ধীরে তিনি বাগান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিনই অপরাহ্ণ বেলায় সূর্য যখন ডুবছে তখন পথের প্রান্তে এক সরাইখানায় ফ্রান্সের ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর বেওয়ারিশ লাশ চলে গেল সরকারী কবর খানায়।

বিদ্ধমৃগ

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

ASP/UCO-33/47

৺পূজোর অভিনন্দন

আমাদের বন্ধু এবং
পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি

দি
ইউনাইটেড
কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

মুখোসৌন্দর্যকে ফুলের মত তাজা রাখতে চাই

সুষমা

নাইন ফ্লাওয়ার

স্নো

বিদ্ধ মৃগ

ব্যবসা বাণিজ্য এবার লাটে উঠলো বুঝলি পদ—।

সুরাজ সামন্ত তার 'অফিস ঘরের' কাঁপটার আধখানা নামিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ধীরাপদর কাছে এসে দাঁড়ায়। সন্ধ্যে থেকেই আজ বেচাকেনা নেই, শ্মশানটা প্রেফ 'শ্মশানের মতো' পড়ে আছে, ধীরাপদ খানকতক ভাঙা ইঁট জড়ো করে 'উচ্চ মঞ্চ' গেঁথে তার উপর চুপ করে বসে আছে অনেকক্ষণ থেকে।

সুরাজ বার কয়েক ডেকে ছিল, 'এই পদ কাত্তিকের দিকে মাথা দিয়ে বসে আছিস কানো? পেরাণে কী তোর 'ভাব' লাগলো?'

ধীরাপদ সাড়া দেয়নি।

সুরাজ বিড়বিড় করে বলেছে, 'ভাব লাগবে বৈ কি! 'বয়েস' ধরেছে তো। ও বাবা শ্মশান মশান কিছু মানে না, যখা নিয়মে আপনার 'কাজটি' চালিয়ে যায়।

রাগও নয়, বিরক্তিও নয়, শুধু অনিবার্যকে স্বীকার করার একটা নিরিখ অস্থিরতা। অন্য কোনো মনিব হলে, তার এরকম নিতান্ত অধস্তনের 'বয়েস ধরেছে' মেনে নিতে রাজী হতো কি না সন্দেহ। নির্ঘাৎ পঞ্চাশবার ডাকাডাকি করতো, অথবা বেয়াজ দেখাতো। কিন্তু সুরাজ সামন্ত সে ধরণের লোক নয়। সে ওই কাঠ বওয়া ধীরাপদকেও 'মানুষ' বলে গণ্য করে।

হয়তো শ্মশানের মাঝখানে বাস করতে করতে ছোট বড় জ্ঞানটা সুরাজের ভোঁতা হয়ে গেছে, পদমর্যাদা সম্পর্কে তেমন কোনো মর্যাদাবোধ নেই তার। তা'ছাড়া এখন আর ধীরাপদ তো তার শুধু কাঠ বওয়া চাকরই নয়, একাধারে সহকারী, রন্ধনকারী, বন্ধু সঙ্গী একমাত্র আত্মীয়।

'পদ' ছাড়া নিজেকে এখন আর ভাবতেই পারে না সুরাজ।

পদকে যখন পেয়েছিল সুরাজ সে তখন নিতান্ত বালক মাত্র। এই শ্মশানের পরিবেশেই ঘুরে বেড়াতো, মাঝে মাঝে দয়া পরবশ হয়ে কেউ দু'চারটে পয়সা দিতো, তাই দিয়েই কোথা থেকে যেন কী খেয়ে টেরে আসতো। পেট ভরার ব্যাপারটা যে বেশ সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো তা মনে হয়না, কিন্তু ওছাড়া বোধকরি আর কোনো উপায় ছিল না তার।

চন্দনকাঠের দোকানদার সুরাজ সামন্ত ক'দিন ধরেই দেখছিল এবং সুকান্তি ছেলেটাকে এমন একটা বিদঘুটে জায়গায়, এমন বেওয়ারিশ ঘুরে বেড়াতে দেখে তার কৌতূহল হয়েছিল।

ক'দিন দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে বললো, 'তুই কাদের ছেলে রে?'

ধীরাপদ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললো 'জানিনা।'

'বাঃ, বাঃ। ভ্যালা মোর ভায়রে। কাদের ছেলে তা' জানিস না? কেউ কোথাও নেই বুঝি?'

ধীরাপদ উত্তর দিল না। ক্রুদ্ধ মুখে চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু সুরাজের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া তো আর সেই পটকা ছেলেটার কর্ম নয়। অতএব সে 'বলং বলং বাহুবলং' এর উপদেশ ভুলে অন্য বলের শরণ নিলো। উদ্ধত গলায় বললো। 'ধরছো কেন?'

সুরাজ সামন্ত ওই ছোট্ট ছেলেটার ঔদ্ধত্য দেখে মজা পেল। হেসে হেসে বললো। 'ধরছি খাঁচায় পুরবো বলে। তুই এরকম শ্মশানে ঘুরে বেড়াস কেন?'

উদ্ধত কণ্ঠ আরো উদ্ধত হয়ে উত্তর দিল, 'আমার ইচ্ছে।'

'ও হো হো! ওরে আমার ইচ্ছেময়! তা' চাকরী করবি?'

ছেলেটা, একবার যেন অবাক হয়ে তাকালো। একটু যেন থতমত খেলো, তক্ষুণি সামলে নিয়ে বললো, 'না।'

'না। একদম সোজা না।'

সুরাজ মজা মারার গলায় বলে, 'এই বাজারে লোকে একটা চাকরী পায় না, আর তুই হাতের লক্ষ্মী ঠেলে দিচ্ছিস? ভারী মুখ্যু তো।'

ধীরাপদ ততক্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমি মুখ্যু তা তোমার কি? তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগেনা।'

ছেলেটার সাবধানযুক্ত ছোট্ট মুখে এই বড় কথাটা রীতিমত বেমানান লাগলো, তবু চটে উঠলোনা সুরাজ সামন্ত। বরং হেসে হেসেই বললো। 'তেল তো দেবো। কিন্তু ওই চরকাটারই যে অভাব।'

ধীরাপদ তখনও জোর জোর গলায় বলে উঠলো, 'অভাব তো আমি কী করবো?'

সুরাজ সামন্ত হেসে বললো, 'বেশ চাকরী না করিস, তো নেমন্তন্ন খা। আমার কাছে খাবি আজকে। বুঝলি? একটু পরেই ভাত রাঁধবো, আসবি।...ওই যে মড়াপোড়াবার কাঠের দোকান দেখছিস? ওটা আমার। ওর পিছনেই থাকবার ঘর, সেখানেই রান্না-বান্না করি। আসিস বুঝলি?'

ধীরাপদ ভুরু কুঁচকে বললো, 'কেন? তুমি তো অচেনা। তুমি কেন আমায় নেমন্তন্ন করবে?'

'বাঃ এই তো চেনা হলাম।'

ধীরাপদ বললো, 'তবে খাবো।'

'মাথা কিনলি বাপ। কেত কেতাখ করলি আমায়।' সুরাজ সামন্ত নিজের মনেই কথার ফুলঝুরি কাটে, 'আমার বাবার ঠাকুর চোদ্দপুরুষ, আমার গুরুপুত্তুর।'

ধীরাপদ সন্দেহের গলায় বলে, 'কী বলছো অতো?'

'কিছু না কিছু না, বলছি—ভুলে গিয়ে কোথাও চলে যাসনা বাপ। ভাত কোলে নিয়ে বসে থাকবো।

সুরাজের কথাবার্তার ধরণই ওই।

নইলে সত্যিই কিন্তু আর ছেলেটাকে দেখে দর্শন মাত্রেই প্রেম সঞ্চার হয়নি তার। তবে একটা তাক্ সে করছিল। বুঝেছিল ছোঁড়াটা বেওয়ারিশ। ওটাকে পুষলে মন্দ হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তিহীন জীবনে দ্বিতীয় একটা কেউ থাকে তো মন্দ কি। এখন থেকেই ফুট ফরমাশ খাটতে পারবে, আর খাটতে খাটতেই 'কামলায়েক' হয়ে উঠবে। মুড়ি ফুলুরি খেয়ে দিন কাটায়, ভাতের নেমন্তন্নে আসবে ঠিক।

তা' সুরাজ সামন্তর হিসেবে ভুল হয়নি।

এসেছিল ছেলেটা আন্দাজ মত সময়ে। সাধ্যমত পরিপাটি করে ভাতটা দিল সুরাজ আর সেই

তাঁকে জেনে নিল ছেলেটার নাম ধীরাপদ, বুঝে নিলো, কোন এক অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসে ধরা পড়বার ভয়ে শ্মশানের আশ্রয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সুরাজ বলেছিল, 'ও বাবা আবার ধীরাপদ। বলি তিনকুলে তো নেই কেউ, এমন বাহারের নামটি কে রাখলো?'

'জানি না।'

'থাক গে। অতবড় নাম চলবে না। শুধু পদ! বাস!'

তারপর বলেছিল, 'এখানে তোর ভয় করে না?'

পদ নিস্পাট সরল গলায় বলেছিল, 'করে তো! ঝড়া এলে ভয়ে কাঁপি। রামনাম বলি।'

'তবে বেছে বেছে এমন জায়গায় এলি কেন?'

'যদি ধরে নেয়, তাই।'

'ভূতের ভয়ের থেকে ওদের ভয়টা বেশী?'

'বেশীই তো। ভূত তো আর সত্যি মারে না। শুধু ভয় দেখায়। ওরা তো সত্যি মারে। মেরে মেরে ছাল তুলে দেয়।'

ছেলেটার কথা-বার্তা বেশ।

ভেবেছিল সুরাজ।

বলেছে ঠিক, ভূতেরা সত্যি মারেনা, শুধু ভয় দেখায়। মানুষে মেরে মেরে ছাল তোলে। পিঠের ছাল, মনের ছাল।

দু'চার দিন মেসন্তর চলে, আর তাঁকে তাঁকে চলে তোয়াজ। 'চাকরী কর না।'

ধীরাপদ ভাত খায় আর রেগে রেগে বলে, 'আমি কি কিছু কাজ জানি যে চাকরী করবো'।

'আহা তুই কি অফিসের চাকরী করবি? ধর এই ছোট বালতিটা? ভরে আনতে পারবিনা?'

'একশো বার।'

'উত্তম। এই ঝাড়ুটা দিয়ে ঘরটা সাফ্ করতে পারবি?'

'কেন পারবো না? আমাদের বুঝি ঘর সাফ্ করতে হতো না?'

'ধর আমি কাপড়টা ছেড়ে গেলাম কেচে শুকিয়ে রাখতে পারবি?'

'খুব খুব। সবই তো করতে হতো ওখানে।'

'ভাল ভাল। এই চাকরীই করবি। আমার উপকারের জন্তে ট্রেনিংটা দিয়ে রেখেছে দেখছি।'

বাস তদবধি রয়ে গেছে পদ সুরাজ সামন্তর কাছে।

ক্রমশঃ জোয়ান হয়েছে, খদ্দের এলে কাঠ বয়ে বয়ে এগিয়ে দিতে শিখেছে, সামন্তর থেকে ভাল রাঁধতে শিখেছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বই জোগাড় করে একটু পড়তেও শিখেছে।

'অরফ্যান হোমে' অক্ষর পরিচয়টা হয়েছিল, সেটাকেই বনেদ করে—

সুরাজ বলে, 'পড়ে শুনে কি তুই ব্যারিস্টার হবি নাকি রে পদ।'

পদ তাড়াতাড়ি বই তুলে রাখে।

সুরাজ বলে, 'আহা আমি তো আর পড়তে মানা করিনি।'

পদ্ম বলেছে 'না এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

ধীরাপদর মেজাজটি কিঞ্চা চড়া, কথাবার্ত্তাও উদ্ধত, কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে ভারী মুখচোরা। সেখানে কোথায় যেন গভীর একটা লজ্জা আছে তার।

হয়তো সে লজ্জা পরিচয় হীনতার লজ্জা।

এ পৃথিবীতে পিতৃপরিচয় হীন ছেলের হয়তো গোপাগুনতি নেই, কিন্তু মা-তো একটা থাকে তাদের? অন্ততঃ কোনো চেনা লোক।

এই যে সুরাপ সামন্ত!

একদা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, অবশেষে এই মড়াপোড়ানোর কাঠের দোকানদারের মত একটা কাজ বেছে নিয়েই শ্মশানে জীবনটা কাটিয়ে দিল। তবু দেশে তার মা-ভাই আছে, জানে ধীরাপদ। কদাচ কখনো একটা পোষ্টকার্ড আসে বিচিত্র হস্তাক্ষরের।

একবার ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে দুদিনের জন্যে গিয়েও ছিল সুরাপ সেই তারাপীঠের কাছে কোথায় যেন। জরির শাড়ী নিয়ে গিয়েছিল ভাইঝির জন্যে।

কিন্তু ধীরাপদর?

ধীরাপদর যদি রাশি রাশি টাকা হয়?

কার জন্যে এক পয়সার জিনিস কিনবে সে, কাকে বলবে, 'এই দেখো আমার এতো হয়েছে।'

নাঃ, পরিচয় হীনতায় বড় হীনতা।

অবশ্য মুখে কখনো এ নিয়ে কোনো আক্ষেপ করেনা পদ্ম, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ওই যে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়, ও থেকেই বোঝা যায়।

আজ কোজাগরীর রাত্রি।

মেঘহীন নীল নির্মল আকাশে জ্যোৎস্নার বড় বাহার খুলেছে।

শ্মশানের উপরও তার দান অকৃপণ।

যেন এখানের সমস্ত বেদনা সমস্ত নিষ্ঠুরতা সমস্ত বীভৎসতার উপর একখানা হালকা রেশমের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যে থেকে আজ আর সুরাপ-সামন্তর একটাও খদ্দের নেই। তাই পদ্ম তার ইটের সিংহাসনে বসেছিল চুপচাপ। কিন্তু ভাবছে, এমনও মনে হচ্ছিল না। যেন একখানা খালি বাক্সর মতো মন নিয়ে বসে আছে।

যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, রেঁধে রাখা ভাত তরকারি গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখছিল, তখন ভেবেছিল, 'খদ্দের লক্ষ্মী, খদ্দের না এলে আমাদের লোকসান, তাই খদ্দের খদ্দের করে হাপাই আমরা, কিন্তু 'খদ্দের' মানেই যে মড়া, এ একথা কি কোনো দিন ভেবে দেখি? মড়া আসবে, তবে তো তার আত্মীয় বন্ধুরা কাঠ কিনতে আসবে। তাও আবার সামন্তর দোকানে সবাই আসেনা, আসে ভাগ্যবানেরা। প্রিয়জনকে চন্দন কাঠে পোড়াবার সঙ্গতি তো সকলের থাকেনা। গেরস্ত লোকেরা হয়তো এক টুকরো চন্দন কাঠ, আর একছটাক গাওয়া ঘী কিনে চিতায় দিয়ে, 'ভাল জিনিস' দিলাম, ভেবে আত্মতৃপ্তি পায়।

সে জিনিসও রাখে সামন্ত আজকাল।

পাওয়া ঘী, কস্তুরী ধূপ।

অবিশ্যি ঘীয়ের বোতলের গায়ের লেবেলেই 'বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত' থাকে, ভিতরে আদি ও অকৃত্রিম ডালডা। কিন্তু সেটাই তো নিয়ম।

পদ্ম বলে, 'ওটাতে কিন্তু তোমার পাপ হচ্ছে সামন্তদা, মড়ার সঙ্গে জোচ্চুরী!'

সুরাজ সামন্ত হো-হো করে হাসে আরে ধুর ধুর! মড়ার কোনো সুখ দুঃখু বোধ থাকে? ঘীয়ের বদলে কেরোসিন দিয়ে পোড়ালেও কিছু এসে যাবেনা তার। আর ওই ঘাটা শ্মশানের যাত্রীরা? ওরা ওসব জেনে বুঝেই বিশ্বাসের ভান করে। জানেও বস্তু পাওয়া যায় না। সত্যি বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত' পেতে হলে, গরু পুষে নিজে হাতে ঘরে ঘী করতে হবে তবে? তাই বোতলটা হাতে নিয়ে বলে, 'খাঁটি তো?' আমরা দোকানদার বলে, 'আজ্ঞে তা আর বলতে? আসল গব্যঘৃত।' তখন ওরা 'বিশ্বাস' করে নিয়ে গিয়ে চিতায় ঢালে। ওই যে গব্যঘৃতর ধামটা দিলো, ওর থেকেই বিবেকে সান্ত্বনা পেলো। মাঝে থেকে আমাদের 'টু পাইস!'

পদ্ম তবু বলে, 'উঁহু দেখো তোমার ওই জোচ্চুরীর জন্যে একদিন কেউ ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে।'

সামন্ত আরো হাসে।

হাহা করে হেসে বলে, 'তা' যদি বললি তা'হলে তো কবেই পওা পওা ভূত ঘাড়ে চেপে বসে থাকতো। এই কাঠ গুলোই কি চন্দন কাঠ নাকি?'

পদ্ম তখনও 'পৃথিবীতে প্রবেশ' করেনি, তাই পদ্ম চা করে বলেছে, 'চন্দন কাঠ নয়?'

'পাগল!'

'তবে যে এতো চন্দনের গন্ধ বেরোয়?'

'আছে চালাকি। চন্দনের গোসবো কিনতে পাওয়া যায়; সেই জিনিস কিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই, গন্ধে 'ম ম' করে।'

পদ্ম ছেলেমানুষ হলেও কথায় চড়া।

সে চড়া গলায় বলেছে, 'এতেও তোমার পাপ হয় না?'

'পাপ! হুঁঃ! বড় মহাজ্ঞান রে পদ্ম, এখানে পাপ পুণ্যি বলে কিছু নেই। আর পাপই যদি বলিস, সেটা তা'হলে ওই সব বিদ্বান পণ্ডিতদের হবে। যারা রাতদিন বসে বসে ভেজাল বানাচ্ছে। তারা যদি পাওয়া ঘীয়ের গোসবো, চন্দনের গোসবো, এসব না বানাতো, তা'হলে আমরা মুখ্যু লোকেরা কী করতাম বল? ওসব পাপ পুণ্যি নিয়ে মাথা ঘামাসনে পদ্ম, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। চোখকান বুজে শুধু দেখবি, কিসে 'টু পাইস' ঘরে ওঠে।'

তা' ক্রমশ পদ্ম সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে বৈ কি, সে আবার আরো চালাকি করে দোকান ঘরের ফাঁকে পর্যন্ত একটু 'গোসবো' ছড়িয়ে দেয়। হেসে হেসে বলে, খদ্দের আকৃষ্ট হবে।'

তবু হঠাৎ হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে যায় সে। 'খদ্দের' শব্দটার মানে ভাবতে বসে।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, খালি বাক্সর মতন মন নিয়ে বসে থাকে।

আজও বসেছিল, সুরাজ সামন্ত কাছে এসে দাঁড়ালো। পরিবেশটার ওপর একটা ঢিল ফেললো। বললো, 'ব্যবসা-বাণিজ্য এবার লাটে উঠলো, বুঝলি পদ্ম।'

পদ্ম বললো, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস নাকি? কি বললাম বলতো?'

পদ্ম এবার সচকিত হয়ে বললো, 'ওই যে বললে, বাবলা লাটে উঠলো।'

'হুঁ তা কেন উঠছে বল দিকি?'

ধীরাপদ ধীর গলায় বললো, 'মানুষ আর মরছে না বোধ হয়।'

সুরাজ সামন্ত আর একখানা ইঁট কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে বসে বলে, 'কতকটা ঠিক বলেছিস! মানুষ তেমন মরছে না। মানে আমার দোকানের যারা খদ্দের, বড় মানুষরাই তারা সহজে মরতে চাইছে না। জগতে যতো নতুন নতুন ওষুধ বেরোচ্ছে। তারাই তো খাচ্ছে নিচ্ছে। তাই রগড়ে রগড়ে সবাই আশী নব্বই বছর অবধি বেঁচে থাকছে। অবিশ্যি এটা হচ্ছে একটা কারণ, তা'ছাড়া বড়লোক হিঁদুরা যে সবাই ক্রেমে ক্রেমে খেষ্টান হয়ে যাচ্ছে। মড়াকে কাঁধে চাপায় না, চুলিতে দেয় না। ইয়া বড় সেই কালো চকচকে গাড়িতে চাপিয়ে এনে ইলেকট্রিকের ঘরে ঢুকে দেয়। ব্যস পাঁচ মিনিটে খতম। আত্মবন্ধুর আর খাটতে হল না। তবে আর কী কাঠ চন্দন কাঠে?'

পদ্ম গম্ভীরভাবে বলে, 'তোমার অবিশ্যি ব্যবসার লোকসান সামন্তদা, তবে দেখে শুনে মনে হয় ওটাই ভালো।'

'ওটাই ভালো?'

'তবে না তো কী?' পদ্ম বলে, 'ঠেঙিয়ে পোড়ানোর চেয়ে হাজার গুণে ভালো। দেখলে কেমন হয় বল? হিঁদুদের নিয়ম ভালো নয়।'

'তা' নয়রে পদ্ম, তা' নয়। আমাদের হিঁদুদের রীতিনীতি কী জানিস, চোখের সামনে ভস্মিভূতো হয়ে গেল, দেখলো, চিরতরে মায়ার বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল।'

'তা হ'বে।'

বলে চুপ করে যায় পদ্ম।

সামন্ত একটু উসখুস করে বলে, 'আজ আর সন্ধ্যে থেকে একটাও খদ্দের নেই। লক্ষ্মীপুজোর রাতে কিছু কেলতে নেই বলে কি মড়াও ফেলছে না বাবা!'

পদ্ম গম্ভীর ভাবে বলে, 'তুমি যেন একটা কাঠ পাথর হয়ে গেছো সামন্তদা।'

'তা' গেছি বোধহয়।' বলে হেসে ওঠে সুরাজ।

পদ্ম আস্তে বলে, 'তুমি তো বলে থাকো 'মড়া'। যেন কী একটা জিনিস। তোমার ব্যবসার মাল। কিন্তু যাদের বাড়ি থেকে বেরোয়, তাদের বাড়ির অবস্থাটা ভাবো।'

'অতো ভাবলে চলে না। তোকে শত দিন মানা করেছি পদ্ম, আবারও করছি বেশী কিছু ভাবতে বসিসনে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তা' ভাবনাটা যে এসেই যায়। মনে হয় এর মানে কি, ওর মানে কি। এই যে দেখি, যেদিন আকাশে জ্যোছনা, বাতাস বইছে মিষ্টি, সেদিন তোমার খদ্দের কম থাকে। যত বাড়াবাড়ি বড় জল দুর্যোগের রাত্তিরে। এর মানে কি?'

'মানে সোজা।' সুরাজ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'কথাতেই বলে 'বিপদ একলা আসে না।' তা' থাকগে চল খাওয়া-দাওয়াটাই সেরে নেওয়া যাক।'

পদ এ কথার উত্তরও দেয় না, ওঠেও না।

সামন্ত একটা হাই তুলে আবার বলে, 'নে নে ওঠ। কী রেঁধেছিস?'

পদ বসে বসেই ব'লে, 'মনে নেই।'

'মনে নেই? কী রেঁধেছিস মনে নেই?' সুরাজ গম্ভীর গলায় বলে, 'পদ তোর এবার একটা বিয়ের দরকার হয়েছে।'

পদ এবার উঠে দাঁড়ায়।

ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তুমি আমার মনটা বুঝতে জানো না সামন্তদা।'

তারপর দু'জনেই কাঠের দোকানের পিছনের দিকের ঘরে চলে যায়।

অন্যমনা হলেও রান্নাটা ধীরাপদ ভালই করে। আজও করেছে।

সামন্ত খেতে খেতে বলে, 'মাঃ পদ্মা থাকলে তোর এই হাত দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম পদ। আহা কী ক্যাকড়ার ঝালই রেঁধেছিস।'

'ভাল হয়েছে?'

'হয়েছে বলে হয়েছে। একেবারে মারকাটারী। তা তোর নিজের রেখেছিস তো?'

'থাকবো না কেন?'

'কই দেখি?'

'এই তো বাবা। তোমার যতো সব—'

'আহা চটছিস কেন? তোর যে আবার সবটুকু আমার পাতে ঢেলে দেওয়া রোগ আছে কিনা।'

বলে মহোৎসাহে খেতে থাকে সুরাজ।

পদও চালায় সেই সঙ্গে।

তবে কোন সধবা মড়ার গায়ের গহনা খোলা নিয়ে শাশুড়ী জামাইয়ে বেধে গিয়েছিল ঝগড়া, সেই গল্প ফাঁদে সামন্ত। হেসে হেসে বলে,

'শাউড়ি বলে, 'আমার মেয়ের গায়ের এসব গহনা সব আমার দেওয়া। যাক মেয়ের সঙ্গেই যাক—' জামাই ব্যাটা বলে, 'যাবে বললেই তো যেতে দেবে না। মুচকরাসে বেচে নেবে। তা' সোনাগুলো মুচকরাসে নেবে, এই আপনি চান?'

শাউড়ি বলে, 'তোমার মতন চামারের হাতে পড়ার থেকে, মুচকরাসে নিক, তা'ও আমার সইবে।' সে এক ঝগড়া। মড়া রইল পড়ে দু'পক্ষে বচসা। শাউড়ি বলে 'মেয়ে আমার স্বামীর দুর্ব্যবহারে মনের কষ্টে কষ্টে মরেছে, ওকে চিতাদই করে গিয়েই ওই পিচাশ এক্ষুণি আবার বিয়ে করবে, আর ওই সব গহনা সেই বৌকে পরাবে।'

জামাই বলে, 'সালঙ্করা কন্যে সম্প্রদান করেছেন আপনি আমায়। তার মানে গহনা সমেত। আর এখন আপনার ওতে কী এক্তার আছে? আমি বেচে খাই বিলিয়ে দিই। যা খুশি করি।'

ওরে বাবা সে একেবারে রক্ত জানানের ব্যাপার। মধ্যযুগের কথা কানেই নেয় না। শেষ পর্যন্ত ঘাট পুলিশ এসে থামায়। এ বড় আজব জায়গা রে পদ. কত রকম ঘটনাই যে ঘটে।'

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়।

জ্যোৎস্নায় মোড়া প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখে ওদের দু'জনেরই যেন গা ছমছম করে। মুহুর্মুহু মড়া এসে ভয় করে না সুরাজ সামন্তর, মৃতদেহহীন শ্মশানের দিকে তাকিয়ে ওর ভয় করে।

অথচ চিতা জ্বলছে দু-চারটে :

এখানে তো অগ্নি আনবার। কিন্তু—ওরা সব সন্ধ্যের আগেই এসেছিল। চিতা খালি পায়নি বলে বসেছিল।

পদ বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সামন্ত বললো, 'বাদল বুঝি না?'

'এখন থাক, ইচ্ছে হচ্ছে না। সকালে হবে।'

বলেই পদ চমকে তাদের কাঠের দোকানের চালার দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করে ডাকলিল, 'সামন্তদা।'

ভয়ার্ত শব্দ।

সুরাজ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলে কী ব্যাপার?

'এই দেখো কাণ্ড।'

কাণ্ডটা দেখে সুরাজ সামন্ত। দেখে স্থির হয়ে যায়।

তার দোকানের চালার ছায়া ছায়া অন্ধকারে কারা কখন এসে একটা খাটিয়া নামিয়ে রেখে গেছে। শাদা চাদর ঢাকা।

সুরাজ উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'মানে? গেল কোথায় তারা?'

'জানিনা। এই তো দেখছি।'

'বিষ্টি নয় বাদল নয়, এখানে মড়া রাখতে এলো কেন! আর রেখে চলেই বা গেল কেন?'

সুরাজ সামন্ত উত্তেজিত গলায় বলে,

'দেখ কারা কোথায় বসে গাঁজার ধুম দিচ্ছে। নিশ্চয়ের মড়া বোধহয়। সৎকার সমিতির লোক হলে ঘরে এরকম! কিন্তু আমার এখানে কেন! একী মুস্কিল। দেখ বাবা দেখ।'

কিন্তু মুস্কিল কমলো না।

দু'জনে মিলে খুঁজেও কোথাও কোনো গাঁজার ধুম দেওয়া পার্টি দেখতে পেলো না।

তারমানে কোনো গোলমেলে মড়া, চুপিচুপি পাচার করে দিয়ে ভেগেছে।

সুরাজ সামন্ত বলে, 'চল ঘাট পুলিশকে খবর দিয়ে আসি। আমার একী 'গোরো'রে বাবা। ওঁ্যা। নিঘ্‌ঘাত খুনের লাশ পড়। নচেৎ আপ্ত' হত্যের। গোলমালের ভয়ে—।'

ঘাট পুলিসকে খবর দিতে গিয়ে দেখে ইতিমধ্যে বিরাট কাণ্ড। কালো চকচকে গাড়ী চড়ে কেষ্ট বিষ্টু কে একজন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে শত খানেক লোক। মন্ত্রী মান্ত্রার মতো কেউ হবেন, বড় বড় লোক এসেছেন সঙ্গে। পুলিশ তাঁদের তত্ত্বাবধান করছে। ফুলের তাঁরে শবদেহ অদৃশ্য।

'ভীড় ভাট্টাটা একটু না কমলে পুলিশ কথা কানে নেবেনা।' বললো সুরাজ।

পদ বললো, 'তবে ওখানে গিয়ে বললেই ভাল হয়। ফুকুর পেয়াল আছে—'

পদর সঙ্গে সঙ্গে সুরাজও চলে এল। তার দোকানের গায়ে একখানা পাটিয়া বসানো আছে, এটা তো কম অস্বস্তিকর নয়।

দোকানে লাইট আছে, কিন্তু এখানটা ছায়া ছায়া।

ধীরাপদ ভেতর থেকে একটা হ্যারিকেন নিয়ে আসে। উঁচু করে তুলে ধরে বলে, 'কী মনে হয় বলতো সামন্তদা? মেয়ে না পুরুষ?'

সামন্ত নিরীক্ষণ করে বলে, 'মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে।'

পদ আলোটা—আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারপর চিৎকার করে বলে, 'সামন্তদা নড়ছে।'

'নড়ছে!'

সুরাজ সামন্ত বলে, 'তোর মাথাটাই নড়ছে। অত কাছে যেতে হবেনা, সরে আয়।'

'সামন্তদা সত্যি বলছি—' পদ পিছিয়ে এসে বলে, 'দেখো তুমি বুকের কাছটায় চাদর ওঠা পড়া করছে।'

সুরাজ সামন্ত বোকে ছেলেটা ভয় পেয়েছে।

তাই আবার ও তাকে সরে আসতে বলে।

বলে, 'বাতাসে কাঁপছে।'

কিন্তু শেষ অবধি আর উড়িয়ে দিতে পারেনা। শুধু নড়া নয়, যেন নড়া চড়ার আভাস স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশঃ।

এযুগে কি আর 'ধানোয় পেয়েছে' বলে চেঁচিয়ে উঠবে?

পুলিশ এসে মুখের ঢাকা খুললো।

বছর বুড়ি বাইশের একটা মেয়ে।

দেখে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়।

নাকে নাকি চশমা পরার দাগ, হাতে কব্জিতে ঘড়ির ব্যাণ্ডের দাগ।

অথচ চুপি চুপি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই গেছে।

তার মানে ভয়ানক ভাবে নার্ভাস হয়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। বিপদ এড়াতে গিয়ে বিপদের ঘরের দরজা খুলে বসেছে।

মনে করেছে, মড়া তো কথা বলবেনা, অতএব পরিচয় ধরা পড়বেনা। কীর্তি জানাজানি হবেনা।

একটা সাধারণ শাড়ী জামা পরা একটু সুশ্রী ধরণের চেহারার বছর কুড়ি বাইশের মেয়ে, এর মধ্যে থেকে পরিচয় খুঁজে পাবার পথ কোথায় ?

আহা রে, স্বপ্নেও কি ভেবেছিল তারা মৃতদেহ নড়ে উঠবে ? স্তব্ধ হয়ে যাওয়া রসনা আবার কথা কয়ে উঠবে।

এখনও কথা কয়নি, কিন্তু হাসপাতালে যখন নিয়ে গেছে, এবং বেঁচেও আছে, কইবেই কথা।

তখন জানা যাবে খুনের চেষ্টা, না আত্মহত্যার চেষ্টা। বোঝা যাবে স্বামীর অথবা বাপের কার মুখ পোড়াতে বসেছিল।

এই অঞ্চলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার ঢেউ উঠছে। হয়তো বিষ প্রয়োগই।

কে বলতে পারে সম্পত্তির ব্যাপার ট্যাপার কিছু আছে কিনা। হয়তো ওকে সরিয়ে ফেললে কারো 'পথ' পরিষ্কার হবে।

তাই লক্ষ্মীপুজোর দিন লক্ষ্মীর জাতের এক জনকে —

সামন্ত পদর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উদাস গলায় বলে, লক্ষ্মী কি অলক্ষ্মী কে জানে রে পদ। পৃথিবীর অনেক কিছুই এখনো তোর জানতে বাকি আছে। হয়তো মেয়েটা বংশের মুখে কালি দিতে বসেছিল।'

'তাই বলে মেরে ফেলবে ?' পদ উত্তেজিত গলায় বলে, 'একী যুগের মুলুক পেয়েছে নাকি ? বলি— ছেলে বেটা গুলোই বুঝি সব সময় বংশের মুখ উজ্জ্বল করে বেড়ায় ? কই তাদের তো মেরে ফেলবার কথা ওঠেনা ? বংশ ! বংশ মহিমার জন্য তুলতে একটা মানুষকে মেরে ফেলতে হবে !'

'তা' তুই অমন রেগে ফুলছিস কেন ?' সুরাজ বলে, 'তোর কী এসে যাচ্ছে ? সত্যিই মেরে ফেলেছে তার ও তো কোনো ঠিক নেই। আজকাল তো শুনি এমন খুনের বড়ি উঠেছে যে, গোটাকতক বেশী খেলে জন্মের শোধ ঘুমিয়ে পড়ে। যাক গে ও কথা, কিসে মরছিল, কে মারছিল সে চিন্তায় তো দরকার কি ? থানা পুলিশ, হাসপাতাল, এদের হাতে চলে গেছে, আমাদের বালাই গেছে।'

পদ ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় সামন্তর দিকে।

পদর মধ্যে যে একটা বন্য বহ্নি আছে, সেটা থেকে যেন হঠাৎ ঝিলিক ওঠে। পদ প্রায় চেঁচিয়ে বলে, 'বালাই গেছে। বলিহারী সামন্তদা, খুব। সাধে বলি তুমি সেরেফ ইট পথের হয়ে গেছো। মেয়েটা বাঁচলো কি না, জ্ঞান হয়ে কী বললো, জানতে হবেনা ?'

'না হবেনা।'

সুরাজ সামন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি পদ, কৌতূহল হয়ে ওসব খোঁজ করতে যাসনি, বিপদে পড়বি। তোর ওপর সন্দেহ এসে পড়বে। কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখবি তুইই খুনে আসামী বনে গেছিস, ফাঁসির দড়ির দিন গুনছিস। ও বড় সর্বনেশে পথ।'

কিন্তু পদ এতো সহজে বুঝ মানেনা, পদ এতো অল্পে তুষ্ট পায়না। পদ যুক্তিতে আসে। পদ তাই সামন্তকে প্রশ্ন করে কেউ কাউকে খুন করে নিজের চালার নীচে রেখে দিয়ে নিজেই পুলিশ ডাকে কিনা।

সামন্ত হেসে ওঠে।

বলে, 'ডাকে বাবা, তাও ডাকে। গলাটিপে মেরে ফেলে সেই গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে আড়ায় ঝুলিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে পুলিশ ডেকে এনেছে, এ ঘটনাও শুনেছি। বলেছি তো তুই এখনো 'পিথিবীতে প্রবেশ করিসনি তাই দশ তাতেই গোয়ার্তুমী করতে যাস। বলি, 'ওই মেয়েটার বিত্তান্ত জেনেই বা তোর কী লাভ? না জানলেই বা তোর কী লোকসান? এই যে এতো লাশ আসে, কতো সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে, কতো ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বৌ তুই কি তাদের বৃত্তান্ত জানতে যাস?'

'সুন্দরী' এবং 'ছেলেমানুষ' এই দুটো শব্দ বোধকরি অপমান বোধ করে পদ্ম। তাই চেঁচানোর বদলে গুম্ হয়ে যায়। আস্তে গম্ভীর গলায় বলে, 'পদ্মকে যেয়া দেবার আগে জিনিসটা মিলিয়ে দেখতে পারতে সামন্তদা। মরে এসেছে, পুড়ে গেল, সে এক আর মরেছে বলে কেউরা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল, আর মৃতদেহটা নড়ে উঠলো, নিখেস ফেললো সে আর। এমন কেস এর আগে আর দেখেছো?'

এমন কেস। ঠিক এ রকম!

সামন্তকে স্বীকার করতেই হলো, দেখেনি। ওড়েজলে মড়া ফেলে পালিয়ে যাওয়া দেখেছে সামন্ত, বেওয়ারিশ লাশও দেখেছে ঢের। কিন্তু সে লাশকে বেঁচে উঠতে দেখেনি কখনো।

তবে? এতেও কৌতূহল হবেনা পদ্মর?

পদ্ম একটা রক্তমাংসের জীব তো বটে? কিন্তু সামন্ত?

সে তো আগেই নির্দ্ধারণ হয়ে গেছে। 'ইট পাথর।'

পদ্ম তা নয়। পদ্ম তার নিজের রক্তমাংসের সত্তাকে অস্বীকার করতে পারেনা। পদ্ম বাঁচতে চায়পাতালে। করবেই খোঁজ। পদ্মর জেনে নেওয়া চাই, ওর নাম কি? ও বেঁচে উঠে কী বলেছে।

সামন্ত ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ঠিক আছে যা করবি নিজের দায়িত্বে করবি। পরে যেন বলতে আসিসনে 'সামন্তদা আমায় জেল থেকে বাঁচাও।'

'আসবোনা।'

বলে ঘরে উঠে যায় পদ্ম।

গুম্ হয়ে বসে থাকে।

আর ভাবতে থাকে ওই মরে বাঁচা মেয়েটার বিত্তান্ত না জেনে কী করে থাকা সম্ভব!

কিন্তু সে বিত্তান্ত কি পদ্মর জানবার অধিকার আছে। পদ্ম কে? একজন প্রত্যক্ষদর্শী? ভালকথা। পদ্মই প্রধান সাক্ষী? তাও ভালকথা, কিন্তু পদ্ম কি একটা মানুষ যে কাজ মিটে যাবার পরও লোকে তাকে পুঁছবে?

তবে হ্যাঁ ভবিষ্যতে যদি এ কেস আদালতে ওঠে, তখন আবার পদ্মর ডাক পড়তে পারে। তা 'কেস্' উঠবে মনে হয়। যদি অবশ্য মেয়েটা বাঁচে।

কারা তাকে এমন ভাবে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে, তাদের সন্ধান করবেন বৈকি 'মহামান্য হাইকোর্ট বাহাদুর।' কে বলতে পারে ওই অনুসন্ধান থেকে কোনো বিরাট ন্যাং এর সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা।

তবে, এখন কেউ পাত্তা দেয়না পদ্মকে।

পদ্ম 'মাস্তোয়ারি রিলিফ হাসপাতালের' আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে যাকে পায় প্রশ্ন করে বেড়ায়, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করে না তাকে।

সামন্ত ওর গতিবিধি দেখে আর রাগে ছটফটায়। দোকানের কাজে মন নেই ওর, রাঁধছে অখাদ্য। কথা বললেই খেঁকে উঠছে, একী বিপদ!

মনে মনে বলে, সত্যিই ধানোর টানোয় গেল নাকি রে বাবা। নাঃ একটা প্রতিকার দরকার।

ধমক চমকে যে হবেনা, তা বুঝে ফেলে সুরাজ সামন্ত। ও ছেলের যা প্রকৃতি হয়তো ছিটকে পালিয়েই যাবে জন্মের মতো। 'মড়াটার' ভালবাসায় পড়ে গেল নাকি। বিড়বিড় করে বলে সুরাজ, নাকি শুধুই কৌতূহল। দেখি আমিই যদি—

তা পদ্মর থেকে সুরাজ সামন্তর কথতা আছে বৈকি। অনেক 'বিত্তান্তই' জেনে আসে সামন্ত ঠিক ঠিক জায়গায় নল চালিয়ে। তবে নলটা চালাচ্ছে আগে বলেনি।

পদ্মও খেয়াল করছেনা, যে মানুষ এই 'মহাপেট' ছেড়ে এক পা নড়তে চায়না, সে বেরোচ্ছে কেন।

সেদিন খেতে বসে কথাটা পাড়ে সামন্ত।

'বিত্তান্ত বিত্তান্ত বলে হেদিয়ে মরছিলি, জেনে এলাম বিত্তান্ত। এই রিলিফ হাসপাতালে ক'দিন পুলিশের হেফাজতে ছিল, জ্ঞান হওয়াতে জেল হাসপাতালে নিয়ে গেছে—

'জেল হাসপাতালে—,

হাতের ভাত হাত থেকে ঝরে পড়ে পদ্মর।

রিলিফ হাসপাতালের বাড়িটা দেখেও যে একটু সুখ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই বাড়ির মধ্যেই কোনো একটা ঘরে আছে সে।

কিন্তু সুরাজ সামন্ত খবর এনে দিয়ে যেন পদ্মর মনের সব ছবিটা ঝাড়া দিয়ে মুছে দিল।

পদ্ম অস্ফুট গলায় বললো, 'জেল হাসপাতালে কেন?'

'বাঃ ও 'কি এখন কয়দামী মাল' নাকি? যদি জ্ঞান ফেরে, তখন জেরা কতো তল্লাস চলবে তার ঠিক কি।'

'জ্ঞান তো ফিরেছে বললে?'

শিথিল গলায় বলে পদ্ম।

সুরাজ ভাতের গ্রাসটা মুখে ভরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে বলে, সে জ্ঞানের হদ্দ গয়া। পুলিশের এতো আশার গুড়ে বালি। মড়া চড়া খাওয়া সোওয়া ওঠাবসার জ্ঞান ফিরেছে, কথাও বলছে, কিন্তু নাকি আসল জ্ঞান হারিয়ে বসে আছে। পূর্বকথা কিছু বলতে পাচ্ছেনা। সিঁড়ি শক্তিটাই নাকি গুলে খেয়ে বসেছে। নিজের নামটা পর্যন্ত বলতে পারছেনা নাকি। ডাক্তাররা নাকি মাথা খুঁড়ে ফেলছে সেই সিঁড়ি শক্তিটা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সবতক্তা! হচ্ছেনা, তবে নাকি যতদিন না ফেরে, রেখে দেবে হাজতে।

পদ্ম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সামন্তর মুখের দিকে। এই তরতর কথাটা এতো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলছে সামন্তরা। সত্যিই কি লোকটা কাঠ পাথর। মায়া মমতা বলে কিছু নেই?

বলে দিল 'লবডঙ্কা'।

ওই লবডঙ্কার মানেটা ভেবেছে ?

তার মানে মেয়েটার এই এতোখানি বয়েসটা সব মুছে যাবে। জানবেনা কোথায় মা বাপ, কোথায় ঘরবাড়ি, নামটা পর্য্যন্ত জানা থাকবেনা।

তারমানে একেবারে পদর মতন হয়ে যাবে।

কেজানে পদকেও কেউ ছেলেবেলায় ওইভাবে কোথাও চাদর চাপা দিয়ে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল কিনা, পদরও সিঁতিশক্তি লোপ পেয়েছিল কিনা। নচেৎ এতো হাতড়ে মরে পদ, সময় পেলেই হাতড়াতে বসে, কিছু কি মনে আসে ? আসেনা।

তারমানে পদর পরিচয় দিতে বলতে হবে 'ভূঁইফোঁড়'।

তাও তাই হবে।

ওই না মরা না বাঁচা মেয়েটার।

সামন্ত পদর মুখের দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল আর মনে মনে বলছিল লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া সত্যিই সেই লাশ ছুঁড়িটার ভালবাসায় পড়ে মরেছে নাকি রে বাবা। নচেৎ মুখের চেহারা অমন শঁকমুখি হচ্ছে কেন ?

একী পাপ ! একী গেরো !

তবে ওসব বিষয়ে কিছুই বলেনা। শেষ গ্রাসটি পর্যন্ত খেয়ে থালার পাশ চাটতে চাটতে আড়চোখে বলে, 'ডাক্তারী পরীক্ষের নাকি বলেছে, ঘুমের বড়িই খেয়েছিল বেদার। আর বলেছে—। চোক সিলে বলে সামন্ত। এখনো যে হয়নি, কুমারী কন্তে। আর নাকি বাঙালীর মেয়ে।'

পদ এবার বিরক্ত গলায় বলে, 'সে আবার ডাক্তারে ঘটা করে কী বলবে ? দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছিল, মাথায় সিঁদুর নেই। আর দিশী করে কাপড় পরা।'

সামন্ত সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'তাতে কি ! শহরে আজকাল সধবাতেও সিঁদুর মাথায় দেয়না'।

'যাক, শুনলিতো বিত্তান্ত ? হলো-তো চতুবার্গ লাভ ? এখন আবার কাজে কর্মো মন দে দিকি।'

আগে হলে, বা অন্য প্রসঙ্গ হলে পদ হয়তো ঠিকরে উঠে বলতো, 'কাজ করছিনা ? সব ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছি ?'

কিন্তু এখন পদ কিছু বললোনা, শুধু গুম্ হয়ে থাকলো।

কিন্তু পদর ঘাড়ে চাপা ধানো পদকে ছাড়েনা।

পদ একা হলেই ভাবতে বসে কেন হাসপাতালে কি চিরকাল রেখে দেবে ? মেয়েটা যদি বিষবড়ির গুণে জন্মের শোধ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গিয়ে থাকে ? জন্মের মতো হাজতে রেখে দেবে ? ভেবে ভেবে মরে যায় পদ। আর পদ চোখ বুজলেই সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পায়।

শাদা চাদর চাপা দেওয়া খাটিয়ায় পড়ে থাকা লাশ। তার বুকটা নিঃশ্বাসে ওঠা পড়া করছে। পদ জানিকেনের আলো তুলে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছে।

সামন্ত বলেছে। খবরদার হাত ঠেকাসনি, পুলিশ এসে যা করবার করবে। কিন্তু সামন্ত বলেছে 'মনে হচ্ছে ?—মেয়ে ছেলে।'

সেটাতো পদ্মরও মনে হচ্ছিল।

পদ্ম তাই নিজের নিশ্বাস বন্ধ করে ওই নিশ্বাসের ওঠাপড়া দেখছিল।

আর চাদর ঢাকা থাকলেও পদ্মর মনে হচ্ছিল নির্ঘাৎ একটা কম বয়সী মেয়ে ছেলে, মনে হচ্ছিল সুন্দরী মেয়ে।

কেন এসব মনে হচ্ছিল তা' জানেনা পদ্ম তবু সেই রকম দৃশ্য দেখবার জন্যেই আশায় কম্পিত হচ্ছিল সে।

সামন্ত ঘুঘু ছেলে।

সামন্ত পুলিশকে বলতে যায়নি 'সন্দেহ হচ্ছে বেঁচে আছে।' সামন্ত শুধু ওই অলক্ষ্য লাশ নামিয়ে রেখে হাওয়া হয়ে যাওয়ার কথাটাই বলেছিল। এই এতোদিন মহাশ্মশানে বাস করতে করতে এই শিক্ষাটা হয়েছে সুরাজ সামন্তর, পুলিশের কাছে কথা যত কম কওয়া যায় ততোই মঙ্গল।

পদ্মও অতএব বলে উঠতে পারেনি 'ওগো দেখো দেখো মনে হচ্ছে নড়বার চেষ্টা করছে।'

পদ্মর আলো উঁচু করে ধরা হাতটা ভারী হয়ে আসছিল, তবু সে সেটা এতোটুকু নামায় নি।

তারপর তো কতো কাণ্ড কতো জেরা, কতো ঘাটের জল খেয়ে তবে আবার স্থগিত হওয়া। কিন্তু পদ্ম নামের ছেলেটা স্থগিত হল কই ? পদ্ম চোখ বুজলেই দেখতে পায় পুলিশের লোক এসে মুখের চাকাটা খুলে দিল।

আতে কাঁপা হাতে নয়, অভ্যেসের মতো ঝপাৎ করে।

তারপরই সন্দেহের গলায় বলে উঠলো 'আলোটা আরো এগিয়ে আনোতো।'

পদ্মর বুক কাঁপছিল, পদ্মর হাত কাঁপছিল তবু পদ্ম টু শব্দ করেনি। আতে এগিয়ে এসেছিল।

লোকটা অস্ফুটে একটা শব্দ করে বলেছিল এই সবাই ভীড় ছাড়ো।

ভীড়।

হ্যাঁ ভীড় জমে গিয়েছিল বৈকি। অনেক লোকের ভীড়।

শ্মশান তো ঘুরছান, এমন একটা ঘটনা ঘটলে মরুভূমির মাঝখানেও পাতাল ফুঁড়ে লোক উঠে ভীড় জমিয়ে তোলে।

ভীড় ছাড়লে, এদিক ওদিক করে কোথা থেকে যেন একটা টর্চ এনে ফেলেছিল লোকটা, এবং টর্চ ধরে দেখে জন্মের হার মেনে যাওয়ার ভঙ্গীতে বলেছিল, 'লাশ নয়! জীয়ন্ত।'

তা' সেই হতভাগা মড়া মেয়েটা জীয়ন্ত হয়ে, 'পদ্ম' নামের একটা জলজ্যান্ত ছেলেকে মেরে রেখে গেল।

পদ্মর এখন রাতদিনের চিন্তা, কেমন করে জেল হাসপাতালের মধ্যে ঢোকা যায়।

কিন্তু এই দুর্দান্ত শহরের কড়া আইন কানুনের মধ্যে অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে আসা আর শ্মশানের ছায়ায় প্রতিপালিত একটা মুখ্যু ছেলের নাক গলাবার ছিদ্র কোথায় ?

যাদের অর্থ প্রতিপত্তি আছে, যাদের পেটে বিদ্যেবুদ্ধি আছে, তারা সবকিছুই করতে পারে। তারা লক্ষ্মিয়ের লোহার বাসরেও ঢুকতে পারে। তারা দরকার পড়লে জ্যান্তকে মড়া সাজিয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে যেতে পারে, সুস্থকে পাগল সাজিয়ে পাগলাগারদে ভরে দিতে পারে।

পদ্ম সে কথা জানেনা তা নয়, তবু পদ্ম চেষ্টা করে বেড়ায়। এবং অনেক কাণ্ড করে গেটের বারে অনেক বসে থেকে থেকে এইটুকু মাত্র জানতে পারে, এখনো মৃত্যি ফেরেনি মেয়েটার। পাশ্ব দাস কথা বলে, অথচ এটুকু বলতে পারে না নামটা কী তার, বাড়ি কোথায়।

খবরটা যে সরবরাহ করে, সেই বাড়ুদারটা গোকে উঁচিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ওর খোঁজে পদ্ম দরকারটা কী? ওর সঙ্গে পদ্মর কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

পদ্ম ভয়ে ভয়ে ইতিবৃত্তটা বলেছিল।

বলেছিল, একটা মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে গেল, এমন ঘটনা তো সে জীবনে দেখেনি, তাই কৌতূহল। জ্যান্ত হয়ে কী বলছে, কোন লোক তাকে এইভাবে ফেলে গেছে সেটা জানাচ্ছে কি না, এইসব কৌতূহল আর কি। আর কিছুই না।

গোকুলা অবশ্য এটা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেয়। সত্যিই তো হতেই পারে কৌতূহল। আর এই লোকটাই যখন প্রথম দর্শক।

পদ্ম ভাবতে ভাবতে ফিরে আসে ডাক্তারেরা তেমন করে দেখছে না। বরং বিলেত আমেরিকা থেকে কতো ওষুধ আসে এখন, কতো আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটায়। আর এই সামান্য একটা স্মৃতি ভ্রংশের ব্যাপার ঠিক করে ফেলতে পারে না।

পদ্মর প্রাণের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে।

পদ্মর মনে হয় যদি পদ্ম সেই কলীটাকে হাতে পেলে, ফিরিয়ে আনতে পারে তার স্মৃতি। অতি মূর্খ বলেই এমন কথা ভাবতে পারে পদ্ম। নইলে একথা ভাবতো। তাই যদি পারতো, তা'হলে তো আমার স্মৃতিটাই ফিরিয়ে আনতে পারতাম। আমি নিজে কেন একটা অন্ধকারের গহ্বরে মাথা খুঁড়ে মরি।

ডাক্তারা চেষ্টা করছে বৈকি।

আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কেবলমাত্র ডাক্তারের ধর্ম হিসেবেই নয়, অন্য কথাও স্মরণ করে। রোগিনীটিতো শুধু একটা মানুষ মাত্র নয় সে যে রীতিমত দাবী মানুষ। আসামী।

ওকে সারিয়ে তুলতে না পারলে, ওর অপরাধের বিচার হবে কি করে? মহামান্য আদালত বাহাদুরের নির্দ্দেশে ওর শাস্তি হবে কী করে?

ওকে যদি জেলে পাঠাতে হয়, সারিয়ে পাঠাতে হবে। যদি ফাঁসি দিতে হয়, তাহলেও যমে মানুষে যুদ্ধ করে বাঁচিয়ে তুলে হবে তো?

ওকে সুস্থ করে তুলতে না পারলে ওর স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে কী করে? ওকে জেরা করা যাবে কী করে? আর জেরায় জেরায় কত বিকৃত না করতে পারলে দু'পক্ষের উকিলের—মজার লড়াইটা হবে কী করে?

কিন্তু ওই মেয়েটার পক্ষে আবার দিতে যাবে কে?

কে ?

কেন সরকার বাহাদুর।

যার কেউ নাই তিনি আছেন তার। রাখতেও তিনি, মারতেও তিনি।

কিন্তু এসবই হবে ওর স্মৃতি ফিরলে।

তাই অবিরতই ওর বিস্মৃতির নীরেট দেওয়ালে করাঘাত করা হচ্ছে। পক্ষ সম্বেচটা ভুল।

প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা মনো-বিশ্লেষক ডাক্তার মল্লিক এসে বসেন ওকে পর্যবেক্ষণ করতে। এসেই খুব উল্লাসের সঙ্গে বলেন, 'এই যে কেমন আছো ? নিশ্চয়ই খুব ভালো। চমৎকার 'ফ্রেশ' দেখাচ্ছে তোমাকে। ব্রেক কাট হয়ে গেছে ? আচ্ছা বোসো একটু গল্প করা যাক।'

ডাক্তার মল্লিক চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেন, 'এখন তো তুমি বেশ ভাল হয়ে গেছ, তবু শুয়ে থাকো কেন ? উঠে বেড়াও ?'

মেয়েটা আপত্তির সুরে বলে, 'কই ভাল হয়েছি ? উঠলেই তো আমার দুর্বল লাগে।'

'তাই বুঝি ?' ডাক্তার মল্লিক যেন মমতায় বিগলিত হন, 'তাহলে তো তোমার এখন একটা ভাল টনিক খাওয়া দরকার।'

মেয়েটা জানলার দিকে তাকিয়ে বলে, 'খাই তো।'

'আরো ভাল টনিক খাবে। আমি ডাক্তার চৌধুরীকে বলে দেব। তবে কী জানো ?' প্রৌঢ় মনোবিদ্ পিতার মতো কোমল গলায় বলেন, বেশী শুয়ে থাকলেও ওরকম হয়। মানে শরীরের মধ্যেকার যন্ত্রপাতিগুলো মানু-টানু সবাই একভাবে থাকে তো ? সেইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে যায়, হঠাৎ তাদের টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে, প্রথমটায় ভারসাম্য রাখতে পারেনা তারা, তাই উইক লাগে। একটু একটু করে উঠবে ? উঠবে, বেড়াবে।'

'বেড়াবো !'

মেয়েটা অভিযোগের গলায় বলে, 'কোথায় বেড়াবো শুনি, রোগীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ? অমন বেড়ানোর আমার দরকার নেই।'

ডাক্তার মল্লিকের চোখে একটু আশার আলো জ্বলে ওঠে। তিনি আরো বলেন, 'তা সত্যি। বলেছো ঠিক। কিন্তু তুমি তো হসপিটালের কম্পাউণ্ডে বেড়াতে পারো ? সেখানে সুন্দর গাছ টাছ আছে —ফুল আছে—'

মেয়েটা যেন ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'হ্যাঁ, আর বেশ ডাকাত ডাকাত পাহারওলাও আছে। দেখলে রাগে গা জ্বলে যায়।'

'ওঃ তাহলে তো চলবে না। তা' তুমি আমার সঙ্গেও বেড়াতে যেতে পারো। আমার গাড়ীতে। তোমার যেদিকে যেতে ইচ্ছে হবে --'

মেয়েটা বাচ্চার মতো হাততালি দিয়ে বলে, 'কী মজা ! কী মজা ! কখন নিয়ে যাবেন ?'

'বোসো এই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি আগে !'

'ওঃ আবেদন।'

মেয়েটা বিরক্তিতে মুখ কোঁচকায়।

ডাক্তার কথা চালিয়ে যান। 'তা' যা বলেছ, ওতে কোনো কাজ হয় না।'

এই চিকিৎসা।

কোনো সময় কোনো ক্ষেত্রেই ওর কথার প্রতিবাদ করবেন না। শুধু একভাবে বলে যাওয়া 'তা তো সত্যি।' বলে যাওয়া 'সে তো বটেই।'

'বইপড়তে ইচ্ছে করে না তোমার? খবরের কাগজ' নিয়ে আসা হাতে কাগজ খানা পাকাতে পাকাতে কথা ব'লেন ডাক্তার মল্লিক, 'এই নাওনা পড়না।'

মেয়েটার চোখে যেন একটুকরো আলো জ্বলে ওঠে, তার সঙ্গে আবার হতাশার ছায়া। ইতস্তত: করে বলে, 'কী করে পড়বো? চশমা কই?'

চশমা।

ডাক্তার সযত্নে তৃণখণ্ড দেখেন।

ডাক্তার সযত্নে ডুবুরি নামান।

'ওঃ তাওতো বটে। চশমটা নেই। তা'চলনা একবার তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে, একটা নতুন প্রেস্ক্রপশন করিয়ে নিয়ে চশমাটা করিয়ে দিই। কে দেখেন তোমাদের?'

'আমি জানিনা। আমি সব ভুলে গেছি।'

'আহা মনে করতে চেষ্টা করনা? না হলে তো চশমাটা হয়না।'

'না হোক।'

'না হলে চলবে কি করে? পড়তে হবে তো?'

'আপনারা আমার জন্যে এতো করতে যাবেন কেন?'

'বাঃ। এটা আমাদের ডিউটি নয়? বেশ, তোমার ডাক্তারের নাম মনে না থাকে, আমার সঙ্গে একজন চোখের ডাক্তারের কাছে চল। খবরের কাগজ টাগজ না পড়লে—'

মেয়েটা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'কী হবে আমার কাগজ পড়ে?'

'বাঃ কী হবে মানে? আমার কী হয়? কাগজ পড়ে সব কিছু জানতে পারবে।'

'জানতে পেরে আমার কী হবে?'

ডাক্তার মল্লিক বলেন, তুমি যদি এভাবে প্রশ্ন করো, তাহলে সারা জীবনেও তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবেনা। জানতে হয়। সব কিছু জানবার—চেষ্টা করতে হয়। না জানলেই অসুবিধে। এই যে আমি? তোমার সঙ্গে এতো আলাপ অথচ তোমার নাম জানিনা। ভাকতে পারিনা, কী মুস্কিল বলতো? তুমি অন্তত: যদি তোমার নামটা মনে করে আমায় বল —।'

'আমি তো জানিনা।'

'বেশ নাই বা জানলে, একটা নতুন নাম তাহলে তোমায় দিই। কেমন? সেই নামেই ডাকবো।'

'আপনার ইচ্ছে।'

'বাঃ তা কেন? তুমি একটা নাম, ঠিক করো! তোমার যেটা পছন্দ।'

এইভাবে চলছে তোয়াজ।

ভাবছেন, যদি ওই পছন্দর সূত্র ধরেই বার হয়ে আসে ওর সত্যি নাম, নামের সূত্রে ঠিকানা। আর ঠিকানার সূত্র ধরেই বাকি সব সূত্র।

অতএব ওই নামটার জন্যেই চেষ্টা।

'আচ্ছা আমিই তোমার একটা নাম দিই। ধর মিস্ সরকার।'

মেয়েটা উদাসীন ভাবে বলে, 'আপনার যদি তাই ইচ্ছে হয়—।'

'বাঃ শুধু আমার কেন, তোমার ইচ্ছেও থাকা চাই। তা'হলে না হয় মিস রায়।'

চোখের দিকে চোখ রাখতে চান, কোন পক্ষে কোন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মেয়েটা জানলার দিকেই চোখ মেলে রাখে।

'নাঃ এ নাম তোমার পছন্দ নয় মনে হচ্ছে। তবে? মিস ঘোষ।'

মেয়েটা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'ওগুলো একটা নাম নয়।'

ডাক্তার মল্লিক উৎফুল্ল গলায় বলেন, 'নাম নয়। কেন? এই তো আমার নাম ডাক্তার মল্লিক। সবাই আমায় তাই বলে ডাকে।'

'বেশ তবে ওর থেকেই একটা বলবেন।'

ডাক্তার মল্লিক হেসে ওঠেন।

বলেন, 'ভারী দুষ্টু মেয়ে তুমি। পছন্দ নয় সেটা স্পষ্ট করে বলবেনা। বেশ তোমার নাম রাখা যাক, 'অমলা।'

মেয়েটা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।

মেয়েটা তীব্র গলায় বলে 'ওঠে কেন? ও নাম কেন? না।'

'না! না কেন?'

ডাক্তার পর্যবেক্ষণ করেন। এই সাধারণ নামটায় এতো আপত্তি কেন? তবে কি ওই নামটার সঙ্গে কোনো যন্ত্রণার স্মৃতি জড়িত আছে ওর?

তবে ওটা নিয়েই চালানো যাকনা।

'কেন অমলা নামটা তো বেশ সুন্দর। যার মধ্যে কোনো মালিন্য নেই।'

'তা হোক। ও নামে কক্ষণো ডাকবেন না—আমায়। কক্ষণো না।'

ডাক্তার তখনকার মতো চুপ করে যান, কিন্তু ওই নামটা নিয়ে চিন্তা করেন।

বই পড়েন, অন্য 'কেস' এর ফাইল ওলটান।

অতএব পরম সন্দেহ সত্য নয়।

আরো একজন ডাক্তার মাঝে মাঝে আসেন।

ডাক্তার বলাক। বয়েস কম।

তাঁর মনঃ সমীক্ষা অন্য পদ্ধতির।

তিনি প্রথমেই ধমকের গলায় বলেন, 'আপনার—তো কোনো অসুখই নেই, তবে মিছি মিছি রোগী সেজে আছেন কেন?'

ধরে নেওয়া যাক অমলাই! তা' অমলাও চড়া গলায় বলে, 'আপনারাই সাজিয়ে রেখেছেন। জেলখানায় আটকে রেখেছেন।'

'আমরা সাজাতে যাবো কেন? কী দরকার আমাদের? আপনি আপনার নাম ঠিকানা, ঘটনা ইত্যাদি সব খুলে বলে দিন আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব।'

'আমি কী করে বলবো?'

এবার অমলার কণ্ঠে অসহায়তা।

'কেন ঠিক যে ভাবে আমি বলছি 'আমার নাম ডাক্তার সুরপতি বসাক! আমার বাড়ি বাহাদুর ভি গোলাম মোস্তফা লেন। আমার বাবার নাম হীরাপতি বসাক, তিনি মারা গেছেন। আমি বিলেত থেকে স্পেশালিষ্ট হয়ে এসেছি। আমার একটা কালো রঙের গাড়ী আছে—বলুন বলুন, আপনিও এইভাবে বলে যান।'

'অমলা' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমার কিছু মনে নেই।'

ডাক্তার বসাক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'আপনার সব মনে আছে। আপনার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি, আপনি ইচ্ছে করে বলছেন না।'

'আ—আ আ।'

অমলা চীৎকার করে ওঠে।

ডাক্তার বসাক ভারী জুতোর শব্দ করে ঘরে পায়চারী করতে করতে বলেন, 'বেশ আপনি যদি মনে করতে চেষ্টা না করেন, আবার আপনাকে ইলেকট্রিক চিকিৎসা করানো হবে। মনে আছে তো? মাথায় ইলেকট্রিকের শক্ দেওয়া! বলুন, বলুন মনে আছে কিনা।'

'অমলা' শান্ত গলায় বলে, 'আছে।'

'তবে? এটা মনে আছে, আর এই কুড়ি-বাইশটা বছর সময়, তার কিছু মনে নেই? এ কখনো হয়? ভাবুন, ভাবতে চেষ্টা করুন। স্মৃতির ঘরের একটির পর একটি পর্দা খুলে ফেলুন। নিজেকে নিজে বার বার জিজ্ঞেস করুন,—

'আমি কে! আমার নাম কি? আমার বাবার নাম কি, মার নাম কি। আমি কোথায় থাকতাম। আমি কোন স্কুলে পড়তাম। সেখানে কোন মিসট্রেস আমার প্রতি কঠিন ব্যবহার করতেন। জিজ্ঞেস করুন মনকে।'

অমলা মুখ নীচু করে থাকে।

অমলা কথা বলে না।

'আপনার কপালে দুঃখ আছে।' ডাক্তার বসাক চড়াচড়া গলায় বলেন, আচ্ছা আর একবার ওই ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাটাই হোক।'

চলে যান।

যেন রেগে রেগে, পা ঠুকে ঠুকে।

ওঁর চিকিৎসা পদ্ধতি এই।

রাগিয়ে দিয়ে, ভয় পাইয়ে দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে অসাড় চিত্তবৃত্তিকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি শক্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা।

কিন্তু সত্যিই কি অসাড় ? সত্যিই কি হারিয়ে যাওয়া ?

ডাক্তার মল্লিক যে মেয়েটার নাম দিয়েছেন অমলা, আর একজন যার নাম ছিল মাধবী, সত্যিই কি তার চিত্তবৃত্তি বোবা দেওয়ালের মতো অসাড় হয়ে গেছে ? তার স্মৃতিশক্তি ধূসর শূন্যতায় হারিয়ে গেছে ?

তার কি মনে পড়ে না ছবির মতো সুন্দর একটা বাড়িতে থাকতো সে, সে বাড়িতে তার মা ছিল বাপ ছিল ছোট ভাই ছিল। আর মার নামটাই ছিল অমলা।

ওর কি মনে পড়ে না, এখনো ওর হাতের কব্জিতে যে সরু শাদা একটা দাগ রয়েছে, সেই দাগটা কিসের ? ওর কি ভয়ানক খারাপ লাগেনা চশমাটা না থাকায় ?

সবই মনে আছে ওর।

মনে আছে বর্দ্ধমানে থাকতো ও।

বাবা তার বর্দ্ধমান কলেজের বাংলার লেক্‌চারার, ছবির মতো বাসাবাড়ি, মা বাবা ভাই আর সে, এই নিয়ে সুন্দর সংসার। কোথাও নেই মালিন্য, কোথাও নেই ভয়।

না কোথাও কোনোখানে ভয় ছিল না মাধবী নামের সেই মেয়েটার।

বাবা মেয়ে বলতে তদ্গত। মা-মেয়ের গৌরবে গর্ববিত।

কারণ ?

কারণ মাধবী স্কুলে সব সময় প্রথম হয়েছে, ম্যাট্রিকে উল্লেখযোগ্য হয়েছে, ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে।

বাবা উঠতে বসতে ডাকেন, 'মাধু মাধু'। পড়া থেকে ডেকে উঠিয়ে এনে বলেন, 'ভাল করে পড়ছিস তো ? আমার তো আর তোর সাবজেক্টে নাক গলাবার উপায় নেই। বুঝতেও পারবো না।'

মাধবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তোমার আবার বেশী বিনয় বাবা! তুমি ইচ্ছে করলে ইংলিশের ক্লাসও নিতে পারো।'

'হুঁঃ পারি। তোর পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়। তা' পড় পড়, মন দিয়ে পড়। তুই আমার বংশের মুখোজ্জ্বল মেয়ে।'

মাধবীকে তার বাবা বংশের মুখোজ্জ্বল মেয়ে বলতো।

আর মাকে ডেকে ডেকে বলতো বাবা, 'দেখো অমলা যখন তখন তুমি তোমার ওই রান্নাঘরের মধ্যে পুরে ফেলোনা মাধুকে. 'মাধু দুটো লুচি বেলে দিয়ে যাবি রে ? মাধু চপ্ কটা পড়ে দিয়ে যাবি রে ?' বলবে না এসব। নিশ্চিন্ত মনে পড়তে দেবে।'

মাধবীর মা বলতো, 'দু'খানা লুচি বেললেই যদি ফেল হয়ে যায় তো কিসের মহিমা তোমার মেয়ের ? মেয়েমানুষ সব শিখতে হয়।'

বাবা বলতো, 'শিখবে শিখবে। সব শিখবে। তোমার মেয়ে রান্নায় ঠেকবে না কি ? কিন্তু এখন নয়। এখন যা করছে, তা' তোমার ওই চপ পড়ার থেকে অনেক বড়ো।'

মা বাবার এই হাল্কা কথা কাটাকাটি মাধবীর কাছে একটা কৌতুকের বস্তু ছিল। মাধবী হেসে হেসে বলতো, 'তা' বলে তা নয় বাবা। ভালো ভালো খাওয়া খাওয়াটি না হলে পড়তে মন লাগে নাকি ?'

বাবা হা-হা করে হেসে বলতো, 'সে তো একশোবার। খাবি খুব ভালো ভালো খাদি কিন্তু সে সব মা করে দেবে।'

এই স্বর্গীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছে মাধবী।

এমন আদরের আদরিণী ছিল সে।

ছোট ভাইটা 'দিদি' বলতে অজ্ঞান ছিল।

স্কুল থেকে এসে মার কাছে না গিয়ে দিদির খোঁজ করে বেড়াতো।

এই জীবনকে ভাঙা মাটির পাত্রের মতো ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল মাধবী, উন্মাদনায় আর এক নূতন জীবনের আশায়।

আর এখন?

এখন মাধবী অঙ্ক কষে কষে ভেবে চিন্তে স্মৃতি ভ্রংশের অভিনয় করছে। মাধবী দু'দুটো ডাক্তারকে বিভ্রান্ত করছে।

কিন্তু মাঝখানের অধ্যায়টা?

যে জীবনের আশায় চলে এসেছিল?

উঃ। অধ্যায়টা যদি সত্যিই স্মৃতি থেকে মুছে যেতো। কিন্তু তা' যায় না, সেই অধ্যায়টাই মনের মধ্যে হিংস্র নোখ বসিয়ে বসে আছে।

আশ্চর্য! এই পৃথিবীতে শয়তানের চেহারাও ঠিক মানুষের মতই হয়।

মাধবী তাই মানুষই ভেবেছিল 'অরবিন্দ' নামের সেই শয়তানটাকে।

কিন্তু একা মাধবীই বা কেন?

মাধবীর বাবা মা ছোট্ট ভাইটা পর্যন্ত কে না ভেবেছিল তাকে অদ্ভুত সুন্দর একটা 'মানুষ' বলে। বাবাই তো ডেকে এনেছিল আদর করে।

বাবার কলেজের এক প্রফেসরের দূর সম্পর্কের শালা।

অনেক টাকার নাকি মালিক, এই বয়সেই দিকে দিকে তার নানা বিজ্‌নেস। আর নিত্য নতুন পরিকল্পনাও মাথায় খেলে তার। এসেছিল বর্দ্ধমান সহরে একটা 'ইলেকট্রিক্যাল গুডস্'এর দোকান দেওয়া যায় কিনা তা'রই তদ্বির করতে।

প্রফেসর তাকে সমাজ পরিচিত করতে নিয়ে এসেছিলেন কলেজ লাইব্রেরীতে, আর তখনই মাধবীর বাবার সঙ্গে আলাপ উঠেছিল জমে।

ছেলেটার সম্পর্কে আরো আশ্চর্য, সে নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাবের ম্যাজিক দেখাতে পারে। সে গল্প মাধবীর বাবার সেই প্রফেসর বন্ধুই বলেন, 'নিজের আত্মীয় বলে বলছি না। এমন ছেলে দেখা যায় না। কতো পয়সার মালিক। কলকাতায় চার-পাঁচটা বড় বড় দোকান, অথচ কী বিনয়ী, কী নিরহঙ্কার! কে বলবে অতো পয়সা। কাল থেকে এসেছে পর্য্যন্ত তো ভাবে-ভাষীদের নিয়ে মশগুল হয়ে ভাবের ম্যাজিকই দেখাচ্ছে। অথচ হিসেব পত্র নিয়ে যখন বসবে? একটি ঝানু ব্যবসাদার।'

মাধবীর বাবা হয়তো মাধবীরই মতো ছেলেমানুষ।

তাই সেই দিন বাড়ি এসেই পরমানন্দে ওই 'অরবিন্দ' নামের অভিনব মানুষটি সম্পর্কে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি এবং বাঙালীর বিজনেস সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু 'কাল' করেছিল তাদের ম্যাজিক।

মাধবীর ছোট ভাই বাবার কাছে হাপসে পড়লো। সেই আশ্চর্য মানুষটিকে একবার বাড়িতে আনা যায় না? একবার বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখে নেওয়া যায় না?

বাবা বললো, 'তা যদি বললি খোকা, সে ইচ্ছে আমারও করেছিল, তবে চট করে বলতে পারিনি। তোদের মাও তো ম্যাজিক দেখতে খুব ভালবাসে।'

কিন্তু শুধুই কি মাধবীর ভাই আর মাধবীর মা?

এ সংসারে ম্যাজিক দেখতে কে না ভালবাসে? জেনে বুঝে ঠকবার জন্যেই তো উৎসুক হয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ।

গুরুর ম্যাজিক, জ্যোতিষের ম্যাজিক, বাদুড়ী জলপড়া দৈব অলৌকিকের ম্যাজিক জুয়ার ম্যাজিক হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক, ম্যাজিক মাত্রেই দেখবার জন্যে পৃথিবী পাগল।

তাদের ম্যাজিক?

তাইবা কম কি?

ওর পিছনে পিছনেই তো আসে 'জীবন্ত মানুষকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা', 'জলজ্যান্ত তরুণীকে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া—'

মাধবীর বাবা সেই ম্যাজিক ওয়ালাকে বাড়িতে আদর করে ডেকে এনেছিল।

আর আনার পর দেখেছিল তার আরো গুণ আছে। ফটো তোলায় নাকি ওস্তাদ সে।

হয়তো এই নিয়ম।

শয়তানকে নানা গুণে ভূষিত হতে হয়। তা না হলে স্বর্গকে বিধ্বস্ত করবে সে কোন হাতিয়ারে?

ক'দিনই বা বর্তমানে ছিল অরবিন্দ?

তবু তার মধ্যেই তাদের হাত সাফাই দেখানো সেরে, তরুণী নারীকে উড়িয়ে দেবার সাফাইটা রেখিয়ে দিল। আর অবশ্যই 'জীবন্ত মানুষকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার' বিদ্যেটাও দেখানো হলো তার।

মাধবীর সেই আলাভোলা বাবা, সেই 'অবলা' নামের রান্নাপাগল মা, ওরা কি ওই ম্যাজিকের খেলাটা দেখার পরও আস্ত আছে আর?

মাধবী ছেলেবেলা থেকে ক্লাসে ফার্স্ট হতো মাধবী তার বাবার মুখউজ্জ্বল করা মেয়ে হচ্ছিল, অথচ মাধবী মাত্র কয়েকটা দিনের চেনায় একটা ম্যাজিকওলার সঙ্গে চলে এলো, তার সেই 'স্বর্গভূমিকে' ভাঙা মাটির পাত্রের মতো ছুঁড়ে দিয়ে।

তার মানে মাধবীর ওই বই পড়া বিদ্যেটা কোনো কাজে লাগল না।

এই যেন হাসপাতালের ওয়ার্ডে বন্দিনী মাধবী এখন অবাক হয়ে ভাবে কী করে সম্ভব হয়েছিল মাধবীর ওই চলে আসাটা।

অথচ হয়েছিল।

তবু মাধবী জানেনা সেটা সম্পূর্ণই স্নেহের উন্মাদনা, না স্নেহের উত্তেজনা।

ছেলেবেলা থেকে মা বাবা দু'জনেই তাকে শুধু আদর করেছে, তোয়াজ করেছে, তার ইচ্ছে পূরণ করেছে। তাই হঠাৎ সেই একদিন তারা শাসনের চোখে তাকালো তৎক্ষণাৎ মাধবী নামের মেয়েটা একটা স্নেহের ছবি হয়ে গেল। ঘাড় বাঁকিয়ে বুনো ঘোড়ার মতো ভাবলো 'ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি।'

শাসনের ঘটনাটা ঘটলো ফটো নিয়ে।

ওই তদ্দিনেই, সকলের সামনে দেখিয়ে এবং সকলের আড়ালে লুকিয়ে মাধবীর অজস্র ফটো তুলে ফেলেছিল অরবিন্দ, এবং যাবার দিন তার একটা ক'রে প্রিন্ট এ্যালবামে গেঁথে উপহার দিতে এসেছিল মাধবীকে।

কিন্তু এ উপহারের আগে ওই ফটো তোলার মাধ্যমে অন্য আরো উপহার কি নেয়নি অরবিন্দ মাধবীকে? এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেনি সর্বস্ব উপহারের?

দিয়েছিল।

আর সে প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল মাধবী।

কারণ মাধবী তার আগে কখনো শয়তান দেখেনি। মাধবী শুধু তার আলাভোলা বাবাকে দেখেছিল, দেখেছিল তার অমলা নামের মাকে। দেখেছিল বাবার বন্ধুদের, আর ভাইটির খেলার সাথীদের।

আর কউকে দেখেনি মাধবী।

তাই মাধবী সেই সর্বস্বের প্রতিশ্রুতিতে কম্পিত হয়েছিল, স্পন্দিত হয়েছিল, এই মাটির পৃথিবীটাকে আলোয় গড়া অমরাবতী ভেবেছিল।

কিন্তু মাধবীর সেই অমলা নামের মায়ের মনের মধ্যে মাধবী মালিন্য দেখতে পেল।

মা কি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল?

তাই মা অমলা হয়েও অমন মালিন্যের পরিচয় দিয়ে বসলো।

হয়তো নিতান্ত নির্বোধ হলেও 'মায়ের' মধ্যে আলাদা একটা শক্তি থাকে, তাই মা টের পায় সন্তানের জীবনে অকল্যাণ আসছে, পাপ আসছে।

মাধবীর মাও টের পেয়েছিল।

তাই মাধবীর মা সন্দেহ করেছিল, সতর্ক হয়েছিল।

অথচ মাধবী মার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। মাধবী টের পায়নি নিজে সে কতো নির্বোধ।

—হ্যাঁ সেদিন—

সেদিন সেই করাত কাটার খেলাটা হল?

সেদিন তখন—যখন অরবিন্দ নামের ম্যাজিকওলাটা মাধবীকে সেই ছবির অ্যালবামের সঙ্গে আরো কিছু উপহার দিতে উদ্যত হচ্ছিল, তখন মাধবীর মা অমলা হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আর তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ তীব্রতায় বলে উঠেছিল 'অরবিন্দ! আমরা তোমায় মা খুব ভাল ছেলে বলে জেনে ছিলাম!'

এই পরিস্থিতিতে মাধবী হঠাৎ 'কাঠ' হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অরবিন্দ সহসা এক কাণ্ড করে বসেছিল।

অরবিন্দ একেবারে নাটকের দৃশ্যের মতো অমলার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলেছিল, 'মাসীমা আমি মাধবীকে বিয়ে করবো। কথা দিচ্ছি।'

বিয়ে করবো। এর থেকে বড় অঙ্গীকার আর কি আছে?

মাধবীর আপাদ মস্তক অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চে ভরে উঠেছিল। মাধবী বুকের মধ্যে খুব একটা সাহস বোধ করেছিল।

কিন্তু মাধবীর মার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মাধবীর মা নীরস স্বরে বলেছিল, 'বিয়ে করবো' বলে কথা দিয়েই কি আমাকে তুমি রাজা করে দিচ্ছ ভাবছো? আমরা মুখ্যু মানুষ, আর তুমি নীচুঘরের ছেলে, তোমার সঙ্গে আমরা আমাদের মেয়ের বিয়ে দেবই বা কেন? টাকা থাকলেই সবকিছু কেনা যায়না বাপু, এই কথাটি মনে রেখো। আর ভবিষ্যতে আর কখনো আমার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে এসোনা।'

মাধবীর মা বলেছিল 'আমার মেয়ে।'

কারণ মাধবীর মা পুরনো কালের মানুষ।

তার ধারণা সন্তান তার বাপ মায়ের।

ধারণা ছিল অকল্যাণকে ঝাঁটিয়ে সাফ করা যায়।

কিন্তু অমন সেকেলে আর ভুল ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে চলবো বললেই তো-চলা যায়না?

মাধবী বলেছিল, 'মা। তোমাদের ওইসব জাতের নিয়ম এযুগে চালুকর। বলেছিল আমি ওসব জাতটাত মানিনা।'

অরবিন্দ চলে গিয়েছিল।

তাই মা মেয়ের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল। তার সেই নিরীহ শান্ত হাস্যমুখী মা।

মা অ্যালবামটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে বলেছিল, 'এই সব ছবি তুলিয়েছ তুমি? অ্যাঁ! এই সব চঙের ফটো! তুমি একটা ভদ্রবাড়ির মেয়ে না? তুমি বড্ড শিক্ষিতা না? তলে তলে এই করছো তুমি? তোমার লেখাপড়ার গলায় দড়ি।'

আরো অনেক বলেছিল মা।

কারণ চিরদিনের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসটা আচমকা চুরমার হয়ে যাওয়ায় মা ক্ষেপে গিয়েছিল।

মা যদি অতো গাল মন্দ না করতো; যদি বাবা আসামাত্র সেই ছেঁড়া ফটোগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে না দেখাতো, তা'হলে কী হতো কে জানে।

কিন্তু মা ক্ষেপে গিয়েছিল। বাবাকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাই মাধবীও ক্ষেপে উঠেছিল।

মাধবী তাই ছোট্ট একটা এ্যাটাচিকেস সম্বল অরবিন্দ নামের 'বিশ্বাসের' কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল।

তারপর?

তার পরের কথা ভাবতে পারেনা মাধবী।

শয়তানের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে কেমন দেখতে হয়, তারপর শুধু সেইটাই দেখতে পেয়েছিল মাধবী।

ম্যাজিকওয়ালার অগাধ ধন সম্পত্তি, বিশ্বাস প্রতিশ্রুতি সব কিছুই মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। ধরা পড়ে গেল যতোরকম বিজনেসের নাম করেছিল অরবিন্দ 'আমার' বলে, সব কিছুই তার পাঞ্জাবী মনিব করমচাঁদের। অরবিন্দ তার সামান্য মাইনের একটা কারবারীর মাত্র।

কিন্তু মাধবী কি শুধু তাতেই ঘুমের বড়ি খেতে বসেছিল?

না, মাধবী ওটুকুতে অতোটা করতে বসেনি; মাধবী অতো বোকা নয়। কিন্তু অরবিন্দ যদি তার হাতে পাওয়া 'মাল'টি তার মনিবকে উপঢৌকন দিতে বসে, যদি ভয়ানক ভাবে বন্দিনী করে ফেলে মাধবীকে পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে, তাছাড়া আর কি করবে মাধবী?

মাধবী তার জন্যে নিয়োজিত দাসীর কাছে অনিদ্রা রোগের যন্ত্রনা পেশকরে করে ঘুমের বড়ি আনিয়েছিল।

তারপর আর কিছু জানেনা মাধবী।

জানতো না করমচাঁদ পাঞ্জাবী কী ভাবে তার পায়ের কাছের 'অন্তরিধেকে' সরিয়ে ফেলতে পারে।

আর এও জানতে পারেনি 'মৃতদেহ' হয়ে এসেও একটা ঘুমন্ত মানুষকে সে কীভাবে মারতে বসেছে।

ওই মেয়েটা নিশ্চয় পূর্বজন্মে আমার কেউ ছিল।

আজকাল অহরহ এই কথাই ভাবছে পথ।

কে বলতে পারে এই জন্মেই কিনা!

আমিও তো এমনি নাম গোত্তরহীন, জন্ম কর্ম সব ভুলে যাওয়া। কেউ জোর করে বলতে পারে কোনো ভদ্দরলোকের ঘরের ছিলাম কিনা।

আমাকেও হয়তো আমার আপনার লোকেরা 'মড়া' ভেবে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, দুঃখের প্রাণ তাই টিকে গেছি। যেমন ওই মেয়েটা।

ওর জন্যে কত দুঃখই না তোলা আছে।

সেরে উঠলেই বাকি শাস্তি হবে ওর।

লক্ষীছাড়া আইন।

যেন বলির পাঁঠাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা। কেন রে বাবা কী দরকার তোদের ওকে নিয়ে অত ভোগবার! ছেড়ে দেনা রাস্তায়, ওর যা খুশি করুকগে। দেশে এতো কোটি লোক আছে, সবাইয়ের ওপর তোরা চৌকী দিবি? একটা মানুষও নিজের ইচ্ছায় চলতে পারবেনা? কেন? কেন শুনি?

বলি এই যে রাস্তায় রাস্তায় কানা-খোঁড়া ঘুঠে অন্ধর জল পড়ে আছে, ঘুলোয় ধনটাচ্ছে, 'মা মা বাবা বাবা' করে গলা ফাটাচ্ছে, কই তাদের দিকে তো চোখ পড়ছেনা তোদের? কই বলছিনা তো এরা কোথা থেকে এলো, ওরা কেন খেতে পাচ্ছেনা!...এই যে রাত্রির অনাথ আশ্রমে হাজারে হাজারে ছেলে মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাপাচ্ছে, কই তোরা তো তোদের টিকটিকি পুলিশ লাগিয়ে খুঁজে বার করতে যাসনা কোথায় তাদের মা বাপ, কে তাদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে আর কীভাবে তারা মানুষ হচ্ছে! দেহটার যখন ছিষ্টি হয়েছে, মা বাপ তো ছিল কোথাও? মরে গেলেও, তাদেরও কেউ ছিল। তা নয় 'পথ'র মতন বাপ মা ছেলে মেয়ে অন্ধকারে হাতড়ে মরবে আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আর একটা জ্ঞান 'সিঁতি' লোপ

পাওয়া মেয়ে, যার ভেতরে কোনো দুঃখু হাহাকার নেই, তাকে নিয়ে দেখ্ কচলাচ্ছে, কিনা বিচার হবে ওর। ধুর! ধুর! মেয়েটাকে ওই ফাটক থেকে বের করে আনা যেত! দেখতাম কেমন করে শাস্তি দিস ওকে।

রাতদিন এখন ওই চিন্তা ধীরাপদর।

মেয়েটাকে ওদের কবল থেকে বার করে আনা যায় কিনা। তাহলে অন্তত: দেরে গেলে আবার থানা পুলিশে পড়তে হবেনা।

পদ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে মেয়েটাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, পদ তাকে আশ্রয় দিয়েছে। বলছে, 'দেখো যে অবস্থায় আমার সেই অবস্থা তোমার। তুমি আমি একই গোত্তর। আমিও জানিনা আমি কে, তুমিও ভুলে গেছ তুমি কে। তবে একসঙ্গেই থাকা ভাল।'

পদর নিজের কোথায় আশ্রয়, তা' জানেনা পদ অন্যকে আশ্রয় দেওয়ার স্বপ্ন দেখে। ঘুমিয়ে জেগে।

আবার পদ এও ভাবে, সেদিন যদি পুলিশে খবর না দিয়ে পদরা মেয়েটাকে ঘরে তুলে সেবা যত্ন করতো, তাহলে সে পদদেরই সম্পত্তি হয়ে যেতো। পুলিশের ঘরে উঠতো না।

ওই সামন্তদাই যতো নষ্টের গোড়া। তাড়াতাড়ি পুলিশ না ডাকলে চলছিলা না ওর। ভেবে চিন্তে দেখ আগে। তা নয় পুলিশ! পুলিশ!

কিন্তু মুরারি সামন্ত ক্রমশই অসহিষ্ণু হচ্ছে। অমন চটপটে, অমন কাজের ছেলেটা কী হয়ে যাচ্ছে দিন দিন! যাত্রা অথান্ত হচ্ছে, জলের বালতি খালি পড়ে থাকছে, ছাড়া কাপড় কাচা হচ্ছেনা, খদ্দের এসে অস্থিরতা করছে কাঠ ওজন করতে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। পদ যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেড়াচ্ছে।

বেলার দিকে হাত মুখ ধুয়ে এসে বালতিটা খালি দেখে সামন্তর গায়ের রক্ত মাথায় উঠলো। চেঁচিয়ে ডাকলো, পদ পদ! বলি কোন চুলোয় আছিস? দেখি একবার।

এ ধরণের কথা অবশ্য সামন্তর নতুন নয়। তবে ভঙ্গীটা আগের মতো নয়। পদও তাই আগের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়না, কোন চুলোয় আর যাবো? চুলোর বোঝেই তো পড়ে আছি। কেন কী হয়েছে কী?

পদ চুপচাপ আস্তে এসে দাঁড়ায়।

মুরারি আরো জ্বলে ওঠে, বলে, 'এই যে আমার ধীরাপদ বাবু এলেন ধীরে ধীরে গজেন্দ্র গমনে। বলি সত্যিই তাহলে পেত্নীতে পেয়েছে তোকে? হারামজাদী ছুঁড়ি বরলোনা তবু পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চাপলো কেমন করে বল দিকি!'

পদ এবার কথা কয়।

ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'খারাপ করে কথা বোলোনা সামন্তদা, ভাল হবেনা বলছি।'

'ভাল হবে না। তুই আমায় 'ভাল' দেখাতে এসেছিস পদ? বড্ড তোর বাড় বেড়েছে দেখছি। এই জন্যেই শাস্তরে বলেছে মেয়েছেলেই হচ্ছে যতো নষ্টের মূল। অমন যে রাবণ রাজা, কুড়ি হাতে রাজত্ব সামলাচ্ছিল, দশমুখে খাচ্ছিল, সেও ধ্বংস হলো ওই এক মেয়ে ছেলের কারণে। বেদ পুরাণ, শাস্তর ইতিহাস সবেতেই এই এক কাহিনী। বেটাছেলে উচ্ছন্ন যাওয়ার গোড়া ওই মেয়েমানুষ। তা সেতো তবু আজ একটা ঘটনা। বলি তোর কি? বল পদা, তোর কি? একলহমা একখানা মড়ার মুখ দেখলি তবুবধি মানুষ থেকে ভূত বনে গেলি?'

পদ ঘাড় গুঁজে বলে, 'কোনটা হচ্ছেনা তোমার? যে এতো শোনাচ্ছ?'

'ওঃ। আবার মুখে মুখে কথা! বলি এইযে বালতিতে জল নেই, এর কি?'

পদ নীরবে একবার সুরাজ সামন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বালতিটা তুলে নিয়ে চলে যায়।

সুরাজ গুম্ হয়ে বসে থাকে।

অতোগুলো কটু কথা বলবার ইচ্ছে তার ছিলনা, কিন্তু ছেলেটার অবংপতন দেখে মনটা তার সবসময়ই জলে পুড়ে যাচ্ছে।

তার যদি একটা সত্যিকার মেয়েছেলে দেখে মজতো। তাহলে সুরাজ সামন্ত বলতো ঠিক আছে বাবা, বয়েস ধরেছে, হবেই তো।

এমনিতেই তো ভাবছিল সে, আমার জীবনটা তো গেল, একটা ঘুপিমতো মেয়ে জোগাড় করে পদর বিয়ে দিলে হয়।

পানের দোকানের হরিদাসের একটা মেয়ে আছে বিয়ের মতোন, রাস্তায় কলে জল টল নিতে আসে, দেখতে মন্দ নয়। গড়ন পেটন আছে। হরিদাস বেহারী, কিন্তু ওর বৌটা বাঙালী। মানে আর কি, বিদেশে বিভূঁইয়ে একটা বৌতো চাই মানুষের। তা যাক্ হরিদাস যে বেহারী তা বোধহয় হরিদাস নিজেই ভুলে গেছে। কথাটা একবার পাড়লে হয়।

মনে মনে এই সব ভেবে রেখেছিল সুরাজ, হঠাৎ একী উৎপাত। মেজাজ ঠিক রাখা যায়?

জলের বালতিটা আস্তে নামিয়ে রেখে পদ যেন বাতাসকে শোনানোর মতো করে বলে, 'আমি আর এখেনে থাকবোনা।'

সামন্ত বালতিটা তুলে নিচ্ছিল, থমকে দাঁড়ালো। বললো 'কী বললি?'

'যা বললাম শুনতে পেয়েছো।'

'না পাইনি শুনতে!' সামন্ত চেঁচিয়ে বলে, 'তোর গলায় বল আর একবার শুনি।'

পদ পরিষ্কার গলায় বলে, 'এখেনে আর থাকবার ইচ্ছে নেই।'

'ওঃ ইচ্ছে নেই। তা' যাও তবে। যেখানে থাকতে ইচ্ছে যাও সেখানে। কিন্তু শুনতে তো একবার হবে আমাকে, ইচ্ছেটা হঠাৎ হইল না কেন?'

'শ্মশানটা একটা বাসকরার জায়গা নয়'—বলে পদ সামন্তর ভাত বাড়তে যায়।

সামন্ত শিথিল গলায় বলে, 'জন্ম গেল ছেলে খেয়ে। আজ বলছিস জান! যদি এতদিন তো বলিসনি একথা?'

'একদিন মানুষের চোখ ফোটে।'

'ওঃ চোখ ফুটেছে। তা' ভালো। বেশ আজই চলে যাও।'

'তাই যাবো। কিছু টাকা নিয়ে যাবো।'

'টাকা নিয়ে যাবি?'

সুরাজ চড়া গলায় বলে, 'টাকা নিয়ে যাবি মানে? কার টাকা নিয়ে যাবি?'

'তোমার বললে তোমার, আমার বললে আমার।' পদ গম্ভীর গলায় বলে, 'দু' জনেই তো খাটি।'

'ও! ভাগ নিতে এসেছো? ব্যবসার ভাগ? ওরে আমার পার্টনার রে। একটা পয়সাও পাবিনা যা। ভাগ।'

গ্রহ-নক্ষত্রের শত্রুতা থাকে বৈকি।

হঠাৎ চঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসে সে, যা একেবারে অভাবিত।

যাকে যে কথা বলবার নয়, তাকে তো বলে ফেলে মানুষ, যে কথা নিজেরই অগোচরে ছিল সে কথা মুখে বেরিয়ে আসে। শুনে মনে হয়, এতোদিন বুঝি তবে মনের মধ্যে গোপা ছিল এ সব।

পদও তাই ভাবলো।

আর পদও তাই বললো।

মানে দু জনেই কোনো দুই গ্রহের শীকার হলো।

পদ বললো, 'কথাটা আমার বলার ইচ্ছে ছিল না সামন্তদা তুমিই বলাচ্ছো।—স্মরণ আছে কি যখন তুমি আমায় দেখেছিলে, কেবল বলতে 'চাকরী করবি, চাকরী করবি?' তা' করছি তো চাকরী এ যাবৎ। কই মাইনে কি দিয়েছ কোনো দিন?'

'মাইনে!'

সুরাজ সামন্ত দাওয়ার খুঁটিটা চেপে ধরে বলে 'মাইনের কথা বলছি তুই? আর এই যে খাওয়ালাম পরালাম, এতোবড়টা করলাম—'

পদর মুখে কিন্তু আসছিল।

পদ সামলে নিলো।

পদ গম্ভীর গলায় বললো, 'ও: তা'লে আমারই বলা ভুল হয়েছে বেশ, তবে নয়, গোটাকতক টাকা ভিক্ষেই দাও। একেবারে শুধু হাতে তো বেরোনো যায় না। আমি কাশী চলে যাবো।'

কাশী চলে যাব।

সুরাজ সামন্তর চোখে হঠাৎ জল আসে।

পদ যে তার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে।

এর থেকে পদ ওই 'মাইনে মাইনে' করে লাঠালাঠি করলোনা কেন। তাতে অনেক মান ছিল সুরাজ সামন্তর।

তা' নয় পদ এককথায় মহত্ত্ব দেখিয়ে 'পাওনা' কথাটা ত্যাগ করে ভিক্ষে চাইলো।

এতেও চোখে জল আসবেনা?

পদ বলে বলে কি সত্যিই সুরাজ সামন্ত কাঠ পাথর!

পদর বিয়ের মতলবে আস্তে আস্তে কিছু টাকা জমাচ্ছিল সামন্ত, বাক্স খুলে গুণে দেখলো দু'শো মতো হয়েছে। আবার একটি একটি করে গুণে একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে পদ যেখানে বসে বাসন মাজছিল, সেখানে রেখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'এই রেখেছিলাম তোমার বিয়ের জন্যে, নিয়ে যাও। যাবার আগে দেখিয়ে যেও চাল ডাল তেল মশলাগুলো কোথায় আছে।'

পদ অনেকক্ষণ সেই ন্যাকড়াবাঁধা পুঁটলীটার দিকে তাকিয়ে রইল। পদরও চোখ দিয়ে অঝোর জল বেরোতে লাগলো। তবু পদ মনকে বাঁধলো।

চলেই যাবে সে।

এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে তার।

এ পরিবেশ বেঁধে যায়ছে।

কারো জন্যে কারো দিন আটকায় না, সুরাজ সামন্তরও 'পদ্ম' নামক হতভাগাটার অভাবে দিন আটকে থাকবে না। একটা চাকর-টাকর রাখবে।

অনেকক্ষণ পরে পুঁটলীটা খুললো।

দেখে অবাক হয়ে গেল।

সামন্তর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো 'এতো কেন?'

সামন্ত অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে বললো 'কলকাতার রাস্তায় নামলে ওই 'এতো' আর এতো থাকবে না।'

'তা হোক। এতো নেবোনা।'

সামন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'নেবেনা তো রাস্তার ভিখিরিদের বিলিয়ে দাওগে। সুরাজ সামন্ত দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে কালীঘাটের কুকুর হতে পারবে না। আর যে টাকা একজনের বিয়ের জন্যে জমিয়েছিল তাই দিয়ে পেটের ভাতও করবে না।'

শ্মশান ছেড়ে চলে যেতেও যে এতো যন্ত্রণা হয় তা' জানা ছিল না পদ্মর।

এই যে বন্ধন ছিন্ন করার তীব্র যন্ত্রণা, এ কী শুধুই সুরাজ সামন্তর জন্যে? ওই গঙ্গা ওই চিতাবহ্নি, ওই চিমটে হাতে ঘুরে বেড়ানো ভস্মমাখা সাধু অ-সাধুর দল, ওই যেখানে সেখানে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা হতভাগা কুকুরেরা, আর ওই মুহুর্মুহু নতুন নতুন কণ্ঠের হরিধ্বনি, এরা সবাই কি সহস্র বন্ধনে বেঁধে রাখেনি পদ্ম নামের একটা মূর্খ অবোধ চিত্তকে?

তবু পদ্ম চলে যাচ্ছে।

যেন কে কোথায় বসে পদ্মকে আরো এক তীব্র আকর্ষণে টানছে।

কে সে?

জানে না সেকথা পদ্ম।

পদ্মর শুধু মনে হচ্ছে পদ্মর জায়গা এখানে নয়। পদ্মর জন্যে ভয়ানক ভাল কিছু একটা অপেক্ষা করছে। পদ্ম এখান থেকে বেরিয়ে পড়লেই বুঝি সে ভালটা পেয়ে যাবে।

তাই পদ্ম মা গঙ্গাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে। সুরাজ সামন্তকে প্রণাম করা সম্ভব হয়নি। সেই যে সে ঘরে খিল লাগিয়ে ঘুমোচ্ছে সে ঘুম আর তার ভাঙতেই চাইল না।

'সামন্তদা আমি যাচ্ছি—সামন্তদা আমি চললাম'—বলে যার কয়েক ডেকে যাওয়াতেই একটা প্রণাম রেখে চলে এসেছে।

'আমি এখন দুশো টাকার মালিক।' মনে মনে বললো পদ্ম, ভগবান যদি দিন দেয় তো এ টাকা আমি সামন্তদাকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু এখন আমি কাশী যাবো। জন্মে কখনো এ পৃথিবীকে দেখিনি, দেখবো। ঠিকই বলেছে সামন্তদা, ঘুতেই পেয়েছে আমায়। নচেৎ কেন সেই একদণ্ডের দেখা একটা অচৈতন্য মুখকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। কেন কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে সে মুখে চৈতন্য ফুটলে কেমন দেখায় দেখি একবার।

কী লাভ হবে আমার তাতে ?

সত্যিই কি পুলিশে ওকে ছেড়ে দিলে আমার কাছে থাকতে চাইবে ও ? যতই পূর্বকথা ভুলে যাক, একটা ভাল ঘরের মেয়ে তো।

ভাল ঘরের বৈ কি !

ওর চেহারায় সে সাক্ষী আছে।

পদ্ম ঠিক করেছিল আর সেই 'অনিই' কারী মেয়েটার মুখ ভাববে না। কাশী চলে যাবে। নতুন জীবনের সন্ধান করবে।

তবু পদ্ম অজ্ঞাতসারে সেই মুখটাই ভাবতে লাগলো।

তা' ভাবতে ভাবতে কি পদ্মর চোখ দুটো আপনি হয়ে গিয়ে সর্বত্রই সেই মুখটা দেখতে সুরু করলো ? তাই পদ্ম ছাওড়া স্টেশনের ভীড়ের মধ্যে সেই মুখ দেখতে পেলো ?

পদ্ম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না, তবু পদ্ম ভীড় ঠেলে ছুটতে সুরু করলো। আর কৃতকার্য্যও হলো।

হাঁপিয়ে বললো, 'আপনি !'

'আপনিই' ঘোরিয়ে নেল মুখ ফিরে।

অথচ মনে মনে অহরহই তাকে সগোত্র ভেবেছে।

মেয়েটার যে কেমন একটা উদভ্রান্ত ভাব, তা বুঝতে পারলো পদ্ম। তার মানে এখনো জ্ঞান-গম্যি ফেরেনি। তাহলে পুলিশ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল কী করে ? পালিয়ে আসেনি তো ?

তাই সম্ভব।

পদ্মকে দেখেই যেন সরে পড়তে চাইছে।

কিন্তু কেন ?

ও তো পদ্মকে চেনেনা।

ও তো পদ্মর মুখ দেখেনি।

তবুও মেয়েটা সরে পড়তে চাইল। কিন্তু পদ্ম কি সরতে দেবে। ও তীব্র গলায় বললো, 'কে তুমি ?'

পদ্ম বললো, 'সে' বিত্তান্ত তো এককথায় বলা যাবে না। একটু পাশের দিকে যেতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কি করে ?'

মেয়েটা চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠলো, 'কী যা তা বকছো। আমি তোমায় চিনিনা যাও।'

'আজ্ঞে আপনি আমায় চিনবেন কোথা থেকে ? যখন দেখা সাক্ষাৎ তখন তো আপনি 'লাশ' মাত্তর। চোখ বন্ধ। কিন্তু একা একা যাচ্ছেন কোথায় ?'

পদ্মর মন স্বপনের ধ্যান-জ্ঞান আবারও সরে পড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু পদ্ম কি তা দেয় ? পদ্মও সঙ্গে সঙ্গে সরে। আর সেই প্রবল ভীড়ের মধ্যেই কথা চালিয়ে যায়, পালাচ্ছেন কেন ? আমি তো আপনার অনিই করতে আসিনি। আমি বরং—' পদ্ম চোক গিলে বলে, 'আমি বরং আপনার সাহায্য করতে পারি।'

'কে বললে তোমার আমার সাহায্যের দরকার ?'

'মানে একা যাচ্ছেন। এদিক আবার খুব ভিড় তো লোক পেয়ে গেছে ওদিকে আবার হয়তো পেছনে পুলিশ।'

মেয়েটা হঠাৎ পদর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমার কথা কি করে এতো জানলে তুমি ?'

পদর সমস্ত শরীরের মধ্যে ভূমিকম্প হয়।

পদর চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরতে থাকে। পদ আস্তে বলে, 'আমি সব জানি।'

ভীড়ের চাপে সরতে সরতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল ওরা। ভীড়টা কিঞ্চিত পাতলা।

পদ বিহ্বল গলায় বললো, 'আমি তো কাশী যাচ্ছি, আপনি ?'

মেয়েটা ওর ওই বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমিও কাশী যাব ! কিন্তু টিকিটটা তোমায় কিনে দিতে হবে। আছে পয়সা ? আমার নেই।'

অথচ পদ এই কিছুক্ষণ আগেও ভাবছিল, পদর মতো হতভাগা দুনিয়ায় আর দুটো নেই।

এখন কি পদ নিজের ভাগ্যটার কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে লোককে ? তবু পদর ভয় হলো, টিকিট কাটতে পাঠাবার নাম করে ওকে ভাগাবার তাল করছে না তো।

তাছাড়া অনভিজ্ঞ পদ, অনেক কষ্টে একবারতো আর একজনকে দিয়ে টিকিট কিনিয়েছে, আবার—

'কী হলো ? টাকা নেই বুঝি ?'

মেয়েটা বলে কুদ্ধ হাসির সঙ্গে।

পদ তাড়াতাড়ি বলে, 'তা কেন ? পয়সা আছে তবে। যা ভীড় যেতে আসতে, রেলগাড়ীটা ছেড়ে দেবে কিনা তাই ভাবছি।'

'তা বটে।'

মেয়েটা বলে, 'তবে থাক, আমি এমনিই যাব।'

পদ গম্ভীর ভাবে। বলে, 'তা হয় না। আমার দাদা জানতে পুলিশের কবলে পড়ে যাবেন। মনে হচ্ছে তো পালিয়ে এসেছেন। চলুন আমার সঙ্গেই চলুন। এই নিন টিকিটটা আপনি ধরুন ; আমি বরং বলে করে হাত ধরে দিয়ে ফিটিয়ে নেব।'

চেহারাটা মন্দ নয়, জামা-কাপড়ও কর্সা, তবু দেখলে চিনতে ভুল হয় না নেহাৎই ছোটলোক।

চলন্ত ট্রেনে মনে মনে একটা কুদ্ধ হাসি হেসে মেয়েটা ভাবতে থাকে একটা ছোটলোক এখন আমার ত্রাণকর্তা কিন্তু আশ্চর্য্য, কে এ ? একজনায় আমার হাতে নিজের টিকিটটা তুলে দিল। ঈশ্বর প্রেরিত না কি।

কিন্তু ঈশ্বর আমার জন্যে দূত পাঠাবেন একথাও ভাবছি আমি।

কিন্তু কী ব্যাপার।

ও এতো কথা জানলো কি করে ?

আমি যা জানিনা তা'ও ও জানে।

আমাকে নাকি শ্বশানে মড়ার খাটিয়ায় পাওয়া গিয়েছিল। একথা জানতাম না আমি।

কিন্তু কাশী গিয়ে আমি কি করবো?

জানি না।

হয়তো এই ছোটলোকটাই আমার অগতির গতি হবে। লোকটা বোকা নয়। টিকিট চেকার আসবার আগেই টাকা বার করে বসে আছে, বলে, তাড়াতাড়িতে টিকিট কিনতে পারিনি।

তা তাই হয়। বিপদে পড়লেই বুদ্ধি আসে।

পদ্ম জগতের কিছু জানে না, তবু পদ্ম ওকে নিয়ে একটা ধর্মশালায় তোলে।

তারপর পদ্ম কৃতার্থের গলায় বলে, 'তখনথি কেবল ভেবেছি আপনার নাম কি? কথা বললে আপনাকে কেমন দেখতে লাগে। মানে মরে যাওয়া মানুষকে বাঁচতে তো কখনো দেখিনি।'

মাধবী অবাক হয়।

শুধু কৌতূহলে মানুষ এমন কৃতার্থমন্য হয়। শুধু একবার দেখে এমন করে মনে রাখতে পারে?

এখন যেন আর ওকে ছোটলোক বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কে বলতে পারে পুলিসের চর কিনা।

নইলে এতো কথা জানলো কোথা থেকে?

হয়তো আমায় কলো করছে এই রকম বোকা মুখ্যু সেজে—

তাই মাধবী ভানটাই চালিয়ে যায়।

বলে, 'আমার নামটাও কিন্তু মনে নেই। সব ভুলে গেছি।'

'সেই তো জ্বালা।' পদ্ম বলে, 'নচেৎ তো নিজের জায়গায় চলেই যেতে পারতেন। আচ্ছা আপনার কি একেবারেই কিছু মনে পড়ে না?'

'না।'

'তা' এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?'

'জানি না।'

পদ্ম হেসে ওঠে, 'আমার সঙ্গে একই দশা। আমিও জানি না কি করতে এসেছি। কি বা করবো। তবে শুনেছি মা অন্নপূর্ণার রাজত্বে কেউ উপোসী থাকে না তাই—কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনা কী বলে আপনাকে ডাকি।'

মাধবী গম্ভীর ভাবে বলে, 'দিদি' বলতে পারো।'

'দিদি!'

পদ্ম কেমন আহত দৃষ্টিতে তাকায়।

যেন মাধবীর মনের ভাবটা পড়তে পারে। দিদিমণি না বলে শুধু দিদি বলতে বলছি।

কিন্তু দুঃখ করে লাভ কি?

পদ্মকে দেখে চাকর বাকর ছাড়া আর কিই বা ভাবা যায়।

তথাপি দু'জনে যে একজায়গায় বসে দোকান থেকে আনা খাবার ভাগ করে খাচ্ছে এতেই পদ্ম ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

পদ ওর কাছে নিজের জীবন কথা বলে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। পদ ওর সাহায্য করতে পাচ্ছে ভেবে ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

পদর যদি অনেক টাকা থাকতো, এই ভাবে চাকরের মতই ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে, জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো।

কিন্তু টাকা বড় দুর্লভ বস্তু।

পদ ভেবে পাচ্ছে না এরপর কি করবে।

'বিশ্বনাথ দর্শনে যাবেন না?'

পদ প্রশ্ন করে।

পদ এ প্রশ্ন করে না, করতে জানেও না তোমার পূর্ব স্মৃতি লোপ পেয়েছে তো তুমি যাই পড় কি করে? অথচ যেখানে সেখানে যা পাচ্ছে পড়ছে মেয়েটা চকচকে চশমায়।

ওই চশমা জিনিসটাই যেন ব্যবধানের প্রাচীর। ওইটা দেখলেই মনে হয় পদর থেকে অনেক উচ্চস্তরের জীব।

এক ধর্মশালায় বেশীদিন থাকতে দেয়না তাই এ ধর্মশালা থেকে ও ধর্মশালা। এতে বাসাভাড়া লাগেনা। মাধবী হাসে।

অনেকদিন পরে হাসে মাধবী। হেসে হেসে বলে, 'খুব চালাক তো তুমি? বেশ বাসাভাড়া বাঁচাচ্ছো?'

পদও হাসে।

বলে, 'ওই জন্যেই তো বাবা বিশ্বনাথের ঠাঁই আদা।' গরীবেরও অন্নজোটে এখানে।'

'তা' জোটে। মাধবী আবারও হেসে বলে, 'যেমন আমার জুটছে। একটা পয়সা হাতে নেই, কাশী চলে এসেছি, দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মলিন হয়ে যায় মাধবী। এই জীবনটার জন্যেই কি সে অতো কৌশল করে অত অভিনয় করে পালিয়ে এসেছে? মলিন মুখ করে করে ডাক্তার মল্লিককে বলেছে, 'বাইরে বেড়াতে গেলে আমার সব কষ্ট সেরে যাবে।'

পদ ওর মুখের দিকে তাকায়।

ভাবে কথা বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যায় কেন ও? ওর কি তবে কিছু কিছু মনে পড়ে?

'কিন্তু একদিনও বিশ্বনাথ দর্শনে যাওয়া হচ্ছেনা।' 'তুমি আপনি' ছাড়া কথা বলে পদ। 'দিদি' বলা—তার দ্বারা হবেনা।

'তুমি দেখতে গেলেই পারো। আমার ওসব ইচ্ছে নেই।'

'বাঃ বাঙালীর মেয়ে, হিন্দুর মেয়ে।'

মাধবী হঠাৎ ঝলকে ওঠে।

বলে, 'আমি কিসের মেয়ে তুমি জানো? তুমি পুলিশের স্পাইই না কি তাই শুনি? সব সময় এতো কৌতূহল কিসের? এতো কথাই বা কিসের?'

পদ্ম মাথা হেঁট করে চলে যায়।

পদ্মর চোখে জল আসে।

মাধবী তাকিয়ে দেখে।

মাধবীর ওই রোগা পাতলা ম্রিয়মান মুখটা দেখে মায়া আসে। মাধবী কাছে এসে হালকা গলায় বলে, 'আচ্ছা লোক তো তুমি? টাটাও বোঝোনা? কোথায় যেন খুব ভাল পান পাওয়া যায় বলেছিলে, যাও ঝিকি নিয়ে এসো ঝিকি।'

পদ্ম কৃতার্থ হয়ে চলে যায়।

কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে বুকটা যেন ধসে যায় পদ্মর। বড়জোর আর দুটো দিন। তারপর।

পান নিয়ে এসে পদ্ম ঈষৎ উৎফুল্ল গলিয়ে বলে, 'আপনি পান সাজতে পারেন?'

পান!

পান সাজতে।

মাধবী অবাক হয়ে বলে, 'কেন?'

'না মানে বলছি, কাশীতে তো দেখছি পানের ব্যবসা বেশ লাভজনক ব্যবসা। একটা পান বারো নয়া পয়সা। তাহলেই বুঝুন? টাকায় কেড়িটাকা লাভ। আপনি যদি পান বানিয়ে দিতে পারেন, আমি দোকান পেতে বসি। তা'হলে আর কোনো চিন্তা থাকেনা।'

'বাঃ চমৎকার।'

মাধবী বলে, 'পরিচয়টা ভালই হবে। কাশীর পানওয়ালী।'

'বাঃ তা' কেন? আপনি কেন?' পদ্ম লাল হয়ে বলে, 'আমি বসবো দোকানে। আপনি শুধু—।'

মাধবী চটে ওঠে।

লোকটা ভেবেছে কি। এই ভাবেই ওর সঙ্গে থেকে যাবো আমি? ওর ঘর ধরাবো?

অথচ তা ছাড়া আর কি হতে পারে ভেবে পাচ্ছেনা।

মাধবীই কি কোনো কাজের সন্ধান করবে?

ছেলে মেয়ে পড়ানো।

দোকানের হিসেব রাখা। যা হোক।

কিন্তু যেখানে যা করতে যাবে, সবাই তো প্রথমেই জিগ্যেস করবে বাড়ি কোথায়। বাপ মা কোথায়, এভাবে একা কেন। সঙ্গে ও কে?

কিন্তু সত্যিই ওকে?

মাধবী ওর বিহ্বল ভাব দেখে।

ওর কৃতার্থ ভাব দেখে।

ওর সর্বংসহা ভাব দেখে।

মাধবীর মেয়ে মানুষের চোখ যা দেখে, ভুল দেখেনা। কিন্তু মাধবী ভেবে পায়না এটা কেমন করে সম্ভব।

এতোদিন ভেবেছি ও কে! ওকে পুলিশের চর ভেবেও সন্দেহ করেছি, কিন্তু এখন বুঝেছি ও একটা

খাঁটি মানুষ। কিন্তু বড্ড বোকা মানুষ। নইলে ও অর্থ সমস্যার সমাধান করে ভাবতে পারে পানের দোকান দেবে। আর সে পান তৈরি করবে মাধবী।

ওকি তবে ওর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবির সঙ্গে মাধবীকেও আঁকছে? ওকে কি তবে এই বেলাই বুঝিয়ে দিতে হবে, এটা রূপকথার কাল নয়। কাঠুরে ও রাজকন্যার গল্প এযুগে হয় না।

কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার পর?

ও যদি বলে, বেশ তবে আমার দুইতঃ মাপ করো, আমি বিদায় নিই।

তা'হলে?

পাছে চেনা লোকের চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে যে অহরহ লুকিয়ে থাকা, সেটা তবে কার আড়ালে হবে?

ও মন্দিরে যাবার জন্যে মিনতি করছে আমায়, আমি ওই ভয়ে যাচ্ছিনা। তবু ধর্মশালাতেই কি কম লোক আসে!

অনেক রাত করে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যায় মাধবী। বলে 'দিনের বেলা বড্ড ভীড়। রাতেই ভাল।'

রাতেও অবশ্য লোকের অভাব নেই। তবে ভীড়টা নেই।

গঙ্গার জলের উপর ঘাটের আলো পড়ে, নৌকোয় নৌকোয় মাঝিদের লালচে আলোগুলো জ্বলে, ওরা রান্না খাওয়া করছে তার আভাস পাওয়া যায়। তুচ্ছ উপকরণ তুচ্ছ রান্না তবু হয়তো পরিতৃপ্তিটা তুচ্ছ নয়।

হঠাৎ হঠাৎ এক এক সময় মনে হয় মাধবীর কী বা এমন মন্দ এই জীবন?

কী ক্ষতি হয় যদি সত্যিই মাধবী তার পূর্ব জীবন, পূর্ব পরিচয় শ্লেটের লেখার মতো নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে আবার তাতে নতুন লেখা লেখে?

যদি ওই ভালবাসায় বিহ্বল ছোটলোকটার ঘরেই বন্দী হয়ে ওই মাঝি মাল্লাদের মতো তুচ্ছ উপকরণের মধ্যে সুখ পরিতৃপ্তি খোঁজা যায়।

হায় সত্যিই যদি অতীতটা মুছে যেতো মাধবীর?

মাধবী ভাবে—শুনেছি পাগলের ভান করতে করতে নাকি পাগল হয়ে যায় কেউ কেউ। তা' আমিই বা কেন স্মৃতি-ভ্রংশের ভান করতে করতে স্মৃতিভ্রষ্ট হচ্ছিনা?

তাহলে তো সত্যিই বেঁচে যেতাম।

বীরাপদ নামের এই মানুষটার ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে পারতাম।

বীরাপদ মূর্খ হতে পারে, কিন্তু ছোটলোক ন

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আবার নিজের উপর ঘৃণায় শরীর রি রি করে আসে তার।

এসব কী আবোল তাবোল ভাবছে মাধবী?

মাধবীকে কি মাধবীর বিধাতা এই জন্যে বিষ বড়ির পরেও আবার কেরৎ দিয়েছেন!

মাধবীর এই মুহূর্মুহু মনোভাবের পরিবর্তনে সঙ্গ যেন বিশেষহারা হয়ে যায়। ভেবে পায়না কিসে ও প্রসন্ন হবে।

কিন্তু এক একদিন মাধবী এমনিই প্রসন্ন থাকে। ঘাটের একেবারে কাছাকাছি উঁচু সিড়িতে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'আচ্ছা বীরাপদ তুমি যে বলেছিলে, নিজে নিজে বই পড়তে? আর পড়না?'

ধীরাপদ কৃতার্থের গলায় বলে, 'কই আর হলো ? একবার সামন্তদা বলেছিল টুকুলে ভর্তি করে দেবে, তারপর দোকানের কাজে—তবে এখন আক্ষেপ হয়। বিদ্যেহীন মানুষ বাতিহীন মন্দিরে তুল্য। তখন যদি ভাবতাম !'

মাধবী আস্তে বলে, 'মানুষ মাত্রেরই আক্ষেপ করার আছে ধীরাপদ।'

'তা তো বটেই।'

মাধবী জ্যোৎস্না ভাসা গলার দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই যে তুমি। তুমিই কি এরপরে আক্ষেপ করবেনা, কে কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে ঘাড়ে চেপে বসলো, আমার এতো ঝামেলা বাড়ালো, এতো টাকা খরচ করালো। অথচ লাভ হল না কিছু। একা থাকলে—।'

হঠাৎ পদ্ম আত্মহারা হয়।

পদ্ম রাজকন্যার হাত চেপে ধরে। বলে, 'খবরদার আর একথা বলতে পাবে না তুমি।'

'আপনিটা' কখন খসে যায়, যে সম্বোধন অহরহ মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে তাই উচ্চারিত হয়।

কিন্তু মাধবী এই ধৃষ্টতায় রেগে ওঠেনা। মাধবীর ওই হাতে ধরা হাত ছোটলোকের স্পর্শে সঙ্কুচিত ও হয় না। মাধবী শুধু মৃদু হেসে বলে, 'কিন্তু আমার জন্যে এতো করবে কেন তুমি ? করবার তো একটা কারণ থাকা চাই ? আমি তোমার আত্মীয় নই, কিছুনা—।

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

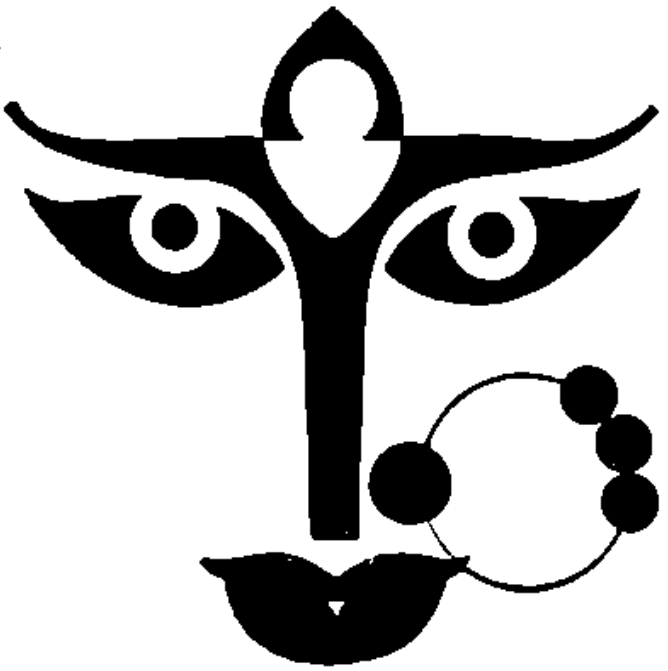

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।
প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পূজার সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ টাকার গুণিত অধিক পরিমাণ টাকাও জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পদ মূর্খ, পদর ভিতরে কোনো ভাষা নেই, তাই পদ বলে উঠতে পারেনা, 'আত্মীয় নও? তুমি যে আমার আত্মার আত্মীয় পরমাত্মীয়।'

পদর শুধু ভিতরটা আকুলি বিকুলি করে ওঠে। পদ শুধু বলতে পারে, 'আত্মীয় নও কিন্তু তুমি আমারই সমগোত্তর। তোমায় দেখেই আমার প্রথম মনে হয়েছে আমাকেও হয়তো এমনি করে কেউ রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেছলো. আমিও তোমার মতন শুধু পরমায়ু ছিল বলেই বেঁচে গেছিলাম। তারপর যবে থেকে শুনলাম তোমার পূর্বকথা সব ভুল হয়ে গেছে মনটা কেমন করে উঠলো। কেবলই মনে হতে লাগলো দেখি, দেখি।' মরা মানুষ বাঁচলে কেমন হয় দেখি, পূর্বকথা ভুলে যাওয়া মানুষ কেমন হয় দেখি। দেখা হলে বলবো, দেখো তুমি ও যা আমিও তাই। আমিও জানিনা কোথায় আমি জন্মেছি কোথায় আমার মা বাপ, তুমিও ভুলে গেছ কোথায় তুমি জন্মেছ কোথায় তোমার মা বাপ—।

মাধবী একবার সামনের গঙ্গার দিকে তাকায়, একবার দূরের আলো জ্বলা নৌকোগুলোর দিকে তাকায়। মাধবী এই অবোধ সরল প্রেম নিবেদনের কাছে মাথা নত করে।

মাধবী আর অভিনয় করতে পারেনা।

মাধবী আবছা ভাসা-ভাসা গলায় বলে, 'ভুলে যাইনি।'

ভুলে যাইনি!

ভুলে যাইনি!

এ কেমন কথা। পদ অবাক হয়ে ওই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে, 'ভুলে যাওনি?'

'না ধীরানন্দ! আমি শুধু পুলিসকে ঠকাবার জন্যে ভুলে যাওয়ার ভাণ করেছি।' মাধবী একটু নড়ে চড়ে বসে বলে, 'এতোদিন ভাবতাম কে জানে তুমি পুলিশের লোক কিনা। কিন্তু এখন আর তা ভাবিনা। তোমার কাছে সবকথা খুলে বলতে পারি। ডাক্তারকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আমি থিয়েটারের মতো স্মৃতি ভ্রংশের পার্ট মে করেছি। আমার নাম মাধবী, বর্তমানে আমাদের বাড়ি; সেখানে আমার মা বাবা ভাই সবাই আছে। আমি কলেজে পড়তাম, লেখাপড়ায় খুব ভাল মেয়ে ছিলাম।'

এরপর আর কি বলবে ভাবে মাধবী। কিন্তু ততক্ষণে পদ নামের একখানি ভালবাসায় বিহ্বল বিষণ্ণ হৃদয় যেন ভয়ানক এক অভিশাপে পাথর হয়ে গেছে।

পদ যখন ভেবে চলেছে ও আর আমি একই দুঃখে দুঃখী, ও তখন পদর সঙ্গে ভান করছে! থিয়েটার করছে!

ও বড়লোকের মেয়ে, ও কলেজে পড়া মেয়ে, ওর মা আছে, বাপ আছে, ভাই আছে। তার মানে এই দুনিয়ায় যা যা থাকবার তার সবই আছে ওর।

তার মানে পদ যখন দু'আনার জিলিপি এনে ওকে দিয়েছে, ও তখন মনে মনে হেসে খেয়েছে সে জিনিস। আর পদ যখন পানের দোকানের কথা তুলেছে?

পদর হঠাৎ ইচ্ছে হয় সামনের ওই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

পদ অজ্ঞাতসারে সরে বসে।

পদর মনের মধ্যে ব্যবধান ছিল। দূরত্বের সম্ভ্রমের। পদ ওকে বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে করতো। তবু পদ জানতো সে 'ঘর' ওর কাছে ছায়ায় বিলীন।

কিন্তু এখন একী জানলে পদ ?

এতোদিন পদ ওর নামটা জানবার জন্যে কতো ব্যাকুল হয়েছে এখন পদর কাছে সেই নামটা যেন মূল্যহীন হয়ে গেল।

মাধবী ওর কাছে বিস্তৃত হতে গিয়ে সমস্ত বিস্মৃতিও হারালো। ছোটলোক পদ অবাক হয়ে ভাবলো ওই দেবীর মতো মুখ, অথচ ভিতরে এতো কপটতা! ওর পিছনের জীবনটা আপনা থেকে এই ভেবে নিশ্চিহ্ন ছিল পদ, সেই সুখের উপর মাধবী একখানা ঘান ইট বসালো।

পদ সেই আঘাতে পাষাণ হয়ে গেল, তাই পদ পাথুরে গলায় বললো, 'তারপর ? বর্দ্ধমান থেকে ক্যালকাতলায় এনে ফেললো কে ?'

মাধবী ওর ওই গলার স্বর লক্ষ্য করলোনা। মাধবী বললো, 'এনে ফেললো আমার নিয়তি। তা ছাড়া আর কি বলবো ?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় পদই বলে ওঠে, 'তা মনেই যখন আছে পদ, ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে গেলেই হয়।'

মাধবী হাসে।

ক্ষুব্ধ বেদনাময় হাসি।

'মেয়ে মানুষ যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সে কি আর ঘরের মানুষ থাকে ধীরাপদ ?'

ধীরাপদর এ প্রশ্নের উত্তর জানবার কথা নয়। তবু ধীরাপদ যেন এই গঙ্গা এই আকাশ এই ঘাট এদের শোনাবার জন্যে তার ধারণার কথা বলে, 'তবু গিয়ে দেখলে হতো। যতোই হোক মা বাপের প্রাণ!'

মাধবী কি ছেলেমানুষ হয়ে গেল।

মাধবী কি ভুলে গেল পদ আর তার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান ? তাই যে আবার পদর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তাই বলছো ধীরাপদ ? মা বাপের প্রাণ এতর পরেও ঠিক থাকে ?'

'জানিনা।'

পদ নীরস গলায় বলে, 'মা বাপ কেমন জিনিস তা জানিনা। লোকে বলে তাই বলছি। একখানা পত্র লিখে দেখতে পারেন, যদি তাঁদের ইচ্ছে হয়, তাহলে এসে নিয়ে যাবেন। নচেৎ পত্রের জবাবই দেবেন না।'

'ধীরাপদ তোমার কতো বুদ্ধি! লেখাপড়া শিখলে তুমি—'

'ধীরাপদ উঠে দাঁড়ায়।

ধীরাপদ বলে, 'লেখাপড়ায় বুদ্ধি বাড়ে এ জ্ঞান আমার নেই। রাত হলো চলুন।'

আবার 'আপনি' দিয়ে কথা বলে পদ।

হয়তো অজ্ঞাতসারেই।

চিঠিখানা পোষ্ট করতে গিয়ে মৃণ্ময় পদ্ম একটু হার্শনিকের হাসি হাসলো। মনে মনে বললো, শুনেছি রাবণ রাজা নিজের মিত্যুবাণ নিজে যত্ন করে তুলে রেখেছিল, মৃণ্ময় পদ্ম, নিজের মিত্যুবাণ নিজেই গড়লো।

আচ্ছা দুষ্টুমী করে যদি চিঠিটা আমি ডাকবাক্সেতে না ফেলি! ভাবলো পদ্ম। এ ভাবনে না যাবা করে নেবেনা তাই এলোনা, চিঠি ছিলনা।

ব্যাস্ তা'হলে আর ভাবনা কি?

থেকে যাবে এখেনেই।

কিন্তু পদ্মর তাতে কী লাভ?

পদ্ম একটা নিঃশ্বাস ফেললো। চিঠিটা ডাক বাক্সেতে ফেলে দিল।

যে চিঠিটা লিখতে সারারাত্তির লেগেছে মাধবীর।

কিন্তু কতোটুকুই বা চিঠি!

মাকে নয় বাবাকে নয় ভাইকে।

'খোকা, আমি এখন নীচের ঠিকানায় আছি।

ইতি – দিদি।'

সুর গেছে কেটে।

তাল গেছে ভেঙে।

ইন্দ্র সভা শ্মশান হয়ে গেছে।

আর পদ্মও আবার সেই শ্মশানের পদ্ম হয়ে গেছে। যে পদ্মকে দেখে সুরাজ সামন্ত বলেছিল, 'কিসের পেয়েছে তোকে? ফুতে?'

কিন্তু এখানে পদ্মর ভাবান্তর দেখবার কেউ নেই। পদ্মর সুখ, পদ্মর দুঃখ, পদ্মর সৌভাগ্য পদ্মর সর্বনাশ সেই ঘরে বাঁচা মেয়েটা এখন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নতুন করে ঘর বাঁচার তুলাদণ্ডে তুলছে। হয় মৃত্যু নয় জীবন।

সেই 'জীবনটার' চেহারা তবু মাধবীর কল্পনার মধ্যে আছে, কিন্তু মৃত্যুটার?

জানা নেই।

চিঠিটার যদি উত্তর না আসে, মাধবী কি আবার একবার ঘুমের বড়ি খেয়ে দেখবে? না কি অন্য আর এক মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যাবে।

যদি সভ্যতা থেকে, সমাজ থেকে, আলো থেকে সরে গিয়ে বীরাপদ নামের একটা তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে জীবনটাকে কোথাও একখানে ফেলে রাখা যায়, তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলা যায়?

তবু আশ্চর্য, সেই 'মৃত্যুর' মতো জীবনের ছবিটাও বারে বারে কোথা থেকে যেন উঁকি মারে। আর সেই উঁকি মারার মধ্যে নিজের প্রতি ঘৃণা আসেনা।

চিঠিখানা যদি না লিখতো মাধবী?

হয়তো ওর মা সে চিঠিটা দেখে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে বলবে: লজ্জা করলো না। লজ্জা করলো না! বলবে, এখনো বিষ খায়নি। এখনো গলায় দড়ি দেয়নি। ছি ছি।

আর বাবা বলবে, চুপ করো চুপ করো। লোকে শুনতে পাবে।

হয়তো মা বাবা রাষ্ট্র করেছে ওদের সেই কলেজে পড়া মেয়েটা হঠাৎ কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে মারা গেছে।

তা'হলে?

'মা বাপের প্রাণ' কোন কাজে লাগবে তা'হলে?

কিন্তু মাধবীর যুদ্ধবিক্ষত চিত্তের উপর এসে পড়লো এক টুকরো স্নিগ্ধ শান্তি।

টেলিগ্রাম এলো।

'এখুনি যাচ্ছি। আসতে যাচ্ছি।'

তা'র মানে 'মা-বাপের প্রাণ' কথাটার মানে আছে। তার মানে এ যুগে সে প্রাণ স্বাধীনতার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে।

টেলিগ্রামটা যখন এসেছিল, তখন পদ্ম বাইরে ছিল।

ও আসতেই কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিল মাধবী।

'কী এ?'

বললো পদ্ম।

'টেলিগ্রাম। বর্দ্ধমান থেকে এসেছে।'

ধীরাপদ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে বললো, 'কি লেখা আছে?'

'আসছেন।'

'ওঃ!'

মাধবী অবাক হলো।

মাধবী ওর মুখে আত্মপ্রসাদের ছাপ দেখতে পেল না। কারণ মাধবী ভেবেছিল, হয়তো ধীরাপদ বলবে। দেখলেন তো? বলিনি, 'মা বাপের প্রাণ।' হয়তো বলবে, দেখলেন তো শুধু শুধু এতোদিন কষ্ট পেলেন।

তখন মাধবী বলবার সুযোগ পাবে,—কষ্ট নয় ধীরাপদ, তোমার কাছে যা যত্ন পেয়েছি তা' চিরকাল মনে থাকবে।

আরো কিছু বলবে।

কিন্তু সে সুযোগ দিল না ধীরাপদ।

অনেকক্ষণ পরে মাধবী পদ্মর কাছে এসেই বলে, 'তোমার কথাই ঠিক হলো ধীরাপদ।'

পদ্ম শুধু চোখ তুলে চাইল।

'ধীরাপদ তুমিও আমার সঙ্গে চল না?'

পদ্ম লাজুক চোখটা তুলে বলে, 'কোথায়?'

পদ্মর চোখ অমন লাজুক কেন? পদ্ম কি নেশা করেছে?

মাধবী আস্তে বলে, 'বর্দ্ধমানে। আমাদের বাড়িতে বাড়ির লোকের মতো থাকবে।'

হঠাৎ পদ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে।

পদ সুরাজ পাত্রর মতো ব্যঙ্গের গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'বাড়ির লোকের মতো? ঝিঁঝিমণির জুতো কাচতে? ঝিঁঝিমণির ঘর মুছতে? কর্তাবাবুর পা টিপতে?'

মাধবী থতমত খায়।

মাধবী কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু পদ ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

কিন্তু মাধবী কেন ওই ছোটলোকটার দুষ্টুমায় রেগে ওঠে না? মাধবী কেন ভয়ানক একটা অপরাধিনীর মত চুপ করে বসে থাকে?

তারপর মাধবী কেন হিসেব করতে বসে, ওই টেলিগ্রামের হিসেবে কখন সেই 'আসতে আলাটা' হতে পারে? ক'ঘণ্টা পরে?

সেই ঘণ্টাগুলোর মধ্যে কাশী ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না? দূরে অনেক দূরে?

কী ক্ষতি তাতে?

আর কতোখানি লাভ এক স্নেহাক্ত অতীতকে বুকে মেখে সেই অমলা নামের মালিন্যহীন মহিলাটির দয়ার ঘরে আশ্রয় নিয়ে বহু মিথ্যায় কলঙ্কিত একটা দাম্পত্য জীবন সংগ্রহ করায়? যে জীবনে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে একটা লুকোচুরির গ্লানি।

সমস্ত রাত জেগে থাকলো মাধবী।

সমস্ত রাত পায়চারি করলো।

অপেক্ষা করতে লাগলো রাত্রি শেষ হবার।

কিন্তু রাত্রি শেষ হবার আগেই যদি কেউ ঘরের তালা খুলে ঘর খালি করে চলে যায়, তাকে কে ধরবে?

তাকে গিয়ে বলতে পারবে,—চল আমরা পালাই। সমাজ থেকে সভ্যতা থেকে, ধর্ম থেকে, ভয় থেকে, শুধু ভালবাসার ঘরে।

না, তাকে আর ধরা যাবে না।

ধর্মশালায় কতো লোক আসে, কতো লোক যায়, কে জানতে যাচ্ছে তারা কোথায় যায়।

বড় জোর ধর্মশালার দারোয়ানটা বলতে পারে,—'ওই সাত নম্বর ঘরের বাংগালী বাবু? ওতো রাত থাকতে বাজে চলা গিয়া।

আচ্ছা উদ্ভ্রান্ত বীরাপদর কি হঠাৎ মনে পড়েছে তারও একটা ভালবাসার ঘর আছে!

প্রহসনের পর

সেই জয়াকরের কথা আজ আবার হঠাৎ মনে পড়ল।

মনে পড়বার কারণ অবশ্য একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ। বিয়ে যাদের হচ্ছে তারা কেউই যাকে বলে আর যৌবনের ঘরে নেই। এক রকম অবসর প্রাপ্ত জীবনই কাটাচ্ছে বলা যেতে পারে।

এখন নাম দুটো বললে কেউ চিনবেনা এমন নয়। এখনো মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের বিশেষ একটি চিত্রবিচিত্র পাতায় কখনো একের কখনো আরেকের কখনো বা এক সঙ্গে দুজনেরই নাম আরো অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

হয়তো অবশ্য এখন স্কুল পাইকা কিংবা বলা উচিত দশ পয়েন্ট।

এককালে ডবল গ্রেট না হোক গ্রেট অন্ততঃ মাঝেমাঝে দুজনেরই ভাগ্যে জুটেছে।

এখন যে দশ পয়েন্টও সব সময়ে জোটে না তা নিয়ে দুজনের কারুরই কিন্তু মাথাব্যথা বুকজ্বালা বিন্দুমাত্র নেই।

ওরা জীবনটাকে দেখতেই শিখেছে অন্যভাবে। তা না হলে এই বিয়ে করে আর বয়সকালে বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পাঠায়।

নেমন্তন্নের চিঠির নিচে ওদের নিজেদেরই সই করা নাম। আর কেই বা ওদের হয়ে নেমন্তন্ন করবে।

ছোট চিঠি।

ভাই।

আগামী শুক্রবার আমাদের বিয়ে আর সন্ধ্যায় তার প্রীতিভোজ। অতি অবশ্য আসবে।

ইতি—অতীন আর মন্দা।

অতীন আর মন্দার বিয়ের চিঠি পেয়ে জয়াকরের কথা মনে হওয়াটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে।

কোথায় অতীন আর মন্দা, আর কোথায় জয়াকর!

মন্দা না হোক অতীন এক সময়ে বেশ একটু নামকরা অভিনেতাই হয়েছিল।

পরিচালকেরা তার পেছনে একটু আধটু ছোটাছুটি করেছে। তার থাকে বলে বন্ধ অফিস ছিল।

কিন্তু জয়াকরের সে সব কিছুই নয়।

জয়াকর হল বোম্বের আর অতীন কলকাতার।

জয়াকর ফিল্ম জগতে ঢুকতে না ঢুকতেই বিদায় নিয়ে গেছে আর অতীনের এখনো নামকাটা যায় নি।

অতীন আর মন্দার জুটী কোনো কোনো পরিচালক ছবির পক্ষে পরমন্ত বলেও মনে করেন।

তবু জয়াকরের কথাটা অতীন মন্দার বিয়ের চিঠি পেয়ে মনে পড়েছে বোধহয় ওই ঘুটী বাঁধার ব্যাপারে।

অতীন একদিন ক্যামেরায় ফ্লোরেসাপ অগ্রাহ্য করে লং-শটে সাধ করে চলে গিয়েছিল প্রায় একস্টুডিয়োর ভেতর থেকে মন্দাকে টেনে আনতে।

আর জয়াকর!

তার কথাই তাহলে বলি,

জয়াকরকে এক হিন্দী ফিল্ম কোম্পানীর অফিসে প্রথম দেখি।

বোম্বাইএ সেই কোম্পানীর একটি ছবির গল্প মেরামতের কাজে প্রায়ই তখন পরিচালক ও লেখকের সঙ্গে পরামর্শ সভায় গিয়ে বসতে হত।

নামে গল্প বিচার ও সংশোধনের পরামর্শ-সভা, আসলে ফিল্মের রাজ্যের রসালো পরচর্চ্চার আড্ডাখানা। ঘণ্টায় দশমিনিট কাজ হ'ত কিনা সন্দেহ। বাকি সব সময়েই গল্প-গুজব হৈ-হুল্লোড়। কোম্পানীর কর্তাদের জানাশোনা, খাতিরের ও পেয়ারের যে কেউ যখন খুশী এসে দরজা ঠেলে এসে ঢুকত। চা-কফি পান সিগারেট যে যত চায়।

ফিল্মের রাজ্যের মানুষই বিচিত্র। তাও আবার বোম্বাই-এর। কত রকমের অদ্ভুত চরিত্র যে শুধু ওই পরামর্শ সভাতেই দেখেছি তা লিখলে ছোটখাট মহাভারত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে জয়াকর এক হিসেবে নগণ্য, তবু তার কথাও কেন আগে মনে পড়ছে এ লেখা শেষ হ'লে আশা করি বোঝাতে পারব।

জয়াকরকে প্রথম দেখে বেশ একটু সম্ভ্রম হয়েছিল। একটুর জন্যে ছবির নায়ক হওয়া যাদের হক যায় সেই ধরণের হলেও হতে পারত চেহারা। একটু স্থূলতার আভাস থাকলেও বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান। নাক-মুখ-চোখ বাগালো না হলেও চলনসই। পোষাক পরিচ্ছদে একেবারে ফিল্মির দোকানের বিজ্ঞাপন।

সে ঘরে ঢুকতেই সবাই যে রকম সসম্ভ্রমে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাতেও তাকে একটা কেউকেটা বলে ধারণা হবারই কথা।

সেটাতেই সে ধারণা একটু চিড় খেল তার গলার আওয়াজ শুনে। অমন প্রিয়দর্শন চেহারাটায় কেমন একটু বেমানান মিহিসোহের খানখেনে আওয়াজ। 'হিরো' হওয়া কেন তার কপালে নেই কিছুটা তখনই বুঝলাম। কয়েক মিনিট কথাবার্তার পরই বাকিটাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

জয়াকর এ আড্ডার সকলেরই তামাসার পাত্র। তাকে বোকা বানিয়ে মজরা করা এখানকার সকলেরই একটা মজার খেলা। জয়াকর সে উপহাসের কিছুই বোঝে না এইটেই আশ্চর্য।

বোম্বাই-এর এসব সমাবেশের ভাষা হিন্দী ইংরেজী মেশানো খিচুড়ী। জয়াকরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসবার পর সেই খিচুড়ী ভাষায় তাকে নাচানো শুরু হয়ে গেল।

আমাদের পরিচালকই পালা শুরু করলেন। গম্ভীরমুখে যেন অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বললেন, আমরা ও বড় বিপদে পড়েছি জয়াকরজি। এখন আপনিই ভরসা। আপনি একটু মেহেরবানি না করলে আমাদের ছবিই বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন কি হয়েছে কি? জয়াকরের তারিক্কি চালে জিজ্ঞাসা শুনে মনে হল এ ধরণের মুস্কিল আসান করাই তার কাজ।

পরিচালক এবার সবিস্তারে যে গল্প ফাঁদলেন তাতেই তামাসার ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ আগেই ছবির যে নায়িকার সঙ্গে পরিচালককে এই ঘর থেকে কোনে সকৌতুকে আলাপ করতে শুনেছি তাঁকে হঠাৎ কোম্পানীর ওপর রাগ বলে বর্ণনা করে পরিচালক জানালেন নায়ক পছন্দ না হওয়াই নাকি এই বিরাগের কারণ।

বুঝতেই ত পারছেন জয়াকরজি গল্প লেখক এবার তালে তাল দিলেন, নায়ক পছন্দ না হবার আসল কারণটা কি। এখুনি যদি ফোন করে জানাই যে, জয়াকরজিকেই আমরা হিরো নেব ঠিক করেছি এক সেকেণ্ডে তার রাগ জল হয়ে যাবে। কিন্তু ভুল যা হয়ে গেছে তাও আর শোধরাবার উপায় নেই।

ইঁ্যা-পরিচালক অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন এক কাঁড়ি টাকা 'হিরোকে' আগাম দেওয়া হয়ে গেছে। বাজারে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে, এখন হঠাৎ বদলাতে গেলে প্রডিউসার ডিষ্ট্রিবিউটার সবাই বেঁকে দাঁড়াবে। তাই হিরোইনকে যেমন করে হোক এই ছবিটার জন্যে অন্ততঃ এই 'হিরোর' সঙ্গে কাজ করতে রাজি করাতেই হবে। আপনি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না।

নেহাৎ নিরেট হাম্বড়া আহাম্মক না হলে জয়াকরের অমন দুর্দশা হবে কেন? এই মিথ্যে স্তাবকতাতেই সে কেঁপে ফুলে কোলা ব্যাঙ। যেন এ ধরণের অনুগ্রহ সে হামেশাই করে বেড়ায় এমনি চালের সঙ্গে জয়াকর আশ্বাস দিলে—ঘাবড়াবার কিছু নেই। যা বলবার আমি বলে দেখব্ন।

নিজে থেকে এভাবে নাক বাড়ালে তা মলে দেবার সুযোগ কেউ ছাড়ে। পরিচালক যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে বললেন, দেখব্ন বস্ জয়াকরজি! মেহেরবানি যখন করছেনই যেন আর দেরী করবেন না! 'হিরোইন'কে এখানেই ডেকে পাঠাচ্ছি। যত রাগই করুক আপনি আছেন জানলে আর না এসে পারবে না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজই মতটা করিয়ে দিন।

জয়াকরকে একটু যেন পন্ডিত মনে হল। কিন্তু নিজের জালে জড়িয়ে তার আর তখন পালাবার রাস্তা নেই।

ঘরের মধ্যেই কোন একটা ছিল। সেটা যেন খারাপ হয়েছে এই অজুহাতে গল্প লেখক বাইরে অফিস ঘরে গিয়ে অন্য কোনে কি জানিয়ে এলেন কে জানে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখলাম সত্যি ছবির নায়িকা সশরীরে এসে হাজির।

তাঁর ঘরে ঢোকার ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম তামাসার পালার ভূমিকাটা তিনি রপ্ত করেই এসেছেন। জয়াকরকে নিয়ে এধরণের রঙ্গ-রহস্যে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে নতুন নয় বলেও মনে হ'ল।

ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই তিনি চোখে-মুখে আগুনের হল্কা ছিটোলেন—কেন আপনারা মিছিমিছি আমায় আলাতন করছেন বলতে পারেন? আমি ত সাফ কথা বলে দিয়েছি যে এ ছবিতে আমি নামবনা। ইচ্ছে করলে আপনারা নালিশ করতে পারেন আমার নামে: নেহাৎ জয়াকরজির নাম করে ডেকে পাঠিয়েছেন তাই না এসে পারিনি।

নায়িকার মুখের তোড়ের সামনে সবাই যেন স্তব্ধ। পরিচালক মুখ কাঁচুমাচু করে কোনমতে যেন বলে ফেললেন,—জয়াকরজি-ই আপনাকে কিছু বলতে চান। দয়া করে যদি শোনেন।

নায়িকা এক মুহূর্তে যেন অন্য মানুষ। জয়াকরের দিকে ফিরে করুণ মিনতির সুরে বললেন,—দোহাই জয়াকরজি! আপনি এদের হয়ে কিছু বলবেন না। আপনি হয়ত জানেন না। কিন্তু আপনার কথা ঠেলবার ক্ষমতা আমার নেই।

জয়াকর নিজেই তখন নিজের ক্ষমতায় বহর দেখে বোধহয় হতভম্ব। এয়ারকুলার লাগানো ঘরেই তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

জয়াকরকে নিয়ে এ তামাসা তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলল। পরের ছবিতে জয়াকরকে নায়কের ভূমিকা দেবার প্রায় লিখিত কন্ট্রাক্ট করিয়ে নিয়ে তবে যেন নায়িকা কোন রকমে চোখকান বুজে ও ছবিটা শেষ করতে রাজী হলেন।

তামাসাটা যত না উপভোগ করেছি। জয়াকরের ওপর অনুকম্পা মিশ্রিত একটা ঘৃণা অনুভব করেছি সেদিন তার চেয়ে অনেক বেশী। লোকটা এমনি মাথামোটা আহাম্মক যে, তাকে বাঁদর নাচাবার এই অতি সস্তা জলের মত পরিষ্কার কারসাজি গুলোও ধরতে পারেনা। নিছক বুদ্ধির অভাব বুঝলে হয়ত শুধু করুণাই মনে জাগত। ঘৃণাটা তার হামবড়াই-এর জন্য। এ রকম মানুষের উপযুক্ত সাজাই হওয়া উচিত।

সেই সাজাই একদিন তার দেখলাম।

জয়াকরকে নিয়ে রং-তামাসা প্রায়ই নানারকম হয়। সেইদিনই সেটা চরমে পৌঁছোল।

আমাদের ছবির নায়িকার প্রতি তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সবাই তাকে কদিন ধরে বুঝিয়েছে যে, নায়িকার আসছে জন্মদিনে জয়াকরের একটা পার্টি দেওয়া উচিত। নায়িকা অন্ততঃ মনেমনে তারই আশায় আছে বলে হোমরাচোমরা প্রডিউসার ডিরেক্টরদের নিমন্ত্রণও নাকি প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তাকে বোঝানো হয়েছে।

জয়াকরকে বেশী প্যাস দিতে হয়নি। দুচারবার কথাটা তুলতেই সে রাজী হয়ে গেল বাহাদুরি দেখাতে।

উঠতি 'হিরোইনের' জন্মদিনের পার্টি! যেখানে-সেখানে ত দেওয়া যায় না। বোম্বাই-এর পয়লা নম্বরের একটি হোটেলের নিজস্ব বিস্তৃত একটি বারান্দায় তার আয়োজন হয়েছে। নিমন্ত্রিতের মধ্যে নায়িকা পরিচালক গল্প লেখক সুরকার গীতিকার বাদে আমার মত আরো দুচারজন।

হোটেলের বারান্দায় আমাদের জন্যে সাজান নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসে একটু অবাকই হলাম। এমনিতেই হোটেলটি বেশ বাস্তবহুল। তার ওপর ফুলের তোড়া মালা সাজসরঞ্জাম থেকে খাবার-দাবারের যে এলাহি কাণ্ড দেখলাম তা প্রায় রাজকীয়। জয়াকর সম্বন্ধে এই কদিনের মধ্যে যেটুকু জেনেছি তাতে এমন বেপরোয়া খরচ করবার মত অবস্থা তার নয় বলেই ধারণা হয়। তার নিজস্ব কোন আয় আছে কিনা জানি না, কিন্তু ফিল্মের জগতে সে প্রায় বেকারের দলেই পড়ে। তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করলেও কাজকর্ম কেউ বড় একটা তাকে দেয় না। পোশাক-আশাকে যতই ফিটফাট থাক, বোম্বাই-এর শহরতলীর এক আধা-বস্তিতে সে থাকে জানি। তার মত মানুষকে দিয়ে এধরণের আমিরী ভোজ দেওয়ানোটাই একটু নির্মম তামাসা।

সে তামাসা খানেক বাদেই অমন নির্মমতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

আমাদের দলের মধ্যে গীতিকারের একটু বেশী রসিক বলে খ্যাতি আছে। তার রসিকতাটা মুখের ভাষার বদলে হাত পায়ের আন্দোলনেই প্রকাশ পেল। প্রথম যেন অসাবধানে একটা দামী গেলাস ভাঙলেন টেবিল থেকে ফেলে। 'বয়'রা এসে সে ভাঙা গেলাসের টুকরো কুড়োতে কুড়োতেই একটা প্লেট ঝন ঝন করে মেঝের ওপর পড়ে চৌচির।

আরে করছেন কি মশাই! - আমাদের গল্প লেখকের মুখে চাপা কৌতুকের হাসি,—হোটেল যে এসব কিছুর দাম ধরে নেবে।

তা নিক্ না!—প্রীতিকার নির্বিকার—কার পার্টিতে এসেছি সে খেয়াল আছে! জয়াকরকি তুচ্ছ কটা পয়সার তোয়াক্কা করে!

আর একটা প্লেট খাবারসুদ্ধ টেনে টেবিল থেকে ছুঁড়ে ফেলে মুখচোখে মধুর আবেশ ছুটিয়ে প্রীতিকার বললেন,—কি মিষ্টি আওয়াজ বলুন ত জয়াকরকি। ভাবছি এই আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে একটা গান বাঁধব নায়িকার জন্যে। ভাঙা গেলাস প্লেট কুড়ান বন্ধ করে বয়রা তখন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জয়াকরের দিকে চেয়ে দেখলাম তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে।

টেবিলে তখন ছোঁয়াচে রোগের মত প্লেট ভিস গেলাস ফুলদানি ভাঙার তাণ্ডব সুরু হয়ে গেছে।

বন্ধুদের কেউ গিয়ে খবর দেওয়ায় স্বয়ং ম্যানেজারই এবার ছুটে এলেন। সমস্ত বারান্দাটার দিকে আর চাওয়া যায় না। সেখানে রক্তপাতটুকু বাদে যেন একটা লঙ্কা হয়ে গেছে।

রসিক প্রীতিকার ম্যানেজারকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে মধুর হেসে বললেন,—কিছু ভাববেন না ম্যানেজার সাহেব! এ পার্টি যিনি দিয়েছেন সেই জয়াকরকি রইলেন। আপনাদের যা কিছু লোকসান হয়েছে সব উনি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন। আপনাদের ঘাড়ধাক্কার আগেই আমরা হাওয়া হচ্ছি।

'হিরোইন' সমেত এক এক করে সবাই হুড়হুড় করে বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে আমিও।

হোটেলের বাইরে এসে শুধু কারুর গাড়িতে আর উঠতে পারলাম না। সবিনয়ে সকলের কাছে মাপ চেয়ে নিজেই একটা ট্যাকসি নিয়ে বাসার দিকে ফিরলাম। বাসা পর্যন্ত যাওয়া হল না। কিছুদূর গিয়ে ট্যাক্সিকে ঘুরে আবার হোটেলেই যেতে বললাম। হাসবড়া আহাম্মক জয়াকরের শেষ যে বিবর্ণ বিহ্বল চেহারা দেখে এসেছি মন থেকে তা কিছুতেই যেন মোছা যাচ্ছে না।

হোটেলের কাছাকাছি গিয়ে আবার ট্যাক্সি থামাতে হ'ল।

পোর্টিকোর নিচে যে গাড়িটি এসে দাঁড়িয়েছে সেটি আমার চেনা। যেটুকু সংশয় ছিল গাড়ি থেকে নায়িকাকে নামতে দেখেই তা দূর হয়ে গেল। জয়াকরকে হিন্দী ছবির জগতে আর কেউ তারপর দেখেনি।

নবোদিতা একজন নায়িকাকেও তার কিছুদিন পর থেকে।

দুটি ঘটনার মধ্যে কোন সংযোগ আছে কিনা জানি না।

তেসরা আষাঢ়

শৈবাল সেনগুপ্ত

আবার কবে দেখা হবে ?

যেন মেঘ মেদুর আকাশের একটানা গুমোট গুমগুম করে দূরে মন্দ্রস্বরে একটা বীণা বেজে উঠল। বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কথা বলল ত্রিদিবনাথ।

—তুমি যখনই আমাকে ডাকবে তখনই আমি তোমার পাশে আসব।

কলনিঃস্বনী নির্ঝরিনীর কুলু কুলু ধ্বনি বেজে উঠল মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরে। তার দুটি হাত তখনও ধরা পড়ে আছে ত্রিদিবনাথের শক্ত দুটি মুঠির মধ্যে।

ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য হাঁফিয়ে পড়েছে ডিসট্যান্ট্ সিগ্‌ন্যালের অপেক্ষায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত যাত্রী ঘিরে বোম্বে মেল ঢুকবে হাওড়া স্টেশনে। শেষ হবে দু'রাত্রি আর দু'দিনের দীর্ঘযাত্রা। একটা চলমান বাঁশের মতো তাদের এই ক্ষুদ্র জগৎটা এখুনি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে জল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। কে জানে সে জগৎ টিকবে তো? হয়তো চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়বে। একটা অজানা আতঙ্ক মন্দাকিনীর নারী হৃদয়ের পিছন থেকে শিরশিরিয়ে উঠল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর থেকে সব দুর্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলে সে বলল—হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপ দুটো বেঁধে নাও এখনও খোলা রয়েছে যে।

ত্রিদিবনাথ মন্দাকিনীর হাত ছেড়ে দিল। পিছন ফিরে ব্যস্ত হল স্ট্র্যাপ বাঁধার কাজে। ট্রেন ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে সুরু করেছে। মন্দাকিনীর গলা থেকে এবার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বার হয়ে এল প্রায় তার অজান্তেই—শোন।

ত্রিদিবনাথ হোল্ডঅল বাঁধা শেষ করে মুখোমুখি হল মন্দাকিনীর।—কি ? এবার দুটি হাত উঠে এল মন্দাকিনীর। যেন একটা কিছু আশ্রয় পেতে চাইছে তারা। মন্দার মুখে কথা নেই। কিন্তু হাত দুটি থর থর করে কাঁপছে আপনার অন্তরের আবেগে।

ত্রিদিবনাথ তার দু'হাত বাড়িয়ে মন্দার দুটা হাত ধরে নিল। মন্দাকিনীর দুচোখের ওপর চোখ রেখে দেখল—আষাঢ়ের নিবিড় মেঘ আলয় হয়ে জমেছে সেখানে।

•• •• •• ••

অথচ দু'দিন আগেও কেউ কাউকে জানত না, চিনত না। কেউ কারুর নাম পর্যন্ত শোনেনি। পুণাতে জন্ম আর বোম্বাই-এ মানুষ মন্দাকিনী। কলকাতার বাগবাজারের বিখ্যাত মুখার্জি সেনের, মুখার্জি পরিবারের

ছেলে ত্রিদিবনাথ। নেহাৎ ঘটনাক্রমেই এসে পড়েছিল বোম্বে ক্যালকাটা মেলের ফার্স্টক্লাসে একই কুপেতে। মন্দার জন্য আগে থেকেই জায়গায় বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন তার জি, আই, পি রেলের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী কাকা। বলেছিলেন—মন্দা, তুমি ঐ কুপেটাতেই যাও। ব্রহ্মের রঙ্গে একগাড়ী আমেরিকান সোলজার সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়ার চেয়ে সেইটাই ভাল। আর দেখি যদি অন্য কোন মহিলা যাত্রী একা যান তো তাঁকে ঐ কুপেটাতেই ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। নৈলে, আমি টি, টি, আই আর গার্ডকে বলেই রেখেছি কামরায় একটা বার্থ খালি রেখে দেবার জন্য।

কিন্তু ট্রেন ছাড়ার ঠিক পনের মিনিট আগেই ঝড়ের মতো স্টেশনে এল ত্রিদিবনাথ। তার বোম্বাইয়ে যেমন যাওয়া তেমনি আসা। সকালে সে এসে পৌঁছেছে বোম্বেতে। একটা জরুরী মেডিক্যাল বোর্ডের মিটিং এটেণ্ড করেছে তার মাস্টার মশাই সার্জন ললিত বাঁড়ুজ্যের প্রতিনিধি হয়ে। সন্ধ্যাবেলাতেই সে ফিরতি ট্রেন ধরতে এসেছে কলকাতা ফেরার। অনেক জরুরী কেস তার পড়ে আছে কলকাতায়। এই নিদারুণ তাড়াহুড়োর মধ্যে বার্থ রিজার্ভেশন্ মোটেই সম্ভব হয়নি। সে এসে ধরল স্টেশনে তারপ্রাপ্ত মারাঠী কেরানীটিকে। আর সেও ত্রিদিবনাথকে বোধ হয় বাঙালী বুঝে নিয়েই মন্দাকিনীর কাকাকে দেখিয়ে বলল—ওঁকে গিয়ে বলুন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নৈলে একটা সিটও পাওয়া সম্ভব নয় এ ট্রেনে। সব মিলিটারীতে ভর্তি।

অগত্যা ত্রিদিবনাথ মন্দাকিনীর কাকাকে বলল। বুঝিয়ে বলল তার বোম্বে আসার প্রয়োজন, আর ফিরে যাবার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়ও কিছুটা পেশ করল সে। কারণ ভদ্রলোক এই যুদ্ধের যুগে ভাইঝিকে এতদূরের পথ নিতান্ত একা পাঠাতে যে একটু চিন্তিত হন নি এমন নয়। আর হবেনই বা তিনি দীর্ঘদিনের প্রবাসী বাঙালী, আসলেতো বাঙালীই। ত্রিদিবনাথের সঙ্গে দুচার মিনিট আলাপ করে তার পরিচয় সংগ্রহ করে তিনি এসে বললেন ভাইঝিকে :—এই ভদ্রলোকটী যদি এক কামরায় তোর সঙ্গে যান তবে তোর কি খুব অসুবিধা হবে মন্দা? ইনি সার্জন ললিত বাঁড়ুজ্যের ছাত্র। আমাদের বন্ধু ডাক্তার কাপলওয়ালার বিশেষ বন্ধু, এসেছিলেন একটা মেডিক্যাল বোর্ডের মীটিং এটেণ্ড করতে—

মন্দাকিনী শান্ত হাসি হেসে বলেছিল—কিছুমাত্র নয়।

ট্রেন ছাড়তেই ত্রিদিবনাথ মন্দাকিনীকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগটা নিয়েছিল।—আপনি আমাকে একটা মস্ত বড় সমস্যা থেকে বাঁচালেন।

ত্রিদিবনাথের মুখে চোখে যেন কিছুটা কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল। মন্দাকিনী একবার শান্তহাস্যে তার কথাগুলি শুনে নিয়ে আগের মতো আবার জানালার বাইরে চোখ মেলে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি সে। ত্রিদিবনাথ প্রকাণ্ড চওড়া লাল রঙের বেক্সিনমোড়া বার্থটার একদিকে সসঙ্কোচে বসে পড়েছিল। অপরিচিতা মহিলার প্রতি সসম্ভ্রম সঙ্কোচ। এটা ত্রিদিবনাথের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। বার্থটার অন্যদিকে জানালার পাশে বসেছিল মন্দাকিনী বার্থের ওপর দু পা মুড়ে। যেন সমস্ত কুপেটার সম্রাজ্ঞী সে। ত্রিদিবনাথ আজ রাতের জন্য যেন আশ্রয় পেয়েছে নিতান্ত কৃপা বশেই। ত্রিদিব মন্দার মুখখানা আদপেই দেখতে পাচ্ছিল না। সেটা ফেরান ছিল বাইরের দিকে। তবু আর একবার সে কথা বলল—

দুজনে একসঙ্গে অনেকদূর পথ যাব, যদি আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলবেন।

তারপর একটু থেমে সামান্য একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

আর যে ভদ্রলোক আপনাকে তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁর নামটা ?—মজাকিনী হৈত্র। যিনি আমাকে তুলে দিয়ে গেলেন তিনি আমার কাকা, শ্রীপ্রত্যুৎনারায়ণ হৈত্র।

মিষ্টি মিনমিনে সুর থেমে উঠল মজাকিনীর গলায়। তার মুখটা তেমনি জানালার দিকে ফেরানই রইল। এদিকে ত্রিদিবনাথ ঈষৎ প্রতীক্ষামান হল ওদিক থেকে কিছুটি কোন প্রশ্নের। কিন্তু কোন প্রশ্নই উঠল না আর। একটু অপেক্ষা করে ত্রিদিবনাথ নিজের পরিচয় দিল প্রায় উপযাচক হয়ে। আমার নাম ত্রিদিবনাথ মুখার্জি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চিরে ক্যালকাটা মেল হু-হুকারে ছুটে চলল। আর মজাকিনী সেই যে জানালার বাইরে চোখ মেলে চুপচাপ বসে রইল, আর কোনো দিকে সে নড়লই কেরোল না। ত্রিদিবনাথ বুঝল মহিলাটি আলো আলাপী নয়। অথবা একমাত্র সহযাত্রী পুরুষ হওয়ার জন্যই বোধ হয় মনে মনে উনি একটু বেশী রকমে ব্রীড়া সঙ্কুচিতা। স্বভাব গম্ভীর ত্রিদিবনাথ সাধারণতঃ অপরের প্রতি খুব একটা কৌতূহলী নয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যেটুকু আলাপ তা হয়ে গেছে। যা বলবার বলেছে। তারপর যেচেটে যে আর কথা বাড়ায় নি, এতে সে বরং খুশীই হয়েছে মনে মনে। এক একটা লোক আছে কি রকম বকে। তাদের এতটুকু ভাল লাগে না তার।

—কিন্তু তবুও শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরেই একটা কি দুটো প্রশ্ন করা উচিত ছিল বুঝি মহিলাটির। ভাবল ত্রিদিবনাথ মনে মনে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ওপর দিয়ে একটা সন্দেহের ছায়া মেঘ একটুখানি ছায়া ফেলে গেল :—মহিলাটি কি সৌজন্যবোধ বর্জিত ?

পরক্ষণেই সজাগ হল ত্রিদিবনাথ। তার মনের থেকে কথাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল সে। অপরিচিতা একজন ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে বেশী কিছু চিন্তা করার মতো অসামীনতা আর কিছুই হতে পারে না।

কূপের মধ্যে প্রচণ্ড গরম হচ্ছিল। পাখার হাওয়াটাও পর্যাপ্ত বলে বোধ হচ্ছিল না। বাইরে থেকে যে পরিমাণ হাওয়া আসছিল তা ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত পৌঁচচ্ছিল না। কেমন যেন হাঁসফাঁস করা অ্যাপ্‌সা অমোট আবহাওয়া। তাই দেখে উঠছিল ত্রিদিবনাথ। সে ওঠে তার স্যাটকেসটাই, সব খুলে হাল্কা হল। এবার সে একটু আরাম করে বসে সুটকেসের ভিতর থেকে মেডিক্যাল জার্নাল কয়েকখানা বার করে নিয়ে তাদের মধ্যে ডুবে গেল।

কল্যাণ আসতেই সে কামরা ছেড়ে রেস্তোরাঁ কারে খেতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। এবং সৌজন্য-বোধেই সহ যাত্রিনীকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার খাবার ব্যবস্থা আছে তো ?

অস্পষ্ট স্বরে ওদিক থেকে আওয়াজ এল—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ডান দিকে একটু হেলে গেল। মুখ কিন্তু যেমন বাইরের দিকে ফেরান ছিল তেমনি রয়ে গেল। ত্রিদিবনাথ বলে গেল—ইগাংসুহীতে আমি ফিরে আসব। আপনি দরজা বন্ধ-করে রাখুন।

কামরায় ফিরে এসে দরজায় একটু ঠেলা দিতেই সেটা আপনি খুলে গেল। কামরার স্বল্প আলোতে ত্রিদিবনাথ দেখল মজাকিনী যেমন জানালার ধারে বাইরে চোখ মেলে বসে ছিল, ঠিক তেমনি বসে আছে। তার প্রকাণ্ড বড় খোঁপাটা নজরে পড়ল ত্রিদিবনাথের। খোঁপা ঘিরে রয়েছে একটা বেল ফুলের মালা। তার সুগন্ধে সারা কামরাটা ভেসে যাচ্ছে। বোধ হয় মাঝখানের কোন স্টেশনে কিনে থাকবে মালাটা,—মনে মনে ভাবল ত্রিদিবনাথ।

কিন্তু তারপর আর ভাববার অবসর নেই। এখুনি মেডিক্যাল জার্নালগুলো থেকে দরকারী পয়েন্টগুলো

টুকে নিতে হবে। পরের আর্টিকেলটার সমস্ত গুরুত্ব নির্ভর করবে এই পয়েন্টগুলোর ওপর। ট্রেনের কামরায় এই যে নিরবিচ্ছিন্ন সময়টুকু, সেটার ভালভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে।—না হলে কলকাতায় ফিরে গেলেই তো আবার সেই উদারাম্ভ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার। আর মাঝে মাঝে কড়া কাজের মানুষ বাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কেস নিয়ে আলোচনা। সেও একবার সুরু হলে বেশ কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা নিশ্চিন্তি। সময় তার নেই। এম্, এস্, এর পরীক্ষাটা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত তার দম ফেলবার অবকাশটুকু নেই। আপাততঃ এই ট্রেনের কামরার কাজটুকু এগিয়ে রাখা যাক।

সে জানালাগুলো আর নোট বই নিয়ে ওপরের বার্থের ওপর চড়ে বসল। মাঝে একবার বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হল বটে, একজন মহিলার সঙ্গে সে জীবনে এই প্রথম রাত্রি যাপন করছে। একেবারে একলা, সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই বিছানা বিছিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, মাথার ওপর বেড সুইচ জ্বালিয়ে কাজ সুরু করে দিল ত্রিদিবনাথ। মাঝে কি মনে হতে মুখ বাড়িয়ে বলল—আপনার যখন খুশী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বেন। ইচ্ছে হলে বড় আলো জ্বালিয়েও রাখতে পারেন, না হলে নিভিয়ে দেবেন। যেমন খুশী আপনার। কোন ভয় করবেন না।

ট্রেন তখন ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে বাইরে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে। মন্দাকিনী চোখ মেলে বসে আছে সেই অন্ধকারের মধ্যে। মন্দাকিনীর ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস চলন্ত ট্রেনের বাইরে তাকিয়ে বসে থাকা। ট্রেনে উঠলেই, তা সে যতোদূরেই থাক না কেন, জানলার ধারে সে বসবেই। ট্রেন থেকে বাইরের দৃশ্যটাকে অদ্ভুত লাগে। চলছে তো চলছেই। পাহাড় পর্বত, অরণ্য নদী, প্রান্তর জনপদ, সব চলছে। আকাশ চলছে, পৃথিবী চলছে, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলো চলছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই চলছে। আর এই নিশুতি নিস্তব্ধ রাত্রে সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে, বাইরের চোখ মেলে সবকিছু দেখা না গেলেও, অন্তরের চোখে সবই দেখা যাচ্ছে। অনুভব করা যাচ্ছে এই গভীর আবেগটাকে। মনে হয় এ যাত্রা যেন জানা থেকে অজানায়, কূল থেকে অকূলে, আলো থেকে অন্তহীন অন্ধকারের রাজ্যে।

মন্দাকিনী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। মিলিয়ে ফেলেছিল, মিশিয়ে গিয়েছিল বাইরের অন্ধকারে ঢাকা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে। আকাশে নক্ষত্রগুলো আর দেখা যাচ্ছিল না। দারুণ ওমোট লাগছিল মাঝে মাঝে। মেঘে মেঘময় আকাশ ছেয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে সে ডুবে যাচ্ছিল অতলে, যদিও তার চোখের পাতা দুটো খোলাই ছিল। কেবল তার কানে ভেসে আসছিল গতিহীন মৃদঙ্গের নির্ঘোষ বাষ্পরথের নিরবিচ্ছিন্ন চলমান ছন্দে —গরে। তার মনেই ছিলনা সেই ট্রেনের পাশ পরিসর কামরা টুকুর কথা। মনেই ছিল না যে ওপরের বার্থে একজন যুবা, আর নীচের বার্থে সে, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, একেবারে একেলা। সে ধ্যানস্থের মতো নিবিড় নিস্তব্ধতায় চুপচাপ বসেছিল। তার ধ্যান ভঙ্গ হল ত্রিদিবনাথের কথায়। সে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে কামরার বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চুপ চাপ বসে পড়ল আগের মতো।

তখন বাইরের অন্ধকারের স্তূপ ঘরের মধ্যে ঢুকেপড়ল হুড়মুড় করে। সব কিছু ডুবে গেল, হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। ট্রেন কেবল তার বিরামহীন তাল বাজিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল লাগনের পাশে। আর বাইরের বিশ্ব প্রকৃতি থেকে একটানা এস্রাজের ছড় টানার মতো একটা সুর উঠতে লাগল—ঝিম্ ঝিম্, ঝিম্ ঝিম্, ঝিম্ ঝিম্।

•• •• •• ••

কন্তো হাত খেয়াল নেই। মাথার কাছে খোলটা দেওয়া বেত দুইটা জেলে রেখেই বই পত্রের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে ঘুমোচ্ছিল ত্রিদিবনাথ, উপুড় হয়ে ঠিক একটা ছোট্ট শিশুর মতো। চোখেতে সারাদিনের কাজের ক্লান্তি তার উপর শোধ তুলেছিল: সে তার অজানাতেই তলিয়ে গিয়েছিল গভীর ঘুমে।

ওদিকে বাইরে ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে। প্রবল প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকারের অন্তরালে নিঃসুম নিশুতি রাতে, আকাশ পৃথিবী প্লাবিত করে বৃষ্টি নেমেছে।

ওরোট গেছে কেটে। ত্রিদিবনাথের নিদ্রা তাতে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। এদিকে নীচের খোলা জানালাটা দিয়ে ঝর ঝর করে বৃষ্টির ধারা কামরার ভেতরে ঢুকতে সুরু করেছে সবেগে।

মন্দাকিনী এতক্ষণ জানালাটা বন্ধ করবার কথা ভাবেই নি। সে কুকার্ড চাহকের মতো মুখে, মাথায় সর্ব্বাঙ্গে জলের ঝাপটা মেখে নিজেকে জুড়িয়ে নিচ্ছিল। যখন জানালাটা বন্ধ করার কথা তার মনে হল তখন সে দেখল সে নীতি মতো বৃষ্টির জলে স্নান করে উঠেছে। মাথাটা যেন এইমাত্র কেউ জলে ডুবিয়ে নিয়ে এসেছে। সমস্ত ঘরটা জলে থৈ থৈ করছে জলে।

সে তাড়াতাড়ি উঠে জানালাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। পারল না। ভারী কাঠের কামরা, ভারী লোহার জানালা। কি ভাবে যে জাম হয়ে বসে গেছে তা কেউ জানে না। মন্দাকিনী শক্ত হাতে নড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু না:—

অগত্যা সে কামরার বড় আলোটা জেলে দেখল। গিয়ে দাঁড়াল ত্রিদিবনাথের খাটের পাশে। অতবড় লোকটা কিরকম ছোট্ট একটা বাচ্চার মতো ঘুমোচ্ছে। সমস্ত মুখখানায় শিশুর অবাধিত সারল্য। আহা বেচারা! নিশ্চই বড় ক্লান্ত। ভাবল মন্দাকিনী। তার ভিতরটাও এবার ভিজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মুখ মনের চোখের সামনে এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভেসে উঠল। তীব্র উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ মুখ তীক্ষ্ণ চোখ—বিনু নারায়ণ ভিড়ে। চিৎপাবন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও এই রকম পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ত। জেগে থাকলে বিনু ছিল ঝক ঝকে খাপ খোলা তলোয়ার। ঘুমোলে তাকে এত সুন্দর কখনও দেখাত না। ডেরিয়ার তৈরী করতে গিয়ে মন্দাকিনীর অন্তরে গভীরতাটুকুর কোন মূল্য সে দিল না। প্রেমের চেয়ে বড় হল তার কাছে অর্থ, চাকুরী, পদমর্য্যাদা। থাক জীবনের সে অধ্যায় অনেককাল শেষ হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস অজানাতেই মন্দাকিনীর বুকচিরে বার হয়ে এল। সে ত্রিদিবনাথকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তীক্ষ্ণ শরের মতো এক ঝাঁক বৃষ্টি সগর্জ্জনে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সচেতন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার বন্ধ বদন করে ফেলল। ডাক দিল—ভট্টর মুখার্জি। ভট্টর মুখার্জি।

ও ডাকে জাগবার মতো ঘুম ত্রিদিবনাথের নয়। বিশেষতঃ সারাদিনের প্রচুর ক্লান্তি আর ওরোট পরিশ্রমের পর। অগত্যা মন্দাকিনী তার সব লাজ-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে ত্রিদিবনাথের অঙ্গস্পর্শ করে নাড়া দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল ত্রিদিবনাথ। ঘুম জড়ান ছোট ছোট চোখ দুটো পিট পিট করতে করতে মন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

পরক্ষণেই তার ঘুমের সমস্ত জড়িমা কেটে গেল। বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল—একি? আপনি এত রাত অবধি জেগে আছেন? ঘুমোন নি? ব্যাপার কি?

মন্দাকিনী নিতান্ত অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে জবাব দিল—ঘরে বৃষ্টির জল ঢুকে সব ভেসে গেছে। জানালাটা আমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি নে।

ত্রিদিবনাথ লাফিয়ে নেমে পড়ল নীচে। ত্রিপিং স্যুটের হাতগুটিয়ে এগিয়ে গেল জানালাটার দিকে। ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। সেই মেয়েটা জাপটে ধরল জানালাটার সঙ্গে। সোটা কতক বড় বড় ঝাঁকি দিতেই জানালাটা এক সময়ে কপাট করে নীচে নেমে এল। ততক্ষণ ত্রিদিবনাথের সুখ চোখ ভিজে গেছে বৃষ্টির ঝাপটে। তার চোখ থেকে ঘুমের শেষ রেশ টুকুও ঘুরে নিঃশেষ হয়ে গেছে তার সঙ্গে।

মন্দাকিনী ইতিমধ্যে তোয়ালে দিয়ে মুছে নীচের বার্থটা কিছুটা বসবার উপযোগী করে ফেলেছিল। ত্রিদিবনাথ হাসতে হাসতে এসে তার উপর বসে পড়ল। মন্দাকিনী এসে তার সামনে দাঁড়াল।

—আপনার হাত কেটে যায়নি তো?

জিজ্ঞাসা করে মন্দাকিনী।

—না, তবে জানালাটা বেশ কড়া ধরেই বসে ছিল।

হাত দুটোকে বিস্তার করে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বলল ত্রিদিবনাথ। মন্দাকিনী দেখল শাল প্রাংশু মহাভুজ না হলেও সে হাতের হাড় রীতিমতোই চওড়া, যেন তামা লোহা পিটে তৈরী। আর হাতের চ্যাটাল চেটো দুটোর ওপরে মোটা লম্বা আঙুলগুলো যেন লোহার শক্ত শাঁড়াশী।

ত্রিদিবনাথ এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মন্দাকিনী এবার অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে ত্রিদিবনাথকে দেখতে লাগল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাড়ে মাসে একটা রীতিমতো শক্ত শরীর, লম্বায় প্রায় ছ'ফিটের কাছাকাছি। দেখলেই মনে হয় এ শরীর সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ধরে! ঈষৎ লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ বাঁকান নাক, ছোটছোট চোখ কিন্তু তাদের মনি দুটো জ্বলছে অনর্গল করে দুটো কমল হীরের টুকরোর মতো। মাথার চুল একেবারে কদম ছাঁট করে ছাঁটা। তাতে না আছে ঢেউ না আছে কেশের বাহার! নাঃ সারাটা শরীরে কোথও একটু বাহুল্য নেই, বিলাসিতা নেই। তবু সব কিছু ছাপিয়ে ত্রিদিবনাথের সারা মুখে খেলা করছে একটা অদ্ভুত তারুণ্য।

ত্রিদিবনাথও মন্দাকিনীকে ভাল করে দেখল। শ্যামাঙ্গী একটি মেয়ে। মাথায় মাঝামাঝি। চেহারাতে এমনিতে কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। তার বড় বড় ডাগর দুটি চোখে যে সুনিবিড় প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে আছে গাড়ীর নিস্তেজ আলোতেও তা ত্রিদিবনাথের নজর এড়াল না। সে বিস্মিত হল। কারণ স্ত্রীজাতির চোখে এ ধরণের গভীরতা তার কাছে ছিল একেবারেই অদৃষ্ট পূর্ব। সেই অদৃষ্টপূর্বের ছোঁয়া সরাসরি এসে লাগল ত্রিদিবনাথের অন্তরে। ত্রিদিবনাথ চোখ নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষণ কালের জন্যে। তার পর চোখ তুলে হাসতে হাসতে বলল—এঃ, এরে একেবারে জলময় করে গেছে।

মন্দাকিনীও এবার হেসে উঠল। স্মিত মুখে বলল—আমাদের বার্থ ছাঁখানা ঠিক দ্বীপের মতো মনে হচ্ছে, নয়?

ত্রিদিবনাথ আরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মন্দাকিনীর সেই হাসি ভরা মুখের দিকে। ঝকঝকে দাঁতগুলি যেন নির্মুক্ত নিটোল, যাহাই ভরা মুক্তোর গাথা মালা। প্রশান্ত মুখে স্ত্রীজাতির ঐ হাসিটুকু একটা দুর্লভ অনবদ্য সামগ্রী। না, এত সে তার এতোবড়ো জীবনের মধ্যে কখনো দেখেনি। পাছে তার চোখে এতটুকু ঘোর ফুটে ওঠে তাই ত্রিদিবনাথ তখনি সচেতন হয়ে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। গম্ভীর গলায় বলল—আপনাকে এবার ওপরের দ্বীপটাতে আশ্রয় নিতে হবে।

মন্দাকিনী সামান্য বাধা দিতে গেল— কিন্তু—

—না, আর কিন্তু নয়। আমি ডাক্তার, আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। যান উঠে পড়ুন।

কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে যেন আদেশই করল ত্রিদিবনাথ। স্বভাবসিদ্ধ শান্তস্বরে মন্দা তার প্রতিবাদ —তুলল কিন্তু ডাক্তারদেরও তো অসুখ করে থাকে।

—আমার কখনো কিছু হয় না। দেখছেন না, আমার শরীরটা।

বলতে বলতে ত্রিদিব জিনদয়া ছোট্ট শিশুর মতো সেই ভিজে বাথটাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। যেন আর কেউ তাকে এইখান থেকে টেনে তুলতে পারবে না।

মন্দাকিনী ত্রিদিবনাথের মুখের উপর তার সেই শান্ত, স্নিগ্ধ হাসিটা ছড়িয়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। ত্রিদিবনাথ একবার উঠে বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু যেন কিছু-ক্ষণ তার দু'চোখে ঘোটেই ঘুম এল না। মন্দাকিনীর সেই কোমল চোখের স্নিগ্ধ, শান্ত দৃষ্টির আবেশটা আর সেই ঝকঝকে পরিষ্কার মুক্তোর মতো সাজান দাঁতের আভা তার মনকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখে দিলে। অবশেষে সে ভাবল গভীর রাতে ঘুম ভেঙে উঠলে স্নায়ু শুশ্রূষার ক্রিয়া সাধারণতঃ দুর্বল হয়। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। তাই এবার জোর করে মন থেকে সব চিন্তা সরিয়ে সে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে মন্দাকিনীকেও যেন কিছুক্ষণ জাগিয়ে রেখে ছিল একটা অনুভূতি। ঐ বলিষ্ঠ লোকটা ঘুমোলে কি ভয়ানক অসহায় মনে হয়। মনে হয় সংসারে সব রকম জটিলতা মুক্ত সরল, সুন্দর একটী শিশু। তার নিজের অগোচরেই তার অন্তরে একটা মধুর স্নেহ রস সিঞ্চিত করে তাকে যেন খানিকটা ভিজিয়ে তুলে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ছিল সেই জেদী শিশুর মতো বাথটা আঁকড়ে পড়ে থাকা। এইটাই কি এই ব্যক্তির আসল স্বরূপ ভাবছিল মন্দাকিনী। —কিন্তু না: মনকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। —সে জোর করে মন থেকে সব ভাবনা তাড়িয়ে ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ট্রেন চলতে লাগল গুম্ গুম্ আওয়াজ তুলে তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

•• •• •• ••

কখন রাতে যে ঘুমটা তার এসেছিল তা ত্রিদিবনাথের খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙতে তার অনেক বেলা হয়ে গেল। ঘুম ভাঙল কুপের বাইরে বেয়ারার দরজাটা থাকা দিচ্ছিল। সে উঠে দরজা খুলতেই বেয়ারা সেলাম দিয়ে ব্রেকফাষ্ট এগিয়ে দিল। ত্রিদিবনাথ ঘড়ি দেখল। বেলা প্রায় ন'টার কাছাকাছি। ট্রেন কোন একটা অখ্যাত স্টেশনে থেমেছিল, এবার চলতে সুরু করল।

কিন্তু ত্রিদিবনাথের সব কিছু চিনে নিতে যেন খানিকটা সময় চলে গেল। যে পৃথিবীতে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ছিল; এ সে পৃথিবী নয়। প্রখর সূর্যের আলো, প্রচণ্ড তাপ্‌লা গরম, ভয়োট আবহাওয়া এ সবকিছু যেন ঘাড় গুঁজের ছোঁয়ায় কোথায় মিলিয়ে গেছে। আকাশে এখন পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘ চোখে ধাঁধা কাজল লাগিয়ে দিয়ে অন্তর পর্যন্ত শীতল করে দিচ্ছে। মৃদু মন্দ হাওয়া দিচ্ছে, ভিজে নরম ছোঁওয়ায় সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে। ঝির ঝির করে আস্তে আস্তে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে।

আর বাইরের প্রকৃতি। সে দিকে তাকালেই ত্রিদিবনাথের সমস্ত মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। রেল পথের দু'পাশে পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের ওপর দিয়ে ঘনশ্যাম অরণ্য দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। সারা রাত বৃষ্টি ঝরে সেই অরণ্যানীর শ্যামলিমা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

পাহাড়ের উন্নত চূড়াগুলি প্রগাঢ় নীলাভ মেঘে ঢাকা। মেঘের ঘনশ্যাম, পর্বত অরণ্যের ঘনশ্যাম, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে একটী মহান সুগম্ভীর; কিন্তু ভাবরূপ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে অজস্র চঞ্চলা ঝরণা নেমে আসছে ঝর ঝর কল কল রবে তুলে, হৈ হৈ করতে করতে।

ট্রেন খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। আর ত্রিদিবনাথ মন্ত্র মুগ্ধের মতো দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বাইরের সেই রূপ দেখছিল। ভিতরে ভিতরে তার মনটা অরণ্য শিখীর মতো পেখম মেলতে সুরু করে দিল।

—সার ব্রেক ভ্যান তৈয়ার।

—বেয়ারা ব্রেক ভ্যান সাজিয়ে গাড়ীর পা-দানি বেয়ে বার হয়ে গেল। ত্রিদিবনাথও দরজা বন্ধ করে ধীরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বার হয়ে এসে দেখল, খোলা জানালাটার পাশে একটা ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে মন্দাকিনী বাইরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল বসে আছে ঠিক আগের সন্ধ্যার মতো। কতোক্ষণ বসে আছে তা সে জানে না। জানলাটা তার মাথার কাছে ছিল বলে সে তাকে আসে দেখতেও পায়নি। ইতি মধ্যে তার স্নান সারা হয়ে গেছে। তার পিঠের উপর ভিজে কালো চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে।

—আমি প্রস্তুত।

ত্রিদিবনাথের গলা শুনে মন্দাকিনী কামরার দিকে ফিরে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিদিবনাথের অন্তরে একটা বিপর্যয় হয়ে গেল। মনে হল বাইরের ওই বর্ষা ঘন বিশ্ব প্রকৃতি এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি শ্যামা নারীর রূপ ধরে কামরায় এসে বসেছে তার মুখোমুখি। পর্বতের শিখরে যেমন ধূম্র নীল মেঘের পুঞ্জ ঢেউ খেলিয়ে নেমে এসে মিশে একাকার হয়ে গেছে সানুদেশের বনভূমির গাঢ় নীল রূপের সঙ্গে, তেমনি মন্দাকিনীর মাথার ঐ ঘন কালো কেশের রাশি চল নিয়ে নেমে এসেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে তার দেহের সানুদেশ পর্যন্ত। তার মুখে, তার সারা অঙ্গের সন্তরাস্ত ভিজে শ্যামলা রূপটি যেন সে এখনি নিয়ে এল ঐ বর্ষা-স্নাত প্রকৃতির সিক্ত শ্যামলিমা থেকে। এমনকি তার পরণের শাড়ীখানা পর্যন্ত কে যেন ঘুনে দিয়েছে আকাশের সবটুকু মেঘলা রং উজাড় করে দিয়ে। একি অদ্ভুত একত্ব। এই জন্যেই সুজলা ধরিত্রী সমস্ত জগৎজীবের জননী চিরন্তনী নারী। এই জন্যেই কি বর্ষায় তাঁর পুরাতনী দেহে নব যৌবনের সঞ্চার হয়। তার সন্তানের রূপৈশ্বর্য পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ওঠে তাঁর শ্যামল তনুকে ছাপিয়ে। সেই দেহের গভীরে মাটীর কোষে কোষে অনুপ্রবেশ করে বর্ষার জলবিন্দুরা। সিঞ্চিত করে, অভিষিক্ত করে নতুন প্রাণরসে। যৌবনবতী ধরিত্রী গুরুভন্তী হন, নব নব প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত করেন নিজেকে।

বিজ্ঞানী ত্রিদিবনাথের সারা মন কাব্যময় হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জিজ্ঞাসা এল। —তাহলে আমার সম্মুখে বসে আছে প্রকৃতির প্রতীক রূপা যে নারী তার দেহের কোষে কোষে কি নব বর্ষার রস সিঞ্চন ঘটেনি? কে জানে—?

কি যে ভাবছিল তা ত্রিদিবনাথের খেয়ালেই ছিল না। মন্দাকিনী এক পেয়ালা কফি তৈরী করে তার হাতে তুলে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলল—আপনাকে বড় আনমনো মনে হচ্ছে। রাতে ঘুম হয়েছিল তো?

ত্রিদিবনাথের মন এবার ভিতর থেকে উঠে এল। সে একটু মৃদু হেসে বলল—কি জানেন' আজকের সকালটা যেন মনে হচ্ছে একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্র করেছে। এমন বর্ষা, এমন একটা বিশেষ জায়গায় আমি বেড়াতে আমার জীবনে এই প্রথম। আর এই বর্ষা সজল শ্যামা পৃথিবীর ভুবন ভরা, সজীব রূপকে এক নারীর মধ্যে দেখলাম এই প্রথম।

বাইরে তৎক্ষণে মেঘের ওপর মেঘ জমে আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে এল। আবার বর্ষণ সুরু হয়ে গেল তীব্র বেগে। দু' একটা তীক্ষ্ণ জলের ঝাপটা ভিতরে আসতেই ত্রিদিবনাথ উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

ত্রিদিবনাথের অস্ফুট কথাগুলিতে মন্দাকিনীর মুখের শান্ত হাসিটা একটুখানির জন্য মিলিয়ে গেল।

ত্রিদিবনাথ জানালাটা বন্ধ করতে ব্যস্ত ছিল বলে সেটা টের পেল না। মন্দাকিনীর অন্তরটা অকস্মাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই তার নিজের মন তাকে আশ্বাস দিল। —না, এ চাটুকারিতা নয়। এ হল অন্তর অনুভূতির সহজ সরল সলজ্জ প্রকাশ।

মন্দাকিনীর স্বাভাবিক শান্ত সুরে, ধীরে ধীরে বলল—একটা বাংলাদেশের নবম বর্ষা নয়। মহারাষ্ট্রে একে বলে বারীশ। মারাঠা বর্ণীদের মতো এর বিক্রম।

বলতে বলতে উঠে গিয়ে অন্ধকার কামরার আলোটা জ্বেলে দিল। ত্রিদিবনাথ মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনায় কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

মন্দাকিনী বলল—এদিকে বর্ষা আমরা আসবার আগেই এসে গেছে। এই সবে নতুন বর্ষা শুরু হচ্ছে। তবে মুরুটা অন্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেক প্রবল। এবার এ অঞ্চলে বর্ষা আষাঢ়ের প্রথমেই এল। সব বছর তা হয় না।

ত্রিদিবনাথ আনমনায় জিজ্ঞাসা করল—দেশী মতে এটা কি আষাঢ় মাস? মন্দাকিনী জলজল চোখ মেলে বলল—হাঁ, আজ যে তেসরা আষাঢ়। অবশ্য কবি কালিদাসের মতে হাওয়া উচিত ছিল—আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।

ত্রিদিবনাথ মুহূর্তে উচ্ছকিত হয়ে উঠল মন্দাকিনীর সংস্কৃত উচ্চারণে। এ উচ্চারণ বাঙালীর নয়। বাঙালীরা 'শ' এর স্বস্থান উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়। 'ষ' 'স' এর তফাৎ তাদের কাছে অভিন্ন। ত্রিদিবনাথের তখুনি মনে পড়ল তার কাশীবাসী পণ্ডিত মাতামহের কথা। তাঁর কাছেই ছেলেবেলায় ত্রিদিবনাথকে বেশ কয়েক বছর পাঠ নিতে হয়েছিল ছেলেবেলায়।

—আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ বড় বিশুদ্ধ। কোথায় শিখলেন?—প্রশ্ন করল ত্রিদিবনাথ।

—আমার জন্ম পুণাতে, আমি বড় হয়েছি মধ্যপ্রদেশ আর বোম্বাইএ। সংস্কৃত পাঠ নিয়েছি স্কুল কলেজে মারাঠী পণ্ডিতের কাছে। তাদের উচ্চারণ অনেক শুদ্ধ। বাঙালীদের মতো বিকৃত নয়।—বলল মন্দাকিনী।

মন্দাকিনীর কথাগুলো সত্যি। তবু ত্রিদিবনাথের খাঁটি বাঙালী অহংকারে একটু লাগল। সে তখুনি বলল—সব বাঙালীকে দোষ দেবেন না।

বলেই জরাট, ঈষৎ কর্কশ গম্ভীর, পুরুষোচিত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি করতে লাগল—

আজ বংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করা বর্তকানাং।
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ॥
তেনাধিক্ষ ত্বয়ি বিধিবশাদ্ দূর বন্ধু গতোঽহং।
যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধ কামা॥

একটু হেসে থামল ত্রিদিবনাথ। হাসতে হাসতেই বলল—মেঘকে আজ এই নতুন বর্ষায় একটু বন্দনা করার সুযোগ পেয়ে ছাড়া গেল না।

মন্দাকিনীর টইটুম্বুর হৃদয়ে কখন যে প্লাবন নেমে এসেছিল তা সে নিজেই টের পায়নি। এবার দু'কূল ছাপিয়ে সে উছলে উঠল।—কি সুন্দর, কি চমৎকার মন্দাক্রান্তার আবৃত্তি। এ উচ্চারণকে প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু এও তো বাঙালীর নয়।

ত্রিদিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল—বাঙালীরই তবে কাশীবাসীর।

মন্দাকিনীর উচ্ছলতা অবাধ হল। বলল—জানেন কি যেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেইটাই হল

কালিদাসের মেঘদূতের যাত্রাপথ, এবং তা সে এই আষাঢ়ের প্রথমেই। আমি গতকাল ট্রেনে ওঠার থেকেই আশা করেছিলাম সেই মেঘকে দেখব বলে। এই মেঘ প্রথমে পূর্বমেঘ হয়ে চলে পুবের দিকে, এই দিকেই এখন আমাদের ট্রেন চলছে। তারপর মোড় নিয়ে খুব ধীরে উত্তরে অলকাপুরীর পথে, উত্তরমেঘ হয়ে। তার দেখা আজ পেলাম, আমরা ভাগ্যবান!

একটু থেমে ত্রিদিবনাথের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে সে এবার শান্ত কণ্ঠে বলল—কিন্তু আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন। আমি ভেবেছিলাম, আপনি একে ডাক্তার তায় সার্জন। সবরকম বাহুল্য বর্জিত একজন কাজের মানুষ, যাঁরা একটা মিনিটও বৃথা ব্যয় করেন না।

ত্রিদিবনাথের সারা মুখ হাসিতে ভরে উঠল। সে বলল—কাজ করতে আর দিল কই। আজ সকালটা আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, সব কাজ পণ্ড করার জন্য।

ট্রেনটা এসে একটা জায়গায় থেমে পড়ল। বাইরের বৃষ্টির বেগ কমে এল। জানালা উঠিয়ে দিতে দিতে ত্রিদিবনাথ বাইরে তাকিয়ে দেখল। একটা অত্যন্ত অপরিচিত জায়গা। দু'দিকে বিশাল অরণ্য। একটু দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে পর্বত শ্রেণী।

ট্রেনের আর গতি নেই। ব্যাপার দেখবার জন্য ত্রিদিবনাথ বার হয়ে পড়ল ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় করে। বাইরে আসতেই গার্ডের সঙ্গে দেখা। খবর পাওয়া গেল, কিছুদূরে পাহাড়ে ঝর্ণার দাপটে রেলের লাইনের নীচে মাটী ধসে গেছে। প্রায় ভেসে যাবার মতো অবস্থা। সেখানে কাজ চলছে। লাইন সক্ষ করে না বাঁধা অবধি ট্রেন এখানে আটকে থাকবে।

ত্রিদিবনাথ উত্তেজনা নিয়ে কুপেতে ঢুকল। বলল—নিন, এই বার আপনার পূর্বমেঘের সঙ্গে প্রাণ ভরে মিতালী করুন। ট্রেন এখন সহজে এখান থেকে নড়ছে না।

মন্দাকিনী ছেলে মানুষের মতো হুলহুলিয়ে উঠল।—সত্যি, তাহলে চলুন একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক।

গার্ডের জিম্মায় কুপেখানা রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। গার্ড বললেন—ট্রেন এখন ঘণ্টা তিনেকের আগে ছাড়ছে না, যান একটু ঘুরে আসুন। কিন্তু সাবধান জঙ্গলের খুব ভিতরে যাবেন না, ভয়ংকর শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা এখানে। আর এই বর্ষায় ওদের প্রতাপও খুব বেশী।

বৃষ্টি কখনও থামছে, কখনও ঝিরঝির করে ঝরছে। রেল লাইন থেকে এক শ' গজের মধ্যেই সুরু হয়ে গেছে জংগল। সেই বেলা অন্ধকার দিনে জংগলের ভিতরকার অন্ধকার যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। বড় বড় ঘাসের ঘন সবুজ পায়ে মাড়িয়ে ওরা দুজনে সেই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের অভ্যর্থনা জানাল এক ঝলক ভিজে বাতাসে ভেসে আসা বনৌষধির তীব্র সুগন্ধ। ভিজে মাটীর গন্ধের সঙ্গে, বন কুসুমের সুবাস মেখে সে গন্ধ হয়ে উঠেছে সুরার মতো মাদকতা পূর্ণ।

মন্দাকিনী বলল—এই গন্ধটি হল অরণ্যের নিজদেহের সুঘ্রাণ। এর তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুর গন্ধের সঙ্গে হয় না। এ হল অনবদ্য ভাবে একক।

জনহীন, নিস্তব্ধ, নিবিড় বনভূমি। কেবল ঘণ্য ঝিল্লীর নিরবিচ্ছিন্ন ঝংকারে ভরে আছে। আর মাঝে মাঝে তার টুপটাপ করে গাছের পাতার থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ত্রিদিবনাথ বলল—এ যে গহন অরণ্য। এর মধ্যে এলে মনেই হয় না যে কোনদিন আমরা সভ্য শহরে বাস করেছি।

মন্দাকিনী ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গেছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করছে একটা বিশাল প্রাচীন মহুয়া গাছের ছাওলাধরা, ভিজে কাণ্ডের প্রান্তভাগ স্পর্শকে। ত্রিদিবনাথ কাছে আসতেই গভীর আবেগের সুরে সে আত্মগত ভাবেই বলল—এই অরণ্য যে কতো প্রাচীন, তা কি কেউ জানে? পূর্বমেঘ যক্ষের বার্তা নিয়ে যখন এই অরণ্যের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল, তখন হয়তো এই বৃদ্ধ বনস্পতি তার যৌবনের শাখা বিস্তারিত করে অভিনন্দিত করেছিল সেই মেঘকে।

ত্রিদিবনাথের দিকে এবার উদ্দেশ করে সে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে লাগল—এই যে গিরিশ্রেণী এর নাম অমর কণ্টক রেঞ্জ। কালিদাসের কালে এর নাম ছিল আম্রকূট। আমার কাকার প্রচণ্ড সখ হল সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ আর প্রাচীন স্থানগুলি খুঁজে বার করা। তার সঙ্গে আমি বার কতক এ অংঞ্চলে ঘুরে গেছি। এ অংঞ্চলে শাল, সেগুন, রাজাশাল, মহুয়া সব বিশাল বিশাল বনস্পতির সঙ্গে দেখুন কি রকম অজস্র ঘুরো আমের গাছ। এই জন্যই এর নাম আম্রকূট।

ত্রিদিবনাথ অবাক হয়ে দেখল আকাশ ছোঁয়া আমগাছ গুলোতে কাঁদি কাঁদি আম ফলে রয়েছে। ততক্ষণে মন্দাকিনী নিজেই আবৃত্তি করতে সুরু করেছে মেঘদূত থেকে :

ত্বামাসার প্রশমিত বনো পপ্লবং সাধু মূর্ধা।
বন্যাভ্যধ্বশ্রম পরিগতং সানুমানাম্র কূটঃ॥

ঝির্ ঝির্ করে উচ্চগ্রামে বাজছে তার কণ্ঠস্বর। অরণ্য-গিরীর অবিশ্রান্ত ঐকতানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

ছায়োপায়ঃ পরিণত ফল শ্যোতিভিঃ কাননানৈঃ।
ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধ বেণী সবর্ণে॥

—আর ঐ দেখুন পাহাড়ের গায়ে আমের জঙ্গল।

ত্রিদিবনাথ বিস্ফারিত চোখে সেই শ্যাম সুন্দর বনের দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্ত গাছগুলোতে আম যেন সেইখানেই আকাশের ঘন মেঘকে মাটিতে টেনে নামিয়ে এনেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে অজস্র পার্বত্য ঝর্ণা, ঝাঁপিয়ে চলেছে ওপর থেকে নীচে নিদারুণ বেগে। তাদের থেকে শুরু গম্ভীর জল আছড়ানির আওয়াজ উঠে সমস্ত বনভূমি গম গম করে বাজছে।

মন্দাকিনী এবার ত্রিদিবনাথের হাত ধরে নিল। এ যেন তার নিজের ঘর বাড়ী। এখানে যেন সে আবাহন করে নিয়ে আসছে তার নব পরিচিত বন্ধুকে। বলছে এই অমরকণ্টকেরই আর এক পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ সলিলা রেবা। এই রেবার আর এক নাম নর্মদা। —রেবাং দ্রক্ষ্যু সুংপল বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা। তারপর এই মেঘকে কতো গিরি নদী বন পার হয়ে যেতে হবে। নদীর কতো বিচিত্র নাম। —বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, শিপ্রা। তাদের তীরে তীরে কতো বিচিত্র জনপদ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী। এখান থেকে সুরু করে সমস্ত ভূ-খণ্ডটা ভারতবর্ষের এক রোম্যান্টিক যুগকে আর এক রোম্যান্টিক কবিকে যুক্ত করে রেখেছে।

ত্রিদিবনাথ কথা বলছিল না। শুধুই মন্দাকিনীর কথা শুনে যাচ্ছিল। আর মন্দাকিনী কলকল করে যেন স্রোতস্বিনীর মতো বয়ে যাচ্ছিল। এখানে যেন সে চলা পেয়েছে। হঠাৎ সে কথা বলা থামিয়ে কতকগুলো গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল বলুন তো, ওগুলো কি ফুল?

ত্রিদিবনাথ দেখল বনের সেই অংশটায় আবছা অন্ধকার খান খান করে ভেঙে দিয়ে গোটাকতক ময়ূর

গাছ দুলে দুলে আলোর হাসি হাসছে। গাছগুলো খুব উঁচু নয়। মনে হচ্ছে যেন বনের জামাকে হরিচন্দন চর্চা করে দিয়েছে।

ত্রিবিষনাথ মৃদু হেসে তাকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনিই বলুন।

মন্দাকিনী শুধুনি ফিরিয়ে জবাব দিল—ওগুলো কদম্ব, নীপ। "নীপং দৃষ্টা হরিত কপিশং কৈশরৈ বর্দ্ধ রুঢ়ৈঃ—

—ওগুলো কেলি কদম্ব। ওধরে দিল ত্রিবিষনাথ। তারপর যোগ করল—আসল কদম্ব অনেক বড়। গাছও বড় ফুলও বড়। এগুলো অনেক ছোট দেখছেন না? আমাদের গ্রামের জংগলে হত। ঠাকুরদা বলতেন এর তলায় কৃষ্ণ নাকি বাঁশী বাজাতেন। বৃন্দাবনে এ ফুলের গাছ আছে প্রচুর।

—আমাকে কিছু পেড়ে দিন।

—ছোট শিশুর মতো আবদার ধরলো মন্দাকিনী।

—বেশ একটা সর্তে। দিন নয় দাও। আপনি নয় তুমি।

—বেশ আমাকে কেলি কদম্ব পেড়ে দাও।

দ্বিরুক্তি না করে বলে ফেলল মন্দাকিনী। আর দ্বিরুক্তি না করে ত্রিবিষনাথ ফুল পাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

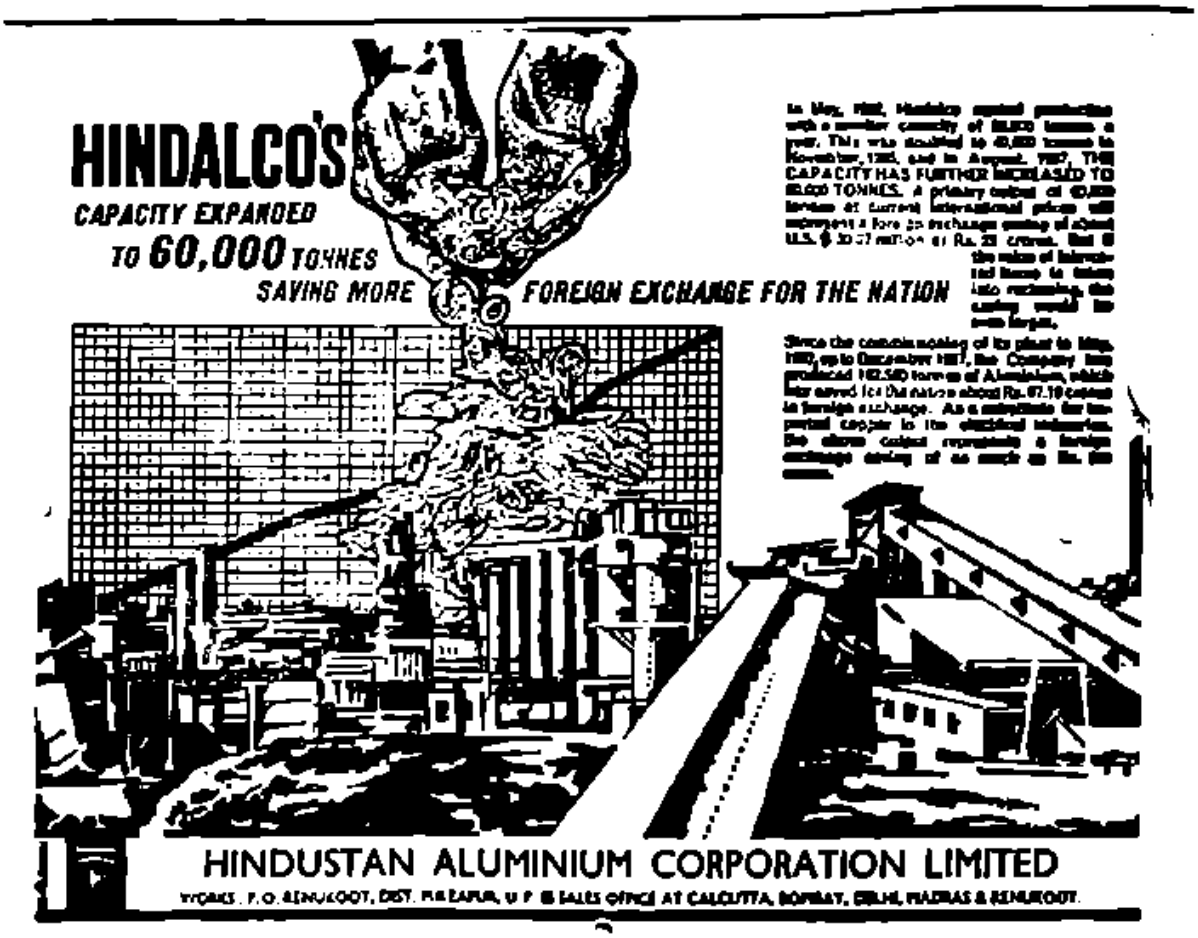

কিছুক্ষণ পরে বেশ গোটাকতক ফুলভর্তি ডাল ভেঙে এনে দিল মন্দাকিনীকে ত্রিদিবনাথ। মুখে অল্প হাসি। মন্দাকিনী তার হাত দুটো ধরে আদর করে ঝাঁকানি দিল।

এতক্ষণে তারা একটা পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই পাহাড়ের নীচেই গম্ গম্ আওয়াজ তুলে নেমে আসছিল একটা বেশ বড় ঝর্ণা। ভিজে পাথরের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে পড়ল। ত্রিদিবনাথ বলল তুমি নিতান্তই বুনো। বোম্বাই সহরে থাক কেমন করে?

মন্দাকিনী হাসিভরা মুখে বললে—বোম্বাই এ ঘরটা না থাকলেই নয়, তাইতো থাকি। সময় পেলেই পালিয়ে যাই জংগলে। আমার কাকারও এই বুনো স্বভাব। জংগল ছাড়া থাকতে পারেন না।

—কলকাতা যাচ্ছ কেন?

জিজ্ঞেস করল ত্রিদিবনাথ।

—আমি যে অফিসে কাজ করি সেটা যুদ্ধের জন্য কলকাতায় চলে গেছে। আপাততঃ আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে।

—তোমার যা স্বভাব কলকাতায় থাকতে পারবে তো?

—না পারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার বোম্বাই, কি পুণায় পালিয়ে আসব। কিন্তু আশ্চর্য হবার কথা আমারই। তুমি হলে পুরো সহরে মানুষ, ডাক্তার। তুমি কি করে এই জঙ্গলকে ভালবেসে ফেললে?

ত্রিদিবনাথের মধ্যে কবি ত্রিদিবনাথ, দার্শনিক ত্রিদিবনাথ কথা বলে উঠল। —আমার লোনা রক্ত স্রোতে যেমন সমুদ্রের ঢেউ খেলে আছে তেমনি এই অরণ্য ছেয়ে আছে আমার সমস্ত অস্তিত্ব। সমুদ্র, পর্বত, অরণ্যকে আমি ভালবাসি। কারণ এই জগৎকে আমি ভালবেসেছি।

তারপর একটু থেমে বলল নববর্ষার এই ধরণীর ঘনশ্যামরূপ, এই মেঘ মেদুর আকাশ স্নিগ্ধ দিন, আজ বহু, বহুদিন পরে আমার কর্মক্লান্ত, চিন্তাবিভ্রান্ত স্নায়ুগুলোকে নরম শেষব স্পর্শে শান্ত করে নিয়েছে। বহুদিন পরে বর্তমানকে সরিয়ে টেনে এনেছে আমার অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো, যখন আমার নাড়ীর যোগ ছিল সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে। বর্ষার ভিজে হাওয়া আমার শরীরের কোষে কোষে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছে। আমার সৃষ্টি কল্পনাকে নতুন করে সঞ্জিবিত করে তুলেছে। আর তুমি, তুমি মন্দাকিনী কোন স্বর্গ থেকে তুমি আজ ধরে এলে আমার মনের দ্বারে। তোমাকে দেখে যুগশায় কালিদাস কেন নারী প্রেমকে 'তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা' বলে বর্ণনা করেছেন। কেনই বা তাকে "যা তত্র স্যাদ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতু" বলেছেন। আমি তোমাকে এই সমস্ত বনরাজি নীলা অরণ্য পর্বতের সঙ্গে আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের সঙ্গে বিশ্বের এই মহান শ্যামাদের সঙ্গে এক করে দেখেছি। আমি তোমার মধ্যে দেখেছি এই ধরিত্রী মাকে, যিনি সৃষ্টির সবচেয়ে আদি নারী।

ত্রিদিবনাথের কণ্ঠস্বর থর থর করে কাঁপছিল ভিতরের আবেগে। সেই আবেগের অনুরণন উঠল এবার মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে। সেও অন্তরে থর থর করে কেঁপে উঠল। আকাশে গুরু গুরু করে মেঘের দ্রুদঙ্গ বেজে উঠল। আর সেই মুহূর্তে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে উঠল একটা ময়ূরের ডাক। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর বার বার। সমস্ত গাছের পাতাগুলো যেন শিউরে উঠল সেই আওয়াজে। সেই প্রাচীন অরণ্যের মধ্যে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই গুরু গম্ভীর ধ্বনি। তারপর সেই প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজল পর্বত মালার শিখরে শিখরে। শেষে মেঘের গম্ভীর স্নিগ্ধ গম্ভীর শব্দের সঙ্গে গিয়ে মিশে একাকার হয়ে গেল।

ত্রিদিবনাথ প্রচণ্ড উল্লাসে দু'হাত আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—অপূর্ব অপূর্ব। আজ যুগশায় রবীন্দ্রনাথ

কতো বড় সত্যদ্রষ্টা। বলেই আবৃত্তি করতে লাগল—"নববর্ষাগমে গিরিপাদ মূলে সভা এটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয় কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামারমান তমাল তালীবনের উর্ধবাহু শতসহস্র শাখা প্রশাখার আন্দোলিত মর্মর মুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য ক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রাচীন বনস্পতি মণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে —দেখো মন্দাকিনী আজও আমার লাইনের পর লাইন মনে আছে। বলে তৃপ্তিতে সে মন্দাকিনীর সমস্ত দেহটা ধরে আনন্দের সঙ্গে একটা বিপুল ঝাঁকনি দিল। সেই ঝাঁকনি খেয়ে মন্দাকিনীর মনে হল তার অন্তরের সুগভীর অন্ধকার গহ্বর থেকে যেন আর একটা কবরাবিত প্রাণ মুক্তোখিতের মতো উঠে এল। ত্রিদিবনাথের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এই কেকারবের, এই কাংস্য ক্রেংকার ধ্বনির যেন একটা পরম সাদৃশ্য রয়েছে। সে চোখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। সে তার হৃদয়ের মধ্যে একটা প্রচণ্ড মত্ততার আলোড়নকে সংযত করে নেবার জন্য যেন প্রাণপণে প্রচেষ্টা করতে লাগল। ত্রিদিবনাথ তার হাত ধরেই বুঝল মন্দাকিনীর সারা শরীর তখন বাতাসের মুখে পত্রের মতো থিরথির করে কাঁপছে।

—চল আমরা ফিরি। আকাশের মেঘ বড় ঘন হয়ে আসছে। জোরে জল আসছে।

ত্রিদিবনাথ অত্যন্ত নরম সুরে প্রায় বাতাসের ফিসফিসানীর মতো মন্দাকিনীর কানে কানে বলল।

মন্দাকিনী বলল—চল। কিন্তু তার আগে একটু দাঁড়াও। আমি তোমাকে প্রণাম করব।

বলতে বলতে ত্রিদিবনাথের পায়ের কাছে নত হল মন্দাকিনী। ত্রিদিবনাথ তাকে দু হাতে ধরে তুলতেই সে বললে—আজ দিনটা আমার জীবনে বড় স্মরণীয় দিন। আজ তেসরা আষাঢ় আমার জন্মদিন। আর আজই তুমি আমার জীবনে এলে। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, সে তুমিই আমাকে দিলে।

ত্রিদিবনাথ বলল—আশীর্বাদ করি মন্দা তুমি সুখী হও।

মন্দাকিনী ম্লান হেসে বলল—উঁ হুঁ। তা হয় না। আষাঢ়ের প্রথমে যারা জন্মায় তারা জীবনে ভালবেসে সুখী হয় না, জানো কি? জ্যোতিষ এ কথা বলে।

•• •• •• ••

আজ তেসরা আষাঢ়। আজও তেমনি কলকাতার সারা আকাশ জুড়ে মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এখন তখন বৃষ্টি ঝরছে মুষলধারায়! ডাক্তার ত্রিদিবনাথ মুখার্জী তার লেক রোডের বাড়ীর চার তলার বারান্দায় আড় হয়ে শুয়ে আছেন। ইজিচেয়ারে—বুচোখ তাঁর বোজা। নাম, যশ, অর্থ, এই জীবনে পেয়েছিল প্রচুর। পেয়েছেন সুগৃহিণী স্ত্রী, কৃতবিদ্য পুত্র কন্যাদের; তাঁর সংসার সুখসুখে।

তবু আজ মনে হচ্ছে জীবনটা যেন বড় ফাঁকা, বড় নিঃসঙ্গ। বার বার তাঁর মনে পড়ছে সেই গিরিপাদমূলে প্রাচীন অরণ্য সেই নববর্ষা সমাগম, সেই ধরিত্রীর মতো শ্যামা সুদন্তি একটি নারী, পরণে তার মেখলা রংএ শাড়ী। তার জন্মদিন ছিল এই তেসরা আষাঢ়। তেসরা আষাঢ়কে কিছুতেই ভুলতে পারেন না ত্রিদিবনাথ।

সেই মেয়েটির শেষ কথা ছিল—তুমি আমাকে যখনই ডাকবে আমি আসব।

কিন্তু এম্, এস ডিগ্রী লাভ, ইউরোপ আমেরিকাতে স্কলারশিপ নিয়ে যাওয়া; ফিরে এসে প্রাকৃটিস লাজিয়ে বসা এসবের মাঝখানে তাকে তাঁর আর ডাকাই হয়ে ওঠেনি। সেই অরণ্যের আমেজ এই সভ্য সহরের চোখ ধাঁধানি আলোয় মন থেকে সরে গিয়েছিল। তবুও-তার মনে নিত্য যাওয়া আসা, পরণে মেখলা শাড়ী, ছায়ায় মেদুর।—বাদলা এলেই তাকে মনে পড়ে।

———

মেয়ে কেরাণী

এখন আর অফিস থেকে ফিরতে রাত হলে, বাবা, মা কিছু বলেন না, বরং মনে মনে খুশি হন এই ভেবে যে পয়লা মাসে মাইনের টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত আরো কিছু এনে অনীমা তাদের হাতে তুলে দেবে।

প্রথম প্রথম লোক্যাল ট্রেনটা হুইসিল্ বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে যাবার পর মিনিট পনেরোর মধ্যে অনীমার চটির শব্দ রান্নাঘরের পিছনের রাস্তায় শুনতে না পেলে, একটা অজানা আতঙ্ক ও উদ্বেগ মায়ের মনের কোণে উঁকি মারতো, চেপে রাখলেও হয়ত কোন তরকারিতে দু'বার নুন দিয়ে ফেলতেন, কিংবা কোনটায় একেবারে দিতে ভুল হয়ে যেতো।

রান্নাঘরের পশ্চিমের ছোট্ট জানালাটার কাছে গিয়ে তিনি বারে বারে দাঁড়াতেন। বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে কেবল তাকাতেন দূরে, তন্তুপুকুরের পাড় ঘুরে যে সরু রাস্তাটা স্টেশনের দিকে সোজা চলে গেছে, অনীমার রঙীন শাড়ীটার কোন চিহ্ন দেখা যায় কিনা। পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার রাস্তায় দূরে দূরে আজকাল বিজলী বাতি জ্বললেও এত দূর থেকে মানুষের মুখ চেনা না গেলেও বোঝা যায় চলার পরিচিত ভঙ্গী দেখে। বিশেষ করে মায়ের চোখকে ঠকানো যায় না। ঠিকই ধরা পড়ে। এমনি কত দিন হয়েছে। তাই এর ব্যতিক্রম হলে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে শশীপদবাবুকে বলতেন, আচ্ছা মানুষ যা হোক তুমি। বলি এত রাত হয়ে গেল, এখনো কেন মেয়েটা বাড়ী ফিরছে না; তার জন্ত কি তোমার মনে এতটুকু ভাবনা চিন্তা হয় না। ওই সমস্তো মেয়ে, এখান থেকে একবার ট্রেন, একবার ট্রাম বাস বদল করে, শৈত্য শ্রীম বাদ নেই, ঝড় বাদল মাথায় করেও রোজগার করে আনছে তোমার সংসার প্রতিপালন করার জন্তে, তোমার ছেলে মেয়েদের ভাত কাপড় ও লেখাপড়া শেখানোর জন্তে।

তুমি থামো। বলে স্ত্রীর ওপর যেন ঝাঁঝমুখী হয়ে উঠতেন। তোমার মেয়ে একা এই পৃথিবীতে চাকরী করে বাপ-মা, ভাই বোনকে খাওয়াচ্ছে না। মেয়ের রোজকার দিব্যি বসে বসে খাচ্ছেন বলে যখন তখন স্ত্রী তাঁকে খোঁটা দিতেন। তাই রাগ সামলাতে না পেরে একদিন শশীপদবাবু ছেলে বেওনে জ্বলে উঠেন, তোমার মেয়ে কেবল একা চাকরী করে বাপের সংসার চালাচ্ছে না, দেখে এসো কলকাতার অফিসগুলো, হাজার হাজার মেয়ে পুরুষের পাশে বসে কলম পিষছে। তাছাড়া বাপের সংসার চালানোর মধ্যে ত কোন লজ্জার কারণ নেই। একটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, আই. এ. বি. এ. পাশ করাতে যা বাপের খরচ হয় তার চেয়ে অনেক কমে একটা ছেলে মানুষ হয়। তারও পর বাপের সম্পত্তিতে যখন ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার আইন করে দিয়েছে তখন ছেলের যেমন কর্তব্য বাপের সংসারের দায়িত্ব বহন করা মেয়েরই বা তা থাকবে না কেন? আমার ছেলেরা ছোট, ওই মেয়ে বড়। কাজেই বড় ছেলের কাজ করতে ও বাধ্য। ওর পিছনে আমি ছেলের চেয়ে বেশী খরচ করেছি। একটা মেয়েকে এই বাজারে বি. এ. পাশ করানো কি সোজা খরচ।

গৃহিণী এবার কান্নার রাগ চেপে বলেন, সে তো কোনদিন পারবো না বলেনি! সুখ বুঝে চাকরী করে ত টাকা এনে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে। তাই বলে এতরাত হয়ে গেল, আসছে না কেন, কলকাতার পথে ঘাটে কত গুণ্ডা বদমাইস তেমন কারো পাল্লায় পড়লো কিনা, একবার স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করাটাও কি তোমার উচিত নয়।

কথায় মাঝে যুক্তি আছে। তাই গৃহিণীর সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তখনি চলে যেতেন স্টেশনে এবং তারপর থেকে যে সিনিই ফিরতে দেরী হতো, ট্রেন লেট করা বা অন্য কোন কারণে কিংবা ছুটির পর দুঘণ্টা অফিসেই ওভারটাইম কাজ করতে গিয়ে বিলম্ব হলে। মোটকথা সাড়ে সাতটার লোকালে অসীমা বাড়ী না ফিরলেই স্টেশনে পা দিয়ে সে দেখতো, বাবা অপেক্ষা করছেন তার জন্যে।

অসীমাই শশাঙ্কাকে একদিন নিষেধ করে। বাবা, কেন মিছিমিছি আপনি এতকষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি কচি খুকী নই। তাছাড়া দেশের কতলোক এই ট্রেনে ফেরে। রাত হলেও পাড়ার ভেতর দিয়ে এটুকু যেতে আমার একেবারেই ভয় করে না।

তোর মাকে বলিস। আমি ত বুঝি যে মেয়ে কলকাতার সহর চষে বেড়াচ্ছে, তাকে সামলাতে যাওয়ার মত মূর্খতা আর নেই। তোর মাকে ত সব সময় বোঝাচ্ছি। ওরা এখন স্বাধীন হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে ওদের গায়ে হাত দেয় এতখানি সাহস কারো নেই। হাজার হাজার মেয়ে তাহলে এমনি করে সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারতো না। দিন নেই, দুপুর নেই, রাত নেই সব জায়গায় দেখো মেয়েছেলের দল স্কুল কলেজের কত কচি বয়সের মেয়ে।

অসীমা মাকে বুঝিয়ে রাজী করায়। বলে তুমি জেনো মা, নিজের ইচ্ছে না থাকলে কারো সাধ্য নেই, কোন মেয়ের অনিষ্ট করতে পারে।

ধীর স্থির কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে অসীমা। কোন অসন্তোষ, এতটুকু বিরক্তি কোনদিন মা বাপের বিরুদ্ধে তার মনে জাগে না। বরং বাপ মায়ের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বাবা বেশীদূর লেখাপড়া শেখেননি। অল্প মাইনের চাকরী করেও তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্যে যে কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন, সেই কথাটাই সব সময় মনে করে। সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে বাবাকে কি করে শান্তি দেবে তাই ভাবে। সে ছাড়া আরো পাঁচটি ছোট ছোট ভাই বোন। তাদের খাওয়া পরা লেখাপড়ার খরচা এ বাজারে ত কম নয়। দিনে দিনে যত বাড়ে জিনিষ পত্রের দাম, ওর দুশ্চিন্তা যেন সেই পরিমাণে বেড়ে চলে।

অফিসের সহকর্মীরা যদি কোনদিন ওকে বলে, মেট্রোয় একটা ভাল বিলিতী ছবি এসেছে, আমরা সবাই শনিবার দেখতে যাবো, তুই যাবি।

মিথ্যে একটা অজুহাত দেখিয়ে অসীমা এড়িয়ে যায়। একটাকা চল্লিশ পয়সার মাকিন মেয়ে পুরুষের বেলেল্লাগিরি দেখে যতটুকু আনন্দ পাবে, তার চেয়ে ওই পয়সায় ছোট ভাইটার জন্যে একজোড়া মোজা কি একটা পেন্সিল কিনে নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিতে পারলে অনেক বেশী আনন্দ সে পায়।

কেনটিনে নখ করে অফিস বন্ধুদের সঙ্গেও কোনদিন খেতে চায় না। এক সঙ্গে দেড়টাকা, দু'টাকা টিফিন করে উড়িয়ে দিতে তার মন সায় দেয় না কোনদিন। বাড়ী থেকে দুখানা পরটার সঙ্গে একটু আলুচচ্চড়ি টিফিন কৌটায় ভরে নিয়ে আসে, রোজ অসীমা তাই খেয়ে কেনটিনে গিয়ে শুধু এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে বার পয়সা অতিরিক্ত খরচ করে।

ফেরবার সময় ট্রামে বাসে যে দিন উঠতে পারে না, হাঁটতে হাঁটতেই লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় থেকে

বেলেঘাটা স্টেশনে চলে আসে। এতটুকু লজ্জা সে বোধ করে না। বরং ওই পেশাপেশি ভীড়ে বাস ট্রামে ওঠাটাই মেয়েদের বেশী লজ্জার কারণ বলে মনে করে সে।

বছরের পর বছর কাটে—

অসীমা স্কুলেই যায় যে সে মেয়েছেলে বিশেষ যখন পুরুষ ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মত ছাতা নিয়ে, হাতে একটা চৌকো ঘড়ি বেঁধে, কাঁধে শান্তিনিকেতন ব্যাগ কাপড়ের খোলার ভেতরে টিফিনের কৌটার সঙ্গে ছোট একটা হাত ব্যাগে মাসুলি টিকিট ট্রাম ভাড়া ও মনিব্যাগের কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে ছুটতে ছুটতে চাঁদপাহাটি লোকাল ধরে কিংবা বেলেঘাটা স্টেশনে নেমেই দ্রুত পা চালায়, প্রায় ছোটার মতই গেট থেকে বেরিয়ে যাতে ট্রামডিপোতে গিয়ে আগে ভাগে ড্যালহাউসীর ট্রামে একটা সিট অধিকার করে বসতে পারে।

পুরুষদের সঙ্গে কেবল চাকরীর ক্ষেত্রে নয়, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, সর্বত্র প্রতিযোগীতা করতে করতে অসীমার মনটা যেন কেমন রুক্ষ পৌরুষ হয়ে ওঠে।

এখনো পাড়ার দিদিমা পিসিমার দল, দুপুরে পান দোক্তা গালে দিয়ে পাড়া বেড়ানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি।

অসীমার মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে, বলা বাহুল্য গল্প মানেই পরনিন্দা, পরচর্চা, হঠাৎ কেউ মন্তব্য করে ওঠেন, হ্যাঁলা ছোটবৌ অসীমার কি বিয়ে থা দিবিনি, তোদের সংসার চাকরী করে চালাচ্ছে বলে ওর জীবনটাকে কি এমনি করে নষ্ট করে দিবি। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত সে। রূপ যৌবন সব যে ওদিকে ভাঁটা পড়ে গেল—দেখতে পাসনা কি চোখে। এই বলে আবার গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে এনে তিনি বলেন, পসী বেটা ছেলে, মেয়ে রোজগার করে খাওয়াচ্ছে বলে, না হয় তাকে পরের ঘরে পাঠাবার কথা মুখে আনে না। কিন্তু তুই মা হয়ে কি করে এত বড় পাপ কাজটি করছিস বুঝতে পারি না।

মামীর কানে সেইদিন রাত্রেই কথাটা তুললে শশীপদ জ্বলে ওঠেন রাগে। বলেন মেয়ের যেদিন খুশী বিয়ে করবে, আমিত তাকে ঘরের ভেতরে আটকে রাখিনি। খোলামাঠে ছেড়ে দিয়েছি। চরে বেড়াচ্ছে। আর কচি খুকীও নয়। বিয়ে করলেই হলো না। তার কতরকমের ঠেলা, দায়দায়িত্ব কত, প্রতিদিন চারিদিকে দেখছে তা, তাই বেঁকা ধরে গেছে, বিয়ের ওপর। এখন কেবল রোজগারটা করে বাপের কাছে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত। আর কোন ঝামেলা পোয়াতে হয় না। কিন্তু বিয়ে করলেই, নিজের সংসারে কিরকম ঝঞ্ঝাট। তার ওপর প্যাঁ প্যাঁ কতগুলো হবে। তাদের আজ রোগ, কাল ডাক্তার ডাকা, পরশু লেখাপড়া শেখাও তারপর স্কুল, মাষ্টার, পরীক্ষা কি নয়। অসীমার মত মেয়েরা তোমাদের সেকালের মেয়েদের মত বোকা নয়। ওরা লেখাপড়া শিখেছে। নিজেদের কিসে ভাল, কিসে মন্দ, তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী বোঝে! কাজেই আমি বাপ হয়ে তার ওপর জোর করে ঘাড় ধাক্কির চাপিয়ে দিতে চাই না।

সব অফিসেই মেয়ে কেরানীদের ভেতর দুটো দল থাকে। একদল যেমন পুরুষদের সুদৃষ্টি থেকে নিজেদের দূরে রাখে, নিজেরাই জোট বেঁধে টিফিন করে, গল্প করে, হাসাহাসি করে। আবার কার কতখানি অভাব অনটন, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে মনটাকে হাল্কা করে। অফিসে রোজগার করতে এসেছে, এখান থেকে বড়টাপারে ঘুরে মুছে বাড়ীতে নিয়ে যায়, একটা কানাকড়িও নষ্ট করে না। বরং কে কুদৃষ্টিতে চায়, কে কাকে গোপনে চিঠি লিখেছে, তাই নিয়ে হাসাহাসি করে।

আর একদল তেমনি, এর সম্পূর্ণ উল্টো। জীবনটাকে কেবল ছুটাছুটি করে, মুলত ট্রাম বাসে জীবন

বিপন্ন করে। ভীড়ে পিষ্ট হয়ে, বাপমায়ের সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার জন্য নয়। বাপ মা তাঁদের কৃতকর্মের ফল নিজেরা ভোগ করুন। তাঁদের সব দায় দায়িত্ব তাদের বহন করবার জন্যে বিধাতা তাদের সংসারে পাঠাননি। এটা তারা পদে পদে অনুভব করে।

ছুটির পরে কিংবা অপিস পালিয়ে তাই তারা সহকর্মী কোন পুরুষকে নিয়ে লঞ্চের কোন কাফে বা রেস্তোরাঁর পর্দার আড়ালে বসে চতুর্দিকে পেঁয়াজ রসুনের উগ্র গন্ধ বা শিককাবাব্ বা কষামাংসের পোড়া গন্ধের মধ্যে বসেও স্বর্গসুখ অনুভব করে, যাদের জীবনে যে এখনো রস আছে, রং আছে, স্বপ্ন আছে, কল্পনা আছে, খাদ্য তালিকা দেখে সব চেয়ে সস্তায় যা পাওয়া যায়। শুকনো চৌষ্ট অথবা ভেজিটেবল চপ চিবতে চিবতে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, একঘণ্টা হোক, কি দেড়ঘণ্টা হোক, যতক্ষণ দুজনের ট্যাঁকের জোর থাকে, তারা সব ভুলে গিয়ে স্বর্গ রচনা করে। পাঞ্জাবীর হোটেলের ময়লা পর্দা তোলা কাঠের পার্টিশন করা ছোট কেবিনে, পাশাপাশি দুখানা টিনের চেয়ারে বসে, প্লাসটিকের ঢাকা দেওয়া একরত্তি টেবিল সামনে রেখে।

অসীমা যে এদলে নয়, এসব মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, তা শশীপদ বাবু জানেন। মেয়েকে তিনি চেনেন ভাল করে। তার চরিত্রে কেবল দৃঢ়তা নয়, তার সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আত্মসম্মানবোধ এমনিভাবে মিলিত হয়েছে যে সগর্বে তিনি সেকথা প্রচার করে বেড়ান। বলেন, তেমন শিক্ষা তিনি মেয়েকে দেন নি। কেউ বলতে পারবে না যে অপিসে কোন পুরুষের সঙ্গে চলাচলি করে। তবু প্রথম দিকে যখন রাত হতো অসীমার অপিস থেকে ফিরতে তখন গৃহিণীর পরামর্শে দু'চার দিন গোয়েন্দাগিরি করতে ছাড়েননি। তিনিই স্বামীকে তাড়না করে ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন কলকাতায়, মেয়ে চাকরী করে খাওয়াচ্ছে বলে, আজ্ঞা মেয়ে রাত দুপুরে ফিরবে, আর পাড়ায় সেই নিয়ে চিঢি পড়ে যাবে, তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবো।

মা রাত্রে মেয়ের পাশে শুতে এসে, এক একদিন প্রশ্ন করতেন, হাঁরে সীমা তোদের অপিসে এত পুরুষ কাজ করে, তোর এই সোমত্ত বয়েস, তোকে যদি কেউ কিছু করে বসে! তুই বাড়ীতে না ফেরা পর্যন্ত আমার যেন বুকের ভেতরটা দুরদুর করতে থাকে! তুই বাপু দেরি করিসনি। ঠিক সময়ে এসে গাড়ী ধরিস!

অসীমা মাকে এই বলে সাহস দেয়। তোমার মেয়ের পায়ে চটিজুতো আছে ভুলে যেও না মা! পুরুষ জাতটা হলো নেড়িকুত্তার মত। একবার রুখে দাঁড়ালেই হলো, সেজ গুটিয়ে ছুট দেবে!

তার মানে তোর পিছনেও লেগেছিল, তাই বল? মা প্রশ্ন করেন।

অসীমার ঠোঁট ঘুমে জড়িয়ে আসে, তবু উত্তর দেয়, যেখানে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ একসঙ্গে কাজ করে, পুরুষরা ছোঁড় কথা কইবে কেন মা! তবে শক্ত মাটিতে বেড়াল আঁচড়ায় না। মনে রেখো। বলতে বলতে মায়ের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

বাস্তবিক অপিসের পুরুষরা সবাই মনে মনে শ্রদ্ধা করতো অসীমাকে। তার বেশভূষায় যেমন শালীনতা, কথায় দার্ঢ্য, আচার আচরণে তেমনি ভদ্রতা সভ্যতা। সবসময় এমন গাম্ভীর্য ও আত্মসম্মান বজায় রেখে চলে, যে অন্য মেয়েদের দেখলে যাদের মুখ চুলবুলিয়ে ওঠে, একটু কষ্টিনষ্টি, কি রঙ রসিকতা না করে পারে না। তারাই অসীমাকে দেখলে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

ওর অপিসের একটা ছোকরা দিনকয়েক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। আঠার মতো ওর পিছনে লেগে থাকতো। আসা যাওয়ার পথে ওই ভীড়ে ট্রাম বাসের ভেতরে কেমন করে, কোথা দিয়ে যে সে এসে একেবারে ওর গায়ের পাশে দাঁড়াতো, ভেবে পেতো না অসীমা। ঠিক কোন সময় কোন ট্রামে বাসে সে উঠবে, সব যেন তার কণ্ঠস্থ। গোয়েন্দার মত যেন সে ওকে অনুসরণ করে।

এক একদিন এমন বিশ্রীভাবে সে দাঁড়ায় যে ওই পেশাপেশি ভীড়ে মনে হয় যেন ওকে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে। লজ্জায় অসীমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলেও কিছু বলতে পারে না। ঠিক তার কানের পাশে কিংবা খোঁপার নীচের দিকে, ব্লাউজের ওপরে ফাঁক টুকুতে ঘাড়ের যে নিম্ন অংশ বেরিয়ে থাকে, তার ওপর সেই যুবকটি উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অফিস পর্যন্ত চলে আসে।

কিন্তু শোভনতার একটা সীমা আছে, যুবকটি সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, অসীমা রাস্তায় নেমে তাকে ডাকলে, শুনুন!

যুবকটি তার সামনে এসে দাঁড়াতে, সে বললে, আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি দিন দিন আপনি অসভ্যতার মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন! ছিঃ লজ্জা করে না? আপনার মা বোনেরা ট্রামে বাসে চড়ে না? আপনি ভদ্র লোকের ছেলে, শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট একথা ভাবলে গা ঘিনঘিন্ করে। আমাদের অফিসেই আপনি কাজ করেন, তবে অন্য ডিপার্টমেন্টে; আমি খোঁজ নিয়েছি। কাল থেকে যদি আপনাকে আবার একই ট্রামে বা বাসে উঠতে দেখি তাহলে বড়বাবুর কাছে আপনার নামে রিপোর্ট করবো মনে রাখবেন। বলেই হনহন করে চলে যায় অসীমা।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে অসীমা দেখে সরকারী হাসপাতালের লেডি ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছেন তাদের বাড়ী থেকে। আর তার বাবা তাঁর ব্যাগটা হাতে নিয়ে পিছনে পিছনে চলেছেন।

ব্যাপার কি মা? শুয়ে আছো কেন, কি হয়েছে? অসীমা যেন মনের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারে না। সে আবার প্রশ্ন করে। লেডি ডাক্তার এসেছিলেন কেন? কি হয়েছে মা তোমার?

মেয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি তেমনি নীরব হয়ে রইলেন।

অসীমাও মায়ের কোন জবাব না পেয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করে। মা জবাব দিচ্ছেন না কেন। সে তো কোন অপরাধ তাঁর কাছে করেনি! তাই এবার আস্তে আস্তে মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে, মা কি হয়েছে তোমার?

এবার দু'চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন কি হয়েছে জিজ্ঞেস করিসনি মা। আমি সেকথা মুখ দিয়ে তোর সামনে উচ্চারণ করতে পারবো না! জানিনা কি করে কি হবে! একে একের খেতে দিতে পারছি না এই দুর্দিন। মিনিমাম পত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম। বলতে গিয়ে হুহু করে চোখের জলে বুক তাঁর ভেসে যায়। একটু থেমে আবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তিনি বলেন, যে সর্বনাশের কথা শুনিয়ে গেল এখনি লেডি ডাক্তার। আমার ও বুকের রক্ত দিয়ে হবে যাচ্ছে। ভাবতে পারছি না এর ওপর আবার যদি একজন বাড়ে। তাকে কি খাওয়াবো। তোর বাপ ত একবারও সেকথা ভেবে দেখে না। মুখটা বালিশের মধ্যে গুঁজে শুয়ে রইলেন। মেয়েকে যেন সে কালা মুখ আর দেখাবেন না!

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো অসীমা, কোন কথা যেন তার মাকে বলার নেই। শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। জমাট কালো। ভয়ঙ্কর!

ইদানীং প্রায়ই বাড়ী ফিরতে 'লাষ্ট ট্রেন' হয়ে যায় অসীমার। মা ভাবেন মেয়ে বুদ্ধিমতী, সবই বোঝে। তাই 'ওভারটাইম' বেশী করে খাটছে। জানে ও যে নতুন অতিথি আসছে সংসারে: তার দায়িত্বও তো তারই ওপর।

কিন্তু মাসকাবারে হলে মাইনে এনে যখন বাপের হাতে দিলে, তখন শশীপদ বাবু খোকার মত মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, আর? 'ওভারটাইম' খাটনি যে এ মাসে এতো।

'ওভারটাইম' খেটেছি, কৈ বললে? অসীমার কণ্ঠস্বর যেন রুক্ষ শোনায়।

শশীপদ বাবু বলেন, লাষ্ট ট্রেনে ত ক'দিন বাড়ী ফিরলি দেখলুম।

ও: বলে হঠাৎ থেমে অসীমা বলে, বন্ধুদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন শশীপদ বাবু। হঠাৎ নিজেকে সংবরণ করে নিলেন।

পরের মাসে, আসল মাইনে থেকে আরো পঁচিশ টাকা কম দিল অসীমা। বললে এক সহকর্মীর বিবাহ বার্ষিকী, আর একজনের ছেলের জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে উপহার কিনতে হয়েছিল।

এর ওপর কি বলবেন মেয়েকে বুঝতে পারেন না শশীপদ বাবু। গম্ভীর মুখে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু তারপরের মাসে পঞ্চাশটা টাকা কম দিতে, তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন প্রতি মাসে এরকম কম দিলে, আমি কি করে চালাবো! তার ওপর লেডি ডাক্তার, যে সব ওষুধ খেতে দিয়েছে তোর মাকে। তার দাম দেবো কোথা থেকে

তা, আমি কি জানি! বলে ঘর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে যায় অসীমা।

স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি বলেন, তোমার মেয়ের স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়েছে। আমাকে অনেকেই বলছে। কলকাতায় একটা ছোঁড়ার সঙ্গে নাকি ঘোরাফেরা করে। সিনেমা থেকে বেরুতে একদিন ওদের দেখেছে। আবার পার্কষ্ট্রীটের রেস্তোরাঁ থেকেও বেরুতে দেখেছে কালীপদদা নাকি একদিন। তোমায় এতদিন বলিনি, পাছে দুঃখ পাও।

যাও, ওসব মিথ্যে কথা শুনতে ভালো লাগে না। গৃহিনী স্বামীকে ধমক দিয়ে ওঠেন। মেয়ে আমার তেমন নয়। তাকে আমি তোমার চেয়ে ভালো চিনি।

না-না-মিথ্যে নয়। সত্যি! তোমার মেয়েকে তুমি সাবধান করে দিও, মা বাপের মুখ পেয়ে তোমাকে নাকি! মাইনের একটি টাকাও কম দিলে আর চলবে না। উড়তে হলে এ বাড়ীতে থাকা চলবে না। বাপ পিতামহের মুখে কালি দিতে আমি দেবো না। স্পষ্ট তাকে বলে দিয়ো, রোজগার করে খাওয়াচ্ছে বলে, কি যা ইচ্ছে তাই করবে ভেবেছে? তেমন বাপ আমায় পাবনি। ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবো।

পরের দিন শশীপদবাবু স্ত্রীর ঘরে ঢুকে বলেন, বলে দিয়েছো মেয়েকে আমার কথা?

চুপ করে, কোন জবাব না দিয়ে তেমনিভাবে স্ত্রীকে নিরুত্তর থাকতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন, শশীপদবাবু কি আমার জবাব দিচ্ছো না যে? তার মানে মেয়ের সঙ্গে তোমারও গোপন 'সড়' আছে বুঝেছি। বেশ তুমি না পারো আমি বলবো। ডাক নাকি মেয়েকে। আজ কিরুক অফিস থেকে রাত্রে—

তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। যা বলার সে নিজেই আগে আমাকে বলে গেছে?

কি বলেছে?

বলেছে এ মাস থেকে আর একটা পয়সাও দিতে পারবে না। অফিসের একটি ছেলের সঙ্গে তার রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে হয়ে গেছে। এতদিন ঘরভাড়া পায়নি। ছুটির পর ঘুরে ঘুরে কেবল হয়রান হয়েছে। কালকেই ওরা বাড়ী ঠিক করে তিনমাসের আগাম ভাড়া দিয়েছে।

এঁ্যা—কি বললে। যেন শুনতে পাননি। তবু একবার ওই কথাটা মুখে উচ্চারণ করেই নির্বাক হয়ে গেলেন। নিমেষে শশীপদবাবুর চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে, মনে হয় বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে। ধপ্‌ করে পড়ে যাবেন। দেয়ালটা এক হাতে চেপে ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বাইরে গিয়েও মনে হয়, পৃথিবীতে কি কোথাও একফোঁটা আলো নেই, বাতাস নেই, সব অন্ধকার।

কিশোর যৌবন

প্রবোধ সেনগুপ্ত

টুনি মাসী আমার মায়ের নিজের বোন নয়। মায়ের দূর সম্পর্কের এক বোন। ছোটবেলা থেকে মা-বাপ হারিয়ে আমার মায়ের আশ্রয়েই অতি আপনজনের মতন আছে। আমরা দু'জনে সমবয়সী।

কিন্তু টুনিমাসীকে আমি ভালবাসতুম। টুনিমাসী কি সে-কথা বুঝতো?

টুনিমাসী এখন দিব্যিসুখে স্বামী সংসার করছে! তার বাড়ী গেলে খুব আদর-যত্ন করে, হরদম খাবার কথা বলে সত্যি, কিন্তু আমার কেমন ভাল লাগে না, বেশীক্ষণ বসতেও ইচ্ছে করে না। সব চেয়ে খারাপ লাগে, তার ঐ মা কোঠাইমার মত ভিজে ভিজে গলায় খেতে বলা, বসতে বলা, থাকতে বলা! বিশ্রী যেন!

প্রথম যেবার টুনিমাসীর শ্বশুরবাড়ী যাই, দেখে তার বিয়ে হয়েছে; মাথায় সিঁদুর, কপালে টিপ, পরনে একদম সুতোর তাঁতের ডুরে শাড়ি. চান সেরে পিঠের ওপর চুল ছড়িয়ে দিয়েছে, গলার হারটা চিক্ চিক করছে, কানের দুলটা নড়ছে পিটারের বাজনার মত!

দেখে খুব ভাল, আবার খুব খারাপ লেগেছিল কেন জানি না। যারা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় তাদের চোখে যেমন সকাল বেলার রদ্দুর সয় না, তেমনি টুনিমাসীর মুখের হাসিটা আমার সয় হয়নি, খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করলুম।

টুনিমাসী হেসে বললে, সকাল বেলা পল্টুবাবুর মুখটা অমন গোমড়া কেন? উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে ওর মাথার ভেজে-জবে উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা, পরনের ডুরে শাড়ির জলজলে ডোরাগুলো দেখতে লাগলুম। ভাবলুম, বিয়ে হয়ে টুনিমাসীর খুশী যেন ধরছে না।

কাছে এসে টুনিমাসী বললে, কি ভাগ্যি সকাল বেলা পল্টুবাবুর মুখ দেখলুম! তবু ভাল, পল্টুবাবু মাসীর খোঁজ নিতে এসেছেন!

গম্ভীর গলায় বললুম, মরে গেছে আমার খোঁজ নিতে। মা বললে, তাই—টুনিমাসী হেসে সারা হয়ে গেল। যেন আমার রাগটা কিছু না, ছেলেমানুষী! আমার হাত ধরে তেমনি হেসে মাসী বললে, মা বললে আর অমনি তুমি এলে! কি বাধ্য ছেলে গো!

টুনিমাসীর হাসি যেমনি, কথাও যেমনি তীক্ষ্ণ। খুব খারাপ লাগল। কেন মাসী কি আমাকে সন্দেহ করে, মা'র কথায় আমি আসিনি? মনে করে ওর জন্যে এসেছি?

রাগ দেখিয়ে বললুম, আমার অত সময় নেই।

টুনিমাসী আর হাসলে না, শীতে সকালের কুয়াশা ঢাকা রোদের মত মুখ করে বললে, সত্যিই তো, পল্টুবাবু এখন কাজের লোক হয়েছে—ভুলেই গিয়েছিলুম।

তেমনি গম্ভীর স্বরে বললুম, মা তোমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছে—রাত্তির বেলা থাবে, থাকবে—

হঠাৎ আমার হাত ধরে টুনিমাসী হেসে বললে, কিন্তু তোমার তো রাগ হ'বে না পল্টুবাবু?

চোখ-মুখ আমার লাল হ'য়ে উঠলো, কান দুটো যেন গরম হ'য়ে গেল। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিমন্ত্রিত হয়ে আমাদের বাড়ী রাত্রি বাস করলে আমার রাগ হ'তে যাবে কেন? ওরা তো আর আমার ঘাড়ের ওপর থাকতে যাচ্ছে না।

টুনিমাসীর কথাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করলুম। কি ভেবে মাসী অমন করে বললেন? উনি কি জানেন না আমি ওকে কত ভালবাসি? ওর বিয়ের আগে এই সেদিনও এক ঘরে এক বিছানায় শুয়েছি, কত খুনসুড়ি করেছি! মা'র কত বকুনি খেয়েছি: তুই ছোঁড়া ওর পিছনে লাগিস্ কেন? কাল থেকে তোরা দুজনে আলাদা আলাদা থাকবি; দুজনকে যদি একসঙ্গে দেখি তো—

তারপর টুনিমাসীই চুপিচুপি ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আমার গলা জড়িয়ে ভাব করেছে। সমবয়সী বন্ধুর মত কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে খাবিয়ে একশা করে ছেড়েছে। শেষে নিজেই সারা দুপুর ঘরে পাখার বাতাস ক'রে ঠাণ্ডা করেছে, মা'র বকুনি আমি গায়েই মাখিনি। টুনিমাসীকে যে কি ভালবাসি, এক মিনিটও যে মাকে না দেখে থাকতে পারি না!

সে বছর সবে নেকেণ্ড ক্লাশে উঠেছি। বই খাতার নামের সঙ্গে লিখতুম (প্রি-ম্যাট্রিক। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখাটা তখনো অস্পষ্ট। কিন্তু টুনিমাসী ঠিক কখন যেন লক্ষ্য করেছে, সবাইকে জানিয়ে হেসে-হেসে বলছে, পল্টুবাবুর গোঁফ্ বেরিয়েছে যে! এঃ! লায়েক হ'য়ে গেছেন।

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। কে জানে গোঁফ বেরনটা বোধ হয় ভাল নয়। ছি-ছি, কি কাণ্ড! মাকে ডেকেও টুনিমাসী বলেছিল। মা কিছু না বলে আড়চোখে চেয়ে চলে গিয়েছিলো। টুনিমাসী এমন সংঘাতিক জানতুম না। কি এমন নতুন জিনিস যে তাই নিয়ে হৈ চৈ করতে হবে? টুনিমাসীর যদি একটু লজ্জা থাকে! গোঁফ গোঁফ করে কি কাণ্ডটা করছে।

শেষে টুনিমাসীর মুখের ওপর রেগে মেগে বললুম, আমার গোঁফ বেরিয়েছে তা তোমার কি?

টুনিমাসী সেই কেমন করে আমার মুখের দিকে চায় আর হাসে। কি যেন বিস্ময়ের আর কৌতুকের বিষয় কিশোর মুখে গোঁফের রেখা!

আর কিছু করতে না পেরে বেগে বললুম, তোমারও বেরুবে; হ্যাঁ!

টুনিমাসী হাসতে লাগল, ওর চোখ দুটো যেন বুজে যাচ্ছে। বললে, আহা, কি ছেলের বুদ্ধি! মেয়েছেলের কখনো গোঁফ বেরোয়?

রাগে দুঃখে আমার মাথার ঠিক ছিল না, বললুম, কেন বেরোবে না? নিশ্চয় বেরোবে, মেয়েছেলে বলে খাতির নাকি?

টুনিমাসী আমার কথায় একটুও বিচলিত হলো না, তেমনি চোখ জুড়নো হাসি হেসে আমার মুখটা দুহাত দিয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে গদ্ গদ্ স্বরে বললে, বেশ দেখতে লাগছে রে তোকে! কার্ত্তিকের মত কেমন গোঁফ না?

লজ্জায় মরে গেলুম। লজ্জাটা আরো প্রকট হলো রাত্তির বেলা। মা কাউকে কিছু না বলে আলাদা আলাদা ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর মাসীর সঙ্গে এক ঘরে নয়। বুঝতে পারলুম না আমার দোষটা মা কি দেখেছিলেন।

একে আতঙ্ক নেই তার এই নিষিদ্ধ ফলের মত ব্যবস্থা! চোখে ঘুম আর আসে না, বিছানা নয় যেন বালির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছি! পাশের ঘরে মা বাবা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বুক টিপ টিপের মত বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামটা কেমন শব্দ করছে, ইঁদুরের পায়ের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি? জানালার বাইরে আকাশটা আর দেখা যাচ্ছে না। টুনিমাসীও কি একা একা ঘুমচ্ছে।

কি মনে হল, বিছানা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চুপ করে দালানে খানিক অপেক্ষা করলুম। আমাদের পুরনো ঘরের সামনে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি টুনিমাসীকে ডাকবো কিনা ভাবলুম। হঠাৎ মনে হলো সারা বাড়ীটা যেন কেঁপে উঠলো। টুনিমাসী বেরিয়ে এসেই আমার হাত ধরে তার বিছানার মধ্যে নিয়ে গেল, আমার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেল; কি ভয় যে করছিল।

যেন কি অপরাধ করেছি, কতদিন টুনিমাসীর মুখের দিকে চাইতে পারিনি। কেবল মনে হয়েছে মা যদি জানতে পারেন তাঁর নিষেধ অমান্য করে সারা রাত মাসীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে ঘুমিয়েছিলুম। জানলে হয়তো ওঁদের ঘরেই আটকে রাখবেন, সোনা আর লক্ষ্মীর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে দেবেন!

এই নিয়ে টুনিমাসীকে বোধহয় মিথ্যা সন্দেহ করেছিলুম। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো দরজা জানলা বন্ধ ঘরে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। বিছানা থেকে ভয়ে ভয়ে উঠলুম। দরজার খিল খুলতেই টুনিমাসী আমাকে একেবারে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, আলোটা নিবিয়ে দিল। বিছানার মধ্যে কতক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ঘরে চুপটি করে পড়ে রইল, আমার দম যেন বন্ধ হয়ে এল।

টুনিমাসী ফিস্ ফিস্ করে বললে, গোপ বেরিয়েই বড় গণ্ডগোল করে।

তোমার জন্যেই তো। সবাইকে বললে।

না বললেও সবাই জানতো! তুই-ও জানতিস্—

কি জানতুম?

ঠোরে আমার গাল টিপে দিয়ে টুনিমাসী বললে, ন্যাকা।

আমার কি হয়েছে জানি না কি আশ্চর্য এখন! আমার সবঘরনী টুনিমাসী কিন্তু বার বার ঐ কথা বলতো মিটি মিটি হেসে হেসে, খুব লাবেক হয়েছিস্! তোর গোঁপটা বেশ কালো হয়েছে মাছির পালকের মতো!

তারপর আমার মুখটা টেনে নিয়ে কতক্ষণ নিজের গালে চেপে ধরে রাখতো আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতো। টুনিমাসী যেন আমাকে নিয়ে খেলা পেয়েছে।

তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। দুপুর বেলা টেষ্ট পরীক্ষার পড়া পড়ছি, নাইবার খাবার কথা ভুলে গেছি। কতদিন চুল ছাঁটা হয়নি, ভূতের মতো চেহারা হয়েছে। টুনিমাসী কিন্তু খুব সাহায্য করছে, চা কফি করে খাওয়াচ্ছে, যখন যেটা দরকার এনে দিচ্ছে, সব সময় কাছে কাছে আছে।

সেদিন আবার বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, চেয়ারের ওপর পা তুলে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়া মুখস্থ করছি। কোন দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ আমার ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দে চোখ তুলে দেখলুম, কোথাথেকে টুনিমাসী এসে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়েছে।

কি ব্যাপার?

...মুখে আঙুল তুলে টুনিমাসী শব্দ করতে মানা করলে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। ঠিক দুপুর বেলা টুনিমাসী আবার কি কাণ্ড করবে ভেবে ঘেমে উঠেছি।

টুনিমাসী কাছে এসে পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মত আমার গায়ের চাদরটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বললে, কি শীত কাতুরে যে তুই!

টুনিমাসী যেন রণচণ্ডী মূর্তি, মাকে বললে, বোউরা ছেলে কোথাকার; পড়ে সবাইকে একেবারে রাজা করবেন। চুল ছাঁটতে পার না? দাড়ি কাটতে পার না? লেখাপড়া আর কেউ করে না, না?

বলেই টুনিমাসী বুকের ভেতর থেকে বাবার দাড়ি কামানো সেফটি রেজার ব্লেডটা বার করে আমার ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। কিরে বাবা, ঠিক দুপুরে ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করবে নাকি একলা পেয়ে।

তারপর আমার হাত ধরে চেয়ার থেকে নামিয়ে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে গাল টিপে টিপে ক্ষুর চালাতে লাগল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলুম।

তারপর কামান হয়ে গেলে মাসী আমার মুখের সামনে একটা আয়না ধরে বললে, দেখ দেখি, কেমন দেখতে হয়েছে, সুন্দর!

লজ্জা-ভয়ে গালে হাত দিয়ে পরখ করলুম। তুলতুলে পালিশের মত গালটা চকচক করছে। টুনিমাসীর খুশী মুখের ছায়াটা আমার মুখের আয়নার যেন প্রতিফলিত: আমার গোঁফটা কিন্তু মাসী ফেলে দেয়নি। দুর্গা প্রতিমার কাঠামোর কার্তিকের মুখের গোঁফের রেখার মত মাখার করে দিয়েছে।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমার চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিয়ে বললে, আজ যদি সেলুনে গিয়ে চুল ছেঁটে না আসিস তো কাঁচি দিয়ে তোর চুল কপচে দেবো।

বলতে হয়নি, টুনিমাসী আমাকে একটাকা নগদ দিয়েছিল চুল ছাঁটতে। তারপর মা আমার ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন, যখন তখন বলতেন, তুই পড়গে যা, সব সময় এখানে কেন? (মানে টুনিমাসীর কাছে কাছে কেন?)

টুনিমাসী বলেছিল তুই বড় হয়েছিস কিনা, তাই দিদি নজর রাখছে।

কিন্তু বড় হওয়া কি অন্যায়? গুরুজনরা কি চায় না, আমরা বড় হই? কে জানে। টুনিমাসীকে কিন্তু সব সময় কাছে পেতে ইচ্ছে করতো, সব নতুন জিনিস যেন ওকে দেখাতে, বলতে ইচ্ছে করতো। ইচ্ছে করতো টুনিমাসীকে নিয়ে কোথাও চলে যাই যেখানে মা-রা কেবল পাহারা দেয় না।

টুনিমাসী কিন্তু খুব চালাক (এসব ব্যাপারে এখন বুঝতে পারি)। সব সময় মার কাছে কাছে, আমি যে একজন আছি, ভুলেই গেছে যেন! মা'র সামনে আমাকে নিয়ে রগড় করতো, সব ব্যাপারে আমার খুঁত ধরতো, অপদস্থ করতো।

খুব রাগ হ'তো। সেই কথাটা মনে হতো—মার বোন মাসী, কাদার ছেলে ঠাসি!

একদিন এমন শিক্ষা দেব মাসী বুঝতে পারবে! সব সময় পেছনে লাগা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। একদিন টুনিমাসীর বিয়েই হয়ে গেল। আমাদের বাড়ী থেকেই বিয়ে হল। একবার দেখেই মেয়ে পছন্দ হয়েছিল বলে টুনিমাসীর কি গর্ব। সব সময় সেই কথা, টুনি সুন্দরী তাই।

সুন্দর কাকে বলে? টুনিমাসী কি এমন সুন্দর! আমাকে বললে ওর হাজারটা খুঁত বার করতে পারি—তারি আমার সুন্দর! রোগা রোগা, লম্বা, কি বিশ্রী। ওর শ্বশুর বাড়ীর লোকে কি দেখে যে পছন্দ করলে কে জানে!

বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হতে টুনিমাসী যেন আনন্দে ডগমগে হয়ে গেল। ভাবটা যেন আর ক'দিন। যেন আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে, যোবণো বোনঝির খবর করে যাচ্ছে। কিরে কেমন আছিস সব?

পাকা-দেখার পরই টুনিমাসীর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। নিজের ওপর যেন রাগ করেই গোঁফ কামিয়ে ফেললুম।

টুনিমাসী দেখে হেসে বললে, মাসীমুখো! বেশ হয়েছে।

অথচ একদিন আমার গোঁফ-ওঠা নিয়ে ঐ মাসী কি উৎসাহ না দেখিয়েছিল। আমাকে যেন বোঝাতে চেয়েছিল আমার দৈহিক পরিবর্তনের কি একটা রহস্য। তখন টুনিমাসীর কি আনন্দ আমাকে কেড়ে বিগড়ে খাচ্চে আদর করে। আমারও তাকে খুব ভাল লেগেছিল। টুনিমাসীর বুকের মধ্যে মুখ নিয়ে কতবার বলেছিলুম তোমার চুল কি সুন্দর। যেন সিল্কের মত—

টুনিমাসী চুল দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিয়ে বলেছিল, তোর ভাল লাগে? মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু তার চুলের স্পর্শ আমার দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। অনির্বানীয় সে পুলক আনন্দ!

**　　**　　**　　**

আমার ঘরটাতে টুনিমাসীদের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমারই খোয়ার, সকাল থেকে নতুন মেসোমশায়ের আপ্যায়ন করতে ছোটাছুটির অন্ত নেই। টুনিমাসীরা এল, খেলো, দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তুই শালা ঘর চোরের মত খেটে! একবার ইচ্ছে হয়েছিল রাত দশটার আগে আর বাড়ী ফিরবো না! মা যেমন বেমক্কা করেছেন, বুঝবেন! না, পারলুম না, দূরে দূরে থাকতে, যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলুম, ওদের সামনে থাকলুম সপরিবার।

টুনিমাসী খুব প্রশংসা করলে, পল্টবাবু কি কাজের ছেলে হয়েছে, না দিদি? জামাইবাবুর আর ভাবনা নেই।

কতবার যে টুনিমাসীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি তার হিসেব নেই। সত্যি মাসী অনেক সুন্দর হয়েছে, মুখটা বিয়ের পর যেন আরো উজ্জ্বল হয়েছে, পিঠের ওপর খোলা চুলের রাশিতে নিরুপম দেহ বেশ ভারি দেখাচ্ছে, আর ওই বুকটা—

টুনিমাসী ফস্ করে বললে, অমন হাঁ করে কি দেখছিস্ রে ছোঁড়া, দেখিস্নি কখনো? খুব লজ্জা পেলুম। মনে হলো ওর চেয়ে গালে একটা চড় মারলে পারতো মাসী!

মাথার মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। মাসীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে!

ভোর বেলা টুনিমাসী ঘর থেকে বেরুতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। যেন মা কি পিসী কথা কইছেন দিদি ফরমাস করে বললে, এই শোন, তোর মেসোকে টুথপেষ্ট আর ব্রাশ দিয়ে আয় আমার সুটকেশে আছে।

চাকর নাকি? কিছু না বলে এগিয়ে গেলুম। টুনিমাসী পিছু পিছু এসে বললে, কথা কানে গেল না বুঝি? দাঁড়া দিদিকে বলছি—

রেগে বল্লুম, বলগে যাও। যার দরকার সে দেখে নেবে।

টুনিমাসী গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল হয়তো মাকে নালিশ করবে। তা করুক আমি গ্রাহ্য করি না।

বেশরম। ওঁরা সারারাত ধরে ফুর্তি করে মুখ এঁটো করবেন আর সাত সকালে আমি তা পরিষ্কার করবার জন্যে হাতের কাছে মুখ ধোবার সরঞ্জাম যোগাড় করে দেব! কেন কি ভেবেছেন উনি!

টুনিমাসীকে আমি আর ভালবাসি না, ঘেন্না করি।—ওর ঘরকে ঘিরে করি।

ভারতীয় রেলওয়ের আদিপর্ব

পূর্ব রেলওয়ে প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন "এক্সপ্রেস"

প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ-নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, লোহাচালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে।

জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জন্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর সুখ্যাতি এবং আর্থিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি চালাই কারখানা স্থাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট কারখানার এই হল গোড়াপত্তন।

মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ন কোম্পানি থেকে ৪৮০০০-এরও বেশী সতাধিক বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং ১,১২০০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ, দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার টন ইস্পাতের কাঠামো বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

মার্টিন বার্ন হাউস,
১২ বিশপ লে., কলিকাতা ১

শাখা: নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

মাঠ

শরদিন্দু পাত্র

স্বামীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করেই বাপের বাড়ি চলে এসেছিল সুরুচী।

ঝগড়া লিখলাম বটে, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা যেন এই ঝগড়াকে ভাইভোর্সের ভূমিকা বলে প্রথমেই ভুল করে না বসেন। গ্রাম্যবাংলা—বিশেষ করে চাষী গেরস্ত ঘরে এ ধরণের ঝগড়া লেগেই আছে।

এই সব ঘরে সারা বছর স্বামীও যেমন খাটে, স্ত্রীকেও তেমনি খাটতে হয়। এসব ঘরের স্ত্রীরা বাড়িটুকু, পুকুরঘাটটুকু, আর মাঠটুকুর বাইরে বেরোবার অবকাশ পায় না। একঘেয়ে, সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ এদের জীবন তবু এরই মধ্যে থেকে তারা আনন্দের উপাদান সংগ্রহ করে নেয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও ঘটে। ভিন্ গাঁ থেকে যে সব মেয়েরা বউ হয়ে আসে তাদের কারও কারও মনের গড়ন অন্য রকম। তারা একটু বৈচিত্র্য চায়। গ্রামের ঐ গণ্ডির মধ্যে মুখ বুজে থাকতে থাকতে তারা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তখন তাদের মনে পড়ে বাপের বাড়ির কথা। সেখানকার সামান্য উৎসবটুকুর স্মৃতিও তার মনকেও চঞ্চল করে তোলে। যে মেয়ে সে হয়তো কখনো রং মাখেনি, যে চড়কের দিনে সে হয়তো দীর্ঘদিন চড়কতলায় মেলা দেখতে যায়নি, আজ হঠাৎ আপন মনে সাড়া দিতে দিতে সেই উৎসবগুলিকেই উপলক্ষ্য করে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আর এতে যদি কেউ, বিশেষ করে স্বামী বাধা দেয় তা হলেই, মনোমালিন্য।

সুন্দরীর ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকম। বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। ছেলেপুলে হয়নি। শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসার। একটি দেওরও নেই যে ঝগড়া করবে, একটি ননদও নেই যে গল্প করবে। তার ওপর সে কাজনার মেয়ে— মনটা একটু শহুরে, চেহারাটিও নামে রূপে সার্থক, আর স্বামী যে তাকে একটু বিশেষ ভালোবাসে তা সে ভালোভাবেই জানে। আর সর্বোপরি সুবিধে এই—বাপের বাড়ি তার কাছেই। দুখানা আমনের মাঠ পেরোলেই কাজনা-পাওুয়া বাস-রাস্তা। বাসেও উঠতে হয় না। আর ক্রোশখানেক পথ হাঁটলেই তাদের বাড়ির কাছের শিবমন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্দরী কিছুদিন ধরেই বাপের বাড়ি যাব যাব করছিল, কিন্তু নিরাপদ যেতে দেবে না। কেন যে যেতে দিতে চায় না তা সুন্দরী ভালো করেই জানে। শাশুড়ি মারা যাবার পর সুন্দরী দেখেছে শূন্য বাড়িতে ও কিছুতেই একটা দিনের জন্যেও থাকতে পারে না। ও বলে, তুই বুঝিস না রে, ঘরগুলো খাঁ খাঁ করে যেন গিলতে আসে।

সবই বোঝে সুন্দরী, তার জন্যে মমতাও তার বড়ো কম নয়। কিন্তু তবু এক একটি মেয়ের স্বভাবই এই সরল অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিদানে নিঃসংকোচ ভালোবাসা নয়, তারা একটু অত্যাচার করেই আনন্দ পায়।

তাই নিরাপদ যখন চাষের সময়ের অজুহাত দেখিয়ে এক দিনের জন্যেও তাকে কাজনায় রেখে আসতে চাইল না, তখন সুন্দরী একাই একটা পুঁটলি হাতে করে মাঠ পার হয়ে সোজা পাওুয়ার রাস্তা ধরে কাজনা

চলে এল। প্রথমে বেয়োতে একটু ভয় ভয় করছিল। ভয় তার শুধু পাওুয়ার রাস্তাটুকু। নইলে এ মাঠঘাটটা তো তার প্রতিদিনের চেনা। যখনই তার মন খারাপ হয়েছে, সেই জানলা দিয়ে এই মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কেমন যেন সান্ত্বনা পেয়েছে। এই মাঠ ধরেই কাশবনায় যাওয়া যায়। এই মাঠেই তো কাশবনার পথ। তখন তার মনে হয়েছে এই মাঠ দুটিই তার যেন এই বিদেশে এক মাত্র বন্ধু।

কাশবনায় বধূ দেখবার উপলক্ষ্য করে এসেছিল, বধূ—উল্টোরথ ছোটে গেল তবু সুন্দরী বেয়ানের নাম করল না। সে নিজে তো ঝগড়াঝাটি করে এসেছে আমার নিরাপদকেই এসে সেধে নিয়ে যেতে হবে—তবে যাবে। এই প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু নিরাপদেরও আসার নাম নেই।

এমনি সময়ে দুর্যোগ বাধল।

পর পর দু বছর খরার পর এ বছর জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে বর্ষণ শুরু হলে চাষীরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। কিন্তু আষাঢ় পড়তে না পড়তেই বৃষ্টির চেহারা যেন বদলাতে লাগল। এ তো বঙ্গদেবের প্রসন্ন হাসি নয়। চাষীরা বলাবলি করতে লাগল—আকাশের বর্ণখানা একবার দেখেছ গা? যেন ধোঁওয়া। আর কেমন ঘোঠেলা বাতাস বয়ছে?

এ যে কিসের লক্ষণ অভিজ্ঞ চাষী মাত্রই তা জানে। তাদের অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তো সর্বনাশ। অতি বৃষ্টিতে আমন ধানের বীজতলার চিহ্নমাত্র আর থাকবে না। আর এই কোমরজোর আউস, পাট?

সুন্দরী যখন বাপের বাড়ি আসার জন্যে রাগ করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে তখন নিরাপদর সময় কাটছে দুর্ভাবনায় মাঠে মাঠে ঘুরে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে।

শেষ পর্যন্ত চাষীদের আশংকাই ঠিক হল। গত ২৩শে আষাঢ় থেকে সেই যে বৃষ্টি আরম্ভ হল তিন দিন বিরতি নেই। বৃষ্টির জলে খাল বিল মাঠ থৈ থৈ, তার ওপর বাকি ডি, ভি, সির পাকেৎ আর মাইথন বাঁধ থেকে জল ছেড়েছে। সোনায় সোহাগা। বাঁকা, বেহুলা উপছে ছোড়ে জল ছুটে চলেছে। কাশবনা মহকুমার কাশবনা এক আর কাশবনা দু নম্বর ব্লকের ১৭টি অঞ্চলের মধ্যে অন্তত ১৩টি অঞ্চল ভেসে গেল বন্যায়। কত বাড়ি পড়ল, কত গবাদি পশু মরল। নিঃসহায় মানুষ কেউ গাছের ওপর, কেউ ভাঙা চালের ওপর স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শূন্য আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। জল—শুধু জল।

কাশবনার মহকুমা শাসক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখনই রিলিফের ব্যবস্থা করা চাই। হাজার হাজার নরনারী জলবন্দী হয়ে আছে।

দেখতে দেখতে কাশবনা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল—বান—বান—কাশবনা মহকুমার অন্তত ছশোটি গ্রাম বন্যায় কবলে! আর ষাট হাজার লোকের জীবন বিপন্ন।

এ খবর সুন্দরীরও কানে গেল। তার শুভ্র ললাটে চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে উঠল। মাকে গিয়ে বলল, মা, আমাদের গ্রামের কিছু হয় নি তো?

মা সান্ত্বনার সুরে বললে, হলেও তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি। তা হলে নিরাপদ চলে আসত।

এদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই। খবর আসছে—জল ছাড়ছে। এল, ডি, ও, বাকি যার যেখানে যত নৌকো আছে সব সীজ করে রিলিফে লাগিয়েছেন। কিন্তু কটাই বা নৌকো। তার ওপর ঐ জল ঠেলে একটি গ্রামে ঢুকে ফিরে আসতে প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগছে। আর নৌকোতে এক এক করে দশ বারো জনের বেশি লোকও নেওয়া যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে কলকাতার ইস্কুল কলেজগুলির দরজা এদের আশ্রয়ের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। দলে দলে সর্বহারা মানুষেরা ভিড় করে আসছে। পরনে শুধু একখানি কাপড় মাত্র, মাথায় কারো মাদুর জড়ানো অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, কারও বা মাথায় ভাঙা ট্রাঙ্ক, বাচ্চা ছেলেদের হাতে লণ্ঠন, কেউ বা খাঁচাশুদ্ধ পাখিটাকেও আনতে ভোলে নি।

সুন্দরীর ছোটভাই ঝুলো এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে, দিদি, মিলিটারি এসে গেছে। তারা বাবার নৌকো নিয়ে জলে নেমেছে।

সুন্দরী অবিশ্বাসের সুরে বললে, ধুর।

—মাইরি। আমি নিজে দেখে এলাম।

সুন্দরীর আর শুনতে ইচ্ছে করল না। সে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার তখন কেবল এই ভাবনা—নিরাপদ যদি ভালোই থাকবে তা হলে এখনো তাকে নিতে আসছে না কেন?

পরের দিন খবর এল শুধু শ্রীরামপুর বা রাহাতপুরই নয়—জালিরতলা, খোড়ো, হিজলী, কেলেবন্দ, খাগড়া কুট, উত্তরপাড়া—ওদিকে হাটকালনা অকলের কোলেডাঙা, মীরপুকুর, লালপুকুর, এসব জায়গায় কত যে ঘরবাড়ি পড়ে গেছে তার ঠিক নেই।

শুনতে শুনতে সুন্দরীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে আরও মারাত্মক খবর এল কোথায় নাকি ঘর চাপা পড়ে একজন মারা গেছে।

এ খবর শোনবা মাত্র সুন্দরী আর স্থির থাকতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল তাদের নিজেদের ঘরখানির কথা। বেশে মাটির নয়—এঁটেল মাটির দেওয়াল। গরমকালে যেমন ফেটে চৌচির হয়, বানের জলে তেমনি মুহূর্তে আটাগোলা হয়ে যেতে পারে। আর যে গোঁয়ার ঐ মানুষটা ভয় তো বিবেচনা কিছুমাত্র দেয়নি। ঘর ছেড়ে যে কোথাও যাবে তাও মনে হয়না —তা হলে?

—হ্যাঁরে ঝুলো, যে লোকটা মারা গেছে তার বয়েস কত জানিস?

—না, কে আর খোঁজ পাচ্ছে।

সুন্দরী মার কাছে গিয়ে বললে, মা, আমি আজই চলে যাব।

মা চমকে উঠল। বললে, সে কী। কোথায় যাবি? সেখানে কী অবস্থা তা কে জানে।

—সেইজন্যেই তো যেতে হবে।

মা বললে, যদি ঘরদোর ভেঙে গিয়ে থাকে তা হলে গিয়ে দাঁড়াবি কোথা?

সুন্দরী হঠাৎ দুচোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠে বললে, মানুষটারই বা কী হল তাই বা কে জানে।

সুন্দরীর মা চমকে উঠে বললে, ছি! ওকী অলুক্ষণে কথা।

—তবে ও নিতে আসছে না কেন?

—তুই কী বোকা মেয়ে রে। নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায়? সবই তো জলে ভাসছে। সেজন্যে তবু তুই নিরাপদ জায়গায় আছিস।

—কিন্তু সেও তো চলে আসতে পারত। তার সেখানে কী রাজকাজ?

এ কথার উত্তর তার মা দিতে পারল না।

তখনকার মতো আলোচনা থেমে গেল বটে, কিন্তু সুন্দরীর মন থেকে দুর্ভাবনা কিছুতেই ঘোচে না। তার কেবলই মনে হতে লাগল—এতই যদি বিপদ তা হলে ও চলে আসছেনা কেন?

শেষে ছোটো মেয়ে আবার এক কাণ্ড করে বসল। কারও নিষেধ মানল না, বেলা ছুটোর সময় পুঁটলি একটা নিয়ে যেমন একাই চলে এসেছিল তেমনি একাই রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

ওর মা যখন বলে বলে আর পারল না তখন ছুলোকে পাঠিয়ে দিল।

সুন্দরী বললে, তুই যাবি আমার সঙ্গে?

—হুঁ।

—তবে চ।

ছখানা মাঠ পার হয়ে কালনা-পাতুয়া সড়কের যেখানে সেদিন একা একা সুন্দরী এসে উঠেছিল আজ ভাইটির হাত ধরে সেখানে এসে পৌঁছতেই অবাক হয়ে গেল। দেখল মাঠের চিহ্নমাত্র নেই। লাল জল খল্‌খল্ করতে করতে ছোবেচৌন, ভেসেনই, বাহাদুরপুর ভাসিয়ে, মাঠের ওপর ক্রমশই এগিয়ে আসছে। কাছে পিঠে জনমানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, সুন্দরীর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ছুলো শীতে কাঁপছিল। একটা বাবলা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সুন্দরী তাদের গ্রামের দিকে যতদূর পর্যন্ত তাকানো যায় তাকাতে লাগল—তাদের কোনো চিহ্ন নেই। জল শুধু জল। মাত্র ছখানি মাঠের পরেই তার শ্বশুরবাড়ি। এই মাঠ ছুটিকে সে তিন বছর ধরে কতবারই দেখেছে। এই মাঠের উপর দিয়ে কত বার কত সময়ে এসেছে গেছে। এই মাঠ যে তার ঘরের উঠোন! অতি পরিচিত বলেই সাহসে ভর করে সেদিন একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু আজ সেই চিরপরিচিত মাঠ কোথায় গেল?

ছুলো এ ক'দিন বানের কথা লোক মুখেই শুনেছিল, আজ স্বচক্ষে দেখে তার কেমন ভয় করতে লাগল। শুকনো গলায় বললে, দিদি, কী করবি? এ যে সমুদ্দুর!

নিরুপায় সুন্দরীর দুই লক্ষ্যনিবদ্ধ চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কোনো উত্তর দিতে পারল না।

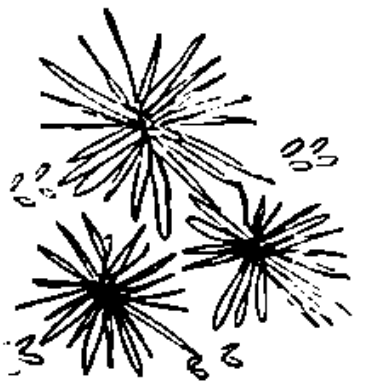

মঞ্জীর মঞ্জুল বাজে

(প্রাচীন তামিল কাহিনী অবলম্বনে)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইংরেজী, ফরাসী, চেক্ প্রভৃতি বহুভাষার অনুদিত প্রাক্-সঙ্গম যুগের তামিলনাদের একটি সুপরিচিত প্রাচীন কিম্বদন্তীকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন দুহাজার বছর আগেকার একটি কবি—নাম 'ইলাঙ্গো-আদিগল' তাঁর শিলপ্পদিকরম কাব্যে—চেরনাড তখন দেনগুত্তবান—তারই বিশেষ বান্ধব ছিলেন সিংহলের পরাক্রান্ত নরপতি প্রথম গজবাহু। ঐতিহাসিক শেষয়িরিশাস্ত্রী, কনকসুভপিল্লে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, বাসুদেবী পিল্লে, আর দীক্ষিতার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, ঔপন্যাসিক আর কে, নারায়ণ, ঐতিহাসিক ব্যাসায়, রেভঃ পোপ, সাহেব যার জেনারল ম্যাকেঞ্জী, আবে দুবয় প্রভৃতি অনেক মনীষিই এই "মঞ্জীর কাব্য" (Lay of the Anklet) এর কাহিনী শুনিয়েছেন, কথা কইছে বেথার অবাদি অতীত।]

গানের আরম্ভ যেদিন, সেদিন পূর্ণাবয়বচক্র নিশুপ্ত তন্দ্রী তমালতাপী বনরাজী নীলা লবণাম্বুরাশির বারে উৎসবের গুনগোরবটা লেগেছে, আনন্দের জোয়ার এসেছে মাহেন্দ্র লগ্নে। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর শুধু জল আর জল, ঢেউ আর ঢেউ, গোচরের সঙ্গে অগোচর—বিশ্ব যে মাহেন্দ্রক্ষণ। পিছনে পুষ্পকন্যা কাবেরী ছুটে চলেছে সমুদ্র তটে তার পুণ্যোদকের আয়টুকু দান করবার চেষ্টায়। এই সেই কাবেরী যেখানে উৎকল শশিক পথ বেয়ে কলিঙ্গ পার হয়ে কাঞ্চী সরিতে স্নান সারতে এসেছিলেন বহু তাদৃশপী সমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধির পথে, যেখানে চন্দন বন আছে, মলয়শৈল আছে, সহ্যাদ্রি আছে আর আছে বেপথুমানা কেরল যোষিতের দল।

সন্ধ্যার তন্দ্রায় গোধূলিলগ্নে বিবাহের বাসর বসেছে বালুবেলায়। উৎসবের সুর লেগেছে জলে স্থলে আকাশে অন্তরালে, শুধু যন্ত্রসঙ্গীত বচনে নয়, গানে সুরে কাজে অকাজে আসঙ্গনে বিসঙ্গনে আলোয় আধারে জড়ানো একটি মিলন-মাঙ্গলিকের শুভক্ষণ—আমার হৃদয় শুধু তোমার হোক্ নয়, তোমার হৃদয়ও আমার হোক্। সারা নগর জুড়ে হীরতাং কুঙ্কুমতাম্—হস্তীপৃষ্ঠে দূত তখনও বিসঙ্গনের গান সারছে—এল পুরবাসী সবে, জীবনের উৎসবে, নরবিনোদা করো না হেলা। রাত গভীর হল, অন্ধকার ঘনিয়ে পড়লো মূর্ছার মত—তবু নৃত্যগীত আলাপ বিলাপ প্রণয় সম্ভাষণের বিরাম নেই, বাঁশি বাজল রাত্রিশেষের প্রহর জানিয়ে, চাঁদ পশ্চিমে হেললো—ভোরের শুকতারা ডাক দিলে ক্লান্ত নাগর-নাগরীদের, শ্রান্ত হও তোমরা।

হলো কোত্তিলন্-তরুণীর যৌথ জীবনের সুরু—দিন যায়, কাল যায়, স্বপ্নের ঢেউতোলা নীলঘুমের মত বছরের পর বছর কাটে—ঋতুতে ঋতুতে প্রেমের নব নব পরিচিতি, নতুন ধরনের উল্লাস বিলাস। তবু বিবাহিত প্রেমের (কলপু) মাধুর্য ম্লান হয় না তাদের, প্রদীপ্ত যৌবন ভাস্বর ঘরে ফোটে কতো গান, কতো স্বপ্ন, কতো ধ্যান, কতো অনুমান মান অভিমান, বিরাবের গুরুদিনে, আষাঢ়ের ভরা সন্ধ্যায়, শ্রাবণের মুষলিত শ্রাবনের রাত্রে,

বেলাভের দিনান্ত বেলায়। বসন্তের শেষপ্রহরে ক্লান্ত নরবন্তের পিলুঁয়ারোঁরা তারা শোনে রক্তিম সুখ পুষের আমন্ত্রণের মাঝে।

তারপর ঘটলো সেই ঘটনা—যা ঘটেছে চিরকাল প্রেমের ত্রিভুজের সৃষ্টিতে। বিধাতার বিধান উল্টে গেলো মানুষের হিংসাভরা কাহিনীতে, কামনার সঙ্গে ঘটনার লাগলো সংঘাত, লাবনার সঙ্গে স্বভাবের—মানবের মরণবাণ যে মানবীর হাতে। রাজসভায় আমন্ত্রণ এলো কোভিলনের, নৃত্যগীতের আসর বসবে, নাচবে তথী মাধবী, সুতনুকা যেন বিধির আদির সৃষ্টি, নীল কটি গভীর নাভি, গ্রন্থা নৃপীর তুল্য দিঠি। কোভিলনের রক্তের মর্মরে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বাজলো তা, আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তে। রাজা সুন্দরীকে দিলেন চন্দনমালা, আর একহাজার আটটি স্বর্ণমুদ্রা। সেদিনকার রীতি অনুযায়ী সেই অনন্যা কন্যা তখন পণ্যা, ভোগ্যা—যে কেউ সে মালা ক্রয় করবে সে পাবে ঐ লোভনীয়াকে অঙ্কশায়িনী করবার অধিকার। তার বৃদ্ধা কুব্জা দাসী তখন রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিতে আরম্ভ করেছে—কে নেবে এই পসরা, এই মালা—এতো শুধু ফুলদোলের কারুকাজ নয়, মাল্যধারিণীরও প্রতীক, নাগরের দল, রসিক সজ্জন, তোমরা এসো, সর্বোচ্চ দর হাঁকো, পাবে এই নিতম্বতন্বী চকোর নেত্রা রমনী বল্লকে। লজ্জাবতী সকল লজ্জা বিসর্জন দেবে প্রেমের মহোদধিতে।

কোভিলন চঞ্চল হয়ে উঠলো রূপজমোহে। সর্বোচ্চ দরে কিনে নিলে এই মালাটি, আবার পরিয়ে দিলে লজ্জাবতীর গলায়—নৃত্যকলা পটিয়সীও এসে তার হাত ধরে বললে—প্রিয় তুমি স্বাগত, আমার হৃদয় মন্দিরদ্বার তোমার তরে উন্মোচিত হয়েছে, নিঃসঙ্গচিত্তে তুমি চলে এসো আমার সাথে, তোমার সব অনঙ্গ তাপ নির্বাপিত হবে আমার শীতল অঙ্গস্পর্শে। তার রথে চড়ে সে এলো মাধবীর কুঞ্জ বিতানে। তারপর কোভিলন ভুলে গেলো সব, সাধ্বী স্ত্রী, সংসার, সমাজ। দীর্ঘ দশ দিনে কতো পাতার সবুজ রং শুকিয়ে যায়, আষাঢ়ের বর্ষা নামে, শ্রাবণের ঘন মেঘ, কেকাধ্বনি এদের দেহের খেলাঘরে ওরা মেতে থাকে নিজেদের নিয়ে, গণ্ডুষে গণ্ডুষে ধরণীর তরুরস করে পান। দীর্ঘদিনের ছায়া দীর্ঘতর হয়, তেপান্তরের মাঠে সন্ধ্যা নামে, শালে তালে মহুয়ার ডালে আমে জামে জমে জটলা, জটিল হয়ে ওঠে ওদের জীবনও 'কলমুর' অর্থাৎ নিবিড় প্রেমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। মাধবীর অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে ওঠে, চোখের পল্লব হয় দিগন্তের রেখার মত বাঁকা। আর কন্যাগীর চক্ষুদুটি ভরে ওঠে অশ্রুতে, বিষাদখিন্ন দেহ আরো শীর্ণ হয়, সে দেবতার মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দেয়—আমি যদি সতী হই তাকে আসতেই হবে ফিরে। পাষাণী মাথা খোঁড়ে—ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। পাষাণ দেবতা অলক্ষ্যে হাসেন।

এমন একটি দিনে এলো ইন্দ্রপূজার উৎসব। স্নান সেরে গান হয়ে প্রসাধিত হয়ে তারা চললো দেব-মন্দিরে সপ্তস্বরা সমুদ্রের ধারে। কেউ করছে প্রথমমুখ সম্ভোজাতকে নমস্কার, কেউ করছে মদনপূজার উদ্যোগ, কেউ পড়ছে বা সৃষ্টি প্রেই যাত্রার স্তোত্রপাঠ, কোথাও গান, কোথাও রসালাপ, কোথাও শাস্ত্রচর্চা, কোথাও নৃত্যগীত, কোথাও পানশালা, কোথাও বিস্তৃতে প্রণয়ভাবণ। কোভিলন তাদের বস্ত্রের আবরণ থেকে বার করলে বাঁশিটি মুহূর্ত হয়ে উঠল সুর, মাধবীর চরণ উঠলো দুলে। বাঁশী গাইলে—যেতে যেতে পথের থেকে আমায় তুমি নেয়ো ডেকে, তোমার চরণ ছন্দ মরালীর গতিকেও হার মানায়। ধীবরেরা সমুদ্রে জাল ফেলে মৎস শিকার করে, তোমরা বঙ্কিম কটাক্ষের উর্ণনাভে পুরুষদের বন্দীকরো।

আর একটি সুর বললে—সুরভিত সুপবিত্রাদের কুঞ্জে মরকতদ্যুতি আমার প্রিয়া যেন দেবসংহিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, বরকান্তি তন্বী। আমি যদি জানতাম তাহলে আসতাম না এখানে অঙ্গ কটাক্ষের জালে ধরা দিতে।

উত্তরে গাইলে মাধবী বাঁশী কেড়ে নিয়ে—যে হিরণ্যহংস দুঃখ মনে করিয়ে দিওনা আমার গত জনমের

কাঙ্ক্ষিতকে—সে প্রিয় আজ কোথায় কাম্যসু সরোবরের উদাস ঘোড়ার পাশে আছি বসে, তবু আমার তৃষ্ণার শান্তি নেই, শান্তি নেই।

সহসা আকাশ বাতাস ঘনিয়ে ওঠে বিরহী বিহঙ্গিনীর কান্নায়—সত্যিকারের মনের মানুষ কোথায়, যাকে পেলে সব পাওয়া সফল হয়, সব চাওয়া সার্থক হয়।

মাধবী আনমনা হয়, কোভিলন ভাবে কি হলো মাধবীর—সে কী আর কারোর ধ্যানে নয়, অন্তকোন প্রিয়জনকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্মরণ করছে। দুজনের মাঝখানের যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, প্রাচীর গড়ে উঠছে মনের অন্তরালে। হাত ধরাধরি করে যারা বসে ছিল তারা জলের ধারে, হংসমিথুনের ক্রীড়া দেখছিল রক্ত কমল দলের পেছনে, চক্ষুর সঙ্গে চক্ষুর মিলন। তারপর হঠাৎ কোভিলন উঠে পড়লো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলো সেখান থেকে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো মাধবী সেও রথে চড়ে ফিরে এলো উদ্যানবাটিকায়—না, কোভিলন ফেরেনি সেখানে। স্নানান্তে বিশুষ্কগাত্রী হয়ে নবপট্টবস্ত্র পরিহিতা মাধবী বসে বসে একটি মালা গাথলে—মধ্যমণি হিসাবে তাতে দিলে একটি পদ্মদল, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করলে একটি কবিতার চরণ—আকাশে উঠেছে চাঁদ একাকিনী যারা তারাই মনমরে অস্তমিত হয়, চন্দ্রাহত হয়, এই কথাটা বুঝে নেবে সখা—তারপর এক সহচরীকে ডেকে নিপুণিকা পাঠিয়ে দিলে এই লিপিকা কোভিলনের কাছে—প্রথমে মুখে বলবে সে, তারপর মালাটি দেবে হাতে—সেই হবে প্রোষিতভর্তৃকার প্রিয়জন মিলনের সংকেত।

সঙ্গিনী এসে বললে—আর্যা, কোভিলন মালাও নিলেনা, লিপিও পড়লেনা। মাধবী ভাবলে তার ক্ষণিকের অভিসারের বিদায় ক্ষণ এসে গেলো বুঝি, আবার তার গগনে কোন চন্দ্রের উদয় হবে কে জানে, না, না, এতো প্রেম, এতো সোহাগ, এতো আলিঙ্গন আলিঙ্গন সবই কী বৃথা—হয়তো তার প্রিয় পুনরাগমনায় চ। প্রিয় বিরাহত হয়েই সে নিদ্রাবিহীনা রজনী কাটালে একাকিনী বিরহ শয্যায়। ভর্তৃহীনা সে, সামান্যা জনপদবধূ, তার জীবনে বহুসংসর্গ বহু পরিচয় ঘটেছে, তবু কোভিলনের জন্য কেমন যেন তার মন কেমন করে। তার অন্তশ্চেতনায় কে যেন বলে এই পাখী আর ফিরবেনা এই নীড়ে—সোনার পিঞ্জর ছিঁড়ে সে গেছে আকাশের উদার আতিথ্যে—তার জীবনধর্ম তাকে নিয়ে গেছে তার প্রিয় পরিজনের ঘরে, যৌবনের উষ্ণ স্পর্শকে অস্বীকার করে, নাম্র স্নিগ্ধ মঙ্গল পরিবেশে। কিন্তু সে তো অপর্ণা নয় যে তার তপস্যা হবে অনশনের। সে যে সীমান্তবর্গের ইন্দ্রাণী।

কোভিলন ফিরে এসেছিল কন্যকার কাছে, বলেছিল—আর নয়, এই শহর থেকে পালাই চল, কুহকিনীদের দেশে না থাকাই মঙ্গল। কন্যকা জানতো তার স্বামীর অর্থে ঐশ্বর্যে ভাঁটা পড়েছে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সে পড়েছিল মাধবীর ফাঁদে, ঐ রমণী তাকে মোহন করেছে শুধু দেহের সৌরভীয় নয়, মনের স্নেহে নয়, ধুল অর্থসম্পত্তিতেও, প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছে কোভিলন মাধবীকে। তবু স্বামীকে বাধা দিতে পারেনি কন্যকা, মনে মনে ডেকেছে দেবতাকে, প্রণাম করেছে বিপ্রহরকে—ফিরিয়ে দাও, দেবতা, ফিরিয়ে দাও।

এখন সে বলে—তাই চলো প্রভু তাই চলো, কিন্তু জানি তোমার অর্থসংকট, আমার এই দুটি সুবর্ণ মঞ্জীর আছে, মাধবীকেও কিছু উপহার দিতে চাও তো দিতে পারো—

না, না, ঐ সব শোভনিকাদের পায়ায় আর নয়, এসো আমরা মাদুরায় চলে যাই, সেখানে নতুন করে জীবন আরম্ভ করি—তুমি আর আমি, ঐ দুটি স্বর্ণ-মঞ্জরী বিক্রয় করে ব্যবসায়ের মূলধন করি।

রাতের গভীরে ওরা দুজনে 'পুহার' শহর ত্যাগ করে চললো নদীর দক্ষিণ ধার দিয়ে—উৎসবক্লান্ত নগরীর দীপ সবে নিভেছে, কোলাহল একটু কমেছে, তখনও পথে দেখা যাচ্ছে মত্ত নাগর নাগরীদের—দরিদ্র ধনী ভিক্ষুক, ভণ্ড, যোগী ভোগী ত্যাগী, এক এক প্রহরে যারা জাগে। কোভিলন বললে—ধারে বহু থেকে এই মুক্ত

জীবনকে ফেলিনি বহুদূর, কি ভুলই করেছি—আজি প্রাণের সুরে মিশিয়ে দিতে হয় সুন্দরের সুরে, তবেই সংসার এসে মন্ত্রতাকে তাড়ায়।

নদী পার হয়ে তারা পৌঁছল উরিয়র নামে নগরতলীতে—একটি পান্থশালায় স্ত্রীকে রেখে সে গেলো এক সরোবরে স্নানের জন্য, এমন সময় এক পথিক এসে বললে—তোমার সঙ্গে কথা আছে ভাই।

কোন্ডিলন প্রশ্ন করে—তুমি কে? কোথা থেকে আসছো?

বন্ধু, তুমি আমায় চিনতে পারলে না—আমি যে এসেছি তোমার খোঁজে, মাধবী পাঠিয়েছে, সে অনুতপ্তা, সে অনুরক্তা, তুমি ফিরে চলো সে তোমাকে চায়—তুমি তার কৌমারহর না হলেও যৌবন হরণ করেছো, সমুৎকণ্ঠিত হচ্ছেন তোমার চিত্ত সেই উন্মীলিত মালতী সুরভির জন্য। তোমার পিতামাতা যে আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন—

তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বলো যে তাদের কুপুত্র সুপুত্র হয়েই ফিরবে, আর মাধবীকে বলো সে যে আমার জীবন যৌবনকে কয়েক দিনের জন্যেও মেহ মমতায় প্রেমে অভিষিক্ত করেছিল তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার পথ এখন ভিন্ন। নারীর কটাক্ষ তার সুগঠিতা তনু, তার সুর, তার স্পর্শ আর আমায় মুগ্ধ করেনা—না ভাই তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বলো যে সে যেন অন্যভাবে অন্যজনকে ভজন করে—যৌবনবতীর আশ্রয়ের অভাব হবে না।

স্নান সেরে ফিরে এসে কমলীকে কিছু আর বললো না সে, বিশেষ করে যে মাধবীর প্রেরিত দূতকে কোন্ডিলন ফিরিয়ে দিয়েছে।

মাদুরাইএ পৌঁছে তারা আশ্রয় নিলে গোপালকদের একটি গৃহে গোপপল্লীতে। কমলী বললে—এই নাও একটি মঞ্জীর, বাজারে গিয়ে বিক্রী করে এসো—আর না জানি তোমার পিতামাতা কতই না ভাবছেন তোমার জন্য—

মন খারাপ হয়ে গেলো কোন্ডিলনের, যেন কোথায় একটা অশুভের ছায়াপাত। পথে যেতে যেতে মনে হলো যেন তার জীবনের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে এক প্রবল ঝঞ্ঝা বাত্যায়। সে গেলো পাণ্ড্য রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিকারের বিপণিতে, বললে—ভাই আমি বিদেশী, বাণিজ্য করতে এসেছি, আমার কাছে এই স্বর্ণমঞ্জীরটি আছে, এমন একটি সুগঠিত কারুকার্য খচিত শিল্পদ্রব্য যা রাজ্ঞীর পদতলেই শোভা পায়—

সত্যই ভাই—বললে চতুর স্বর্ণকার—তুমি ভেবোনা, বিশ্রাম করো, আরাম করো—আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি—যদি সেখানেই এর গতি হয় তাহলে তোমার অর্থের অভাব হবেনা—একটু অপেক্ষা করো।

ওদিকে পাণ্ড্যরাজ্ঞী প্রাসাদের অন্তঃপুরে, সে দিন নীরব অসহযোগ—রাজা ও রাণীর মধ্যে হয়েছে দাম্পত্য কলহ। গুণীরা এধরনের বিবাদকে মধুক্রিয়ার মধ্যে স্থান দিলেও দুন্দুভিতে আঘাত সুরু হলেই তাক ওঠে গুরু গুরু গুরু। রাজা তখন রাজসভা ত্যাগ করে অন্দর মহলে যাচ্ছিলেন ভাবতে ভাবতে যে রাণীকে প্রসন্ন মুখ করা যায় কিভাবে—কলহের সুরু হয়েছিল মধুভাবেই কিন্তু গুরু হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এর মধ্যে রাণীর মঞ্জীর গেছে চুরি এবং রাজঅমাত্যদণ্ডপাল ন্যায়াধীশরা তার পুনঃপ্রাপ্তির কিছু উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি। এবং রাণী মহারাজকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—প্রভু আপনার রাজদণ্ড এতই মসৃণ যে তস্কর স্বয়ং এসে মঞ্জীরটি ফেরত দিয়ে যাবে তার জন্যে চৌরতস্করনিকরদের আর নিযুক্ত করবার দরকার নেই। এমন সময়ে দেখা হয়ে গেলো স্বর্ণকারের সঙ্গে, সে বললে—মহারাজ রাজ্ঞীর পায়ের যে মঞ্জীরটি হারিয়ে গিয়েছিল সেটির সন্ধান আমি পেয়েছি এবং তস্করটিকেও পাহারায় রেখে এসেছি, এখনি রক্ষীদের পাঠান, নগরপালকে সংবাদ প্রেরণ করুন। রাজা উৎফুল্ল হয়ে তখনি নগরপালকে আদেশ দিলেন এবং বিদেশী বাণিকের কাছে মঞ্জীর পাওয়া গেলে তার শিরশ্ছেদ করবার হুকুম দিলেন। অন্য সময় হলে তিনি হয়তো তাকে বিচারের জন্য নিয়ে আসতে বলতেন। মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যস্ততায় সে কথা আর মনে রইলোনা।

স্বর্ণকার ফিরে এলো রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে এবং কোভিলনকে বললে তার মঞ্জীরটি দেখাতে। কোভিলন অত্যন্ত আনন্দিত যে নরপতি স্বয়ং তার মঞ্জীরের গ্রাহক এবং নিশ্চয়ই সে যথেষ্ট মূল্য পাবে, যাতে তার শুধু অর্থসঙ্কট দূর হবে না, ভবিষ্যতের মূলধনও সে সংগ্রহ করতে পারবে।

সে বললে— এই দেখো, কি চমৎকার কারুকার্য, কি ঔজ্জ্বল্য, কি রং-এর বিন্যাস—

তখন রক্ষীদের প্রধান যিনি কখনও যে অলঙ্কারটি চর্মচক্ষেও দেখেননি তিনি ভাবলেন—সাধারণ বাসরিকের কাছে রত্নখচিত এমন মূল্যবান মঞ্জীর আসতেই পারে না, অতএব এটি নিশ্চয়ই সেই অপহৃত বস্তু।

সবাই তাকে ঘিরে ধরলে, বললে—বন্ধু তুমি বেহালিক, রাতার ধন চুরি করে রাজদ্বারেই বিক্রী করতে এসেছো, তোমার সাহস তো কম নয়—

কোভিলন চেঁচিয়ে উঠে বললে—তোমরা কি উন্মাদ না বুদ্ধিহীন, কি বলছো ?

বলছি এই—বলেই চক্ষের নিমেষে একটি পাষোন্মত্ত রক্ষীর শাণিত তরবারে কোভিলনের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে গেলো—অপরাধ সে রাজ্ঞীর মঞ্জীর চুরি করেছে।

ওদিকে কন্নগী বসে আছে স্বামীর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায়। প্রহরের পর প্রহর যায়, কোভিলন ফেরে না। পল্লীর গোপবালারা বলে—ভাইতো দিদি, মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে, দইটা জমছেনা, বেদুগুলি অকারণে অশ্রুপাত করছে, এ সব অমঙ্গলের লক্ষণ, এসো আমরা চক্রপূজা করি—'কুরবৈকত্তু আমুচ্চিয়ব কুরবৈ' ব্রত অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে গোপী নৃত্য। কিন্তু কন্নগী ভাবে কোভিলন গেলো কোথায়, আবার কি এদেশেও কোনো রমণীর দুঃখে পড়লো। এমন সময় খবর এলো যে এক তস্করকে রাজাদেশে নিহত করা হয়েছে রাজ্ঞীর মঞ্জীর চুরির অপরাধে। সে বাজারে ঐ মণিটি গোপনে বিক্রয় করতে নিয়ে এসেছিল।

কন্নগী পাগলিনী হয়ে ছুটলো—কী, কী, আমার স্বামী চোর, হতেই পারে না—পাণ্ড্যরাজ তুমি ভুল করেছো, তুমি পরস্বাপহারী, তুমি নরঘাতী, আকাশ পড়ুক তোমার মাথার উপর, বাতাস দিক্ অভিশাপ, বিনা বিচারে তুমি রাজধর্ম প্রতিপালন না করে দোষী সাব্যস্ত করেছো আমার স্বামীকে।

ততক্ষণে মৃতস্বামী দেহের ওপর মোরুদ্যমানা উন্মাদিনীর বিলাপ শুনে জমে গেছে মাতব্বর জন সাধারণ। ক্রুদ্ধ জনতা সাগর গর্জনে বললে—চলো রাজপ্রাসাদে—সত্যমিথ্যার বিচার বিশ্লেষণ চাই, রাজা প্রজার প্রতিনিধি —এই স্ত্রীলোক যা বলছে তা যদি সত্য হয় তবে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে—রাজধর্ম সত্যের জন্য, সত্যরক্ষার জন্য সেই ধর্ম যদি পালিত না হয়, তবে রাজাই বা শাস্তি পাবে না কেন ?

প্রাসাদের প্রহরীরা দ্রুতপদে রাজাকে খবর দিলে। তিনি তখন অন্তঃপুরে মহিষীর বিরাম-মন্দিরে আরাম করছিলেন, বললে—মহারাজ, ঘোর রাবা আলুলায়িতকুন্তলা মহাকালীরূপিনী এক চণ্ডোগ্রা নারী আপনার দর্শন চাইছে, বিচার চাইছে, তার স্বামীকে নাকি রাজাদেশে হত্যা করা হয়েছে। রাণী বললেন,—বিচার শালায় যেতে বলো,—রাজা বললেন—না, নিয়ে এসে তাকে, রাজধর্মই হচ্ছে বিচার চাইলে স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা না করেই শুনতে হয় এইখানেই নিয়ে এসো, আমি প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান বাটিকায় স্বচ্ছ সরোবরের তীরে মর্মর বেদীতে বসছি।

বিপুল বন্যার মত উন্মাদিনী কন্নগী ছুটে এলো, পিছনে ক্ষুব্ধ জনতা—বিচার চাই, বিচার চাই—

রাণী এগিয়ে এসে কন্নগীকে বললেন—আমার রামপদতলের সুবর্ণমঞ্জীর চুরি গেছে—যার কাছে পাওয়া গেছে, সে তস্কর না হোক চৌর্যাপরাধের সহায়তা করেছে। অতএব ন্যায়বিধানে শাস্তি তার প্রাপ্য।

কন্নগী ক্ষিপ্তা হয়ে বললে—তার অন্যায়ের সীমানা কোথায় দেবী, রাজাকে সে অধিকার দিয়েছে জনসাধারণ, শাস্ত্র বাক্য আর ধর্মের দেবতারা—দেব অংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু বিচার না করে শাস্তি দিতে কে তাঁকে

অধিকার দিয়েছে। তারপর রাণীর কোলের দিকে ছুড়ে দিলে আর একটি মঞ্জীর—নাও এটাও তাহলে তোমার—এই কি বিচার না অনাচার স্বৈরাচার ভ্রষ্টাচার।

রাণী থতমত খেয়ে গেলেন—তা কী রকম করে হয়—তাঁর তো ছিল মোটে ছটি মঞ্জীর তিনটি হয় কোথা থেকে, মহারাজ আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, বলেন মহিষী।

রাজাও হতভম্ব হয়ে পড়েন, কন্যাটি চীৎকার করে বলে—শোনো রাণী, শোনো রাজ,—ঐ মঞ্জীর আমার, আমার মৃত স্বামীকে আমি দিয়েছিলাম বিক্রয় করতে অর্থলাভের জন্য, তাকো তোমার রাজ অধিকারের বলিকারকে, ভেঙে দেখুক এর ভেতর কি আছে—

রাণী বললেন—আমার মঞ্জীরের অভ্যন্তরে আছে মুক্তা—
এই দেখো আমার মঞ্জীরের মধ্যে অন্য বস্তু—

পাণ্ড্যরাজ হতাশ হয়ে দেখছিলেন ঘটনার স্রোত কোনদিকে যায়। হায় হায় করে উঠলেন তিনি—এ কী বিচার প্রমাদ, কি কুক্ষণেই তিনি রাজবর্ণকারকে ঐ আদেশ দিয়েছিলেন, সবেরই মূল রাণীর সঙ্গে তার দাম্পত্য কলহ, স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিলোপ। এখন নষ্ট মোহ হলেও তিনি তো বিগতব্যর্থ নন। বেদিকার মূলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। রাজ্ঞী শোকে হাহাকার করে উঠলেন। কন্যাটি তখন চীৎকার করছে—মাদুরাইবাসীরা শোনো আমি যদি সতী হই তবে এই রাজ্যের সর্বনাশ ঘটবে।

এখানে বিচারের নামে প্রহসন হয়—ভস্মীভূত হোক এই অভিশপ্ত নগরী, অনল দেবতা উজ্জীবিত হও, হে অগ্নি তুমি প্রসন্ন হও, আমাদের সুপথে নিয়ে যাও, পুড়িয়ে ছারখার করে দাও এই মিথ্যারাজা ও তার রাজত্বকে। সতীর অভিসম্পাতে রাজা তখন জরজর। আত্মগ্লানিতে বিগতপ্রাণ।

আগুন হাতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত পথে পথে চীৎকার করে বেড়াতে লাগলো কন্যাটি—বিচার চাই, বিচার চাই। সতীর রোষে দগ্ধ হতে লাগলো পাণ্ড্যরাজধানী মাদুরাই নগরী। হঠাৎ দেখাগেলো এক নীলবর্ণ ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে বেরিয়ে কন্যাটিকে বললে—সতী, অক্ষম দুর্বল, মায়ের কোলের শিশু, মূক জন্তুদের তোমার রোষবহ্নির অভিশাপ থেকে মুক্তি দাও।

হ্যাঁ, রক্ষা পাবে যারা নিরপরাধ, যারা শুচিব্রত, যারা তপস্বী, নারী, শিশু, সেবিকারা, পূজারিনী, দেবদাসীর দল। পুড়তে লাগলো পাণ্ড্য রাজধানী—চতুর্দিকে পালাও, পালাও রব—সপ্তজিহ্ব-অগ্নির জয় হোক্—অগ্নয়ে স্বাহা।

নগরীর অধিদেবতার তপোভঙ্গ হয়—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এ কী পথ রচনা—অর্ধচন্দ্র মুকুট শোভিতা এক জটাধারিণী দেবী কন্যাটির সামনে এসে বললেন—কোডিলন পূর্বজন্মে রাজ কার্যে অবহেলা করেছিল, তোমারই মত এক উন্মত্তা নারী তাকে অভিসম্পাত দেয়—নিয়তি কেন বাধ্যতে, এ জন্মে তারই প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে, বৃথা তুমি রুষ্ট হচ্ছো, প্রেমের অমৃতে তোমার ব্যথাকে সৌভাগ্যবতী করে তোল।

—তাই করবো দেবতা, এই আমি তপস্যায় বসলাম।

—মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়েই অমৃতের জ্যোতিকে তুমি পাবে, পশ্চাতে হবে তোমার মুক্তি।

প্রজ্বলিত হুতাশন ক্রমশঃ নির্বাপিত হয়ে এলো, একটি পাহাড়ের উচ্চচূড়ায় (তিরুপ পরম কুন্দ্রম) এই সাধিকা রইলেন বসে একাগ্রচিত্তে শুরু প্রতীক্ষায়। পশ্চাতে কোডিলনের বিদেহী আত্মা তাকে নিয়ে গেলো বিরহ-মিলনের অতীত তীর্থে, সব শেষের সহবাসে।

এই স্থানটি আজও পুণ্যতীর্থ বলে গণ্য, 'পত্তিনী'দেবীর আসন—সতী কন্যাটি বসেছিলেন প্রায়োপবেশনে যেখানে মাদুরাই শহরকে রোষবহ্নিতে ভস্মীভূত করে। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

ধাত্রী পান্না

আমরা পাড়ার ছেলেরা তাকে বুড়ি পান্না দাই বলেই ডাকি—যদিও বুড়ি বলার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, পান্না দাই বয়সে যৌবনের সীমা অতিক্রম করলেও বার্ধক্যের ধারে এসে এখনো পৌঁছায় নি।

মোটাসোটা গোল গাল গড়ন, চোখ দুটি ছোট-ছোট,—বয়েস ত্রিশ অতিক্রম করে চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাজ পোশাকের বাহারেও তাকে যৌবনবতী দেখায় না। তবুও বুড়ি পান্না দাই প্রসাধনে যথেষ্ট যত্নশীলা। রঙ বেরঙের শাড়ী ঘুরিয়ে পরার মধ্যে বিন্যাসের বাহার তার মোটা ব্যাঙের মতন থপ থপে আলগা শরীরে মোটেই মানানসই নয়; আর হাতকাটা ব্লাউজে নগ্ন বাহুর আত্মপ্রকাশ আরো দৃষ্টিকটু। মুখে কালো কালো মেচতার দাগ প্রসাধন প্রলেপের মধ্য থেকে প্রকট হয়ে দেখা দেয়—ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ দুটি কাজলের রেখায় পটলচেরা হয়ে উঠবার সুযোগ কখনই পায় না।

তবুও পান্না দাই-এর সাজ পোশাকের সজ্জাও আর প্রসাধনের চাতুর্যের অভাব নেই। এই সাজ সজ্জা আর অঙ্গরাগে পান্না দাই-এর বিগত যৌবন বুঁকিয়া বেশি করেই প্রকাশ পায়—তাই বুঝি সে বুড়ি পান্না দাই।

বরফ কখনো কখনো যদিবা বুড়ি পান্না দাইকে কালো ব্যাগ হাতে সাদা সরুপাড় কাপড় আর আঁট সাট লেসের ব্লাউজে বিনা প্রসাধনে ধাত্রী বিদ্যার কাজে পথ চলতে দেখা যায়, তখন বয়স তার দেহের গড়নে চল্লিশ) ছুঁই ছুঁই করে অন্ততঃ তখন আর তাকে বুড়ি বলা চলে না।

কলকাতার এই উত্তর সীমান্ত সাবেকী পল্লীতে বহুদিনের এক সেকেলে দোতলা বাড়ির বিধ্বস্ত দেয়ালে সংলগ্ন কাঠের ফলকে লেখা মিস পান্নাবতী সীল মীডওয়াইফ—তার নাম এবং পেশার স্বাক্ষর বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

পান্না দাই কলকাতার কোন এক নার্সিং হোমে ধাত্রীবিদ্যার কাজে যায় হয়, কিন্তু তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। তারপর তার অখণ্ড অবসর। ওই সামান্য কয়েক ঘণ্টার কাজে কীই বা সে আয় করে—আর কী করেই বা তার সংসার চলে তার সন্ধান আমরা রাখি না; তবে তার একমাত্র ভাই-যিনি বাকি যুদ্ধফেরত ক্যাপ্টেন সীল তিনিও ধাত্রী পান্নার গলগ্রহ হয়ে থাকতে ছেলে বুড়োর আড্ডাও বজলিশীতে অমান, ইংরেজের যুদ্ধের বীরত্ব সম্পর্কীয় গাল গল্পে কাপ কাপ চা আর বিস্কুট এই দুর্মূল্যের বাজারেও শ্রোতাদের জুগিয়ে যান মীডওয়াইফ পান্নাবতী সীলের আনুকূল্যেই।

এক একদিন এই নিয়ে ভাই বোনে তুমুল ঝগড়া ধাঁচি সৃষ্টির হয়, ক্যাপ্টেন জয়দেব সীলকে তখন মিলিটারী পোশাকে একটা ব্যাগ হাতে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। পান্নাবতীর কণ্ঠস্বরে গাল মন্দের ঝড় বয়ে চলে, জন্মের মতন যা আর যদি কিরিস তা হলে খ্যাংরে বিষ ঝাড়বো।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ভবদহের বেলা আবার তাদের ভাঙা বারান্দায় ডাইনিং টেবিলে ভাই বোনকে চায়ের আসরে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হতে দেখা যায় আর পাড়ার ছেলের দল যখন গুটি গুটি আবার চায়ের লোভে সেখানে এসে হাজিরা দিতে সুরু করে তখন পান্নাবতী শীল গলার স্বর সপ্তমে তুলে প্রসাধনের গন্ধ ছাড়িয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে পড়ে যাত্রী বিদায় বিবর্ণ ব্যাগটিকে হাতে নিয়ে। কোথায় যায় সে—তা অবিশ্যি আমাদের কারুরই জানা নেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরের সোজা রাস্তা ধরে মাইলখানেক পান্নাবতী বিবর্ণ ব্যাগ হাতে কোথায় এগিয়ে চলে তার সন্ধান আমরা কেউ রাখি না—আমাদের তখন চায়ের আসরে ক্যাপ্টেন শীলের বীরত্ব ব্যঞ্জক যুদ্ধের গল্প শোনার প্রতিই আগ্রহ বেশি।

উত্তরের রাস্তার শেষ প্রান্তে বস্তী এলাকায় পান্নাবতীকে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়। সেখানে নোংরা বেশভূষার নোংরা ছেলেদের কণ্ঠে ছড়ার ছবরা ?

পান্নাবতী দাই
বিয়ে কিছু নাই
খপ্ খপে দ্যাত
চলে চ্যাং চ্যাং।

পান্নাবতী গলার স্বর সপ্তমে তুলে ছেলেদের তেড়ে যায়। আর বিশেষ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় যার উদ্দেশ্যে গালাগাল বর্ষণ করে, সে লোকটি তখন পান্নাবতীর দৃষ্টির আক্রমণ থেকে ভয়ে লজ্জায় ঘরের কোণে আত্মগোপন করে থাকে।

টানা মিনিট পনের ধরে পান্নাবতীর গালাগালবর্ষণ চলতে থাকে, হারাধনজোড়া বিনোদ, সুরেশের পালের জন্ম দিয়েছে। সুরেশের বাচ্চাগুলো নরকের কীট, নর্দমার পোকা।

নর্দমার পোকারাও তখন বাড়ির মধ্যে বাপের কোলের কাছে আশ্রয় নেয়।

বস্তীপল্লীর সকলকে ছেড়ে শুধু এই একটিমাত্র পরিবারকে আক্রমণ করার যে কী সঙ্গত কারণ তা কিন্তু কারুরই বোধগম্য নয়।

বরং বস্তীর অপরাপর ছেলেমেয়েদের তুলনায় নরেশ পালের ছেলে মেয়েগুলো অপেক্ষাকৃত ভদ্র এবং শান্ত এবং প্রকৃতপক্ষে যাত্রী পান্নাবতীকে তারা অত্যন্ত সমীহের চোখেই দেখে থাকে।

বস্তীতে বাস করলেও নরেশ পাল ভদ্র বংশজাত। অবস্থার বিপাকে তাকে এই দরিদ্রপল্লীতে দরিদ্রতম হয়ে বসবাস করতে হয়।

কারখানার কর্মী নরেশ পাল মধ্যবয়স্ক। এককালে পান্নাবতীদের প্রতিবেশী ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ অন্তরঙ্গতা এবং আত্মীয়তার ভাবও ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় সদ্ভাবের বন্ধন দুই পরিবারের মধ্যে। পান্নাবতী আর নরেশপাল প্রায় সমবয়সী।

মধ্যে বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে উঠলো যখন পরিণত বয়সে নরেশ পাল যৌবনবতী এক মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠলো। আর বছর বছর পিতৃত্বের অধিকারী হয়ে সংসারের ভারবাহী জন্তুতে পরিণত হতে লাগলো।

লম্বা দোহারা চেহারা নরেশ পাল—শান্ত এবং ভদ্র। কারুর সাতে পাঁচে থাকে না। দেবার ধারে

পৈত্রিক ভিটে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় ছ'শাতটি ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীর হাত ধরে উত্তরের সীমান্তে এই বন্ধী পল্লীতে এসে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে।

স্ত্রীর স্বভাবটিও স্বামীরই মতন। প্রৌঢ়ী চেহারায় এখনো তার যৌবনের যাদন। সাতটি সন্তানের মা হয়েও আর অভাবের তাড়নাতেও তার দেহের সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি।

পান্না দাইকে সে রীতিমত ভয় করে; আর তাকে দেখলেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে আরও গোপনে তৎপর হয়ে ওঠে।

কিন্তু পান্না দাই-এর নিত্যকারের আক্রমণ একই সুরে চলতে থাকে।

নরেশ পাল কিংবা তার স্ত্রী নয়া পাড়ার ছ চার জন লোক কখনো সখনো পান্নাবন্ধীকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার কুরধার রসনার কাছ থেকে সবাই সভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাই এখন প্রায় নিত্যকারের এই পরিস্থিতি সকলেরই গা সহা হয়ে গেছে।

আকাশ-ভাঙা বর্ষার রাতে সেদিন ক্যাপ্টেন শীলের চায়ের টেবিলে আমাদের আসর জম-জমাট হয়ে উঠেছিলো।

বিকেলের দিকে কালবৈশাখীর ঝড় তারপর একটানা বৃষ্টি। ক্যাপ্টেন শীলের আসর থেকে আমরা কেউ আর উঠতে পারিনি।

পান্না দাই কিছুক্ষণ গালাগালমন্দ করে হেরেছিলো। প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে তারপর বৃষ্টির সঙ্গে। এই বৃষ্টিতে সেও বাড়ির বার হতে পারেনি।

হঠাৎ বাড়ীর বন্ধ দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম।

ক্যাপ্টেন শীল দরজা খুলতে দেখা গেলো বিমর্ষমুখে সর্বাঙ্গসিক্ত একটি কিশোর ছেলেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে।

'দাইমা আছেন?'

'কেনরে?'

'বাবা বললেন শীগগীর আমাদের বাড়িতে আসতে।'

পান্না দাই ঘরের মধ্য থেকে বার হয়ে এলো। কিন্তু ছেলেটিকে এক নজরে দেখেই রাগে যাকে কাটা হয়ে উঠলো—'দূর হ। দূর হ হারামজাদা আমার বাড়ি থেকে।

ক্যাপ্টেন শীল বাধা দিতে চেয়েছিলেন আমরাও কিছু যুক্তি বা বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু পান্নাবন্ধীর কুরধার রসনার কাছে দাঁড়ায় তখন কার সে সাধ্য?

তবু ছেলেটি বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, 'আমার মা যন্ত্রণায় কাঁদছে—হাত পা ছুঁড়ছে বাবা বললেন—শীগগীর যা—'

চায়ের টেবিলে ক্যাপ্টেন শীলের মিলিটারী রুলটি নিয়ে পান্না দাই ছেলেটিকে তেড়ে গেলো, 'বেরো বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে। শূয়রের বাচ্চার আস্পর্ধা কতো—বলে কিনা তাদের বস্তীতে যেতে, দূর হ, দূর হ।'

ছেলেটি ভয়ে পালালো, আমরাও সেই আকাশভাঙা বৃষ্টির মাঝে ক্যাপ্টেন শীলের চায়ের আসর থেকে সভয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

এক নাগাড়ে ধাত্রী পান্না গলার স্বর প্রথমে তুলে অকথ্য ভাষায় নরেশ পালকে আক্রমণ করে চললো।

তিনদিন তিনরাত্রি আমরা আর ধাত্রী পান্নার কোন গলার স্বর শুনতে পাইনি—তার চেহারাও দেখতে পাইনি।

যেদিন আবার তাকে দেখলাম বস্তীপাড়া থেকে ফিরতে সেদিন তার হাতে নার্সের সেই বিবর্ণ ব্যাগটি নেই—পরণে আঁট সাঁট কাপড়—ব্যাঙের মতন থপ থপে দেহে একটা আণ্ডের সংঘম—দুটি হাত জুড়ে বুকের ওপর ন্যস্ত একটি সদ্যজাত শিশু—নরেশ পালের স্বর্গত স্ত্রীর অষ্টম গর্ভের সন্তান।

পিছনে বস্তীর কয়েকটি নোংরা ছেলে মেয়ের দল শুধু ভাঙা গলায় গেয়ে চলেছে—

'পান্নাধাত্রী দাই
বিদ্যে কিছু নাই,
থপ থপে ব্যাঙ
চলে চ্যাং চ্যাং।

একদিন ছিল যখন বাংলার রাজা রাজড়ারা ছিলেন সমাজের কর্ণধার বাঙ্গালীর শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিপুষ্ট হতো এই সব রাজাদের আনুকূল্যে। এইসব রাজবাড়ীতে বারমাসে তের পার্বণ—দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবের বন্যায় দেশের জনসাধারণ কতই না আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করতো। যাত্রা, নাটক, কথকথা, রামায়ণগান, কীর্তন প্রভৃতি বাঙ্গালীর লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও ধারা প্রসারতা লাভ করার সুযোগ পেতো এইখানেই।

নাটোরের মহারাজা রাজমাতার কাছ থেকে এই রচনাটি পেয়ে আমরা সত্যিই বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি, সেদিনের রাজবাড়ীর একটি নিখুঁত চিত্র দেখে!

গল্প-ভারতীর পুরাসংখ্যার স্বল্পাভাবে বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তা সত্ত্বেও এই রচনাটি প্রকাশ করে পাঠকদের সামনে একটি সেদিনের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

সেকালের কথা

নাটোর—রাজমাতা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেব্বী

অনুলিখন—বাসন্তী বাগচী

'এই সব ছাইপাঁশ কাগজে লিখ্‌বি আমার নাম করে? কী-ই বা লিখ্‌বি? আজকাল তো মনেও থাকে না কিছু।·· ঢাক পেটাতে আমি ভালোও বাসিনা, আমার কথা আবার কী লিখ্‌বি? তাই কর বাবা, নিজের নামেই লেখ।—আমার নাম নয়। তুমি সি. আই. ডি···সি. আই ডি··

জেরা করে করে লিখে নিচ্ছ সব।

দশ বছর বয়সে বৌ হয়ে এলাম নাটোর রাজবাড়ীতে। রিপ্পি খণ্ডনের জন্য মহারাজ আঠারো বছর বয়সেই বর হলেন। নাটোরে কনে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে দেওয়া হোল। বিয়ের সময় বর এল যখন, সকলে বর দেখতে বেরোলো। আমিও ছুটে বেরোলাম। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ঘোমটার মধ্যে তাকানোর জন্য সে কী বকুনি! শাশুড়ী যত না বলতেন, পাঁচজনে বলতেন তার দশগুণ। তোদের রাজাদাদার কথা আবার কী বলবো! দশ বছরের মেয়ে, ভয় ডর কমই ছিল। ফুল শয্যার রাত্রে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম "মহারাজ, আপনি উপন্যাস জানেন?" মহারাজ হেসে বল্লেন "হ্যাঁ, আমি অনেক উপন্যাস জানি।" "তোহাই মহারাজ একটা উপন্যাস বলেন, আপনের দুটি পায়ে পড়ি।"

আমার বিয়ের সময় নাটোরে সেই প্রথম হাটিছাড়া ভূমিকম্প, উত্তরবঙ্গে বাড়ীঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না—(তাই তো এখনো বড়বৃষ্টি হলেই বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে, সকলকে ডেকে ডেকে বলি, ওরে তোরা খবরদার বাইরে যাবি না, বৃষ্টিতে ভিজবি না। কেবলি মনে হয় ভূমিকম্প···ভূমিকম্প - ঐ বুঝি আবার

হয়!) সেই প্রথম যাবের পরে আর একবার হয়েছিল সেই কনকারেন্সের সময়। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সবাই সেবার এসেছিলেন নাটোরে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির (নাম বলব না) গোসলখানা থেকে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে বেরোনো অনেকদিন পর্যন্ত সকলের হাসির খোরাক জুগিয়েছিল।

আমার বাপের বাড়ী ছিল তাহিরপুরের কাছেই,—মঙ্গলপাড়া। সেখান থেকে রাজবাড়ী দেখা যেত। মামার বাড়ী ছিল নাটোরের কাছেই, লোচনগড়। সকলে 'নোচনগুড়' বলতো। এক লাঠিয়ালের নামেই গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। আমার মা বাবার আমি একমাত্র মেয়ে। বাবা ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। মা গেছেন রাজবাড়ীতেই, চল্লিশ বছর বয়সে, ব্লাড প্রেসারে। ৺ঈশ্বর কবিরাজ, রাণী রুক্মণির আমলের লোক, তাঁকে আমি মামা বলে ডাকতাম। আঁতুড়ে তাঁর মা যখন মারা যান, তখন আমার দিদিমা সেই ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে তিনি মামা। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। আমার বিবাহ-প্রস্তাব তিনিই এনেছিলেন। দশবছর বয়সে বিয়ে হোল। আমার নিজের মামা আমাকে বিয়ের আগে পড়াতেন 'আখ্যান মঞ্জরী'; মামা পড়া তৈরি করতে বলে চলে যেতেন, মামাতো বোনের দেওর, আমারই সমবয়সী ছিল। বই হাতে বসে ভাবছি, সে এসে বল্লো, "বেয়ান, আপনি ভাবছেন যেন? আমি আপনাকে পড়াব।" আমি তো বেঁচে গেলাম! পড়া তৈরি করে ভারি খুসি হয়ে মামার কাছে বই নিয়ে গেলাম। মামা পড়া নিচ্ছেন,—ছেলেটি আমাকে যা পড়িয়েছেন— সবই ভুল। মামা বল্লেন, "পড়া কে দিল?"

—"বেয়াই।"

মামা ডাকলেন "বসন।" (বসন্ত) সে তো বাড়ী ছেড়ে বহুদূরে গিয়ে লুকিয়ে থাকলো। রাত বারোটার সময় তাকে খুঁজে বার করা হোল। সাত দিনের জন্য মামা-বাড়ী এসেছিলাম, তারপর একমাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম ছেলে কোলে এল, তারপর একটি মেয়ে। একই রোগে অকালে দুটি সন্তান মারা যাবার পরে সকলে স্থান পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। শাশুড়ী রাজি হলেন না। কাজেই, একাই কিছুদিন থেকে কোলকাতায় স্বামীর কাছে রওনা হোলাম। মামা কারণে স্বামী আগে থেকেই কোলকাতায় বাস করছিলেন। কোলকাতায় আসার সময় দু'জন ঠাকুরাণী, দু'জন দাসী, তিনজন খানসামা এল আমার সঙ্গে। তখনো আমার ঘোমটা ঘুচলো না কিন্তু। কী করে যে পরে ঘোমটার অন্তর থেকে বাইরে বেরোলাম তা' নিজেই বুঝতে পারি না। প্রথম প্রথম বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করতো। বন্ধুদের সহায়তায় ক্রমশঃ আস্তে আস্তে অভ্যাস হোল। মুঙ্গেরের নারায়ণ সিংহের বৌ-এর সঙ্গে ছিল আমার গলাগলি ভাব। গেটের সামনের ছোট বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে তাঁরা তখন বাস ছিলেন। ব্রাজিলিং যাওয়া হোল, সিমলা যাওয়া হোল, দূর দেশে বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে সব অভ্যাস হয়ে গেল। আগে ওঁদের টি-পার্টিতে নিয়ে যেতে যখন চেষ্টা করেছেন···ক্রমে রাজি হয়েছি। প্রথমে একদিন মিলিত পার্টিতে গিয়েই বলেছিলাম "আমি বাড়ী যাব, আমার ভাল লাগছে না।" পরে আবার আমাদের বাড়ীতে একটা পার্টি হোল,—মহিলা পার্টি। একটি মহিলা সমিতিতে আমাকে করলো প্রেসিডেন্ট। গাড়ী এসে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়ালো, অমনি চারদিকে কানাত পড়ে গেল। লাট সাহেবের মেম এসেছিলেন, আমার খুব প্রশংসা করলেন। পার্টিতে এক মেম সাহেব একটু একটু বাংলা জানতেন; কাছে বসিয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "তুমি কেমন আছ?"···আশু চৌধুরীর বাড়ীর মেয়েরা এসে সহরে সাজসজ্জার হাতে খড়ি দিলেন। ব্রোচ পৌঁজা, কুঁচিয়ে সাড়ী পরা। মিসেস পি কে রায় টুপি পরতেন। কেউ কেউ ওড়না পরতেন। আমি তো বাঁ পায়ের জুতো ডান পায়ে, ডানপায়ের জুতো বাঁ পায়ে পরে বসে থাকতুম।

আমাকে ওঁরা প্রেসিডেন্ট করলেন চিত্তরঞ্জনের আরো অনেক মেয়ে আসবেন, এই আশায়। প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে যখন আমাকে চেয়ারে বসায়, কিছুতেই বসব না, জোর করে ধরে নিয়ে গেল। মহারাজকে বাড়ী ফিরে সব জানালুম, মহারাজ খুব হাসলেন। সেই সমিতিতে একটি ছোট্ট এতটুকু ঘোমটা দেওয়া বৌ এসেছিল, আমি গিয়ে কোলে নিলাম। সমিতিতে কী কাজ হবে সম্পূর্ণ স্থির হওয়ার আগেই সমিতি ভেঙে গেল। সবাই বল্লেন, এ সব এখন চলবে না। সভানেত্রীর ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন মহারাজ। তখন স্বদেশী আন্দোলন একটু একটু আরম্ভ হয়েছে। তখন ওরা মেয়ে জোগাড় করতে চায়, ছেলে তো আছেই। আমাদের সমিতিতে আসতেন সরলাদেবী, ইন্দিরা দেবী। আরো অনেকেই আসতেন। জোড়াসাঁকোর মেয়েরা তখন কুঁচি দিয়ে কাপড় পরতেন। এটি প্রথম শিখে এলেন ওঁদের বৌ জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী। মাথায় কাপড় থাকতো, মুখে ঘোমটা দিতেন না। জামা পরার প্রথা আগেও ছিল। আমি নাটোরে তখন রীতিমত বৌ। মা যদি বলেন "বৌমা, খাটের উপর থেকে ঐ কুর্তাটা নিয়ে এস।" কুর্তা! খাটের উপরে, পাশে কোথাও কুর্তা খুঁজে পেলাম না। খাটের তলায় উঁকি মেরে শির দিয়ে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। 'নিত্য' বি তখন খাটের উপর থেকে জামা এনে দিল। "এই তো—তুমি বল্লে নাই?" আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো বলে 'শিরাণ', কী করে বুঝবো শিরাণকেই কুর্তা বলে? অনেক পরে সেমিজ, কামিজ, জ্যাকেট, ব্লাউজের চলন হোল। কুর্তা যা শিরাণ ছিল অনেকটা গেঞ্জির মত।···আর একদিন মা যদি বলেছিলেন "বৌ মা, ঐ হাত বাক্স থেকে বন্দীটা নিয়ে এস।" 'বন্দী' আবার কী রে বাবা! উপায়ান্তর হাত নেড়ে জানালাম নেই। তখন শাশুড়ীর মুখে মুখে কথা কওয়ার চলন ছিল না। মা যদি নিজে গিয়ে বাক্স খুলে সীথি পাটি নিয়ে এলেন।

কোলকাতায় মহারাজের বন্ধু ছিলেন অনেকে, কত নাম করব!···চৌধুরীরা ছিলেন আমার আত্মীয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মা ছিলেন আমার ধর্ম মা। তাঁকে 'দাদা' বলতাম, তিনি ডাকনাম ধরে 'বসন' বলে ডাকতেন।···না না বসন্ত আমার নাম ছিল না, আমার শিশুকালে আমার বাবার মামা আমাকে দেখলেই গান ধরতেন—

"বসন পর মা বসন পর, বসন পর তুমি
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি।"

তিনি শাক্ত ছিলেন।···আমার চেয়ে বয়সে যারা বড়, সকলেই নাম ধরে ডাকতেন। আমি রবীন্দ্রনাথের সামনে বেরিয়েছি মহারাজ যারা যাবার অনেক পরে, ছেলের অনুরোধে। 'রবিঠাকুর' রোজই আসতেন। একদিন কে এসে বলেছে "রবিঠাকুর এসেছেন।" "এঁ্যা, কোথায়?"

"ঐ যে নীচে বসঘরে।" বাড়ী সুদ্ধ সবাই উঁকি মেরে দেখতে ছুটলো। আমার মেয়ে আপার মস্তক দেখে বল্লো, "ধ্যেৎ, এ তো মানুষ, ঠাকুর কই?"

একদিন গিয়েছিলাম জোড়াসাঁকোয়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে কখনো দেখিনি, বেরোতেন না কোথাও। যখন মারা গেলেন, তাঁর মেজো মেয়ে রাণীর যত্ন সত্ত্বেও করে সবাই চেঞ্জে নিয়ে যেতে বল্লেন। মহারাজ তখন রাণীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আমাদের মধুপুরে দুই মাস থাকার ব্যবস্থা করে ওখানে রেখে এলেন। দু'মাস পরে সুস্থ হয়ে ফেরার সাতদিন পরেই রোগের আবার বাড়াবাড়ি হোল। আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবার আগের দিন রাণী গান গেয়েছিল "তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি যাই।" "কাল তো চলেই যাব, আজ একটি গান গাই।"···মহারাজ যখন রাণীর সঙ্গে কথা বলতেন, মনে হোত যেন

সমবয়সী ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে।···শিলাইদহে বোট দুখানা ছিল নদীর ধারে। রবীন্দ্রনাথ একবার বল্লেন "রাজন্, চলুন বোটে গিয়ে থাকা যাক কিছুদিন।" উনি গেলেন, আমি যাইনি।···একদিন মহারাজের বন্ধুরা মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, 'ডাকাত সেজে অন্দর বাড়ীতে যাব।' আমার ছেলে ভয় পেয়ে মুখ শুঁকলো, মেয়ে কিন্তু চিনে ফেললো সবাইকে। আমি বল্লাম "ছেলে মেয়েকে ভয় দেখানো চলবে না।" সুধীর চৌধুরী, রজলাল রায়, ডাক্তার সরস্বতী, রজনী মজুমদার, নীলকমল খানসামা,—মহারাজ সবাইকে বলে রাখলেন "আমি যখন পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করব,—শুনবামাত্র তোমরা এসে পড়বে।" যথা সময়ে হৈ হৈ করে ডাকাতেরা এসে পড়লেন, গয়না ইত্যাদি খুলে নিলেন। রান্নাবাড়ীতে গিয়ে খানসামার বৌএর হাতের রূপার চুড়ি খুলে নিলেন। আস্তাবলে, ধোপা-নেথর মহলে কান্নাকাটি।·····

রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মহারাজের একবন্ধু যতীন্দ্রনাথ বসু (লোকটি খুব হাসাতেন রগড়ের কথা বলে।) সবাই ভিক্ষে করতে বেরোলেন। ঃ তামাসা ছাড়া ওঁরা তো থাকতে পারতেন না।··· অপরাধের মধ্যে আমি বলেছিলাম "অনেকদিন কীর্ত্তন শুনি নি, শুনতে ইচ্ছে করে।" সন্ধ্যার পর এইঘরে বসে আছি, মহারাজ বেড়িয়ে এসে ঐ বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন! বল্লেন, "আজ খুব ভাল কীর্ত্তন শুনলাম।"

"আহা, আমার শোনা হোল না।"···আমার ছেলের মাষ্টার মহাশয় রজনী মজুমদার এসে বল্লেন, "মা, কয়েকজন ভদ্রলোকের ছেলে এসেছে, খুব ভাল কীর্ত্তন গায়।"

"কোথায় বসানো হবে?"

"বাজনা নিয়ে এসেছে, দাঁড়িয়ে গাইবে।" বারাণ্ডার নীচে বাগানে দাঁড়িয়ে অনেক গান হোল, উপর থেকে কিছু গান আমি ফরমাস করে গাওয়ালাম। মাথায় পেরুয়া পাগড়ী, কালো আলখাল্লা পরণে, সুরের ঠাকুরের হাতে এস্রাজ, মহারাজ নিয়েছিলেন তুর্কীতবলা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যতী বসু ছিলেন গানের দলে।

রজনী মজুমদার কিছু রেজগী পয়সা এনে ওঁদের দিলেন। যতী বোস কপট মেজাজ দেখিয়ে বল্লেন "নাটোরের নামশুনে এসেছি, এখনো আশা ছাড়িনি, আশা আছে মনের মত বখশিস পাব। পঞ্চাশ টাকা দিতে বল্লাম, তার আগেই রেজগী পয়সা পেয়ে রাগ করে মুদির দোকানে গিয়ে ওঁরা গান গেয়ে ভিক্ষা করে চাল ডাল আনলেন। তারপর গেলেন সি, আর, দাশের বাড়ী। সি. আর. দাশের বেয়ারা বক্সী চিনতে পেরে মহারাজের হাত ধরলো, মহারাজ চোখটিপে ইসারা করলেন প্রকাশ না করতে। কাশ্মীর থেকে এক ডাক্তার এসেছিলেন, ওরা তারপরে গেলেন তাঁদের বাড়ী। ডাক্তারের স্ত্রী ছিলেন বেজায় চালাক, ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গান শেষ হবার পরে থালাভরে খাবার এনে নাম করে করে ডেকে পরিবেশন করলেন ছদ্মবেশধারীদের।

ফরমায়েসী গল্প

গল্পের ফরমায়েস অনেক এসেছে। তা লিখেছি। সংসারে-সমাজে বাস করতে গেলে অনেক রকম কর্তব্য পালন করতে হয়। বন্ধুকৃত্যও তো এক রকমের কর্তব্য।

কিন্তু এবার অন্যরকম।

ঠিক এইভাবে এমন লোকের কাছ থেকে যে এ অনুরোধ আসবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর এ-ঘটনাটা না ঘটলে জানতেও পারতাম না যে সংসারে এত রকমের দুঃখও আছে।

দুঃখ এখানে অনেক রকমের। খাবার দুঃখ, না খাবার দুঃখ, সুখের দুঃখ, অসুখের দুঃখ। তবেক রকমের দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে দুঃখের এন্সাইক্লোপিডিয়া প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন দুঃখের কাহিনী আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম।

একই ট্রেনের একই কামরায় আমরা দু'জনে আসছিলাম।

নাম-ধাম সুটকেসের ওপরেই লেখা ছিল: ললিত মোহন ভট্টাচার্য। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ পোষাক দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে ভদ্রলোক টাকাওয়ালা। টাকাওয়ালা লোকদের বোধহয় চেহারাই আলাদা হয়। টাকার গন্ধ বোধহয় শিশুতেই না থেকে মোছা যায় না।

কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনাতেই প্রথম প্রমাণ পেলাম যে টাকাটাও ব্যক্তি-বিশেষের কাছে কত হেলা-ফেলার জিনিস।

ললিতবাবু হঠাৎ কথায় কথায় বললেন—আমার জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন মশাই? প্রস্তাবটা শুনে আমি চমকে উঠেছি।

ললিতবাবু বললেন চমকে উঠলেন কেন? ভাবছেন আমার জীবনে কোনও ঘটনা নেই? জানেন, আজকে আমাকে সবাই কোটিপতি বলে জানে, কিন্তু এককালে আমিই ডাকাত ছিলাম?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

বললাম- বলছেন কী!

ললিতবাবু বললেন—হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, বাজারে যে-সব উপন্যাস বেরোয় তার চেয়ে অনেক ভালো উপন্যাস হবে। আমাকে দেখতে এই রকম নাদুস-নুদুস, কিন্তু কে দেখলে বিশ্বাস করবে বলুন তো যে আমার জীবনে এত রোমান্স আছে? লিখবেন?

আমি আর কী বলবো। চুপ করে ছিলাম।

ললিতবাবু আবার বললেন—লিখুন না, যা খরচা লাগে ছাপাতে তা না-হয় আমিই দেব। দেখবেন সমস্ত লোক যারা বই পড়বে তারা কত মনের খোরাক পাবে।

আমি তখনও চুপ করে ছিলাম।

ললিতবাবু ততক্ষণে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন আমার সঙ্গে। অনেক খাইয়েছেন। একসঙ্গে আমরা

অনেক দূর থেকে আসছি। একটা দিন একটা রাত এক বাড়িতে এক কামরায় কেটেছে। দু'জনে দু'জনের সঠিক পরিচয় পেয়ে গিয়েছি।

বললেন—আরে মশাই, সংসারের কিছুই তো সঙ্গে যাবে না, একদিন চোখ উল্টোলেই সব অন্ধকার। তা হলে কীসের আর অহঙ্কার করি। নইলে আমার কাছে সত্তোর-আশি লাখ টাকা কিছুই নয়—

হালের অবস্থা সবই বললেন ললিতবাবু। বিরাট লোহা-লক্কড়ের কারবার। চালু ব্যবসা, দেখা-শোনাও বেশি করবার দরকার হয় না। ছেলে বড় হয়ে গেছে। মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যাকে এক-কথায় বলে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ। যুদ্ধের সময় টাকায় একশো টাকা মুনাফা করেছেন তিনি। চল্লিশখানা বাড়ি করেছেন কলকাতা সহরে। চারটে গাড়ি বাড়িতে, কারখানায় বারোশো স্টাফ। আরো অনেক কিছু।

বললেন—এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়, বলেও বেড়াই না কাউকে। কিন্তু যখন শুনলাম আপনি লেখক তখন বলছি। কারণ অন্য কেউ তো এর আলো বুঝবে না।

জিজ্ঞেস করলাম—আলো? আলা বলছেন কেন?

ললিতবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো আমার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্যে আপনাকে এত খোশামোদ করছি। এর থেকে আগে অনেক সুখে ছিলাম মশাই যখন ট্যাঁকে আমার একটা পয়সা ছিল না।

একটু আগ্রহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

ললিতবাবু বললেন—যদি উপন্যাস লেখেন তো বলি—

বললাম—কাহিনীটা তো আগে শুনি—

PUJA GREETINGS

We wish you Happy & Prosperous
Puja Season

We invite you to visit our Bank for any reason.

"However" small or big you may be
We open our door for everybody,

THE BANK OF INDIA LIMITED

70-80, MAHATMA GANDHI ROAD, BOMBAY-1

T. D. KANSARA
CHAIRMAN

R. GERSAPPE
REGIONAL MANAGER
(Calcutta Circle Branches)

ললিতবাবু বললেন—আমি কিন্তু ব্যবসাদার লোক মশাই, বেটা যদি সেটা একেবারে না করে ছাড়ি না। আপনি যদি রাজি থাকেন তো বলুন। একটা চুক্তি করে ফেলি—

আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারলাম না।

ললিতবাবু বললেন—এখন যদি কথা না-দিতে পারেন তো পরে না-হয় ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবেন। কিন্তু কাহিনীটা আগে শুনে নিন্—

বললাম—বলুন—

ললিতবাবু গল্প বলতে লাগলেন। সত্যিই বড় রোমাঞ্চকর জীবন ললিতবাবুর। ছোট বয়সে বাপ-মা মারা গিয়েছিল। তখন থেকে অনাথ। পরের বাড়ি গলগ্রহ হয়ে মানুষ। সেই ছোট বয়সেই গরু চরিয়ে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে পেট ভরাতে হতো।

সেই সময়ে একদিন ডাকাতের দল তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। ডাকাতের দলের সঙ্গে চলে গেলেন বর্মায়।

বললেন—হাঁ মশাই, আমাকে একেবারে বর্মায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলে তারা।

জিজ্ঞেস করলাম—তখন আপনার কত বয়েস?

—এই ধরুন, আট কি ন'বছর।

—তারপর?

—সেই বয়েস থেকেই তাদের সঙ্গে ডাকাতি সুরু করলুম। সেখান থেকে মাঝে-মাঝে ইণ্ডিয়াতে আসতুম ডাকাতি করতে। এই হাতে মশাই একদিন দু'শো লোক খুন করেছি, তা আমাকে দেখে আপনি এখন বিশ্বাস করতে পারবেন?

—কী করে খুন করতেন?

ললিতবাবু বললেন—পিস্তল দিয়ে। পিস্তল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমার এমন টিপ্ হয়ে গিয়েছিল যে দু'শো গজ দূরে আপনার মাথায় কমলালেবু রেখে আমি সেটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে পারতুম—

গল্প শুনতে শুনতে আমার তখন খুব আগ্রহ বেড়ে গেছে।

বললাম—আপনাকে এখন দেখে কিন্তু কিছু বোঝা যায় না—

ললিতবাবু বললেন—আরে, এখন তো দুধ-ঘি খেয়ে খেয়ে চেহারা বেঢপ হয়ে গেছে। জানেন, একবার আমরা একটা জাহাজ এ্যাটাক্ করেছিলাম। তিরিশ জন আমেরিকানকে আমি একলা খতম করেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন মেমসাহেব ছিল। আমাদের দলের সর্দার যখন তাকে খুন করতে যাচ্ছে তখন আমি তার দিকে পিস্তল তুলে বলেছিলুম—যদি তুমি এই মেমসাহেবকে মারো তো আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো—

বললাম—বাঙালীর ছেলেদের তো এমন সাহস দেখা যায় না!

ললিতবাবু বললেন—নামেই শুধু ছিলুম বাঙালী মশাই। বাঘা-বাঘা বর্মীরা পর্যন্ত আমার ভয়ে কাপড় নষ্ট করে ফেলতো। একটা আস্ত পাঁঠা আমি হজম করেছি একবারে। একসের ঘি একলা চুমুক দিয়ে খেয়েছি, একটা ঢেঁকুরও ওঠেনি।

বললাম—ডাকাতি ছাড়লেন কেন?

ললিতবাবু বললেন—সে এক বিচিত্র রোম্যান্স মশাই। মানে প্রেম।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম—প্রেম? আপনি প্রেমে পড়লেন?

ললিতবাবু বললেন—আমি প্রেমে পড়িনি মশাই, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়লো। সেই জন্যেই তো বলছি, আপনি যদি আমার জীবন-কাহিনীটা লেখেন তো দেখবেন এ সাধারণ কাহিনী নয়। আমি বাঙালী ঘরে জন্মে যা দেখেছি যে-ভাবে জীবন কাটিয়েছি, তা আর কোন বাঙালী সেভাবে দেখেনি, সেভাবে জীবনও কাটায়নি।

তারপর সেই বিচিত্র কাহিনী বলতে লাগলেন ললিতবাবু।

ডাকাতদের দলে রাণী বলে একটা মেয়ে ছিল। তাকেও আমার মত একদিন তারা চুরি করে এনেছিল। ছোটবেলা থেকে দলে থেকে থেকে সেও আমার মত বন্দুক চালাতে শিখেছিল, মানুষ খুন করতে শিখেছিল। একদিন জঙ্গলের ভেতরে রাত্রে আমরা ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ কার ছোঁয়া লেগে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি রাণী। রাণী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করতে বলছে।

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম—কী?

রাণী বললে—চেঁচিও না, ওরা শুনতে পাবে। সমুদ্রের ধারে চলো। ওখানে গিয়ে বলবো—

আমি বুঝতে পারলুম না কী বলতে চায় সে।

আস্তে আস্তে তার পেছন-পেছন গেলাম।

একটি তালগাছের তলায় এসে সে দাঁড়ালো। আশে-পাশে কাছে-দূরে কেউ কোথাও নেই। সামনে শুধু বিশাল সমুদ্র। তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে রাণীর মুখে-গালে পড়ছে। রাণীকে হঠাৎ বড় সুন্দর লাগলো আমার।

কিন্তু তখনও জানি না রাণীর কী মতলোব!

॥ শারদীয়ার নতুন বই ॥

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥০ প্রাচীন পারসিক হইতে (কবিতা) ৫॥০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪॥০

শঙ্কুমহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

অন্য ভুবন ৪॥০

বিমল করের উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪৲

'তন্ত্রাভিলাষী' প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥০

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙ্গালী জীবনে রমণী ১০৲

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥০

তাকাতি করে করে তখন আমার মনের কোমল বৃত্তিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বললাম—কী বলতে ডেকেছিলে, বলছ না তো ?

রাণী হঠাৎ আমার হাত দু'টো চেপে ধরলে।

বললে—ললিত, আমার কিছুই ভালো লাগছে না—

আমি তো অবাক। এই কথাটা বলতে সে আমাকে এতদূরে ডেকে এনেছে নাকি ?

বললাম—এই সামান্য কথাটা বলতে এতদূরে আসবার কী দরকার ছিল ?

রাণী হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো।

বলে থামলেন ললিতবাবু।

বললাম—তারপর ?

ললিতবাবু বললেন—আমার মুখ দিয়ে এ-সব কথাগুলো শুনতে আপনার হয়ত ভালো লাগছে না। তার চেয়ে আমি যদি কতবার লণ্ডন গিয়েছি, আমেরিকায় গিয়েছি, সেখানকার হোটেলে কী কী খেয়েছি, সে-সব দেশে কী কী জিনিস দেখেছি তা বললে আপনারও শুনতে ভালো লাগতো। কিন্তু সে-সব তো আমার মতন হাজার-হাজার লোক দেখেছে। আজকাল তো আমেরিকায় যাবার লোকের অভাব নেই কলকাতায়। আর আমার মত টাকাও আছে বহু লোকের। কিন্তু এখন যা বলছি আপনাকে এ আপনি আর কারো কাছে শুনতে পাবেন না। ভাগ্যচক্রে পড়ে এমন করে ডাকাতের দলের মধ্যে ডাকাতিও করতে হয়নি কাউকে।

বললাম—তারপর কী হলো বলুন।

ললিতবাবু বললেন—রাণীকে আমি কখনও অন্য চোখ দিয়ে দেখেনি মশাই। রাণী পুরুষ-মানুষ কি মেয়েমানুষ তাও কখনও আগে ভাবিনি। কিন্তু সেদিন মাঝ রাত্তিরে সেই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি যেন হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে গেলুম। আমি এখন সংসারী লোক। আমার আওতায় এখন কত স্টাফ কাজ করছে। আমি তাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তারা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে আমিই একদিন ডাকাত ছিলুম—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

ললিতবাবু বললেন—আমার এই হাত দিয়ে যে কত লোককে যে খুন করেছি তার গোণা-গুণতি নেই। এখন টাকার জোরে সে-সব রক্তের দাগ মুছে ফেলেছি। পৃথিবীতে টাকা থাকলে সব দোষ ধুয়ে-মুছে যায়। অথচ বিশ্বাস করতে পারবেন সমুদ্রের নাবিকরা একদিন আমার নাম শুনলে ভয় পেত ?

বললাম—তারপর সে রাণীর কী হলো বলুন—

ললিতবাবু বললেন—ওঁ বলি, আর সময়ও নেই বেশি, ট্রেণ এবার দাওড়ায় এসে পৌঁছবে। সেই রাণীর কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিই।

রাণী বললে—ললিত, আমার কিছু ভালো লাগছে না—

আমি বললাম—এই সামান্য কথাটা বলবার জন্যে এত দূরে আসবার কী দরকার ছিল ?

রাণী হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। সে তার ব্লাউজের ভেতর হাত পুরে দিলে। পুরে দিয়ে কী একটা জিনিস বার করে আনলে। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এটা তুমি নাও, তোমাকে আমি দিলাম—

জিনিসটা হাতে নিয়ে বললাম কী এটা।

রাণী বললে—একটা হীরে।

—এটা আমায় দিচ্ছ কেন ?

রাণী বললে - এ একটা অদ্ভুত হীরে। শুনেছি এ-হীরে কাছে থাকলে কেউ মরে না।

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কোথা থেকে পেলে তুমি এটা ?

রাণী বললে—দেবনগরের মহারাণীর গলায় এটা ছিল। তাকে খুন করার আগে এটা আমি কেড়ে নিয়ে ছিলুম। আমাদের দলের কেউ জানতে পারেনি—

বললাম—কিন্তু এত লোক থাকতে এটা তুমি আমায় দিচ্ছ কেন ? নিজেই রাখতে পারতে ?

রাণী বললে—আমার প্রাণের আর দাম কী, বলো। বরং তোমার কাছে থাকলে তুমি বিপদ-আপদ থেকে বাঁচবে !

বললাম—তোমার প্রাণের দাম কি আমার প্রাণের চেয়ে কিছু কম বলতে চাও ?

—কম নয় ? আমার কে আছে বলো না। আমি কীসের জন্যে বাঁচতে চাইবো ? তুমি বেঁচে থাকো, তাহলেই আমার সুখ।

কথাগুলো শুনে আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো, তবে কি যা সন্দেহ করছি তাই সত্যি ?

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

কিন্তু তখন আর খেয়াল ছিল না। গল্প শুনতে শুনতে মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম—হাওড়া ষ্টেশন এসে গেছে। হৈ-চৈ ভিড়। কুলিদের চিৎকার।

ললিতবাবু শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখলাম তার মুখ-চোখের চেহারা আমূল বদলে গেছে।

বললাম—তারপর কী হলো বলুন ?

ললিতবাবু বললেন—আজ থাক্, এর পরে অনেক কাণ্ড আছে ! আমার জীবন এক বিচিত্র রহস্য মশাই, একদিন সবটা বলবো আপনাকে। দেখবেন খুব ইণ্টারেষ্টিং আর থ্রিলিং ঘটনা আছে।

তারপর বললেন—এই নিন্ আমার কার্ড, একদিন সময় করে যদি দেখা করেন···

বলতে বলতে আর শেষটা বলা হলো না। গুড়মুড় করে তখন লোকজন ঢুকে পড়েছে গাড়ির মধ্যে। চাপরাশি, বেয়েরা, ম্যানেজার, সরকার, একগাদা লোক।

তারা এসেই ললিতবাবুকে সেলাম করলে—সেলাম হুজুর।

আমি ব্যাপার দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। লোহা-লক্কড়ের কারবারী ললিতবাবু। যাঁর সঙ্গে এতক্ষণ এক গাড়িতে এসেছি তিনি হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন পঞ্চমবাহার আমার চেয়ে অনেক উঁচু হয়ে গেলেন।

ললিতবাবু যাবার আগে হঠাৎ আমার দিকে ফিরলেন।

বললেন—আসি, যাবেন কিন্তু ঠিক ঐ ঠিকানায়—

দেখলাম তাঁর অফিসের বড় বড় সব অফিসার টাইপের লোক তাঁকে ঘিরে নিয়ে চলতে লাগলো। সামনেই রাস্তার ওপর বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে তিনি উঠলেন। আর গাড়িটা ছেড়ে দিলে।

হাতের কার্ডখানার দিকে চেয়ে দেখলাম। লেখা রয়েছে—ললিত কুমার ভট্টাচার্য, প্রিমিয়ার হার্ড-ওয়ার মার্চেণ্টাইল্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ১৮বি নং স্ট্র্যানড্ রোড।

আস্তে আস্তে আমি কুলির মাথায় মাল-পত্র চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম।

কথাটা আমার মাথায় বহুদিন ঘুরছিল। সেই ডাকাতির কাহিনী, সেই ডাকাতের হলেং বাঈর উপাখ্যান, এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আমার আর কিছু মনে হয়নি। অন্ততঃ এ কাহিনী ১৮বি নং স্ট্র্যানড্ রোডের প্রিমিয়ার হার্ড-ওয়ার মার্চেণ্টাইল প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক ললিত কুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শোনবার আশা করা তো একেবারেই অস্বাভাবিক।

গল্পটা মারপথে শেষ হয়ে যাওয়াতে মনটাও একটু খুঁত-খুঁত করছিল। বাকিটা একদিন শোনবার জন্যে উৎগ্রীব হয়েছিলাম। কিন্তু সব সময় কি সব ব্যাপারে সময় পাওয়া যায়? সময় করে একদিন ললিতবাবুর কাছে যাবো-যাবো করেও যাওয়া হলো না।

শেষকালে এক বন্ধুর কাছে একদিন গল্পটা বললাম।

এককালে শৈলেশের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিলাম।

বললাম—মানুষের অতীত-জীবনে যে কত রহস্য থাকে তা মানুষের মুখ দেখে বোঝা যায় না—

বলে ললিতবাবুর সঙ্গে ট্রেণে দেখা হওয়ার কাহিনীটা বললাম।

শৈলেশ শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে- ললিতবাবু? ললিত কুমার ভট্টাচার্য? প্রিমিয়ার মার্চেণ্টাইলের মালিক তো? আমার পিসেমশাই হো ওর পার্টনার—আমার পিসেমশাই ওঁকে ছোটবেলা থেকে জানে—আমার পিসেমশাই-এর নাম শুনেছিস? অতুল সরকার—

বললাম—তোর পিসেমশাইএর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

শৈলেশ বললে—খুব পারি আজকেই চল্—

তা সেদিনই আর যাইনি। তবে কয়েকদিন পরেই শৈলেশ আমাকে তার পিসেমশাইএর কাছে নিয়ে গেল। শৈলেশের পিসেমশাইও বিরাট লোক। বিরাট বাড়ি করেছেন হয়ত্নে। সামনে পাঁচ বিঘে জমির ওপর বাগান। চার-পাঁচখানা গাড়ি, বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। নিজে পদ্মশ্রী হয়েছেন। নামের পাশে পদ্মশ্রীটা লেখেন না বটে, কিন্তু জানে সবাই।

একেবারে ভেতরে বসবার ঘরে নিয়ে বসলাম।

শৈলেশের পিসেমশাই এলেন। এঁরও বেশ ঘপাদই চেহারা।

আলাপ-পরিচয় হবার পর জিজ্ঞেস করলেন—কী জানতে চান বলুন?

সব ব্যাপারটা খুলে বললাম।

বললাম—আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে বলেই আপনার কাছে এলাম। ওঁর জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে বলেছেন আমাকে। এককালে ডাকাত ছিলেন তিনি, এ-কথা ভাবতেই পারা যাচ্ছে না।

অতুলবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে।

বললেন—এইসব বলেছে নাকি? ডাকাতি করতো? আর আপনিও এইসব বিশ্বাস করলেন?

বললাম—রাণী বলে একজন ডাকাত-মেয়ে ওঁকে একটা হীরে দিয়েছিল, সেই হীরে কাছে রাখলে নাকি কেউ মারা যায় না—

অতুলবাবু শুনে আরো হাসতে লাগলেন। বললেন—আমি ললিতকে ছোটবেলা থেকে জানি। ওর আর জানতে কিছু বাকি নেই আমার। বড় ভীরু প্রকৃতির ছেলে ছিল ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলা

থেকেই কেবল পেটের অসুখে ভুগতো। তারপর আমরা দু'জনে একসঙ্গে এই বিজনেস আরম্ভ করি। জীবনে কখনও কলকাতার বাইরে যায়নি। ইদানীং ব্যবসার খাতিরে শুধু এদিক-ওদিক ঘুরছে।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তাহলে ও-সব গল্প বলতে গেলেন কেন আমাকে? ও-সব কি মিথ্যে কথা?

অতুলবাবু বললেন—তাহা মিথ্যে কথা। ওর একবর্ণও সত্যি বলে ভাববেন না।

বললাম—তাহলে ও-সব বলে লাভ কী?

অতুলবাবু বললেন—ওই যে শুনেছে আপনি গল্প-লেখক। গল্প-লেখকের কাছে নিজের কিছু বাহাদুরি দেখাতে হবে তো!

—কিন্তু আমার কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে ওর লাভ কী? ওর কাছে আমি? উনি কোটি-কোটি টাকার মালিক আর আমি সামান্য গল্প-লেখক!

অতুলবাবু বললেন—তা হলে কী হয়, তবু তো গল্প-লেখককে লোকে এক-ডাকেই চেনে আর লোহা-লক্কড়ের কারবারীকে কার চিনতে দায় পড়েছে?

তবু আমার বিস্ময় দূর হল না।

বললাম—কিন্তু তিনি আমাকে এই কার্ডখানা দিয়েছেন আর দেখা করতে বলেছেন যে। বলেছেন আরো অনেক রেমোকরু ঘটনা আছে ওঁর জীবনে।

অতুলবাবু বললেন—সব মিথ্যে কথা, সব। ওর জন্ম কলকাতায়, কর্মও ওর কলকাতায়। বরাবর পেট-রোগা মানুষ, কাঁচকলার ঝোল খেয়ে ভাত হজম করতে হয়। ও করবে ডাকাতি? ওকে আমি চিনি না? ওর চৌদ্দ পুরুষ কখনও ধর্মায় যায়নি!

বললাম—তাহলে ও-সব বলতে গেলেন? মাথায় ও-বুদ্ধি এল কি করে?

অতুলবাবু বললেন—আরে জানেন না, ও যে কেবল যত ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ে। অফিসে তো কাজ-কর্ম ওকে কিছু করতে হয় না, আমিই সব কাজ করে দিই। তাছাড়া কার্ম এখন বড় হয়ে গেছে, কাজ করবার জন্য গাদা গাদা অফিসার আছে। ও কেবল এয়ার-কনডিশনড্ কামরায় ভানলোপিলোর চেয়ারে বসে ডিটেকটিভ নাবিশগুলো গেলে। লিওসে স্ট্রীটে গিয়ে ওই সব নাবিশগুলো পয়সা দিয়ে কেনে আর পড়ে। পড়তে পড়তে কেবল ওই ধরণের জীবনের স্বপ্ন দেখে, আর ভাবে ওর ওই রকম জীবন হলে ভালো হতো। কিন্তু পেট-রোগা মানুষ, কিছু করবারও ক্ষমতা নেই—

শুনতে শুনতে আমার মনে হলো এও তো এক ধরণের চরিত্র। সংসারে কত রকমের বিচিত্র মানুষই থাকে তাহলে। নইলে ললিতবাবুকে বাইরে থেকে দেখে কে তার আসল স্বরূপটা ধরতে পারবে।

———

ছায়াঝড়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কুন্তল নিতান্তই ব্যতিক্রম।

লেখাপড়া করতে এসে সে ব্যাপারটাকেই সেকেণ্ডারি করে নেওয়া, একোনো কাজের কথা নয়। কুন্তল ঘটকের এ ধরণের কথায় লণ্ডনের আর সব বাঙালী তথা ভারতীয় ছাত্র তাকে এক রকম একঘরেই করে রেখেছিলো।

তাতে কোনো দুঃখ ছিলো না কুন্তলের। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ছাত্র, যাকে বলে ডেডি সিরিয়াস স্টুডেণ্ট, পড়াশুনো ছাড়া অন্য দিকে মন দেবার সময়ই তার ছিলো না বলা চলে। কাজেই আড্ডা দিয়ে বেড়াবার সুযোগ সে পাবে কী করে?

ক্লাসের পর লাইব্রেরীতে বসে সময় সময় একেবারে যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়তো কুন্তল। নোট করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো, কোনো টেরই পেতো না সে।

প্রায় এমনি ধরণেরই আরেকটি ভারতীয় ছেলে পড়তো কুন্তলের সঙ্গে। সে ছাত্রাবলী। নাম পরমেশ্বরম। বন্ধুরা ডাকতো তাকে পরম বলে।

এই পরমও খুব প্রিয়পাত্র ছিল অধ্যাপকদের মনোযোগী ছাত্র হিসেবে। লাইব্রেরীতে সেও অনেক সময় কাটাতো। ইণ্ডিয়া হাউসেও মাঝে মাঝে তার দেখা হতো কুন্তলের সঙ্গে। আসলে ঘটক এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে পরমই ছিলো একমাত্র যোগসূত্র।

লেখাপড়ায় ভালো হলেও পরম আমোদপ্রমোদের বেলায় আর কারো চেয়ে কম যেতো না।

লণ্ডনে থাকবে, অথচ স্ফূর্তি লুটবে না—সে আবার হয় নাকি?

—কুন্তলকে এমনি কথা অনেক দিন শুনিয়েছে পরম। তাকে সিনেমা, অপেরা এবং নাইট ক্লাবে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু মাত্র দু'টি শোতে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও নেওয়া সম্ভব হয় নি তাকে। অপেরায় যেতে কুন্তলের খুব একটা আপত্তি না থাকলেও সময় ও সুযোগ করে ওঠা যায় নি।

যাই হোক, দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে কুন্তলের। সে ডক্টরেট পেয়েছে। অধ্যাপক ডোনাল্ড প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা খুবই হাই কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছে তাকে তার সুন্দর থিসিসটির জন্যে।

এবার ঘরে ফেরার পালা।

দেশেতো যাচ্ছ, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কোনো কথাইতো তুমি বলতে পারবে না এখন সম্বন্ধে।—বন্ধুরা বলেছিলো।

কেন?—প্রশ্ন তুলেছিলো কুন্তল।

যাবে, পাঁচ পাঁচটা বছর গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো তোমার চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার তোমার ল্যাণ্ড লেডীকে ছাড়া আর ক'জন মেয়েকে জানো তুমি? নিজের ফ্ল্যাট-ঘর, কলেজ আর মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়া হাউস, এর বাইরে লণ্ডনের কতটুকুই বা তুমি দেখেছ এবং লণ্ডন লাইফ সম্বন্ধে কীই বা তোমার অভিজ্ঞতা যে দেশে গিয়ে এদেশের কথা তুমি বলতে পারবে?

ঠিক বলেছিস চন্দ্র, এতদিন লণ্ডনে কাটিয়েও যে একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে পারলো না, সে যতো বড়ো ডক্টরই হোক না কেন, তার দ্বারা কিছু হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।—কেবলের ছাত্র চন্দ্রকান্তনের কথার পিঠে বললে জগদীশ আচার্য।

এ মন্তব্য বোধ হয় গভীরভাবেই আহত করলো কুন্তলের পৌরুষকে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে এতক্ষণ নিজের সমালোচনা বেশ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো ডক্টর ঘটক। পার্টিতে অন্তত একজন ভারতীয় তরুণী মিসেস উষা মালহোত্রা উপস্থিত, তাই কোনো জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলো সে। কিন্তু জগদীশের মন্তব্যের পর আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না তার পক্ষে। চট করে সে বলে বসলো, আরে কি মুস্কিল, আজই তো উড়ে যাচ্ছি না। আরো তো মাস দুই আছি লণ্ডনে– এনাফ টাইম ফর মেকিং লভ এ্যাণ্ড এভ্রিথিং।

চিয়ার ইউ আপ, চিয়ার ইউ!—বলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে নিত্যানন্দ পট্টনায়ক, ভূপিন্দর সিং, চন্দ্রকান্তন্ এবং জগদীশ আচার্য। সেদিনের আড্ডায় কি কারণে পরম আসতে পারেনি।

কুন্তলের ডক্টরেট প্রাপ্তি উপলক্ষে তার অনারে যে টি-পার্টির আয়োজন করা হয়েছিলো কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুর উদ্যোগে সেই ছোট্ট চায়ের আসরে বসেই সে সন্ধ্যায় দীর্ঘ আলোচনা চলেছিলো অনেক রাত অবধি।

আক্রমণ আসছিলো চারদিক থেকে। কুন্তল সত্যি সত্যি এটে উঠতে পারছিলো না একক যুদ্ধে। এমন কি শ্রীমতী মালহোত্রা দু'একবার তার হয়ে কথা বলতে গেলেও খুব সুবিধে হয়নি তাতে।

অগত্যা কুন্তল বলেই ফেললো, বেশ তো দাওনা একটা ভালো মেয়ে জুটিয়ে, আজ থেকেই ভাব শুরু করে দি। এমন তো একজন মিঃ ফ্রীম্যান!

বাঃ এই তো চাই! উষাদি, আজ থেকে কুন্তলের দায়-দায়িত্ব সবই তোমার। জগদীশ চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

'অলরাইট' বলে সে ভার সানন্দেই গ্রহণ করে শ্রীমতী মালহোত্রা।

কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর রঙ বদল হতে থাকে যেন। কুন্তলের কাছে পৃথিবী তখন অন্যরূপা।

রাজধানীর উত্তর উপান্তের শহরতলী।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট একটি অঞ্চল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকালয়। সামনেই বিরাট সবুজ এলাকা গোল্ডার্স গ্রীন।

বড়ো বড়ো যানবাহন চলাচলের বিরাট রাস্তা হেণ্ডন ওয়ে। তার পুবে সেকেণ্ডারি স্কুলের ছাত্রদের প্রকাণ্ড একটা খেলার মাঠ আর পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকার ক্রমবর্ধনশীল সুন্দর বসতি ওয়েসেক্স ক্রেসেণ্ট।

এই পল্লীরই শিশু বিদ্যালয় ওয়েসেক্স প্রাইমেরী স্কুল। স্কুল-বাড়িটির বয়েস অনেক। কম হলেও অন্তত সত্তর বছর। তা' হলেও লাল ইটের তৈরি এ বাড়িটির একটা চারিত্রিক আকর্ষণ আছে। সকালে-বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে অনেকেই এদিকটায় এসে থাকেন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে।

কাজেই জেনীও যে সেখানে আসে তাতে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে, এরূপ মনে হওয়ার কোনো কথা নয়।

তবে ব্যাপারটা হাল আমলের। বড়ো জোর দিন পনেরো ধরে জেনী অর্থাৎ জেনিফার উইলিয়ামস সকালে-বিকেলে ঘণ্টাখানেক করে কাটিয়ে যায় এই কিণ্ডারগার্টেন স্কুলটির কাছে।

সকালবেলা স্কুলের গেটের সামনে এক একটি গাড়ি এসে যেই থামে জেনী সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে ছোট ছোট কচি কচি ছেলেমেয়েরা যেমনি এক একজন করে নামতে থাকে জেনী তাদের প্রত্যেককে আদর করে। দু'একটি করে মিষ্টি কথাও বলে সবার সঙ্গে।

বাচ্চাদের মনে হয়, এও বোধ হয় তাদের এক নতুন দিদিমণি। একে ওদের খুব ভালোও লাগে।

ভালো লাগবেই বা না কেন? ক'দিন ধরে জেনী আবার রোজ বিকেলে ওদের খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা শেষে প্রত্যেককে চকোলেট বা টফি বিলোতে শুরু করেছে। বাচ্চারা এতে ভারি খুশি।

স্কুল বাড়ির পেছনেই খেলার মাঠ। তার একটু দূরেই এক কোণায় ছোট্ট একটি মিঠাই দোকান। স্কুলের শিশুদের জন্যেই এ দোকান। জেনী এ দোকানের নতুন খদ্দের এবং সত্যি সত্যি বড়ো খদ্দের। রোজ এতগুলি করে টফি, চকোলেট বা অন্য কোনো মিষ্টি আর তো কেউ কেনেনা তার দোকান থেকে। দোকানী তাই খুবই সন্তুষ্ট জেনীর ওপর।

জেনী অবশ্য খুব অচেনা নয় দোকানী এটনি রাসেলের কাছে। আসলে সেও তো এ পাড়ারই মেয়ে। কাজেই হঠাৎ হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ওয়েলেস্ক ক্রেসেন্টের ঠিক উত্তরেই মর্টেণ্ড রোড। তারই এক মাথায় একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকে জেনী তার বাপ-মায়ের সঙ্গে।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। যখন ঐ মিষ্টির দোকানটি প্রথম বসে এই ক্রেসেন্ট এলাকায় সে সময়ে লিণ্ডা, শীলা প্রভৃতির সঙ্গে জেনীও ছিল এ দোকানের একজন নিয়মিত খদ্দের।

এ পল্লীর এ মেয়ে কয়টি সমবয়সী। তখন বয়েস ছিল নয় কি দশ, এখন বিশ-একুশ। এখন ওরা কেউ আর এ দোকানে আসে না টফি-চকোলেট, আইসক্রীম বা অন্য কিছু কিনতে, কিন্তু আগে আসতো দল বেঁধে।

সেই জেনীকে কি আর সহজে ঠাহর করার জো আছে? এগার বার বছর পর সেই ছোট্ট জেনীর যৌবন এখন উপচে পড়ছে প্রতি অঙ্গ থেকে। এটনিকে তাই বেশ একটু চিন্তা করেই ওর নামটাকে ছুঁতে হয়েছে।

কিন্তু কী ব্যাপার? কেন রোজ রোজ আজকাল এরকম করছে জেনী?

এটনি রাসেলের মনে প্রশ্নের আনাগোনা শুরু হয়েছে। শুধু একা সে-ই নয়, স্কুলের শিক্ষিকারাও এ রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। রোজ পাঁচ-সাত শিলিং করে মিঠাই কিনে যাওয়া ধাতব্যের জন্যে, এতো খুব সহজ কথা নয়। তাই মুখে মুখে ঘটনাটা রটেও গেছে অনেক দূর পর্যন্ত।

আসল ব্যাপারটা কি তা আন্দাজ করার জন্যে লোকজনও কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে স্কুলের কাছে। এমন কি জেনীর মা-বাবাও এসে দেখে গেছেন তাঁদের মেয়ের কাণ্ডকারখানা। তাঁদের সে বলেছে, বাচ্চাদের মধ্যে সময় কাটাতে তার খুব ভালো লাগে, তাই সে দু'বেলাই এসে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাশায় সময় কাটিয়ে যায়।

মা-বাবার আপত্তি করার কোনো কারণই থাকতে পারে না এতে। তাঁরা চুপ করেই থাকেন। তবে তাঁদের শুধু একটা ভাবনা, জেনী তা'হলে ওর কাজটাও ছেড়ে দেবে নাকি!

বেশ ভালোই একটা কাজ করে জেনী। বৃটিশ মিউজিয়মের চাকরিতে যেমনি একটা ইজ্জৎ আছে, পড়াশুনারও আবার তেমনি অনেক স্কোপ। সাগরপারি করে জেনী তার এমন চাকরিটিকে নষ্ট করে না বসে, সেটা একটা চিন্তার বিষয় বৈকি।

কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়ামের ঐ সুন্দর চাকরিটিই যে জেনীকে একটা বিরয় পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে তার বিন্দু-বিসর্গও তো জানতে পারেন নি তার বাপ-মা।

শ্রীমতী উষা মালহোত্রার নিয়মিত যাতায়াত ছিলো বৃটিশ মিউজিয়ামে। ইংল্যাণ্ডের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের সঙ্গে শ্রীমতী মালহোত্রার একটা প্রাণের যোগ গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরে। সে একরকম এ লাইব্রেরীর একজন স্থায়ী সদস্যা। এই বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রতি তার এমনি গভীর আকর্ষণের মূলে রয়েছে প্রধানত জেনী। ঘর দেওয়া-নেওয়া থেকে সেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

বাস্তবিকই শ্রীমতী মালহোত্রার সঙ্গে জেনীর এমন ভাব হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যে যে তারা একে অন্যকে একটা অনুরোধ করলে সে অনুরোধ কখনো উপেক্ষিত হয় না।

কয়েকবার মালহোত্রাদের ফ্ল্যাটেও গিয়েছে জেনী। তাদের ঘর-সংসার দেখে বেশ ভালোও লেগেছে তার। তবে তার বন্ধুর স্বামীটিকে দেখে খুব গোবেচরা গোছের লোক বলেই মনে হয়েছে তাকে। গল্প-সল্প তার সঙ্গে এতদিনের মধ্যেও কখনো জমে ওঠেনি!

উষাকেও একবার যেতে হয়েছিলো জেনীদের বাড়িতে সেই ওয়েসেক্স ক্রেসেন্টে। জেনীর অনুরোধ এড়ানোর কোনো উপায় ছিলো না বলেই সে গিয়েছিলো। তা'ছাড়া ভদ্রতার খাতিরে একটা রিটার্ণ ভিজিটও তো দিতে হয়!

কথায় কথায় উষা একদিন বলে ফেলেছিলো জেনীকে, আমার কর্তার সঙ্গে আলাপ করে তুমি মোটেই খুশি হওনি জানি। সে যেচারা ব্যাঙ্কের অফিসার। সারাদিন পাউণ্ড-শিলিং গুনতে গুনতে হিসেব ছাড়া আর কিছুই বড়ো স্থান পায় না তার মাথায়। তাই বলে আমাদের সব বন্ধু-বান্ধবকেই তুমি অমনটি ভেবে নিওনা যেন।

বেশ, দেখবো কেমন তোমার সব আর বন্ধুরা।

জেনীর সে ইচ্ছে পূরণের সুযোগটা যে এতো তাড়াতাড়ি এসে যাবে উষা তা' ভাবতে পারেনি।

ডক্টরেট পাওয়ায় কুন্তলের সম্মাননায় সেদিন যে বৈঠক বসেছিলো তাতে ভঃ ঘটককে বাস্তবী ছুটিয়ে দেবার ভার পড়েছিলো শ্রীমতী মালহোত্রারই ওপরে এবং পরদিনই সে কুন্তলকে নিয়ে বৃটিশ মিউজিয়মে হাজির হয়েছিলো।

কুন্তলের মতো অমন শান্ত সুবোধ ছেলে যে জেনীর প্রথম দৃষ্টি-শরেই একেবারে ধরাশায়ী হবে তা' কল্পনাও করতে পারেনি শ্রীমতী মালহোত্রা।

বেশ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বড়শিতে মাছ ধরা পড়েছে। বন্ধুরা সবাই খুশি। ওদের সবার সঙ্গে আগের মতোই আবার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে কুন্তলের, ওরা তবুও খুশি।

জেনীও মাঝে মাঝেই কামাই করছিলো বৃটিশ মিউজিয়মের কাজে। কুন্তলের সঙ্গে পরিচিত হবার পাঁচ দিনের দিন মিসেস মালহোত্রা ঐ লাইব্রেরীতে গিয়েছিলো জেনীর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখে সে অনুপস্থিত, খোঁজ নিয়ে জানতে পায় এক বন্ধুকে নিয়ে সে ব্রাইটনে এক দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছে।

সে বন্ধু যে নিশ্চয়ই কুন্তল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিলো না শ্রীমতী মালহোত্রার।

ঠিক তাই। জেনী নিজেই পরদিন স্বীকার করেছে সে কথা।

কুন্তলকে যতোটা নিরীহ বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে ততোটা নিরীহ সে নয় কিন্তু!

কেমন?—জেনীর কথার পিঠে প্রশ্ন তুলেছিলো উষা মালহোত্রা।

ব্রাইটন সমুদ্রতীরের সব দৃশ্য দেখে বলতে গেলে একরকম উন্মাদই হয়ে উঠেছিলো কুন্তল। রৌদ্র-স্নানরত আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রায় নগ্ন নরনারীদের দেখে সে আর স্থির থাকতে পারেনি। আমাকেও চুমোয় চুমোয় সে অস্থির করে তুলেছে।

কিন্তু তাতে তোমরা কখনো বিরক্ত হও তাতো আমার জানা ছিলোনা।

কিন্তু সেখানেই তো ঘটনার শেষ হয় নি। কুন্তল যে এতো তাড়াতাড়ি শেষ অবধি যেতে পারবে তা' আমি সত্যি ভাবতে পারি নি।

তার মানে?

বাঃ, তুমি যেন একেবারে ছোট খুকিটি! দু'টো বাচ্চার মা, তোমায় আবার এর মানে বুঝিয়ে বলতে হবে।

বলোই না, তোমার মুখে কুন্তলের গল্প শুনতে ভারি ভালো লাগছে।—বেশ জোরের সঙ্গেই তাগিদ দেয় মিসেস মালহোত্রা।

অগত্যা আর না বলে পারে না জেনী। তারও বলতে ভালোই লাগে। পুরোপুরি সে কুন্তলের মতো ব্রিলিয়ান্ট একটি ছেলেকে জয় করে নিয়েছে, এ যে তার মস্ত বড়ো একটা গৌরবের কাহিনী।

সে কাহিনীই জেনী খুব চুপি চুপি বলে চলে তার বন্ধু শ্রীমতী মালহোত্রাকে।

চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি আর সমুদ্রের উদাস পরিবেশ যে সব মানুষকেই চঞ্চল করে তুলবে সে স্বাভাবিক! তা'ছাড়া চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে নর-নারীর চুম্বন-আলিঙ্গনের দৃশ্য পড়লে কোন যুবক নির্লিপ্ত থাকতে পারে?

কাজেই কুন্তল যদি নির্লিপ্ত থাকতে না পেরে থাকে তাতে দোষের কিছু নেই, এইতো বলতে চাও?—উষা গলা বাড়িয়ে জেনীর মুখের কথাই বলে দেয়। উত্তরও আসে সেই রকম।

ঠিক তাই। চারদিকের দৃশ্য দেখে বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারেনি কুন্তল। আমাকে টেনে নিয়ে সে সমুদ্র-স্নানে নেমেছে, জলকেলিতে মেতে উঠেছে আর সবার মতো।

তারপর?

ঘণ্টা দেড়েক জলে কাটিয়ে দু'জনেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। উঠে এসে একটা দোকানে ঢুকে চায়ের পেনি করে দিয়ে গা-হাতপা মুছে, চুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে নিলাম দু'জনে। তারপর একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে লাঞ্চটাও সমস্ত মতো সেরে নেওয়া গেলো।

তারপরেই সওনে ফিরে এলে বুঝি?—জিজ্ঞেস করে মিসেস মালহোত্রা।

বারে, এতো শিগ্‌গীরই যদি ফিরবো তা'হলে আর ব্রাইটনে যাওয়া কেন?

বেশ তো, এর পরে তা'হলে কি করলে তাই বলো।—উষা দেবীও নাছোড়বান্দা।

ব্রাইটনের ডেকে বেড়ানোটা ভারি আনন্দদায়ক। সমুদ্রতীর জুড়ে রকম রকম বহু ডেক। তীর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত জলের ওপর চলে গেছে তার অনেকগুলি। সন্ধ্যার আলোর মালা যখন জ্বলতে থাকে সেই

ডেকগুলিতে কী সুন্দরই না তখন দেখায়! বিকেল বেলায় চার পেনি করে টিকিট কিনে তেমনি একটি ডেকে বেড়াতে গিয়ে আমরা সন্ধ্যে অবধি তার উপর মুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো এক সঙ্গে আমাদের একখানা ফটো তুলতে হবে। আমার প্রস্তাবে কুন্তল এক কথাতেই রাজী হলো।

রাজী না হয়ে বোধহয় তার আর কোনো উপায়ও ছিলোনা।

চলতো তাই হবে। তবে দু'মিনিটের বেশি প্রয়োজন হয়নি মেশিনে সে ফটো তুলতে। দু'পেনিতে নেগেটিভসহ ফটো নিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই বৈদ্যুতিক আলোয় এমন কতোগুলি সিনেমার বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে গেলো কুন্তলের যার মধ্যে অন্তত একখানা ছবি না দেখে মোটেই সুস্থ হতে পারছিলো না সে।

কী নাম সে ছবিখানির?

একটু ইতস্তত করলেও সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো জেনীকে। সে বললে, 'দি ফিনিশিং টাচ' অথবা 'বেডরুম সিক্রেট' এ দু'খানার মধ্যে একটা ছবি চয়েস করার ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলো কুন্তল। আমার যার মতো' বেডরুম সিক্রেট'ই দেখা হলো।

তার ফল কী দাঁড়ালো? কী রকম লাগলো ছবিখানা?—এমনি ভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়েই জেনীর কাছ থেকে সব কথা বার করে নিচ্ছিলো উষা।

এরই মধ্যে দু' পেয়ালা চা এসে গেছে। চা খেতে খেতেই জেনী বলে চলেছে তাদের ব্রাইটনের গল্প। ছবিটি সম্বন্ধে বললে, এ ছবি যেমন লাগবার তেমনই লেগেছে। তবে উত্তেজনার মুহূর্তগুলিতে কুন্তল বড্ড বেদামাল হয়ে পড়ছিলো।

তাই বুঝি! তখন তোমাকে খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়েছে, তাই না?

না, মুস্কিল কিছু নয়। তবে ব্রাইটনে কাল যা গরম গিয়েছে কি বলবো? সেই গরমের মধ্যে হুড়োহুড়িটা সময় সময় অসহ্যিকর বলে মনে হয়েছে বৈকি।

তাই বলো, কুন্তল তা'হলে তোমায় বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে ছেড়েছে।

না, তেমন কথা বললে কুন্তলের ওপর খুবই অবিচার করা হবে। খুবই আনন্দের মধ্যে কাল সারাটি দিন আমাদের ব্রাইটনে কেটে গেছে। সিনেমা দেখে এসে আলোকজ্জ্বল রাত্রিতে এক ঘণ্টার জন্যে বোট ভাড়া নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে যে কী আরাম পেয়েছি তা' আর কী বলবো?—বলেই একটু হেসে ফেলেছে জেনী আর তা' দেখে শ্রীমতী মালহোত্রার ঠোঁটেও হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

হাসতে হাসতে উষা জিজ্ঞেস করে, সেই আনন্দের স্মৃতি নিয়ে কাল রাতেই ফিরে এসেছো লণ্ডনে, না রাতটা ব্রাইটনেরই কোনো হোটেলে কাটিয়ে আজকেই মাত্র ফিরেছো?

না, না, তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার তো মাত্র পথ। কাল রাত ন'টার ট্রেন ধরে বারোটা একত্রিশে এসে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছেছি।

ভালোই করেছো। কুন্তলকে নিয়ে হোটেলে রাত কাটালে গার্জেনদের কাছে দু'-চারটে কড়া কথা হয়তো শুনতে হতো তোমাকে।

তা' এতেও যে একেবারে রেহাই পেয়েছি তা' নয়। কুন্তলতো স্টেশন থেকে দু'পা হেঁটেই ওর ফ্ল্যাটে চলে গেলো। বাসে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়ে আমি যখন বাড়িতে এসে ঢুকলাম তখন রাত বেড়টা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। মা-ই উঠে এসে দোর খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কড়া মেজাজে শুনিয়েও দিলেন যে ড্যাডি খুবই চটে গেছেন আমার এরকম দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যে।

তা' মাসিকে একটু জানিয়ে রাখলেই পারতে যে ব্রাইটনে বেড়াতে যাচ্ছো, একটু দেরি হতে পারে ফিরতে।

ঠিকই বলেছো, কিন্তু তখন কি আর জানতাম কুন্তল এমন পাগলামি করবে। তার পাগলামির জন্যেই তো অতোটা দেরি হয়ে গেলো।

যাই তিয়ার জেনী, তুমিও যে সে পাগলামিতে পুরোদমে মেতে গিয়েছিলে তা' কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আমাদের কুন্তলের দেশে ফিরে যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত তুমি আবার ভণ্ডুল করে দেবে না তো?

হোয়াট ডু ইউ মীন, উষা?—জেনী যেন চমকে ওঠে।

থাক, ও নিয়ে এখন আর কোনো কথা নয়। অনেকক্ষণ গল্প হলো, যাই এবার।—বলে বিদায় নেয় শ্রীমতী মালহোত্রা।

এখন আর বিকেলে একদিনও ঘরে থাকে না কুন্তল।

পর পর দু দিন সে জেনীকে তার ঘরে নিয়ে এসেছিলো। বাড়িওলীর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো তাই রক্ষে। কোনো রকমে জানতে পারলে তুমুল কাণ্ড বেঁধে যেতো। লুকিয়ে বাইরের মেয়ে ঘরে নিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ঘরে স্ফূর্তি লোটার মজাটা টের পেতো কুন্তল ঘুণাক্ষরেও যদি বাড়িওলী কিছু শুনতে পেতো।

তবে ধর্মের কল ঠিকই বাতাসে নড়ে। দু'দিনের সাফল্যে সাহস যেন বেড়ে গিয়েছিলো কুন্তলের। জেনীকে সে নিমন্ত্রণ করেছিলো, ছুটির পর বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে সরাসরি ভিক্টোরিয়ায় তার ফ্ল্যাটে চলে আসতে। দু'জনে বসে একসঙ্গে কফি খাবে, গল্প-সল্প আমোদ-স্ফূর্তি করবে, এই কথা ছিলো।

নির্দিষ্ট দিনে ঠিক ঠিক সময়েই যাদুর মতো এসে উপস্থিত হয়েছিলো জেনী।

কিন্তু কড়ার শব্দ হতেই কুন্তল বেরিয়ে আসার আগে যে পাশের ঘোরটা খুলে যাবে এবং বাঘিনী বাড়িওলী তার ওপর যে অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়বে জেনীর কাছে তা' ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

এখানে ওসব চলবে না, এটা ভদ্দর লোকের সেরা বাড়ি। যাও, পালাও এখান থেকে। ভালো ভালো ছেলেদের মাথা খাওয়ার যম এই ডাইনীগুলো!

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িওলীর ওই কাঁচা খিস্তি আর শুনতে পারেনি জেনী। গট গট করে সে দোতলা থেকে এক তলায় নেমে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর মনে মনে কেবল ভেবেছে, কুন্তলটা কি বোকা, তাকে একটু সাবধান করে তো দেওয়া উচিত ছিলো—তা'হলেই তো সে আর কড়া নাড়তো না অমন করে।

জেনীতো গাল খেতে খেতে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচলো। বাড়িওলী তারপরে পড়লো কুন্তলকে নিয়ে। তার ঘরে ঢুকে যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ করলো তাকে। পারলে তাকে তখনি ফ্ল্যাট থেকে বিদায় করে দেয়, এমনি মেজাজ তার।

অন্যায় সে করেছে। কাজেই গালাগাল হজম না করে উপায়ই বা কি। ডাক-চিৎকার করে ক্লান্ত হয়ে বাড়িওলী তার নিজের ঘরে চলে গেলে কুন্তল যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ঘর লক-আপ করে বেরিয়ে এলো।

পথে ভিক্টোরিয়া পার্কে ওয়েট করছিলো জেনী। সে ধরেই নিয়েছিলো, কুন্তলকে আসতেই হবে। সে এসে ডাকতেই লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে জেনী।

ও, হোয়াট এ কুল ইউ আর ?—অভিমানে, অপমানে কণ্ঠ তার অবরুদ্ধ হয়ে আসে। আর কোনো কথা পারে না জেনী।

কুন্তল বার বার করে ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে নেয় জেনীর সঙ্গে। এ ঘটনার পর আর কখনো ভিক্টোরিয়া মুখো হয়নি জেনী। কুন্তলও আর তাকে সেদিকে যাবার জন্তে অনুরোধ করতে ভরসা পায়নি।

ছুটি হবার আগে সেই থেকে রোজই এসে কুন্তল অপেক্ষা করতো বৃটিশ মিউজিয়ামের সামনে। সেখান থেকে এক একদিন এক এক জায়গায় চলে যেতো সে জেনীকে নিয়ে।

সেদিন খুবই লজ্জা পেয়েছিলো কুন্তল। এমন একটা অবস্থায় চন্দ্রকান্তনের চোখে চোখ পড়ে গিয়েছিলো তার যে ওভারকোটে মুখ ঢেকে ফেলতে হয়েছিলো তাকে।

তখনো আকাশে সূর্য ডোবেনি। কিছুক্ষণ ধরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিলো। হাইড পার্কে মানুষজন যারা বেড়াতে এসেছিলো অনেকেই তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কেউ কেউ আবার বৃষ্টি থেমে যাবে আশায় বড়ো বড়ো গাছের নিচে যেয়ে আশ্রয় নিচ্ছিলো।

তেমনি একটি গাছের দিকেই দৌড়ে যাচ্ছিলো চন্দ্রকান্তন। পাশেই আরেকটি গাছের তলায় এক জোড়া মানুষ শুয়ে। সকালে-বিকেলে সন্ধ্যায় এমনি জোড়া মানুষ হামেসাই দেখা যায় হাইড পার্কে। কেউ সেদিকে ভুলেও তাকায় না, কেউ মাথাও ঘামায় না ও নিয়ে।

অনেকদিন দেখা হয়নি, হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় চন্দ্রকান্তন অভ্যাসবশতই বলে উঠেছিলো, এই যে, কুন্তল যে!

সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের ওভারকোটটা টেনে কুন্তল তার মুখ ঢেকে ফেললে চন্দ্রকান্তন আর কোনো কথা না বলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেছে। একই ওভারকোটের ওপর এবং আরেক ওভারকোটের তলায় শুয়ে শুয়ে সবই লক্ষ্য করেছে জেনী, কিন্তু কিছুই সে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

এমনি করে জেনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েই আরো বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেয় কুন্তল।

বাড়ি থেকে খুব ঘন ঘন চিঠি পাচ্ছে, সে ইদানীং। মা-বাবার তাগিদ, ভাই-বোনদের তাগিদ—তাড়াতাড়ি এবার বাড়ি ফেরো।

'বিদেশে বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব'—এই শিরোনামে দেশের কয়েকখানি সংবাদপত্রে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ভক্টর কুন্তল ঘটকের। তার সবগুলি কাটিং একসঙ্গে করে ছোট ভাই শিশির পাঠিয়ে দিয়েছে দাদাকে, আর চিঠিতে লিখেছে, 'আমাদের দাদা ভক্টর ঘটক হবার পর কতটা বদলেছে তা' দেখবার জন্তে, জানবার জন্তে আমরা ভীষণ ব্যগ্র হয়ে পড়েছি। পারতো এ পত্র পেয়েই লেখে চেপে বসো যাতে এ সপ্তাহেই তোমাকে আমরা হমদম এয়ারপোর্টে রিসিভ করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারি।'

এমনি এক একখানি চিঠি আসে বাড়ি থেকে আর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে কুন্তল। সেও অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে দেশে ফেরবার জন্তে। কিন্তু জেনীর কবল থেকে কী করে সে ছাড়া পাবে? সে তার এক মহা দুশ্চিন্তা।

এদিকে কলকাতা থেকে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির কুন্তলের নামে। সে টেলিগ্রাম আবার রিসিভ করেছে স্বয়ং বাড়িওলী। সে ভারি খুশি সেই তারবার্তায়। টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে দুপুর রাত অবধি বৃদ্ধি জেগেই বসে রয়েছে ইয়ং ভক্টরের জন্তে।

কুন্তল ঘরে ঢুকতেই বাড়িওলী টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তক্ করে একটা কড়া গন্ধ নাকে যেতেই বাড়িওলীর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তবু 'হিয়ার ইজ ইওর লিউজ ফর ইউ' বলে টেলিগ্রামখানা সে হাতে তুলে দেয় কুন্তলকে।

কুন্তল এক মুহূর্তে বাবার পাঠানো টেলিগ্রামখানা পড়ে ফেলে – ম্যারেজ সেটেল্ড, কাম সার্প!

বাবার নামে এ তার পাঠানো হলেও এর পেছনে যে পুরো মায়ের হাত রয়েছে তা' বুঝতে একটুও দেরি হয় না কুন্তলের। সে ধরেই নেয় রিফেক্ট পার্কে তাদের বাড়ির আশপাশের বৌ-ঝিরা আর আত্মীয়-স্বজনরা মাকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছে, শ্রীমান ভক্টরেট পাবার তিন-চার মাসের মধ্যেও যখন ফিরে এলো না, তখন মেয়ে-বৌ নিয়েই যে সে আসবে তা' অবধারিত। তাই এই টেলিগ্রাম।

কুন্তল যখন টেলিগ্রাম পেয়ে এমনি চিন্তায় মগ্ন সে সময়েই বাড়িওলী তাকে দু'টো কথা শুনিয়ে বিদায় নেয় সেখান থেকে। সে বলে যায়, 'কুন্তল তুমি তো এমন ছিলে না কোনোদিন। কী বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে তোমার মুখ থেকে। ঐ ভাইনী মেয়েটা তোমাকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। বাবা যেচে তোমার জন্যে ভালো মেয়ে ঠিক করে ফেলেছেন, পালাও এবার লণ্ডন থেকে।'

কিন্তু ভালো-মন্দ ঠিক মতো বিচার করার অবস্থা ছিলো না তখন কুন্তলের।

দু'দিন পরের কথা। সেটা গান্ধী দিবস।

ইণ্ডিয়া হাউসে প্রতিবারের মতো সেবারেও জাঁকজমকের সঙ্গে দোসরা অক্টোবরের অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন হয়েছে। যেন হল ঘরটি ভরতি লোক—ভারতীয়-অভারতীয় বিচিত্র মানুষের বিচিত্র সমাবেশ। উজ্জ্বল একটি সকাল।

শ্রীমতী উষা মালহোত্রার কণ্ঠে গান্ধীজির প্রিয় সঙ্গীত 'রামধুন' এবং 'একলা চলরে' গান দু'টি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো। গানের পরেই উষা এসে বসলো একেবারে কুন্তলের গা ঘেঁষে। জেনী তার আরেক পাশে। জানাশুনো বন্ধুদের মধ্যে আরো অনেকেই সেখানে।

এবারের মতো যেলে আর ফেরা হলো না তা'হলে!—কুন্তলের কানে কানে টুক করে বলে বসলো শ্রীমতী মালহোত্রা।

তার মানে?—কিছুই যেন বুঝতে পারেনি, এমন ভাবেই পাল্টা প্রশ্ন তোলে কুন্তল।

এ নিয়ে পরে কথা হবে।—বলেই তখনকার মতো উষা চাপা দিয়ে দেয় ব্যাপারটাকে।

অনুষ্ঠান শেষে যে যার কাজে ফিরে যায় ইণ্ডিয়া হাউস থেকে। উষা একটা লিফ্‌ট দেবার জন্যে কুন্তল আর চন্দ্রকান্তনকে তার গাড়িতে তুলে নেয়।

গাড়ি ষ্টার্ট দিতেই সরাসরি প্রশ্ন করে বসে উষা, তা'হলে বিয়ের নেমন্তন্নটা কবে পাচ্ছি ভক্টর?

সে আবার কি কথা?

বারে, ছেলে হতে চললো, আর বিয়েটা হবে না!

আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেকটা হতভম্বের মতোই চন্দ্রকান্তনের প্রশ্নের জবাব দেয় কুন্তল।

কিন্তু যাই বলো ভক্টর, শ্রীমতী জেনিফার উইলিয়ামস্ তোমার কাছে তার যৌবন কথা লুকিয়ে রেখেছে আর আমাকে সব কথা বলে দিয়েছে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছিনে।—উষা খোঁচা দেয় এই বলে

আচ্ছা উষাদি, জেনী সত্যি সত্যি তোমায় কি বলেছে, বলো তো শুনি।

এই তো মাত্র পরশুদিন আমি গিয়েছিলাম বৃটিশ মিউজিয়ামে একটা বই ফেরৎ দিতে। জেনীর সঙ্গে দেখাও করে এলাম। সে আমার সঙ্গে গেট অবধি এলো। বললে, উষা তোমার সঙ্গে অত্যন্ত গোপন একটা কথা আছে। কী কথা, জিজ্ঞেস করতেই কানের কাছে মুখ এনে ছোট ছোট দু'টি বাক্যে সে তার কথা শেষ করলো।

বাঃ, কী সে কথা তা' না বলেই চুপ করে গেলে কিন্তুই তো বলা হলো না। আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দাও, তবে তো।- চন্দ্রকান্তন শ্রীমতী মালহোত্রাকে খুঁচিয়ে দেয় এই ভাবে।

আমি আবার কী ফাঁস করে দেবো। তুমি ভাবছো ডক্টর কিছুই জানেনা। তা' হতেই পারে না। আমি মোটেই তা বিশ্বাস করিনা। বেশ জোরের সঙ্গেই এই ঘোষণা করে মালহোত্রা।

কিন্তু কিছুই তার জানা নেই বলে কুন্তল যখন কথা দেয় তখন আর চুপ করে থাকতে পারে না উষা। জেনীর সে দু'টি বাক্যই উদ্ধৃত করে জানিয়ে দেয় সে কুন্তলকে।

জেনী খুবই চুপি চুপি আমায় বলেছে, 'আমার বাচ্চা হবে। কুন্তল আমায় বিয়ে করবো তো?'

ওসব বাজে কথা, বিয়ে-টিয়ে কিছু হবে না।—শুনেই চমকে ওঠে কুন্তল, কিছুটা চটেও যায়।

ভারি মজার কথা বলছো দেখছি! জেনীকে যে উপহারটি তুমি দিয়েছো সেই বাচ্চাটির কী হবে?—কঠিন প্রশ্ন তুলে বসে চন্দ্রকান্তন।

কিন্তু তার খুব সহজ সরল উত্তর আসে কুন্তলের তরফ থেকে। পরিষ্কার ভাষায় সে বলে দেয়, ও উপহার পাবার জন্যে জেনীর তাগিদটাও খুব কম ছিলো না। তবু তা' থেকে সে যদি মুক্ত হতে চায়, তার হাসপাতালের খরচটা বইতে আমি রাজী আছি। একথাটা তোমরা ওকে জানিয়ে দিতে পারো।

সেটা তোমারই জানিয়ে দেওয়া উচিত জেনীকে।

না, তা' কেন হবে উষাদি? সেতো আর আমায় বলেনি যে তার পেটে বাচ্চা এসেছে এবং তার জন্যে আমিই দায়ী। সেকথা সে তোমাকেই বলেছে এবং দয়াবশত যেটুকু আমার পক্ষে করা সম্ভব সেটুকুই তোমার মারফৎ তাকে জানিয়ে দিতে চাই।

ও, ডক্টর হয়ে খুব কথা বলতে শিখেছো দেখছি। এটা তোমার দয়া হলো! এতদূর এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করবে না বলছো, সেটাই তোমার দয়া! আশ্চর্য করলে।

কটা বিয়ে করবো বলো। দেশে আমার বিয়ের যে সব ঠিক-ঠাক!—বলেই চন্দ্রকান্তনের পরোক্ষ তিরস্কারের জবাবে কুন্তল তার বাবার টেলিগ্রামখানা তুলে দেয় তার হাতে।

গাড়িও ততক্ষণে ভিক্টোরিয়ায় কুন্তলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাড়ি থেকে নামতে নামতেই শ্রীমতী মালহোত্রাকে অনুরোধ জানায় কুন্তল, উষাদি, পারোতো আজই সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে দিও জেনীকে।

ও. কে. বলে হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেও উষার তখন একমাত্র ভাবনা কী করে সে জেনীকে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করবে। আর এ সংবাদের শকটাও যে হবে তার পক্ষে মারাত্মক! আর সামান্য একটা 'জোক' করতে গিয়ে ঘটনাটা যে এমন দাঁড়িয়ে যাবে, এমনটি সে ভাবতেই পারেনি।

কিন্তু এ নিয়ে আর দেরিও করা চলে না। উষা পরদিনই দেখা করে জেনীর সঙ্গে। জেনীকে সইয়ে সইয়ে সব কথা খুলে বলে। তাকে কুন্তল বিয়ে করবে না, সে কথা শোনা মাত্রই যেন বাজ পড়ে

তার মাথায়। চোখ-মুখ তার লাল হয়ে যায়। তার কান দু'টোর মধ্যে ভোঁ-ভোঁ শব্দ হতে থাকে, মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে ভন্ ভন্ করে।

তার মধ্যেই জেনী হঠাৎ একবার বলে ওঠে, তা'হলে আমার পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে কী উপায় আমি করবো?

ও নিয়ে অতো ভেবো না তুমি। ওর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে'খন।—জেনীকে আশ্বাস দেয় শ্রীমতী মালহোত্রা।

কিন্তু এর কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, একটু ভেবেচিন্তে বলো দেখি।—জেনী জিজ্ঞেস করে। কথায় কথায় অনেকটা সুস্থও বোধ করে সে।

তবে তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুব সহজ নয়। যতোই ভেবেচিন্তে বলা হোক না কেন, কিসে আবার কোন্ ফ্যাসাদ ঘটে বলে সেটাও একটা দুর্ভাবনা।

তবু খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে উষা এটাই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে চায় তার বন্ধুকে, যে কুন্তল নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে আজ দেশে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে তার পাপকে জেনী কেন নিজের ঘাড়ে বয়ে বেড়াতে যাবে?

এ অবস্থায় কী করা যায়, তাই বলো।—জেনী জানতে চায়।

এ নিয়ে আর বলাবলির কী আছে? এ পাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে হবে তোমাকে। কুন্তলকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে, তার ছবি একেবারে মুছে ফেলতে হবে তোমার মন থেকে।

তোমার কাছে খুবই সহজ বলে বোধহয় মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, তাই এমনি গড়গড় করে বলে যেতে পারলে এতগুলো কথা।—এই বলে উষার ডান হাতটা টেনে এনে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে জেনী। এক একটা কথার হাতুড়ির আঘাতে তার বুকটা যে ভেঙে কিরূপ চুরমার হয়ে গেছে সেটাই সে বুঝিয়ে দিতে চায় তার বন্ধুকে।

কিন্তু উষা কি তা' বোঝেনা, সবই বোঝে। নারী-হৃদয়ের কান্না সর্বত্রই যে সমান, সর্বত্রই এক।

তবু উষার একটা দায়িত্ব রয়েছে জেনীর ওপর। কুন্তলের সঙ্গে সে-ই ভিড়িয়ে দিয়েছিলো জেনীকে। সেটা চার মাস আগের কথা। মাস দুই-আড়াই আগেই কুন্তলের দেশে ফিরে যাওয়ার সব ঠিকঠাক ছিলো। জেনীর আকর্ষণে সে যেতে পারেনি। তিন মাস ধরে তার সন্ধান বয়ে চলেছে জেনী। সে দায়িত্ব অস্বীকার করে কুন্তল যখন চলে যেতে পারছে, জেনী তখন সে দায় বইতে যাবে কেন? জেনীকে আবার তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

শ্রীমতী মালহোত্রা তার বন্ধুকে আগের দিনের মিস জেনিফার উটলিস্বামসরূপেই আবার দেখতে চায়।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত আদায় করা গেছে জেনীর। লণ্ডনের একটা ক্লিনিক থেকে খালাস হয়ে জেনী আবার সেই-সেই।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বেশ কিছু পাউণ্ড অর্থদণ্ড দিয়ে কয়েক দিন বাদেই স্বদেশে ফিরে গিয়েছে কৃতী বাঙালী সন্তান ডঃ কুন্তল ঘটক।

আরো মাস দুই বাদে অগ্রহায়ণের এক শুভ সন্ধ্যায় রিজেন্ট পার্কের এক নতুন বাড়িতে শাঁখ বাজিয়ে

বন্ধুবরণের উৎসব চলেছে। সারা বাড়ি জুড়ে যখন আনন্দের সীমা নেই, কুন্তলের মুখখানি তখন কেন অমন কালিমালিপ্ত!

কুন্তলের চোখের সামনে কেবলি একটি ছোট্ট শিশু বার বার ভেসে উঠছে। কেবলি কাঁদছে ঐ শিশুটি। প্রচণ্ড একটা ঝড় যেন ঐ কান্না। কে এই শিশু, কেনই বা এতো কাঁদছে সে?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না কুন্তল।

হঠাৎ তার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে যায় বাড়ির দারোয়ান। লণ্ডনের চিঠি, আজই বিকেলের ডাকে এসেছে।

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে একবার দেখে নেয় কুন্তল, লিখেছে মদনীশ আচার্য।

চিঠি পড়ে কুন্তল একেবারে হতভম্ব! মদনীশ লিখেছে—

আশা করি মঙ্গল মতোই দেশে ফিরেছো এবং বাড়িতে বেশ ভালোই কাটছে। বিয়ে-থা'র ব্যাপারটা নিশ্চয়ই চুকে গেছে। ভয়ে ভয়ে এ্যাদ্দিন তোমায় একটা দুঃখের খবর জানাইনি। নিজের শিশুকে হারিয়ে জেনীর মাথাটা বোধ হয় খারাপই হয়ে গিয়েছিলো। ওয়েলেন্স প্রাইমারী স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে সে সারাদিন তার বাচ্চাকে খুঁজে বেড়াতো। তাদের টফি-চকোলেট এবং আইসক্রীম ইত্যাদি খাইয়ে ভাবতো তার নিজের বাচ্চাকেই খাওয়ানো হচ্ছে। এমনি ভাবেই সে তার দিন কাটাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। ঠিক আট দিন আগে ঐ স্কুলের প্রায় মুখেই জেনী একটা গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। সে নাকি একটা ছায়ামূর্তি দেখে নিজের বাচ্চা ভেবে তাকে বাঁচাতে গিয়ে চলন্ত গাড়ির তলায় পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এরপর চিঠির বাকি অংশটুকু আর পড়তে পারলো না কুন্তল। তার দু'চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে এলো।

বাড়িতে তখনো ঘন ঘন শাঁখ বাজছে এবং মাঝে মাঝেই উলুধ্বনি পড়ছে।

নিতা আসা যাওয়া

— আশিস দত্ত রায়চৌধুরী

পাখীগুলো ঝলমলে টেলিগ্রাফের তারের উপর লাফালাফি করছে। একটা কলরব করে উঠতেই অন্যগুলোও একযোগে কিচির-মিচির সুরু করে কি দুর্বোধ্য ভাষায়। ওরা কেউ খেয়ে থাকতে চায়না শুনতে চায় না, শুধু শোনাতে চায়। কেউ শুনুক না শুনুক তাদের তাতে কিছু যায় আসেনা। ওরই মধ্যে একটা পাখী যেন গোত্রছাড়া, অশ্বত্থগাছের ডালের উপর বসে আছে। ডালটা দুইয়ে এসে ওর ভার গুলো দুই দুই করছে। কোনদিন ওর উপরই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, পাখীটা সেই সরু ডালটায় বসে আছে কৌতূহলী দুটো ছোট্ট গোলগোল চোখ মেলে দেখছে ওই কলম্বুটে পাখীগুলোর দিকে। মাঝে মাঝে গলা ঘুরিয়ে ডানা মেলে গায়ের ধুলো ময়লা সাফ করে নিয়ে প্রসাধনপর্ব শেষ করে আবার চাইছে ওদের দিকে।

ঝগড়াটা বোধহয় ওকেই কেন্দ্র করে। দুটো বজ্জাতগুণ্ডা পাখী নিজেদের মধ্যে এইবার বাকযুদ্ধ শেষ করে ঝটাপটি লাগিয়েছে, ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে একটা অপরটাকে ঠোকরাচ্ছে দলের বাকীগুলো মাতব্বরি করছে।

—মরণ! সকাল থেকেই সুরু করেছে আপদগুলো!

বকুল মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। ওরাই প্রায় ওর সঙ্গী। ছোট লাইনের স্টেশন; গ্রামের বাইরেই বলা যায়। চারিদিকে ধানক্ষেত, গ্রামের সীমানায় বাঁশঝন আর আমবাগান, মাঠের বুকচিরে ছোট্ট রেললাইনটা ঘুরতে ঘুরতে এসে এই গাঁখানাকে ছুই ছুই করেও নাগাল না পেয়ে আবার বের হয়ে গেছে জংশন স্টেশনের দিকে। ছোট এর সীমানা—কমতাও অত্যন্ত সীমিত।

এইটুকু পথ আসতেই ট্রেণটা ঘুরতে থাকে—ইঞ্জিনটাকে ওই বগিগুলোকে প্রথম দেখে হেসে উঠেছিল বকুল।

—ওমা এ যে খেলাপাতির গাড়ি! এ গাড়ি চলে তো?

প্রথম নোতুন বৌ-এর কথায় একটু বিব্রত হয়। বয়স হয়েছে চোখে মুখে বয়সের ছাপ। মাথার চুলগুলোও ইতিমধ্যে বেশ টাঁই টাঁই উঠে গেছে, টাক পড়ছে। বসে বসে চাকরী—খাবার ধাবারটা মেলে বেশগাঁয়ে, তার একটু বুড়ি সকারও হয়েছে।

এতদিন বিয়ে করার কথাও মনে হয়নি তার; ভেবেছিলো দিন কেটে যাবে যেমন তেমন করে, শুধু পোটারই কোনরকমে একবেলা ভাত আর ভাজি করে দিতো আর রাতের বেলায় খান কয়েক রুটি ভাল আর দুধ, ঘিটা পেতো সস্তাদরে। এ অঞ্চল থেকে অনেক ছানার চালান যায় তাইতে ছানার খুঁটি থেকে ওই জল ছুটিয়ে ঘি করে আনতো।

কিন্তু শুধু রিটায়ার করে যেদিন চলে যাবার পর থেকেই তার নাকাল সুরু হ'ল। নাকাল যাকে বলে! আর মনোজ ঘটক যেন ওৎ পেতেছিল। সুচারুদিন আগিয়ে আগিয়ে যায়।

—লেখাপড়া জানা মেয়ে, দেখতে শুনতেও তেমনি ঘুতের। গরীবের ঘর হলে কি হয়—কুল দেখে নেবেন মাস্টারবাবু!

দীর্ঘ সতেরো বছর চাকরীতে ওই কোম্পানীর কোট গায়ে দিয়েই কেটেছে। একটা ঘুতি আর সেটি তার উপর ওই কোট চাপিয়েই প্রমথ সহরে সেজে মাঝে মাঝে, এদিক ওদিকে মেয়েদের বাড়িতে যাবে তাও ওই পোষাক।

আজ দামী ফিনিধুতি সবুজের পাঞ্জাবীতে তাকে যেন বেমানান ঠেকে। শালীরা যে ওর কপালে চন্দন পরাতে এসে বলে,

—ও মাস্টার মশাই, কপাল আর মাথা দুটোর মধ্যে ডিমার্কেশন লাইন কোনটা?

তার টাকটাকে নিয়ে এতদিন কেউ রসিকতা করেনি। প্রমথের কাছে এই প্রথম মনে হল তার বয়স হয়ে গেছে। অনেকখানি বয়স। তার পাশে ওই বকুলের মত মেয়েকে ঠিক মানায় না। বাসর ঘরেও এমনি দুচার কথা শুনেছে। কোন একজন প্রবীণা মহিলা আড়ালে বলে,

ওমা, বয়সের যে গাছপাথর নেই গো বরের, তা বকুলের বাবা কি আর পাত্র পেলেনা?

বকুলের চোখেও ফুটে উঠেছে ম্লান একটু বেদনার ছায়া। ইস্কুলে পড়েছে বাবার সংসারের নিত্য অভাবটাকে দেখেছে, তাই মনে হয়েছে বারবার তার কোন আশাই পূর্ণ হবেনা কোনদিন। পাশ করে কলেজে পড়তে যাবে তাও হয়নি।

নিজের বন্ধু বান্ধবদের স্বামীকেও দেখেছে তার নিজের জীবনেও একটা আশা স্বপ্ন ছিল সব ফুরিয়ে গেছে।

প্রমথ হয়তো স্থীর চোখে সেই কালো ছায়াটুকু লক্ষ্য করেনি। সেও ওই আলো—কলরব মেয়েদের ভিড় দেখে হকচকিয়ে গেছে।

এত কাল এই জগতের সংবাদ সে জানতোনা। ওদের কথাগুলোয় শুধু প্রমথের সারামন জলে ওঠে।

বড়লাইনে বেশকয়েক ঘন্টা এসে জংশন স্টেশনে নেমে তাদের গাড়ি। বকুলের মন কেমন করছিল। বাবা তাকে এইখানে পর করে দিল। এতকাল যে সহরে বাস করেছে, মিশেছে এর জীবনে—দেখেছে এই সহরের কর্মব্যস্ত জীবনকে, সেই জীবন থেকে বকুলকে ওরা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। বকুলের মনে হয়েছিল সে যেন এইবার হারিয়ে গেল, এই সহরে আর তার খোঁজ কেউ করবেনা। আর আসবেনা তারা গঙ্গার ধারের বালিচরে এখানের দিনগুলো তার জীবন থেকে শুকনো পাপড়ির মত এক একটা করে ঝরে পড়ে যাবে, একটু ম্লান সুরভি লেগে থাকবে তাও হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে একদিন।

তাই বোধহয় ওর বাবার দুচোখ ছেয়ে জল নেমেছিল।

ওই লোকটাকে মনে মনে সহ্য করতে পারেনি। তবে সবকিছু হারিয়ে যাবার উপলক্ষ্য ওই লোকটাই। তামাটে রং মাথায় টাক—গালদুটোতে একটু বাড়তি মাংসও লেগেছে। কোথাকার স্টেশন-মাস্টার। বকুলকে এই সহরের জীবন—এতদিনের তার স্মৃতি আর আনন্দভরা জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল জোর করে।

যাবার সময় বন্ধুদল একজনকে শুধু দেখবে আশা করেছিল, কিন্তু সেও আসেনি। বোধহয় সেও আজ তার ভুল বুঝেই রইল।

বকুল তবু এই জীবনকেই মেনেনিতে চেষ্টা করেছে।

গাড়ি বলতে দুখানা যায় আর দুখানা আসে। আসা যাওয়ার মুখে দুএকজন যাত্রী তাকির হয়, কেউবা অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্য যারা নামলো তারা চলে যায় গ্রামের দিকে।

আবার নিস্তব্ধ হয়ে আসে জায়গাটা। অশথ বটের ছায়া নামে। দূরের কোন যাত্রী এলেছিল গাড়োয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে ফেরে: পথ ধরে গরুর গাড়িটা চলিয়ে নিয়ে যায়।

বকুলের এই নির্বান্ধব জীবনে নামে একাকীত্বের বোঝা।···ছোট বাসা ওপাশে দুচার জন কুলিখালাসীর ঘর, সামনের জমিটুকুতে বকুল নিজের হাতে লাগিয়েছে দুচারটে গাছ পালা, তবু সময় কাটে না।

মনেহয় সময়টার সব গতি হারিয়ে গেছে! দিন মাস বছরগুলোও পার হতে না—বকুলের জীবনে ওরা কি কঠিন বোঝার মত চেপে বসেছে।

তাই মাঝে মাঝে শুধায়,

তোমাদের বদলি হয় না?

প্রথম গাড়ি পাশ করিয়ে বাড়ি ঢোকে। চান খাওয়া করে সন্তান দেয় একটু, স্ত্রীর কথায় ওর দিকে চাইল। এখানের স্টেশনে সেইই কর্তা। এদিক ওদিক দুচারটে পয়সা আমদানী হয় তাছাড়া শাক কলা মূলো তো আসেই। ইস্টিশান মাস্টারবাবু বলে এ চাকলার লোক তাকে চেনে, খাতির করে। অন্যত্র গেলে সেখানে হবে বুকিং ক্লার্ক, না হয় গুদামবাবু, পরের তাড়া খেতে আর পারবে না এই বয়সে। বকুলের অবশ্য সুবিধা হয়। প্রথম ইতিমধ্যে টের পেয়েছে তার ঘটা বেশ বেড়ে গেছে। শাড়িও কেনা হয়, মাঝে মাঝে এ গ্রামের স্বর্ণকারদের পাতুকেও এ বাড়িতে যেতে আসতে দেখা যায়। মাইনের টাকাটায় তার হাত পড়তো না, এখন তার থেকেও বেশ ঘটা হচ্ছে। প্রথম মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তবু স্ত্রীর মুখের উপর কিছু বলেনি। বকুলের শহরে যাবার কথা শুনে বলে প্রথম,

—এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে বলো? সবই তো আসছে! তবে আবার শহরে কেন? শখের বিবি সেজে ঘুরতে?

বকুল ওর কণ্ঠস্বরের ঝালটুকু টের পেয়ে থেমে গেল। প্রথমের মনের অতলে একটা লোভ নীচতা আর একা থাকার যাতনা রয়ে গেছে। সকলের মধ্যে গিয়ে সে থাকতে পারবে না। তাছাড়া জানে বকুল লোকটা ভীষণ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সবকিছুর উপর ওর কড়া নজর, সবকিছুকে আগলে আগলে রাখতে চায় নিজের অধিকারে।

প্রথম এসে বকুল এখানে একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই বৈকালে কাযকর্মে সেরে শাড়িটা বদলে নিতো, চুল বেঁধে সাধ্যমত একটু প্রসাধন করে বাসা থেকে বের হয়ে ওই বট অশথ গাছের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে স্টেশনে গিয়ে উঠতো।

চারিদিকে ধানক্ষেত, ওপাশে খানিকটা লাল ডাঙা মাথা তুলেছে—দুচারটে তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে একসাথে খাড়া হয়ে, তারও ওদিকে নদী একটা বয়ে এসে লাইনের নীচে দিয়ে চলে গেছে—ছোট্ট নদী। তবু বর্ষায় ওর তোড় বাড়ে মাঠ ডুবিয়ে দেয় ঘোলাটে জলে জলে—এঁটেল মাটির কাদা ওঠে পথে—তারই মাঝে প্লাটফরমটা সুন্দর। সিঁথির সিন্দুরের রঙের খোয়াগুলো ঘুরে ঘুরে লালচে হয়ে গেছে—একপাশে তার ঘন সবুজ মেহেদিগাছের বেড়া, ধারে ধারে ফুটে থাকে লাল করবীর গুচ্ছ, সাদা বেগুনী রং-এর মেহেদী ফুলের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরে থাকে। দুচারটে আমগাছ ক'বছরে সকলকে সবুজ হয়ে উঠেছে, পাখীগুলো

ওখানেও কলরব করে. বট অশথ কৃষ্ণচূড়া আর ওই আমগাছগুলো ছায়গাটাকে ছায়াময় সবুজ করে রাখে।

দিনান্তের ট্রেনখানা শহরের দিকে যাবার মুখে দাঁড়ায়, দু'একজন যাত্রী নারী-পুরুষও থাকে। ট্রেনখানা ব্রিজের উপর গুমগুম আওয়াজ তুলে এসে দাঁড়ায়; প্রমথ এই সময় স্টেশন থেকে চামড়ার ছোট ক্যাসব্যাগটা সিল করে বগলদাবা অবস্থায় এনে গার্ড সাহেবের হাতে দেয়।

এখানের গ্রাম্য যাত্রীদের মধ্যে বকুলকে যেখানান ঠেকে, প্রমথও দেখেছে তাকে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে ট্রেনের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য সেই মাঠ—সবুজ নির্জনতা লোকের ভিড়ে ভরে ওঠে। ওই মানুষগুলোও ট্রেন থেকে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

আবার ট্রেনখানা ক্ষীণসুরে সিটি বাজিয়ে দীর্ঘ দেহটা নাড়া দিয়ে সচল হয়ে ওঠে। বাবুদের দীঘি-ওই অশথ গাছের ওদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে হারিয়ে যায়, সব কোলাহল কলরব থেমে যায়। খুদু মিঠাইওয়ালা, নবীন পোর্টার ওই ভিখারী ছোড়াটা সবাইকে ঠকিয়ে ট্রেনখানা পালিয়ে গেল।

আজকের মত এখানের জীবনের কলরব থেমে গেল। মাঠের বুকে আকাশের গায়ে দিনের রঙীন আলো মুছে দিয়ে নামছে সন্ধ্যার অন্ধকার। যাত্রীরা আলপথ পার হয়ে যে যার গ্রামের দিকে চলেছে। এই স্টেশনটার কথা এখানের পরিত্যক্ত মানুষ ক'জনের কথাও ওরা ভুলে যায়। দুএকটা তারা কি যেন আতুরা চোখে ওই ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। পাখীগুলো তখন ফিরে এসে গাছের ডালগুলোর দখল নিয়ে কলরব বাধিয়েছে। বকুলের মনে হয় এমনি কোন নির্বান্ধব নির্জনে সে নির্বাসিত হয়ে গেছে।

তবু এমনি মিষ্টি বৈকালটুকুর জন্য সে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। তার জীবনের একটি দিন শেষ হ'ল।

প্রমথের ডাকে চমক ভাঙে। অফিস থেকে বের হয়ে আসছে এই দিকে। বকুল ওর দিকে চাইল। বলে,

চল না, ওই লাল ডাঙার ওদিকে ওই তালগাছগুলোর কাছ দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

প্রমথের সারা মন জলে ওঠে। বকুলের স্টেশনে আসা নিয়ে দু'চারটে কথাও কানে এসেছে। গার্ড সাহেব ওই বদন্ত সান্যালটু বলেছে দুজনেই তাহলে টিকিট চেক করছো ভায়া; তা দেখো ওই টেলিগেরাফটা শিখিয়ো না। কোনদিন কোন ছোকরা সিগন্যালারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলবে।

ড্রাইভার নবের চাঁদও হাসে।

—বেশ আছো দাদা। বলে না যাওয়ার মাঝের কোল আর···মানে তরুণী বোবতীর কোল—

কথাটা শেষ করতে পারেনি নবের চাঁদ···কয়লা মাখা মুখে আর লালচে দুটো চোখ মেলে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে থাকে।

নবের চাঁদের ইঞ্জিনে বাকি থানি মনের বোতল থাকে; ওটা না হলে তার ইঞ্জিন চলবে না। প্রমথ ওদের কথার জবাব দেয়নি। জানে জংশন স্টেশনেও এ নিয়ে কথা হয়।

রাগটা বকুলের উপরই পড়ে।

—এসময় ইষ্টিশানে না এলেই পারো।

অবাক হয় বকুল—কেন? এলে দোষ কি?

ফোঁস করে ওঠে প্রমথ—দোষ আর কি! ওই তো দোষ। নেজেগুজে পটের বিবির মত লোকের সামনে না দাঁড়ালে মন ভরে না, এই আর কি!

বকুল লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। নিজের জীবনের সব আশা স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। বনবাসে বন্দী হয়ে আছে। তবু এইটুকু তার কাছে মুক্তির স্বাদ আনে। তাও সহ্য করে না ওই লোকটা।

বকুলের মনের সব সুর কি নীরব আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। সরে এল সে ওই প্ল্যাটফরম থেকে মনে হয় ওই ছোট্ট বাড়িখানা যেন কোন কেল্লাখানা।

দুচোখ বেয়ে জল নামে।

কার হাসির শব্দে চমকে উঠে। আঁধার আকাশ তারায় ভরে গেছে, অনেক তারা। বাতাসে ভেসে আসে মিষ্টি সুবাস। মেহেদী ফুল ফুটেছে অনেক।

—তুমি।

নিখিলকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি বকুল। সুন্দর দীর্ঘ চেহারা চোখে সোনালেন্সের চশমা, মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা, পরণে ওর ধোপদুরস্ত ফুলপ্যান্ট আর সার্ট। একটু ছিমছামই থাকে সে।

নিখিল হাসছে—কেন আসতে নেই? উঃ কোথায় রয়েছো? তা উনি কোথায়? তোমার কর্তাটি?

বকুল হাসে—তিনি! ইস্টিশানে নেমে যার হাতে টিকিট দিয়ে এসে তিনিই। বিনাটিকিটে এসে দেখতে মজাটা? যাও যাইন—

বকুল প্রমথের মত মুখভঙ্গী করে দৃশ্যটা দেখাতে গিয়ে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ে অবাধ ঝরণার মত। নিজের সেই হাসিটাকে এখানে এসে অবধি ভুলে গিয়েছিল বকুল। আজ মুক্তধারার মত সে ছিটিয়ে পড়ে খুশির আবেগে। বলে,

—বস। হাতমুখ ধুয়েনাও ওই বাথরুমে জল আছে। আমি চা চাপাই। নিখিলের জন্য আজ চায়ের জল চাপায় - চটকরে মরদা মাখতে বসে। পোটার রামবচনের বৌকে পাঠায় স্টেশনের মিঠাইওয়ালার দোকানে যদি রসগোল্লা পাওয়া যায়। বলে,

দেখছো তো বনবাসে রয়েছি, হাঁপিয়ে উঠেছি।

নিখিলের চোখে ওর জন্য বেদনা, বকুলের দৃষ্টি এড়ায়না সেটা। বকুল বলে,

একেবারে ভুলেগেছো আমায়। এরজন্য তো তুমিই দায়ী, সেদিন যদি এগিয়ে আসতে এভাবে আমাকে তিলে তিলে মরতে হতো না নিখিল। সেদিন তুমি সরে গেলে—

বকুলের ডাগর দুটো চোখ জলে ভরে ওঠে।

বকুল!

নিখিল ওকে থামাবার চেষ্টা করে। ওর হাতের স্পর্শ লেগেছে বকুলের হাতে, নিবিড় উত্তাপময় একটু স্পর্শ। বকুলের সারা মনে অতীতের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। স্বপ্ন দেখার দিন।

গঙ্গার বালিচরে তারা দুজনে হারিয়ে যেতো, কখনো জলে নামতো। দিনের শেষ রক্তিম আভাষ-পাখীগুলো উড়ে যেতো—ওরা দুজনে যেন কোন নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। বকুলের জীবনে এমনিভরে নিখিল একটি স্থান করে নিয়েছিল।

চা জুড়িয়ে গেল! কি যা তা বলছি—

শহরে শহরে
গ্রামে গ্রামে
পাড়ায় পাড়ায়
ঘরে ঘরে

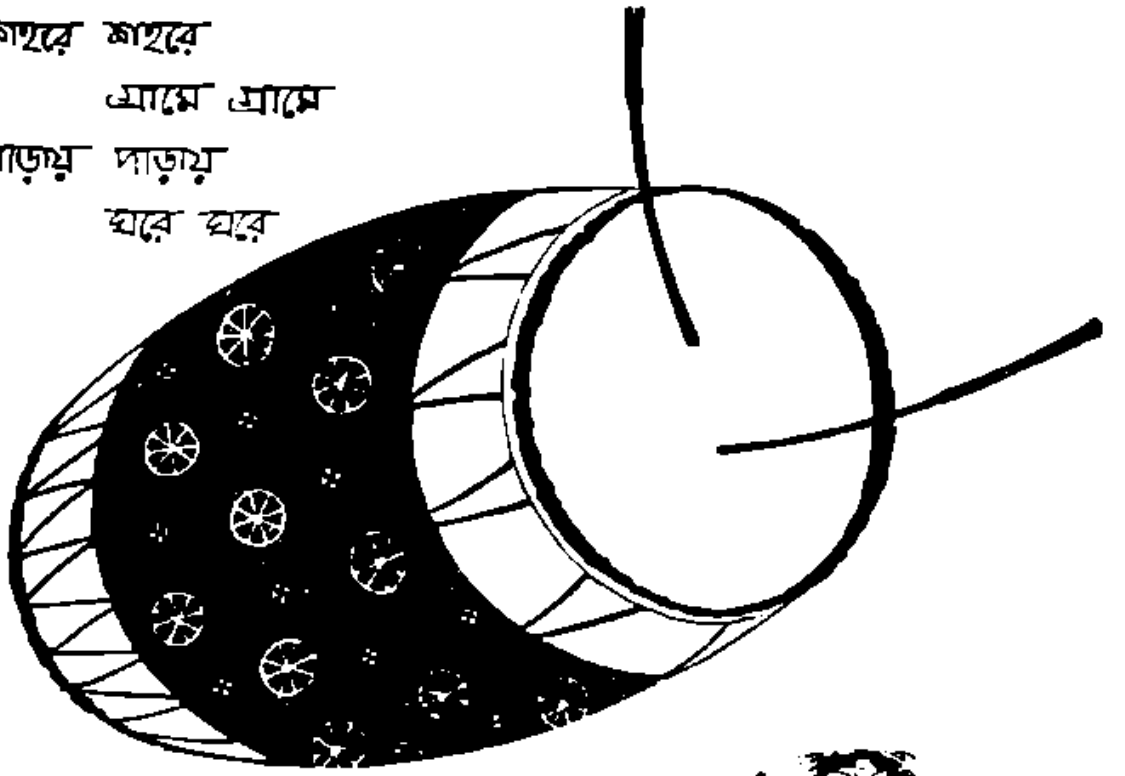

ঢাকের বাদ্যে মুখরিত
আকাশ বাতাস,
আবার মা আসছেন ঘরে

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

আজ সকলের প্রিয়, পুজোর বাজারে আর সব কিছুর সঙ্গে চাই — বোরোলীনও। ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায় তার জুড়ি নেই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

খেয়াল হয় বকুলের। নিখিলও চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সে কি ভাবছে। বলে ওঠে,

—সেইদিনগুলোকে আর ফিরে পাওয়া যায় না বকুল? এই বনবাসে ওই আধবুড়ো মানুষটাকে বেনে নিয়ে শুধু ব্যর্থ হয়ে, বাঁচবে কি করে?

বকুল হাসছে। খিলখিল সেই হাসির সুর ওঠে। পাখীগুলো এসে জুটেছে ওই অশথগাছের ডালে টেলিগ্রাফ লাইনের উপর। সেই মাদী পাখিটাকে ঘিরে কলরব করছে একপাল পাখী। বকুল বলে: মুখপুড়ির রূপ আর গুমোর দেখেছো। ওদের দিকে যেন চাইবার সময় নেই মহারাণীর! বলোতো কারা বেশী নিষ্ঠুর? মেয়েরা না ছেলেরা?

নিখিল জানে তার অপরাধ, তাই শোনায়—ছেলেরা?

বকুলের দুচোখের কালো তারায় কৌতুকের ঝিলিক। যৌবনের বান ডেকেছে ওর সারা দেহমনে। কমলালেবু রং শাড়িটায় সেই রূপের আভা যেন ফুটে বের হয়। চোখ মটকিয়ে বলে বকুল,

ওতো মনরাখা কথা. নিষ্ঠুর মেয়েরাই। আমিই তো তোমায় বলেছিলাম বিয়ে হবে এইবার। আর এলো না তুমি! বলিনি? বকুলের দু'চোখে জল নামে।

হাসছে নিখিল—পাগলী!

বকুল আর নিখিল আজ মুক্তির আনন্দে বের হয়ে পড়েছে অনেক দূরে।

…ওই লাল ডাঙ্গা—তালগাছগুলোর সীমানা পার হয়ে চালু মাঠের নীচে নদীর দিকে চলেছে তারা দুজনে। চরে কাশফুল ফুটেছে বাতাসে মাথা নাড়ে নীলচে শ্বেত উত্তরী। হাওয়া কাঁপে। দূরে দেখা যায় জমাট সবুজের মত সেই ছোট্ট ইষ্টিশান—টিনের বাড়িগুলো। রোদে একটু বিন্দুর মত ঝিকমিক করছে। বকুল খুশিতে ফেটে পড়ে। ওই জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে সে। বলে,

ওখানে ফিরতে হবে ভাবতে ভালো লাগে না নিখিল। মনে হয় এই লাল ডাঙ্গা—তালবন এই কোপাই-এর ধারে ধারে কোথায় পথ ভুলে হারিয়ে যাই। কতোদিন চেয়েছিলাম এই দিকে আসবো। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

আজ তাই হারিয়ে যেতে চাও?

নিখিলের হাতে ওর হাতখানা। ওই কাশবনের আড়ালে কোথায় বাতাসের সুর ওঠে, সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো নীল আকাশের বুকে ভেসে চলেছে। মনের সব চিন্তাগুলো ওই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সেও বাঁচতে চায়। এমনি করে সারা মন দিয়ে ভালবাসার স্পর্শ পেতে চায়। পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে তার ভাবনার বিচিত্র পুথক সত্তাগুলোর মত।

—নিখিল!

বকুলের কণ্ঠে কি নোতুন সুর। সে আজ মনে মনে সব বাঁধন ছেঁড়ার স্বপ্ন দেখে. ওই বন্দীদশা থেকে সে মুক্ত হয়ে এমনি আলোভরা জগতের অসীমে হারিয়ে যেতে চায়।

নিখিল ওর দুচোখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর হাতখানা ওর হাতে কি নির্ভর খুঁজছে। এই খবোক আকিঞ্চনের গভীরে হারিয়ে যেতে চায় বকুল। সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে ওই আলোকোজ্জ্বল স্নিগ্ধতার সবুজ গহনে নিজের মনের কোন জোর তার নেই। তাকে জয় করে নিয়েছে নিখিল একটি চিরজাগ্রত প্রাণ-সত্তা?

—নিখিল!

বকুল হারিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে ভুলে যাবে। তার জগৎ—তার ঘর একটি মানুষ সবারই কথা আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে, কি অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর সেই অনুভূতি! তার যেন নিঃশ্বাসটুকুও ফুরিয়ে আসছে—

—নিখিল!.....হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বকুল।

রাত কত জানেনা। দুচোখ রগড়াতে থাকে, কোথায় সেই মেঘমুক্ত শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ কোথায় হারিয়ে গেছে তার সেই নিখিল।

খোলা জানলার বাইরে দেখা যায় ফিকে চাঁদের কান্নার মত করুণ এতটুকু আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে ঝোপগুলোর বুকে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা করুণ কান্নার মত।

.....কোন এক মহাশূন্য থেকে—কি স্বপ্নের জগত থেকে প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে এসে পড়েছে বকুল কঠিন বাস্তবের বুকে। তবু মনেহয় সেই অতল জগতের কালো মানুষগুলো ছায়া হয়ে ঘুরে ফেরে তার চারিদিকে। নিজের মনের এই স্বরূপটাকে দেখে আজ সে খুশীতে ভরে শিউরে ওঠে। মনেহয় বড় একা সে, ভয় হয়!

—শুনছো।...শুনছো?

প্রমথ ওদিকে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, নাকডাকছে বিশ্রী শব্দে।

বকুলের ভয়ার্ত ডাকে সে পাশফিরে বিড়বিড় করে...ওহোও দিকি রাতের বেলায় জ্বালিয়ো না।...

—ওগো। বকুল ভয় পেয়ে গেছে। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে, সেগুলো ঠিক করে মনে নেই কোথায় কোন আলোর জগতে হারিয়ে গেছল সে! সে আর নিখিল!

নিখিল আসবে বলেছিল, তাকে সে ভালবাসতো। সেও বলেছিল। ওই ঘর বাঁধার কথা। কিন্তু তার কোন স্বপ্নই সত্যি হয়নি। নিখিল তার বিয়ের আগেই দুদিনের জ্বরে মারা যায়।

সেদিন বকুল কেঁদেছিল, কেঁদেছিল তার স্বপ্নের অপমৃত্যুতে।

—তবু মনে হয় সেটা সত্যি নয়। কোন নিশীথ রাতের দেখা স্বপ্ন যা কোনদিন সত্যি ছিল না, সত্য নয়। নিখিল মরেনি—হারায় নি।

আজও তাই সে বৈকালে ওই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে, দুচোখ মেলে সব ক'টা জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে মুখগুলো দেখে, হয়তো কোনদিন সে এসে দাঁড়াবে এই ছায়ানামা ইটিশানে মেহেদী বেড়াঘেরা ফুল-কোটা প্লাটফরমে।

বকুল তাকে নিয়ে ওই পেরুয়া ডাঙা—তালগাছগুলোর নীচে দিয়ে খোয়াই জলধারার পানে বেড়াতে যাবে। পাখীগুলো কলরব করবে দিনশেষের আলোয়।

প্রমথ ওর মনের অতলের সেই খবর জানেনা, বকুল কোনদিনই সেই কথা বলেনি বলতে চায়নি।

তাই রাত গহনে ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারেনা। ওকে মনে হয় অচেনা কোন মানুষ।

আজও তাই বকুল কোন চাঁদ্রা নামা বৈকালে ওই ট্রেনখানার দিকে চেয়ে থাকে—সে আসবে। পাখীগুলো তারের উপর উড়ে বসে, রাখাল বাঁশীর সুর ওঠে মাঠের দিকে, ওই তালবন থেকে খোয়াইএর পারে পারে। মেঘগুলো শেষ আলোয় রঙীন হয়ে ওঠে।

ওই অধরা জগতে বকুলের রঙীমন ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যায়— এমনি করে সে হারিয়ে যেতে চেয়েছে বারবার কোন অজ মনে।

———

মক্কাগমালিকার ঠিকানা

বারীন কর

"Oh Daisy, I am Crazy
For the love of you."

নাচগানের সুর ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলাম। ভালো লাগছে না। আবার মনে যে বন্ধ অবরোধ সুর, খোঁচা দিয়ে সেটাই বার বার জাগিয়ে তোলে।

হায় ভারতবর্ষের গীতা-উপনিষদ, তোমরা কোথায়? কোন্ কাজে লাগলে? আজও শুনেছি, তোমরা নাকি দেশের সম্পদ। কিন্তু, ওই যে বালে হাত-কলকে যে ছেলেটি পিছলে চাকার নীচে পড়ল, তার কোন কাজে লাগলে তোমরা? আমি ওকে চিনি। পাশের বাড়ীর মেয়ের মুখ চুম্বন করে ও রাস্তায় বার হয়েছে। রাত্রে হাসু-ও-হানায় বোমের পিছনে মিলন-মন্ত্রও দেওয়া আছে। আজ ওরা শরীর দিয়ে পরস্পরকে চিনত। এই অহেতুক অকাল মৃত্যুর কি যুক্তি, কোন সাধনা তোমাদের হিমালয়-প্রমাণ নথিপত্রে আছে?

পার্কের বেঞ্চে বসে ভাবছিলাম। বিদ্রোহী তারুণ্যের চিন্তা।

অন্ধকার চারদিকে সমুদ্রের মত।

খস্ খস্ পথে চেয়ে দেখি একজন ভদ্রলোক। অতি পরিচ্ছন্ন পোষাক, দেখলেই মনে হয় কেউ একজন।

"যাই, কি যে করে?" নিজের হাতঘড়িটা দেখে বলে উঠলেন, "সময় উপরে .গছে, দেখা নেই। আশ্চর্য।"

চলাফেরায় আমাকে দেখতে পাননি তিনি। ইতস্ততঃ পাদচারণ কিছুটা মত্ত-মাতঙ্গের প্রায়। প্রস্থেও ভারী, অর্থেও ভারী মনে হয়।

এত ভার বহনকারীর ভারসাম্য সবসময় ঠিক থাকেনা। ভদ্রলোক আমার পা-টা মাড়িয়ে ফেললেন।

"মাপ করবেন, দেখতে পাইনি। লাগেনি তো?" কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেন তিনি।

"যদি বলি মাপ করবনা এবং লেগেছে?"

কাষ্টহাসির পরদা টেনে ভদ্রলোক জানালেন, "আপনার আজ্ঞা রস আছে, দেখছি।"

"যদি বলি এটা রস নয়, রক্ত মাংস?"

এবারে তিনি আমার পাশে বসে পড়লেন, "স্যর, আপনার কি করা হয়?"

"সম্প্রতি এম. এ. ফেলকরা হয়েছে।"

"তাই নাকি? আপনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"শুনি যে তারা নাকি দারুণ স্মার্ট হয়। তাদের দেখে বহু কিছু শেখার আছে।"

সপ্রশ্ন মুখ তার ভদ্রলোকের।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, আপনি কি কলকাতার লোক নন?"

"আজ্ঞে, না। জন্ম থেকে বিহারের গণ্ডগ্রামে মানুষ। পৈত্রিক গালার কারবার। কিছুদিন হ'ল হেড অফিস্ খোলা হয়েছে কলকাতায়। আমি তাই এখানে এসেছি। এবং এসেই ফেঁসে গেছি।" সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল।

"কেন, ঠকে গেছেন নাকি?" ঔৎসুক্যে প্রশ্ন করলাম।

"ঠকেছি কি জিতেছি, এখনও জানিনা।"

"আপনিও যে কথার খেলা চালাচ্ছেন।"

"তাই তো বলেছি, আপনাদের দেখে অনেক শেখার আছে। এর মধ্যেই শিখে ফেলেছি।"

ভদ্রলোক বিদ্রূপ করছেন কিনা বুঝবার আশায় তাকালাম ওঁর মুখে। পাশে বসেছেন বলে অন্ধকারেও দেখা গেল। বেজায় বিষণ্ণ মুখ।

"আমি ছাতুর দেশের লোক, ভালমন্দ জানিনে। আমার জানকাও নেই, সভ্য জগতে কি করে চলা উচিত। মেয়েরা কেমন ব্যবহার আশা করেন, বিশেষ করে কলকাতার মেয়েরা, আমি বুঝতে পারিনে।"

নিবিড় অন্ধকার যেন কিঞ্চিৎ হয়ে গেল। বুঝলাম ভদ্রলোক হৃদয়-বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন।

হায়, গালা-কারবারী, এই সন্ধ্যা তোমার সারাদিনের কর্ম অন্তে খাটিয়া পেতে বসার সন্ধ্যা নয়। একহাতে পেন্সার সরবৎ নিয়ে পেটোয়া বন্ধু বা মোসাহেবের সন্ধ্যা এ-নয়। কলিকাতা মহানগরীতে এসে সন্ধ্যা তোমার চাপা উত্তেজনায় থরো থরো কাঁপছে। বল্লাম, "ও, তা, এখানে দেখা করার কথা ছিল? এসেই তো খুঁজছিলেন।"

"হ্যাঁ, ছিল বইকি। এলনা।"

"এমনিই করে থাকে এরা।"

"সমস্ত কথা ঠিক। অগ্রিম টাকা পর্যন্ত দিয়েছি।"

বাপ্‌রে, ভদ্রলোক দেখছি নারীপণ্যের ক্রেতা! ছোর ব্যবসায়ী, প্রেমের ধার ধারেন না। ঘৃণাবোধ হ'ল, উঠে দাঁড়ালাম।

"বসে থাকুন আপনি। আমি চলছি।"

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বল্লেন, "স্যর, আপনি আমাকে এযাত্রা উদ্ধার করুন। আপনি যা স্মার্ট।"

আমি চটে উঠলাম, "হাত ছাড়ুন, মশাই। আমি ওসব ছোট কাজ করিনা। কাকে কি বলছেন?"

ভদ্রলোক নিভে গেলেন। আম্‌তা-আম্‌তা করে বললেন। "আমি শুনেছিলাম কলকাতার ছেলেরা বহুৎ জানে।"

"জানি বলেই আমরা কি ওইসব করি নাকি?" আমি চলতে সুরু করলাম। এই রকম একটা ইতর লোকের সঙ্গে মেলামেশা কাজের কথা নয়।

"স্যর, ভেবে দেখুন। সামান্য একটু সময় আমাকে দেবেন। অগ্রিম একশো দেব আপনাকে। কাজ হয়ে গেলে নগদ দু'শো।"

ইনি দেখছি গ্রীক দমকামিতার স্বপ্নের। কথাটি না বলে সত্বর পা চালালাম। 'স্বানত্যাগেন দুর্জনঃ' এই নীতির অনুসরণে।

ভদ্রলোক লাফিয়ে আমার পেছু নিলেন মাছোড়বান্দা।

"আপনার কতটুকু সময় লাগবে? অধিকাংশ সময় মুখে বলা, মাঝে মাঝে চলে-ফিরে দেখানো। বেশী সময়ের কথা নয়।"

এ আবার কি? আমি বল্লাম, "লেখাপড়া করবার কথা বলছেন না, কি?"

"লেখাপড়া আর হ'ল কোথায়? মূর্খ হয়েই রয়েছি। ষোলো বছর বয়সে ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন বাবা। তা না হ'লে এমন দশা হয়? মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা দেখাবার জন্যে পয়সা দিয়ে লোক রাখতে হয়? কি করি, বলুন? কলকাতায় এই প্রথম আসছি। কলকাতার হালচাল জানিনা। তার, আমার এই ছাব্বিশ বছর দু'মাস বয়সে কোন মেয়ের সঙ্গে মিশিনি। আমার বোন পর্যন্ত নেই একটা। মা মারা গেছেন বহুদিন।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ধীরে ধীরে আমার চক্ষে আলোক রেখা দিল। সেই আলোতে পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে গেল।

আমি ওঁকে কলকাতার আধুনিক সমাজের নারীর সঙ্গে মেলামেশা পদ্ধতি শেখাব। আমি ওঁকে নারী চিত্তজয়ের মহৌষধ হাতে তুলে দেব। সেই শিক্ষা দিয়ে উনি মানসীর মন জয় করবেন।

হায়রে, ছোটবোনটাকে পর্যন্ত বশ করতে পারিনা, দিনরাত ঝগড়া লেগেই আছে। মানুষ বলে সে মনে করেনা আমাকে।

আমি আবার অন্যকে নারীজয় শেখাব?

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আপনি রাজী হয়ে যান, স্যর। এই যে ঠিকানা নিন আমার। কাল যদি দয়া করে সকালের দিকে আসেন। টাকাটা পেলেই আপনি পাবেন।"

বেশ বনেদী পাড়ায় ফ্ল্যাট। মন্দ কি? ফেল-করা বেকার জীবনে যদি স্বর্গসুখ ছুটেই আসে, আমি তাকে ধরবোনা কেন?

পরের দিন সকালে আমার সাজসজ্জা দেখে ছোট বোনটা মন্তব্য করল, "মুখেতে যে মাকা পড়েছে। বাবুর যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

আমি বললাম নিজের মান বজায় রেখে, "একটা কাজ পেয়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া মুখ ভেংচে নেচে নেচে বলতে সুরু করল, "কাজ পেয়েছি। কী মজা, কী মজা! মা, শোন, এবার আমার বেনারসী শাড়ী হবে। বাবা যে দাদাকে 'বেকার বলদ' বলে গালাগালি দেন, সেটা কিছু নয়।"

কথার আশ্চর্য্য দেখে গা-জ্বলে ওঠে। যাইহোক; সোনিয়ার ঠাট্টা বিদ্রূপে কান না দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি রওনা হ'লাম।

বনেদীপাড়ায় আধুনিক ফ্ল্যাট দালিয়ে রায়বনোহর মিত্র মশাই বসেছেন। পোষাকেও অতি আধুনিক। কিন্তু কিছুতেই যেন বাঙালী মেয়ের মনের চাবীটি পাচ্ছেন না।

কার্পেট ঢাকা, সুসজ্জিত ঘরে তিনি বসে আছেন চিন্তিত মুখে নরম সোফায়। আমাকে দেখে কৃতার্থ

হয়ে গেলেন। হয়তো, বা ভেবেছিলেন, আমিও পূর্বনিযুক্ত 'প্রেম-পূর্বরাগ শিক্ষকের' মত ওঁকে পাগল ধরে নিয়ে কেটে পড়ব।

সযত্নে বসিয়ে কফি-কেক খাওয়ালেন। ডিমের খোলার মত পাতলা কাপে অতি খারাপ ভাবে বানানো কফি খেয়ে মনে হ'ল প্রথমেই ওঁর বেয়ারাকে কফি বানানো শেখাতে হ'বে। এমন কফি যদি প্রেয়সীকে রোজ আদায় করেন, প্রেয়সী কি আর সদয় হ'বেন?

একতাড়া নোট মধ্যের টেবলে চাপা দিয়ে আমাকে প্রকটভাবে দেখিয়ে সামনে রাখলেন। বড় ব্যবসায়ী! টোপ্ সামনে ঝুলিয়ে রাখলে তবেই তো উৎসাহ আসবে।

আরম্ভ হ'ল কাজ।

প্রথমে শুনে নিলাম মানসীর ইতিবৃত্ত।

কোনও দোকানে আলাপ। মেয়েটি রং-তুলী কাগজ কিনছিল বিখ্যাত রংয়ের দোকানে। মনোহর মিশ্র কার্যব্যপদেশে তখন সেখানে উপস্থিত। প্রথম দর্শনেই তিনি প্রেমে পড়লেন।

শিল্পী মহিলাটির ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন ঘোর বৃষ্টির সময়ে মোড়ে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ীতে পৌঁছে দেন কলেজে। বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ যোগাড় হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তিনি নাগাল পাচ্ছেন না। মেয়েটি কি চায় তিনি বুঝতে পারেন না। বন্ধুবান্ধব এখানে কেউ নেই ওঁর। বড়বাজারে দু'একঘর আত্মীয় থাকলেও তারা অন্যরকম। বাঙালী মেয়ে যে শুধু গাড়ীবাড়ী চায়না, মন চায়, উক্ত তথ্য তিনি সম্প্রতি হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

"বাবা বিয়ের জন্যে হামেলা করছেন। এত বয়সে আমাদের সমাজে বিয়ে না করে কেউ থাকেনা। আমি নেহাৎ ব্যবসাটা দাঁড়করাতে যেয়ে বলেছিলাম বিয়ে এখন কোরব না। ছোট ভাই-এর বিয়ে হয়েছে। এজন্য সমাজে আমাদের নিন্দা করে। কিন্তু, সেই পাড়াগাঁতে পড়ে পড়ে পালায় চাষ করেছি। কী বদ্ গন্ধ কারখানায়! কে থাকত ওখানে, কোন মেয়ে? যাই হোক, এখন আমার নিজের ভাগ বুঝে পেয়েছি। যদি এই মেয়েটিকে পাই অন্য কোথাও বিয়ে করব না। আমার নিজের অংশে আর বছরে লাখ টাকা।"

ভাবলাম, কে সেই মহিলা, না জানি কত অসাধারণা যে এমন বুবেরুকে প্রত্যাখ্যান করছেন?

বৈধতার আশ্বাস পেয়ে কাজে নামলাম।

প্রথমেই হাঁটা দেখালাম।

"যদি সঙ্গে মহিলা থাকেন কদাচিৎ জোরে হনহন করে হাঁটবেন না। ওঁর চলার সঙ্গে পা মেলাবেন। উঁচু নীচু পথঘাট হলে দাঁড়িয়ে সাহায্য দেবেন। গাড়ীতে উঠবার সময়ে দরজা খুলে ধরে দাঁড়াবেন। নামবার সময়ে আপনি চট করে আগে নেমে ওঁকে নামতে সাহায্য করবেন।"

"কেমন করে দরজা ধরব? কেমন করে সাহায্য দেব?"

মোটাসোটা ভদ্রলোক আনাড়ীমার্কা ভাবে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে লাগলেন।

একঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে গলদ্ঘর্ম হয়ে বসলাম।

ভদ্রলোক এক ঝটকায় লাল রুমাল খুলে ললাটের ঘর্ম অপনীত করে আমার হাতে টাকা দিলেন; "এক সপ্তাহ শেখাতে হবে। বাকী টাকা সপ্তাহের শেষে পাবেন। বিয়ে যদি হয়, বিয়ের দিনে হাতঘড়ি দেব আপনাকে। আমাদের ঘড়ির এজেন্সি আছে। উঠে পড়ে লাগুন, স্যর।"

আমি ভাবলাম কী শুভমুহূর্তে কেলকরা মন নিয়ে বসেছিলাম পার্কে। ভারতবর্ষের গীতা-উপনিষদের মুণ্ডপাত করছিলাম দর্শনে ফেল হয়ে। তারা আমাকে অযাচিতভাবে সুবর্ণগর্ভকে এনে দিল।

ভাগ্যকে বারবার ধন্যবাদ দিলাম।

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলেন, "আপনার ঠিকানাটা, স্যর? মানে যদি দরকার হয়।"

আমি ঠিকানা বললাম, "লিখে নিন।"

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, "আরে, আপনি যে পাশের বাড়ী।"

"মানে?"

"মন্দারমালিকা গুপ্ত তো পাশেই থাকেন। আপনাকে সঙ্গে দেখা আছে নিশ্চয়। একদম সোফিয়া লরেইনের মত দেখতে, না?"

মন্দারমালিকা কে? ও, ও, মালা? সোমিত্রার সহপাঠিনী বন্ধু। ছবি—আঁকা ছবি!

সেই এই ভদ্রলোকের মনোহারিকা? দেখে কোনদিন মনেও হয়নি সে আবার এত দামী মানুষ।

ঘ্যান্—ঘ্যান্ করে দিনরাত, "প্রতাপদা, সিনেমার টিকেট এনে দাওনা" "প্রতাপদা, আমি একটা যা সুন্দর ছবি এঁকেছি দেখবে এসোনা—" ইত্যাদি।

ছেলেবেলা থেকে দেখছি। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা আমার বিশেষ ভক্ত, পেছু পেছু ঘোরে আমল দেবার কথা মনেও আসেনি। দেখে সোফিয়া লরেইন দূর কথা, বাংলা চিত্রতারকার মুখও মনে আসেনি।

এখন দ্রৌপদীর শাড়ীর মত বিভিন্ন স্তর উন্মোচিত হচ্ছে মালার! আমি চমৎকৃত।

এমন সুযোগকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সবাই তো সে অলাবাজা। আগে ভেবে দেখিনি।

'মন্দারমালিকা' নাম নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছি, একজন যে সেই নাম জপমালা করেছে। তাকি মনোরঞ্জনে, আমার প্রথম এতগুলো টাকা রোজগার হলো। আরও হবে। ওই নামে।

টাকাটা পকেটে পুরে উঠলাম। মালাকে দরকার একটি সূত্র এঁকে ধরিয়ে দিলেই হাতঘড়ি আমার হাতে উঠবে।

মালা অখাদ্য ছবি আঁকে। তাকিয়ে দেখা যায়না। অথচ প্রাণ ঢেলে সে শিল্পী হবার চেষ্টায়। ওর ধারণা ও দেবী নাইট্।

মালার ছবির চোখ বুঁজে, বিবেকের গলাটিপে ধরে প্রশংসা করতে হবে। বলতে হবে, জগতে একটিই মহিলা-শিল্পী, সে হচ্ছে 'মন্দারমালিকা গুপ্ত!'

এঁর টাকার জোরে ছবির একসিবিশন, মালার প্যারিস-ভ্রমণ, সবই কিছুই সম্ভব। পত্রপত্রিকায় সমালোচনা বার হবে। যে ছবির ডুইংটা পর্যন্ত ঠিকমত করতে পারেনি মালা, সেইছবি অপ্রাকৃত শিল্পের অপরূপ প্রকাশ বলে অভিনন্দিত হবে।

রামমনোহর মিত্রের সাধনা সফলপর। কিন্তু টাকা নিয়ে আমি কি করব? টাকা তো খরচ হয়ে যায়।

তার চেয়ে টাকাকে যে প্রত্যাখ্যান করে আমার মত 'বেকার বলদকে' ভালবাসতে পারে, তাকেই নিই না কেন?

মন্দারমালিকা গুপ্তের ঠিকানায় রওনা হলাম।

ভারতবর্ষের গীতা-উপনিষদ আর কিছু দিক না দিক, অন্ততঃ বাংলা দেশে মন্দারমালিকাকে দিয়েছে।

———

ছোটদের আজীবন খুশিপায়ে চলতে হবে—এই কথা মনে রেখে জুতো কিনবেন

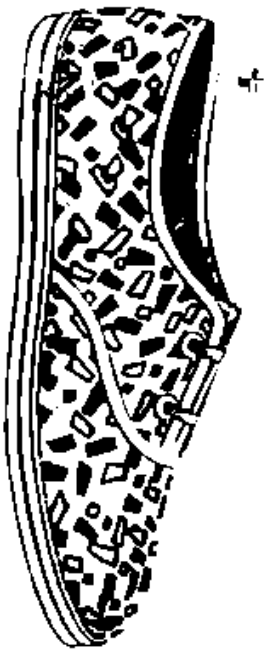

ফান্সি চার্ম ৩-২৫-৪-৭৫

ছোটরা বড়ো হবে পায়ের নিখুঁত গঠন বজায় রেখে—এই যদি আপনার কামনা—তা হলে এখন থেকেই তাদের জুতো কেনা বিষয়ে সাবধান হোন। অন্যথা, ছোট পায়ে বড়ো রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা। ছোটদের বাটার জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি, নকশায় আর নির্মাণে প্রকাশে হাঁটার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। সামনে আঙুল মেলার যথেষ্ট জায়গা, খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর ডাল যা অবাধে পা সঞ্চালনের সহায়ক। তাই সুঠাম গঠনে তাদের পা বাড়ে, যার ফল আজীবন খুশিপায়ে চলা। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর মজবুত পরলা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের। এদের খুশিপায়েই শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।

Bata

ফ্লোরা ৮·৬০

ঘুড়ি ৮·২৫

ডালি ৮·৬০

॥ উত্তাপ ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ভোরবেলা রাস্তা কাঁপিয়ে দুধের গাড়ির চলে যাবার শব্দ পেলাম। তার কিছু পরেই হৈ চৈ-টা শুরু হল। এক এক করে কোথা থেকে নানা বয়সের লোক ভীড় করে এলো। চিলে কোঠার জানালা দিয়ে দেখছিলাম। পথের ওপারের টিনে ঘেরা ডাস্টবিনটার ভেতরেই লোকগুলোর কৌতূহল তখন দানা বেঁধে উঠেছে।

কেউ বলছিল, পুলিশে খবর দাও।

আর কেউ যেন টিপ্পনি কাটলে, খবরটা যে দেবে তাকেই যে আবার জড়িয়ে পড়তে হবে জানো। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সময়ই বা কার আছে মশায়।

ততক্ষণে আশে পাশের অনেকগুলো বাড়ীরই বারান্দা থেকে অবাক চোখগুলো এসে পড়েছে ডাস্টবিনটার ওপর।

ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, আরে হাতপাগুলো এখনও নড়ছে যে, বেঁচে আছে তাহলে। তুলে না নিলে যে মারাই পড়বে।

কথাটা বলেই তিনি তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে গা ঢাকা দিলেন।

বেড়িয়ে ফেরার পথে এক স্বাস্থ্যান্বেষী দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, তুলে নিন, তুলে নিন, মোক্ষলাভ হবে।

তারপর মুখ বিকৃত করে বললেন, কথায় বলে মার চেয়ে কার যেন দরদ বেশী হয়না, এ যে ঠিক তাই হল। কুন্তী তো কুকর্ম করেই ভেসে পড়লে, এখন এলো অধিরথ, তোল কর্ণ।

এসব অলক্ষ মন্তব্যের ওপর আর কেউ এগিয়ে যাবার সাহস পেলনা।

পথের এপারে গাছের তলায় গুটিকয় ভবঘুরের বাস। মেয়ে পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চায় তা জনা আষ্টেক হবে। রঙীন ঘাঘরা পরে, ওড়না উড়িয়ে অলিতে গলিতে ওরা বাসন ফিরি করে বেড়ায়। সমকে ঠমকে, চোখের চাহনিতে ওদের কেমন যেন একরকম মহুয়া মাতাল ভাব। অনেক রাতে কখনো সখনো দেখা যায় ওদের মরদগুলো টলতে টলতে রাস্তায় কোণ তৈরী করে হেঁটে চলেছে, পাশে কখনোবা মেয়েগুলো চলেছে গজরাতে গজরাতে। বৃষ্টি হলে ওরা সামনের বড় বাড়ীর গাড়িবারান্দার তলায় এসে ভীড় জমায়। মেয়ে পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চায় শুয়ে থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে। আশ্চর্য ওদের জীবন যাত্রা। পথেই সংসার। পথেই ওদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ।

একদিন গৃহিনী ওদের ভেতর একটি মেয়েকে দেখিয়ে বলেছিলেন, দেখ, কি সুন্দর শরীর ঐ মেয়েটার। জীবনে ডাক্তারী ওষুধপত্র খায়না বলেই বোধহয় ওর চেহারায় এমন বাঁধুনী।

মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ল, কিছুদিন আগেকার একটা ছবি। ওপাড়ার কয়েকটা মস্তান ওর পিছু লেগেছিল। ও তখন বিয়ে সাদী করেনি। বাসন ফিরি করে ফেরার পথে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা

ছোকরাগুলোর সঙ্গে প্রায়ই ওর চোখাচোখি হয়ে যেত। ওকে দেখলেই ছোকরাগুলোর ঠিক কাকের মুখে খাবার পড়ার মত অবস্থা হত। ওরা যত মন্তব্য করত, মেয়েটার হাসি তত ফেনিয়ে উঠত।

তারপর একরাতে ওদিকের পার্কের কোণায় একটা হল্লা উঠেছিল। ঐ মেয়েটাকে নিয়েই যেন কিসব ব্যাপারস্যাপার ঘটেছিল। কেউ বলেছিল, মেয়েটাই নাকি ছেলেগুলোকে নাচিয়েছে।

আবার কেউ বলেছিল, ও মেয়ে কাল নাগিনী। ওকে ছোঁয়, সাবি কায়।

সে যাই হোক্, ক'দিন পরে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পুরুষ ছেলেটাকে দেখতাম ওর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরত বাসন কিরি করে।

জনসেবায় নিবেদিত প্রাণ সরকারের দক্ষতায় যখন চালের দাম চড় চড় করে বোশেখ জষ্টির রক্তচাপের মত চড়ে গেল তখন গ্রামের মানুষেরা একটুকরো রুটির আশায় ভীড় করে এলো শহরের অলিতে গলিতে। দিনে রাতে তাদের সকরুণ হাক-ডাকে পাড়া মুখর। এমন দিনে একটি ছবি আমাকে অবাক করল। কোন-দিন যাদের ভিক্ষে করতে দেখিনি; পাড়ার বিয়েতে যারা একটিবারও ভোজ খাওয়ার জন্যে ভীড় জমায়নি, তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো চেঁচিয়ে রুটি প্রার্থনা করে চলল। বুঝলাম, আকাল কতদূর তার শেকড় চালিয়েছে।

ভবঘুরেদের মাথায় তেমনি ঘাসনকোসনের পশরা দেখতাম, কিন্তু মেয়ে পুরুষের দেহে আর আগেকার মত জেল্লা দেখতাম না। পথ পেরিয়ে যাবার সময় দেখতাম, ওরা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে আছে। কখনোবা মেয়ে পুরুষে মিলে সোহাগোল তুলত, আর পাশে বসে খাবার জন্যে কাঁদত ছেলেগুলো।

আজ দেখি, ভবঘুরেদের সেই নতুন বিয়ে করা মেয়েটা গাছতলা থেকে পায়ে পায়ে রাস্তা পার হয়ে ঐ ঘটনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটুখানি উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা সে বুঝে নিলে। তারপর সবকটা লোককে অবাক করে দিয়ে সে ডাস্টবিনের ভেতর থেকে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যেমন পায়ে পায়ে গিয়েছিল, তেমনি পা চালিয়ে চলে এলো গাছ তলায়। কারো দিকে একবার সে ফিরেও তাকাল না।

কথায় কথা লাগেনা। তাই যে যতটা পারলে মুখের সুখে মন্তব্য ছড়িয়ে ঘরে ফিরে গেল।

আমি আমার চিলে কোঠা থেকে দেখতাম, গাছের ডালে একটা ছেড়ির দোলনা ঝোলান হয়েছে সেই দোলনার রাজশয্যায় শুয়ে পরম আনন্দে দোল খাচ্ছে ডাস্টবিনের সেই ছেলেটা।

একদিন দেখি, আমাদের গলির ভেতর দিয়ে ঐ মেয়েটা বুকের ভেতর ছেলেটাকে চেপে ধরে নিয়ে চলেছে। সোহাগে চুমোয় ভরে দিচ্ছে তাকে।

সেদিন একটা হাকডাক শুনে জানালা খুলে দেখি, পথের ধারে বড় বাড়ীর দরোয়ান খুব গুড়পাচ্ছে। একখানা গাড়ি চালিয়ে ছোট মেমসাব রোজকার মত হাওয়া খেতে যাচ্ছিলেন। রিটায়ার্ড জজ সাহেবের কনিষ্ঠা কুমারী। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে এই ভবঘুরেগুলো। তাঁদের বাড়ীর গাড়ি বারান্দার তলায় সেদ রাত্তের বৃষ্টির জন্যে সবাই মিলে জড়ো হয়ে বসেছিল। হটিয়ে দেবার ইংগিত করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

জজসাহেবের মেয়েটি নাকি এ অঞ্চলে মক্কীরাণী। সন্ধ্যার আবছায়ায় একাধিক পুরুষকেই নাকি তাঁর গাড়ির কাণ্ডারী হতে দেখা গেছে।

পরের দিন দেখি, পুলিসের গাড়ি এলো। ঐ ভবঘুরেদের দু'চারজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। তারপর থেকে আর ওদের ঐ গাছতলায় বা এ তল্লাটে দেখিনি।

ভবঘুরেদের ঐ মেয়েটার ওপর কেমন এক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। ওরা চলে গেলে বার বার ঐ মেয়েটার ছবি আমি চোখের ওপর ভেসে উঠতে দেখতাম। ওর কুমারী জীবনের ঐ খিল খিল হাসিতে

ফেটে পড়া মুখখানা ; আবার বিয়ের পর ওর স্বামী-লোহাগ, শেষে ডাস্টবিনের ছেলেটাকে সারাক্ষণ বুকে চেপে রাখা এমনি অজস্র ছবি।

একদিন আমাদের বাড়ীর ঝি এসে পৃথিবীকে একটি সমাচার দিলে। ঐ মেয়েটার সঙ্গে নাকি তার বাজারে যাবার পথে দেখা হয়েছিল। তার বুকে সেই ছেলেটা রয়েছে। মেয়েটার চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আর সেই কুড়োনো ছেলেটা নাকি ভারী মিষ্টি দেখতে হয়েছে।

আরও জানা গেল, বড় বাড়ীর ছোট মেমসাবের কারসাজিতেই নাকি তার বছর করেদ হয়েছে ক'বছর। সেই মেয়েটা গণগণ করে বলেছে, তার মানুষটা একদম সাচ্চা, চুরি ডাকাইতির অপরাধ সব নাজান ঘটনা।

এর পর একটি বছরের বিরতি। অবশেষে এক শীতের সকালে যবনিকা উঠল।

খুব ভোরে ডাক্তারের নির্দেশমত আজকাল লেকের ধারে বেড়াতে শুরু করেছিলাম। ভোরে উঠে রোজকার মত লেকের গাছগুলোর নীচে দিয়ে হাঁটছিলাম। এত ভোরে কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। তাছাড়া ঘন কুয়াশায় দিনের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিল না।

হঠাৎ সামনে দেখলাম একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লেকের যে জায়গাটায় সাধারণতঃ গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সেইখানেই গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল। কুয়াশার রঙের সঙ্গে গাড়ির রঙ মিশে যাওয়ায় কয়েক হাত দূর থেকেও স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল না।

পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ল সেই মেয়েটা। গাড়ির ধারে ছেলেটাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে।

কি একটা কথা হচ্ছিল। একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বড় বাড়ীর ছোট মেমসাবেরই গলা।

কেন বায়েলা করছিস্? শেষে তোকেও কয়েদে পাঠিয়ে দেব।

জবাব দিয়ে উঠল ভবঘুরে মেয়েটার গলা, ভয় দেখাইস না মেমসাব। হামি কারে ভর করি নাই।

তারপর একটু চুপ করে করুণ গলায় বললে, তু কি পাথর মেমসাব। আপনা বাচ্চাটার লেগে তুর এতটুক্ মায়া নাই। দেখ্, দেখ্ তুর পানা সোন্দর হইছে। জাড়ায় দেখ্ কেমন কাঁপতে লাগছে।

দেখলাম, গাড়ির ভেতর থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এল। হাঁ ঠিকই দেখলাম, একখানা কারুকরা সোনার থালা ধরা আছে সে হাতে।

এই নে, আর কোনদিন এখানে বায়েলা করতে আসিস না। এটা বেচলে বেশাই টাকা পাবি। তুকে গরম জামা কিনে দিবি। হাঁ, খবরদার এদিকে তোকে যেন আর না দেখি। তাহলে কুত্তা লাগিয়ে দেব।

মেয়েটা থালাখানা হাতে নিয়ে খুব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর মেমসাবের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এ তুর হাতে মানাইবে ভাল, তু রাখ্। শেষে পুলিশ লোককে বলবি, হামার থালা লিয়েছে, ও চোট্টাকো পাকড়ো।

একটু থেমে হেসে বলল, ভয় নাই, হামি আর আসব নাই। তুর পয়সায় কেনা জামার ঘিকে হামার বুকে রাজা বাবার জাড়া তাপ মিলবে।

এর পর আর কোনদিকে না তাকিয়ে মেয়েটি ঐ শীতে কাতর ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে হন হন করে কুয়াশার ভেতর মিলিয়ে গেল।

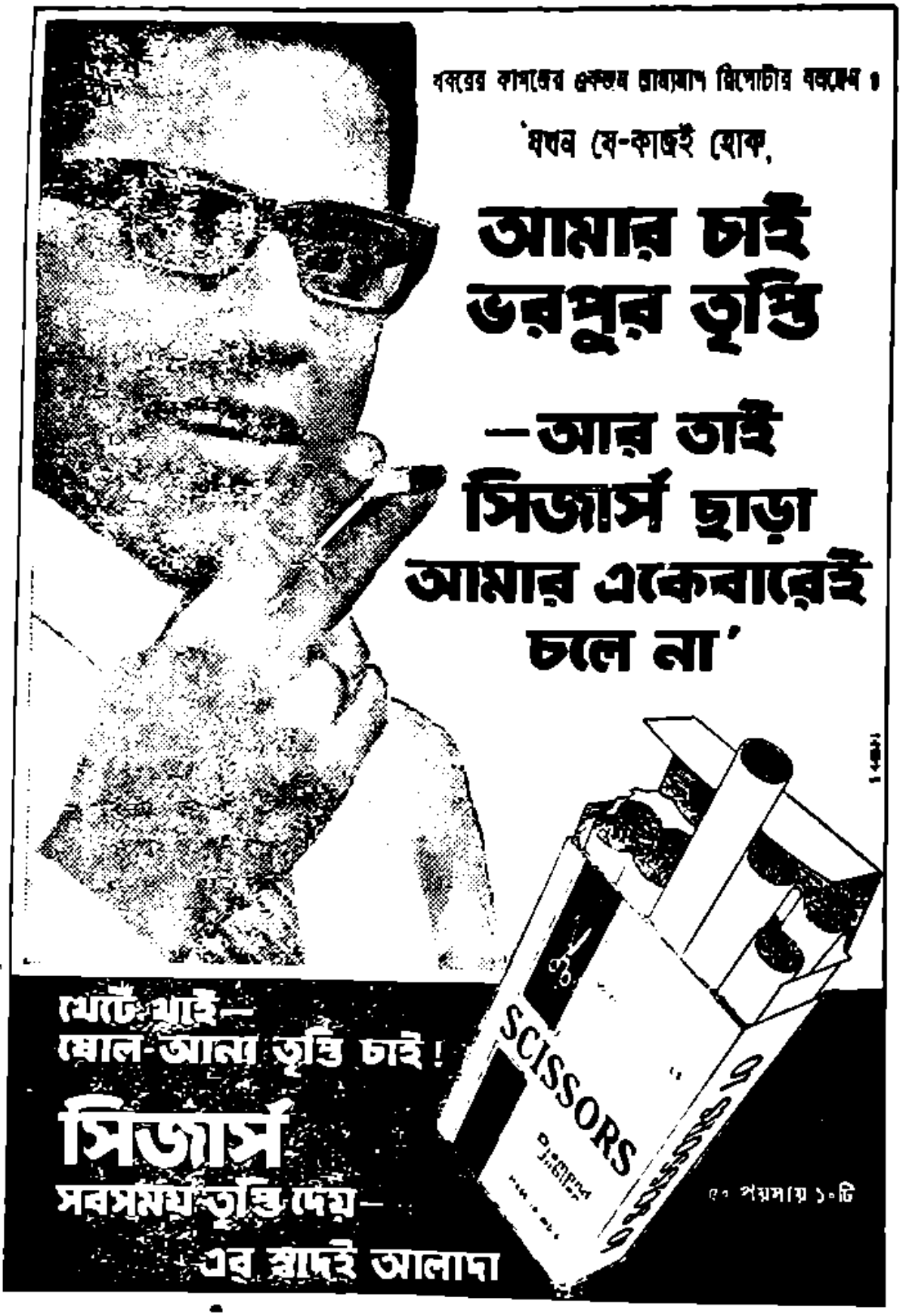
খবরের কাগজের একজন রোয়াবাশ রিপোর্টার বলছেন :
'যখন যে-কাজই হোক,
আমার চাই
ভরপুর তৃপ্তি
—আর তাই
সিজার্স ছাড়া
আমার একেবারেই
চলে না'
খেটে খাই—
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!
সিজার্স
সবসময় তৃপ্তি দেয়—
এর স্বাদই আলাদা
SCISSORS
৫০ পয়সায় ১০টি

মাপের চেয়ে বড়ো

কবিতা সিংহ

সেই শিয়ালদার পুরোনো কানিচাতের আড়ত থেকে হাটা শুরু হয়েছে। তখন বাবা পড়া দুপুর। তারপর থেকে একবারও ট্রামে না চড়ে হাঁটতে হাঁটতে বউবাজারের মোড়। অমলের কোমর ব্যথা করে গিয়েছিল। অথচ ইলার ভ্রুক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে ইলার মুখ তেলতেলে হয়েছে। ঘামে সিঁথি ভিজেছে, হাওয়ায় বিনুনির চুল উড়েছে আর একপশলা বৃষ্টি হওয়ায় চটির প্রান্ত ছিটকে শাড়ির শিছনে কাদার ছররা। খানিকটা মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় ইলা একবার চায়ের দোকানেও ঢুকেছিল। পর্যাটনে বেরোনোটা চলে যাবার পরেই হঠাৎ বলেছিল,

এই, দেখেছ প্লাস্টিকের টেবলক্লথটাতে ঠিক কাশ্মীরী কার্পেটের কি চমৎকার ইমিটেশন প্রিন্ট করেছে।

অমল কাশ্মিরী কার্পেট কেমন দেখেনি। তাঁরা চাষপুরুষের কেরানী। তবু ইলার কথাবার্তা তার অদ্ভুত ভালোলাগে। বেশ একটা ঘোরার দেওয়া। তার মা মাঝে মাঝে নিরামিষ তরকারিতেও যেমন গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে মুখ বদলানোর চেষ্টা করতেন। শিয়ালদার কাঠের আড়ত থেকে বউবাজার। কিনতে বেরিয়েছিল দুজনের মাপের ছোটখাটো সামগ্রী। বেরোবার আগে আফিসে বসে ইলা লিস্ট করেছে। কি আর এমন। একটা কেরোসিন কাঠের জানলার আলমারি, একটা ছোট তক্তপোষ। সেটাতেই নাকি দুজনের মোটামুটি কুলিয়ে যাবে, একটা টুল আর একটা ছোট্ট টেবিল। বাস, ঘরত একখানা। ভাড়া করেছে কালিঘাটে। জানালা তিনটে ঘরটা একটা। স্পেস এর পরিমাণ আশ্চর্য কম। তা হোক, ঐ ঘরের জন্য ষাটটি টাকা গুণে দিয়ে অমল খুব ধার্শনিক ভাবে ভেবেছিল আসলে কিন্তু তার আর ইলার খুব কম ক্ষমতা নয়। কলকাতা শহরে, যেখানে ষাটলক্ষ লোকের বাস, সারা পৃথিবী যে শহরের নাম জানে, সেখানে দশফুট বাই বারোফুট জায়গার মালিক হতে পেরেছে তারা।

কিন্তু জানলার আলমারি ঘর করতে গিয়ে ইলা আঙুল উঁচিয়ে ছিল আয়না বসানো কারুকার্য খচিত খাটের দিকে। দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিল,

জিনিসটা পেলেন কোথায়? খাঁটি বার্মাটিক। বনেদী জিনিস। চাপা গলায় অমলকে বলেছিল,

জানো, জোড়াবাগানের বসুদের বাড়ি, আমার মেজমাসিমার শ্বশুর বাড়ি আর কি, ঠিক অমনি একটা খাট ছিল। আমরা সব লায়াদুপুর খাটের ওপর খেলতাম। আয়নায় মুখ দেখতাম। খাটথেকে নামতে হলে দুধাপ সিঁড়ি লাগত। খুব সুবিধে। বৌবাটি খেলা হত। খাটের তলাটা যেন একতলা। ওপরটা দোতলা।

আর আশ্চর্য ভালো গল্প বলতে পারে ইলা। অমলের বেশ ঘুম লাগে ইলার গল্প শুনতে শুনতে।

ওই খাট থেকে গল্প লাফিয়ে যেত ছোট মাসির বিবাহিত জীবনে। বিবাহিত জীবনে তাঁর স্বামীর সন্দেহ বাতিকের ফলে ঘরের মধ্যেই বন্দিনী থাকার গল্প। গল্প লাফিয়ে যেত বড় বড় সেপাইয়ের মূর্তি

বসানো বড় বাড়ির ঘষাকাচের চৌকোনা আলোর তলাদিয়ে টকাটক ছুটি গাড়ি চড়ে যাই নাচ দেখতে যাওয়ায়।

অবশ্য তার ফাঁকে ফাঁকে দুপুরের রোদ. শুখোট, হাটার ক্লান্তি ফুটপাথে বসা কানা খোঁড়া কাচের বাসনের দরাদরির সহাবস্থানও থাকত। রেস্তোঁরা থেকে হামচুকিয়ে যেন প্রায় ইলার আঁচল ধরেই বেরোল অমল। ইলা তখন তাদের বাড়ির গুপ্তধন লুকোনোর গল্প বলছে। জায়গাটা একটা ভিড়াক্রান্ত চৌরাস্তা। তখন ট্রাফিকজাম। একটা দরি আলো কেপছে ইলার গায়ে। পিছনে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ট্রাম। পাশে হর্ণ দিচ্ছে ট্যাক্সি। ইলার ভ্রুক্ষেপ নেই।

—তারপর জানো, শুনেছি যদির আক্রমণের ভয়ে রাজা বিজয়কেশব সোনার বড় বড় বাটকে ধাঁয়া খাইয়ে ওই বড়বাড়িরই কোথায় যেন পুঁতে রেখেছিলেন। তার নক্সাটা ছিল তার গোমস্তার বউএর গলায়। সোনার তাবিজে।

অমল প্রশ্ন করেছিল—গোমস্তা বউয়ের গলায় কেন?

ইলা চোখ ঘটকে বলেছিল,

আহা! বোঝেনা যেন!

তখনই মুহুর্মুহু হর্ণ উঠেছিল পিছন থেকে। আর ইলা পা তুলে বাড়াতে গিয়ে বলেছিল,

ঐ যাঃ, চটিটা ফটাং করে ছিঁড়ে গেল।

অমল ইলাকে নিয়ে কোনোক্রমে ফুটপাথে চলে এলো। একটা রোগা বকুলগাছের তলায় মুচির দিকে চটিটা বাড়িয়ে দিয়ে ইলা হেসে তাকাল অমলের দিকে।

অমলের অদ্ভুত লাগল। একশো বছর আগে রাজা বিজয়কেশবের প্রপৌত্রীর পৌত্রী ফাটাপাড়ি আর ফিট না হওয়া কেনা স্লিউথ পথে ছেঁড়া চটি সারাচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আস্তান বয়নে। সমস্ত ব্যাপারটা এত অসম্ভব মনে হয়। অমল অবশ্য এমনিতে ইলাকে কিছু বলেনা। কিন্তু ইলা মাঝে মাঝে বাইরের লোকের কাছে তার পুরোনো দিনের গল্প আরম্ভ করলে তার সব যেন কেমন সাজানো সাজানো মিথ্যামিথ্যা লাগে। মনেহয় সবাই ওর খালি হাত, গলা, কান, সস্তা হাওড়া-হাটের শাড়ি, রোগাটে মুখ দেখছে আর মনে মনে হাসছে।

পুরোণো গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান পেরোতে পেরোতে ইলা আবার তাদের সংসারের কথায় ফিরে গেল।

মাসে একদিন কিন্তু সিনেমা। তার বেশি না।

এই-ই আচ্ছা তুমি সকালে যে লিস্ট করলে তাতে মাসকাবারী বাজারের হিসেব ধরেছ? মাছ বোধহয় রোজ হবেনা না?

অমলের খুব নিরানন্দ লাগল। সংসার যখন পাততে যাচ্ছে তখন অভাবে ঘটটিকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আজ আবার সেই আলোচনা কেন?

অমল বলল,

—কৈ বললেনা ত গোমস্তা বৌএর কাছে তাবিজ কেন?

—ভালোবাসা ছিল!

ফিরে তাকাল ইলা। অমল দেখল ইলার মুখটা কোন একটা দোকানের সবুজ আলো পড়ে—অবাস্তব হয়ে গেছে। সবুজ রঙের চোখ নাচিয়ে ইলা বলল,

—ওরা ত সেই থেকে বংশ বংশধরে আমাদের ক্ষতি করল, জানোনা।

অমল ইলার গলার স্বরে যেন অদ্ভুত একটা জ্বালা ধরতে পেল। চাপাগলায় ঘিস্‌হিস্ করে ইলা বলল,

—ওই যে পুরন্দর, ও' ওত ওদেরই বংশের.

অমল যেন একটা ছপ্‌চির মার খেল। ইলা একটু বোকা আছে। কেন যে বারবার মনে করিয়ে দেয় পুরন্দরের ঠোঁট কল্‌কে সে অমলের হাতে পড়েছে। পুরন্দর এককালে ইলার সম্বন্ধে খুব খানিকটা উৎসাহ দেখিয়েছিল। সে নাকি সেই কলেজে থাকতে। ইলার কাছে শোনা গল্প। অমল সত্যি মিথ্যে জানেনা। তখনও ইলাদের গাড়ি ছিল। ইলা নাকি মাঝে মধ্যে কলেজের গাড়িতেই আসত। পুরন্দরও পুরোপো পরিচয় খুঁজে পেতে বের করেছিল। তারপর যা হয়।

আবার বেলা আসিলে। দুইংরোম খুলে তখন পি. চৌধুরীর ঘরে ঢুকতে হয়। পুরন্দর বিলেত থেকে ফিরে অনেক করে ইলাকে চেনো পেয়ে চিনতেই পারল না। নতুন করে পরিচয় করল। তারপর ভালোকাজ পারেনা এই অভিযোগ করে অন্তসাহেবের ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করাল। সেখানেই অমলের সঙ্গে ইলার আলাপ।

ইলা কিন্তু আশ্চর্য পারে। সিঁড়ির পাঁচতলা থেকে একতলা।

—আমরা যেন কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম ?

অমল বশম্বদের মত বললে,

—দুজনের মাইনে আর পাঁচশোটাকা জি পি এফ লোন নিয়ে।

ইলা বললে,

—আঃ কি ভালো লাগছে তাই না। এতগুলো টাকা।

অমল বললে,

—তা তোমার ত সবই পছন্দ আর দরকরা হ'ল। এখন বাড়ি ফিরবেনা। কালইত—বিয়ে। রেজিষ্ট্রারের সামনে অমনি জোড়ো কাকের মত দাঁড়াবে নাকি !

ইলা হেসে বললে,

—এই-ই কি হচ্ছে। এখনই জোড়ো কাকের মত লাগছে তোমার চোখে। বিয়ের পর তাহলে কি হবে বলোত।

অমল বললে,

—খুব খারাপ হবে !

ইলা বললে,

—না ঠাট্টা না। এখন যাবো চৌরঙ্গির একটা সেহন রাস্তার দোকানে। ওখানে অনেকী বাড়ির অনেক পুরোনো জিনিষ সেল হয়।

অমল বললে,

—কিন্তু সেখানে তুমি কি কিনবে ইলা ?

—বত্রিশ সিংহাসন।

ইলা অন্তরংগ সুরে বলল,

—বাঃ বলিনি বুঝি তোমায়! একটা শুধু বাজে খরচ করব। একটা পার্চমেন্টের শেড্ দেওয়া দাঁড়ানো আলো কিনব।

অমলের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ইলা বলল,

—পার্চমেন্টের শেডে খুব সুন্দর হাতে আঁকা সিনারি টিনারি নানান রকম পাওয়া যায় জানো। বেশ কেমন পুরোনো পুরোনো বনেদী গন্ধ লাগানো থাকে। চৌরঙ্গীর ওই দোকান গুলোয় খুব পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে যখন সন্ধ্যে বেলা সব কাজ সেরে ঘর অন্ধকার করে ওই আলোটি জ্বালিয়ে দেব, তখন দেখবে কি ভালো লাগবে।

অমল আর ইলা এবার একটা রিক্‌শা চড়ল। নির্জন নির্জন চওড়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে রিক্‌শাটা। রাস্তার আলো আঁধারিতে মাঝে মাঝে হাতে হাতে ধরা সাহেব মেম। মাঝে মাঝে অনেকখানি জায়গা নিয়ে গাছের আড়ালে আধো ভোরা প্রাসাদোপম সব বাড়ি। ইলার ছোঁয়া ইলার কণ্ঠস্বর হঠাৎ অমলের কাছে অদ্ভুত সুরেলা লাগছিল।

—জানো আমি যখন খুব ছোট্ট, বাবার সঙ্গে এপাড়ায় আসতাম মেলে। কতরকম জিনিষ যে কিনতেন বাবা। যত অদরকারি। চীনেমাটির বড় বড় ভাস, ব্রঞ্জের মূর্তি, বেলজিয়াম আয়না, কাইজারের ওয়াইন সেট্। বাবার যেন একটা নেশার মত ছিল।

অমল মনে মনে ইলার ছোটবেলাকে কল্পনা করছিল। ইলার দেওয়া ওর ছোট বেলার একটা সাটিনের রিবণ বাঁধা ফ্রিলদেওয়া ফ্রকপরা ছবি থেকে বেরিয়ে এসে ইলা যেন মেলের দোকানে বহু আলোকিত ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমলের কেমন যেন মায়া হতে লাগল। সে হাতড়িয়ে যেন জড়িয়ে রাখল ইলাকে।

মেলের দোকানের সামনে বেশ খানিকটা গাড়ি আর ভিড়। অমল আর ইলাও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল। চারিদিকে এমন সব সামগ্রি যে অমলের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এগুলো ঠিক ঠাক চেনেনা বলেই হয়ত কেউ তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। তিন চার খানা বড় বড় ঘরে কয়েকটি বনেদী পরিবারের গৃহস্থেরতা মাল সাজানো আছে। অমল আর ইলা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। একটা বিরাট চাউস কাঠের ব্যাপার। কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি। অমল ভেবেছিল, এটা আবার কিরে বাবা!

ইলা বললে, গ্রাণ্ড পিয়ানো।

অমল একটা ডাইনিং টেবিলের কোনা ঘুঁষে বললে, বাবা! প্রায় আমাদের ঘরের মতই বড়। একটা ব্রঞ্জের ভেনাসের তলায় দাঁড়িয়ে হাসলে, বাব্বা! বর্ষাকালে তলায় দাঁড়ালে গায়ে বৃষ্টি পড়বেনা।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে ইলা দাঁড়িয়ে গেল। স্থির। অমলের কবজি চেপে ধরল ইলা তারপর চাপা গলায় বললে, দেখতে পাচ্ছো!

অমল বললে,

—কি?

—ওই যে, ওই স্ফটিকের পুতুলটা।

ইলার চারপাশ দিয়ে লোকের আনাগোনা। কথাবার্তা। সিগারেটের ধোঁয়া, নিলামের ধ্বনি। কিন্তু ইলার কানে কিছুই যাচ্ছিলনা। সে আবার বললে,

—শেষ পর্যন্ত ছোটকাকা ওকে বেচে দিলে!

অমল বললে,

—ওই পুতুলটাকে ?

ইলা স্রোতের মত বলে যাচ্ছিল,

—জানো, আমাদের বাড়ির সিঁড়িটা ছিল কাঠের। খুব চওড়া সিঁড়ি। কার্পেট মোড়া। এমন নরম আর পুরু কার্পেট যে পা ডুবে যায়। কার্পেটের কথা এমন করে বলছি কেন বলো ত ? আশ্চর্য নীল রং বলে। নরম বলে। সিঁড়িতে ওঠা শুধু সিঁড়িতে ওঠা নয়ত যেন মখমল দিয়ে মোড়া। সিঁড়ির দুপাশের দেওয়ালে ছিল পাখের কাজ। গাঢ় সোনালিতে কত রকম যে নক্সা। আর পাখের মাথা, সবুজের মাথা কোলানো। তাই কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে থাকত সিঁড়িটা। সিঁড়ির ঠিক মাঝের চাতালটার কোণের দিকে দাঁড় করানো থাকত ওই মূর্তিটা। আমি যত সিঁড়ি বেয়ে উঠতাম মনে হ'ত আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর মূর্তিটা ক্রমশঃ আমার কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে আসছে। সে যে কি আশ্চর্য লাগত।

আমি ওকে যেমনি ভয় করতাম, তেমনি সমীহ করতাম—তেমনি ভালোবাসতাম। বিশেষ করে ওর চোখদুটো।

কথাটা বলতেই অমল মূর্তিটার চোখের দিকে তাকাল। অদ্ভুত লাগছে মূর্তিটা। পুরুষ মূর্তি। স্ফটিক, তাই ভিতরের সব বংকির রেখাই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে দেখা যায়। মনে হয় যেন বরফ দিয়ে তৈরী। এত সুন্দর। এত আশ্চর্য সুন্দর হাতে একটি সবুজ স্ফটিকের লতা। কাঁধে উড়ন্ত রক্তাভ দুটি ডানা। একখণ্ড হরিদ্রাভ স্ফটিকের কটি বস্ত্র শুধু লজ্জাস্থান ঢেকে আছে। স্ফটিকের বুক। স্ফটিকের পেশি স্ফটিকের ঠোঁট নাক কিন্তু অক্ষি গোলকের একটি শূন্য আর একটিতে নীল স্ফটিকের চোখ।

গলা নামিয়ে ইলা বলল,

—এই স্ফটিকের পুতুলের গল্প পুরন্দরকে করেছিলাম। পুরন্দর বলেছিল ও দেখেছে ওকে। পুরন্দর নাকি ছোটবেলা আমাদের বাড়ি যেত। পরে ওর মনে পড়েছিল আমার সঙ্গে খেলেওছে। পুরন্দরই নাকি গুলতি ছুঁড়ে ওর একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল।

অমলের মুখ আবার একটু ম্লান হ'ল।

সে মনে মনে ভাবলে ইলা যে কেন সব সময় পুরন্দরের কথা বলে।

ভাবতে না ভাবতেই ইলা আবার অমলের কবজিতে চাপ দিল।

—দেখো, পুরন্দরও এসেছে !

পুরন্দর অমল আর ইলাকে দেখতে পায়নি। চালের মাথায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল সেও।

কোমরে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে মূর্তিটার আপাদ মস্তক খুব তারিফি চালে দেখতে লাগল সে।

অমল বললে,

—ছোট সাহেব বোধহয় এটাদিয়ে ড্রইংরুম্ সাজাবে ইলা। যা মনে হচ্ছে ছোটসাহেবের চোখে বোধহয় ব্যাপারটা খুব ধরে গেছে।

ইলা বললে,

—শোনো, আমাদের কাছে কতটাকা আছে ?

অমল ইলার আশ্চর্য রুদ্ধ কণ্ঠ শুনে চমকে তাকাল। যেন অন্য লোকের গলা শুনছে। তাকিয়ে দেখল ইলার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। রগের শিরা দপ্ দপ্ করে কাঁপছে। চোখ দুটো।

—ইলা! কি করছ। তোমার দাঁড়ানো আলো ···

ইলা দম্ভোহিতের মত মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বললে—আমার পুতুল, আমাদের রায়চৌধুরী বাড়ির পুতুল কোনো সোদাগর ছেলের বাড়ি যাবেনা।

অমল অনুভব করল তার কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম দেখা দিয়েছে। সে যে কি করবে কিছুতেই বুঝতে পারলেনা খানিকক্ষণ। কাল তাদের বিয়ে। আজ তারা বাজার করতে বেরিয়েছে। ফেরার পথে দোকান থেকে ইলার বিয়ের শাড়ি ব্লাউজের প্যাকেটটা নিয়ে যাবার কথা।

অমল দেখল পুরন্দর ফিরে দাঁড়িয়ে ইলাকে দেখতে পেয়ে—আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। পুরন্দরের টেবিলে আজই ইলা আর অমল মেহতরের কার্ড রেখে এসেছে। সাতদিন পরে ছোট্ট একটা পার্টি দিচ্ছে তারা।

হঠাৎ কি মনে করে মশ্ মশ্ করতে করতে পিছন ফিরে এগিয়ে এল পুরন্দর। অমলকে অস্বীকার করে পাইপ কামড়ে বললে,—ছোট বেলার সেই পুতুলটা কিনতে এসেছেন বুঝি!

ইলা উদ্ধত ভংগিতে বললে,—হ্যাঁ। যত টাকা লাগে।

হঠাৎ অমল একটু এগিয়ে এসে বলল, না ইলা। পুতুলটা তুমি কিনবে না। আমাদের ঘরের মাপটা মনে করে দেখো একবার। বারোফুট, বাই দশফুট। তার মধ্যে একটা তক্তপোষ, একটা কালের আলমারি একটা টেবিল, আর কি যেন তোমার, একটা সখের দাঁড়ানো আলো এতসব ধরাতে হবে তোমাকে।

ইলা চিত্রার্পিতের মত ফিরে তাকাল অমলের দিকে। অমল স্নেহতরে যেন এক ছোট্ট মেয়ের সংগে কথা বলছে এমনি সুরে বললে,

—কি মনে পড়ছেনা! বাইরে চলো। যখন তোমার সংগে সারাজীবন একসংগে থাকতে হবে আমাকে, তখন তোমার সব ভুলে যাওয়া হিসেব নিকেশ ত আমারই মনে করিয়ে দেবার কথা।

পুরন্দরের সামনে থেকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে অমল ইলাকে দোকানের বাইরে নিয়ে গেল।

রক্তগোলাপ

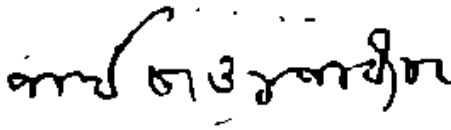

দিকে যতদূর দেখা যায় সবুজ মাঠ—প্রান্ত সীমায় সবুজ পাতের কটকি শাড়ীর মত সবুজ বনানী রেখা। মাঠের এদিকে ওদিকে অতিকায় গন্ডার পাখির মত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকটি প্যাটন। কোথাও চাকা বসে গেছে মাটিতে, রুক্ষ চটে টাল বেরিয়ে পড়েছে।

কর্ণেল মোহন সিং বললেন, ওগুলো পঁয়ষট্টি সালের তোলা ফসল। যেগুলোর চলৎশক্তি ছিল সেগুলিকে নিয়ে আমরা লাগিয়ে রেখেছি রেজিমেন্ট হেড কোয়ার্টারের সামনে। অনেক ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছি দেশের বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের দেশের লোক জানুক, পঁয়ষট্টির হানাদারেরা আমাদের মাতৃভূমি গ্রাস করতে এসে কী ফল হাতেনাতে পেয়ে ফিরে গেছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হোক আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তার ওপর।

—এদিকে তাকিয়ে দেখুন, গোটা দশেক ট্যাঙ্ক রয়েছে এই শেডে। এগুলো সবই সেঞ্চুরিয়ান, পঞ্চাশটন ওজন। দুর্ভেদ্য ইস্পাতের বর্ম ভেদ করা কঠিন। সামনে পঁচাশি মিলিমিটারের বিধ্বংসী কামানের নলটি যখন গোলাবর্ষণ শুরু করে তখন তার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি?

তাকিয়ে দেখছিলাম ট্যাঙ্কগুলির দিকে।

এক একটি ট্যাঙ্কের এক একটি নাম—কোনটির নাম চাণক্য, কোনটির নাম অশোক, কোনটির নাম বিজয়। এখন সকালবেলা ট্রুপ কমাণ্ডারেরা এসেছে। ড্রাইভার, গানার, কমাণ্ডার আর লোডারেরা নিজেদের ট্যাঙ্কে বসে মেশিনপত্র চেক করছে। ছোটখাটো মেরামতির কাজ সেরে নিচ্ছে। যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময়েই ওদের কাজ কঠিন বাঁধা। প্রতিদিন ট্যাঙ্কগুলোকে তৈরি রাখতে হয়। সচল আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকমাইল রাস্তা ঘুরিয়ে আনা হয়। বার বার পরীক্ষা করা হয় যন্ত্র আছে কিনা বোরসাইট, কাজ করছে কিনা রেনজ অ্যাডজাসটার, এলিভেটিং আর ট্রেভারসিং কনট্রোল ঠিকমত মজবুত আছে কিনা। একটা ট্যাঙ্কের পিছনে দশজনের তাই বাটুনির অন্ত নেই।

চারিদিকে ব্যস্ততার মধ্যে চোখ পড়ে গেল এককোণে একটি ট্যাঙ্কের দিকে। কভার দিয়ে মোড়া গান, মনে হয় অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। পাতলা ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। অতিকায় জন্তুটি নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ।

ডাকলাম, কর্ণেল সিং!

ইয়েস মিঃ সেন।

এই ট্যাঙ্কটির নাম কি? বলেই চোখে পড়ে গেল, বডির গায়েই বড় বড় করে লেখা রেড রোজ। বললাম, ট্যাঙ্কের নাম কি রোজ?

কর্ণেল সিং হেসে বললেন, হ্যাঁ। ফুলের নামে নাম।

রসিকতা করে বললাম, কুমার সম্ভব পড়েছেন মিঃ সিং ?

নিশ্চয়ই। আপনারা সিভিলিয়ানরা মনে করেন, আমরি অফিসারেরা বন্দুক ছাড়া আর কিছুই জানেনা।

লজ্জিত হয়ে বললাম, মিথ্যে কথা বলব না কর্ণেল। আমারও এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন আর্মির সঙ্গে মিশে আমার ধারণা পালটাচ্ছে।

কুমার সম্ভবের কথা বলছিলেন না মিঃ সেন ?

হাঁ, মদনের পুষ্পধনুর কথা মনে পড়ছে। আপাতত আপনাদের 'রেড রোজ' এনিমি টেরিটরিতে অকাল বসন্ত সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয় না।

কর্ণেল সিং গম্ভীর হয়ে বললেন, না। রেড রোজ গত দু'দুটো যুদ্ধে অন্ততঃ ত্রিশটি পাকিস্তানি প্যাটন ধ্বংস করেছে। ল্যাণ্ড মাইন আর শত্রুদের বুকে দি রোজ লড়াই করেছে বাঘের মত।

কিন্তু এই ট্যাঙ্ককে দেখে মনে হয় অনেকদিন ব্যবহার হয় না।

ঠিক ধরেছেন। রেড রোজ আজ এক বছর হল ব্যবহার হয়না। ব্রিগেডিয়ার চতুর্বেদীর অনুরোধে। অবশ্য এ অনুরোধ না দিয়েও কোন উপায় ছিলনা। আমরা আর্মিতে কোন সুপারস্টিশান মানিনা, কিন্তু হাবিলদার যোশিজির ডার্মার অ্যাম্পিউটেশনের পর কোন সওয়ার এই ট্যাঙ্ক চালাতে রাজি হয় নি। অবশ্য তাদের ফোর্স করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখা গেল, এভাবে জোর করলে জওয়ানদের মনোবলের ওপর তার একটা হতে পারে। তাই আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে ট্যাঙ্কটি।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কী ব্যাপারটা একবার খুলে বলবেন কর্ণেল সিং।

কর্ণেল সিং হেসে বললেন, সব কথা প্রেসের জন্য নয় মিঃ সেন।

হিরণ্য ক্যান্টনমেন্টে আমরা দিন তিনেকের অতিথি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আতিথ্যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি পাঞ্জাবের সীমান্ত থেকে জনপদে। এই সেই সব জনপদ, সেই সব প্রান্তর যেখানে পঁয়ষট্টি সালে আগুন জ্বলে উঠেছিল। জম্মু পাঠানকোট রোডে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছি বার বার হিমালয় রেঞ্জের দিকে। ওই হিমালয়ের কোলে কাশ্মীরের মাটি জুড়ে সেদিন হানাদারদের অসংখ্য পায়ের ছাপ। ছাবব্ উপত্যকায় সেদিন বারুদের গন্ধ। চেনাব আর বিলাসের জল রক্তে রাঙা।

আমাদের বীর সৈনিকেরা সেদিনের ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে। আজও তারা প্রস্তুত যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়। সেই প্রস্তুতির সর্বাত্মক রূপ দেখার জন্য আমরা এসেছি সাংবাদিকের দল।

মাথার মধ্যে সকাল থেকে ঘুরপাক খাচ্ছিল একটি নাম হাবিলদার যোশিজির ডার্মা। কর্ণেল মোহন সিং যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু অদম্য কৌতূহলের যে পাগলা ঘোড়াটা মনের মধ্যে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে তার রাশ টেনে ধরি কোথায় সে শক্তি ?

মেজর রায় বাঙালী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা হাবিলদার যোশিজির ডার্মাকে আপনি চিনতেন ?

আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন মেজর রায়। তারপর বললেন আপনি কি করে জানলেন ?

কর্ণেল সিং কিছুটা বলেছেন।

বাকীটা ওঁর কাছ থেকেই শুনুন না।

ওঁকে এখন কোথায় পাব। ব্যস্ত মানুষ। একটি গোটা রেজিমেনটের কম্যাণ্ডার। আপনি বাংলোয় বেলুন মেজর। বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করা যাবে।

হাবিলদার যোশিঙর ভার্যার গল্প শুনলাম সেদিন রাত্রে। পাঁচ নং ক্যাভালরির আর্মি মেসের বারে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে।

মেজর রায় বললেন, হাবিলদার যোশিঙর ভার্যার মৃত্যু আমার কাছে নিতান্তই অ্যাকসিডেণ্ট বলে মনে হয়েছে। কর্ণেল সিং অবশ্য এটাকে অ্যাকসিডেণ্ট বলতে চাননা। উনি বলেন, অনেক সময় জড় পদার্থও প্রাণবেগে সঞ্জীব হয়ে উঠতে পারে। এটা নির্ভর করে বস্তুকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর। বস্তুকে যদি মানুষ মনে করে তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি তাহলে বস্তুও নাকি আর নিছক বস্তু থাকেনা। আর তাছাড়া রেড রোজ বা রক্ত গোলাপ নামের একটা ইতিহাস আছে। আমাদের এই বিশ্বস্ত ক্যাভালরির ইতিহাস বোধহয় শুনেছেন। প্রায় দু'শ বছর এর বয়স। সেকালে এরা ছিল অশ্বারোহী। প্রায় একশ বছর আগে এই রেজিমেনটের একটি ঘোড়ার নাম ছিল রেড রোজ বা রক্ত গোলাপ। অন্ততঃ গোটা দশেক যুদ্ধে রেড রোজ অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়েছিল। এইমাত্র সেদিন যখন আমাদের ট্যাঙ্কবাহিনী তৈরি হল, তখন ইতিহাসের রেড রোজকে অক্ষয় করার জন্য একটি ট্যাঙ্কের নাম রাখা হল রেড রোজ। সেঞ্চুরিয়ান রেড রোজ আমার স্কোয়াড্রণে। ট্যাঙ্কটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও লড়েছে। কিন্তু সেঞ্চুরিয়ান হেভি ট্যাঙ্ক হলেও মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী—জটিলতাও কম। আমি বলব আমাদের রাশিয়ান পি. টি. সেভেন্টি সিক্সের চেয়েও সেঞ্চুরিয়ান আমার বেশী পছন্দ।

এক একটি ট্যাঙ্কে চারজন করে জওয়ান থাকে। আমরা এখনও ওদের বলি সওয়ার। ড্রাইভার, গানার, লোডার আর কম্যাণ্ডার। ট্যাঙ্ক যখন চলে তখন প্রত্যেকের ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে কম্যাণ্ডারই হল নম্বর ওয়ান। ফায়ারিং অর্ডার দেবার, ট্যাঙ্ককে সামনে পিছনে চালনা করবার সমস্ত দায়িত্ব তার। ট্রুপকম্যাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাও সে করে।

হাবিলদার যোশিঙর ভার্যা ছিল এমনি একজন কম্যাণ্ডার। রেড রোজকে যে বছর আনা হল সে বছরই যোশিঙর নায়েক থেকে হাবিলদার হল। মীরাটের ছেলে, বছর ত্রিশেক বয়স। কালো লম্বা চেহারা।

রেড রোজকে পেয়ে মনে হল সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। প্রতিদিন ট্যাঙ্ক মেরামত বা অয়েলিং করা আবশ্যকীয় কাজ। কিন্তু যোশিঙর আরও বেশী কিছু করত। সে ট্যাঙ্কটিকে নিয়েই দিনরাত পড়ে থাকত। আর কাউকে ট্যাঙ্কের কাজ করতে দিত না। বাকী সওয়ারদের বলত তোমাদের কিছু করতে হবেনা। তোমরা শুধু খাও, ঘুমোও।

সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট মালহোত্রা ছিল ওদের ট্রুপ কমাণ্ডার।

আমাকে একদিন মালহোত্রা এসে বলল, স্যর যোশিঙর ভার্যার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, কেন কী ব্যাপার?

যোশিঙর রেড রোজের সঙ্গে আপন মনে কথা বলে। জওয়ানেরা হাসাহাসি করে এ নিয়ে। ওরা

বলে রেড রোজ হল যোগিন্দরের বউ। আমার মনে হয় স্যর, যোগিন্দরকে এম, আই, রুমে পরীক্ষার জন্য পাঠানো দরকার। শেষকালে অপারেশনের সময় না একটা গণ্ডগোল বাধায়।

সেদিনই দেখা করলাম যোগিন্দরের সঙ্গে। সকাল বেলা ইউনিট লাইনে গিয়ে দেখি একটি ঝকঝকে শাদা তোয়ালে দিয়ে যোগিন্দর রেড রোজের গানটি পরিষ্কার করছে। যোগিন্দর এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। বললাম কি হাবিলদার সাব, তোমার ট্যাঙ্কের কনডিশন কী রকম ?

যোগিন্দর বলল, ফারস্ট ক্লাস স্যর। এইতো আগের মাহিনায় ইনস্পেকশন হয়ে গেল। রিপোর্ট দেখুন। একবছরের মধ্যে রেড রোজকে এল, এ, ডি তে পর্যন্ত পাঠাতে হয় নি।

এল, এ, ডি হল লাইট এণ্ড্ ডিটাচমেন্ট। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড মেকানিকাল ইনজিনিয়ারিং ইউনিটের লাইট মেরামতির ওয়ার্কশপ।

সত্যি ঝক ঝক করছে রেড রোজ। যেন একটি ভাজা রক্ত গোলাপ। ভেতরে গিয়ে দেখলাম প্রতিটি যন্ত্র ঝকঝক করছে। কে বলবে, এই ট্যাঙ্কটি যুদ্ধ করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

তুমিতো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ যোগিন্দর।

যোগিন্দর হেসে বলল, সাব রেড রোজের একদিনতো জন্মেছি ছিল। একদিনতো তার সওয়ার তার সঙ্গে প্রাণীর মত ব্যবহার করেছে। তাকে দানা খাইয়েছে, তাকে নলাইঝালাই করেছে, ব্যামারি হলে তাকে দাওয়াই দিয়েছে, তাকে মনের মত জিন পরিয়েছে। তবেই না সে সওয়ারকে দুষমণের চক্করের ভিতর পৌঁছে দিয়েছে। তবেই না তার আঁখ থেকে বিজলী নিকলেছে মেজর সাব। আমি মনে করি আমার রেড রোজ এখনও সেই জিন্দাই আছে। আপনি দেখবেন মেজর সাব দুষমণের সঙ্গে ও কিরকম মোকাবিলা করবে।

মিথ্যা বলেনি যোগিন্দর ভার্মা। কচ্ছের রণক্ষেত্রে রেড রোজ একাই শত্রুর দশটি ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করেছে। তারপর পয়ষট্টি সালে পাঞ্জাবে।

লাহোর সেক্টরে আমি নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি রেড রোজের দুর্জয় সাহস। ওরা অনেকেই প্যাটন থেকে নেমে হাত তুলে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে। রেড রোজের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জানেন, ওদের ট্রুপের তিনটি ট্যাঙ্কের মধ্যে দুটো ট্যাঙ্কই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে ট্রুপ লিডার। কিন্তু রেড রোজ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছে। ওদের ডিয়্যাজ দুবার এয়ার ষ্ট্রাইকিং করার চেষ্টা করেছে দুবারেই বেঁচে গেছে রেড রোজ।

যুদ্ধ যখন থামল তখন হাবিলদার যোগিন্দর ভার্মা ভি. সি। সুবেদার রাজু, কোম্পানি কোয়ার্টার মাষ্টার আবদুল হামিদ, সুবেদার অজিত সিং, নায়েক প্রেম সিং এর মত হাবিলদার যোগিন্দর ভার্মাও সাহসিকতার পুরস্কারে সম্মানিত।

মনে আছে কর্ণেল সিং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখন কেমন মনে হচ্ছে হাবিলদার সাব।

যোগিন্দর বলেছিল, সাব, কেরামত যদি কারুর থাকে তাহলে আমার নয় রেড রোজের।

কিন্তু তুমিই তো কমাণ্ডার যোগিন্দর। তুমি যদি অরডার না দাও লোডার অ্যামুনেশন বন্ধ লোড করবে কি করে, গানারও বা কি করে গুলি করবে, ড্রাইভারের সাধ্যকি সে চালায় আর রেড রোজ তো লোহা আর ষ্টীলের মেশিন। তার চাকাতো আর ঘাড়ুতে চলবে না।

যোগিন্দর বলেছিল, রেড রোজকে আমি কিছু বয় মনে করি না স্যর। ওর সঙ্গে বাত বলি আমি, ও আমার বাত শোনে। ও আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত।

কর্ণেল সিং আমাকে পরে বললেন, লোকে তাহলে যা বলে সত্যি?

কী তার, আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

রেড রোজ যোগিন্দরের পিয়ারী তার নাম।

হেসে উঠেছিলেন কর্ণেল মোহন সিং। আমাদের ফিফ্‌থ ক্যাভালরির কমাণ্ডার। সে হাসিতে আমিও যোগ দিয়েছিলাম মিঃ সেন। ওকী মিঃ সেন, অনেকক্ষণ আপনার গ্লাস খালি, বলেন নি কেন? বারম্যান দাবকো আউর এক গ্লাস। বেয়ারা রায় অর্ডার করলেন।

আবার বিয়ারের বোতল খোলার শব্দ। গ্লাসের উপর সমুদ্রের ফেনার মত সাদা ফেনা। রেডিওগ্রামে রেডিও সিলোনের চটুল গানের কলি ভেসে আসছে। আরমি অফিসারদের মদের পেয়ালার চুংচাং আওয়াজ। চাপা গলার আলাপের গুঞ্জন। কে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

বেয়ারা রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম তারপর?

তারপরের ঘটনা আপনার কাছে অ্যাবসার্ড বলে মনে হবে মিঃ সেন, আমারও হয়েছিল। কিন্তু কর্ণেল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন। আমি এখনও করি নি।

যুদ্ধের পর বছর অনেক কেটে গেল। কয়োবায়ুত এরিয়া থেকে আমাদের ইউনিট সরে এল পীস্ টেশনে। যোগিন্দর ভার্মা রেড রোজের পরিচর্যার ভার আরও বাড়িয়ে দিল। দিনকে দিন কি রকম গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল সে। ব্যারাক থেকে বেশী বেরুতো না। রেড রোজের একটি ছবি তুলে তার খাটিয়ার সামনে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিল। তার কমরেডরা এ নিয়ে হাসাহাসি করত। এসব আমাদের অফিসারদের কানেও এসেছিল।

যুদ্ধের পর যোগিন্দর সেবার জাহুয়াথীতে গেল ছুটিতে।

ফিরে এসে একদিন আমার কাছে এসে বলল, স্যর আমাকে একটা ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স দিতে হবে।

আমি বললাম, তুমি ব্যাচিলর মানুষ, ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স নিয়ে কি করবে?

যোগিন্দর বলল, আমি শাদি করে এসেছি স্যর। এই ছুটিতে গেলে সিয়েছিলাম, বুড়ি মাই কিছুতে ছাড়ল না।

সেকী, এতো বড় খোশ খবর। একদিন বড়খানা খাইয়ে দাও যোগিন্দর।

যোগিন্দর একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, একদিন রাম পাখ্‌টি দেব স্যর। আপনি মেহেরবানি করে আমার কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দিন।

যোগিন্দরের নামে একটি ফ্যামিলি কোয়ার্টার অ্যালট করে দেওয়া হল। তারপর একদিন তার বউকে নিয়ে এল যোগিন্দর। সত্যি সত্যি তার টুপের অওয়ানদের নিয়ে একদিন পার্টি দিল। আমার বাসায় এসে একদিন বউ দেখিয়ে গেল। বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েটি।

তারপর নতুন বাসায় চলে গিয়ে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল যোগিন্দর। একেবারে গেরস্ত

মানুষ। কোথায় গেল তার রেড রোজের পরিচর্যা। রুটিন মাফিক কাজ সেরে যোগিন্দর তাড়াতাড়ি ছুটে চলে যেত কোয়ার্টারে।

বিকেলে গেমসের পর আবার চলে যেত কোয়ার্টারে।

সবাই বলল, বউ পেয়ে যোগিন্দর ভার্মা রেড রোজকে ভুলে গেছে। তার নেশা ছুটে গেছে।

মাস কয়েক পরের কথা। আমাদের গোটা আর্মড ব্রিগেড গেল একসারসাইজে। গোটা ব্রিগেড মুভ করে গেল কয়েক ঘন্টার মধ্যে।

যে জায়গাটিতে ক্যাম্প করা হল সেখান থেকে মাইল কয়েকদূরে এক পরিত্যক্ত সয় ক্ষেতের মধ্যে আমাদের শুটিং রেঞ্জ। এক একটি কোয়াড্রণ এক একদিন রেঞ্জ প্র্যাকটিস করতে যেত।

পরের দিন সকালে আমরা ব্রেক ফাস্টের প্ল্যান করছি ঠিক সেই সময় কর্ণেল সিং ছুটে এসে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে।

কী হয়েছে স্যর ?

শুটিং রেঞ্জে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

হাবিলদার যোগিন্দর ভার্মা বোধ হয় মারা গিয়েছে। তুমি এখুনি চলে যাও।

যোগিন্দর ভার্মা মারা গিয়েছে। চমকে উঠলাম। বিশ্বাস করতে মন চাইল না।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। হ্যাঁ, মারা গেছে যোগিন্দর ভার্মা। ডেড বডি রিমুভ করা হয়েছে অনেকক্ষণ।

মৃত্যুর যা বিবরণ পাওয়া গেল, তাতে আরও চমকে উঠতে হল। ক্রশ কানট্রি রান প্র্যাকটিস হচ্ছিল। ছোটখাটো গর্ত, এবড়োখেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে ট্যাঙ্ক ছুটে চলেছে বিশ মাইল স্পীডে। যোগিন্দর যথারীতি কমান্ড করছিল। কিন্তু কি মনে করে চলন্ত অবস্থাতেই যোগিন্দর ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁকুনি লেগে পড়িয়ে পড়েছিল চেনের ভেতরে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে রেড রোজের তাবি চাকার তলায় যোগিন্দর ভার্মা একটা তালগোল পাকানো মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

এটি আমার কাছে স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন অলৌকিকের ওপর বড্ড বেশী আস্থা স্থাপন করে মিঃ সেন। মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল রেড রোজ প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রচণ্ড হিংসার উপেক্ষার জ্বালা সইতে না পেরে রেড রোজ ইচ্ছা করেই তার পায়ের তলায় চেপে মেরে ফেলেছে যোগিন্দরকে। নয়ত কেন যোগিন্দর বাইরে বেরিয়ে আসতে যাবে ?

পাছে ট্রুপের মরাল নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্য রেড রোজকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে এক কোণে। ব্রিগেডিয়ার চতুর্বেদীর অনুজ্ঞায় রেড রোজকে কনডেমন ডিক্লেয়ার করতে হবে। রেড রোজ বাতিল হয়ে যাবে। তার বদলে হয়ত আসবে নতুন ঝকঝকে বৈজয়ন্ত।

চোখের সামনে ভেসে উঠল এক পাশে অবহেলা ভরে ফেলে রাখা ম্রিয়মাণ রেড রোজকে। রক্ত গোলাপ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন।

মনে হল রেড রোজ শুধু হাবিলদার যোগিন্দর ভার্মাকেই খুন করেনি—নিজেও আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

প্রহরা

সুকোমল বসু

আড়াইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউসকে উপলক্ষ্য করে ছোট জনপদ। হাজার তিনেক মজুর, সাত-আট শো কেরানী আর শ'দুয়েক এঞ্জিনীয়ার ও তাদের পরিবার মণ্ডলীই প্রধানতঃ এই শ্রীপুরীর বাসিন্দা। এদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য কিছু মুদি বনাম মনোহারি দোকান এবং চা ও খাবারের স্টল আছে। আশপাশের অঞ্চল থেকে কিছু কিছু সব্জিওয়ালা, মাছ, ডিম বা মুর্গীর ফিরিওয়ালা, দুধ বা খাবার বিক্রেতা আসে, আবার চলে যায়।

চারদিকে পাহাড়। উঁচু নিচু পিচের চকচকে রাস্তা; রাস্তার ধারে ল্যাম্প-পোস্ট ফ্লুরোসেন্ট আলোর লম্বা লম্বা টিউব। টিলার গায়ে পদস্থ কর্মচারিদের বাংলো; প্রতিটির সঙ্গেই ফুলের বাগান। এরও উপর আরও উঁচু পাহাড় ও ঘন অরণ্য। নিচের প্রধান সড়ক থেকে বিভিন্ন রাস্তা নেমে গিয়েছে ঢালু অংশের দিকে। সেখানে বাড়িগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু তাদের সঙ্গেও কিছু না কিছু বাগান আছে। এখানে জায়গার অভাব নেই। বাড়িগুলি ঠাসাঠাসি নয়। গাছ আর গাছ আর গাছ সর্বত্র। যেন বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য কুটির বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সদর রাস্তার দাঁড়ালে এগুলির অধিকাংশই নজরে পড়বে না। নজরে পড়বে এদের পশ্চাতে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দণ্ডায়মান ভীমকান্তি পাওয়ার হাউস আকাশের দিকে দুটো কালো কালো চোঙা তুলে দিয়েছে, যেন দিগন্তকে হাঁক দিয়ে বলছে, 'আমি আছি।' তারও দূরে দিক-চক্রবেখার পাহাড়ের নিচে কয়লাখনির সাজ-সরঞ্জাম ক্ষীণ মরিচেখার মতো নজরে পড়বে।

দিনে দু'তিন হাজার টন কয়লা খায় পাওয়ার হাউসটা, কিন্তু শ্রীপুরে কয়লার দাগ মাত্র নেই। চকচকে শহর। সবুজ বন, মেহগিনি রঙের রাস্তা, বাড়িতে বাড়িতে বাগানে রঙিন ফুল ফুটে রয়েছে। রাস্তায় মোটরগাড়ি, জীপ্, বা ভ্যান্ চলছে সর্বদাই, কিন্তু ভিড় নেই আর আওয়াজও নেই। লোক চলে শান্ত, শুধু পাওয়ার হাউসের হাজিরে, বিরতি আর ছুটির সময় সংখ্যা কিছু বাড়ে। তাও বেশি নয় আর বেশিক্ষণ নয়। মোটামুটি মনে হবে, স্বপ্নের শহর ঘুলছে বা ঘুমোচ্ছে। যারা দু' একদিনের জন্য বেড়াতে আসে তারা মুগ্ধ হয়ে বলে, 'চমৎকার।' বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে' বলেন, 'রক্ষে করো! এ জঙ্গল থেকে পালাতে পারলে বাঁচি!'

এই এক ঘেঁয়েমি ভাঙবার জন্য মজুরেরা পচাই খায়, কলহ বা স-মাদল নৃত্যের আসর বসায় এবং মাঝেমাঝেই হাল ফ্যাসানের 'ঘেরাও' চালায়। কেরানীরা ক্লাব-হাউসে নাটকের মহড়া দেয়। অফিসারেরা এ-বাড়িতে ও বাড়িতে সন্ধ্যার পর সস্ত্রীক 'সোস্যাল কল্' যেন বা নিজ বাড়িতে পার্টি ডাকেন।

আজ পার্টি প্রজেক্ট ম্যানেজার মুখার্জি সাহেব বাংলোর লনে। একহপ্তা আগে থেকেই এর তোড়জোড় চলেছে। কেক্ এসেছে কলকাতা থেকে, ধানবাদ থেকে প্যাড়া, জালমুঠ, দহিবড়া, জাম্রাসগড় থেকে বিশেষ ফরমাস দিয়ে ভালো সন্দেশ জোগাড় হয়েছে। ইন্‌স্পেকশন বাংলোর বাবুর্চি মাংস ও সব্‌জির চপ্ আর সিঙাড়া সরবরাহ করেছে।

কিন্তু নিমন্ত্রিতদের কারুর মুখেই এমন সব লোভনীয় খাদ্যের স্বাদ লাগছে না। সবার মনেই এক উদ্বেগ, মুখে একই কথা। এছাড়া আর আলোচনা নেই।

গত রাতে প্রজেক্ট অফিসের কেরানী মদন পাড়ের কোয়ার্টারে ডাকাতি হয়ে গেছে। পাড়ের কোয়ার্টার 'পি'-সেক্টরে; সেটা কলোনীর সীমারেখার কাছে। কিন্তু এত আলো, চারদিকে এত কোয়ার্টার এত মানুষ, প্রজেক্টের এত আধিপত্য সত্ত্বেও যদি কলোনীর মধ্যেই ডাকাতি হয়ে যেতে পারে, তবে নিরাপত্তা কোথায়? আজ পি-সেক্টরে হয়েছে, কাল এ-সেক্টরে হোমরা-চোমরাদের বাড়িতে হলেই মারে কে?

মুখার্জিসাহেব বলেন, আমি হেড-অফিসকে বার বার বলেছি, সিকিউরিটি পার্সনেল এক্স-সার্ভিস ম্যানদের মধ্য থেকে নাও। আমাদের যারা আছে, দরকার হলে তারা যে বন্দুকও ছুঁড়তে পারবে না। কিন্তু কে শোনে সে কথা। কর্তারা শহরের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত বলে নিজেদের খিওরি চালিয়ে যাবেন--। মহিলাদের মুখ থেকে আরও এক পোচ আলো অন্তর্হিত হলো। প্রজেক্টের রক্ষীবাহিনীর জনবল কম নয়। ভরসা ছিল তাদের ওপর। সেই ভরসাটুকুও ধূলিসাৎ করে দিলেন প্রজেক্টের কর্তা।

'আমরা এরই মধ্যে এ ব্যাপারে এই দু' সেক্টরের জন্য ভিজিলেন্স পার্টি গঠন করে ফেলেছি,। আজ রাত থেকেই পাহারা শুরু হবে। হপ্তায় একদিন আপনারও ডিউটি পড়েছে নাহার। এটা মোরাল বুস্টার হিসেবে। শুনেছি ওদিকে আরও দু একটা সেক্টরেও ভিজিলেন্স পার্টি আজ রাত থেকেই কাজে লাগবে।' সহকারী এঞ্জিনীয়ার সিনহা সোৎসাহে জানালে। সিনহার বাবা বিহার সরকারের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। বাপ কো বেটা হিসাবে দুর্জন-দমনে তার উৎসাহ প্রচুর। তার উদ্যোগে ইনিয়র অফিসারেরা মিলে এক আত্মরক্ষার দল গঠন করেছে এবং হোমরা-চোমরা এমন কোনও অফিসার নেই যার পাহারার ডিউটি নির্দিষ্ট হয় নি। এটা এমন একটা ব্যাপার যে, কারুর আপত্তি করবারও উপায় নেই। সকলেই বিনা প্রতিবাদে এই কর্তব্য মেনে নিয়েছেন। পালাক্রমে জনকুড়ির একদল নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াবে সারারাত ভর। ডাকাতদের আটকাবে বা সত্যই মুখোমুখি হলে তাদের সঙ্গে লড়বে। হাতিয়ার অনেকগুলি লাঠি এবং দু' একটা বন্দুক। ধর্মের জন্য নাইটরা একদা জাঙ্কা-জোব্বা পরে, তলোয়ার আর বর্শায় সুসজ্জিত হয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় চেপে হুদুর দেশের জন্য বের হয়ে পড়েছিল। আর শ্রীপুরীর অফিসারেরা নিজেদের ধনসম্পদ গৃহ এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে রাতও জাগতে পারবে না?

রাত দেড়টা পৌনে দুটো হবে। ক্রিং ক্রিং করে' টেলিফোন বেজে উঠল একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার দত্তের বাড়িতে। দত্তগৃহিনী চামেলি বিছানাতে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। একে তো চোখের পাতা একবারও বোজেনি তিনঘন্টার চেষ্টায়। তার উপর গরির মধ্যে এত গরম কোথা থেকে এসে শকিত হলো? দুর্ভাবনায় গরম নয় তো? একি কাণ্ড! বাড়ীর পুরুষদের ডেকে নিয়ে গেল পাহারা দেবার জন্য, আর 'তারা' যদি এসে তোমার বাড়িতেই হাজির হয়! এত খবর রাখে ডাকাতেরা, আর কোন্ কোন্ বাড়ির কর্তা বাড়ি নেই, সে খবর পায় না? পাহারাদারদের দলেই নাকি এদের লোক থাকে। কি প্রকাণ্ড বোকামি এই ভিজিলেন্স পার্টির পরিকল্পনা। প্রথম থেকেই সে আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা কি যুক্তি শোনে। অন্দরের কাছে মান রাখতে হবে। বৌয়ের শাড়ির আঁচল ধরে বসে থাকলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কোনও বাড়ির বৌই রক্ষা পাবে না, কর্তারা যুক্তি দেখিয়েছেন। রক্ষা করতে হলে বৌথ প্রচেষ্টা চাই।

মিনিট কুড়ি আগে একবার ভিজিলেন্স পার্টির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত প্রেতপুরীর মত নির্জন রাস্তায়। তারপর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এই ফাঁকে যদি কতগুলি

ভারি পায়ের আওয়াজ বাংলোর গেটের কাছে এসে থেমে যায়, দরজায় কঠিন আঘাতের সঙ্গে গুরুগম্ভীর হুকুম আসে, 'কিওয়ার খুলো, জলদী খুলো' তবে কি করবে চামেলি? আট বছরের ছেলে মাণিক বিছানায় আর বাণীর বি রুক্মিণী মেঝেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এরা কতটুকু সাহায্য করতে পারে তাকে? এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং আওয়াজে চমকে উঠল চামেলি। ডাকাত নয়, ফোন। তবে যেন ভয় করতে লাগল। কে এত রাত্রে ফোন করছে? কেউ বিপন্ন হয়ে ডাকছে কি? বিপন্ন হলেই বা সে কি করতে পারে? হয়তো তার স্বামীই ফোন করছেন কোথা থেকে তাদের খোঁজ নিতে। বিছানা থেকে উঠে পড়ে একটু ভয়ে ভয়েই পাশের কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই প্রথমেই সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

'হ্যালো, কে?' বেশ কাঁপা কণ্ঠের সুর চামেলির, যেন তারের ওদিক থেকে হুঙ্কার আসবে, "তোমার যম!"

'সুরমা। কি খবর? কিছু বিপদ-টিপদ…'

'যে কোনও সময়েই আসতে পারে।' ওদিক থেকে জবাব এলো, 'তবে এসে পৌঁছায় নি। পোঁটলাটা হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে আছি মাত্র!' শুধু যন্ত্রটির শ্রবণাংশে নয়, প্রায় বাইরে স্পষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েছে কণ্ঠস্বর।

সুরমার স্বামীও গ্র্যাণ্টের বিশিষ্ট কর্মচারি; একই রাস্তায় সাত আটটি বাংলো পার হয়ে হালদার সাহেবের বাড়ী। ভারি ফুর্তিবাজ মেয়ে সুরমা। হাসছে, রসড় করছে, টগবগ করছে সারাক্ষণ। চামেলির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। প্রায় প্রতি দুপুরেই এসে হাজির হয় সে চামেলির বাড়ীতে; প্রায়ই আরও তিনচার জন বিপ্রহর বিরহিনীকে টেনে নিয়ে আসে। ভুড়িয়ে আড্ডা মারে। চা খায়। তারপর কর্তাদের ছুটি হবার দু' দশ মিনিট আগে হাওয়া হয়ে যায়।

'পোটলা! কিসের পোটলা?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে চামেলি।

'ওই সব, যা কলকাতায় মেয়েরা সেফ্ ডিপজিট ভল্টে রাখে…'

'ওরে সর্বনাশ! ওগুলি বাইরে রেখেছিস কেন? লুকিয়ে ফেল।' চামেলি শঙ্কিত গলায় বললে। 'কিছু বালিশের খোলাই খুলে তুলোর ভেতর, কিছু বা …'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই।' জবাব এল সুরমার। 'সব একেবারে রেডী করে' রেখেছি। এলেই পোটলা সুদ্ধ হাতে তুলে দেব। বলব্ নিয়ে যাও। যেচ্ছায় দিয়ে দিলাম যা কিছু আছে। প্রাণে মেরোনা, বাবারা!…'

'এত সব বলতে পারবি! তার আগেই তো আমার দাঁত-কপাটি লেগে আসবে।…একবার দেখতে কাও। বাবুরা সব বেরিয়েছেন ডাকাত তাড়াতে। আধ ঘণ্টা পর পর একবার এক এক রাস্তায় লাঠি ঠুকে হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন। এর ফাঁকে যদি ওপরের জঙ্গল থেকে ডাকাতের দল বাড়িতে এসে হানা দেয়, তবে সামান্য বাধা দেবারও কেউ নেই। ভাবছি কাল আমি জোর করে বলব, তোমাদের দু'জনের একই দিনে ছিটটী নেওয়া চলবে না। দুজনের অন্তত একজন…'

'তাও কি কখনও হয়।' জবাব এলো সুরমার 'তাতে আড্ডার ব্যাঘাত হবে যে! জমবে কেন?… শহরে ডাকাতের উপদ্রব। এমন সময় বাড়ীতে না থাকাইতো ভাল। দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। একদম নিরাপদ। বাড়ীতে ডাকাত পড়ার ভয় নেই…আচ্ছা ভাই, এখন রাখি। ঘরের ভেতর আওয়াজ শুনলে তোমারা প্রথমে এখানেই ঢুকে না পড়েন। কাল যাব দুপুরে।'

ডিজিলেন্স পার্টির পাহারার ফলেই হোক, বা ডাকাতির রীতি অনুসারেই হোক, এর পর তিন তিনটে রাত নিরাপদে কেটে গেল। কোথাও ডাকাতির কোনও খবর নেই। রক্ষীদলের উৎসাহ আরও

বেড়ে গেছে। সিন্‌হা বলছে, এই ব্যবস্থাটাকে একটা স্থায়ী ব্যবস্থায় দাঁড় করাতে হবে। কর্তব্য করা হচ্ছে বলে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবীই পরিতৃপ্ত। নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে আসছে। যাদের সপ্তাহে দু'দিন করে' মাত্র ডিউটি, তারা খেটে এসে চারপাঁচ দিন ডিউটি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাকাত কোথায়? তারা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাল নাকি?

টহলদারি দলের পুরোভাগে মার্চ করে যেতে যেতে সিন্‌হা সেই কথা নিয়েই মজা করছিল সেই হাতে, তাও তো সামনে পড়ে একদিন মার খায়নি, সালে লোস! একবার পিটিয়ে ছিলাম এক দলকে খেপগড়ে। বেজায় মার দিয়েছিলাম। তারপর থেকে হেসাগড়ে তো দূরের কথা তার আশেপাশের কোনও খানেও দু'চার বছরের ভেতর ডাকাতির খবর শোনা···উহ্, কৌন্ হ্যায় রে?···'

সহসা দূরে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর বদলে গেল সিন্‌হার। ডান হাত থেকে লাঠি নিয়ে এলো বাঁ হাতে, বাঁ হাতের বড় টর্চ দ্রুত এসে হাজির হলো ডান হাতে। গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাঘ-মারা টর্চের আলো নিচের রাস্তার দিকে চকিতে ছুটে গেল।

'সো আই হ্যাভ্ গট্ ইউ!' চাপা ও উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল সিন্‌হা।

তখন সবাই সচকিত হয়ে নিচের রুক্ষ-অস্পষ্ট রাস্তার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করল। যতই আব্‌ছা হোক, অস্বীকার করবার উপায় নেই। দলে বেশ ভারি ওরা। তাদের নিজেদের দল থেকে সংখ্যা খুব কম নয়। মানে মুখোমুখি হলে সংঘাত অনিবার্য।

'রুকুক। বন্দুক সামনা!' সিন্‌হা প্রথম লাইন থেকে ক'পা পেছনে হেঁটে এসে বললে। অর্থাৎ যাদের হাতে বন্দুক আছে তারা এবার এগিয়ে যাও। হালদার সাব্, প্রসাদসাব তৈয়ার রহিয়ে। অল্ রেডী। কুইক্ মার্চ!' প্রকৃত জেনারেলের মত এবার সৈন্যদলের একেবারে পেছন হ'তে আদেশ এলো সিন্‌হার।

কিছুটা ভয় পেলে কি হবে, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব ও সম্মানের প্রশ্ন আছে এতে। কমাণ্ডারের আদেশ শিরোধার্য করে যুবক ও মধ্যবয়স্ক অফিসারদের এই দলটি এগিয়ে গেল ডাকাতের দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। ওরা যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়, তবে রক্তারক্তি অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু অপরপক্ষও দমবার নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল, ভয় না পেয়ে তারাও দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'কৌন্ হ্যায়?' পেছন থেকে সিন্‌হার আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু তার পর্দা এতটা নিচু যে, প্রতিপক্ষের কানে তা পৌঁছবার কথা নয়, ভয় পাওয়া তো দূরের কথা।

কোনও জবাব এলো না ওদিক থেকে. কিন্তু তাদের পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'ঠায়র যাও, সামনেওয়ালো। হল্ট্!' এইবার সামনে এগিয়ে এসে বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন প্রসাদ-সাহেব। অগর ঔর এক পায়র সামনা আওগে তো গোলী মার দুংগা। শুট্ করেংগা, শুট্ করেংগা···' উচ্চতর অফিসার তিনি, এবার রক্ষীবাহিনীতেও কর্তৃত্বের আসন না নিয়ে উপায় নেই।

'ও প্রসাদ-সাহেব, করছ কি, থামো থামো।' এবার দ্রুত উষির জবাব এলো ওদিক থেকে।

ঠিক ডাকাতের মতো গলা তো নয়! হকচকিয়ে গেল রক্ষীদল। এ যে স্পষ্টই স্ত্রী-কণ্ঠস্বর। কি রকম ডাকাত এরা?

'খবরদার, সত্যি যেন গুলি টুলি ছুঁড়বেন না। আমি মিসেস হালদার। আমরাও পাহারায় বের হয়েছি। নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি করে লাভ নেই·।

নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠ। মিসেস হালদার পরিহাসপ্রিয়। কিন্তু আজ তার এ কি পরিহাস! দ্রুত অস্ত্র সংবরণ করে' লজ্জিতভাবে এগিয়ে গেল এ-পক্ষ।

'আপ্‌কো তো ম্যয় অভ্‌ কহ্‌ দিয়া!' চকিতে পেছন থেকে সামনে এসে হাসির হল্লোড় সিন্‌হা। 'দেখিয়ে তো ক্যায়সা রোখ দিয়া!' অবলীলাক্রমে আবার দলের লীডার পদটি অধিকার করলেন।

'আপনাদের বীরত্ব তো সুবিদিত'। সুরমা প্রায় জন পঁচিশ মহিলার এক মুখের মুখপাত্রী হিসাবে জবাব দিলে। 'মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে যথেষ্ট'।

'কিন্তু ব্যাপার কি। আপনারা বেরিয়ে পড়ছেন কেন? আমরা পুরুষেরা কি সত্যই এতটা অশক্ত হয়ে গেছি?' প্রসাদ সাহেব সহাস্যে প্রশ্ন করলেন।

'কোথায় অশক্ত। আরেকটু হলেই তো গুলি ছুঁড়তেন।' সুরমা বললে। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তব্য আছে। বাংলার কবি বলেছেন, "মা জাগিলে যব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"

'কিন্তু গৃহ সামলাবে কে?' হালদার সাহেব দার্শনিকের মতো আকাশের দিকে চোখ তুলে শুকতারাকে প্রশ্ন করলেন।

'আধঘণ্টা পর পর যারা বাড়ীর সামনে দিয়ে একবার করে লাঠি ঠুকে যায়, তারাই সামলাবে!' জবাব এলো সুরমাদেবীর কাছ থেকে। 'আমরাই বা পাহারা দেব না কেন? শ্রীপুরী রক্ষায় আমরাও অংশ গ্রহণ করতে চাই---।'

'শুনিয়ে মিসেস্‌ হালদার। রাত কো প্যাহ্‌রা দেনা কোই মজাকে কাম্‌ নহী।' সিন্‌হা স্ত্রিভেনরীর সঙ্গে বললেন। 'হম্‌ ইন্‌জিয়ে কহ্‌ রহে কি আপ্‌ আরাম করেংগে।'

খিলখিল একটা হাসির রোল উঠল নারীবাহিনীর মধ্যে। আরাম! সারারাত ভয়ে তারা চোখের পাতা বোজাতে পারে না। পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে কখন যে ডাকাতেরা এসে বাড়িতে হানা দেয়, সেই আতঙ্কে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় তাদের। এদিকে বহু বাড়ীর কর্তা নিজেদের ডিউটির দিন ছাড়াও ডিউটি দেবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। বাড়ীর গৃহিণীরাও তাই মিসেস্‌ দত্তের বাড়ীতে সভা করে মিসেস্‌ হালদারের নেতৃত্বে দল গঠন করে নিয়েছে। যে বাড়ীর কর্তারাই রাতে পাহারার ডিউটিতে বের হবে, সে বাড়ীর গৃহিণীরাই নারীরক্ষীবাহিনী হয়ে বেরিয়ে পড়বে। এই পরিকল্পনা আজই চালু করা হয়েছে।

'হা জী!' হাসির তাৎপর্য ঠিক বুঝতে না পেরে চোখ তুলে তাকালেন সিন্‌হা।

'আরাম আমাদের দরকার নেই। দরকার নিরাপত্তার।' সুরমা জবাব দিলে। 'আপনারা দল বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যেমন নিরাপদ বোধ করেন, বাড়ীতে ডাকাত-পড়ার বিভীষিকার হাত সংগৌরবে এড়িয়ে যান, আমাদেরও তাই পছন্দ!... চল সবাই, এবার আমরা 'পি' সেক্টরের দিকে এগিয়ে যাই। ওদিকেই আহত ফরেস্ট আর ডাকাতের ভয়। শুধু 'এ' আর 'বি'-সেক্টরে আমাদের পাহারা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনে। বল্‌ ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' বলে সহর্ষে জনি তুলে দু' জনেরও অধিক বাড়ীর গিন্নী সকৌতুকমুখে সীমান্তের অরণ্যের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

'আর উপায় কি!' প্রসাদ সাহেব নিরুপায়ের কণ্ঠে বললেন। 'ডাকাত থাক। এখন "মি লেডী"-দের পাহারা দিতেই বেরিয়ে পড়ি চল।'

'চলিয়ে।' বলে উৎসাহভরে সিন্‌হা তাড়াতাড়ি দলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াল।

EXPORT QUALITY
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা®
এক্সিকিউটিভ কালি
Sulekha
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
EXECUTIVE IN

ছায়া

এই নিয়ে আজ কদিন ধরে খুঁটিনাটি খিটিমিটি লেগেই আছে।—নিজের মনের সঙ্গে নিজের। অনেক পাতা নষ্ট করেও একটা মনোমত গল্প লিখে উঠতে পারছেনা শঙ্কর সেন। না গল্পগুলো এখনো শুধু ওর নিজের মতই হচ্ছে।—নিজের মনের মতো নয়।

আজ প্রায় দশ বছর ধরে গল্প লিখে আসছে শঙ্কর সেন। আগে বেশ চাহিদা ছিল। সম্পাদকেরা নিজেরাই চেয়ে চেয়ে পাঠাতেন। আজকাল কেমন যেন বাজার মন্দা পড়ে যাচ্ছে, দর কমে আসছে, দাম পড়ে যাচ্ছে শঙ্কর সেনের। আর সেইজন্যেই অদ্ভুত একটা ব্যর্থতা-বোধ ওর অবসরের আরামটুকু কুরে কুরে খাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা যখন কোর্ট থেকে ফিরে, মুখ হাত ধুয়ে, বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসে, আর বাইরের নিমগাছটার সরু সরু পাতার ভিতর দিয়ে দক্ষিণা বাতাস চিড় খেয়ে খেয়ে ঝির ঝির করে গায়ে এসে লাগে,—

তখনো মনের ভিতর থেকে নিষ্ফলতার খুঁতটা কিছুতে যেন মুছতে চায়না।

বনশ্রী কিন্তু শঙ্করের কথা মানতে রাজী হয়না;—বলে, "তুমি মিছে মাথা খারাপ, আমার তো তোমার লেখা বেশ ভালোই লাগে।—আমার বন্ধুরা অনেকেই তোমার লেখার ভক্ত। আজকাল তো গল্প বল, কবিতা বল,—মাথা খুঁড়লেও মানে বার করবার যো নেই। তোমার লেখাগুলো অন্ততঃ বোঝা যায়।—বেশ স্বাভাবিক সোজাসুজি খোলা মেলা গল্প।"

আরে এইখানেই তো সবচেয়ে বড় আপত্তি। শঙ্কর সেন কি করে বনশ্রীকে বোঝাবে, যে, আজকাল গল্প শুধু গল্প নয়,—সাহিত্য নয় শুধু জীবনের ছবি, ঘরকন্নার ফটোগ্রাফ,—সুখ-দুঃখের পাচালী।

যাঃ বনশ্রী এসব যুক্তি মানতে চায়না,—চিরকাল শুনে আসছে Literature is the mirror of life.

আঃ ভুলে যাও, ভুলে যাও, আয়নাটাকে উল্টো করে ধর। জান নাকি যে আয়নায় ছবিটা উল্টো করেই পড়ে,—শুধু তোমার স্পর্শের সংস্কার সেটাকে সোজা করে দেখায়, আজকের এ যুগ সংস্কার ভাঙার যুগ—সব সংস্কারের শিকড় টেনে ছিঁড়তে হবে।

আজকের এযুগ এটাই দেখাতে চাইছে, যে, মানুষের সৃষ্টি বিধাতার চেয়ে ছোট নয়। বারবার মানুষকে যে শুধু বিধাতার সৃষ্টিটাকেই কপি করতে হবে।—শুধু স্বাভাবিকতার অনুকরণ করে যেতে হবে। গাছটাকে গাছ বলেই আঁকতে হবে। পাখীটাকে পাখী এমন কোন কথা নেই।

সেইজন্যেই ভাখোনা, আজকের কবিতা তার আত্মার রস কে নিংড়ে বার করে দিয়েছে,—জানিয়ে দিচ্ছে, তার আত্মা তোমার ভোগের বস্তু নয়। আজকের ছবির সামনে থেকে রঙমহলে ফিরে আসতে হয়, বোঝা যায়না বলে,—বড় বড় কথা দিয়ে তাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে হয়।—আজকের সঙ্গীতেও ভাখো, সুর নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি লোফালুফির খেলা।

এযুগের মানুষ প্রমাণ করতে চাইছে, যে শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই সে একক। সে অদ্বিতীয়, সে অনন্য সাধারণ। সে প্রকৃতির সাধারণ স্বাভাবিকতার হাত থেকে শিল্পকে উদ্ধার করতে চায়।

গল্পও ঠিক তেমনিই হওয়া উচিত এযুগে। যাকে ধরা যাবেনা, ছোঁয়া যাবেনা, বোঝা যাবেনা, —শুধু বুদ্ধির গুহামুখে গিয়ে যা দরজায় আঘাত দেবে মাত্র। ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

শঙ্কর পায়চারী করতে করতে এইসব ভাবছিলো।

বাংলাদেশের একটা ছোট মফঃস্বল টাউন। শঙ্কর সরকারী চাকুরে। রোজ সকালে বেলা করে ঘুম থেকে উঠে, সেই ক্রোধে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে বকাবকি করে। পৌনে দশটা নাগাদ কোনমতে নাকেমুখে গুঁজে কোর্টে গিয়ে হাজির হয়,—তারপরে সারাদিন জোয়াল কাঁধে ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎ এক সময় বেলা পাঁচটা বেজে যায়। কাছেই বাড়ী, তবু সব সেরে সুরে বাড়ী ফিরতে ছটার কম নয়।

কিন্তু এটা তো ওর বাইরের পরিচয়।—মুন্সিফ শঙ্কর সেনের পরিচয়।

এরপরে আছে অন্দর,—সেখানে বনশ্রীর রাজত্ব।—মহারাণী বনশ্রীর পাস্ তালুকের খাজনাখানা সে।

কিন্তু তবু সেই অন্দর মহলেও তার অন্তর মেলেনা। না,—কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। শঙ্কর সেন একটি "চারমিনার" ফুঁকতে ফুঁকতে পায়চারী করছিলেন, আর তার মুখের কাছে বিন্দু বিন্দু অগ্নিকণা গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই হয়ে ঝরে পড়ছিল।

বনশ্রী এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত,—মফঃস্বলের কোয়ার্টার্স,—বিরাট রান্নাঘর। তার এককোণে বনশ্রী একটা ছোট্ট বেকারী বসিয়েছে। আজ যখন চারদিকে রুটীর দুর্ভিক্ষ,—বনশ্রী দিব্যি পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে ময়দা তৈরী করে পাউরুটী "বেক" করছে। বনশ্রী আলস্য অভ্যাস করতে ভয় পায়। সারাদিন তার এটাসেটা কাজের অন্ত নেই,—বিকেল হলেও তার রেশ মেটে না। হয় কারু বাড়ী যাও, হৈ হৈ করে আড্ডা দাও, তাসটাস খেলো, নয়,—বাড়ী বসে পাঁউরুটী তৈরী কর, জ্যাম, জেলি, আচার বানাও।

এমন এক একটা ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যায়, বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে, জোনাকিদের পাখায় রক ঝকে ঝিকি মিকি আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে কটা যেনেক সময় হারিয়ে ফেলা যে কতখানি দরকার বনশ্রী তা একেবারেই বুঝতে পারে না।

শঙ্কর সেন সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে মাটিতে ফেললেন। আর তখনি হঠাৎ মনে পড়ল গত শনিবার সন্ধ্যার আগেই মাধবী এসেছিলো।

মাধবী আজকাল প্রায়ই আসে। কেন কে জানে? বোধহয় এই আধাসহর আধাগ্রামের পরিবেশ তার কর্মক্লান্ত জীবনের উপরে একটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

মাধবী বনশ্রীর ছোট বেলার বন্ধু। কিন্তু সে বনশ্রীর মত ঘর সংসারের সমুদ্রে ডুব দেয় নি। ছুটো তিনটে চাকরী বদলে বদলে এখানে সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাধবী এই নিয়ে পর পর কবার এলো গেলো। শনিবার বিকেলে আসে, রবিবার বিকেলে চলে যায়। মানে, সপ্তাহ শেষের ছুটীর সুরটীকে কবর দিয়ে যায়। অবশ্য সেই কবরের উপরে ঢেলে দেয় তার নিজের সুর।

মাধবীর একটীমাত্র গুণ, সে ভালো গান করতে পারে, এছাড়া আর বিশেষ কোন গুণের খবর সে জানে না।

মাধবী যখন আসে, তখনো সিকেলে রং লাগে না,—শুধু চারিদিকে কেমন যেন একটা নরম নরম ভাব আকাশকে আলিঙ্গন করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

শঙ্কর ভেবেছিল আজও হয়ত মাধবী এসে পড়বে। মাধবী এসে অবশ্য বেশীক্ষণই তার বান্ধবীর সঙ্গে থাকে।—বনশ্রীর ঘরকন্নার স্বাদ একটু চেখে চেখে যায়। তবু যখন সন্ধ্যে পাঁচ হয় তখন সে আর ঘরে থাকতে পারে না। এইখানে বারান্দায় এসে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে বসে পড়ে।

মাধবীর নামের সঙ্গে কিন্তু তার চেহারার মিল নেই। দেহ তার ফুলের মত নরম কোমল নয়। বরং বনশ্রীর চেহারায় আছে অরণ্যের কঠিনতা। মাধবীর চেহারাটা শক্ত শক্ত। মুখখানা চৌকা ধরণের—চোয়ালটা কঠিন, চোখদুটি তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ, অনেকটা মঙ্গোলীয় ধাচের।

মাধবী পাশে বসে বলল, "শুনো আজ কি একটা নতুন রান্না করছে, এল না কিছুতেই।"

শঙ্কর বলেছিল,—"ও রান্না করুক, আপনি গান করুন,—আমার দুটোতেই সমান লাভ, সমান লোভও।"

মাধবী বলেছিলো,—"গাইব বলেই তো এলাম। সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে ঘরের কাজ করবার কথা আমি ভাবতে পারিনা। বিশেষতঃ একটা চাঁদ ধোওয়া আকাশের নীচে, গঙ্গার ধারে, গাছের ছায়ায় যদি গান না গাইলাম, তবে ফিরে গিয়ে সেই বাগবাজারের হাটুবাবুর গলিতে এই গানকে বিসর্জন দেবো।"

শঙ্কর বললে,—"আপনি এতদিন আসেননি কেন? আমরা তো অনেকদিন এখানে আছি।"

জবাবে মাধবী বলেছিলো, "সত্যি আসতে আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। আপনাদের বদলির সময় এসে গেল। আপনারা চলেগেলে এখানে আর কার কাছে আসব। অথচ কলকাতার সেই ঘুপচাপা গলিতে বসে এ জায়গাটার জন্যে আমার খুব মন কেমন করবে।"

মাধবীর কথা শুনে শঙ্কর হঠাৎ ভুলেগিয়েছিল যে সে এতক্ষণ মনে মনে বনশ্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। যেন মাধবীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে থাকাটাই তার কাছে একান্ত স্বাভাবিক! অন্ধকারে মাধবীর চেহারাটা ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তবু ওর অস্তিত্ব যেন কেমন করে ওর নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

শঙ্কর ভেবেছিলো এ শনিবারও হয়ত মাধবী আসবে, ভেবে একটু অস্বস্তিতেই ছিল। গান ভালো গায় বটে, তবু প্রত্যেকটা শনিবার—একটু too much হয়ে পড়ে, নয় কি? কিন্তু মাধবী এল না।

শঙ্কর তার প্রতিজ্ঞা রাখলো। খেয়ে দেয়ে উঠে, একটি সিগারেট শেষ করে আর একটি ধরিয়ে নিয়ে পড়ার টেবিলে বসল।

বনশ্রী শুতে যাবার সময় ডেকে গেল,—"মিছে বেশী রাত কোরনা, কাল সকালে আর উঠতে চাইবে না। রবিবার ঐ একটা ছুটীর দিন,—বেশ একটু বেড়িয়ে আসা যেতো। ঠিক আমি বেলা দশটার আগে বাবুর ঘুম ভাঙবে না।"

শঙ্কর জবাব দিলো না,—ওর মন গহন মননের মধ্যে ডুব দেবার সাধনা করতে লাগল। যাতে করে এই চিলে ঢালা আধভোলা জীবন যাত্রার মধ্যে থেকে সেই গাঢ় জীবনরস সেই আত্মার নির্যাস ছেঁকে নিতে পারে—যাতে করে ওর গল্প সেই গল্পটাকে ছাড়িয়ে যায়, ওর কথাশিল্প সত্যিকারের শিল্পকর্মের মর্যাদা পায়।

দেখতে দেখতে রাত ঘন হয়ে ওঠে। জনহীন রাস্তার খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায়, অনেক

ঘুরে ঘুরে একএকটা কয়লাখনির আলো টিম টিম করে জ্বলছে। চারিদিক নিবিড় নিথর। রাশি রাশি ঘন কালো অন্ধকারের স্তূপকে সরিয়ে দিয়ে শঙ্করের টেবিল-ল্যাম্পটী ওর খাতার উপরে আলো ছড়াচ্ছে।

লিখতে লিখতে শঙ্করের হাত একসময়ে থেমে এল। মাথাটা একটু ঝুকে পড়ল খাতার উপরে।

আর ঠিক তখনি মাধবী এল। মাধবী এসে এক হাত টেবিলের উপরে রেখে, আর একহাতে চেয়ারের পিছন দিকে ভাখল। মাধবীর শরীর ওকে ছুল না,—ওকে ঘিরে ধরে রইল।

শঙ্কর বললে,—"মাধবী তুমি এসেছো।—আমি এতক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম,—তুমি আজ এত দেরী করে এলে?"

মাধবী নিরাসক্ত সুরে বলল,—"আমাকে তো তোমার দরকার নেই।"

শঙ্করের কেমন ইচ্ছে হোল ওর হাতের উপরে নিজের কপালটা আস্তে আস্তে গুইয়ে দেয়,—কিন্তু ও নড়তে পারল না। হঠাৎ মনে হোল,—সত্যিই তো মাধবীকে তার কোন দরকার নেই। তার সারাদিনের কাজ কর্ম, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো-টেড়ানো কোনখানেই তো মাধবীর কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি নিশীথের রতি উৎসবেও তো বনশ্রীই তার চিরসঙ্গিনী, সেখানেও তো মাধবীর কোন কাজ নেই।

কিন্তু একথা বলতে শঙ্করের মন চাইল না। বললে,—"কেমন করে জানলেন, যে, একেবারেই প্রয়োজন নেই।"

একথার উত্তরে মাধবী হঠাৎ আরো ঘন হয়ে মাথা নীচু করে ওর কপালের উপরে একটা চুম্বন করলে। তারপরে হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে খাতা বন্ধ করে দিল,—"বলল,—চল।"

শঙ্কর চোখ মেলে অবাক হয়ে বলল,—"একী তুমি?"

"না তো কে?" বনশ্রী আরো অবাক হয়ে বললে,—"কে আর এখন তোমার কলম কেড়ে নিতে আসবে? রাত দুপুরে আর কাউকে স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?"

———

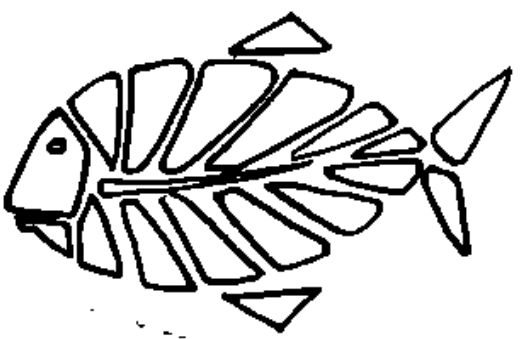

আকাশ তারা মন

- শরৎ বসু

হাজার হাজার তারা জ্বলছে ঐ মস্ত বড় আকাশে। অন্ধকার কালো আকাশটাকে তাই দেখা যাচ্ছে। সব তারাগুলো কিন্তু একই ভাবে জ্বলছেনা। কেউ মিটি মিটি, কেউ বা ধপ্ ধপে। কোনওটাকে খুব বড় দেখাচ্ছে, কোনওটা ছোট। কোনওটা আবার কাঁপছে, কোনওটা স্থির, অচঞ্চল।

মানুষেরও নাকি হাজারো রকমের মন আছে। হাজার হাজার মন একটা মানুষের।

বনানী ভাবতে লাগল।

হাজার কেন তারও বেশী। যত রকমের চিন্তা, তত রকমের মন। একটা মন দু'টো চিন্তা পরস্পর বিরোধী করতে পারেনা।

মনকে তো আর দেখা যায় না। কত মন আছে,—কে আর গুণে দেখছে।

আকাশের ঐ হাজার হাজার তারার মত মানুষের মধ্যেও নাকি হাজার হাজার মন জ্বলছে। কখনও অন্ধকারে নিভু নিভু, কখনও বা আলোয় ঝলমলে।

বনানীর সেই আগেকার মনটা কবে মরে গেছে।

আকাশের তারাগুলোও হারিয়ে যায়। আজ যেটা জ্বলছে, কাল সেটা নাও থাকতে পারে।

—কিন্তু মন মরে যায় নাকি! মনের আয়ু কতদিনের? একটা মন কতদিন বাঁচে!

ভাবতে ভাবতে জানালার কাছে এগিয়ে এল বনানী। জানালাটা ভাল ক'রে খুলেদিল।

সামনের বাড়ির বারান্দার পাশ দিয়ে দু'টো নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে। সেই দিকেই তাকিয়ে রইল বনানী।

গাছগুলো চলতে পারেনা। আকাশ থেকে আলো কুড়িয়ে নেয়, আর মাটি থেকে রস। তাইতেই খুশী। তার চেয়ে বেশী কামনা, বাসনা প্রত্যাশা—কিছুই নেই ওদের।

কামনা-বাসনা-প্রত্যাশা! মন থেকেই এরা নাকি জন্মায়।

শুধু মনের মন থেকে নয়,—প্রাণের মন থেকে, দেহের মন থেকেও। দেহ-মন-প্রাণ,—এদের থেকেই জন্মায়,—কামনা-বাসনা-প্রত্যাশা ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ। আরও কত রকমের ইচ্ছা-অনিচ্ছা! ঘৃণা, বিরক্তি, ঈর্ষা-দ্বেষ।

বনানী যেন কোথায় পড়েছিল এ-সব কথা।

আলো-ঝলমলে আকাশের পটভূমিকায়, ঝির ঝিরে বাতাস লেগে কেঁপেওঠা গাছ-গাছালির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন স্থির হ'য়ে গেল বনানী। মুখটা বাড়িয়ে নিজের মরম গালটাকে জানালার গরাদে চেপে ধরল। গরাদের লোহা লোহা গন্ধটা খারাপ লাগলনা। স্নো-পাউডার-বোলানো মুখটায় একটা হলদে দাগ ধ'রে যাবে,—এ-কথা জেনেও মুখটা সরিয়ে নিল না। ঠাণ্ডা গরাদটাকে বনানীর খুব ভাল লাগছে।

সন্ধ্যে হবার আগেই সে গা ধুয়ে এসেছে। ভিজে ভিজে নরম শরীরটা খট্‌খটে শুকনো শাড়িটাকেও জায়গায় জায়গায় ভিজিয়ে দিয়েছিল। এখন কিন্তু সব শুকিয়ে গেছে।

ভেতর থেকে তাপ উঠছে নাকি ?

বনানী ভাবল—তাই বোধহয় ঠাণ্ডা বরাবরটাকে এত ভাল লাগছে !

গাছ দুটোর দিকে আবার নজর পড়ল।

বনানী ওদের সহ্য করতে পারছেনা। ওদের ঐ স্বাধীন অস্তিত্ব ভারী কষ্ট দেয় ওকে।

এক জায়গায় অনেকদিন ধ'রে আটকা পড়ে থাকতে কারই বা ভাল লাগে। মনগুলো থাকবে এখানে-ওখানে ছড়ানো, আর দেহটা ইট কাঠের বেড়ায় আবদ্ধ।

বনানী তা কিছুতেই সহ্য করবেনা।

গাছেরা সত্ত ক'রে কেননা তাদের মন নেই ;—বনানী তো উদ্ভিদ নয় !

বনানীর স্মরণে আছে,—প্রণবের সঙ্গে তার এমন কোনও কথা হয় নি, যা থেকে সে অনুমান করতে পারত যে সে বাঁধা পড়তে চলেছে। তিন বছর ধরে কত কথা বলেছে প্রণব ; নীল নীল স্বপ্নের মত কথার জাল বুনেছে ব'সে ব'সে ;—সন্ধ্যা বেলায় ঘাসের সমুদ্রে, দুপুরে গাছের ছায়ায়, রাত্রে সিনেমা-গৃহের অন্ধকার ঘরে। মুড়ি-বাদাম-চা আর তার সঙ্গে অনর্গল কথা।

অনেকদিনের শ্যাওলা ধরা একটা ইট্ তুলে নিয়ে প্রণব একদিন দেখিয়েছিল,—ঘাসের হলদে চেহারা।

তারপর ইটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুনিয়েছিল,—সবুজ জীবনের কথা !

প্রণবের মা-বাবা-ভাই-বোন,—আরও কত আত্মীয়-স্বজন। এদের সঙ্গে বনানীর কি সম্বন্ধ ? এরা আছে, থাকুক না।

বনানী বিয়ে করেছে প্রণবকে ! আইনের সাহায্যে ওরা হ'য়েছে—স্বামী-স্ত্রী !

কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী-দেওর-ননদ,—এই ধরনের কোনও সম্বন্ধ আইন দিয়ে গড়া যায় নাকি !

মন্ত্র প'ড়ে, গোত্র মিলিয়ে, পূর্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাঁদের পরিতৃপ্ত ক'রে যে-বিয়ে করা, আর বন্ধু বান্ধবকে সাক্ষীরেখে একজন রেজিষ্ট্রারের সামনে শপথ গ্রহণ ক'রে যে-বিয়ে,—এ-দুটোর মধ্যে কি কোনও পার্থক্য নেই !

বিয়ে মানেই কি শ্বশুর-শাশুড়ী, ঘাঁড়াঘর আর প্রসূতিসদন !

এমন বিয়ে তো চায়নি বনানী।

তবু এমন বিয়ে কেন ! বিয়ে করার কথাই যে সে ভাবতে পারতোনা।

প্রণব একদিন আবেগ ভ'রে বলেছিল,—তিলে তিলে তুমি নিজেকে হত্যা করছ যনি ! অনেক সম্ভাবনাকে বঞ্চিত করে নিজেও বঞ্চিত হচ্ছ !

—বিয়ে করলেই বেঁচে উঠবো নাকি ?—বনানী জিজ্ঞেস করেছিল।

—তবু তুমিই বাঁচবেনা, বাঁচবে আরও অনেকেই।—কথাগুলো খুব জোর দিয়েই বলেছিল প্রণব।

বনানী এখন আকাশের ঐ জলজলে তারাগুলোর দিকে চেয়ে ভাবছে—একেই কি বেঁচেওঠা ব'লে ! এর চেয়ে আগের মৃত্যু তো অনেক মহান ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া !

আর এখন !

পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুর, স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরা ! সতীলক্ষ্মীর মৃত্যু ! এ-মৃত্যুর নাকি মূল্য অনেক ! সব মেয়েরাই নাকি এই ভাবে মরতে চায়।

যারা চায়, তারা মরুক !

বনানী কিছুতেই এই ভাবে মরতে পারবে না !

এই মুহূর্তে বনানীর মনে হ'ল প্রণবকে বিয়ে করা তার উচিত হয় নি।

প্রণব শুধু স্বার্থপর নয়,—বিশ্বাসঘাতক।

তিন বছর তার সঙ্গে মেলা মেশা ক'রে বনানী তাকে চিনতে পারেনি। বুঝতে পারেনি তার চির-রুগ্ন বাবাকে দেখাশোনার জন্যে তাদের সংসারে একটি নার্সের প্রয়োজন ছিল।

শুধু নার্স নয়, রান্নাঘরে সে প্রণবের মা'র সহকারিণী। আর সকাল সন্ধ্যায় তার ছোট ছোট ভাই-বোনেদের প্রাইভেট টিউটর।

নার্স রাঁধুনি এবং টিউটর।

এ-ছাড়া বনানীর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এদের সংসারে।

প্রণবের ধারণা,—বনানী শুধু তার স্ত্রী নয়, সে এ-বাড়ীর বৌমা, বৌদি, আরও কত কী !

প্রণব একদিন বলেছিল, বোধহয় এই প্রসঙ্গেই,—মেয়েরা, নিজেকে টুকরো-টুকরো ক'রে ভেঙে সংসারে এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, আসল মেয়েটাকে কেউ আর খুঁজে পায়না। টুকরো টুকরো অনেক পরিচয়ের মধ্যে কখন যে সে হারিয়ে যায়, নিজেও তা টের পায়না।.....সংসারের কেন,—স্বামীর কাছেই কি সব সময় সে স্ত্রী হ'য়ে থাকে ! কখনও মায়ের স্নেহ-শাসন, কখন বা সোহাগী মেয়ের আব্দার কখনও ভগ্নী, কখনও সখী। মেয়েরা তাই চিরদিনই রহস্যময়ী।

বনানী কিন্তু রহস্যময়ী হ'য়ে থাকতে চায়না। সে সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চায়,—এ সংসারে সে আর থাকবেনা। স্বার্থপর প্রণব তার কেউ নয়।

কিন্তু প্রণবের দোষ কি ! সে তো কিছু অন্যায় করেনি।

বনানীর আগের মনটা এইমাত্র হঠাৎ নিভে গেল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও সেটা তীব্রভাবে জ্বলছিল। তার জায়গায় যে মনটা জেগে উঠল তার আলো অনেক স্নিগ্ধ, অনেক রমণীয়।

...বাপের বড় ছেলে প্রণব। দায়িত্ব তার কম নয়। বনানীকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। উচিতও নয়। নিজের সুখের জন্যে প্রণবকে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করবে,—এমন নীচ, স্বার্থপর মেয়ে কিছুতেই হতে পারবেনা বনানী। বনানী অশিক্ষিতা নয় ! শুধু, রুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারে সে জন্মেছে।

তবুও প্রণবকে ক্ষমা করতে পারেনা বনানী।...

আর একটা নতুন মন ধপ্ ধপ্ ক'রে উঠল।

বনানীর মনে প'ড়ে গেল,- বিয়ের প্রায় মাস চারেক পরে প্রণবের বাবা মারা গেলেন। এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্যে সকলে বনানীকেই দায়ী করল।—ওদের বংশে কেউই এমন ভাবে রেজিষ্ট্রী ক'রে ভিন্ন গোত্রের মেয়েকে ঘরে তোলেনি। বনানী এল বলেই অমন সদাশিব মানুষটা চোখ বুজল।

বনানী জানে,—এই সব অযৌক্তিক, অর্থহীন কথা শুনেও প্রণব কিছু বলেনি। অত যুক্তিবাদী,

বুদ্ধিদীপ্ত মাইটা এত বড় অন্যায় চুপ করে সহ্য করল। স্ত্রীর অপমান, লাঞ্ছনা যাকে বিচলিত করেনা, সে আবার কিসের স্বামী।

বনানীর এই মনটার শিক্ষা ক্রমশঃ তীব্রতর হতে লাগলো।

অন্ধকারে নারকেল গাছ দুটোকে আর ভাল দেখা যাচ্ছেনা। বাইরে তাকাতেও আর ইচ্ছে করছেনা। জানলার গরাদ ছেড়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বনানী। তারপর চুল আঁচড়াতে লাগল। ফিতের একপ্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে আর একপ্রান্তের সঙ্গে বিনুনীর গোড়া বাঁধল।

আয়নার দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চাপা নিজের মূর্তিটাকে দেখে বনানীর মনে হল,—মূর্তিটা খুব রেগে গেছে। এখনই একটা কিছু করে বসবে।

কিন্তু হাতের কাছে কিছু করার না থাকায় বনানী মনে মনে ঠিক করল,—নাঃ, এখানে আর নয়।

আইনের সাহায্যে যে সম্বন্ধটাকে গড়ে তোলা হয়েছে—আইনের সাহায্যেই তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কিন্তু বিয়ে ভেঙে দিলেই কি দেহে-মনে আবার কুমারী হওয়া যায় ?

একটা বুটিল মন পিঠ বুঁজো ক'রে উঠে দাঁড়াল।

কুমারী, সধবা, বিধবা—মেয়েদের তো এই তিনটে পরিচয়। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর কোন পরিচয়ে সে সমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে।

ছোট একটা হাঁ করল বনানী। আর সঙ্গে সঙ্গে কিংতেটা খসে পড়ল। চুল এলো হয়ে গেল।

একটা হিমকা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। বনানীর আঁচলটা কাঁধ ছেড়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলনা বনানী। মনে হ'ল পায়ের নিচে বুঝি মাটি নেই।

টলতে টলতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। বালিশে মুখগুঁজে অসহায়ের মত শুময়ে শুময়ে কাঁদতে লাগলো।

অসংখ্য মনগুলো একে একে সব নিভে গেল। বনানী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল প্রণবের ডাকে !

প্রণবকে দেখে বনানী শিউরে উঠল—চোখ-মুখ লাল, চুল এলোমেলো। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে।.....

ধড়মড় করে উঠে পড়ল বনানী।

আলুথালু বেশবাস ঠিক ঠাক করে নিয়ে প্রণবকে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিল বিছানায়। কপালে হাত রেখে বনানী ঠোঁট কামড়ালো।—উঃস্ এত জ্বর! কি করলে বল তো? কতদিন বলেছি অত খাটতে হবেনা, আমি বরং আবার চাকরিতে বেরুই, তা কিছুতেই শুনলেনা। এত খাটুনী, ঐ শরীরে কি সয়। অফিসে ওভারটাইম, তার ওপর টিউশনী। এত বড় সংসারের বোঝা তুমি কি একলা সামলাতে পার!

—পারিনা বলেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি বনি! সংসারের ভেতরটা তোমার, বাইরেটা—

—চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি!—

বনানী একদৌড়ে রান্নাঘরে গেল।

শাশুড়ী দুধ জাল দিচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—প্রণব এসেছে বৌমা? চায়ের জল বসাবো?

বনানী কিছু বলল না। দুধের কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে শাশুড়ীকে হাতধরে এ-ঘরে নিয়ে এল। তারপর নিচু গলায় বলল,—খুব জ্বর হয়েছে, আপনি ওঁর কাছে বসুন! আমি ওদিকটা দেখছি।...

রান্নাঘর থেকেও একফালি আকাশ দেখা যায়।

বনানী দেখল,—সেখানেও অনেক তারা জ্বলছে। নতুন নতুন তারা, এতদিন এদের কাউকেই যেন সে দেখেনি। কিংবা অনেক দূরের আকাশ থেকে আজই তারা যেন প্রথম জ্বলে উঠল।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

॥ চন্দ্রাবতী লাহুল ॥

কাঙ্কু মহারাজ

হিমালয় অভিযানের অন্যতম পথিকৃৎ স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড আশি বছর আগে এসেছিলেন লাহুল উপত্যকায়। এসেছিলেন আজকের পথেই। পাঠানকোট থেকে মাণ্ডি ও কুলু হয়ে মানালী। সেখান থেকে রোতাং গিরিবর্ত্মের পাদদেশ রাহালা। তারপরে ১৩,৯০০ ফুট উঁচু রোতাং পেরিয়ে গ্রামফু। সেখান থেকে মাইল তিনেক হেঁটে কোকসার।

প্রথম দর্শনে স্যার ফ্রান্সিসের লাহুল উপত্যকাকে মনে হয়েছিল,

'There was no sign of life and vegetation except for an occasional bird. Huge depressing mountains shut me in on every side and the whole valley looked..... inexpressively dreary and desolate.'

একালের লাহুলযাত্রীদের মতোই ইয়ংহাজব্যাণ্ড কোকসারে রাত্রিবাস করেছিলেন। রাতে চাঁদ উঠল। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁর মনে হল সফর সার্থক হয়েছে কারণ তিনি এক রূপকথার দেশে এসেছেন। তাঁর ভাষায়, 'After···dinner···when I noticed that towards the east it was getting lighter and lighter, just as if the sun was rising behind the mountains, only the light was white and silvery instead of ruddy. Lighter and lighter it grew. Peak after peak was lit in the silvery radiance. At last the moon at its full appeared above the mountains and the valley was almost as light as day...desolation was now transformed into a scene like fairyland.'

তার পরে বহু যুগ কেটে গেছে। জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাহুলেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাহালা পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলে। লাহুল উপত্যকায় পথ তৈরি হয়েছে। কোকসার থেকে গাড়ি যায় কেলং—উপত্যকার সদর। লাহুল যাত্রীদের এখন কেবল রাহালা থেকে কোকসার এই সাড়ে তেরো মাইল পথ পায়ে হাঁটতে হয় কিম্বা ঘোড়ায় চড়তে হয়। অদূর ভবিষ্যতে তাও দরকার হবে না। রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে বাসপথ তৈরি হচ্ছে। তখন বরোমাস লাহুলের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে। এখন শীতের পাঁচমাস বিমান ও বেতার মারফত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এক কথায় লাহুল এখন আর সমতল ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়।

প্রভূত পরিবর্তনের মাঝেও লাহুলের নৈসর্গিক শোভার কোন পরিবর্তন হয় নি। আজও সে চন্দ্রাবতী। লাহুল তার বৈচিত্র্য ময় সৌন্দর্য নিয়ে এখনও একইভাবে পর্যটকদের চিত্ত হরণ করে। চাঁদনী রাতে কোকসার ডাকবাংলোয় বসে আজও তাদের মনে হয়—মাটির পৃথিবী নয়, রূপকথার দেশ।

দুর্গম গিরি প্রাচীরে পরিবেষ্টিত লাহুল। উত্তরে কাশ্মীর, পুবে স্পিতি উপত্যকা, দক্ষিণে বিপাশা উপত্যকা ও পশ্চিমে চাম্বা উপত্যকা। স্পিতির সীমান্তে তিব্বত। সমতল ভারতের সঙ্গে সেকালে লাহুল-স্পিতির সম্পর্ক ছিল খুবই কম। তারা বহুকাল একা ছিল। তাই এখানে গড়ে উঠেছিল একটি নিজস্ব স

ও সংস্কৃতি। হিমাচল তার বুক দিয়ে বাইরে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সযত্নে রক্ষা করেছে। লাহুল-স্পিতিকে এক পৃথক ভূখণ্ড রূপে লালন-পালন করে এসেছে।

এই পার্থক্য লাহুল-স্পিতির রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে মানব-প্রকৃতির ওপরে। হিমালয়ের আড়ম্বর তাদের অনাড়ম্বর প্রকৃতি-দান করেছে। চিরতুষারময় পৃষ্ঠমালা, আঁকাবাঁকা রুপোলী নদী ও ঝরণা তাদের প্রকৃতি-প্রেমিক করে তুলেছে। দশ থেকে বারো হাজার ফুট উঁচু অনুর্বর শীতল উপত্যকা লাহুল-স্পিতির মানুষকে সহনশীল ও শ্রমশীল করেছে।

লাহুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল বার্লি। এই বার্লির জন্য যুগে যুগে লাদাকী ও তীব্বতীরা লাহুলে হানা দিয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে কিন্তু তাতে লাহুলীদের প্রকৃতি পালটায় নি। সমতল ভারতের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও লাহুলের মানুষ ভারতকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের বৈশিষ্ট্য টুকু বজায় রেখেছে।

লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার মিলিত জনসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। আয়তন ৪৭০০ বর্গমাইল। এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে স্পিতি। কিন্তু তুলনায় লাহুল উপত্যকা স্পিতির চেয়ে উর্বর আর তাই লাহুলের লোকসংখ্যাও বেশী। লাহুলের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত কেলং এই মহকুমার সদর। কেলং কোকসার থেকে চল্লিশ মাইল। দৈনিক দুখানি করে যাত্রীবাহী জীপ (বাস) যাতায়াত করে।

তিনটি ছোট ছোট উপত্যকা নিয়ে লাহুল—চন্দ্রা, ভাগা ও পাটান। বড়ালাচা লা (গিরিবর্ত্ম—১৬,২০০´) থেকে চন্দ্রা ও ভাগা নদী উৎপন্ন হয়ে লাহুল পর্বতশ্রেণীর দুদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে তাণ্ডিতে এসে মিলিত হয়েছে। কোকসার চন্দ্রা উপত্যকায় ও কেলং ভাগা উপত্যকায় অবস্থিত।

দুটি নদীর মিলিতধারার নাম চন্দ্রভাগা বা চেনাব। তাণ্ডি থেকে পাটান উপত্যকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রভাগা জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতমা চন্দ্রভাগা। একে একে বিতস্তা (ঝিলাম), ইরাবতী (রাবী) ও শতদ্রু (শুতলেজ) এসে মিলিত হয়েছে চন্দ্রভাগার সঙ্গে। তার পরে চন্দ্রভাগা সিন্ধুনদে মিশে গেছে।

বৈদিকযুগের নদী চন্দ্রভাগা। ঋগ্বেদে একে বলা হয়েছে অসিকনী। সম্ভবতঃ চন্দ্রভাগার জলধারা ঈষৎ কালো বলে এই নাম হয়েছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে—কেউ যদি অনাহারে থেকে সাতদিন চন্দ্রভাগার পুণ্যধারায় অবগাহন করে, তাহলে তার মন পবিত্র হয় এবং সে মহামুনিতে পরিণত হয়। পুরাণ ও ভাগবতে চন্দ্রভাগার উল্লেখ আছে।

কেলং সেকালেও প্রধান জনপদ তথা রাজধানী ছিল। কেলং ও গোম্বলার ঠাকুরবংশ বহুকাল লাহুল উপত্যকা শাসন করেছেন। গোম্বলার ঠাকুরদের বাড়ি এখনও লাহুলের উচ্চতম অট্টালিকা। কোকসার থেকে কেলং যাবার পথে সবাই দেখে যান একবার। ঠাকুররা জাতিতে রাজপুত।

লাহুলীদের নিজস্ব ভাষা আছে। লেখার সময় এরা তিব্বতী অক্ষর ব্যবহার করেন। কিন্তু তিব্বতী ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার কোন মিল নেই। তিনটি পৃথক ভাষা আছে লাহুলে। এদের মধ্যেও মিল খুবই সামান্য। অথচ আশ্চর্যের কথা বছর পঞ্চাশেক আগে কলকাতার দক্ষিণে একদল উপজাতীয় মানুষ বাস করতেন, তাঁদের ভাষার সঙ্গে কোকসারী ভাষার অদ্ভুত মিল ছিল। এখন অবশ্য লাহুলীরা বহিরাগতদের সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলেন। সবাই অল্প-বিস্তর হিন্দী বলতে পারেন।

লাহুলীরা প্রায় সবাই বৌদ্ধ। তাই সারা উপত্যকা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য গুম্ফা। বোধিসত্ত্ব ত্রিলোকনাথের মন্দির লাহুল উপত্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। লামারা এখনও লাহুলের সবচেয়ে সম্মানিত সম্প্রদায়।

লাহুলের বাৎসরিক তুষারপাতের পরিমাণ বাইশ থেকে চল্লিশ ফুট আর বৃষ্টিপাত মোটে পাঁচ ইঞ্চি। স্বভাবতঃই লাহুল অভাব আর অনটনের দেশ। তাই এদেশের মানুষ অতীত কাল থেকেই জনসংখ্যা হ্রাসের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। সেই ভাবেই গড়ে তুলেছেন তাঁদের সামাজিক ব্যবস্থা।

সামাজিক নিয়ম অনুসারে কেবল বড় ছেলে বাবার সম্পত্তির অধিকারী। তাই আগে কেবল বড় ছেলেরাই বিয়ে করত। অন্য ছেলেদের ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামের গুম্ফায় চলে যেতে হত। কোন কারণে বড় ভাই-য়ের অকালমৃত্যু হলে পরের ভাই গুম্ফার লামাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসত এবং দাদার সম্পত্তি ও স্ত্রীর অধিকারী হত।

কালের প্রভাবে এখন সে নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। এখনও সামাজিক মতে কেবল বড় ছেলেরাই বিয়ে করে কিন্তু অন্য ছেলেদের বড় একটা ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় না।

প্রত্যেক বাড়িতে কমপক্ষে দুখানি ঘর থাকে। একখানি বড় ও একখানি ছোট। বড় ছেলের বিয়ের পরে বাপ-মা ছেলে-বউকে বড় ঘর ছেড়ে দিয়ে ছোট ঘরে চলে যান। বাড়িতে আর কোন ঘর না থাকলে ছোট ছেলেরা তখনকার মতো গুম্ফাতে গিয়ে বাস করতে থাকে। তার পরে তারা বৌদির সম্মতি নিয়ে একে একে বাড়ি ফিরে আসে ও বড় ঘরে আশ্রয় পায়। অর্থাৎ বহুপতি প্রথা প্রচলিত হয়েছে লাহুলে। প্রথম সন্তান বড় ভাই-য়ের। পরের সন্তানেরা যথাক্রমে ছোট ভাইদের। আজও লাহুলে নারী বহুরূপে সমাদৃতা।

লাহুলী সমাজে কোন পণপ্রথা নেই। সামাজিক স্বীকৃতি পেলেই ছেলে-মেয়েরা স্বামী-স্ত্রী রূপে বস-বাস শুরু করে। সে-জন্য বিবাহ উৎসবের কোন প্রয়োজন হয় না। পরে সুবিধা মতো উৎসব তথা ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হলে গ্রামের মোড়ল কিম্বা গুম্ফার লামা মিটমাট করে দেবার চেষ্টা করেন। যদি তাঁরা এক বছরের মধ্যে তাদের বিবাদ না মেটাতে পারেন, তাহলে বিবাহ ভেঙে দেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের দায়মুক্ত হয়ে আবার মনমতো জীবন-সঙ্গী জুটিয়ে নেয়।

জাতীয় সরকার লাহুলের উন্নয়নের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। লাহুলের প্রাকৃতিক সম্পদকে লাহুলীদের সেবায় নিয়োজিত করার চেষ্টা চলেছে। কানাডার জনৈক কৃষিবিশারদের মতে—জমি তৈরি করে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারলে, লাহুলের মাটিতে প্রচুর ফসল হতে পারে।

লাহুলের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবহন ও শিক্ষা। গত কয়েক বছরে কেলং-য়ে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও প্রায় প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়েছে। মেয়েদের জন্য কেলং-য়ে কার্পেট কারখানা হয়েছে। হয়েছে ডাক ও তার অফিস, হাসপাতাল, ডেপুটি কমিশনার ও পি. ডাবলু. ডি. অফিস। স্থাপিত হয়েছে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন মোটর পথ।

উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হয়েছে লাহুলে। আর স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিকতার রাহু গ্রাহুলকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। দুর্গম গিরিপ্রাচীর পেরিয়ে দুর্নীতি এসেছে। লাহুলের সরল জীবনকে ক্রমেই জটিল করে তুলছে। বছর দুয়েক আগে জনৈক সাধারণ সরকারী কর্মচারীর বাড়ি থেকে একলক্ষ টাকার নোট পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য সে-টাকা লাহুলের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। জানি এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শত হলেও লাহুল ভারতেরই অংশ। ভারতে যা চরম সত্য, লাহুলে তা মিথ্যে হবে কেমন করে?

শুধু বিস্মিত হয়েছি কারণ কেলং দুর্গাপুর থেকে বহুদূরে, আর লাহুল যে আজও চন্দ্রাবতী।

অব্যর্থ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

টিক্ টিক্ ক'রে দেয়ালে ঘড়িটা বেজেই চলেছে। অনেক চেষ্টা করেও অন্যমনস্ক হতে পারছে না অনিমেষ। বার বার চোখ গিয়ে পড়ছে মিনিটের কাঁটার উপর। ঠিক একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধ'রে এই ঘরে বসে আছে অনিমেষ, ঘড়ির কাঁটায় দেখছে সময়ের বয়স বাড়া। বড় সাহেব জেনারেল ম্যানেজার ফোনে ডেকে বলেছিলেন বাড়ীতে দেখা করবার জন্য। জরুরী কি দরকার। অনিমেষ এসেছে যথাসময়ে কিন্তু দেখাটা এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। না, বাড়ীতে থেকে খামোকা অনিমেষকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখেননি তিনি দেখা না ক'রে। সভ্যভব্য চাকর জানিয়েছে—সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে ছিপ দেখতে গিয়েছেন। সাহেব-বাড়ীর চাকর, বেশী কথা বলবার অভ্যাস নেই। সেপ্টেম্বর মাস, তাই ফ্যানটার দিকে চেয়ে সেটা অন্ করেই চলে গিয়েছে খবরটা দিয়ে। এতক্ষণ ধ'রে একা, ঠিক একা নয়, এক বিরাট চেহারার অ্যাংলোসেক্সিয়ানের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে অনিমেষ। দরজার ওপাশে একটা র‍্যাগের উপর বসে হিংস্র দু'চোখ মেলে অনিমেষকে দেখছে কুকুরটা। একটা বই দেখবার জন্য হাত বাড়ালেও ধমক দিচ্ছে—গ-র-র-র।

শার্টের হাত যেখানে শেষ, কব্জইএর নীচে একটা মশা। রক্ত খাচ্ছে, আস্তে আস্তে অনিমেষের রক্তে ওর স্বচ্ছ শরীর লাল হতে দেখা যাচ্ছে। উঁহু, রক্ত খেয়ে পালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। ওটাকে মারবে ব'লেই প্রস্তুত হচ্ছে অনিমেষ। মোক্ষম একটি ছোট্ট চড়, চ্যাপটা হয়ে গেল মশাটা। এঃ! শার্টে রক্ত লাগল নাকি! এক কণা রক্ত, এক কণা লাল রক্তের অনেক দাম। অনেক দাম একঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের।

সানরাইজ ইনডাস্ট্রিতে সেল্‌স অর্গানাইজার অনিমেষ বোস। স্মার্ট, কাজ ভালবাসে, ভালবাসে কাজ দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি বানাতে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে। দশবছর আগে অফিসে ঢুকেছিল বাইশ বছরের ছেলে টাইপিষ্ট-কাম ক্লার্ক হয়ে। পেয়েছে টাকা মাইনে। চল্লিশ, প্যান্টের নীচে শার্ট ঢোকানো, কোটো খুলে টিফিন খেত মহা আনন্দে রুটি-আলু। আনন্দে খেত কিন্তু তৃপ্তি ছিল না সে আনন্দে। একটা টেবিল, রেমিংটন মেশিন, কয়েকটা মাত্র ফাইলে নিজের ভবিষ্যৎ বন্ধক দিতে পারেনি। অবিশ্রান্ত খেটেছে, নানারকমে নিজেকে নিক্ষেপ করেছে কর্তাদের চোখের সামনে। পদোন্নতি ঘটেছে। পাঁচশো নশো পঞ্চাশের গ্রেড। সেল্‌স-এ কাজ, সুতরাং নানা খাতে বরাদ্দ খরচের কিছুটা আসে নিজের পকেটেই। অনিমেষ একদা অনেককে তেল দিয়েছে, আজকে তাকেও অনেকে তেল দান করে নিজেরা তৈলাক্ত হবার আশায়। কিন্তু তৃপ্তি হয়নি এখনো। তার কি বাড়ী হয়েছে? প্যানশেনে দেড়শো টাকার একতলা ছেড়ে উঠতে পেরেছে কি তিনশো টাকার ওয়েল ফারনিশড্ ফ্ল্যাটে? গাড়ী? টাই-সুটের আভিজাত্য? কিছু, কিছু হয়নি অনিমেষের। হয়নি, তবে হতে পারে। সব হবার আশার আলো কেবল উঁকি দেয়নি, ঝপ ঝপ ক'রে জ্বলছে সামনে। বেটার চান্স পেয়ে জোনাল ম্যানেজার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে দু'মাস হ'ল।

সিংহাসন শূন্য পড়ে, সামনের বোর্ড মিটিং-এ স্থির হবে, কার ভাগ্যে এই পরম আকাঙ্খিত সিকেটি ছিড়বে। বড় সাহেব একবার একটু সদয় হয়ে ঠেলে দিলেই এখন কতিপয় ঘর, লেডি স্টেনো টাইপিস্ট, বেয়ারা, ক্লার্ক, ইত্যাদি ইত্যাদিতে সমন্বিত ষষ্ঠৈশ্বর্যময় জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে গিয়ে বসতে পারে অনিমেষ। বড় সাহেবের হাতকে দাক্ষিণ্যে প্রসারিত করবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছে, এখনও করে যাচ্ছে সে। বড় সাহেবের গতবল উদ্ভাসিত হয়েছে প্রসন্নতায়, ধৈর্য ধ'রে লাল কলিকা খরচ ক'রে তার ফলের দিকে অতন্দ্র চোখ পেতে বসে আছে অনিমেষ। ঘড়ির কাঁটা দরল আরো কুড়ি মিনিট। সামনের নীচু টেবিলে রাখা কাগজটার উদ্দেশে হাত বাড়াল। গ-র-র-র।

গাড়ী থামবার শব্দ। এক লাফে অ্যালসেশিয়ানটা সব গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে দরজায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল। কী করুণ দৃষ্টি! কী বক্তব্যের কুঁই কুঁই শব্দ! ব্যাটা বদমাস!

—এই যে, অনেকক্ষণ নাকি?

সোফায় হেলান দিয়ে অমায়িক মুখে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল ম্যানেজার।

—না:, খুব ডেমন বেশী—সাড়ে সাতটায় এসেছি।

—সাড়ে সাত! এতটা সময় একা একা—

—একা কোথায়, বন্ ছিল তো। ওদিক হতে মধুর কণ্ঠ নিক্ষেপ করলেন ম্যানেজার-ঘরণী।

—হ্যাঁ, বন্। বনের সঙ্গে আপনার কেমন বনছে বোস? বেশ ভাব লাগছে তো ওকে?

—ইয়ে, হ্যাঁ, বেশ ভালই। কষ্ট করতে হ'ল কথাটা বলতে। মিসেস কুণ্ডুর দিকে চাইল অনিমেষ। হলুদ রং সুডৌল বাহু দিয়ে কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরেছে রেখা কুণ্ডু। ব্যাটা কুকুর এখন মিনি বেড়াল সেজে কুঁই কুঁই করে গলে পড়ছে। সামনের পা দু'টো তুলে দিয়েছে নিজের শাড়ী মোড়া হাঁটুর উপর। অনিমেষের গলার চামড়ায় একটা সুড়সুড়ি অনুভূত হ'ল। জোয়ান মদ্দ অ্যালসেশিয়ানটা!

—তারপর খবর কী বলুন। এই হিচ্‌কক্‌ের বইগুলো এখন টায়ারসাম, কাজকর্মের পরে মাথা ঠেণ্ডা হয়ে যায়।

হাই তুললেন বড় সাহেব। উপরের মাড়ির দাঁত ছাড়া খালি জায়গাটা দেখল অনিমেষ।

—যত সব বোকার মত কথা! বনের গালে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল রেখা কুণ্ড।

—জানো ওদেশে যাঁরা যত বেশী সিবিআস কাজ করেন, তাঁরাই ডিটেকটিভ বই বেশী পড়েন, ব্রেন ফ্রিয়ার রাখবার জন্য। আপনি কি বলেন মিস্টার বোস?

কি বললে মিসেস খুশী হবে, মিস্টার রাগবে না ঠিক করতে না পেরে, অনিমেষ এক বিস্তৃত হাসি বের করল।

—আমাকে আসবার জন্য ফোন করেছিলেন স্যার?

—আমি! ও! কী যেন কী যেন—, ও হাং মাই মেমারি! একদম ভুলে গিয়েছি। মি, বোসকে কেন ফোন করেছি।

মি অর্থাৎ রেখা কুণ্ড প্রতিধ্বনি করল,

—তুমি কেবল ভুলে ভুলে যাও। আমি আর মনে করিয়ে দেবনা। তোমার চেয়ে বন্ ভাল। ও কক্ষনো কিছু ভুলে যায় না।

—তা তো বুঝলাম, এবার কথাটা বলুন। বোস অনেকক্ষণ বসে আছেন।—আর একটা বিয়ার হবে। কী খেয়ছে বাইরে, জিভে হলুদ রং।

—সেই তালিয়ার কাটিং।

—গড্! ঠিক ঠিক। বুঝলেন বোস, মিসেসের সখ হয়েছে ফ্লাওয়ার শোতে এবার তালিয়া পাঠাবেন। ওর হবি হচ্ছে গার্ডেনিং, পোয়েটিক হবি। তা আমি তো ওয়ার্থলেস ফেলা, আপনি ছাড়া গতি নেই। আপনার সাহায্য না পেলে বেচারীর ইচ্ছেটা কিন্তুতেই সফল হবে না।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আগে ওদের নিয়ম কানুনগুলো আনিয়ে নি, তারপর গাছের ব্যবস্থা। প্রাইজ উনি নিশ্চয়ই পাবেন।

বিগলিত হবার ভাব করল অনিমেষ।

—হাউ নাইস অব ইউ! কাছে উঠে এল রেখা গুপ্ত। শোতে স্ট্যাণ্ড করলে ধন্যবাদ তো দেবই, অ্যাডভান্স করছি থাউজেণ্ড থ্যাঙ্কস।

রেখার শরীরের উঁচু নীচু বাঁকগুলো চকিত কটাক্ষে দেখে নিল অনিমেষ। পিঠে হাত বোলাচ্ছে, তাকেও কুঁই কুঁই করতে হবে।

—এ আর এমন কঠিন কাজ কী! অর্থাৎ আরো অনেক কঠিন কাজ এলেও করতে প্রস্তুত।

—আচ্ছা, আসি তাহ'লে—।

স্মিত হাস্যে বিদায় নিয়ে পথে বের হ'ল অনিমেষ। উঃ! কত যে হবি আছে এই মেয়েলোকটার। কুকুর, ফটোগ্রাফি, ডাকটিকেট, এখন আবার তালিয়া। সেক্রেটারীর বউ গোলাপ করছে, সুতরাং ওর তালিয়া চাই! প্রাণান্ত হ'ল অনিমেষের। জোনাল ম্যানেজার রেকমেণ্ড করবার ভার যদি বড় সাহেবের উপর না থাকত!

বাসের পা-দানীতেও দাঁড়াবার জায়গা নেই, ট্রাম টার্টিস্ রেস দিচ্ছে। খালি সীট, খোলা জানালার পথে চোখ বাইরে পাঠালে অনিমেষ। রাস্তায় ভীড় পাতলা, সিনেমা হলের কাছে কিছু সংখ্যক এখনো ঘুরছে উড়ো টিকেট পাবার প্রত্যাশায়। একটা মেয়ে এসে পাশে বসল। ঘামের সঙ্গে মিশেছে দেশী সেন্টের গন্ধ। মেয়েটার হাতকাটা জামা, পেটের কাছে ঝুলে রয়েছে একগলা কালো মাংস। অসহ্য! দু'টো স্টপ বাকী থাকতেই উঠে দাঁড়াল অনিমেষ।

সাড়ে দশটা। ভিতরের গেঞ্জিটা গায়ে এঁটে বসেছে।

নরম কুশনে ডুবে অনিমেষের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে সুমিত্রা। চোখে মুখে কী স্বর্গীয় মাধুরী! কী অপূর্ব স্মিত হাসি! কুঁই কুঁই করছে অর্থনীতিতে ফার্স্ট, অধ্যাপক কুণাল সেন।

স্বামীকে দেখে ঠোঁট খোলাল, চোখ কপাল সুমিত্রা। এগুলো ক'রে ক'রে এমন রপ্ত হয়ে গিয়েছে, যে প্রেজেণ্টেশনে প্রিপারেশনের দরকার হয়না। কুণাল বলল:

—তোমাকে ক্রুশিফাই করা হবে অনিমেষ। বেচারীকে সারাদিন একা বাড়ীতে ফেলে, রাত দশটায় বাড়ী ফেরা!

—কে করবে সেই মহৎ কাজটি? দাঁত বের করল অনিমেষ। হাসিটা যেখাল মুখ ভেংচানোর মত। একা বাড়ীতে ফেলে, বাড়ীটা যেন দণ্ডকারণ্য।

—বসো, স্নান করে আসি।

—নাঃ, আর বসা নয়। ম্যাডাম তাহলে আমাকে আর ক্ষমা করবেন না। আমি উঠি, তোমরা কাকলী আরম্ভ কর।

—আরে বোসো, বোসো। এই দুপুর রাত কি কাকলী করবার সময় নাকি!

বাথরুমে ঢুকে এতক্ষণে একটু আরাম পেল অনিমেষ। সেপ্টেম্বর মাসের রাত দশটা, গায়ে জল ঢাললে বোমাক জাগে। গায়ে জল ঢালতে লাগল। দিনের ক্লান্তি ঝরে পড়তে লাগল, কাটল না মনের তিক্ততা। কতগুলো টাকা গচ্চা যাবে তালিয়ার গাছ যোগাড় করতে। টাকা বেরিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করল অনিমেষ।

—ভালই যদি না লাগে, তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন সাত কাণ্ড করে?

খেতে খেতে স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে প্রমাদ গণল অনিমেষ। জ্বাও ঠ্যালা! মাথে একটা বাজছে ঘড়িতে, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে, ক্লান্তিতে শরীর অবশ, এখন রেফারেন্স সহ বিয়ের কারণ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর। অবিকল অ্যালসেসিয়ানদের মত কুঁই কুঁই করতে করতে বা-হাত দিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরল অনিমেষ। ইস্! এক বছরেই মেয়েরা এমন পুরনো হয়ে ওঠে। তারপর আবার যদি পূর্ব রাগের পালা থাকে—একেবারে নরক ছুড়নো ভাত। পেটের ক্ষিধেতে খাচ্ছি তো খাচ্ছিই, না স্বাদ না গন্ধ। অরুচি এসে যায় একটুতে। তাইতো বিবাহোত্তর জীবনটাকে সুসহ করবার জন্য নানা ব্যবস্থা। ছেলে মেয়ে, কুকুর, তালিয়া।

মেয়েরা নিজেদের খুব চালাক মনে করে। পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর মনের কথা যদি কিছু বুঝতে পারে, অনিমেষ বাজি হারবে একশো টাকা। ব্যাচিলাররা অবশ্য স্বামীদের করুণার চোখে দেখে। ভাবে বন্ধুর বউদের মত মাধুর্য, রহস্যের সবটাই পাচ্ছে তারা। হামবাগের দল। আরে জিত পট্টি তো স্বামীর হাতে। প্রেজেন্ট কর স্ত্রী জিনিষ, নিয়ে যাও খরচা ক'রে সিনেমা জলসাতে। হাসি দেখ, গান শোন কান ভরে নাও বক্‌বকানীতে। ব্যস, তার বেশী নয়। হাত নাড়লেই গ-র-র-র। নট নড়ন চড়ন।

স্বামীর আদরে গর্ববিনীর রোলে চলে এল সুমিত্রা।—ওতে আর ভুলছি না। কেবল এড়িয়ে যাওয়া! কথার উত্তর দিতে হবে।

অনিমেষ হাসল। এঁটো মুখই ঘষল সুমিত্রার ঘাড়ে। ফোলানো ফাঁপানো রেখা সুওকে মনে পড়ছে। প্রাইজ পাবার পর রেখা যদি অনিমেষের গলা জড়িয়ে গালে গাল ঘষে বলতো, কেমন হয় তাহ'লে! বড় সাহেব সহ্য করবেন? মৃদু হেসে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন অনিমেষের কুই কুই করা?

তিনি সইলেও বন্ কিছুতে সইবে না। লাফিয়ে উঠবে! —গ-র-র-র। টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে।

মশারীর মধ্যে উগ্র ক্রীমের গন্ধ, বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মুখ বের করে রাখল অনিমেষ ঘুম আসতে আসতে ফিরে গিয়েছে। আচ্ছা সুমিত্রা এত ক্রীম মাখে কেন! লাবণ্য টিকিয়ে রাখবার জন্য। যে লাবণ্যের জালে সম্প্রতি বন্দী হয়েছে কুপাল! অনিমেষকে মুক্ত করবার দায় হতে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে সুমিত্রা। না হ'লে একঘরে বাস ক'রে লাবণ্য বজায় রাখবার নেপথ্য বিধানের আয়োজনে হিমসিম খেয়ে মরত বেচারী। অবশ্য অনিমেষ একদিন বন্দী হয়েছিল। আকণ্ঠ তলিয়ে গিয়ে ভেবেছিল আর উদ্ধার পাবে না কোনোদিন। কিন্তু কী আশ্চর্য বিয়ের মন্ত্র! ঘাউ ঘাউ আগুন লোকজনের ভীড়, রকমারী খাবারের মিলিত গন্ধ, একঘণ্টা ধ'রে অনন্ত কতগুলো অনুস্বার বিসর্গ কণ্টকিত সংস্কৃত মন্ত্র—সাদির

সব বাঁধ কেটে গেল। একেবারে খোলামাঠে বেরিয়ে এল অনিমেষ। আর মুক্ততার আবরণ নেই। সুমিত্রা কেবল একটি মেয়ে বিবাহিতা স্ত্রী অনিমেষের। ওর একটি দাঁত উঁচু, খেতে অনাবশ্যক শব্দ করে, মাঝে মাঝে অনেক জিনিষের জন্য প্রায় বেমানান বিরক্তিকর মূঢ়তা প্রকাশ করে। অতি সাধারণ, হাজারটি মেয়ের একটি সুমিত্রা অথচ ওকে বিয়ে করবার জন্য তখ সময় আর এনার্জি ব্যয় করেনি অনিমেষ। সুমিত্রার মাকে খোশামোদ, ভাইকে ক্রিকেটের দুষ্প্রাপ্য টিকেট। একশো ঘণ্টা ধ'রে ওর বাবার রাজনৈতিক মতামত সংক্রান্ত বক্তৃতা শোনা। আবার কনভিন্সড্ হয়ে গেলেও চলবে না। জোরালো যুক্তিগুলো জোর গলায় বলবার সুযোগ পেকে বঞ্চিত হ'লে চটে যাবেন ভদ্রলোক। সে অসহনীয় অবস্থা। শেষের দিকে অবশ্য অনিমেষ ঝুঁড়িয়ে এসেছিল, বিয়ে না হলেও চলত। কিন্তু তখন অপর পক্ষই অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। ফিরবার উপায় নেই বলেই ফিরতে পারল না সে, কিন্তু মনের মধ্যে কোনো তাগিদ ছিলনা সুমিত্রাকে একেবারে নিজস্ব অধিকারে পাবার জন্য: এই-ই বোধহয় পুরুষের ধর্ম। কিছু পাবার জন্য চরম উত্তেজনা, আবার সে উত্তেজনা ঠাণ্ডা হতেও বেশী সময়ের দরকার নেই, চরম আকাঙ্ক্ষা, পরম অনীহা দু'টোই পাশাপাশি বাস করে তার চরিত্রের মধ্যে।

এই যে জোনাল ম্যানেজারের পোস্ট, যার জন্য প্রতিটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ তীব্র ক'রে এতদিন সময় চেষ্টা করে চলেছে অনিমেষ, তার রক্তে লাল হতে দেখছে ম্যানেজার হস্পতিকে, এটাও কি এমনি বিস্বাদ বিরক্তিকর হয়ে উঠবে পাবার কিছুদিনের মধ্যে! পাগল! নিজেকেই বোঝাল অনিমেষ। একি বিয়ে করা, একটি বাঁধাধরা দিনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো জীবন ভরে! মেয়েরা তো চাঁদের মত। বিয়েতে ষোল কলা পূর্ণ হয় তাদের। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আকাশে, পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। তার পরই কৃষ্ণপক্ষ সুরু হয়ে যায়। কেবল ক্ষয় আর ক্ষয়। তবে চাঁদের সঙ্গে তফাৎ আছে একটু! ওরা যেমন আবার শুক্লপক্ষের আবির্ভাবে কলায় কলায় নতুন করে ভরে ওঠেনা, তেমনি আবার অমাবস্যার একেবারে ডুবিয়েও যায় না। অভ্যস্ত একটা অভ্যাসের মত জেগে থাকে মনের প্রান্তে। উৎসাহ নেই, ঔৎসুক্য শেষ হয়ে গিয়েছে তবু ওদের বাদ দিতে গেলে, জীবনের অনেকটাই বাদ দিতে হয়। পুরুষের দ্বন্দ্ব-বৈষম্য ভরা জীবনে মাঝে মাঝে আবেগের চল নামে। কর্মহীন কোনো অলস বেলায় পুরনো দিন বেরিয়ে আসে মনের গোপন গুহা ছেড়ে। চোখের সামনে দোলে মাধুরীভরা যৌবন স্বপ্ন। তখন মনে পড়ে যায় সেই ক্রীড়া সহচরীকে, যার মুখে 'কেনিলোজ্জ্বল সুরা' ধরেছিল একদিন—। পুরুষ তাকে ডেকে আনে, যে জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়েও বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছে। ক'টি মুহূর্তের জন্য পুরনোর মধ্যে নতুনের স্বাদ।

আস্তে আস্তে ঘুমন্ত সুমিত্রার পিঠে হাত বোলাল অনিমেষ, সুমিত্রা বিস্বাদ হয়ে উঠেছে, তবু ওর জন্যই তো বাড়ী চাই, গাড়ীচাই। নতুন সুখে সন্ধানে বলসে উঠবে সুমিত্রা। বারে বারে রং বদলাবে ওর আর সেই রং বদলের মধ্যে অনিমেষ দেখবে, অনুভব করবে নিজের আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি। কিন্তু যত বাজে ভাবনা। এটা খুব সত্যি কথা যে রাত মানুষকে সেন্টিমেন্টাল করে তোলে। সবাই বলে মেয়েরা রাতের যাদুকরী! পুরুষকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলে ওরা তখন। ভারি মিথ্যে কথা। রাত্রি নিজেই মোহময়ী কুহকিনী। নিরালা ঘর পড়ে পড়ে চরাচর অবশ করে, অভিসারে বের হয় ও। কারোর সাধ্য নেই তখন ওর কাছে ধরা না পড়ে। এইতো কতটা সময় আবোল তাবোল ভেবে রাতের পাওনা মিটিয়ে দিতে হল অনিমেষকে।

জেনারেল ম্যানেজারের পোস্ট! দিনে দিনে এ চাকরি কত মাধুরী ঐশ্বর্য বিস্তার করবে। জেনারেল থেকে ঠেলে দেবে জেনারেলের দিকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে। তখন আর রেখা কুণ্ডুর অ্যালসেসিয়ান ডাকটিকেট ডালিয়া নয়। স্বয়ং কর্ত্রীর বিদয়ৎ করা। তার আবার রেসের ছবি। একটা টিপস্ দিতে পারলে আর দেখতে হবেনা। মিসেস সোম একজন কলারসিকা বটে। বিরাট এক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী যার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সোম সাহেব। মাঝে মাঝেই এদের বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। অল্পবয়সিনী শিল্পীরা চোখে কাজলে ঠোঁটে লাল লাগিয়ে, মধুর হেসে অফিসেই টিকেট বিক্রী ক'রে যায় হাজার টাকার উপর। সুমিত্রাকেও এই দলে ঢুকিয়ে দিতে হবে। সাঁড়াশী আক্রমণ! অনিমেষ তার ফোনের রেঞ্জ বাড়াবে, অ্যাপ্রিসিয়েটিভ চোখে তাকাতে বাধ্য করবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। লেডী সোমের জন্ম ঘোড়ার রিয়ের টিপস্ যোগাড় করবে। রেখা কুণ্ডুর মত স্লাকা নয় বিনতা সোম। বয়স হয়েছে, ভারি গলা। নাকের তলায় ঠোঁটের ওপর রোমরাজির বাহুল্য একটা পুরুষোচিত গাম্ভীর্য এনেছে চেহারায়। স্বামীর কাছেও ভয়েস আছে। কেবল গলার সমক নয়, ওঁর বাবার ছ'লক্ষ টাকার শেয়ার আছে কোম্পানীতে।

সোম সাহেব নাচ-গান টানের সমজদার বলে রটনা আছে। সুমিত্রা যদি কাউকে মুগ্ধ করতেই চায়, মাধুরী ছড়িয়ে দিক যোগ্য স্থানে। মিন মিনে, পানসে, না মরতেই মরা প্রফেসরটাকে খায়েল করে কী বাহাদুরি দেখাবে ও! বরং মুগ্ধ করুক সানরাইজের ভাগ্য-বিধাতাকে। নিজের ভাগ্যস্থানে চির রবি প্রকাশমান থাকবে তাহ'লে।

আঃ! রাত জেগে মাথা গরম। সেই আকাশকুসুম গল্পের ছেলেটার অবস্থা আর কি। আগে জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে গিয়ে পৌঁছতে দাকক তারপর পরবর্তী পরিকল্পনায় অনেক কারুকার্য করবার সময় পাবে। মণা দু'টো অনিমেষের রক্ত খেয়ে খেয়ে লাল হতে লালতর হচ্ছে। ভাবছে তার শরীরে সাড় নেই। সাড় যে কী পরিমাণ আছে সেটা বুঝিয়ে দেবে সময় এলে। এখন ধৈর্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনেক ধৈর্য, রাশি রাশি ধৈর্য চাই। তারপর আর কুঁই কুঁই নয়, গ-র-র-র।

—আপনার তো পোয়া বার, বৃহস্পতিবার তুঙ্গ ক্ষেত্রে। কুটিল চোখে চাইল জেনারেল ম্যানেজারের পি-এ বিপুল সুর। অনিমেষের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। ওদিকে বিপুল ততক্ষণে তার দু টি ঠোঁট এমন সেঁটে নিয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে খুলবার কোনো লক্ষণ নেই। ব্যগ্র হ'ল অনিমেষ।

—হঠাৎ এমন কথা বললেন কেন বিপুলদা? ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। মিনতি ঝরে পড়ল অনিমেষের কথায়। নিজে চারমিনার খেলেও পকেটে সর্বদা মজুত থাকে এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক। সেই পরম রমণীয় দামী কুফিকাটি ধরল অনিমেষ পি-এর বন্ধ ঠোঁটের সামনে। সেদিকে কটাক্ষে চাইল বিপুল সুর। ধরজা একটু ফাঁক, অনিমেষ তাড়াতাড়ি লাইটার জ্বালল।

সিগারেটের দৈর্ঘ্য কমবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলের চোখের ছুটিলত্ব কমতে লাগল। ধোঁয়া ছেড়ছেড়ে নাক দিয়ে, ঠোঁটে একটা হাসির ভাব।

—কি বলছিলেন বিপুলদা?

—বলছিলাম যে আর সিগারেটে হবেনা, ভাল খ্যাট চাই। আমার পাড়ার সর্বজনীনেও দিতে হবে একশো টাকা চাঁদা।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি বড় ডাইয়ের মত যা বলবেন, আর মা দুর্গার পুজো—। পাওয়াতো হবেই। কিন্তু হয়েছে কি?

—হয়েছে! ছোট ছোট টোকা দিয়ে ফাইলের উপর থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল বিপুল। প্লেটের ঢাকা খুলে গ্লাস তুলে জল খেল তাকিয়ে তাকিয়ে। ব্যাটা শয়তান! ফোঁটা ফোঁটা ক'রে স্যালাইনের ড্রপ ঢালছে গলার নলীতে। জল খেয়ে পকেটের মধ্যে খোঁজ খবর করে বের করে আনল কি একটা কুচি। মুখে ফেলে এবার লাগল চশমা মুছতে। তারই বা পরিপাটি কত। হাঁ করে পরম হাওয়া চশমার কাচে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, কাছে এনে চশমা পর্যবেক্ষণ আর শেষ হয় না। কান গরম লাগছে অনিমেষের, রক্ত জমা হচ্ছে মাথায় এসে। কিন্তু ধৈর্য চাই। গ-র-ম-র নয়, কুই কুই।

—বিপুল দা!

—হুঁ, সুসংবাদ। আপনার পুজোতে তুষ্ট হয়েছে গ্রহরাজ। প্রসন্ন দৃষ্টি। বড় সাহেবের বাড়ীতে বৌমার তৈরী কেক খেলাম সেদিন। চমৎকার, অবিকল ফিরপোর কেক। তা ডালিয়াটা তৈরী করালেন কাকে দিয়ে? বিস্তর খরচ হয়েছে তো। কিন্তু হয়েছেও খুব সুন্দর। সিয়োর প্রাইজ পাবার আনন্দে মেম সাহেব তো আনন্দে ডগমগ।

উঃ! কত যে বক বক করছে ব্যাটা, আসল কথা ভাঙছে না কিছুতেই। দাঁত কামড়ে ধৈর্য ধরল

জাতির দুটি সেরা জুড়ি

বেঙ্গল ল্যাম্প ও বাঘ যেমন টাইগার ব্রাণ্ড ক্ষেত্রে বিখ্যাত—কেউ ঘরে কেউ বাইরে। এই বিখ্যাত ল্যাম্প যেমন তৈরী সমস্ত ল্যাম্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটিই প্রথম ল্যাম্প যা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনে, পরিচালনায় ও কর্মিগণ দ্বারা ভারতে প্রস্তুত।

Bengal LAMP

দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিমিটেড

৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অনিমেষ, অবশেষে ধৈর্যের ফল মিলল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে, উঠবার তাড়া আছে, সুতরাং বক্তব্য আসতে ত'ল বিপুলকে।

—আপনার নাম রেকমেণ্ড করেছেন বড়সাহেব।

—করেছেন! উঃ! সবই আপনার আশীর্বাদ বিপুলদা। কত যে আপনি আমাকে ভালবাসেন। চেয়ারের তলায় খুঁজে বিপুলের জুতোয় হাত বোলাল অনিমেষ।

—আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, কাজটা হোক আগে। কপালে হাত ঠুকল বিপুল।

—বড়সাহেব তো রেকমেণ্ড করেছেন, কর্তারও আপত্তি নেই। স্যাকড়া বেঁধেছে অন্য দিকে।

—স্যাকড়া! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল অনিমেষের।

—আর বলেন কেন! মহা ঝামেলা। মিসেস সোমের কে এক ভুতো ভাই ফিরেছে বিলেত থেকে। বেটাচ্ছেলে পড়েছে নাকি অনেক, পরীক্ষা দেয়নি একটাও। বিরাট অভিজ্ঞতা কিন্তু মুখ মত চাকরি পছন্দ হচ্ছে না। সোমের কাছে কেঁদে পড়েছে, হয় তো বা জোনাল ম্যানেজারের চেয়ারে তাকেই বসিয়ে দিতে হয়।

—এ্যা!

—ঘাবড়াবেন না, দেখুন কি হয়। কর্তার নাকি বিশেষ মত নেই। পারচেজে শক্ত বাঙালী মুটুস বসিয়ে আজশোধে সারা হচ্ছেন এখন। পারচেজ অফিসার দু'হাতে সিঁদকাঠি চালাচ্ছে, মুখ খুলবার উপায় নেই কর্তার।

ঢং ঢং—পাঁচটা বাজল। ড্রয়ারে আলমারিতে চাবি ঘুরালো বিপুল মুখর। বোধো মজাটা। কেবল পেয়াম আর সিগারেট। কেক-সন্দেশ-আপেলের বেলায় বড়সাহেব। ছোঁড়া ত্যাদোড়, তালিয়া দিয়ে ভজিয়েছে গিন্নিকে। বস্ত সাহেবের মতলব তো ঘুরিয়ে দিয়েছিল বিপুল।

—অনিমেষ ঘোষকে রেকমেণ্ড করে কাজ নেই আর। ক্লার্ক থেকে অফিসার হয়েছে। একটা ডিপার্টমেণ্টের হেড করে বসালে অফিসের মান নষ্ট হবে। হেড টাইপিষ্ট নীলরতন এখন ওকে তুমি বলে, নাম ধরে ডাকে। তাছাড়া ও মহা ঘড়িবাজ, কতদূর যেতে পারে তার ঠিক নেই।

বড়সাহেব তা হুঁ, তা হুঁ করছিলেন। বিদঘুটে দিল বউটা এসে। বেটি একেবারে প্রলয় নাচ দেখালে। পুষেছে আবার নেকড়ে মার্কা কুকুর। একবার ছুঁ করলে আর দেখতে হবে না। চিবিয়ে খেতো করে রেখে গলাটি।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও অনিমেষের পেন্সনটা ঘামে ভিজে গেল। কি করা যায়! কিছু করা যাবেনা ভালই বুঝছে অনিমেষ। বিনতা সোমের ভুতোভাই, সোম সাহেবের আপত্তি টিকবে না শেষ পর্যন্ত। ভাগ্য তাকে ঠিক এই সময়ে বিলেত থেকে এনে বিনতা সোমের কাছে হাজির ক'রে দিয়েছে। চিরদিন এই নিয়তি অনিমেষের, শেষ মুহূর্তে সব নষ্ট হয়ে যায়। গত পাঁচবছরের এফিসিয়েন্সির রেকর্ড, বড়সাহেবের রেকমেণ্ডেশন—কোনো কাজে লাগবে না। জোনাল ম্যানেজারের পোস্টের জন্য দরকার শুধু এক কোয়ালিফিকেশন মিসেস সোমের ভাই হওয়া।

অনেকক্ষণ মাঠে বসে থেকে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল অনিমেষের। ছেড়ে দেবে! একটুও চেষ্টা না ক'রে, চিরদিন নির্মম হয়ে বঞ্চনা ক'রে এসেছে সেই ভাগ্যের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবে! নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে দেখবে কেমন ক'রে তার তীরটি লক্ষ্যের মাঝা ছুঁয়ে পড়ে গেল মাটিতে! উঠে দাঁড়াল অনিমেষ।

টোস্ট, গরম চা এক পট, আরো দু'টো ডিম। দীর্ঘ সময়ের উপবাস ভঙ্গের পর নিজেকে খুব সজীব লাগছে। রাস্তা পার হয়ে ডবলডেকার ধরল অনিমেষ। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—পরিতোষ। পরিতোষ নাম করা বেহুদে। প্রথম জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে শিথিল হয়ে গিয়েছে। বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা পর্যন্ত হয়নি। কথা শোনাবে পরিতোষ? যদি শোনায়, বোঝা যাবে এখনো আছে কিছু প্রীতির উৎস।

স্টপে নেমে পাঁচটাকার সন্দেশ কিনল অনিমেষ। মোড়ঘুরে তিনটি বাড়ী, ছাই রংএর বিবর্ণ দোতলা। একটা নিঃশ্বাস ফেলল অনিমেষ। বাড়ীটা আগের মতই আছে। দরজার পাশে ডাস্টবীন, আলোর বালবটা বোধ হয় ভাঙা, ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে কাছের লাইট পোস্ট। দরজার শোয়া পথের কুকুরটাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল অনিমেষ।

পরিতোষ বাড়ীতে আছে। লুঙ্গি এবং একটা গ্যাপারের মধ্যে ঢুকে মাথা নীচু ক'রে কি যেন কাগজপত্র দেখছে। নিশ্চয়ই রেস সম্বন্ধীয়, আজ বুধ, দু'দিন বাদে আসবে শনিবার। একটুও ইতস্তত: না করে পরিতোষের বাঁকানো পিঠের উপর একটি অন্তরঙ্গতার কিল বসাল অনিমেষ।

চমকে মুখ তুলল পরিতোষ, চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হতভম্ব চোখে।

—তুই! বেঁচে আছিস?

—তীষণ বেশী রকম বেঁচে আছি। বউকে ডাক। ছেলেমেয়ে ক'টা?

—এখন এক আর একদুই। একটি গতবান।

চমৎকার চা। গরম লুচি-মাংস। বিষ্টি চোখ চেয়ে অনুযোগ দিল পরিতোষের বউ। মা এলে আঠারো বছরের পরিতোষ কী কী বলত তার একটা বানানো ফিরিস্তি দিলেন। পরিতোষের ছেলেরা কাকু ব'লে ডাকল। অনেক চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে চীনে লুডো খেলায় জিততে না পেরে, ছেলেদের বুদ্ধি-মত্তা প্রমাণ করে পরিতোষকে মোহিত করে ফেলল। পাঁচ টাকার সন্দেশ সিচুয়েশন অনেকটা সেভ করে দিয়েছে।

হোয়াইট রোজ, ব্ল্যাকপ্রিন্স? ওরা হট কেতারিট বটে কিন্তু বাজি মারবে কুকুর।

—ঠিক বলছিস?

—একেবারে চন্দ্র-সূর্যের মত ঠিক। টেবিলে বিরাট ঘুষি বসাল পরিতোষ।

মরিয়া হতে হবে। শেষ এবং মোক্ষম চেষ্টা। যদি লক্ষাভেদ না হয়! হতেই হবে। না হ'লে ছেড়ে দেবে এই উঞ্ছবৃত্তি। আর চাকরিই করবে না। মাথার মোট বয়ে কেরী করবে জিনিষ, রিক্সা টানবে। তবু আর কুঁই কুঁই নয়। গ-ড-ব-র। ট্যাক্সি নিল অনিমেষ। আলিপুর।

কুকুর ঘাই হয়েছে। কিনিসে এসে নেক দিয়ে মেরেছে ব্ল্যাক প্রিন্সকে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অল্প অল্প হাসছিল অনিমেষ। এবার কত্তিও ঘর, ভৈরোঁর কলকাত্তাকে বানিয়েছে মে-জুনের বাজিলিং। অব্যর্থ হাতে লক্ষ্যভেদ করেছে অনিমেষ। পাঁচ বছরের সার্ভিস রেকর্ড, বড় সাহেবের রেকমেণ্ডেশন কোনো কাজে লাগেনি। রাশি রাশি বিলেতী অভিজ্ঞতা, মিলের দোষের কারিন হয়ে অন্যান্যের কোয়ালিফিকেশন—দুরমাষ দোষের সব সৌভাগ্য উড়িয়ে দিয়ে কত্তিও অনিমেষকে পৌঁছে দিয়েছে উইনিং পোস্টে।

শতাব্দীর পটে বাঙালীর বীরত্ব

শ্রী সমাচি

ঐতিহাসিক টড্ তাঁর রাজস্থানের ইতিহাসে রাজপুত বীরত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন টড আজ পর্যন্ত বাঙালীর বীরত্বের কথা অর্থাৎ বাঙালী জাতির সামরিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নি। আচার্য যদুনাথ সরকারকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাঙালী জাতির শৌর্য-বীর্যের পরিচয় তো অনেক পাওয়া যায়। সেইসব উপাদান নিয়ে একখানি প্রামাণ্য সামরিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব কিনা? এর উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন বাঙালীর military valour নিয়ে একখানা বই লিখতে পারলে ভাল হয়। বাঙালীর কলঙ্ক-কালিমা দূর করতে এইরকম একখানি হিষ্ট্রি লিখব ঠিক করেছিলাম কিন্তু এক মুঘল যুগের ইতিহাস লিখতে সারা জীবন কেটে গেল। এখন যাটোর্ধ্বের অবসাদ ঠেলে দিয়ে এই রকম একটা কাজে হাত দেওয়া আমার জীবনে আর সম্ভব নয়। শিবন বা যমসেনের মতো কল্পনা কুশল ঐতিহাসিক প্রতিভা ভিন্ন এই জাতীয় একটি পুস্তক রচনা করা সাধারণ হিষ্টোরিয়ানদের পক্ষে কঠিন। আমি জানি বাংলাদেশ সুপ্রাচীন, কিন্তু এর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। একসময়ে বাংলার একাধিক বীর সন্তান বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য রচনা করেছিলেন, এককালে বাঙালী ঔপনিবেশিকরা দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বাংলার শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন—এসবই ঐতিহাসিক সত্য, কিংবদন্তী নয়। এর প্রামাণ্য উপাদানেরও অভাব নেই। কিন্তু সেসব data সংগ্রহ করে কে, সংগ্রথিত করে কে আর বিচার-বিশ্লেষণই বা করে কে? একাজ একার নয়, অনেকের মিলিত প্রয়াস ভিন্ন বাঙালীর মিলিটারি হিষ্ট্রি লেখা মোটেই সম্ভব নয়।"

যদুনাথের এই আক্ষেপবাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটিকে: "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।...আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। একার কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" সমরপটু বাঙালীর বীর মূর্তিকে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে তুলে ধরতে হলে শুধু ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত লিখলে চলবেনা, রচনা করতে হবে ঐতিহাসিক ইতিহাস (ক্রোচে যাকে বলেন "Historical history") যা আপন জাতির হৃদয়ে মুদ্রা অঙ্কিত করতে সক্ষম। সুখের বিষয় বর্তমানকালে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই জাতীয় কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তবে তাঁদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, শুধু বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস-রচনা প্রণালী অনুসরণ করলেই হবে না; কারণ বাঙালীর সামরিক প্রতিভার পরিচয়, তার জয় ও পরাজয়ের ইতিহাস। সে ইতিহাস পাওয়া যাবে তাম্রে, শিলায়, কাব্যে, ভাষায়, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। আরো মনে রাখতে হবে যে, বাংলার ইতিহাস ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ: বাঙালীর বাহুবলের ইতিহাসকে বাংলার চতুঃসীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলে বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখা চলেনা কিছুতেই।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করি।

এই শতাব্দী বাঙালীর এক গৌরবের যুগ। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড় তখন শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করেছিল। গৌড়রাজমালা পাঠে জানা যায় যে, সেযুগে বঙ্গবাহিনী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটির রাজপ্রাসাদের মূলে সমবেত হয়ে যে জয়নাদ করেছিল, তা সিংহ-গর্জনের ন্যায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে রাজন্য-সমাজকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। বলতে গেলে বাঙালীর পুরুষকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গৌড়াধিপ শশাঙ্ক; তাঁর সময়েই বাঙালীর বীরত্ব-গাথা ভদ্রের মুখে, অদ্রির কলকে উত্তর-ভারতে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর সময়েই বাঙালীর গৌড়ীয় মহাসাম্রাজ্য অনায়াসে পশ্চিমে স্থূণীনগরে এবং দক্ষিণ পুরুষোত্তম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সমগ্র পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ তাঁর রাজছত্রের ছায়াতলে পরিপুষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বাঙালীর বল সত্যিই হেলায় আপন বিজয়স্তম্ভ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। শশাঙ্ক ছিলেন সেই বঙ্গবীর, যিনি কর্ণ-সুবর্ণ থেকে জয়রথে রণযাত্রা করে সুদূর কান্যকুব্জের সিংহদ্বারে দারুণ আঘাত হেনেছিলেন।

প্রতি যুগেই বাঙালীর গৌরব আত্মপ্রকাশ করেছে জয়-পরাজয়ে। সেই একদা বিপুল পাল সাম্রাজ্যের কাহিনী, বাঙালীর দিগ্বিজয়ের কাহিনী। আজো তার স্মৃতি উত্তর-বঙ্গের বহু রাজসরীর ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, আজো তার কীর্তি বহু জলবিমুখ গভীর-গর্ভ জলাশয়ে, স্তূপের পর স্তূপ অধুনা ভগ্ন স্তূপে, কত পাষাণে গঠিত দেবদেবীর মূর্তি পরতলে, কত সুবৃহৎ স্তূপের ইটকে প্রস্তরে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে—শুধু কি গৌর-বীর্য, নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র গৌড়বঙ্গে গৌড়ের রীতি, গৌড়ের শিল্প, গৌড়ের ধর্ম, গৌড়ের কলা, গৌড়ের সাহিত্য, গৌড়ের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে, গৌড়সাম্রাজ্যকে ভারতবর্ষকে করেছিল গৌরবোজ্জ্বল। এই যুগ পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের যুগ-বাঙালীর নবজীবনলাভের যুগ। পাল-বংশের কাহিনী, বাঙালীর কাহিনী, কারণ পালরাজগণ বাঙালীই ছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য বাংলা থেকে মগধাভিমুখে ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাভ করেছিল।

পাল-যুগ বাঙালীর দিগ্বিজয়ের যুগ। যে বিরাট সেনাকটক ধর্মপালদেবের রাজ্য বিজয় ব্যাপারের উত্তর সাধক ছিল তা সর্বতোভাবেই বাঙালী সেনার কটক। প্রতিহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়রে প্রস্তর-ফলকের শিলালিপিতে ধর্মপালের সৈন্যগণ বাঙালী বলে পরিচিত এবং ধর্মপাল বঙ্গপতি বলে আখ্যাত। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইতিহাস তাই বাঙালীর বাহুবলের অপরূপ ইতিহাস—অধুনা দুর্বল বাঙালী তখন উত্তরাপথের সার্বভৌমত্ব লাভ করে ভারতে পূজিত হয়েছিলেন। ভাগলপুর শাসন, বাদলস্তম্ভ শাসনে উৎকীর্ণ শ্লোকমালা এর অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে। দেবপালকে বলা হয়েছে বাংলার আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডারের মতোই তিনি ছিলেন রাজ্যবিস্তারে লুব্ধ। পাহাড়পুরের স্তূপ খনন করে পাওয়া গিয়েছে বরেন্দ্রের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পরম্পরা। দেবপালের তাম্রশাসন পাঠে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, দেবপাল মালব থেকে কাঞ্চী পর্যন্ত জয় করে বঙ্গসাম্রাজ্যকে অল্পকাল কিছুদিনের জন্যও ভারতব্যাপী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় কোন বঙ্গ কবিই পালযুগের লোক-বিশ্রুত নৃপতিদের কারো কাহিনীই রচনার যোগ্য বলে মনে করেননি।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাল-সাম্রাজ্যের শাসনের উপর যে নবীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করে বিজয়নগরে রাজধানী স্থাপিত করেছিল, তা ইতিহাসে সেন-রাজবংশ নামে সুপরিচিত। গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে—এপর্যন্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সেন-

রাজা বাহুবলের রাজা বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুগের বিবিধ তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেন বীরাগ্রগণ্য বলে উল্লিখিত হয়েছেন এবং তাঁর গৌরবমণ্ডিত বিজয়পতাকা দক্ষিণ সাগরের বেলাভূমে জয় জয় নাদে প্রোথিত হয়েছিল। তাঁর সময়ে আবার চারদিক বাঙালীর বিজয়স্তম্ভ, স্থাপিত হয়ে বাঙালীর জয়গাথা ঘোষণা করেছিল। বাঙালীর দুর্ভাগ্য, ইতিহাসে অলীক কাহিনী রচনা করে সেই লক্ষ্মণ সেনের শিরেই ভীরুতার কলঙ্ককালি অর্পণ করেছে। 'নোদিয়া বিজয়' উপন্যাস রচয়িতা মীরকাশিম পর্যন্ত এই পরাক্রান্ত নৃপতিকে কাপুরুষ বলে ঘোষণা করতে সাহস করেননি।

তারপর পাঠানদিগের শাসন-সময় থেকে কোম্পানির আমল পর্যন্ত বাংলার যোদ্ধৃপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে, এক ক্ষেত্রেই সহকর্মীরূপে রণক্ষেত্রে যশোলাভ করে বাঙালীর বীরকীর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছিল। এযুগের সেনা মুসলমানের সেনা ইতিহাসে 'বঙ্গ-সৈন্য' আখ্যায় অভিহিত। পাঠান বা মোগল বঙ্গপতিদের অধীনে বহু সহস্র হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য থাকত। সব মুসলমানই যে উত্তরাঞ্চল থেকে আনীত হতো তা নয়—সব হিন্দুই যে রাজপুত বা শিখ ছিল তা নয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য যে পাঠান ও মোগলদের বঙ্গসৈন্যের কলেবর পরিপুষ্ট করত তা এলিয়টের 'হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া' বইতে (৪র্থ খণ্ড) স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এ যুগের বাঙালী হিন্দুর রণপাণ্ডিত্যের আলোচনা করতে হলে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, তারা যখন মুসলমানের সঙ্গে প্রায় পরিচয়লাভ করেছিল তখন তাদের 'মুসমর' প্রায় অতীত হয়েছিল। কিন্তু তখনো গৌড়-বঙ্গেই অল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার পাঠান-সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করবার শক্তি হিন্দুযোধের ছিল। আরো মনে রাখতে হবে যে তিনশো বছর চেষ্টা করেও দিগ্বিজয়ী আরমাণ ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারেনি। পাঠান দুশো বছরে ভারতবিশ্যাত হিন্দুসাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল—কিন্তু তিনশো বছরেও বাংলা জয় করতে সমর্থ হয়নি, তদ্রিক্ত তিনশো বছরেও মুসলমানের অধীন হয়নি।

এই প্রসঙ্গ একটি বিষয় স্মর্তব্য। বাঙালীর ভাট ও চারণ কোন দিন যে বাঙালীর বাহুবলের জয়গান গেয়েছিল তার চিহ্ন নেই। কোথাও নিবিড় বনের মধ্যে একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ কোন নিভৃত পল্লীতে প্রচলিত বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ। চাষের মাঠে জমি কর্ষণের সময় চাষীর হলের শীর্ষভাগে সমুত্থিত ও অনাবশ্যক জ্ঞানে দূরে নিক্ষিপ্ত একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর-ফলক, অন্ধভক্তির মূল-চন্দনে অঙ্কিত কোন জীর্ণ গ্রন্থ বা তাম্রপট্ট এখন বাঙালীর ভাষাহীন ভাট। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি : "হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই। আপনার গুণগান আপনি না গাইলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে সেই তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপরজাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমানদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রোমক লিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয় গ্রীক-লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই। কেননা, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।" তাই হিন্দুকেই হিন্দুর কথা বলতে হবে, লিখতে হবে। বাঙালী হিন্দুর সামরিক প্রতিভার ইতিহাস বাঙালী হিন্দু লেখকদেরই রচনা করতে হবে আর সে ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে বিভিন্ন যুগের তাম্রলিপি থেকে যা আজো মুখর হয়ে বলছে :

রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী-নয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ যুদ্ধ বিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলব্ধ করপাতৃতবিস্তরণা-গঙ্গাপি নূনযমুনা ঘুনাতু ॥

দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ এই শ্লোকটিতে প্রথম নরসিংহদেবের অদ্ভুত বীরত্বের কথা এবং রাঢ় ও বরেন্দ্রের পাঠানদের পরাজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন রাজকবি।

পাঠানযুগের আর একজন বাঙালী বীর কালাচাঁদ ভাদুড়ি, পরবর্তীকালে যিনি কালাপাহাড় নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। হিন্দুসমাজের অনুদার নীতি তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল বিপর্যয়—বৈদ্য কালাচাঁদ মহম্মদ কাদ্‌লি নাম গ্রহণ করে হিন্দুদ্বেষীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সত্য। তথাপি ইতিহাসের ন্যায়বিচারে তাঁর শৌর্যকাহিনী বাঙালীর শৌর্যকাহিনী। মুকুন্দদেব যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান সোলেমান। তিনিই সেনাপতি কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন সেই বীরশ্রেষ্ঠের অসির ফলকে বঙ্গসৈন্যের বিজয় কীর্তি উড়িষ্যায় ও রাঢ়ে, কামরূপে ও কোচবিহারে উৎকীর্ণ হয়েছিল। পাঠানযুগে অর্ণবপোত তৈরির কথা সিজার ফ্রেডারিক নামক এক ভিনিস দেশীয় বণিক তাঁর বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের 'চিত্তাইবাড়ি' নৌ নির্মাণের জন্য সুবিখ্যাত ছিল। বাঙালীর সামরিক প্রতিভা এই যুগে নৌসাধনের ভিতর দিয়ে বিস্ময়কর ভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছিল—নৌ শিল্পের অভ্রান্ত পরিচয় আছে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে।

মোগলযুগে বাঙালী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের যে হিসাব আইন-ই-আকবরিতে দেওয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা বাঙালীর শৌর্যের পরিচায়ক। সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করে ভারতবর্ষকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক বিভাগ সেকালে 'সরকার' নামে পরিচিত ছিল। সম্রাটের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক সরকার থেকে সেনা সংগৃহীত হবার রীতি ছিল। বাঙালী যখন জলে বাংলা থেকে

নিজের দেশকে চিনুন

কালীঘাটের পট বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিল্পকলা। ঐতিহ্যসন্ধানের প্রেরণায় একালের বহু দিকপাল শিল্পী কালীঘাটের পটুয়াদের কাজ আয়ত্ত করতে চেয়েছেন শ্রদ্ধাশীল অনুরাগে।
আমাদের শিল্প-ঐতিহ্যের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবাংলার বহুস্থানে: শান্তিনিকেতন, কাঁথার ফ্রেস্কোয়; দার্জিলিং, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে; গৌড়, আদিনা, বর্ধমানের মসজিদে; বিষ্ণুপুর, ওন্ডিপাড়া, ইলামবাজার, ঐটপুরের মন্দির-স্থাপত্যে ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে॥

পশ্চিমবঙ্গ পার্বত্যাঞ্চল ভ্রমণের সমস্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য সুবিধে

শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, কালিম্পং, দুর্গাপুর, পুরী, কোণার্ক ও ভুবনেশ্বরের স্যুভেনির ও ইকনমি ট্যুরিস্ট লজে বুকিং-এর জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬/২ ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট কলিকাতা-১
ফোন ২৩-৮২৭১ গ্রাম ট্যুরিস্টোরাম

কলকাতা সিনেমাটিক একটি ট্যুরিস্ট গাইড তৈরী হচ্ছে।

সেনা-সংগ্রহ করার সম্ভাবনা ছিলনা। আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায় যে, বাংলায় তখন এমন সরকারও ছিল। যেখান থেকে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পদাতিক সংগৃহীত হতে পারত! এমন সরকারও ছিল, যেখানে সম্রাট দু'হাজার অশ্বারোহী সেনা পেতেন! আইন-ই-আকবরিতে সন্নিবেশিত তালিকা থেকে জানা যায় যে, বাংলার প্রায় সকল স্থান থেকেই সৈন্য সংগৃহীত হতো। বাঙালী যোদ্ধজাতি না থাকলে এরূপ ঘটতে পারেনা। বাংলার ইতিহাস পূর্বাপর এই সত্যটাই মেলিয়ে ধরে যে, বাংলার কোন কালে যোদ্ধার অভাব ছিলনা।

বাংলার বারভূঁইয়ার কাহিনী—বাঙালীর শৌর্য বীর্য ও গৌরবের কাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের বারভূঁইগণ বারভূঁইয়ার ন্যায় বিরাজ করতেন। পাল ও সেন রাজাদের পরে—দীর্ঘকাল পাঠান শাসনের অধীনে থেকেও যে বাঙালির শৌর্য বিলুপ্ত হয়নি—ভৌমিকদের কাহিনীই তার অন্যতম প্রমাণ। যশোহরে প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্প রায়, সাঁতৈলে রামকৃষ্ণ, ভূষণায় মুকুন্দ রায় প্রভৃতি যখন বীরদর্পে রাজ্যশাসন করতেন; যখন বিক্রমপুরে কেদার রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক্য, চন্দ্রপ্রতাপে ঈশাখাঁ, খিজিরপুরে ঈশাখাঁ, ভাওয়ালে কমল গাজি রাজত্ব করতেন তখন বাংলার প্রজা বুঝবার সুযোগ পায়নি যে, গৌড়ে বা টাণ্ডায়, রাজমহলে বা ঢাকায় একজন গৌড়পতি ছিলেন—দিল্লীতে বা আগ্রায় একজন সম্রাট ছিলেন! বারভূঁয়াদের ইতিহাস ইহাই প্রমাণিত করে যে, ভৌমিকগণ বীর বাঙালী সেনার উপর নির্ভর করেই বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিলেন। সম্রাট আকবরের সময়ে যে স্বাধীনতার উদ্ভব হয়েছিল, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সুদীর্ঘকালের যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঙালীর সামরিক শক্তিরই পরিচয় দেয়—আর পরিচয় দেয় তার স্বাধীনতা লিপ্সার। এই দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরকাল বাংলার মুসলমান ও হিন্দু ভৌমিকগণ মোগলের সঙ্গে, মোগলশ্রেষ্ঠ আকবরের সেনাপতিদের সঙ্গে সমানে লড়েছে। কখনো হেরেছে, কখনও জিতে মোগলসেনাপতিদের বিহার পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু কোনদিনই বশ্যতা স্বীকার করেনি। স্যর যদুনাথ সরকার তাই লিখেছেন: "আকবরের সমগ্র রাজত্বকালটায় আকবর কখনো বাংলাদেশে স্থায়ী অধিকার লাভ করতে পারেন নাই।" আর প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আলাউদ্দীন ইসপাহানী সিতার খাঁ-র হাতে লেখা পুঁথি বহার-স্তান্-ই-খাইরী অবলম্বন করে যদুনাথ লিখছেন: "প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধপোতশ্রেণীতে পূর্ণ প্রায় ১০০ নৌকা, বিশহাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল।" বলী প্রতাপাদিত্যের সেনা বাঙালীই ছিল।

প্রতাপাদিত্যের রণতরী তখন সাগরদ্বীপে, চট্টগ্রামে, খুলনা ও চকশ্রীতে বিপুল শক্তির পরিচয় প্রদান করেছিল: তাঁর কুশলীর কর্মশালায় নির্মিত কামান ও বন্দুক যে অনল বর্ষণ করত, তা দিল্লীর রাজসিংহাসনকেও স্পর্শ করেছিল!! আর আজ দিল্লীর বড়বাজারে ছুমুঠো চালের জন্য বাঙালীকে মাথা খুঁটতে হয়! সেই চিত্র আর এই চিত্রে কত তফাৎ। বাঙালীর শৌর্য বুঝি চিরকালের মত নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে। অথচ বাঙালী সৈন্য ও বাঙালী সেনাপতিদের সুনিপুণ রণ কৌশলে বাংলার প্রতাপকে দিল্লীর নিকটেও দুঃসহ করে তুলেছিল। আজো মুকুন্দপুর প্রভৃতি বহুদুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রতাপের ও বাঙালীর বাহুবলের পরিচয় দিয়ে থাকে। নবাবী আমলেও বাঙালীর মধ্যে সামরিক শক্তির অভাব ছিলনা। বাঙালী সৈন্যের সাহায্যেই নবাব আলিবর্দি বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে নবাব সিরাজের যে ৫০ হাজার মিত্র পদাতিক ও ১৮ হাজার শিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও সে

কথা স্বীকার করেছেন। বাঙালীরা অবাধে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন না করলে সিরাজের পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব হতোনা। কোম্পানীর আমলেও বাঙালীর সামরিক শক্তি বিলুপ্ত হয়নি। লর্ড ক্লাইভ বিলক্ষণ জানতেন যে, বাঙালী অপরিণাম ফলী হতে পারে, কিন্তু যখনতখন পণ করে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাদের পক্ষে খুবই সম্ভব—এবং সেইজন্যই তিনি নবাব মীরকাসেমের সৈন্যদের disband করে দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে প্রায় বিশযুদ্ধকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বাঙালী রেজিমেন্ট বলে আর কিছু ছিলনা। শাসক ইংরেজজাতি বাঙালীকে সৈন্যবিভাগ থেকে দূরেই রেখেছিল। বাঙালীর যে একসময়ে সামরিক প্রতিভা ছিল, সেই ইতিহাসটা ভুলিয়ে দেওয়ার কম চেষ্টা হয়নি ইংরেজ শাসনের যুগে। বাঙালীর সেই প্রতিভার উত্থান আবার দেখা গিয়েছিল ১৯১৫ সনে য়ুরোপীয় মহাসমরে বাঙালী রেজিমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

উপসংহারে আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, বাঙালী জাতির অতীত তিমিরাচ্ছন্ন ছিলনা ;—উহা শৌর্যে, বীর্যে দীপ্ত, জ্ঞানে গরিমায় উজ্জ্বল, সভ্যতা, ধর্ম ও ললিত শিল্পকলার বিকাশে মহৎ ছিল। আমরা জানি অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায়না : অথবা অতীতের পুনরভ্যুত্থানও সম্ভব নয়, কিন্তু ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য সেই অতীতকে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। অনেকে বলে থাকেন যে, অতীতাশ্রয়ী মন নিয়ে বর্তমান বা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য একটা ভিত্তি বা অবলম্বন দরকার। বাঙালীর শৌর্যবীর্যের অতীত ইতিহাসটা হলো সেই ভিত্তি বা অবলম্বন। শুধু সন তারিখের তালিকায় ভাঙাগড়া ও হার-জিতের বিচার কণ্টকিত বাংলার ইতিহাস বাঙালীজাতি গঠন করতে পারবে বলে বোধ হয়না। ঐতিহাসিক যেদিন বাঙালীর মর্ম স্পর্শ করতে পারবেন, সেইদিন সত্যকার ইতিহাস বিরচিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন : "যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সবাঙ্গ সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ বাসনা করেনা।"

বিস্তীর্ণ বাংলার নানাস্থানে অনুসন্ধান করলে আজো কত রাজনগরীর ধ্বংসাবশেষ, কত দুর্গ-পরিখার বিস্তৃত খাত, কত ভগ্ন প্রাকারের জীর্ণস্তূপ ও বিলুপ্ত বৃক্ষের পাদপীঠ নয়নগোচর হয়ে থাকে। এসবের ইতিহাস, বাঙালীর শৌর্য বীর্যের ইতিহাস। এসব সংগ্রহ করতে হলে অধুনা প্রবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়। কালনির্দেশের উপায় নেই, বংশ বিবৃতির উপায় নেই, সমসাময়িক রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যেসব স্মৃতিচিহ্নের সম্বন্ধ সংস্থাপন দুরূহ বা অসম্ভব। কিন্তু বাঙালীর সামরিক ইতিহাস রচনা করতে হলে, তার রণ কুশলতার কাহিনী সংগ্রহিত করতে হলে এইসব বীর স্মৃতিকে অবলম্বন করতেই হবে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান তাদের ইতিহাস লেখেনি—দিল্লী আগ্রার মুসলমান ঐতিহাসিক মোগল পাঠানের বিজয় বার্তা ঘোষণা করবার জন্য বাঙালীর যে কথাটি যেভাবে লিখবার প্রয়োজন মনে করেছেন, অনেকজনে তাই-ই লিখেছেন মাত্র। বাঙালীর বীর-স্মৃতি রচনা করবার জন্য বাঙালী যদি অগ্রসর না হয়, কে আর হবে? প্রাণের বল এবং দেহের বলকে এক করে বাঙালী আবার তার কীর্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুক—ইহাই আমাদের বলবার কথা।

———

চোখে যার চোখ পড়ে

পূর্ণেন্দু পাইক
– শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গল্পভারতী শারদীয় ১৩৭৫

G.E.C.

পূজার অভিনন্দন

Osram

ইলেকট্রিক বাল্ব ও ফ্লুরেসেণ্ট টিউব

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

KALPANA/GEC/48

চোখে যার চোখ পড়ে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবীনের বাড়ী

[জমিদারের বাড়ী যেমন হয়ে থাকে, তেমনি।
বড় জমিদার।]

(সিঁড়ি দিয়ে আগে-আগে নামছে ছেলে। ছেলের হাতে একটা বন্দুক। পেছনে নামছে তার মা।)

মা। নবীন! কথাটার জবাব দিয়ে যা।

নবীন। কি জবাব দেবো মা? বিয়ে করতে যে বলছো, জমিদারী চলে গেল, খাব কি?

মা। তোর বাবা তোর খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

নবীন। খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, এইবার বিয়ের ভাবনা ভাব্—না কি বলছ তুমি?

মা। না রে না, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই শুধু একবার মুখ ফুটে বল্ বিয়ে করবো, তারপর যা করবার আমি করছি।

নবীন। তুমি তো করবে সব। কোত্থেকে একটা অজানা অচেনা বুদ্ধু মেয়েকে ধরে এনে বলবে, নে একে বিয়ে কর্।

মা। (হেসে হেসে) কি বললি? অজানা অচেনা মেয়ে? বিয়ে ত' অজানা মেয়েকেই করে রে?

নবীন। হ্যাঁ, হ্যাঁ করতো তোমাদের আমলে। যাকে চিনি না জানি না—তার সঙ্গে আমার মনের মিল হবে কি না তার ঠিক নেই; তোমাদের আমলে যেমন হ'তো—

মা। আমাদের আমল কি বদলে গেল নাকি?

নবীন। কবে বদলে গেছে। তুমি এই পাড়াগাঁয়ে রয়েছ মা, তাই বুঝতে পারনি। আর দু-এক বছর যাক্ তখন বুঝতে পারবে।

মা। যাক্ আর বুঝে কাজ নেই। যে-মেয়েটিকে বিয়ে করবি, তুই তাকে দেখতে চাস, এই তো?

নবীন। হ্যাঁ মা, যার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে। বিয়ের আগে তাকে একবার চোখেও দেখব না?

মা। বেশ, তাহলে সে ব্যবস্থা আমি করছি। তুই এখন বন্দুক নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তাই বল্।

নবীন। তোমার জমিদারী ঝিলিমিলি-মদনপুরে যাচ্ছি।

মা। এখন আর জমিদারী বলিস না। যাক্, যাচ্ছিস যখন, শোন্, সেখানে আমাদের মদন-মোহনের মন্দির আছে। সেই মন্দিরের পূজোরী ভৈরব আচার্যের খবরটা নিয়ে আসিস্। মানুষটি বড় ভাল। তোর বাবার বন্ধু ছিল।

নবীন। ও-সব পারব না।

মা। তবে যাচ্ছিস কি জন্যে?

নবীন। জমিদারী গেল, অথচ কাছারীটা দখল করে বসে আছে নতীশ-পরমন্তা। ওকে বলে দিয়ে আসি—কাছারীটা ছেড়ে দিক। ওইখানে আমি ডাক্তারী প্র্যাক্‌টিস্ করব।

মা। ডাক্তারী পাশ করলি কি মদনপুরে বসবার জন্যে?

নবীন। হ্যাঁ মা, ভেবে দেখলাম, এখানে তবু একজন ডাক্তার আছে। মদনপুরের আশ-পাশে কোথাও

একজন ভাল ডাক্তার নেই। ওইখানেই বসব। আমি চলি মা। (চলে গেল)

মা। হরি! [নেপথ্যে—যাই মা] ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দে।

ম্যানেজার

(বিনোদবাবু) :.....

বিনোদবাবু। এই তো মা, আমি এইখানেই আছি।

মা। একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। লিখে নিন।

বিনোদ। বলুন। আচ্ছা দাঁড়ান, কাগজ-কলম নিয়ে আসি। (কাছেই কাগজ-কলম আনতে গেলেন) হঠাৎ—টেলিগ্রাম? কোথায়—বলুন কি লিখতে হবে।

মা। দার্জিলিং-এ আমার এক বন্ধু আছে—ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তার একটি মেয়ে আছে, দেখতে বেশ সুন্দরী। নবীন এতদিন পরে বিয়ে করতে রাজী হলো তো বলে কি না দেখে শুনে বিয়ে করবে। তাই একটা টেলিগ্রাম করে দিন আমার সেই বন্ধুকে। মেয়েকে নিয়ে সে যেন এখানে চলে আসে, আর নিজে আসতে যদি না পারে তো মেয়েকে যেন পাঠিয়ে দেয়। এটটি ভাল করে গুছিয়ে লিখে দিন। বিয়ে-টিয়ের কথা কিন্তু লিখবেন না। লিখবেন—বিশেষ দরকার।

বিনোদ। ঠিকানা বলুন।

মা। মায়ের নাম এস্, চক্রবর্তী বি. এ. বি. টি—ভাল নামটি—আচ্ছা, দাঁড়ান দাঁড়ান ভুলে যাচ্ছি। সেই তো সেবছর দার্জিলিং গিয়ে পরিচয় হলো। হাঁ হাঁ মনে পড়েছে—সুধন্যা চক্রবর্তী। মেয়ের নাম ললিতা। সাঁইত্রিশ নম্বর কার্ট রোড। খুব বড় একটা হোটেল আছে, তার পাশের বাড়ীতেই থাকে।

বিনোদ। (লিখতে লিখতে) ঠিক আছে। চিঠি লিখলেও তো হতো। দার্জিলিং-এ চিঠি তো একদিনেই যায়।

মা। না। টেলিগ্রাম পেলে চট্ করে আসবে। হাঁ হাঁ, আপনি বরং সেই প্রিপেড্ না কি বলে তাই করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে তার দেবে—কখন আসবে জানাবে। আমি স্টেশনে গাড়ী রাখব।

বিনোদ। তাই দিচ্ছি।

মা। আমি ভেবেছিলাম ভাল বংশ থেকে ছোট্ট একটি সুন্দরী মেয়েকে আনবো বৌ করে। কিন্তু আমি ভাবলে কি হবে, ছেলে তো মুখের ওপরেই বলে দিলে—তোমাদের যুগ বদলে গেছে মা। ভাল। আসুক—লেখাপড়া জানা আজকালকার মেয়ে—(চলে যাচ্ছিলেন)

বিনোদ। মা!

মা। (ফিরে দাঁড়ালেন) কিছু বলছেন?

বিনোদ। বলতে কেমন যেন আটকাচ্ছে। তবু বলি।

মা। বুঝেছি। জমিদারী চলে গেল, আপনার চাকরির কথা বলছেন তো?

বিনোদ। না মা তা বলিনি। জমিদারী যেদিন গেছে আমার চাকরিও সেইদিন চলে গেছে আমি জানি। কিন্তু এখনও অনেক ঝামেলা মা, সব কিছু গোছগাছ করে দিয়েই আমি চলে যাব। আমি কিন্তু বলছি অন্য কথা। একটু সাহস যেন তো বলি।

মা। হাঁ হাঁ বলুন। অত সঙ্কোচ করছেন কেন?

বিনোদ। ম্যানেজারই হই আর যাই হই, আমি আপনার কর্মচারী। কথাটা বলা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন বলি শুনুন। আমার একটি মেয়ে আছে আপনি জানেন। আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে চাঁপা।

মা। জানি জানি সবই জানি। তার মা মারা যাবার পর তাকে কলকাতার বোর্ডিং-এ রেখেছেন—

বিনোদ। হাঁ মা, আই-এ পাশ করে বি.এ. পড়ছে। আপনি সবই জানেন, শুধু তাকে কোনদিন দেখেননি।

মা। বুঝেছি বুঝেছি, আপনি কি বলতে চান আমি বুঝেছি। তা বেশ তো, তাকেও আসতে বলুন।

নবীন তাকেও দেখুক। যাকে তার পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করুক।

বিনোদ। আমার মেয়েও ঠিক নবীনের মতই কৌক ধরে বসেছিল বিয়ে করবে না। কাজেই তার বিয়ের কোনও চেষ্টাও আমি করিনি। তবে এখন যখন শুনছি নবীন বলেছে মেয়ে পছন্দ হলে সে বিয়ে করবে, তখন ভাবছি—আমিই বা এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? আমার মেয়ে চাঁপা দেখতে খারাপ নয় মা।

মা। তাহ'লে দু'জনকে দুখানা টেলিগ্রাম করে দিন:

বিনোদ। না মা, আমার মেয়েকে টেলিগ্রাম করলে সে আসবে না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে চিঠি লিখতে হবে।

মা। তাই লিখুন। দু'জনেই আসুক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঝিনিঝিনি-মদনপুরের মদনগোপালের মন্দির।]

(স্টেশন থেকে ট্রেণ ছাড়বার আওয়াজ শোনা গেল। একজন ছোকরা একটা বাইক নিয়ে কসরৎ করছে। একটি মেয়ে টিউবওয়েলে জল ধরছে। অবিবাহিতা তরুণী। পরণে লাল চওড়া পাড় শাড়ী। মাথার চুল খোলা। টিউবওয়েল থেকে জল ধরে বালতিটি নিয়ে এগিয়ে আসছিল মন্দিরের দিকে। বাইক নিয়ে ছোকরাটা তার পথ আগলাচ্ছে ক্রমাগত।)

মেয়েটি। আঃ কী হচ্ছে ভণ্ড! রাস্তাটা ছাড়ো না!

ভণ্ড। দাঁড়াও না একটু। দেখছো না আমি কিরকম প্র্যাক্‌টিস করছি!

মেয়েটি। তুমি দেখছো না—আমি এক বালতি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

ভণ্ড। কোথায় যাবে?

মেয়েটি। জানো না—আমি কোথায় যাই? মদন-গোপালের মন্দিরে।

ভণ্ড। বালতিটা দাও না আমার হাতে। পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটি। হাতে নয়, এই বালতির জল তোমার মাথায় ঢেলে দেবো।

ভণ্ড। দাও না।

মেয়েটি। খুব বাড় বেড়েছ তুমি!

ভণ্ড। তুমিও কম বাড়োনি মালা। এইটুকু দেখেছিলাম, অনেক বড় হয়েছ।

মালা। খুব হয়েছে। আর রসিকতা করতে হবে না। পথ ছাড়ো বলছি

ভণ্ড। যদি না ছাড়ি!

মালা। এই ছাখো তাহ'লে—(বালতিটা মাটিতে নামিয়ে কোমরের কাপড়টা ভাল করে জড়াচ্ছে, এমন সময় মন্দিরের পেছনে হুম্ করে একটা আচমকা বন্দুকের আওয়াজ হতেই ভণ্ড বাইক-সমেত উল্‌টে পড়ে গেল। আর সেই অবসরে হাসতে হাসতে বালতিটা তুলে নিয়ে মালা চলে গেল মন্দিরের ভেতর।)

ভণ্ড। (বাইক ধরে উঠতে উঠতে) বন্দুক চালাবার আর জায়গা পেলে না! ছট্ করে অমনি চালিয়ে দিলেই হলো! উজ্‌বুক্ কোথাকার! (আবার বন্দুকের আওয়াজ। এবার খুব কাছেই) ইস্!

(কটপট করে একটা পাখী পড়লো মন্দিরের চত্বরে। মন্দিরের পেছন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো নবীন। হাতে বন্দুক। পায়ে জুতো। সোজা সে মন্দিরে উঠে পাখীটাকে বোধকরি নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মালা। এসেই সে দুহাত বাড়িয়ে পাখীটিকে তুলে নিয়ে নবীনের দিকে তাকিয়েই দেখে—সে জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে উঠেছে। একে মন্দিরে পাখী মেরেছে, তার ওপর জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে উঠেছে।)

মালা। ইস্! পাখী মারবার আর জায়গা পেলেন না? ঠাকুরের এই মন্দিরে এসে পাখীটাকে গুলি করলেন?

নবীন। না, মানে আমি ঠিক বেটাকে লক্ষ্য করে বন্দুক

চালিয়েছিলাম সেটা মরেনি, উড়ে পালিয়েছে। আর এটা বোধহয় ভয়েই পড়ে গেল। সেটা ছিল ঘুঘু, আর এটা পায়রা।

মালা। নবীনের জুতোর দিকে তাকিয়ে। জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে উঠেছেন?

নবীন। (নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে) ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মালা। (পাখীটার দিকে তাকিয়ে) ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে দিই। চল্। (মন্দিরে ঢুকে পড়লো)

(নবীন মেয়ে এলো মন্দির থেকে। জগু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এইবার এগিয়ে এসে—)

জগু। কে হে তুমি লাটসাহেব, বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করতে এসেছ আমাদের গাঁয়ে?

নবীন। বকো না বকো না। ওই একটা মেয়ের ধমকানি খেলাম আবার তুমিও যদি ধমকাও! খুব অন্যায় করেছি বাবা তোমাদের গ্রামে এসে।

জগু। হ্যাঁ এখান থেকে চলে যাও। পাখী শিকার-টিকার সব বাজে। একটা সুন্দরী মেয়ে দেখেছ আর অমনি দুম্ করে দিলে আওয়াজ করে। তোমার চালাকি আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছ?

নবীন। ভাখো দেখি, তাই ভাবতে পারি? আমার চালাকি তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে? কিন্তু কি করবো বল, বাইক্ থাকলে না হয় মেয়ের পথ আগলে দাঁড়াতাম।

জগু। তার মানে?

নবীন। মানে আর এমন কিছু নয়। মানে—এইদিকে আসতে আসতে আমি সব দেখেছি।

জগু। দেখেছ? আল্‌তাব্‌ড়ি অমনি বলে দিলেই হলো —আমি দেখেছি। তোমার মত আমি টৈরে নই। আচ্ছা বেশ, তুমি হিন্দু তো?

নবীন। কেন আবার ও-সব কথা কেন? বিয়ের ক্যান্‌ডিডেট্ বলে মনে হচ্ছে নাকি?

জগু। অ্যাঁ—বিয়ে! জামাইবাবু এলেন আর-কি! বলি হিন্দু হয়ে জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে উঠেছিলে কেন?

নবীন। এই মরেছে! আবার সেই কথা! এর জন্যে একবার তো উনি আমাকে তিরস্কার (মন্দিরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, পাখীটি হাতে নিয়ে মালা বেরিয়ে এলো। উড়িয়ে দিলে পাখীটিকে। উড়িয়ে দিয়েই এদের দিকে তাকিয়ে—)

মালা। এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কোথায় যাবেন আপনি?

নবীন। জমিদারের একটা কাছারী-বাড়ী আছে—এই ঝিলিমিলি-মহলপুরে, সেই কাছারীতে যাব।

জগু। কাছারী-বাড়ী একটা আছে বটে, কিন্তু জমিদারী-টমিদারী উঠে গেছে তা জানো তো?

নবীন। তাই তো শুনেছি।

মালা। এই দিক দিয়ে সোজা চলে যান—যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখিয়ে দেবে।

জগু। কিন্তু জমিদারের বাড়ী এ-গ্রামে নয়। জমিদার মরে গেছে। তার একটা বখাটে ছেলে আছে শুনেছি।

নবীন। সেই বখাটে ছেলেটাই—আমি। (নিজেকে দেখিয়ে)

(বলেই নবীন চলে গেল। জগুর চক্ষু ছানাবড়া!)

জগু। এই মালা, শুনলে? শুনলে তো ও কে! আমাদের জমিদারের ছেলে।

মালা। তাহ'লে আমি ধেই ধেই করে নাচি!

[নবীনের হঠাৎ মনে পড়লো নজরুল ইসলামের একটা গান। তারই একটা কলি গাইতে গাইতে সে চলে গেল কাছারী-বাড়ীর দিকে—]

'চোখের বালির জ্বালা জানে রে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ঘুম নাই রে
তার ঘুম নাই!'

তৃতীয় দৃশ্য

[কাছারী-বাড়ীর ভেতরের উঠোন। তার দিকে গোমস্তার থাকবার কোয়াটার। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দেওয়া সদর। উঠোনে গাছ পালা। বাঁদিকে কাছারীর সদর। সদর পেরিয়েই টালি-দেওয়া ঢাকা-বারান্দার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে একটা ইজি-চেয়ার। তার পাশে একটা থাম। থামের পাশে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। উঠোনের একটা গাছের তলায় একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে। সেইখানে একটা ছেঁড়া চট্ বিছিয়ে বুড়োমত একটি লোক নিবিকার চিত্তে হুঁকো টানছে আর ছাগলটাকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, কখনও বা তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে।]

(সতীশ গোমস্তা তার কোয়াটার থেকে বেরিয়ে এলো।—ভেতরে একটা গোলমাল চলছিল। ছেলের বৌয়া, মেয়েদের কথাবার্ত্তা)

সতীশ। খবরদার বলছি যখন-তখন ওরকম করে তেড়ে যাবতে এসো না—আমার বুকের ভেতরটা ধড়্ ধড়্ করে।

(সতীশের স্ত্রী শান্তিলতা বেরিয়ে এলো তার পিছু-পিছু। রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি।)

শান্তি। তোমাকেও বলে রাখছি তোমার ছেলের ওই বৌএর দিক টেনে কথা বলেছ কি তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

সতীশ। হ্যাঁ চেঁচাও, আচ্ছা করে চেঁচাও। এত বড় মেয়ে জামাই, ছেলে বৌ,—আমার পেছনে লাগতে লজ্জা করে না? শান্তি! শান্তিলতা। এ নামটা কে রেখেছিল তোমার? শান্তির একেবারে সেই কি বলে না সেই—ইয়ে!

[পেছন থেকে দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে মেয়ে ডাকলে—মা!]

শান্তি। তুই যা! তোর বাপের মুখটা আগে চিবিয়ে খাই, তার পরে যাচ্ছি।

সতীশ। হ্যাঁ তা আবার খাবে না? পতিব্রতা স্ত্রী যে!

শান্তি। তোমার মত পতি—পরের সর্ব্বনাশ করে করে সংসার চালাও। তোমার পায়ে ঠাঁই দাও?

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ)

সতীশ। এই মরেছে! (স্ত্রীকে হাতজোড় করে) হাতজোড় করছি বাবা, তুমি যাও।

(আবার কড়া নাড়ার শব্দ)

কে?

[বাইরে থেকে—দরজা খোলো!]

সতীশ। পারবো না খুলতে! লাট-সাহেব বলে কিনা দরজা খোলো! (দোরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে দুটো মন্ত্রণা হচ্ছে, আর এই সময়টিতে—(দরজা খুলেই জিব বের করে দু'হাত পিছিয়ে এসে) আরে সর্ব্বনাশ, আপনি!

(বন্ধুক হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো নবীন। হাত বাড়িয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল সতীশ। নবীন একটু পিছিয়ে গিয়ে)

নবীন। আঃ ছি ছি ও কি করছো সতীশ? আমি তোমার চেয়ে অনেকে ছোট।

সতীশ। তাতে কি হয়েছে? আপনি আমার মনিব।

নবীন। মনিবের বুঝি বড় ছোট নেই?

সতীশ। আজ্ঞে না, বড় ছোট নেই। (একটা ইজি চেয়ার ছিল বারান্দায়, তাইতেই বসলো নবীন। তাই না দেখে—) ওখানে কেন? ওপরে আপনার ঘরে গিয়েই বসলে হতো না?

নবীন। না, আমি এক্ষুণি চলে যাব।

সতীশ। (সতীশের স্ত্রী তখন দাঁড়িয়েছিল কোয়াটারের দোরের কাছে। পেছন দিকে হাত নেড়ে সতীশ কয়েকবার তাকে ইসারা করেছিল চলে যাবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই সে যাচ্ছে না দেখে) আঃ, তুমি আবার ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? আমাদের জমিদার—যিনি গত হয়েছেন তাঁরই

ছেলে—নবীনবাবু। যাও, চট্ করে এক গ্লাস সর্বৎ করে দাও।

নবীন। না না, সর্বৎ চাই না।

সতীশ। তাই আবার হয় নাকি? (শান্তিলতার দিকে আসতে আসতে) বাগানের গাছ থেকে একটা লেবু এনে—সেই যে সেই কাঁচের গেলাসে চিনি দিয়ে বেশ ভাল করে—চাপাগলায় তোমার পায়ে পড়ি, মাইরি বলছি আর কিছু বলবো না—যাও।

শান্তি। (জোরে জোরে ঝাঁঝানি দিয়ে) যাচ্ছি। (ভেতরে ঢুকে দোরটা বন্ধ করে দিলে)

সতীশ। (হাত কাচতে কাচতে নবীনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) বাবাঃ! যেন বড় বইয়ে দিলে! মান-সম্মান আর রইলো। (কাছে এসে) ওই—ওই আমার ইস্ত্রী।

নবীন। ইস্ত্রি কি বলছো? স্ত্রী বল।

সতীশ। না না ইস্ত্রি—ঠিক বলেছেন—ইস্ত্রি কথাটাই ঠিক। হাত দেওয়া যায় না এত গরম। তার ওপর আগা পাস্তালা পালিশ করে দিচ্ছে হরদম। (পায়ের কাছে বসে) জীবনে আর সুখ নেই বাবু। এখন মনে হয় যেন মরে গেলেই বাঁচি।

নবীন। রাখো ও-সব বাজে কথা। মানুষ ওরকম বলে। নিজেই আগুন জ্বালায়। সেই আগুনে নিজেই জ্বলতে থাকে, আর মুখে বলে মরে গেলেই বাঁচি, কিন্তু মরতে চায় না কেউ। যাক্‌গে এখন আসল কথাটা শোনো আমি যে জন্যে এসেছি। জমিদারী যখন গেল তখন আর সেরেস্তার তো দরকার নেই। এ-বাড়ী তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এখানে আমি ডাক্তারখানা খুলবো।

সতীশ। এই মরেছে, আমি এখন যাব কোথায়? গাছতলায়?

নবীন। তোমার সংসারে লোক তো দেখছি তুমি আর তোমার স্ত্রী—

সতীশ। তাহ'লে তো বাঁচতাম। স্ত্রী তো যেখানে একেবারে ইস্ত্রি—মা-মনসা। ওকে ঢাকিয়ে বিসর্জন দিয়ে ভ্যাং ভ্যাং করে সন্ন্যেসী হয়ে চলে যেতাম যেদিকে দু'চোখ যায়, কিন্তু তার কি জো আছে?

নবীন। কেন? তোমার ছেলেপুলে ক'টি?

সতীশ। জানেন না?

নবীন। না।

সতীশ। সেকথা আর বলেন কেন বাবু। ছেলেটি বড়—ওই একটিমাত্র ছেলে। সেই তো তার বৌ দেখলেন। তারপর তিনটি মেয়ে। তিনটির বিয়ের দুটি গেছে। একটি আছে।

নবীন। গেছে মানে? বিয়ে হয়ে গেছে?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবার কাছে টাকা নিয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পর বড় মেয়েটা ঝগড়াঝাটি করলে জামাইএর সঙ্গে। তারপর একদিন গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে দিলে জীবনটাকে শেষ করে।

নবীন। তারপর?

সতীশ। তারপর? তার পরের মেয়েটার বিয়ে দিলাম। এ যা করলে তা আর বলবার নয়। হঠাৎ একদিন কোথায় যে পালিয়ে গেল তার আর হদিশ পেলাম না। এখন রয়েছে মাত্র ছোট মেয়েটি।

নবীন। এরও বিয়ে দিয়েছ?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি। ওই যে দেখুন না, এইদিকে তাকান। (ঝোঁপ-ঝোঁপ একটা গাছের তলায় যে বুড়ো মানুষটি হুঁকো টানছিল তাকে দেখিয়ে) ওইটি আমার ছোট জামাই।

নবীন। (সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে) তোমার জামাই? উনি তোমার জামাই?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

(জামাই শুনতে পেয়েছিল কথাটা। হুঁকোটি হাতে নিয়েই সে উঠে এলো)

জামাই। আজ্ঞে হ্যাঁ, নমস্কার! আমি ওঁর ছোট জামাই। কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

সতীশ। আমার মনিব। এখানকার জমিদার।

জামাই। জমিদার? আর তুমিন বাদেই (আঙুলে আঙুলে টুটকি বাজিয়ে) জমিদারী তো ফট্।

নবীন। হ্যাঁ সেই কথাই বলতে এসেছি আপনার শ্বশুরকে। অন্য কোথাও একটা চাকরি বাকরি দেখুক।

জামাই। তা আমাকে বলছেন কেন, শ্বশুরের ভাবনা শ্বশুর ভাববে। যাক্, ভালই হলো—(হুঁকোটি, নামিয়ে রেখে একটা মোড়া টেনে এনে নবীনের কাছে বসতে বসতে) আমার নালিশটা তাহ'লে বলি আপনাকে।

সতীশ। (জামাইএর দিকে কটমট করে তাকিয়ে) পশু!

পশুপতি। পশু পশু করবেন না বলছি। আমার নাম পশু নয়, পশুপতি।

সতীশ। পশু পশুপতি একই কথা।

পশুপতি। একই কথা হলেই হলো? পশু মানে বিষ্ট (beast) আর পশুপতি হলো গিয়ে husband of beast. যাক্‌গে শুনুন, নালিশের কথাটা বলি।

সতীশ। নালিশ মানে? আমি কি খুন-খারাপি কিছু করেছি যে তুমি নালিশ করবো বলছো?

পশুপতি। খুনের কথা আমি বলছি? আপনি যা করেছেন সেই কথাটাই বলবো। উনি যখন আপনার মনিব, উনি তার বিচার করে দিন। আচ্ছা বলুন তো মশাই, বিয়ে মানুষ করে কিসের জন্যে?

নবীন। বড় কঠিন প্রশ্ন।

সতীশ। শুনুন তাহ'লে। ব্যাপারটা কি হয়েছে আমিই বলি। জামাই-বাবাজি বলছে—আমার কন্যাটিকে সে নিয়ে যাবে।

পশুপতি। অন্যায় কিছু বলেছি? বিয়ে করা বৌ, বাড়ী নিয়ে যাব না?

সতীশ। থামো তুমি। আমাকে বলতে দাও।

পশুপতি। বেশ তাই বলুন। দেখে মনে হচ্ছে উনি শিক্ষিত ছোকরা, সবই বুঝতে পারবেন।

সতীশ। মেয়ের মা বলছে—তোর করে পাঠিয়ো না। পাঠালে এও আবার সেই দিদিদের মত—

পশুপতি। কখ্খনো না। আমার ওয়াইফ্ কখনও গলায় দড়িও দেবে না, কারও সঙ্গে পালাবেও না। সেরকম 'চিক্' হাদ্‌য়াও আমি নই।

সতীশ। থামো, থামো। মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে বাটিয়ে খাটিয়ে মারবে। ওর আগেকার পক্ষের ছোট ছোট একপাল ছেলেমেয়ে। দুবেলা সেই একগুষ্টি লোকের রান্না করতে হবে। অথচ ওর অবস্থা খারাপ নয়। ইচ্ছে করলেই কি রাঁধুনী রব রাখতে পারে।

পশুপতি। আঃ, কেন রাখিনা তা আপনি কেমন করে জানবেন? মেয়ে কিছু বলছে না, মা-বাপের দরদ একেবারে উথলে উঠছে। বেশ, তাহ'লে আমার কথার জবাব দিন। বি-রাঁধুনী কেন রাখবো? বলি—কেন রাখবো? নিজের বিয়ে করা বৌ থাকতে রাঁধুনী কেন রাখতে যাব? কে রাখে? কোথায় রাখে আমাকে দেখাতে পারেন?

সতীশ। তাহ'লে রাঁধুনী তুমি রাখবে না? আমার ওই মেয়েটাই তোমার সাতগুষ্টির রান্না করবে?

পশুপতি। আলবাৎ করবে। লেখাপড়া শিখিয়েছেন যে শহরের মেয়ের মত কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আপিসে চাকরি করতে যাবে? ভাবলাম দিব্যি গাঁট্টা-গোঁট্টা তাগড়া জোয়ান মেয়ে, ঘর-সংসারের কাজকর্ম করবে, দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে—

সতীশ। মুখ সামলে কথা বল পশুপতি, মেয়ে আমার এখানেও পেট ভরে খেতে পায়।

পশুপতি। আপনি মুখ সামলে কথা বলুন।

নবীন। আঃ, চুপ করুন! চুপ করুন!

পশুপতি। বেশ, তবে চুপই করলাম। এর একটা গোপন রহস্য আছে, পরে বলবো আপনাকে! ওদিকে কল্‌কেটা আমার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

(থামের আড়ালে হুঁকোটা হাতে নিয়ে উঁচু হয়ে বসলো)

সতীশ। রহস্য! কী রহস্য—

(কথাটা শেষ হলো না। যুবতী একটি মেয়ে সরবতের আর জলের গ্লাস দুটি এনে ইজি চেয়ারের হাতলের ওপর নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল—)

সতীশ। যাচ্ছিস কোথায়? শোন্! এই আমার ছোট মেয়ে—উমা। বাবুকে প্রণাম কর্।

(উমা হাসতে হাসতে নবীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। নবীন তার দিকে তাকিয়ে দেখলে। সেও নিঃসঙ্কোচে তাকালে, হাসলে, হেসেই ছুটে চলে গেল)

পশুপতি। দেখলেন? চোখে মুখে কোনোরকম দুঃখু-দুঃখু 'মেলান্-মেলান্' ভাব দেখতে পেলেন?

সতীশ। শুনুন কথা!

পশুপতি। উনি কি শুনবেন? আপনি শুনুন।

সতীশ। আঃ, চুপ, কর বলছি।

পশুপতি। আপনি চুপ করুন।

সতীশ। আমি চুপ করব না। আমার খুশী।

পশুপতি। খুশী বের করছি দাঁড়ান, আপনার মেয়েকে আমি জোর করে নিয়ে যাব।

সতীশ। পারবে না নিয়ে যেতে।

পশুপতি। রীতিমত বিয়ে-করা বৌ। জোর করে নিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

সতীশ। যাক্ অধিকার। পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

পশুপতি। না পারি, আদালত আছে।

সতীশ। বেশ তবে তুমি আদালতেই যাও।

পশুপতি। তাই যাব আমি। দরকার হলে আদালতেই যাব।

(সেই অবসরে গ্লাসের সর্বৎটুকু শেষ করে নবীন উঠে দাঁড়ালো।)

নবীন। এবার আমি চলি সতীশ। (ফিরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম—

(দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো। মদনমোহন মন্দিরের পূজারী ভৈরব আচার্য্য। লম্বা চওড়া সুপুরুষ। খালি পা, খালি গা, কর্সা গায়ের রং, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবিত, পরণে পট্টবস্ত্র, মাথায় বড় বড় বাবরি চুল)

ভৈরব। কোথায়? আমাদের জমিদারের ছেলে না কে এসেছে শুনলাম—

সতীশ। (নবীনকে দেখিয়ে দিয়ে) এই তো! ইনি ভৈরব আচার্য্য। আপনাদের মদন-মোহন মন্দিরের পুরোহিত। আপনার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।

(নবীন গড় হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে ভৈরবকে)

সতীশ। ওকে আবার অত কেন?

(নবীন কটমট করে তাকালে সতীশের দিকে)

সতীশ। ভয় নেই। কালা ও কানে শুনতে পায় না।

ভৈরব। হুঁ। খুব রাগ হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম খিঁচে একটি চড় মারবো গিয়ে তোমাকে। কিন্তু প্রণাম-টনাম করে, দিলে সব মাটি করে।—তুমি কেনা মদন-মোহনের মন্দিরে বন্দুক দিয়ে একটা পাখী মেরে এলে? মন্দিরে রক্তের দাগ পড়লো!

নবীন। না না রক্তের দাগ পড়েনি। মরেনি। উড়ে গেছে। তবে খুব অন্যায় হয়েছে আমার।

সতীশ। জোরে জোরে বলুন। শুনতে পাবে না। বললুম তো—কালা।

নবীন। (জোরে) খুব অন্যায় করে ফেলেছি আমি।

ভৈরব। আমি জানি। অন্যায় হয়েছে তুমি বলবে—আমি জানি। তোমার বাবা আমার মনিব ছিলেন, বন্ধুও ছিলেন। ও-রকম মানুষ আর হবে না। তুমি তার ছেলে। সেই তুমি আজ আমাকে প্রণাম করলে। আমার সব রাগ জল হয়ে গেল।

নবীন। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

ভৈরব। সে আর বলতে হবে না তোমাকে। চলনাম।

সতীশ। পুজো কি এখনও করনি নাকি?

ভৈরব। কার পুজো করবো? জীবহত্যা যেখানে হয় ঠাকুর তো সেখানে থাকে না।

নবীন। জীবহত্যা হয়নি। একটা পায়রা—আওয়াজের ভয়ে পড়ে গিয়েছিল। আবার উড়ে চলে গেছে।

ভৈরব। দেখি।

[চলে গেল]

(সতীশ তার পিছু পিছু গিয়ে দোরটা বন্ধ করছিল. নবীন তার বন্ধুকটা নিয়ে)

নবীন। দোর বন্ধ করছ কেন? আমি যাব যে!

সতীশ। তাই কি হয় কখনও? এই অসময়ে আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো?

নবীন। না না আমি খাব না! আমাকে যেতেই হবে।

(দোরের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল নবীন। নিকট একটা কান্নার আওয়াজ শুনে তাকে থামতে হলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, সতীশের কোয়ার্টারের দরজা থেকে ছিটকে একটি মেয়ে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাছারির উঠোনে। পরনের কাপড়টা সামলে উঠে যখন সে দাঁড়ালো, নবীন দেখলে, পরমা সুন্দরী একটি যুবতী বধূ—কপালটা কেটে গিয়ে দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে—)

বধূ। আমি চলে যাচ্ছি মা. আমার ছেলে দাও।

[দোরের কাছে শান্তিলতা (সতীশের স্ত্রী) কোলে একটি ফুটফুটে ছোট ছেলে।]

শান্তি। দূর হয়ে যা হতভাগী! ছেলে দেবো? ছেলে না দিলেই নয়!

বধূ। আমার খোকনকে দিয়ে দাও। আমি আর কখ্খনো এখানে আসব না।

শান্তি। ছেলে আমি দেবো না। ছেলে আমাদের।

(ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে মেয়েটি। শান্তি কিছুতেই দেবে না। এই সময় নবীন জিজ্ঞাসা করলে সতীশকে—)

নবীন। এ মেয়েটি কে?

সতীশ। পুত্রবধূ—আমার ছেলের বৌ।

(আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো না। আবার ঠেলে ফেলে দিয়েছে বৌটাকে। টাল্ সামলে মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো)

শান্তি। এত বাড় হয়েছে তোর? আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিবি? (একটা চালা কাঠ তুলে নিয়ে মারতে গেল। মেয়েটি পিছু হেটে দাঁড়ালো)

নবীন। কী হচ্ছে এ-সব? (সতীশকে) যাও না, থামিয়ে দাও না!

(শান্তির পেছনে উমা এসে দাঁড়িয়েছে)

উমা। মা, চলে এসো। বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। কি বলছে শুনছো?

(শান্তি গ্রাহ্যই করছে না। কাঠ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বৌটা এবার কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে রুখে দাঁড়ালো।

বৌ। মাকন আপনি আমাকে। ভেবেছিলাম, আপনাদের ছেলে আপনাদের থাক্। কিন্তু এত যখন তেজ আপনার তখন মার খেয়ে যদি মরেও যেতে হয় তো আমি ছেলে না নিয়ে যাব না।

শান্তি। তবে রে হতভাগী—(কাঠটা তুলতেই)

নবীন। (ছুটে গিয়ে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) এ কী করছেন আপনি? দিন—ওর ছেলে ওকে ফিরিয়ে দিন।

(শান্তি গ্রাহ্যই করলে না কথাটাকে। ছেলেটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দোরটা তাদের মুখের ওপরেই দিলে বন্ধ করে)

নবীন। সতীশ!

(সতীশ দোরে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগলো)

সতীশ। খোলো খোলো দরজা খোলো। ছি ছি, মান সম্মান আর রইলো না কিছু। ওরে উমা—

নবীন। মর তোমরা—যা খুশী তাই কর। (সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল)

বৌ। (পেছন থেকে) শুনুন! (কাছে এসে) আপনি যাবেন না।

(মেয়েটি এর বেশি আর কিছু বলতে পারলে না। তার মাথার এলো খোঁপা গেছে খুলে। বুকের কাপড় গেছে আলগা হয়ে। কপালের রক্ত হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে চোখের জলে আর সিঁথির সিঁদুরে মিলেমিশে সে এক অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে তাকে। চোখে জলের ধারা নেমেছে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে)

নবীন। আমি কী করতে পারি বল ?

বৌ। আপনি যাবেন না। আপনি চলে গেলে—

(কথাটা শেষ হলো না। গাছের তলা থেকে পশুপতি এগিয়ে এলো বলতে বলতে)

পশুপতি। সে কথা সত্যি। আপনি চলে গেলে মেয়েটার নড়িলার থাকি কিছু থাকবে না।

নবীন। আমি থাকলেই-বা কি হচ্ছে ? আমার কথা শুনছে কে ?

পশুপতি। ওর বাপ শুনবে। (বন্দুকটি নবীনের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে) আসুন।

নবীন। কোথায় যাব ?

পশুপতি। (ফিরে দাঁড়িয়ে) আপনার কাছারী, মানে আপনারই তো বাড়ী, আর আপনি বলছেন কোথায় যাব ? দোতলায় চমৎকার সাজানো ঘর রয়েছে, ওদিকে স্নানের ঘর, টিউব ওয়েল, রান্নার জায়গা—আসুন।

(নবীনকে নিয়ে পশুপতি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

[কাছারিবাড়ীর দোতলার ঘর]

নবীন। বেশ আছেন আপনারা।

পশুপতি। আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন ? 'তুমি' বলুন। (মেঝের ওপর বসলো) তা মন্দই বা কি আছি। (হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে) মাগো, করালবদনা ! আমার তো শুধু ওই মা-ঠাকরুণকে।

নবীন। মা-ঠাকরুণ মানে ? সতীশের স্ত্রী ? তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ ?

পশুপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ, চ্যালা কাঠটা ভেবেছিলাম বুঝি দেব আপনার পিঠে বসিয়ে। আমার তখন প্যাল্‌পিটেশন হচ্ছে।

নবীন। আচ্ছা ওই মেয়েটির কি ব্যাপার বল তো ? বৌএর ওপর এত অত্যাচার করে কেন ?

পশুপতি। আমার বড়শালা—আমার ওই একটিই শালা —সেই ফকিরকে আপনি দেখেছেন ?

নবীন। না।

পশুপতি। শালাটি অটোমোবাইল্ ইঞ্জিনিয়ার।

নবীন। ইঞ্জিনিয়ার ?

পশুপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার। আর ওর বাপ্, আমার শ্বশুরমশাই হলেন গিয়ে আপনার এস্টেটের জেনেরেল ম্যানেজার।

নবীন। আরে ধেৎ, সতীশ তো এখানকার গোমস্তা। তাও তো আমার জমিদারী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চাকরিটাও গেল। ছেলে তা'হলে ভাল কাজকর্ম করে?

পশুপতি। ভাল বলে ভাল! মাসে মাসে তিরিশ চল্লিশ টাকা কলকাতা থেকে পাঠায় বাপকে। রোজগেরে ছেলে।

নবীন। (হাসতে হাসতে) তিরিশ চল্লিশ টাকা!

পশুপতি। ওই যে পাঠায় ওই যথেষ্ট। অটোমোবাইল্ ইঞ্জিনিয়ার মানে মোটর-মেকানিক। আসল ব্যাপারটা হলো গিয়ে মোটরের কারখানার মিস্ত্রি। লেখাপড়া একেবারে জানে না। তার ওপর ওই সব লম্বা লম্বা কথা বলে বলে বিয়ে করে বসলো লেখাপড়া জানা ওই এক প্রফেসারের মেয়েকে। ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগলো, এদিকে একটা ছেলে হয়ে গেল। ভেবেছিলাম এবার বুঝি গোলমালটা মিটে যাবে। কিন্তু না, মিটলো না। দেখলাম কলকাতা থেকে আবার একটি কালোকুলো বেশ ডাগর ডোগর মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হলো আমার ওই ইঞ্জিনিয়ার শালা ফকির।

নবীন। আবার একটা বিয়ে করলে? কোথায় সে?

পশুপতি। এইখানেই। এদিকে দেখলেন তো আমার শাশুড়ীঠাকরুণ ঝগড়াঝাঁটি একেবারে ভালবাসেন না। তিনি ধরে বসলেন—দুটো বৌ রাখা চলবে না, একটাকে তাড়াতে হবে। ব্যস্, তাড়াও বড় বৌকে। কিন্তু মুস্কিল হলো ওই ছেলেটাকে নিয়ে। আমার শ্বশুর বললে—ছেলে নিয়েই চলে যাক্, ছেলে রাখার ঝামেলা অনেক। শাশুড়ী-ঠাকরুণ বললেন, কভি নেই। (আবার একটি প্রণাম করে) মা আমার মুক্তমালিনী বিকটদশনা। বললেন, ছেলে আমাদের। ছেলে দেবো না। এই তো ব্যাপার। মায়ের আমার সেই এক টেক্‌নিক্। মা মাগো! তখন তুই জগৎ তুই। মাগো, নেচে নেচে আয় মা, নেচে নেচে আয়।

নবীন। (হাসি সামলে) এখন উপায়?

পশুপতি। উপায় আপনার হাতে। বলুন আমার জমিদারী গেছে তোমার চাকরিও গেছে। এ-বাড়ী তুমি ছেড়ে দাও।

নবীন। তা না হয় বললাম। তারপর?

পশুপতি। তারপর বলুন—আইন পাশ হয়ে গেছে, একটা বৌ বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে কেউ করতে পারবে না। তোমার ছেলে দুবার বিয়ে করেছে, বড় বৌকে আপনি আদালতে পাঠিয়ে দেবেন। ছেলের জেল হয়ে যাবে। বললেই দেখবেন—আপনার ওই গোমস্তাবাবুটি আপনার পায়ে ধরবে। তখন বলবেন—তা'হলে ওর ছেলে ওকে দিয়ে দাও। আর ওকে কিছু বোলো না।

নবীন। তাই না হয় হলো। কিন্তু ওই সতীনের সঙ্গে মেয়েটা এখানে থাকবে কেমন করে?

পশুপতি। ঠিক থাকবে। একদিন এ, একদিন ও। পালা করে ঠিক থেকে যাবে। মেয়েদের চেনেন না আপনি—আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ।

নবীন। কি জানি মশাই, মেয়েদের সত্যিই চিনি না। তা তুমি কি করবে? তোমার বৌকেও তো সতীশ পাঠাবে না বলছে।

পশুপতি। ওর বাপ্ পাঠাবে।

নবীন। তা'হলে ওরকম কথা বলছে কেন?

পশুপতি। আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবার জন্যে। আপনার ওই গোমস্তাটি আমাকে অমনি মেয়ে দেয়নি। নগদ পাঁচশ'টি টাকা নিয়েছে বিয়ের আগে। আবার শ'খানেক টাকা দিয়ে দেবো। মেয়েকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার বাড়ীতে।

নবীন। তোমার তো দেখছি পয়সাকড়ি আছে। তাহলে মেয়েটাকে অত খাটাও কেন? একটা ঝিঁঝুনী টিঁঝুনি রাখলেই তো পারো।

পশুপতি। কেন রাখি না জানেন? মেয়েটা দিনরাত কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কোন কিছু ভাববার

অবসরই পায় না। তা না করে ধরুন আমি দুটো লোক রেখে দিলাম, ওকে কাজকর্ম কিছু করতে হলো না, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে শুধু খাওয়া আর শোওয়া। ভেবে দেখুন তাহ'লে কি করবে? কি ভাববে আর কি চাইবে বুঝুন একবার।—নিন, উঠুন এবারে চান-টান করুন।

[সতীশ ঢুকলো]

সতীশ। তুমি আমার নামে বসে বসে লাগাচ্ছো বুঝি?

পশুপতি। আজ্ঞে না। লাগাবার যা কিছু আপনি লাগিয়েই রেখেছেন, আমি বসে বসে শুধু ছাড়াচ্ছি।

নবীন। (সতীশকে) তোমার স্ত্রী দরজা খুলেছে?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুলেছে। দেখলেন তো বাবু, এই আগুনে আমি দিনরাত জ্বলছি।

নবীন। সে আগুন তুমি নিজেই জ্বালিয়েছ।

সতীশ। না বাবু সাধ করে এ আগুন কেউ জ্বালায় না। এই আমার অদৃষ্ট।

নবীন। না, এই তোমার চরিত্র। যাকগে, ও-সব কথা তুমি বুঝবে না। তোমার ছেলে কবে আসবে বল।

সতীশ। কাল শনিবার। কাল আসবে।

নবীন। কাল পর্যন্ত আমি এইখানে রইলাম তাহ'লে।

সতীশ। যাবুন। আমি যেদিকে—ওদিকে আবার—যেদিকে না দেখবো—বুঝতেই তো পারছেন।

নবীন। হ্যাঁ, সবই বুঝতে পারছি।

[সতীশ চলে গেল

পশুপতি। আসুন।

নবীন। তোমাদের ওই যে বৌমা—যার ছেলে কেড়ে নিয়েছিল, মেয়েটি কতদূর লেখাপড়া করেছে জানো?

পশুপতি। সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে বোধহয়। কিন্তু বলতে চায় না।

নবীন। আর ওর স্বামী—তোমার শালা—তার লেখাপড়া কতখানি?

পশুপতি। সেকথা না বলাই ভাল। বলে, অটোমোবাইল্ ইঞ্জিনিয়ার। মোটর কারখানার মিস্ত্রি।

নবীন। মেয়েটার অদৃষ্ট।

পশুপতি। আমার শ্বশুরকে বললেন চরিত্র, আর একে বলছেন অদৃষ্ট। ও দুটোই কি এক নাকি?

নবীন। ঠিক বুঝতে পারি না। তবে আমার মনে হয় দুটোই এক।

[বৈদ্যুতের আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধান। আবার যখন আলো জ্বললো, দেখা গেল জানলার কাছে পেছন ফিরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবীন ঘরে ঢুকলো হাত মুছতে মুছতে।]

নবীন। (মেয়েটিকে দেখে) কে? (মেয়েটি মুখ ফেরালে) ও, তুমিই সতীশের বৌ?

সুধা। হ্যাঁ। আমার নাম সুধা।

নবীন। তোমার ছেলে পেয়েছ?

সুধা। হ্যাঁ, পেয়েছি।

নবীন। কি নাম রেখেছো ছেলের?

সুধা। কিছু না। খোকা বলে ডাকি। (একটু এগিয়ে এসে) তবে ওর একটা নাম আমি মনে-মনে ঠিক করেছি।

নবীন। কি নাম?

সুধা। অনাহুত।

নবীন। তার মানে?

সুধা। unwanted (একটু হাসলে)

নবীন। ও (একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তার মুখের দিকে)

সুধা। অমন করে কী দেখছেন?

নবীন। তোমার মুখে যে হাসি দেখবো তা আমি ভাবতে পারিনি। তাহ'লে কি ঠিক করলে তুমি? ছেলেকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে?

সুধা। সেই কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন যেন বদলে গেল। ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাব না। ছেলে থাকবে এইখানে।

নবীন। তোমার শাশুড়ী তো এইটিই চেয়েছিলেন।

কথাটা যদি আগে বলতে তাহ'লে তো এত কথা-কাটি এত মারামারি কিছুই হতো না।

সুধা। জানি। (চোখ বুজে কি যেন ভেবে) যাদের ছেলে তাদের কাছেই থাক্। আমার শাশুড়ীর কাছে ও ভালই থাকে।

নবীন। ছেলে না হয় ভালই থাকবে, কিন্তু তুমি ?

সুধা। আমার কথা আর কে ভাবছে বলুন !

নবীন। (কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।) যদি বলি—

সুধা। কী বলবেন ?

নবীন। যদি বলি তোমার কথা আমি ভাবছি।

সুধা। সত্যি ?

নবীন। হ্যাঁ, সত্যি।

সুধা। বসুন আপনি। (ইজি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে) আমি আপনার পায়ের কাছে বসি। কথা বলবার একটা মানুষের মতন মানুষ যখন পেয়েছি তখন কথাই বলি। প্রথমে একটি প্রণাম করি।

নবীন। (পা-দুটো সরিয়ে নিয়ে) ভাখো তুমি এ-বাড়ীর বৌ, আর আমি —

সুধা। (হেসে) ভয় পাচ্ছেন ?

নবীন। পাওয়া স্বাভাবিক। তুমি সুন্দরী।

সুধা। আমি কারও স্ত্রী নই। আমি কুমারী। (নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে) মনে মনে হাসছেন তো ?

নবীন। না। এটা হাসবার কথা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

সুধা। কি ভাবছেন ?

নবীন। ভাবছি, যে-জোরে আজ এই কথা তুমি বলছো এতদিন সে-জোর তোমার ছিল কোথায় ? কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার ?

সুধা। তিন বছর।

নবীন। এই তিনটি বছর ধরে শরীরের ওপর মনের ওপর এই অত্যাচার তুমি নীরবে সহ্য করেছ ?

সুধা। না, নীরবে সহ্য করিনি, বিদ্রোহ করেছি। বিদ্রোহ করেছি বলেই আমার শ্বশুরের ছেলেটি অন্য আশ্রয় খুঁজেছে। আমার সতীন এসেছে। বিদ্রোহ করেছি বলেই আজ এখানে আমার ঠাঁই নেই।

নবীন। বুঝেছি। বিয়ের পরেই তোমার পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এখান থেকে। শ্বশুরের মুখে শুনলাম তোমার বাবা একজন প্রফেসার। তোমাকে দিয়ে একটা ডাইভোর্সের স্যুট ফাইল করিয়ে দিতে পারতেন।

সুধা। উচিত হয়ত ছিল কিন্তু কেন পারিনি শুনুন। আমার বাবা ছিলেন কলকাতার একটি কলেজের প্রফেসার। তিনি থাকতেন কলেজের হোষ্টেলে, আমি থাকতাম মেয়েদের হোষ্টেলে। আমি যখন কোর্থ ইয়ারের ছাত্রী তখন বাবার হলো কঠিন অসুখ। আমার আর হোষ্টেলে থাকা চললো না। বাবার সেবা শুশ্রূষা করবার জন্যে আমাকে আসতে হলো বাবার কাছে। ছেলেদের হোষ্টেলে। বাবার তখন জীবন-মরণ সমস্যা। কেউ বলে হাসপাতালে দিন, কেউ বলে আলাদা বাড়ী ভাড়া করুন। বাবার একটি পাঁচহাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্সের পলিসি ছিল। সেই পলিসি 'সারেণ্ডার' করে যা পেলাম তাই দিয়ে বাবার চিকিৎসা চলতে লাগলো। এমন সময় বাবার হলো পক্ষাঘাত। মুখ থেকে আরম্ভ করে বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করলাম, অনেক ডাক্তার, অনেক ওষুধ, অনেক সেবাশুশ্রূষা —কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শম্ভু বাবাকে নিয়ে দেশে এলাম। দেশে আমাদের থাকবার মধ্যে ছিল একখানি ছোট বাড়ী আর বিঘে-পঁচিশেক জমি। সবকিছু দখল করে বসেছিল আমাদের একজন আত্মীয়। আমাদের দুরবস্থা দেখে তাঁর বোধকরি দয়া হলো। লোকটি ভাল। সব কিছু ছেড়ে দিলে। ব্যাধি যে মানুষকে কতখানি অসহায় করে তুলতে পারে তা আমি বুঝেছিলাম বাবাকে দেখে। অতবড় একজন

বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে গেলেন যেন একটা জড়পিণ্ড। ভাল করে কথা বলতে পারেন না, যা বলেন তাও বুঝতে পারা যায় না, কস্ বেয়ে লাল গড়িয়ে আসে, চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাই না দেখে আমি কেঁদে ভাসাই। বাবাও কাঁদেন, আমিও কাঁদি। আমার একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বাবা যেন মরতে পর্যন্ত পারছেন না। আমার ব্যবস্থা মানে আমার বিয়ে।

নবীন। তোমার বিয়ে মানে তো এই পঙ্গু মরণাপন্ন বাপকে একলা ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া?

সুধা। না। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে অধিকাংশ সহরে মানুষের যা ধারণা আমারও সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু গ্রামে গিয়ে সবই আমার বদলে গেল। আমাদের জমি জায়গা বাড়ীঘরদোর যিনি দখল করে ছিলেন তিনি আমার দূর সম্পর্কের এক কাকা। তাঁর এক বিধবা মেয়ে আছে, আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়। সেই একটিই বাবার সেবাযত্ন করতো, আর তার বাবা বিষয় দেখতেন। এমন দিনে এইখানে—আপনার এই গোমস্তার ছেলের সঙ্গে হলো আমার বিয়ের সম্পর্ক। কাকা এলো ছেলেটিকে দেখতে। গিয়ে বললে, বেশ ছেলে। ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় কাজ করে। ছেলের বাপ —জমিদারের ম্যানেজার। আর এই আপনার কাছারীবাড়ী—কোয়ার্টার—সবই বলেছে ওর নিজের সম্পত্তি। তারপর এখান থেকে আমার শ্বশুর দেখতে গেলেন আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ করে বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক করে এলেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমার বাবা যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

নবীন। বুঝলাম।

সুধা। না এখনও বোঝেননি। বাবা জানলেন মেয়ে আমার খুব সুখে আছে। সে অবস্থায় বাবাকে কিছু জানালাম না। তিনি জানুন আমি সুখে আছি।

নবীন। এখনই-বা জানাবে কেমন করে? তোমার একটি ছেলে হয়েছে, অথচ তুমি সেই ছেলেকে ফেলে রেখে একা একা কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে তোমার বাবার কাছে? কি বলবে?

সুধা। বলবার দরকার হবে না। (মাথা হেঁট করে বসে রইলো)

নবীন। কি হলো? অমন করে রইলে যে? কি হয়েছে? (সুধার কাঁধে হাত রেখে) সুধা! (একহাত দিয়ে সুধার মুখখানি তুলে ধরে) একি? তুমি কাঁদছো?

সুধা। (নবীনের পায়ের ওপর মাথা রেখে দুহাত দিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো)

নবীন। কেঁদো না, চুপ কর। তোমাকে সেখানে যেতে হবে না।

সুধা। (মুখ তুলে কাঁদতে কাঁদতে) না যাব না। বাবা মারা গেছে।

আরও সূর্যের কাছে এবং

অলক্ষ্যে বিকেল-এর

কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর

সর্বতম শ্রেষ্ঠ কাব্য সঙ্কলন

আশা যখন বৃষ্টি

সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে

মূল্য মাত্র চার টাকা

এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

নবীন। সে কি? কই তা তো বলনি।

সুধা। কাউকে বলিনি। কেউ জানে না। তবুও আমাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছে। লিখেছে তুই দুঃখ করিস না। তিনি মরে বেঁচেছেন। আজ কুড়ি দিন হলো।

নবীন। (সুধার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিতে দিতে) একটা কথা বলবো?

সুধা। কি কথা?

নবীন। তুমি যাবে আমার বাড়ীতে?

সুধা। (ম্লান একটু হাসলে)

নবীন। বল—যাবে?

সুধা। না।

নবীন। কেন?

সুধা। না। তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে পারবো না।

নবীন। তাহ'লে কি করবে তুমি? কোথায় যাবে?

(পশুপতি ঢুকলো। তাকে দেখে নবীন তার হাতটা ছেড়ে দিলে। সুধা কিন্তু ছাড়লে না।).

পশুপতি। আপনি না পোষ্টাপিস যাব বলেছিলেন? যাওয়া বোধহয় হলো না।

সুধা। না। আমি ওঁকে যেতে দিলাম না।

পশুপতি। এই দোরটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল।

সুধা। আপনি এমন হট করে এসে পড়বেন জানলে বন্ধ করেই দিতাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভৈরবের বাড়ী

(দিনের বেলা)

[লাল টালির একটি চমৎকার বাংলো বাড়ী। বাড়ীর পেছনে একটি আমের ডালে দেখা যাচ্ছে বিস্তর আম ধরেছে। একটি মেয়ে পেছন ফিরে সেই ডালের ওপর বসে বসে কাঁচা আম খাচ্ছে। বঁটুক হাতে নিয়ে নবীন ঢুকলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন ডাকলে।]

নবীন। ও মশাই! শুনুন! শুনুন!

(লোকটি আসতেই) এইটেই কি পোষ্টাপিস?

লোকটি। আজ্ঞে না। ওই তো কাছেই পোষ্টাপিস। এটি গোপাল-মন্দিরের পূজোরীর বাড়ী।

[লোকটি চলে গেল]

নবীন। (বাড়ীটার দিকে তাকাতেই আধ-খাওয়া একটি আম এসে লাগলো তার কপালে) উঃ!

(আমগাছটির দিকে তাকিয়ে দেখে যে-মেয়েটি আম খাচ্ছিল সে তখন ডাল ধরে ঝুলছে। নামবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নামতে পারছে না। নবীন বঁটুকটা নামিয়ে রেখে সেইখানে গিয়ে মেয়েটির কোমরে ধরে) নামো, ঝাঁপিয়ে পড়, লাগবে না। (মেয়েটি নামলো। নবীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে) তুমিই সেই গোপাল-মন্দিরে—সেই পাখীটা আমার হাত থেকে—

মেয়েটি। হুঁ। (ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকলো)

নবীন। (বঁটুকটি নিয়ে সেখান থেকে চলে আসছে, দেখলে গোপাল-মন্দিরের পূজোরী ভৈরব ঢুকলো। খালি গা, খালি পা, কাঁধে একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো পিওনের ব্যাগ) আপনি—

ভৈরব। ও, তুমি এসেছ আমার বাড়ী দেখতে? বোসো বাবা বোসো। মালা! মালা!

নবীন। (পিওনের ব্যাগটা দেখিয়ে) এটা আপনার কাঁধে কেন?

ভৈরব। (ব্যাগটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে) ঘোড়া দুটো এনে দে। আমরা বাইরেই বসি।

নবীন। (বঁটুকটা নামিয়ে) ঘোড়া আনতে হবে না। এইখানেই বসলাম। (দাওয়ার ওপর বসলো)

ভৈরব। ওইখানেই বসলে? মালা, আমাদের চা দে। (বাড়ীটি দেখিয়ে) এই বাড়ী তোমার বাবা তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। তুমি একবার এসেছিলে

তোমার বাবার সঙ্গে। তখন তুমি খুব ছোট। মালার মা তখন বেঁচে ছিল। তুমি আর এসেছ আমার বাড়ীতে, অথচ মালার মা খেতে পেলে না। ওই যে ওই আমগাছটি তোমার বাবা এনেছিল কলকাতা থেকে। মালার মা পুঁতেছিল কিন্তু ও-গাছের আম আর সে খেতে পেলে না। যাক্‌গে, মালা লজ্জা করিস না মা, প্রণাম কর তোর —এই ভাখো, তোমার নামটি ভুলে গেছি।

নবীন। আমার নাম নবীন।

ভৈরব। হ্যাঁ উপীন। প্রণাম কর তোর উপীনদাকে। তা কই, তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না বাবা— আমার কাঁধে এই ব্যাগটা কেন।

নবীন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি জবাব দেননি।

ভৈরব। আমি জবাব দেবো? কার কাছে শুনলে? সামান্য পিওনের চাকরি, পনেরোটি টাকা মাইনে পাই, তা হোক, ওতে আমার অনেক উপকার হয়। গোপালের পুজো, জবাব দেবো কেন? আমি দুটোই করব। পিওনের কাজও করবো, গোপালের পুজোও করবো।

(মালা বেরিয়ে এলো। কাপড় জামা বদলেছে। নবীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে)

মালা। আমি চা আনছি। (আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো)

ভৈরব। পিওনের চাকরিটি কেন নিয়েছি জানো? আমার ছেলে মণি—কলকাতায় পড়তে গেল। কিন্তু তার কলেজের পড়া—চালাবো কেমন করে? তোমার ম্যানেজার বিনোদবাবু এসেছিলেন কাছারিতে। তার মেয়েটিও তো কলকাতায় পড়ে, তাঁকেই ধরলাম। বললাম, আমার ছেলেটাকে পড়িয়ে দিন কলকাতায়। মাসে মাসে ফলটি করে টাকা তিনি দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দয়া, আমার এই পনেরো এই হলো পঁচিশ, আর বাকিটা সে জোগাড় করে ছেলে পড়িয়ে। এমনি কষ্ট করে ছেলেটা বি-এ পড়ছে। আর তুমি বলতে কিনা আমি বলেছি—গোপালের পুজোয় জবাব দেবো? জবাব দেবো তো যাব কি? এ কথা কে বললে তোমাকে? সতীশের ওখানে ছিলে, সতীশ বলেছে নিশ্চয়ই।

নবীন। না না সতীশ বলেনি। সতীশকে কিছু বলবেন না।

ভৈরব। তোমাকেও বলবো না? কাকে বলবো তাহ'লে? দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে আমার যা পাবার কথা তা সতীশ দেয় না। গোপালের আড়াই সের দুধ, সেই দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে এখন হয়েছে আধসের। তাতে জল ঢেলে ঘটি ভর্তি করে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। বলতে গেলে ওর বৌটা তেড়ে মারতে আসে। আমি কানে কম শুনি বলে আমাকে বলে কালাপাহাড়, বলে কালাভৈরব।

নবীন। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

ভৈরব। ভেবেছিলাম একবার তোমার মায়ের কাছে গিয়ে সব বলবো। কিন্তু যাই কেমন করে? একদিকে গোপালের পুজো আর একদিকে এই পিওনের কাজ। কোনাটাই কামাই করবার যো নেই।

(চা নিয়ে এলো মালা। চায়ের কাপটি মালার হাত থেকে নিয়ে)

নবীন। (মালার মুখের দিকে তাকিয়ে) এই জন্যেই বুঝি মেয়ের বিয়ে দেবারও সময় পাননি?

(কথাটা শুনে ভৈরবের কাপটা তার কাছে নামিয়ে দিয়ে মালা ছুটে পালালো)

ভৈরব। মালার বিয়ে? হ্যাঁ, ভাখো তো বাবা তোমার জানাশোনা ভাল ছেলে যদি একটি থাকে—

নবীন। (পকেট থেকে পয়সা বের করে) পোষ্টাপিসে গেলে এখন একখানা খাম পাব? মাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে হবে আমি দিনকতক পরে বাড়ী ফিরবো। সেই খাম কিনতেই আমি এখানে এসেছি।

ভৈরবী। (চা খেয়ে কাপটি নামিয়ে দিয়ে) কি বললে?

নবীন। একখানা খাম কিনবো।

ভৈরব। দাও, আমি এনে দিচ্ছি। (ব্যাগটি তুলে পয়সা নিয়ে চলে গেল)

(মালা এলো কাপ ডিশগুলি নিয়ে যাবার জন্যে)

মালা। পান খান নাকি ?

নবীন। না। তবে সিগারেট খাই। (পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালে)

মালা। বাঁচালেন। পান আমাদের বাড়ীতে নেইও।

নবীন। যদি বলতাম খাই। কি করতে তাহ'লে ?

মালা। বলতাম নেই।

নবীন। বলতে পারতে ? লজ্জা করতো না ?

মালা। না। সত্যি কথা বলতে আমি লজ্জা পাই না। (কাপ ডিস নিয়ে গিয়ে ধুতে ধুতে) সোমত্তা-গিন্নি কি খাওয়ালে কালকে ?

নবীন। তা কি আর মনে আছে ? তোমার কাছে বলতে হবে জানলে মনে মনে একটা লিষ্ট্ করে নিতাম।

মালা ওদের বড়-বৌকে দেখলেন ? সুধাকে ?

নবীন। চেনো নাকি ?

মালা। চিনি। (আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব এলো একটি খাম হাতে নিয়ে।)

ভৈরব। (খামটি নবীনের হাতে দিয়ে) আপো উপীন—

নবীন। উপীন নয়—নবীন।

ভৈরব। আচ্ছা বেশ, বিপিন বলেই ডাকবো।

মালা। (কাছে এগিয়ে এসে) বিপিন নয়। নবীন —ন-বীন।

ভৈরব। ও, নবীন ? শোনো বাবা—আমার মেয়েকে তো দেখছো, ওর জন্যে একটি পাত্র—

(মালা পালালো। একটি কাপ ধুয়েছিল, আর একটি কাপ ধুতে ধুতে শুনতে লাগলো)

নবীন। পাত্র কি কোথাও ঠিক করেছেন নাকি ?

ভৈরব। কোথায় পাব যে ঠিক করবো ? তবে হ্যাঁ সতীশের জামাই পশুপতিকে তো দেখেছো, ওইরকম পাত্র পাওয়া যায়। তা ওরকম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল।

নবীন। (হেসে) হ্যা হ্যা—বিয়ে নাই-বা দিলেন। মেয়ে আপনার বেশ ভালই আছে।

ভৈরব। কি বললে ? পশুপতির মতন পাত্র ভাল ?

নবীন। আজ্ঞে না তা বলিনি। বলছি, মেয়ে আপনার বেশ ভালই আছে।

ভৈরব। হেঁ হেঁ—বাবা, এ তো সতীশের মেয়ে নয়। মা-বাবা যেমন, তাদের ছেলে-মেয়েও হবে তেমনি। আমার ছেলেমেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না।

নবীন। তা সত্যি। দিব্যি কেমন গাছে চড়ে আম পাড়ছে, গুন গুন করে গাছের ডালে বসে আম খাচ্ছে, আবার হাতের টিপ্ পরীক্ষা করবার জন্যে ভদ্রলোকের মাথা লক্ষ্য করে এমন এক একটা আম ছুঁড়ছে যে মাথাটা কেটে যাবার—

(মালা একসময় ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ঘরের ভেতর থেকে মালার হাসির শব্দ শোনা গেল। নবীন তাকালে সেইদিকে। কিন্তু মালাকে দেখতে পেলে না।)

ভৈরব। তা যা বলেছ। আমার ঠিক থাকে না।

নবীন। তবে আমার মাথার ওপরেই আপনার মেয়ের আক্রোশটা যেন একটু বেশি। তখন মজিয়ে একটা পাখী না হয় মেয়েই ফেলেছিলাম। অমনি আপনাকে কাছারি বাড়ীতে দিলে পাঠিয়ে। আমাকে আচ্ছা করে ধমকে অপমান করে দেবার জন্যে।

ভৈরব। না না অপমান কিসের বাবা ? তোমার মায়ের কাছে আমি ভিক্ষা করবার জন্যে গিয়ে দাঁড়াবো—তাতে আবার অপমান কিসের ?

মালা। (ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তার বাবার কাছে গিয়ে জোরে জোরে) বাবা, কানে তুমি আজকাল একদম শুনতে পাও না। উনি কি বলছেন আর তুমি কি জবাব দিচ্ছো !

ভৈরব। কানের চিকিচ্ছে করাবার জন্যে গিয়েছিলাম তো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললে, আপনি বেশ আছেন, লোকের গালমন্দ শুনতে হয় না।

(হাসতে হাসতে)—হাঁ হাঁ দাঁড়া, দাঁড়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কাছারী-বাড়ীতে সতীশের সংসারে কাপড়া-কাঁটি মারামারি লেগেই থাকে। তুমি ওখানে থাকবে ক'দিন? ওখানে তো থাকতে পারবে না!

নবীন। ভেবেছিলাম আজকেই চলে যাব, কিন্তু ওর বড়-বৌকে নিয়ে বিশ্রী একটা হাঙ্গামা বেধে গেছে। কাজেই ওর বড়ছেলে না আসা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে। (মালাকে) তোমার বাবাকে বুঝিয়ে দাও কথাটা।

মালা। যা বা, হয়ে গেছে। আসবামাত্র জড়িয়ে পড়েছেন এক ঝামেলায়।

ভৈরব। ঝামেলা? না না আমার এখানে ঝামেলা কিছু নেই। (নবীনকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে) এই ভাখো, এই ঘরে আমার ছেলে যদি থাকতো, এইটেতে আমি আর এইটে মালার ঘর। তুমি এই মালার ঘরে থাকবে। ওইদিকে একটা ছোট ঘর আছে সেইটেতে ও থাকবে—

(বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—'ভৈরব! ভৈরব!'

মালা। যা যা, পোষ্টমাষ্টার মশাই তোমাকে ডাকছেন।

ভৈরব। (চীৎকার করে) যাচ্ছি। (মালাকে) তুই ঠিক বলেছিস, বিপিন এইখানে থাকবে। আমি কাছারী-বাড়ীতে গিয়ে বলে দিয়ে আসবো সতীশকে। (পোষ্টাপিসে চলে গেল)

মালা। বাবাকে নিয়ে আমার হয়েছে এক জ্বালা। আমি কখন আপনাকে বললাম এখানে থাকতে?

নবীন। তোমার ভয় নেই, আমি এখানে থাকবো না।

মালা। এই দেখুন, আপনিও আমার পেছনে লাগলেন?

নবীন। ওটা আমার স্বভাব।

মালা। স্বভাবটা কিন্তু ভাল নয়। (চলে যাচ্ছিল)

নবীন। শোনো, শোনো—চলে যাচ্ছ কেন?

মালা। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলবেন বলুন।

নবীন। তুমি আমার স্বভাবের দোষ দিলে কেন?

মালা। আপনি অমন বাঁকা-বাঁকা কথা বলছিলেন কেন?

নবীন। (হেসে) বাঁকা-বাঁকা? সে আবার কেমন?

মালা। দেখুন, জানেন সবই, বুঝেন সবই, শুধু কেমন না-জানবার না-বুঝবার ভান করছেন। আমার বাবা ওই তো ক্ষ্যাপা-কালা মানুষ, ভাল মন্দ কিছু বোঝে না। আমরা আপনাদের আশ্রয়েই আছি। আমরা যে কত গরীব—বাবা যে আমার বিয়ে দিতে পারবে না—সেকথা সবাই জানে, জানেন না শুধু আপনি। (চোখ দুটি জলে ভরে এলো)

নবীন। চোখে অমনি জল এসে গেল? মেয়েরা কি শুধু কাঁদতেই জানে? (মালা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো) শোনো। তোমার বিয়ের সব খরচ যদি আমি দিই, বিয়ে করবে?

মালা। দোহাই আপনার! সে চেষ্টা আপনি করবেন না। বিয়ে আমি করব না।

নবীন। এরকম কথা কিন্তু অনেক মেয়েই বলে থাকে, শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে না।

মালা। ক'টা মেয়ে দেখেছেন আপনি? আপনার স্ত্রীকে দেখেছেন, আর দেখছেন আপনার গোমস্তার মেয়েকে।

নবীন। ভুল বললে। আমার স্ত্রীকে আমি এখনও দেখিনি।

মালা। বিয়ে বুঝি এখনও করেননি?

নবীন। না। মনের মত মেয়ে পাচ্ছি না।

(মালা একবার নবীনের দিকে তাকিয়েই চলে গেল সেখান থেকে)

বা-রে! বেশ মেয়ে তো! আমাকে একা ফেলে দিয়ে চলে গেলে? মালা! মালা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাছারী বাড়ী

দিনেরবেলা

(পশুপতি বসে বসে হুঁকো টানছে। ভৈরব এলো।)

ভৈরব। সতীশ রয়েছে? সতীশ!

পশুপতি। না। সে থানায় গেছে। দারোগা ডেকেছে।

ভৈরব। আমি রোগা হয়ে গেছি ? হব না ? তোমার শ্বশুরটি আমায় পাওনা দিচ্ছে না যে ! যাক্‌গে, বিপিন আমার বাড়ীতে থাকবে—সেই কথা বলতে এলাম।

পশুপতি। বিপিন কে ?

ভৈরব। বিপিন গো। তোমার শ্বশুরের মনিব।

পশুপতি। তার নামও জানো না ? বিপিন নয়, নবীন।

ভৈরব। তা বেশ না হয় উপীনই হলো। (হুঁকোটা পশুপতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে) দাও বারকতক টেনে নিই। (টানতে টানতে দেখলে সতীশের স্ত্রী শান্তিলতা আসছে) ওই তো গিন্নিঠাকরুণ। তোমাদের মনিব আমার ওখানে থাকবে। ওর বাপের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা ছিল তো !

শান্তি। আ-হা, কী ভাব-ভালবাসার মানুষটি ! বুঝেছি ! বাড়ীতে ওই অতবড় আইবুড়ো মেয়ে—বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হতো। সেই তাগাট সঙ্গে জুটিয়ে দিতে চায়। সুবিধে পেয়েছে, ছাড়বে কেন ?

ভৈরব। না না সুবিধে অসুবিধের কোনও কথা সে বলেনি।

শান্তি। আ-মর্ মুখপোড়া। কি কথার কি জবাব দিচ্ছে ছাখো ! আর আমার কপাল ছাখো না ! ওই তো বুড়োহাবড়া একটা ঘাটের মড়াকে ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দিলাম, আর কপাল ছাখো ওই কালা-মিনষের। মরছিল পুজো করে—দুদিন বাদে দেখবো জমিদারের শ্বশুর হয়ে দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্ছে।

ভৈরব। (হুঁকোটা পশুপতিকে ফেরত দিয়ে) এই নাও, কিছু নেই। কি বলছো গো তুমি—আমি শুনতেও পারছি না, বুঝতেও পারছি না।

শান্তি। যাক্ আর তোমায় শুনেও কাজ নেই, বুঝেও কাজ নেই, তুমি যাও তো, বিদেয় হও এখান থেকে।

(হাতের ইশারায় ভৈরব বুঝতে পারলে তাকে সে যেতে বলছে)

ভৈরব। হ্যাঁ, যাই। [চলে গেল]

শান্তি। হ্যাঁ যাও। মেয়েটি তোমার দেখতে শুনতে ভাল। তার ওপর বাবুটি আমাদের এখনও বিয়ে করেনি। মুখুটি তার খুব খেতেই বা কতক্ষণ ! (পেছন ফিরতেই দেখলে সুধা এসে দাঁড়িয়েছে) এই যে ! বাবুকে তাড়ালি তো এখান থেকে ?

সুধা। আমি তাড়ালাম ?

শান্তি। তুই তাড়ালি না তো কে তাড়ালে ? দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে কাঁদলে মানুষের ভাল লাগে ? (বাড়ীর ভেতর চলে গেল)

সুধা। (পশুপতির কাছে এসে) ওপরের ঘরের চাবিটা দিন, তালাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি—বাবু তো আসবে না।

পশুপতি। (চাবিটা সুধার হাত দিয়ে) ভৈরবের মেয়ে মালাকে তুমি চেনো ?

সুধা। খুব চিনি।

পশুপতি। বেশ ডাঁসরেল্ মেয়ে, না ?

সুধা। ডাঁসরেল্ কথার মানেটা আমার ঠিক জানা নেই।

পশুপতি। ডাঁসরেল্ মানে উনে আর-কি। লম্বা চওড়া বেশ ডাগর-ডোগর, মানে ওই বয়সের মেয়েদের যেমনটি ঠিক হওয়া উচিত।

সুধা। মালা যেমন হোক্ তাতে আপনার কি ?

পশুপতি। না আমার কিছু না, তবে আমাদের নবীন-বাবুর কথা বলছি। খুব ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি চলবে।

সুধা। আপনি অত্যন্ত ইতর। (ওপরে উঠে গেল)

পশুপতি। হেঁ হেঁ বাবা, তুমিও ওই পেছনে লেগেছ তা আমি জানি। কপাল ! কপাল ! কেউ-বা মাথা ঠুকলেও পায় না, কারও-বা মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না কোনও মেয়ে, আবার কারও-বা পায়ের ওপর মেয়েরা গড়াগড়ি দেয়।

(নবীন এসে দাঁড়ালো পেছনে বন্দুক হাতে নিয়ে)

নবীন। কার পায়ের ওপর মেয়েরা গড়াগড়ি দিচ্ছে ?

পশুপতি। (চমকে তাকিয়ে) না না কিছু নয়। আপনি

এলেন যে? জিনিসপত্র কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?

নবীন। কই না তো। কেন?

পশুপতি। আপনি ভৈরব-পুজোরীর বাড়িতেই থাকবেন শুনলাম—তাই বলছি।

নবীন। কে বললে?

পশুপতি। ভৈরব নিজে এসে বলে গেল।

নবীন। ও। (ইজি চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিল)

পশুপতি। আহা-হা ওখানে বসছেন কেন? সোজা একেবারে নিজের জায়গায় চলে যান। সে আগেই উঠে গেছে।

নবীন। কে?

পশুপতি। আপনার মুহা।—ওই তো! (দেখা গেল মুহা সিঁড়ির মুখে নেমে এসেছে)

[নবীন ওপরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু যাওয়া তার হলো না। গোলমাল শুনে ঘোরের দিকে তাকিয়ে দেখলে—অনেকগুলি মানুষ বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে। সতীশ ছাড়া আর সকলেই নবীনের অপরিচিত। পশুপতি তাড়াতাড়ি নীচের একটা ঘর থেকে দুটো মোড়া এনে দিলে।]

সতীশ। বসুন দারোগাবাবু, বসুন। (পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকটিকে নবীনের কাছে টেনে এনে) এই দেখুন বাবু এই আমার ছেলে ফকির। ফকির, বাবুকে প্রণাম কর। দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

নবীন। (দারোগাবাবুর কাছে এসে) নমস্কার।

দারোগাবাবু। নমস্কার। বসুন।

সতীশ। (নবীনকে দেখিয়ে) ইনিই আমার মনিব। এখানকার জমিদার। এই যাকিছু দেখছেন—সবই ওঁর। ওঁর দয়াতেই বেঁচে আছি।

নবীন। না মশাই। জমিদারী নেই, কাজেই এখন আর জমিদার নই। কি ব্যাপার বলুন তো!

দারোগা। খুব নোংরা ব্যাপার মশাই। সতীশবাবুর এই ছেলে ফকির (ফকিরকে দেখিয়ে) কলকাতা থেকে একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

নবীন। ফকিরের দুটি বৌ আছে জানি। কিন্তু এই দ্বিতীয়াটিকে ফকির তাহ'লে বিয়ে করেনি?

দারোগা। বিয়ে কি বলছেন? এখন আইন হয়ে গেছে, একটা বৌ থাকলে আর-একটা বৌ আনবার উপায় নেই। আবার বিয়ে করতে হলে আগেরটাকে ডাইভোর্স করতে হবে।

নবীন। জানি।

দারোগা। এখন আমার কাজ হলো গিয়ে এদের আদালতে হাজির করে দেওয়া। (সতীশকে) ডাকুন আপনার ছোট বৌমাকে।

(ডাকতে হলো না। বাড়ীর ভেতর থেকে সব মেয়েরাই বেরিয়ে এসেছিল।)

সতীশ। ওই তো এসে গেছে। এইখানে উঠে এসো বৌমা। দারোগাবাবু ডাকছেন।

(কালো রঙের একজন যুবতী এগিয়ে এসে দাঁড়ালো)

ফকির। (পকেট থেকে ছোট একটি চিরুনী বের করে মাথার চুল ঠিক করতে করতে) বিশ্বাস করবেন না স্যার। অল্ ফল্স্, অল বোগাস্।

দারোগা। চুপ কর। তুমি চুপ কর।

ফকির। হোয়াই চুপ করবো স্যার? ইন দিই টেম্পল্ অভ গডেস্ কালী, উই গেভ্ প্রাওয়ার নেকলেস্ টু ইচ্-আদার। মি টু সি, সি টু মি।

নবীন। (হেসে) তাই নাকি? মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে দু'জনে মালা-বদল করেছ?

ফকির। ইয়েস্ স্যার।

দারোগা। বেশ ইংরেজি বলে। আর বেশ গড় গড় করে বলে যায়।

ফকির। শিখতে হয়েছে স্যার। আমাদের কারোবার সব ইওরোপিয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—

নবীন। কি কাজ কর তুমি?

ফকির। অটোমোবাইল্ ইঞ্জিনিয়ারিং।

নবীন। তার মানে কলকাতার কোনও—

দারোগা। হ্যাঁ মশাই, মোটর মেরামতের কারখানার মিস্ত্রি। অনেক কষ্টে আমিই তো ধরে আনলাম সেখান থেকে।

ফকির। (চিরুনী দিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে ঠিক করতে করতে) সায়েব-পাড়ার অল দিই মোটর ওয়ার্কশপ নো মি ইন্ ওয়ান্ কল্। এক ডাকে চেনে স্যার। ফকির মেকানিক্—ব্যস্। (চিরুনীটা জামার বুক-পকেটে রেখে) অষ্টিন, মরিস, রোভার, সিঙ্গার—ইুডি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ডজ্, হাম্বার—এনি কাইণ্ড এনি রিপেয়ার—কল্ ফকির মেকানিক্। ব্যস্। (ডান হাতের দুটি আঙুলে আঙুলে ঘষে পট্ করে একটি আওয়াজ করে) হেন্ এজ হেয়ার। ক্যাচিং মিস্টেক্ বাই দিই আওয়াজ অভ এ গাড়ী ইজ্ নট এ চারটিখানি কথা স্যার। একটা বুড়ো মিস্ত্রি আছে হপ্‌কিন্স্ গ্যারাজে, সে পারে আর আমি পারি। (নবীনের দিকে তাকিয়ে) অমন করে তাকাচ্ছেন কি স্যার, আই ক্যান্ টেল্ ইন দি টপেষ্ট্ অভ্ মাই ভয়েস্—ইফ্ এনি ব্রাদার-ইন্-ল ক্যান্ ডু ইট্, আই স্যাল্ টেক্ সেভেন স্টুল্ অন মাই হেড্।

ফকিরের দ্বিতীয়া স্ত্রী। (এগিয়ে এসে) ছুটামি মারবার আর জায়গা পাও নাই?

সতীশ। এই আমার ছোট বৌ।

ফকির। (মেয়েটির দিকে চোখ পাকিয়ে) সাট্ আপ্ বুঁচি।

বুঁচি। রাখো তোমার চোখ-রাঙানি।

নবীন। এই যদি তোমাদের সম্বন্ধ তো তুমি এখানে এলে কেন?

বুঁচি। ও হারামজাদা তোচ্চার তো আমাকে বলে নাই—ওর বৌ আছে, ছেলে আছে।

নবীন। (দারোগাকে) ওর বাড়ীর লোক কিন্তু জানতো না বোধহয়।

দারোগা। না মশাই, এই বুঁচি মেয়েটিই তো এখান থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল ওর দাদাকে। (বেড়ালে ঠেস্ দিয়ে মাটিতে বসেছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক ছোক্‌রা। তাকে দেখিয়ে) এই তো ওর দাদা।

বুঁচি। হ্যাঁ, আমি দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম তো! লেখ্‌বো না? ও আমাকে বলে কিনা—বেশি ভিড়িং বিড়িং করবা তো কাট্যা পুঁতে ফেলবো।

ফকির। কে বলেছে? হু? হু সেড্ ইট্?

বুঁচি। থামো থামো, আর ইজিরি মারাতে হবে না। বল নাই—তোমরা মস্ত বড় জমিদার? বল নাই তোমাদের জমিদারী আমার নামে লিখ্যা দেবে? এখানে এসে দেখি—সব মিছা কথা। খেটে খেটে মরে গেলাম, পরণের একটা কাপড় দেবার মুরোদ নাই—ওরে আমার সোয়ামী রে! মুখে আগুন। মুখে আগুন অমন হতচ্ছাড়া পুরুষ মানুষের! (তার দাদার দিকে তাকিয়ে) এই দাদা! তুই ওখানে অমন করে বসে পড়লি কেন? ভাত-টাত খাবি তো?

শাশুড়ী-শান্তি। বৌমা! বলি অ বৌমা!

বুঁচি। কী বলছো?

শান্তি। এখানে এসো। শোনো।

দারোগা। দাঁড়ান মা, ওকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। (বুঁচিকে) বলি হ্যাগো মেয়ে, তোমাকে যে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বুঁচি। আ-মর্। তোমার সঙ্গে যাব কিসের লাগ্যা?

দারোগা। তোমার দাদা নালিশ করেছেন। বলেছেন—ফকিরবাবু তোমাদের বাড়ী থেকে তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। এতদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পেরেছেন—তোমাকে নাকি এইখানে আটকে রাখা হয়েছে।

বুঁচি। ও মা আমার কে গো! আমি কচি খুকি, আমাকে আট্‌কে রাখবে! আট্‌কে রাখবার মুরোদ কত! (ফকিরের দিকে তাকিয়ে ঘুচ্‌কি

হেসে) কেমন মজা! (দারোগার দিকে তাকিয়ে) দারোগার যেমন পাগার মতন বুদ্ধি! একেবারে পুলিশ দারোগা নিয়ে চলে এলে!

দারো। চিঠি তুই লিখিস নাই?

বুঁচি। হ্যাঁ লিখেছিলাম। লিখেছিলাম—কতদিন আমার খবর পাও নাই, ভেবেছ বুঝি আমি মরে গেছি। আমি মরি নাই। এইখানে আছি। তারপর (ফকিরকে দেখিয়ে) এই মানুষটার কলকাতার ঠিকানা জানিয়ে লিখেছিলাম—ওইখান থেকে ওকে ধরে নিয়ে এইখানে এসো। আমাকে দেখতে পাবে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। এই তো লিখেছিলাম—না আর কিছু?

দারো। বেশ তবে আমার সঙ্গে তোর কি কথা আছে বল্।

বুঁচি। আ মরি-মরি, ঘুঘু কোথাকার! এই এক হাট লোকের সামনে আমি বলি—

দারোগা। হ্যাঁ মা, বলতে হবে। উনি নালিশ যখন করেছেন, আর আমি যখন এনকোয়েরিতে এসেছি, তখন সব কথাই তোমাকে খুলে বলতে হবে। বল তুমি তোমার দাদাকে কি বলতে চেয়েছিলে!

বুঁচি। (সলজ্জ ভাবে মাথা নীচু করে) আমার ছেলে হবে।

(নবীন মুখ টিপে হেসে দারোগাবাবুর দিকে তাকাতেই দেখলে তিনিও তার দিকে তাকিয়ে আছেন।)

নবীন। এবার ওই দাদাটিকে বলুন, মামলা তুলে নিক।

দারোগা। (নবীনকে চুপিচুপি) মেয়েটির বয়স কত হবে?

নবীন। যতই হোক্, না-বালিকা নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

ভৈরবের বাড়ী।

[কার যেন আসার প্রতীক্ষায় মালা ঘর-বার করছিল, এমন সময় ভৈরব এলো। নবীন এলো তার পিছু পিছু—হাতে বন্দুক আর কাঁধে ব্যাগ।]

ভৈরব। মালা, এই নে, ধরে এনেছি। (নবীনকে) বোসো, বাবা বোসো। পালিয়ো না যেন। আমি এক্ষুণি আসছি। [চলে গেল]

মালা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

নবীন। বাড়ী যাবার জন্যে ট্রেনে যাচ্ছিলাম, তোমার বাবা ধরে নিয়ে এলেন।

মালা। ধরে নিয়ে এলো? জোর করে? এলেন কেন? না এলেই পারতেন।

নবীন। সত্যিই তো। না এলেই পারতাম। কেন এলাম বলতে পারো?

মালা। আমাকে দেখবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

নবীন। নয়ই-বা কেন? (ঘড়ি দেখে) নাঃ, ছুটে গিয়েও ট্রেনটা আর ধরতে পারবো না। উঁহু, খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

মালা। আপনার সে-ক্ষতি আমি পূরণ করে দেবো। (হাসতে হাসতে) বসুন—বসুন।

নবীন। (বসতে বসতে) সত্যিই তুমি অদ্ভুত। তুমি অপূর্ব।

মালা। অমন করে বলবেন না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এত মেয়ে দেখলেন, কেউ অপূর্ব হলো না—আমি অপূর্ব হলাম?

নবীন। তুমি যে তাদের থেকে একটু আলাদা—সেকথা কি তুমি নিজে জানো?

মালা। না, নিজের সম্বন্ধে অতখানি ভাববার অবসর পাইনি। ছেলেবেলা থেকে বাবা করেছে আপনার গোপালের পুজো, আর আমি করেছি গোপালের সেবা। সব সময়েই ভয় হয়েছে আমার দেহ-মন যাতে অশুচি না হয়! বিপদে যখন পড়েছি, গোপালকে ডেকেছি, গোপাল আমাকে রক্ষা করেছে। গোপালকে এখন আর ডাকতে হয় না, সব সময়েই মনে হয় গোপাল আমার সঙ্গেই রয়েছে। এ-কথা বলি না কাউকে, কথা উঠলো বলে শুধু বললাম আপনাকে। অন্যের থেকে আমি আলাদা যদি হয়ে থাকি তো হয়েছি এইখানে।

নবীন। আমি যদি বলি এ তোমার কল্পনার বিলাস?

মালা। যা খুশী তাই বলতে পারেন—আমার কিছু এসে যাবে না।—ও-কথা থাক্। আপনি আজ এখানে থাকবেন তো?

নবীন। (একটু হেসে) এই বাড়ীতে আমি রাত্রিবাস করবো—কাল সকালে দেখবো সারা গ্রামে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। তোমার নামে সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে—

মালা। জড়াক না। যা সত্য নয় তাকে আমি ভয় করি না।

নবীন। অপবাদকে ভয় করনা বুঝলাম, কিন্তু নিজেকে? নিজেকে তুমি বিশ্বাস কর?

মালা। (হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো) নিজেকে? বললাম না—গোপাল আমাকে সাহায্য করেন। বেশবেন? (হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল)

(নবীন একটা সিগারেট বের করলে পকেট থেকে। দেশলাই জেলে ধরালে। এমন সময় মালা ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে সুধা।)

মালা। (সুধাকে নবীনের কাছে ঠেলে দিয়ে) এই নিন, আপনার মনের ছট্‌ফটানি শান্ত হলো কিনা বলুন। দাঁড়ান, লণ্ঠনটা এনে দিই। এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে। (আবার বেরিয়ে গেল)

নবীন। (সুধার দিকে অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) এমনটি কেমন করে হলো সুধা?

মালা। (লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকে) আমার গোপালের ইচ্ছায়। (লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে) তোমরা বসে বসে গল্প কর। আমি চটকরে একবার গোপালের মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

সুধা। একা একা আমাকে—

মালা। একা কোথায়? দু'জন তো! (হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল)

সুধা। এই মেয়েটাকে যতই দেখি, অবাক হয়ে যাই। সামান্য একটুখানি লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু যে-কোনো বিষয় নিয়ে কথা বল ওর সঙ্গে, ও ঠিক তার জবাব দেবে। গান যে ও কোথায় শিখেছে জানি না, অথচ ওর গান শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। হাট বাজার করছে, পুকুর থেকে জল আনছে, সাঁতার কাটছে, গাছে চড়ছে, রান্না করছে, আবার গোপালের মন্দিরে যখন দেখি—তখন মনে হয় ও যেন অন্য মেয়ে। মনে হয় যেন ভক্তিমতী মীরা।

নবীন। ওর কথা পরে শুনবো। তুমি এখানে কেমন করে এলে তাই বল।

সুধা। কি জানলে? মেয়েটা ঝড়ের মত চলে গেল, অথচ যাবার সময় একবার দেখা পর্যন্ত করে গেল না?

নবীন। না, অত ছোট ভাবনা ভাবিনি। ভাবছিলাম—সুধাটা হঠাৎ নিবে গেল, পৃথিবীটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সুধা। আমি বাড়ী যাব বলে বেরিয়ে মালার কাছে চলে এলাম। মালা তার বাবাকে পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে—তোমাকে ধরে আনতে।

নবীন। এখন কি ঠিক করলে বল—কোথায় যাবে?

সুধা। আমার এই চোখ দুটো যেদিকে নিয়ে যাবে।

নবীন। এত সাহস কিন্তু ভাল নয়। বিপদ হতে পারে।

সুধা। যে-বিপদের কথা তুমি ভাবছো, সে বিপদ হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

নবীন। নিশ্চিন্ত হতে পারছি না যে!

সুধা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তুমি ভেবো না।

নবীন। নিজের ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

সুধা। এখনও পর্যন্ত সে বিশ্বাস হারাইনি।

নবীন। যদি কোনদিন হারাও?

সুধা। আমার ভালবাসা আমাকে রক্ষা করবে।

নবীন। সে ভালবাসা তো হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। সে তো শুধু কল্পনা।

সুধা। ভগবানের প্রতি ভালবাসাও তো মানুষের কল্পনা।

নবীন। জীবনটাকে তুমি কি এমনি করে নষ্ট করে দেবে?

সুধা। নষ্ট হবে না তুমি বিশ্বাস কর।

নবীন। বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি আমার।

সুধা। কে বলছে আমি তোমার নয়?

নবীন। তবু বলছো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

সুধা। হাঁ যাব, যাবার প্রয়োজন আছে।

নবীন। পারবে ছেড়ে যেতে?

সুধা। আমি আমার ছেলেকে ছেড়ে এসেছি ভুলে যাচ্ছ কেন?

নবীন। কি কুক্ষণে আমাদের দেখা হলো সুধা—কতক্ষণই বা আমাদের—

সুধা। সারাজীবনেও কিছু হয় না, আবার একটি মুহূর্তে যা হবার তা হয়ে যায়।—যেমনি তোমার চোখে আমার চোখ পড়েছে—

নবীন। কিন্তু তাতেই বা কি হলো সুধা? তোমার আমার দুটো জীবনই যে তুমি নষ্ট করে দিলে।

সুধা। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি, তোমাকে আমি অত নীচে নামতে দেবনা বলেই আজ আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।

নবীন। কিন্তু যে-সুধা তুমি আমার মধ্যে জাগিয়ে দিলে তার তৃপ্তি কোথায়?

সুধা। তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবাসো, দেখবে সে সুধার তৃপ্তি আছে তোমার মনে।

নবীন। না না না—দেহ ছাড়া মন আমি কল্পনা করতে পারি না সুধা।

সুধা। ছি ছি, এই উচ্ছিষ্ট দেহ? এ দেহ দুদিনেই পুরনো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনও যাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে। তখন কী সান্ত্বনা থাকবে আমাদের? এসো তুমি অত উতলা হয়ো না। তাহ'লে কিছুতেই তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না।

(নবীনকে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে)

নবীন। তুমি যেখানেই যাও আমাকে চিঠি লিখে জানাবে বল।

সুধা। নিশ্চয় জানাবো।

নবীন। টাকা পয়সার দরকার হলে আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে চাইবে?

সুধা। চাইবো।

নবীন। বিপদে পড়লে আমাকে ডাকবে?

সুধা। তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? (নবীনের মাথার চুলে হাতে বুলোতে বুলোতে) তোমার আর কি কি প্রতিজ্ঞা করবার আছে করিয়ে নাও।

নবীন। যদি কোনোদিন আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, যদি কোনোদিন কোথাও কোনও সান্ত্বনা খুঁজে না পাই, আমি তোমাকে ডাকব। তুমি আসবে বল!

সুধা। আসব—আসব—আসব। যেখানেই থাকি ছুটে চলে আসবো তোমার কাছে। যেখানে তুমি আসতে বলবে সেইখানে।

নবীন। এ-সব কথা আমি কেন বলছি জানো? কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না—আমি মানুষ।

সুধা। ভুলতে হবে কেন? শুধু মনে রেখো—এই মানুষই হয় দেবতা। তবে সে দেবত্বটাকে সাধনা দিয়ে অর্জন করে নিতে হয়। দেবতা বলে আলাদা কোনও জাত নেই।

নবীন। কিন্তু দেবতা যদি আমি না হতে পারি সুধা? আমার ভালবাসা, আমার প্রেম—সে কি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

সুধা। (চোখ দুটি ছলছল করছে) তোমার প্রেমের দাবী কি শুধু আমার এই দেহ? ক্ষুধিত পশুর মত আমার এই দেহটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে হত্যা না করে ফেলতে পারলে কি তোমার প্রেম শান্তি পাবে না?

নবীন। বিচারবুদ্ধিহীন ক্ষুধিত একটা পশুর সঙ্গেই তোমার পরিচয় হয়েছে সুধা, পরিপূর্ণ মানুষের সঙ্গে হয়নি। তাই তুমি এই নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহের পথটাকেই বেছে নিয়েছ। এমনি করেই ভাবছো তুমি তোমার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেবে না। আমি সব বুঝতে পারছি সুধা। আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো। তোমার ভুল যেদিন তুমি বুঝতে পারবে—আজ আমার কাছে তুমি শুধু এইটুকু বলে যাও যে সেদিন তুমি আসবে আমার কাছে?

সুধা। বলেছি তো ছুটে আসবো। পুজোর নৈবেদ্যর মত এই দেহ আমি তোমারই হাতে তুলে দেবো।

(মালা ঘরে ঢুকলো। সুধার কথার শেষটুকু শুনতে পেয়েছিল)

মালা। কী তুলে দেবে? কার হাতে?

সুধা। তোমাকে তুলে দেবো। (নবীনকে দেখিয়ে) এঁর হাতে।

মালা। উনি আমাকে নেবেন কেন ভাই? উনি হচ্ছেন রাজার ছেলে, আর আমি ওঁর পূজোরী বামুনের মেয়ে।

সুধা। তা হোক্। এত রূপ উনি পাবেন কোথায়? (মালার পরণে ছিল পরদের শাড়ী। মন্দির থেকে আসছে সে। পূজারিণীর বেশ।) তোকে ওর খুব ভাল লাগবে।

মালা। রক্ষে কর্ বাবা ভাল লাগালাগি! অনেক দেখলাম। ও চোখের নেশা দু'দিনেই কেটে যাবে। আমি বিয়েই করবো না।

সুধা। বিয়ে করবো না বললে বাপ শুনবে না। যেখান থেকে হোক্ যেমন করে হোক্ একটা বাঁদরকে ধরে এনে দেবে জুটিয়ে। তখন কি করবি?

মালা। তখনকার ভাবনা তখন ভাববো। এই ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ। একটু চা করে আনি।

সুধা। না, রান্নাঘরের কাজটা আজ আমি করবো। তুই ততক্ষণ ওঁকে একটি গান শুনিয়ে দে।

মালা। ধেৎ, আমার গান ওঁর ভাল লাগবে কেন? গান তুই শোনাবি।

নবীন। দু'জনের গানই শুনবো।

সুধা। তাই হবে। এখন তুই শোনা, আমি চা আনি।

(সুধা চলে গেল)

(নবীনের বন্দুকটা কাছেই নামানো ছিল।)

মালা। (বন্দুকটা নিয়ে) এইটে দরাই এখান থেকে। ওরে বাবা এ তো বেশ ভারি। এইটে দিয়েই সেদিন মন্দিরে আপনি পাখী মেরেছিলেন না?

নবীন। হাঁ।

মালা। (বন্দুকটা তুলে ধরে) কেমন করে চালাতে হয়? এমনি করে?

নবীন। না না ওরকম নয়। (তার কাছে গিয়ে মালার কাঁধের ওপর দিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে কেমন করে বন্দুক ধরতে হয়, কেমন করে চালাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় জোরে এসে দাঁড়ালেন নবীনের ম্যানেজার বিনোদবাবু, আর তার পেছনে সতীশ গোমস্তা।)

বিনোদ। নবীন!

(তাদের দেখেই মালা ছুটে পালিয়ে গেল। বন্দুক হাতে নিয়ে নবীন দাঁড়িয়ে রইলো)

সতীশ। আপনাকে বলেছি তো এইখানে পাবেন। ভৈরব ঠিকই বলেছিল।

বিনোদ। মেয়েটি কে?

সতীশ। ওই তো ভৈরবের মেয়ে—মালা।

বিনোদ। হুঁ (সতীশকে) চল। (ফিরে দাঁড়িয়ে) গাড়ীটা আমি এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি নবীন।

নবীন। কাল সকালে পাঠাবেন। আজ রাত্রে আমি এইখানে থাকবো।

সতীশ। শুনলেন তো? যা বলেছিলাম ঠিক কিনা!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নবীনের ঘর)

[বিন্দুবাসিনী এলেন। সঙ্গে ম্যানেজার বিনোদবাবুর মেয়ে চাঁপা।]

বিন্দুবাসিনী। এই ভাখ্ ম্যানেজার বাবুর মেয়ে চাঁপা। পছন্দ হয়?

নবীন। একে বিয়ে করতে হবে নাকি?

বিন্দুবাসিনী। সেই জন্যেই তো আনিয়েছি।

নবীন। কি নাম বললে?

বিন্দুবাসিনী। চাঁপা।

নবীন। চাঁপা তো ফুলের নাম। সে তো গাছে থাকে। তাকে আবার বিয়ে করে নাকি কেউ?

বিন্দুবাসিনী। ও-সব ঠেয়ালী রাখ্ বাবা। বলি মেয়ে দেখে বিয়ে করবি তাই একে আনালাম কলকাতা থেকে। দার্জিলিং থেকে টেলিগ্রাম এলো। ইলা মাষ্টারণী হয়েছে। বিয়ে করবে না।

নবীন। কিন্তু সভ্যতা-গোমস্তার সংসারে বিয়ের ব্যাপার যা দেখে এলাম, বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার চলে গেছে মা। একটা-আধটা নয়, যতগুলো দেখলাম—সব। মনে হলো সবাই আমরা জন্তু-জানোয়ার।

বিন্দুবাসিনী। ওদের সঙ্গে নিজের তুলনা করছিস কেন?

নবীন। অমনি বিয়ে তো আমারও হবে।

বিন্দুবাসিনী। তা কেন? মেয়ে এনে দিয়েছি, ভাখ্ ভাল করে, পছন্দ যদি হয় তো বিয়ে কর্।

নবীন। আমার একার পছন্দ হলেই তো হবে না মা, ওরও পছন্দ হওয়া চাই। আর্ শুধু বাইরের চেহারা দেখে পছন্দ করা উচিত নয়। কত সুন্দর চেহারার আড়ালে কত কুৎসিত মন লুকিয়ে থাকে। মনের পরিচয় হলো আসল পরিচয়।

বিন্দুবাসিনী। জানি না বাবা, আমরা সেকেলে মানুষ, অত-সব বুঝি না।

নবীন। বোঝ না বলেই তো দেশের এই দুরবস্থা। মানুষের পেটে জন্মাচ্ছে যত জানোয়ার, যত ভূত-প্রেত।

বিন্দুবাসিনী। আমাকে বলিসনে নবীন। যে-দেশের দিকে তাকিয়ে তোরা এই সব কথা বলিস, সে দেশে তো দেখছি বৌগুলোকে নিয়ে মানুষগুলো জলেপুড়ে মরছে। আজ বিয়ে করছে কাল ছাড়ছে। ঘর-সংসার বলে তো কিছু নেই, মনে সুখ নেই, শান্তি নেই—

নবীন। কিন্তু যা ভুল যারা করে বিপদে পড়ে তারাই। তারাই চেঁচায়, তারাই ছটফট করে—তাদেরই আমরা দেখতে পাই। ভুল করেনি—সেরকম লোকের সংখ্যাও সেখানে কম নয়। তাদেরই ছেলেমেয়েরা বিদ্যার বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন অদ্ভুতপূর্ব আবিষ্কারে সারা পৃথিবীটাকে বারংবার চমকে দিচ্ছে। তারা আর যাই হোক্—জন্তু জানোয়ারের বাচ্চা নয়, বাপমায়ের ভালবাসার সন্তান। সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

বিন্দুবাসিনী। তোর বক্তৃতা আমার ভাল লাগছে না নবীন। আমি চললাম। তোরা কথাবার্তা বল্। (যার পিছু পিছু চাঁপা বেরিয়ে যাচ্ছিল) তুমি চলে আসছো কেন? যাও, বোসো ওইখানে। নবীন কি বলতে চায়—শোনো। (মা চলে গেলেন)

চাঁপা। কি বলবেন বলুন।

নবীন। মা তোমাকে কেন এখানে আনিয়েছেন জানো তো?

চাঁপা। শুনলাম।

নবীন। শুধু শুনলাম নয়, তুমি ছেলেমানুষ নও, তোমারও একটা মত আছে। নির্ভয়ে সে মত তোমাকে প্রকাশ করতে হবে।

চাঁপা। তা যদি জানতে চান তো বলছি—আমি বিয়ে করব না। আপনিও তো বলেছেন বিয়ে করবেন না।

নবীন। না, আমি বিয়ে করব না বলিনি। বিয়ে আমি করব, কিন্তু আমার মনের মত মেয়ে চাই। ধরো তুমি যদি আমার মনের মত হও, তোমাকেও আমি বিয়ে করতে পারি।

চাঁপা। মনটা বুঝি একা আপনার?

নবীন। দু'জনের কথাই বলছি। দুজনেরই ভাল লাগা চাই।

চাঁপা। দেখুন, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেন, তবু একটা কথা আমি বলতে চাই, শুনবেন?

নবীন। নিশ্চয়ই শুনবো। বল।

চাঁপা। আমার যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি তাতে মনে হয়—চোখের দেখাটাকে একেবারে বাতিল করে দিলে চলে না। প্রথম দেখবামাত্র যাকে ভাল লাগে, শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে মনের মিল হয়।

নবীন। ও বুঝেছি। ইংরেজি বইএ পড়েছ—Love at first sight. এটা তোমার বই পড়া বিদ্যে। ও-সব কথা ছেড়ে দাও। বিয়ে তুমি করবে কিনা তাই বল।

চাঁপা। আমি তো আগেই বলেছি-বিয়ে আমি করব না।

নবীন। তুমি কি কাউকে ভাল বেসেছ?

(চাঁপা জবাব না দিয়ে বোবকরি লজ্জায় পালিয়ে গেল ঘর থেকে। মা ঢুকলেন)

বিন্দুবাসিনী। কি রে! মেয়েটি কেমন?

নবীন। ভাল।

বিন্দুবাসিনী। যাক্, বাঁচা গেল। তোর পছন্দ হয়েছে, এইবার বিয়েটা দিয়ে দিই।

নবীন। থামো মা থামো। মেয়েটাকে এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন যেন হেঁয়ালী হেঁয়ালী মনে হচ্ছে। আমার পছন্দ হলে কি হবে, মেয়েটা বলছে বিয়ে করবে না।

বিন্দুবাসিনী। তোর মতন ছেলে পেয়েও বলছে বিয়ে করবে না?

নবীন। কেন বলছে জানো মা? বিয়ের ব্যাপারটা দেখে দেখে সবাই আজকাল বুঝতে পেরেছে—এইখানে গোলমাল হলেই বাস্—জীবনটি খতম।

বিন্দুবাসিনী। তোর সঙ্গে বিয়ে হওয়া ওর ভাগ্যের কথা। দাঁড়া ওর বিয়ে করবো না বলা বের করছি। চাঁপা! চাঁপা!

[ডাকতে ডাকতে মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবীনের কাছারি বাড়ী

বিনোদ। সতীশ! সতীশ!

(সতীশ এলো। তার পিছু পিছু এলো তার স্ত্রী শান্তি)

সতীশ। (শান্তিকে) আঃ, তুমি কিজন্যে এসে আমার পিছু পিছু? আমাদের একটা আর্জেন্ট কথাবার্তা চলছে, দেখতে পাচ্ছ না?

শান্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি ওই ম্যানেজার-বাবুকেই বলছি—বলি, কই আমার একটা মেয়েকে তো পার করে দিলেন না? এদিকে ওই কালাভৈরবের মেয়েটার বিয়ের জন্যে তো একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

বিনোদ। কেন পাগল হয়েছি তা তুমি কেমন করে জানবে? যাও তুমি যাও বাড়ীর ভেতর যাও। দুদিন পরে সব বুঝতে পারবে।—যাও। এখনও দাঁড়িয়ে রইলো কেন? যাও!

শান্তি। (বিরক্ত হয়ে) যাচ্ছি। (চলে গেল)

বিনোদ। ভাখো সতীশ, আমি কেন এত ছটফট করছি তুমি বুঝতে পেরেছ?

সতীশ। আজ্ঞে না।

বিনোদ। আমার ছেলেপুলে নেই, একটিমাত্র মেয়ে—তা জানো তো?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি।

বিনোদ। সেই মেয়ের সঙ্গে নবীনের বিয়ে দেবো। কিন্তু সেদিন ভৈরবের বাড়ীতে তুমি আমাকে যা দেখালে—দেখে তো আমার মাথাটি ঘুরে গেল। ভৈরবের মেয়েটা দেখলাম খুব সুন্দরী মেয়ে।

আমার মেয়েও চেয়েও সুন্দরী। শেষকালে নবীন যদি বসে বসে আমি ওই মালাকেই বিয়ে করবো। তখন ?

সতীশ। আপনি কি পাগল হয়েছেন স্যার! ওই পুজোরীর মেয়েকে বিয়ে করবে আমাদের বাবু? তাছাড়া গিন্নি-মা রাজী হবেন কেন ?

বিনোদ। যাকগে বাবা তার আগেই আমি কাজটা সেরে দিয়ে যাই। ভবতারণের ছেলের সঙ্গে ভৈরবের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিই। কিন্তু ভবতারণ বলছে, তার একটি মেয়ে আছে, সেই মেয়েটির বিয়ে না দিয়ে ছেলের সে বিয়ে দেবে না। তাই তো তোমাকে বললাম—ভৈরবের ছেলেকে একটা আরজেন্ট টেলিগ্রাম করে দিতে।

সতীশ। দিয়েছি তো টেলিগ্রাম করে। আপনার নাম দিয়ে আরজেন্ট টেলিগ্রাম করেছি। সে তো এলো বলে।

বিনোদ। ভবতারণকে আসতে বলেছো ?

সতীশ। সে তো কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে গেছে। আজও সে আবার আসবে আমি বলে দিয়েছি।

বিনোদ। ভৈরবকে বলেছ ?

সতীশ। বলেছি তো, কিন্তু মুখ কালো। কি শুনতে কি শুনলে। আমাকে বললে আমি চিঠি বিলি করতে যাচ্ছি।

(ভৈরব ঢুকলো)

সতীশ। (ভৈরবকে দেখেই) ওই দেখুন। নাম করতেই এসেগেছে। ব্যাটা অনেকদিন বাঁচবে। তোর কপাল ভাল কালাভৈরব, ম্যানেজারবাবুর দয়ায় তোর মেয়ে ছেলে দুটোরই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

ভৈরব। প্রণাম ম্যানেজারবাবু, সতীশকে বলে দিন, ও আমাকে কিছু দেয় না। আমার খুব কষ্ট।

সতীশ। তোর কষ্ট আর থাকবে নারে ব্যাটা, দুই বেঁচে গেলি। (চলে যাচ্ছিল)

বিনোদ। পালাচ্ছো কোথায় ? এই সতীশ! ভৈরবের দেবোত্তর জমির চাল তুমি এক ঘাওনা আমি শুনেছি। সব তোমাকে দিতে হবে। না দিলে আমি তোমার হাত থেকে সব কেড়ে নেবো।

সতীশ। তাহলে মরে যাব স্যার।

বিনোদ। তোমার মরাই উচিত। (ভৈরবকে) শোনো ভৈরব, তোমার মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ভবতারণের ছেলের সঙ্গে।

ভৈরব। ওই সঙ্গে ঠাকুরের দুধের কথাটাও বলুন। আড়াইসের দুধ দেবার কথা। তা আধসের দুধে সের দুই জল ঢেলে দেয়। ঠাকুরের দুধে জল ঢালছে, পাপটা কার হচ্ছে ? বুঝিয়ে বলুন তো সতীশকে।

সতীশ। শুনুন—কি কথার কি জবাব দিলে শুনুন।

বিনোদ। তা ঠিক। কিন্তু তুমি একটি মস্ত শয়তান সতীশ। লোকটা নেহাৎ ভালমানুষ, তাই তুমি এতদিন বেঁচে গেছ। এবার কিন্তু এ-সবের একটা মীমাংসা না করে আমি এখান থেকে উঠবো না। (ভৈরবকে) তোমার মেয়ে মালার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল।

ভৈরব। আজ্ঞে না, ঠিক হবে কেমন করে ? আমার পয়সা কোথায় ?

বিনোদ। তোমার একপয়সা খরচ হবেনা। ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলেরও বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। কাজেই ও-ও কিছু নেবে না, তুমিও কিছু নেবেনা। তোমার মেয়ে, ভবতারণের ছেলে, আর ভবতারণের মেয়ে, তোমার ছেলে। বুঝছো ?

ভৈরব। আমি আর কি বুঝবো, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি যাই। আমার আবার ওদিকের কাজ আছে। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) মণি বলছিল সে আইন পড়বে। আমি বলেছি ম্যানেজারবাবুকে বলিস্। আমি গোপালকে বলবো। আমার আর কে আছে বলুন। আমি চললাম। (চলে গেল)

বিনোদ। আমার ওপর মানুষটার কি রকম বিশ্বাস দেখেছো সতীশ? ওর কোনও কষ্ট হবেনা। ওর ছেলে আর মেয়ের বিয়ে আমি নিবিঘ্নে চুকিয়ে দিচ্ছি জানো।

(আবার ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে ভবতারণ ঢুকলো)

ভবতারণ। নমস্কার। আমাকে আবার ডেকেছিলেন?

বিনোদ। হ্যাঁ, বলছিলাম—দুটো বিয়ে একসঙ্গেই হয়ে যাক তাহলে।

ভবতারণ। আমি তো সব কথাই বলেছি আপনাকে। আমার মেয়ের বিয়েটি আপনি দিয়ে দিন এই ভৈরবের ছেলের সঙ্গে। বাস ছেলের বিয়ে আমি তার পরের দিনই দিয়ে দেবো। কথাটা পাকাপাকি করবার জন্যে ভৈরবকে আমি আবার ধরে আনলাম আপনার কাছে।

বিনোদ। ভৈরবের কোনও অমত নেই। ও আমাকে বলেছে।—কি বল ভৈরব?

ভৈরব। আপনি যা করবেন আমি তাতেই রাজী। শুধু জেনে রাখুন পয়সাকড়ি আমার নেই। আর ছেলেটার পড়া যাতে নষ্ট না হয়।

বিনোদ। হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথাটা তোমাকে বলা হয়নি ভবতারণ। বিয়ের পর ওর ছেলে যদি হবে তোমার জামাই। সে যখন 'ল' পড়বে। এই পড়ার খরচটি তোমাকে দিতে হবে। জামাইকে উকিল করবে। তাতে তোমারই তো লাভ।

ভবতারণ। ওটা আবার কেন বলছেন ম্যানেজারবাবু? 'ল' পড়ানোর খরচটি তো কম নয়।

বিনোদ। তোমার অবস্থাও তো খারাপ নয়। তাছাড়া ভৈরবের ছেলে মণির মতন জামাই পাবে কোনদিন ভাবতে পেরেছিলে?

ভবতারণ। সে আপনার দয়া।

বিনোদ। তাহলে এই কথা রইলো। এ-কথার যেন নড়চড় না হয়।

ভবতারণ। আজ্ঞে না, তা হবে না।

বিনোদ। কলকাতায় আমি টেলিগ্রাম করেছি। আজই বোধহয় মণি এখানে আসবে। তার সঙ্গে কথা বলে আমি বিয়ের দিন ঠিক করে বিয়ে দিয়ে তবে এখান থেকে উঠবো। ওদিকে আবার আমার নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ভবতারণ। কোথায় ঠিক হলো?

বিনোদ। আমার মনিবের ছেলে তোমাদের ভূতপূর্ব জমিদার নবীনের সঙ্গে।

ভবতারণ। ওরে বাবা, তাহলে তো রাজা জামাই হলো আপনার!

বিনোদ। তা হলো।

ভৈরব। আমাকে আর আটকে রাখছো কেন? আমি যাই।

ভবতারণ। চল, দুই বেয়াই-এ একসঙ্গেই যাওয়া যাক। নমস্কার। চল।

(ভৈরব আর ভবতারণ চলে যেতেই পশুপতি এলো)

পশুপতি। (ম্যানেজারের পায়ের কাছে বসে) আমার একটা মীমাংসা করেদিন স্যার। আমি আর কতদিন বসে থাকবো?

বিনোদ। তোমার আবার মীমাংসা কিসের।

সতীশ। (ছুটে এসে পশুপতিকে ধরে) তুমি আবার এসময় এসে কেন? ওঠো এখান থেকে।

পশুপতি। দেখুন ম্যানেজারবাবু, আমি ওর কন্যাকে বিবাহ করেছি, আমি ওর জামাই, আমার সঙ্গে ব্যবহারটা দেখুন একবার। ওরা দুই স্বামীস্ত্রীতে আমাকে কি বলে ডাকে জানেন? ডাকে 'বুড়ো' বলে। বুড়ো আমার ডাক নাম। আমার বসবার জায়গা কোথায় জানেন? ওই যে গাছের তলায়—যেখানে তিনটে ছাগল বাঁধা আছে ওইখানে। ওই ছাগলের সঙ্গে আমিও ছাগল হয়ে আছি।

বিনোদ। তুমি রয়েছ কেন এখানে? বাড়ী চলে যাও না!

পশুপতি। বাড়ী যেতেই তো চাই, কিন্তু উনি যে ছাড়ছেন না ওর কন্যাটিকে। মাসে একবার

করে কন্যাটিকে টেনে টেনে নিয়ে আসছেন, আমি আসছি তার পিছু পিছু আর নিয়ে যাবার সময়—বুঝতেই তো পারছেন--আপনাকে সবই তো বলেছি।

সতীশ। তা বড়লোক জামাই, গরীব শ্বশুরকে যদি দু'দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করে তাতে ক্ষতিটা কি?

পশুপতি। দু'দশ টাকা হলে গ্রাহ্য করতাম না। দুশ' টাকা বলুন। গেল বারে দুশ' টাকা, তার আগের বারে একশ পঁচিশ টাকা। এবার কিন্তু পঞ্চাশ টাকার বেশি আমি দেবো না।

বিনোদ। (সতীশকে) তাই নাও না বাবা এবারকার মতন—যা দিচ্ছে তাই নিয়ে—দাও ওদের বিদায় করে।

সতীশ। পঞ্চাশ টাকা তো মেয়ের জামাকাপড় কিনতেই ফুরিয়ে যাবে।

বিনোদ। জামা-কাপড় তোমাকে কিনতে হবে কেন? সে-সব জামাই কিনবে।

পশুপতি। সেকথা আর কোন্ লজ্জায় বলবেন? এই সেদিন কিনে দিয়েছি তিরিশ টাকার। সে-সব ওর শ্বশুরবর্গের কাজে লেগেছে।

সতীশ। শুনুন—জামাইএর কথা শুনুন—'শ্বশুরবর্গ।'

পশুপতি। আপনি যদি বলেন তো আরও পঁচিশটা টাকা বাড়াতে পারি।

সতীশ। না। পুরোপুরিই করে দিতে বলুন।

(ব্যানেজারবাবু তাকালেন পশুপতির দিকে। পশুপতি চোখের ইসারায় সম্মতি জানালে)

বিনোদ। তাহলে এই কথা রইলো সতীশ একশটি টাকা নিয়ে কালই তুমি মেয়ে-জামাইকে বিদেয় করে দাও।

সতীশ। তাই হবে। আপনি যখন বলছেন—

(একটি সুটকেশ হাতে নিয়ে এলো ভৈরবের ছেলে মণি। সুন্দর চেহারা)

সতীশ। (পশুপতিকে : এই তো মণি এসে গেছে। যাও তুমি ওঠো এখান থেকে।

(পশুপতি উঠে গেল)

মণি। (বিনোদবাবুকে প্রণাম করে) আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই চলে এলাম। কি জন্যে ডেকেছেন আমাকে?

বিনোদ। তুমি কি সোজা এইখানেই চলে এলে?

মণি। আজ্ঞে হাঁ।

বিনোদ। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো। চা'টা খাও, তারপর বলছি।

মণি। (বললো) চা আমি খাই না। আপনি বলুন।

বিনোদ। তুমি কী বলেছ তোমার বাবাকে? বি-এ পাশ করে 'ল' পড়বে?

মণি। ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু—

বিনোদ। আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যতদূর পড়তে চাইবে তিনি পড়াবেন।

উৎসবের দিনে

উৎসবের দিনগুলি সার্থক হয়ে ওঠে যখন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়-জনদের হাতে তাদের পছন্দমত বস্ত্রসম্ভার পরিবেশিত হয়। স্বদেশী যুগে বিলাতী সৌখীন বস্ত্র ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মহান ব্রত বাঙালী গ্রহণ করেছিল আর সেই ব্রত সার্থক করে তুলতে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্ম হয়েছিল। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে আর তার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দেশের সেবায়, ৫১ বৎসর

বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭নং জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা।

মণি। কেন পড়াবেন? তাঁর স্বার্থ?

বিনোদ। তুমি বিয়ে করবে তাঁর মেয়েকে।

মণি। আমি কি তাঁকে চিনি?

বিনোদ। নিশ্চয়ই চেনো। তোমাদেরই গাঁয়ের ভবতারণ চৌধুরীকে চেনো তো? তারই মেয়ে।

মণি। হুঁ।

বিনোদ। তাকেই তুমি বিয়ে করবে আর তার ছেলে বিয়ে করবে তোমার বোন মালাকে।

মণি। আপনি কি এই জন্যেই আমাকে ডেকেছেন?

বিনোদ। হ্যাঁ, এই জন্যেই। আমি জানি তুমি আমার কথা শুনবে। আর তাছাড়া তোমার বোনটির বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে, দশ জনে দশ কথা বলছে, সেটাও শুনতে কেমন যেন ভাল লাগছে না।

মণি। মালা বিয়ে করবে না।

বিনোদ। কেন করবে না?

মণি। সে তো বলে—গোপাল-মন্দিরের গোপালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

বিনোদ। (হো হো করে হেসে) পাগল! পাগল! না না, তুমি জানো না। মালা বিয়ে করতে চায় আমাদের বড়বাবুর ছেলে নবীনকে।

মণি। মালা নবীনবাবুকে দেখলে কখন?

বিনোদ। দেখেছে। তুমি জানো না।

মণি। (উঠে দাঁড়ালো) আমি বাড়ী যাই।

বিনোদ। তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও। ভবতারণের সঙ্গে কথাবার্তা আমি পাকা করে ফেলেছি।

মণি। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

বিনোদ। বেশি সময় কিন্তু দিতে পারব না। তোমাদের বিয়ে দুটো আগে সেরে দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে সারবো।

মণি। আপনার মেয়ের বিয়ে কোথায়? কার সঙ্গে?

বিনোদ। আমার মেয়ের বিয়ে নবীনের সঙ্গে।

(মণি চলে যাচ্ছিল। বিনোদবাবু ডাকলেন, 'শোনো'। মণি ফিরে দাঁড়ালো)

বিনোদ। ভাখো, তোমরা আজকালকার ছেলে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে। তবে তুমি সে রকম নও এই যা ভরসা। তুমি যদি মেয়েটিকে একবার দেখতে চাও আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

মণি। দেখতে হবে না। মেয়ে আমি দেখেছি। ভাল নয়।

বিনোদ। ভাল নয় মানে? গায়ের রং কালো, এই তো?

মণি। আমাকে দেখাবার আগে আপনি নিজে একবার ভাল করে দেখবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবীনের বাড়ী

(রাত্রি।)

[একটা ঘরের জানলার শিক ধরে নবীন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কি যে দেখতে পেয়ে—]

নবীন। হরি! হরি। শোন্! ওপরে উঠে আয়।

(পকেট থেকে সিগরেট ধরিয়ে টানতে লাগলো)

হরি। (ঘরে ঢুকে নবীনের কাছে গিয়ে) কি বলছেন?

নবীন। ওখানে ওরকম করে উঁকি ঝুঁকি মারছিলি কেন? কি দেখছিলি?

হরি। কিছুই দেখিনি তো!

নবীন। ওই যে ঘাটের কাছে বসে আছে—কে ও লোকটা?

(হরি মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলো)

চুপ করে রইলি কেন? বল—আমি কাউকে বলবো না। বলবি না? আচ্ছা বেশ তাহলে আমি যাচ্ছি ওইখানে।

হরি। যাবেন না দাদাবাবু, আমি বলছি।

নবীন। বল।

হরি। আপনাকে বলতেই বারণ দাদাবাবু। উনি আমাদের ঝিলিমিলির গোপাল-মন্দিরের সেই যে পুজোরী ভৈরব—তার ছেলে মণিবাবু।

নবীন। কি বলছে সে ?

হরি। ম্যানেজারবাবুর মেয়ে চাঁপা-দিদিমনিকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন উনি।

নবীন। কোথায় সে চিঠি ?

হরি। চাঁপা-দিদিমণিকে দিয়ে দিয়েছি।

নবীন। দিদিমণি কি বললে ?

হরি। কাউকে বলবেন না দাদাবাবু। (হাতের মুঠো খুলে ছোট একটুকরো কাগজে লেখা একটি চিঠি দেখিয়ে) এই চিঠিখানি মণিবাবুকে আমি দিতে যাচ্ছি।

নবীন। (চিঠিখানি খুলে ধরে) "ঠিক আছে। কিছু ভেবো না তুমি। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। এরা জানবে আমি কলকাতায় চলে গেছি।"

ইতি—

তোমারই চাঁপা।

(চিঠিখানা হরির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে) যা দিগে যা। আমি যে জেনে ফেলেছি কাউকে বলিসনি। চাঁপা যদি কোথাও যেতে চায় ওকে বাধা দিস্‌নি।

(হরির মুখে হাসি ফুটলো। চিঠিখানি নিয়ে সে চলে গেল।)

নবীন। (আনন্দের হাসি হেসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) যাক্, বাঁচা গেছে।

(মা বিন্দুবাসিনী এলেন)

বিন্দুবাসিনী। না বাবা অনেক মেয়ে দেখেছি কিন্তু এমন মেয়ে দেখিনি।

নবীন। (হেসে) কার কথা বলছো ?

বিন্দুবাসিনী। ম্যানেজারের মেয়ে। আমি ওর শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি, কিন্তু সেই বহুকভাঙা পণ—বিয়ে করবো না। হয় ওর কোনও ব্যারাম আছে আর নয়তো এমন কোনও রাজা-মহারাজাকে ভালবেসেছে যার জন্যে তোর মত পাত্রকেও তার মনে ধরছে না।

নবীন। (হেসে) হ্যাঁ, রাজা-মহারাজাই বটে।

বিন্দুবাসিনী। তা নয়তো কী ? আচ্ছা তুই বল্ তো খোকা, তোর পছন্দ হয়েছে তো ?

নবীন। কতবার সেই এক কথা বলবো মা ?

বিন্দুবাসিনী। বাস্, তোর পছন্দ হয়েছে, এইবার আসুক ওর বাপ, তারপর দেখাচ্ছি মজা। মেয়েছেলের এত বাড় ভাল নয়।

(নবীন চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে) তুই যাচ্ছিস কোথায় ?

নবীন। কিছু বলবে ?

বিন্দুবাসিনী। আমার এক-এক সময় সন্দেহ হচ্ছে—তুই শিখিয়ে দিসনি তো মেয়েটাকে—?

নবীন। কি শিখিয়ে দিয়েছি ?

বিন্দুবাসিনী। তুই বলবি বিয়ে করবো, আর ও বলবে বিয়ে করবো না !

নবীন। না মা না, আমি কেন শেখাতে যাব ? চাঁপার সঙ্গে আমি কথাই বলি না। আমার সঙ্গে তার দেখাও হয় না। (বেরিয়ে গেল ঘর থেকে)

(হরি এসে ঘরে ঢুকলো—)

হরি। ম্যানেজারবাবু এসেছেন।

বিন্দুবাসিনী। ডাক তো তাকে আমি একবার শুনিয়ে দিই ভাল করে।

ম্যানেজার বিনোদ। (ঘরে ঢুকেই) ডাকতে হবেনা আমি এসেছি। কি শুনিয়ে দেবেন—শোনান্।

বিন্দুবাসিনী। বিলিমিলিতে গিয়ে বসেছিলেন কেন ?

ম্যানেজার। সেখানে একটা মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা করতে হলো। আবার যেতে হবে। চেনেন তো আপনার গোপাল মন্দিরের পুজোরী সেই কালা ভৈরবকে ?

বিন্দুবাসিনী। কেন, আপনি জানেন না ? নবীনের বাপ যে ওকে খুব ভালবাসতো।

ম্যানেজার। তার একটি মেয়ে আছে, জানেন ?

বিন্দুবাসিনী। জানি। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে।

ম্যানেজার। শুধু তাই নয়। মেয়েটি পরমা সুন্দরী। সেখানে গিয়ে শুনলাম—ওই ভৈরব তার মেয়েটাকে

নবীনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে চায়। আমি তাই নিজে গেলাম সেদিন ভৈরবের বাড়ীতে। গিয়ে যা দেখলাম—থাক্, সেকথা আপনার আর শুনে কাজ নেই।

বিন্দুবাসিনী। না বাবা নবীন তো আমার সেরকম ছেলে নয়।

ম্যানেজার। আমি নিজে দেখেছি মা। নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারিনা! আমার ভয় হলো নবীন না বলে বসে ওই মেয়েটাকেই সে বিয়ে করবে।

বিন্দুবাসিনী। তাই যদি করে তো করুক।

ম্যানেজার। কী বলছেন মা? হত দরিদ্র ওই পুরোহিত-বামুনের মেয়ে আসবে আপনার বাড়ীতে বৌ হয়ে? যাক্‌গে, সে-পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ওই গ্রামেই ভবতারণ চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ভবতারণের একটি মেয়েও আছে। সে ধরে বসলো—মেয়ের বিয়ে না দিয়ে আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারবো না। তারই ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমার দেরি হয়ে গেল। টেলিগ্রাম করে কলকাতা থেকে আনালাম ভৈরবের ছেলে মণিকে। সেই যে আমার চাপার সঙ্গে পড়ে যে-ছেলেটি তার সঙ্গে ভবতারণের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম। কাল আমি আবার যাব ঝিলিমিলিতে। ওদের বিয়ে দুটো চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসে চাঁপার বিয়ে দেবো।

বিন্দুবাসিনী। (একটু হেসে) কার বিয়ে দেবেন? আপনার মেয়ে চাঁপার? তবেই হয়েছে। এখানে এসে অবধি সেই এক জিদ ধরে বসেছে—বিয়ে সে করবে না।

ম্যানেজার। বলুক। ওই রকম বলা তার অভ্যেস। সেজন্যে ভাববেন না। এখন নবীন কি বলছে বলুন।

বিন্দুবাসিনী। নবীন বলছে তার পছন্দ হয়েছে।

ম্যানেজার। হরি! হরি! (হরি এলো)

তাকতো বাবা নবীনকে। (হরি চলে গেল) এবার আপনি বলুন মা, ছেলের বিয়েতে আপনি কি নেবেন আমার কাছ থেকে।

বিন্দুবাসিনী। (আবার হাসলেন) এ কি কথা বলছেন? আমি চাই ছেলের বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে একটি বৌ আনতে! আমি কি কুলিন বামুনের মত ছেলের বিয়েতে পণ চেয়ে বসবো নাকি?

ম্যানেজার। তাহলেও ধরুন আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে। নবীনের মত জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে!

বিন্দুবাসিনী। বেশ তাহলে মেয়ে-জামাইকে ভালকরে সাজিয়ে দিন।

ম্যানেজার। সেই ভাল। কলকাতায় আমাদের একটা বাড়ী আছে। আমার ভাইএর সঙ্গে অর্ধেক ভাগ। সে তো আমার মেয়েই পাবে। এই বিয়েটা যদি চুকিয়ে দিতে পারি তাহ'লে আর আমার ঝিলিমিলিতে যাবার দরকার নেই ভবতারণের ছেলে মেয়ের বিয়ে না হলো তো আমার বয়েই গেল।

(নবীন এলো)

নবীন। কি বলছেন?

ম্যানেজার। চাঁপাকে পছন্দ হয়েছে শুনে কী আনন্দ যে আমার হলো তা আর কি বলবো! এবার তুমি বল—তোমার কি চাই।

নবীন। আমার কিছু চাই না। মেয়ের বাপের কাছ থেকে আমি একটি পয়সাও নেবো না।

ম্যানেজার। মেয়ের বাপ যদি স্বেচ্ছায় দিতে চায়?

নবীন। তবু না। তিনি যা দেবেন তাঁর মেয়েকে দেবেন।

বিন্দুবাসিনী। হরি, চাঁপাকে একবার ডাক দেখি।

ম্যানেজার। না না ওকে এখন ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। সেই এক কথাই বলবে। কাল সকালে আ ওকে যা বলবার বলবো।

[ষ্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল]

• • •

বিন্দুবাসিনীর ঘর

(সকাল)

[চৌকের আলো জলতেই দেখা গেল, পরের দিন সকাল। চায়ের একটি ট্রে হাতে নিয়ে হরি ঢুকলো মায়ের ঘরে]

রি। মা! মা!

বিন্দুবাসিনী। কি রে, কি বলছিস? আমি কি এই সকালে চা খাব নাকি?

রি। না মা, এ চা আপনার জন্যে নয়। চাপা দিদিমণির জন্যে চা নিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি—চাপা-দিদিমণি নেই। তাঁর টেবিলের ওপর এই চিঠিখানি পড়ে রয়েছে।

বিন্দুবাসিনী। চিঠি? কই দেখি।

(ট্রে নামিয়ে তার ওপর থেকে কাগজের টুকরোটি হরি মার হাতে দিতেই মা পড়লেন—)

['আবার লিখছি—নবীনবাবুকে বিয়ে আমি করবো না। জানিয়ে গেলে যেতে দেবেন না, তাই আমি কাউকে না জানিয়েই কলকাতা চলে যাচ্ছি। মন যেখানে চায়না সেখানে আর যাই করা চলুক বিয়ে করা চলে না। নবীনবাবুর জন্যে আমার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে আপনারা পাবেন। আমার ওপর রাগ করবেন না।

ইতি—চাপা।']

ভাল। পাজী তাহ'লে উড়লো! না মেয়েটার দোষ নেই। সে প্রথম থেকেই বলেছিল - বিয়ে করবেনা। আমিই মিছেমিছি মেয়েটার খোসামুদি করছিলাম। —হরি, তাকে—নবীনকে আর ম্যানেজারবাবুকে দু'জনকেই ডেকে দে।

ীন এলো)

।। না ডাকতেই আমি এসেছি মা। ম্যানেজারবাবুকে ডাকবে? কেন?

াসিনী। (চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে) এইটে পড়ে ভাখ। চাপা পালিয়েছে কলকাতায়।

নবীন। (চিঠিখানি মনে মনে পড়তে পড়তে) এই চা'টা কার চা?

হরি। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম চাপা-দিদিমণির জন্যে। ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।

নবীন। তাহ'লে আমিই খেয়ে ফেলি। (নিজেই চা তৈরি করতে লাগলো)

বিন্দুবাসিনী। হরি, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন বাবা? চাপার বাপকে এই সুখবরটা দিয়ে আয়।

নবীন। (হাতের চিঠিটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে) এই চিঠিখানা দিয়ে যা।

(চিঠি নিয়ে হরি চলে গেল)

বিন্দুবাসিনী। ছি ছি, তোর বিয়ে নিয়ে খুব কেলেঙ্কারী হলো বাবা। যত ঝঞ্ঝাট বাধালি তুই নিজে।

নবীন। কি রকম?

বিন্দুবাসিনী। মেয়ে দেখতে চাইলি—তাই না শুনে ম্যানেজারবাবু বললেন, আমার মেয়েটিকে দেখুন। কিন্তু তার মেয়ে যে এই রকম সর্ব্বনেশে মেয়ে তা কে জানতো!

নবীন। না মা না, মেয়েটা খারাপ নয়, মেয়েটা ভাল। আত্মসম্মান বোধ আছে।

বিন্দুবাসিনী। ছাই আছে। বাপ তো আমাদের এখানে চাকরি করে। তাও তো আমাদের জমিদারী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরিও গেল। তার মেয়ের এত অহঙ্কার ভাল নয়। তোর মত ছেলের সঙ্গে ওর বিয়েটাকে ও ভাগ্য বলে মনে করলে না? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে তখন বিয়ে ওকে একদিন করতেই হবে।

নবীন। তা হবে।

বিন্দুবাসিনী! তাহ'লে তোকে ছেড়ে কোন্ রাজা-মহারাজার ছেলেকে ও বিয়ে করবে শুনি?

নবীন। (হেসে) আচ্ছা মা, ধরো আমিই যদি চাপাকে বিয়ে করি?

বিন্দুবাসিনী। তাকে তুই পাবি কোথায় ?

(ম্যানেজার বিনোদবাবু এলেন)

ম্যানেজার। এটা কি রকম হলো বলতে পারেন ? একটা মেয়ে এই এত বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল—কেউ দেখতে পেলে না, কেউ আটকালে না ? হরি ! শ্যামসিংকে একবার ডাক দেখি, আমি জিজ্ঞাসা করি।

বিন্দুবাসিনী। না বাবা হরি, যাস্‌নে। দরোয়ানকে ডেকে একটা হৈ চৈ গোলমাল করে আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নেই।

ম্যানেজার। তাহ'লে আপনি কি বলতে চান ?

বিন্দুবাসিনী। আমি আর কি বলবো, আপনার মেয়ে তো চিঠিতে সব কথা লিখে দিয়ে গেছে।

ম্যানেজার। লিখুক্। লিখলেই কি ওর কথা শুনতে হবে নাকি ? আমি ওর বাপ্ না ? কলকাতা থেকে আমি ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছি দেখুন। আসছে শুক্রবার বিয়ের দিন আছে, সেইদিনই ওর বিয়ে দেবো।

নবীন। আপনি ওকে একটু বেশি আদর দিয়ে ফেলেছেন।

ম্যানেজার। হ্যাঁ বাবা তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি ঠিক ধরেছ। ছেলেবেলায় ওর মা মরে গেল, ওই আমার একটি মাত্র মেয়ে—আদর একটু বেশিই দিয়েছি। পরশু একটা বিয়ের দিন আছে। চাঁপা চলে না গেলে পরশুই আমি ওর বিয়েটা দিয়ে দিতাম। আর একটা দিন শুক্রবারে। আর একটা দিন সেই পনেরো দিন পরে আঠাসে তারিখে।

নবীন। দিনগুলো আপনি মুখস্থ করে রেখেছেন দেখছি।

ম্যানেজার। মুখস্থ করতে হয়েছে—ভৈরবের মেয়ে মালার সঙ্গে ভবতারণের ছেলের বিয়েটা দেবো ভেবেছিলাম শুক্রবারে, তারপর ওর ছেলে মণির বিয়ে দেবো ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে—সেটা না হয় পনেরো দিন পরে হলেও চলবে। সে যা হয় হবে, এখন শোনো বাবা নবীন, তোমার যখন অমত নেই তখন আমি বলি কি, এখানে বিয়ের সব ঠিক করে রাখো, আমি এই দশটার ট্রেণেই চলে যাই কলকাতায়। চাঁপাকে ধরে আনি।

বিন্দুবাসিনী। আপনি এখনও ভাবছেন—চাঁপাকে ধরে আনতে পারবেন ?

ম্যানেজার। নিশ্চয়ই পারবো। পরশু আর হবে না। শুক্রবার বিয়ে আমি দেবোই। তোমার হাতে তিনহাজার টাকা আমি দিয়ে যাচ্ছি নবীন। গাড়ীটা নিয়ে গিয়ে সুলতানপুরের বাজার থেকে তোমার নিজের যা ইচ্ছে নিয়ে এসো। লোকজন খাওয়াবার ব্যবস্থা আমি ফিরে এসে করবো। আমার আর দেরি করলে চলবে না। চলি। টাকা আমি দিয়ে যাচ্ছি। (চলে গেলেন)

বিন্দুবাসিনী। কি জানি বাবা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নবীন। আমি তোমাকে সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি মাথো।

বিন্দুবাসিনী। তুই কি ভাবছিস চাঁপা আসবে ?

নবীন। আসতেও পারে।

বিন্দুবাসিনী। সে যে তোকে বিয়ে করবে না লিখে দিয়ে গেছে যে—

নবীন। লিখুক্‌গে।

বিন্দুবাসিনী। তবু তাকেই বিয়ে করতে চাচ্ছিস ?

নবীন। হ্যাঁ। তুমি শুধু পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে যা যা করতে হয় ঠিক করে রেখো।

বিন্দুবাসিনী। তুই যেতে যে না !

নবীন। আমি খেয়েদেয়ে একবার গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে যাব। সুলতানপুরের বাজারে জিনিসপত্র কিনবো, তারপর আসবার সময় ঝিলিমিলি হয়ে আসবো।

বিন্দুবাসিনী। ঝিলিমিলি যাবি কি জন্যে ?

নবীন। তোমার ছেলের বিয়ে, তোমার গোপাল-মন্দিরের পুরোহী বেচারা ভৈরব তো তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল। তাকে বলে আসবো।

বিন্দুবাসিনী। হাঁরে, ম্যানেজারবাবু একটা কথা আমাকে বললেন, কথাটা কি সত্যি ;

নবীন। কি কথা?

বিন্দুবাসিনী। ভৈরবের মেয়েটি কি খুব সুন্দরী?

নবীন। সে রকম সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

বিন্দুবাসিনী। তুই নাকি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি?

নবীন। কই না তো!

বিন্দুবাসিনী। ম্যানেজারবাবু তাহ'লে ভুল বলেছেন।

নবীন। বলবেনই তো। মেয়েটা যে ওঁর মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

বিন্দুবাসিনী। ভৈরব কি মেয়েটার বিয়ে দিতে পারবে?

নবীন। মেয়েটা বোধহয় বিয়ে করবে না। গোপাল গোপাল করেই পাগল।

বিন্দুবাসিনী। তাই নাকি? তাহ'লে তুই আসবার সময় তাকে গাড়ীতে বসিয়ে একবার নিয়ে আয় না, আমি দেখি। বিয়ের সময় এখানে থাকবে, তারপর বিয়ের পর আমরা যখন গোপালকে প্রণাম করতে যাব তখন আমাদের সঙ্গে যাবে।

নবীন। বলে দেখবো – যদি আসে।

বিন্দুবাসিনী। মেয়েটার বিয়ের জন্যে ভৈরবকে কিছু টাকা দিতে হবে। তোর বাবা ওকে খুব ভালবাসতো।

নবীন। ভৈরব সেকথা বলেছে আমাকে।

বিন্দুবাসিনী। মানুষটা ভাল।

নবীন। ওর স্ত্রীও বোধহয় ভাল ছিলেন।

বিন্দুবাসিনী। কি জানি বাবা, আমি দেখিনি।

নবীন। দেখবার দরকার হয় না মা। ছেলেমেয়েকে দেখলেই মা-বাপ দুজনকেই চেনা যায়।

(ম্যানেজার এলেন)

ম্যানেজার। (একতাড়া নোট দিয়ে) এই টাকাটা রাখো নবীন। তোমাকে যা বললাম তাই কোরো। সরকারকে বলে গেলাম। অন্য ব্যবস্থা সবই সে করে রাখবে।

বিন্দুবাসিনী। আপনার মেয়ে আসবে বলে এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ও বলবে আমি বিয়ে করবো না।

আমি ওর ভালমন্দ বুঝবো না? ও একটু লে শিখেছে বলেই একেবারে এত স্বাধীন হয়ে আমি চলি। [চলে গে

তৃতীয় দৃশ্য

ভৈরবের বাড়ী

(দিনের বেলা)

[নবীন এসে দাঁড়ালো।]

মালা। দয়া করে এলেন যখন—বসুন।

নবীন। তোমার দাদা কোথায়?

মালা। আছে যেখানে হোক্। বসুন, তারপর ক'দিন আমার কি ভাবনাতেই না কে দিনরাত শুধু গোপালকে ডেকেছি।

নবীন। গোপাল কি বললে? দেখা হলো গো সঙ্গে?

মালা। হলো বই-কি! এই তো আপনাকে প দিলে।

নবীন। তোমার গোপাল আমাকে পাঠিয়েছে জানি না, আমি এসেছি নিজের গরজে।

মালা। গরজটা কি শুনি?

নবীন। চাপাকে নিতে এসেছি।

মালা। চাপা এখানে আছে আপনাকে কে বললে?

নবীন। আমি জানি।

মালা। জানেন তো খুঁজে বের করে নিন। এই ক'খানা মাত্র ঘর।

নবীন। আমি পুলিশও নই, ডিটেক্‌টিভও নই, তো কিছু অপরাধ করনি। খুঁজে বের করতে কেন? ডেকে দাও চাপাকে। (মালাকে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখে) কে লুকিয়ে রেখেছো বল না!

মালা। বেশ লুকিয়ে কেন রাখবো?

নবীন। লুকিয়ে রাখা অভ্যাস তোমার আছে। সু তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

নবীন। চিরকাল মনে থাকবে।- না না ছেলো না। বল তারা কোথায় আছে।

মালা। চাঁপা গেছে কলকাতায়। সে তো চিঠি দিয়ে এসেছে।

নবীন। হ্যাঁ, সেই চিঠি পেয়েই তার বাবা ছুটেছে কলকাতায়।

মালা। তা আপনি এখানে কেন এলেন? আপনারও কলকাতায় যাওয়া উচিত ছিল।

নবীন। চাঁপার কলকাতার পথ এইদিকে—আমি জানি যে।

মালা। জানেন? কেমন করে জানলেন? সে তো আপনাকে কিছু জানায় নি।

নবীন। চুরি করে জেনে নিয়েছি।

মালা। (নবীনের কাছে বসে) বিপদের কথা শুনুন তাহ'লে। চাঁপা মেয়েটিকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কাল দেখলাম। আগে অবশ্য মণির কাছ থেকে শুনেছি সব।

নবীন। মণিকে তুমি দাদা বল না?

মালা। কখনও বলি, কখনও বলি না। আমরা দু' বছরের ছোট-বড়।

নবীন। মণির কথা পরে শুনবো। চাঁপার কথা বল।

মালা। খুব করে বকলাম মেয়েটাকে। বললাম, তোমার বাবার কাছ থেকে ভিক্ষে করে যে-ছেলে লেখাপড়া শিখছে, বাপ যার পূজোরী বামুন, সাধ-আহ্লাদ দূরের কথা, দুমুঠো খেতে দেবার ক্ষমতা যার নেই, সেই গরীব ছেলেটার শুধু চেহারা দেখে তুমি ভালবেসে ফেললে? দুদিন বাদে যখন পুরনো হয়ে যাবে তখন বুঝবে মজা! কেঁদে কেঁদে মরবে। এমনি সব আরও অনেক বড় বড় কথা বললাম।

নবীন। বড় বড় কথা কি রকম বল না শুনি।

মালা। থাক্ বলবো না। আপনি ঠাট্টা করছেন।

নবীন। না না ঠাট্টা করিনি। তুমি বল। তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুনতে মন্দ লাগছে না।

মালা। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে) মন্দ লাগছে না? আচ্ছা তবে শুনুন। চাঁপাকে বললাম, নবীনবাবু রাজার ছেলে, লেখাপড়া জানেন, দেখতে-শুনতে ভাল, তিনি যখন তোকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তখন তাকেই বিয়ে কর, রাণী হয়ে থাকবি, সুখে থাকবি।

নবীন। এই কথা বললে? বলতে পারলে?

মালা। কেন পারবো না? আরও বললাম, নবীনবাবু ভালবাসার কথা মুখে বলেন বটে, কিন্তু ভালবাসা-টালোবাসার ধার ধারেন না, তোর গায়ের রংটা কর্সা আর বয়েসটাও যখন কম, তখন এইটেই তোর উপযুক্ত জায়গা।

নবীন। ভালবাসার ধার ধারি না আমি? এই কথা তুমি বলতে চাও?

মালা। হ্যাঁ চাই! নইলে ভবতারণকে ফেলিয়ে দিতে পারেন—তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে?

নবীন। আমি কিন্তু ভবতারণের ব্যাপার কিছু জানি না মালা, সে সব করেছেন—

মালা। চাঁপার বাবা—আপনার ম্যানেজার।

নবীন। কিন্তু কেন করছেন জানো তো?

মালা। তিনি ভেবেছিলেন আপনি বুঝি আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন। সেদিন আপনি যখন আমাকে বন্দুক কেমন করে চালাতে হয় দেখাচ্ছিলেন—সেইদিন আমাদের একসঙ্গে দেখে গিয়ে উনি ধরে নিলেন আমি বুঝি আপনাকে ভালবাসি।

নবীন। সত্যি নাকি? সত্যিই কি তুমি আমাকে ভালবাসো?

মালা। হ্যাঁ, বাসি, বাসি, বাসি! আমি আপনাকে ভালবাসি। তাই যদি না বাসবো তো আজ আমার এই বিপদের দিনে আপনার পথ চেয়ে বসে থাকবো কেন?

নবীন। তোমার আবার বিপদ কিসের?

মালা। বিপদ নয়? আপনি যে মেয়েকে ভালবাসেন,

যে মেয়েকে বিয়ে করতে চান, আমার ভাই বলছে কিনা সেই মেয়েকেই ভালবাসে!

নবীন। কে বললে চাঁপাকে আমি বিয়ে করতে চাই?

মালা। চাঁপা নিজে বলেছে। (বলতে বলতে ঠোঁটদুটি তার কেঁপে উঠলো। উঠে দোরের কাছে সজল চক্ষে ফিরে দাঁড়িয়ে) এখনও আপনি আমাকে—

নবীন। এ তো বেশ বিপদে পড়লাম দেখছি! করতে এলাম এক, আর হয়ে গেল আর এক কাণ্ড।

মালা। (আঁচল দিয়ে চোখ মুছে) কী করতে এলেন? চাঁপাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তো?

নবীন। কথাটা শোনো আগে। আমাকে কিন্তু বলতেই দিচ্ছনা।

মালা। নিন বলুন কি বলবেন।

নবীন। ভেবেছিলাম তোমাকেও জানাবো না। কিন্তু কেঁদে কেটে একশা করে তুমি যে-কাণ্ড করলে এখন তোমাকে না জানিয়ে আর পারছি না।

মালা। আপনার দয়া।

নবীন। শুনছে না তো ওরা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে?

মালা। না। তাদের আমি পাঠিয়ে দিয়েছি সুতোহাটিতে সুধার কাছে।

নবীন। তাই বল। খুব ভাল কাজ করেছ! সুধার কাছ থেকেই চাঁপাকে আমি ধরে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ীতে।

মালা। পারবেন না। সে যাবে না কিছুতেই।

নবীন। বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে যাব। তোমরাও বলবে। তুমি বলবে, সুধা বলবে, তাহলেই যাবে।

মালা। তারপর?

নবীন। মণির সঙ্গে ম্যানেজারবাবু চাঁপার বিয়ে কিছুতেই দিতে চাইবেন না।

মালা। সে-কথা ওরাও জানে।

নবীন। আমি কিন্তু যেমন করে হোক তাদের বিয়েটা দিয়ে যেবো।

মালা। আমিও সেকথা ভেবেছিলাম। আপনার সঙ্গে বিয়ের কথাটাকে অগ্রাহ্য করে চাঁপা যখন তার সুটকেশটি হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, ওর প্রতি ভালবাসার কাছে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম সুধার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ওদের বিয়ে দিয়ে দিই। কিন্তু তারপরের কথাটা ভেবে আর কিছু কূল-কিনারা পাইনি।

নবীন। পরের কথাটা কি?

মালা। ম্যাটা ছেলেদের তো বিশ্বাস নেই। আপনি যদি সত্যি-সত্যিই চাঁপাকে বিয়ে করতে চান তাহলে রাগ করবেন আমার ওপর।

নবীন। এখনও সেই কথা? বেশ তাহলে আমি চললাম সুধার বাড়ী। (উঠে সোজা চলে যাচ্ছে দোরের দিকে)

মালা। (তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে হাতটা চেপে ধরে) আমার ওপর রাগ করে চলে যেয়ো না। আমি যে কত অসহায়—আমি যে—(আবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো) আমি কাল সারারাত ধরে গোপালকে ডেকেছি। বলেছি—তুমি নবীনবাবুকে একটিবার পাঠিয়ে দাও আমার কাছে, আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি আমি কি করবো।

নবীন। (মালার হাত ধরে) কেঁদোনা চুপ কর। আমিও কম পরীক্ষা করিনি চাঁপাকে। ক্রমাগত বলেছি—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। মেয়েটা এক চুল নড়েনি। বলেছে, বিয়ে সে করবে না। তখনও বুঝতে পারিনি—মনের এ জোর সে কোথায় পেলে। তারপর দেখেছি মণি চোরের মত চুপিচুপি গেছে আমাদের বাড়ীতে। আমার চাকরকে একটি টাকা ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে চেয়েছে চাঁপার সঙ্গে। দেখা করতে পারেনি। চিঠি পাঠিয়েছে। চাঁপা তার জবাব দিয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সব

আমি দেখেছি। মাকে জানতে দিইনি। দারোয়ান চাকর সবাইকে বলে দিয়েছি—চাঁপা যদি চলে যেতে চায় তো তাকে যেন না আটকায়। নইলে চাঁপার মত একটা মেয়ে দুর্গের মত আমাদের এই অত বড় বাড়ী থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে পারে কখনও?

মালা। সবই বুঝলাম। বিয়েও না হয় আপনি দিয়ে দিলেন। কিন্তু আপনি জানেন কি মণির পড়ার খরচ কে চালায়?

নবীন। আমাদের সেরেস্তা থেকে মাসে দশটি করে টাকা দিতেন ম্যানেজারবাবু। এখন আর দেন না। মণি প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের খরচ নিজে চালায়।

মালা। না! মিছে কথা। মণির সে প্রাইভেট ছাত্রীটি কে জানেন?—চাঁপা। চাঁপাকে তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা বেশি পাঠান তার বাবা। সেই টাকায় মণির পড়ার খরচ চলে।

নবীন। এখনও তেমনি চলবে।

মালা। রাগ করে চাঁপায় পড়া যদি বন্ধ করে দেন তার বাবা? বিয়ের পর চাঁপাকে যদি আমাদের এই গরীবের সংসারে না পাঠাতে চান?

নবীন। আমি আছি কি জন্যে? (মালার হাত ধরে) এই তোমার হাতে হাত দিয়ে আমি বলছি মালা, মণির পড়ার ভার আমি নিলাম। সে বি-এ পাশ করবে, এম-এ পাশ করবে, 'ল' পাশ করবে, উকিল হবে, মোটা টাকা রোজগার করবে, তারপর মনের মত একটি পাত্রের সঙ্গে তার এই বোনটির বিয়ে দেবো।

মালা। আবার সেই কথা? বিয়ে আমি করব না।

নবীন। তাহলে চাঁপার মত তুমিও কাউকে ভালবেসেছো নাকি?

মালা। অত সহজে আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

নবীন। যাকগে, তোমার কথা তুমি বুঝবে। আমি এখন সুধার কাছে যাচ্ছি চাঁপাকে আনতে। চাঁপা আর মণিকে নিয়ে গিয়ে কালই আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেবো। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যদি ভালবাসা থাকে, তাহ'লে তাদের সেই ভালবাসার সন্তানেরাই পারে পরিপূর্ণ মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে, তারাই পারে দেশের কলঙ্ক মোচন করতে। তাদের চোখমুখের চেহারাই হয় আলাদা মনের চেহারা হয় ফুলের মত পবিত্র সুন্দর। এইটিই আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস। পরীক্ষা করবার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন সে সুযোগ আমি ছাড়ব না। চাঁপার আর মণির বিয়ে আমি দেবোই।

মালা। বয়সের ঝোঁকে অন্য কোনও জিনিসকে ভালবাসা বলে ভুল করছে না তো ওরা?

নবীন। না। এদের বেলা বোধহয় তা সত্যি নয়। মণিকে আমি এখনও ভাল করে দেখিনি, তবে চাঁপাকে দেখে চাঁপার কথা শুনে মনে হয়েছে—ভাল ও সত্যিই বেসেছে।

মালা। একজন ভালবাসে আর একজন বাসে না এমনও তো হয়?

নবীন। হতে পারে। এখানে সবই সম্ভব। ভালবাসা না হয়ে যদি ভাল লাগাও হয় তবু আমি তার মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত। ভাল লাগার নেশা থাকে চোখে, আর ভালবাসার অমৃত থাকে হৃদয়ে। আজকাল দেখছি পশুধর্মী মানুষ হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই চাচ্ছে না। চোখ দিয়ে দেখছে, কান দিয়ে শুনছে কিন্তু হৃদয় দিয়ে কোনো কিছু অনুভব করছে না। এই হৃদয়রাজ্যের রাজা হলো গিয়ে প্রেম। তাই প্রেমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ নেই। (মালা চোখ বুজে শুনছিল)—কি ভাবছো?

মালা। ভাবছি ভালবাসার কথা। হাতের মুঠোর মধ্যে যাকে পাই তাকে বোধহয় ভালবাসিনা, তাকে ভাল লাগে। আমি ভালবাসি আমার গোপালকে। (চোখ বুজে রইলো)

নবীন। যাকে জীবনে কোনোদিন পাবে না, যে তোমার নাগালের বাইরে, তাকেই তুমি ভালবাসো ?

মালা। চোখ খুলে সুধাও তো আপনার নাগালের বাইরে। (পালিয়ে যাচ্ছিল)

নবীন। (ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে) একথা তুমি জানলে কেমন করে ? সুধার কথা কেন বললে ?

মালা। যা সত্যি তাই বলেছি।

নবীন। কে বললে সত্যি ? সুধা তোমাকে কিছু বলেছে ?

মালা। মেয়েদের বলতে হয় না। মেয়েরা বুঝতে পারে।

(এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘোরের কাছে এসে দাঁড়ালো সুধা। তার দুপাশে দুজন। চাঁপা আর মণি)

নবীন। তুমি চলে এলে সুধা ?

সুধা। খুব অন্যায় করলাম ?

নবীন। না। আমি যাচ্ছিলাম তোমাদের ওখানে।

সুধা। কেন বিয়ের নেমন্তন্ন করতে ?

নবীন। হ্যাঁ। চাঁপার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন ম্যানেজারবাবু—চাঁপার বাবা !

সুধা। ভাখো তো এমন সুন্দর বর, আর চাঁপা কিনা পালিয়ে এলো বিয়ে করবেনা বলে ? কোথায় গেলি—চাঁপা ?

মালা। চাঁপা পালিয়েছে। (সুধার হাতে ধরে সেও বেরিয়ে গেল। ঘরের ভেতর একা দাঁড়িয়ে রইল মণি)

নবীন। (মণি তার পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করতেই তার দু'কাঁধে দুটি হাত রেখে) বেশি কথা বলবার সময় নেই। তুমি ছেলেমানুষ নও। যা করেছ নিজের দায়িত্বেই করেছ। এর জন্যে ভবিষ্যতে কোনদিন অনুতাপ হবে না তো ?

মণি। না।

নবীন। বাস, কাল তোমাদের বিয়ে। চল আমার সঙ্গে।

শেষ দৃশ্য

নবীনের বাড়ী

(রাত্রি)

[নেপথ্যে সানাই বাজছে। শাঁখের আওয়াজ হলো। নবীন একঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্ছিল বর-বধূ বেশে মণি আর চাঁপা ঢুকলো—হাসি হাসি মুখ।]

চাঁপা। (হাসতে হাসতে) দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনাকে একটা প্রণাম করি।

নবীন। (ফিরে দাঁড়িয়ে) বিয়ে চুকে গেল ? বাস, বাঁচা গেল। এবার তোমরা—সেই যে সাজানো ঘরটা দেখিয়ে দিয়েছি সেই ঘরে চলে যাও। (দু'জনে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই) এবার আর আমার ওপর কোনও রাগ নেই ? খুশী তো ?

চাঁপা। (হেসে মাথাটি কাৎ করে) হ্যাঁ। হ্যাঁ, খুশী। কতবার বলবো ?

নবীন। আমি কিন্তু এখনও খুশী হতে পারছি না।

চাঁপা। কেন ?

নবীন। মা আমার ওপর রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন তাঁর বোন-ঝির বাড়ী—সুধামূর্তি। ফিরে এলে তাঁর রাগ ভাঙাতে হবে। তার ওপর তোমার বাবা আছেন। কলকাতায় তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। তোমাকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখবেন এই কাণ্ড। রাগটা কার ওপর গিয়ে পড়বে বুঝতেই পারছো।

চাঁপা। বাবার রাগ আমি ভাঙিয়ে দেবো। আপনি আপনার মাকে সামলাবেন।

নবীন। সামলাতে সামলাতেই আমার জীবনটা গেল দেখছি। আমাকে কে সামলায় তার ঠিক নেই।

(হরি এলো)

হরি। ম্যানেজারবাবু এসেছেন।

নবীন। সামলাও। সামলাও চাঁপা। মণি—

মণি। (তাড়াতাড়ি নবীনের পেছনে যাবার চেষ্টা করলে,

কিন্তু তার চাদরে তখনও গাঁটছড়া বাঁধা। তাইতে টান পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে) ওরে বাবা, পালাবারও উপায় নেই।

(ম্যানেজারবাবু এলেন)

ম্যানেজার। এটা কি শুনছি?

নবীন। ঠিকই শুনছেন। বিয়েটা সেরে দিয়েছি। নাও তোমরা প্রণাম কর। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে যাও।

(মণি ও চাঁপা প্রণাম করলে ম্যানেজারবাবুকে)

ম্যানেজার। (নবীনকে) তুমি করলে এই কাজ? শেষে ভৈরবের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ম্যানেজার। কেন দিলে?

নবীন। আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করুন!

ম্যানেজার। কি রে চাঁপা, এইটিই কি তুই চেয়েছিলি?

চাঁপা। হ্যাঁ বাবা। এতে যদি কোনও অপরাধ হয়ে থাকে সে অপরাধ আমার।

ম্যানেজার। না না অপরাধের কথা বলছি না। সবকিছু জেনেশুনেই তুই যদি স্বেচ্ছায় এ-কাজ করে থাকিস তাহ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই।

চাঁপা। হ্যাঁ বাবা, সবকিছু জেনেশুনেই আমি এ-কাজ করেছি। তুমি রাগ কোরো না। আমাদের আশীর্বাদ কর।

নবীন। শুনলেন তো? এবার আপনি আপনার মেয়ে-জামাই নিয়ে নিজের ঘরে যান। সারাদিন কিছু খায়নি। ভাল করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন। হরিকে আর আপনার খানসামা মতিকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ঘরে।

ম্যানেজার। মেয়ে-জামাই আমাকে তো প্রণাম করলে, কিন্তু মা কোথায়? মাকে প্রণাম করিয়ে নিয়ে আসি।

নবীন। মা আমার ওপর রাগ করে আমার মাসতুতো বোনের বাড়ী সুধামুখি চলে গেছেন। এদের বিয়েটা চুকে গেল, এইবার আমাকে যেতে হবে সুধামুখি। মায়ের রাগ ভাঙিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে তো!

ম্যানেজার। মন্দির বাবা আসেনি? সে তো আমার বেয়াই হলো।

নবীন। বিয়ের আসরে বসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁকেও ডেকে পাঠান।

ম্যানেজার। (মেয়ে-জামাইকে) এসো তোমরা আমার সঙ্গে। (সবাই চলে গেল। নবীন একা।)

(নবীন সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে টানছে, একজন চাকর এলো)

চাকর। মা আপনাকে ডাকছেন দাদাবাবু।

নবীন। কে? আমার মা?

চাকর। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি এলেন।

নবীন। চল্ যাচ্ছি। (সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, দোরের কাছে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুধার সঙ্গে। ছেলে কোলে নিয়ে সুধা ঘরে ঢুকছিল) একি? তুমি এখানে? ছেলে কোথায় পেলে? এ তো তোমারই ছেলে?

সুধা। আমাকে আর ছেলে কে দেবে? আমারই ছেলে। তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলোর জবাব দেওয়া যায় না—চল—বসি। দাঁড়াও, ছেলেটা বিরক্ত করবে। (দোরের বাইরে তাকিয়ে) ওরে ও, কি নাম ছেলেটার?

নবীন। বিজয়।

সুধা। ওরে ও বিজয়! শোন্।

(বিজয় চাকর এলো)

(ছেলেকে তার কাছে দিয়ে) মার কাছে নিয়ে যা। চল বলি তোমাকে—অনেক কথা আছে।

নবীন। তোমাকে তো আমি মামার কাছে রেখে এলাম—তারপর?

সুধা। মা গিয়েছিলেন ঝিলিমিলিতে।

নবীন। মা তাহ'লে সুধামুখি যায়নি?

সুধা। না। গোপাল-মন্দির থেকে মা ডেকে পাঠালেন মামাকে। মামা বললে, আমি একা যাব না, তুইও চল্। মাকে আমি তো কখনও দেখিনি, দেখবার ইচ্ছে হলো তাই সঙ্গে গেলাম। মামা

আমার পরিচয় দিয়ে সব কথা বলে দিলে। বললে, আমার বিয়ের কথা, আমার ছেলের কথা, আমার চলে আসবার কথা সব। মা শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি এসো আমার সঙ্গে।' মালা রইলো গোপাল মন্দিরে। মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা একেবারে কাছারি-বাড়ীতে। ম্যাটা-ছেলেরা কেউ ছিল না তখন। অত যে দজ্জাল আমার শাশুড়ী, মাকে দেখে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। খোকা খেলা করছিল কোলের কাছে। আমাকে দেখেই হেসে দুহাত বাড়িয়ে আমার কোলে উঠতে চাইলে। মা বলে উঠলেন, ওমা, কিরকম পাষাণী মা রে তুই! নে, ছেলে নে। নিয়ে আয় আমার সঙ্গে। খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আমি মার পিছু পিছু চলে এলাম। কেউ একটি কথাও বললে না।

নবীন। তারপর? ছেলে নিয়ে কোথায় এলে?

সুধা। প্রথমে গোপালের মন্দিরে, তারপর মালাদের বাড়ী। মা বললেন, ছেলের বাপ্‌টাকে তুই সহ্য করতে পারবি না জানি, কিন্তু ওই ছেলে বড় হয়ে ঠিক পাগলের মত যাকে খুঁজে বেড়াবে। বেঁচে যদি থাকিস্ তো খুঁজে তোকে সে বের করবেই। তারপর তোর সেই পেটেধরা আনন্দগোপাল যখন তার দুচোখভরা জল নিয়ে তোর কাছে এসে দাঁড়াবে, তখন তার কাছে কী তুই জবাব দিবি তাই বল। যাক্‌গে, সে-সব কথা বলবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। আমি যে-জন্যে এসেছি শোনো।

নবীন। বল।

সুধা। (হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে) তুমি আমার এই হাতে হাত রেখে বল—তুমি আমাকে কোনোদিন ভুল বুঝবে না!

নবীন। সে-কথা না বললেও চলতো তবু বলছি। এই আমি তোমার হাতে হাত দিয়ে ভগবানকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি—তোমাকে আমি জীবনে কোনোদিন ভুল বুঝবো না।

সুধা। আজ তোমাকে আমি একটি অনুরোধ করবো—সে-অনুরোধ রক্ষা করতে তোমার যতই কষ্ট হোক, বল সে অনুরোধ তুমি রাখবে?

নবীন। রাখবো।

সুধা। আসছি। (দোরের বাইরে মুখ বাড়িয়ে) আয়! (ঘরে ঢুকলো মালা)

নবীন। (মালাকে দেখে) তুমিও এসেছ? কে রইলো তোমাদের বাড়ীতে?

মালা। গোপাল।

সুধা। জাহান্নামে যাক্ ওর বাড়ী! ও যার জন্যে এসেছে, তার জন্যে বাড়ীঘর দূরের কথা, নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে।

নবীন। কার জন্যে?

সুধা। (চুপিচুপি) তোমার জন্যে। (মালার একখানি হাত নবীনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে) মালাকে আমি তোমারই হাতে তুলে দিলাম। এই আমার অনুরোধ।

নবীন। (মালার মুখের দিকে তাকাতেই মালা চোখ নামিয়ে নিলে) কিন্তু ও আমাকে নেবে—তবে তো!

সুধা। ও অনেক আগেই নিয়েছে। আমার মুখ চেয়ে কিছু বলতে পারেনি। এবার চল দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে মাকে প্রণাম করবে চল।

(যেতে হলো না। বিন্দুবাসিনী ঘরে ঢুকলেন)

বিন্দুবাসিনী। কই রে সুধা, এদের বিয়েটা কবে হচ্ছে তাহলে?

নবীন। আবার কার বিয়ে মা?

বিন্দুবাসিনী। তোর। তোর আর মালার।

নবীন। এ ষড়যন্ত্রের ভেতর তুমিও আছ তাহ'লে?

বিন্দুবাসিনী। হ্যাঁ বাবা, আছি।—ওরে সুধা, মালার বাপ্‌কে ডাক্, ছেলে-বৌ দেখলে এইবার মেয়ে-জামাই দেখুক!

[মালা ও নবীন বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করলে]

মন যেতো যেথা ছুটে

—রেখেছিস—

আজার আকর্ষণে আমি এপর্যন্ত যেখানে যেখানে যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি তার মধ্যে প্রকৃত সংস্কৃতিবান, ভদ্র, বিনয়ী, উদার, পরোপকারী, মহাপ্রাণ ও অকৃত্রিম বন্ধু-বৎসল খাঁটি মানুষ আমি একজনকে দেখেছি, যার নাম মৃত্যুর পরও যদি স্মৃতি থাকে মানুষের আত্মার, তবে আমি বোধহয় ভুলতে পারবোনা তার কথা। সে হ'ল আমাদের অশেষ গুণান্বিত বন্ধু হরেন ঘোষ। যে মানুষকে বিশ্বাস করে প্রাণ হারিয়েছে। অমূল্য সে প্রাণ। বাংলাদেশের আর বাঙালী জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়ে গেছে তার সেই অকালে অপঘাত মৃত্যুতে!

সেকালের কর্পোরেশন ষ্ট্রীট এখন যা সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড হয়েছে, সেই রাস্তায়, নিউমার্কেটে যাবার পথে মোড় নেবার আগে কৃতপূর্ব "অ্যালবিয়ন থিয়েটার" বলে যে সিনেমা হাউসটি একদা ছিল তারই বিপরীত দিকের একখানি ঘরে হরেন ঘোষের ব্যবসা সংক্রান্ত অফিস ও তাঁর অসংখ্য বিবিধ শ্রেণীর বন্ধুমণ্ডলীর আড্ডা ছিল। অভিজাত বংশের সন্তানেরা, লক্ষপতি ধনীর দুলালেরা, মধ্যবিত্ত ঘরের রুচিবান শিক্ষিত ছেলেরা এবং বহুজ্ঞানী, গুণী, শিল্পী ও সাহিত্যিক মণ্ডলীর সমাবেশ ঘটতো হরেন ঘোষের কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের এই মাঝারি ঘরখানিতে। চেয়ারে ও কেউ না—কুলিয়ে উঠলে, টেবিলের ওপরও উঠে বসতুম আমরা। চলতো ধুমের আড্ডা। হেন-বিষয় ছিল না বা এই আড্ডায় না—আলোচিত হ'ত।

বন্ধুবর হরেন ঘোষ প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন সাহিত্য প্রেমিক। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসের বইও দু'একখানা ছাপা হয়েছিল তখন। কিন্তু সরস্বতীর কুঞ্জ থেকে লক্ষ্মী তাকে টেনে নিতে চাইলেন তাঁর কুবের আলয়ে। মাঝখান থেকে হ'ল এই যে হরেন তারা ভাইনে বাঁয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী দু'জনকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে শুরু করলেন অপ্রতিহত গতিতে।

এতে হরেনের ক্ষতি হয়নি কিছু। উল্টে মতিই তার। নিত্য নব নব পন্থা উদ্ভাবন করতো সে যাতে উভয় ভারতীরই উপাসনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে।

হরেন ঘোষ একজন "Impresario" বা 'প্রমোদ পরিবেশক' রূপে পরিচিত হবার বহু আগে সে বঙ্গসংস্কৃতির নানাদিকে তার সুদক্ষ দক্ষিণ-পাণি বিস্তৃত করেছিল। তার অফিস ঘরের 'আড্ডায়' নাম রেখেছিল সে "Four Arts Club". এখানে বলে রাখি নামটা কিন্তু original নয়। হরেনের অফিস ঘরে তখনকার দিনে 'মোটর কার' কেনা-বেচা, মোটর মেরামত, মোটর পার্টস বিক্রয় প্রভৃতির কাজে চলতো যা সেদিন প্রায় দুর্লভই ছিল, আজকের মতো অলিতে গলিতে পাওয়া যেত না। কাজেই নৌকীন ধনী বড়লোকেদের অভিজাত উত্তরাধিকারীদের সমাবেশ হ'ত সেখানে। হরেন ঘোষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ ছিল যে, সে ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সব সমাজের যৌবনকে অনায়াসে জয় করতে পারতো।

নিরহংকারী মানুষ। মুখে মিষ্টহাসি লেগেই আছে। বুদ্ধিতে দীপ্ত সুন্দর মুখশ্রী। বাক্যে ও ব্যবহারে বিনয় নম্রতা যেন তার সহজাত। সে যারই সংস্পর্শে আসতো সেই তাকে ভালো-না-বেসে, থাকতে

পারতো না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সে হ'য়ে উঠতো সকলের আপনার আত্মীয়। ওকে মনে হত পরিবারেরই একজন যেন সে।

তার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমরা তার বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিলুম। হরেনকে পাই আমরা গজেন ঘোষ ওরফে গজেনদার আড্ডায়। গজেনদার ছোট ভাইরাও বেশ লায়েক ছেলে। তাদেরও একটা জুনিয়ার আড্ডা চলতো পাশের ঘরেই। সেখানে মোড়ল ছিল নির্মলচন্দ্রের কাকা 'বেচারাম চন্দ্র'। বেচারামের সেকালে 'কাল্লেনবাবু' বলে নামডাক ছিল। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কিন্তু, সহরের খ্যাতনামা সেরা সুন্দরী সৌরিস্ত্রীরা ছিলেন তাঁর প্রেমাস্পদা। শব্দকারের একটি 'ম' কিন্তু তিনি স্পর্শ করতেন না কখনো। তাই মেসার ঘোরে তিনি কোনও দিন হালদদের পাল্লায় পড়ে 'ব্যাঙনোট' সই করে ক্যাসাদে পড়েননি। গজেনদার কনিষ্ঠগণ ছিলেন বেচারামের খুব অনুগত। বেচারামও ছিলেন অতি শান্ত, নম্র, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির মানুষ। অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও অর্থের প্রতি তার কোনও মমতা ছিল না, তাই অকালে তিনি যখন এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান তখন তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য।

গজেনদার বাড়ির জুনিয়ার আড্ডার কেউ কেউ বড়দের আড্ডাতেও উঁকি ঝুঁকি মারতো। ও দলের মূল নায়েন যে বেচারাম, তিনি অনেক সময় দু'নৌকোতেই বিহার করতেন। হরেন ঘোষের মধ্যে যে সাহিত্যিকের শিল্পী মন ছিল সে মন তাকে প্রায় চুম্বকের মতই ওঘর থেকে এ ঘরে টানতো। যখন সে দেখতো সত্যেন দত্ত এসেছে, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছে, চারু বন্দ্যো এসেছে, হেমেন্দ্রকুমার রায় এসেছে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এসেছে হরেন কি থাকতে পারে? তার সাহিত্যিক মন উচাটন হয়ে আমাদের সঙ্গ চাইতো।

আমরা হরেনের সঙ্গে খুব সহজেই একাত্মতা অনুভব করেছিলুম এবং তাকে সানন্দে আমাদের সৌহার্দের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিয়েছিলুম। আমি এই সময় 'সিনেমা' সংক্রান্ত একখানি বই লিখছিলুম। এর আদি উৎপত্তি ও ক্রম পরিণতির ইতিহাস, এর বৈজ্ঞানিক দিক, আলোক-শিল্পের দিক, চিত্রগ্রহণ ও পরিস্ফুটন এবং পর্দার উপর তার প্রক্ষেপ নট-নটীদের অভিনয় কলা, ক্যামেরার কৌশল, ছবির সেট, মেকআপ ছল-চাতুরী সবকিছুই লেখা চাই। কিন্তু আনুষঙ্গিক পুঁথিপত্র কোথায় যে এ বিষয়ে 'থিসিস্' লেখা সম্ভব হবে আমার পক্ষে?

হরেন ঘোষ এগিয়ে এলো। তার সংগ্রহ একখানি 'সিনেমটোগ্রাফ' Annual বই ছিল দিলে আমাকে। আর আমার বন্ধু কবি গিরিজাকুমার বসু সিনেমার চিত্রতারকাদের প্রেমিক, একটি পাকা ঘুঘু দর্শক ছিলেন, এবং সিনেমা সংক্রান্ত বহু সচিত্র সাপ্তাহিকপত্র পত্রিকাও নিয়মিত কিনতেন। "বাতায়ন" সাপ্তাহিকের তিনি চলচ্চিত্র সম্পাদক ছিলেন। কবি গিরিজাকুমার আমাকে অনেকগুলি বিলাতী সিনেমা ম্যাগাজিন দিলেন। তখনকার দিনে যে কটি সিনেমা স্টুডিয়ো ছিল সবার সঙ্গেই হরেনের পরিচয় ছিল। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে সব ক'টি স্টুডিয়োতেই ঘুরলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা কোনো পুঁথি-পত্রের ধার ধারেন না। সবাই ভুঁইফোড় সবজান্তা। কোনও স্টুডিয়োতেই চলচ্চিত্র বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের একটি ক্ষুদ্রতম লাইব্রেরী নেই। হেসে বিস্মিত হয়েছিলুম। হরেন উদ্যোগী পুরুষ। নিরুপায় হ'য়ে বসে থাকবার ছেলে নয়। অবিলম্বে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দোতলার উপর লম্বা একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে হরেন "সিনেমা লাইব্রেরী" স্থাপন করলে। উদ্বোধনের দিন বহু চিত্রশিল্পী পরিচালক প্রযোজক ও পরিবেশক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন। কবি গিরিজা বসু ও আমি, আমরা দুজনে হরেন কর্তৃক 'যুগ্ম-সম্পাদকের' পদে সসম্মানে বৃত হয়েছিলুম। শুভ উদ্বোধনের দিন অনেকেই এসে অনেক তারিফ দিয়েছিলেন এবং এরকম একটি বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগার যে দেশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়

একথাও বলেছিলেন। কিন্তু তারপরদিন থেকে লাইব্রেরীর ত্রিসীমানায় আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। আমরা কিন্তু বেজায় উৎসাহে এই লাইব্রেরীটিকে গড়ে তোলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলুম এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে সিনেমা সংক্রান্ত বহু বই সংগ্রহ করে ফেললুম। আলমারি সাজানো হ'ল। বইয়ের ক্যাটলগ তৈরি হ'ল। প্রথম প্রথম দু'চারজন স্কুল-কলেজের সিনেমা পাগল ছেলেরা আসতো। ম্যাগাজিনগুলো কেউ 'মেরী পিকফোর্ড,' মার্লিন ডিয়েট্রিক আর তখনকার দিনের World. Sweet Heart 'গ্রেটা গার্বো'র নানারকম 'পোজে'র ছবি দেখে খুশী হয়ে বাড়ী ফিরে যেতো।

কিন্তু সচল ছবির কাছে অচল ছবির আকর্ষণ আর কতটুকু? শেষে 'সিনেমা লাইব্রেরীতে' দেখা গেল আমি আর গিরিজা কবি ছাড়া আর কেউ আসে না। প্রতিষ্ঠাতা হরেন ঘোষ মাঝে মাঝে ঝড়ের মতো এসে অবস্থা দেখে একটু হতাশ হয়ে পড়েন। শেষে আমরাই হরেনকে অনুরোধ করে 'লাইব্রেরী' তুলে দিয়ে ঘর ছেড়ে দিতে বলি। মিছে কেন মাসের পর মাস মোটা ভাড়া গোনা? যাদের জন্য 'সিনেমা লাইব্রেরী' করা, তারা যদি এর সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে এবং এর উপকারিতা না বোঝে, তবে এ প্রতাগার রেখে লাভ কী? সেবটায় তুলেই দেওয়া হ'ল।

হরেনের উৎসাহ ও কর্মোদ্যমকে আমাদের ঘুম-আড্ডা কোনোদিন খর্ব ক'রতে পারেনি। ললিতকলার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ তাকে দেশ বিদেশে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের সুকুমার শিল্পের সঙ্গে হরেন ঘোষ প্রথম বাংলার পরিচয় করিয়ে দেয়। বাঙালীদের মধ্যে ; শুধু বাঙালী বলি কেন, ভারতীয়দের মধ্যে "ইম্প্রেসেরিয়ো" বলে কেউ ইতিপূর্বে খ্যাত হতে পারেননি। হরেনই প্রথম ভারতীয় "Impresario" অর্থাৎ চিত্তবিনোদক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করাই যার প্রধান কাজ। সাগর পারের সব দেশেই এঁরা আছেন। কেবল এই হতভাগা দেশে বহু নৃত্যগীত, অভিনয়াদি ললিতকলা শিল্পের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাকে লোক সমাজে প্রদর্শনের আয়োজন করবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

এগিয়ে এলো আমাদের আড্ডার হরেন ঘোষ যেন বিদেশের অজ্ঞাত এই শিল্প জগতের যবনিকা সর্বজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত ক'রে দেখাবার জন্য। এ ব্যাপারে তার প্রথম জয়ধ্বনি বেজে উঠলো অপূর্ব তুল্য নর্তক যিনি বিশ্ববিখ্যাত রুশ নর্তকী 'আনা পাবলোভার' সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বৈত নৃত্যে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন, সেই উদয়শংকরের নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। উদয়শংকরের এই অতুলনীয় নৃত্যের প্রথম আসর বসেছিল কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতায়। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, প্রভৃতির চেষ্টায় যে "Society of Oriental Arts" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুরেন ঠাকুরের হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং-এর দোতলায় একটি হ'লে। এখানেই প্রথম উদয়শংকর বহু রসিক সজ্জনের সমুখে তাঁর অনুপম নৃত্যকলা প্রদর্শন করে সকলকে চমৎকৃত করেন। সে 'বাহবা'র অংশ হরেনও কিছু পেয়েছিল তার এই অমূল্য এক শিল্পীকে আবিষ্কারের জন্য। অতঃপর সহরের অভিজাত প্রসিদ্ধ নাট্যশালায় উদয়শংকরের নৃত্যের ব্যবস্থা হরেনকে বহুবার করতে হয়েছিল এবং প্রতিবার "House full" অর্থাৎ প্রেক্ষাগার দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠায় উদয়শংকরের সঙ্গে হরেনের খ্যাতিও সুবিস্তৃত হয়েছিল। এরপর হরেন যদিও প্রধানতঃ 'ইম্প্রেসেরিয়ো' হওয়াটাকেই তার প্রধান উপজীবিকা করে তুলেছিল, তা'বলে আড্ডাকে কোনওদিনই উপেক্ষা করেনি। কর্পোরেশন ষ্ট্রীট থেকে তার ভেরা ধর্মতলা ষ্ট্রীটে 'ওয়াল্ডেল মোল্লার' প্রাসাদের দ্বিতলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমাদের আড্ডাও তাকে সেখানেই অনুসরণ করেছিল। হরেনের দাক্ষিণ্যে আমরা বহু আনন্দ উপভোগের সুযোগ পেয়েছি যা আমাদের মতো মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে সব সময়ে

দেখা সম্ভব হ'তনা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বহু নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম আমরা এই সুবন্ধু হরেন ঘোষের কৃপায়। নিজে বাড়ি এসে প্রবেশপত্র দিয়ে যেতো তার অত কাজের মধ্যেও। উদয়শংকরকে যখন কেউ জানতো না হরেন একদিন সকালে নিয়ে এসেছিল তাকে আমাদের কালীতলার সামনের পুরোনো বাড়িতে। আলাপ করিয়ে দিলে। সে আলাপ আজও অপলাপ হয়নি। বরং একদা 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর অক্ষয় নন্দীর কন্যা অমলাকে উদয়শংকর বিবাহ করায় ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আরও নিবিড়তর হয়েছিল।

হরেনের কৃপায় দেখেছি দক্ষিণের নৃত্য পটীয়সী বালা সরস্বতীর নাচ। দেখেছি ব্রহ্মদেশীয় 'পো-নৃত্য'। শুক সংকরণ নাম্বুদ্রিপাদের অপূর্ব 'কথা কলি' নৃত্য। সেরাইকালার 'ছউ' নৃত্য। সাধনা বসুর নৃত্য। এই সাধনা বসুর নাচের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল কৃতী নাট্য ও নৃত্যশিল্পী ও পরে ছায়া ছবির চিত্রপরিচালক বন্ধুবর মধু বসুর কথা! মধু বসুই সেই প্রথম দুঃসাহসী শিল্পী, যিনি এই শহরের বুকে বসে অভিজাত ঘরের মাননীয়া মহিলাদের নিয়ে সর্বপ্রথম আলিবাবা অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। হৈ হৈ পড়ে গেছলো সারা শহরে। হরেন ঘোষের আজ্ঞায় অনেকেই এই দলে ছিলেন। হরেনের ছোটভাই বীরু, মধু বসুদের পারিবারিক বন্ধু পালোয়ান (মকনাথ গৌরী ওরা) আর এক বন্ধু 'মন্টি ঘোষ' হরেনের আজ্ঞার সবচিন আজ্ঞাধারী। সবার কথা মনে নেই। তবে দস্যু সর্দার মধু বসুর কুনালদাকে মনে আছে। মধু বসু স্বয়ং 'আবদালা' সেজেছিলেন। অভিনয়ের খুবই প্রশংসা হয়েছিল। মধু বসুর ভাগ্নী 'মুন্ত' ভাল নাম 'সুজাতা' মর্জিনার ভূমিকায় অপূর্ব নৃত্য করে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। অভিজাত ভদ্রঘরের মেয়েরাও যে মধু বসুর মত উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়লে নাট্যাভিনয়ে অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন, 'আলিবাবা নাট্য প্রযোজনা তা প্রমাণ করেছিল।

মণিপুরী নৃত্য-নাট্য সম্প্রদায়কে কলিকাতায় টেনে এনে হরেন ঘোষই প্রথম আমাদের সে নাচ দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। রুক্মিণী ভরতেওলের নাচ হরেনের কৃপাতেই আমরা প্রথম দেখি, পরে অবশ্য মাদ্রাজ গিয়ে আলেয়ারেও আরও দু'একবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সম্প্রতি কিছুদিন আগে দিল্লীতে তাঁর প্রযোজনায় জয়দেবের 'গীত গোবিন্দের' নৃত্যনাট্য দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু সে নাচ দেখে তেমন খুশী হ'তে পারিনি। হরেন আমাদের দক্ষিণ ভারতের আরও অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীর নৃত্য নাট্য দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শান্তা আপ্পের নামটা আজও মনে আছে।

'কোর আর্টস ক্লাব' নামক আজ্ঞাটি প্রথম যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে আজ্ঞার প্রধান ছিলেন সমাজের সংস্কৃতি সম্পন্না মহিলারাই। যেমন রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহ ভাজনীয়া 'ঘাতায়নের' কবি-বধূ বিজয়িনী শ্রীমতী উমা দেবী তদীয়া মাতা নিরুপমা দেবী ও কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবী প্রভৃতি। এ আজ্ঞায় নিয়মিত আসতেন 'রূপালেখার' দীনেশ রঞ্জন দাশ, ইনি নিরুপমা দেবীর অগ্রজ, শিল্পীকেই গোকুল নাগ, ওমর খৈয়াম খ্যাত কাস্তি ঘোষ গৃহ কর্তা সুকুমার দাশগুপ্ত, উমা দেবীর স্বামী শিশির ভাদুড়ী সবাই এই সাংস্কৃতিক আজ্ঞার পরিবেশটিকে যথা সম্ভব রমণীয় করে তোলবার চেষ্টা করতেন! ফলে এ আজ্ঞা খয়রাতু হ'য়ে নির্জ্ঞান হবার পর, হরেন তাকে টেনে এনে সেই শবদেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। 'কোর আর্টস' নাম দিয়ে অতি উপাদেয় একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল। হরেন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানতো। অনেক মরা কাগজকে বাঁচিয়ে তুলতো বটে, কিন্তু, দীর্ঘায়ু দিতে পারতো না। জনপ্রিয় রঙ্গালয় ও নাট্য সংক্রান্ত "নাচঘর" সাপ্তাহিক কাগজখানার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, হরেন এগিয়ে এসে তাকে নবজীবন দিয়েছিল, কিন্তু

পরমায়ু বাড়াতে পারেনি। হরেনের মায়ের মোহ ছিলনা। ছোটভাই বীরুকেই সব ব্যাপারে এগিয়ে দিত।

হরেন ঘোষ তার আড্ডার বন্ধুদের ঠিক আত্মীয়ের মতই ভালো বাসতো। তাদের আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়ে সাহায্য করতো। আমি একবার বিপন্ন অবস্থায় তার কাছে এই রকম অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে যে কত উপকৃত হয়েছিলুম সেকথা আমার আজীবন স্মরণে থাকবে। আমি তখন সবে বিবাহ ক'রে আমাদের লিলুয়ার বাগানবাড়ী 'দেবালয়ে' মধুচন্দ্রিমা যাপন করছিলুম। স্বপ্নের মোহে মায়াচ্ছন্ন দিনগুলি চলেছিল আনন্দলোকের আবেশ মাধুর্যে অভিষিক্ত হয়ে। কাব্যে সঙ্গীতে গল্পে ও মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গলাভে জীবনপাত্র যেন অমৃত রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, কে ভেবেছিল তখন—'এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা!' হঠাৎ নবোঢ়া পত্নী আমার জীবন অসুখ হ'য়ে পড়লেন. জীবন-সংকট অবস্থা। লিলুয়ার 'দেবালয়ে' আমিই একমাত্র বিগ্রহ, দ্বিতীয় পুরুষ কেউ নেই যে ডাক্তার ডাকবে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করবে, ঔষধপত্র কিনে আনবে। আমার বৃদ্ধা জননী যথাসাধ্য পীড়িতা, পুত্র বধূর ভার নিচ্ছিলেন। ভাবছি কী করা যায়? কলকাতায় চলে যাবো? তাই বা কী ক'রে হয় এই মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে?

এমন সময় বিপন্ন মানুষের কাছে 'মধুসূদন দাদার' মতো হঠাৎ হরেন এসে উপস্থিত। বিয়ের পর আমি ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছি, আড্ডায় যাইনা কেন অভিযোগ করতে ও তত্ত্ব নিতে এসেছিল। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখে মহাপ্রাণ হরেন কি স্থির থাকতে পারে? তৎক্ষণাৎ বাইরে তার মোটরের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠলো। হরেন ছুটে বেরিয়ে গেল। কোথায়-কী বৃত্তান্ত—কিছুই বলে গেল না।

রাত্রি ৮টা নাগাদ ডাক্তার ও নার্স নিয়ে এসে হাজির। ডাক্তার রোগী দেখে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে গেলেন। জ্বরের উত্তাপ যে ডিগ্রীতে উঠেছে মাথায় অনবরত আইস-ব্যাগ দিতে হবে। ঘড়ি ধরে টেম্পারেচার নিতে হবে ওষুধও খাওয়াতে হবে। ডাক্তার চলে গেল, কীর কথা উঠতে হরেন বললে লাগবেনা। ও আমার বন্ধুও আত্মীয়, প্রেসক্রিপশান খানা টেনে নিয়ে—ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল সে ডাক্তারের পিছু পিছু।

রাত্রি ১টা নাগাদ হরেন ফিরে এল। সঙ্গে এনেছে 'আইসব্যাগ' এবং একটা 'হটওয়াটার ব্যাগও'—যদি দরকার লাগে! একবাক্স কাঠের কুঁড়ো চাকা বরফ। ওষুধ যা যা লাগবে, যেমন গ্লাস থার্মোমিটার, 'বেডপ্যান'। দেবালয় মুহূর্তে যেন হরেনের যাদু দণ্ডের চোয়ায় 'মাসিং হোম' হয়ে উঠলো। হরেন রোজই আসতো খবর নিতে। কোনও কোনও দিন দু'বেলা। পত্নী আমার একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই হরেন উধাও।

আমি পত্নীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চাঁইবাগায় একটি টিলার ওপর একখানি বাংলো ভাড়া নিয়ে বায়ু-পরিবর্তনে চলে গেলুম।

হরেন শুধু প্রবল আড্ডাবাজই ছিলনা, একজন শ্রেষ্ঠস্তরের মানুষ ছিল। আর একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। প্রমোদ জগতে সুপরিচিত মধু বসু স্বনাম ধন্য পুরুষ। উনি তখন 'সিনেমা টেক্‌নিক' ও 'ফটোগ্রাফী' ইত্যাদি' শিখতে চলচ্চিত্র রাজ্যে ছত্রপতি হিমাংশু রায়ের কাছে জার্মাণীতে গিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে দারুণ অসুখ হ'য়ে প'ড়ে লণ্ডনে তাঁর এক দিদির বাড়ি এসে আশ্রয় নেন। ডাক্তাররা বলছে এখানকার ক্লাইমেট্ ওর সহ্য হবে না। Lungs এর অবস্থাও ভাল নয়। 'টি বি' হ'বার চান্স রয়েছে। একে 'সুইজারল্যাণ্ড' পাঠিয়ে দিন।

মধু বাইনা ধরলেন আমি যেন যার কাছে ফিরে যেতে চাই। তাঁর দিদি হলেন এই শরীর আর নিয়ে সুদীর্ঘ ১৪।১৫ দিনের পথ তাহাতে একলা যাবি কী করে?

তাইতো? যাই কী করে। হাতেও তো এক পয়সা নেই! হঠাৎ একদিন লণ্ডনে হরেন ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হরেন তার ব্যবসা সংক্রান্ত কী একটা বিশেষ কাজে লণ্ডনে গেছলো। কাজ হয়ে গেছে। হরেন বাড়ি ফিরবে। শুনে মধু বলছে আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে চ'। আমি এখানে থাকলে বাঁচবোনা! হরেন বলে ফিরে যাবার রেল আছে তো'। মধু বলে, না কপর্দকও নেই। হরেন শুনে একটু ভেবে বললে—আচ্ছা চল। আমার কাছে যা আছে তাতে দুজনের থার্ডক্লাশে কেরা চলবে। অগত্যা বন্ধুবৎসল হরেন থার্ডক্লাশে বহুকষ্ট সহ্য করে মধুকে নিয়ে দেশে ফিরলো।

বোধ হয় রূপকথার মতো শোনাচ্ছে না? কিন্তু এমনিই মহৎপ্রাণ ছিল বন্ধুবর হরেন ঘোষ—যাকে বিধর্মীরা বিশ্বাস ঘাতকতা করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল। ভাবলে চোখের জল রাখতে পারিনি। আড্ডা আমরা দিয়েছি বটে অনেক। আড্ডার হতভাগা মানুষও অনেক দেখেছি। অসৎ মিথ্যাচারী ও ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি বা স্বভাবও কার কার থাকে। আমি তাদের অনেককেই বিশ্বাস করে ঠ.কছি। তাহ'লেও একথা কোনও দিনই ভুলবোনা যে 'আড্ডা' থেকে আমি অশেষ উপকৃত হয়েছি। আমার এই সাহিত্য জীবনের সার্থকতাও আড্ডার কৃপায় যতটা হয়েছে, নিজের কেরামতিতে তা হয়নি।

এম. সি. সরকারের বইয়ের দোকানে বন্ধুবর সুধীর সরকারের আড্ডায় অনেক সাহিত্যিকই বিকেলের দিকে জড় হতেন এবং দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঘুষের আড্ডা চলতো, কতো যে সুধী সজ্জনের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ এই আড্ডা আমাকে দিয়েছে বা আমাদের অনেককে দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়। সুধীর তাদের অনেকের কথাই "আমার দেশ আমার কাল" গ্রন্থে তার মহাপ্রস্থানের আগে লিখে রেখে গেছে। তাই, সুধীর সরকারের দোকানের আড্ডার কথা আমি আর বলতে চাইনা। কেদার চট্টোপাধ্যায়, যাদব সেন, ধীরি মিত্তির প্রভৃতি একাধিক পরলোক গত বন্ধুর কথা মনে পড়লে দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

অনেক আড্ডাতেই অনেক আড্ডাই দিয়েছি, আনন্দবাজার অফিসে এবং আমাদের কালীতলার বাড়ীতে কংগ্রেসের আড্ডার বড় বড় নেতারা পর্যন্ত পায়ের ধুলো দিতেন। তাঁরা যে কেবল দেশোদ্ধার নিয়েই বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন তাই নয়। সাধারণ সহজ মানুষের মতই সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ আনন্দ বেদনা তাঁদের জীবনে এ সবেরই প্রভাব ছিল। তাঁর অধিকাংশই ছিলেন চিরকুমার। তবে অপর্ণারা কেউ কেউ এ শিবত্বেরও তপোভঙ্গ করেছিলেন।

সাহিত্য জীবনের খণ্ডস্মৃতি

রাধিকারঞ্জন দেবী

সাহিত্য জীবনের কিছু স্মৃতিকথা লিখবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। আমার সাহিত্য জীবন সুদীর্ঘ হলেও, বহুপ্রসূ নয়। বড় বড় ঘরাই ভরে তুলে রাখার মতন ফসল তো নেই-ই—ডাঁড়ার ঘরের কলসী আলাও ভর্তি হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। সব মানুষেরই জীবনে কিছু-না-কিছু ঘটনা থাকে। আমার সাহিত্য জীবনের মধ্যেও একসময়ে একটি 'ঘটনা'র সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গল্প করি।

বাংলা ১৩৩৫ সালে 'লীলাকমল' নামে আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশ হয়েছিল। ১৩৩৬ সালে মাঘ মাসে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণে তাঁর সার্কুলার রোডের বাড়ীতে এক আলাপ-আসরে উপস্থিত ছিলাম। ঐ আসরে আরও অনেকের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মশায় আর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও উপস্থিত ছিলেন। মাঝের বড় ঘরে চা-পানের পরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে যখন অজিত মল্লিক মশাই গান গাইছেন (কল্যাণী মল্লিকের স্বামী, স্বর্ণকুমারী দেবীর জামাতা) তখন জন কয়েক সাহিত্যিককে নিয়ে বাইরের দিকে একটি ঘরে বীরবল আলোচনা সভা জমিয়ে তুলেছিলেন। কে একজন এ-ঘরে এসে আমাকে বললেন—চৌধুরী-মশায় আপনাকে ডাকছেন। উঠে তাঁদের কাছে গিয়ে বসলাম। চৌধুরীমশায় তখন আলোচনা করছিলেন বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের রচনা নিয়ে। তার অল্প কয়েকদিন আগে ভবানীপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আমি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম "বাংলা সাহিত্যে মহিলার দান"। প্রতি দশ বছর করে সময় ভাগ করে নিয়ে সেই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মহিলারা কে কি বই লিখেছেন তারই একটি দীর্ঘ তালিকার প্রায় একশো বছরের হিসেব সংগ্রহ করে ধরে দিয়েছিলাম। সেই কেরীসাহেবের আমলের মার্থা সৌদামিনী সিংহ থেকে শুরু করে ১৩৩৬ সালে মৈত্রেয়ী দেবী পর্যন্ত। স্বর্ণকুমারী দেবী সেই প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে আমার সঙ্গে আলাপের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

চৌধুরীমশায় সেদিন বলছিলেন, বাঙালী মেয়েরা জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রে না হোক একটি মাত্র ক্ষেত্রে, বাইরে পুরুষের পাশাপাশি বরাবর এগিয়ে এসেছেন—সেটি সাহিত্য। কিন্তু, এগিয়ে এলে কি হবে, মেয়েদের লেখায় স্বকীয়তা এখনও ফুটে ওঠেনি। অর্থাৎ—মেয়েদের নিজস্ব বিশেষ উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গী, মেয়েলি সুর বা সুর তাঁদের রচনায় স্পষ্ট হয়নি। মেয়েরা যদি তাঁদের নিজস্ব অনুভূতিগুলিকে নিজস্ব ঢঙে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হোতো, লেখিকাও যথার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারতেন।

আমি সেদিন অল্প বয়সের সীমিত জ্ঞানের সফরী-চাপল্যে চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ বিতর্ক করেছিলাম। শিল্পীর মধ্যে পুরুষ নারী উভয় সত্তাই থাকে। বহুৎ শিল্পী পুরুষ হলেও তাঁর রচনায় নারী হৃদয় ও নারী চরিত্র যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, নারী শিল্পীর রচনাতেও পুরুষ চরিত্র বা পুরুষের উপলব্ধির সার্থক বিকাশ সম্ভব হবেনা কেন?

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যাণ্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যেশগুচ্ছ সমৃদ্ধ ক্যাণ্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা
কোন্‌টী থেকে ভুগছেন?
আমাদের
ভাস্কর লবণ
খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।
যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

চৌধুরীমশায় বলেছিলেন—অবশ্যই সম্ভব। বায়োলজির মতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই পুরুষ এবং নারী উভয় সত্তাই বর্তমান। তবু, কতক ক্ষেত্রে নারী একান্তই নারী আর পুরুষ একান্তই পুরুষ। সেই বিশেষত্বকে শিল্প সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে পারলে তার স্বকীয়তার দাম আছে। জীবনের উপলব্ধিগত বাস্তব সত্যকে শিল্পীরা কল্পনের মধ্য দিয়েও ফুটিয়ে তুলতে পারবে না কেন? অর্থাৎ মেয়েরা এমন লেখা লিখবে না কেন,—যে লেখায় লেখকের নাম দেওয়া না থাকলেও, কারুর বুঝে নিতে ভুল হবে না, ও লেখা মেয়ের। পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক এমনতরটি লেখবার।

চৌধুরীমশায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে, Mrs. Armandine Lucile Aurore Dupin যিনি George Sand ছদ্ম পুরুষ নামে রচনা প্রকাশ করতেন। আরও দু'তিন জন ফরাসী লেখিকার নাম করেছিলেন, যাঁদের রচনায় নারী প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি সুন্দর সুস্পষ্ট ফুটেছে।

'অপরাজিতা' ছদ্মনামে বিশেষ ভঙ্গীর কবিতা—এক্সপেরিমেন্টের মূল কারণ চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে আমার সেদিনকার আলোচনা ও বিতর্ক।

এই সময়ে বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতে 'আত্মশক্তি' 'বিজলী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক আর কতকগুলি মাসিক পত্রে একটি বাদানুবাদের বিষয় ছিল, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার যথার্থ বিচার। কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছিলেন, প্রায়শঃক্ষেত্রে লেখকের নাম আর পরিচয়ের প্রভাবে লেখার মূল্য দেওয়া হচ্ছে। সমালোচকের সঙ্গে লেখকের পরিচয়, প্রভাব বা স্বার্থসম্পর্ক থাকলে—সাধারণশ্রেণীর রচনা উচ্চপ্রশংসার অধিকারী হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনাগুলি কশাঘাতের যোগ্য হয়েও নিন্দাবাদ এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ অপরিচিত-নামা লেখকেরা তাঁদের রচনার উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সম্মান পান না, ব্যক্তিগত পরিচয় ও প্রভাব না থাকায়।

ব্যক্তিগত পরিচয় যে অনেক সময়ে রচনা বিচারের পক্ষে বাধা হয়, আমি নিজেই সে কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। সে কাহিনী এখানে তুলব না। পরে অন্যত্র বলা যাবে।

চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে আলোচনার কয়েক মাস পরে আমি শিলং পাহাড়ে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলাম। লায়াং-উম-থরের শিখরে আমাদের গ্রীষ্মাবাস ছিল। নির্জন পাইন বনে সারাদিন একা বসে অপরাজিতার কবিতা লিখতাম।

ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় বা কবিতায় তুলি দিয়ে ছবি আঁকায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম 'বারো বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে গোপন রেখে, ছদ্মনামে ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাব।—দেখব, রচনা তার নিজের শক্তিতে, বিশেষত্বে বা উৎকর্ষতায় যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই পরীক্ষার নেশে আমাকে অনেক কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখও সইতে হয়েছে। কিন্তু আমার পরীক্ষা সার্থক হয়েছে, পুরস্কারও আমি আশাতীতই পেয়ে গেছি সেদিন।

বারো বৎসর অপ্রকাশিত থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অতি সাবধানে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। এই সময়ে আমি অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সে সকল কথা অন্যত্র যখনও প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 'অপরাজিতার' কবিতা তিন চারটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একাধিক চিঠি পেতে লাগলাম। সকলেরই প্রশ্ন—"কে এই মেয়েটি ?" এই কৌতূহলী দলের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পংংচন্দ্র, অন্নদাশংকর রায়, প্রমথ চৌধুরী, অমিতাক্ষর হালদার, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি। বীরবলের প্রশংসায় অপরাজিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা চিঠিখানি যেদিন আমার হাতে এলো, আমার সেদিনকার মনের উৎফুল্ল উল্লাসের অনুভব ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিন্তু, চৌধুরী মশায়কেও একই উত্তর লিখতে হোলো,—যা প্রত্যেককেই বলতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তরুণ সুকুমার রায় জগদীশ ভট্টাচার্য পর্যন্ত। অপরাজিতা একজন কড়া পর্দানশীন মেয়ে।

অপরাজিতার কবিতা আঁকায়। এখানে আমি লেখা না বলে আঁকাই বলছি। যাঁরা যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী মশায়। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মশায়ও অপরাজিতার কবিতার শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন বহুবার আমার কাছে। এই কবিতার আরও একজন অনুরাগী এখনও লেখা হলেই আমাকে ঐ বইগুলি কেন ছাপানো হচ্ছে না বলে অনুযোগ করেন তিনি—শিল্প-রসিক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। অপরাজিতা দেবীকে নিয়ে সে সময়ে যে রহস্য কুহেলিকা সৃষ্টি হয়েছিল এবং নানা পরস্পরবিরোধী গল্প কাহিনী গড়ে উঠেছিল, তার সাক্ষ্য বোধহয় পঞ্চাশোর্ধ বহু ব্যক্তিই এখনও দিতে পারবেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্র-অপরাজিতা কাহিনীর প্রত্যক্ষ খবর রাখেন। আমি সতর্ক-সচেতনায় রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবীকে সাহিত্যে উপস্থিত করেছি। সেজন্য রচনার আঙ্গিক ও শৈলী সম্পূর্ণ পৃথক করতে হয়েছিল।

আমার আত্ম-অঙ্গীকৃত গোপনতা-ব্রত উদ্‌যাপনের আগেই কবি ইহলোক থেকে তিরোহিত হয়ে ছিলেন। এই সাধনা আমার সার্থক হয়েও বিষাদ-ব্যর্থ হয়ে গেছে, কবির কাছে সমস্ত কাহিনী উন্মোচনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে। তাঁর তিরোধানের পরে চৌধুরীমশায়ের কাছে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে বলেছিলাম।

আমার সবচেয়ে সার্থকতা—যাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত সমালোচনার তীক্ষ্ণ প্রভাবে আমি বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে এই আত্মপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম,—তিনি নিজে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন অপরাজিতার আবির্ভাবে। চৌধুরীমশায় অপরাজিতার রচনার প্রশংসা উন্মুক্ত কণ্ঠে করেছেন। এইখানেই আমার কর্ম সিদ্ধিলাভ করেছে।

অবিরা মাধুরী

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

রেডীমেড • বেনিয়ন • বেল্ট • শার্ট • শার্টিংস • ফুল • হাফ আর্ম • স্লিভলেস আর্ম • 'ভাইটেক্স' • সিকস্কিন • ফ্লাশ মাফিটস • ইকোনমিক • ইউনিটেক্স' • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

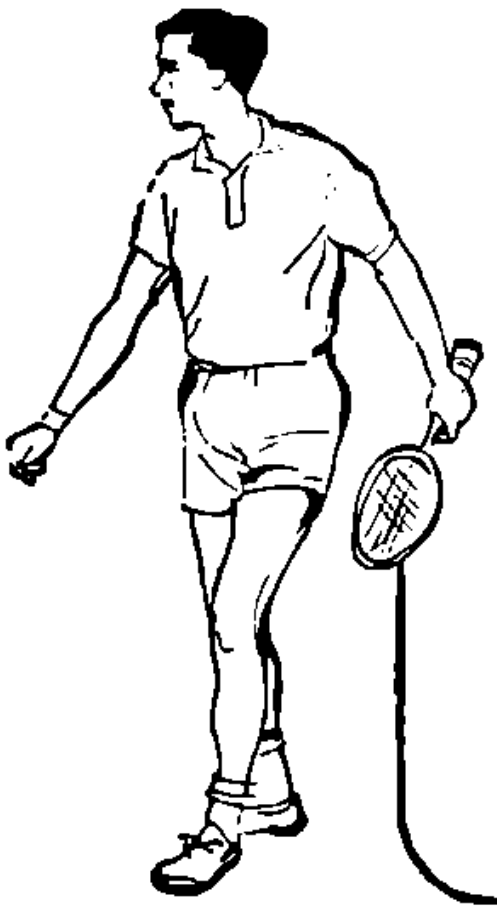

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২১৮০

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

অধরা মাধুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আকাশ নিদারুণ কালো করে এসেছে। পশ্চিমে ঝঞ্ঝিবে, উঃ রে বাবা, উত্তরেও ঘোর কালো। এবার যা একখানা নামবে আর দেখতে হবে না। দেখতে দেখতে কলকাতা ধুয়ে যাবে ভুবে যাবে তলিয়ে যাবে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, ট্যাক্সি তার মিটার বাক্স লাল শালুতে জড়াবে কিংবা 'বিকল' এই নিশান তুলে দিয়ে পাশ কাটাবে। আর যদি পড়ি-মরি ছুটে, চমকি খেয়ে, চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে, একটাকে ধরাও যায়, নির্ঘাৎ প্রশ্ন করবে কোন এলাকা আপনার লক্ষ্য। ভবানীপুর কি শ্যামবাজার, বেহালা কি বেলেঘাটা—সন্তোষ একটা উত্তর আপনাকে দিতেই হবে। যাই উত্তর দিন, ড্রাইভার বিপন্ন বা বিষণ্ণ কণ্ঠে একই আপত্তি জানাবে, এ-অঞ্চলে নিদারুণ জল, গাড়ি যাবে না। আপনাকে জলে ফেললেও কথা ছিল, আপনাকে পথে বসাবে।

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! ধরো ধরো, একজন ঠিক গিয়ে ধরল দরজাটা। অমনি কোত্থেকে আরেকজন এসে দাবিদার হল, বললে, 'আমি আগে হাত তুলেছি মশাই।'

'পাকড়ে ধরা আর হাত তোলা সমান হল?' প্রথম জন খেঁকিয়ে উঠল: 'আপনি তো বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেও হাত তুলতে পারেন।'

'কেন হাত তুলেছি ড্রাইভার জানে।' দ্বিতীয় জন বললে।

'ড্রাইভারের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই বৃষ্টির মধ্যে আপনার হাত তোলা দেখেছে।' প্রথম জন আবার গর্জে উঠল: 'পটল তোলা দেখালেই পারতেন! আমি আগে ধরেছি এ ট্যাক্সি আমার।' বলে প্রথমজন দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়ল।

বিপরীত দরজা খুলে উঠে পড়ল দ্বিতীয় জন। বললে, 'আমি আগে ডেকেছি, এ ট্যাক্সি আমার।

'বেশ, ড্রাইভার বলুক এ ট্যাক্সি কার প্রাপ্য।' বললে প্রথম জন।

দ্বিতীয় জন সমর্থন করল: 'বেশ, বলুক ড্রাইভার।'

দুজনেই ড্রাইভারকে সালিশ মানল। আশ্চর্য, এই এক জায়গায় দুই আরোহীর মিল হল।

ড্রাইভার পরম উদাসীনের মত বললে, 'আমি কিছু বলতে পারব না। আপনারা ডিসাইড করুন।'

কেননা ড্রাইভার জানে যে পক্ষের বিরুদ্ধে সে রায় দেবে সে পক্ষই তাকে গালাগাল ছুঁড়বে। বিচারে যে পক্ষ হারে সে পক্ষ বিচারককে নির্ঘাৎ শালা বলে।

আপনারা ডিসাইড করুন। দুজনে দুকোণে চুপচাপ বসে থাকে। সাধ্য নেই কোনো যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

কেউ কারু জন্যে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। এও হামবড়া, ওও হামবড়া। এ বলে, আমি কম কিসে, ও বলে, আমিও কিছু ভেসে আসিনি।

ড্রাইভার সিগারেট ধরায়।

প্রথম জন বললে, 'থানায় চলুন।'

দ্বিতীয় জন রুখে উঠল : 'ভয় দেখাচ্ছেন কী। চলুন থানায়। সেখানে ডিসিশন হবে।'

কিন্তু ড্রাইভার নড়ে না। বলে, 'থানা পর্যন্ত যে যাব তার ভাড়া দেবে কে?'

সুতরাং গ্যাট হয়ে বসে থাকো। বসে থাকো কুণ্ডলী পাকিয়ে। বৃষ্টি বন্ধ হোক, জল বাড়ুক, সময় চলে যাক। আমি যদি ছেড়ে দিই আমি হেরে গেলাম। ও যদি পেয়ে গেল, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এ লড়াই বসার লড়াই—বসতে না শিখলে স্কোয়াট করতে না শিখলে বাঁচব কী করে?

তখন অনন্যোপায় ড্রাইভার বললে, আপনারা যদি এক অঞ্চলের বাসিন্দে হন, চলুন দুজনকেই আমি একে একে পৌঁছে দিচ্ছি।

এখানেও দুজনের অনৈক্য। এ দক্ষিণের ও উত্তরের।

তখন ড্রাইভার সিগারেটটা শেষ করে নিজের মনে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ক্ল্যাপ ডাউন করে নিয়ে চালাল নিজের মনে।

'এ কী, কোনদিকে যাচ্ছেন?' প্রথম জন চেঁচিয়ে উঠল।

ড্রাইভার নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'হাওড়ায়।'

'ওদিকে আপনাকে কে যেতে বলেছে?' রুখে উঠল দ্বিতীয় জন।

'আপনারাই তো যেতে বললেন।' ড্রাইভার গাড়িতে স্পিড দিল।

'আমরা কখন যেতে বললাম? এই দাঁড়ান, আমি নেমে যাচ্ছি।'

'এই রোকো! হাওড়ায় কে যাবে?'

ট্যাক্সি দাঁড় করাতেই দুজনে দুদিকের দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। শুধু এই পলায়নেই এদের একতা।

ট্যাক্সির কথা রঞ্জন আপাতত ভাবতেই পারে না। বিশেষতঃ ভরা বৃষ্টির দিনে কলকাতায় ট্যাক্সি কি মিটারে চলে? চলে শুধু ঘুষে।

পূরণ করতে গিয়েই যা ফুরিয়ে যায় তার নাম পূরণ।

একমাত্র অগতির গতি রিকশা। বর্ষায় সেই একমাত্র যান—রাজ-যান। কিন্তু তারও গরম কত! যদি যা আট আনা হলে তাই আট গুণ।

'হ্যাঁ রে, যাবি?'

রিকশাওলা গম্ভীর মুখে বললে, 'আপ বলিয়ে বাবু।'

ডালহৌসি স্কোয়ারে রিকশা কোথায়? সুতরাং সে ভাবনা ছেড়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ো। ট্রাম বাস যা পাও ঝুলে পড়ো রড ধরে। রড না পাও আর কাক কোমর ধরে।

এই ডামাডোলে সুবিধে, ভাড়া দিতে হবে না। কী বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি, ভাড়া গুণব কী করে?

বলাবাহুল্য, ভাড়া মারতেই তো ভিড়ের মধ্যে ওঠা। ভিড় দেখে ওঠে পকেটমার, আর আমরা ভাড়া-মার। আবার কখনো কখনো ভিড়ের মধ্যেই নিবিড় হয়ে দাঁড়ানো। কখনো-কখনো ও-পক্ষই এমনি নিশ্চল যে উদাসীন হয়ে যেতে হয়।

আচ্ছা কত ভাড়া মারও ট্রামে-বাসে মারা যায় তার কোনো খতেন হয়েছে? যারা এমনি করে

পয়সা বাঁচায় তারা কি সেই পয়সাটা পথের মোড়ের ভিখিরির হাতে সমর্পণ করে? বয়ে গেছে। তাতো গেছে কিন্তু বিবেক কী বলে, স্বাভাবিক নীতিবোধ কী বলে? একজনের প্রাপ্য মেরে দিয়ে বেমালুম হজম করছি সেই অন্যায়টা খোঁচা মারে না? রাখো তোমার অন্যায়ের বকুতা! তুমিই যেন তোমার প্রাপ্য পাচ্ছ সব কড়ায়-গণ্ডায়! সুবিধে পেয়েছি, মেরে দিয়েছি—এটাই এ যুগের বিধিলিপি। এ যুগে সুবিধাই একমাত্র সু-বিধি!

বেরুতে তো আগে থেকে টিকিট করে তবে ট্রেনে ওঠা। তবে সেখানে অত ডবলিউ-টি বা বিনা-টিকিট কেন? বা, টিকিট কাটবার সময় পেলুম কই? স্টেশনে পৌঁছতে দেরি করলে কেন কেন এক ট্রেন আগে পৌঁছুলে না? বা, বেশ বলেছেন। এক ট্রেন আগে পৌঁছুলেও এই ভিড়। বাজার করে নেয়ে-খেয়ে চৌদ্দ প্যাকেট বোতাম আঁটতে-আঁটতেই দেরি হয়ে গেল। আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে, পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে। সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেই একটু চোখমুখ। টিকিট কাটতে ইচ্ছে করে?

শুধু কি দাঁড়িয়ে যাওয়া? লাফিয়ে ওঠা নয়? নামা নয় লাফিয়ে? উঠতে গেলে পায়ের তলায় ফুটবোর্ড নেই, নামতে গেলে নেই প্ল্যাটফর্ম। খিত-ভিত কিছু নেই। সর্বত্র একটা হুলুস্থুল চলেছে। বাচ্চি যে আপা নেই, ফিরছি যে আশ্রয় নেই। যা পাচ্ছি বৎসামান্য মনে হচ্ছে। আস্তিন গুটিয়ে প্রোসান দিয়ে যদি বা দু'টাকা মাইনে বাড়াচ্ছি, বাজারও তেমনি চড়ে উঠে গালে চড় মারছে। এ যে মশাই, ধামা দিয়ে ছাতা ধরবার চেষ্টা। তাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।

ঐ দেখুন না, আকাশ কালীবর্ণ হয়েছে কি কেরানিরা কলম রেখে উঠে পড়েছে চেয়ার ছেড়ে। পালাই-পালাই রব তুলেছে। ট্রাম-বাস ধরতে পরু-ছোটা ছুটেছে।

অফিস-সুপারইনটেণ্ডেণ্ট গোপেশবাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রঞ্জন। এখনকার পার্টে মুখে একটা কাতরতা ফোটাতে হবে বলে গলার স্বরও নম্র করল: 'স্যার, বাড়ি যাই—'

চোখ না তুলে গোপেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা বেজেছে?'

ডান হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাবার একটা ভঙ্গি করল রঞ্জন। বললে, 'প্রায় চারটে।' ....

'আরো ঘণ্টা দেড়েক তো অফিসে থাকবার কথা—'

'কিন্তু কী ভীষণ মেঘ করেছে দেখুন! এখুনি হুড়মুড় করে নেমে পড়বে।'

'বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি পড়বে তার আমি কী করতে পারি?'

'কিন্তু তোড়ে একবার নেমে পড়লেই রাস্তা এক হাঁটু হয়ে যাবে। বাড়ি পৌঁছুতে পারব না!'

বাড়ি পৌঁছুনোটাই সার কথা। অফিসকে তার সরাসরি সময় দেওয়াটা ওভারটাইমের মধ্যেই নয় হাবিটাই মুখ্য দায়িত্বটা কাল্পনিক। প্রাণধারণটাই আসল কর্তব্যটা হলে হল, না হলে না-হল! গোপেশবাবু জানেন মোটা কথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও ছোকরা তর্ক করবে, আর তর্কে বিপক্ষের উকিলকে পরাস্ত করা গেলেও উঠতি বয়সের একেলে যুবককে বিচ্যুত করা যাবে না। শেষকালে বলবে লোকটা হার্টলেস, দুঃখ-দরিদ্রের প্রতি এতটুকুও দরদ নেই।

ঘুরতে যুবক না এসে ঠোঁটে হাসি আনলেন গোপেশবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ লভেল পেয়েছিলে?'

পেয়েছিলে! 'আপ বলিয়ে সার!' রঞ্জনের জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল। নিজেকে খুব জোর সামলে নিলে। যখন 'তুমি' করে বলেছে তখন নিশ্চয়ই একটু অন্তরঙ্গতার ছোঁয়াচ আছে কোথাও,

সেই সূত্রে কিছু আনুকূল্য পেতেও পারে বা। তাই সত্য কথাটাই বললে মাথা চুলকে : 'কী করে পাব? রাস্তায় বাস ব্রেকডাউন হল যে—'

গোপেশবাবু রোজ দশটায় অফিসে আসেন, আগতদের মধ্যে তিনিই প্রথমতম, আর আসেন কোটের পকেটে এক ঠোঙা লজেন্স নিয়ে। তাঁর সেই আগের দিনের পোশাক, কোট-প্যান্ট। আর কোটের দুদিকে দুটো বিশাল পকেট, একদিকে যত রাজ্যের কাগজপত্র, আরেক দিকে লজেন্সের ঠোঙা। যে সব কেরানি সাড়ে দশটার মধ্যে অফিসে হাজির তাদের প্রত্যেককে একটি করে লজেন্স উপহার দেন, তাদের সময় নিষ্ঠার পুরস্কার বলে। যাদের হাজিরা সাড়ে দশটা পার হয়ে যায় তারা আর পায়না লজেন্স।

লজেন্সটি হাতে পৌঁছে দিয়ে গোপেশবাবু বলেন, 'একবারটি হাসুন।'

'হাসব?'

'শুধু কৌচকাতে যেটুকু পরিশ্রম হয় হাসিতে ততটুকুও পরিশ্রম লাগে না। একমাত্র হাসিই বিনা-ব্যায়ামের জিনিস।'

তখন কেরানি হাসে।

আরেকজনকে দিয়ে গোপেশবাবু বলেন, 'মুখটাকে একটু মিষ্টি করুন।'

'মানে, লজেন্সটা একটি খাব? মিষ্টি মুখ করব?'

'না, না, খেতে বলছি না। কিন্তু একটা মিষ্টি জিনিস পেলেন মুখটা একটু হাসি-হাসি করবেন তো?'

কেরানি তখন লাজুক মুখে হাসি আনে।

আরেকজনকে গোপেশবাবু সরাসরি বললেন, 'খেয়ে ফেলুন।'

'খেয়ে ফেলব?'

'অনেকদূর থেকে আসছেন, গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে গিয়েছে। মুখে পুরুন, ভালো লাগবে।'

কেরানি লজেন্সটা আঙুলে করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বললে, 'খাব যে, ভেজাল কিনা কে জানে।'

গোপেশবাবু হেসে উঠলেন : 'লজেন্স ভেজাল কেউ শুনেছেন?'

কেরানি বললে, 'রঙিন কিনা, তাই সন্দেহ হচ্ছে।'

'বোতলে পোরা রঙিন জল ভেজাল শুনেছি। রঙিন ছেড়ে দিন, সাদা কলের জলও ভেজাল। কলের জলে সাপ আসছে, জোঁক আসছে—'

'স্যার, বৃষ্টির জলও ভেজাল।' কে একজন পাশের টেবিল থেকে টিপ্পনী কাটল : 'বৃষ্টির জলও রেডিও-অ্যাকটিভ—'

'জল বলতে একমাত্র চোখের জলই খাঁটি।' কে আরেকজন ওপাশ থেকে বচন ঝাড়ল।

'আজ্ঞে না, চোখের জলও ভেজাল হয়।' গোপেশবাবু আপত্তি করলেন : যেমন কুমিরের চোখের জল—মুতীরাশ্রু, ক্রকোডাইল টিয়ার্স—'

সবাই হেসে উঠল।

তারপর গোপেশবাবু রঞ্জনের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কী বলো। পৃথিবীতে একমাত্র খাঁটি কী?'

রঞ্জন ভরা গলায় বললে, 'রক্ত, স্যার। হিউম্যান ব্লাড। কালো-রক্তও লাল, সাদা-রক্তও লাল, তামাটে-রক্তও লাল।'

'ঠিক বলেছ।' গোপেশবাবু রঞ্জনের দিকে একটি গভীর সমর্থনের দৃষ্টি পাঠালেন।

এমনি করে মুখের হাসি আর মনের খুশি দিয়ে তোয়াজ করে তুইয়ে-বুইয়ে কেরানিদের কাছে ধরে রাখেন। তাঁর হাত থেকে লজেন্স পাওয়া একটা প্রিভিলেজের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কই, আজ রঞ্জনের তো তা জোটেনি।

'রাস্তায় বাস ব্রেক-ডাউন হল? কেন কলিশন নাকি?' গোপেশবাবু পুরানো কথায় ফিরে গেলেন।

'না, কলিশন নয়। ড্রাইভারগুলো এমন বিশ্রী বেপরোয়া চালায়, গাড়ির প্রতি এতটুকু মায়া-মমতা দেখায় না—যা চালাবার তাই অচল করে বসে।'

'ঠিক বলেছ।' গোপেশবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই অমনি বেপরোয়া চালাচ্ছি, সমাজের প্রতি আমাদের এতটুকু দয়া-মায়া নেই, যা আমাদের সতর্ক হয়ে সযত্নে চালানো উচিত তাই তছনছ করে দিই।'

'আঃ, বৃষ্টি এসে গেল।' জানলার বাইরে চোখ পাঠাল রঞ্জন: 'দেখুন সবাই কেমন বেপরোয়া হয়ে ছুটেছে।'

'সবাই বলছেন কেন, অনেকেই আবার ছুটছে না। অনেকেই তাদের কর্তব্যে দৃঢ় থাকছে। এ তো শুধু বৃষ্টি—বন্যা নয়, ভূমিকম্প নয়, এয়ার-রেড নয়—'

'কলকাতার বৃষ্টি মানে, ঐ যাদের নাম করলেন, প্রায় তাদেরই সগোত্র।'

গোপেশবাবু হাসলেন। বললেন 'তবুও অনেকে শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে। অন্তত আমি থেকে যাব।'

'আপনার গাড়ি আছে।'

'গাড়ি? তার সম্বন্ধে যত কম বলবে ততই ভালো করবে। আগে ছিল পথি নারী বিবর্জিতা, এখন হয়েছে পথি গাড়ি বিবর্জিতা। গোপেশবাবু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন: 'কিন্তু যাদের গাড়ি নেই তাদের অনেকের কর্তব্য বুদ্ধি আছে। তারা ঠিক সময়ে আসে ঠিক সময়ে যায়। কিন্তু তুমি আসতেও লেট যেতেও আলি!'

'যদি যেতে না দেন, যাবনা।' রঞ্জনের স্বরে অভিমান ফুটল: 'সকালে বাস ব্রেক-ডাউন হলে বাকি রাস্তা হেঁটে এসেছি, এখনো বাস-ট্রাম বন্ধ হলে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে। ট্যাক্সি দূরের কথা, একটা রিকশা নেবার মতও আর্থিক সামর্থ্য নেই।'

গোপেশবাবু মন এমনিতেই নরম হত' এ কথায় আরও নরম হল। তাঁর টেকনিক হচ্ছে, বাইরে থেকে শাসন আরোপ করা নয়, ও-পক্ষের নিয়ন্ত্রণ শাসনের বোধটাকে জাগিয়ে দেওয়া। রঞ্জনের মধ্যে তবু একটা শ্রী আছে, অনুমতি চাইতে এসেছে—কেউ কেউ যে না বলেই চম্পট দেবে—এরই মধ্যে হয়তো দিয়েছে—তা আর বিচিত্র কী। সভেজ সরলতার জন্যে রঞ্জনকে একটু ভালবাসেন বলেই তার সঙ্গে ঠিক আদেশের পর্যায়ে না থেকে আলাপের পর্যায়ে নেমে আসেন। তাই কণ্ঠস্বরে আশ্বাস নিয়ে বললেন, ট্রাম-বাস বন্ধ হতে অন্তত আধঘণ্টা একটানা তুমুল বর্ষণ দরকার। তুমি তার আগেই একটাতে ঠিক জায়গা করে নিতে পারবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি এত তাড়া কিসের? তোমার সেই নাটকের রিহার্সেল নাকি?'

'আজকের রিহার্সেল তো আকাশের স্টেজে—'

'তবে কার সঙ্গে মিট করার কথা আছে নাকি?'

যাবার কথা ভাবতে-ভাবতে অন্য দিকে মন কেমন রঞ্জন। বুঝল বৃদ্ধ বিপত্নীক গোপেশবাবু

তেমনি যারা কিছুই শুনতে চায়। ঘাড় চুলকে একটু নাটকে আড়ষ্টতায় রঞ্জন বললে, 'সেই রকমই তো কথা ছিল—'

'তোমার সেই রক্তের টান। কী যেন সেই কথাটা—রক্তই রক্তকে ডাকে।'

'কিন্তু দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।'

'তবে যাও, ছোটো—বৃষ্টি এসে গেল।'

চোঙা প্যান্ট ফিতে বাঁধা চুঁচলো জুতো—তীরের মত ছুটল রঞ্জন। ঘরপরধারায় বৃষ্টিও নেমে এসেছে। বানিকটা ছুটে ট্রাম-স্টপের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল অদূরে একটা গেটের নিচে নীলিমা দাঁড়িয়ে।

এ একেবারে আশাতীত। দুর্যোগের মাঝখানে এ কী সৌভাগ্যের চিঠি! ভাগ্যিস গোপেশবাবু দেরি করিয়ে দিয়েছিলেন তাই তো মিলে গেল এই উপহার—ঘরের উপরে—ফলে জল পড়।

'তুমি এখানে?' রঞ্জন উছলে উঠল।

'এই বৃষ্টির জন্যে।' মৃদু-মধুর হাসল নীলিমা।

উত্তর শুনেই বোঝা উচিত ছিল নীলিমা কিছু গোপন করছে, পুরোপুরি সব কথা বলছে না খোলাখুলি, কিন্তু রঞ্জনের আনন্দ ওসব কিছু দেখতে চাইল না, মানতে চাইল না। অফিস পাড়ায় এর আগে তার সঙ্গে যে কোনদিন দেখা হয়নি, দেখা হবার সম্ভাব্যতা ছিল কিনা, তাও একবার হিসেবে আনল না। এ-পাড়ায় না ও-পাড়ায় কোন অফিসে সে কাজ করে তাতেও তার কৌতূহল ছিল না কোনোদিন। তার একমাত্র লক্ষ্য নীলিমা, একমাত্র সত্য আনন্দ, একমাত্র জিজ্ঞাস্য ভালোবাসা।

সব কিছু ছুটছে কিন্তু ভালোবাসাই দাঁড়িয়ে। সব কিছুই অস্থির একমাত্র ভালোবাসাই অবিচল। সব কিছু বৃষ্টিতে ঝাপসা একমাত্র ভালোবাসাই স্পষ্ট।

'চলো এই ট্রামটা কিন্তু ফাঁকা—'

ফাঁকা মানে পা-দানিটা ফাঁকা। ওঠবার মুখটাতেই গাদি মারেনি। একবার উঠতে পারলেই আস্তে-আস্তে দাঁড়বার জায়গা করে নিতে পারবে।

'উঠে পড়ো।' রঞ্জন আবার ডাক দিল।

সেই ডাক মুহূর্তে নীলিমাকে তার সাময়িক বিন্যাস থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে দিল এক নিমেষে। কোনো দ্বিতীয়ের জন্যে অতিরিক্তের জন্যে অপেক্ষা করতে দিলনা।

বেশ রগ্ড় মেরে নীলিমা, চলতি ট্রামেই বেশ উঠে পড়ল।

'তুমি—তুমি কোথায়?' নীলিমা এক পলক চাইল পিছনে।

'আমার জন্যে ভাবতে হবেনা। আমি ঠিক আছি।' অনেক লোকের ব্যূহ ভেদ করে ঠিক ছুটে এসে হাত ধরল রঞ্জন।

জীবনে যৌবন শুধু একবারই আসে। তাকে আসার মত করে আসতে দাও। যৌবন ছাড়া আর কে পেরেছে অসাধ্যের সাধনা করতে? যদি অসাধ্যকে কেউ সম্পন্নও করে থাকে সে যৌবন।

নীলিমা কেন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিল তার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। সেটি সে রঞ্জনকে জানতে দিল না। গোপন করলে। বিবেককে বোঝাল সেটা এমন কিছু একটা গমন-বিদারক সংবাদ নয় যে রঞ্জনকে বলতে হবে। রঞ্জন যদি স্বামী হত, তবে আজ কেন, সেদিনই বলত।

কিন্তু স্বামী হলেও বা কতটুকু বলত! কতটুকুই বা বলা যায়।

কিন্তু—ব্যাপারটা কী?

কয়েক দিন আগে আরো একবার তুমুল বচসা হয়েছিল এ অঞ্চলে। এরও ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্রাম সড়কের ধার ঘেঁসে। আজকের জায়গায় নয়, আরো খানিক দক্ষিণে, আরেকটা গাড়িবারান্দার নিচে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল নীলিমা। বৃষ্টির ছাটে হাত-পায়ের মত তার চিন্তাভাবনাও যেন অসাড় হয়ে পড়েছিল। ভেবে পাচ্ছিল না এ জলপ্রপাত কতক্ষণে শেষ হবে আর শেষ হলে কী ভাবে কতক্ষণে সে বাড়ি পৌঁছবে। দূরের দিকে ক্লান্ত চোখ মেলে বিষাদের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর এখন উপায় কী।

সেদিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সব্যসাচী। যাচ্ছিল মোটরে, ষ্টীল ড্রাইভারের হাতে। ড্রাইভারের পাশে অফিসের চাপরাশি। পিছনের সিটে সব্যসাচীর পাশে তারই অফিসের একজন সহকর্মী।

বামে-দক্ষিণে সমান ক্ষিপ্রতা—সব্যসাচীরই প্রথম চোখ পড়ল। বললে, 'ঐ মেয়েটিকে লিফট দিই। যেন কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।'

পাশের সহকর্মী সতীনাথ বললে, 'করুণ চোখ দেখে ভোলবার বয়েস কি আর আছে?'

'ভোলবার কিছু নয়। বিপন্নকে সাহায্য করা।'

'সে তো মেয়ে বলেই।' ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা কোটাল।

'নিশ্চয়ই। মেয়ে বলেই তো বেশি বিপন্ন।'

'কিন্তু দেখো পরোপকার করতে গিয়ে নিজে না বিপদে পড়ো।' সতীনাথ কঠিন হতে চাইল: 'কে জানে পথের মেয়ে কিনা।'

'সবাই পথের মেয়ে। ঘর দিলেই আবার ঘরের মেয়ে হয়ে যায়।'

'শেষকালে না ব্ল্যাকমেইল করে!'

তাতেও ভড়কালনা সব্যসাচী। মেয়েটির ঐ একলাটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, আশাহীন আর্ত চাউনি, তাকে ঘিরে একটি অলিখিত নাটকীয়তা—সব মিলিয়ে ঐ মেয়েটিই সব্যসাচীকে আকর্ষণ করল। তার মত শক্তিশালী অফিসার, সঙ্গে যার চাপরাশি, তদুপরি নিরপেক্ষ সাক্ষী সতীনাথ, তার আবার ভয় কী!'

সব্যসাচীর নির্দেশে ড্রাইভার কার্ব ঘেঁসে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

সব্যসাচী মুখ বাড়িয়ে নীলিমার উদ্দেশে ডাক পাঠাল: 'যাবেন?'

সাহেবী পোশাকে কে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক পরিচিত আত্মীয়ের মত তার দিকে হাত বাড়িয়ে কী বলছেন—হ্যাঁ, তাকে লক্ষ্য করেই—নীলিমা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। ঠিক কী যে বলছেন বৃষ্টির শব্দে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না, তবু অবধারিতের মত এমন একটা ডাক—হলই বা তা ছোট ও ক্ষুদ্র—নীলিমা উপেক্ষা করতে পারল না। ডান হাতটা তুলে মাথাটা আড়াল করে—যেন হাত দিয়ে ঐ বৃষ্টির কিছু প্রতিবিধান করা যাবে—কুটপাত পেরিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। প্রশ্নটা কী যেন শোনবার জন্যে কানটাকে তীক্ষ্ণ করল।

'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

'সাউথে।'

'তবে চলুন, উঠে পড়ুন।' সব্যসাচী গাড়ির দরজা খুলে দিল।

দ্বিধা করবার মত বিন্দুমাত্রও সময় পেলনা নীলিমা। এইটুকু আসতেই সে বেশ ভিজে গিয়েছে, আরো ভিজে আগের জায়গায় ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। আর সে তো শুধু ফিরে যাওয়া নয়, ভিজে কাপড়ে অনির্দেশকাল দাঁড়িয়ে থাকা। তা ভাবতেও গায়ে শীত ধরে। তবু একবার সব্যসাচীর চোখের উপর চোখ রাখল নীলিমা। মনে হল সে চোখে শুধু আশ্বাসই নেই, বিশ্বাসও আছে। তাছাড়া এটা এখন জরুরিকালীন অবস্থা। সাধারণ হেয়াল ডিঙিয়ে যাবার মত—এখন অত সূক্ষ্ম বাছবিচার করা যায় না। বৃষ্টির ছাট দিচ্ছেনা বিচার করতে।

নীলিমা গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ল।

যতদূর সরে বসা যায়, বসল সব্যসাচী। বললে, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

এটা একটা প্রশ্নই নয়। কেননা নীলিমা যদি টালিগঞ্জে থাকে আর ভদ্রলোকের বাড়ি যদি ভবানীপুরে হয়, তবে এ আশা করা মোটেই ন্যায্য হবে না যে ভদ্রলোক তাকে আগে টালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে পরে ভবানীপুরে ফিরবেন। বরং ভদ্রলোকের যতদূর দরকার ততদূর চলুন, পথে নীলিমার বাড়ি বা রাস্তা পড়ে সে নেমে যাবে, না পড়ে তো এ ভদ্রলোকের গন্তব্যেই নিজের গন্তব্য শেষ করবে—গাড়ির জন্যে আর পথ বাড়াবেনা। সেইটেই সমীচীন। সেইটেই সুশোভন।

তাই মুখে হাসি এনে বেশ সপ্রতিভের মত নীলিমা বললে, 'তার চেয়ে আপনার বাড়ি কোথায় জানতে পারলে ঠিক করতে পারি আমি কোথায় নামব।

'আমার বাড়ি?' সব্যসাচী সানন্দে তার ঠিকানা দিল।

'তাহলে বাঁয়ে টার্ন নেবার মোড়েই আমাকে নামিয়ে দেবেন।' শান্তিতে বললে নীলিমা।

'আপনার বাড়ি ওখান থেকে কদ্দূর?'

'কাছেই।'

'তাহলে আপনাকে একেবারে বাড়ির দরজায়ই পৌঁছে দিই না কেন? কেন মিছিমিছি ভিজবেন?'

'না, ঐ মোড়ে নামলেই হবে। বৃষ্টি এখন কমে এসেছে।'

এরপর আর পিড়াপিড়ি করার মানে হয় না। ঐ মোড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট বদান্যতা। বৃষ্টি থেমে গেলে মেয়েটা যেন তা একবার ভেবে দেখে।

গাড়ির মধ্যেটা হঠাৎ যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। দুই বন্ধুতে পরস্পর যে একটু কথা কইবে তাও নয়। নীলিমার মনে হল তার মনে যে একটা অকারণ ভয় আছে এ স্তব্ধতা বুঝি তারই প্রতিচ্ছায়া। সে চাইল কথা দিয়ে আবহাওয়াটাকে হালকা করে দিতে। বললে, 'আমার শাড়ীর জলে আপনার কোটটা ভিজে যাচ্ছে।'

'তার জন্যে আপনার দুশ্চিন্তা নেই। আপনার শাড়ির সাধ্যি নেই আমার কোট ভেদ করে আমার গায়ে এসে লাগে। সুতরাং আপনাকে শীর্ণ হতে হবে না।'

'উনি তো শীর্ণ-ই।' সতীনাথ মন্তব্য করল।

'তাহলে শীর্ণতর হতে হবে না।'

দুবন্ধুতে হেসে উঠল আর হাসি এমন সংক্রামক, নীলিমাও সশব্দ হল। তার মানে কোটের সঙ্গে শাড়ির সজল সাক্ষাৎকারে তারও বুঝি আপত্তি নেই।

নেইই তো। চাকরি করতে বেরিয়ে অত ছুঁৎমার্গ মানলে চলে না। লেডিস ট্রামের আরোহিণীদের

এ দাবি সঙ্গত নয় যে কণ্ডাক্টরও মহিলা হবে। তার মানে সকালে-বিকালে দুটো ট্রিপের পরই সে মহিলা-কণ্ডাক্টরের আর দারাদিনে কাজ থাকবেনা। এমন একটা অবান্তর কথাও মেয়েরা ভাবতে পারে! তাহলে তো রাস্তায় কোনো মহিলা চাপা পড়লে এমন দাবি তোলা উচিত কোনো পুরুষ যেন তার সাহায্যে না আসে, হাত-পা ধরে এম্বুলেন্সে তুলে না দেয়, হাসপাতালেও যেন ডাক্তারদের ধরতে না দিয়ে মেয়ে নার্সের খোঁজ করে।

'আপনি কোথায় কাজ করেন?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল দয়াময়ী।

এটুকু নিরুঠাক বলতে বোধহয় দোষ নেই। নীলিমা তাই বলল অসঙ্কোচে।

'সে তো আমারই অফিসের কাছাকাছি।'

নীলিমা তার ভঙ্গিতে সাহস আনল। স্পষ্ট স্বরে অথচ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অফিসটা কোথায় জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। সবাই জানে আর আপনি জানবেন না? সেটার নাম হল লেখকদের দালান।'

লেখকদের দালান! হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল নীলিমা।

'তার মানে রাইটার্স বিলডিং।' সতীনাথ বুঝিয়ে দিল। আর শুধু অফিসেরই নয়। দয়াময়ীর চাকরির ও তার মর্যাদার বর্ণনাটাও দিয়ে দিল সেই সঙ্গে।

কুঁকড়ে শুকিয়ে গেল নীলিমা। বিশালশালুলীর মত একজন তাঁবেদার জবরদস্ত অফিসার—তারই গা ঘেঁসে বসেছে কিনা তারই মত এক পুঁচকে অফিসর। মরমে মরে যাবার মত। দৃশ্য থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে অস্তিত্বহীন ছায়ার মত চুপচাপ বসে রইল নীলিমা। কাঁচের উপর চোখ রেখে তাকাল বাইরের দিকে। সব তারই মত কাপসা, তারই মত মুছে-যাওয়া।

এত হীনম্মন্যতাই বা কেন? সে তো ভিক্ষে করে আশ্রয় নেয়নি। বাড়ি ফেরার অফিস টাইমে কার গাড়িতে লিফ্‌ট পাওয়া যায় এ যে তার মানবীয় ভাবনার অতীত। সে তো বৃষ্টি কখন থামে তারই আশায় শূন্য মনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোকই তো গাড়ি থামিয়ে তাকে ডাকল। সে কি শুধুই মানবিকতা-বোধ, শুধুই কি বিপন্নকে উদ্ধার করার মনোবৃত্তি? তার বাইরে আর কি কিছুই ছিলনা? এই জল-ঝরঝর সন্ধ্যায়—অন্ধকার হয়ে এরই মধ্যে কেমন সন্ধ্যের মতন হয়ে গিয়েছে—একটি পিচ্ছল মুহূর্তে তাকে কি তাঁর চোখে একটু হঠাৎ ভালো লেগে যায়নি? অঘটন-ঘটানো বর্ষা কি তার প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে একটি নতুন সুর লাগিয়ে দেয় নি? না, নিজেকে অত হীনহীন, মাত্র দুশো বাইশ টাকার মাইনের নিস্তেজ কেরানি ভাববার কিছু নেই। নীলিমা সহজের চেয়েও সহজ হয়ে রইল। সে যেমন ভয় পায়নি তেমনি লজ্জাও পাবে না।

অনেক কায়দা-কানুন করে ঘুরে-ঘেরে গাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

এখানে এবার সতীনাথ নামবে।

অনেক হর্ণ দেবার পর ভিতর থেকে চাকর ছাতা ও ওয়াটার প্রুফ নিয়ে আবির্ভূত হল। এতটুকু পথ এক ছুটে চলে গেলেই হয়, তা নয়, ঘরে-সয়ে কত আয়োজন। যার যেমি আছে তার আবার সময়ও বেশি লাগে। ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মাথার উপর ছাতা মেলে ধরে কোনোরকমে পালিয়ে গেল সতীনাথ কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো ফেলে গেল গাড়ির মধ্যে।

পাশে আয়না হতেই সব্যসাচী সরে গেল আর নীলিমাও পারল বিস্তৃত হতে। দুজনের উপস্থিতিতে যতটা সাহস ছিল, এখন একজন কমে যাবার জন্যে, সাহসও কমে যাওয়া উচিত এমনি কিছুই মনে হলনা নীলিমার। বরং মনে হল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কত দিন কত বার সে অফিস-বাড়ি যাওয়া-আসা করেছে। বর্ষা কল্পনাকে যে কত ভাবে প্রভাবিত করে তার কোনো রীতিনীতি নেই, জন্মজন্মান্তরের সুহৃদকে পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয়—সেক্ষেত্রে এই গাড়িটাকে নিজেরই গাড়ি বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? আর পাশের এই লোক? বলা যাক না কেন তারা নিজেরই লোক—করুণা করে নয়, কর্তব্য বোধেই নিতান্ত অনুগতের মত তাকে নিদিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নিয়েছে।

কলকাতার বর্ষাকে নিন্দা করে লাভ কী! দোষ তো সরকারের যে উপযুক্ত সংখ্যায় যান-বাহন দিতে পারছে না, দোষ তো কর্পোরেশনের যে রাস্তাঘাটের গর্ত-গহ্বর মেরামত না করে বাস-ট্যাক্সিকে আরো পঙ্গু পাইয়ে দিচ্ছে। নইলে, মনে করুন, এমনিতেই তো কতো দুষ্কৃত, তার উপরে এই বর্ষা তেমন কিছু অন্যায় করণ নয়, এই আধঘণ্টার বৃষ্টি, তাইতেই কত ওয়াকিং আওয়ার, কত কাজের ঘণ্টা নষ্ট। সেইসঙ্গে কত কর্মশক্তির অপচয়। কেরানিরা কী করবে? কী করে আসবে, কী করে বা বাড়ি ফিরবে?

সজল নয়নে তাকাল নীলিমা। আমিও তো সেই কেরানিকুলেরই একজন।

'তখন অফিস থেকে ফেরার সময় যদি বৃষ্টির জন্যে অসুবিধে হয়, তবে আমার অফিসে চলে যাবেন, সঙ্কোচ করবেন না, আমি আপনাকে লিফট দেব।' সব্যসাচী প্রায় কানে কানে বলার মত করে বললে। সামনে আর্দালিরূপী অভিশাপ বসে, কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত করতে গেলেই শুনবে বিবরণে। শুনতে হয় শুনুক, মেয়েটি কী উত্তর দেয় তাও শুনে নিক।

নীলিমা বললে, 'মনে রাখব। কিন্তু অফিসে যাবার সময় যদি বৃষ্টি নামে? তখন?' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি কটাক্ষগর্ভ হাসিও অযাচিত উপহার দিল।

'বেশ তো, আপনার বাড়িটা দেখিয়ে দিন, আমি সকালবেলা ঠিক তুলে নেব আপনাকে।'

'আপনি যান কটায়?'

'নটায়।'

'তা হলে মিলল না। আমি বেরুই দশটা স-দশটায়।'

তা হলে মিলল না! কেমন লাবণ্যময় লাস্যে বললে। অনেক অনেক অমিল। নটায় বেরুতে পারলেও মিলত না।

জলের সঙ্গে খেলতে খেলতে থেমে থেমে এগুতে লাগল গাড়ি। নীলিমা যে একটি প্রগাঢ় চাহনিতেই বুঝে নিয়েছিল মানুষটি ভদ্র হবে, বিশ্বাসযোগ্য হবে—একটুও ভুল করেনি। একটাও অযাচিত প্রসঙ্গ তুলছেন না, বিরক্তিকর প্রশ্ন করছেন না, তাঁর সম্ভ্রান্ততায় অটল থাকছেন। অন্য লোক হলে এর মধ্যে নিজের প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথাও কত বলে নিত, আর্দালি বা ড্রাইভারকে দুটো প্রশ্ন করেও বোঝাতে পারত নিজের মহিমার দ্যুতি-কান্তি, কিন্তু ভদ্রলোক নীরবতায় ডুবে রইলেন।

কখনো কখনো নীরবতা বুঝি মুখরতার মতই উদ্বেগজনক।

বাকি পথটুকু ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই শান্তি। কিন্তু বৃষ্টি বিষম বেহিসেবী। জলের অস্পষ্টতার মধ্যে পুরোনো চেনা বাড়িটাকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। বাপ-জোকে ভুল হয়ে পড়ে। অনেক ঘুর-পথ ঘরিয়ে দেয়। জন্মান্তরের সুহৃদকেই শুধু মনে করিয়ে দেয় না, প্রাচীন বয়স এক অজানা পথিকেরও সুহৃদ করে তোলে।

এবার সেই টানিংএর পয়েন্টটা এসে পড়ল। আর ভাগ্যের এমন পরিহাস বৃষ্টিও সেই মুহূর্তে প্রবলতর হল। একটা বাজও পড়ল বিদীর্ণ হয়ে।

'কী, এইখানটায় নামবেন বলছিলেন—নামবেন?' সন্ন্যাসীই খোঁজ নেয়ে বললে।

'না। দয়া করে আমাকে আমার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিন।'

'আপনার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না বাড়িটা আমি চিনে রাখি।'

'বা, তা কেন? আপনার কষ্ট হবে ভেবে আপনার পথটা একটু কমাতে চেয়েছিলাম।'

'আমার এখন কী হচ্ছে? কষ্ট না আনন্দ?' আত্মবিস্মৃতের মত তাকাল সন্ন্যাসী।

'নিশ্চয়ই কষ্ট—ঘোরতর কষ্ট। কত আপনাকে ঘোরালাম, কত আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলাম—'

'কিন্তু আপনার কী হচ্ছে?'

'আমার? আমারো কষ্টই হচ্ছে।'

'কষ্টই হচ্ছে?' সন্ন্যাসী চমকে উঠল। স্নেহ মিশিয়ে বললে, 'বৃষ্টির মধ্যে পরের গাড়িতে চড়ে ফিরি বাড়ি ফিরছেন, কষ্টটা কোথায়?'

'আপনার কষ্টেই আমি কষ্ট পাচ্ছি।'

কথাটা শুনে অদ্ভুত ভাবে চুপ করে গেল সন্ন্যাসী। তুচ্ছ একটা কথা কিন্তু মনে হল তার সমস্ত জীবনের পাহাড়ের উপর কে যেন একখানি করপল্লবের কোমল আচ্ছাদন রাখল। ঢেকে গেল, ভরে গেল সমস্ত ধূসরতা।

আর্দালির পিছনের যেন চক্ষু যাই থেকুক যাই থুকুক, সন্ন্যাসী করলেই নীলিমার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবে না। বৃষ্টি যতই সব এলোমেলো করে দিক, তার যাত্রাবোধে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারবে না। বৃষ্টিতে আর সব চলাচল বন্ধ হতে পারে সন্ন্যাসীর রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু এ কেমন তরো কথা! 'আপনার কষ্টেই আমি কষ্ট পাচ্ছি।' এ কি পাশে-বসা এই মেয়েটি বলল না কি এটা এই বর্ষারই সুর?

'এইবার ডাইনে।' নীলিমাই নির্দেশ দিচ্ছিল ড্রাইভারকে, বলে উঠল: 'আর বেশি যেতে হবে না।'

হঠাৎ সন্ন্যাসী বললে, 'এই যে এই আমার ফ্ল্যাট।'

'এত কাছে!' প্রায় উছলে উঠল নীলিমা।

কত কাছে তা কি সন্ন্যাসীর অজানা? কিন্তু নৈকট্য কি স্থানে না অবস্থানে? দোতলার মানুষই তো কত দূর! আধখানা হাত বাড়ালেই তো নীলিমাকে এখন ধরা যায়, কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান!

আরেকটু এগিয়ে আরেকটা বাঁক নিয়েই একটা গলির মোড়ে গাড়ি দাঁড় করাল নীলিমা: 'এইখানে রাখুন।'

সন্ন্যাসী ড্রাইভারকে বললে, 'হর্ন দাও।'

নীলিমা হাসল: 'যতই হর্ন দিন আমার গাড়ি থেকে কেউ ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে আসবে না। আমার বাড়ির লোক স্বপ্নান্তরেও ভাবতে পারে না যে আমি গাড়ি করে ফিরব।'

'কিন্তু এই বৃষ্টিতে নামবেন কী করে? পুরোপুরি ভিজে যাবেন যে?'

'বাসএ করে ফিরতে আরো কত বেশি ভিজতাম।'

'এখানে তো কোথাও কিছু দাঁড়াবারও জায়গা নেই।'

'না, দাঁড়াতে হবে না, এক ছুটে চলে যাব।'

'আপনার বাড়ি কি গলির মধ্যে?'

'তা নয় কি বড় রাস্তার উপর?' খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা: বড় রাস্তার উপর হলে তো শুধু ছুটপাতটুকু পেরিয়ে গেলেই হত। এখন গলির মধ্যে যেতে হবে খানিকটা, তারপর দরজার কড়া নাড়তে হবে। বৃষ্টিতে সেই শব্দ কে শোনে, কতক্ষণে শোনে, তার ঠিক নেই। ভিজে একসা হয়ে যাব।'

'তার চেয়ে আমি বলি যতক্ষণ বৃষ্টিটা না কমে গাড়িতেই অপেক্ষা করা যাক।'

'আপনি পাগল হয়েছেন?' এবার নীলিমার সুরে অন্য রকম টান ফুটল: 'খানিক পরে এ রাস্তায় এমন জল দাঁড়াবে যে আপনার গাড়িই আটকে যাবে। তাই বলি তাড়াতাড়ি হয় আসুন পালাই আপনিও পালান।'

নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল নীলিমা। পিছনে কার একটা মানসিক বাধা অনুভব করে বলল্লে স্নিগ্ধ স্বরে, 'এবার তবে যাই।'

'কিন্তু যাবার আগে একটা কথা দিয়ে যান।'

'কী কথা?' নীলিমা দরজার আংটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কাল নিশ্চয়ই বৃষ্টি থাকবে না। কাল তাহলে এমনি সময় আমার বাড়ি গিয়ে আমাকে রিপোর্ট করে আসবেন বৃষ্টিতে ভিজে আপনার অসুখ করেনি।'

'আর যদি অসুখ করে?'

'তাহলে একটা চিঠি লিখে জেনেন।'

'আচ্ছা।' সেটা যে কত অসম্ভব তাই বোঝাবার জন্যে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠল।

'আর গোড়ার সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোন কথা?'

'অফিস কেরত বৃষ্টি নামলে বা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলে আমার অফিসে চলে আসবেন।' সযত্নে মনে করিয়ে দিল। কোথায় কোন সিঁড়ি দিয়ে কোন তলায় কত নম্বর ঘরে স্লিপ পাঠাতে হবে এঁকে দিল মানচিত্র।

'আপনার বাড়িতে গেলে?'

'ঢুকেই একতলার বাঁ দিকের প্রথম ঘরেই আমি। দরজায় নেম-প্লেট আছে। কলিং বেল টিপলেই দরজা খুলে দেব।'

'এত সহজ? দারোয়ান নেই, কুকুর নেই সত্যি?'

'অত লোকজনও নেই। বাড়ি বলতে অবশ্যি আমি আর আমার একতালা। আপনাকে দোতলায় যেতে হবে না।'

'যেখানে আপনি নেই সেখানে আমার যেতে ভারি ভয় করে।' চলে যাবার আগে আরো একটু মধু ঢালল নীলিমা। তারপরে সহসা দরজাটা খুলে দিয়ে সেই অনর্গল বর্ষণের মধ্যেই রাস্তায় নামল আর সেবেই ছুট দিল গলি দিয়ে—পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না গাড়িটা আছে কি নেই।

সব্যসাচীর মনে হল বৃষ্টির মধ্যে কোনো যুবতীকে এমনি কোনো দিন ছুটতে দেখেনি।

কথাটা মনে ছিল বলেই আজকে বৃষ্টি নামবার তোড়জোড় হতেই নীলিমা সব্যসাচীর অফিসের দিকে যাচ্ছিল সেই প্রতিশ্রুত লিফট পাবার আশায়, কিন্তু তার আগেই রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর আর কথা নেই। তখন ট্রামে ফেরা না বাসে ফেরা, না কি সোজা পায়ে হেঁটে—কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তখন ভিজলেই বা কী, না ভিজলেই বা কী!

রঞ্জন নিশ্চয়ই এক সময় জিজ্ঞেস করবে এ দিকে এসেছিলে কেন? তখন নীলিমা চলতি কথায় মামুলি উত্তর দেবে, এদিকে একটু কাজ ছিল। নিশ্চয়ই রঞ্জন জেরা করবে না, যতটুকু সে বলবে ততটুকুই সে বিশ্বাস করবে।

তার সব কথাই তো সে রঞ্জনকে বলে, কিছু লুকোয় না। আর সব্যসাচী বোসএর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তার গাড়িতে লিফট পাওয়া, সেতো বলবার মত কথা। তারপর, তার পরদিন তার বাড়িতে গিয়ে যা সব কাণ্ড দেখে এল শুনে এল সে তো এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা। যদি কাউকে বলতে হয়, প্রথমেই বলতে হয়, তবে রঞ্জনকে। ঘটনার পর রঞ্জনের সঙ্গে এই তো প্রথম দেখা—বলবে কখন? আজকে কেন সে এদিকে এসেছে সে সামান্য কথাটাও বলবার মত নয়। বলতে গেলে অনেক কথাই উঠে পড়বে। কী এমন কথা! কেন তা বলবে না? কেন তা গোপন করতে ইচ্ছে করছে প্রাণপণে?

কারণ নীলিমা সব্যসাচীকে ছুঁয়েছে।

তাই এ কথাটা পূর্বপ্রেমিক—পূর্বপ্রেমিককে বলা যায় না।

লিফটের পরদিনই সন্ধের দিকে নীলিমা সব্যসাচীর বাড়িতে এসে হাজির হল। যাঁ দিকের দরজায় ঠিক নেম-প্লেট, ঠিক কলিং-বেল বেল। টিপলে কে না জানি দেখা দেয়, কী ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করে কে জানে। ভয়ে-ভয়ে বেল টিপল নীলিমা।

প্রত্যুত্তরে স্বয়ং সব্যসাচীই দরজা খুলে দিল।

'কে?'

প্রথমটা সব্যসাচী কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল, এক নজরে চিনে নিতে পারেনি।

'সে কি, চিনতে পাচ্ছেন না?' অভিমান না দেখিয়ে হাসি ঝরাল নীলিমা।

তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল সব্যসাচী। উজ্জ্বসিত হয়ে উঠল: 'আরে তুমি? এস এস।' পরে হঠাৎ কী ভেবে গম্ভীর হল: 'কাল আপনি করে বলেছিলাম, তাই না? আপনি করেই বলা উচিত। পাড়ার মেয়ে হলে কি হয়, অফিস-পাড়ার মেয়ে। 'আপনি'ই সম্ভ্রান্ত। সবত্র আপ বলিয়ে।'

'কালকের কথা কাল গেছে, আজ প্রথমেই তুমি বলেছেন, আজ ওটাই চালু থাক।' বলতে-বলতে ঘরের মধ্যে চলে এল নীলিমা।

'আজ তোমার গায়ে ঠিক অফিসের প্রলেপটা নেই বলে চট করে চিনতে পারিনি।'

নীলিমা লজ্জায় আড়া কোটাল মুখে-চোখে, সমস্ত ভঙ্গিতে। সে যে অফিস সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তোল বদলে এসেছে ঠিক ধরতে পেরেছেন ভদ্রলোক। সদ্যের উপর ছোটখাটো একটু সাজগোজও যে করে এসেছে তাও বুঝি তাঁর চোখ এড়ায়নি।

'কিন্তু যখন হাসলে তখন মিস লাকটারকে চিনতে দেরী হল না। মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে এল।'

'সেইটেই তো স্বভাবের ডাক। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট।' নিজের থেকেই নীলিমা বসল চেয়ারে।

'বয়েসে ছোট। বয়েস তো একটা মায়া। তা তোমার কত বয়েস হবে?' সব্যসাচীও বসল।

'মেয়েদের কি বয়েস বলতে আছে?' চোখের কোণে হাসির ঝিলিক দিল নীলিমা।

'মেয়েদের বয়েস বলেই কিছু নেই—বলবে কী করে? কিন্তু মেয়ে-কেরানির বয়েস তো লিপিবদ্ধ আছে—সে লিপিতে কত?'

'বাইশ-তেইশ। আপনার?' প্রশ্ন করতে এতটুকু ঠেকলনা নীলিমা।

'কত মনে হয়?' কপালে একবার হাত বুলোল সব্যসাচী।

'বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ।'

'আরো দশ বছর যোগ করো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহাই তিপ্পান্ন।'

'বাষট্টি-তেষট্টি হলেই কী।' নীলিমা নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আপনিই তো বলেছেন বয়েস। একটা ভ্রম। আসল হচ্ছে—'

'কী আসল?'

'আসল হচ্ছে প্রাণ

কথাটা যেন স্পর্শ করল সব্যসাচীকে। সব্যসাচী নড়ে-চড়ে উঠল। বললে, 'পাশের ঘরে চলো।'

পাশের ঘরটা কী জাতীয় একবার উঁকি মেরে দেখল নীলিমা এটা যেমন অফিস ঘর-ঘর, খাড়া-খাড়া কাঠের চেয়ার, পাশেরটা বসবার ঘর, ছড়িয়ে বসার সোফা-কৌচ। অবলীলায় পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হল নীলিমা আর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে একটা সোফার মধ্যে ডুবে গেল। দিব্যি তাকিয়ে দেখল পাশের ঘরটা শোবার একটা মাত্র সিঙ্গল খাট পাতা। নিজের মনেই মুখ টিপে হাসল নীলিমা—নিশ্চয়ই আরো পাশের ঘরে যেতে বলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের আশ্চর্য, বাড়িতে আর লোক কই? চাকরের পাত্তা কই?

সবগুলি ঘর যেন শূন্যতায় রোদে খাঁ খাঁ করছে।

'তুমি কী খাবে বলো?' সব্যসাচী আবার চঞ্চল হল।

'আপনি আমার সঙ্গে যা খাবেন তাই।' সুন্দর হীরক চোখে তাকাল নীলিমা।

'আমি তো এখন এক কাপ চা আর দুখানি বিস্কুট খাব।'

'আমাকেও তাই দেবেন।'

'আমি না হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—বেশি খাওয়া বারণ—'

'আজ আমিও কম বুড়ি হয়নি—বেশি খাওয়া অসাধ্য। কিন্তু আপনাকে এই চাটুকু কে করে দেবে?'

'চাকর আছে।'

ঘরের ঔদাসীন্যটা নীলিমার কানে বাজল। সব্যসাচীর গায়ে এখনো শার্ট, পরনে ট্রাউজার্স, পায়ে অফিস-শূ। শুধু কোট আর টাই থেকেই সে মুক্ত হয়েছে। তার মানে অফিস থেকে সদ্য সদ্যই সে ফিরেছে, চিৎপোড়া বাঙালিয়ানায় এখনো বিশ্রাম নিতে বসেনি, কিন্তু এই লোকটাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা করে নেবার মত প্রিয়জন কেউ নেই কেন? শুধু একটা চাকরই আপনজন?

অবশ্য সাহস নীলিমার, জিজ্ঞেস করে বসল, 'এ বাড়ির প্রাণ কই?'

'প্রাণ ?'

'আই মিন, পৃথিবী কট ?'

হাত তুলে উপরের দিকে ইঙ্গিত করল সন্ন্যাসী। প্রথমটা নীলিমা বিস্ময় হল, ভাবল বুঝি স্ত্রীলোকটা ইহ সংসারেই নেই—পরে আবার আশ্বস্ত হল, তার এই আশ্রয় আর থাকায় আর কেউ এসে সহজ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা, খানিকটা সময় জীবনের আরেক কোণে বসে নতুন রকম শান্তিতে কাটানো যাবে।

নীলিমা অনুভব করল সমস্ত পরিবেশটা কেমন অতর্কিতে তারই কর্তৃত্বের মধ্যে চলে আসছে। জিজ্ঞেস করলে, 'তবে আপনার দেখাশোনা করে কে ?'

'এই যে আসছেন।' যদ্যপি হাসিতে সমস্ত মুখ ভরে তুলল সন্ন্যাসী।

কাকে যেন দেখবে সমস্ত হয়েছিল নীলিমা, চমকে চেয়ে দেখল বয়স্ক এক ভৃত্য দুহাতে দুটো খাবারের প্লেট নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকেছে।

'ইনিই আমার অবৈতনিক। এখন এঁরই হাতে মানুষ হচ্ছি।' সন্ন্যাসী স্নেহচোখে তাকাল চাকরের দিকে : 'এঁর নামটিও যাকগে বেলপেকটেবল।'

'কী নাম ?' নীলিমাও তাকাল স্নেহ ভরে।

টেবলের উপর দুটো প্লেট পাশাপাশি রেখে ভৃত্য বললে, 'কৃষ্ণ।'

'সাবধান !' সন্ন্যাসী বলে উঠল : 'কখাচ একে কেষ্ট বলতে পারবে না। কেষ্টা বললে তো একেবারে কুরুক্ষেত্র।'

'না, কৃষ্ণই তো ভালো।' মিষ্টি করে হাসল নীলিমা : কৃষ্ণই তো সন্ন্যাসীর সব। কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।'

কৃষ্ণ গম্ভীর মুখে বললে, 'আমার সাহেব তামাক খায়না আর আমার নাম কৃষ্ণকান্ত নয়, কৃষ্ণধন।'

অতিভাবকই বটে। নীলিমা হেসে ফেলেও হার মানল না, তার সেই হাসির রূপোর কুচিগুলি চারপাশে ছিটিয়ে দিল। বললে, 'কা কৃষ্ণে যে লাইনটা কোট করতে গেলায়—'

'যেখো কৃষ্ণকরুণ দিয়ে কিছু পাও কিনা।' কৃষ্ণ সরাসরি নীলিমাকেই লক্ষ্য করল : 'কী খেবে ? চা না কফি।'

কতদিন ধরেই যেন এ-ও-না বলে আসছে এমনি অক্লেশে নীলিমা বললে, 'চা।'

যাবার আগে কৃষ্ণ আবার বললে, 'যা দিয়েছি সব কিন্তু খেতে হবে, ফেলতে পারবেনা। অন্যথা কিইনি কিছু।'

যা দিয়েছে, সত্যকী, অন্যথা বলা যায় কী করে। একটা অমলেট আর চারটে সন্দেশ— দুটো নরম আর দুটো কড়া। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্লেটটা আয়তনে সমান হলেও ভিতরের দ্রব্য অতিকীর্ণ। সেই সাদাস্ত দুখানি বিস্কুট।

'আমার বেলায় তো অন্যথা নয় কিন্তু সাহেবের বেলায় ?' যেন কৃষ্ণও তার কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসছে এমনি ভাবের থেকে বললে নীলিমা।

'ওঁর যে মা অনেক অন্নবিধে।'

মা ! নীলিমার বুকের ভিতরটা কেমন থরথর করে উঠল। মা, মা-ই তো সর্বাচীন সম্বোধন, কানে-শোনো বুকে-ডাকা বুকে ঘাসা কত যত্নের কত পরিচিত দিনের সুগন্ধ দিয়ে ভরা, এত এত শিউরে ওঠবার কী !

খা না বলে দিদি ভাকলে কি বেশি ভালো শোনাত ? কখনো না। তবু এই নির্জন সংসারের পরিবেশে এই মা-ডাকটা নিদারুণ অদ্ভুত শোনাল।

'যাই তোমার জন্যে আগে একগ্লাস জল নিয়ে আসি। পরে চা খেব।'

কৃষ্ণ চলে যেতেই একটা নরম সন্দেশ আঙুলে করে ধরে সন্ন্যাসীর প্লেটের উপর রাখতে গেল নীলিমা। সন্ন্যাসী অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠল : 'আমি না, আমাকে না—'

নীলিমা তখন সন্দেশটা প্লেটে না রেখে সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। বললে, 'আমি দিচ্ছি, আপনি খান—'

'তুমি তুলে দিচ্ছ, নিশ্চয়ই খাব। কিন্তু এখন নয়।' দুষ্টু-দুষ্টু চোখে হাসল সন্ন্যাসী : কৃষ্ণ শুধু এক গ্লাস জল নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় গ্লাস চাইতে গেলেই ঠিক ধরে ফেলবে আমাকে। তাই আগে চা-টা আসুক, ঠিক খেয়ে নেব। তোমার দেওয়া জিনিস ফেলতে পারবনা।'

সন্দেশ ফিরিয়ে নিল নীলিমা।

কৃষ্ণ আগে জল ও পরে চা দিয়ে গেল। তখন আশে পাশে কেউ নেই দ্বির জেনেও লুকিয়ে সেই সন্দেশটি ফের সন্ন্যাসীর হাতে গুঁজে দিল নীলিমা। সন্ন্যাসী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেটা মুখে ফেলে দিয়ে চক্ষুতে চোখ বুজল।

বাইরে কত বড় ভয়ঙ্কর দুর্দান্ত অফিসর, শুধু শক্তিমত্তায় নয় কর্মনৈপুণ্যে, এমন কি বিদ্যায় বৈদগ্ধ্যে—এস বোস বললে সকলে প্রায় থরহরি. সম্ভ্রমে প্রায় সন্তর্পিত—সে কিনা সংসারের একান্তে এত নির্জীব এত দুর্বল, কটি কোমল আঙুলে ধরা একটি সন্দেশের জন্যে লালায়িত! মানুষের ভিতরে বাইরে এত বড় একটা ব্যবধানও সম্ভব, কী জানি কী, নীলিমা তার কূল অভিজ্ঞতায় কুলিয়ে উঠতে পারল না।

খেতে-খেতে ভয়টি গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়িতে ঐ কৃষ্ণই আপনার একমাত্র সঙ্গী ?'

'কৃষ্ণ আর কতটুকু ! ও ছাড়া আরেকজন সঙ্গী আছে।'

'কে সে ?' যেন চমকে উঠল নীলিমা।

'কী তার নাম বলব ? তার বাংলা নাম জানিনা। ইংরিজি নাম বলতে পারি—যাকে বলে বোরডম—বোরডম—বাংলায় তুমি কী বলবে ?'

'বিরাগ বা বিরক্তি বলা যায় না ?' নীলিমা বললে ভয়ে-ভয়ে।

'বিরাগ বা বিরক্তির মধ্যেও তো একটি সক্রিয়তা আছে। কোনো ব্যাপারে বা কারু সম্পর্কে আমি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট এ তো স্পষ্ট বোঝা যায়, ধরা যায়, তার প্রতিকারে আমি আগ্রহী হতে পারি, চাইকি লড়াই করতেও পারি—কিন্তু এ যে কিছু না চাওয়া না-পাওয়া, না-করা শুধু নয় করতে না-পারাও নয়—করতে না-জানা—বোরডমের মত বাংলায় কোনো কথা আছে ?'

'জানিনা।'

'অনীহা ? না, অনীহাও নয়। বাংলাতে নতুন এ কথাটা খুব চলেছে আজকাল। অনীহা মানে তো অচেষ্টা। অস্পৃহা—আমার চেয়ে-স্পৃহাও তো কিছু কম নয়—এ বলতে পারো কিছুতে মন-না-বসা ! হ্যাঁ, এতক্ষণে পেয়েছি কথাটা। কিছুতে মন-না-বসা ! কিছু ভালো লাগে না তাও তো বলতে পারি না। পড়তে বসি দু'পাতা পড়ে ফেলে দিই. লোকের সঙ্গে কথা বলি, দু-চারটে কথার পরেই কেটে পড়ি নয়তো চুপ করে যাই, থিয়েটারে সিনেমায় বা অন্য কোনো ফুর্তির জায়গায় যদি ঢুকি কতক্ষণ পরে কে যেন ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দেয়। মন বসে না, কিছুতেই মন বসে না—'

'কিন্তু অফিসে? আপনার কাজে?'

'সেখানে আমি আরেক লোক। সেখানে আমি দুর্ধর্ষ। অপ্রতিরোধ্য। সেখানে কাজ বলতে আমি.আমি বলতে কাজ। যতক্ষণ পারি অফিসে ওভারস্টে করি—আজ যে সকাল সকাল ফিরেছি সে শুধু ফিস লাফটার আনতে পারে সেই আশায়—কিন্তু যতক্ষণই বা বেশি থাকি এক সময় দোকান তো বন্ধ করতেই হয়—তখন কাজ ছুট হয়ে আমি যাই কোথায়? হাঁটব কোন পথে? কোন ফুটপাথে কড়া নাড়ব? কোন গন্তব্যে উপনীত হব?'

কী বলবে কিছু খুঁজে পেলনা নীলিমা। শুধু বললে, 'চা খান।'

নীলিমা বলতে বলেই যেন সন্ন্যাসীর চায়ের পেয়ালা মুখে তুলল। বললে, 'তুমি রাস্তায় লাইন দেওয়া দেখেছ, সিনেমার লাইন, রেশনের লাইন, মাঠের লাইন, রেল-স্টেশনের লাইন? মনে হয় তেমনি একটা অন্তহীন লাইনের শেষপ্রান্তে আমি বসে আছি। ফিরে যাবার উপায় নেই, অথচ লাইনও এগোচ্ছে না। বোরডম—ফিস লাফটার, একেই বলে বোরডম।' চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নীলিমা মুখ ম্লান করে বললে, 'আপনি যদি এমনি হতাশার কথা বলেন তাহলে আমি চলি কী করে?'

'হতাশ! তার চেয়েও কিছু বেশি আছে কিনা বলো।' চায়ের পেয়ালাটা আবার তুলতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসী, থেমে পড়ল। আর্তস্বরে বললে, 'ঐ ঐ সুরু হয়ে গেল—'

মাথার উপরে দোতলায় অনেকগুলি পায়ের ধাপাধাপির শব্দ শোনা গেল, অনেক ঘুঙুরের আওয়াজ, সঙ্গে নানাজাতীয় বাজনার হট্টগোল।

'ওটা কী?' চোখে মুখে ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

'ওটা একটা তাণ্ডব। জলসার রিহার্সেল।'

'ওরে বাবা! কতক্ষণ চলবে?'

'কম করে বলতে গেলে রাত দশটা পর্যন্ত। নাচ থামলে গান—একটের পর কোরাস। গান থামলে নাটক—কাটাকাটি, কাটাকাটি

'কদিন এমনি চলবে?'

'চলবে কি চলছে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে চলছে। এ যে চ্যারিটি ফাংশন। চ্যারিটির কি শেষ আছে? হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুলের সাহায্য, বন্যাত্রাণ, বস্ত্রাত্রাণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—হাজার গণ্ডা চ্যারিটি। বুঝলে না, পরের চ্যারিটি করে নিজেদের ভরণপোষণ—তাই যত চ্যারিটি তত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স?'

'আপনি এ সহ্য করছেন?'

নীলিমার কথাটা ধিক্কারের মত বাজল সন্ন্যাসীকে। কণকাল সে যেন বিমূঢ় হয়ে রইল। পরে অসহায় চোখে বললে, 'আমি কী করতে পারি?'

'এ উপদ্রবে আপনি অসুস্থ হন না?'

'অসুস্থ বলে অসুস্থ। প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। বুক কাঁপে।'

'তবু সহ্য করছেন আপনি? এ সাইলেন্স বন্ধ করতে পারছেন না?'

'তুমি কী বলছ? এই তো সংস্কৃতি। একে কি কখনো বন্ধ করা যায়?'

'তাই বলে একটা অসুস্থ লোকের মাথার উপরে এমনি উৎকট আকাবে তার প্রতিকার হবে না?'

নীলিমা অবাক মানল: 'আপনি এত বড় একজন হর্তা-কর্তা অফিসর, উপরওয়ালাদের শায়েস্তা করার পথ বার করতে পারেন না?'

পরাক্ষুতের মত চোখ মত করল সন্ন্যাসাচী।

'আপনার পুলিশ কী করে?'

'আর বোলো না! ঐ দোতলার ফ্ল্যাটটাও যে আমার।'

'আপনার মানে? আপনি ওটার ভাড়া নেন?'

'হ্যাঁ, ওটাও আমারই টেনান্সির মধ্যে।'

'তবে কি ওটা আর কাউকে সাবলেট-করা?'

কী বলবে এক মুহূর্ত বুঝতে পারল না সন্ন্যাসাচী। ম্লানকণ্ঠে বললে, 'না, ওটা আমারই দখলে।'

'তবে আপনারই বাড়িতে আপনার উপর অত্যাচার? এটা আপনি কনট্রোল করতে পারেন না? অন্তত যখন আপনার বিশ্রামের সময় তখন তো আপনি রেহাই পেতে পারেন?'

'সে সামান্য কথাটাই বা বোঝে কই?'

'আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি না।' নীলিমা ঝাঁপরে পড়ল: 'আপনি বাড়ির কর্তা, মাস মাস ভাড়া দিচ্ছেন আর আপনি জোর করে এই হাইসেন্স বন্ধ করে দিতে পারেন না? এমনি দাপাদাপি চেঁচামেচি চললে কার সঙ্গে বসে দুদণ্ড আলাপ করবেন কী করে?'

'তুমি ঠিক বলেছ।' হঠাৎ সন্ন্যাসাচী ভিতরে ভিতরে একটা জোর পেল। তার ফলে সমস্ত শৈথিল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গা-ঝাড়া সোজা হয়ে। বললে, 'নিশ্চয়—কার সঙ্গে শান্তিতে বসে একটু আলাপ করতে পারব না? তুমি বোসো, আমি এর একটা বিহিত করছি। যাচ্ছি উপরে।' সন্ন্যাসাচী দোতলার উদ্দেশে রওনা হবার উদ্যোগ করল।

'আমি আর বসে কী করব, আমি এবার যাই।' উঠি উঠি করল নীলিমা।

'না, না, তুমি যেয়ো না, তুমি থাকো। তুমি এসেছ, তোমাকে পেয়েছি—তারই জন্যে তো যাবস্থা নিতে চলেছি।' সন্ন্যাসাচী নীলিমার চোখের মধ্যে চোখ রাখল: 'সত্যি, যেয়ো না কিন্তু—কী ফিরে এসে দেখব, চলে গিয়েছ?'

মায়া হল নীলিমার। বললে, 'বলছেন যখন বসছি।'

সদর থেকে দোতলায় ওঠবার সরাসরি যে সিঁড়িটা দেখা যায় সন্ন্যাসাচী সেটা দিয়ে উঠল না। ভিতর দিকে একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি আছে সেটা দিয়ে উঠল। উপরে-নিচে সবগুলি ফ্ল্যাট বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাড়া দেওয়া হবে বলে ঐ একটা সহজে সাধারণ সিঁড়িই রেখে দিল, সন্ন্যাসাচী ঠিক তার উপরের ফ্ল্যাটটাও তার টেনান্সির সামিল করে নিল বলে বাড়িওলাকে বললে তাকে একটা একলার জন্যে আলাদা সিঁড়ি তৈরি করে দিতে। বাড়িওলা সহজেই রাজি হল। তার ফলে এই দ্বিতীয় সিঁড়ি।

চুপচাপ একা বসে নীলিমা ভাবছিল কী করে, কতক্ষণ বসে! একটু ভয়-ভয়ও সে করছিল না তা নয়, আবার এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নিমন্ত্রণে বসে আছে, ভাবতে আশ্বাসেরও উৎকটা পাচ্ছিল। তবু প্রতীক্ষারও তো একটা প্রসন্ন আছে। এ বাড়ির অন্য কোনো লোক যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করে,

আপনি কে, তখন এক কথায় নীলিমা কী বলবে? তারপর প্রশ্ন যদি আরো একটু গভীরে যায়, আপনি এখানে কী করতে বসে আছেন, তারই বা সদুত্তর কোথায়?

কী রকম যেন বিহ্বলের মতিভ্রান্তি বসে লাগছিল নিজেকে। নিদারুণ খাপছাড়া! ভাবছিল, কৃষ্ণকে ডেকে, বলে, চলে যাই। কৃষ্ণই বা তাকের নাগালে আছে কিনা কে বলবে? কৃষ্ণকে তাকতে সে নির্জনতার আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে নাকি? কে যেন কী আছে, পালিয়ে যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু কানের মধ্যে সব্যসাচীর সেই অসহায় আর্তস্বর বাজতে লাগল: তুমি যেয়ো না, তুমি থাকো, ফিরে এসে যেন তোমাকে দেখি।

নীলিমা লক্ষ্য করল হাপাহাপি চেঁচামেচি হঠাৎ থেমে গিয়েছে। তারপর সুরু হয়েছে বচসা? ঐ প্রভূত্বময় গম্ভীর স্বর নিশ্চয়ই সব্যসাচীর কিন্তু তাকে প্রতিবাদ করছে একটি তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠ—সে কে? মেম্বী হাসীয়া কেউ নিশ্চয়ই—হয় সভানেত্রী নয় অভিনেত্রী। ভদ্রলোক যেন সবাইকে বলছে চলে যেতে আর ভদ্রমহিলা যেন বাধা দিচ্ছে, না, কেউ যাবে না। এ বাড়ি আমার—বলছে ভদ্রলোক। এ ঘর-বারান্দা আমার—হাঁকছে ভদ্রমহিলা। নীলিমা যতদূর বুঝতে পারছে—এ ধরণেরই বিতণ্ডা চলেছে। ভদ্রলোক বলছে, সব বন্ধ করো, ভদ্রমহিলা বলছে, চালিয়ে যাও। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সুরু হচ্ছে জগঝম্প। পরে আবার কলহের শিখাটা উচ্চতর হচ্ছে। কেউ কেউ বুঝি সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, কেউ কেউ বুঝি তবুও যাচ্ছে না, এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। গোলমাল থামলেও গোলমালের পরমটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না সহজে।

কিন্তু নীলিমা আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

না, ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে সব্যসাচী নেমে এসেছে, কিন্তু এ কী উত্তেজিত মূর্তি! সেই স্থির কঠিন পুরুষ নয়, কী রকম যেন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে! হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে, টলছে দেয়াল ধরে ধরে। বসবার ঘরে নীলিমা পর্যন্ত এগোতে পারল না, মাঝখানের শোবার ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বোধ হয়। নীলিমা নিবিকার ছুটে গেল। সব্যসাচীর কপালের উপর নিঃসঙ্কোচ স্নেহহাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

কপালের উপরে নীলিমার উষ্ণ ডান হাত দুই ব্যাকুল হাতে ধরে রইল সব্যসাচী। বললে, 'এমনি কতক্ষণ থাকো, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' পরে সেই হাত তার খোলা বুকের উপর টেনে আনল, বললে, 'এইখানে খানিকক্ষণ চাপ দিয়ে রাখো, বুকের ধড়ফড়ানিটাও থাকবে না।'

নীলিমার মনে হল এই বিপর্যয়ের জন্যে সেই দায়ী। তারই প্ররোচনা সব্যসাচীকে উপরে পাঠিয়েছে, সংঘর্ষে উদ্যত করেছে। নইলে, সে যদি ইন্ধন না জোগাত, এই আগুন জ্বলত না। কী দরকার ছিল পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে হৃদ্যকে নষ্ট করে ফেলা? এখন এই রুগীকে সামলাবে কে?

কৃষ্ণ এল। সে আগে আগে এমনি অবস্থায় মোকাবিলা করেছে, তাই চঞ্চল হল না। দক্ষ হাতে ওষুধ খাওয়ালে সব্যসাচীকে। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারকে ফোন করব?'

সব্যসাচী বললে, 'দরকার নেই।'

অনেক হালকা বোধ করল নীলিমা। আবার খাটের কাছে শিয়র ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বললে, 'এখন কেমন লাগছে?'

'অনেক ভালো।'

'তবে আমি এবার যাই।'

'যাবে? হাঁ, যেতে তো হবেই।' যেন কাতর স্বগতোক্তির মত বললে সব্যসাচী। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থেকে বললে, 'আবার এস।'

'যা, আদর যে কি। আসতে তো হবেই।' হাসল নীলিমা।

'হ্যাঁ, আমাকে সম্পূর্ণ ভালো করে তোলো।'

'নিশ্চয়ই তুলব।' এগিয়ে এসে স্বেচ্ছায় সব্যসাচীর চোখে মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দিল নীলিমা। এ শুধু মমতার নয়, সাধনার নয়, এ আরোগ্যের স্পর্শ। জীবন-আগরণের শিহরণ দিয়ে ভরা।

বাড়ি ফিরে যেতে যেতে নীলিমা ভাবছিল যোড়শীর যার সঙ্গে এত বচসা সে মহিলাটি কে? স্ত্রী? না, আর কেউ?

আমার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে দরকার কী? সে সব্যসাচীকে জানে, তার বন্ধু তার বুকেই সে পরিচিত। তার বাইরে তার কৌতূহল কেন?

তবু এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা সে তার আপনজন রঞ্জনের কাছে চেপে যাবে? বলবেনা খুলে-মেলে?

বৃষ্টির মধ্যে দুজন—রঞ্জন আর নীলিমা—চলতি ট্রামে উঠে পড়ল। কোথাকার ট্রাম দেখবার সময় নেই। কোথাও না কোথাও তো সেটা যাবে, যদি না যাবার হয়, থামবে তো কোথাও। পথের পরিচয়ের দরকার নেই, গন্তব্যের ঠিকানারও দরকার নেই, তারা যে একসঙ্গে আছে, একসঙ্গে থাকতে পারছে—এই তাদের পথ, এই তাদের গন্তব্য।

ট্রামে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে তাইনে বেঁকল না, সোজা চলল। নীলিমা আর রঞ্জন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসল। ফুল ট্রামে উঠে পড়েছে বলে এতটুকুও ঘাবড়াল না, হা-হুতাশ করল না। হয় পথে কোথাও নেবে পড়বে, নয়তো সোজা ডিপোতে চলে যাবে। ডিপোতে ট্রাম নিশ্চয়ই ফাঁকা হয়ে যাবে—সমস্ত গাড়িতে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ থাকবেনা। বৃষ্টির দিনে ট্রাম-ডিপো যে একটা সুন্দর জায়গা সেটা প্রত্যেকে আবিষ্কার করবে। বৃষ্টির মধ্যে কেউ তাদের ঠেলে বার করে দেবেনা। যাত্রা শেষ হয়েছে বলে যদি কেউ আপত্তি করে তারা বলবে যাত্রা ফের আরম্ভ করতে আমরা রাজি আছি। ততক্ষণ দুজনে বসিনা একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে, আষাঢ়ে গল্প করি। তোমরা ভিড় কোরোনা। এদিক-ওদিক থাকো।

কতদিন ধরে একটা নির্জন জায়গা খুঁজছে রঞ্জন, কিন্তু কোনো নির্জনতাই নীলিমার মনঃপুত নয়।

ঐ ফুল ট্রটের মোড়ে বৃষ্টিটা একটু কম-কম মনে হতেই দুজনে নেমে পড়ল। নেবে রাস্তা পার হয়ে একটা সিনেমার এসে দাঁড়াল।

নীলিমা বললে, 'দারুণ ভিজে গেলাম।'

রঞ্জন হেসে বললে, 'এখুনি কী, আরো কত ভিজতে হবে।'

'তার মানে?'

'এখনো তো ম্যাটুরেশন পয়েন্ট পর্যন্ত আসেনি। এখন তো বড় ভিজবে শুধু ভেজাভাই হবে।'

বিরক্ত কটাক্ষ হানল নীলিমা: 'চলো টিকিট কেটে সিনেমায় ঢুকে পড়ি।'

'পাগল! আজকের এমন অদ্ভুত সন্ধেটা পর্যন্ত ছবি দেখে কাটাব? আজ দেখব তোমাকে। দাঁড়াও এখানে কোথাও কাছাকাছি একটা রিকশা পেয়ে যেতে পারি—' বলে জলের মধ্যেই ছুট দিল রঞ্জন।

নীলিমা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো হৈমন্তেরপায় সন্ন্যাসীর গাড়িটা এখন এদিকে চলে আসতে পারেনা? তা হলে সে কী করে? ডেকে উঠে বসে? রঞ্জনকে ফেলে রেখে চলে যায়? যা, তা কেন? রঞ্জনতো এখুনি ফিরে আসছে। ওকেও তুলে নেয় নিশ্চয়ই। তারপর কী করে কী ভাবে সন্ন্যাসীর পরিচয় দেবে রঞ্জনের কাছে? কোনখান থেকে সুরু করবে? যেটুকু সে না-বলা রাখবে সেটুকু যদি সন্ন্যাসী বলে দেয়? সন্ন্যাসী তো রঞ্জনকে চেনেনা, যদি আধখানুকুর কথা বলে দেয়? কী বলতে কী বুঝবে রঞ্জন তার ঠিক কী! দরকার নেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে। তার চেয়ে সিনেমার পোস্টার দেখা ভালো।

রঞ্জন ভিজতে ভিজতে ছুটে এল। বললে, রিকশা ঠিক মোড়ে নেই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চলো হেঁটে গিয়ে ধরি।'

'তার মানে আমাকে আরো ভেজাতে চাও?' দৃষ্টি আবার বাঁকা করল নীলিমা: 'তুই কোথাকার!'

'পাগল! যা আমার একলার দেখবার তা সকলকে দেখাই কেন?' রঞ্জন দীপ্ত কণ্ঠে বললে, 'তোমাকে আর মুক্ত বৃষ্টিতে ভিজতে হবেনা। এই দেখ রিকশা এসেছে।'

রিকশাওয়ালা বললে, 'মার্কেট পর্যন্ত যাব।'

'আমিও তো তাই বলছি মার্কেট পর্যন্ত।'

'দুটাকা দিতে হবে।'

'সেতো ভাড়া। তার উপরে বকশিস নিবিনে? বকশিস চার আনা।' নীলিমার হাত ধরে টানল রঞ্জন: 'উঠে পড়ো। পৃথিবীতে এমন উপকারী গাড়ি তুমি আর কোথাও পাবেনা।'

বাক্যব্যয় না করে রিকশাতে উঠে বসল নীলিমা। যতটুকু সাধ্য পাশে জায়গা দিল রঞ্জনকে। ভিজের উপর ভিজে—রিকশাওয়ালা চাকাটুকি দিয়ে বাঁধন-ছাঁদন দিয়ে দিল। এখন আর ভাবনা নেই, এখন সীমাবদ্ধ সান্নিধ্যে অবশ্য নিবিড়তা!

রঞ্জন বললে, 'কি, তুমি না রিকশা তুলে দেবার পক্ষে?'

'নিশ্চয়ই। এমন একটা কুচ্ছিত গাড়ি সত্য ভেবে কল্পনা করা যায় না।' বললে নীলিমা।

'কিন্তু কী আনন্দের সন্তার বয়ে নিয়ে চলেছে দেখ!' রঞ্জন হাসল: 'আনন্দ আবার সত্য হল কবে?'

'তাই বলে মানুষ মানুষকে টানবে এ অসহ্য।'

'তুমি মানুষের বদলে যন্ত্র আমদানি করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। যন্ত্রই তো মানুষকে কর্মক্লেশ থেকে মুক্তি দেবে।

'তখন দেখবে মানুষ কাজ হারিয়ে বলবে আমাদের আবার মোট বইতে দাও, কাঠ কাটতে দাও, রিকশা টানতে দাও। যন্ত্রের দৌরাত্ম্যে মানুষের যখন আর কাজ থাকবেনা তখন কাজের অভাবে তারা আবার এই যন্ত্রকেই ভাঙতে সুরু করবে। কিন্তু যাই বলো,' রঞ্জন ঘনতর স্নেহে উচ্চারিত হল: 'তোমার এই রিকশাওয়ালা কিন্তু আমাদের পেয়ে খুব খুশি। সে নিশ্চয়ই চাইবেনা তার শ্রমের লাঘবের জন্যে আমরা তার বদলে একটা ট্যাক্সি নিই।'

'আশ্চর্য এটুকুন পথ দু টাকা!' নীলিমা রঞ্জনের অপচয়কে শাসন করতে চাইল: 'এতটা প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।'

'দয়া করে তুমি রিকশাওলার অপরাধ নিও না। সারা বছর শুকনো থাকে এই বর্ষায় ওর মতন্তা ফেলে। আজকের লগ্ন তো শুধু ওর নয়, আমাদেরও।'

'না, তোমার এমন অবস্থা নয় যে তুমি অকারণে দুটো টাকা এমনি জলে ফেলে দিতে পারো।'

'কী বলো! অকারণে! এমন হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া, এমন বৃষ্টি, ফুল ট্রাম, নতুন পরিবেশ, নতুন সম্ভাষ্য—অপচয় ছাড়া এমন ঐশ্বর্য তুমি পেতে কোথায়?'

'না, ধৈর্য ধরা উচিত ছিল।' নীলিমা সিক্ত গলায় বললে, 'উচিত ছিল বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করা।'

'অনেক হয়েছে, আর অপেক্ষার কথা বোলোনা। আমরা অপেক্ষা করলেও বৃষ্টি থামতনা, করেই যেত। অপেক্ষা করে করেই কি রাত ভোর করে দেব? বুড়ো হয়ে যাব?'

'কিন্তু এ তো যাচ্ছ মার্কেট পর্যন্ত। তার পরেও তো কত পথ!'

'যদি বৃষ্টি না থামে তবে আবার রিকশা নেব। যে পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেখান থেকে আবার নতুন রিকশা—'

'হঠাৎ তোমার পার্স এত ভারি হয়ে উঠল কী করে?'

'একটা চ্যারিটি সোসাইটির ফাংশনে নাটকের মধ্যে ঢুকেছিলাম, হিরোর পার্টে বহাল হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেশ একটা ভালো টাকা আগাম দিয়েছে। কিন্তু যতদূর বুঝছি প্লে বোধহয় হবে না।'

রঞ্জন যে মাঝে মাঝে এমেচার থিয়েটার যায়না পায় তা নীলিমা জানে এবং এতে করে তার আয়ের অঙ্কটা একটু বাড়ে ভেবে তৃপ্তি পায়। চাকরির বাইরে কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ যদি থাকে তবে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাই একটা ভালো পার্ট পেয়ে যদি ফসকে যায় সেটা নীলিমারও মনস্তাপ। তাই উদ্বিগ্ন স্বরে নীলিমা জিজ্ঞেস করল, 'কেন, প্লে হবেনা কেন?'

'শুনছি সোসাইটিরই নাকি টলমল অবস্থা।'

'ভালো টাকা দিচ্ছিল—অবস্থা খারাপ হল কী করে?' নীলিমার কণ্ঠের দুরাশা কাটল না।

'কী জানি কী গোলমাল!' কথা আর বাড়ালনা রঞ্জন, চেপে গেল। বললে, 'আমার বেপারীর জাহাজের খোঁজে কী দরকার? বাকি টাকা দেয় প্লে করে দেব, না দেয়, যা পকেটস্থ করেছি তাই উপরি পাওনা।'

ইচ্ছে করেই ব্যাপারটাকে বিশদ করলনা রঞ্জন। নইলে এমনিতে বিষয়টার মধ্যে রঙ রস নাটক সব ছিল, কিন্তু কথা বাড়াতে গেলেই অনিন্দিতা বোসএর কথা উঠবে নীলিমা ঠিক নিরাসক্ত ভাবে নিতে পারবেনা। সুতরাং সেটা গোপন করে রাখাই শ্রেয়িকের কাজ।

নীলিমা লক্ষী মেয়ে, কথার মধ্যে ফাঁক খুঁজে উঁকি দিতে চাইল না। যেমন উদাসীন থাকে তেমনি উদাসীনই থাকল।

ও কি অন্য কোনো কথা ভাবছে? বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবার কথা?

অসহিষ্ণু হয়ে রঞ্জন বললে, 'তাই বলে তুমি কাঠ হয়ে থেকো না।'

'আমি বুঝি কাঠ?'

'নিষ্ঠুর কাঠ।'

'কাঠে বুঝি এত ফুল-ফল ফলে? এত মধু ঝরে?' এসে গেছে মার্কেট তাই নীলিমাও ঘনাল হল।

বললে, 'জানো, শীত হলে গায়ে তাপ হয়, গ্রীষ্ম হলে ঠাণ্ডা হয়, আর বর্ষায় যেমন ভিজে তেমনি ভিজেই থাকে।'

'মোটেই না। পথ ফুরিয়ে গেল বলে, নইলে আমি প্রমাণ করতাম বর্ষায় ভিজে কাপড় শুকিয়ে যায়।'

মার্কেটে পৌঁছুতেই কে যেন কাকে ডাকছিল পলায় 'লীলা' বলে ডেকে উঠল। চমকে উঠেছিল নীলিমা, কিন্তু তার ডাক নাম যে লীলা সে তো সব্যসাচী জানেনা। না, এ সব্যসাচী নয়, তার তাকেও কেউ ভুল করে লীলা বলে ডাকছে না।

রঞ্জনও চমকে উঠেছিল। নীলিমার ডাক-নাম লীলা—অনিন্দিতা বোস এর ডাক নাম নিন্দা।

রঞ্জনের 'কৃত্তিকৃষ্টি' ক্লাবের চাঁই শুভেন্দুই রঞ্জনকে নিয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে নিশ্চয়ই—চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে—কিন্তু রঞ্জনী গন্ধার ফুটন্ত যৌবনের মত পরীর, শুধু বিগত দিনের সুগন্ধে নয় আজকের রাত্রির উজ্জ্বল উন্মেষেই যা পরিচিত রূপের এমন মহামহিম উচ্চারণ রঞ্জন কল্পনাও করতে পারত না।

শুভেন্দু বললে, আপনাকে যার কথা বলছিলাম। যদি আমাদের ক্লাবের 'যেমন সঙ তেমন রঙ' নাটকটা সিলেক্ট করেন, তা হলে এ হিরোর পার্ট নির্ঘাৎ মাতিয়ে দিতে পারবে।'

'সত্যি?' অনেক কমবয়েসী মেয়ের মত অভ্যস্ত সুর বের করে বললে অনিন্দিতা, কিন্তু পরিপূর্ণ চোখে তাকাতে গিয়েই স্তম্ভিত হল। শক্ত কাঠামোতে স্থির দীর্ঘচ্ছন্দ যুবক—নায়ক হবারই উপযুক্ত। অনিন্দিতার মনে হল শুধু রঙ্গমঞ্চকে নয় অনেক স্বপ্নমঞ্চেই এ মাতিয়ে দিতে পারবে।

'কী নাম আপনার?'

'রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।'

'রঞ-জন!' অন্যরকম করে উচ্চারণ করল অনিন্দিতা: অর্থাৎ যে জন রণ করে তার মানে অপনি যোদ্ধা।'

'যোদ্ধা!' সুন্দর সমানে-সমানে হাসল রঞ্জন: 'আমি যুদ্ধ করব কী! আমার পদবীতে যে চট্ট। চটি পড়ে কি কেউ যুদ্ধ করতে পারে?'

অনিন্দিতার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে হাসল। ছেলেটি শুধু চেহারায়ই সুন্দর নয়, কথায়ও সুন্দর। পুরুষের সৌন্দর্য ব্যক্তিত্বে আর বাক্যই ব্যক্তিত্বের মধু।

'পদবী ফেলে দিন। পদবী দিয়ে মানুষের পরিচয় হয় না।' অনিন্দিতা হঠাৎ মুখচোখ কুটিল করে তুলল।

'কিন্তু আপনাকে তো আমরা মিসেস বোস বলেই জানি।' কে একজন বয়স্ক লোক বললে।

'মিসেস বোস বলে ডাকেন—তা আপনারা ডাকতে পারেন। কিন্তু আমি মিসেস-টিসেস নই, ওটা আমার পরিচয় নয়। আমি অনিন্দিতা—সকলের অনি-দিদি। কী বলো মেয়েরা?'

কতগুলো মেয়ে এককোণে বসে গুলতানি করছিল, তারা সমস্বরে বলে উঠল: 'অনি-দিদি! অনি-দিদি!'

'তোমরা ছেলেরা কি বলো!'

আরেক কোণে কতগুলি ছোকরা আড্ডা দিচ্ছিল, তারাও তালে-তালে বলে উঠল: 'অনি-দিদি, অনি-দিদি!'

পরিতৃপ্ত চোখে তাকাল অনিন্দিতা। বললে, 'রঞ্জন যদি বোকা না হয় তো রঞ্জন কী?'

রঞ্জনের মাথায় দুষ্টুমি খেলল। বললে, 'এক্স-রে।'

'এক্স-রে?' অনিন্দিতার সঙ্গে-সঙ্গে অনুচর ছেলেমেয়েগুলি হেসে উঠল।

'কিংবা,' রঞ্জন আরো বিনীত হল, 'বলতে পারেন শুধু-এক্স।'

বালবিদ্যুতের আবার একচোট হাসি।

'কেন এক্স কেন?'

'প্রফেসর Rontgen এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই থেকে এক্স-রের বাংলা নাম হয়েছে রঞ্জন রশ্মি। এখন রে-র মানে হচ্ছে রশ্মি। সুতরাং রঞ্জনের মানে হচ্ছে এক্স।'

বলার ধরণে এবারের হাসি আরো ব্যাপক হল।

হঠাৎ কাছে এসে নিচু গলায় অনিন্দিতা বললে, 'কথাটার আরো একটা মানে আছে। সেটা আপনাকে আমি পরে জানাব।'

রঞ্জনের যেন তা জানতে বাকি আছে! নিজের নামের মানে ভাবতে গিয়ে নীলিমার মুখখানিই তার মনে পড়ে গেল। নীলিমাই মুখই যেন তার নামের মানে দেয়া!

'বসুন। চট করে চলে যাবেন না যেন। অনেক কথা আছে।'

একটা টেবিল ঘিরে বন্ধুদের দল নানা আলোচনা করছে, তারই ধারে ওকটা চেয়ারে রঞ্জন বসল। ব্যাপারটা কী সে আগেই শুনেছে, এখন স্বচক্ষে দেখে অভিভূত হয়ে গেল। উঠতি বয়সের কত শিল্পী, কত তাদের নৃত্য ও নাটকের আয়োজন, কতই বা গানের ঘুমবাম। মিসেস অনিন্দিতা বোস একজন নতুন ইমপ্রেসেরিয়ো—নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠান করে টাকা তোলেন ও তা দিয়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করেন। 'অনিন্দিতার আনন্দমেলা' বেশি আকর্ষণীয় যেহেতু তার শিল্পীর দল সব সময়েই নতুন, সব সময়েই আগন্তুক আর বিষয়গুলি সব সময়েই আধুনিক ও অগ্রগামী। ছেলের অগ্রপাতে মেয়ে বেশি, কেননা অনিন্দিতা জানে যত বেশি মেয়ে তত বেশি চাকচিক্য—তত বেশি টিকিটের মর্যাদা। যাদের যৌবন গত বা হত তাদের অভিনয়ে যতই পারিপাট্য থাক, শুধু মেক-আপের ফাঁকিতে দর্শকে ঢেউ তুলতে পারবে না, আর যে মেয়ে সুন্দর তার অভিনয়ে ত্রুটি হলেও সে সুন্দর। তার নাচের ভুলও দর্শককে নাচিয়ে যাবে। কিন্তু যতই মেয়ে এনে জড়ো করুক অনিন্দিতার নজর ছেলের দিকে। কেননা সে জানে আসল সম্ভাবনা ছেলের মধ্যেই—মেয়ে আর কতদিন!

পাশে-বসা শুভেন্দুর কানে-কানে বলার মত করে রঞ্জন বললে, 'মেয়ে কত!'

শুভেন্দু বিজ্ঞের মত হাসল। মিসেস বোসের মত এমন একজন মহাধাত্ত মহিলা, তার পক্ষছায়ায় সকলেই নিরাপদ। নিরাপদ শুধু নয়, বাধিত। বাধিত শুধু নয়, বশংবদ। কেউ নেই অনিন্দিতার কথার উপর কথা কয়। কথা কইবার দরকার যা কী। যে কেউই অনিন্দিতার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় সে পাক বা না পাক, কিছু না কিছু দক্ষিণা পায়। চ্যারিটির আরম্ভ নিজের গৃহেই, এ আপ্তবাক্যে নিরঙ্কুশ বিশ্বাসই অনিন্দিতার সাফল্যের হেতু। তাই যখন সে কোনো লোকসেবায় টাকা দেয়, খরচ খরচা কেটে রেখে তবে দেয়। আর এই খরচ খরচার মধ্যে জলদার ভিতরের ও বাইরের সবলের প্রাপ্যই ধরা থাকে। এমনও কেউ কেউ আছে যে পাট পায় না অথচ মাইনে পায়। যেহেতু তুমি অনিন্দিতার মনোনীত, কোনো না কোনোদিন তুমি কাজে লাগতে পারো সেই জোরেই তোমার মুনফা মিলে যাবে। তাই সে আসে অন্তত বসে থাকতে আসে।

মিটুট নিখুঁত সংগঠন। দু'দুটো মেয়ে হিসেব লিখছে—আদায়ের আর বায় শোধের। টিকিট বেচার ভার আর দুটোর উপর—সময়ে সময়ে এই সংখ্যাটা বিগুণ হয়ে ওঠে। এরা কাউন্টারে বসে না, এরা কার্মে ক্যাটরিতে ঘোরে, শাঁসালো অফিসারদের গাঁথে। এই টিমের অধিকর্ত্রী স্বয়ং অনিন্দিতা আর সে দিয়ে দাঁড়ালে কার সাধ্যি নেই সর্বোচ্চ দামের টিকিট একটা না কেনে। তাই সরাইকে দিয়ে থুয়ে করিয়ে কম্বিয়ে বেশ মোটা রকম মুনফা কামায় অনিন্দিতা এই সকলের ব্যবস্থা। রঞ্জন লক্ষ্য করল এই সংগঠনের নামও অনিন্দিতা। অনিন্দিতার নাটক—অনিন্দিতার নাচগান—অনিন্দিতার দলবল—তার নামেই সবাই মাতোয়ারা! মেয়ে কত! কিন্তু রঞ্জন চেয়ে দেখল নীলিমার মত কেউই মন-প্রাণ ভরে দেয়না। বা, কথা না বলে আলাপ না করে তুমি তাদের দাম কষবে? এই তো শুনতে পাচ্ছি তাদের কথা তাদের হাসির শব্দ, টের পাচ্ছি তাদের আলাপের কী গতি রীতি, কই কিছুই তো চিত্তে এসে লাগেনা। নীলিমার কথা কী মিষ্টি, হাসি কী সরল-অমল আর যা সে বলবে, তারই মধ্যে তার যতটুকু বলবে ব্যক্তিত্বের সুগন্ধ। সে যদি কোনো শব্দও না করে, নীরবে কাছে এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার মুখের দিকে তাকালেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

তুমুল হৈ-হল্লার শেষে মহড়া ভেঙে গেল। এবার তবে ছুটি। রঞ্জন তার হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা প্রায় বাজে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে—কতগুলি মেয়ে ঝাঁকবেঁধে—সিঁড়ি দিয়ে নামছে যেন ঝর্ণার প্রপাতের মত। নীচে-উপরে আশেপাশে আরো যে ফ্ল্যাট আছে এবং সেসব ফ্ল্যাটে যে বাসিন্দে আছে তা তারা লক্ষ্যের মধ্যেই আনছে না। তারা আছে, তাদের পায়ের নীচে ধরাপৃষ্ঠ আছে আর তাদের শরীরে আছে নতুন বয়সের যৌবন এতেই তারা বিশেহারা। নীলিমা হলে কখনোই এমনি ছন্দ-ছাড়া হত না। খুশিতে সে যদি উচ্ছ্রীও হত, সুশ্রী থাকত!

কথা আছে, অনেক কথা—একটি কথাও তো পরিবেশন করল না। রঞ্জন বসে-বসে ক্লান্ত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। চট করে চলে যাবেন না—সে কথা মানতে গিয়ে এ তো শেষেরও বেশি প্রতিক্ষা করেছে। তবু যে একটাকে কেটে পড়েনি তার কারণ মেয়েগুলি। মেয়ে দেখতে রঞ্জনের বেশ আনন্দ হয়। আর এ দেখে আরো আনন্দ হয় কেউ তার নীলিমার, তার নীলার মত যথেষ্ট নয়।

রঞ্জনও শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল। সৌজন্যের খাতিরে একবার, মানে শেষবার তাকাল অনিন্দিতার দিকে আর অনিন্দিতা তখুনি তার চোখে ছোট্ট একটি ইশারা করল।

সে ইশারার অর্থ কাছে এস। শোনো—শুনে যাও। সকল কানের আড়ালে তোমাকে একটি গোপন কথা বলবার আছে।

রঞ্জন এক মুহূর্ত নিশ্চলের মত মত দাঁড়িয়ে রইল।

সন্দেহ কী, অনেক কথা—একটি ক্ষুদ্র কটাক্ষেই এক অভিধান কথা।

রঞ্জন নড়তে পারছেনা দেখে অনিন্দিতাই তার কাছে এগিয়ে এল। কেউ যারে কাছে-নেই, তবু কণ্ঠস্বর নিচু করে গোপনতার মায়া মাখিয়ে বললে, 'কাল একলা-সকাল সকাল এস।'

'কখন?' কটার সময়?'

'ধরো সাড়ে চারটেয়।'

আজিসের কথা ভেবে বুঝাই বুঝি দ্বিধা করছিল রঞ্জন, অনিন্দিতা করুণা করে বললে, 'আচ্ছা পাঁচটায়। কেমন?'

'আসব।' আরেকবার তাকাতে সাহস পেল না রঞ্জন। একটু বুঝি দ্রুত পায়েই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

কথা—কথা কি শুধু মুখ বলে? কথা বলে চোখ। সমস্ত নৈপুণ্য চোখে। চোখের আলোতেই লিপির সবগুলি অক্ষর ঝলমল করে ওঠে।

পরদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন। জরুরি রিহার্সালের কথা বলেই গোপেশ বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিল।

'সে কী কথা?' গোপেশ বাবু একটু অবাক হলেন: 'সন্ধের আগেই রিহার্সেল?'

'নাটকটা খুব জরুরি, স্যার।' রঞ্জন কান চুলকোল।

'নাটক না উপন্যাস?' গোপেশ বাবু তাকালেন বাঁকা চোখে।

'নাটক স্যার।'

'তাই বলে এ দিকের নাটকটার দিকেও লক্ষ্য রেখো।'

এ দিকের নাটক বলতে গোপেশবাবু বোধহয় অফিসের কর্তব্যের কথাটাই বোঝাতে চাইছিলেন, কিন্তু কেন কে জানে রঞ্জনের নীলিমার কথাই মনে পড়ে গেল। সে তো শুধু ঘটনার নাটক নয়, চিত্তবিলাসের উপন্যাস নয়, মর্তের ধূলিতে অমরাবতীর কবিতা নয়—সমস্ত কিছু হয়েও সে আবার ব্যাকরণ সর্বস্বের ব্যাকরণ।

প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলেন গোপেশবাবু।

রঞ্জনও অনুভব করল আজকের দিনও বুঝি প্রথম দিন। নীলিমার প্রথম দিনের ডাকও তার মনে পড়ল? সে ডাক মধুরীর ডাক। আজ যেন তাকে তিক্ত ডাকছে, রুক্ষ ডাকছে, ডাকছে কটুকষায়। জীবনে এ ডাকও প্রথম বৈকি। আরও ডাকাও দুর্বারম।

ফ্ল্যাট বাড়ির নিচেটা কেমন যেন খমথম করছে মনে হল। এখন তো দিন বিকেলের দিকে ঢলে পড়েছে, চারদিকে একটু সাড়াশব্দ থাকলেই স্বাভাবিক হত। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, কেমন যেন মুখ ফেরানো। এ সব ঘরে না-জানি কারা থাকে—তাদের কারু ঘরে কি কোনো শিশু নেই? কোনো কান্না কোনো কোলাহলেরও কি আভাস মিলবে না? এ কি কবরের দেশ? শুধু স্তব্ধতার স্তূপ!'

কালকের রাতে হোটেলের নাচ-গান-অভিনয়ের হৈ-হল্লা কেমন যেন অবাস্তব, কেমন যেন ভিত্তিহীন বলে মনে হল।

কাকে চাই—আশে-পাশ থেকে সামান্য কোনো কৌতূহলের খোঁচা নেই। একটা মাত্র সিঁড়ি বা দিয়ে উপরে সটান উঠে যাওয়া যায়। আর উপরে উঠে একটি মাত্রই লোক যার কাছে সে অবাধে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

একটি কটাক্ষের এমনি অমোঘ নিমন্ত্রণ!

উপরে উঠছে না নিচের দিকে নামছে বুঝতে পারছে না রঞ্জন। তবু সে যাচ্ছে, চেনা দরজার কাছে এসে সে থামছে, দ্বিধা করছে বন্ধ দরজায় টোকা মারবে কিনা।

কে জানে দরজা খুলে কী সে দেখতে পাবে ভিতরে। হয়তো অনেক লোকজন, অনেক বাধাবিপত্তির দুর্ভাবনা। হয়তো রঞ্জনকেই চিনতে পারবে না। থিয়েটারে পার্টের প্রার্থী তো এ সময়ে কেন? যুধ-শুক্র-রবিও তিন দিন ক্লাস বসে তখন একদিন যেন আসে—আর তাও সন্ধে সাতটার পর। আজতো বেস্পতি—

তাও ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে চারটে। এত তাড়া হওয়া কিসের জন্য? আগে এলেই আগে পায় না। আগে আগে দরখাস্ত করতে গেলেই আগে আগে বরখাস্ত হয়ে যায়।

ছলনাতেই নারী মহীয়সী এ কথা রঞ্জন বইয়ে পড়েছে, না হয় বই-ই এবার নিজের চোখে মিলিয়ে নেবে। অভিজ্ঞতাই তো জীবনের ইট-কাঠ, অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে গেলে তো বলেই বাঁধা হবে না। ঐ ঘটাকটাই তো অভিজ্ঞতা।

সেই কটাক্ষকে স্মরণ করে, তবু ভয়ে-ভয়ে, দরজার আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা মারল রঞ্জন।

কে একটি কিটফাট যুবতী মেয়ে দরজা খুলে দিল।

এ আবার কে? থমকে গেল রঞ্জন। ভুল ঘরে ঢোকা দিল না তো? ভয়ে-ভয়ে ছোট করে জিজ্ঞেস করলে, 'বিশেষ বোস আছেন?'

'আরে এস এস, রঞ্জন না?' ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ডেকে উঠল অনিন্দিতা। একটা টেবিলের সামনে বসে লিখছিল, উঠে দাঁড়াল। স্বল্প বেশবাস, উঠে দাঁড়াবার আড়ম্বরে বুকের আঁচল পড়ে গেল মাটিতে। তুলে স্থাপন করবার উদ্যমেও কেমন একটা অমনোযোগ দেখাল। আবার তুলতে আবার পড়ে যেতে পারে, তাই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। রঞ্জন দেখল চোখ ভরে। দেখল রুক্ষতার মধ্যেও কত মহিমা কত বৈভব।

'বোসো, বোসো।' অনিন্দিতা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। বললে, 'তুমি আসবে বলে আমি আজ দুপুরে ঘুমুতে পারিনি।'

অপরাধীর মত মুখ করে বসল রঞ্জন। বললে, 'আপনি দুপুরে ঘুমুন নাকি?'

'দুপুরটাকে ভুলে থাকবার জন্যে ভদ্রমহিলার পক্ষে খুবই ভদ্রতম উপায়। কিন্তু তুলেই কি আর ঘুম আসে? আজ তো বেশি করেই আসবে না—আসেওনি। একবার চেয়ারে বসেছি আরেকবার ইজিচেয়ারে শুয়েছি।' অনিন্দিতা এখন মুখোমুখি ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল।

পয়ানা শোভাকে দেখতে দেখতে রঞ্জন বললে,—'কেন, আজকে ঘুমের ব্যাঘাত হল কেন?'

'আহা, বুঝতে পারো না?' চোখের কোলে কালো মদিরার বুঝি বুলোল অনিন্দিতা: 'প্রীযানের জন্যে।'

'আমার তো আসবার কথা সাড়ে চারটেয়।' হাতের ঘড়িতে রঞ্জন সমর্থন খুঁজল।

'সেই ঠিকমত সময়ে আস কি-না তারই জন্যে উদ্বেগ। না কি একেবারে ভুলেই যাওয়া করে দিলে!' দু হাত উপরের দিকে তুলে যুক্ত করতলে মাথা রেখে অনিন্দিতা ভঙ্গিতে আলস্যের লাস্য ছড়াল।

'আপনাকে ভুলব না আরো কিছু!'

'সত্যি? কিন্তু তোমাকে যে আপনি ছেড়ে তুমি বলছি তাতে তুমি চটছ না?'

'চটব কেন? তুমি তো বেশ ভালো ডাক!'

'ভালো ডাক!' অনিন্দিতা স্বরটা বাঁকা করল: 'লোকে তুমি বলে কখন?'

'বয়সে ছোট হলে। আর—'

'তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট তা আন্দাজ করতে পারো?'

'কী করে পারব? আমি কি বয়েস বিশ্বাস করি?'

'বটে? তোমার বয়েস কত?'

'আমার বয়েস ত্রিশ আটাশ।'

'আর আমার বয়েস আমত্রিশ পঁয়তাল্লিশ।' উচ্চরোলে হাসল অনিন্দিতা।

ভাগ্যিস এখানটায় অনিন্দিতা লক্ষ্যে হেসে উঠেছিল তাই একবার নীলিমার কথা রঞ্জন ভাবতে পারল। তাই সাহস করে বলতে পারল : 'ও কিছু নয়। তুমি ডাক অনায়াসে চলতে পারে।'

'সে তো আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই পারে।'

'আমার দিক থেকেও পারে।' দুই ঠোঁটে হাসল রঞ্জন।

'তার মানে?' ভ্রূকুটি রাগ দেখিয়ে অনিন্দিতা ইজিচেয়ারে উঠে বসল।

'তার মানে আমি তোমাকে তুমি বলতে পারি।' যতই ভয় দেখাক, রঞ্জন আর ভয় পেলনা। বললে, 'ছোট হলে যেমন বলা যায় তেমনি আবার সমানে-সমানে বলা যায়।'

'আমি আর তুমি সমান-সমান?' অনিন্দিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'কেন নয়? অন্তরাগে সমান-সমান।'

'উত্তরে অনিন্দিতা কী করে বা কী বলে দেখবার জন্যে এক নিশ্বাস স্তব্ধ হইল রঞ্জন। অনিন্দিতা কাছে এসে রঞ্জনের মুখটা দু হাতে ধরে বুকের উপর টেনে আনল। সস্নেহে বললে, 'তাই তো ডাকবার সময় মিসেস ঘোষ বললে?'

'আর বলব না।'

'তবে কী বলবে?'

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

—সাফেশ বিক্রেতা—

সিমলার

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

হেড অফিস—৫৭/২বি, ৫৭, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-১-৫০

শাখা— ৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৫-১৮২৯

„ ২৮, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

'অন্তু বলব।'

'উঃ, অসম্ভব।' দু কানে দু হাতের দুটো আঙুল ঢুকিয়ে অনিন্দিতা ছিটকে দূরে সরে গেল। তার আগের চেয়ারে গিয়ে বসল। বললে, 'ঐ নামে আমাকে আমার স্বামী ডাকত।'

'তোমার স্বামী?' রঞ্জন যেন হকচকিয়ে গেল: 'সে বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে বৈ কি। দুর্দান্ত বেঁচে আছে।'

'সে কোথায়?'

'সে এখন অফিসে।' বলেই, যেন আশঙ্কা করা দরকার এমনিভাবে দেখিয়ে হেসে বললে, 'ভয় নেই। এক্ষুনি সে ফিরবে না। ফিরলেও আসবে না এখানে।'

'কেন, সে কি আলাদা থাকে?'

তীক্ষ্ণ প্রশ্নে অনিন্দিতা হঠাৎ বিব্রত বোধ করল। বললে, 'আলাদা থাকলেও দূরে থাকে না। এই কাছাকাছি থাকে।' ধীরে ধীরে অনিন্দিতা আয়ার তার চেয়ারের কাছে সরে গেল।

'কাছাকাছি মানে কত দূরে?'

'নিচে। নিচে এক নম্বরের ফ্ল্যাটে।'

বেশ, তাতেই রঞ্জনের চলে যাবে—এর বেশি খবরে তার প্রয়োজন নেই। তবু কৌতূহলই মানুষের বড় ব্যাধি, তাই প্রশ্নটাকে তাড়াতে চেয়েও তাড়াতে পারল না। জিজ্ঞেস করলে, 'যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল সে কে?'

'কী, রঞ্জন-রশ্মির চোখ ঠিক পড়েছে তাহলে?' পরিচিত পরিহাসের মলমল মিশিয়ে হাসল অনিন্দিতা।

'সশরীরে একজন দরজা খুলে দেবে আর তা চোখে পড়বে না?'

'বেশ তো রঞ্জনরশ্মি ওদে নিজেই বলুক মেয়েটি কে?'

'তোমার মেয়ে?'

'না, না, আমার মেয়ে হতে যাবে কেন? এবার যেন পরিহাস নয়, অনিন্দিতার মুখে চোখে একটা কঠিন আলার ছাপ ফুটে উঠল: 'আমার মেয়ে কোথায়? আমার মেয়ে নেই। ও আমার কাজের মেয়ে।'

'শালীন ভাষায় যাকে বলে পরিচারিকা।'

'হ্যাঁ, তাই। সহকারিণী।' অনিন্দিতা অন্য দিকে চোখ রাখল।

কিন্তু কৌতূহল রঞ্জনকে ছাড়ল না। এই কৌতূহলের জন্যে আদিম মানুষ তার স্বর্গ খুইয়েছে তবু সেই কৌতূহলই তাকে জানলার ফাঁকের কাছে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামীও কি এমনি একটি সহকারিণীকে নিয়ে থাকে নাকি?'

অনিন্দিতা ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বললে 'তা একদিন উঁকি মেরে দেখে এলেই পারো কার সঙ্গে থাকে।'

'আমার ভুল হয়েছে। আমি মার্জনা চাইছি।' রঞ্জন বিরক্তির কারণটুকু ঠিক মুছে দিল কথা চেয়ে: 'তুমি যেমন কাজের মেয়ে, তোমার সহকারিণীকে নিয়ে থাকো তোমার স্বামীও তেমনি কাজের লোক, তার সহকারীকে নিয়ে থাকে। এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমি যেমন একলা, আমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার স্বামীও তেমনি একলা।' তারপর রঞ্জনের যেন একটু বেশি কথা

এবার সৌরভ সেই প্রগলভতায় বলে বসল : 'একদিন নিচের ফ্ল্যাটে গিয়ে তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে আসব।'

'খবরদার না।' অনিন্দিতা গর্জন করে উঠল : 'আমার ঘরে এসে আমার বন্ধু হবার পর আর আমার স্বামীর চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না।'

দিব্যি হাসিমুখে মেনে নিল রঞ্জন। বললে, 'তুমি যখন বারণ করছ তখন নিশ্চয়ই মাড়াব না। একটা শূন্য ঘরের চৌকাঠের চেয়ে তোমার বন্ধুতার দাম অনেক।' তারপর এই বন্ধুতাকে ঘনতর করার জন্যে বললে, 'তোমার কাছে এতক্ষণ এসেছি এখনো কিছু খেতে দিচ্ছ না?'

'কী মিষ্টি ছেলে!' স্নেহের উত্তাল ঢেউয়ে ছুটে এসে অনিন্দিতা রঞ্জনের মুখটা আবার বুকের কাছে টেনে নিল। বললে, 'নিশ্চয়ই খেতে দেব।' বলেই ছেড়ে দিয়ে ডাকলে বাসন্তীকে।

রঞ্জন দেখল সেই দরজা খুলে দেওয়া মেয়েটিই বাসন্তী।

'কি রে, হল?' অনিন্দিতা উৎসুক খুশিতে জিজ্ঞেস করল।

'হয়েছে।' বাসন্তী বললে, 'ওঘরে দিয়েছি।'

'না, না, এখানে নিয়ে আয়। এখানে সাজিয়ে দে।'

অনিন্দিতা উঠে তার টেবিলের দিকে গেল আর টানা খুলে একটা চৌকো খাম বের করল। সেটা রঞ্জনের হাতে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'এটা রাখো।'

'কী এটা?' এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হল রঞ্জন।

'পঞ্চাশটা টাকা। তোমার যাওনার বউনি।' জলো-জলো চোখে হাসল অনিন্দিতা।

'অভিনয়ে পার্ট নিলাম না এখুনি টাকা কী?'

'আগাম দিয়ে রেখে তোমায় নাম পাকা করে নিলাম।'

'টাকা না নিয়ে বুঝি পাকা হতে পারতাম না?'

'তবু আমার আপন লোককে আমি টাকা দেব তাতে তোমার কী বলবার আছে?' অনিন্দিতা তার মুখে-চোখে উপদেষ্টার গাম্ভীর্য আনল : 'হাতে যা আপনি এসে পড়ে, তা অকুণ্ঠ নিয়ে নেবে। না চাইলে যা পাওয়া যায় তা যদি না নাও, তাহলে জীবনে যখন চেয়ে চেয়েও যা পাবে না তার দুঃখ সহ্য করবে কী করে?'

'কিন্তু আগে থাকতেই টাকা—যার না হতেই যামাযৎ—' রঞ্জন যেন এ জায়গাটা স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার মত বললে।

'হ্যাঁ।' অনিন্দিতা প্রায় ধমক দিয়ে উঠল : 'তোমাদের নাটকের নাম 'যেমন সঙ্গ তেমন রঙ্গ' না? আমারও সেই নাটক। যেমন সঙ্গ তেমনি রঙ্গ। আমার সঙ্গ করতে এসেছ, আমার রঙ্গও তোমাকে দেখে যেতে দেব। আমি পরীক্ষা না নিয়েই পাশ করে দিই, শুধু পাশ করে দিই না, একেবারে প্রথম করে দি—'

'কিন্তু সত্যি বলছি,' রঞ্জন খামটা হাতে রেখেই বললে, 'আমার টাকার দরকার ছিল না—'

'দূর বোকা ছেলে!' আবার ধমক হানল অনিন্দিতা : 'টাকা কখনো কার বেশি হয়? কখনো কেউ বলতে পারে আমার ভালোবাসা পাবার দরকার নেই? উড়িয়ে দেবার জন্যেও তো টাকার দরকার আছে। বেশ কদিন রেস্তরাঁয় খাও, সিনেমা দেখ, এমনি ঘুরে বেড়াও '

'ও ভাবে ওড়াবার জন্যে একজন সঙ্গী দরকার।'

'যেন তোমার ফুইটফাই নেই?'

'কোথায় পাব?' ক্ষুণ্ণায়িত ভঙ্গি করল রঞ্জন। মনে মনে নীলিমাকে বললে, তুমি এখন এসো না। তুমি শূন্যের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকো।

'বিশ্বাস করি না। এমন সুন্দর পৌরুষভরা চেহারা, তুমি কার রঞ্জন হতে এখনো বাকি আছ!'

'রঞ্জন?' যেন নিজের নামটাই নতুন রকমের রঞ্জনের কানে বাজল।

'হ্যাঁ, মনোরঞ্জন?' অনিন্দিতা টেবলের দিকে সরে গেল, কী একটা অকারণ গোছগাছে মন দিলে। বললে, 'তোমার মায়ের সেই আরেকটা অর্থের কথা বলব বলেছিলাম না? এটাই সেই অর্থ। তুমি তো বশ-জন ষোলা নও, তুমি রঞ্জন—বাঁশিওয়ালা।'

রঞ্জন হাসল, বললে, 'আমাদের দেশে যিনি বংশীধর তিনিই আবার বিরাট ষোলা।'

'জানি। তুমিও তেমনি বাঁশি হয়ে কার হৃদয়ে ঢুকে অন্ধ হয়ে বিকল হয়ে বেরিয়ে যাবে।' অনিন্দিতা ভ্রূকুটি করল।

'আমি আবার কার হৃদয়ে ঢুকব? কার নয়নরঞ্জনই হতে পারলাম না। তার মনোরঞ্জন!'

'সত্যি বলছ তোমার কেউ নেই?'

এই ঘরের ছাদ ক্ষণকালের জন্যে নীলিমাকে আড়াল করে থাকে। তাই উপরের দিকে চোখ না পাঠিয়ে রঞ্জন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ রাখল। বললে, 'সত্যি বলছি আমার কেউ নেই।'

'একজনও নয়?' অনিন্দিতার চোখে সেই নেত্রোদ্ভূত কটাক্ষ ফুটে উঠল।

রঞ্জনের সাড়া দিতে দেরি হল না। স্বর গাঢ় করে বললে, 'শুধু একজন আছে।'

'কে সে?'

সে ফুইটফাই নয়, সে লেডি লাভ।'

কথা বলার ধরনে ও সংকেত সংকুল চাউনির মিলনে দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বললে, 'দাঁড়াও, আমার স্বামী আসুক, তার কাছে গিয়ে নালিশ করি। তোমার কী ব্যবস্থাটা তখন হয় দেখবে।'

এতটুকু ভয় পেল না রঞ্জন। বললে, 'তোমার স্বামীও আসবে না, তার কাছে তুমি নালিশও করবে না—'

'হ্যাঁ, শোনো,' অনিন্দিতা মুখে আরেক রকম গাম্ভীর্য আনল: 'সে আসুক বা না আসুক, তুমি কিন্তু তার কাছে কোনোদিন যেও না।'

'না, না, আমি নিচে নামব না। কিন্তু,' এতক্ষণে টাকা-ভরতি খামটা পকেটে পুরল রঞ্জন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শরীরে একটা নিশ্চিন্ত স্ফূর্তির ছন্দ আনল। বললে, 'তোমার স্বামীর ডাকা অন্ন তো তোমার পছন্দ নয়, তবে আমি তোমাকে কী বলে ডাকব? অনি বলে?'

'না, না, ও নামও দিদি-মাসির সঙ্গে মিশে পচে গিয়েছে। তোমার জন্যে নতুন নাম হবে। সে আমি তোমাকে বলব খাবার সময়। এখন খাবে এস।'

ততক্ষণে বাসন্তী কোণের দিকের টেবিলটা প্লেটে-বাটিতে সাজিয়ে দিয়েছে। রাশি-রাশি খাবার। এক নজর দেখেই ভড়কে গেল রঞ্জন। বললে, 'ওরে বাবা, এত! লুচি মাংস পায়েস—আবার মাছ! এত রাজ্যের খাবার কোথায় পেলে?'

'তুমি আসবে ভেবে নিজের হাতে রান্না করেছি।' অনিন্দিতার কণ্ঠ করুণার্দ্র শোনাল।

'নিজের হাতে রান্না করেছো? কী আশ্চর্য!' শ্রদ্ধাবিস্ময়ে মুহূর্তের মত তাকাল রঞ্জন: 'কিন্তু এত কি একজনে খেতে পারে?'

'খুব পারে। অফিস থেকে ফিরেছ, এখন তো তোমার খিদে পাবার কথা।'

'তাই বলে এত?'

'তুমি হাত লাগাও তো—দেখি কতদূর কী খেতে পারো। অবশ্যি রান্না খারাপ হলে কী করে খাবে?'

রঞ্জনকে বসিয়ে পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল অনিন্দিতা। তার শেষ কথাটাতে কি একটু বেদনার ছোঁয়া লাগল, একটু অভিমানের? কি জানি কি! রঞ্জন হাত লাগাল।

'যেমন গ্রাস করে যাচ্ছ মনে হচ্ছে তোমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। স্নেহে কথাটাকে লঘু করে দিল অনিন্দিতা: 'তুমি সব শেষ করতে পারবে।'

'আমি যা খাই গোগ্রাসে খাই। কিন্তু গোগ্রাসেরও একটা সীমা আছে। তুমি যা দিয়েছ তা সীমাহীন।' অর্থটাকে খাদ্যেরও বাইরে নিয়ে গেল রঞ্জন।

'জানো আমি যখন কাউকে খাওয়াই তখন তার খাওয়ার মধ্যে আমি আমার ছেলের ক্ষুধাটাকে দেখি।' বলতে বলতে অনিন্দিতার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

'তোমার ছেলে!' আশ্চর্য হবার মত কিছু নয়, তবু কেন কে জানে রঞ্জন।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস:—মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই—১

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন—এইটিই বৃহত্তম বেসরকারী ব্যাঙ্ক

মনে রাখার মত কয়েকটি তথ্য

অনুমোদিত মূলধন— টা ১০,০০,০০,০০০৲ আদায়ীকৃত মূলধন— টা ৪,৭৭,৫৪,১০৫৲

সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিল— টা ৭,০২,০৬,০০০ মোট আমানতের পরিমাণ— টা ৩৯৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে (৫১-১২-১৯৬৭)

ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে শাখা ও পে-অফিস আছে।

লণ্ডন অফিস:—ওরিয়েণ্ট হাউস, ৪২।৪৫ নিউ ব্রড ষ্ট্রীট, লণ্ডন ই. সি.-২

নিউ ইয়র্ক এজেন্টস:—মরগ্যান গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অফ্ নিউ ইয়র্ক

চেস মানহাট্টান ব্যাঙ্ক

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কার্য্যালয়:—

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

ভি. সি. প্যাটেল
চেয়ারম্যান

বি. সি সর্ব্বাধিকারী
চীফ্ এজেণ্ট

'হ্যাঁ, ষোল বছরের ছেলে। প্রচণ্ড স্বাস্থ্য ছিল—দেখতেও প্রকাণ্ড।' অনিন্দিতার চোখে স্পষ্ট জল দাঁড়াল : 'খুব খেতে পারত। ওর সাহেব বাপ ওর এই বেশি খাওয়া দেখতে পারত না। বলত অসভ্যতা। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পরই ঐটুকুন ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দিল। ওর ধারণা বিলেত গেলে ছেলে শুধু মানুষই হতে পারবে না, সভ্য হতে পারবে। সব, সব—সবটা সবরের সব। ছেলের আর কী! কিশোর বয়সের এডভেঞ্চারের স্বপ্ন দিয়ে ভরা—হাসতে হাসতে রুমাল নাড়তে-নাড়তে চলে গেল। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এক কার একসিডেন্টে—' দু হাতে মুখ ঢাকল অনিন্দিতা।

তাহলে এই মহিলার জীবনে রোদন আছে—রৌদ্রের রোদন। কিন্তু তার কী সান্ত্বনা সে দিতে পারে রঞ্জন ভেবে পেল না।

নিরুপায় হয়ে বললে, 'বেশ আমি যাচ্ছি। চোখ চাও, আমার খাওয়া দেখ।'

অনিন্দিতা মুখের থেকে হাত সরাল বটে কিন্তু মুখের গ্লানিমা এক নিমেষে মুছে ফেলতে পারল না।

রঞ্জন আবার বললে, 'তুমি যদি বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকো আমি যাই কী করে?'

'না, সব বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছি। তুমি খাও!'

অনিন্দিতা এটা-ওটা এগিয়ে দিতে লাগল আর রঞ্জন যথাসাধ্য পাঠাতে লাগল গলার নিচে। তার এ খাওয়া নিজের তুষ্টির জন্যে নয়, শুধু অনিন্দিতার তৃপ্তির জন্যে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মুখ মুছে বিদায় নেবে, বাসন্তী ছোট একটা প্লেটে পান আর মশলা নিয়ে এল।

বাসন্তীকে দেখে রঞ্জনের কেন কে জানে মেয়ের কথা মনে পড়ল। তখন এই মেয়ের কথাটাই যেন শেষ হতে পারেনি। অব্যক্ত থেকে গেছে।

আবার সেই কৌতূহল রঞ্জনকে খোঁচা মারল।

'তোমার মেয়ে কোথায়—কী যেন বলছিলে তখন—' ধরিয়ে দিল রঞ্জন।

এ বুঝি আগুন ধরিয়ে দেওয়া। অনিন্দিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'আমার মেয়ের কথা জানতে চেওনা। সে এখন পাগলা গারদে। ঐ, ঐ নিচের ঐ পিশাচই তাকে পাগল করেছে। নির্মম, নৃশংস।'

'কেন, কী হয়েছিল?' দীর্ঘ পরিচিত আত্মীয়ের মত জিজ্ঞেস করল রঞ্জন। এতটুকুও পাশ কাটাল না। যতটুকু জানা যায়, যতটুকু দেখা যায়। যতটুকু বা সাধ্যমান হওয়া যায়।

'আমার মেয়ে ছেলের চার বছরের বড়। দেখতে সে আমার মতই সুন্দর ছিল। কী আমি সুন্দর নই?'

'সে পরে বলব।' যেন কোনো দ্বিতীয় মহাপ্রাজ্ঞের মত বললে রঞ্জন, 'তোমার মেয়ের কথা বলো।'

'সে সুন্দরী, মর্যাদাবান ঘরের মানে হাইস্রাউ অফিসরের মেয়ে এক অনুপযুক্ত যুবককে ভালোবাসল—বিয়ে করতে চাইল। তার কসাই বাবা সে নির্বাচন বরদাস্ত করতে পারল না, মেয়েটাকে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখলে। এক-আধবেলা নয়, রাত-দিন, দিনের পর দিন। মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে গেল তবু তার সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হল না। যখন দরজা খোলা হল মেয়ে তখন বদ্ধ উন্মাদ।'

রঞ্জন আহত দৃষ্টি নত করল। মানুষকে জানতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে শুধু দুঃখকে জানতে পাওয়া।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল অনিন্দিতা। বললে, 'আমিও উন্মাদ। আমার মেয়ে গুম হয়ে গেছে আর আমি গানে নাচে নাটকে হট্টগোলে মুখরিত হয়েছি। আচ্ছা,' অনিন্দিতা দরজার কাছে রঞ্জনের প্রায় গা ঘেঁসে

এসে দাঁড়াল ; 'আমি যে তোমাকে ভালোবাসছি এ তো অনুপযুক্তকেই ভালবাসা। তবে আমার উন্মাদ হতে বাধা কোথায় ?'

সহজ নিশ্বাসকে ব্যস্ত হতে দিলনা রঞ্জন। বললে, 'তোমার মেয়ে তো ভালবাসবার পর উন্মাদ হয়েছে, আর তুমি তো উন্মাদ হবার পর ভালোবাসছ।'

'ও একই কথা।'

'কিন্তু এ কি ভালোবাসা ? একদিনের খেলা একদিনের আলাপেই এ জাগরণ ?

'তুমি কী যে বলো ! চিরদিন বলে কিছু নেই, সবই একদিন। একদিন তো বেশি বলছি—এক মুহূর্ত। এক মুহূর্তেই অঘটন। এক মুহূর্তেই প্রেম। এক মুহূর্তেই প্রেম।'

'আর এক মুহূর্তেই ভুল।'

যে ভুল করেনা সে তো কিছুই করে না। তাই পথ ভুলে মাঝে মাঝে এস।'

'যা, আসব বই কি। ভুল পথেই তো ফুল ফোটে। কিন্তু তোমাকে কী নামে ডাকব তা তো বললে না।'

'ও, হ্যাঁ—অনু নয়, অনি নয়,মিতা নয়, নিতা নয়, তুমি আমাকে 'নিন্দা' বলে ডেকো। জানো না চারদিকে আমার অনেক নিন্দা। তুমি আমাকে সেই নিন্দা বলে ডাকলে আমার ক্ষোভ যাবে।'

অনিন্দ্য নাম। কিন্তু ডাকবো তো তোমাকে নিরিবিলিতে।'

HOME OF INDIA'S FINEST

SILK and COTTON SAREES,

HANDICRAFTS and Novelties

for

—HOME AND GIFTS—

★ ★ ★ ★

BENGAL STORES LTD.

8A, Chowringhee Place,

CALCUTTA-13

Phone : 23-2253

'নিরিবিলি ছাড়া আমাদের আর দেখা হবে নাকি ?'

'তবে এবার যাই।' বললে, 'তুমি নিন্দা নও তুমি কীর্তি।'

নিন্দা !

কে লীলা বলে ডাকল নীলিমা শুনল সন্ন্যাসী তাকে লীলা বলে ডাকছে আর রঞ্জন শুনল সেই বুঝি ঘুরে বা স্বপ্নে অনিন্দিতাকে দেখে নিন্দা বলে ডেকে উঠেছে।

অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারবে না, আভাসে ইঙ্গিতেও নয়। আর সব বিষয়ে উন্মুক্ত হলেও এ ঢেকে রাখতে হবে। কী অবস্থা, তবু শত অবস্থিতেও একে বাইরে উদ্ঘাটন করা যাবে না। দুজনের ঐ দুই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদের মিলতে মিশতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, তাদের ভালোবাসায় এক চুল বেশা পড়ছে না, বরং ঐ অভিজ্ঞতায় তপ্ত হয়ে তাদের মিলনের, তাদের ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়েছে। অথচ এরি সংস্রবে এমন দুটো আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কেউ কার কাছে ব্যক্ত করতে পারবে না। জীবনের ভোগ্যকে যে অতিরিক্ত দুন সুস্বাদু করে তাই রাখতে হবে লুকিয়ে। তার স্বাদটুকু একে-অন্যকে জানতে দেবে না। যদি নীলিমা শোনে রঞ্জন অনিন্দিতার সঙ্গে কী আলাপ-আলোচনা করেছে তা হলে সে নিশ্চয়ই নিদারুণ মুখ ভার করবে আর রঞ্জন যদি শোনে নীলিমা সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়েছিল তা হলে সেও ছেড়ে দেবে না। তিলকে তাল করে দেখবে।

দরকার নেই খোলামেলা হয়ে। আপন কথা গোপন করো। ঘরে যেখানে আলো জ্বলছে তার কথা বলো, অন্ধকার বারান্দার কথা বলো না।

মাঝে মাঝে অন্ধকার বারান্দা ঘুরে আবার আলোকিত ঘরে এসে পরস্পরকে দেখ। দেখ আরো বেশি আলোকিত দেখায় কি না।

'তোমার যা একখানা শ্রী খুলেছে আয়না থাকলে দেখাতাম।' বললে রঞ্জন।

'আর তোমার ?'

'এই চোঙা প্যান্টে কী যে কদাকার হয়েছে তা আর মনে করিয়ে দিও না। আগের দিন হলে ব্যাগি প্যান্ট বেশ হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নেওয়া যেত, বাতায় জল জমলেও প্যান্টটা বাঁচত। এখন শার্ট ভেজে প্যান্টও ভেজে। জল যদি ফল হয় তবে এখন গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়োনো।'

তবে ঐ প্যান্ট পর কেন ?

'ওটা ঘুমের হাওয়া। তোমরা যেমন হাওয়া-খাওয়া ব্লাউজ পরো এও তেমনি। পরেও স্বস্তি নেই, বারে বারে আঁচল টেনে বারান্দা ঘুলঘুলিগুলো ঢাকবার চেষ্টা। ঢাকবেই বা কী ছাই, আঁচলেও তো টানাটানি। তা ছাড়া কোথাও কোথাও বারান্দাও নেই, উঠোন হয়ে গিয়েছে, ঘুলঘুলি নেই, যেন সেট আলিবাবার চিচিং ফাঁক—' কথাটা বলতে পেরে হাসতে লাগল রঞ্জন।

'আর তোমাদের কথা বোলো না। দাঁড়াতে পারো না, বসতে পারো না। দাঁড়াতে গেলে আড়ষ্ট, বসতে গেলে প্রাবাস্য।' পালটা নীলিমাও কম হাসল না।

'আমাদের আরো অনেক অসুবিধে আছে যা কোনো ভদ্রমহিলাকে বলা যায় না।' এক মুহূর্ত থামল রঞ্জন—ভদ্রমহিলা বলতে সে বুঝি অনিন্দিতার কথাই ভেবে ফেলেছিল—পরে বললে, 'আসলে এ প্যান্ট তো পালাবার জন্যে—ছোটবার পক্ষে এত সুবিধে যে বলে শেষ করা যায় না।

'চলো একটা চায়ের দোকানে ঢুকি।'

'নিশ্চয়ই। যার তো সেই পুরোনো মার্কেট, পুরোনো চায়ের দোকান, কিন্তু দেখ বর্ষা সমস্ত কী নতুন করে দিয়েছে!'

'শুধু বর্ষা?' ভিজে মাথার থেকে মুখে টুপ টুপ বৃষ্টির জল পড়ছে, চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

'না, না, শুধু বর্ষা নয়, তুমি। তুমি সঙ্গে আছ বলেই সমস্ত নতুন, সমস্ত অপরূপ।'

'শুধু আমি আছি বলে? চোখের পাতায়ও জল, আবার অগাধ করে তাকাল নীলিমা।

'না, না, শুধু তুমিও নয়, তোমার আমার ভালোবাসা আছে বলে।'

'তাই বলো। ভালোবাসাই সমস্ত।'

'হ্যাঁ, ভালোবাসাই সমস্ত। ভালোবাসাই আনে, ভালোবাসাই দেয়, ভালোবাসাই ভরে রাখে।'

'আর ভালোবাসা কখনো চলে যায় না।'

একটা চায়ের দোকানে ছোট কুঠরিতে বসেছে দুজনে। কোথায় বসেছে, কী খাচ্ছে, কতক্ষণ থাকতে পারবে, তারপর কোথায় যাবে, কতক্ষণে যাবে, যেতেই বা পারবে কিনা সে সব কিছুই হিসেব করছে না। তারা আছে আর তাদের মধ্যে ভালোবাসা প্রাণময় হয়ে আছে এই তাদের সমস্ত উত্তর, সমস্ত সমাধান।

শুধু এরই মধ্যে টুকরো স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের পটে ফুটে ওঠে। রিকশাতে যখন যখন তার বক্ষের নিবিড় সঙ্গ চাইছিল তখন নীলিমার মনে পড়ছিল সন্ধ্যাসাঁঝের সেই শিশুর মত আশ্রয় খোঁজার ব্যাকুলতা আর

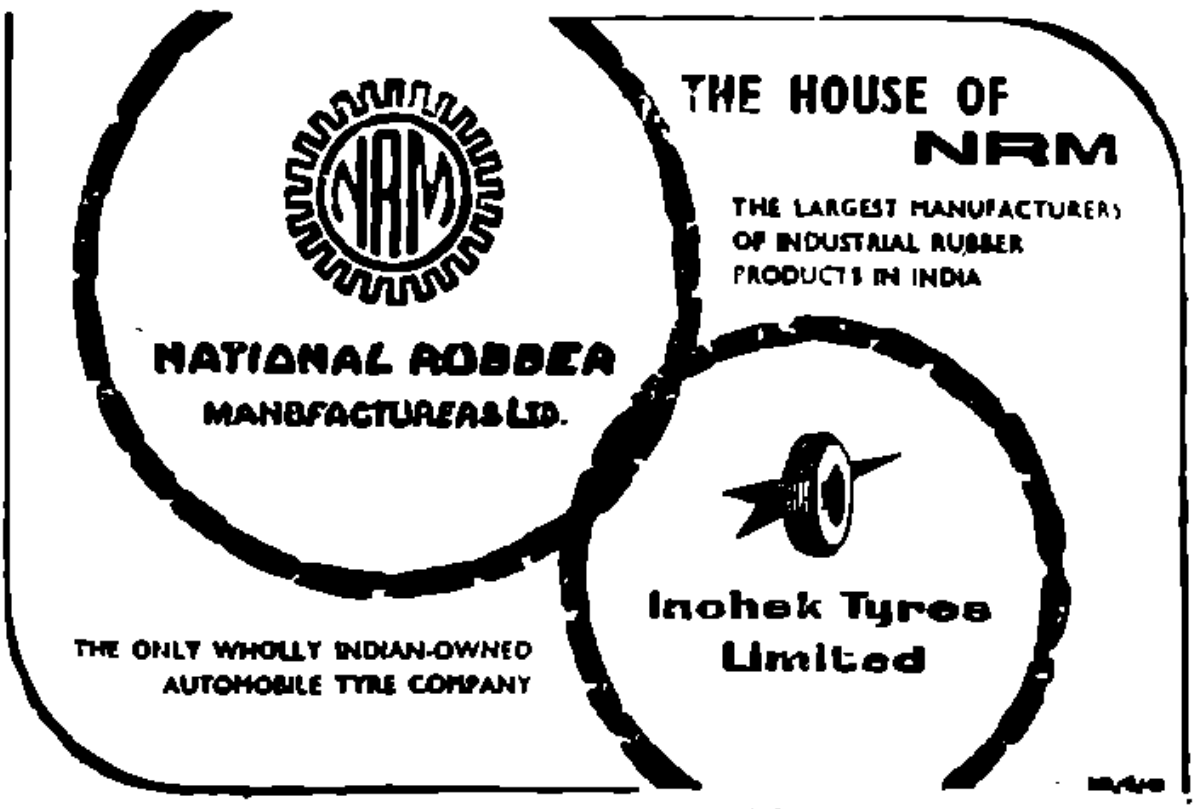

নীলিমা যখন সর্বশেষে রঞ্জনকে স্নেহের একটি চুম্বন প্রত্যর্পণ করতে যাচ্ছিল তখন রঞ্জনের মনে পড়ল কী করে শেষ মুহূর্তে মুখটা ঝট করে সরিয়ে নিয়ে অনিন্দিতার প্রথম চুম্বন ঠোঁটে না নিয়ে গালের উপর নিয়েছিল।

মনে হল তুমিই যেন আমার মুখটা ঠেলে দিলে আর ভদ্রমহিলার উপহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল—খুব রসিয়ে গল্প বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল রঞ্জনের, কিন্তু সাহস হল না। কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার নামে চালাতেও ভয় হল। কী জানি যদি সন্দেহ করে। সন্দেহই তো প্রেমের ক্যাপার! তারচেয়ে দু পেয়ালা চা খাও, আজে বাজে গল্প করো, স্বর্গ এখানেই নেমে আসবে।

শুধু আজেবাজে কেন? মাঝে মাঝে উচ্চ কথাও কত বলে তারা। কিন্তু যারা সম্ভ্রান্ত তারা কি খেলো কথা বলতে পারে? খেলো কথায় কত রস তার সন্ধান রাখে? সত্যসাচী বলতে পারবে হাওয়া-খাওয়া ব্রাউজ আর উঠন্ত-কাটন্ত প্যান্টের কাহিনী?

'জানো আমার বোধহয় জ্বর হবে।' রঞ্জন বললে।

'যদি হয় আমাকে ডেকো, আমি গিয়ে সেবা করব।' নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বললে নীলিমা।

'তুমি কত সেবা করবে!'

'তুমি কত ডাকবে!'

'ডাকবো কেন নিজের থেকে আসবে।'

'খবর পাব কী করে? খবর পেলেই বা কী। তোমার ঘরের দরজা খোলা রাখবে তো? এ তো এক বাড়িতে আলাদা ঘরে থাকা নয় যে অসুখ হলেও আসব না।' তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে দিল নীলিমা; তোমার ঘরে আমার জায়গা দাও, দেখি সেবা করি কিনা।'

উপরের ঐ ভদ্রমহিলা স্ত্রী ছাড়া আর কী হতে পারে? স্ত্রী হয়ে স্বামীর শান্তিভঙ্গ স্বাস্থ্যভঙ্গ করতে পারে? আর স্বামী যখন নিরাকরণ অসুস্থ, তখন এক বাড়িতে থেকেও স্ত্রী তাকে একটু সাহায্য করতেও অগ্রসর হয় না? যারা সর্বাঙ্গীণ বন্ধু তারা আবার এমনি সর্বাঙ্গীণ শত্রু হতে পারে?

'আচ্ছা তোমার কী মনে হয়', রঞ্জন গম্ভীর হবার চেষ্টা করল: 'আমরা যখন বিয়ে করব, সংসার করব, তখন আমরা আবার ঝগড়া করব?'

'যা, ঝগড়া করব বৈ কি। ঝগড়া না হলে ভাব আবার জমবে কী করে? ঝগড়ার পরে মান করব আর সে মান ভাঙাতে তুমি কত কিছু আমাকে দেবে—খোবে—'

'সে ঝগড়া নয়। সকলের সামনে আমি তোমাকে অপমান করলাম, তুমি আমাকে অপমান করলে। তুমি আমাকে গেট আউট বলে তাড়িয়ে দিলে আমি তোমাকে গেট আউট বলে তাড়িয়ে দিলাম—উঃ, এও সম্ভব?'

তেমন কিছু দেখেছ নাকি?

রঞ্জন নিজেকে সামলে নিল। বললে, 'দেখিনি, তবে শুনেছি তো, কাগজে পড়েছি—'

'আমাদের তেমন কিছু হতে পারবে না।'

'পারবে না?' যেন চমকে উঠল রঞ্জন: 'কেন পারবেনা?'

'আমি যে নীলিমা, তুমি যে রঞ্জন।' খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা।

কিন্তু যাই বলো ভদ্রলোক কী আনরিজনেবল! এ ভাবছে রঞ্জন। যাই বলো ভদ্রমহিলা কী হাউহাটেড! এ ভাবছে নীলিমা।

'কিন্তু আমাদের ভয় নেই ঠিক বলেছ —আমি রতন তুমি নীলিমা।

আরো অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত ফুরন করে একটা ট্যাক্সি পেল।

আর কিছুই ভাববার নেই। একসঙ্গে আছি একসঙ্গে চলেছি এই অনন্তের মধ্যে থাকা অনন্তের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া।

তারপর চলতে চলতে রতন জিজ্ঞেস করলে, 'আমি কি তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছি?

'মোটেই নয়।' বলল নীলিমা, তুমি আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছ।'

তারপর এক সন্ধ্যায় নীলিমা গেল সন্ন্যাসীর ঘরে।

'আরে এস এস।' সন্ন্যাসী উথলে উঠল: 'তোমায় কী বলে ডাকব? তোমার নাম কী?'

নীলিমা এতটুকু গোপন করল না। বললে, 'নীলিমা।'

'নীলিমা?' বাঃ, সুন্দর নাম। দাঁড়াও।' খানিকক্ষণ কী চিন্তা করল সন্ন্যাসী। বললে 'আমার তো সবকিছুই বিপরীত। তুমিও আমার বিপরীত হয়ে ওঠ।'

'তার মানে?'

'তুমি নীলিমা তো, তুমি মালিনী হয়ে যাও।

'সুন্দর হল তো! তাই ডাকবেন। মালিনী বেশ শোনাবে।'

'শুধু ডাকব না তুমি আমার মালিনী হয়ে যাবে।'

● আপনার লাইব্রেরীর জন্যে আজই সংগ্রহ করুন
● বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সংযোজন
● প্রাণরসপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে
ঘিরে কয়েকজনের সমাবেশ।
অনিলকুমার ভট্টাচার্যের
একজন আর কয়েকজন
। দাম : চার টাকা।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে ভূমিকায় স্বর্গীয় ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—ব্যক্তি উপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহার্যে যাঁরা না এসেছেন, তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। রঙ্গরসে, আলাপে, রসিকতায়, সহজস্বতায়, কৌতুক-পরিহাসে এমন একজন মানুষ আজ মিলবে না। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাই একটি যুগের অবসান। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রেখায় অনিলবাবু সেই অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। অনিলবাবু নিজে কবি ও কথক। কবি-মন নিয়ে তিনি মানুষ উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ গল্প শুনিয়েছেন।

জি এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

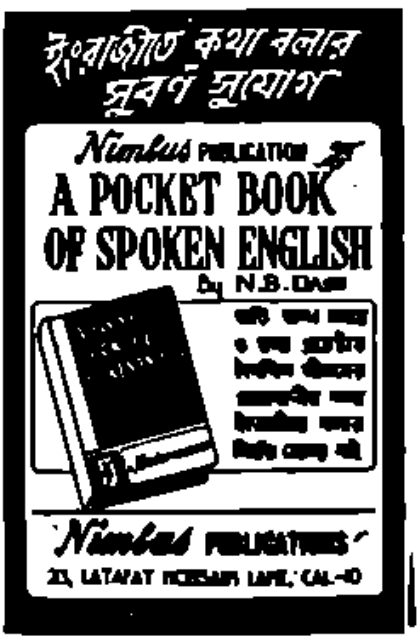

Anglo-Bengali Rs. 3·25
Anglo-Hindi Rs. 5·25

লজ্জায় আরক্ত হত না নীলিমা, নিজের প্রশ্নেই অজানতে হয়ে গেল। অসাবধানে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনার আপনার উপরতলার খবর কী?'

'বলছি। তার আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও। লোকজন যায়, উঁকি মারে।'

সব্যসাচী ভেবেছিল নীলিমা তার কথা শুনবে, কিন্তু দরজা বন্ধ না করে পরদাটা শুধু টেনে দিল।

সব্যসাচীর মনে হল লোকে না দেখুক এটা নীলিমা যেমন চায় তেমনি পালিয়ে যাবার পথ থাকুক এটাও কামনা করে।

অনেক গভীর গহনের পথ। পর্বত লঙ্ঘন ধীরে ধীরে।

পরদা টেনে দিয়ে সোফায় বসল নীলিমা। বললে 'উপরে খুব চুপচাপ দেখছি।'

'ভেঙে গিয়েছে।'

'সত্যি?' সব্যসাচীর মুক্তির হাওয়া যেন নীলিমা গায়ে লাগাল।

'হ্যাঁ, বিদায় হয়েছে।'

'উপরটা তাহলে খালি?'

'হ্যাঁ, খালি। তুমি এসে থাকবে?' সব্যসাচী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: 'চলে এস না, কালই চলে এস। ভাড়া লাগবে না।'

'বা, ভাড়া লাগবে না কেন? তাছাড়া আমি তো একলা নই, আমার মা বাবা ভাই বোন সবাই থাকবে যে।'

সব্যসাচী নিস্তেজ হয়ে গেল। ভাবল অবলা মাধুরী কি এত সহজেই ধরা পড়ে?

দেখি আরো ভালো করে দেখি। আকর্ষণ করি।

আর সেই মুহূর্তে রঞ্জন এসেছে অনিন্দিতার খোঁজে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখল দরজায় তালা বন্ধ।

সোভলায় হঠাৎ একজনকে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার?'

'ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'জানিনা।'

'কে জানে?'

'তাও জানিনা।'

রঞ্জন জানে কে জানে। নিচের ঘরের বাসিন্দে সেই স্বামী জানে। কিন্তু অনিন্দিতার বারণ সে যেন তার স্বামীর কাছে না যায়। অনিন্দিতার সে কথার সে মান রাখবে। হাওয়ায় পরদাটা দুললেও সে ভিতরে ঢুকবে না। দেখবেনা উঁকি মেরে।

খুঁজতে খুঁজতে অবলা মাধুরীকে সে নিজেই একদিন ধরে ফেলবে। সে নিশ্চয়ই কাছেই আছে দূরে যায়নি। বন্ধ তালা খোলার চাবি তো তারই হাতে।

রঞ্জন যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল।

নীলিমা তা দেখতে পেল না। সেও ফিরে যাবে।

স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপনার ভবিষ্যত নিরাপদ হোক

পোস্ট অফিসে পাঁচ বছরের
স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) পরিকল্পে
অর্থ লগ্নী করুন

- প্রতি ১০০ টাকা পাঁচ বছর পরে বেড়ে হবে ১২৫ টাকা
- আয়কর মুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদ
- অন্তত পঞ্চাশ টাকা হলেই পাসবই খোলা যায় একই পাস বইতে যতবার খুশী ৫০ টাকা করে জমা করা যেতে পারে।

ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াতেও এই পরিকল্পে আমনত গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছে

বিশদ বিবরণের জন্য
আজই যে কোন পোস্ট অফিস খোঁজ করুন

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ)/স. স. ১,৬৭০৫/৬৮

লোমহর্ষক

শৈবাল মুখোপাধ্যায়

জানেন ত ট্রেনে চড়ে বেড়ানো আমার সহ্য হয় না। এ আমি মোটে ভালোবাসিনা। শুধু যে ভীড় ঠেলা-ঠেলি করতে হয়, রিজার্ভেশন কাউন্টারে দশ-কুড়ি দিন আগে থেকে লাইন বেঁধে বসে থাকা দিতে হয় তা নয়, আমার পায়ের সেই ব্যথাটা। ডাক্তাররা মুখের মত বলে ওটা কিছু নয় বাত—আসলে যে কি তা আমি জানি। এটা একটা মনোগত স্বীকৃতি, গাঁটের কাছে ব্যথা, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় একটু বেশী আউড়ে উঠে।

এ ছাড়া আর এক প্রকার অসুবিধা কি জানেন, ট্রেনে চড়লে মানুষের বক-বক করার স্পৃহাটা বৃদ্ধি পায় একটু আশ্রয় পেলেই হল। জানেন ত স্বয়ং রবি ঠাকুরকেই কে নাকি বলেছিল—মশাই কি করা হয়? আমি মশাই, সামাজিক মানুষ, জন সমাজে বেশ খাতির করে আমাকে, পাড়ার পূজো, জলসা প্রভৃতি ফাংসনে আমি হাত খুলে চাঁদা দিই। কিন্তু কি জানেন অজাত-কুলশীলদের সঙ্গে চট করে কথা বলতে আমার প্রবল বিতৃষ্ণা। তবে হ্যাঁ, আমার নিজের যদি কথা বলার প্রবৃত্তি হয়, সে আলাদা কথা।

এই সেদিন মেদিনীপুর লোক্যালে ফিরছিলাম খড়গপুর থেকে। আমার ভাগ্য ভালো গাড়ীটায় তেমন ভীড় ছিলনা। কলকাতায় পৌঁছায় প্রায় ঘন্টা তিনেক, কার দায় পড়েছে। আমাদের কামরাটা আগেকার সেকেণ্ড ক্লাসকে থার্ডক্লাসে প্রমোশন দেওয়া, ইংরেজ আমলের গাড়ি, বেশ হাত পা ছড়ানো কামরা—চারটি সিট, আর চারিটি সিটেই বার জন প্রাণী. পাঁশকুড়োয় দুজন নেমে গেল, বইলাম আমি আর একটি পাতলা ছেলেমানুষ ছোকরা। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। চোখে কালো পুরু লেন্সের চশমা, মুখে একটা খুশী খুশী ভাব। জীবনটা যেন ওর কাছে একটা পরিহাস মাত্র। বড়লোকের ছেলে, গায়ে টেরিলিনের সার্ট, পরণে বেশ দামী কুচকুচে প্যান্ট,—পাশে একটি একজিকিউটিভ এ্যাটাসে কেস, মানে, দামিদামি জিনিষপত্রে ভর্তি নবযুবক। পর এই চটুলতাটুকু কিন্তু আমার ভালো লাগছিল না গোড়া থেকেই।

কি একটা মাসিক পত্র পড়ছিল, ওই আজকালকার যে সব পাঁজীর মত মোটা মোটা মাসিক বেরোয়া পড়েন, অনেকটা সেই ধরণের। পাশকুড়ো পেরোতেই বইখানি সিটের ওপর ফেলে জানলা দিয়ে বর্ষা বিধৌত গ্রাম বাংলার বিসর্গ শোভা নিরীক্ষণে মন দিলেন বাইরে বেশ চাঁদের আলো, পরিষ্কার কালের আকাশ, মাটিতে জল পরিষ্কার। স্বীকার করতেই হবে যে এই দৃশ্য নয়নভুলানো দৃশ্য।

যাই হোক আমি সেদিনের খবরের কাগজখানা নাকের উপর চোখ রেখে চেকোস্লাভকিয়া ভুবেছে ভুবেছেন কি ভোবেন কি তাই ভাবতে থাকি। এ সব লক্ষণ আমার অতিশয় পরিচিত। রাস্তের ম্যাগাজিন পাঠ শেষ এখন একটু কথা জমাবার তালে আছে, সুযোগ পেলেই হয়। একটু যদি সতর্ক না হই তাহলে দুজনের চোখে চোখ অকস্মাৎ পড়লেই ছোকরা আলাপাচারের সূত্রপাত করার সুযোগ পাবে।

কিছু পরে, আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম, কি আশা, দেখি যে জানলার কাঁচে আমার প্রতিবিম্বটা ও লক্ষ্য করছে। যদিও খবরের কাগজের পাতার মুখটা লুকিয়ে রেখেছি, ও আমার চোখ দেখতে পেয়েছে। সত্যি সত্যি, ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসল মনে হল, আমার এই স্বচ্ছ কাঁচের প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিচিত হবে ছোকরা যেন পুলকিত। অতএব, কি আর করা, আমি সশব্দে আমার মুখের ওপরকার খবরের কাগজখানি নামিয়ে রেখে আমার বন্ধুরা উঠে যাবে বলেন আমার ক্ষমা-সুন্দর-দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

ছোকরার ভাবভঙ্গীতে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। এমন কি আমি যে ওকে ওর একটা উচিত উত্তর দিলাম তাও বোধ করি বুঝল না। সুতরাং, আমার খবরের কাগজটা উঠিয়ে নিলাম, আমার একটু নীচু করে ধরলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, দেখি ও হাসছে। এ একেবারে অসহ্য। আমি অতি কষ্টে আমার বাঁ পায়ের ব্যথাটা ভেদ উঠে দাঁড়ালাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল বুঝিয়ে দিই যে ঘরে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সভ্য মানুষের ধর্ম, সে জ্ঞান তার নেই। বিশেষতঃ আমি যে প্রায় খঞ্জ।

এর একটা ফল পাওয়া গেল, মানে ছোকরা নিজে থেকেই বলল—আমি হাসলাম বলে কিছু মনে করবেন না, আর এক চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে। সে কথা মনে করে হেসে ফেলেছি।

আমি শীতল গলায় বললাম-তাই নাকি।

প্রাণের আবেগে সে যেন আর চেপে রাখতে পারছেন না, একটা ভাবনার কিছু ব্যাপার কথা তার মনে পড়েছে যেন। তারপর একেবারে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে উঠল আনন্দে স্ফার, আমার রাণীবাসিমার কথাটা ভাবছি আর হাসি পাচ্ছে—

আমি আবার পড়া সুরু করতে যাচ্ছি এমন সময় এই ঘোষণা। থাক তবু পাচ্ছে, যা মোটেই বলেনি। তার কথাটা অনেকক্ষণে ভালো। আমি বললাম—যাবাজী! আমি কারো আন্টার স্বজন সম্পর্কে কৌতূহলী নই।

এই বলে আবার খবরের কাগজটা উঠিয়ে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম আচ্ছা জবাব দিয়েছি, একেবারে মর্মের মত।

ওদিকথার সাড়া থেকে জবাব এল-না, আমারও তেমন উৎসাহ নেই। অন্ততঃ এখন আর নেই—সম্রাট আমার হাতেই তাঁকে মরতে হয়েছে।

আমি খবরের কাগজটা আবার ফেলে দিলাম একটু ঠিক হয়ে শুছিয়ে বসলাম তারপর একটু আন্তর করে বললাম—

—দেখুন, রেল জার্নির একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে যদি আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত সহযাত্রীকে মিথ্যা এবং আজগুবি ঘটনার উল্লেখ করে চমকে দিতে চান তাহলে—

সেই দুর্বিনীত ছোকরা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল—কি করে জানলেন এ কথা মিথ্যে।

—কারণ তাহলে এখন আপনি এভাবে আমার সামনে বসে থাকতেন না।

—তাই নাকি? এই কথাটির মধ্যে একটা মুকবিয়ানার সুর ছিল। সে আমাকে এইবার প্রশ্ন করল—আপনার কি ধারণা যে সব খুব বয়সের ব্যাপারে খুনীরা ধরা পড়ে।

আমি ভাবলাম ফেউলটিতে যদি ট্রেন থামে কিংবা মেচেদায় তাহলে না হয় অন্য কমপার্টমেন্টে চলে যাব কিন্তু সেই পায়ের ব্যথাটা ওর জন্য যে কিছুই করার সাহস হয়না, সব ব্যাপারেই বাধা, জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই আর ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগে।' তাছাড়া আরো ভাবলুম যে ও হতভাগা ঠিক মনে করবে

আমি ওর কথাগুলি একেবারে নির্ভেজাল বলে বিশ্বাস করেছি আর তাতে ভয়ে কাহিল পালটাচ্ছি। একা ওর সঙ্গে থাকতে ভয় হচ্ছে।

ব্যাপারটি ধামা চেওয়ার মানসে আমি বলবার কথা বাড়াতে আমি চাইনা এ আলোচনায় আমার এতটুকু আগ্রহ নেই।

এই কথা বলে আর একবার সংবাদ পত্রের বর্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করি।

লোকটার দুঃসাহস কম নয়। বলে উঠল—ও তাই নাকি! তাহলে মাপ করবেন। আমি ভেবেছিলাম একজন অবলা খুনীকে চোখের সামনে দেখে আপনার কৌতূহল হবে এবং কিভাবে কি করেছি তা তা শোনার আগ্রহ হবে।

ছাপা এবং সংবাদপত্রীর ভয়ে আমার চোখ বিস্ফারিত হলেও এতক্ষণে আমার মনে কিছু কিছু পরিমাণে কৌতূহল সঞ্চারিত হয়েছিল।

লোকটি বোধহয় তা বুঝেছিল এবং বুঝেছিল বলেই বলতে থাকে—ব্যাপারটি রীতিমত বুদ্ধির খেলা কারণ কেউ জানেনা যে একটা খুন হয়েছে। আমি অবশ্য অর্থের প্রয়োজনেই কাজটা করলাম। অর্থের জন্য কি না করা যায় বলুন! আপনি সত্যি কি শুনতে চান না—?

এতক্ষণে আমার কৌতূহল বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খবরের কাগজটা উলটে-পালটে বিজ্ঞাপন, শোক-সংবাদ, সভাসমিতি, বেতারতথ্য, বাজার দর সবই পড়া শেষ। আর সহযাত্রীর গালগল্প যখন মানুষকে শুনতেই হয়, তখন এই কাহিনী নিঃসন্দেহে একটা লোমহর্ষক কাহিনী। স্বাভাবিক সংকোচ নয়।

আমি আমার খবরের কাগজটা শেষপর্যন্ত ফেলে দিলাম। পর দশ মিনিট ধরে ওটা না পড়ে কেবল নাকের ওপর উঠিয়েছি আর নামিয়েছি। তারপর একটা কথা মনে জাগল, আমি প্রশ্ন করি—আপনি কি আমার কাছে কনফেস করতে চান।

—যদি তাই মনে করেন, তাহলে তাই। তাতে কিছু আসে যায় না। আমাকে এখন কেউ স্পর্শ করতেও পারে না। তাহলে মানুষ এইবার, ঘটনাটা ঘটল মাস আষ্টেক আগে, রাণী মাসীর কাছে রেবা-ঘটিত ব্যাপারটি ধরা পড়ে গেল। রেবা মেয়েটার সঙ্গে আমার এই একটু মাখামাখি ছিল। মেয়েটা অবশ্য তেমন সহজ নয়, ভালো মেয়ের দলে নয়, ওর একটু বদনাম-ই ছিল আর আর আমার এই মাখামাখি টুকুও তেমন সরল বলা যায় না। আমি কিঞ্চিৎ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতায় জড়িয়ে পড়লাম এই ব্যাপারে। হাতে টাকা নেই, আমি একটু আধটু লিখে থাই, টাকা কড়িও সব সময় সহজে আমার ধরা দেয় না। তাই রাণীমাসীর কাছে হাত পাতলাম।

রাণী-মাসীদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভালো, আমার প্রতি একটা টান আছে আর তাছাড়া আমি ছাড়া মাসীর আর আছেই বা কে। ওঁর টাকাকড়ি সব পাওয়ার একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী আমি। কিন্তু দেখুন, সেই সব টাকা আমার হাতে এসে পড়তে অনেক টাইম লাগবে। মাসীর শরীর তেমন ভালো নয়, একটু হাঁপানির টান আছে, কিন্তু মাসীর বয়স অবশ্য কম, সুতরাং টাকা হাতে আসতে অনেক দেরী। মাসি দিনরাত ঘরেই থাকেন, ঠাণ্ডা লাগার ভয়, কিন্তু এদিকে বেশ শক্ত সমর্থ।

তাই গেল বছর সেই ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্য আন্দোলনের সময়টা আমি কলকাতা ছেড়ে রাণী মাসিদের চন্দননগরের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। এই বাড়িতে মাসি একাই থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। টেলিফোন প্রায় গায়েই বলা যায়। বাড়িতে থাকে শুধু মোতির মা, মাসির অনেক কালের আদরের দাসী।

চপুর ছুটো নাগাদ গিয়ে হাজির হলাম। যোতির মা দরজা খুলে জানালো বাসি নিজের ঘরেই শুয়ে আছেন, আমি সোজা ওপরে চলে যেতে পারি কারণ বাসি দুপুরে ঘুমান না, জেগে রেডিও শুনছেন। বাসি খুব দরকার না হলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামেন না, আমার জানা ছিল।

আমি ওপরে উঠে দেখি, বাসি একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন, পাশের ইলেকট্রিক হীটারে কেটলিতে জল চাপানো। বাসি সেদিনের খবরের কাগজটা মুখের উপর চাপা দিয়ে হয় রেডিও শুনছেন, নয়, রাম নাম জপ করছেন। হীটারটা জ্বলছেনা, কারণ পাওয়ার ফেলিওর এ অঞ্চলের নিত্যকার দুর্ঘটনা।

কিন্তু ঘর ঢুকে বাসিকে প্রণাম করতেই আমি বুঝলাম টাকা আর মিলবেনা। বাসির মেজাজ সপ্তমে। একেই অতি খিটখিটে বদ মেজাজ স্ত্রীলোক, আর এখন ত কেপে রয়েছে। কারণ, কয়েকদিন আগে এক হিতৈষী দূর সম্পর্কের পাঠতুতো দাদা জানিয়ে গেছেন বেবার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা, তার আমরা হলাম কুলীন বামুন, বেবারা পুরুষ আসত সিডিউল কাষ্ট বলে উদ্ধৃত। কিন্তু বেবা একটু দুষ্টু, মেয়ে চলেও, বাস গেলে শুধু রেডিও থেকে প্রায় তিনশো টাকা, তার ওপর গ্রামোফোন, ঘরনা এসব আছে।

আগেই বলেছি আমাদের ঘনিষ্ঠতা একটা খুব পরিচ্ছন্ন ব্যাপার নয়, আর সেই কথাটা বাসির মত কেরল কুসংস্কারবদ্ধ প্রবীণা রমণীর কানে তুলে দেওয়াটা আমার নিজের দাদার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কাজ হয়েছে, এ একেবারে চরম শত্রুতা। পিসি শুনেছেন মেয়েটার বদনাম আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী রাগ সিবিলকাষ্ট বলে। পিসি সিডিউল কাষ্ট বলতে পারেন না, বলেন শিবিল কাট।

পিসি আমাকে অনেকগুলি কড়া কথা শোনালেন, সাদা হরদরে হাতের নীল শিরা ফুলিয়ে চেয়ারের হাতলে আঘাত করলেন বার বার, ঐ ভাবেই রাগের প্রকাশ।

আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। আমি জবাব দিলাম। বাসি বললেন এই নির্লজ্জ বেহায়া চ্যাংড়া ছোকরার আর তিনি মুখ দর্শন করতে চান না, প্রভাস উকীলকে খবর পাঠিয়েছেন, রবিবার এলে বাসি উইলটা পালটে ফেলবেন এ একেবারে ঠিক। তারপর বাসির একটা পাই পয়সা আমাকে বর্তাবে না—

তাহলে?

যুবকটি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে তাহলে?

এই অবস্থায় আপনি কি করলেন?

স্বীকার করতে বাধা নেই আমি বেশ মন দিয়েই সব শুনছিলাম। এখন মাতৃত্ব হয়ে বেশ তীক্ষ্ণ গলায় বললাম কি পায় করতাম, অবস্থাটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। বেহদ কর্ণ তেমন কঠিন, কিছু বলার নেই—

যুবকটি বাধা দিয়ে বলে তা মোটেই সম্ভব নয়। আমার মাথায় বুদ্ধি যোগে গেল। আমি বাসির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে একটা বালিশ বিছানা থেকে তুলে নিলাম। তারপর বাসি শেষ নিঃশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত বালিশটা তেমনই চেপে ধরে রইলাম বাসির মুখের ওপর

আমি জোড়লার মত বলি তা হলে তা, আপনি সত্যি তা করেন নি তো।

করলাম। করতেহল। বাসি আর উইলটা বদলাতে পারল না।

একথার পর আমি আর কিছু বলতে পারিনা। আমার একবার মনে হল বিপদ জ্ঞাপক চেন টা টানি, কিন্তু এ সব গাড়িতে এলার্ম চেন নেই। আর থাকলেই বা কি হত? আমাকে ত' উঠে দাঁড়াতে হত, পায়ের সেই ব্যাথাটা—তা ছাড়া ছোকরা আবার বেশ শান্ত গলায় কথা বলছে।

এই খানেই আসল! বুদ্ধির খেলা মন দিয়ে শুনুন, আমি বাসির অবস্থা পোঁছা থেকে তেল চেলে বিয়ে

মাসির গায়ের আলোয়ানে লাগিয়ে দিলাম। আর দু একটা খবরের কাগজ হীটারের পাশে রাখলাম, একেবারে হীটারে লেগে ছুঁয়ে—পাওয়ার ফেল করেছে, মিনিট বা চারটের মধ্যে লাইন ঠিক হবে, হীটার আপনি জ্বলে উঠ্‌বে, প্লাগ লাগানো আছে, তারপর খবরের কাগজ থেকে আলোয়ানে লেগে যাবে আগুন-আর সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা বাণী মাসির আকস্মিক মৃত্যু—একেবারে নৈব দুর্ঘটনা বলা যায়। মাসি প্লাগ লাগিয়ে বসে ছিলেন, কখন যে আবার বিজলী বাতি জ্বলেছে বুঝতে পারে নি—হাঁচান, আমার কথায় বাধা দেবেন না; এরপর কি শুনুন।

আমি সিঁড়ির উপর থেকে মোতির মাকে ডাকলাম। মোতির মা নীচে আসতেই আমি উপর থেকে বললাম, না ঠিক আছে মাসি চশমার খাপটা পাঠিয়েছেন না—

তারপর আমি জোর গলায় মাসির সঙ্গে কথা বলতে থাকি, খাওয়া-আলোচনার উপস্থিতি বোঝাই, দু একবার চেয়ারের হাতলে আওয়াজ করলাম, অর্থাৎ মাসি আমার কথায় চটে যাচ্ছেন। তারপর নীচে এসে মোতির মার সঙ্গে দু চারটে মামুলী কথা বললাম। ইলেকট্রিক কানেক্টেড ফেল করেছে। কেট্‌লিটার জলগরম হলে বলে মাসিই ওকে ডাকবেন, ততক্ষণ মোতির মা একটু জিরিয়ে নিতে পারে।

আমি এতক্ষণ যেন দম বন্ধ করেছিলাম, বললাম—আপনি তাহলে কি একেবারে সজ্ঞানে এমনভাবে একটা বুড়োমানুষকে ঠগীদের মত মারলেন, কি মশাই?

লোকটি বলল সবই একেবারে প্রয়োজনমাফিক আমি মোতির মার সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন ঠিক সাড়ে তিনটে। মাসির কোলের ওপর ট্রানসিস্টরটা ঘুমিয়ে পড়ল। এরপর চারটে নাগাদ ইলেকট্রিক কারেন্ট আবার চালু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আগুন এবং মাসির ঘর প্রায় আধঘন্টায় পুড়ে ছাই। আমি তখন শ্রীরামপুরে চাতরা নাট্যমন্দিরে বসে নতুন ড্রামাটার কি দারুণ সম্ভাবনা তা কুড়িজন লোককে বোঝাচ্ছি এবং চা পান করছি।

যখন শুরু হল মোতির মা এবং আমি দুজনেই বললাম, আমি শেষ পর্যন্ত বেশ সুস্থ এবং সহজ ছিল মাসির উইল পরিবর্তনের ব্যাপারটা কেউ শোনেনি। কাজেই কোনরকম সন্দেহের ছায়া কারো মনে আসেনা। একেবারে এ্যাকসিডেন্ট, হয় লট সংকিচ, নয় হীটারটা থেকে কাগজ পড়ে আগুন লেগে যাবে এইমে, বাগবাজার এসে গেল, যাই এবার আমাকে নামতে হবে—

আমি সজ্ঞানে চেয়ে রইলাম, চোখ মেলে দেখলাম ওপরের বার্থ থেকে একটা ছোট্ট সুটকেশ নামানো তাতে লেখা আছে এম, এম,—আমি এখন কি করি।

লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু তবু একজন ভদ্র এবং সৎ নাগরিক হিসাবে পুলিশকে খবরটা দেওয়া উচিত। বাগবাজারে না কলকাতায়, কোথায় গিয়ে বলতে হবে কে জানে।

ট্রেনটা থেমে আসছে—

লোকটি বলল আচ্ছা, তার নমস্কার। আপনাকে জোর করে ধরে রেখে শোনালাম আমার কাহিনীটা কি করব বলুন, ট্রেন জার্নি তারি বোরিং লাগে। তাই না। আচ্ছা—

লোকটা নামিয়ে একরকম চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নামল—সহসা আমার মনটা কেমন ঘৃণায় ভরে গেল। এই বয়স এর মধ্যে এত পাপ। আমি জোর গলায় চেঁচিয়ে বলি সত্যি আপনি টাকার জন্য পাপ করলেন?

কি করি বলুন। টাকার যে দরকার ভীষণ।

—তবে, পরিমাণটা তেমন বেশী নয়, মাত্র তিনটাকা

—বলেন কি!

কিন্তু লোকটা ততক্ষণে ভীড়ের মধ্যে ভীড়ে গেছে।

আমি ধাতস্থ হওয়ার আগেই ও' ট্রেন ছেড়ে দিল। ছোকরার ওপর আমার যা রাগ ধরেছিল, কি বলব। মেজাজটা একেবারে খিচড়ে দিয়ে গেল। তারপর নজর পড়ল একখানা ছোটো মাসিক পত্র নাম "রঙবন্ত", এইখানাই পড়ছিল ছোকরা। মাসিক পত্রটি খোলা অবস্থায় উল্টে রাখা ছিল। দেখলাম একটি গল্পের নাম "রাশীবাসি" আর লেখকের নাম যদি মজুমদার। লোকটার সুটকেসে লেখা ছিল "এম, এম"

আমি তাড়াতাড়ি বইখানি চোখের কাছে তুলে এক নিঃশ্বাসে পাতাগুলি উলটে যাই। এলেই গল্প, হুবহু সেই একই গল্প, যা এতক্ষণ ধরে শুনলাম।

পাজি, বজ্জাত, চ্যাংড়া! অসভ্য, নির্লজ্জ, বেহায়া! কি আশ্চর্য! আমি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজাতকুলশীল আমাকেই যে নিজের কীর্তি কলাপ বলে গেল, তা নয়, আবার বুক ফুলিয়ে মাসিকের পাতায় সেই একই কাহিনী নির্ভয়ে ছাপানো হয়েছে। এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি রে বাবা! কি দুঃসাহস!

না, ঘটনাটা পুলিসের হাতে দেওয়াই উচিত।

"ছোট পরিবারই সুখী পরিবার"

আপনি পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে, আপনার আয় অনুযায়ী সীমিত পরিবার গঠন করে সন্তানদের সুশিক্ষিত, কর্মঠ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থের অধিকারী ক'রে গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজেও ভাবনা চিন্তা ও অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিবাহিত জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করতে পারেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আপনাকে পছন্দ মত পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবে। যোগাযোগ করুন। বিনা অর্থব্যয়েই সবরকম সাহায্য পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হেলথ এডুকেশন ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত

শিল্পী

ঘরে উজ্জ্বল আলো যেমন জ্বলছিল তেমনিই জ্বলতে লাগল, চারিদিকের মহার্ঘ্য গৃহসজ্জার দীপ্তি একটুকু ম্লান হ'ল না—শুধু এই সমস্তর মালিক যিনি, সেই গৃহস্বামীই যেন নিমেষে শুকিয়ে উঠলেন—দর্শনার্থী আগন্তুকের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু যে শুষ্ক বা বিবর্ণ হয়ে উঠলেন তাই নয়—কোন্ এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় দেখতে দেখতে, বোধ করি ভাল করে চেয়ে দেখতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই, ঘেমে উঠলেন। সেই প্রথম শীতের আমেজ লাগা সন্ধ্যাতেও তাঁর কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠল—জামার গলার কাছটা ভিজে ন্যাতার মতো হয়ে গেল।

অবস্থিটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই। ঠিক তখনই চিনতে পারেন নি, এই নামের সঙ্গে তার যোগাযোগটা ধরতে পারেন নি তখনও—তবু কী যেন এক অজ্ঞাত কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন। আবছা আবছা ঝাপসা ঝাপসা একটা পরিচয়ের অদৃশ্য সূত্র মনে পড়েছে, সেইটেই হাতড়ে বেড়িয়েছেন মনে মনে এবং স্মৃতিটা পরিষ্কার হওয়ার আগেই কে জানে কেন—একটা অপরাধ বোধ জেগেছে! নামটার সঙ্গে কোথায় কী একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে মনে হয়েছে, তার কাছে অপ্রীতিকর, তার কাছেই লজ্জাকর।

আর ঠিক সেই কারণেই 'না' বলতে পারেন নি। চাকর রামলাল নতুন লোক, সে বাবুর সৌভাগ্যের সময়েই এসেছে, আগের ইতিহাস তার কিছু জানবার কথা নয়! যারা জানত তাদের সকলকেই তাড়িয়েছেন শৌরিপদ, বেশ বিশেষ করে বুঝেসুঝেই। কারণ তিনি জানেন যে, সামান্য অবস্থা থেকে বড় হলে—যারা সেই আগের সামান্য অবস্থাটা দেখেছে তাদের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা। আমি যাকে হিতাহিত নগণ্য কি কারণে পাত্র দেখেছি সে আমার সামনে বড় বাড়ি করবে বা গাড়ি হাঁকাবে সেটা আমার কাছে অসহ্য। তাই সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যের সমস্ত চিহ্ন, পূর্বের সমস্ত সম্পর্কও মুছে ফেলেছেন তিনি। সুতরাং রামলালের কাছে লোকটার বিনত প্রার্থনা অবজ্ঞার বলে মনে হয়েছে। অনুনয়টা ধৃষ্টতার মতো শুনিয়েছে। এই দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি—অন্তত ওর বেশভূষা ও হাতের গামছায় বাঁধা পুটুলি দেখে তার তা মনে হয়েছে—ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। একথা বিশ্বাস করতে পারে নি রামলাল। সে তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল, 'বাবুর সময় নেই' বলে। 'যা বলবার আমার কাছে আগে বলতে হবে বইলে হুট করে বাবুর কাছে গিয়ে আমি বলতেও পারব না,' একথাও বলেছিল।

কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, বার বার সেই একই কথা বলেছে, 'একটিবার আমার নামটা বলে ছাখো—তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন। তার সেই বাবা—আমি কিছু চাইতে আসি নি, বরং দিতেই এসেছি। তুমি শৌরিবাবুকে গিয়ে বলো যে সুলতানপুর থেকে মহেশ সাঁপুই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার

সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁর কিছু সুবিধেই হবে—অসুবিধে নয়। এটাও তাঁকে বলো। লক্ষ্মী বাবা আমার—তুমি একবারটি বলে দ্যাখো, আমি তো জোর করছি না, হ্যাঙ্গাম হজ্জুত করছি না—যদি সব শোনার পরও তিনি না বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাবো।

আর একবার রামলাল মহেশ সাঁপুইয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষা ক'রে দেখেছিল। আবক্ষলম্বিত জনচটের মতো মোটা ভাগড়, সেটা পরবার জন্যে হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। পায়ের গোছ ছাড়িয়ে ওপরে বহুদূর পর্যন্ত ধূলি ধূসর, একটা খাকি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো তাতে ডিনচারটে ক'রে তালি। গায়ে টুইলের শার্ট—লাল ধুলোয় সেটারও প্রায় বর্ণান্তর ঘটেছে—তার ওপর একটা সওদাগরের ভাঙে বোনা চৌকুপি কাটা সুতি-চাদর—তাদের দেশঘাটের দিকে হাটে এই সব চাদর বিক্রী হয়—তাদের মতো গরীব গেরস্তরা কেনে—কোন ভদ্রলোককে অঙ্গাপি কিনতে বা পরতে দেখেনি রামলাল। এ লোকের সঙ্গে তার মিলিবের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে—বিশ্বাস করা শক্ত। এর দ্বারা তার কোন উপকার কি সুবিধে হবে সে তো আরও অবিশ্বাস্য সে আবারও তাই ঘাড় নেড়েছে, জোর জোরেই বলছে সরে পড়তে।

তবু লোকটি যায়নি। 'বাবা বাছা' করেছে, কাকুতি মিনতি করেছে! অগত্যা গিয়ে খবরটা দিতে হয়েছে বাবুকে। তবু তখনও সে ধারণা করতে পারে নি যে বাবু ঐ লোকটার সঙ্গে সত্যিই দেখা করবেন বা নিয়ে আসতে বলবেন। এই দাড়ী গোঁফ সেটা, মোজেক পাতা পুরু কার্পেট, মাথার ওপর সদ্য ঝোলা বড় ঝাড়ের আলো—সমস্ত জিনিসের সঙ্গেই যে একেবারে বেমানান লোকটা। সে কথা বলেওছে রামলাল—আগন্তুকের আকৃতি বেশভূষা এক হাঁটু ধূলোর কথা—সব।

কিন্তু রামলালের বিস্ময় শতগুণ বেড়ে গেছে বাবুর মুখের চেহারাটা দেখে। একটা অপরিচিত ভিক্ষার্থী শ্রেণীর লোক দেখা করতে চায়—রামলাল এসে এই সংবাদ দেওয়ার প্রারম্ভে যে বিরক্তিকঠোর ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল বাবুর মুখে সেটা রামলাল বুঝতে পারে, সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হ'ল পরবর্তী অবস্থাটা। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখল রামলাল, আগন্তুকের নামটা শোনার পর কেমন ভূত দেখার মতো বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন বাবু ওর মুখের দিকে, একটু একটু করে পূর্বের যে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গিয়ে সেই উদ্ভট সৌভাগ্যাকৃষ্ট মুখ কেমন ক'রে পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠল, স্পষ্টই একটা কি যেন অজ্ঞাত ভয়ে এবং অস্বস্তিতে ছট ফট ক'রে উঠলেন।

আরও অবাক হল যখন দেখল যে তার বাবু নির্বাকই হয়ে গেলেন—কথায় কোন খবর উত্তর দিতে পারলেন না। নীরবে ইঙ্গিত করলেন লোকটাকে নিয়ে আসতে—এবং লোকটি এসে ঘরে ঢুকে দরজাতে দাঁড়াতে রামলালকেই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলেন চলে যেতে—আর যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যেতে।

'বড়লোকের মর্জ্জি বোঝা ভার'—এছাড়া তার কোন সান্ত্বনা বা কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় দেখল না রামলাল। আধুনিক চাবি পড়ে যাওয়া এক পাল্লার দরজা—তাতে কান দিয়ে আড়ি পাতাও কঠিন—তাছাড়া সে চেষ্টার অন্য বিপদও আছে। কি সরলা তার একটি ভালবাসার মানুষকে এখানে ঢোকাবার ভাল খুঁজছে অনেক দিন ধরে—সে যদি দেখতে পায় তো এ সুযোগ সহজে ছেড়ে দেবে না। পুরুষের হৃদয় গলানো চের সহজ, স্ত্রীলোক বিশেষ সে যখন স্বার্থের গন্ধ পায় তখন তার হৃদয় পাষাণের চেয়েও কঠোর হয়ে ওঠে। এজ্ঞান তেমন দেখাপড়া না থাকলেও রামলালের হয়েছে এই বয়সেই।

মহেশ সাঁপুইকেও ইঙ্গিতে বলতে বলেছিলেন সৌম্যিপদ, আড়ষ্ট শিথিল হাতটা কোনমতে তুলে সাবধানে

পদীর্ঘটা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বসেন নি। বসতে ভরসা হয়নি তাঁর, সঙ্কোচে বেধেছিল। তাঁর ঐ সাহজাদি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো পায় এই দামী কার্পেটে এসে দাঁড়াবার জন্যেই লজ্জার শেষ নেই যেন—তার ওপর এই ময়লা কাপড়জামা, ধুলিবিবর্ণ সাড়ে চারটাকা জোড়ার চাদর নিয়ে ঐ দামী রেশমের আস্তরণ ঢাকা সুবিপুল আসনে বসা নিতান্ত ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস বলেই বোধ হয়েছে।

তাই তেমনি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, বলল, না না, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবেন না। আমার কাপড়চোপড়ের যা অবস্থা—। চিনতে পেরেছেন এই ঢের।.... আপনার চাকরটি তো তাড়িয়েই দিচ্ছিল। অবিশ্যি তাকে দোষও দিইনা। তাড়িয়ে দেবারই তো কথা, যা আমার বেশ সূষা—এ বাড়িতে একেবারেই বেমানান।... আমাকে—আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?

বিস্ফোরণ নয় বজ্রও নয় শেষের কথাগুলো সন্ত্রাসের সংশয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গেই উচ্চারণ করে মহেশ সাঁপুই।

তখনও ঠিক সামলে নিতে পারেন নি শৌরিপদ বাবু। অভাবনীয় অনভিপ্রেত এই আবির্ভাবের আঘাত—একটা ঐকান্তিক সর্বনাশের আশঙ্কা যা আতঙ্ক তাকে কিছুক্ষণের জন্য যেন জড় করে দিয়েছিল। একেবারে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলেই একটা আঘাত লেগেছে তার স্নায়ুকেন্দ্রে। তখনও তাই বাক্ যা কর্মশক্তি ফিরে পান তিনি—সাধারণ কথা কইবার মতো এতটুকু শক্তিও ফিরে আসে নি। সে জন্যে এখানেও নিঃশব্দে ঘাড় নাড়তে হ'ল তাঁকে—চিনতে পেরেছেন।

এবং সেই সঙ্গে আবার ও একবার ইঙ্গিত করলেন—সামনের আসনটা দেখাবার চেষ্টা ক'রে—বসতে। অর্থাৎ ভাল করেই চিনতে পেরেছেন। সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ কোথাও নেই। চিনতে না পারারও কোন কারণ নেই। গত কয়েক বছর ধরেই এই লোকটির আগমন আশঙ্কা করছিলেন শৌরিপদ বাবু। প্রথম প্রথম তো কাঁটকিত হয়ে থাকতেন—বরং দীর্ঘ দিন না আসাতে ইদানীং সে ভয়টা ছিল না, একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তবু যত দিন প্রবল ছিল, এই আবির্ভাবের জন্যে প্রহর গুনছিলেন বলতে গেলে—ততদিন, সে অবস্থায় ঠিক কি ভঙ্গী নেবেন। বিস্ময় ও আহত-সম্মানের কোন্ সুরটি দিয়ে খেলাবেন—কেমন করে অস্বীকার করবেন সমস্ত ব্যাপারটা—মনে মনে মহড়া দিয়ে রাখতেন। একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। উড়িয়ে দেবেন আগাগোড়া সমস্ত অভিযোগটা চেঁচামেচি করবেন, পাগল বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন মহেশ সাঁপুইকে। এসবই ঠিক করা ছিল, তখন এলে কোন অসুবিধেই হ'ত না।

দীর্ঘ দিন কেটে যাবার ফলে যেমন আশঙ্কাটা কেটেছে একটু একটু করে, তেমনি সে প্রস্তুতিও নষ্ট হয়েছে। অতর্কিতে এমন ভাবে এসে পড়ার ফলে ঠিক যা যা করবেন বলে এতকাল ভেবে রেখে ছিলেন তার আর কোনটাই মনে পড়ল না। অসহায় বিহ্বল ভাবে চেয়েই রইলেন শুধু—ভাগ্যবিড়ম্বিত, ভাগ্যের হাতে প্রহৃত ব্যক্তির মতো।

অনেকদিন কেটে গেছে সত্যিই—তবু চিনতে না পারার কথাও নয়। ঠিক তেমনিই আছে মহেশ সাঁপুই—আজ থেকে সাত বছর আগে যেমন ছিল। সেই একবারেই দেখে ছিলেন এটা ঠিক—তবু তাঁর এই ভাগ্যের সঙ্গে, অথবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, (এখনও মনে হ'লে বৈষ্ণবিক চিমটি খাওয়া মতো মুখ বিকৃত করেন শৌরিপদ) সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলেই, মনে আছে। মুখ চোখ আর মনে ছিল না, থাকা সম্ভব নয়—একটা আবছা অস্পষ্ট আসল মাত্র মনে ছিল। কিন্তু এখন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল। আসল যেটা মনে ছিল সেটা এই বেশভূষাই। এমনিই পোশাক ছিল সেদিনও এক হাঁটুঝুলো, তালিদেওয়া কেডস্ জুতো,

ময়লা জামার ওপর এই সন্ধ্যা বেলার চাদর, হাতে তেমনিই তেলচিটে গামছায় জড়ানো বাণ্ডিল একটা। উপরন্তু বেটা ছিল—একটা ভাঙ্গি দেওয়া বিবর্ণ ছাতা। বোধকরি সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে বলে নেওয়া চলে নি।

তবে সেদিনকার শৌরিপদর পরিবেশ খুব একটা বেমানান হয় নি। আজ যেখানে তাঁর এই—ঠিক প্রায়োপবেশন না হ'লেও—নতুন অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। তার ঠিক পাশে ঐ যে 'নিত্যসুখা লণ্ড্রী'টা এখন যেখানে আছে। ঐখানে ঐ গ্যারেজ ঘরে শৌরিপদ একটা ছাপাখানা খুলে বসেছিলেন। মহেশ সাঁপুই সেখানেই এসেছিল সেবার। অর্থাৎ সেখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক ব্যবসা চেখে দেখে—শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে এই ছাপাখানা করেছিলেন। প্রেসও অবশ্য নামেই—একটা ছোট হাত্ ফুলস্ক্যাপ ট্রিডল্ মেশিন ও কিছু ইংরাজী বাংলা টাইপ সবই পুরনোদরে কেনা যার কেস গ্যালি সুদ্ধ। এ পাড়ায় প্রেস চলার কথা নয়—কিন্তু যে পাড়ায় চলে সে পাড়ায় ত্রিশটাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। অগত্যাই এ পাড়ায় ঐ গ্যারেজ ঘর খানি ভরসা করে বসতে হয়েছিল। একটু আশা ছিল, বিয়ের প্রীতিউপহার, ভাড়ার রসিদ বই—চিঠির কাগজ—একাজ কি দুচারটে পাওয়া যাবে না? এই রকম গোটা কতক কাজ পেলেই খরচা উঠে যাবে। খরচাও তো খুব বেশী নয়, একটি দ্বিতীয় 'আসষ্টি পারসোন' কম্পোজিটার আর একটি ট্রিডল্ ম্যান—লোক বলতে তো এই।

কিন্তু তাও পাওয়া যায়নি—সে রকম দুচারটে কাজও। কাজ মিলত কদাচিত কখনও। ফলে ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর তখন তাগাদা, নিজের গহনা ও সংসার খরচা। এখানে কর্মচারিদের মাইনে, বাড়িভাড়া। শুধু পাওনাদার ছাড়া যেন পৃথিবীতে কেউ নেই এমনি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল শৌরিপদর। সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরেও কাজ যোগাড় হয় না—লোকগুলোকে বসিয়েই মাইনে দিতে হয় একরকম। এক এক সময় ভাবেন ছাড়িয়েই দেন—কাজ এলে নিজেই না হয় কম্পোজ করে মেসিনে ছেপে দেবেন। আবার সাহস হয় না—এমনিই কাজ দেয় না কেউ। লোকজন নেই দেখলে আরও দেবে না।

এই অবস্থাতেই একা শুম্ হয়ে বসেছিলেন সেদিন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রেসের দুজন লোক সারাদিন চুপ করে টুলে বসে থেকে বাড়ি চলে গেছে, একটা কাজও ছিলনা করার মতো। কিন্তু শৌরিপদ যেতে পারেন নি। পারেন নি—মানে এখানে কোন কাজ ছিল বা কাজের আশা ছিল বলে নয়, পারেন নি বাড়ি ফেরার মুখ ছিল না বলেই। অন্তত পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা উচিত আজ। নইলে চলবে না—কিন্তু পকেটে তাঁর ষোলটি পয়সা বা চার আনার বেশী পড়ে নেই। এখানে ক্যাশের বাক্সটাতে আছে সবসুদ্ধ জড়িয়ে টাকা খানেকের রেজগি। এতে হাত দেওয়ার উপায় নেই, কাল সকালে ঘুনো গয়লাকে দেওয়া থেকেই শুরু হচ্ছে দেহি দেহি; চার আনা ক'রে দুজনের জলপানি আছে, এটা ওটা পঞ্চাশ রকমের খুচ্‌রো খরচ। তাই একাই নিজের চেয়ারে শুম্ হয়ে বসেছিলেন। আলো মিটমিটি জ্বলছে, তা জ্বেলেও। গভীর রাত না হ'লে। স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু না করলে—ছেলেকে দিয়ে ডাকতে না পাঠালে বাড়ি ফেরার উপায় নেই। একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনা বা বাক্যযন্ত্রনা কিছু কম হবে।

এমনিও নড়তে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এইখানে এই চেয়ারে বসে বসে ঘরে যাওয়ার মতো ইতিমধ্যে পরিস্থিতি আর কিছুই হ'তে পারে না।

ঠিক সেই সময়েই এসেছিল মহেশ সাঁপুই। ঠিক এই ভাবে, আজ যেমন এসেছে। এই রকম দীন হীন বেশ, এই রকম ঘুলি মলিন। সুলতানপুর থেকে সকালে রওনা হয়ে এখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিছুই

জানেনা—কোথায় যেতে হবে কার কাছে! এ পাড়ায় কে কুটুম ছিল তার সন্ধানেই এই বাগবাজারের প্রান্তে খালধারে এসে পড়েছিল। সে কুটুম যে বছর খানেক আগে মারা গেছে সে খবরটা জানত না। তার পর থেকে লক্ষ্যহীন ভাবেই ঘুরছে। হঠাৎ ওর ছাপাখানার সাইনবোর্ডটা নজরে পড়তে এবং সামনেই ওঁকে বসে থাকতে দেখে ভরসা করে ঢুকে পড়েছিল।

ভেতরে আসব বাবু? প্রশ্ন করেছিল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রথমটা শৌরিপদও ভেবেছিলেন ভিক্ষার্থী। কিন্তু তার পর আর একটু তাকিয়ে দেখে কে জানে কেন মনে হয়েছিল যে ঠিক সাধারণ ভিক্ষা এমন কি তার চেয়ে কোন উচ্চশ্রেণীর সাহায্য চাইতেও আসেনি লোকটি। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই বলেছিলেন—আসুন বসুন কী চাই আপনার? ছাপাবেন কিছু?

হঠাৎই মনে হয়েছিল কথাটা। ওকে সাইনবোর্ডের দিকে বার দুই তিন তাকাবার পর এদিকে এগিয়ে আসতে দেখেই মনে হয়েছিল। আশাও হয়েছিল একটু, হয়ত লোকটি কোন জমিদারের গোমস্তা কি সরকার চেক বা দাখিলা ছাপাতে এসেছে।

লোকটিও সাগ্রহে ঘাড় নেড়েছিল। ক্লান্ত মুখ আশাতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যেন। ঘরে ঢুকে নিজেই ওঁর ডেস্কের সামনের টুলে বসে বলেছিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই আশাতেই এতদূর আসা। আমি আসছি সেই সুলতানপুর থেকে-বীরভূম জেলার সুলতানপুর নাম শুনে থাকবেন বোধহয়।

তারপর গামছার পুঁটলি খুলে বার করেছিল চার পাঁচ খানা খাতা, ওঁর সামনের ডেস্কের ওপর রেখে বলেছিল, অনেকদিনের সাধনা বাবু, দীর্ঘকালের। কবি থেকে যে লিখেছি তা অনুমান করতেও পারবেন না। সেই ষোল বছর বয়স থেকে। কবিতা ছড়া গান নাটক গল্প নভেল। তা এই রকম চল্লিশ পঞ্চাশ খানা খাতা বোঝাই লেখা আছে যে সব। উহি মধ্যে থেকে বেছে এই কখানা নভেল এনেছি যদি পারেন এই কটা ছেপে দিতে বাবু। আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। বয়েস হয়ে আসছে, আর কটা দিনই বা বাঁচব—একখানাও যদি ছাপা দেখে যেতে পারি।

আপনার লোকসান হবে না বাবু, পড়ে দেখুন। নিশ্চিত পছন্দ হবে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একান্ত মিনতির সুরে শেষের কথাগুলো বলেছিল মরেশ সাঁপুই।

হতাশ হয়েছিলেন বৈকি! এই শ্রেণীর আশাভঙ্গে সাধারণত ক্রুদ্ধই হয়ে ওঠে লোক বিশেষ এই অবস্থায়—কিন্তু কে জানে কেন শৌরিপদ তা হ'ন নি। বোধহয় হতাশার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছিলেন বলেই ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে কৌতুক বোধই করেছিলেন। অনেক কিছুই করেছেন গত ক'বছরে জীবিকার জন্যে অনেক রকম দেখেছেন। এর আগে কিছুদিন এক ছাপাখানাতে চাকরিও করেছিলেন। এ লোকটি যে ভুল করেছে—সে ভুল অনেকেই করে। সেটা সেই প্রেসে থাকতেও লক্ষ্য করেছেন—তাই কি বলতে চাইছে লোকটি বুঝতে অসুবিধে হয় নি তার।

বাংলা শব্দ ব্যবহারের শৈথিল্য এটা। বই প্রকাশ করাকে অনেকেই বই ছাপা বলে উল্লেখ করেন। অমুক প্রকাশক আমার অমুক বইখানা ছেপেছেন একথা অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকও বলে থাকেন। 'ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন এই কথাই বলতে চান তিনি সে ক্ষেত্রে। প্রকাশক ও মুদ্রাকরে যে অনেক তফাৎ, সেটা বহুলোক ভাল জানে না। হয়ত এককালে সব প্রকাশকেরই নিজস্ব ছাপাখানা থাকত—কিম্বা সেই কেরি সাহেবের আমল থেকে বিদ্যাসাগরের আমল পর্যন্ত ছাপাখানা থেকেই বই প্রকাশিত হ'ত—তখন থেকেই ধারণাটা চলে আসছে তাই। এ লোকটিও প্রেসের সাইন বোর্ড দেখে ঢুকে পড়েছে অনেক আশা করে।

অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, তবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলারই চেষ্টা করেছিলেন শৌরিপদ বাবু। কে জানে কেন, সম্ভবত লোকটির একান্ত দীন ও বিনত ভঙ্গিতেই—রাগ করতে পারেন নি, আর হাতে কোন কাজ না থাকতে—অথবা কাজ না থাকার চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়েই বিরক্তও হন নি। বরং কিছুক্ষণ লোকটির সঙ্গে বক বক করে হাত ভুলে থাকতেই চেয়েছিলেন। প্রকাশক ও মুদ্রাকরে যে চের তফাত, মুদ্রাকররা চিনির বলদ মাত্র, বই ছাপা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ ছাপিয়ে বাঁধিয়ে প্রচার করা—সেটা করেন প্রকাশকরা। কোন কোন প্রকাশকের নিজেরও ছাপাখানা আছে—কিন্তু ছাপাখানা থাকলেই প্রকাশক হয়না। তাছাড়া প্রকাশকরা এমন ভাবে অপরিচিত লোকের লেখা প্রকাশ করতে চান না। সাময়িক পত্র অর্থাৎ মাসিক বা সাপ্তাহিকে লিখে খানিকটা নাম হলে তবেই প্রকাশকরা ভরসা করে ছাপার খরচ বার করেন। এসব কথাই বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন ওকে।

কিন্তু লোকটি শোনেনি। এত কথা হয়ত বুঝতে পারে নি, এর গোলমেলে কথা, এত রকমের ভিন্ন ব্যবস্থা। সে একেবারে তার হাত দুটি চেপে ধরেছে, দোহাই বাবু, আপনিই একটা যাহোক সদগতি করে দিন। আমি এত জানি না, কোথায় কার কাছে কি যেতে হয়, এত ঘুরতেও পারব না। আমার সঙ্গে হয়ত দেখাই করবেনা কেউ। প্রাইমারী ইস্কুলে মাষ্টারী করি—এর বেশী ভাল জামা কাপড়ের সঙ্গতি নেই। কলকাতা সহরে এ পোষাকে ভিখিরী ভাবে সবাই। আপনার অনেক দয়া, তাই কথা বলেছেন, বলতে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাকে আজই ফিরতে হবে—কলকাতা সহরে এক ঘর যে কুটুম ছিল জানতাম তারা নেই,—আমার সে ভাইপোর শ্বশুর মারা গেছে, তারা অন্তরে চলে গেছে। জানতামও না, আজ এসে শুনলুম। এখানে রাত কাটাবার জায়গা নেই। রাত দশটা চল্লিশের গাড়ি ধরে আমোদপুর গিয়ে পড়ে থাকতে হবে।···আপনি যখন এত দয়া করেছেন—আর একটু করুন। এগুলো থাক আপনার কাছে, অবসর পেলে পড়ে দেখবেন একটু। যদি ভাল লাগে, যদি মনে হয় চলবে—দয়া করে আপনিই কাউকে বলে করে একটু ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ে ধরলেও আমার ক্ষতি নেই। মনে করুন আমি পায়েই ধরছি আপনার।

আর বলার অবস্থা ছিলনা শৌরিপদবাবুর। সারাদিনে—সেই যা ভোরে দুখানা বালিশকুট খেয়ে বেরিয়েছেন তারপর আর চার পাঁচ বার চা ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। মাথা ঝিম ঝিম করছে এখন। আর বকে কিছু সুফল হবে বলেও মনে হয় না। পুস্তক প্রকাশন জগতের এত ভালোকটো সদ্য পল্লীগ্রামগত এই অনভিজ্ঞ প্রাইমারী পণ্ডিতের মাথায় ঢুকবেনা। এতক্ষণ তো বকে দেখলেনও। এর পর বোঝানো মানে আরও খানিকটা বকা, উনি পড়লে কোন সুবিধা হওয়া যে সম্ভব নয়, ওর ভাল লাগলেও যে প্রকাশকরা সে কথার উপর নির্ভর করে বই প্রকাশ করবেন না, এমন কি তাঁদের ভাল লাগলেও ছাপতে চাইবেন না তাঁরা—কারণ বই কেউ পড়ে কেনে না, লেখকের নাম দেখে কেনে, কেনার পর পড়ে—আর সে 'নাম' করতে হয় দীর্ঘকাল সাময়িক পত্রে লিখে। প্রকাশকরাও লেখকের নাম হলে তবে ভরসা করে ছাপেন—যথেষ্ট নাম হ'লে ছাই ভস্ম যা লেখেন তাই ছাপা যায়। মহেশ সাঁপুইয়ের লেখা যত ভালই হোক, কেউ প্রকাশ করবেনা, হয়ত কোন সম্পাদককেও পড়াবো যাবেনা। বহুজায়গায় পাঠাতে হবে, বেশির ভাগ জায়গা থেকেই ফেরৎ আসবে—দীর্ঘকাল ধরে পাঠাতে পাঠাতে হয়ত দৈবাৎ কেউ ছাপাবেন দয়া ক'রে। সে দীর্ঘদিন ব্যাপী বিস্তৃত প্রক্রিয়া। অত দিন ধরে অতকাণ্ড করার সময় হবে না শৌরিপদ বাবুর, এ দাবী করাও মহেশের উচিত নয়—সমস্ত প্রস্তাবটাই অবাস্তব ও অসঙ্গত।

এমনি অনেককথা বোঝাতে বলতে হয় তখন, অনেক বকতে হয়, তাতেও সম্ভবত মাথায় ঢুকবেনা লোকটির। আরও, অনেক বকাবে, অনেক অনুরোধ মিনতি করবে। সত্যিসত্যি পায়ে ধরাও আশ্চর্য নয়।

না, অত ঝঞ্ঝাট পোষায় নি সেদিন। অপরিসীম ক্লান্তিতেই আরও চুপ করে গিয়ে ছিলেনশৌরিপদ।

আরও কিছু মিনতি এবং তোষামোদ ক'রে খাতাগুলো রেখেই যখন চলে গিয়েছিল মহেশ সাঁপুই—তখনও বাধা দিতে চেষ্টা করেন নি। খাতাগুলো তাদের সাদাসিধে ধাঁচে—অর্থাৎ ঝাঁটানো কাগজের সঙ্গে একদিন বাইরে ফেলে দিলেই হবে, এই ভেবেই চুপ করে ছিলেন। শুধুশুধু খামোকেটে বকার চেয়ে সেটা ঢের সোজা।

পড়েইছিল খাতাগুলো। ফেলে দেওয়া বা সরিয়ে রাখাও হয়ে ওঠেনি। এমনি পড়ে থাকতে থাকতে সেই দিনের মতো কর্মহীন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় অলস কৌতূহলভরে একটা খাতা টেনে নিয়েছিলেন শৌরিপদবাবু, উলটে দেখেও ছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতেই—কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার পরই যেন চমকে উঠেছিলেন। যতটা 'নন্‌সেন্স' দেখবেন ভেবেছিলেন তা তো নয়ই—উপরন্তু তার মনে হয়েছিল—রীতিমতো পাকা লেখা।

পড়তে পড়তে গভীর রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন—তাই কত রাত হয়ে গেছে টের পাননি। ছেলে ডাকতে আসতে তবে হুঁশ হয়েছে, অনিদ্যাসত্ত্বেও খাতা উলটে রেখে উঠে বসতে হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি। বিস্ময় ও মুগ্ধতার ভাব তাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত অভিভূত করে রেখেছিল। শৌরিপদ বাবু নেহাৎ "ছাপাড়ে ভূত" নন্—সাহিত্য প্রীতি ছিল তার বরাবরই একটানে কিছু চর্চাও করেছেন। কলেজে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে অনেক লিখেছেন। তার পরও পড়ার অভ্যাসটা বজায় রেখেছিলেন দীর্ঘকাল অবধি। একেবারে এই দৈন্য দশায় পৌঁছবার আগেও, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত বই আনিয়ে পড়তেন। তেমন ভাল লিখতে না পারুন—ভাল লেখা কাকে বলে তা জানেন।

পরের দিন সকালে গিয়ে খাতার বাকী অংশটুকু শেষ করেছেন, তারপর আর এক খানা খাতা টেনে নিয়েছেন, তারপর আর একখানা। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছেন বলতে গেলে। পড়ে চমকে গেছেন, অবাক হয়ে গেছেন। দু একটা ছোটোখাটো গ্রাম্যতা দোষ ছাড়া, ভাষার দুএকটা শৈথিল্য ছাড়া—কোথাও কোন ত্রুটি নেই। একেবারে প্রথম শ্রেণীর রচনা। এ লেখা যদি এমনি অখ্যাত অজ্ঞাত হয়ে যায় তো সেটা বঙ্গ ভারতীরই দুর্ভাগ্য বুঝতে হবে, শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অনেক ভেবেছেন শৌরিপদ বাবু, কী করা যায়—অনেক চিন্তা করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে এই দুর্বুদ্ধি দেখা দিয়েছে মাথায়। লোভ প্রবল হয়ে উঠেছে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, নিদারুণ অভাবেই এতখানি নিচে নেবেছেন শৌরিপদ; বাধতে পেরেছেন। কিছুদিন আগে হলেও—একথা ভাবতে পারতেন না, কখনও কোন অসতর্ক মুহূর্তে মনের কোনে চিন্তাটা দেখা দিলে লজ্জিত বোধ করতেন, নিজেকে ধিক্কার দিতেন।

আরও একটা ব্যাপার ছিল অবশ্য। শৌরিপদবাবুর তরফ থেকে বলা যায়।

মহেশ সাঁপুই নাম, আর দেশী কলম ও কালিতে লেখা ঐ পাণ্ডুলিপি—এ দেখলে কেউই ছাপবেনা, কোন সম্পাদকই।

সে চেষ্টাও তাই করেন নি শৌরিপদ। সাবধানে যত্ন করে 'কপি' করেছেন সমস্ত বইগুলো, যেখানেই যা ছিল সংশোধন করে, গ্রাম্য দুষ্ট শব্দগুলো বদলে নিখুঁত নির্ভুল করে নকল করেছেন। তার পর গেছেন তাঁর অপরিচিত এক মাসিক পত্রের সম্পাদকের কাছে। যখন ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছেন তখন দিন-কতক এই দৈনিক-যান-মাসিকপত্রের আপিসেও কাজ করেছিলেন। সেই থেকেই পরিচয় ছিল সম্পাদকের সঙ্গে। হঠাৎ এতদিন পরে শৌরিপদকে লেখক রূপে দেখে বিস্মিত হয়েছেন তিনি, কিছু ঠাট্টা-তামাসাও করেছেন কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি—উলটে দেখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

তারপর, তিনিও চমকে উঠেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়েছে তাঁকেও। সঙ্গে সঙ্গে দুই পরিচ্ছেদ ছেপে

দিয়েছেন। সৌরিশদকে ডেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং কিছু-কিছিৎ সম্মানদক্ষিনা দেবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সাধ্যও কিছু অগ্রিম দিয়েছেনও। তারপর—প্রকাশিত ঐ প্রথম কিস্তি নিয়ে সৌরিশদ গেছেন এক বিখ্যাত সাপ্তাহিকের সম্পাদকের কাছে। অনবদ্য যে প্রচুর পরিমাণে পান ভোজন না করালে কোন নতুন লেখকের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন না—কি সৌরিশদ বাবুকে তাও করাতে হয়নি। ভাগ্যই ভাল—এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মারফৎ যাওয়ার ফলেই হয়ত—বিনা ঘুষেই সেই কিস্তিটি পড়াতে পেরেছেন সৌরিশদ। তার পর আর কোন বেগ পেতে হয় নি, অন্য লেখা সরিয়ে রেখে, এমন কি পূর্ব বিজ্ঞাপিত লেখাও—সৌরিশদর একটি নূতন ধারাবা অবিলম্বে শুরু করে দিয়েছেন ছাপাতে।

এর পর সৌরিশদর অন্যত্রের গতি আর কোথাও ব্যাহত হয় নি। প্রকাশকরা নিজে থেকেই ছুটে এসেছেন, অগ্রিম টাকা দিয়ে গেছেন। বই ছাপার পর বিক্রীও যেমন দ্রুত হয়েছে তেমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্ম রাইট বিক্রী হয়েছে। হিন্দী, মারাঠী সংস্করণ ছাপা হয়েছে। কাগজে কাগজে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে—ওর লেখার জন্য। পূজাসংখ্যার জন্য উপন্যাস চাই—দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত অঙ্কার পেয়েছেন! একটা গৌরব ও সাফল্যের শিখর চূড়া থেকে আর একটায় চলে গেছেন অনায়াসে। প্রথম কাহিনীর কিস্তি লেখানো শুরু হতেই বোম্বে থেকে হিন্দী এবং মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণ ভারতীয় চিত্ররূপের জন্য ছুটে এসেছেন প্রযোজকরা, মোটা মোটা টাকা দিয়ে গেছেন তার ফলেই এই বাড়িটি করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। কিছু দেনা করেই করতে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু সে দেনা শোধের অভাব হয়নি তখন, তখনও বেশী দেরি লাগেনি।

শুধু দুটি অসুবিধা ছিল এর মধ্যে। এই দুটি চিন্তাই তাঁর কুসুম কোমল সৌভাগ্য শয্যাকে কণ্টকিত করে রেখেছিল। জীবনের অমৃতপান একটা বড় রকম তিক্ততায় সৃষ্টি করত মধ্যে মধ্যে। প্রথমত—মহেশ সাঁপুই যে কখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়ে গিয়েছিল—মোট ছখানি উপন্যাস ও একটি নাটক (যে নাটকও ছাপা হয়েছে, ষ্টেজে অভিনয়ও হচ্ছে), তা ত সবই প্রায় ছাপা হয়ে গেছে। এখন কি হবে? চারিদিক থেকে লেখার তাগাদা আসছে অনবরত। কিছু কিছু চেষ্টা যে না করেছেন সৌরিশদবাবু তাও না, কয়েকটা গল্প তো লিখতেই হয়েছে—কিন্তু রচনার মানে যে আকাশপাতাল তফাৎ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে সৌরিশদবাবু নিজেই যথেষ্ট সচেতন। তিনি খাটছেন খুবই—এক একটি লেখা তিন বার চার বার করে লিখছেন—যথাযথ অক্ষর নেই—তবু ঠিক ঐ সুরটি আনতে পারছেন না সুরপল্লীগ্রামের অর্ধশিক্ষিত এক পাঠশালার পণ্ডিত যা অনায়াসে পেরেছে।

আর একটি দুশ্চিন্তা ছিল এইটেই বেশী যদি কোনদিন ঐ মহেশ সাঁপুই এসে হাজির হয়, খুঁজে বার করে তাঁকে—কৈফিয়ৎ চায়। যদি জানতে পারে যে তার সব লেখাই ছাপা হয়েছে, তা বিক্রীও হচ্ছে প্রচুর, সেই সব লেখার জন্যেই আজ সৌরিশদ বাবুর এত সম্মান ও অর্থ অথচ সে নিজে এর একটুখানি ফল ভোগ করতে পারছে না, তাহলে যেমন করেই হোক ওকে খুঁজে বার করবে এবং কৈফিয়ৎ চাইবে।

কিন্তু দিন দিন করে মাস ছয় বৎসর—বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে যখন—সে ভয়ঙ্কর যোগাপড়ার দিন দেখা দেয় নি—তখন বিপদের সে আতঙ্কটাও কমেছে একটু একটু করে—প্রস্তুতিটাও নষ্ট হয়েছে।

একেবারে আজ—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো এই আগমন আকস্মিক অতর্কিত এই আক্রমণ।

সেই জন্যেই সৌরিশদ বাবুর এই বিহ্বল স্তম্ভিত অবস্থা।

কিছুই করতে পারছেন না, কিছু বলতেও না। না-চেনার ভান করাই যে উচিত ছিল গোড়া থেকে এতদিনের জেবে রাখা সেই মূল্যবান যুক্তিটাও যোগাল না প্রয়োজনের সময়টায়।

কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে দিল মহেশই। সে তেমনি সসঙ্কোচ বিনয়ের সুরেই বলল, 'বই গুলো ছাপা হয়েছে দেখলুম বাবু। জানতাম না, হঠাৎ একখানা চোখে পড়ল 'ধরণীত্রী দুসর' বইখানা—। বিশদ এই লেখিন আপনার নামটাও জেনে যাওয়া হয়নি তো, তাই বিজ্ঞাপন দেখে কিছু বুঝতে পারিনি। ওখানা পড়বার পর খুঁজে খুঁজে চেয়ে চিন্তে সব কখানাই দেখলুম। তার মানে আপনার পছন্দ হয়েছিল পড়েছেন দেখে। দেখলেন তো বাবু লেখিন আমি মিছে কথা বলে যাই নি। পছন্দ হবে আপনার—সবাইকারই হবে—তা আমি বরাবরই জানতাম।

আবারও চমকে ওঠেন সৌরিপদ, আরও হতভম্ব বিহ্বল হয়ে পড়েন। কৈ, এর কণ্ঠে তো এতটুকু উষ্মা কি তিরস্কার নেই। এ কেমন ধারা লোক? কিম্বা এটা সেই এযাবৎ আলঙ্কিত প্রচণ্ড বিস্ফোরণেরই ভূমিকা? ঝড়ের আগে যেমন প্রকৃতি শান্তাস্তর হয়ে থাকে তেমনি?

মহেশ সাঁপুই কিন্তু বলেই চলেছে—ভালই করেছেন বাবু। আমার নাম দেন নি। মহেশচন্দ্র সাঁপুই লেখকের নাম থাকলে কেউ বই ছাপত না। কিনতও না কেউ। এতো তবু বই কখানার নাম হয়েছে পড়ছে ত এত লোক। আমার চিন্তার সঙ্গে এতগুলো লোকের মিল হচ্ছে, আমার যে লিখতে আসা ভুল হয় নি, কিছু শক্তি যে আছে সেটা তো জেনে গেলুম, তাতেই আমার শান্তি।

তারপর একটু থেমে—যেন আরও কিছুটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত মুখে বলল, একটি কথা বাবু, তা এতই যখন করলেন, এগুলোরও একটা সদ্গতি করে দেন। আপনারও তো লাগবে, নিশ্চয় আরও অনেকে আপনার বই চাইছে—আর আমারও বরুন শরীর যেমন খারাপ হয়েছে—কবে আছি কবে নেই, আমার বাড়ির লোকেরা তো ভাবে আমি একটা পাগল, না খেয়ে না দেয়ে দিন রাত কী সব বাজে হিজিবিজি লিখছি গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল, লেখক বলে কেউ পোঁছে না, একটা লেখা ছাপা হয় না—শুধু লিখেই যাচ্ছি। তার মানে আমি চোখ বুজলেই সঙ্গে সঙ্গে কেঁটিয়ে ফেলে দেবে ঐ সব বাজে কাগজের বোঝা—কেউ উল্টেও দেখবে না। তাই যে কখানা পেয়েছি এনেছি বাবু, কটা গল্প নাটক—আরও তিন চারটে উপন্যাস। এগুলোও ছেপে দেন আজ্ঞে। বোধ হয় বেশীদিন আর বাঁচব না, শরীর একেবারে ভেঙে এসেছে, তবু আপনার হাতে পড়লে একসঙ্গে ছাপা হবে—এইটে ভেবেও শান্তি পাব।—যদি পারেন, আমি আর বেশী বয়ে আনতে পারলুম না—যদি সময় করে কাউকে আমার বাড়ী পাঠাতে পারেন, যদি কাজে লাগবে মনে করেন অধিকন্তু—আরও কিছু আছে সেগুলোও দিয়ে দিতে পারি। কী আর হবে—তবু যদি কিছু কাজে লাগে। ওখানে থাকলে উনুনে পোড়ানো ছাড়া কোন গতি হবে না।

হয়ত এরপর কিছু উত্তর আশা করেছিল মহেশ। কেমন একটু ব্যাগ্র উৎসুক চোখ মেলেই চেয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। কিন্তু সৌরিপদবাবু তখনও কোন কথা কইতে পারলেন না। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেছে কিন্তু বিস্ময়ের যে শেষ হচ্ছেনা। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছেই যে।

মহেশ যেন খুব একটা কি হতাশা বোধ করল কিন্তু আর কিছু বলল না, ধীরে ধীরে গামছার পুটুলিটা খুলে সেই রকম আগের মতো বিবর্ণ কয়েকটি খাতা ও কিছু এমনিই সেলাই করা কাগজের তাড়া বার করে সৌরিপদবাবুর সামনে কারুকার্য কাজ করা কাঠের তেপায়াতে রাখা বিরাট জরুরী খাতাটার ওপর রাখল। তারপর গামছাখানা জড়িয়ে পাট করে নিয়ে বলল, চলি বাবু তাহলে, নমস্কার। ঠিকানা ঐ খাতাতেই লেখা আছে—যদি দরকার মনে করেন—

এইবার যেন সহসা সজাগ হয়ে উঠলেন,—আর নীরব থাকলে চলবেনা বলেই বোধ হয় প্রাণপণে কথা কইলেন, সৌরিপদ বাবু। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান—সে কি কথা। আমি—অধিকন্তু

আমার খুবই অন্যায় হয়েছে—তবে ঐ যা বললেন, কারণটা ওই, আর ঠিকানাটাও তো জেনে রাখিনি—মানে এইলে অন্তত কিছু টাকা—তা আপনি—এখন কিছু নেবেন নাকি ?

এতখানি জিভ কেটে মহেশ বলল, ছিঃ বাবু, ছেলে অন্তত দিয়েছি সে একরকম কিন্তু তাই বলে তার দাম নিতে পারব না। ও আদেশ আর করবেন না—'

তা একটু বসুন অন্তত—আরও যেন ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন সৌরিপদ, এরই মধ্যে।

না বাবু, ট্রেনটা আবার এগিয়ে দিয়েছে—সাড়ে দশটার গাড়ি। এতটা হেঁটে তাড়াতাড়ি যাওয়া—গাড়িটা পেলে হয় তাই—।

তা অন্তত—মানে বেশ তো, আমার কাছেই থাকুন না দাতটা। অন্তত কিছু খেয়ে যান—এবং বিশ্রাম করে—আমি গাড়ি ঠিক করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

মাপ করবেন বাবু, ছেলে অন্তত দেবার পর—যে বাড়িতে পুষ্যি দেওয়া হয়—সে বাড়িতে আর খেতে নেই : সেও এক রকম ছেলে বেচে খাওয়া হয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বললেন এই ঢের। আমি আসি আজ।

আবারও হেঁট হয়ে একটি নমস্কার করে মহেশ দাঁপুই বেরিয়ে গেল সৌরিপদ বাবুর বৈঠকখানা থেকে। সে ঘরের উজ্জ্বল আলো যেমন জ্বলছিল তেমনই জ্বলতে লাগল, চারিদিকের মহার্ঘ্য গৃহসজ্জার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হল না—শুধু এই সমস্তর মালিক যিনি তাঁর মুখেই সে যেন সন্তানের কালি লেপে দিয়ে গেল, শুধু মনেই নয়—মনে হতে লাগল বাইরের তিনি যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছেন—তাই গত কয়েকটি মিনিটের মধ্যে।

[সিনেমা যখন দেখি তখন চোখে দেখি এবং কানে শুনি। আমাদের মনে এর প্রভাব তাই সক্রিয়, ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু সিনেমা যদি অসুস্থতা ও বিকৃতির বাহন হয় তাহলে? বিশেষ ক'রে কিশোর মনের উপরে সিনেমা কী প্রভাব বিস্তার করবে? এ বিষয়ে গল্প-ভারতীর প্রাক্তন সম্পাদক লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গভীরভাবে ভেবেছিলেন। সেই ভাবনার স্বাক্ষর বর্তমান নিবন্ধ। আজকের দিনে যখন সিনেমা নর-নারী কিশোর-কিশোরীর মনকে নরকের দিকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিচ্ছে তখন এরূপ একটি সুচিন্তিত অন্বেষণাত্মক রচনা সত্যই বিশেষ সময়োপযোগী ও কল্যাণকর হবে।]

সিনেমার প্রভাব

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল যেকোন সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়ালেই দেখা যাবে, দলে দলে তরুণ এবং বৃদ্ধদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও সিনেমা দেখে ফিরছে। বড়দের চেয়ে ছোটরাই প্রশংসায় বা নিন্দায় বেশী মুখর এবং বাড়ীতে বড়রা বলতে না পারলেও, ছোটরা ঠিক বলে দেবে, কোন্ হাউসে কি বই হচ্ছে, ক'সপ্তাহ চলছে এবং তাতে কে বা কারা অভিনয় করছে! শহরে এবং শহরের আশে পাশে যে কোন বাড়ীতে একটু লক্ষ্য করলেই, আমার এ-কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন।

সিনেমা-দেখা আমাদের "নেশা" বনেছে। বিশেষ করে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। এবং আজ একটু ভেবে দেখবার সময় এসেছে, এইভাবে অতি অল্প বয়স থেকে সিনেমায় মেতে ওঠা ছেলে-মেয়েদের দিক থেকে ভাল হচ্ছে কি?

এ-কথা আলোচনা করবার আগে, সাধারণভাবে আগে আলোচনা করা দরকার, সিনেমার সামাজিক প্রভাব অর্থাৎ চলচ্চিত্র বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের সকলের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

আমাদের দেশে কেউ এখনো এই বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা করেন নি—করা দরকার বোধ করেন নি। কিন্তু সিনেমার জন্মভূমি এবং লীলাক্ষেত্র আমেরিকায় এই নিয়ে রীতিমত আলোচনা চলছে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন সব প্রশ্নমালা তৈরী করে দর্শকদের কাছ থেকে তার উত্তর সংগ্রহ করছেন··· ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে প্রেক্ষাগৃহে বসে অনুসন্ধিৎসু সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্ররা আশে পাশের দর্শকদের উপর বিশেষ বিশেষ ছবির আশ্চিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন···এবং এই সব ফলাফল নিয়ে সাময়িক-পত্রে রীতিমত বাচনিক লড়াই চলেছে। আমেরিকার ছবির খবর আমরা অনেকে রাখি কিন্তু তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে তার খবর রাখা আমরা প্রয়োজন বোধ করি না। এখনো পর্যন্ত করি নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে করতে হবে, তাতে কোন ভুল নেই। কারণ সামাজিক মনের ওপর ভাল হোক মন্দ হোক, এত বড় প্রভাব এবং এতো প্রত্যক্ষ প্রভাব আর কোন জিনিসের নেই। এবং প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে এবং বেড়ে চলবেও।

আমেরিকায় এই রকম একটি বৈজ্ঞানিক সোসাইটি সামাজিক মনের ওপর সিনেমার প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা দেখবার জন্যে গবেষণা সুরু করেন। সেই গবেষণা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রথমে একটা তালিকা করেন, ছবির আড়ালে কি আদর্শ বা কি মনোভাব সচরাচর ফুটে ওঠে। আদর্শ ছবি কি হওয়া উচিত সে-কথার আলোচনা এ-ক্ষেত্রে নয়; যে সব ছবি এখন তোলা হচ্ছে এবং দেশ-বিদেশে দেখানো হচ্ছে, সেই সব ছবির মধ্যে আমরা সচরাচর কি সামাজিক আদর্শ, রূপ বা মনোভাব দেখতে পাই? এর যদি একটা তালিকা তৈরী করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে আমাদের ওপর তার প্রভাব কোন্ দিকে কিভাবে এসে পড়ছে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এক হাজার চলতি ছবি থেকে বিশ্লেষণ করে একটা তালিকা তৈরী করেছেন। নীচে সেই তালিকা দেওয়া হলো। অল্প বিস্তর সব ছবিই এই তালিকার কোন না কোন একটা বিষয় ছুঁয়ে আছে। তবে এর যে কোন ব্যতিক্রম নেই তা বলা চলে না। ব্যতিক্রম আছে বলেই, এই তালিকার মর্ম বিশেষ করে আরো ফুটে ওঠে। এখন তালিকাটি দেওয়া হচ্ছে :—

(১) টাকা-কড়ির দিক থেকে যে ঐশ্বর্য, সেটা একটা মস্ত বড় কাম্য জিনিস এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে জীবনের বিশেষ কোন বিরোধ নেই।

(২) বিলাসিতা, বিশেষকরে নারী-সম্পর্কে, সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা।

(৩) রাজা-রাজড়া বা কর্মহীন ধনীদের জীবনের সারাক্ষণের লক্ষ্য হলো নারী-চর্চা…

(৪) বড় সাহেব বা বড় বড় কর্মকর্তা তাঁদের কাজের টেবিলে, কাজের ফাইল ছাড়া আর সব আছে…

(৫) মেয়েরা সাধারণত বাপের আদর পাবে, যে আদর একেবারে অন্ধ…

(৬) মেয়েদের উপার্জনের পুরুষ ছাড়া, আর কোন ক্ষেত্র নেই।

(৭) মৈশ-উৎসব এবং তার আনুষঙ্গিক নারী ও মদ বর্তমান নাগরিক জীবনের অপরিহার্য স্বাভাবিক অঙ্গ।

(৮) জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা হলো, যৌন-আকর্ষণ - একমাত্র আকর্ষণও বলা যেতে পারে।

(৯) আত্মা বা ধর্ম-সংক্রান্ত জিনিস, বাতিক বা হাস্যকর কিম্বা পাগলামীর মজার প্রকাশ…

(১০) দারিদ্র্য এবং স্বাদেশিকতা উচ্ছ্বাসের জিনিস…শুধু নায়িকার সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্যে তার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা।

(১১) গুরুজনকে অপমান করা, সম্মানীয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো, সুস্থদেহে অকারণ পাগলামী এবং ভাঁড়ামি এগুলো হলো হাসির প্রধান উপকরণ…

(১২) জগতের মধ্যে সবচেয়ে সহজ-লভ্য জিনিস হলো, প্রেম। এবং প্রেম হলো, যাকে প্রথম দেখে ভাল লাগলো, তাকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরা।

(১৩) প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্য্য শুধু তখনই আছে, যখন নায়ক নায়িকাকে গোপনে চুম্বন করবেন বা একজনের বিরহে অপরজন আত্মহত্যা করতে ছুটবেন।

(১৪) পৃথিবীতে সবাই গান গাইতে পারে এবং তার জন্যে সময় বা স্থান বা লগ্নের কোন প্রয়োজন নেই।

এই যে বিশ্লেষণ চিত্রটি ওপরে দেওয়া হলো, এর প্রতিক্রিয়া সামাজিক মনের ওপর কখনই ভাল হতে পারে না। য়ুরোপের একজন বিখ্যাত সমালোচক সেইজন্যে সিনেমা সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছেন "Cinema at it's worst reflects an impoverished hedonism, an appalling absence of cultural background, or international understanding and a dangerous escapism from the social problems….

জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের নিষ্ঠুর সমস্যার হাত থেকে এই যে পালিয়ে বেড়ানো…এর মধ্যে আবার একটা বিরাট "জোচ্চুরী" আছে। কারণ প্রত্যেক জিনিসটিকে ছবিতে জীবনের বাস্তবরূপ এবং সমস্যার আকারেই দেখানো হয়। কিন্তু সিনেমার এই বাস্তবতা এবং সমস্যা-বিলাসিতা একটা বিরাট রাঙতা মোড়া জিনিস যার তলায় সস্তায় সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু নেই। অবশ্য য়ুরোপ এবং আমেরিকার কোন কোন ডিরেক্টর অথবা প্রোডিউসার সিনেমার এই প্রচলিত রূপকে বদলে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করছেন যার মধ্যে সমাজ, দেশ এবং বাস্তবতা রোমান্স বর্জিত বিরল-সত্যের মত ফুটে উঠছে তবে তার সংখ্যা এখনো অল্প। আমাদের দেশের মতই ওদের দেশেও, ছবির যাঁরা মালিক, তাঁদের দৃষ্টি শুধু পড়ে আছে টিকিট ঘরের দিকে। তাই ওদের দেশেও ডনি Rogr manvile কে বিলাপ করে লিখতে, "The vicious circle of the box-office prevents the healthy development of the documentary fiction….

আমরা স্মরণ করতে গর্ব অনুভব করছি যে সেদিন প্রবাসী-ভারতীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা শুধু ভারতে নয় বিশ্বের বহু স্থানে বিশেষ সুনাম ও গৌরব অর্জন করেছিল।

এই কৃতিত্বের মূলে প্রবাসী-ভারতীর সেদিনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত সহচর ডঃ কালিদাস নাগ-এর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

তারপরই আমাদের আগ্রহে এবং অনুরোধে তিনি প্রবাসী-ভারতীতে ধারাবাহিক ভাবে "রবীন্দ্র যুগ" লিখতে আরম্ভ করেন। এই অসামান্য ও তথ্যপূর্ণ রচনাবলী রবীন্দ্র অনুরাগীদের প্রচুর আনন্দ দান করে এসেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আকস্মিক তিরোধানের জন্য ডঃ নাগ "রবীন্দ্র যুগ" শেষ করে যেতে পারেন নি। আমাদের কাছে তাঁর যে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ছিল তার কিয়দংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

সম্পাদক—প্রবাসী-ভারতী

রবীন্দ্র-যুগ

ডঃ কালিদাস নাগ

প্রমথ চৌধুরীর যুগকে ভালো করে বুঝতে হলে ইন্দিরা দেবীর অবদানটিও মনে রাখা দরকার। তিনি তাঁর সহধর্মিনীও বটেই, সহকর্মিনীও ছিলেন। স্বামীর তিরোধানের পরেও তিনি একনিষ্ঠ থেকে সেযুগের বিচারধারা সমানে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। তাঁর পিসীমা স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন নারী সাহিত্যিকাদের অগ্রণী ছিলেন, কাব্যে, নাটকে, গল্পে ও গানে, উপন্যাসে ও বিজ্ঞানে, তেমনি ইন্দিরা দেবীও অনেক ক্ষেত্রে নীরবে কাজ করে গিয়েছেন, যদি উনি কিছু লিখে যান তবেই আমরা জানতে পারবো। ফরাসী সাহিত্যে তিনিও পারদর্শিনী, এবং সেক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীকে তিনি কত সাহায্য করেছেন কে জানে! তাঁর পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর জননী জ্ঞানদানন্দিনী (এঁদের চিঠিপত্র সম্প্রতি 'বেণে' বেরিয়েছে দ্রষ্টব্য)। তাঁদের একমাত্র কন্যা ইন্দিরাকে নতুন পদ্ধতিতে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং কন্যাতে সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। পুরোনো 'ভারতী' ও 'সাধনা' ঘাঁটলে এসব খবর পাওয়া যাবে। সঙ্গীত শাস্ত্রেই উনি বিশেষজ্ঞ, আর তাঁর রচিত ও সংশোধিত স্বরলিপি ছাপা হলে এখনকার শিক্ষার্থীদেরও অনেক উপকার হবে। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ যেসব গান গাইতেন, বিলেত থেকে ফিরে বিদেশী ছন্দ ও সুর কেমন করে কোথায় নিজের গানে ঢুকিয়েছেন যেসব বিষয়ে সন্ধান ইন্দিরা দেবী দিয়ে গেছেন। আর 'বিচিত্রা'র বৈঠকে (সৌভাগ্যক্রমে আমি উপস্থিত ছিলাম) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের demonstrative lecture-এ উপলক্ষে তিনি পিয়ানো বাজিয়েছেন, একজন (হয়ত গোয়ানিজ ফিরিঙ্গি) বেহালা ধরেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্প্যানিশ, জার্মাণ ও ইংরেজি সুর গেয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। Swinburne-এর একটি lyric আগাগোড়াই গেয়ে গেলে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। আর ইন্দিরা দেবী কিছু কণ্ঠে ও কিছু যন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে আরো কিছু বিদেশী গান মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে মনে হয় স্কটল্যাণ্ডের সুরস্রষ্টা কবি বার্ণস ও আয়ারল্যাণ্ডের সুর (Irish melodies) রবীন্দ্রনাথের

সমসাময়িক সুরকারদের মধ্যে আরো দুজনের কথা মনে পড়ে যারা পাশ্চাত্য সুরের ছন্দ ও রূপ বাংলা গানে দিয়ে গেছেন। একজন সুরশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অন্যজন অতুলপ্রসাদ সেন। এঁদের সম্বন্ধেও ভালো রকম আলোচনা হয়নি। কিন্তু দিলীপ কুমার রায় গেয়ে শুনিয়েছেন। হয়ত কিছু লিখেছেন। ইন্দিরা দেবীর মতো সরলা দেবীও যন্ত্র সঙ্গীতে সুদক্ষা ছিলেন। কবি তাঁকেও collaborate করতে ডাকতেন। (সরলা দেবীর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য) ১৮৯৬ সালে ওয়াচার সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেস যখন বসে তখন রবীন্দ্রনাথ ৩৫ বছরের যুবক। যন্ত্র নিন্দিত কণ্ঠে আমাদের জাতীয়সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' নিজের অনুযায়ী অনুযায়ী সুর দিয়ে সেই বিরাট জনতাকে মুগ্ধ করেছিলেন। পরবর্তী অংশের সুর ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর দেওয়া শুনেছি। (রাখীমালা দ্রষ্টব্য)। পরে সরলা দেবী পাঞ্জাবী নেতা রামভজ দত্তচৌধুরীকে বিবাহ করে হিন্দী, পাঞ্জাবী ভাষা ভালো রকম শিখেছিলেন এবং নতুন ধরণের ভজন কীর্তনের সুর চয়ন দিয়ে গেছেন। 'জয় হিন্দুস্থান' ঐকতানে সুরে তিনি গাইয়েছেন। 'বীণাইবীর সভায় তিনি অনেক স্বদেশী গান ও গাওয়াতেন। আর 'বঙ্গভান' তার স্বরলিপি লিখে দলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে প্রতিমা দেবীকেও এই সূত্রে স্মরণ করা উচিত। কারণ দুজনে মিলে তাঁরা 'সংগীত সঙ্ঘ' ও 'মানস সংগীত পত্রিকা' সুরু করে অনেক প্রাচীন ও আধুনিক জোড় গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে গেছেন। এই সংগীতের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রসংগীতের ধারা এক অভিনব বিকাশ আমরা সেকালে দেখেছি। উপভোগ করেছি, কিন্তু বয়সের বুঝতে শিখেছি। অর্থাৎ 'গীতবিতান যুগের গান (সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য) বিলেত যাত্রার আগে যেভাবে ফুটেছিল, ১৯১৩।১৪ সাল থেকে ১৯২৩।২৪ পর্যন্ত দশ বছর ধরে যেন আর এক নতুন পাতে রয়েছে। 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' থেকে সুরু করে 'গীত পঞ্চাশিকা' ও 'রক্ত করবী' পর্যন্ত বিচিত্র ছন্দ ও সুর বিন্যাস সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। আর পেশাদারী ওস্তাদদের আহ্বান করে নতুন সৃষ্টি পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। 'সংগীতের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে নিজে তাঁর নতুন রচনা নতুন ভাবে গেয়ে রামমোহন লাইব্রেরীতে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। (অবশ্য কড়া সমালোচনা থেকেও তিনি নিষ্কৃতি পাননি)। সুরকার রবীন্দ্রনাথের উপর ভাষ্য করে যেতে পারেন একমাত্র ইন্দিরা দেবী। তাঁর কাছ থেকে আদায় করবার মতো চেলাদের লাগিয়ে দেওয়া উচিত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকালমৃত্যুতে ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেছে। কারণ সত্যিই তিনি ছিলেন রবীন্দ্র সংগীতের ভাণ্ডারী। তাঁর কাছে যখনি কোন প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছি তিনি শুধু বুঝিয়ে দিয়েছেন তা নয়, হরদম্ভরা উদার কণ্ঠে যে কোন 'সুরের' রবীন্দ্র সংগীত দিনেন্দ্রনাথ গেয়ে শোনাতেন। আর মেজাজ ভালো থাকলে নিজে দিয়ে আমাদের প্রিয় রবীন্দ্র গীতগুলির স্বরলিপি লিখে দিতেন। দিনু বাবু যেমন তাঁর কণ্ঠে আর এস্রাজে সব সুর ধরে নিতেন, ইন্দিরা দেবীও মনে ধরে রাখতেন। আর নিখুঁত স্বরলিপি করে রেখে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। অনেকেই ভুলে গেছেন যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথও ভালো এস্রাজ বাজাতেন। এবং তাঁর দাদা শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ তাঁর বৈঠকখানায় বড় বড় কালোয়াতদের নিমন্ত্রণ করে এনে উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনবারও সুযোগ দিতেন। তাঁদের সেই ঐতিহাসিক ভবানন বাড়ী ও শিল্পীদের তীর্থ স্থান দক্ষিণের বারান্দা সূত্রে মিলিয়ে গিয়েছে। (অধুনা 'রবীন্দ্র ভারতীর হল)' শুধু সেতুর নীরব সাক্ষী হয়ে আছে দুইখানি অপূর্ব বই ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে'।]

১৯১৪ সালের জানুয়ারীর (২১ই মাঘ) ভোরে আদিসমাজে প্রার্থনা সভায় গিয়ে বসেছি। সন্ধ্যায় ও পাঠ দিতিমোহন সেন করলেন। আর যেখানে মহর্ষিদেব বেদীতে বসে উপাসনা করেছেন, সেইখানে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত উদ্বোধন সংগীত নিজে গাইলেন। 'ভোরবী' 'ভৈরবীর' অপূর্ব সুরবিন্যাস—'ভোরের বেলায় কখন এসে, পরশ করে গেছ হেসে' যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় মহর্ষি ভবনের বিশাল প্রাঙ্গণে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রহ্ম সংগীতের আসর জমে উঠল। তার মধ্যে পাশোয়াজও আছে। আবার শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (সুকুমার রায়ের পিতা U. Roy) বেহালায় সংগত করেছিলেন। একজন বেরিয়ে দিলেন বিখ্যাত য়ুরোপীয় শিল্পী Mot Allen একটি কোণে স্তব্ধ হয়ে শুনছেন। এমনি অনেক পাশ্চাত্য গুণগ্রাহী রবীন্দ্র সংগীত শুনতে জোড়াসাঁকোয় আসতেন ও শান্তিনিকেতনেও যেতেন—তা বহুকাল দেখেছি। উপাসনার পরে রবীন্দ্রনাথ গল্পে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাও যেন এক সুরলোকের মহাকাব্য! বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টারা কিভাবে ছন্দে সামগান করে উঠতেন তা' এইসব প্রেরণার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছি। বোলপুরের ছেলেমেয়েরা সমবেত সংগীতগুলি নিখুঁতভাবে গেয়ে গেল। তারপর চরম বিস্ময়—রবীন্দ্রনাথ একটি মেয়েকে একক সংগীতে নামালেন—কুমু গুপ্ত (সাহানা দেবী)। তিনি প্রথম শোনালেন 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে'। কত রকম সুর তার মধ্যে মিশে গেছে। বিশ্লেষণ করে তা' বোঝাবার নয়। সকারুণীর একটি পদ—'তবে আকাশ কেন এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে'—এই পদের মীড় শুনে শুষ্ক গগনেন্দ্রনাথ তাঁর পার্শ্বচর পণ্ডিত দিনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, "দিনেশবাবু, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ত লিখলেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় আর কথায় কত বড় জিনিষ প্রকাশ করা যায়, বাংলায় লিখে সেটা বোঝাবেন কি?"

কবির দিব্য ভাবনের অপূর্ব রূপ সাহানা দেবী আবার ফোটালেন মিশ্র সিন্ধু রাগিনীতে আর একটি গান গেয়ে। 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু।' রবীন্দ্রনাথ সুর দেওয়ামাত্র তাঁর কণ্ঠ থেকে সুর ধরে নিতে পারতো এই মেয়েটি, তাই সাহানার কাছে এসব গান যারা শোনেনি, তারা সবটা বুঝবে না। (বহুকাল পরে সেদিন পণ্ডিচেরীতে বন্ধু দিলীপ কুমারের ঘরে সাহানা দেবীকে আবার গান গাইয়েছি)।

এই সময়ে আমার ভাই গোকুল আমার সঙ্গে কবির কাছে সলজ্জমে যেত। সেও অতুল বসু তখন Percy Brown-এর চেলা হয়ে Govt. School of Arts-এর কাজ করে। আর রবীন্দ্রনাথের একটা পোর্ট্রেট সে আঁকবে এই তার দুরাভিলাষ। গোকুলই প্রথমে এঁকেছিল, এবং তখনি কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ সেখানি কিনে নেন। গোকুল শিল্পী হলেও অভিনয় নৈপুণ্যও দেখিয়েছিল ও সি. পাকুলীর ভাই-এর সঙ্গে। আর কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামতেই আমার প্রবীণ বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ঠাট্টা করে বললেন, "তোমার ভাই গোকুলের লেখায় কথিকার ছোঁয়াচ লেগেছে। "সত্যি তার প্রথম ও শেষ উপন্যাস 'পথিক' শেষ করে যখন গোপনবাসায় শুয়েছিল, তখনো গুরুদেবকে স্মরণ করে "ওগো পায়ে চলার পথ" পথিকের প্রথম কথাই উদ্ধৃত করেছে। রবীন্দ্র সংগীত আমি গাইতে সুরু করলেই গোকুল বেহালায় অনুসরণ করতো। যন্ত্রানু ও যন্ত্রভাষী আমার এই ভাইটিকে বন্ধু মনীন্দ্রলাল বসু ও দিনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতি কয়েকজন চিনেছিলেন। আর আপনা থেকে তাকে কাছে টেনে স্নেহাশীষ জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ও নব্য ধারা নিয়ে অনেক কিছু বলবার আছে। 'সবুজপত্র' যুগ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে নিয়ে অর্থাৎ মেসের ঝি, কয়লা খনির কুলি, আর বিলাসী কলকাতার স্নান নিয়েও যে সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে, তার স্বাক্ষর রয়ে গেল শরৎসাহিত্য, 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' যুগ পর্যন্ত।

শরৎচন্দ্র জন্ম ১৮৭৬ মৃত্যু ১৯৩৮ ১৬ই জানুয়ারী।

১৮৯৩ সালে অর্থাৎ ১৭ বছর বয়স থেকে শরৎচন্দ্র ছোটগল্প, অসমাপ্ত উপন্যাস ইত্যাদির কয়েক ছাত্র

বন্ধুদের শোনাতেন। তা আমরাও ভাগলপুরে শুনেছি। এন্ট্রান্স পাশ করে তি এন. জুবিলী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, কারণ ১৮৯৪ সালে মাতৃবিয়োগ ও মামার বাড়ীর 'ব্যবহারে' মনঃক্ষোভ করেন। ১৮৯৭।৯৮ অর্থাৎ ভূমিকম্প ও প্লেগের বছর শরৎচন্দ্রের পিতা, পুত্র ও এদের নিয়ে ভবঘুরে দিনপাত করছেন। অথচ শরৎ আলমপুরের ক্লাবে 'মৃণালিনী', চিন্তামণি', ও 'জনা' অভিনয় করে ও গান গেয়ে ১৯০০ সালে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। মজঃফরপুরে অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে অতিথি হলেন। ও স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর বন্ধুত্ব ('শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব) ও সন্ন্যাসী ভাই (এক ভাই বেলুড় মঠে যোগ দেন)। ১৯০৩ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে ও কলকাতায় ভবানীপুরের বাসায় (উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদার বাড়ী)। ভবানীপুর থেকেই (কোনো সাহায্য যোগাড় করে ?) ব্রহ্মদেশ যাত্রা (১৯০৩) ও সেখানে ১৩ বৎসর কাটান (১৯১৬ সালে ১১ই এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ) এবং বহু অরুণ সেনের নিমন্ত্রণে বিনয়চন্দ্র সেনের বেকালার বাড়ীতে আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। তখন থেকে ১৯৩৬ সালে যখন Bengal প্রতিষ্ঠা করি, তখন পর্যন্ত কুড়ি বছর ধরে তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি, আমার ভাই গোকুল আমার হিদিমবিদ্ বাড়ীতে শিবপুরে থাকতেন বলে বাজে শিবপুরের বাড়ীতে সর্বদা যেত। আর আমাকেও খবর দিত অপরিণত তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক দয়া দেখে সেকালে মুগ্ধ হয়েছি। গোকুলের ইচ্ছা ছিল শরৎচন্দ্র ও 'কল্লোল যুগ' নিয়ে সে কিছু লেখে। কিন্তু 'পথিক' শেষ করেই সে পথা নেয়। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। শিবপুর থেকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর অনুরাগী হিসেবে 'নারায়ণ' পত্রিকায় কিছু লেখা দেন। যদিও তিনি 'ভারতবর্ষেই' বাঁধা পড়েছিলেন। (মাসিক ১০০৲ টাকা দক্ষিণা) ১২।২।১৬ তারিখের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি দ্রষ্টব্য।

১৯১৯ সালে বেরাল হল পল্লীগ্রামে থাকবো ও ১১০০৲ টাকা, বিয়ে পানিত্রাস গ্রামে তাঁর বড়দিদি (অনিলা দেবীর কাছে) রূপনারায়ণ তীরে সুন্দর কুটির গড়ে অনেকদিন কাটিয়েছেন। পরে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় অধিনী দত্ত রোডে ১৯৩৪ এর জুলাই-এ পাকা বাড়ী তৈরী করেন। আর সে বাড়ী ৫৭ বছর ভোগ করে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৯৯এ পরলোক গমন করেন।

এখনো কেউ ভালো করে লেখেননি ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র ও সেখানে তাঁর সাহিত্য চর্চার। ১৩ বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার অর্থাৎ ১৯১২ ও ১৯১৩ শেষভাগে অল্প দিনের জন্যে তিনি কলকাতায় আসেন। কারণ তখন কবি পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায় (১৩১৯।২০, ১৯১২।১৪) 'গ্রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' ছাপা হয়ে খুব সাড়া পড়ে। আবার (১৩২০।২২) অর্থাৎ ডি. এল. রায়ের মৃত্যুর পরেই জলধর সেনের সম্পাদনায়) 'বিরাজ বউ', 'পণ্ডিতমশায়', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি ছাপা হতে লাগল। ১৯০৩ সালে ব্রহ্মদেশ যাত্রার আগেই কিভাবে কতোটুকু কোন বই লেখা সুরু করেছিলেন, তা তিনিও বলেননি, বন্ধুরাও কেউ লেখেননি। কিন্তু বেনামীতে (মামা সুরেন গাঙ্গুলীর নামে) একটি গল্প লিখে 'সুকুমার' পুরস্কার পেয়েছিলেন ('মন্দির' ১৩১০ সন)। ৫৲ টাকা পুরস্কারেই মহাখুশী। যেমন ভারতবর্ষের মাসিক ১০০৲ টাকাই মনোমত (কারণ সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে রেঙ্গুনের চাকরী ছেড়ে আসেন)। ১৩১৪।১৯০৭ 'ভারতী'তে ছেলেবেলার রচনা 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। ১৩১৯।১৯০২তে 'যমুনায়' (গল্পটি) বেরোয়।

তারপর সাহিত্য পত্রিকায় বাল্যস্মৃতি 'কাশীনাথ' 'অনুপমার প্রেম' ও 'হরিচরণ' প্রভৃতি কাঁচা লেখা জোর করে তুলেন সভাপতি ছেলে বেলায় শরৎচন্দ্র বিশেষ মুষ্ক হয়েছিলেন। ১৩১৮-১৩২১ (১৯১৪-১৫)

'যমুনায়' গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ (নারীর মূল্য, নারীর লেখা, কানকাটা, গুরুশিষ্য সংবাদ) ছাপা হয়। ১৩২০ আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতবর্ষ পত্রিকা'। এবং 'চরিত্রহীনের' প্রথম পলতা তিনি পাঠান, কিন্তু তাঁরা সাহস করেননি প্রকাশ করতে। তবে 'বিরাজ বউ' তাঁরা ছাপেন। আর ১৩২০-২১শে (১৯১৪) যমুনায় 'চরিত্রহীন' ছাপা হয়। ১৩২১ থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'পণ্ডিত মশায়' ও তিনটি গল্প। 'বিরাজ বউ' ও 'বিন্দুর ছেলে' বই হয়ে বেরোল। আর এম. সি. সরকার এও সন্স 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশায়' ছাপেন। এখন থেকে লক্ষ্মীর সুনজর দেখা দিল। 'বড়দিদি' পুস্তকারে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হবে ও 'বিরাজ বউ' ১৯১৪-এ বেরোয়। ১৯২০ সালে শিশির পাবলিশিং হাউস 'যমুনের মেয়ে' ছাপে তাঁর রেঙ্গুন থেকে ফেরার পরে। তার আগে এম. সি. সরকারই (আগষ্ট ১৯১৪) একসঙ্গে 'পণ্ডিত মশায়', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি,' 'চরিত্রহীন' ও 'নারীর মূল্য' ছেপে দেয়। তাঁর রচনার যথাযথ বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। এবং সে বিষয়ে গবেষণে নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত মন্তব্য ও রচনা সংগ্রহও করা উচিত। সমসাময়িকদের মন্তব্যও সংগৃহীত হয়নি। তিনি চলে গেছেন প্রায় ২০ বছর। খুব দেরী হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করাউচিত।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হবে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ক্লাবে। ১৯১৫ সালে কবির জন্মদিনে খবর পেলাম যে তিনি জাপান যাবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তার আগেই 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সকলকে চালাবার ভার দিলেন (১৯১৩)। তার আগেই শরৎচন্দ্রের একটা বেনামী রচনা (ভারতী) পরে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে করেছিল। আবার শরৎচন্দ্র যখন 'নারীর মূল্য' লিখেছেন, তার কিছু পরেই ১৯১৪।১৫।১৬ 'সবুজ পত্রে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথও 'স্ত্রীর পত্র, 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি রচনার ভেতর দিয়ে নারীর জীবনের নতুন মূল্য করে গেছেন। তা নিয়ে বিতর্ক ও প্রতিবাদও কম হয়নি (বিপিনচন্দ্র পালও ছাড়েননি 'যুগান্তরের পত্র' দ্রষ্টব্য)। ইংরেজিনবীশরা ঠাট্টা করে বলেছিলেন ইবসেনের নায়িকাদের ছায়া পড়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর। আমরাও Immitessance of Ibsenism পড়া সুরু করলাম। রুশ নাট্যের সেবায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের রচনা তুলনা করা হয়েছিল, (১৯১২ সালে), তেমনি বিলাতপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের নতুন রচনার মধ্যে ইবসেন প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যিকদের ছোঁয়াচ সমালোচকরা পেতে সুরু করলেন। অর্থাৎ সাহিত্য মানে শুধু ইংরেজি সাহিত্য রইল না, Continental literature (যেন বেগে জলের মতো) বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলে এটা। এতো অস্বীকার করা যায় না।

'বিচিত্রা ক্লাবের সঙ্গে সুকুমার রায়-এর নেতৃত্বে 'মণ্ডে ক্লাব (Monday club) গড়া হল। অথচ বিষয় গুরুগম্ভীর, আলোচনা হত। যথা : রামমোহন ও টুরিজ্ম।' সুকুমার এই সময়ে 'পঞ্চকল্পক্রম' রচনা শেষ করে শোনালো। কবির সঙ্গে নিয়মিত আমি যাই এবং সত্যেনদত্ত ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯১৪-র ৮ই মে মাসে তাঁর ৫১ বছরের জন্মোৎসবে প্রণাম করতে গিয়ে শুনলাম, যে যে মাসে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেছেন হিমালয় অভিজ্ঞান বলাকার সন্ধানে। ইবসেনের সব নাটক তখন পড়ে শেষ করেছি। মেটারলিঙ্কে Essays on Modern Drama এবং Russian Literature (যে ১৯১৭ Revolution-এর ৩ বছর আগে) বিষয়েও আমরা সজাগ হয়ে উঠেছি। Tolstoyএর কিছু রচনা পাঠ ও অনুবাদও সুরু হয়েছে। Turgenev-এর 'Sports man's skets ইত্যাদিও আমাদের সামনে হাজির। ২১শে মে ১৯১৬তে 'সবুজ পত্রে' প্রথম সংখ্যায় কবির নতুন সুর 'ও-রে নবীন, ওরে আমার কাঁচা।'

শান্তিনিকেতন থেকে এই সময়ে C. F. Andrews ও তাঁর বন্ধু W. W. Pearson দু'জনেই 'প্রবাসী' সম্পাদকের কাছে আসা যাওয়া করতেন। Andrews এর লেখা Modern Review-তে বেরতে আরম্ভ হয়েছে আর Pearson সাহেব আমাকে Browning ভক্ত দেখে খুশী হয়ে ব্রাউনিং ভক্তের ইংরেজি কবিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জুন মাসে কবে কলকাতায় এসেছিলো সবুজ পত্রের কাজে। সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। আর এপ্রিল মাসে (২০শে রবিবার) বোলপুরে প্রথম অচলায়তন অভিনয় নিয়েও আলোচনা হল। কবি আচার্যের ভূমিকায়, দিনুবাবু পঞ্চক, পিয়ার্সন সাহেব হরিজনদের সোনাপাণ্ডে, সেজেছিলেন। বন্ধুবর অজিত চক্রবর্তী এই সময়ে শান্তিনিকেতনের কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় জীবনের শেষ পাঁচ বছর (১৯১৪-১৮) কাটিয়ে যান, কারণ তাঁর প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩-১৯০৫) ৭০ বছরে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের ইতিহাস যার জীবনে বাঁধা—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবনী লেখা। (১৮১৭-১৯০৫) এ যুগেও বিশেষজ্ঞ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁর বাড়ীতে আমরা দু'জনে গিয়ে দীর্ঘকাল তত্ত্ব আলোচনা করেছি তার হিসেব নেই। শুধু তার কিছু পরিচয় রেখে গেছে অজিত চক্রবর্তীর 'দেবেন্দ্র নাথের ভূমিকায়। (দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনু বাবু একাজে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য করেছিলেন)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে অজিত কুমারকে সাহায্য করতেন তাঁর রচনাদি 'প্রবাসী' ও 'Modern Review'তে নিয়মিত ছেপে। পাতা হিসেবে দু'টাকা ও চার টাকা রেটে সাহিত্যিক-দের দক্ষিণা নিয়মিত তিনি দিয়ে যেতেন।

১১ই আগষ্ট (১৯১৬) মেয়ো হাসপাতালের ছাদে বৈঠক জমালেন। তাঁর আবৃত্তি ও গানের মধ্যে শুনলাম রবীবাবু তাঁর গলেশ রেকর্ডিংএর ব্যবস্থা করেছেন। এশিয়ার প্রথম নোবেল লরিয়েটের কণ্ঠস্বর রাখবার চেষ্টা ১৯১৪ থেকেই হয়েছিল, কিন্তু রেকর্ড ইত্যাদি কতটা রক্ষা পেয়েছে জানা নেই। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও কবির একদিন দেখা হল, আর কবির দাদা দ্বিজেন্দ্র নাথের যুগের সাহিত্যিক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমার মাষ্টার মহাশয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরু বলে স্নেহভরে ডেকে তাঁর নতুন আবিষ্কার বাঙ্গার বছরের পুরোনো বাংলার বিষয়ে অনেক কথা বললেন। এম. এ পরীক্ষার দাপটে আবসরা হয়ে ১৩ই আগষ্ট সেজ মামার নিমন্ত্রণে মাদ্রাজে রওনা হলাম। ঠিক পনেরোই আগষ্ট ১৯১৬। ভারত সাগরের এপারের প্রাচীন বন্দর থেকে দেখতে চেষ্টা করেছি আর সাগরের ওপারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুনের ধোঁয়া যেন আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে। কবিগুরু কিছু প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন সুরের অমৃত "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

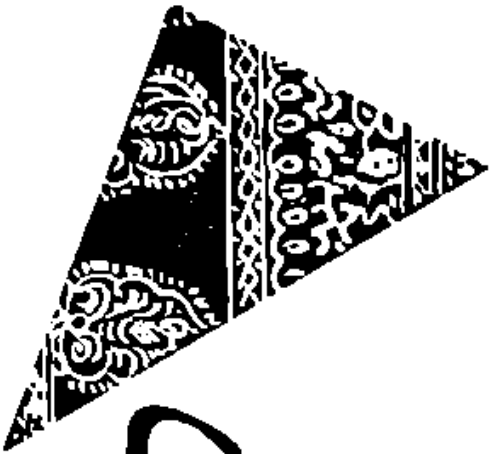

শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা
আসাম
উড়িষ্যা

সচিত্র সংযোজন

গল্প ভারতী শারদীয় ১৩৭৫

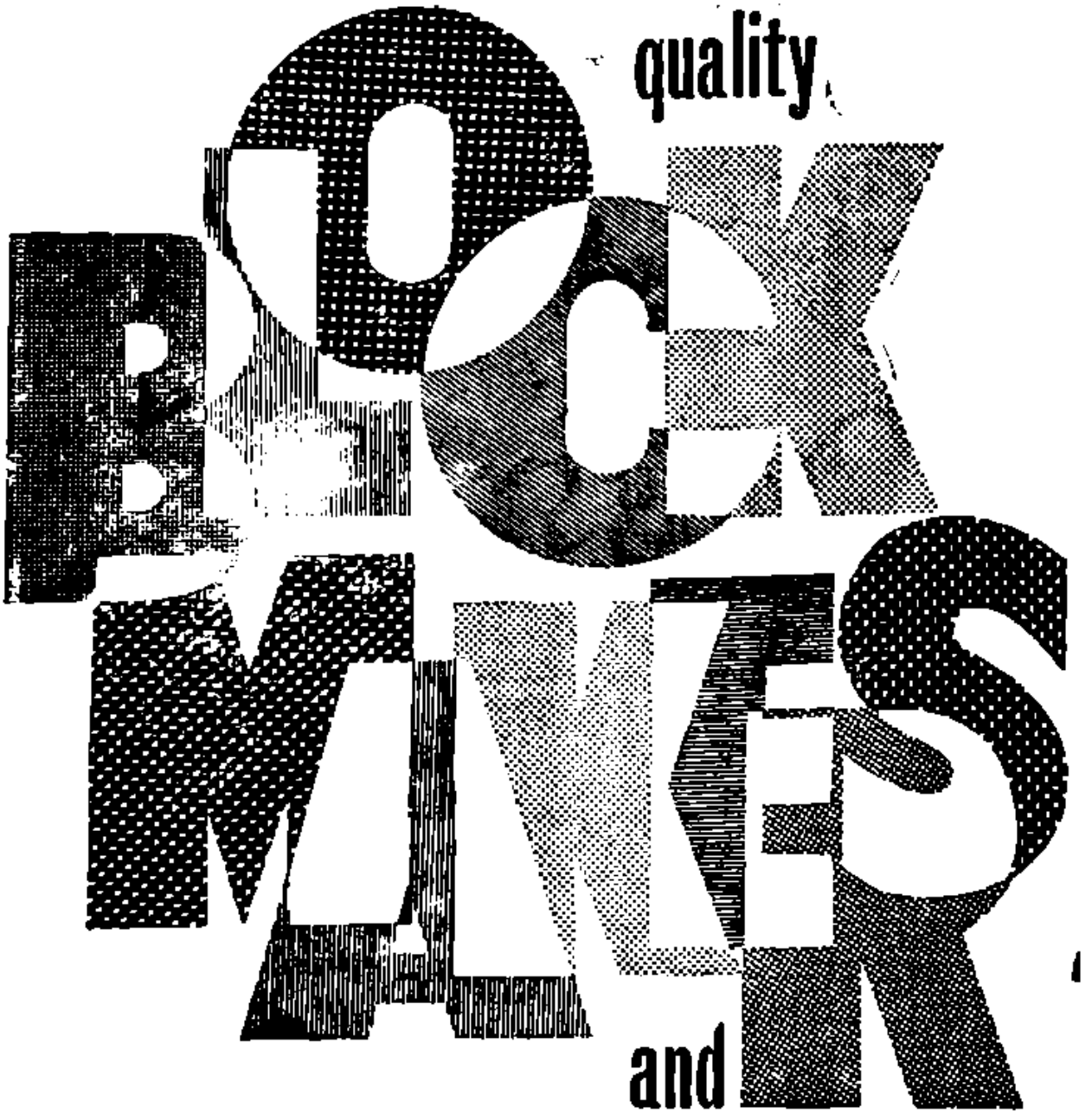

PRINTERS

COMMERCIAL REPRODUCTION PRIVATE LIMITED

7, Dacres Lane, Calcutta-1. Phone-23-1117 Branches. New Delhi

বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতি

—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলা দেশের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি যে একদিন বৃহত্তর বাঙ্গালী সংস্কৃতিরই অঙ্গ ছিল, তাহা আমরা ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছি। অবশ্য বৃহত্তর বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলিতে আজ বাঙ্গালী জীবনের যাহা সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই মনে করিলে চলিবে না। প্রধানতঃ পাল সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে একদিকে কাশী কোশল একদিকে অঙ্গ এবং আর একদিকে কামরূপ পর্যন্ত যে সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাতেই পূর্বভারতীয় অঞ্চলে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিবার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে মাগধী প্রাকৃত এবং তাহা হইতে মাগধী অপভ্রংশ ভাষা এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া প্রচার লাভ করিয়া তাহাই বিদগ্ধ সমাজের অনুশীলনের বিষয় হইয়াছিল। এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতেই রাজনৈতিক ঐক্য সূত্রেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তুর্কী বিজয়ের পর হইতেই সেই ঐক্য বন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে হইতে শেষপর্যন্ত ইংরেজ শাসনের যুগে তাহা বিচ্ছিন্ন হইতে গিয়াছিল। যদিও এ কথা সত্য রাজনৈতিক জীবনের সংহতি দৃঢ়তা লাভ করে তথাপি এ কথাও সত্য যে ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী প্রাচীনকাল হইতেই রাজনৈতিক জীবনের উত্থান পতন নিরপেক্ষ ভাবেই তাহার সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে। কারণ যাহারা দেশে সিংহাসনের অধিকার লইয়া ব্যগ্র থাকিতেন, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংহতি সৃষ্টি করিবার সহায়ক হইতে পারিতেন না। তবে ইতিহাসে তাহার ব্যতিক্রমও আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট অশোক তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পূর্বভারত অঞ্চলে পালসম্রাটগণও সমগ্র পূর্বভারত অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং কামরূপ ব্যাপিয়া এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে সহায়ক হইয়াছিলেন। তাহারই ভিত্তির উপর এই বিস্তৃত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ইহার মধ্যে আমরা আজিও ঐক্যের উপকরণগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

ভাষা এবং ধর্মই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিবার প্রধান সহায় হইয়া থাকে। ভাষা তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পূর্বভারতীয় অঞ্চলের আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা মাত্র মাগধী প্রাকৃত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, কেহ কেহ গৌড়ীয় প্রাকৃত নাম এর ভাষার কল্পনা করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতেই যে আধুনিক বাংলা ভোজপুরী ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার জন্ম হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই সূত্রে এই অঞ্চলের যে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল নানা সূত্র হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হইবার ফলে ভাষার বিভিন্ন আধুনিক আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঐ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে একই ক্ষেত্র হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলার খনার বচনগুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয় সকলেই নিঃসন্দেহ। তবে অর্থ বোধগম্য হইবার জন্য ইহাদের ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। খনার বচনগুলি কেবলমাত্র আজ বাংলাদেশেই

যে প্রচলিত আছে তাহা নহে, প্রাদেশিক ভাষায় উড়িষ্যা এবং আসামেও প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একই অখণ্ড ক্ষেত্র হইতেই যে ইহাদের উদ্ভব ইহাদিগ ইহাদের ভাষা হইতে তাহা আজিও বুঝিতে পারা যাইবে।

বাংলা	ওড়িয়া
হাত বিশে করি ফাঁক।	হাত বিশো করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুতে রাখ।	অহ কঠল পুথি রাখ।
গাছাগাছি ঘন সবে না।	গছ গছলি ঘন হেবো না।
ফল তাতে ফলবে না।	গছ হেব ত ফল হেব না।

এইবার অসমীয়া ভাষার একটি ডাকের বচনের সঙ্গে একটি বাংলা ডাকের বচনের তুলনা করিলেও দেখা যাইবে, ওড়িষ্যার সঙ্গে এই বিষয়ে বাঙ্গালীর যে সম্পর্ক ছিল, আসামের সঙ্গে তাহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

বাংলা	অসমীয়া
পানী ফেলিয়া পানীকে যায়।	পানীর পেলাই পানীকে যায়।
আন পুরুষে আড়ে চায়।	তাকে বলে ভাইর না দিবারাই।
তারে নাহি বলিহ সতী।	
যজনে সে দুষ্ট যতি।	

জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের এমন একটা ক্ষেত্র আছে, যেখানে মানুষে মানুষে ঐক্য আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় কারণ, তাহাতে বহির্মুখী কোন কৃত্রিম অলঙ্করণ থাকে না। খনার কিংবা ডাকের বচনগুলি যেমন কতকটা তেমনই জাতির লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও তাহার তেমনই সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে বাংলাদেশের প্রচলিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া ইহার ওড়িয়া পাঠের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখাইতেছি তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কৃত্রিমতা বহির্ভূত সাধারণ জীবনের মধ্যে মানুষে মানুষে ঐক্য আরও কত নিবিড়। ছড়াটি বাঙ্গালীর জীবনে যেমন সুপরিচিত ওড়িয়া সমাজেও তাহাই—

বাংলা	ওড়িয়া
আমার কথাটি ফুরা'ল।	মো কথাটি সইলা, ফুল গাছটি মইলা।
নটে গাছটি মুড়াল।	হইরে ফুল গছ তু কাহি কি মলু?
কেন রে নটে মুড়ালি?	মোতে কালী খাই খাই গলা।
গরুতে কেন খায়?	হইলো কালী খাই, তু কাহিঁকি খাই গলু?
কেন রে গরু খাস?	মোতে গটড় জগিলা নাহি।
রাখাল কেন চরায় না?	হইরে গটড় তু কাহিঁকি জগিলু নাহি?
কেন রে রাখাল চরাস্ না?	বড় বহু ভাত দেলা নাহিঁ।
বৌ কেন ভাত দেয় না?	হইলো বড় বহু তু কাহিঁকি ভাত দেলু নাহি?
কেন লো বৌ ভাত দিস্ না?	পুষ কান্দিলা।
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না?	হইরে পুষ তু কাহিঁকি কান্দিলু?

কেনরে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না ?
ব্যাঙ্ কেন ডাকে না ?
কেন রে ব্যাঙ্ ডাকিস না ?
সাপে কেন খায় ?

কেন রে সাপ খাস্ ?
খাবার ধন খাব নি ?
গুড় গুড়ুতে খাব নি ?

মাতে ধুলিয়া কথা কামুক্তি দেলা।
হইলে ধুলিয়া কথা তু কাহিঁকি কামুক্তি দেস্ ?
দু বাটি জলে যায়, ক'অল মাউস পাইলে
রটবার কামুক্ত দিএ।

যদিও আজ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় উদ্ভূত হওয়া দুইটি প্রচলিত আছে, তথাপি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহারা উভয়েই একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যেদিন ইহা উদ্ভূত হয়, সেদিন বাঙ্গালীই হোক কিংবা ওড়িয়াই হোক তাহারা একই অখণ্ড লোক-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত ছিল।

উপরে ওড়িষ্যা এবং আসামের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষাগত কিংবা লোক-সাহিত্যগত ঐক্যের কথা উল্লেখ করা হইলেও মগধ বা উত্তর বিহারের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা কিছু উল্লেখ করা হয় নাই, এখন সেই বিষয়েও একটি দৃষ্টান্ত দিব।

মগধের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, কারণ মগধ উত্তর বাংলার সংলগ্ন প্রদেশ এবং মগধ হইতেই একদিন বৌদ্ধধর্ম উত্তর বাংলার পথে বাংলার অন্যত্র প্রচারলাভ করিয়াছিল, মগধ বিশেষতঃ মিথিলার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। ভাষার মাধ্যমেও এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হইয়াছিল। বর্তমানে লৌকিক সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কাব্য মধ্যযুগে বাংলার লোক-সাহিত্যের স্তর হইতেই ক্রমে শিল্প-সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইয়া সে যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের রূপ লাভ করিয়াছিল। মগধ বা মিথিলা (তীরভুক্তি) অঞ্চল হইতে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি বাংলাদেশে একদিন প্রচারিত হইয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যরূপে গঠিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্তও উত্তর বিহারের প্রতি গ্রামাঞ্চলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী গীত হয় এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেখানে হিন্দীভাষা আঞ্চলিক রূপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাও মিশ্রিত করিয়া এই বিষয়ক গীত রচিত হইয়াছে এবং নিরক্ষর হিন্দীভাষী গ্রাম্য কৃষকগণ সেই বাংলাগীত আজিও গাহিয়া থাকে। হিন্দী বেহুলার কাহিনীতে প্রচলিত একটি বাংলাগীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ওরে পুরবে খোজিলাম বংগলা রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে।
ওরে পছিম খোজিলাম দেব করতার হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে।
ওরে উত্তরে খোজিলাম মোরঙ্গ রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে।
ওরে দক্ষিণে খোজিলাম পুর্ব জগরনাথ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে।

উত্তর বিহারে প্রচলিত মনসার গীতিকাহিনীতে বাংলাগান প্রচলিত থাকিবার কারণ কি ? প্রথমতঃ ইহা বাংলাদেশ হইতে উত্তর বিহারে প্রচারিত হইয়া থাকিতে পারে, সেইজন্য কিছু কিছু অংশ বাংলা রহিয়া

গিয়াছে। কিংবা যেমন ব্রজবুলি ভাষাকে ব্রজের ভাষা বা রাধাকৃষ্ণের ভাষা বলিয়া মনে করিয়া সেই ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছি, তেমনই সমস্ত উত্তর বিহারের গ্রাম্য কৃষকগণ বাংলাদেশকেই বেহুলা-লক্ষীন্দরের জন্মভূমি মনে করিয়া সেই দেশের ভাষায় তাহাদের গীত গাহিয়া থাকে। কিন্তু যাহাই হোক, উহা দ্বারা এই দুই প্রদেশের নিতান্ত সাধারণ জনগণের মধ্যেও যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও নিবিড় ছিল তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

মিথিলার সঙ্গে বাংলা ভাষার সুনিবিড় ঐক্য ছিল বলিয়াই একদিন মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালী নিতান্ত আপনার ধন-বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, শুধু তাহাই নহে তাহা অনুকরণ করিয়া শত শত পদাবলী রচনা করিয়াছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত শিবগীতের অনুকরণ করিয়া বাঙালীর শিব উমার প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছে। বাংলা শিবায়ন কাব্যের বহু আখ্যানিক মৈথিল শিবগীত অবলম্বন করিয়া রচিত। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বাঙালী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদগুলিও মিথিলার অধিবাসিগণ প্রাচীনকাল হইতেই নিজেদের রচিত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল, সেই সূত্রে বাঙালী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসকেও তাহারা নিজেদের দেশের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। বাঙালী কবি নারায়ণ দেবের রচিত মনসামঙ্গল কাব্য যেমন আমাদের সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত হইয়া অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বহু পদ বাংলা ভাষার সহজেই রূপান্তরিত হইয়া বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগেও সমগ্র পূর্ব ভারতে পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ব্যাপিয়া একই অখণ্ড ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল, তবে সেই ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ বা প্রাদেশিক রূপে বিভক্ত ছিল মাত্র।

DESIGN ● DISPLAY ● EXHIBITION ● OUTDOOR

ASTER ADVERTISING SERVICE PRIVATE LTD.

3, CAMAC STREET, CALCUTTA-16

PHONE : 44-6552

প্রাচীন কাল হইতে পূর্ব ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এক ধর্মগত অখণ্ডতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই প্রভাব এই অঞ্চলে নানাভাবে আজও অনুভূত হইতেছে। প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারাই এই অখণ্ডতার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন দেখা গেল যে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আদর্শ এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে, তখন তাহার ভিতর আর একটি ধারার উদ্ভব হইল, তাহা তান্ত্রিক বা মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়া সমগ্র পূর্ব ভারত অঞ্চল অর্থাৎ যে অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম পথ লাভ করিয়াছিল, সেই অঞ্চল হইতে বিদায় লইয়া গেল।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের ধর্ম সাধনার মধ্যে তান্ত্রিক সাধনার একটি বিশেষ স্থান ছিল। সাময়িকভাবে বৈদিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা পর পর তাহা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাই শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়াও আত্মবিস্তার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহারই ফল স্বরূপ এই অঞ্চলের তান্ত্রিক বা মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিকাশ লাভ করিল। কামরূপের কামাখ্যা তীর্থ তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা এবং মিথিলায় ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। এই সূত্রে এই বিস্তৃত অঞ্চল তান্ত্রিক ভাবধারার সূত্রে একত্র গ্রথিত হইল। বৌদ্ধধর্মও ইহার এককোণে কোন প্রকারে প্রচ্ছন্ন রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। সুতরাং সেই যুগে কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত এক সংস্কৃতিক অখণ্ডতা ইহাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্মের যে ভাবধারা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা এই অঞ্চলে তুর্কী বিজয়ের পর নূতন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের এবং আসামে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লাভ করিল। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রে সমগ্র উড়িষ্যা এবং আসামের সুদূর উপত্যকাকে সুদূর মণিপুর পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। মধ্যযুগে এক অখণ্ড ধর্মচিন্তার মধ্য দিয়া উড়িষ্যা হইতে আসাম পর্যন্ত আবার এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিল।

পূর্ব ভারতের যে বিস্তৃত অঞ্চল বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশ নামে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর জাতি ব্যতীত এক বিপুল সংখ্যক আদিবাসী লোক বাস করিয়া থাকে তাহারা দুইটি প্রধান প্রাচীন জাতির বংশধর—একটি নিষাদ জাতি ইহারাই ইংরেজীতে Proto Australoid নামে পরিচিত আর একটি কিরাত জাতি তাহারাও ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির সন্তান। এই দুইটি স্বতন্ত্র জাতি এই অঞ্চলে ভারতীয় আর্যভাষী জাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রতিবেশী রূপে বাস করিয়া তাহাদের সংস্কৃতি দ্বারা যেমন প্রতিবেশী বৌদ্ধ হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তেমনই বৌদ্ধ হিন্দু সমাজের বহু উপকরণ দ্বারাও ইহারা পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহারা পরস্পর হইতে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে পারে নাই। তবে এই কথা সত্য এই সকল আদিম সমাজ নিজেদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে নাই। অর্থাৎ বিহারী, বাঙ্গালী, উড়িয়া কিংবা অসমীয়া যত সহজে ভারতীয় আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, ইহারা তাহা করিতে পারে নাই। ইহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া তাহাদের আদিম ভাষা বহুলাংশে রক্ষা করিয়াছে, সেইজন্যই তাহাদের দ্বারা ঐক্যের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হইলেও এক অখণ্ড সংস্কৃত ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

বাংলার দেব দেউল

—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মন্দির বা দেবগৃহের পরিকল্পনা মানব সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুপ্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীতে যে সকল সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে তার সবগুলিতেই যেমন দেবতা সম্পর্কে বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় তেমনি যারা মূর্তিতে দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করেছে তারা সেই মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া যারা নিরাকার রূপে পরমেশ্বরের পরিকল্পনা করেছে তারাও দেবতার স্মরণ ও প্রার্থনা করে প্রার্থনাগৃহ সৃষ্টি করে তাকে মহনীয় রূপ দিতে তৎপর হয়েছে। মানুষের ধর্মসাধনার ক্ষেত্র তাই মন্দির দেবগৃহ বা প্রার্থনা সৌধের একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় সৌধের উদ্ভব ও বিবর্তনের সন্ধান করলে দেখা যায় যে মানুষ সংস্কৃতির উদ্ভবের সুরুতে মৃতদেহকে ভূপ্রোথিত করে সেই সমাহিত দেহকে রক্ষা করবার জন্য সমাধির উপর বা চারদিকে যে বেষ্টনী রচনা করেছিল সেইখানে তার সূত্রপাত হয়। মিশরের পিরামিড শ্রেণীর সমাধি সেই ধারারই বিবর্তিত রূপ। প্রাচীন ভারতে এই ধরণের সমাধিকে অবলম্বন করে যে সৌধনির্মিত হয় তাকে বলা হত স্তূপ। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর ভগবানের পূত দেহাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপকে বৌদ্ধরা অতিপবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও পূজা করত। মণ্ডলাকৃতি ভিত্তির উপর নিরেট গম্বুজাকৃতি এই স্তূপ কিন্তু আবাসযোগ্য অট্টালিকা নয়, তবে এর অভ্যন্তরে বুদ্ধের চিরন্তন অবস্থান কল্পনায় একে রাজচক্রবর্ত্তীর প্রাসাদের অনুকল্প বলে মনে করা হত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণের মতে অসুরদের সমাধি হবে মণ্ডলাকৃতি আর দেবানুগামীদের সমাধির ভিত্তি হবে চতুষ্কোণ। (১২।৮।১।৫) এ থেকে অনুমান হয় সমাধিসৌধের বিবর্তনের মুখে মণ্ডলাকৃতি এবং চতুষ্কোণ এই উভয় নক্সারই ভিত্তির উদ্ভব হয়েছিল। ক্রমে এই নিরেট বা ঘনত্ব সম্পন্ন সমাধি গৃহ প্রাচীর সম্বলিত অট্টালিকায় পরিণত হয়; আর এই নক্সার বাড়ী আবাসগৃহে এবং দেবগৃহে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে বহুপ্রাচীন যুগ থেকেই মন্দির বা দেবগৃহের প্রবর্তন হয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণোত্তর বৈদিক সাহিত্যে মহাভারত ও রামায়ণে মন্দিরের বা দেবায়তনের উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ জলাধার সংলগ্ন গৃহগুলিকে অনেকে মন্দিরের অনুকল্প বলে অনুমান করেন। ভারহুতের স্তূপ প্রাচীরের গায় মণ্ডলাকৃতি ভিত্তি সম্বলিত ছোট মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিহারের অন্তর্গত রাজগীরের বিখ্যাত গোলভিত্তি যুক্ত মনিনাগের মন্দিরের (মানিয়ার মঠ) মূল অংশের নির্মাণকাল এখনও নির্ণিত হয় নাই। সম্ভবত অধুনা আচ্ছাদনহীন এই মন্দিরটিতেই ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরের নিদর্শন রক্ষিত আছে। এই মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টক নির্মিত; এর পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে নির্মিত কিছু মন্দিরকেই ভারতের মন্দির শিল্পের প্রায়ম্ভিক নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়। মধ্যভারতের সাঁচী, তিগাওয়া ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত চৌকো নক্সার নীচু অনলংকৃত সমতল ছাত সম্বলিত মন্দিরগুলি পাথরের তৈরী। এছাড়া গুপ্তযুগে তৈরী ইটের মন্দিরেরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমতল ছাতের পরিবর্তে শিখরের প্রবর্তনও গুপ্তযুগেই শুরু হয়। এই ধারা অবলম্বন করেই ভারতে প্রধানত দুইটি মন্দির রীতির উদ্ভব হয়, একটি সুদক্ষিণে আমলক শোভিত উত্তুঙ্গ শিখর সম্বলিত নাগর রীতির মন্দির প্রধানত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে; অন্যটি ক্রমক্ষীয়মান

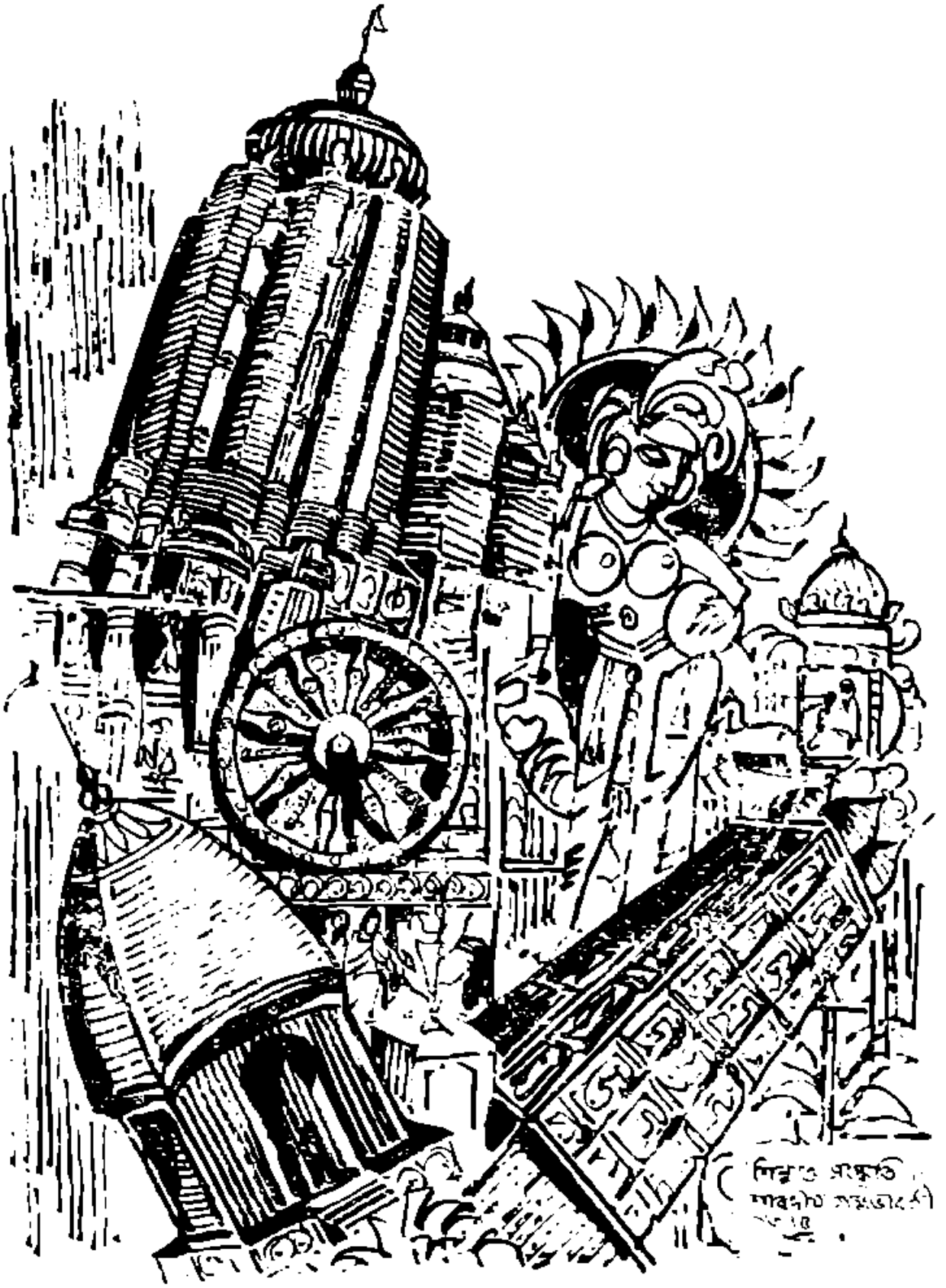

॥ শিল্প ও সংস্কৃতি ॥
শারদীয় পত্রিকা
১৩৭৩

॥ শিল্প ও সংস্কৃতি ॥
শারদীয় সম্ভভারতী
১৩৭৫

॥ শিল্প ও সংস্কৃতি ॥
শারদীয় গল্পভারতী
১৩৭৫

॥ শিল্প ও সংস্কৃতি ॥
শারদীয় গল্প ভারতী
১৩৭৫

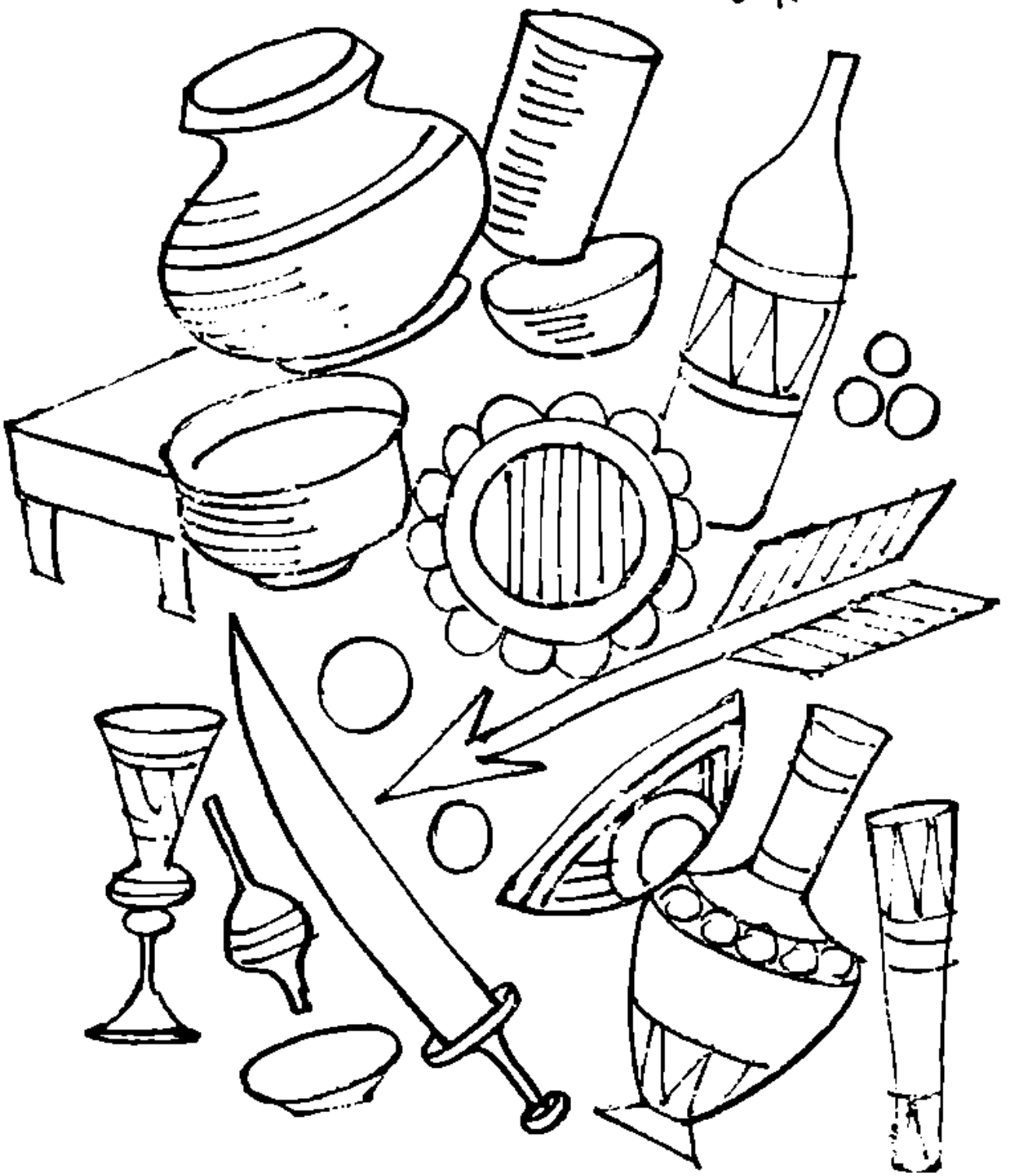

॥ শিল্প ও সংস্কৃতি ॥
শারদীয় গল্পভারতী
১৩৭৫

কোনাকৃতি পঞ্চদশীর্ষ দ্রাবিড় রীতির মন্দির, প্রধানত দক্ষিণ ভারতের সম্পদ। উত্তরকালে উড়িষ্যা, মধ্যভারত গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চল যেমন নাগর রীতির উত্তুঙ্গ দেউল নির্মাণ করে গৌরব অর্জন করেছিল দক্ষিণের তাঞ্জোর কাঞ্চী ইত্যাদি অঞ্চলও তেমনি দক্ষিণী রীতির মন্দিরে শোভিত হয়ে উঠে। প্রকৃতি যেমন পৃথিবীকে নদ-নদী সাগর অরণ্য পর্বতে সজ্জিত করে আনন্দ উপভোগ করেছে তেমনি মানুষও পৃথিবীকে সজ্জিত করতে প্রয়াস করেছে উদ্যান, সরোবর অট্টালিকা দিয়ে। আর মানুষের এই উদ্যমে পুরোবর্তী স্থান অধিকার করেছে দেবায়তন রচনার প্রয়াস। উদ্যান সরোবর এবং উচ্চচূড় মন্দির সমন্বিত এই দেবায়তনের সমারোহ মানুষের সভ্যতার এক বিশিষ্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই। জল, পলিমাটি আর জঙ্গল সমাচ্ছন্ন প্রাচীন বাংলাও মন্দির নির্মাণে কম উদ্যমশীল ছিল না। বাংলার সমাজ মানস যেমন ভারতীয় সমাজ মানসের অঙ্গ হয়েও স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ, বাংলার মন্দির শিল্পের গতিপ্রকৃতিও অনেকটাই তেমনি বিশিষ্ট। বাংলার মন্দির শিল্পের ধারা ভারতীয় মন্দির শিল্পেরই অন্যতম অভিব্যক্তি হলেও নানা বিচিত্রতায় বাংলার মন্দিরশিল্প এক স্বয়ংপূর্ণ রসপরিণতি পরিগ্রহণ করেছিল লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ প্রাচীন ও মধ্যযুগে মন্দির নির্মাণে কম উদ্যোগী ছিল না। কালপ্রভাবে অবলুপ্ত বা জীর্ণ এই মন্দিরগুলিতে অতীত দিনের বাংলার সমাজও সভ্যতার বিবর্তনের বহু পরিচয়ই বিধৃত হয়ে আছে। এরই মধ্যে কতগুলি মন্দিরকে পটভূমির প্রসারে কল্পনার বিস্তারে, এবং শিল্প সৃষ্টির দক্ষতায় সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দলিল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরগুলি বাঙালীর অন্যতম গৌরবের সামগ্রী বাংলার জাতীয় তীর্থক্ষেত্র। বাঙালীর অন্তরের পরিচয় দিতে, তার স্পর্শশীলতার তার আনন্দ বেদনার এবং সর্বোপরি তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশে বাংলার দেব দেউলগুলি একান্তই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মন্দির সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পূর্ববাঙ্গলার রাজশাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরের মন্দির। মন্দিরটি ছিল বিশ্রুত কীর্তি পালসম্রাট ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারের অঙ্গ। চতুর্দিকে বেষ্টনীযুক্ত বিস্তৃত চত্বরের মাঝখানে এই মন্দির অবস্থিত। ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া এই মন্দিরের উপরে হয়ত উত্তর ভারতীয় রীতির একটি শিখর শোভিত ছিল। নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে এই মন্দিরের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, জাভা ও কম্বোজের বহু মন্দিরের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরের পরই উল্লেখ করা যেতে পারে আশুতোষ সংগ্রহশালার কর্মীদের খুঁড়ে বার করা বেড়াচাঁপার বৃহৎ মন্দিরটির কথা। বারাসতের সন্নিকটবর্তী এই বেড়াচাঁপায় একসময়ে একটি বৃহৎ নগর বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরেরই অন্যতম অলঙ্কাররূপে এই মন্দিরটি সম্ভবতঃ গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মন্দিরটির গঠনের উপকরণও ছিল ইট।

বাংলাদেশের সব মন্দিরই কিছু ইষ্টক নির্মিত নয়। বর্ধমানের বরাকরে এবং মানভূমে তেলকুপীতে কয়েকটি পাথরের তৈরী মন্দির এক সময়ে বাংলা যে প্রস্তর মন্দির নির্মাণেও পারঙ্গম ছিল তার পরিচয় বহন করছে। কহ্লণের রাজতরঙ্গিনীতে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের উচ্চচূড় সমলঙ্কৃত সুবৃহৎ স্কন্দ কার্তিকেয়ের মন্দিরের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে ত্রিবেণীর মুরারী মন্দিরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে ত্রিবেণীর জাফরখা গাজীর দরগার মূল সমাধি ও পার্শ্ববর্তী ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড সমূহের কথা সহজেই মনে হয়।

মুসলমান আগমনের বিপর্যয়ে বাংলার অতীত ঐতিহ্য বন্যাবিক্ষুব্ধ এবং ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়লে প্রাচীন মন্দির নির্মানের ধারারও ছেদ পড়ে। হতোদ্যম বাঙালী মন্দির শিল্পী সমাজের অবস্থাদৃষ্টে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে—এক দীর্ঘকালের জন্য। তারপর সময়ের বিবর্তনে বাংলার ভাগ্যেরও কিছু পরিবর্তন

ঘটে। কিছুকালের ঘোর অরাজকতার পরে প্রজাপুঞ্জের আনুকূল্যে উদার চরিত্র হুসেনশাহ সুলতান পদে বৃত হলে বাংলার জনচিত্তে পুনরায় কিছু উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার দেখা দেয়। এই সময়েই বাংলার অন্তর মথিত করে নবদ্বীপে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তাঁরই পুণ্যস্পর্শে বাংলার সংস্কৃতি যেন আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সুদীর্ঘকাল নিজেকে হীনাভিহীন রূপে পরিচিত করে অতি সংগোপনে বাঙালী যে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাকে আবার নব সমক্ষে পুনরুদ্ভাসিত করতে সাহসী হয়ে উঠল। তবে এবার আবার যখন বাঙালী মন্দির নির্মাণে ব্রতী হল তখনদিনে পূর্বতন আড়ম্বরপূর্ণ নাগরীতির মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে তার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও সেই মহামহীয়োজ্জ্বল রাজাধিরাজেরা আর এগিয়ে আসছেনা মন্দির নির্মাণে উৎসাহ দিতে। জনবহুল নগরগুলি বিধর্মী রাজশক্তির প্রত্যক্ষলীলাভূমি। তাই আড়ম্বর পরিষ্ট নাগর সভ্যতার পরিবর্তে পল্লীর উদ্বেলতাহীন নিস্তরঙ্গ জীবনই হল এই নূতন প্রেরণার উৎস। হর্ষোৎফুল্ল স্কন্দ কার্তিকেয় বা বিষ্ণু-নারায়ণের উপযুক্ত মর্যাদা বা আড়ম্বরের সম্ভার যোগানো আজ তার সামর্থের অতীত। তাই সে আজ আরাধ্যরূপে গ্রহণ করেছে গৃহশিশুরূপী গোপালকে, বেণুচারী বংশীধারী শ্যামরায় বা সবংসহ চিহ্নমাত্রে পর্যবেসিত মহাদেবকে। খড়ের চালা ঘরই হল তার মন্দিরের আদর্শ। এই নবতর পরিবেশে হীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নবজাগ্রত সত্তা এই চালাঘরকে নিয়েই তার মন্দির-নির্মাণের নূতন পরীক্ষার সূত্রপাত করল। চালাঘরের মত সহজ, চালাঘরের মত সুন্দর আর কি আছে। দৈন্যগ্রস্ত অবদমিত বাঙালীর। বাঙালী স্থপতির হাতে এই চালাঘরই অপূর্ব সৌন্দর্যে নূতন রীতির মন্দিরে রূপ নিল বাঙালীর শিল্পচিত্ত এই নূতন হেউল মন্দিরকে নিয়ে মহীয়ান হয়ে উঠল।

বাংলার প্রায় সর্বত্রই এই নূতন ধারার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হেউলের সন্ধান পাওয়া যায়। বিধ্বংসী পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের পূর্বে পর্যন্তও নবনির্মিত এই অর্বাচীন নগরী কলকাতার অভ্যন্তরে এবং নিকট সান্নিধ্যেও এই ধারার মন্দির নির্মিত হয়েছে। আজ এই ধারার প্রবাহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এইসব মন্দিরের গড়ন অতি পরিচিত। চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর গড়ানো ছাত বিশিষ্ট চালার চারকোণে চারটি অনুচ্চ শিখর, কেন্দ্রে একটি অনতিবৃহৎ চূড়া। এই পাঁচটি চূড়াযুক্ত মন্দিরকে বলা হয় পঞ্চরত্ন; এই প্রকার নয়টি চূড়া থাকলে নবরত্ন। এছাড়া ছাতে গড়ানো চালার সংখ্যা চারটি বা আটটিও হতে পারে। এই বিভিন্ন ধরনের মন্দিরের নির্মাণের এক বৃহৎ পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছে বাঁকুড়া জেলার অন্যতম জনপদ বিষ্ণুপুর। এখানে নানাধরনের অসংখ্য মন্দির স্থানীয় উচ্চসংস্কৃতি সম্পন্ন মল্ল রাজন্যবর্গের উদার পৃষ্ঠপোষকতার সাক্ষ্য বহন করছে। এইসব মন্দিরের মধ্যে আছে জোড়বাংলা মন্দির, লালজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, কালাচাঁদ মন্দির ইত্যাদি। এছাড়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে মালদহে, বীরভেড়িয়াতে, বসড়ী-কৃষ্ণনগরে, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, বলতে কি বাংলার প্রায় সর্বত্রই নানাধরণের মন্দির বাংলার ঐতিহ্যের এক বিশিষ্ট সম্পদরূপে এখনও সমুজ্জ্বল।

বাংলার মন্দির বাংলার অনাড়ম্বর সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সম্পদ। কালের বিবর্তনে বাংলার সংস্কৃতিও নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। প্রতিবেশী ওড়িষ্যার পাথরের মন্দির শ্রেষ্ঠীকাল অতিক্রম করে তীর্থযাত্রী এবং সৌন্দর্য পিপাসুদের আহ্বান করেছে তার রাজকীয় আড়ম্বরে পরিপুষ্ট রসবৈচিত্র পূর্ণ মন্দিরশিল্পের রসাস্বাদনে ঐ শিল্পের সঙ্গে তুলনায় বাংলার মন্দিরশিল্প নিতান্তই ঘরোয়া অতিসাধারণ। এই মন্দির শিল্প বাংলার জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত, নিকটের, নিতান্তই নিজস্ব। এর প্রতিটি ইঁট সাধারণ মানুষেরই হাতের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ। এর প্রাচীরের গায়ে পোড়ামাটির যে কাজ তাতে দেখি

সাধারণ মানুষেরই মনের প্রতিফলন। এই মানসিকতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে শিশু-কৃষ্ণের জীবন লীলাতে; যে কৃষ্ণ একান্তভাবেই বাঙালী গৃহস্থের ঘরের আদরের সন্তান। তার জীবনে অসুর বধের মধ্যেও বাঙালী কি বৈরীদমনের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল! তার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়েছে মন্দিরের নির্মানকার্যের মধ্যে। গৃহস্থের আপন বাসের চালাঘরের সঙ্গে মন্দিরের শিখর চূড়া জুড়ে যে ঢেউটি সে রচনা করল সে যেন নিজের কুটিরেই দেবতার আপন প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ। এই মন্দিরে তাই বাঙালী মননের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় অন্য কোন শিল্পকৃতির মধ্যে বাঙালী মনের, বিশেষ করে মধ্যযুগের বাঙালী মনে প্রতিচ্ছবি তেমনভাবে বিধৃত আছে বলে মনে হয়না। বাঙলার মন্দিরগুলিকে তাই বাঙালীর জাতীয় তীর্থরূপে পরিণমিত করা প্রয়োজন। নিজেকে বুঝতে হলে, আপন প্রসুপ্ত মনের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলির মত বাংলার মন্দিরগুলিকেও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই মন্দিরদৃষ্টে বহু সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

———

বাংলার দারু ও মৃৎশিল্প

—গৌরীশংকর দে

নদী-মাতৃক, সমতল দেশ বাংলা। সুলভ নয় এখানে ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের অভিঘাত উপকরণ। মহিমাময় মর্মর তো দূরের কথা সাধারণ পাথরও এ-দেশে দুর্লভ। তবু নিরুৎসাহ হয় নি বাঙালী শিল্পী। স্থলনের প্রেরণায় অতিক্রম করেছে সব অভাব অসুবিধা—শিল্পকলার উপকরণ? হয়েছে কেন বাঁশ, কাঠ, বনখাগড়া? বাংলামায়ের যে স্নেহ এ-দেশকে করেছে শস্য-শ্যামল, সেই স্নেহ, সেই পলিমাটির মধ্য থেকেই রূপ নিয়েছে শিল্পীর স্বপ্ন।

যে মাটিতে আমরা জন্ম নিই, যে মাটিতে একদিন লীন হয় আমাদের মরদেহ, এই মাটি থেকে শিল্পী গড়েছে প্রতিমা। দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী যেন-তেনপ্রকারে তৈরী ক'রেই খুশী হয়নি এ-দেশের কুম্ভকার ওই সব সামগ্রীকে দিয়েছে নানা আকৃতি, বিচিত্র ভঙ্গী, আশ্চর্য ছন্দ। রেখায়, বর্ণে, আলপনায়, মৃত্তের মৃত্তিকা পেয়েছে স্বর্গের ঐশ্বর্য।

বাংলার মৃৎশিল্পের নিদর্শন অনেক: হাঁড়ি, সরা, ঘট, পুতুল, প্রতিমা, মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলক, আরো কত কি। বাঙালীর মন, সংস্কৃতি, সাধনা আর বাংলার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে এ-দেশের নানা প্রাচীন জনপদের পথে, প্রান্তরে, পুকুর পাড়ে, জঙ্গলে ঢাকা ঢিবি সমাহিত আর ধ্বংসস্তূপে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায়ই উদ্ধার করছেন নানা মাটির পাত্র আর মূর্তি। বেড়াচাঁপার চাষের খেত, খোলা মাঠ আর খনা-মিহিরের ভিটে থেকে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের গ্যালারীতে স্থান পেয়েছে অজস্র পোড়ামাটির পুতুল মূর্তি আর ফলক। তমলুক, হরিনারায়ণপুর আর বাণগড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির কাজ।

প্রাচীন সভ্যতার একটি বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শন মাটির পুতুল। মহাস্থান, বেড়াচাঁপা, তমলুক, বানগড় আর হরিনারায়ণপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অজস্র—নির্মাণ-কৌশল ও বিষয়-বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। দেবদেবীর নানা মূর্তি এবং হাতী, ঘোড়া, ছাগল, ষাঁড় ইত্যাদি জীবজন্তুর মূর্তি। বাঁকুড়া জেলার পোখরনা থেকে পাওয়া গেছে একটি সুন্দর নারী মূর্তি। মনে হয় যক্ষিণী বা নায়িকা। এই সব পুতুল যেন আভাষ আনে এক লুপ্ত পৃথিবীর। এরা আজ ভাষা হারিয়ে চুপ ক'রে আছে, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে কথা ব'লে উঠবে, আর অমনি আমাদের মনে পড়বে হারানো দিনের হারানো কাহিনী।

বাংলার নানা অঞ্চলের অসংখ্য মন্দিরের গায়ে বিস্ময়কর অজস্র মৃৎফলক। এদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার। জল, স্থলজ, পাহাড়, জীব-জন্তু আর সমসাময়িক চাষী, মেয়ে, প্রভৃতি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ছবির মিছিল চলেছে মন্দিরের গায়ে। অপূর্ব শিল্প-কাজ, কিন্তু শিল্পীর নাম জানি নে। লোকায়ত শিল্পের তীর্থ পাহাড়পুর।

মৃৎফলকের কাজ দেখতে হলে যেতে হবে পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড় আর পাহাড়পুর, ফরিদপুর ময়নামতীতে। মায়াদেবীর স্বপ্ন, বিশ্রামরত মহিষ, মিথুন মূর্তি, গৃহাভিমুখী বৃদ্ধ, শিকার সহ-শিকারী, শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিক কাহিনী থেকে শুরু ক'রে চারপাশের প্রাণিজগৎ, জীবনের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা মন্দিরের মৃত্তিকাফলকে। প্রাচীন বাংলা লুপ্ত হয়েও বেঁচে আছে যেন মন্দিরের গায়ে।

পশ্চিমবাংলার মৃৎফলক সমৃদ্ধ মন্দির : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শ্রীধর মন্দির, বীরভূম জেলার ইমামবাজারের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির, জয়দেব মন্দির ও বুকল মন্দির, মুর্শিদাবাদ জেলায় বরানগরে চারবাংলা মন্দির ও কালীমন্দির, হুগলী জেলায় কামারপাড়ার মন্দির, বাঁশবেড়িয়ায় বাসুদেবের মন্দির ও নদীয়া জেলায় বীরনগরের মন্দির ও চাকদহের পালপাড়া মন্দির। এই সব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের সূক্ষ্ম কারুকাজ ও সুন্দর মূর্তি প্রস্তরের কারুকার্য মূর্তিকেও ম্লান ক'রে দিতে সক্ষম। মন্দির তো নয় যেন প্রদর্শনী ; রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের সচিত্র পুঁথি ; নিরক্ষর গ্রামবাসীরও বোধগম্য।

প্লাষ্টিক আর রবারের পুতুলের আমদানী সত্ত্বেও বাংলার মৃৎশিল্পের সাধনা আছে অব্যাহত। বিভিন্ন জেলার মৃৎশিল্পীরা তৈরী ক'রে চলেছে দুর্গা, বাসন্তী, কালী, মনসা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্তিক গণেশ, প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি ; পুজা-পার্বণে ব্যবসায়ের জন্য ঘর সাজাবার জন্য কিংবা ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য পুতুল এবং নানারকমের মাটির পাত্র। এখনো কত রকম পুতুলই না তৈরী হয় : কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-রাধা (যুগল) মহাদেব (দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়), লক্ষ্মী, সংস্কৃতী গণেশ, বালক গোপাল, গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ-নিতাই (যুগল), আদি-কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি।

মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখে পড়ে : কলসী কাঁখে নারী, মা ও ছেলে, যুবতী, আদাদী, বেহাই-বেহান ইত্যাদি। এ ছাড়া তৈরী হয় বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোড়া, গরু, কাকাতুয়া, টিয়া, টুনটুনি, হাঁস, ময়ূর ইত্যাদি পশু-পাখির মূর্তি। এখনো গ্রামের নানা মেলায় ও কলকাতায় রথের মেলায় এ-রকম মাটির পুতুলের ব্যাপক সমাবেশ দেখা যায়। কুম্ভকারেরাও কম যায়না ! তারা নিয়ে আসে নানা আকারের কলসী, ঘট, থালা, বাটি ধূপদানী, ফুলদানী ইত্যাদি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

মৃৎশিল্পের কাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কৃষ্ণনগরের নাম। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ইতিহাস অনেকদিনের। রাজা ভবানন্দেরও আগে থেকে। রাজপরিবারের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা এখানকার মৃৎশিল্পের প্রসারে অনেকখানি সহায়তা করে। রাজবাড়িতে মূর্তি গড়ার জন্য বাৎসরিক বেতনে কুম্ভকার নিযুক্ত হতো।

রাজাদের অনুসরণে সমগ্র নদীয়া জেলার ধনী সম্প্রদায় বাৎসরিক বেতনে কুম্ভকার নিযুক্ত করে প্রতিমা তৈরারী করাতেন। শিল্প-উৎকর্ষ যাতে বাড়ে তার জন্য প্রতিবছর রাজবাড়ির বিরাট মাঠে বিসর্জনের দিন সহরের সমস্ত প্রতিমা জমায়েৎ করা হতো। রাজা ও রাণী বিচার করতেন। কারুকার্যের জন্য যে-সব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হতো রাজা ও রাণী সেই সব প্রতিমার শিল্পীকে অর্থ বা খেতাব দিয়ে পুরস্কৃত করতেন। প্রতিমার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও কৃষ্ণনগরের মহারাজা চেষ্টা করেছিলেন ! যে সব ব্যক্তি আর্থিক অসঙ্গতির জন্য প্রতিমা তৈরী করাতে পারতেন না রাজার কাছে আবেদন জানালে তারা মূর্তি নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য পেতেন।

প্রতিমা নির্মাণ ব্যতীত মাটির ফল ও পুতুল তৈরীর কাজ কৃষ্ণনগরে ক্রমে প্রসার লাভ করে। এই শিল্পটির দিকে য়ুরোপীয়দের নজর পড়ে। বাংলা-বাসের স্মৃতি হিসেবে তারা মৃৎশিল্পীদের দিয়ে বাংলার পল্লীজীবনের নানা চিত্র ও জেলে, শিকারী, ব্যাধ, পূজারী, চাষী, শ্রমিক ইত্যাদি তৈরী করাতেন ও দেশে যাবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। এই পুতুলগুলিকে বলা হতো ডজন পুতুল।

বাংলার মৃৎশিল্প এমনি ক'রে য়ুরোপে পরিচিত হয়। তাছাড়া বিষয়-বৈচিত্র্য দেখা দেওয়ার ফলে শিল্পীদের প্রতিভা নানা পথে বিকশিত হতে সুযোগ পায়। এর পরে কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা ভারতের ও ভারতের বাইরে নানা জাতির লোক, সভীদাহ, বিবাহ ইত্যাদি বাংলার নানা সমাজ ব্যবস্থার ছবি এবং বাজার, মাঠ,

নদীমাতৃক, ধানের ইত্যাদি পলীদৃশ্য তৈরী করতে শুরু করেন। কৃষ্ণনগর ক্রমে আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বহু য়ুরোপীয় এসে এর মৃৎশিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ওই মৃৎশিল্পীদের দিয়ে তৈরী করাতে শুরু করেন গ্রীক মূর্তির আদর্শে নানা ভঙ্গীর নারীমূর্তি ও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। আগা রং করার পরে মনে হতো মর্মরমূর্তি। এই ভাবে শুরু হয় মৃৎশিল্পের আধুনিক ধারা।

কুম্ভকারদের কর্মকেন্দ্র রূপে একসময়ে বিখ্যাত ছিলো হালিসহর। তখন তখানে কুম্ভকারদের বিরাট হাট বসতো। গঙ্গাঘাট—থেকে মাটির বাসনপত্র চালান যেতো নৌকোয় ক'রে। হালিসহরের হাঁড়িকলসীর এখনো বেশ নাম।

বাংলার লোক-শিল্পের আসরে বিশিষ্ট আসন দখল ক'রে আছে বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্প।

বাঁকুড়ার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পথের ধারে, গাছতলায় চোখে পড়ে সিঁদুরমাখা মাটির হাতি ঘোড়া। বাঁকুড়ার টেরাকোটা ঘোড়া আজ আর ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না। পোড়ামাটির কালো ও বাদামী মূর্তিগুলি আকারের তুলনায় অসম্ভব হালকা আর ফাঁপা। এই মূর্তিগুলি ঠিক বাস্তবের অনুকরণ নয়; এর বিমূর্ত বা abstract-রূপ যেন শিল্পী ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। ওই অঞ্চলে প্রতি বছর তৈরী হয় লক্ষ—লক্ষ হাতি ঘোড়া। কিন্তু কিছু হাতি ঘোড়া তো বিশাল! এ রকম আর কোথাও চোখে পড়ে না।

মনসা পুজার সময় বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চলে কুমোরেরা গড়ে 'মনসার বারি।' ঘটের উপরে মুকুটাকারে সাজানো থাকে সারিবদ্ধ সাপের ফণা। কোনো-কোনো ফণা আট দশ, এমন কি ষোল ফুট উঁচু। দূর থেকে মনে হয় অতিকায় সব সাপ ফণা তুলে ধেয়ে আসছে। এই সব মূর্তির সামনে দাঁড়ালে অন্তত মুহূর্তের জন্ত চারপাশের পরিবেশ কী রকম অবাস্তব আর অপ্রাকৃত মনে হয়।

• • •

বাংলার ধাতুশিল্পের আবির্ভাব সুদূর অতীতে। বাড়ি-ঘর আসবাব, যানবাহন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতে গিয়ে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে পড়েছে মন, কারিগর মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে শিল্পীতে, সুন্দরের স্বাক্ষর পড়েছে তৈজসপত্রে, দীপাধারে, যানফলকে। ধাতুশিল্প সত্যি তখন একটি উচ্চ সূক্ষ্মশিল্পে উন্নীত হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে নানা অঞ্চলে ধাতু-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তম্ভগুলি জীর্ণ হ'লেও তার গায়ে আজো দেখা যায় বিচিত্র কারুকাজ এবং তার শিল্পকলাও অতি উচ্চ স্তরের। এ রকম কয়েকটি ধাতু-স্তম্ভ, ব্রাকেট ইত্যাদি এখনো ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই ধাতুস্তম্ভ ও ব্রাকেট প্রাচীন বাংলার ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভগ্নাবশেষ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বাংলায় ধাতু নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিলো না। সেগুলির অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু দু একটির অংশ প্রায় হাজার বছর ধ'রে টিঁকে আছে। অংশ থেকে সমগ্র মন্দিরটি কত সুন্দর ছিলো ধারণা করা যায়।

বাংলা দেশে সপ্তদশ শতকের আগে ধাতু বিগ্রহের প্রচলন ছিলো না। তবে বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামে একটি সুন্দর বলরাম মূর্তি আছে। কাঠের তৈরী এই মূর্তিটি প্রায় সাত-আট হাত উঁচু, মূর্তিটি দাঁড়ানো, চৌদ্দটি হাত, মাথায় সর্পফণার ছাতি। কয়েক বছর পর পর এই বিগ্রহ নতুন ক'রে তৈরী করা হয়।

যানবাহন শিল্পও সেকালে খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিলো। সেকালের প্রধান যানবাহন ছিলো গো-যান, অশ্বযান, পাল্কি ও নৌকা। গোরুর গাড়ি তৈরী হতো পলাশ আর শিমুল কাঠে। গ্রীক ঐতিহাসিক রচনা থেকে জানা যায় গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের রথ ছিলো।

মধ্যযুগে নৌকার প্রচলন আরো বেড়ে যায়। নানা রকমের নৌকা তৈরী হতো। গলুইয়ে খোদাই করা থাকতো বিভিন্ন জন্তুর মুখ। সেই অনুসারে নৌকার নাম হতো: "সিংহমুখী", "বাঘমুখী", "ঘোড়ামুখী", "হংসমুখী", "নাগফণা", "শঙ্খচূড়" ইত্যাদি। এছাড়া থাকতো "চন্দ্রপাল", "চীরামুখী", "চন্দ্রকরা", "ছাউপাল" ইত্যাদি বিলাসতরণী।

বাংলার হাকশিল্পের সুবর্ণযুগ বোধহয় বিগত হয়েছে। আগেকার দিনের বাড়ি ঘরের কড়ি-বরগায়, ধরজা, জানালায়, আসবাবে যে রকম কারুকাজ দেখা যেতো এখন আর তা দেখা যায় না। এর কারণ মানুষের রুচির পরিবর্তন, প্রতিভাবান হাকশিল্পীর অভাব, এমন কি উপযুক্ত হাকর অভাব। এ ছাড়াও অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে।

তবু এই শিল্প একেবারে লুপ্ত হয়নি। এখনো মেলায় গেলে চোখে পড়ে রং করা পুতুল, হাড়ি-কোড়া, বাসনপত্র। এক শ্রেণীর নরনারীর কাছে এখনো এ-সব জিনিসের বেশ চাহিদা। তবে বাংলার শিল্পীরা এখন নজর দিয়েছে অলংকরণের দিকে নয়, আকারের দিকে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে হাক শিল্পেও। নিরাভরণ অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আজকের স্থপতি ও ভাস্করের কাম্য। হাকশিল্পীরও বোধ হয় তাই।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। Indian Terracotta Art—Edited by A. Goswami ২। The Tribes and Castes of West Bengal—A. Mitra ৩। History of Bengal—R. C. Majumdar ৪। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, ৫। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ৬। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন, ৭। বাংলার লোকশিল্প—কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গসংস্কৃতিতে পট ও পটুয়া

—রবেন্দ্রনাথ মল্লিক

বঙ্গ সংস্কৃতিতে ঐতিহ্য-লালিত ও সাধনাময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল বাঙালি পটুয়াশিল্পীদের বিচিত্র ও বিবিধ ভাব ও ভাষায় চিত্রিত পটচিত্রের ঐশ্বর্য মাধ্যমে। ঐতিহ্যাশ্রিত পথ ও মতকে প্রবহমানে গ্রহণ ক'রে পটুয়াদের পটচিত্র রচনা বাংলার শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসকে বহুভাবে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করছে। অনস্বীকার্য যে বহুযুগ ব্যাপী শিল্প সাধনার অনুভবময় প্রকাশ অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে হয়তো সেই অনুভবের মহতী অবদান বাংলার পটচিত্রে খুঁজে পাওয়া নাও যেতে পারে কিন্তু শিল্পীর যে মুনশিয়ানা, যে ধরন ও প্রকাশ ভঙ্গীর সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায় তা তো উপেক্ষার বস্তু নয়। অপূর্ব রেখা রচনার নিপুণতা। অভাবনীয় ঐশ্বর্যে ভরপুর তাঁদের হাত ও রেখার পরিমিতি জ্ঞান। আশ্চর্য লাগে ভাবতে কি গভীর ব্যঞ্জনায় ভরা পটচিত্রের প্রতিমাগুলি। চোখের টানারেখায় সমস্ত অন্তরের ভাবটি রসমূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠছে। শিল্পীর হৃদয়ের চিহ্ন প্রতিটি রেখায় ফুটে ওঠে অথচ কি অনায়াসে শিল্পীর তুলির টানটোন।

উনবিংশ শতাব্দীর আলোকিত ঐশ্বর্যে আমরা বিদেশী চিত্রকলার সমাদর করতে থাকি সত্যি কিন্তু বাংলার তথা ভারতের লোকচিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ লুপ্ত হয়ে এসেছিল বা তার প্রতি হৃদয় প্রকাশ একরকম অবহেলিত সমাজের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর আর একটি অবদান যে নবজাগৃতি, তার আলোকে আমাদের রসিক শিল্পীরাই যেমন অতীতা ইলোরার শিল্প গুহা ও ঐতিহ্যকে আপন সম্পদ বলে চিনলেন তেমনি দেশজ পটশিল্পকেও নিজস্ব সম্পদ বলেও গ্রহণ করলেন। তাই বঙ্গ সংস্কৃতির আলোচনায় পট ও পটুয়াদের বিষয় অবশ্যই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

পট বললেই সাধারণত বাংলায় আমরা চিত্রকে বুঝে থাকি। কিন্তু আসলে পট একটি বিশেষ ধরণের চিত্রকেই বোঝায়। এই বিশেষ ধরণটি হচ্ছে এই যে, কোনো কাপড়ের ওপর চিত্র অংকিত হলে তাকেই পটচিত্র বলা হবে। 'পট' শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে সংস্কৃত বা পালির 'পট্ট' শব্দের অর্থ কাপড় এবং সেই পট্ট শব্দ থেকেই বাংলায় 'পট' শব্দের উৎপত্তি। বৈদিক ভাষায়ও পট শব্দের অর্থ কাপড়ই। মহাভারতে ও কাত্যায়ণ সূত্রে পট শব্দে চিত্র বোঝানোর প্রয়োগ প্রথম পাওয়া গিয়েছে বলে শোনা যায়। শব্দের উৎপত্তির মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বস্ত্রের ওপর অংকিত চিত্রই মূলত সেকালে ছিল এবং তা পট নামেই পরিচিত হয়। পটের চিত্রাংকন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্য মঞ্জুশ্রী—মূলকল্প'—নামের গ্রন্থটিতে করা হয়েছে বলে জানা যায়। এটি তিব্বত ও চীনে অনুদিত হয়েছিল বলেও শোনা গিয়েছে। ভারতের পটশিল্প বহুল প্রচলিত ছিল এ সকল অনেক তথ্যের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়।

বৌদ্ধ ভ্রমণশীল শ্রমণেরা দেশেবিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। ভারতের সীমানা অতিক্রম ক'রে বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধের মহৎ আদর্শ প্রচারের জন্যে তাঁরা যেমন বিভিন্ন কাহিনী কথায় কথায় প্রকাশ করতেন তেমনি 'জাতক কথা'-র কাহিনী চিত্রিত নানা চিত্র কাপড়ের ওপর দেখানো হ'ত। এইসব কাপড়ের ফলক চিত্রই পট্ট নামে পরিচিত ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে পটচিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন—"আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের

ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদিগের উপাধি ছিল 'মঙ্করী'। হস্তের সহিত সংযুক্ত চিত্রাঙ্কিত কোনো বস্তু অথবা 'ফলক-হস্ত' অর্থে কবিকঙ্কণ 'মঙ্করী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (চণ্ডীকাব্যের প্রথমাংশ)।" তিব্বত ও চীনে এই কাপড়ের ওপর চিত্র বহুল প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমান যুগেও এই কাপড়ের ওপর চিত্রকার্য চীনের বা তিব্বতের বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বাংলার পট চিত্রের বিষয়বস্তু সাধারণত রামায়ণের কাহিনী, মহাভারতের কাহিনী বা পুরাণের কাহিনী নিয়ে চিত্রিত হয়ে আসছিল। মূলত এই পট চিত্ররচনা হয়েছিল কথকের কথকতার সময় শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার এবং কথিত বিষয়কে আরো মনোজ্ঞভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে। কথকের শুধু বাচনিক সৌকুমার্যের সম্প্রহণ তৎকালীন লোকসমাজের সাধারণ শ্রোতার মানসে কতটুকুই বা গ্রহণীয় ছিল?—পটচিত্রে প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু চিত্রিত দেখলে যাত্রাগান শোনার প্রায় সমপরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল কথক সাধারণের।

এইখানে হয়তো মনে হতে পারে যে পট ও পটুয়ার জীবনচর্চা কি তা হলে ভারতীয় কথকের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই? তাঁদের কি শিল্পের বা সৃষ্টির প্রেরণা চিত্রায়ণের কাজে উৎসাহদান করেনি? এই দুটি বিষয়ে ভাববার আছে অনেকখানি, তবে মনে হয় যে শিল্পী তার জীবন ও জীবিকাকে সবসময় এক করে নিতে পারে না কিন্তু আমাদের চতুর্বর্ণ শাসিত সমাজে যে কোনো শিল্পকর্মের প্রেরণা বংশগত বা ঐতিহ্যগত বা জন্মগত রূপ গড়ে উঠেছিল। এর ফলে পটুয়ারা জাতধর্মে প্রথাসিদ্ধভাবে পটরচনায় লোক হয়ে উঠতেন। যেমন সমাজে নানা জাতের লোক তাদের নানা কাজ চিরাচরিতভাবে বাঁধাগত পুরুষানুক্রমে ক'রে চলছিলেন। এবং এঁরা গ্রামের বা শহরের এক প্রান্তে একত্র পাশাপাশি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন বলে সাধারণত বলা হয়ে থাকে। কুমারটুলির মতোই কলকাতাতেই রয়েছে পটুয়াটোলা। কালীঘাট অঞ্চলের অনুরূপভাবে রয়েছে প্রসিদ্ধ পটুয়াপাড়া। বরিশালের পটুয়াখালির কথাও শোনা যায়। কুমোর বা কামার এঁরা যেমন হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে গণ্য হচ্ছিলেন না তেমনি পটুয়ারাও অবহেলিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে বহু বর্ণহিন্দু যেমন ক্রমক্রমে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে ছিলেন তেমনি পটুয়া সমাজের বহুগুণী শিল্পী মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইখানে যে তাঁরা যখন পটচিত্র রচনা করলেন তাতে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীসমূহই চিত্র কাহিনীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। পটচিত্রে তাই বরাবরই দেখা যায় হিন্দু ভারতের চিত্র কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করেছে। বেহুলা বা মনসার কাহিনী নিয়ে যেসব পট রচনা হয়েছিল তেমনি আবার গাজির পটও পূর্ব বঙ্গের কোনো কোনো স্থানে পরিচিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে অন্য নানান ভাবধারা আসতে থাকে প্রথাবদ্ধ পটচিত্র রচনার মধ্যে। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু অংকন রেখার স্বভাব ধর্মটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

কালীঘাটের পটচিত্রের প্রসঙ্গে দেখা যাবে সেখানে একেবারে ইংরেজ আমলের নানাবিধ ঘটনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে চিত্র রচনা চলেছিল। আমাদের সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিও যেমন কালীঘাটের পটের বিষয় হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে আরো কত বিষয় নিয়েই না পট রচনা করেছিলেন কালীঘাটের নিপুণ পটুয়ার দল। এখানে কালীঘাটের রঙিন পটচিত্রের মধ্যে বিখ্যাত একটির নামকরা যায়। সেটি ভারতেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর মধ্যে প্রথম দেখার চিত্রটির কথা মনে আসে। সেকালে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি-কারী ঘটনাও কালীঘাটের পটুয়ারা চিত্রিত করেছিলেন।

পট থেকে অর্থাৎ বস্ত্র থেকে পট নামের উৎপত্তি হলেও বর্তমানের পটুয়াপল্লীতে অবশ্য কাপড়ের ওপর চিত্রকর্ম রচনা করা হয় না তেমন। কাগজের ওপরই কালীঘাটের পটচিত্র দেখা যাচ্ছে। রঙ

রেখার চং পটের চিত্র প্রণালীর কিছু অংকিত হয়েছে কাগজের ওপর। ঐতিহ্য সূত্রটি রয়েছে অংকন প্রণালীর মধ্যে, চিত্রকলার মধ্যে।

সহজ সরলরেখার নিপুণ টানটোনে পটচিত্র রচনা হয়। একটি সূক্ষ্ম শিল্পীর মানস অভিপ্রায়ের অভিনিবেশে রচিত হয় পট চিত্র। এই রেখার সরলগতির অন্তরালে প্রয়োজনানুগ রঙের প্রলেপ আসে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় পটুয়াদের এই রেখারচনায়। পটচিত্রের এবং পটুয়াদের বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই নিহিত রয়েছে এই রেখার সাহায্যে চিত্রময়ী ঐশ্বর্যসৃষ্টির মৌল ভাবনায়। সব থেকে আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই চিত্র রচনার সহায়ক রঙ এবং তুলি উভয়েই তাদের গৃহে প্রস্তুতজাত দ্রব্যবিশেষ। কোন বিদেশী কারখানার উৎকৃষ্ট শিল্প সামগ্রী নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায় যে কাপড়ের ওপর প্রথমে খুব পুরু ক'রে গোবর ও কাদামাটির প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর দেওয়ালে চুনকাম করার মতো চকগুঁড়ো সাদা জমি তৈরি করা হয়। এর পর নানা ধরণের পটচিত্র রচনা করা হয়ে থাকে।

বংশগতভাবে ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যপুষ্ট হয়ে পটুয়া সমাজ পটচিত্র রচনা করতেন। বঙ্গসংস্কৃতির এক ঐশ্বর্যময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল কালীঘাটের পটচিত্রকে কেন্দ্র ক'রে। বাংলার ইংরেজ শাসনের গোড়ার যুগে কলকাতার কালীঘাট এক বিশিষ্ট অঞ্চল। তখনকার প্রাচীন ঐতিহ্যান্বিত কালীঘাটের পটুয়াদের প্রচুর রঙ্গ ব্যঙ্গচিত্রও বাঙালি মানসে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে পট ও পটুয়াদের অবদান বিস্ময়করভাবে শিল্পরসিক বিশ্ববাসীর অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বাংলা ও বাঙালির জীবনযাত্রার চিত্রে চিত্রিত করার মহৎ-প্রেরণা পটুয়াদের যৌগতে এসেছে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। রাজপুত বা কাংড়া চিত্রকলার রাজাদের জীবনকেন্দ্রিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনী চিত্রিত হয়েছে আবার সমসাময়িক যুদ্ধ প্রভৃতিও চিত্রের বিষয় হয়েছিল। পটচিত্রের মধ্যেও তেমনি বৌদ্ধযুগের বুদ্ধ জীবনকথা যেমন পটের প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তেমনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে এবং কথকদের কথকথার প্রয়োজনমতো বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা হতে থাকল পটচিত্র। বাঁকুড়ার ফুলপটচিত্র বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উড়িষ্যারও পটচিত্র উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এই পটচিত্রে কথক নানাবরনের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তারই চিত্ররূপ পটে অংকিত থাকে। মানুষের জনজীবনের বহুবিধ কর্মের মধ্যে অসৎকর্ম সংঘটিত হয়। এবং সেই অসৎ কর্মের ফলে মানুষের পাপ জন্মে থাকে। সেই পাপের জন্যে নরক যন্ত্রনাভোগের ব্যবস্থা আছে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদান করার অধিকার জগন্নাথেরই। এই বিষয় বস্তুকে বোঝাবার জন্যে একটি দীর্ঘ পটচিত্রের তিন ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে উপরিভাগে যমরাজের চিত্র, মধ্যখানে নরকযন্ত্রনার পাশাপাশি নানান রকম ক্রিয়াসকল এবং শেষে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার চিত্র দেওয়া হয়েছে। এমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের, রামযাত্রার বা দুর্গার পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনার চিত্রও পটে দেখা যায়।

বাঙালি পটুয়ারা বিচিত্র বর্ণে যে অমূল্য পটরচনা করেছিলেন বর্তমানে তাঁদের সেই বংশধরদের আর তেমনভাবে এই কর্মে প্রচুর সময় দিয়ে লিপ্ত থাকার মতো সুযোগ আসে না বা রোজগার এতে তেমন হয় না বলেই বোধহয় ক্রমে ক্রমে সকলে অন্য কর্মে আত্মনিয়োগ করছেন। বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কলকাতাতেও পটচিত্রের পটুয়াদের বসবাস একসময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। আজ আর নতুন করে বুদ্ধের আত্মকথা বা কালীঘাটের পট তেমন দেখা যাবে না তবে এর আর এক রূপ দেখা যায় পোড়া মাটির দরার ওপর রঙিন চিত্ররচনা। দুর্গা বা লক্ষ্মীর সরা নামে একটি বিশেষ পরিচিত এবং আবৃত।

ইই আরেক ধরণের শিল্পকর্মের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিশেষ। গুরুসদয় দত্ত অবশ্য এই পটুয়া শিল্পীদের আর কর্মের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর মতে 'পটুয়াসংগীত' বলেও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা

বাংলার লোকশিল্পের ও লোকসংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এই পটুয়াদের অবদানের তাই বিশেষ ভাবে বর্ণিত করার প্রয়োজন হয়। শোনা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরাতন পটের সন্ধান দেশে পাওয়া যায়। এর পূর্বের কোনো পটচিত্র তাতে আসেনি তবে সংস্কৃত বা বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লেখ গিয়েছে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর বুকে বসে বাংলার লোকশিল্পের ও লোকসংস্কৃতির বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে গেলে সেই শিল্পের ও সংস্কৃতির ধারকবাহকদের অবস্থার কথা বিচারবিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলার পটুয়াদের তিনভাগে ভাগ করা চলে—উত্তর পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার এবং লার। এই বিভাগের মধ্যে সমগ্র বাংলার পটুয়াদের এক সামগ্রিক বিচার করা চলে। বাংলার । গ্রামীন শিল্পের স্বভাব কারিগর। তাদের স্বভাব ধর্মে এবং প্রথাসিদ্ধ শিল্পীরূপে কাজ করে চলেছিল। ধর প্রান্তে মেদিনীপুরের পটুয়াদের নিবাস বলে জাতিগত ভাবে। এঁরা হিন্দুসম্প্রদায়ের কিন্তু বর্ণ নিরূপণের বলে গণ্য হতেন। শোনা যায় মেদিনীপুরের এই পটুয়া শিল্পীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। পুরের পটুয়াদের সন্ধান এখনও কিছু কিছু তমলুক মহকুমার নূর্মীরমারা গ্রামে পাওয়া যায়। এরা ও খাটাল মহকুমার মধ্যে সীমিত হয়ে রয়েছেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও হিন্দু উভয় পটুয়াই তারা লক্ষ্মীর সরা করার কাজ আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটানোয় আত্মনিয়োগ করেছিলেন যায় যায় এখনও সেখানে তাঁরা রয়েছেন। কিন্তু হিন্দু পটুয়া পরিবার দেশ ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গেও বসতি স্থাপন করেছেন। কালীঘাটের পটুয়ারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের পর্যায়ভুক্ত। এঁদের দু'এক ঘর এখনও আছেন। প্রাচীন শিল্পীর ক্ষমতাও মাত্র একটি পরিবারেই লক্ষ্য করা যায়। তবে ই প্রতিমা নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রাচীন শিল্প কাজ থেকে ল আসছেন। প্রতিমা গঠনে তাঁদের সেই প্রাচীন পটুয়া শিল্পের মূনসিয়ানা প্রকাশ পাবে বলেও আশা করতে পারি। বাঁকুড়ার পটুয়াদেরও অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। আজ নিত্যপ্রয়োজনের তাগিদ স্বভাব ধর্মকে গ্রাস ক'রে ফেলছে ক্রমে ক্রমে।

ব এক সময় কাশ্মীরের শাল তৈরির শিল্পের মতো এক এক পরিবারের স্ত্রীপুত্র সকলের সহায়তায় তোলা শিল্পকর্ম ছিল, যে হিসেবে একে পারিবারিক শিল্পকর্ম বলা চলে; সেই পটশিল্প ও পটুয়া । আজ অদৃশ্য প্রায়। দেশবিদেশের শিল্পরসিক এই পটচিত্রের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার স্রষ্টার দল আজ গৌরবের বদ নিয়ে ধনী হতে পারলেন না। আমাদের বিশেষভাবে আজ কসংস্কৃতির পুনর্জীবন দানের কথা চিন্তা করতে গেলে এখনও যে সকল মুষ্টিমেয় পটুয়া পরিবার দেশে রয়েছেন তাঁদের যথোপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাংলার সাংস্কৃতিক রক্ষায় তাই হবে বিশেষ সহায়ক।

———

বাংলার লোকনৃত্য

—বেলা অর্ণব

বিধাতার সৃষ্টি মানুষ আদিকাল থেকেই তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, জীবনের নানা আচার-আচরণ এবং অন্তরের অনুভূতিকে যেমন পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে, চিত্রাঙ্কনে নানা রঙ এবং রেখায় সুচিত্রিত করে প্রকাশ করতে চেয়েছে তেমনি সুরে এবং নৃত্যাঙ্গনেও তার বিচিত্র অভিব্যক্তিকে মেলে ধরেছে শিল্প, চেতনার যুগ থেকে প্রতি যুগে।

লোক শিল্পের বড় কথা তাই তা অতীত নয়—তা স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক জীবনের সহজ এবং সরল শিল্প প্রকাশ।

পাখির গানে যে সুর, মেঘ দেখে ময়ূরীর নৃত্যে যে ছন্দ তা আঙ্গিক প্রধান বা শিক্ষাগত শিল্প নয় তা তার প্রাকৃতিক বিকাশ। এই প্রাকৃতিক বিকাশই হচ্ছে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নির্দেশন।

প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন শিল্পে লোক সমাজের এই শিল্প চেতনা এবং শিল্প প্রকৃতিই প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সত্তা; আর আশ্চর্যের কথা এই সত্তার মধ্যে একটা সার্বভৌম সমভাবকে লক্ষ্য করা যায়।

নৃত্যের কথাই ধরা যাক্।

বিভিন্ন দেশের নৃত্যকলায় বিশিষ্ট এবং নিজস্ব আঙ্গিক এবং শিক্ষাগত শিল্প নৈপুণ্যকে লক্ষ্য করা গেলেও লোকনৃত্যে কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা ঐক্যকে খুঁজে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্ম সংস্কার তার সাংস্কৃতিক প্রকাশকে দেখা যায় বিভিন্ন দেশের লোকনৃত্যের মাধ্যমে। তার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি থাকলেও ভাবের একটা মিলনকে খুঁজে বেখানে দেখা যাবে সেখানে একটা সমন্বয়বাদ। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরণের লোকনৃত্য প্রচলিত থাকলেও প্রাদেশিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে আমরা একই নদীকে প্রবাহিত হতে দেখি সাগর সঙ্গমে।

তাই জেলেদের মাছ ধরা থেকে যুদ্ধ-উন্মাদনা এবং ধর্মানুষ্ঠানের নৃত্য ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশেই জীবন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির একটি ধারারই বিকাশ; আর এক্ষেত্রে আশ্চর্য মিল এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের। আমাদের বাংলাদেশের লোকনৃত্যের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর কথাই এইবার বলি।

'বারো মাসের তের পার্বণ' আমাদের বাংলাদেশে—সেই পাল-পার্বণের নাচ-গান আমাদের দেশের ধর্ম সংস্কার। সেই সংস্কার আপন বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতির ব্যাপ্তির মধ্যে এগিয়ে চলেছে। বাউল নাচ, মিনাবের নাচ, কালীর নাচ, গাজনের নাচ, গম্ভীরা নাচ ধর্মের সংস্কার হলেও তার অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা উচ্চশ্রেণীর নৃত্যকলা।

আমাদের দেশের শিব নৃত্যের অধিদেবতা। এই শিব এবং শঙ্করকে নিয়ে নটরাজের যে নৃত্য ভঙ্গিমা তা উচ্চাঙ্গের নৃত্য মহিমা। লোকশিল্পে এই শিব কৃষকবেশে, সাধারণ বাঙালী পরিবারের জামাতা বেশে, সন্ন্যাসী এবং ভিখারির বেশে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গিমায় লোকনৃত্য অপূর্ব কলা কৌশলে আমাদের নিত্যকার শিল্পের অভিব্যক্তি।

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে সঙ ও মুখোস নাচে যে ভঙ্গিমা—তা কোন বাঁধাধরা নৃত্য ছকের ধারা এবং ছলের

শিক্ষানীতি পদ্ধতি দশার নয়; কিন্তু তার ট্র্যাডিশন বংশ পরম্পরায় প্রচলিত পদ্ধতি। আর তার নৃত্যছন্দে মনোহারিত্বের মুক্ত প্রকাশ। ঢাকের বাজনার তালে পূজা মণ্ডপে চাকীদের নৃত্য তাও অপূর্ব লোকনৃত্য।

শীতকালসাপেক্ষ বণ-নৃত্যের পাত্তার দেখা যায় ছায়বেশী, ভাইলাম, অসিনৃত্য প্রভৃতি। শক্তি চর্চার সুন্দর অভিব্যক্তি এইসব নৃত্য।

মাথায় লাল কাপড়, পরণে মাল কোঁচা দেওয়া কাপড়, হাতে ঢাল, বল্লম—ঢালী নাচে তিন বা ততোধিক লোক নিয়ে দল গঠিত। দুই দলে প্রদর্শনীমূলক নাচ চলে। তার সমাবেশ আজকের সমাজে কমে আসছে; কিন্তু কিছুদিন আগেও কবিগানের আসরগুলো আমাদের গ্রাম বাংলার উৎসবে উৎসবে প্রচলিত অনুষ্ঠান ছিল।

লোকনৃত্যের আর একটি ধারা বাংলাদেশে মেয়েদের ব্রতকথায় দিয়েছে, উৎসবের নানা স্ত্রী-আচারের আনুষ্ঠানিক পর্বে। ফুল যেমন আপন খুশীতে নিজেকে মেলে ধরে—এই সব মেয়েলি নাচেও তার তেমনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য বোধ।

ক্ষেতে ফসল বোনা এবং ফসল তোলার সময় ঋতু উৎসবে, গ্রাম দেবতার পূজা-পার্বণে, পুত্র-কন্যার জন্ম উৎসবে, বিবাহে প্রতিটি মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে কত রকমের না লোকনৃত্য। পশ্চিম বাংলার মেয়েলি উৎসব ব্রাহ্ম এবং উত্থ পরবে এখনও মেয়েদের যে সব নাচ দেখা যায় তার স্বাভাবিক ভঙ্গি চমৎকার। ছৌ-নৃত্য বিভিন্ন ধরণের হলেও বাংলা এবং উড়িষ্যার লোক-নৃত্যের একটি বিশিষ্ট অবদান।

পুতুল নাচের ধারাটিও বাংলাদেশের লোক-নৃত্যের এক স্বেচ্ছাধীন ভাবধারা।

এছাড়া সারি, জারি, শাতা, ঢোলী, সেচনী প্রভৃতি যে বিচিত্র লোক-নৃত্যের ধারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নৃত্যকলা।

ঘাটুনাচে পুরুষেরা নারী সেজে চটুল নৃত্য করে থাকে। ব্রতচারী নৃত্যও লোক-নৃত্যের একটি বিশিষ্ট অবদান।

গাঁওতালী এবং ঝুমুর নৃত্য প্রেমরসে সঞ্জীবিত। বাংলার লোক সঙ্গীতে যেমন লোক জীবনের বিভিন্ন ধারার প্রকাশ—লোক-নৃত্যেও তারই প্রতিফলন। আর বাংলার নিজস্ব গান প্রায় সবই নৃত্য সম্বলিত।

জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যভাব, প্রাকৃতিক বৈভব এবং চিত্তবৃত্তির সৌন্দর্য প্রিয়তাই বাংলার লোক-নৃত্যের সহজ-সুন্দর ছন্দ।

বাঙালী তার প্রাকৃতিক জীবনকে বিকশিত করেছে সংস্কৃতির বিস্তৃততর ছন্দে প্রবাহে, আর তার সুষ্ঠার, অভিব্যক্তিই হচ্ছে বাংলার লোকনৃত্য

বাংলার কুটীরশিল্প

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষ করে ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে যে প্রাণের জোয়ার এসেছিল তার ফলে সব দিক দিয়ে দেশ ও জাতিকে স্বাবলম্বী আত্মপ্রতিষ্ঠ করবার মহান চেষ্টা হয়েছিল। তখন বাংলার ঘরে ঘরে শোনা গিয়েছিল চরকার ঘরঘর্, কামারের কারখানায় হাপরের শব্দ। কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে কত শিল্প সেদিন বাংলাদেশের নানা প্রান্তরে গড়েছিল। কিন্তু শুধু ৫০।৬০ বছর আগে নয়, বাংলাদেশে কুটীরশিল্পের প্রচলন বহুদিন আগে থেকেই। বাংলার ঐতিহ্যবাহ কয়েকটি কুটীরশিল্পের বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

তাঁতশিল্প : তাঁতে উৎপন্ন বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি বিশ্ববিদিত। ঢাকার মসলিনের নাম একদিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশী শাসক বর্গের চোখদুটি এই শিল্পের ওপর তাই প্রথমেই পড়েছিল। তার প্রতিবাদে স্বদেশী যুগে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের মন্ত্র বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়েছিল : 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' কিন্তু বাংলার তাঁতে শুধু মোটা কাপড়ই উৎপন্ন হত না, সেই সঙ্গে অপরূপ কারুকার্যময় সূক্ষ্ম বস্ত্রও বাঙ্গার তাঁতীরা প্রস্তুত করত। তাই কলের সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রবল প্রতিযোগিতাতেও বাংলার তাঁতশিল্প অবলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং বলা যায় আজ তার কদর আরও বেড়েছে। বাংলাদেশের ঢাকাই, ধনেখালী, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙার শাড়ি ও ধুতি আজও সকলের কাছে সমাদৃত হয়ে থাকে। বীরভূমের গামছা, টেবিলঢাকা, বিছানার চাদর ইত্যাদি তাঁতবস্ত্র ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় বস্তু। মুর্শিদাবাদের সিল্কের বস্ত্রাদির চাহিদা কম নয়। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা তাঁতবস্ত্রের শিল্প ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব এনেছেন তার সমাদর আজ সারা দেশে।

ধাতুশিল্প : বাংলাদেশে কাঁসা পিতলের তৈজসপত্রের ঐতিহ্য বহুদিনের। বহরমপুরের খাগড়াই কাঁসার বাসন বিখ্যাত। সেখানকার সর্বোত্তম কাঁসার ৭ ভাগ তামা এবং ২ ভাগ রাং থাকে। এই কাঁসা ঢালাই-এর পর পিটিয়ে গড়া হয়, রং ভালো, সহজে ভাঙে না এবং ফলকও পড়ে না সহজে।

কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থানের ছুরি কাঁচির সুনাম দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের শৌখিন জাতিরও কদর আছে।

কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় এবং কাছাকাছি অনেক গ্রামে কুটির শিল্পরূপে ঢালাই পিতলের নানারকম জিনিস তৈরি হয়। এই কাজের উপাদান পুরনো পিতল বা গান মেটালের টুকরো বা ছাঁট। পিতলের কবজা, ছিটকিনি, আলনার হুক, জলের কল, পাইপ জোড়বার জিনিস, বিজলী বাতির ব্রাকেট, আলমারির কল, তালা, চাবি ইত্যাদি নানা জিনিস তৈরি হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী আমদানি জিনিস কমে যাওয়ায় এই কুটিরশিল্পের এখন যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। আধুনিক প্রয়োজনের জন্যে অনেক নতুন কাজও এখন হচ্ছে। অনেক কারিগর এখন নিজেদের ছোট ছোট কারখানায় এক-একরকম কাজ করে। কেউ মোটর গাড়ির মত গাড়ি তৈরী করে, কেউ করে নানারকম যন্ত্রের জন্যে নানা আকারের স্প্রিং, কেউ দরজার জন্যে কব্জা শিকল, কেউ রিকশার লণ্ঠন। আবার কতকগুলি কারখানায় শুধু অস্ত্রে শান দেওয়া হয়, কোথাও বা ধাতুদ্রব্যে পালিশ এবং রূপো বা নিকেলের প্রলেপ দেওয়া হয়। এসব কারখানা সবই শহরে প্রতিষ্ঠিত।

মাটির জিনিস : মৃৎশিল্প বাংলার ঐতিহ্য বহুদিনের। কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তি এবং বাঁকুড়ার পোড়ামাটির জিনিসের কদর আজ ভারতের বাইরেও ছড়িয়েছে। মানুষের প্রতিমূর্তি থেকে শুরু করে জীবজন্তু, ফলমূল, কুঁজো, ফুলদান, ধূপদান ইত্যাদি কত রকমের সুদৃশ্য মাটির জিনিস বাংলাদেশে তৈরি হয়ে থাকে।

কাঠের জিনিস : বাংলাদেশে খড়মের প্রচলন বহুদিন থেকে; কলকাতায় এবং কাছাকাছি জায়গায় অনেক ছোট কারখানা আছে যেখানে খড়ম তৈরি হয়। কাঠের তৈরি খেলনা এবং অলংকৃত ছোট ছোট নানাজিনিস বাংলাদেশে তৈরি হয়ে থাকে। এইসঙ্গে বাঁশ ও বেতের জিনিসের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীনিকেতন এবং তাঁদের সমগোত্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বাঁশ ও বেতের যে সুদৃশ্য নানা সামগ্রী তৈরি করেন তা আজ শুধু এদেশীয়দের কাছেও নয় বিদেশীদের কাছেও বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে।

চামড়ার জিনিস : বাংলাদেশের আধুনিক কুটীরশিল্পের মধ্যে চামড়ার তৈরি কারুকার্যময় নানা শৌখিন জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা যে নয়নবিমোহন কারুকার্যের প্রবর্তন করেছেন তার ফলে চামড়ার তৈরি এসব জিনিসের কদর আজকাল খুব বেড়েছে। বিচিত্রিত চটিজুতো, পার্স বা মণিব্যাগ, নোটবুক, বসবার মোড়া ইত্যাদি জিনিসের ক্রেতার অভাব নেই।

একটি স্বল্পপরিসর নিবন্ধে বাংলার কুটীরশিল্পের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান কুটীরশিল্পের কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এছাড়া, কাগজের জিনিস, সোলার অলংকার, তবলা, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র, শাঁখার জিনিস ইত্যাদি আরও কত কুটীরশিল্প বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। কালক্রমে একদিকে যেমন অনেক কুটীরশিল্প নষ্ট হয়ে গেছে, অপরদিকে তেমনি আধুনিক প্রয়োজনে নতুন নতুন শিল্পেরও উৎপত্তি হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলেও বাংলার ঐতিহ্যময় কুটীরশিল্পগুলি কোনদিনই অবলুপ্ত হবেনা এ বিশ্বাস ও ভরসা আমাদের আছে।

বাংলার লোকগীতি

—হাসি ভট্টাচার্য

লোকগীতি লোকের গান।

এইলোক সাধারণ গ্রামীন মানুষ; যেদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়—অশিক্ষিত চাষী, তাঁত, মাঝি খেটে-খাওয়া মানুষের দল। নগর-সভ্যতার আলো এদের চোখে নেই, যন্ত্র-সভ্যতার প্রসার এখানকার মাটির রসকে নিঙড়ে নেয়নি, এদের মনের মধ্যে আমিত্ব মাথা চাড়া দেয়নি—তাই সহজ সরল মনে সংস্কার আর সন্দেহ নিয়ে নীল আকাশের তলায় এদের বসবাস। এদের জীবনকে ঘিরে প্রকৃতির প্রসারিত অবদান। সেই অবদানের প্রভাবে এদের মানসিকতা গড়ে ওঠে—এরা তাই প্রকৃতি-প্রাণা।

গণজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির বন্ধন অচ্ছেদ্য। এই প্রকৃতি হচ্ছে গ্রামের মানুষের ঈশ্বর—এদের প্রাণের উৎস। পল্লীর গণ-জীবনের গানে তাই প্রকৃতিরূপ ঈশ্বরের প্রসাদ।

বাংলার চাষী ধান না হলে দেবতাকে ডাকে, বৃষ্টি না হলে মেঘের সঙ্গে গানের সুরে কথা বলে। প্রকৃতির সঙ্গে এই একান্ত আত্মীয়তার বন্ধনই হচ্ছে গ্রামীণ লোক-জীবনের এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি পল্লী-জীবনের বিস্তৃত ধারায় প্রবাহিত। ছড়ায়, গানে, কথায়, সুরে, আলপনার চিহ্নে এই বহুধা সংস্কৃতির প্রসার একের সঙ্গে বহুর মিলন; সীমার মধ্যে অসীমের আকাঙ্ক্ষা লোকগীতির প্রসার গ্রামের মানুষের জীবনকে ঘিরে, তাদের লৌকিক ধর্ম এবং মর্মকে ঘিরে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কার, বিভিন্ন লোকাচার এবং জীবন-ধারার বিভিন্ন রীতি নীতি—বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতিও তাই বিভিন্ন প্রকারের।

বৃষ্টির জন্যে মেঘ-আরাধনার গান পূর্ববঙ্গে মৈলা নামে পরিচিত। মৈলাগান পূর্ববঙ্গের চাষী-সম্প্রদায়ের প্রাণের আকুতি।

'বৃষ্টি না নামিয়া পরাণ করল্যা বুকি খার।
ও মেঘ আইস বৃষ্টির পানি হইয়া রে!'

উত্তরবঙ্গে এই গানই শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানে—

'আল্লা মেঘ দে, পানি দে!'

আবার পশ্চিমবঙ্গের ছড়ায় শুনি—

আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে,
ধানের মা মাটি, কপাল গেল ফাটি।
বৃষ্টি আয়রে লুটোপুটি
ধান দেব মুঠি মুঠি।'

প্রকৃতিকে নিয়ে এমনি বহু গান এবং ছড়া বাংলার লোকগীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত—যাদের মূলভাব একই—শুধু সুরের মধ্যে বিভিন্নতা।

যে সংস্কার থেকে মেঘকে বৃষ্টি কামনায় ডাকা হয় ভাল ফসলের আশায় তা সংস্কৃতির বিস্তারে এক অঞ্চল থেকে আরও বহু অঞ্চলে প্রসারিত।

বাংলার পাল-পার্বণের গানে ও ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে প্রকৃতি পূজাই করা হয়।

প্রতিটি ঋতু বৈচিত্র্যকে নিয়ে নানা ধরণের পাল-পার্বণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ফাল্গুনের গান ভাদুটুনু, পৌষ-পার্বণ, ভাই দ্বিতীয়ার গান, চৈত্র পরবের গান—প্রভৃতি বহু পাল-পার্বণের গান বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্ম-উৎসবেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের গান শোনা যায়।

চৈত্র উৎসবে শিব পুজো। বাংলাদেশের শিব হচ্ছেন কৃষি দেবতা। এই দেবতা বাংলাদেশের ঘরের মানুষ। তাই তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া কথা। সে কথায় অভাব অভিযোগ সংসার সংসর্গ সবই অকপটে প্রকাশ পায়।

গাজন-গম্ভীরা আর নীল পুজোয় ধর্ম-সন্ন্যাসীদের গানে শিবকে নিয়ে ঘর-সংসার, অভাব-অভিযোগ আর ঘর-সংসার থেকে সামাজিক প্রসঙ্গের আদান-প্রদান। উত্তরবঙ্গ মালদহের গম্ভীরার শিবপূজার গানে ভোলা শিবের ভূমিকে শোনা যায়—

'ভোলা বেশ ভালো তো বলা
এ কেমন তোমার পূজা,
করলি ভাকের একি রকম
ঠিক যেন ভাক ভাসুর রাজা,
এ কেমন তোমার পূজা।'

পশ্চিমবঙ্গের গাজনে এই শিবের বন্দনায় গাজন-সন্ন্যাসীর গান—

'ভালত ভোলা, শিব, তোমার একি মোহন বেশ,
মাথায় পরেছ মুকুট নেইকো জটার লেশ।
বাঘছাল কোথায় গেল, কোথায় গেল হাড়ের মালা,
মাথায় সাপ কি বনে গেল, হইয়ে ফালা-পালা।'

আরি গান মুসলমান সম্প্রদায়ের মহীর-সঙ্গীত। আরি শব্দের অর্থ ক্রন্দন। কিন্তু এই শোকের মধ্যে বীর পূজার উদ্দীপনা।

'রণে যদি না যাই প্রিয়া হাসোরের দিনে
কেমনে দেখাব মুখ আল্লাতালের সামনে!'

কর্ম-সঙ্গীতেও লোক-জীবনের কর্মধারার শ্রান্তি-অপনোদনের সুর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকগীতিতে শোনা যায়। চাষী ক্ষেতে ফসল ফলায়, মাঝি নদীতে দাঁড় বেয়ে চলে—কখনো স্রোতের প্রবল ধারা, কখনো ভাটির টান, প্রভৃতি কাজ করে। কঠিন পরিশ্রমের কাজ প্রভৃতি রসদ জোগায় গানের সুরে সুরে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এইখানে একদিকে জীবনের বাস্তবতা আর একদিকে কল্পনার রঙের আমেজ।

ভাটিয়ালী, সারি, ধানকাটা, ঢেঁকিপাড়ের গান, ছাদ পেটানী প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম-সঙ্গীত এই পর্যায়ের গান।

ছাদ পেটানীর গানে মধুর বিরহের ব্যঞ্জনা কর্ম-জীবনের কাঁকে কাঁকে—

'তুই যে আমার চান্দের কণা
আন্ধার কইরা কই গেলিলো,

আন্ধার কইর‍্যা কই গেলিলো
পাগল কইর‍্যা কই গেলি লো—'

ধান কাটা গানেও কৃষক প্রেমিকের কণ্ঠে একই ভাবের ছোতনা—

'ওপারে পায়রাণী ধান টিয়ায় কাইট্যা নেল
প্রাণবন্ধুরে খবর দিও যৈবন বইয়া গেল।'

মাঠে মহিষ চরানোর কালে রাখালের গান—

তাত অইল খরখর সন্ধ্যা অইল বাসী
আর ঘন দুধের ক্ষিরসাগে পইড়্যা রইল মাছি
রে মইষাল ভাই!'

এই সব গানের বিরহের ছোতনায় শ্রমিক-জীবন শ্রমক্লান্ত জীবনকে খানিকটা রঙের আমেজে ভরিয়ে রাখে, প্রকৃতিও এখানে অন্তরঙ্গতার সুরে কথা বলে।

বাংলার লোক সঙ্গীতের অপরিমিত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে এমনি সে গান এবং ছড়া সংস্কার থেকে সংস্কৃতির পথে বিকশিত।

লোকগীতির বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গ্রামীন জীবনের ধর্ম, কর্ম, লোকাচার এবং অন্তর নিষ্ঠা ও প্রকৃতি প্রিয়তার কথাই এসে পড়ে। এর সামগ্রিকতায় যে ব্যাপ্তি, সুরের যে দ্যুতি তাকে জীবনধর্ম এবং মর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

বাংলার আউল, বাউল, ফকীর, দেহতাত্ত্বিক—প্রভৃতি মর্ম-সঙ্গীত ভাবের মরুকতমণি। নিরক্ষর গণ-জীবনের যে গভীর রহস্যময়তা, ভূমি থেকে ভূমার প্রতি যে অনুরাগ, যে দার্শনিক-তত্ত্ব—তা কোন দেশের লোক সঙ্গীতে সচরাচর দেখা যায় না। জীবনকে ঘিরে জীবনোত্তর পথের যাত্রা সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতির বিশালতায় পরিব্যাপ্ত।

'বাড়ির কাছে আরশীনগর পড়শী বসত করে!' বাউলের এ-গানের সুর বাঙালীর ধর্ম সাধনার মরুকথা শুধু নয় –গ্রাম-বাংলার মর্মকথা! এই মর্মবাণী বাংলার লোকগীতির সাংস্কৃতিক চেতনা।

॥ পাষাণে প্রাণের ভাষা ॥

(উড়িষ্যা-ভাস্কর্য)

—গীতা মাইতি

হৃদয়কে অপবাদ দেওয়া হয় পাষাণ বলে, কিন্তু ঐ পাষাণও যে প্রাণের লীলা কমলের সৌরভকে ছড়িয়ে দিতে পারে দিকে দিকে তার প্রমাণ উড়িষ্যার দেব দেউল গুলি। মানুষের ভাষা মনের যে ভাব, যে কামনা-বাসনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত ভাস্কর্য গুলি তাদের নীরব ভাষায় মানুষেরই মনের সেই সমস্ত ভাব-ভাবনাকে তাদের পাষাণ অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। যে সকল রূপ-দক্ষ কলাকার যুগ যুগ ধরে তাঁদের সাধনাকে এই পাষাণ মূর্তি গুলির মধ্যে রূপায়িত করেছেন, তাঁরা ব্যক্তিমানের ভাবনার সংগে আশ্চর্য ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন বিশ্বমানবের মন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্প ভাবনার বহমান নদী গুলি এক সংগে কলিঙ্গের শিল্প-মহাসমুদ্রে তাদের ধারা মিলিয়েছে।

সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছরের সাধনায় কলিঙ্গের মূর্তি নির্মাতারা উড়িষ্যায় এক বিশিষ্ট শিল্পরীতির প্রবর্তন করেছেন। এই ভাস্কর্যের গঠন পরিপাট্য, শিখর সম্পন্ন মন্দির নির্মাণের কৌশল উড়িষ্যার ভাস্করদের গভীর শিল্প সাধনার পরিচয় বহন করে চলেছে।

উড়িষ্যার প্রথম যুগের যে সমস্ত মন্দির আজও মহাকালের ধ্বংসকে এড়িয়ে ভ্রাম্যমাণের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছে তার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা দেখতে পাই ভুবনেশ্বর জনপদের পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে। এই মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছিল যখন তখন উড়িষ্যায় চলেছিল শৈলোদ্ভবদের রাজত্ব। জীবনরস-রসিক রাজাদের আনুকূল্যে সেদিন উড়িষ্যা ভাস্কর্যের যে প্রদর্শনী শুরু হয় তারই সমৃদ্ধ পরিণতি আমরা দেখতে পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোণারকের সূর্য মন্দিরের গাত্রে।

প্রাচীনতম মন্দির গুলির মধ্যে এখনও পরশুরামের মন্দির অক্ষত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের জগমোহন অংশটির গাত্রে অজস্র চিত্র উৎকীর্ণ হয়ে আছে দেখা যায়। অবশ্য মহাকালের হস্তস্পর্শে অনেক গুলি ক্ষোদিত চিত্রই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। রামায়ণের কয়েকটি চিত্র, বিষ্ণুধর ও অন্নপূর্ণার মূর্তি, রাবণের কৈলাস তুলন উত্তোলন প্রভৃতি ভাস্কর্য গুলি এখনও দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কোথাও গজ সিংহের মুখের অংশ ক্ষোদিত, কোথাও বা আহার অন্বেষণে রত হংস শ্রেণী। ধ্যানে উপবিষ্ট লাকুলীর মূর্তিও এই মন্দিরে দেখা যায়।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মন্দির সিদ্ধিশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, বৈতাল প্রভৃতি। উড়িষ্যার ভৌম রাজাদের আনুকূল্যে এই মন্দির গাত্রে রূপদক্ষ শিল্পীরা তাঁদের ভাস্কর্য শিল্পের সাধনাকে রূপায়িত করেন। প্রথম পর্যায়ের মন্দিরের শিল্পকর্মের সংগে এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পের সুস্পষ্ট ব্যবধান বর্তমান। এ যুগে শিল্পী মানস ও দক্ষতা অনেক পরিণত।

উপরের তিনটি মন্দির যে একই কালের সৃষ্টি তার প্রমাণ প্রত্যেকটি মন্দিরের সম্মুখে নটরাজ মূর্তির অভিন্ন মুদ্রা। এই সকল মন্দির গাত্রের কোথাও অনল কন্যার ক্লান্ত দেহ ভঙ্গিমার বিপুল একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। উড়িষ্যা রীতির বিশিষ্ট ফুল লতার কাজও এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য সুষমার পরিচায়ক।

উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরটি আনুমানিক দশম শতাব্দীর সৃষ্টি। এই মন্দিরের প্রবেশ পথে কারুকার্য খচিত অর্দ্ধবৃত্তাকার তোরণটি শিল্প সুষমার এক নিদর্শন। মন্দির দেহের মূর্তি গুলিও পরিণত ভাস্কর্য শিল্পের সার্থক পরিচয় বহন করছে। শিশু ক্রোড়ে সপ্তমাতৃকা, গণেশ, কার্ত্তিকের প্রভৃতি মূর্তিগুলি সে যুগের ভাস্কর্যের সুন্দর নিদর্শন।

ত্রয়োদশ মন্দির শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। লিঙ্গরাজের সমুন্নত মন্দিরের বুঝি এমন কোন কোণ, এমন কোন শিখর নেই যেখানে শিল্পীর ধ্যান, ভাস্করের সাধনা না কান্ত করছে। বিচিত্র ও বিভিন্ন ভঙ্গীর শালিক, উপশিষ্ট, হস্তায়মান শত শত মূর্তি দেখলে মনে হয় যেন বিশ্বকর্মা ও তাঁর সহ কারিগরেরা তাঁদের ধ্যানকে পাষাণে রূপদান করেছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশেরই কত ভঙ্গিমার মূর্তি কোথাও নিরেট কালো পাথরে গড়া তাঁর অবয়ব যেন এক বিস্ময়কর সাধনা-প্রতিমা। আবার কোথাও বালুপাথরে উৎকীর্ণ অপূর্ব নৃত্যশীল অঙ্গ ভঙ্গ। কোথাও বস্ত্র-পরিধান রত বিজ্ঞাপনা নায়িকা মূর্তি। দেহের চারু সুষমায়, নয়নের সলজ্জ ভঙ্গিতে, করাঙ্গুলীর শিল্পসম্মত বিন্যাসে, দেহের বঙ্কিম ঠামে সে নারী বিশ্বের কলা মূর্তীদেরও। অনুরাগ লীপ্ত মিথুন মূর্তির অভাব নেই লিঙ্গরাজের মন্দিরে। অসংখ্যের অংশে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শিল্পরূপ লাভ করেছে। কোথাও হনুমান সীতাদেবীর ভার গ্রস্ত করে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী, কোথাও মুকুর ধারিণী মুগ্ধ মনে আবেশে আপনার চারুমুখখানি নিরীক্ষণ করছে।

দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। এমন শিল্পের সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞ আমাদের অপার বিস্ময়কেই শুধু জাগ্রত করে।

এই মন্দির নির্মানের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আর এক মন্দিরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। সে মন্দির আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার শিল্পের উৎকর্ষতায় শিল্পরসিকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। এই মন্দির ভুবনেশ্বরে অবস্থিত রাজারাণীর মন্দির। এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। পরিত্যক্ত অবস্থায় এই মন্দিরটি আশ্চর্য সব শিল্পের আলেখ্য নিজদেহে ধারণ করে রয়েছে।

রাজারাণী মন্দিরের চারুহাসিনী স্বর্ণবর্ণধারিণী কিংবা নিষ্ণাত মুগ্ধ আনন্দ বিস্ময়ে দেখছেন যে জননী মূর্তি তার তুলনা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশাপার্শ্বচরী, নটরাজ ও আরো অগণিত মূর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এই মন্দিরে। লীলায়িত ভঙ্গিমায় তরুণাধার চরণ স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে যে অনন্য কন্যা সে পথিকের দৃষ্টিকে বারবার আকর্ষণ করে নেয়।

উড়িষ্যার ভাস্কর্য কলা বুঝি তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করেছে কোণারক মন্দির প্রাঙ্গণে। এই মন্দির পরিকল্পনায়, এর ভাস্কর্য কলায় যে বিস্ময় উদ্ভাসিত হচ্ছে তা উড়িষ্যার পথ প্রান্তর অতিক্রম করে পৌঁছেছে বিশ্বের রসিকজনের দরবারে। কোণারকের মন্দিরের বিশাল প্রস্তরখণ্ডগুলি দিন-মাস-ঋতু-বর্ষচক্রে আবর্তীত হয়ে যেন অখণ্ড আনন্দ মূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে কালজয়ী শিল্পীর হাতে।

বিশ্বপ্রাণের দেবতা সূর্য এই মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা। সূর্য থেকে জন্ম নিয়েছে এই জীবধাত্রী ধরিত্রী। ধরিত্রীর কূলে প্রাণের যে বিচিত্র লীলা তার উৎস বিপুল প্রাণসম্ভব সূর্য দিবাকর। তাই দেখা যায় এই মন্দির দেহে জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মের চিত্র রূপায়িত হয়ে আছে। এই মন্দির যেন বিশ্বপ্রাণের এক বিস্ময়কর রথ। এই রথের সারথি স্বয়ং বিশ্বদেব সূর্য। এই রথের বারোটি চক্র যেন বারোটি মাসের প্রতীক। আর যে সপ্ত অশ্ব এই রথটিকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে তারা সপ্ত দিবসের প্রতীক। দিন রাত্রির আলো অন্ধকার মাস-ঋতু-বর্ষের পথ পার হয়ে এই রথ চলেছে অবশ্য জীবনকে বহন করে মহাকালের পথের

ওপর দিয়ে। রথ চক্রের অর্কগুলিতেও শিল্পীর দক্ষ ভাস্কর্য সাধনা কোদিত হয়ে আছে। মন্দিরের বিভিন্ন দিকে সূর্যের বন্দন নীলাভ পাষাণ মূর্তি। সেই মূর্তি নির্মাণে একদিকে শিল্পীর বলিষ্ঠ দৃঢ়তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি লাবণ্যময় এক কোমলতা মূর্তির সারা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। সূর্য মূর্তি কোমলে কঠোরে সত্যিই শিল্পীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

সমস্ত মন্দির গাত্রে ভাস্কর্যের যেন শোভাযাত্রা চলেছে। নাটমণ্ডপে নর্তকীরা বিভিন্ন মুদ্রায় নৃত্যরত। জগমোহনের উপরে উঠে এলে সে আর এক বৃত্ত। কোথাও কামমুখ চলেছে গজেন্দ্র গমনে। কোথাও বা মুদঙ্গ বাদিনী, মুরলী আর বল্লিকা বাদিনীরা মন অপূর্ব লীলা ভঙ্গীতে বাদনরত। তাদের অলঙ্কার পরিকল্পনায়, ছন্দিত দেহের সুষমা রচনায় শিল্পীর প্রশংসনীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তিগুলির কিছু কিছু ক্ষয়, কিন্তু শিল্পীর অস্ত্রের সাধনার সাক্ষী হয়ে আজও তারা দাঁড়িয়ে আছে।

বিশাল মন্দিরের এমন কোন দিক নেই যেখানে শিল্পীর দক্ষ হাত কাজ করে যায়নি। কোথাও ফুললতার কাজ, কোথাও ফুললতার সুষমা। কোথাও বা অতিকায় বলিষ্ঠ অশ্বকে ধরে রেখেছে আরোহী।

একদিকে দর্পণধারিণী স্নিগ্ধ হাসি টেনে মুকুরে নিজ মুখশ্রী দেখছে। বোধ হয় নায়কের সঙ্গে মিলনের পূর্বে সমস্ত প্রস্তুতি।

মন্দিরের বহু ভাস্কর্যের মধ্যে একটির কাছে এসে শুধু বিস্ময়ে বলিষ্ঠ দর্শককে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

প্রেমিক ভুলে ধরেছে প্রেমিকার মুখ খানি। প্রেমিকের মুখে যেন প্রেমের আনন্দময় মন্ত্রধ্বনি, আর মোহাবিষ্ট নায়িকা যেন বহুত আবেশে অন্ধ্রাচ্ছন্ন।

উড়িষ্যার শিল্পীরা যথার্থ প্রেমিক না হলে, জীবনের এমন সার্থকতম চিত্র ফুটিয়ে তোলা কোনরকমেই সম্ভব হত না।

জড়, আকার সৌষ্ঠবহীন পাষাণের বুকেও যে অমন্ত প্রাণলীলা সুপ্ত হয়ে আছে তারই অপার রহস্য-লোকের সন্ধান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন উড়িষ্যার কালজয়ী শিল্পীর দল।

উড়িষ্যার পল্লীগীতি

সুকুমার রায়

উড়িষ্যার লোকসঙ্গীতিকে বিষয়বস্তু অনুসারে অন্যান্য দেশের লোকসঙ্গীতির মত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :—(১) ধর্মসঙ্গীতি (২) উৎসব-অনুষ্ঠানের গান (৩) গাথা সঙ্গীতিকা (৪) কর্ম-সংগীত—চাষবাসের, গাড়িওয়ালার, মাঝি মাল্লার, জল আনার, সেলাই কোঁড়ার, খেলাধুলা ও ঘুমপাড়ানীর গান (৫) বাজিকরের ও পাঁচালীর গান এবং (৬) বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক রীতি ও আদিবাসীদের গান। এসব শ্রেণীর গান ছাড়া অন্যধরণের গানেরও প্রচুর উদাহরণ মিলে।

মৌখিক রচিত কথা এবং সুরছন্দের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ নিয়েই পল্লীগীতি তৈরী হয়। মুখে মুখে প্রচলিত গান ধীরে ধীরে বিশিষ্ট প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আরো রূপান্তরিত হয়ে সংস্কৃতির ছোঁয়া পেলে তখন রূপটি হয় স্বতন্ত্র। এরূপ ছোঁয়া দুরকমে হতে পারে কথায় অথবা সুরে। বাংলা বহু ধর্মীয় গানের উৎপত্তি হয়েছে মূলত লোকগীতি থেকে এখন আর সেগুলো লোকগীতি নয়। উড়িষ্যার "ছান্দ" গানের রূপটী যদিও সুরের দিক থেকে এখনো অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক রীতি রক্ষা করছে, কিন্তু ভাষারূপের দিক থেকে সে যুগের ওড়িয়া অমর কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের হাতে সে গান প্রাচীন ধর্মীয়গানের পর্য্যায়ে এসে গেছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীনিমাইচরণ হরিচন্দনের গান এইরীতির লোকসঙ্গীতির সাক্ষ্য বহন করে। সুরও ছন্দের দিক থেকে মৌলিক রীতির একটি ছান্দ : মায়ামৃগ দেখে সীতার বিলাপ :

আহা ধনুর্দ্ধর বীরবর। ধনুশর ন দিলা কি কর
যাহার বাণ ব্রহ্মাণ্ড বহি পারে। তাকু মাইলা প্রণত (অসুর) ছার, রে দৈব।
আহু ন দিলে মোর যো পতি। জানন্তি সে পতির বিপত্তি
বুঝি ন পারি মু সরতে অইলী। মোহ জন্তু বিনা সব পাঠ, রে দৈব।

গানের সুরের মধ্যে আছে কতকটা বিলাপের মত ভঙ্গি টপ্পার তানের মতো টান এবং তাল অপ্রধান। খুব কমই মিলে এ ধরণের গান।

"জনান" গানকে আজকাল প্রাচীন ভক্তিমূলক গানের পর্য্যায়ে ধরা হয়ে থাকে। বহু বিভিন্ন ধরণের ওড়িয়া লোকসঙ্গীতিতে অনুরূপ গান মিলে। এই গানে,—জগন্নাথ দেবকে সরাসরি অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে দুঃখ দানের জন্যে অভিযোগ করা বা দায়ী করা—এ ধরণের বিষয়বস্তুই প্রধান। বর্তমানে এ গানের সুরে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু গানের মধ্যে যে করুণ রস আছে এর মূল উৎস স্বতঃস্ফূর্ত। পুরীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে লৌকিক রীতি জনান শুনে দেখেছি সত্যি ভিখারি জগন্নাথদেবকে দুঃখ জানাচ্ছে। লোকসঙ্গীতিতে ব্যথার সুরে অভিব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে জনান'র কথা উল্লেখ করা গেল, যদিও জনান অনেকাংশে সংগীতের ক্ষেত্রে বর্তমানে সুসংস্কৃত ধর্মীয় গীতিরূপে পরিগণিত।

"ছাসকাঠিয়া" উড়িষ্যার বিশেষ জনপ্রিয় লোকগীতি। এ গান মূলত ছিল সাধন সংগীত-দাস আগে গায়ক। এ গানের উৎপত্তি গঞ্জাম এলাকায়। বর্তমানে দাসকাঠিয়া সাধন সংগীত থেকে স্বতন্ত্র। দুজন গায়কের একটি দল একজনের হাতে রামতালি, অন্যের হাতে কাঠি। একজন মূলগায়ক, কিন্তু দুজনই প্রধান। দুজন সাদা মাথায় পাগড়ী পরে গায়ে চাপকান ধরনের কোট নীল লাল অথবা অন্য রঙের পট্টবস্ত্র পরে সেজেগুজে আসরে এসে দাঁড়ায়। গান আবৃত্তিমূলক, রসিকতা পূর্ণ, সুরে একঘেয়ে, ছন্দে তালে বহুবিচিত্র, অভিব্যক্তি পৌরুষপূর্ণ, কোথাও দুজনে কলেবর ঘাবণঘর, প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়। রসিকতা একঘেয়েমি ভাঙে।

"খঞ্জনী ভজন"প্রচলিত ভজন ও বহু বিষয় অবলম্বন করে এই প্রার্থনামূলক গান মুখে মুখে উড়িষ্যার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। "থকা মন চাল যিবা" (শ্রান্ত মন চলো) "চকামনু দেখিবা" (চক্ষু নয়ন জগন্নাথকে দেখব) অথবা "মন কচ্ছচিরে পাইলা যে মজা" (যে মন যে ধন পাওয়া গেছে তাকে হারিও না:) "পরম পুরুষ রত্নকু ছাড়ি কনু গড়গড় পুজা (পরম পুরুষ রত্নকে ছেড়ে শুধু পাথর নুড়ি পূজা করলুম): খঞ্জনী মানে কাঠের গোল যন্ত্রটিতে গোসাপের চামড়ার তৈরি ছাউনী লাগে যাতে মন্দিরা কোনটাতে মন্দিরা গাঁথা থাকে। এযন্ত্রটির প্রচলন অবশ্য বাংলা ও উত্তরভারতেও আছে।

"ঘুলুকী গীত"—'কেলা' গোষ্ঠির লোক খমকজাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে গান আর কেলুনীরা নাচে। এ গান নৃত্য সম্বলিত। এতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান যথেষ্টই আছে, কিন্তু গানগুলো কিন্তু হাল্কা ভাবের আমেজ এনে দেয়।

"ঘোড়া নাচ গীত"—চৈত্রাদী গানের একটি বিশেষ রূপ অশ্বমুখী বাশুলীর পূজা উপলক্ষে বিশেষ করে কৈবর্তদের গান। চৈত্রপূর্ণিমা থেকে এর আরম্ভ। উড়িষ্যার ভিন্নস্থানে বিখ্যাত বাশুলী দেবী মন্দিরে এ উৎসব হয়। ঘোড়া নাচ গীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঘোড়া সেজে নৃত্য এবং সেই সঙ্গে গান। এ গানের যন্ত্র চোল এবং মহুরী (সেনি শানাই)। ঘোড়ার নাচের তালে তালে গায়ক করতাল বাজিয়ে গান করে অথবা গায়ককেই ঘোড়া অনুসরণ করে। গায়ককে বলা হয় "রাউত" এবং গায়িকাকে "রাউতানী"। ঘোড়ানাচ গীতের আরম্ভের সময়ের "বাইগণ পুজা মলা (বেগুনের গাছ মরেছে)। সর্বমঙ্গলাকু মু জনাউছি (সর্বমঙ্গলাকে আমি জানাচ্ছি) যো গীত অনুকূল হেলা (আমার গান করবার সুযোগ হল)।

"ছাতনাটগীত"—শৈবতন্ত্রের গান। বিবিধ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক একই শৈবতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষ করে শিবপূজা অবলম্বন করেই এ গীত প্রচলিত হয়। ছাত কথির উদ্দেশ্য থাকে রসচর্চা। বাংলা দেশের শিবের গাজনের মতোই এ গান অত্যন্ত সাধারণ এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানাভাবে প্রচলিত। বাংলা থেকে আরম্ভ করে কর্ণাটক পর্যন্ত এই শৈবতন্ত্রের প্রচার হয়েছিল।

"পাটুয়া ষষ্ঠী পাটুয়া ইত্যাদি"—কেউ বলেছেন বাংলাদেশের পটুয়া গান বা নাচের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এর সঙ্গে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই বাংলার পটুয়া পট চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ওড়িয়া পাটুয়া শাক্ত দেবীর উৎসব উপলক্ষে গীত। পাটুয়ানাচের দৃশ্যটি এইরূপ-মাথায় থাকে কাঠের লম্বা মুকুট বা শিরোভূষণ। এর ওপর ফলস। নাচবার সময়ে লোকটি ছোটো কাঠের খুঁটি পরে, তার ওপর ভর করে নাচে। অবেকটা যেন সার্কাসের ব্যাপার ঘটে যায়। শক্তির আরাধনায় এরা মুখে মুখে গান রচনা করে। কিন্তু গান আরম্ভ করে ঘোড়া নাচের মতো একই রকমে "গা গহীরীর বেত, মা ষষ্ঠলাকু যো ভগবত, অনুকূল হেলা গীত।" উড়িষ্যা বহু শাক্ত পীঠের মধ্যে কয়েকটিতে বিশেষ স্থলেই পাটুয়া বা রণপা-ষষ্ঠী-পাটুয়া প্রচলিত।

বঙ্গীয় রীতির বহু প্রকাশের মধ্যে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ভাগবত অবলম্বিত গানের পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত দেবীর গানের অস্তিত্বও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কাছু ছাড়া গীত নাই কথাটি উড়িষ্যা সাধারণ জনগনের গান

সম্পর্কে খাটে না, কিন্তু বর্ষার প্রাচীন সংগীতের প্রায় অনেকটাই কৃষ্ণরাধা সম্বলিত। জগন্নাথ সংস্কৃতির দেশে জগন্নাথের রূপও গানে স্পষ্টও প্রত্যক্ষ। এ ছাড়াও লৌকিক স্তরের মধ্যে ভীম ভোইর রচনা বা মহিমা ধর্মের গান, অলেখ সম্প্রদায়ের গান এবং নাথ সম্প্রদায়ের গানও চলিত ছিল। ছান্দরচনায় ভাষায় ঐতিহাসিক কবি উপেন্দ্রও নিজে বাঁধ সাধক ছিলেন।

গাথাগীতির মধ্যে দুটো বিশিষ্ট ধরনের রচনার কথা উল্লেখযোগ্য বোধ পারে গোবিন্দ চন্দ্রের গান, ঘটনা গাই গীতি। গোবিন্দচন্দ্রের গান নাথ গীতিকা। নাথ সম্প্রদায়ের এই রচনা বাংলা ও উড়িষ্যায় একই রূপ পেয়েছে। নাথগীতিকা বাংলা থেকে উড়িষ্যায় প্রসারিত। গাথাগীতি সাধারণ জনগণের জীবন সমস্যা, বাইরে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে নি। বাংলা দেশেও গাথাগীতির এ দুর্বলতা লক্ষণীয়।

আনুষ্ঠানিক গানের মধ্যে রথ উৎসবের গান একটি প্রধান মেয়েলী গানের সম্পদের দেয়। আষাঢ় মাসের এই উৎসব উপলক্ষে নারী সমাজে বড় আকর্ষণীয় লোকগীতি প্রচলিত হয়ে-দোলার মর্মস্পর্শী গান বলে উল্লেখ করা যায়। তিনদিন এই রজদৌলী উৎসবের তিথি। পৃথিবী সৃষ্টির জন্যে তৈরী হচ্ছেন। তখন তার বুকে আঘাত প্রতিঘাত চলবে না। ঘরে তিন দিনের খাবার তৈরী, উনুন জ্বলবে না। মেয়েরা খালি পা ঘাসিতে ফেলবে না কিছু অনুষ্ঠানে দোলায় উৎসবে মেতে উঠবে। একজন সাজবে দোলাবাহী ওরা গাইবে :—

বসন্তে ডাকিলা গজ। বনে হাতী ডেকে গেল
অসল যৌন দিব ও আজ। আজকেই আসল যৌবনের দিন
নব বাজলো আজিত পহিলি রজ। নিজেকে সাজাতে আজ প্রথম রজস্বলা
নহি, আসিছি পহিলি রজ। সখি, পয়লা রজ এসেছে।
রজবতী বসুমাতা। বসুমতি রজস্বলা হয়েছেন
হেনা, যতা, পোড়-পিঠা সন্তীতা। হাবা, যতা পোড়-পিঠে বাখা আছে
সবুরি ঘরে সো, ক্ষীরি ভোগ যে সন্তীতা। সকলের ঘরে ঘরে ক্ষীর ভোগ
আম ক্ষীরি ভোগ যে সন্তীতা। আমাদের ক্ষীর ভোগও রাখা আছে।
কাল খাকি পান দিস। গালের ভেতরে পান পুরে দিয়ে
দোলী খেল ঠেই কুমারী মেল। কুমারীরা একত্রিত হয়ে দোলা খেলছে
সহকে সুহলো কিয়ে কেতে হয়ে গেল। সুখের গল্প, সবার হাসির এক ছল
রঙ্গে কিয়ে হয়ে কেতে গেল। আনন্দে কত পরিহাসই না এল।
বাড়ি বড় গছ ভালে। বাগানের বড় গাছের ডালে
জেন্থা বান্ধি দোলি খেলিবা বোল। পাটুকে দড়ির মোলাতে ঝুলন খেলার সময়
খুশি মনরে সো গাউহন্তি তালে তালে। খুশি মনে তালে তালে গায়
সত্ত, গাউহন্তি তালে তালে। সত্যি, গাইছে তালে তালে।

শারদ পূর্ণিমায় যখন বাংলায় লক্ষ্মী পূজার উৎসব তখন উড়িষ্যায় একটি বিশেষ উৎসব রাত্রির উদ্‌যাপন চলে—কুমার উৎসব। কুমারী অথবা কেহ কোন অঞ্চলের কুমার কুমারীদের উৎসব বলেও। গানের মধ্যে এক বিচিত্র ভবিষ্যৎ-বিলাসাকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়;

কুঁয়ার পুনেইজন গো। কুমার পূর্ণিমা চাঁদ গো
ফুল-ঘউন-বেণী। ওগো ফুল-ঘউন- বেণী

কুমারীমানে যে পুচি খেলুছন্তি। কুমারীরা মিলে পুচি খেলছে।

খুঁটিয়া শবদ শুণ গো। পাতের মলের শব্দ শোন গো।

কুল-বউল-বেণী। ওগো, কুল বউল-বেলা।

হাঁ৷ পুচিপাথার গানে মেয়েরা কোন ঘরের আঙিনায় একসঙ্গে জড় হয়ে বিকেলে নৃত্য ভঙ্গীতে কোমর উঁচু আর পায়ের মলসের মুক্তির ছন্দে খেলা করে। অনাবিল আনন্দে অর্থশূন্য গানও গায়।

বিবাহের গানের প্রচলন যেমন বেশী নেই, বরং বিবাহের পর স্বামীর ঘরে যাবার বিদায়ে 'কাহ্নী' গানের প্রচলনই সমধিক। অন্তঃশ্রেণীর মেয়েলী গীতের মধ্যে "চিতা কুটা (কেশুনী) গীত" অর্থাৎ ছুঁচ ফুটিয়ে যুবতীর হাতে বুকে কপালে কইকর চিত্র আঁকার উপলক্ষে তাকে ভোলাবার জন্যে গানের প্রচলন ছিল। কর্মগীতির মধ্যে বিশেষ হচ্ছে "হলুয়াগীত।" শেষ রাত্রিতে হাল নিয়ে চাষীর মাঠে যাত্রা, হাল চাষের কথা। হাঁড়িতে করে মাঠে ভাত নিয়ে আসার কথা ইত্যাদি নিয়ে মৌখিক রচনা চলে। গানের ভাষা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুরের শেষের টানটা দীর্ঘায়িত।

ওড়িয়া ভাষার মৌখিক রূপান্তরের ফলে আঞ্চলিক ভাষা অন্যান্য দেশের গানের মধ্যে রূপ পেয়েছে। এদের দক্ষিণ অঞ্চলে কোরাপুট, গঞ্জাম প্রভৃতি এবং উত্তরাঞ্চলে সম্বলপুর প্রভৃতি এলাকার ভাষার রূপে মৌখিক প্রভাব আছে। দক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাটকী ও উত্তরাঞ্চলে হিন্দি প্রভাবের লক্ষণ মিলে। এর মধ্যে সম্বলপুর অঞ্চলের ভালখাই গীতের প্রাধান্য আছে। রচনা জীবন নির্ভর, এতে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বন, কিন্তু সহজেই নর-নারীর বাস্তব সম্পর্কে এসে পড়ে। পুরুলিয়ার মতো ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি এখানকার করমগানও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এ গান মূলত আদিবাসী থেকে এসেছে।

সম্পূর্ণ উড়িষ্যার একতৃতীয়াংশে জনগণ আদিবাসী। বিশেষ করে এঁরা সাঁওতাল, ভুঁইয়া, কাঁচা পরজা, গড়বা, জুয়াংগ, সাউর, গোন্ড, শবর প্রভৃতি। এদের মধ্যে অনেকেই এখনো উন্নতির মুখ দেখতে পায় নি, ফলমূল আহরণ ও শিকার এদের উপজীব্য, কুসংস্কারনির্ভর এদের জীবন। লিখিত ভাষা না থাকায় গান এদের মুখে মুখে ফেরে। কিছু কিছু মৌখিক কাহিনীও আছে। বাইরের গানেও এরা প্রভাবিত হচ্ছে।

মোটামুটি উড়িষ্যার পল্লীগীতির কতকটা ব্যাখ্যা করা গেল। ভাণ্ডারটি বিরাট। ওড়িয়া ভাষায় কয়েকটি ভাল ভাল সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সুরের রূপ সংগ্রহের তেমন ব্যবস্থা এখনো নেই। নৃত্যের-স্বাভাবিক প্রবণতা অনেক ওড়িয়াগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মযূর ভঞ্জের ছউনাচ মূক লোক—নৃত্য মাত্র, সংগীত সঙ্গে সম্পর্ক নেই। জগন্নাথের রথের গতির সঙ্গে রথের ভেতরের সমাগত জনকে যেমন আনন্দে সামান্য দূর থেকে নাচতে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকগীতিতে যেন সেরূপ একটা ছন্দপ্রাধান্য এবং তাল-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। অনেক গায়েনের বিশেষ গুণ রসিকতা। সুর সাধারণত ব্যক্তি-নির্ভর। প্রাচীন ধর্মীয় গীতি অর্থাৎ ওড়িশী, চম্পু ও জনানয় কিছু কিছু উপাদান অনেক লোকগীতির সুরেই মিলে।

উৎকলে পালপার্বণ

—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালের পুরী। উৎকল তথা কলিঙ্গের অংশ। পুরী তখনো পুরীধাম হয় নি, হয়নি জগন্নাথ—সুভদ্রা—বলরাম এই ত্রিমূর্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র। রাজা ছিলেন সেকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন, রাণী গুণ্ডিচারানি। জগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশ দিলেন রাণীকে এক রাত্রে—'আমি প্রচ্ছন্ন, হয়ে রয়েছি অনেকদিন এবার আমার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করো।' দেবতা কোথায় রয়েছেন আত্মগোপন করে? আবার স্বপ্নাদেশ হল—'আমার মূর্তি অমুক অঞ্চলে বনজঙ্গলের মাঝে কোনখানে রয়েছে দৃষ্টির অগোচরে।' কোথায়? কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে সেই মূর্তি লুক্কায়িত? দেবতা জানালেন—'খোঁজ, খুঁজতে থাকো, হদিশ তো বলে দিলাম, বাকিটুকু তোমার কৃত্য।' অতএব চলল অনুসন্ধান। শেষে পাওয়া গেল সেই মূর্তি। মহাসমারোহে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হল। কেবল শ্রীজগন্নাথ নয়, সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম। যুগ্ম ত্রিমূর্তি। একে তিন, তিনে এক।

রাণী আবার প্রত্যাদেশ পেলেন। অস্পৃশ্য ও অচ্ছুৎদের মধ্যে দেবতার ভক্ত আছে, অথচ সর্বত্র তাদের যাতায়াতের অধিকার নেই। কিন্তু তারা কি তাই বলে নবাবিষ্কৃত দেবমূর্তির দর্শন পাবে না? কিভাবে পাবে দেবতাই উপায়নির্দেশ করলেন—মন্দির থেকে মন্দিরেরই আকৃতির রথে আরূঢ় হয়ে বিগ্রহ বাইরে আসবেন—কাঠের সচল রথ—আসবেন পথের উপরে, খোলা নীল আকাশের নীচে, জাতিধর্মনির্বিশেষে ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে বনজঙ্গলের মাঝে লুক্কায়িত অবস্থা থেকে একবার দেবতা যাত্রা করেছেন মন্দিরাভিমুখে, অধিষ্ঠিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেখানে—এবারে তাঁর (তাঁদের) নবযাত্রা কাষ্ঠযানে আরোহণ করে। দৈবাদেশ, অতএব যাহাপনা হল সেই ব্যবস্থাই—হল জগন্নাথদেবের 'নবযাত্রা'—তথা রথযাত্রা।

এই হল পুরীর এবং উড়িষ্যার রথযাত্রার উৎস—ইতিহাস। সেই প্রথমবারের পর থেকে ব্যাপার রূপ নিলে মহোৎসবের—জাতীয় উৎসবের— প্রতি বছরেই তাই এর পুনরনুষ্ঠান।

বাংলাদেশে যেমন দুর্গোৎসব, উৎকলে তেমনি রথযাত্রা উৎসব। এ-উৎসবের আবার কেন্দ্রবিন্দু পুরী শহর। সেখানে জগন্নাথ মহাপ্রভুর সুবিরাট মন্দির। দেবতার তৎসমুচ্চ মহিমা আকাশগামী। নিত্য দেবসেবার আয়োজন। অগণিত ভক্ত। বছর জুড়ে যাত্রীর আনাগোনা। পুরীর মন্দিরকে ঘিরে সারা পুরী জেলায় রথের সমারোহ লক্ষ্য করা যায় বিশেষভাবে। তাছাড়া উড়িষ্যার অন্যান্য অংশেও তারই অনুকৃতি। উৎকলে জাতীয় উৎসব।

জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ। জয় দেবী সুভদ্রা। জয় দেব বলরাম!

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" পুণ্য হবে, উপরন্তু পুনর্জন্মের ভাবনা নেই।

ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি। আর মাঝে মাঝে ভক্তকণ্ঠের জয়ধ্বনি। 'জগন্নাথের রথ চলেছে জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথের তলে সবাই করে পর্ব'। বাতাসের হরির লুঠ চলেছে মাঝে মাঝে। তাই নিয়ে কড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি।

রথের গতি শুরু হল কোনও একখানে এসে। এ হল "মাসির বাড়ি"। সুভদ্রা ত্রিমূর্তি এখানেই অবস্থান করবেন, বিশ্রাম করবেন সপ্তাহ ধরে। আটদিনের দিন আবার ফিরে চলবেন মন্দিরাভিমুখে।—পুনর্যাত্রা।—উল্টোরথ। উল্টোরথের পালা শেষ হলে তবে রথোৎসবের পরিসমাপ্তি। আবার হবে একটি বছর পরে।

উড়িষ্যার পালপার্বণ বলতে তাই প্রথমে আসে রথযাত্রা। এ-উৎসব বাঙালীরও। কিন্তু উৎকলের মত বাংলাদেশে এটি মুখ্য পার্বণ নয়। তবু মহেশের রথোৎসব সুবিখ্যাত।

শুধু কি পুরী জেলা? কিরঙ্গড়, কালাহাণ্ডি, সম্বলপুর, গঞ্জাম, সুন্দরগড়, কটক, বালেশ্বর—কোথায় নয়? শুধু কি রথযাত্রাই? মন্দিরের বাইরেও উৎসব—সেখানে আপামরজনসাধারণ অংশভাক্—সে হল মেলা। রথতলা নির্দিষ্ট হয়েছে একজায়গায়, সেখানে বসেছে রথের মেলা। কাঁসার বাসন, পিতলের বাসন, লোহার হাতা-খুন্তি -খুরপি-কাস্তে-দা-বঁটি বাঁশের আর বেতের নানা জিনিসপত্র। বিভিন্ন কুটিরশিল্প। কেউ কিনছে, বেচছে কেউ। মেলার চেহারা বাংলাদেশে যা, উড়িষ্যাতেও তাই।

কথায় বলে রথ—দোল। আর বলে দোল—দুর্গোৎসব। দোলযাত্রা উড়িষ্যাবাসীকে মনে করিয়ে দেয় শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোপিনী সমভিব্যাহারে দোলক্রীড়া। রঙে রঙে রাঙা চারিদিক। প্রধান 'প্রতিপক্ষ' শ্রীরাধা। আবির, কুঙ্কুম, কাগ—সবই রক্তিম। শ্রীরাধিকার মনটিই যে রক্তিম—লাল রক্তিম, রাগরক্তিম। কৃষ্ণ—অনুচর আর, রাধা-সখীরা গৌন, ওরা পারিপার্শ্বিকের প্রতিভূ। দোলযাত্রার দিন সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথদেব লালে লাল। দেবতা আর মানুষ উভয়েই রঙিন এই দিনে—তা সে পুরী জেলারই হোক, কিংবা গঞ্জাম-কোরাপুট-সম্বলপুর-কটক-ই হোক। সুন্দরগড়, বালেশ্বর, কিরঙ্গড়ও বাদ যায় না।

দুর্গোৎসবও আছে। কৃষ্ণাবতারে আর দুর্গারূপে মূলত প্রভেদ কিছু নেই। তাঁকে যেভাবে ভজনা করবে সেভাবেই তো তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! কটকের দুর্গাপূজা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কটক শহরের আশপাশ থেকে এই উপলক্ষে বহুলোকের আগমন হয়। মেলা বসে—সেখানে পালা, দাশকাঠিয়া, রামলীলা গোটিপুয়া নাচের আড়ম্বর। তাছাড়া নানা কুটিরজ জিনিসপত্রের আর কাঠের সামগ্রীর ভিড়, বেচাকেনা। পুরীর দুর্গাপূজায় এসে জড়ো হয় প্রায় ৫০,০০০ ভক্তদর্শক। বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলায় দুর্গোৎসবেরও বেশ ধুম, বহু লোকের আনাগোনা, মেলার সম্ভার। ভুবনেশ্বরের দশহরা উৎসবে কম করে একহাজার জনসমাগম হয়। দশহরা উৎসবের প্রচলন আর দেখা যায় কালাহাণ্ডি ও সম্বলপুর জেলায়।

রাসযাত্রা আর ঝুলনযাত্রা—এ দুটিও কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত পার্বণ। দুইটি উড়িষ্যার সর্বজনীন অনুষ্ঠান। রথ আর দোলের যেখানে যেখানে আড়ম্বর বেশি, সেই সেই জায়গাতেই রাস আর ঝুলনেরও উৎসব। রাসমঞ্চ তৈরী হবে, কুসলতাপাতায় মন্দির, মঞ্চ ও বিগ্রহ সাজান হবে, তৈরী হবে দোলনা। রাধাকৃষ্ণ পূর্ণিমা তিথিতে ঝুলনায় এসে বসবেন। রাস পূর্ণিমার শ্বেতচন্দ্র আনন্দে হাসবে আকাশে। সম্বলপুরের ঝুলনেরই নামডাক বেশি।

যিনি শিব তিনিই কৃষ্ণ। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল। আর কৃষ্ণ তথা বিষ্ণু তো মঙ্গলময়ই। শিবরাত্রি তাই উৎকলবাসীর প্রধান তিথি। কটকে যান, পুরীতে আসুন, বালেশ্বরে পদার্পণ করুন, কিংবা ময়ূরভঞ্জ—সুন্দরগড়

কিয়ড়, কালাহাণ্ডি, গঞ্জাম, কোরাপুট—সম্বলপুর ঘুরে দেখুন,—শিবের তিথিতে ভিড় লেগেই আছে দেখবেন শিবলিঙ্গের চতুর্দিক ঘিরে।

মকরপর্ব উদ্‌যাপন করে ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, কটক ও কিয়ড়ে মেলায় মানুষই বেশি। মকর পর্বকে অন্য কথায় মকরযাত্রা বা মকরসংক্রান্তি উৎসবও বলে। মেলা এ পর্বের অঙ্গ।

পাল আর পার্বন, ব্রত আর পরব—সাধারণ মানুষ তো একরকম বেঁচে আছে এদেরই মধ্যে। এরা যদি না থাকত দৈনন্দিন জীবনে, মানুষ কোথা থেকে জীবনীরস আহরণ করত তা জানিনে। কতকগুলো পরবের রয়েছে শাস্ত্রীয় ভিত্তি,কতকগুলো আবার পুরোপুরি লোকভিত্তিক। তেমনি একটি হচ্ছে কুমারী (কুমার) পূর্ণিমা। এর অনুষ্ঠান কার্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে। প্রধানত মেয়েদেরই অনুষ্ঠান, মেয়েরাই উপবাসাদি করে থাকে, তবে এর আর একটি বিশেষত্ব আছে—নববিবাহিত বরবধূ বিবাহের প্রথম বছরে এই উৎসবটি বিশেষ করে পালন করবে উড়িষ্যায়।

আরেকটি লোকানুষ্ঠান ধানুযাত্রা। কুমারী পূর্ণিমাতে চলন বেশি ময়ূরভঞ্জেই। অবশ্য দেশের সব জায়গায়ও আছে। আর ধানু বেশি দেখা যায় বালেশ্বর ও কটক জেলায়। ধানু শুরু হয় পনাসংক্রান্তির দিন। পনাসংক্রান্তি হল বৈশাখের শেষ দিনটি। এরই অপর নাম পাটুয়া। পাটুয়া উপলক্ষে সাতদিন উপবাস করা হয়। ধানু পরবে ব্রতধারীরা লম্বা লম্বা কাঠের 'রণপা'-য় চ'ড়ে সারদা-বিমলা-কমলা প্রভৃতি দেবদেবীর নামে ঘট বহন ক'রে জলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে হাঁটে।

ঠাকুরাণী যাত্রা এবং তারা-তারিণী যাত্রা আর দুটি লোক-পরব। কোরাপুট, গঞ্জাম ও অন্যান্য জায়গায় ঠাকুরাণীযাত্রা এবং গঞ্জাম জেলায় তারা-তারিণী যাত্রা দেখা যায়।

অন্য একটি পার্বণ বারুণীযাত্রা। কটক জেলায় আছে যাজপুর বলে একটি জায়গা। এখানে অনেক সূর্যমন্দির আছে। এই যাজপুরের নদী নামে বৈতরণীর প্রসিদ্ধি। বৈতরণীর তীরে হয় বারুণীযোগে এক উৎসব। এই উপলক্ষ্যে বহু লোক আসেন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান অর্পণ করতে। কিংবদন্তী আছে, বারুণী তিথিতে শুকনো বৈতরণী নাকি জলে ভরে যায়—এই জলরাশিকে বলে "দুগের বারি।"

বালিযাত্রা আরেকটি পরব। এও লোক-পর্ব। বাংলা দেশে যেমন চড়কের সময় হয়, উড়িষ্যার বালি পরবের সময়েও তেমনি মেলা বসে, চলে তেমনি বেচাকেনা, জনয়ের আদান-প্রদান। কোরাপুটের বালিযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবের সময় পাঁচ হাজারের মত লোক জড়ো হয়, অনুষ্ঠান হয় রামলীলা, দণ্ডকাঠিয়া, পালা, আদিবাসী নাচগান ইত্যাদির। কটকের বালিযাত্রার বেশ নাম আছে—ওখানকার দুর্গাপূজার মতই। ওখানেও মেলা ও নানা লোকানুষ্ঠান চলে।

ছোটখাট পর্ব-যাত্রা আরো আছে। যেমন দু'একটির নাম করা যায়—পৌষ পর্ব, চৈত্র পর্ব (কালাহাণ্ডি ও কোরাপুট জেলায়), বাসন্তী পূজা (বালেশ্বর), মেরুযাত্রা (গঞ্জামে), রাজা পর্ব ও কার্তিক পূর্ণিমা যাত্রা (কটক জেলায়) চৈত্রপর্বের অপর নাম ঘোড়া পূর্ণিমা বা ঘোড়ার যাত্রা ; একটিকে কেউ কেউ চৈত্র- দোল হিসেবেও চিহ্নিত করেন। মৌকোর মাঝিরা চৈত্রের এই পূর্ণিমা তিথিতে নাচ গান-সমন্বিত্যাহারে খুব বড় উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

দুর্গাপূজার মত কালীপূজারও প্রচলন আছে উৎকলে। পুরী, ভুবনেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ জেলা, কটক জেলা প্রভৃতি জায়গায় কালীপূজা উল্লেখযোগ্য।

আরেকটি বড় উৎসব স্নানযাত্রা। এটি জ্যৈষ্ঠমাসের পরব। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্গত, যেমন রাস-দোল। সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলরামের বিগ্রহ মন্দিরসিংহাসন থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় নির্দিষ্ট স্নানমণ্ডপে।

সেখানে একশো-আট কলস জল ঢেলে স্নান করান হয় ত্রিমূর্তিকে। অতঃপর ঐ স্নানজলেই সাতদিন ধরে চলে নানা উৎসব অনুষ্ঠান—পূজাপাঠ ইত্যাদি। উৎসবকর্ম শেষ করে সন্ধ্যার পরে বিগ্রহত্রয় ফিরে আসেন মন্দিরে স্বস্থানে। রথযাত্রা ও দোলযাত্রার ধুম সেখানেই, স্নানযাত্রার প্রথাও সেই সেই জায়গাতেই।

গোবিন্দ দ্বাদশী কোনও বার্ষিক বা মাসিক অনুষ্ঠান নয়। প্রতি একহাজার বছরে বিশেষ তিথিনক্ষত্র অনুসারে মাত্র একবার এই পর্বের অনুষ্ঠান হয় বলে শোনা যায়। শীতের শেষভাগে বা বসন্তের প্রারম্ভে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণতঃ এটি অনুষ্ঠিত হয়। পুরী শেষাতেই আধিক্য। লোকসমাগম পাঁচলক্ষের মত হয় বলে জানা যায়।

ভুবনেশ্বরের আশোকাষ্টমীযাত্রা বিখ্যাত। এ-উৎসবের দেবতা হচ্ছেন লিঙ্গরাজ প্রভু। প্রচুর লোক এই উপলক্ষ্যে এসে জমায়েৎ হয় ভুবনেশ্বরে। সঙ্গে থাকে ব্যবসায়ীদের মেলার আয়োজন।

বৈশাখী অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে একমাস পর্যন্ত চলে চন্দনযাত্রার উৎসব। জগন্নাথ দেব ভক্তবাহিত হয়ে চন্দনপুষ্করিণীতে নীত হন এবং সেখানে চন্দনকেলি করেন। এই অনুষ্ঠান বেশি দেখা যায় কটক জিলায়।

বার্ষিক নয় এমন একটি উল্লেখযোগ্য বড় উৎসব হল "নবকলেবর"। মহাপ্রভু জগন্নাথ মাঝে মাঝে পুরাতন দেহ ত্যাগ ক'রে নতুন শরীর পরিগ্রহ করেন, এই লোক প্রসিদ্ধিই সম্ভবতঃ এই উৎসবের মূল—শাস্ত্রেও এসম্পর্কে উল্লেখ আছে শোনা যায়। বারো বছর পরে পরে প্রথম যে আষাঢ়মাসটি মলমাস পড়বে, সেই বছরে নবকলেবর পালিত হয়ে থাকে। আষাঢ়ে মলমাস না পড়লে হবেনা। পুরী শহরেই এই উৎসবের ঘটা সবচাইতে বেশি। এ সম্পর্কে একটি উৎসকাহিনী আছে সেটি সংক্ষেপে এই—জগন্নাথদেবের দারুনির্মিত দেহ নবকলেবর অর্থ এই দারুদেহের পরিবর্তন। যেবারে নবকলেবর হয়, সেবারে কোন একজন বিশেষ (দৈবনির্দিষ্ট) ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পেয়ে থাকেন—অমুক জায়গায় বনে বিশেষ একটি গাছ আছে [এই গাছটির বিশেষত্বের মধ্যে, কোনও পক্ষী এর ডালে বসবে না' এর ওপরে মলত্যাগ করবেনা, ইত্যাদি]—ঐ গাছটি তুমি কাটবে—সেই কাঠে আমার নতুন বিগ্রহ তৈরি হবে, তুমি তৈরি করবে সেই দারুদেহ। তারপর সেই নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে।' সাধারণতঃ এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে থাকেন কোন বৃদ্ধ দারুশিল্পী, এবং এই দৈবাদেশ সারা উড়িষ্যাবাসীর পরম কামনার বস্তু। অবশ্য এর মধ্যে একটি 'কিন্তু' আছে: বিশেষ গাছটি যে ব্যক্তি কাটবে, মৃত্যু তার অনিবার্য, সে বিলীন হয়ে যাবে দেবতার অস্তিত্বের মধ্যে। আরেকটি ব্যাপার আছে: গাছটি কাটা হবে সোনার কুড়ুল দিয়ে। সোনার কুঠারে কোন বড় গাছ কাটা অবশ্য সম্ভব নয়, তাই প্রথমে সোনার কুঠার স্পর্শ করিয়ে পরে লোহার কুড়ুলেই গাছ কাটা হয়ে থাকে। নতুন মূর্তি তৈরি ক'রে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুরাতন বিগ্রহটি মহাসমারোহে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়।—এই হল "নবকলেবরের" বৃত্তান্ত।

যেগুলির কথা বলা হল, প্রধান উৎকলীয় পালপার্বন বলতে এইগুলিই উল্লেখযোগ্য।

উৎকল ললনা

উষা ভট্টাচার্য

কটির সন্ধান মেলে বঙ্গরমণীর অন্তরের অন্তস্তলে। তেমনি সন্ধান উড়িষ্যাবাসিনীর অন্তরেও খুঁজে পাওয়া ভার নয়। কখনও যা মেলিল। তবু সাদৃশ্য ধরা পড়ে যায় উৎকল ললনার মনোলোকে।

জন্মথেকে মৃত্যুপর্যন্ত সামাজিক, লোকাচার আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎকল কন্যার সাজে বঙ্গললনার চিন্তাধারায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীত সাধনায় বৈসাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যের সমারোহই ভীড় করে আসে।

শিশুকন্যাকে নিদ্রাতু স্বামীর দুই প্রসারিত হাতের মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে দুটি মিষ্টি আচরণে স্বামীর মন বিহ্বল করে প্রগলভা হাস্যময়ী ছুটে চলে চঞ্চলচরণে আর প্রিয় সঙ্গিনীদলায়, সেখানে নৃত্যে গীতে রাত পোহায়। শেষ প্রহরে বধূ আলতো চরণে পতিশয্যায় আশ্রয় নেয়। যুবতী স্বামী প্রহরে প্রহরে প্রিয়ার অঙ্গসুবাসের অপেক্ষায় অহেতুক বহুবার আঘ্রাণ নিয়েছে হবের বস্ত্র বাতাসের গায়ে গায়ে। কতবার প্রিয়ার হস্তের শঙ্খনিকনের আস্বাদ নিয়েছে শিশুকন্যার বেসরী বলয়ের রিনিকি-ঝিনি ঝঙ্কারে। তারপর কোন অসতর্ক ক্ষণে নিমিলিত আঁখি পল্লব বিলিত হয়ে সুসুপ্ত সমাধ তলে টেনে নিয়েছে উচ্ছকিত যুব সত্তাকে। বাইরে তখন চাঁদের আলোয় চাঁদের হাট বসেছে।

ঘরে ঘরে রাতের আহার কটি রাতেই সমাধা হয়ে যায়। গৃহস্থালীর পরিমার্জনা, আত্মীয় পরিজন আপ্যায়ণ ও সুসম্পন্ন হয়ে যায়—। বাইরে চাঁদের খেলা। পূর্ণিমা নিশির পূর্ণশশী মধ্যগগনে বিরাজ মানে। এখন চাঁদনী রাতে ঘরে থাকা দায় সখী! ঘরে থাকা দায়! চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। উৎকল যুবতী ঘরে থাকতে চায় না।

শারদীয়া আকাশে পূর্ণচাঁদ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরে আয় রে তোরা ঘরের বাহিরে। বাহিকার প্রাণ মন কাড়ান ঐ কালার বাঁশরীর উচ্ছ্বাস, কে রোধিতে পারে সখি। কন্যা বধূ সবে মিলি তখন নৃত্য-পাগল। উঁচি পড়া বাজুতে বাঁজু বেঁধে একে অপরের কটি দেশে আবেষ্টন করে আদিবাসী চঙ্গে চঞ্চল অঙ্গে ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে যায় এক, দুই, তিন। আবার ঐ শ্রেণীবদ্ধ যৌবনধারা ফিরে যাচ্ছে পিছু হটে এক, দুই, তিন। কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীত। নয়ন বিহ্বল, বিবশ অন্তরস্তল নৃত্য রসে টৈটম্বুর। সঙ্গীতের লহরে লহরে যুবতী-হৃদয় হিল্লোলিত। এই নৃত্য লহরা দেহ মনের গ্লানি হরণ করে উৎকল-কন্যার। বাংলায় একে খুঁজে পাওয়া ভার।

এই বধূরা যেদিন স্বামীগৃহে এসে প্রথম পা দেয় সেদিনও তার শিল্পীমনের পরীক্ষা দিতে হয় সর্বজন সমক্ষে। বধূবরণ হবে। আপেক্ষমানা আত্মীয়া পড়শীজন। গৃহপ্রবেশদ্বার নির্মল, সুচিক্কন পরিমার্জিত। দোয়ারী থেকে বধূর হাতবরে আহ্বান করেন শঙ্খধাতা।

আজ বধূ স্বামীগৃহে গৃহস্থালী করতে এলো। উৎকলে বর হয়েছিল—গেলবছর অথবা মাস দুতিনেক পূর্বেই। কন্যাকে তখন একবার আসতে হয়েছিল এই গৃহের প্রাঙ্গণতলে। বরের বাড়ীতে বিবাহকর্ম সমাধা হোক। বিত্তশালী শ্বশুর অভিথি অভ্যাগতকে আপ্যায়ণে তৃপ্ত করবেন। সুতরাং স্বল্পবিত্ত কন্যাপক্ষের

ব্যয় সঙ্কুলন ও হবেই, উপরন্তু প্রথা অনুযায়ী বরপক্ষ বধূযাত্রীদের সমাদর করে অর্থ প্রাধান্যের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত করেও তুলবার সুযোগ পাবেন। কন্যার পিতা একাধারে অর্থব্যয় ও কন্যাদায়ে হলে অবশ্যই প্রথা, পরিবর্তন সাপেক্ষ। কন্যার গৃহে অতিথি বরপক্ষের সাদর অভ্যর্থনাও কলিযুগ সমাজে দুর্লভ নয়। সাধারণত সেকালে কন্যা সপ্তমবর্ষিয়া হইলেই পাত্রস্থ হওয়ে কোন বাধা ছিল না, ব্যতিক্রমে শিশুবিবাহও চলতি ছিল।

সুতরাং বালিকা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হলে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের কোন একটা নির্দিষ্ট দিন বেঁধে দেওয়া থাকতো না। বয়স অনুপাতে কেউবা তিনরাত্রি কেউবা সাত বা ষোল রাত্রি যাপন করে শাশুড়ীর আদর কেড়ে শ্বশুর গৃহ থেকে পিতার আলয়ে ফিরে যাবার অনুমতি পেত।

এরপর কন্যা একদিন বয়স্থা হলো। শ্বশুরালয়ে ঘর করতে যেতে হবে।

যাইয়া যামগো শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গে দিব গাছ গাছারী
ধান দিব, ধন দিব, দিব নতুন শাড়ী।
আর দিব জোরা জোরা মাটির ভাণ্ডার
কাঁসা দিব, পিতল দিব, দিব গহনা ভারী
কন্যা ছাড়ি হৃদয় জ্বলে, নয়ন পাথার।
মাছ দিব, পান দিব, দিব ক্ষীরার পাত।
যাইয়া আমার শ্বশুর ঘরে খাইও চিকন ভাত।
আর দিব গাই বিয়ালে নবনী বাছুর
যাইয়া লইব কুটুম্বের ঘর, শাশুড়ী শ্বশুর।
আর দিব শীল নোড়া,
পারলে ঘর দিব বাইন্ধা
আর রইল কত বাকী, মনে রইল সাধ
পারি যদি আকাশ হইতে পইরা দিব চাঁদ।

দিনে দিনে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হয়। তাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে হবে।

প্রস্তুতি চলে ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে। বছর ঘোরে, বয়স ভরে।

ধান, চাল, পিতল, রূপা, মসলা-জিরে-পান কিছুই বাকী থাকে না। মন্তা-মিঠাই যাবে বলে জোড়া মাটির হাঁড়ি ভর্তি হয়ে। আর যাবে ধন-দৌলত। সামর্থ্যে সকল বস্তুই প্রস্তুত। সামর্থ্যের বাইরে সাধ্যও সংগ্রহ হয়েছে। সগৌরবে বধূযাত্রা সংসার করতে এলেন।

প্রথম পদক্ষেপেই অন্দরে নয়, বধূর প্রথমে পা পড়বে দহিয়াঙ্গনে। কোথাও বা সদর রাস্তার ওপরেই। দোয়ারী থেকে বধূকে আহ্বান করে দাঁড় করান হলো উন্মুক্ত পথের ওপর। কোন্ এয়োস্ত্রী এসে বধূর হাতে তুলে দিলেন একবাটি চালধোয়া পিটুলী। এবার বধূ তার দুইহাতের আঙুলে গড়ে তুলবে আলপনা, নিজের দুটি পায়ের আঙুল ঘেঁসে যত্নের গড়ে তোলে পথচিত্র, সে পথের ওপর পা রেখে রেখে বধূ গৃহাঙ্গনে প্রথম পদার্পণ করবেন। পাশে পাশে বধূর হাতেই অঙ্কিত হবে লক্ষীসহ ঘরের মাঙ্গল্যের পদছাপ।

এই আলপনা নববধূ প্রায় মাসান্ত পর্যন্ত ঘরের নানা স্থানে অঙ্কিত করে প্রস্তুতি বচন আহরণ করে নেয়। প্রায় ছ ভিন মাস পর্যন্ত নতুন বধূর এই আলিম্পন পর্ব অবশ্য করণীয় নিয়মচর্চা।

শ্বশুরের আগমন করবার পূর্বেই নববধূ স্বামীর শয্যা ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে উপস্থিত হয়। পতীর গাত্রে স্বামীর ঘরে গমন- ও লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহনির্গমন, বাহীর তৃণ শয্যায় নিদর্শন। সমস্ত বহির্বাটন ঝাঁট পাট ক'র, নিকানো বধূর নিত্য কর্ম। প্রতিগৃহ দ্বারে আলিম্পন রচনাও এই বধূর একটি গুণপনার স্বরূপ। গৃহবাসীর প্রণামেমান দৃষ্টি সর্বদাই এই আলপনার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে চলে প্রতি পদক্ষেপে।

উৎকল কন্যার গৃহপ্রাচীর গাত্রে ও সুসজ্জিত হয়ে বর্ণিত হয় না।

নানাপ্রকার রঙএর সংমিশ্রণে তারা রচনা করেন অতি সুদৃশ্য আসন। রঙগুলি সাধারণতঃ সংগ্রহ হয় গ্রাম্য প্রথায়। কেমন কাঠ কয়লার গুড়ো সিন্দুর, নীল অথবা পাতার রস প্রভৃতি থেকে। অবশ্য আধুনিক কালের মনোহারী দোকানদারেরা শহরে রঙ-এর যোগানদার হতে সদাই তৎপর।

এই রঙে রঙে রমণীকুল রচনা করেন দেওয়াল-চিত্র। এসব চিত্র কলায়। স্বভাবতই প্রকৃতির প্রভাব লক্ষিত হয়। সাধারণ ফুল, লতা, পাতা আর পক্ষীর চিত্রে রঞ্জিত হয়ে ওঠে ঐ ঘরের মোটা দেওয়াল, পৈঁঠা কখন বা মেঝে। বস্তুই ঘরে কর্তাব্যক্তির আসন পিঁড়ি ঘেরে, অথবা গ্রাসের ঘেরে বৃত্তাকারে বধূরা সুন্দর আলপনা দেখায় গৃহকে সর্বদা উৎসব রসে উল্লাসিত করে তোলেন।

একটি কোমল কল্পনার সর্বদাই উৎকলবাসীর মন-মানসকে শিল্পরসে সিক্তিত করে রাখে। এমনি চিত্রাঙ্কন পল্লীবাংলার গৃহ রচনায়ও ধরা পড়েছে কালে কালে। বধূ তার গুণাবলীর মধ্যে আলপনা রচনাকেও সযত্নে স্থান দিয়েছে। একটি পান থেকে পঞ্চপান, সপ্তপান রচনা। প্রজাপতির বিপক্ষ প্রসারিত দেহ ব্যঞ্জনা ঘরে ঘরে নববধূর গুণপনার সাক্ষ্য বহন করে।

এসব গুণ বিশেষতঃ নববধূর গুণপনার অন্তর্ভুক্ত।

এবারে বধূর সন্তান মানুষে। নবজাতকের লালন কর্ম প্রধানতঃ ধাত্রীমাতার সহায়তায় হয়ে থাকে। নবজাতকের মাতাকে তৃতীয় দিবসে, তারপর সপ্তম দিবসে পরে বাদশ দিবসে নবসূতিকার সহায়তায় শুদ্ধ হতে হয় আঁতুড় কেটে। এ প্রথা পল্লী বাংলার ঘরে আজও বিদ্যমান।

ছেলে ভোলান এক কঠিন কাজ। এতে প্রথম প্রসূতির হাত তত দক্ষ নয়। সুতরাং ক্রন্দন মুখর সন্তানকে হাসি খুশি করে তুলতে হয় ছড়ার মোহে আর গানের সুরে সুরে।

মায়ের হাতে চাঁদামামা এক মস্ত অস্ত্র। কি বাংলা, কি বিহার কি উড়িষ্যা। একই আকাশ পটে ফুটে ঐ চাঁদামামার মনোহারী রূপছটা। আর ঐ রূপমাধুরী ছেয়ে রাখে শিশুর কোমল কল্পনা জগৎকে। যা এই সুযোগটি পুরোপুরি আয়োগ করেই ক্রন্দন রোমাল শিশুকে শান্ত সুশীল করে তোলে। বাংলার মায়ের ছড়াখানি :

"আয় চাঁদ আয়, খোকা ঘুম যায়।
দুধ দেব ভাত দেব, রাঙা ঘোড়ায় গাড়ী দেব,
আমার সোনার কপালে চাঁদ টি দিয়ে যায়।"

আবার উড়িষ্যার কন্যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"আ চন্দ মামু, ধরণ পণী,
মো কানুহর হাতরে গড় খসি।"

এই একই স্নেহে প্রবাহিত মাতৃহৃদয়ের মেহ ধারা। মাতৃহৃদয় সর্বকালে সর্বদেশে এক রসসিক্তিত। ভিন্ন ঘর, ভিন্ন কলিজ। একই ভূমি, পরস্পরে পটুয়া গড়ে তোলে একই বিধাতা।

আসামের লোকধর্ম ও লোকরীতি

—ডঃ সন্ধ্যা ভাদুড়ী

মহাভারতের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ এবং বর্তমানে আসাম তার দুরারোহ গিরিমালা, দুর্গম পাথর সঙ্কুল অরণ্য দুস্তর নদনদী নিয়ে এমনই একটি ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশে মোহিনী মায়ার আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে মানুষকে। তার একদিকে সাংঘাতিক সাঙ্ঘাতিক ব্যাধির প্রকোপ, অসভ্য পার্বত্য জাতির হিংসা আর বিষাক্ত সরীসৃপ ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়। অন্যদিকে খাসিয়ার দুর্গম ও নদীস্রোতমালাবৃত প্রান্তরের অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমির আকর্ষণ।

বস্তুত: ইংরেজের আগমণের পূর্ব-পর্যন্ত আর্য ও অনার্য পরিবেশের বৈচিত্র্যময় সমন্বয়স্থল এই ভিন্ন-ধর্মীয় দেশ একটি রহস্যাবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রেখেছিল। এই মন্ত্রতন্ত্রের দেশে শৈবশক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য দু একজন সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া আর বড় একটা কেউ যেতে সাহস করতনা। যাবার সুগম পথ ও ছিলনা। ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস ছিল যাদুবিদ্যার দেশ কামরূপে গেলে মানুষকে ডাকিনী যোগিনীরা মেষে পরিণত করে রেখে দেয়। সুতরাং বিস্ময় ও বিভীষিকার দোলায় নদীমেখলা শ্যামদুকূলা পর্বতদুরতায়া এই মনোমোহিনী ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার রমণীয় পার্বত্যভূমি সব যুগে ভারতবাসীকে বারে বারে দুলিয়েছে আর ভুলিয়েছে।

পৌরাণিক প্রাগ্‌জ্যোতিষের খ্যাতি মহাভারতে বিদিত। তার সংলগ্ন মনিপুরের রাজকন্যা ও পরে মহাজী চিত্রাঙ্গদাকে অমর করে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণশিরীর পূর্বকালীন সত্তা লোহিত ও সুবর্ণশ্রী নদী। খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যে পরলৌহিত্যের কথা বলেছেন সেটি আসামেরই নামান্তর। এই সব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে এক সময় আর্য সংস্কৃতি আসামে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু আসামের সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতির অবিকৃত সংস্করণ নয়। আশেপাশের আদিম পার্বত্য জাতি নাগা, খাসী, জৈন্তী, আবর, কুকী, মিশমী, গারো, বোড়ো প্রভৃতির অবদান আসামের সংস্কৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। আর দেখা যায় বাংলার অবদান। বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সৌন্দর্যচেতনা ও শিল্পবোধ বহুল পরিমাণে ছাপ রেখে গেছে আসামের সাংস্কৃতিক জীবনে।

বাংলাদেশের মত আসামও ধর্মচেতনার অভিব্যক্তি হয়েছে উৎসবের মধ্য দিয়ে। কামাখ্যার অম্বুবাচির মেলা, দুর্গোৎসব, বিহু উৎসব, শাক্তি বারমাসী গীত, শৈবগীত, রামায়ণী গান ও মেহতর গীত—এই সবের মধ্যে মানুষ প্রকাশ করেছে তার অন্তর্হিত আনন্দকে। এই আনন্দের উপলব্ধিই ধর্মের বড় কথা, অনুষ্ঠান তার উপলক্ষ্য মাত্র।

বাংলা ও আসামের ঐতিহ্যগত এই মিল বহুকালীন। বাংলার দুর্গোৎসব আসামেরও উৎসব।

কামরূপ শক্তি সাধনার একটি মহাপীঠ। কামরূপে অবস্থিত দেবী কামাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের যে অভিমত তার থেকে জানা যায় শিবের মত ইনিও বেদবহির্ভূতা নন। খাসি ও গারো এই দুটি পর্বতমালার মধ্যবর্তী নীলাচল পর্বতে কামাখ্যার মন্দির। উক্ত পর্বতীয় জাতিরা মাতৃতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দেবী কামাখ্যা প্রথমে অনার্য পর্বতীয় জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাদের উপাস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি পৌরাণিক দেবী শিবজায়া দুর্গাতে রূপান্তরিত হন। কামাখ্যা দেবীর আদি পুরোহিত গারোরা পরবর্তীকালে স্থানচ্যুত হয়। তাদের স্থান অধিকার করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ।

দেবী কামাখ্যা সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী ও পৌরাণিক তথ্য পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে পৃথিবীর পুত্র মিথিলাধিপতি কামরূপকে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি কামরূপ অধিকার করেন এবং কামাখ্যা দেবীর রূপে উন্মত্ত হয়ে তাকে পত্নীরূপে লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক রাত্রির মধ্যে তাঁর মন্দির নির্মাণ করতে পারলে তার পত্নী হবেন এই সর্তে দেবী সম্মত হন। মন্দির নির্মাণের কার্য এক রাত্রির মধ্যে যখন শেষ হয়ে আসছে তখন ভীত হয়ে তিনি মোরগের ডাকের মধ্য দিয়ে রাত্রি-প্রভাতের বার্তা ঘোষণা করে রাজাকে নিরাশ করেন।

কালিকা পুরাণ ও যোগিনী তন্ত্র থেকে জানা যায় দেবী কামাখ্যা ধীরে ধীরে পার্ব্বতী তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী দুর্গার এই ত্রিবিধ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

নরকাসুরের পর দীর্ঘ দিন দেবী কামাখ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। কামরূপে যখন বর্মণবংশ রাজত্ব করছেন তখন সেখানকার উপাস্যদেবতা শিব।

খৃঃ ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ যখন ভাস্করবর্মার রাজ্যে উপস্থিত হন সেখানে তখন শিবের পূজা চলছে।

দীর্ঘ দিনের অবলুপ্তির অন্ধকারের পর দেবী কামাখ্যাকে আবার দেখা যায় কোচদের রাজত্ব কালে। রাজা নরনারায়ণ ১৬শ শতাব্দীতে কামাখ্যার মন্দির নির্মাণ করেন। একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কামাখ্যার উপাসক নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ দেবী দুর্গার উপাসনার জন্য নীলাচল পর্বতে একটি প্রস্তরের মন্দির নির্মাণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি উপাসনার প্রথা আসামে প্রচলিত হয়। এটি বোধহয় অহোম রাজত্ব কালে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে তার সংস্কৃতি সম্বন্ধ স্থাপিত হবার কালেই হয়েছে। আরো পরে ব্রিটিশ-শাসনকালে শাসন কার্যব্যপদেশ আসামে আগত বাঙালীদের উদ্যোগে আসামে বাংলাদেশের দেবীমূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। শক্তিসাধক অহোম রাজগণ কালীপূজার প্রবর্তন ও করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত জনসাধারণের ধর্ম বৈষ্ণবমতকে পরাভূত করে ও বৈষ্ণবদের উপর নির্যাতন চালিয়ে অহোমরাজগণ শক্তি সাধনার উৎকর্ষ সাধন করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রাজা রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে বাংলাদেশের মা দুর্গা আসামে রীতিমতই আসা যাওয়া করতে থাকেন। এই সময় শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য নামক একজন শাক্ত পুরোহিত আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী রাজা শিবসিংহ ও রাজকুমারদ্বয় প্রথমসিংহ ও রাজেশ্বর সিংহ শাক্তমতে দীক্ষিত হন। এই মতদ্বৈধ সত্ত্বেও শিবসাগরে দেবীর মন্দির, শিবমন্দির ও বিষ্ণু মন্দির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এক জায়গায় সে সকলের সঙ্গে এক, যা হচ্ছে তার মানস সত্তা। এই মনকে বাহন করে তার চৈতন্যময় সত্তার অভিব্যক্তি। এই মনের মাধ্যমে

তার ধর্মচেতনার উপলব্ধি ও উৎসবের মধ্যে তার আনন্দময় সত্তার প্রকাশ। বাংলাদেশের নবান্ন, পৌষপার্বণ, মাঘব্রত, দোল, চৈত্রসংক্রান্তি গাজন—এসবের মত আসামের বিহু উৎসব তার প্রকৃতি প্রীতিকে ব্যক্ত করেছে। এই বিহু আসামের বিখ্যাত লোক-উৎসব। প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্যের মধ্যে আপন অন্তরের আনন্দ-ঐশ্বর্যের উপলব্ধি ও তার অভিব্যক্তি রূপ পরিগ্রহ করেছে এই বিহুর মধ্য দিয়ে। লোকগীতির মাধ্যমে এই লোকনৃত্যগুলি প্রথমে নিছক আনন্দ পরিবেশনের কাজেই ব্যাপৃত ছিল। পরে এদের মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।

বহাগ, কাতি ও মাঘ—এই তিনটি বিহু তিনটি বিশেষ ঋতুকে নির্দেশ করে। এগুলিকে ঋতু উৎসব বললে অত্যুক্তি হয় না। বহাগ বিহু বা বৈশাখী বিহু নববর্ষের উৎসবের সমতুল্য। এর গানগুলি তারুণ্য ও প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে, কলাগাছের তলে কিংবা বাঁশবন বা আমবাগানের ভিতরে তরুণ তরুণীরা ঢোলের শব্দের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে উৎসবে মত্ত হয়ে উঠত বহাগ বিহুতে। এই গানগুলির নাম বিহুগীত বা বনগীত। প্রকৃতি ও প্রেমের বৈচিত্র্য এই গানগুলির উপাদান। বিহুর মধ্যে কাতি বিহু বা কার্তিক বিহু অপেক্ষাকৃত অপ্রধান। উৎসবের রং ও এর ম্লান। অন্য বিহু দুটির বর্ণাঢ্য সমারোহের সঙ্গে তুলনা করে "কাঙালী বিহু" এই নামান্তর এর তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপলক্ষ্যে তুলসী মূলে প্রদীপ জ্বালানো প্রথা বঙ্গদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। কার্তিকমাসে তুলসীতলায় প্রদীপ দেখানো ও আকাশপ্রদীপ জ্বালা গ্রামবাংলার একটি পবিত্রতার ছবি।

বাঙালী বিহুর পাশে রাজার মত এসে দাঁড়ায় ভোগালী বিহু বা মাঘবিহু। প্রান্তর লক্ষ্মী তাঁর শস্যসম্ভার নিয়ে ঘরে এসে উঠেছেন বহু বিশ্রামহীন দিনের পরিশ্রমকে সার্থক করে। আনন্দ কর, উৎসব কর, ভোগ কর। গোলাভরা ধান ও গোয়াল ভরা গরু, ভোজের উপকরণের প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে ঘর। শস্যরিক্ত প্রান্তর ও আলোক শিখায় নতুন করে সজ্জিত হোক্। বাংলার পৌষপার্বণের মত এই মাঘ বিহু একটি বিশেষ লোক-উৎসব।

বিহুগানগুলি সরল হৃদয়ের সহজ অকৃত্রিম নিরলঙ্কার প্রকাশ। যেমন—

"ঘরে মন নেই, ক্ষেতে মন নেই, মন যে যায়,
তুলার মতন ভেসে উড়ে যায় যেথা সেথায়।"

অথবা "বাঁশবনে চাই সরল কোনটা যেথা বসি যায়,
প্রিয়ার আননে চেয়ে দেখি সেথা পূর্ণ চাঁদ।'…

পাশাপাশি অবস্থান করতে করতে দুটি দেশ ও জাতির মধ্যে সামাজিক রীতি ও প্রথার সাধারণতা, ধর্ম ও উৎসবের ঐক্য প্রায়শই ঘটে থাকে। আসাম ও বাংলাদেশের বিবাহ পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্মার্ত রঘুনন্দনের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা যদিও সমগ্র আসাম গ্রহণ করেনি তবুও বিবাহের উৎসব ও স্ত্রী আচারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। একটি প্রধান অমিল হল বাংলার মত আসামে বরপক্ষকে কন্যাপক্ষের মেয় বরপণ বলে কিছু নেই। কামরূপ জেলার অধিবাসীরা বরং কন্যাপক্ষকেই তাম্বুল, দধি, গুড়, বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মানিত করেন।

মধ্য ও উপর আসামের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহোৎসব তিনদিন ধরে চলে। প্রথম দিনে বর পক্ষের মহিলাগণ বস্ত্র, অলঙ্কার, তেল, সিঁদুর, মাছ ও "টেকেলি" নামে মাটির ঘট ও নানারকম মিষ্টান্ন নিয়ে কনের বাড়ীতে যেতে ও কন্যা কর্তার হাতে 'টেকেলি' দান করে কনেকে সিঁদুর কাপড় ও অলঙ্কার পরিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "জোড়ন পিন্ধোয়া।" প্রাগ্‌বিবাহ অনুষ্ঠানের নাম "আইঠি পিন্ধোয়া।" এটি বাংলা দেশের পাকাদেখার অনুরূপ। পাত্রপক্ষের লোকেরা পাত্রীর বাড়ীতে উপহার নিয়ে উপস্থিত হলে পাত্রীপক্ষের মহিলাগণ যে গান গান তার একটি দৃষ্টান্ত—

"আগরধন ভারতে কি কি অনিছা
বাটচরার মুখেতে খোঁয়া।
মোর ঘরলৈ কি কার্যে আহিছা
দেউতার আগতে কোঁয়া।

অর্থাৎ তোমরা ভারে করে কি এনেছ দেউড়িতে রাখ, এবং আমাদের ঘরে কি কাজে এসেছ গৃহ কর্তাকে জানাও।

বাংলাদেশের অধিবাস ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান আসামেও প্রচলিত। বিবাহের পূর্বে কনেকে "কাষাপাটের কাপোর", "মেজাকরী বা কিংখাপের মেখলা" ও "রীহা" পরানো হয়। মেখলা, রীহা ও চাদর আসামে মহিলাদের পোষাক। বাংলা দেশের মত এখানেও চারপাশে কলা গাছের চারা পুঁতে সেখানে কনেকে স্নান করানো হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর এই অনুষ্ঠান হয়। এই স্নানের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। নদী বা জলাশয় থেকে 'এয়োরা' জল তুলে আনেন। সেই জলে বর কনেকে বার বার স্নান করানো হয়। এর নাম "পানিতোলা" ও "নোয়নি"। নোয়নির অর্থ স্নান। বাংলার দেশের "জলসওয়ার" সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। নোয়নির গানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ—

"রাতি তোলা পানি তুমি অতিবর শুদ্ধ।
পুন্নালে পরিব পখী পানি যাব চুয়া।"

পাত্রে আমাদের তোলা জল অতি শুদ্ধ। রাত পোয়ালে পাখি ঐ জলকে অশুদ্ধ করবে।

বঙ্গুবেদীয় অসমীয়াদের বিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম ও সপ্তপদীর প্রথা দৃষ্ট হয়। বিবাহের পর বর কন্যার বাড়ীতে কোন রান্না করা খাবার খায় না। এদেশের বাসরঘরের নাম "ভিতরলৈ নিয়া।" এখানে কড়িখেলা ছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠান কিছু নেই। বিবাহের পর দিন সূর্যোদয়ের পর বর কনেকে নিয়ে প্রত্যাগমন করে। তার হাতে থাকে কাটারি ও তাম্বুল। বরকনে এসে দাঁড়ালে তাদের প্রাঙ্গণে "চরা" অর্থাৎ শীতলপাটির উপর বসিয়ে মাঙ্গলিক বরণ ডালার থেকে চাল দিয়ে গুরুজনরা আশির্বাদ করেন ও উলুধ্বনি করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "আগ দিয়া" বা "আগচাউল।" ছোট কুলার উপর মঙ্গল ভাণ্ড হলুদমিশ্রিত চালে পূর্ণ করে বরণ ডালা সাজিয়ে বাংলাদেশেও বরকণেকে বরণ করার প্রথা দেখা যায়। এই দিনে বরকর্তা কনের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজনে আপ্যায়িত করেন। এঁদের ভোজনের পর

কনে বরের প্রসাদ পায়। এটি বাংলার পাকস্পর্শের অনুরূপ। "আগলিয়া" ও দেশে বৈধবিবাহের স্বীকৃতি।

এ অঞ্চলের বিবাহের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিয়ের তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ এই দেশে ফুলশয্যার দিনে বরের বাড়ীতে নন্দীপুরাণের মূল শ্লোকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে আবৃত্তি করে শোনানো হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "বোবাবুবি।" পার্বতীর নাসিকাজাত বোবা বুবি নামক অসুর দম্পতীর এই কাহিনীটি বর কনের উপর অপসংলোকের "মন্তর লাগার" প্রতিকারের জন্য অবতারণা করা হয়। বাংলাদেশের হুবচনী পূজার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

———

আপনার
শারদোৎসবের দিনগুলি
মধুময় হয়ে উঠুক।

ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী
৪১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আপনার আনন্দমুখর দিনগুলি ধরে
রাখতে সহায়তা করবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লোকসংগীত

—অমলেন্দু বিকাশ রক্ষচৌধুরী

Oh you can kiss me on a Monday,
A Monday a Monday
Is very very good
Oh you can kiss me on a Tuesday a Tuesday
A Tuesday in fact I wish you would !

ভোরবেলা তীব্র শীতের মধ্যে খালি গায়ে কাঁধে একটি গীটার ঝুলিয়ে কনি ফ্রান্সিসের (Connie Francis) জনপ্রিয় গান গাইছে একটি ছেলে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে অবশ্য পঞ্চাশ ফিট নিচে একটা ঝরণার ধারে।

নাগাভূমির রাজধানী কোহিমাতে পৌঁছে প্রথম যে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে তা হল ঐ। পরে অবশ্য হামেশাই কোহিমাতে এ ধরণের দৃশ্য দেখেছি। নাগা যুবক-যুবতী সকলেই কিছু না কিছু গাইতে পারে। শুধুমাত্র গীটারে সুর তুলে বিলিতি গান অথবা বিলিতি সুরে নাগা গান গাইছে প্রায় সকলেই।

শহরের আশেপাশে নাগাদের মধ্যে সঙ্গীতের এই ধারাটি দেখে মনে হল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বন্যায় যেন নাগাভূমি ভেসে গেল ! স্বভাবতঃই মনে হয়েছিল যে তবে নাগা লোকসংগীতের আসল ধারাটি কি ? এই ধরণের পাশ্চাত্য সুরের নাগা গান নিশ্চয়ই নাগা লোকসংস্কৃতি ও সঙ্গীতের আসল ধারা হতে পারে না।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে হল না। সহজেই যা হৃদয়ঙ্গম করলাম তা হল আমার শোনা এবং আমাকে প্রথম চোটে আকৃষ্ট করা পাশ্চাত্য ঢংএর নাগা সঙ্গীত আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে নাগা ছেলেমেয়েদের গান। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত যে গানের ঢেউ এখানেও এসে লেগেছে—অবশ্য একটু বেশিমাত্রায়ই এসে লেগেছে।

কিন্তু লোকসংগীতের আসলধারাটি ও সাধারণ নাগাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বিকেলবেলা ক্ষেতের কাজ সেরে যখন নাগা নারী-পুরুষ বাড়ী ফিরতে মুখ ফেরায় সূর্য তখন অস্তাচলে—কাঁধে সকলের কোদালি অথবা মুদ্রল আর কণ্ঠে 'হো হো—হো হো' ধ্বনির সুর। অর্থাৎ আমাদের 'সা' এবং 'পা' এই দুটি সুরের অনুরণণ অথবা গুঞ্জরণ।

গ্রামের সাধারণ নাগা যুবক-যুবতীদের দেখেছি হাতে শুধুমাত্র একটা একতারা জাতীয় যন্ত্র নিয়ে গান গাইতে। তাতে শুধুমাত্র দুটি বা তিনটি স্বরের প্রাধান্য। সুরের কোন রকম ঝকঝকের বড় একটা শুনিনি। অকৃত্রিম নাগা লোকসংগীত অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবমুক্ত লোকসংগীত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অনেকে মিলে একসঙ্গে সমস্বরে মাত্র দু-তিনটি স্বরের উপর কণ্ঠস্বরকে প্রসারিত করে গেয়ে থাকে।

আমাদের সমতল-ভূমির লোকসংগীতের সংগে নাগাদের লোকসংগীতের মিল খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

নাগাদের লোকসংগীতের চেহারার সংগে উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যান্য সমতলের লোকসংগীতেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অসমীয়া লোকসংগীতের কথা ছেড়ে দিলাম—কারণ সুরের দিক থেকে, গানের কথা ও আঙ্গিকের দিক থেকেও বাংলার লোকসংগীতের একটা মিল পাওয়া যায়—এমন কি আজ যে মিজো সমস্যায় জর্জরিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত—সেই মিজোদের লোকসংগীতেরও যথেষ্ট মিল পাওয়া যায় আমাদের এই সমতলভূমির গানের সংগে। অরুণোদয় সম্মান মিজোদের লোকসংগীতের একটু নমুনা তুলে ধরছি অনুবাদ করে :—

মিজো শিকারীর দল বন্যবরাহ বধ করে গান গাইতে থাকে—

'ফসল বুনতে ধানের ক্ষেতে
এখন যাবো না,
যে সোনার ফসল নষ্ট করে
কিছুই রাখল না,
তাকেই আমি শেষ করেছি
এনেছি তাকেই ধরে
তোমরা দেখনা'।

আবার ব্যাঘ্র শিকার করা হলে গাইতে শোনা যায় : -

'মানুষের মত পশুর মাঝেও আছে বীর
তিয়াল নদীর তীর ধরে চলে
করেছি শিকার ব্যাঘ্র বীর!'

গানের ভাবের সংগে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের লোক সংগীতের ভাবের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এখানেও সুরের প্রাধান্য পাশ্চাত্য সংগীতের। অনেক মিজো যুবক-যুবতীকে তাঁদের গানের আদি রূপ অথবা খাস গ্রাম্য রূপ শোনাবার জন্য অনুরোধ করেও তা শুনতে পাইনি। কারণ সে সম্বন্ধে দেখলাম তাঁদের ধারণা একদমই নেই। বরং তার চেয়ে আমাদের হিন্দী ফিল্মী সুরের সংগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রচেষ্টায় আমাদের বাংলা দেশের ভক্তিমূলক বিভিন্ন সুরের তাদের পরিচয় বেশি।

খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের লোকসংগীত সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা চলে। পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবই ওদের মধ্যে বেশি। ভারতীয় সংগীতের প্রভাব ওদের মধ্যে খুব বেশি অনুপ্রবেশ করেনি।

আসল কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রচার ঐ সব অঞ্চলে যত বেশি আমাদের ভারতীয় সংগীতের প্রচার ও প্রসার সেই তুলনায় খুবই কম। উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ভারতীয় লোকসংগীতের সাবলীল ধারাটির সুস্থ অনুপ্রবেশ ঘটান খুবই প্রয়োজন। সেই কথাটি বিশেষ করে ভাববার জন্যই ওপরের কয়েকটি কথা বলা।

আসামের লোকনৃত্য

—শান্তা বসু

প্রাণের প্রকাশ দেহের মাধ্যমে। সেই প্রাণের দুঃখ বেদনা আনন্দ অনুরাগ ইত্যাদি অনুভাবের প্রকাশ ভাবের বৈচিত্র্যে। তার লীলা বিচিত্র। কখনও কণ্ঠের সুর ও ধ্বনিতে কখনও দেহের ছন্দ ও মাধুর্যে। সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্ম হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশে। ভাষাকে অতিক্রম করে যায় সুরের মূর্ছনা আর নৃত্যের ব্যঞ্জনা। নৃত্যের আদিম রূপটিই হোলো লোকনৃত্য।

'লোক' শব্দটি প্রথমেই অর্থ করে একটি মানুষ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়। আজকের দিনে সাধারণতঃ এই লোকরীতি বা লোকনৃত্য শুধু সেই সমাজের মধ্যেই প্রচলিত যে সমাজ শহরের আধুনিক সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রগতির থেকে দূরে সহজ সরল পাহাড়ী, উপত্যকাবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত। একথা বলা যেতে পারে যে লোকনৃত্যের প্রকাশ আর বিকাশের উৎস সম্পূর্ণ ভাবে গ্রামীন। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎসব-আনন্দ, ক্রিয়া কর্ম, পূজা-পার্বনের মধ্যেই এর জন্ম। কোনো শিক্ষক, শিল্পী বা নর্তকের সাহায্যে নয় অন্তরের আনন্দের প্রেরণাতেই এর রূপায়ণ। তাই সভ্য সমাজের নৃত্যের সঙ্গে লোক-নৃত্যের পার্থক্য অনেক। লোকনৃত্য ক্লাসিকাল নৃত্যের মত জনমন রঞ্জনের জন্য বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। লোকনৃত্য পল্লীদেবতার আপন খুশীর মহোৎসব। লোকনৃত্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আদিম নৃত্যভঙ্গিমা থেকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। তার ভিতরের উচ্ছ্বাস, সুলতা বা কিছু কিছু অশালীন ভঙ্গিমা ক্রমেই অপসারিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে আদিম নৃত্যই লোকনৃত্যের উৎস। আবার লোকনৃত্যই ক্লাসিকাল নৃত্যের জনক। ভাব, আবেগ, উচ্ছ্বাস ক্লাসিকাল নৃত্যে একটা বিশেষ ধারার, বিশেষ রীতিতে, বিশেষ ভঙ্গিমাতে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু লোকনৃত্যে সব ভাবাবেগ বা স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসই এবং মৌলিকও বটে! শিক্ষা সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষ ক্রমেই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে জাগে কুণ্ঠা, দ্বিধা বা লজ্জা যা তাকে সরল আত্মপ্রকাশ থেকে বিরত করে। সেই জন্যই লোকনৃত্যের পরিবেশে ওই আত্মসচেতনতার স্থান না থাকায় তার প্রকাশ অকুণ্ঠ সাবলীল।

লোকনৃত্যের আরও একটি বিশেষ মূল্য আছে। আনন্দের মুহূর্তে মন বাধাবন্ধনহীন হয়, স্বাভাবিক প্রকাশে উন্মুখ হয়। যখন তার প্রকাশ এই নৃত্যের মাধ্যমে তখন তার মধ্যে সে সমাজের সত্যকার সাংস্কৃতিক বা সভ্যতার রূপটিও ধরা পড়ে। সেই দিক থেকে লোকনৃত্যের ভিতর একটি জাতির বৈশিষ্ট্যের, সভ্যতার রূপটি সহজেই ফুটে ওঠে। একথাও বলা যেতে পারে ভারতে লোকনৃত্য একদিকে বিরাট তাৎপর্যময়, কারণ লোকনৃত্যের ভিতর দিয়েই স্পষ্ট এবং অকৃত্রিম ভাবে ভারতের অন্তরতর সত্তাটির প্রকাশ ঘটে।

শহর থেকে দূরে—হাটে, মাঠে, ঘাটে আবার পর্বতে অরণ্যে—প্রকৃতির উদার উন্মুক্তির কোলে যারা বাস করে—প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপরই যাদের সর্বতোভাবে নির্ভর—তাদের উপর প্রাকৃতিক অবস্থান আর

পরিবেশের প্রভাব বড় কম নয়। ফলে কোনো দেশের লোকনৃত্যের ভিতর সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্পষ্টতই রূপ পায়। যেমন ধরা যাক, হাওয়াই দ্বীপের লোকনৃত্য যা আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে বলা যায়—সেই নৃত্যের প্রধান ভঙ্গী হলো দেহের পশ্চাদ্‌ভাগের দ্রুত ছন্দে আন্দোলন সেই সঙ্গে দুটি প্রসারিত হাতের তালুর বিলম্বিত সঞ্চালন। এই নৃত্যের মূলে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই হাওয়াই দ্বীপের তালবনের সঘন ঘোলা আর হাতের ভঙ্গীতে রূপায়িত শান্ত সমুদ্রের বুকের উপর ছোটো ছোটো ঢেউগুলির অবিশ্রাম ভেঙে পড়া।

তেমনি এই দেশে মণিপুর ইত্যাদি পাহাড়ী অঞ্চলের লোকনৃত্যে দেখা যায় দুই হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দেহের উপরিভাগের দ্রুত সঞ্চালন। পাহাড়ের প্রচণ্ড ঝড়ে বিশাল বনস্পতিদের চঞ্চল আলোড়নই এর মূল প্রকাশ। অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশের অধিবাসীদের লোকনৃত্যে বাঘ, হাতী, সাপ, ময়ূর ইত্যাদি জীবজন্তুর নৃত্য বা শিকার নৃত্যই প্রধানতঃ রূপ নেয় ওই একই কারণে।

আবার গ্রামের সামাজিক পরিবেশে লোকনৃত্য আসে ধর্ম আর সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রকাশে। বরণ নৃত্য বা নানা ধরণের ব্রত নৃত্যের উদ্ভব এর থেকেই।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের মতে প্রতিটি ভারতবাসী একদিক থেকে নৃত্যশিল্পী। অবশ্য ভারতের শতকরা আশী ভাগেরও বেশী অধিবাসী গ্রামীন। গ্রামের মানুষদের বিশেষ ভাবে গ্রামের মেয়েদের চলাফেরা বা কাজকর্ম সব কিছু ভঙ্গীর মধ্যেই একটা ছন্দ আর তাল ফুটে ওঠে বৈকি। মাথায় সোনার মত ঝকঝকে পিতলের কলস পর পর সাজিয়ে দুইদিকে দুটি বাহু চলার তালে তালে সঞ্চালিত করে গোয়ালিনী যখন গ্রামের ছায়া ঢাকা পথ বেয়ে তার নিজস্ব রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গীতে চলে কিম্বা যখন বেলা পড়ে এলে কলসী কাঁখে গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে চলে জল ভরতে তখন তাদের বঙ্কিম দেহভঙ্গী আর পায়ে পায়ে চলার তালে তালে বেজে ওঠা নূপুরের ধ্বনি—আবার গৃহকাজের ফাঁকেও ঢেকিঘরের আড়ায় দাঁড়িয়ে সুগঠিত কোমল পায়ের আঘাতে ঠিক সুষম ছন্দে যখন ঢেকিতে পাড় দেয় তখন বঁকিমদের সেই তালে তালে কমর কমর আওয়াজে নাচের ছন্দ আপনি জেগে ওঠে।

তেমনি নাচের ছন্দ জাগে মাঠে ধান কাটতে। নদীতে নৌকা বাইতে, কুমোরের চাকের ঘূর্ণিতে, জেলের মাছুতে আর তাঁতীর তাঁতেতে।

শিল্প তার সবচেয়ে বড় প্রেরণা পেয়েছে ধর্মের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে ভারতে। যে কোন শিল্পই হোক না সে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য সবকিছুই ধর্মের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে ভারতের মাটিতে। ভারতীয় নৃত্য তাই প্রধানতঃ ধর্ম অনুষ্ঠান বা কাহিনীকে রূপায়ণ।

আসামের লোকনৃত্যের উল্লেখে প্রথম আসে মণিপুরী নৃত্য। মণিপুরের নৃত্য লোকনৃত্যের মধ্যে সবার উপরে স্থান পায়। আজ সারা ভারতেই এই মণিপুরী নৃত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। লোকশিল্প হিসাবে মণিপুরী নৃত্য এখনও পূর্ণ গৌরবে বিদ্যমান। প্রতিটি উৎসব সে সামাজিক বা পূজাপার্বন যাইহোক নৃত্যের মাধ্যমেই তার প্রকাশ। মণিপুরে যে কোনো চাঁদের আলোভরা রাতে বছরের যে কোনো সময়েই তরুণ তরুণীরা সমবেত হয় নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারপর গ্রামের পর গ্রামে চলতে থাকে তাদের নৃত্য অভিযান আর একের পর এক বাড়তে থাকে তাদের দলের সংখ্যা। অবশ্য মণিপুরী নৃত্যের মূল প্রেরণার উৎস ধর্মের কাহিনীতেই কিন্তু প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই কেন্দ্র করে। মণিপুরের প্রতিটি গ্রামে আছে একটি করে কৃষ্ণ মন্দির। কখনও কৃষ্ণরাধা, কখনও কৃষ্ণবলরাম কখনও বা কৃষ্ণ-

চৈতন্য। আর প্রতিটি মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির যেখানে কৃষ্ণচরিতামৃতের উপর ভিত্তি করে নৃত্য উৎসব পালিত হয়।

অনেক সময় নর্তকদের সঙ্গে বাদক ছাড়া গায়ক ও থাকে। নৃত্যের সঙ্গে তাদের কণ্ঠে বাজে কৃষ্ণ-লীলার গান। মণিপুরী নৃত্যের নর্তক গায়ক ও বাদক সকলেরই বেশ ভূষা অতি সুন্দর উজ্জ্বল ও রঙীন হয়। নর্তকীদের পরণে থাকে আঁট ভেলভেটের জামা তার হাতে দুই ইঞ্চি চওড়া সোনালী জরীর কাজ করা। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালী অবধি প্রচুর ঘের দেওয়া ঘাঘরা সাধারণত টুকটুকে লাল কিম্বা ঘন সবুজ রেশমের—তার প্রান্তে ঝকঝকে উজ্জ্বল সেকুইন বসানো। আর সমস্ত রেশমী আবরণটি ভরে ছোটো ছোটো গোল কাঁচের টুকরো ফুলের মত বসানো। নাচের এক একটি হিল্লোলের জরীতে, রঙেতে, কাঁচেতে ঝলমল করে ওঠে। কোমরের কাছে অতি সূক্ষ্ম সাদা জরীর কাজ করা কাপড়ের বন্ধনী থাকে তন্বী দেহবল্লরীর ভঙ্গিমা ফোটাতে। রূপালী জরীর ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকে রেশমী ঘাঘরাটি এই অনুরূপ সুন্দর আবরণ আর আভরণে সজ্জিত তরুণীদের তন্বীদেহখানি যখন নৃত্যের তালে তালে একই ছন্দে সঞ্চালিত হয় তখন তাদের ওই উজ্জ্বল রঙীন আবরণের উপর আলো পড়ে অজস্র তারার মত জ্বলতে থাকে তাদের অঙ্গবাস। স্বপ্ন লোকের সৃষ্টি করে নর্তকীদের সেই মোহিনী মূর্তি। মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুলের থেকে মুক্তা বোলে পাকে পাকে বাধা থাকে মুক্তা গাঁথা মালা।

কৃষ্ণের পরণে থাকে হলুদ সিল্কের কাপড়। কালর দেওয়া রেশমী কোমরবন্ধ। দেহের উপরিভাগে থাকে না কোনো আবরণ কিন্তু অজস্র আভরণে ঢেকে যায় সারা অঙ্গ। মাথায় থাকে শিখিপুচ্ছ দেওয়া উজ্জ্বল রত্ন খচিত মুকুট।

এই নৃত্য রাস-লীলা নামে সারা ভারতে বিখ্যাত। এই রাসলীলা নৃত্য ছেদহীন ভাবে চলতে থাকে বারোদিন ধরে। এই নৃত্যের সঙ্গে চলে বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলী সঙ্গীত।

এই রাসলীলা নৃত্যের পরই জনপ্রিয় নৃত্য হলো 'লাই-হারোবা'। মন্দিরের সামনে খোলা চত্বরে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সুরু হয় সুন্দর রঙীণ পোশাকে সজ্জিত মেয়েদের ফল ফুল ইত্যাদি নৈবেদ্য নিয়ে দেবতাকে নিবেদনের নৃত্যে। এরপর তরুণরা এই তরুণীদের মধ্য থেকে তাদের নৃত্য সঙ্গিনীকে নির্বাচন করে।

এছাড়া মণিপুরী ছেলেদের মধ্যে 'বকাসুর' নৃত্যটিও অতি প্রিয়। কৃষ্ণের বকরাক্ষসকে বধ করার কাহিনী। একটি বিরাট কাঠের বকের কাঠামো তৈরী হয় কাপড়ে মুড়ে। তার চোখ দুটি আগুনের ভাঁটার মত—আর বিরাট লম্বা ধারালো কাঠের ঠোঁট তৈরী করা হয়। কোনো নর্তকের কাঁধের উপর এই কাঠা-মোটি শক্ত ভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। নর্তকের পায়ে বাঁধা থাকে অনেকগুলি ঘুঙুর। কারণ সেই নর্তকেরই পা দুটি তখন বকরাক্ষসের পা। বেশীর ভাগ মণিপুরী নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র বলতে বোঝায় খোল এবং মঞ্জনী। গরাতে চৈত্রের শেষদিনে নববর্ষের আবাহনে যে নৃত্য গীত হয় তাকে বলে 'বৈশাখ বিষ্ণু'। গ্রামের তরুণ তরুণীরা খোলা মাঠে এই বিষ্ণু নাচের উৎসবের আয়োজন করে।

নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে যে লোকনৃত্যের প্রচলন নৃত্য হিসাবে তার খ্যাতিও বহু বিস্তৃত। এই নৃত্য প্রধানতঃ যুদ্ধ-নৃত্য। নাগা যোদ্ধাদের উৎসব পরিচ্ছদ সত্যিই চিত্তাকর্ষক। তাদের নৃত্য একটি নিখুঁত যুদ্ধ-নৃত্য। বসন্ত উৎসবের সময়ে তারা দলে দলে এগিয়ে আসে পূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। বাম বাহুতে একটি পিতলের কাজ করা টুকরো বাইসনের শিং দিয়ে সাজানো থাকে। এর অর্থ তাদের

অঙ্গের চিহ্ন—তাদের নিহত শত্রুর মাথার। আর যা হাতে ধরা থাকে বর্শা অর্থাৎ যে অস্ত্রে শত্রু নিহত হয়েছে। অনেকগুলি পিতলের অলঙ্কার বুকের উপর ঝোলান থাকে তার অভিযানের সাফল্যের চিহ্ন স্বরূপ। নাগা সমাজের কিছু শ্রেণী অতি সুদক্ষ শিল্পী। তাদের তৈরী পিতল বা লোহার অলঙ্কার অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য বিশিষ্ট হয়। নাগা নৃত্যে নর্তকের কণ্ঠে শোভা পায় পালক কিম্বা শিঙের মালা—হাতে ঝকঝকে পিতলের বালা আর অতি সুন্দর কাজ করা পিতলের শিরস্ত্রাণ। নৃত্যের ভঙ্গীতে যথার্থ গতিতে ছুটে যায় নাগা নর্তকের হাতের বর্শা কাউকে আঘাত না করে। তরুণী তরুণী নাগা নর্তকীরা পুঁতির মালা, পিতলের বালা ইত্যাদি আভরণে সজ্জিত হোয়ে মোড়লের বাড়ীতে নাচের জন্য যায়। পরস্পর হাত ধরে কেউ ভঙ্গীতে দুলে দুলে নাচে, ক্লান্তিহীন ভাবে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তারা নেচেই চলে বাঁশের তৈরী মাচার নৃত্য-মঞ্চে।

আসামের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বহু লোকনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলা আর নাগা যুদ্ধ-নৃত্যই সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনপ্রিয়।

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ
আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের
অমৃত জীবন-কাহিনী
লেখক—জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
জনক জননী
ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙালীকে মুগ্ধ করিবে।
'জনক জননী'
বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটা নতুন যুগের রচনা···
বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ··· ···
প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।
মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮০০
প্রকাশক—সন্তোষলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১০৫৫

আসামের রেশমশিল্প

—মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনাংশুকের যে প্রসিদ্ধি, প্রাচীন বাংলার মসলিন বস্ত্রের ও তেমনই প্রসিদ্ধি। শৌখিনতা ও বিলাসিতা যেসব মানুষের প্রিয় অথবা বৈশিষ্ট্য ছিল সেকালে তাদের পক্ষে ঐ দুটি বস্ত্র ছিল অপরিহার্য। মসলিন অধুনা লুপ্ত, চীনাংশুকের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু এযুগে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে আছে নয়, সগৌরবে বিরাজ করছে—ঐ দু'শ্রেণীর সগোত্রীয় শৌখিন অসমীয়া রেশমশিল্প: ঐ অংশুকের প্রসিদ্ধিও বড় কম নয়।

আসামের রেশমশিল্পের ইতিহাস আজকের নয়। এ ইতিহাস বহুপুরাতন এবং ঐতিহ্যময়। সেই রামায়ণ ও অর্থ-শাস্ত্রের যুগ থেকে ভারতবর্ষের এই অংশে নানা ধরণের রেশম বস্ত্র তৈরির জন্যে রেশমকীট প্রতিপালনের কথা শোনা যায়। মুগা শ্রেণীর রেশম উৎপাদন করে আসছে এই প্রদেশ স্মৃতির অতীত কাল থেকে। রামায়ণে আমরা পাই রেশমগুটি পালকদের দেশের উল্লেখ: পণ্ডিতেরা বলেন, এ উল্লেখ নিঃসন্দেহে কামরূপ সম্পর্কে। 'হর্ষচরিত' আর 'অর্থ শাস্ত্রে' দেখি, গুটিপোকা পালন ও সরেশ রেশমীবস্ত্র তৈরির জন্যে কামরূপের খ্যাতি ছিল চীনের সমান। গুটিপোকার চাষ সর্ব প্রথমযুগে সুরু করেছিল আসামের বোড়ো সম্প্রদায়—পরে অন্যান্য জীবিকাধারীদের মধ্যেও এ জিনিসটি ছড়িয়ে যায়। ক্রমশঃ অহোম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পটি উন্নতি ও প্রসারতা লাভ করে।

সারা ভারতে যত রেশম উৎপন্ন হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে আসাম প্রদেশে। রেশমের কাজ করে এখানকার কৃষকরাই প্রধানতঃ—চাষবাসের ঋতুর আগে ও পরে যখন শুধের হাতে অবসর থাকে। তা কম নয়, প্রায় আট লক্ষ লোক রেশমের কাজে নিযুক্ত, অনেকের রুজি রোজগার এতেই। এ পেশার সম্প্রসারণ বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর।

রেশমগুটি তৈরি করে রেশমকীট। গুটি থেকে আঁশ পাওয়া যায় সেই আঁশ থেকে সুতো। তবে পাই কাপড়। রেশমের আঁশ তিন রকমের—এরি, পাট, মুগা। এ তিন রকম থেকেই যা রেশমী বস্ত্র তৈরী হয় তা অতি চমৎকার, অসমীয়ারা তা দিয়েই তৈরি করেন তাঁদের ব্যবহার্য জাতীয় পোষাক। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিটি অসমীয়া নারী তো পাট মুগার তৈরি পোষাক পরবেনই—ওটা তাঁদের অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

আসামে রেশমশিল্প হচ্ছে প্রধানতঃ উটজ শিল্প। গুটিপোকা প্রতিপালনের কাজটা সাধারণত মেয়েদেরই কাজ, অবসর সময়ের জীবিকা হিসেবে তাঁরাই এ-কাজ করে থাকেন—অবশ্য পরিবারের অন্যান্যেরাও তাদের সাহায্য করে। বলা যায়, এটা প্রায় প্রতি পরিবারেই সম্পূরক পেশা—সাংসারিক প্রয়োজনে ও যাবীলাওয়া মেটাতে (অর্থাৎ ঘাটতি অর্থ যোগাড় করতে) তাঁরা রেশমকীট পালন করেন। কিছু

লোক আবার আছে যারা এরকম 'অ্যামেচার' নয়, তারা 'প্রোফেশনাল', তারা গুটির চাষ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে—যদিও এদের সংখ্যা কম। সংসারেরও তো রেশমচাহিদা আছে, সেটুকু মিটিয়ে মেয়েরা বাড়তিটুকু বাজারে বিক্রি করে দেন।

বর্তমানে গুটি ও কীটের চাষীরা নানা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন শিল্পটির উন্নততর পরিচালনার জন্যে। উপযুক্ত বা বড় বড় সমিতি গুলিকে সরকার ও সাহায্য করে থাকেন।

সাধারণত দেখা যায় গুটিচাষীরা নিজেদের বাড়িতেই যা কিছু করেন। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে নিজ নিজ কুটিরের উঠোনে কীটপালন করেন। সাম্প্রতিক কালে আবার বিশেষ ধরণের পালন গৃহ গড়া হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় গুটির চাষ করবার জন্যে।

খরচটা খুব কম। সরঞ্জামের কামেলা বলতে বেশি কিছু নেই—দরকার লাগে কিছু সাধারণ বস্ত্রপাতির —এবং তা কমবেশিই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সরঞ্জাম গুলি এই :—(১) বাঁশের তৈরি ডালা (দাম পড়ে ২—৩ টাকা), (২) বাঁশের চন্দ্রকী ফুল (প্রতি ১০০ গজ ৬—৮ টাকা) (৩) সুতোর জাল (০, ১৫ পয়সা), (৪) চরখা (আন্দাজ ৪৮ টাকা), (৫) তকলি (আট আনা), (৬) সিদ্ধ করবার জন্যে একটা পাত্র (৪ টাকা), (৭) একটি পুরো তাঁত (৫০—৭০ টাকা)। ব্যস, আর কিছু না। চরখা ব্যবহৃত হয় সাধারণত দু'রকমের : 'ভীর'—চরখা, এতে মুগা সুতো কাটা হয়, আর 'দাস'-চরখা, এতে এরি সুতো কাটা হয়। তাছাড়া বর্তমানে 'জয়পুর' নামে চরখাটিও ক্রমশঃ লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাঁশের ডালাটি গোল কিংবা আয়ত ক্ষেত্রাকার হয়, খাওয়াবার জন্যে রেশমকীটগুলোকে ঐতে রাখা হয়।

চরখার মত তকলিতেও আঁশ থেকে রেশমের সুতো কাটা হয়। এই তকলিকে স্থানীয় মানুষরা বলে তকুয়া। তকুয়ায় কাটা সুতো নাকি বেশি সমান হয়। তবে এ প্রক্রিয়াটা একদিকে পরিশ্রমসাপেক্ষ, অন্যদিকে সময়ও লাগে বেশি। চরখায় অল্প সময়ে অনেক বেশি সুতো কাটা যায়।

সিল্কের যেমন জাত-বিভাগ আছে সেইরকম আছে রেশমকীটেরও। বস্তুতঃ, রেশমকীটদের শ্রেণী অনুসারেই সিল্কের শ্রেণীবিভাগ। যে কোন কীট যেকোন ধরণের সিল্ক তৈরি করতে পারেনা। সিল্কটা আসলে কী?—ঐ কীটদেরই তো একধরণের মুখনিঃসৃত লালা। যেমন মাকড়সা লালা দিয়ে জাল তৈরি করে। এক্ষেত্রে তিনটি ধরণের রেশম ও রেশমকীট দেখি আমরা :—(ক) এড়ি বা এরাণ্ডি নামের কীট থেকে ঐ নামের রেশম, (খ) মুগা নামীয় কীট থেকে ঐ নামের রেশম, আর হচ্ছে (গ) পট্ট বা পাট।

এড়ি পোকারা খায় প্রধানত : রেড়িগাছের পাতা। এরা যে রেশম তৈরি করে তা দিয়ে মানুষ বানায় এড়ি কাপড়। এই কাপড় মোটামুটি শাদা রঙের হয়, তাতে মেশানো থাকে হলদেটে আভা, মোলায়েম হয়, আবার খসখসেও। এড়ি কাপড় বেশ গরম কাপড়, তাই শীতকালে এর প্রচুর ব্যবহার।

মুগা রেশমের আবার উপবিভাগ : চম্পা গুটি, এর পোকারা সাধারণত চাঁপাফুল গাছের পাতা খেয়ে থাকে আর হচ্ছে মেজাঙরী বা অমকরি গুটি। মুগাবস্ত্র হয় সোনালী হলুদ রঙের। অনেক সময়ে লাক্ষার সাহায্যে লালরং করা হয়। পাট-গুটি পোকারা খায় অন্য একধরণের গাছের পাতা। পাট রেশমের আঁশ সবচাইতে মিহি ও মোলায়েম, রং শাদা আর হলদের মাঝামাঝি।

কোনও বিশেষ শ্রেণীর গুটির চাষ নির্ভর করে, যেখানে হচ্ছে সেই জায়গার বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার ওপর। যেমন, বৃষ্টি যেখানে খুবই বেশি ও আবহাওয়া আর্দ্রভাবাপন্ন, সেখানে এরি-র চাষ ভাল হয়। এই রকম অন্য শ্রেণীর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন।

স্বং জেলা অঞ্চলে এরি ও পাট রেশমগুটিই হয় বেশি, মুগা খুব কম। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এরি সবচেয়ে বেশি, অল্প মুগা ও পাট। গারো পার্বত্য অঞ্চলে এরি চাষ প্রধান। নওগাঁ ও কামরূপ···পাট, মুগা, এরি তিনরকমই হয়। শিবসাগর জেলা থেকে আসে আসামের তৈরি মুগা রেশমের অধিকাংশ। সম্মিলিত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলে, সম্মিলিত খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এবং মিজো হিলস্-এ এরি বেশি।

তালিকা আরো বড় করে লাভ নেই।

রেশম বোনা শুক্তি কাপড় বোনার মতই। প্রক্রিয়া একই। তবে রেশম বস্ত্র বুনতে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাবধানতার দরকার হয়। অসমীয়াদের মধ্যে সে-দক্ষতা সাধারণতঃ বংশসূত্রে বর্তায়।

এরি-র সুতো দিয়ে তৈরি হয় এরি বোরকাপর, এরি পাশরা এবং এরি চাদর। এইগুলি অসমীয়া পুরুষরা ব্যবহার করে ধুতি ও আংরাখা হিসেবে। পাট আর মুগার সুতো দিয়ে তৈরি হয় মেখলা, চাদর, রিহা, চেলেঙ, চুবিয়াং তাছাড়া ব্লাউজপীস, শাড়ি, ধড়া ও জৈনসেম। শেষোক্ত দুটি খাসি ও জয়ন্তিয়ার মেয়েরাই ব্যবহার করেন বেশি।

আসামের এণ্ডি শরীর গরম রাখে, টেকসই এবং সহজে ধুয়ে সাফ করা যায়। শীতকালে র‍্যাপার হিসেবে এণ্ডির ব্যবহার সুপ্রচলিত। মুগার দাম এণ্ডির চেয়ে বেশি। আর পাট হচ্ছে বিলাসীদের সামগ্রী, মুগা-এণ্ডি উভয়ের চাইতেই দাম বেশি।

ব্যবহারোপযোগী মূল্য ছাড়াও আসামের রেশমী পোষাকের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও আছে। ভারতের অভ্যন্তরে নানা জায়গায় এবং বাইরের বিদেশে এই শিল্পটির চাহিদা বাড়বার সম্ভাবনা প্রচুর। এই শিল্পে নিযুক্ত যাঁরা তাঁরা অবসরের হিসেবেই কাজ ক'রে থাকেন—যখন চাষবাসের তাগাদা নেই—সর্বসময়ের জন্যে যদি এরা আত্মনিয়োগ করতেন তবে শিল্পটি আরো উন্নত হত বলে মনে হয়।

আসামের জলবায়ু আপাংগোড়াই রেশমশিল্পের উপযোগী ও আদর্শ! তিন ধরণের সিল্কই এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে পারে। জনসংখ্যার যে অংশটি সাধারণত বেকার বা অকেজো, তাদের অনায়াসেই এ-কাজে লাগান যায়। তাছাড়া এ-শিল্পে মূলধনও যে লাগে বেশি, তা নয়। পরিশ্রম ও খুবই কম।

রেশম আসামের কাপড় তথা পোষাকের ঐতিহ্য। যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ এই কাজ ক'রে আসছে—আজ নতুন নয়।

আসামের জলবায়ু মোটামুটি ভাবে নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে। লোকসংখ্যা ঘন, মাটি রেশমকীট ও তাদের খাদ্য উদ্ভিদের উপযোগী। আর আছে সনাতন কুশলতা। এত সুযোগের যোগাযোগ যেখানে, সেখানে রেশম শিল্প আরো বেড়ে ওঠার কথা, দরকারও। অবশ্য সরকারের নজরও এদিকে উচিত মতই গিয়েছে—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে রেশম শিল্পোন্নয়নের ও স্থান রয়েছে, সমুন্নত ও আধুনিক প্রণালী গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে জনগণকে, নানা রকমের উন্নতির

রেশমকীট সৃষ্টি বা আবিষ্কার করা হয়েছে এবং সেগুলো রেশমশিল্পীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। বর্তমানকালে রেশমকীটদের রোগ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, ফলে গুটির উৎপাদনের পরিমাণ গেছে অনেক বেড়ে এবং আনুষঙ্গিকভাবেই বেড়েছে 'রে সিল্ক' এর উৎপাদন। এর ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন হচ্ছে, ভবিষ্যতে ও হতে থাকবে।

আসামের রেশম শিল্পের কথা আজ শুধু সারাভারতে নয় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মার্কিন দেশে ও জার্মানীতে আসামের রেশম বস্ত্রের প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আসামের রেশমশিল্প চিরজীবী হোক।

FLIES TWICE A DAY TO BAGDOGRA

HAPPY HOLIDAYS IN KALIMPONG & DARJEELING

CALCUTTA - BAGDOGRA - CALCUTTA				
Viscount IC-223	F-27 IC-221	Flight time :	F-27 IC-222	Viscount IC-224
Daily	Daily		Daily	Daily
1405	0700	D CALCUTTA A	1050	1735
1535	0840	A BAGDOGRA D	0910	1605

Provide connection to/from Delhi & Bombay (All timings are local time)

Indian Airlines 39, Chittaranjan Avenue, Calcutta

DARJEELING Laden La Road. Tel : Booking Office—355
BAGDOGRA Hilgan Road, Siliguri. Tel : Booking Office— 4116 Airport— 2411

IAC-84

অসমীয়া দারুশিল্প

—দেবধানী

দারুশিল্প এবং সূত্রধরশিল্প, এ-দুটি বস্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। এবং এই শিল্পের প্রতি ভারতের পূর্বসীমান্তবর্তী আসাম রাজ্যের অধিবাসীদের মনোযোগ খুবই। অসমীয়াগণ মুখ্য ও গৌণ উভয় ধরণের পেশা হিসাবেই শিল্পদুটির চর্চা ক'রে থাকেন এবং এই ব্যাপারে দেশগতভাবেও অনেক সুযোগ-সুবিধা বর্তমান। অর্থাৎ কাঠের কাজে প্রধান যে উপকরণ লাগে—কাঠ—তার কোন অভাব নেই এই রাজ্যে। বনজ সম্পদ প্রচুর—তার মধ্যে আছে অগুণতি দামী দামী গাছের জঙ্গল।

এক কথায়, সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দারুশিল্পে আসামের নামডাক যতটা হওয়া উচিত ছিলো, ততটা নয়। বরং অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের দারুশিল্পের কথা শোনা যায় এ-শিল্পে। শিল্পটিতে যে প্রচুর মূলধন বা দারুণ পরিশ্রম দরকার হয় তা নয়। আসামের লোকসংখ্যা যে কম তাও নয়। অথচ শিল্পটি যেন অন্যান্য কাজকারবারের তুলনায় বেশ কিছুটা অনাদৃত।

কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে দেশের বনজঙ্গলে মজুত, কিন্তু দেশীয় সূত্রধর ও দারুশিল্পীর বেশ অভাব। ব্যতিক্রম দেখা যায় সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্যাঞ্চলে—সেখানে বহু লোকের এই পেশা। কাঠের কাজে ভাল দেশীয় লোক পাওয়া যায়না কেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া ভার। নগরাঞ্চলে (সমতলভূমিতে) যেসব বড় বড় প্রতিষ্ঠান সূক্ষ্মকর্মের পণ্য উৎপাদন করে, অসমীয়া কারিগর সেসব জায়গায় খুব কমই দেখা যায়। খাসিয়া কারিগরদেরই যা কিছু নামডাক এই কাজে।

সমভূমিতে যেসব সূত্রধরের বাস, তাঁরা অবশ্য বহুপ্রাচীনকাল থেকে এই কর্ম করে আসছেন এবং গ্রাম্য সমাজে তাঁদের কদর বেশ। এঁরা সাধারণত কাঠের বাড়িঘর তৈরি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি তৈরি, লাঙল-জোঁত-আসবাবপত্র, দেবদেবীর মূর্তি, নৌকো তৈরি ইত্যাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন। সেইসঙ্গে দরজা-জানলা তৈরি বা মেরামত, গাঁকো তৈরি, এসবও করে থাকেন।

আসামের বনজ সম্পদ ও তার খ্যাতি আজকের কথা নয়। অনেক দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য কাঠের জন্মভূমি এই বনভূমি। যেমন বলা যায়, চন্দনকাঠ, অগুরু, অশ্বত্থ, বট, মধুরাশ্বত্থ, খদির (খয়ের), শাল্মলী, চাম, সুন্দী, শাল, সেগুন, বনসুন্দ, তিতলসুন্দ, নাগেশ্বর, পলাশ, আম, বেল, নিম, শিশু, সরল—এবং আরো কত। গার্হস্থ্য ও ধর্মীয় নানা কাজে এই সব কাঠ লাগে। পৌরাণিক যুগ থেকে কামরূপের চন্দন-কাঠের প্রসিদ্ধি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আমকাঠ ও বেলকাঠে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়।

পুরাকালে কাঠের ও কাঠনির্মিত দ্রব্যের ওপর শৈলিক খোদাইকর্ম শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই হত না, আসবাবপত্রেও তা দেখা যেত—যেমন পালং, পালপিড়া, বরপিড়া, কারোনী। এখনও দেখা যায়, স্থানীয় কারিগররা বেঞ্চি, চেয়ার টুল, (বইয়ের তাক), টুল এইসবের ওপরে নক্সা কেটে তোলেন। তার চেয়ে

আরেকটু সূক্ষ্ম কাজ দেখা যায় বাসু, কাহোনি, তুরপটি, নাগেনি ইত্যাদি ছোট ছোট বয়নসরঞ্জামগুলোতে—টিয়াপাখি, ময়ূর, সিংহ, হনুমান, ফুল—লতা-পাতা, ইত্যাদি। এইসব নক্সা দেখা যায় পালকি আর ঘোলাতেও ধরুম, বাতিদান, ছড়ি এদের গায়েও নানা ডিজাইন দেখা যায়। নৌকোগুলোর গায়ে থাকে পাখি, জানোয়ার, মাছ ইত্যাদির ছবি।

কাঠখোদাইকরের অসমীয়া ভাষায় নাম হচ্ছে খোনিকর। খোনিকরদের নামে একটি প্রাচীন গ্রামই রয়েছে শিবসাগর জেলার সদর সাবডিভিসনে—খোনিকর গাঁও। শোনা যায়, পুরানো আহোম রাজন্যবর্গ খোনিকর ও তাদের পেশার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সবরকমে।

কাঠশিল্পের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কাঠ—নরম ও কঠিন দুরকমেরই। আসামের বনজঙ্গলে এই দুই রকমেরই কাঠ মেলে। বস্তুতঃ এই রাজ্যে পাওয়া যায় একশোরও বেশি জাতের কাঠ। সারা দেশে বর্তমানে ১৪৪টি করাতকল (মিল) আছে কাঠ চেরাইএর জন্যে: এইগুলিতে প্রায় ২৮২১ জন কর্মী নিযুক্ত। এই 'মিল্'-গুলিতে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তাতে স্থানীয় প্রয়োজনগুলো মিটানো যায়। এইসব কল থেকে চেরাই করা কাঠ সংগ্রহ করেন কাঠশিল্পীরা।

কাঠের শিল্পে কাঠ ছাড়া আর যা যা লাগে তা হল: লাক্ষা, রঙ্গন, আঠা, মেথিলেটেড স্পিরিট শিরিষকাগজ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরণের কাঠ লাগে বিভিন্ন ধরণের জিনিস তৈরি করতে।

গার্হস্থ্য ও কৃষিগত প্রয়োজনের বাইরে বৃহৎশিল্প ব্যাপারে যেসব ব্যবহার হয় সেগুলি এই :—দেশলাই শিল্পে ১০,০০০ টন কাঠ লাগে, 'প্লাইউডে' ২৪,০০০ টন, রেলের 'স্লীপার' তৈরিতে ৬,০০০ টন, আসবাব পত্রে ২,০০০ টন এবং বিবিধ খাতে ৩,৬০০ টন।

কাঠ শিল্প গ্রামে ও শহরে দুজায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। তফাৎ এই শহরে এটি সব সময়ের প্রধান পেশা, গ্রামাঞ্চলে অবসরসময়ের গৌণ জীবিকা। গ্রামের কারিগর তৈরী করেন সাধারণতঃ ডিজাইনের টেবিল, চেয়ার, খাটপালঙ্ক, কাঠের পুল, কিংবা মাঝে মাঝে কাঠের গৃহ। কেউ কেউ আবার বিশেষ ভাবে তৈরি করতে পারেন জেলে নৌকো, পারাপি নৌকো ইত্যাদি। শহরাঞ্চলে দেখা যায়, বেশির ভাগ সূত্রধররাই কলকারখানায় কাজ নেওয়াটা তেমন পছন্দ করেন না, বরং দিনমজুরির ভিত্তিতে লোকের বাড়ি বাড়ি কাজকর্ম ক'রে পয়সা রোজগারই তাঁদের কাম্য। দিনমজুরিতে দিনে আয় হয় ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা।

কাঠের কাজে যন্ত্রপাতি লাগে নানা ধরণের। যেমন, করাত, ব্লেড, ভাইস, উকো, র‍্যাঁদা, বাটালি, ছেনি, স্ক্রু-ড্রাইভার, গ্রাইন্ডার, ড্রেল, স্কোয়ার, লেভেল, গজ, হাতকরাত, ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শঃই ছোট ছোট, হয়ত বা একজন মানুষেরই কারবার—এটা বিশেষ ক'রে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে।

কাঠের ফুল-লতা-পাতা-জন্তু-জানোয়ার খোদাই করা হয় ছেনি-বাটালি দিয়ে। ছুরি আর গজও থাকে অবশ্য সেই সঙ্গে। কারিগরের দক্ষতার ওপরে কাজের উৎকর্ষ নির্ভর করে, বলাই বাহুল্য। আবার দেখা যায়, একেক জনের একেকটি ব্যাপারে বিশেষত্ব থাকে।

বিগ্রহ, বিগ্রহের সিংহাসন ইত্যাদি দ্রব্যে প্রথমে খোদাই, পরে যানানদই রং করার পালা। অনেক সময় বার্নিশও করা হয়। রং লাগানোর পর রোদে কিংবা ছায়ায় কোন খোলামেলা জায়গায় শুকাতে দেওয়া। পুরোপুরি শুকোবার পরে বিক্রীর পালা। আসবাব পত্র ইত্যাদি তৈরী তথা বিক্রীর সাধারণত

বিশেষ সময় থাকে বছরে,—গ্রামে যেমন শীতকালটা। তবে শহরে সেরকম বাছবিচার নেই, ও হল সারা বছরের ব্যাপার। শীতকালে কাঠও মেলে বেশি, খদ্দেরের চাহিদাও হয় বেশি।

সমতলভূমি অঞ্চলে গ্রামের মানুষদের মধ্যে কাঠের খড়মের ব্যবহার খুব। এই খড়ম বেশি তৈরি হয় কাছাড় জেলায়—দাম জোড়াপ্রতি পড়ে ৩ টাকা থেকে ১৬ টাকার মধ্যে। তারপর আছে নৌকো। দেশের আভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও মাল বহনের কাজে নৌকো অত্যন্ত দরকারী। আর নৌকো মানেই কাঠ। তবে আসামে নৌকোর চাহিদা কম, অনিশ্চিতও বটে, তাই পাইকারী হারে নৌকো গড়া বড় একটা হয়না এছাড়া কাঠ থেকে হয় গরুর গাড়ির চাকা। তবে বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে—অক্টোবর থেকে এপ্রিলএর মধ্যে। চাকা তৈরী করবে যে, তাকে কামারগিরি ও ছুতোরগিরি দুটোতেই ওয়াকিবহাল হতে হয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, কাঠশিল্পী ও সূত্রধরেরা কেবল সেইটুকু পরিমাণেই দ্রব্যোৎপাদন করেন যা চট্ ক'রে বিক্রি হয়ে যাবে। গুদোম জাত ক'রে রাখার মত উৎপাদন কেউই করতে চান না। সূত্রধরদের আর্থিক অনটন, উপযুক্ত স্থানাভাব বিক্রীর প্রয়োজনীয় 'বাজার' না থাকা, আধুনিক প্রচার ব্যবস্থা বা 'শোরুম' এর অভাব—এইসব অসুবিধার সম্মুখীন থাকতে হয়। তবে অবশ্য রাজ্য সরকার নিস্পৃহ নন এর উপর। দারুশিল্পের জন্যে কতকগুলি সরকারী পরিকল্পনাও আছে। এই গুলির মারফৎ উপযুক্ত কারিগরদের অর্থ সাহায্য, টেকনিক্যাল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। সহজ সর্তে ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে। আর আছে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আধুনিক কলাকৌশল কায়দাকানুন শেখানোর বন্দোবস্ত। এসব সত্ত্বেও, আসামের দারুশিল্প এখনও পর্যন্ত সুগঠিত বা সমুন্নত নয়, এ-জীবিকায় বেশি লোক আসতেও চান না—অথচ তার প্রয়োজন আছে।

সিমলার প্রসিদ্ধ

* সন্দেশ বিক্রেতা *

সুবোধচন্দ্র মল্লিক

৬৪/১, রামতনুলাল সরকার ষ্ট্রীট, (সিমলা) কলিকাতা-৬

প্রোঃ—সাধন চন্দ্র মল্লিক এণ্ড ব্রাদার্স

ফোন : ৫৫-৫৮৪৫

বাংলা-উড়িয়া-অসমীয়া সাহিত্য

—ডঃ উমা রায়

উড়িয়া-অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা-ভাষার অতি নিকট সম্পর্ক। ভাষাতাত্ত্বিক মতে আদিতে এই তিনটি ভাষা একই ভাষা ছিল। বারশ-তেরোশ শতাব্দীর পর থেকে প্রথম ওড়িয়া ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে কেননা তার নিদর্শন আমরা পাই বারশ শতাব্দীর তাম্রশাসনে। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—ষোড়শ শতাব্দীর পর অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। বাংলার যে কামরূপী উপভাষার নিদর্শন আমরা পাই তা থেকে অসমীয়া ভাষার পার্থক্য খুব বেশি নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেও উভয় ভাষাতেই সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন পনরশ ষোড়শ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গতই এসে পড়ে হাজার বছরের পুরোনো বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাপদের কথা। গ্রন্থটি শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন নেপাল থেকে ১৯০৭ সালে এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগণ ও দোহা" নামে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের রচনাকাল যে সময়ে নির্ণীত হয়েছে সে সময়ে ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষাগত পৃথক গৌরব লাভ করেনি এবং বাংলার সঙ্গে একাত্ম হয়েই বিরাজ করছিল। স্বাতন্ত্র্য লাভ করবার পর উভয় ভাষাই গ্রন্থটিকে আপন আপন ভাষাগত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে দাবি করে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের তো বিহারী বলেই দাবী করেছিলেন। যাই হোক এখন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে চর্যার ভাষা বাংলা ভাষারই প্রাচীনতম নিদর্শন। কাজেই আমরা স্বচ্ছন্দে একথা বলতে পারি বাংলা ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরতে পারে।

সব দেশেরই মৌখিক সাহিত্যে প্রবচন, ছড়া ইত্যাদিকে প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন রূপে অনেকেই ধরেছেন—কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে হয়তো এগুলির উৎপত্তি বা রচনা অতি প্রাচীন কালে হয়েছিল কিন্তু এখন ভাষার যে রূপের মধ্য দিয়ে এগুলি সাহিত্যে বর্তমান আছে তা অনেকটাই আধুনিক। বাংলার ডাকের বচন, খনার বচনের উদাহরণ দেখেই তা বোঝা যাবে—

যেমন—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥"
"কাপাস বলে কোটা ভাই।
আতি পানি বাচেন পাই॥"
"কোদালে কুড়ুলে দেবের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলবো চাষাকে বাঁধতে আল।
আজ না হয় জল হবে কাল॥

এগুলি হচ্ছে খনার বচন। তাকে বচনের উদাহরণ—

"সাচ্চ কইলে বড় কর্ম।
মওপ ছিলে বড় ধর্ম।
যে যেয় ভাত পানা পানি শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী।
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে যায়।"

অনুরূপ বচন ওড়িয়াতেও পাই—

"যেবে বর্ষই শ্রাবণের শেষ। ধন্য সে রাজা ধন্য সে দেশ।"
"শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা চৌথি।
চৌদিক যেবে যেহ না উঠি।
পূর্ব পশ্চিমে যেবে ন বহই বা।
বাপা যোইলে পুত যে দেশান্তর যা।"

এর ভাষাও আধুনিক। ওড়িয়াতে ডাকের বচন কৃষি-পরাশরে সংকলিত হয়েছে।

অসমীয়া ভাষাতেও ডাকের বচন, ছড়া ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। এর আদি যে সময়েই হোক না কেন—বর্তমান ভাষারূপ এর আধুনিক। এদিক দিয়ে তিনটি ভাষাতেই একটি সাদৃশ্য দেখা যায়।

যেমন—"তেরেসে ধর্মক করিব জানি
পুখুরী খানিয়া রাখিব পানি।
বৃক্ষ রোপণত অধিক কর্ম
মঠ মণ্ডপ গুচকয় কর্ম।"

অথবা "পতিপদ্ম দিনে আপত নাই মতি।
গৃহে বাতি দেই সন্ধ্যাবেলাত।
রন্ধন করয় বচন মিষ্ট।
সেই গৃহিনীয়া বোলয় ইষ্ট।

কিংবা যি নারী প্রভাতে নিদ্রাক যায়।
বাসি সন্ধ্যাত দুকি পাই।
উদয় কালত নিলিপে ঘর।
ডাক বলে তাইক দারিয়ো নর।"

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্যযুগ বলে ধরা হয়। বাংলা, আসামী ও ওড়িয়া তিনটি ভাষাতেই এই সময়কার সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের মতন এই দুটি প্রদেশের সাহিত্যও প্রধানত এ সময়ে ধর্মানুরঞ্জিত রূপেই লক্ষিত হয়।

চৈতন্য পূর্ব যুগে বাংলার সাহিত্যিক কালে ছিল বৈষ্ণবগীতি কাব্য—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, অনুবাদ সাহিত্য—রামায়ণ ও ভাগবত, মঙ্গলকাব্য - মনসামঙ্গল রচয়িতার সংখ্যাগত লঘুত্ব লক্ষণীয়। বৈষ্ণবগীতি কাব্যে বিদ্যাপতিকে আত্মিক নৈকট্যের তাৎপর্যেই ধরা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তার যথাযথীয়

ভাষার গৌরব সম্বন্ধিত স্বাক্ষর বহন করে মাথা তুলে অবিস্মরণীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পদাবলীর চণ্ডীদাস নিয়ে তর্কের শেষ নেই কারণ ভাষা তাঁর আধুনিক। তবে এই আধুনিকতার পেছনে আছে কীর্তনীয়াদের কিছু অবদান—এ কথা অনেকেই বলেন এবং কথাটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। মনসামঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা কানা হরি দত্ত হলেও পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচয়িতা বিজয় গুপ্ত অথবা বিপ্রদাস পিপ্পিলাই কিংবা নারায়ণদেব এ নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধরবসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের ভাষাও যথেষ্ট পরিমার্জনা লাভ করেছে।

ঠিক এই সময়কার অসমীয়া সাহিত্যের রূপ কি ছিল? অসমীয়া সাহিত্যের মধ্য আর ভণিতার যুগ বলতে শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালনির্দেশ করেছেন। তবে তাঁর মতে এই যুগটির বিচার করাই ভাল। তাহ'লে পরবর্তী যুগের সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাবো ঠিক বাংলার মতনই এ যুগেও অনুবাদ সাহিত্য রামায়ণাদির রচনাই জনপ্রিয় সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই সময়কার সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাগবত ভট্টাচার্য বা অনন্ত কন্দলীর "কুমর-হরণ" কাব্য, পীতাম্বরের "উষা পরিনয়", মাধব কন্দলী প্রমুখ রামায়ণ কথাকারদের বিবিধ রামায়ণ কাব্য বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। অসমীয়া ভাষার রামায়ণ চারটি শ্রেণীতে বিভাজ্য—যেমন পদ্য রামায়ণ, কথা রামায়ণ, গীতি রামায়ণ ও কীর্তনীয়া রামায়ণ। মাধব কন্দলী ও অনন্তকন্দলী ছাড়াও শঙ্করদেব, মাধবদেব—প্রভৃতি কবিরা ও বহু রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। এ যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য শঙ্করদেবের রামবিজয় বা সীতা স্বয়ংবর, মাধবদেবের রামভাওনা, অনন্তকন্দলীর সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি।

বাস্তবিকপক্ষে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে স্থান—অসমীয়া সাহিত্যে ও সামাজিক ইতিহাসে কন্দলী রামায়ণেরও সেই স্থান—একথা মনে রাখতে। বিশেষ করে মাধব কন্দলী তাঁর রামায়ণকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ঢেলে সাজিয়ে তৃষ্ণার্ত জনসাধারণকে পরিবেশন করেছিলেন মোটের পর জনমানসের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেই তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এমনটি বাংলা সাহিত্যেও দেখি কৃত্তিবাসের রামায়ণে। তিনিও এখানে বাঙালী জনমানসকে সম্মুখে রেখেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এই রামায়ণ কথা বাংলাদেশে যেমন সুর সহযোগে গান রূপে পরিবেশিত হতো আসামেও তেমনি রামায়ণ সুরতীর্থ সহযোগেই গান করা হতো।

ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে বলরাম দাস স্মরণীয়। তিনি সম্ভবত তেমন লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন না (কৃত্তিবাস কিন্তু বিদ্বান ছিলেন—মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন)—লোকমুখে রামায়ণ শুনেই তিনি "জগমোহন"—শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় এই রামায়ণ রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন বলে তাঁর রামায়ণকে তিনি "জগমোহন"-রামায়ণ আখ্যায় ভূষিত করেছেন—

"জগমোহন কেলি এ রামায়ণ নাম।
শুদ্ধ করি ভজিলে পাইব বিষ্ণু ধাম।"

বলরাম দাসের এই রামায়ণের অন্য নাম দাণ্ডি রামায়ণ।

ওড়িয়াতে বাংলার শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মত ভাগবত অনুবাদও পাই। জগন্নাথ দাস ছিলেন ভাগবতের অনুবাদক। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন।

মহাভারত অনুবাদক হিসাবে সারলা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ

ছিলেন, মূল মহাভারতের অনেক কিছুই এঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না, কিন্তু সমস্ত ওড়িয়া ভূ-প্রকৃতি ও জন-জীবনের ছায়া এই মহাভারত স্নিগ্ধ ও সুকুমার করে তুলেছে।

আসামী ও ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে এই সময়কার অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি গভীর ও অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তা হচ্ছে ভক্তিভাব। মহাভারতকার সারলা দাস, রামায়ণকার বলরাম দাস ভাগবতকার জগন্নাথ দাস ওড়িয়া সাহিত্যে প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। মহাভারত রচনায় ওড়িয়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পূর্বগামী।

চৈতন্যোত্তর যুগ যার সীমা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত—এই সময়কার সাহিত্যের ইতিহাসেও বাংলা, ওড়িয়া ও আসামী সাহিত্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বলতে গেলে এ যুগে কাব্যধারার—অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের কাব্যধারার পাশাপাশি রীতি-কাব্যধারারও একটি প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়েছিল। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের প্রচণ্ড গতিবেগে সাহিত্যের যে বিচিত্র তরঙ্গ-আবর্তের বিবিধ রূপকলা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—তা ওড়িয়া ও আসামী সাহিত্যে অনুপস্থিত। বাংলা দেশের নিজস্ব মঙ্গলকাব্য—মনসা-মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্যান্য বিবিধ মঙ্গল কাব্য যেন একটি মহানদীর মতো কালের পথে পথে বাঁকে বাঁকে পাশা শাখানদী ও উপনদীর জলস্রোতে বর্দ্ধিতকায় হয়ে প্রবল গর্জনে, গতিতে ও তরঙ্গভঙ্গে অতুলনীয় মর্যাদা গ্রহণ করেছিল। আবার নীতিকাব্যে ধারার ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পদাবলীর বিচিত্ররূপ বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে—তাও বোধহয় অননুকরণীয়। কিন্তু তা বলে প্রতিবেশী অসমীয়া ও ওড়িয়া সাহিত্যও দীনবেশে ছিল না। ওড়িয়া সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। বাস্তবিকপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই একটি কৃত্রিম কাব্যরীতি ওড়িয়া সাহিত্যে লক্ষিত যার উপর সংস্কৃত ভাষা-ছন্দের প্রভাব বিশেষ ভাবেই দৃষ্ট হয়। উপেন্দ্র ভঞ্জ এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি এঁর কবিত্বাভিমান সম্বন্ধে সুন্দর শ্লোক আছে—

"উপইন্দ্র ধারবর টেকি বেকি বেনি বাহাদু।
ভূমিতলে কবিগণে ন গণই কাহাদু।
জয়দেব দীনকৃষ্ণ পদে মোর শরণ।
অভি সবু কবিষর মাথে বাম চরণ॥"

অর্থাৎ জয়দেব ও দীনকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য সব কবিদের মস্তকে বামচরণ স্থাপন করেন।

দীনকৃষ্ণ রসকল্লোল গ্রন্থের কবি। এর চল্লিশটি ছন্দে প্রথম থেকে শেষ চরণ পর্যন্ত প্রতিটি পংক্তির আরম্ভ "ক" দিয়ে। উপেন্দ্রভঞ্জের প্রভাবে পরবর্তী কালে বহু কবি সত্যজীবনের কাব্য রচনাকালে শিল্পকলায় মণ্ডিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্যে এই যুগে শঙ্করদেব প্রখ্যাত কবি। ইনি বড় সাধক ও দার্শনিকও ছিলেন। এঁর সময়ে অসমীয়া সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিতত্ত্বের স্বরূপটি এক হলেও রূপ ও আস্বাদনটি ছিল বিভিন্ন। উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ও বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পার্থক্য বিশুদ্ধা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির পার্থক্যে। বাংলা বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধকেই বিশেষরূপে উপজীব্য করেছিলো। কিন্তু উড়িষ্যা করেছিলো শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধকে। আসামের শঙ্করদেব কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রাগানুগা মার্গের পথিক তিনি ছিলেন না। শঙ্করদেব ছিলেন দাস্যরসের রসিক। এদিকে ওড়িয়ার অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য পরম্পরা

সম্প্রদায়ের সাধক। এই শিক্ষাপরম্পরাবৃক্ষ গুরু দয়াল দাসের শিষ্য বৃন্দাবতীর সাধনাও সহজিয়ের সাধনা। বৃন্দাবতী-রচিত "পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রোদয়" রসাত্মকরী ছন্দে রচিত নিম্ন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। ঠিক এই শ্রেণীর মহিলা কবি তদানিং অন্য কোনো প্রদেশে ছিল না। সতেরো শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের "প্রেমপঞ্চামৃত" একটি উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আমাদের শব্দরূপের ব্রজবুলিতে সুন্দর পদরচনা করেছেন -'হরি হরি লিয়া মোরি বৈড়ি অধিক ডেলি করলে অতয়ে অপমানা।"—ইত্যাদি পদ ব্রজবুলির অনুলিখিত সৌন্দর্যকে অপরূপায় প্রকাশ করেছে। অবশ্য একথা ঠিক কি ব্রজবুলি কি বাংলা—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিতা পদাবলীর যে হিল্লোল ঘটিয়ে দিয়েছেন তার বৈচিত্র্য ও গভীরতার কাছে অন্য কোনো প্রদেশেরই পদাবলী সাহিত্য তুলনীয় নয়।

যদিও ক্রমপরম্পরায় আসে না—তবু উল্লেখ করা প্রয়োজন—ওড়িয়া ও অসমিয়া সাহিত্যের বিশেষ কয়েকটি রচনারীতির কথা অবশ্য এই রচনারীতির কোনো কোনটি বাংলা সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। যেমন চৌতিশা ও বারমাস্যা। মঙ্গলকাব্যে ও পদাবলীতে আমরা চৌতিশা ও বারমাস্যার সাক্ষাৎ পাই।

চৌতিশা রচনায় ওড়িয়ার বঞ্চানাস উল্লেখযোগ্য। চৌতিশা রাগরাগিণী সহকারে গাওয়া হতো। এই চৌতিশারই একটি প্রকারভেদ "কোচিলি" গীতের মধ্যে মার্কণ্ড দাসের "কেশব কোইলি" প্রথম স্থানে কিংবদন্তী আছে। এই জাতীয় পদে কোকিলকে সম্বোধন করে বলা হয়, যেমন—যশোদার উক্তি—

"কোহিলি! খণ্ডরক্ষীর দেবি মুঁ কাহাকু।
গাইবার পুত্র গলা মধুরাপুরকু। (লো কেইলি।)
কোইলি! নব দেহ পাদাণ গরিলা।
নয়নে কজ্জল দেই রখে বসাইলা। (লো কেইলি।)

অসমিয়া সাহিত্যেরও এই রকম বিশেষ কিছু—সাহিত্যরীতি দেখা যায়, যেমন—

"বিয়ানাম" প্রভৃতি গ্রাম্যকথা, আদিরসাশ্রিত "বিষ্ণু"-গীত ও "নৌগীত" (অবশ্য নৌ-গীত পূর্ববঙ্গেও প্রচলিত ছিল) ইত্যাদি।

মনে হয় তিনটি প্রদেশেই বারমাস্যা গীতগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল—বিশেষ করে "বিরহ" কাব্যে।

আঠারো শতাব্দীতে সাহিত্যের প্রাণপ্রাচুর্য অনুরূপ গ্রহণ করবার পূর্বে যেন থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে "গদ্য" অনুপ্রবেশ সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিয়েছিল। শুধু তাই নয়—ধর্মীয় মনোভাবের বদল হয়ে "মানবিক" মনোভাবের অবতারণায় এ যুগের সাহিত্য অনেক বেশি মূল্যসমন্বিত হলো। ফলে জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্য অসীম সহানুভূতি ও বিস্তারের সঙ্গে বাংলা-ওড়িয়া আসামের সাহিত্যকে এক নবরূপে সিঞ্চিত করলো—যা আধুনিক সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অনুভব করবেন।

———

সাধনা বিউটি ক্রীম

মেয়েদের ত্বক সৌন্দর্যের গোপন রহস্য ধরা পড়েছে সাধনা বিউটি ক্রীমে।

আপনার প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় এই 'ক্রীম' অপরিহার্য। নিখুঁত, কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ লাবণ্যময় ত্বক—সাধনা বিউটি ক্রীমের এই তো সবচেয়ে বড়ো অবদান।

নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন আধুনিকারা এর প্রশংসায় মুখর। এই ক্রীম ছাড়া তাঁদের একটি দিনও চলে না। দিনের পর দিন ত্বকের যত্নের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা বিউটি ক্রীম-এর ব্যবহার আপনাকে এনে দেবে নতুন রূপ লাবণ্য।

প্রসাধন ব্যবহারের প্রথমেই নজর দিতে হবে পরিচ্ছন্নতার দিকে। ধুলো ময়লা জমতে দিলে শেষ পর্যন্ত ত্বকের লোমকূপ বুঁজে যায়। ফলে দেখা দেয় নানারকম ব্রণ, মেচতা, কালো দাগ ও মালিন্যের চিহ্ন। হারিয়ে যায় দেহের স্বাভাবিক রং, সজীবতা এবং সৌন্দর্য। কাজেই প্রথমেই ত্বক পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্বক পরিষ্কার করার পর, ঘাড় থেকে শুরু করে চিবুক গাল, কপাল এবং চোখের চার পাশে 'সাধনা বিউটি ক্রীম' লাগান। ধীরে ধীরে আলগোছে আঙুল চালিয়ে তা ত্বকের গভীরে বসিয়ে দিন। বিশেষ করে সকালে স্নানের পর ও রাত্রে শয়নের পূর্বে এই ক্রীম সযত্নে ব্যবহার করুন। দেখবেন, ব্রণ, মেচতা, কালোদাগ, কলঙ্ক চিহ্ন, ছুলি, বার্ধক্যের রেখা, এমনকি বসন্তের দাগও কোথায় মিলিয়ে গেছে। আপনার দেহে আবার ফিরে এসেছে স্বাভাবিক রং, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য। বসন্তের পুষ্প পেলব-মাধুর্যে আপনার তনু আবার হয়েছে কত সুন্দর কত সজীব।

'সাধনা বিউটি ক্রীম' শীতকালীন রুক্ষতা, গুনের বেঁচা-কাটা, হাত-পা কাটা, গ্রীষ্মের প্রদাহ প্রভৃতি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। কাটা, পোড়া, অল্পবয়স ত্বক-ক্ষত, পাকে ও আঙুলে ঘা এবং ছাতাও আরাম হয়।

দাড়ি কামাবার পর এর ব্যবহার অত্যন্ত আরামপ্রদ ও নিরাপদ।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র।

'সাধনা বিউটি ক্রীম' ব্যবহারে ত্বক সত্যই কোমল হয়। আমি নিয়মিত ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি।

—ইচিত্রা মিত্র

সাধনার 'বিউটি ক্রীম' সৌরভে মনোহর ও প্রয়োগেও ত্বকের সৌন্দর্যবর্ধক। —ডঃ উষা রায়

আমি নিয়মিত সাধনা বিউটি ক্রীম ব্যবহার করে বেশ সুফল পেয়েছি। —বেলা দে

অঙ্গরাগের নিত্য প্রয়োজনে 'সাধনা বিউটি ক্রীম' অনন্য। আমি নিত্য ব্যবহার করে থাকি।

—অধ্যাপিকা হাসি ভট্টাচার্য

সৌন্দর্য সাধনায় 'সাধনা বিউটি ক্রীম' অপরিহার্য। এর মিষ্টি গন্ধও মনোমুগ্ধকর। —ডঃ সুনন্দা ঘোষ

আননশ্রীকে সুন্দর করার সাধনা এখনও চলেছে এবং সেই সাধনায় শ্রেষ্ঠ সহায়ক সাধনার অমূল্য দান 'সাধনা বিউটি ক্রীম' —ডঃ সন্ধ্যা ভাদুড়ী

'সাধনা বিউটি ক্রীমে'র সুমিষ্ট গন্ধ এবং স্নিগ্ধতা মনকে প্রফুল্ল করে। —শ্রীমতী সেন

আমি নিয়মিত ব্যবহার করে দেখেছি 'সাধনা বিউটি ক্রীম' দিনের সঞ্চিত কালিমা মুছে দেয় এবং অলক্ষ্যে ত্বকের পরিপুষ্টি সাধন করে। —চিত্রিতা দেবী

দেহ ও মনের সৌন্দর্য রক্ষা করে একমাত্র 'সাধনা বিউটি ক্রীম'। —করুণা সাহা

'সাধনা বিউটি ক্রীম' ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি। এই ক্রীম ত্বককে কোমল রাখে।

—বিনতা রায়

সত্যিই আমার মুখে অতিরিক্ত কসমেটিক ব্যবহারের ফলে কেমন যেন কালো কালো ছোপ ধরেছিল। গত কয়েক মাস ধরে 'সাধনা বিউটি ক্রীম' পাউডার বেস হিসাবে ব্যবহার করেছি এবং ফলও আশ্চর্য পেয়েছি।

—উষা ভট্টাচার্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শারদীয়া
চতুর্বিংশতি বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পাড়ার ছেলেরা কালীপুজো করবে।

আমার কাছে এসে বললে, কিছু লিখে দিন।

কি লিখবো ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো—যে-প্রশ্নটি ছেলেবেলা থেকে আমার মনের মধ্যে জাগে, অথচ যার কোনও মীমাংসা কেউ কোনোদিন করে দিতে পারেননি—সেই কথাটি লিখি।

কালীর প্রতিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই আমি ভাবতাম—কে এই প্রতিমার পরিকল্পনা করেছিলেন আর কেনই-বা জননী-মূর্তির এমন সংহারস্বরূপ?

যখনই কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এই মূর্তি পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করেছেন আমি আগ্রহের সঙ্গে তা পড়েছি: পড়ে কিন্তু খুশী হতে পারিনি। লেখা পড়ে কখনও-বা মনে হয়েছে লেখক নিজেই বুঝতে পারেননি, আবার কখনও-বা দেখেছি 'প্রলয়ঙ্করী' 'করালবদনা' নৃমুণ্ডমালিনী' এমনি-সব বড় বড় বিশেষণ দিয়ে বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

শিলং-পাহাড়ে একবার এক সন্ন্যাসী স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে নিতান্ত অর্বাচীন ভেবে মৃদু হেসে বলেছিলেন—এই সামান্য কথাটা আপনি জানেন না?

সবিনয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল, আজ্ঞে না, জানি না।

তখন তিনি আমাকে যে-গল্পটি বলেছিলেন সেটি এই:

কালীর প্রতিমা কিরকম হবে—ভাবছিলেন নবদ্বীপের আগমবাগীশ। ভেবে ভেবে কিছুতেই যখন ঠিক করতে পারলেন না, তখন মনে-মনে সঙ্কল্প করলেন, আগামী কাল সকালে ঘুম ভাঙবার পর প্রথমেই যার মুখ দেখবেন কালীপ্রতিমা হবে সেই মুখের অনুরূপ। পরের দিন অতি প্রত্যূষে যেই তিনি বাড়ীর বাইরে এসেছেন, দেখলেন নবযৌবনা যুবতী এক গোয়ালিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। তার বাঁহাতে একতাল গোবর, আর ডান হাতটা ওপরের দিকে তোলা। সুমুখে পুরুষমানুষ দেখে পরণের কাপড়টা সে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু গোবর-হাতে তাড়াতাড়ি তা সে পারলে না। তার ফল হলো বিপরীত। সমস্ত কাপড়টাই খসে পড়লো তার দেহ থেকে। মেয়েটি তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। লজ্জায় সে জিভ কেটে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুহূর্তের ব্যাপার। আগমবাগীশ বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। বললেন, পেয়েছি।

এই হলো কালী মূর্তির পরিকল্পনা।

গল্পটি বামীজি কার কাছে শুনেছিলেন জানি না। আমাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

আমি কিন্তু এই উদ্ভট গল্প শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এবং অনেক পুরাণ-গ্রন্থে এইরকম কালীমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। সুতরাং আগম-বাগীশের গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তারপরেই শুনলাম রবীন্দ্রনাথের গান—

"আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁহাতে তোর শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ!"

একবার ভেবেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি।

পরে বুঝেছি অন্যায় করেছি। জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত ছিল। আমার জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন।

তা যখন হয়নি তখন নিজের কাছেই এর জবাব চেয়েছি।

এই যে কালীমূর্ত্তি - এই যে মৃন্ময়ী প্রতিমা, এ প্রতিমা আনন্দময়ীর প্রতিমা নয়। সাধকেরা এই দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্ত্তিকে মা বলে ভেবেছেন। শাস্ত্রকারেরা এই মাতৃমূর্ত্তিটিকে কোথাও এতটুকু কোমল মধুর শান্ত ও সুখকর করবার চেষ্টা করেননি। জননীমূর্ত্তির এমন সংহারক্রপ আমরা কোথাও কখনও দেখিনি।

জীবনের উষালগ্নে মমতাময়ী যে জননীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সেই জননীই আজ তাঁর সত্যরূপে প্রকটিত হয়েছেন। কালী অর্থাৎ কালের ভগ্নাংশ আমাদের এই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনকাল নিরাসক্ত এবং নিষ্ক্রিয় মহাকালকে স্পর্শ করে তারই উপর প্রতিষ্ঠিতা। আমাদের সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী কি বলছেন? বলছেন—এখানে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই সত্য। কিন্তু এই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তোমরা ভয় পেয়ো না। অভয় হস্ত উত্তোলন করে মা বলছেন—'মা ভৈঃ!'

যে-মা আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি সেই মা-ই আমি তোমাদের সংহার করবো। তার জন্য অবশ্য আমার লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই। প্রকৃতির এই অমোঘ সত্য আমাকে পালন করতেই হবে।

কিন্তু এই মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করে আমিই তোমাদের নিয়ে যাব নব নব জীবনের অমৃতলোকে।

এ-সত্য তোমাদের অজানিত নয়। সবই তোমরা জানো।

অথচ সৃষ্টি-রহস্যের এই খেলাটা ভাল জমবে না বলে মৃত্যু এবং তার পরবর্ত্তী জীবনের মাঝখানে মায়ারূপিনী আমিই টেনে দিয়েছি বিস্মৃতির একটি কৃষ্ণ যবনিকা।

আজ এই অমানিশার সন্ধিপূজালগ্নে তুলে দাও সেই কৃষ্ণ যবনিকা। চোখ চেয়ে ছাখো সেই মহাসত্যকে। দেখে নিঃশঙ্ক হও! নিশ্চিন্ত হও!

তোমরা কেউ মরবে না। তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমরাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে যেখানে তুমি খুঁটি গেড়ে বসেছ, সেখান থেকে কেউ যদি অকস্মাৎ তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তুমি সহজে তা বরদাস্ত করতে পারবে না। আবার তোমার সেই নিজের জায়গায় ফিরে আসতে চাইবে।

মাছকে জল থেকে তুলে দাও, সে আবার জলে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করবে।

একটি লতাগাছের মুখটাকে ছায়ার দিকে ফিরিয়ে দাও, দেখবে যেদিকে সূর্যের আলো সেইদিকে সে মুখ বাড়াচ্ছে। কারণ সে জানে, সূর্যের আলোক তার জীবন। সেই জীবনে অর্থাৎ সে তার স্বরূপে ফিরে যেতে চায়।

সেও যেমন মরতে চায় না, তোমরাও প্রত্যেকে তেমনি মরতে চাও না—বাঁচতে চাও। চিরজীবী হতে চাও।

সত্যই তো, এ-ইচ্ছা আমাদের জাগে কেন? সব সময় এই ইচ্ছা দ্বারা আমরা পরিচালিত হই কেন? যার প্রচুর আছে, স্নেহ মমতা এবং ভালবাসার পাত্র যার অনেক, সেও যেমন মরতে চায় না, যার কিছু নেই, যে-মানুষ নিঃস্ব এবং নির্বান্ধব, সেও তেমনি বাঁচতে চায়। অথচ মুখে বলে, 'মরণ হলেই বাঁচি।'

বাঁচবেই তো। আবার নতুন করে বাঁচবে।

কারণ, আমরা সকলেই চিরজীবী। আমরা 'সৎ স্বরূপ'।

তাই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা আমাদের স্বরূপে ফিরে যেতে চাই।

আমরা যা জানি তার চেয়ে বেশি জানতে চাই। জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও সীমা টেনে তৃপ্তি পাই না। অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে চাই।

এই খানেই বুঝি আমরা 'চিৎস্বরূপ।'

তারপর সুখ ও শান্তি। আমরা দুঃখী হতে চাই না। দুঃখ-কষ্টকে আমরা ঘৃণা করি। কারণ আসলে আমরা 'আনন্দস্বরূপ।'

এই সচ্চিদানন্দে ফিরে যাবার জন্যই জীবনে আমাদের যত-কিছু দুঃখভোগ—যত-কিছু সংগ্রাম।

অজ্ঞানের অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়ে সংসারের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে আমরা হাহাকার করতে থাকি। ক্ষণস্থায়ী এই অনিত্য সংসারকে ভাবি নিত্য এবং চিরস্থায়ী। অপবিত্র এই দেহটাকে ভাবি সুন্দর। পরিণামে দুঃখ পাব জেনেও ইন্দ্রিয় সুখকে ভাবি চিরস্থায়ী এবং আনন্দময়।

কেউ আমাদের আপনার নয় জেনেও আত্মীয়-স্বজনকে ভাবি আপন জন।

এরই নাম মায়া, এরই নাম অজ্ঞান।

তাই এই খণ্ডকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকার কাছে—চৈতন্যরূপিনী মহামায়ার কাছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হোক্—তিনি যেন তাঁর মায়া-যবনিকা আমাদের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত করে দিয়ে আমাদের অন্তঃকরণকে অনির্বচনীয় আনন্দে এবং চিত্তকে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

স্বামী জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরু-শিষ্য সংবাদ

সদানন্দ

—নরেন, তোমাদের সংসারের অভাব মোচনের জন্যে মার কাছে প্রার্থনা করেছিলে?

—না আমি তো সেকথা একেবারেই ভুলেগেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজের ঘরে বিশেষ চিন্তামগ্ন। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাঁর সংসার চলবে কি করে এই চিন্তায় তিনি অধীর। বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। ভাইদের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। কি করে তিনি সংসারের সব দায়িত্ব পরিত্যাগ করবেন? না তা হতে পারে না সংসার তাঁকে চালাতেই হবে। কিন্তু কি উপায়ে? গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন, কিন্তু কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, মা ভবতারিণী তো ঠাকুরের সব ইচ্ছাই পূর্ণ করেন তখন তিনি কেন ঠাকুরকে তাঁর কাছে তাঁর অভাব মোচনের জন্যে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করবেন না? ঠাকুর কি আর সে অনুরোধ ফেলতে পারবেন? বিবেকানন্দ উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন। মন্দিরের কাছে গিয়ে ঠাকুরের সামনে হাজির হয়ে বললেন—আজ আমার পরিবারবর্গ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আপনি দয়া করে মার কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তারা রক্ষা পায়।

নম্র এবং মিষ্টি গলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন—নরেন। আমি কি করে এসব কথা বলি। তুমি নিজে গিয়ে মা ভবতারিণীকে বল। তুমি মাকে অবহেলা করছ বলেই তো তোমাদের এই কষ্ট।

বিবেকানন্দ বললেন—মাকে আমি জানি না। আপনি দয়া করে আমার হয়ে তাঁকে বলুন না! আপনাকে বলতেই হবে।

ঠাকুর বললেন—আমি বারবার বলেছি। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। তুমি তাঁর কথা শুনছনা, তাই তিনি আমার কথায় কান দিচ্ছেননা।

আজ মঙ্গলবার। সোজা চলে যাও মন্দিরে। সেখানে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে মার কাছে প্রার্থনা জানাও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি যে বর চাইবে তাই পাবে।

বিবেকানন্দ ভাবলেন—আমি যা প্রার্থনা করব তাই পাব! বলতে বলতে তাঁর চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আশায় ও আনন্দে। হবে আর আমার পরিবারের কোন অভাব থাকবে না।

সাগ্রহে তিনি অপেক্ষা করছেন। রাত্রি ন'টার সময় রামকৃষ্ণদেব বললেন—এইবার যাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্র কম্পিত পদক্ষেপে মন্দিরের

দিকে চললেন। মার সামনে দাঁড়াতেই কি এক অলৌকিকভাব ও আবেশে তাঁর সমস্ত চিন্তা ভেসে গেল। মার সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বার বার বলতে লাগলেন—মা আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, দিব্য জ্ঞান দাও আর আমায় সব পরিত্যাগ করার ক্ষমতা দাও।

শান্ত প্রবাহে বিমুগ্ধ বিবেকানন্দ সব কিছু বিস্মৃত হলেন, কেবল চিন্ময়ী মা তাঁর হৃদয় উজ্জ্বল করে রইল।

মোহমুক্ত হয়ে নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে ফিরে এলেন। ঠাকুর জিগেস করলেন—কি নরেন মার কাছে অভাব মুক্ত হবার জন্যে প্রার্থনা করেছ?

বিবেকানন্দ চমকে উঠলেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তো তিনি মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর করলেন—না। কি করে যেন আমি সব ভুলে গেলাম। বলুন, এখনও কি কোন উপায় আছে?

ঠাকুর আদেশ করলেন—যাও, আবার যাও। মার কাছে গিয়ে বল।

আবার বিবেকানন্দ গেলেন মার কাছে। কিন্তু মাকে দেখেই সব ভুলে গেলেন। কেবল বারবার প্রার্থনা করতে লাগলেন—মা আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দিব্যজ্ঞান দাও।

নরেন্দ্র ফিরে এলে ঠাকুর আবার প্রশ্ন করলেন—মার কাছে জানিয়েছো তোমাদের অভাবের কথা।

নরেন্দ্র বললেন—না। বলতে পারিনি।

ঠাকুর বললেন যাও। আবার যাও। মার কাছে গিয়ে প্রার্থনা কর। যাও।

বারবার তিনবার নরেন্দ্র মন্দিরে গেলেন। মন্দিরে ঢুকতেই লজ্জায় তিনি অভিভূত হলেন, তিনি ভাবলেন, ছিছি, কি তুচ্ছ জিনিষের জন্যে আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি। হায়! আমি কী মূর্খ! রাজাধিরাজের কাছে আমি একমুঠো দরিদ্র ভিক্ষা করতে এসেছি।

লজ্জায় ও অনুতাপে সিক্ত হয়ে তিনি আবার মার কাছে প্রার্থনা করলেন—আমায় দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি দাও।

ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। সহসা একটা দিব্য আলোকরশ্মি তাঁর মনের মধ্যে খেলে গেল তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই সব ঘটছে। তা নাহলে বারবার তিনবার আমি অকৃতকার্য হলেম কেন? আবার তিনি ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনিই তো আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। আমি কি করে চাইবো বলুন। আপনিই বলুন, আমার সংসারে কেউ আর যেন কষ্ট না পায়। এই আশীর্বাদ আজ আমায় করুন।

শান্ত হাসি হেসে পরমহংসদেব বললেন, আমি তোমাকেই তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করতে বলেছিলেম। কিন্তু তুমি পারলেনা। যাই হোক, তোমার বাড়ির কাউকে আজথেকে অন্ন-বস্ত্রের জন্যে কষ্ট পেতে হবেনা।

সেই থেকে বিবেকানন্দের পরিবারের কাউকে খাওয়া পরার জন্যে কোনদিন কষ্ট পেতে হয়নি।

অন্তরীক্ষে

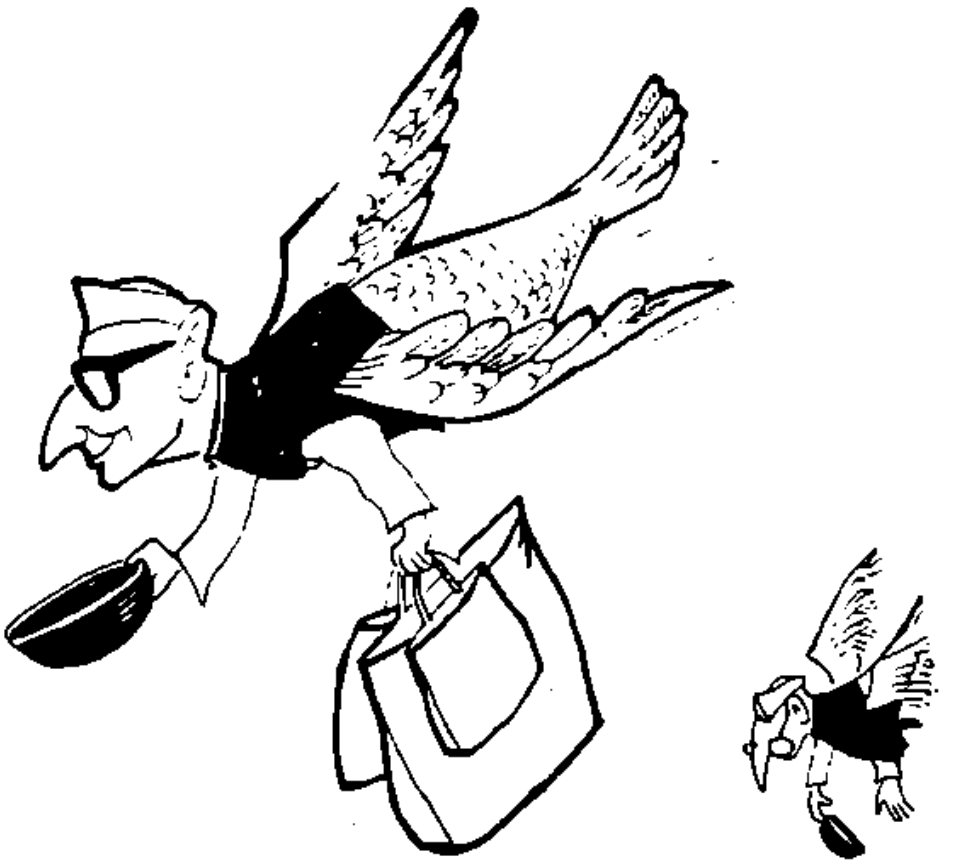

সাহায্য লাভের আশায়

দেশাই মশায়ের

বিদেশ পরিভ্রমণ

ও শুধু হাতে প্রত্যাবর্তন

রাজনীতি ও দলাদলি সর্বত্র!

ত্রাণ কার্য্যও কি এ পাপ থেকে আজ মুক্ত নয়।

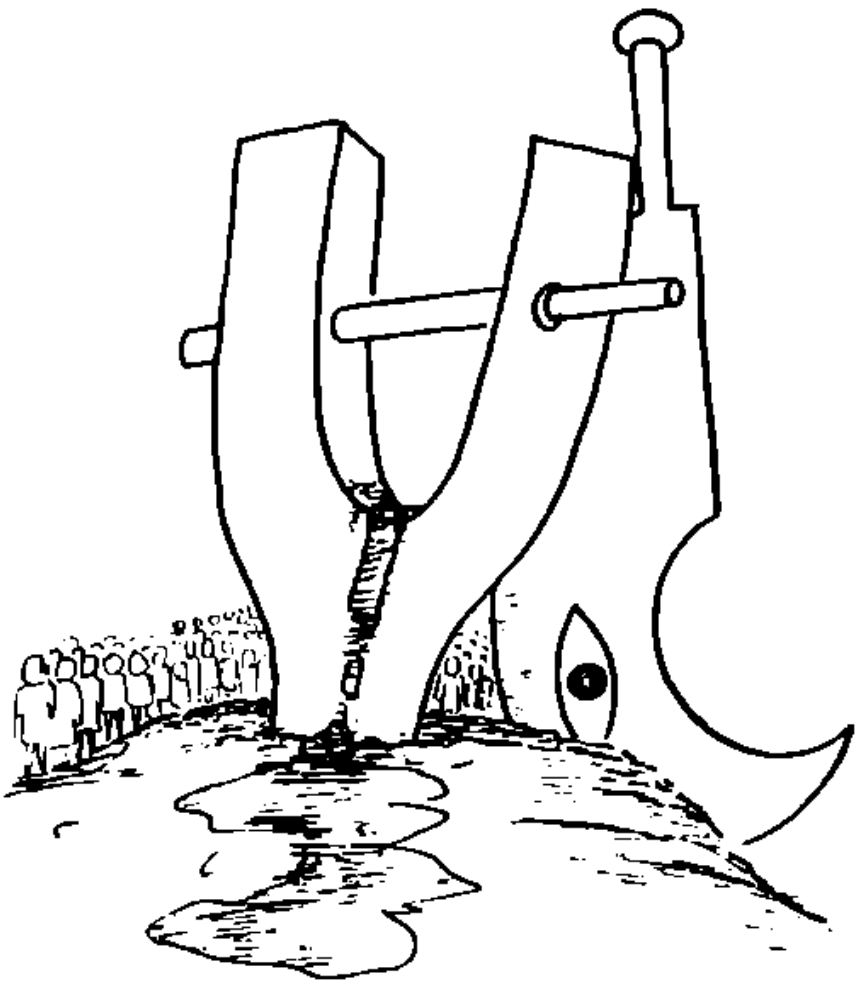

মানুষকে হত্যা করলো কে ?

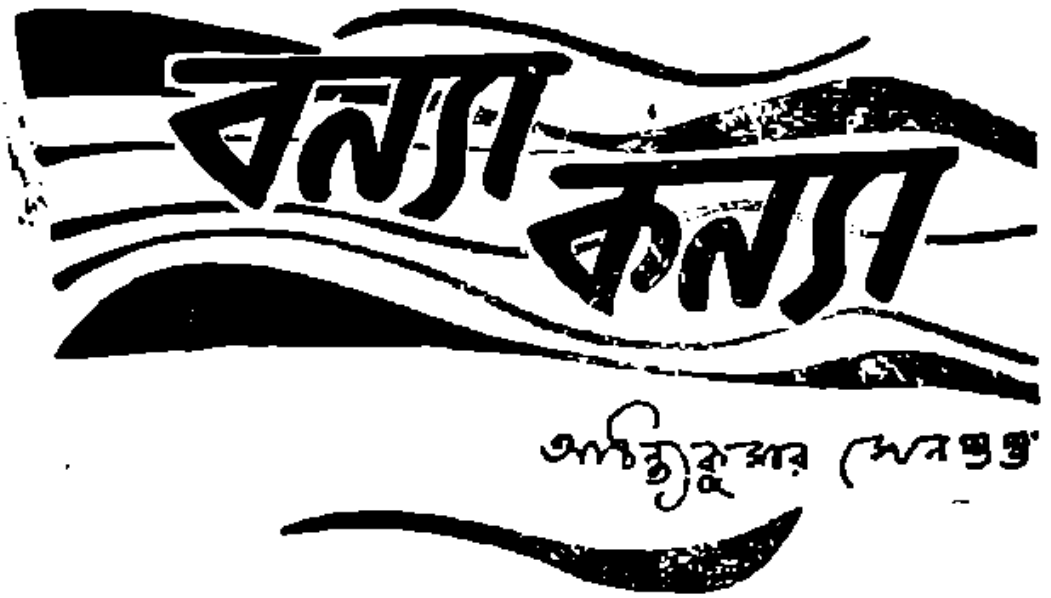

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জর্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জর্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই বছরে-বছরে ঘোরে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুকুলিকা দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি

দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃস্নেহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শীমূত হস্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘনিষ্ঠা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অন্ধখামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার

জ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি ঠেকে ছিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা ঠেকে দিল। সেটা ভুলনায় খারাপ হলেও সুবীর যখন সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানছে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো চলে থাক করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। তাকে কোথাও গিয়ে জয়ন্ত জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল।

সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস পড়ছে। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা নিতে। হিমাংশু মিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—!

৫ উন্মিল ৫

বনছায়ার নিজেকে কীরকম কুৎসিত, অশুচি মনে হতে লাগল। যেন একতাল কাদার মধ্যে ডুবে ছিল এতক্ষণ। বাথরুমে গিয়ে অনেক বারান্নাতেও এ গ্লানির যাবেনা। এ শুধু দেহের গ্লানি নয় এ অপমানের জ্বালা।

ঘুমন্ত পেয়ে তার ইচ্ছা ও সম্মতির বিরুদ্ধে তাকে আক্রমণ করবে এ কী নির্লজ্জতা! এ অবস্থায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী রেপ-কেস আনতে পারেনা? ভাবতেই কি রকম বিসদৃশ লাগল! ঐ অত্যাচারের অধিকার যথেচ্ছ পরিচালনা করবার জন্যেই তো স্বামীর স্বত্ব-স্বামিত্ব। ধর্ষণ বলে সাব্যস্ত না হোক, নিষ্ঠুরতা তো হতে পারে। আবার আপন মনে হাসল বনছায়া। ঐ নিষ্ঠুরতাই তো স্বামিত্বের ভূষণ। তারই তো আরেক নাম পৌরুষ। কোনো ক্ষেত্রেই স্ত্রীর উপর স্বামীর পৌরুষপ্রতিষ্ঠা দণ্ডনীয় নয়। স্ত্রীর মর্যাদা লঙ্ঘন করলেও নয়। নিভৃত কক্ষে স্বামীর কাছে স্ত্রীর আবার মর্যাদা কী।

তবে এর প্রতিকার কোথায়? প্রতিকার একমাত্র প্রতিরোধে। কিন্তু সেই থেকে তো সুরু হবে

সংঘর্ষ—তার মানে ঝগড়া, বচসা—এমন হীন কথা নেই যা সেই বচসার মধ্যে সম্ভবেনা—আর তার ফলে মারামারি, দৈহিক নির্যাতন—আইনের চোখের প্রত্যক্ষ 'ক্রুয়েলটি'—তার পরেই শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে পৃথকবাস এবং অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ। কথাটা মনে করতেই শিউরে উঠল বনছায়া। না, না, কিছুতেই না। সে তার বিয়েকে অমন একটা বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে যাবে না, কখনোই না। সেখানেও সে প্রতিরোধ করবে। তার দুই অস্ত্র—তার প্রেম আর সহিষ্ণুতা—তার স্বপ্ন আর সাহিত্য। সে অত সহজে হারবেনা, ছাড়বে না তার আনন্দের বন্ধন।

'তুমি মদ খেলে কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল বনছায়া। ভেবেছিল অভিমানের সুর আনবে, বেরিয়ে এল ঘৃণার সুর।

'খাবার জিনিস পেয়েছি, খেয়েছি—এতে আবার কথা কী।'

'আগে তো কোনোদিন খাওনি।'

'আগে তো কত জিনিসই করিনি। এখন চান্স পেলাম, খেলাম।' সুবীর বাহাদুরের মত বললে, 'সবই আনন্দের জন্যে।'

'আনন্দের জন্যে!'

'আরো, বলতে পারো, উন্নতির জন্যে।'

মূঢ়ের মত তাকাল বনছায়া।

'পার্টিতে বস আমাকে তাঁর নিজের পাশে বসালেন। গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, খান, টেস্ট করুন। আমি কিছুটা সংকুচিত হলাম, অনভ্যাসের সংস্কার একটু বাধা তো দেবেই। বস ধমকে উঠলেন, সে কী, আগে খাননি বলে আজ খাবেন না? দাদা গ্লাস হাতের কাছে এসে মিনতি জানালেও না? তবে প্রথম চুমু খেলেন কী করে? আগে তো কোনোদিন খাননি। তাই বলে উৎসুক ঠোঁট ফিরিয়ে দিলেন?' বস একটা খুব উপভোগ্য কথা বলেছে সেই গৌরবে হেসে উঠল সুবীর।

'আর তুমি অমনি ঢক ঢক করে সবটা গিলে ফেললে?' চুম্বনের প্রসঙ্গের লজ্জা সে নিজে সেই বিবেচনায় বনছায়া ভীষণ বিরক্ত হল।

'ঢকঢক করে খাই না চুকচুক করে খাই তখনো আমি দ্বিধা করছিলাম, বস আবার ধমকে উঠলেন। কী অত ভাবছেন, আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে খেয়ে ফেলুন। টু স্টার্ট উইথ, এক পেগ তো মোটে মাল, একটা ব্যাঙাচির পক্ষেও যৎসামান্য। ইয়ং ম্যান, তোমাই খুব ইউ ফাইট পাই? তাছাড়া, আপনি রাইটার, আপনি তো সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে, সব রকম অভিজ্ঞতার মোকাবিলায় প্রস্তুত। আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? তারপর কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললেন, মদ না খেলে বড় রাইটার হবেন কী করে?'

বিরক্তিতে তার বাঁধা, বনছায়া টং করে উঠল: 'যেন সমস্ত বড় রাইটারই মদখোর!'

'স্ট্যাটিসটিকস পরে নেওয়া যাবে।' বনছায়াকে নিরস্ত করে সুবীর তার আগের কাহিনীতে ফিরে গেল: 'আমি তবু একটু খুঁত খুঁত করলাম, গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললাম, কে জানে কী হবে! আমার হাকামিতে বস আবার ধমকে উঠলেন। বললেন, আনন্দ হবে। যান, এই তো চরম কথা—আনন্দ হবে। আনন্দের জন্যেই তো সমস্ত। চাকরি-বাকরি, সংসার, সাহিত্য, সবই এই আনন্দের জন্যে। মদ যদি আরো একটু আনন্দ আনে, আনন্দ বাড়ায়, তবে তাকে বাদ দিই কেন? আর এ বস্তুটি হাতের কাছে বিনাদামে এসে পড়েছে! এ আনন্দ শুধু আমারি একার নয়, আমার বন্ধুরও। আমার খেয়ে আনন্দ, বসএর খাইয়ে আনন্দ।'

'তোমাকে এক গ্লাস বিষ দিয়ে তোমার বস যদি আনন্দিত হতে চান তুমি তাই খাবে?'

'বিষ কিনে খাবনা কিন্তু অমৃত কিনে খাব।'

'কিন্তু মদ তো বিষ।'

'তেমনি চা-ও তো বিষ, সিগারেটও বিষ, তুমি যে তেলেভাজা খাও সেও বিষ।' সুবীর তার্কিকের ভূমিকা ছেড়ে দার্শনিকের ভূমিকা নিল, বললে, 'বিষ তো প্রতি গ্রাসে প্রতি নিশ্বাসে। সে কথা তুলতে যেওনা। বস খুশি হবেন বস প্রসন্ন থাকবেন এটাই তো মদ খাবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি। কিন্তু আমার বেলায় তিনি একটু বেশি আশ্বাস দিলেন। বললেন, এতে আনন্দ তো হবেই, আপনার উন্নতিও হবে। লেখার উন্নতি, চরিত্রে উন্নতি চাকরিতে উন্নতি।'

'লেখার উন্নতি তো দেখছি কবিতা লেখা ছেড়ে স্যামফ্লেটের অনুবাদ করছ। চরিত্রের উন্নতি তো রাত্রেই দেখলাম। আর চাকরির উন্নতি কী তা তো হালে-চালেই চোখে পড়ছে।'

তার চাকরি সম্বন্ধে কিছু বক্রোক্তি করলেই সুবীর আহত হয়। তাই এবারও সে ক্ষুণ্ণ হল। বললে, 'আর দুটো, মানে কবিতা ও চরিত্র, ও দুটোই গৌণ। আসল হচ্ছে চাকরি—টাকা, টাকার সুবিধে। যার বেশি টাকা তাকেই বড়োলোক বলে। যে বড়োলোক সেই বড়োলোকপক্ষ, সেই মহৎচরিত্রবান। কেননা টাকার জোরে তারই বড়ো বিজ্ঞাপন।'

'তাই সেই উন্নতির আশায় গ্লাসটা শেষ করলে?' নির্মম চোখে একটু কৌতুক করল বনছায়া: 'খেয়ে কেমন লাগল?'

'এ প্রশ্নটা বোস-সাহেবও করেছিলেন, খেয়ে কেমন লাগছে? আমি বললাম, বেশ ভালো লাগছে, স্ফূর্তি-স্ফূর্তি লাগছে আর এক পেগ দিন—'

'উঁহু—' বনছায়া আর্তনাদের মত একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে উঠল।

'কিন্তু, ভয় নেই, বোস-সাহেব আর দিলেন না বললেন, এই ভালো, যাত্রা ছাড়াবেন না। ড্রিঙ্ক করে আপনি তো আমার মত শ্মশানে ফিরবেন না, ফিরবেন আপনার সংসারে, যেখানে আপনার স্ত্রী রয়েছে অপেক্ষা করে। তাঁর সঙ্গে আপনার আনন্দের ছন্দ ঠিক রাখতে হবে তো? এক পেগ চলে যাবে। কিন্তু বেশি হলে ও পক্ষ পীড়িত হবে নিশ্চয়। ও পক্ষ পীড়িত হলে আপনার আর আনন্দ কোথায়? সুতরাং যাত্রা ভেঙে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আর দিলেন না খেতে। বললেন, তবে আপনার স্ত্রীর যদি সম্মতি থাকে, কিংবা তিনি যদি নিজে কিঞ্চিৎ সিক্তিত হন, তাহলে অবশ্যি আলাদা কথা।'

'তার মানে?' বনছায়া ঠিকরে উঠল।

'কিসের কী মানে?' গোবেচারা মুখ করল সুবীর।

'সিক্তিত হন মানে?'

'একজন আধুনিক কবি হয়ে দু একটাও সাধু ভাষা বলতে পারনা? সব সময়ে অসাধু কথাই বলতে হবে? তার মানে বস বলেছেন পরের ককটেইল পার্টিতে তোমাকেও নেমন্তন্ন করবেন।'

'আমি—আমি যাব মদ খেতে?' বনছায়া লাফিয়ে উঠল।

'খাওয়া আর খাওয়া দুটো আলাদা ব্যাপার।' সুবীর মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বললে, 'নাই বা খেলে, খেতে দোষ কী। তুমি না হয় মদের বদলে লেমনেড খেলে। খাওয়াটা বড়োকথা নয়, যাওয়াটাই বড়কথা।'

'খেতে খেতেই পিছলে যাওয়া। অসম্ভব। তোমার উন্নতি নিয়ে তুমি থাকো, তোমাদের ও সব ভবন্ত সংস্রবে আমি নেই।' বনছায়া ঘর ছেড়ে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

কদিন পরে সন্ধ্যার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বনছায়া উপন্যাস লিখছে, সুধীর পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। হাতে একটা মোটা প্যাকেট।

'একটা সুখবর আছে।'

'সত্যি?' ধড়মড় করে উঠে বসল বনছায়া: 'কোথাও তোমার কবিতা বেরুচ্ছে?'

'না, ওসব কিছু নয়। আমার উন্নতি হয়েছে। আমি চাকরিতে কনফার্মড হয়েছি। হুট করে আমাকে আর কেউ ছাঁট করে দিতে পারবেনা। তার উপর বস আমাকে একটা এপ্রাইনমেন্ট দিয়েছেন যার ফলে আজ আমার একশো টাকা রোজগার হল।' চোখে মুখে আনন্দের ছবি আঁকল সুধীর: 'তোমার জন্যে তাই একটা উপহার নিয়ে এলাম।'

কোনোদিন একটা ফুল পর্যন্ত আনে না, বনছায়া বিস্ময়ে উদগ্রীব হয়ে রইল। প্যাকেটটার যা আকার-প্রকার তাতে শাড়ি মনে হয় না, গয়না তো সুদূরপরাহত—হয়তো বই-টই কিছু হবে। কিন্তু প্যাকেটের চাকনা খুলে যা সুধীর বার করল তা রঙে-টলোমলো একটা সুন্দর বোতল।

'কী এটা?'

'ইংরিজিতে যে নামই দিই বাংলায় শুধু একটাই প্রতিশব্দ আছে। সেটা যেমন স্থূল তেমনি অনার্য। কিন্তু যাই বলো সনাতনরূপে আধুনিক।'

'তুমি আমার জন্যে মদ এনেছ? মদের বোতল?'

'একা তোমার জন্যে নয়, আমাদের দুজনের জন্যে। আমরা বিশেষ দিনে দল ঠিক করে ইচ্ছেমত মাত্রা মেপে এ পানীয় সেবন করব আর দুজনে আমোদিত হব, সুরভিত হব, প্রকাশিত হব—বলো না আর কী কী হব—এটা কি কম আনন্দের কথা?'

বনছায়ার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল: 'তুমি আমাকে মদ খেতে শেখাবে?'

'আহাহা, কী ভয়ানক শোকের কথা, তুমি আমাকে ঘোল খেতে শেখাবে!' সুধীর বিদ্রূপ করে উঠল: 'নিজেদের ঘরে, নিভৃতে, যেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই, যখন এমন কি অভিরাম পর্যন্ত নেই, তখন দুটিতে মুখোমুখি বসে একটু বিলিতি মদ্যপান করব তাতে তোমার আপত্তি কী। নিজেদের ঘরে নিজেদের খুশিমত আমরা এত সব খেতে পারি খাওয়াতে পারি, এ সামান্য পানীয়ে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আজ প্রায় প্রতি ঘরে দম্পতির সান্ধ্যবিনোদনে এর ডাক পড়ছে। প্রেমিক প্রেমিকার তো কথাই নেই, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার টেবলে পেয়ালার বদলে গ্লাস শোভা পাচ্ছে. একদিন বারগুলোতে উঁকি মেরে দেখে এস না—'

দু চোখে মর্মভেদী ধিক্কার পুরে বনছায়া সংক্ষেপে বললে, 'ছি ছি ছি!'

সুধীরও তার রসনাস্ত্রে এবার শান চড়াচ্ছে। হিমাংশু তার সামনে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছিল সেগুলিই প্রবলতর কণ্ঠে ঘোষণা করল। মদের মধ্যে কোনো নীতি বা মর্য্যালিটির প্রশ্ন নেই, মাত্রা মেনে চললে স্বাস্থ্যের কথা তোলাও অবান্তর। বনছায়া যে নাক কুঁচকোচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সে কত সেকেলে, তার সংস্কার কতদূর ভূ। তীর্থ করার জন্যে না হোক, অন্তত একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে প্রসিদ্ধ জায়গাটায় যেতে দোষ কি। একেবারে তলিয়ে যেতে কে বলছে, ভাসা-ভাসা একটা অভিজ্ঞতাও তো থাকা দরকার।

মেয়েরা তো তাই কোনোদিন বড় নেশন হতে পারল না, তাদের অভিজ্ঞতা শুধু ছেলেল, নয় কৌশল, নয় ঐতিহ্যবহ।

'কিন্তু মদ খেয়ে কী হবে শুনি ?' বিরক্তিতে বনছায়ার স্বর চড়ে গেল।

'আনন্দ হবে।' ফেটে পড়ল সুধীর : 'নইলে কেনই বা এত লাভ পরা আর সাজ খোলা ? কেনই বা রন্ধনচর্চা ? কেনই বা এত গয়নের এত আদরের বৈচিত্র্য ? সমস্ত মূলে ঐ আনন্দের সন্ধান। আনন্দ —নানারকম আনন্দ, নানারকম আনন্দ। আনন্দই একমাত্র প্রয়োজন। কখনো সুখের আনন্দ, কখনো না হয় দুঃখের আনন্দ—'

'না, আনন্দের জন্যে মদের দরকার হয় না।'

'অন্তত: আমার সম্পর্কে তোমার বিরূপতা দূর করবার জন্যে দরকার হয়। আমার সম্পর্কে তুমি যে নিতান্তই কোল্ড, উদাসীন, তার ওষুধই হচ্ছে ঐ টনিক। তা আমার সুখ আমার তৃপ্তির প্রতি তোমার দৃষ্টি থাকবে কেন, তোমার দৃষ্টি—'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল বনছায়া। কান খাড়া করে রাখল কথাটা কী ভাবে শেষ হয়।

সুধীর কথাটা শেষ করল না, অন্যকথায় লাফিয়ে পড়ে বললে, 'দরকার নেই, তোমাকে খেতে হবে না, বোতল আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। ভেবেছিলাম বাড়িতে থেকে মাত্রার মধ্যে থাকবে, দুজন দুজনকে রাখব শাসনে—এই পর্যন্ত, আর নয়—পরস্পরের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে উঠবে। তা যখন তোমার ইচ্ছে নয়, বেশ, আমি একাই আমার নিজের পথে চলব, তুমি তখন কিন্তু বলতে পারবে না—'

'তার মানে তুমি একা-একা মদ খাবে ?'

'বোকা পাব কোথায় ? তুমি তো বোকা হতে দিতে চাও না। তুমিও তো—'এখানে সুধীর যেন কাঁটার মত একটা কটাক্ষ ফোটাল : 'তুমিও তো একা-একাই থাকতে চাও।'

'আমি খাব না বলে তুমিও খাবে না এভাবে সমঝোতা গড়ে তোলো না। তা নয়, আমি খাব না বলেও তোমাকে যে করে হোক খেতেই হবে ? একদিন তোমার বস তোমাকে কী একটু খাওয়াল আর তাতেই তুমি এই মদ পেয়ে গেলে—এতদূর দাসত্ব !'

'কী আর করা, প্রত্যেক দীক্ষার জন্যে গুরু দরকার। আমার মদের দীক্ষার গুরু আমার বস। আর কে না জানে, দাসত্ব করতে করতেই প্রভুত্বে প্রমোশন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না,' বনছায়া হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : 'তোমার বস তোমাকে নষ্ট করছে, আর তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাইছ।'

'আমার বস সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে হবে না।' সুধীর রুখে দাঁড়াল : 'তুমি তোমার নিজের ঘর দেখ। তোমাকে যে নষ্ট করেছে তাকে ঠেকাও।'

'আমাকে ! আমাকে নষ্ট করেছে !' বনছায়া বোকা হয়ে উঠল : 'কে সে ?'

প্রশ্নের পাশ কাটাল না সুধীর, স্পষ্ট মুখোমুখি হল। বললে, 'আমার বেলায় আমার বস কিনা জানি না, তোমার বেলায় তোমার বস।'

'আমার বস, মিস্টার ভৌমিক !'

'হ্যাঁ, যার একটা অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তুমি নিরালায় বসে ধ্যান করছ।'

'ঈশ—কী সাংঘাতিক !' বনছায়ার সমস্ত শরীর ঝি-ঝি করে উঠল।

'সাংঘাতিক তো নিশ্চয়ই। নইলে ছাড়ুন-ছাড়ুন বলবার কী মানে! যেখানে এত বদ্ধতা, মাইনে-বাড়ানো, কমিশন বাড়ি ফেরার আয়োজন, সুখ-সুবিধের ছড়াছড়ি, সেখানে তিনি এই চরিতার্থতা আশা করতে পারেন বৈকি ছাড়ো-ছাড়ো নয়, ছাড়ুন-ছাড়ুন। অথচ অভিনয় না করলে পাতিব্রত্য ফুল হয় যে।'

'ছি ছি,' লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ঢাকতে চেয়েও ঢাকল না বনছায়া, বললে, বললে, 'একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর তুমি তার ঐ ব্যাখ্যা করলে?'

'হ্যাঁ, চিৎকারটা ছাড়ো-ছাড়ো নয়, ছাড়ুন-ছাড়ুন। বেশ সম্ভ্রান্ত চিৎকার!' সুধীর তার বিদ্রূপের প্রখর রইল: 'স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ও তো অবদমিত ইচ্ছারই বিপরীত প্রতিফলন। তুমি মনে মনে যেটা চাইছ সেটাই স্বপ্নে ঘটতে দেখে বাধা দেবার ভান করছ। চাইছ আসুন আসুন কিন্তু মুখে বলছ ছাড়ুন-ছাড়ুন।'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল বনছায়া। বললে, 'তাদের বিশ্বাস হয়েছে, দয়া করে আর বিজ্ঞানে দিশপন্ন হয়ো না।'

'কোনো দিকে দিশপন্ন হতে পারিনি বলেই তো তোমার এত অবজ্ঞা!' সুধীরের কথায় হঠাৎ কেমন বেদনার সুর বাজল: 'স্ত্রীর স্বামীর সুখের জন্যে কত কিছু করে, আর এ তো স্বামীরই কণ্ঠস্বরে কোলের কাছে বসে একটুখানি ড্রিঙ্ক করা—আর এতেই তোমার উপর কিনা হিমালয় ভেঙে পড়ল! কিন্তু আজ যদি কোনো প্রাইভেট পার্টিতে তোমার বস তোমাকে একচুমুক ককটেইল খেতে বলত, তুমি তাকে বাধিত করতে, ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে না। তাই বলছিলাম আমার শাস্তি আমার তৃপ্তির দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, তোমার যত দৃষ্টি সব তোমার বস-এর দিকে।'

বনছায়া আর উত্তর করলনা, কথা বাড়ালনা। অবস্থাটা সম্যক বুঝে নিল। সুধীর ভুরুপ করবার মত একটা রঙের তাস পেয়ে গেছে—তার সেদিনকার সাদা ঘুমের উপর সুধীরের গভীর প্রণয়ের উত্তরে তার সেই চকিত আর্তনাদ—'এ কী অন্যায়, ছি, ছি, ছাড়ুন, ছাড়ুন।' সেই আর্তনাদটাকে এখুনি একটা আনন্দধ্বনিতে ডুবিয়ে দেওয়া দরকার। বেলা আর বাড়তে দেওয়া নয়। কাঁটা যদি সন্দেহের ঘর এখুনি সেটাকে তুলে ফেলা উচিত, তর্কের মাটিতে রেখে দিলেই কাটল বাড়াবে। স্বামীর ক্ষুদ্র একটা নিভৃত বাসনকে প্রশ্রয় দেবার আপত্তিতে সে বিয়েটাকে বিপন্ন করতে পারবে না। একটু শুধু ড্রিঙ্ক করা তো, সে আর এমন কী অন্যায়—স্বামীর সখ হয়েছে, সে তা মিটিয়ে দেবে। 'স্বামীর কোলের কাছে বসে একটুখানি ড্রিঙ্ক করা—'ঐ জায়গাটা কেমন সুন্দর বলেছিল। হ্যাঁ, স্বামীর গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাস ঠেকিয়ে দিয়ে সে সখ পাবে। তার আবার ভয় কী। তারও হাতে রঙের তাস আছে—সামান্য ছুরি-তিরি নয়, সাহেব-গোলামের চেয়েও যা বেশি—তার হাতে আছে রঙের টেক্কা, সেরা তাস, যার আরেক নাম ভালোবাসা।

বনছায়া স্নেহ মিশিয়ে অপরূপ করে হাসল। বললে, 'না, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার দৃষ্টি সব সময়ে তোমার সুখের দিকে—তারো চেয়ে বেশি, তোমার ভালোর দিকে। বেশ, তোমার কথা রাখব, তোমার কোলের কাছে বসে মদ খাব। আর তোমাকে বুঝতে দেব তোমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কী নিদারুণ ভুল!'

মুহূর্তে ঘরখানে পরিবেশটা নতুন হয়ে গেল। ওজন কেটে বইল দক্ষিণ হাওয়া। সুধীর উল্লাস করে উঠল: 'ভুল, ভুল, সমস্ত ভুল। একমাত্র সত্য হচ্ছে উন্নতি—আত্মোন্নতি। আর আত্মোন্নতির অর্থই অর্থোন্নতি!'

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে ঘরের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসল।

'তুমি আমাকে নিজের হাতে ঢেলে দাও।' বনছায়া বললে, 'দেখো বেশি দিয়ে ফেলো না'।

'না, অল্পই দেব।' মাথা নাড়িয়ে সুবীর বললে, 'সব বলে দিয়েছে, মিষ্টি মদ, এতে নেশা লাগবেনা, একটু জল মিশিয়ে নিলেই হবে।'

এর পিছনেও সব-এর নির্দেশ। কিন্তু বনছায়া আর ওদিকে গেলনা। নিজের-বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে রইল। রইল ধৈর্য ধরে।

সুবীর গ্লাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে দিল বনছায়াকে।

'আমাকে যতটুকু দিয়েছ তুমিও ঠিক ততটুকু নেবে। একচুল বেশি নয়।'

'তাই নেব। সমান-সমান। আমি তো আগেই বলেছি আমি তোমাকে কনট্রোল করব, তুমি আমাকে কনট্রোল করবে।'

তাদের মধ্যে আরো একটা সর্ত স্থাপিত হল। যেদিন সব উপস্থিত হবে সেদিন পূর্বক্ষণে তারা পানে মিলিত হবে। উভয়ের সম্মতিতেই ভূমিকা, উভয়ের সম্মতিতেই পরিশেষ।

'তাহলে কি পানের বাইরে আমাদের সঙ্গ আর হবেই না?' চোখে দাস্তপুরে জিজ্ঞেস করল বনছায়া।

তার ব্যাকুলতায় খুশি হল সুবীর। বললে, 'পানের রাত হচ্ছে পুজোরছুটি আর বাকি সব ছুটকো-ছাকটা—কী, গ্লাস শুধু ধরেই রইলে যে, খাও, চুমুক দাও।'

'কী রকম ভয় করছে!' বনছায়া দারা শরীরে লাবণ্যের ঢেউ-আনল: 'যদি মাতাল হয়ে যাই।'

'তাহলে তো অপরূপ দেখতে হবে।' ভাবতেই যেন সুবীরের চোখে নেশা লাগল, বললে, 'অনেক রকম সুন্দরী আছে, তবে, শুনেছি মাতাল-সুন্দরীই নাকি অপার্থিব।'

'দেখো বাপু, আমি কিন্তু কিছু জানিনা, তোমার কথায় আছি।'

'না, না, কিছু ভয় নেই তোমার। একদিন খেয়েই বুঝবে কতটুকু তোমার ডোজ। মাতাল হয়ে লাভ নেই—শুধু একটু গোলাপী নেশাই যথেষ্ট।'

দুজনে ধীরে ধীরে বার-বার গ্লাস শেষ করল। তারপর জল পাশাপাশি। আলোটা নেবালনা। ঘর অন্ধকার করে দিলে পরস্পর পরস্পরকে আনমিত চোখে দেখবে কী করে?

কতক্ষণ পরে সুবীর জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো।' বনছায়া ভারাট গলায় বললে, 'মনে হচ্ছে আমার খুব সাহস বেড়ে গিয়েছে, আমার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি অনেক শক্তি অনেক উৎসাহ—'

'কী ইচ্ছে করছে?' কণ্ঠস্বর অস্ফুট করল সুবীর।

'লিখতে ইচ্ছে করছে! ইচ্ছে করছে রাত জেগে লিখে বইটা শেষ করি। মনে নানারকম সব আইডিয়া এসে যাচ্ছে, নানারকম ভাবালস। উপন্যাসে ভাবালসই তো আসল! ভাবালসের মধ্য দিয়েই চরিত্রের রূপায়ন। কী বলো, তাই না? কিন্তু তুমি যা শত্রু—তুমি কি লিখতে দেবে?'

সুবীর যা ফল চেয়েছিল তা পেলনা। ভেবেছিল এক উত্তেজনা থেকে বহুতর উত্তেজনায় বিকশিত হবে বনছায়া। কিন্তু দেখা গেল ঘুরে ফিরে সেই স্বাভাবিকতায়ই তার অগাধ বিশ্বাস। না, মাত্রা সে কিছুতেই ছাড়াবেনা, আর মত্ততাকে অভ্যাসের ধারে-কাছে আসতে তো দেবেই না, রাখবেও এত দূরে-দূরে যেন সেটা একটা বিরল পূজা পার্বণের ব্যাপার। শুধু সংস্কারের অহংকারটুকু যে ভাঙতে পেরেছে এই যা সুবীরের অহংকার।

'এবার তবে আমার বস-এর পার্টিতে চলো।' সুবীর ডাকল বনছায়াকে।

'কী, মদ আছে?'

'মদ ছাড়া আবার পার্টি কী। পার্টির নামই তো মোরগপুচ্ছ। ককটেইলস।' সে কথা তো তোমাকে একদিন বলেছি।'

'সেখানে আমি এক পেটি কেরানির বউ, আমার নিমন্ত্রণ হয় কী করে?'

'নিমন্ত্রণ হয়েছে। কার্ড দেখ। মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস—'

'কে না কে, আমি নই। পার্টি হয় সমানে-সমানে, কুলে-মানে যারা সমোত্র, তাদের। মোরগপুচ্ছদের ভিড়ে ময়ূরপুচ্ছদের স্থান নেই।'

'তা হলে যাবে না?'

'না। আমার মনে হয় তুমিও না গেলে ভালো করবে।'

'অসম্ভব। আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু যখন বস তোমার কথা জিজ্ঞেস করবেন, জানতে চাইবেন, কেন এলে না, আমি তখন কী বলব?'

'কী বলবে তার আমি কী জানি।' একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বনছায়া বললে, 'বোলো, তাকে এখনো এত নষ্ট করতে পারিনি যে মদের গন্ধ পেলেই ছুটে আসবে।'

সুবীর একা গেল আর ফিরল প্রায় হাতাল হয়ে।

বনছায়াই দরজা খুলে দিল।

'এ কী, সর্ত ভাঙলে যে! কথা ছিল না বাইরে যাবেনা?'

'তুমি গেলে না কেন? তুমি গেলেই তো পারতে কনট্রোল করতে।' সুবীর উলটো চাপ দিল: 'না গিয়ে তুমিই তো সর্ত ভাঙলে।'

'বা, বেশ কথা! কনট্রোলের কথা তো বাড়ির গাওয়ার, সমস্ত বিষয়টাই তো বাড়ির ব্যাপার। বাইরে কে যাচ্ছে, কে দেখছে?'

'সারাক্ষণ কি বাড়ি দিয়ে হয়? বাড়ির বাইরেও তো বিরাট শহর।'

'বেশ, তবে সেই শহরেই খোঁজগে, বাড়িতে আর পাবেনা।'

কদিন শান্তিতে থাকবার পর সুবীর আবার সর্ত ভাঙল—এবার বাড়ির সর্ত। মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত বনছায়ার পাশ থেকে সে ধীরে উঠে গেল, নিঃশব্দে মদের বোতলটা বার করে ঘুরে সরে গিয়ে গ্লাসে মদ ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে নিল। আলো জ্বালাতে হলনা, খোলা জানলা দিয়ে ঘরে যেটুকু আলোর আভাস এসেছে তাতেই সমাধা করল।

তারপর শান্ত হয়ে শুতে গেল।

'এ কী, এ কী—' ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল বনছায়া।

'এ সেই গান, যা হঠাৎ সুদূরলোক থেকে ভেসে আসে।'

'কিন্তু তুমি তো মদ খেয়েছ।' বনছায়া অসহায়ের মত বললে, 'আমি বুঝেছি, এ তো বাড়ির মদ।'

'বাড়ির মদ তো খাবার জন্যেই। ঘরে জমা করে রাখবার জন্যে নয়।'

[ক্রমশঃ

উত্তর বঙ্গের দারুণ সংকটে আপনার কর্তব্য

বিশেষ ক্রোড়পত্র : গল্পভারতী : কার্তিক ১৩৭৫

উত্তরবঙ্গের বন্যা

১৯২২ সালের ঘটনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংকট ত্রাণ সমিতি

[আজকের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে চেচল্লিশ বছর আগেকার কথা—১৯২২ সালে সেপ্টেম্বরের শেষে উত্তরবঙ্গে অত অকস্মে এসেছিল এমনি প্রলয়ংকর বন্যা। সেদিন সমগ্র বাঙালী জাতি যাঁর আহ্বানে আর্তত্রাণে উদ্দীপ্ত হয়েছিল সেই পুণ্যশ্লোক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেদিন বিপন্ন মানুষের সেবার জন্যে যে অদ্ভুত কর্ম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙালী জাতির ইতিহাসে চিরদিন তা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সেই বন্যায় আচার্য দেবের কিছু কর্মকৃতির স্মৃতি এই সূত্রে চয়ন করে দেওয়া হল। সেদিনকার বাঙালী আত্মত্রাণে যেমন করে জেগে উঠেছিল আজও তেমনি ভাবে উদ্বুদ্ধ হোক দেশজননীর কাছে এই প্রার্থনাই আজ আমরা করবো। মা, বাঙালীজাতিকে আজ সমস্ত কলুষ ও মলিনতা মুক্ত করে অমর মন্ত্রে দীক্ষা দাও]

উত্তর বাংলার প্রতি বন্যার যেন বিশেষ অভিশাপ আছে। ইতিপূর্বে ১৯২২ সালে যে বন্যা হয়েছিল তার সর্বনাশ ও বড় কম ছিল না।

তখন বিদেশী শাসকদের ছিল নিষ্ঠুর ঔদাস্য। সংগঠিত কোন ত্রাণ কর্মের ব্যবস্থা ছিল না। দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম বেসরকারী ভাবে খুলনা দুর্ভিক্ষে 'আর্তত্রাণ' ও উত্তরবঙ্গের প্লাবনে সঙ্কটত্রাণ সমিতি গঠন করেন।

পাড়ায় পাড়ায় দলে দলে ছেলেরা গান গেয়ে টাকা পয়সা কাপড়চোপড় সংগ্রহ করতে লাগল। সারা কলকাতায় সে কি অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। অমৃতলাল বসু গান বেঁধে দিলেন :

"ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার
ঐ শোন ঘোর রব ভীম নাদ তার!
ভাসিতেছে প্রাণীকুল ঘোর চারিধার
ভ'সে যেন তৃণ গুচ্ছ না পেয়ে আধার।
স্থবির বালক নারী
হা অন্ন হা অন্ন করি
ভুবন বিদারি সবে করিছে চীৎকার।"

সারা কলকাতার সকল পল্লী সেই গানে মুখরিত হয়ে উঠল।

ছেলের দল যখন গান গাইতে গাইতে পল্লী পরিক্রমা করত তখন এমন বাড়ী ছিল না যে বাড়ির পুরস্ত্রীরা টাকা পয়সা জামা কাপড় দেন নি।

সেই দলের পুরোভাগে থাকতেন, সুভাষ চন্দ্র বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত কুমার বসু, সুধীর ঘোষ, রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব, অমর বসু, ডাঃ ইন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি অগ্রণী দেশকর্মী ও নেতার দল।

মনে আছে, একদিন খর রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে আমরা গান গাইতে গাইতে চলেছি এমন সময় একটি বড় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। আমাদের ভিক্ষার ঝোলায় দিলেন অনেক চাল, কাপড়, টাকা। তারপর বাড়ির মধ্যে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। বললাম, আপনি এই রোদে আমাদের সঙ্গে কেন? বাড়ি যান, আমরা এখনো অনেক ঘুরবো।

বৃদ্ধা তার উত্তরে কি বললেন, জানেন? বললেন, "আমার সব সোনার চাঁদ ছেলেরা (বিশেষ করে সুভাষ বাবুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে) এত কষ্ট করে ঘুরছে, আর আমি একটু ঘুরতে পারবো না।" প্রায় তিন ঘণ্টা তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সে কথা বিদ্যুতের মতো লোক মুখে ছড়িয়ে পড়বার পর হাজার হাজার লোক চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে আমাদের সেই পথ পরিক্রমায় যোগ দিয়েছিল।

এই সূত্রে আচার্য দেবের আত্ম-কাহিনীর কিছু প্রাসংগিক অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। তার মধ্যে থেকে পাঠকবর্গ অনেক তথ্য আহরণ করতে পারবেন।

আচার্যদেব লিখছেন—১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রবল বৃষ্টির ফলে আত্রাই নদীর গর্ভ প্লাবিত হয় তাহাই বন্যার কারণ। স্টেটসম্যানের একজন সম্পাদক সেই সময় ঐ অঞ্চলে ছিলেন। তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এই ভীষণ সংবাদ মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে অন্যসূত্রে সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঘটনাস্থলে অবস্থা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। সেখান হইতে তিনি আমার নিকট, কংগ্রেস অফিসে এবং বঙ্গীয় যুবক সংঘের আপিসে তার করেন। সুভাষবাবু বঙ্গীয় যুবক সংঘের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংবাদ পত্রের মারফৎ সাধারণের নিকট এই মর্মে আবেদন করা হইল যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন হলে জনসভা করিয়া বন্যা সাহায্য কমিটি গঠন এবং ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী আলোচনা করা হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় অপূর্ব আগ্রহ সহকারে যোগ দিয়াছিল। বন্যা সাহায্য সমিতি গঠন হইল এবং আমি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইলাম। আমি গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলাম না কিন্তু লোকে আমার আপত্তি গ্রাহ্য করিল না।

বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যা সাহায্য সমিতির অফিস করা হইল এবং অপূর্ব উৎসাহের চাঞ্চল্যে ঐ বিদ্যা মন্দিরের নীরবতা যেন ভঙ্গ হইল। দলে দলে নরনারী ঐ স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিল। বহু স্বেচ্ছা সেবক, তার মধ্যে অধ্যাপকরাও ছিলেন, প্রত্যহ সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনবরত কার্য করিতেন।

শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের হৃদয়আর্তের দুঃখে স্বভাবতই বিগলিত হয়। তিনিই প্রথম স্বেচ্ছায় বন্যা বিধ্বস্ত স্থানে গিয়া অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ডাঃ জে. এম দাসগুপ্ত বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে কিছুকাল থাকিয়া সেবা সমিতি গঠন করেন। বগুড়ার নিঃস্বার্থ কর্মী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় নৌকার অভাবে কেরোসিন টিনের তৈরী নৌকায় চড়িয়া বন্যার্তদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তও বহু স্বেচ্ছা সেবক সংগ্রহ করিয়া বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন এবং সেবাকার্যের প্রধান চাপ শেষ পর্যন্ত বহন করেন।"

এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিলাতের প্রভাবশালী পত্রিকা ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের এক বিশেষ সংবাদ দাতা বন্যার বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং ১১ই নভেম্বর তাঁর কাগজের জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে ভারত গভর্নমেণ্টের অবহেলা, কাজের ত্রুটি, সরকারী কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা প্রভৃতির

কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে ভারত গভর্ণমেণ্টের আমলাদের অমার্জনীয় ঔদাসীন্যের ফলেই এই বন্যার সৃষ্টি এবং এই বন্যার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এই প্রসঙ্গে সেই পত্র লেখক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্রাণ কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে এই পত্র প্রেরক লিখছেন —গভর্ণমেণ্ট যখন দারিদ্র পালন করবার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখালেন না তখন একজন রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক স্যার পি. সি. রায় কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন এবং দেশবাসীকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্যে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে সকলে সোৎসাহে সাড়া দিল। স্যার পি. সি. রায় প্রবল জাতীয়তা বাদী এবং গভর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠন কর্তা হিসাবেও তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইংরাজকে আমি বলতে শুনেছি—'মিঃ গান্ধী যদি আর দুজন স্যার পি. সি. রায়ের মত লোক পেতেন তাহলে এক বছরের মধ্যেই তিনি স্বরাজলাভে সক্ষম হতেন।'

ম্যাকেস্টার গার্ডিয়ানের সেই দীর্ঘ পত্রটির ছত্রেছত্রে ছিল বাঙ্গালী যুবকদের সম্বন্ধে বাঙ্গালী নেতাদের সম্পর্কে, বাঙ্গালী সংগঠন কার্যের বক্তৃতা সম্পর্কে, বাঙ্গালীর চরিত্র সম্পর্কে উচ্ছসিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা।

হায়! সেদিনও নেই সে বাঙ্গালীও নেই। সেদিন কি আর ফিরে আসবে?

উত্তরবঙ্গের মহাপ্লাবন

কয়েকটি ঘটনা :

উত্তরবঙ্গের সর্বনাশা মহাপ্লাবনে কত যে মর্মান্তিক মৃত্যু, কত যে বেদনাদায়ক ঘটনার কথা শোনা গেল তার হৃদয় বিদারক স্মৃতি বাংলা দেশের মানুষের মন থেকে বোধ করি কোন দিনই মুছে যাবে না।

জলপাইগুড়ির ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক দীর্ঘপত্রে তাঁর ভীষণ করুণ অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের জানিয়েছেন। স্ত্রী পুত্রদের কোন রকমে বাঁচাবার পর তিনি নিজে জলের স্রোতে ভেসে যান। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ডাঙায় উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে ভগবানকে স্মরণ করে তিনি যখন কালো করাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেই সময় একটি মিলিটারি জীপ সেই জায়গায় এসে জলে আটকে যায়। তিনি কোন রকমে সেই জীপটাকে ধরে ফেলে প্রাণ বাঁচান। তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনীতে তিনি লিখেছেন। চোখের সামনে দেখলাম, মায়ের বুক থেকে শিশু ছিটকে চলে গেল স্রোতের মধ্যে। আর 'আমার খোকা', 'আমার খোকা' বলতে বলতে মা সেই স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খোকাকে বাঁচাতে। নিমেষের মধ্যে তলিয়ে গেল। হারিয়ে গেল, মা আর তাঁর শিশু। স্বামী তখন আর একটি ছেলের হাত ধরে ডাঙায় দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করছেন। ...বৃদ্ধা মা জলের তলায় পড়ে আর্তস্বরে ছেলেকে বলছেন, "তুই আমায় জলে ভাসিয়ে দিলি, ওরে আমাকে বাঁচা, আমাকে বাঁচা," বলতে বলতে তিনি ভেসে চলে গেলেন, ডুবে

গেল তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, আর ছেলে বাড়ির ছাদে বসে অসহায়ের মতো কাঁদতে লাগল। পরদিন সকালে দেখা গেল, ছেলেটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তার মুখে কেবল একটি কথা, মা, মা, মা। চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি গোটা পরিবার, স্বামী স্ত্রী তিনটি ছেলে মেয়ে। তাদের মধ্যে কী করে যেন রক্ষা পেয়ে গেল দশ বছরের মেয়েটি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দু' হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে সে কাঁদছে আর বলছে আমার মা, আমার বাবা, টুলু, দাদা, এরা সব কোথায় গেল? সেই মেয়েটির কান্না কি আর কোনদিন থামবে! থামবে কি সেই মহিলার কান্না ও যাঁর চোখের সামনে ভেসে চলে গেল তাঁর স্বামী পুত্র কন্যা আর তিনি রইলেন বেঁচে! তিনিও পাগল হয়ে গিয়ে কেবল বলছেন "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও; আমি যাই, ওরা আমাকে ডাকছে।"..... এমনি কত ঘটনাই যে ঘটেছে তা লিখে শেষ করা যাবে না!

এরই মধ্যে দুটি কুকুরের আশ্চর্য প্রভুভক্তির কাহিনী সেদিন শোনালেন স্থলেখক শ্রীরাসবিহারী রায়। তাঁর জামাই আনন্দবাজারের জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি রূপে সেখানে ছিলেন সপরিবারে। সেদিনকার সেই ভীষণ রাত্রে তিনি অঘোরে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময়ে কাপড়ে টান পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখলেন, তাঁর পোষা দুটি কুকুরের একটি তাঁর কাপড় দাঁত দিয়ে টানছে, ভাবলেন, কুকুরটা দুষ্টুমি করছে। ধমক দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন পাশ ফিরে দেখলেন, অন্য কুকুরটি তার বিছানায় উঠে বসে মাথা দিয়ে তাঁকে ঠেলছে। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন। নামলেন খাট থেকে। এ কী! জল। ঘরের মধ্যে জল! গোড়ালি ডুবে গেল! বাইরে কড় কড় শব্দ হচ্ছে। জল ঢুকছে ঘরে, সর্বনাশ! বন্যা এসেছে! চীৎকার করে স্ত্রী-পুত্রদের তুললেন। তারপর কোন রকমে জল ঠেলতে ঠেলতে তাদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গেলেন। কুকুর দুটো! কুকুর দুটোই তাদের বাঁচালো। কিন্তু তারা তো সঙ্গে আসে নি। তারা যে ঘরের মধ্যে, নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে রয়ে গেল। অস্থির হলেন ভদ্রলোক। তাদের বাঁচাতেই হবে। এগিয়ে গেলেন। সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। সর্বনাশ! এখন কি আর ঘরে যাওয়া যায়। প্রবল স্রোতের মুখে তখন ঘর ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু কারুর নিষেধ শুনলেন না তিনি। যারা তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে। কুকুর দুটির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তিনি জল ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢোকেন। কী স্রোত! কী জলের তোড়। দাঁড়ানো যায় না। ঘরে ঢুকে দেখলেন। কুকুর দুটো একটা উঁচু জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে, বোধ করি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, জল ক্রমে তাদের গ্রাস করবার জন্যে উপরে উঠছে। ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে দুই কাঁধে দুই কুকুরকে নিয়ে কোন ক্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপর স্রোতের সঙ্গে প্রাণ পণ লড়াই করতে করতে ডাঙায় এসে পৌঁছুলেন। কুকুর দুটো প্রভুর কাঁধ থেকে মাটিতে নেমে সবাইকে শুঁকে বেড়াতে লাগল। যেন বলতে চাইল, তোমরা সব নিরাপদে আছো তো। এই দেখ, আমরাও বেঁচে এসেছি।

…কিন্তু বন্যার সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে—হিন্দু মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বন্যা সেবা-কার্যের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ বলিয়া—মনে হয়। যাঁহারা এই—মিলন সম্ভবপর মনে করেন না—, তাঁহাদিগকে আমি—জানাইতে চাই যে, বন্যাপীড়িতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান এবং যাঁহারা সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে কোন হিন্দুই, মুসলমান ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করে নাই। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপোষ সফল হইতে না পারে কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই।

এই বন্যার মধ্য দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র রকমের বেশভূষা, বিভিন্ন ধর্ম, এবং বিভিন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ যে একটী অখণ্ড দেশ তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপত্তি ঘটিলেই সমস্ত অঞ্চই গভীর আন্তরিকতা ও সমবেদনার সঙ্গে তাহাতে সাড়া দেয়।

ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কয়েকটি চিত্র

অদ্ভুত

সুকুমার রায়

আচ্ছা, নমিতাদি, কয়েক বছর ধরেই আপনার সঙ্গে পুরীতে রথের সময়ে বেড়াতে আসছি, কিন্তু প্রতিবারেই সমুদ্রের পারে ঘুরে ঘুরে একবার করে এই পুরোনো ভূতের বাড়িটার কাছে এসে ঘুরে যান। কই, রথ দেখতেও তো যান না আর আমি প্রতি বছর রথ দেখতে এলে, আপনি বলেন, ওই ভূতের বাড়িটা দেখো।

নমিতা হোটেলের দিকে দ্রুত হেঁটে আসে। বৃষ্টি আসছে। দূর সমুদ্রে বৃষ্টি নেমেছে, এক মিনিটেই যেন ছুটে আসবে। সারা দিনই আকাশে মেঘ করেছিল। নমিতা হোটেলে ঢুকেই ধীরাকে বললেন, চা-এর অর্ডার দিয়ে এসো।

ধীরা একটু পরে এসে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, নমিতাদি স্থির হয়ে বসে আছে খাটের ওপর। চোখ দুটো জানালা দিয়ে সুদূর সমুদ্রে স্থির হয়ে আছে যেন। বাইরে কালো অন্ধকার নেমে আসছে তীর্যক বৃষ্টির ধারা রাস্তার আলোতে তীরের মতোই দেখা যাচ্ছে। ধীরা নমিতার ধ্যান ভাঙাতে চাইল না। হোটেলের একটা লোক চা নিয়ে এল। ধীরা ধীরে ধীরে পট থেকে কাপে ঢেলে নিলে, বললে, দুধ-চিনিটা নেবে নিন নমিতাদি।

নমিতা ধীরাকে বললেন, ধীরা প্রতিবারেই আমি আশ্রম থেকে তোকে বেছে নিয়ে এখানে আসি, কারণ তুই আমার জন্যে ভাবিস, আমার যত্ন করিস। তোকে আমি বলব কেন আমি এখানে আসি। সহসা কখনো কাউকে বলিসনে যেন—অন্তত আমার আশ্রমের মেয়ে অথবা শিক্ষিকাদের কাছে নয়।

ধীরা চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়।

তোকে আমি বিশ্বাস করি। তুই আমাকে ছেড়ে যেতে চাস না যতো, কাছে কাছে থাকিস। তাই তোকে বলতে আমার আপত্তি নাই। ওটা সত্যি একটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু আমি যে কথা বলব সেটা ভূতের কথা না কি অদ্ভুতের, তাই ভাবি। আজও ভাবি, ভাবতেই আমি প্রতিবছরে এ সময়টাতে পুরীতে আসি।

ধীরা জানতো নমিতাদির অতীত জীবনের বহু-ঘটনা আছে যা আজকাল কেউ জানেনা। নমিতাদি সেকালে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ছিলেন, কিছুকাল জেলে ছিলেন—কি একটা মামলায় জড়িয়ে। কিন্তু তাও সামান্য সময়ের জন্যে। পরে, মেয়েদের শিক্ষার জন্যে আশ্রম গড়ে তোলেন নিজে। ধীরা দেশ বিভাগের সময়ে সহায় সম্বলহীনা, বিধবা হয়ে নমিতাদির আশ্রমে আসে। সেই থেকে নমিতাদির কাছেই শিক্ষা-দীক্ষা, নমিতাদির সেবাযত্ন ওর ধ্যান-জ্ঞান।

নমিতাদি বলেন, ধরণাটা ভেঙিয়ে যে। তোর কাছে বলব আমার সে দিনের কথা যার রেশ আছে

আমার সারা জীবন ভরে। অনুতাপ ঠেকবে, বিশ্বাস হয় না আমারও—অথচ আমার জীবনেই এ ঘটনা ঘটেছিল।

আমরা যে দলে ছিলাম তার একমাত্র নেশা ছিল ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়ানো। আমাকে যিনি দলের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর নাম সুধীন। আমার এক ভাই আমার কাছে রিভলভার রেখে পালিয়েছিল, সুধীনদা এসে সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যান। সুধীনদাই আমাকে ছোরাখেলা লাঠিখেলা শিখিয়ে ছিলেন।

উনিশশো একত্রিশ সালই হবে সে সময়টা। আমি তখন কলকাতায় হস্টেলে এসেছি, কলেজে পড়ি। পুলিশের উৎপাতে বাবা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর মূল কারণ ছিলেন আমার কাকাবাবু। কাকাবাবু পুলিশের বিখ্যাত লোক ছিলেন – ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। ঢাকার সন্ত্রাসী দলগুলো ওর লক্ষ্য থেকে নিস্তার পায়নি। প্রত্যেকের খবর ইনি জানতেন। প্রত্যেককে সাবধান করে দিতেন। একটি ডাকাতের দল ধরেছিলেন। অনেক ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। পোলিটিকেল মার্ডারের সন্ধান করতেন। এজন্যে ওর ওপরও দলের লোকের নজর ছিল। পরে আমার কাকাকে গুলী করে মারেন আমাদের দলের কোন ছেলে। আমি তখন কলকাতায়।

একদিন সকালে পত্রিকা খুলে দেখি ঢাকায় সন্ত্রাসীর গুলিতে ইংরেজ খায়েল হয়েছে। বুঝতে বাকী রইল না চারদিকে আগুন লাগবে। কিছুদিনের মধ্যেই দাদাদের হাতে লেখা একটি আদেশ এল আমার ওপর।

"সুধীনের সঙ্গে বিবাহিতা-বৌ সেজে কলকাতায় মাণিকতলা থেকে পুরীতে যেতে হবে। সুধীন বর সেজে যাবে, এবং পুরী থেকে পালাবে।"

ইতিমধ্যে কলকাতায়ও আগুন জ্বলে উঠল—রাইটার্স বিল্ডিং-এ গুলি। বুঝেছিলাম যে কোন কারণেই হোক এদেশে থাকলে সুধীনদার রক্ষে নেই।

আষাঢ় সন্ধ্যা। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে হোটেলের একটি ঘরে নমিতাদির স্মৃতি-চারণ শুরু হয়ে গেল। নমিতাদির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল মীরা, নমিতাদির দৃষ্টি বহুদূরে। নমিতাদি একটানা বলে যেতে লাগলেন:

সেদিন হস্টেলে ঢাকায় যাবার জন্য ছুটির দরখাস্ত দাখিল করে, ছোট চিমকুট হাতে নিয়ে মাণিকতলার ফ্ল্যাট-বাড়িটা খুঁজে বের করলাম। এক ভদ্রমহিলা বেরুলেন, আমার নাম বলতেই ভেতরে নিয়ে গেলেন। সুধীনদা তৈরি হয়েই ছিলেন। পাশের ঘরেই শাড়ি-গহনা ছিল, বললেন সেজে নাও। মাসী তোমাকে সাহায্য করবেন। ভদ্রমহিলা আমাকে সাজিয়ে দিলেন। হাসলেন। অত্যন্ত শুষ্ক হাসি, বললেন, বেশ হয়েছে, মানিয়েছে। সিঁদুরও দিয়ে দিলেন, মাথায়। সুধীনদা সিল্কের জামা পরে নিলেন। মাসীমা সজল চোখে বিদায় দিলেন, জানতেন এটা কি যাত্রা! হাওড়ায় এলাম দুজনা। সেকালে হাওড়া থেকে টিকটিকির নজর এড়িয়ে পার হওয়া সোজা ব্যাপার ছিল না। মেদিনীপুর পর্যন্ত পেরিয়ে গেলে স্বস্তি। পোলিটিকেল ডাকাতি আর মার্ডারের জন্যে সুধীনদার ছবি হয়ত তাদের পকেটে পকেটে ঘুরছে।

পুরীতে পৌঁছে একদম মণিকনিকাদাহীর কাছে এক পাণ্ডার বাড়িতে। সেখান থেকে পার্টি দাদাদের পাঠানো একটি প্যাকেট করা বাক্স পাওয়া গেল। তাতে ছিল টাকা—পাণ্ডা ভেবেছিল ওটা বই। পাণ্ডাকে আগেই কয়েকটি টাকা দেওয়া হয়েছিল এজন্যে। আর আমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে দেওয়া গেল, স্থানীয় স্যাকরাকে দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে সোনার বাট তৈরি করে দেবার জন্যে। যেন আমাদের উদ্দেশ্য

নতুন পছন্দসই পয়না তৈরি করা। আমাদের আস্তানা হল শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরের কাছে এক মহিলার বাড়িতে—তাও শুধু এক বেলার জন্যে। স্বর্গদ্বার থেকে আরম্ভ করে সমস্তটা সমুদ্রের পাড়ে একবার ঘুরে এলাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা হল। কি করে সুধীনদা ভূতের বাড়িটার কথা জেনেছিলেন জানিনা। শুনেছিলেন কেউ ওখানে থাকে না, আসে না। সুধীনদা বললেন, এইতো ভাল। নির্জনে ভূতপ্রেতের সঙ্গে রাত্রিবাস করা যাবে।—কি বলো? আবৃত্তি করতে লাগলেন—যে বিবাহে চলিলা বিলোচন।

রাত্রি সাতটা বেজে গেল—সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে। সেকালে এত হোটেল ছিলনা। বং বেরং এ সেজে ছেলেমেয়েরাও ঘুরত না। আমরা এক নির্জন যায়গায় বসে দিন কাটিয়ে দিলাম। কয়েকটি মোমবাতি ও একটি হোলাতে রাত্রির খাবারের জন্য একটি প্রসাদের হাঁড়ি যোগাড় করে দুজনা ঢুকে পড়লাম এই পুরোনো ভূতের বাড়িতে। পোড়ো বাড়িটাতে কয়েক বছরের ভেতরে কোন লোক ঢুকেছে বলে মনে হয়না। দেয়ালের গায়ে সোনা পোকা, দুচারটা চামচিকে উড়ে গেল। কার্নিশের ওপরে পাখির বাসার ঝাপটা। একটা ঘরের দরজা যেন কেউ খুলেই রেখেছে। কী বড়ো বড়ো দরজা! ঘরের মাঝখানটায় মেহগনির বড়ো গোল টেবিল, চারদিকে কয়েকটি পুরোনো ধরনের চেয়ার। ওদিকে খাটটি পুরোনো পরিচ্ছন্ন বর্তমান—কেউ যেন বেশ পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাশেই একটি বাথরুম, মোমবাতিটা হাতে করে বাথরুমের দরজা খোলা মাত্রই ভুস করে আওয়াজের সঙ্গে যেন একটা হাওয়া বেরিয়ে গেল। ভীষণ একটা দুর্গন্ধ। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলেন সুধীনদা,—দরকার নেই বাথরুমের। গন্ধটা সরে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সুধীনদা হেসে বললেন, আমাদের শুভরাত্রির জন্যে সবই কমপ্লিট কি বলো?

কমপ্লিট! 'হা-হা-হা-হা' একটা হাসি যেন দূর পর্যন্ত ভেসে গেল। আমি তখন প্রায় অচেতন হয়ে নাক মুখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি। সুধীনদাকে জিজ্ঞেস করি "কমপ্লিট" বলে এত জোরে হাসলে কে?

আমি ছাড়া কে হাসবে?

কিন্তু ওটা সুধীনদার গলা নয়, প্রতিধ্বনিও নয়, বুক টিপ্‌টিপ করে উঠেছিল। সামলে নিলাম। আমি কেন ভয় পাব? আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে কেমন যেন টায়ার্ড মনে হচ্ছে।

একটু বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করি, বাথরুমে যাওয়া যাবে না বুঝি?

না ওটা ভাল নয়।

আমার মনে হচ্ছিল বারান্দা দিয়ে লম্বা কালো মতন একটা মূর্তি হেঁটে গেল, কিন্তু, ওঁকে বলব কি করে? স্বীকার করবে না, বললাম, একটা লোকের মতো দেখতে পেলাম দরজার বাইরে। সাবধান থাকা ভাল সুধীন দা। আজতো রয় কনের নির্জনবাস, চারদিক দেখে নেওয়া ভাল।—বলেই হেসেছিলাম।

সুধীনদাও একটু হাসলেন। মোমবাতির আলোটা মাঝে মাঝেই নিভে যেতে চায়। একটু সরিয়ে রাখা গেল। একটা বড় দেওয়াল আলমারী দরজাটা খানিকটা ভাঙাচোরা। যেন ভেতর থেকে বন্ধ। সামনেই আমাদের জিনিষপত্র কয়েকটি একটি র‍্যাকের ওপর রাখা হয়েছে। কি যেন মনে হল, সুধীনদা খাবারের থলেটা ছাড়া সবই টেবিলের ওপর সামনেই রাখলেন। পকেট থেকে ছোরাটা একবার বের করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার কাছে রাখবে?

আমি জানাই, আমার কাছে বুকের ভেতরে একটা লুকোনো আছে।

বেশ, কিন্তু নমিতা, তুমি কাল ঘুমোওনি, বরং খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নাও। তুমি কিন্তু খাটে শুয়ে পড়তে পারো আমি বসে ঘুমুব। মশা নেই।

ওই খাটে শুতে ভরসা হলনা, বললাম, আমিও বসে কাটাতে পারব। অনেক রাত তুমি ঘুমোওনি ঘুমিয়ে নাও।

সুধীনদা একটু নীরব থেকে ধীরে ধীরে জানলেন, ঘুম কি আর হবে নমিতা? কি হবে ঘুমিয়ে! যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে আর যতদিনে ইংরেজ না তাড়াতে পারব ততদিন কি ঘুম হবে?

তা বলে, এখনইতো কিছু করতে পারছ না।

পারবনা হয়ত। কিন্তু ওরা কি ভয় পায়নি? ঢাকায়—কলকাতায়—

আমি বললাম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু হবে কি?

সুধীনদা গম্ভীর হয়ে বলেন, এপথে কত ছেলে প্রাণ দিয়ে গেছে, একথা জানো। তাদের মতোই মরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি—মরব। তবু আগুন জ্বালিয়ে যাব।

কথা বলছিলাম সুধীনদার সঙ্গে কিন্তু আশেপাশে কি রকমের অদ্ভুত আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

কোথায় আওয়াজ? সুধীনদা শুনেও শোনেন না, বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, আমার মাথায় বক্সা ঝুলছে, তেমনি বাংলাদেশের অনেক ছেলেদেরই মাথায় ঝুলছে। অনেকে ধরা পড়েছে। তাই মনটা ভারি হয়ে আছে। কম পরিশ্রম করিনি। ট্রেন ডাকাতির পর থেকে—যাক সে সব কথা নমিতা।

আমি চুপ করে চকল দীপশিখার দিকে চেয়েছিলাম। বাইরে দমকের হাওয়া এসে ঘরজা জানালা থইথই করে নাড়িয়ে দিচ্ছে, একটা লোকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছি--একটা কালো ছায়ামূর্ত্তি না কি?

সুধীনদার মনের মধ্যে ওসব ভাবনার লেশমাত্রও নেই। উনি বলছেন, নমিতা কয়েকদিনের মধ্যে দেশের ভাগ্যের একটা ছক তৈরি হয়ে গেল—আগুন জ্বলেছে। কিন্তু আমি কোথাকার মানুষ কোথায় ছুটে চলেছি? দেশে থেকে মৃত্যুতে ঝাঁপ দিতে পারতুম। কিন্তু প্রয়োজন তো সে রকম নয়। আর আদেশও হল অন্য রকমের। কয়েকদিনের মধ্যে বিক্রমপুরের বধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে নৌকো করে ভাগ্যকুল থেকে ষ্টীমারে চেপেছি, তারপর কলকাতায়। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএর ঘটনার পর মনে হয়েছিল আমিও তো মরতে পারতুম। পালাব কেন?

বললাম,-সুধীনদা মরে যাওয়াটা তো বড়ো কথা নয়।

"হুম্!"—একটা শব্দ ভেসে এল বারান্দা থেকে কেউ কথাগুলো শুনছে নাকি? পাশের ঘরে পদশব্দ মনে হল দেওয়ালের ওদিকেই কোন খটখটে আওয়াজ। এবারে বলে উঠলাম, কে কে?

দাঁড়াও। সুধীনদা লাফিয়ে উঠে ছুটে বারান্দায় বেরুলেন, এক মুহূর্তে ফিরে এলেন। দূরে রাস্তায় কোনো লোক হেঁটে যাচ্ছে। এদিকে দালানের কোন ফাটল দিয়ে হাওয়া ঢুকছে। আর "হুম্" শব্দটা পাখিরও হতে পারে। কোনো কাল প্যাচা ও রকম শব্দ করে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সুধীনদা আবার বসে পড়লেন। আমার একটু রাগ হল—কিছুতেই স্বীকার করবেন না কোন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। কেউ হাঁটছে। কোথাও থেকে শব্দ আসছে। দরজা বন্ধ করা হবে না, কারণ জানালাগুলো খোলা যায় না। একটা ভারি লোক যেন আবার কোথাও

হেঁটে যাচ্ছে। পাশের ঘরে অথবা দেওয়ালে শব্দ মাঝে মাঝে বারান্দার কার্নিশের ওপর পাখির পাখার ঝাপটা। সুধীনদা আমার দিকে চেয়ে হাসেন, বুঝিয়ে যেন আমি ভয় পেয়েছি, বলেন, রাস্তায় একটা বড়ো ষাঁড় দেখেছিলাম সেটাই বোধ হয় ঘুমুবার জন্যে ঢুকেছে। পোড়ো বাড়ি। কত জন্তু-জানোয়ার ঢুকে আছে কে জানে?

আমারও একটু রাগ হল। ভূত আছে কি নেই জানিনে, কিন্তু ভয় আছে একথা সত্যি। যদিও সুধীনদার মনে তার চিহ্নও নেই। কিন্তু আমিও বুঝতে দিতে চাইনে, ছমছমে ভাবটাকে, শুধু সাবধান থাকা ভাল। মেয়েদের মনে সহজে সন্দেহ আর ভয় আসে, বই কি?

এবারে স্পষ্টই মনে হয়েছিল একটা দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি যেন ঘরটার ওদিকে সরে গেল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের হাওয়া খট খট শব্দে ঘরটা-জানালা নাড়িয়ে রেখে যায়। সুধীনদা বললেন, খেতে হবে তো—দাঁড়াও খাবারটা বের করি। জলের বোতলও সঙ্গে আছে—কুছ পরোয়া নেই।

আমার মোটেও খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কেমন যেন মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরে যেতে চায়। সুধীনদা হঠাৎ করে আর একবার বারান্দায় উঁকি মেরে দেখে এলেন। এসেই আমার থুৎনিতে হাত ঠেকিয়ে বললেন, কেমন যেন ঘাবড়ে গেছ। তুমি আমার নতুন বৌ দেখে এসেছ ঘাবড়াচ্ছ কেন? দুনিয়ার সব জন্তু-জানোয়ার ভূত-প্রেত যেখানে খুশি থাকতে দাও। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। বাধা দেবার কেউ নেই। জানো, বহুদিন আগে একবার নরেনদা বললেন, রাত তিনটেতে আমার সঙ্গে শ্মশানে দেখা করতে আসবি। ওখানে শিমুল গাছের তলায় দাঁড়াবি, আমার আসতে যদি দেরি হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তখনও শ্মশানের ওদিকটা ইলেক্ট্রিক লাইট যায় নি। সেই মহাশ্মশানে যেতে লোকে ভয়ে কাঁপত। ওই শ্মশান নিয়ে অনেক কথা শোনা যেত। কিন্তু আমার ভয়টা সাপ আর পাগলা শেয়াল নিয়ে। রাত তিনটেতে যখন পৌঁছলাম তখন ঘোর অন্ধকার। চারদিকে জোনাকি জ্বলছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জানোয়ারের চোখ। শ্মশানে একটা মড়া জ্বালানো শেষ হয়ে গেছে, লোকজন ফিরে গেছে। একটু দূরে ঘরের ভেতরে ডোম থাকে। ওর কাছে কাগজ জমা দিলে কাঠ খড় পাওয়া যায়। জায়গাটা কিন্তু কাছাকাছি নয়। সেই রাত শেষে মশার জ্বালায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হাঁটতে সুরু করলাম। আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা।

ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছেন, আর আমি একমনে শুনছি। মাঝে মাঝেই আলোটা নিবু নিবু হয়ে আসে। আমি ঘরের আশেপাশে অন্য কোনও কিছুর উপস্থিতি বুঝতে পারছিলাম। সুধীনদা ভূত বিশ্বাস করেন না। অতএব প্রশ্নটা আসে না। বলে চললেন, তারপর দূর থেকে দেখতে পেলাম একটা লোক এগিয়ে আসছে। নরেনদা নাকি? না তো! লোকটা শিমুল গাছের পেছনে মিলিয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম—লোকটা কোথায় গেল? ভোজালিটা বাগিয়ে রেখেছিলাম। কে জানে ডিকুটিকিও (ডিটেক্টিভ) হতে পারে। কিন্তু হদিস করতে পারলুম না। শিমুল গাছের পেছনে মিলিয়ে গেল বুঝি। কিছুক্ষণ পর দেখি সে রকমেরই একটা লোক শ্মশানের আধপোড়া চুল্লীটার পাশে। যদি ওটা লোকই হয়ে থাকে শিমুল গাছের পেছন দিয়ে নিচু পথে শ্মশানে গেল কি করে?

আমি জিজ্ঞেস করি, বাবাঃ, কিছুই পেলে না?

নাঃ। নরেনদা এলেন ঠিক সময়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো দুজন। রাস্তার ধারে একটু দূরে নতুন কালভার্ট তৈরি হয়েছে। সেখানে সকলে মিলে বসে গেলাম। সেই শেষ রাত্রিতে একটা রেল

ভাকাতির প্ল্যান হল—টাকা দরকার। বাড়িতে যে লোকটিকে দেখেছিলাম নরেনদাকে তার কথা কিছু বলিনি। যদি ভূত হয়ে থাকে তবে সাক্ষাৎ করতে হবে।

আমি নীরবে সুধীনদার উক্তি শুনতে থাকি। মাঝে মাঝে দমকের হাওয়া ঘরের ভেতরে হানা দেয়—মোমবাতিটা নিভতে নিভতে আবার সচেতন হয়ে ওঠে। টুক্ টুক্, খপ্ খপ্ নানারকমের শব্দ পাচ্ছি। সুধীনদা ইচ্ছে করেই দরজার দিকে পেছন ফিরে বসেছেন। একটা কালো মূর্তি ছায়ার মত মাঝে মাঝেই আমার চোখে আসে, আমি সুধীনদার দিকে তাকাই। পাশের ঘরটাতে নৃত্য হচ্ছে নাকি। কে জানে? সুধীনদা যেন শুনেও শুনছেন না। গল্প বলছেন।

উনি বলে চললেন, আমি পরদিন আবার সেই শ্মশানে ভূত দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনই নরেনদা বললেন শ্মশানে আর যেওনা। যে ছায়া দেখেছ ওটা শ্মশান পাগলা, আমার লোক। খবর পেয়েছি ওখানে টিকটিকিরা ঘোরাফেরা করছে।

পাশের ঘরে অদ্ভুত একটা শব্দ হতে লাগল। বাইরের দিকেও দরজাটা খুলে যেতেই আলো নিবু নিবু। আমি হাতে বাতাসটা আড়াল করে ধরেছিলাম। সুধীনদা একবার দ্রুত বাইরে গেলেন। আমি যেন দেখতে পেলাম আলমারীর ওদিকে দেওয়ালের মত থেকে একটা বড় কালো হাত খাবারটা ধরতে আসছে বুঝি। আমার চোখেরও ভুল হতে পারে। কিন্তু অজান্তে আমার ভেতর থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল। "এই!"

সুধীনদা ফিরে এসে বলল, কি?

আমি ভাবছিলাম, ভয় করব না—দুবেলা মরার আগে মরব না। তাছাড়া সুধীনদার কাছেই বা দুর্বলতা কেন দেখাব?

বললাম, না কিছু নয়। ওদিকে কি দেখলে?

কিছু নয়। গিয়েছিলাম কুকুরে তাড়াতে। বাড়িটাতে বানরও আছে বোধ হয়। মাঝে মাঝেই লড়াচড়া করছে। প্যাচা আছে, ওরা কথা বলে উঠতে চায়, "তোরা আবার কে এসেছিস"?

আমি হেসে বলি, থাক আর কিছু যে নেই।

আর কি থাকবে বলো?

আমি বললাম, সে কথা আর উচ্চারণ নাই করলাম।

থাকলেই বা কি? যা জানিনা—যাকে দেখিনি, বুঝিনা তাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তবে, ভূত একদিনে হতেই হবে সরকারী খাঁড়া যখন ঝুলছে। ফাঁসীতে যেতে হবে তো!

না তোমাকে ফাঁসিতে যেতে হবে না। আচ্ছা এখান থেকে কি সমুদ্র দেখিয়ে যেতে পারো না?

এ সমুদ্র তো জাহাজ চলবার নয়—শুধু চান করবার আর বেড়াবার। পোর্ট কোথায়? ডকপথ কোথায়? বহু দূরের কথা। চলো খেয়ে নিই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ঢুকে আলোটা নিবিয়ে দিল। আমি এবারে সুধীনদাকে ধরেই ফেললাম একটা কালো লম্বা হাত দেখতে পাচ্ছিলাম। সুধীনদা খেয়ালকরেন নি, বলেন, দাঁড়াও দিওনতাবটা হাতে আছে।

গুলি ছুঁড়লে লোকে টের পাবে।

ভূতের বাড়িতে কিসের আওয়াজ হচ্ছে কে বুঝবে? আমি পাশের ঘরটা খুলে দেখব কি আওয়াজ হচ্ছে ওঘরে?

আমি বললাম, ওটা ফেলার দরকার কি? অনেকটা জড়িয়ে যাবে যে। কোথা থেকে একটা লম্বা হাত আমাদের খাবার উঠিয়ে নিলে, তুমি দেখলে না?

সুধীনদা বলেন, ধুর! তা কি হয়? কি যে ভয় পাচ্ছ তুমি! আশ্চর্য।

ছেড়ে দিলাম সুধীনদাকে। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু আমি কেন ভয় পাব? আমার কাছে একটি ছোরা আছে। দেয়াশলাই ধরিয়ে আবার আলোটা জ্বাললেন সুধীনদা। সত্যি তো খাবারটা উধাও হয়েছে। সামনেই একটা ভাঙ বন্ধ দরজা ছাড়া আর কিছু নেই তাতে বড়ো টেবিলটা ঠেকানো। কারো সাধ্যি নেই অন্যদিক থেকে কেউ কিছু করতে পারে। মেঝের ওপর খাবারের হাঁড়িটা নামিয়ে কে যেন এক খাবলা খেয়ে গেছে। ও থেকে আর খাওয়া চলবে না। খাবার ফেলে দিতেই হবে। কিন্তু থাক খাবারটা ওখানে, দেখব কে খায়, সুধীনদা বললেন, বেশ মজা তো, ভূত যদি ছায়া হয়ে থাকে তবে খেল কি করে? কাজেই এটা ভূতের কাজ নয়।

আমি বললাম, বড়ো খারাপ লাগছে বাড়িটা।

আমার মজা লাগছে। আরো ভাল লাগছে তুমি থাকায়। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছ—গায়ের রক্ত ফোটা দিয়ে উঠছে, সত্যি মেয়েদের সঙ্গে আছি নির্জনে আজ বুঝতে পারছি।

নির্জন কোথায় সুধীনদা?

তুমি বলছ ওসব অশরীরীদের কথা, ওরা থাক। কিন্তু সারাজীবনের ব্রহ্মচর্য ব্রতটাও একদিন ভাঙতে চাও বলে মনে হয়।

আমি তো তোমার বিয়ের কনে দেখে পুরীতে এসেছি।

সুধীনদা বললেন, সেইটেইত খারাপ করেছ এখন বিধবা সেজে ফিরতে হবে। কারণ জীবনে যে ব্রত নিয়েছি তা থেকে ত আর ফিরতে পারব না। বাড়িতে খবর পাঠাবে ওকে ভূতে খেয়েছে। আমি যাব মাদ্রাজ, সেখান থেকে জাহাজে চাপতে পারব না হয়ত—হয়ত বরে যেতে হবে।

বোকার মতো জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কবে দেশে ফিরবে?

কি জানি! যতদিন ইংরেজ এদেশে থাকবে ততদিন ত নয়।

বারান্দায় আবার শব্দ পাওয়া গেল, কে যেন সত্যি খটখট করে হেঁটে যাচ্ছে বুটের আওয়াজ মনে হচ্ছে যেন। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সুধীনদা বললেন, টিকটিকিরা টের পেল না কি?

আমি ওঁকে ঘেঁসেই দাঁড়িয়েছিলাম, কলকাতা থেকে নতুন বৌ সেজে এসেছি, সেটা যেন আমার স্বাভাবিক নির্ভরতার দাবী, ওই সুরক্ষ লোকটাকেই আশ্রয় করে থাকতে চাই বিপদের মুখে। আওয়াজটা ঘুরে মিলিয়ে গেল, সুধীনদা বলেন, ওঃ বুঝেছি পুলিশ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখানে। ভয় করছে তোমার?

আমি বললাম, না।

সুধীনদা হেসে বললেন, ভয় তুমি করছ না কিন্তু ভয়ে তোমাকে পেয়েছে, বুঝেছি। তা হোক। একদিন ছিল তোমাকে লাঠি ছোরা খেলা শেখার পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু, আজ বুঝেছি ভয় থাকলে মেয়েদের ভাল লাগে বোধহয়।

কেন? কেন?

না হলে আমাকে এমন জড়িয়ে থাকতে না।

তুমি তো বলতে চাও তুমি সংসারত্যাগী, সুধীনদা।

উপায় কি নমিতা? ওই একটিই তো পথ আমার।

সুধীনদা ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, সেই কথা বলেছিলাম।—পুরোনো কথা। আমার একটি ভাইকে পুলিশ অত্যাচার করে পিটিয়ে মেরেছে। একটি সি-আই-ডি ইন্সপেক্টার আর একটি সার্জেন্টকে আমি যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। ডাকাতি করে বহু টাকা দিয়েছি পার্টির হাতে—এখন বাকি জীবনের জন্যে কোথায় পা বাড়াচ্ছি কিছু ঠিক আছে? আজকের এই অশান্ত মনের কোন মূল্য কেউ দেবে কি না জানি না, কিন্তু ইংরেজ এদেশ থেকে ফিরে যাবার জন্যে আমরা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছি। এরপর মরেও এখানকার ভূতগুলোর মতো ঘুরে ফিরে আমরা অশান্ত হয়ে থাকব যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়।

ও কী? আমার চেয়ারটা কে টানছে?

সুধীনদা বললেন, দাঁড়াও আলোটা জেলে নিচ্ছি। এখানে দেওয়ালেরও হাত আছে না কি? একটা হাত যেন দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হল।

আলো জেলে সুধীনদা একবার আশেপাশে তাকালেন। প্রসাদের হাঁড়িটা খালি হয়ে গেছে। বেড়ালের মতো বড়ো দুটো ছুঁচো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ছুঁচো শালারা কি জ্বালাতনই না করছে নমিতা।

কিন্তু একটা কালো হাতও যে জ্বালাচ্ছে সুধীনদা।

কোথায়? আমার বিশ্বাস হয় না নমিতা। মরণের জন্যে যারা সব সময়ে তৈরি, তারা কিছু স্বীকার করে? একমাত্র ফাঁসীর দড়িকে স্বীকার করি?

দুজনা নীরব হয়েই ছিলাম নিবু নিবু আলোর সামনে। সুধীনদা একটু অন্যমনস্ক, বোধহয় কিছু লক্ষ্য করছিলেন। তাকালেন, রিভালভারটা তোমার কাছে রেখ। একটা মোড়ক আমাকে দিলেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নকুলের মত বারান্দায় ছুটে কারো ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন একটা কালো ক্ষীণ দেহী দীর্ঘ লোক শীর্ণ চেহারা। পেটে ছোরা বসিয়ে দিলেন। আর্তনাদ করে বারান্দায় পড়ে গেল লোকটা। অবশ্য আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু পরে এসে বললেন, "ব্যাটা ভূতের ভেক ধরে লোক ভাগায়। আচ্ছা ব্যবস্থা।" অস্ফুট আর্তনাদ তখনও শোনা যাচ্ছিল। ঘরে এসে দাঁড়াতেই সামনের আলমারীর দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, বীভৎস চেহারার একটা লোক নমিতাকে ধরতে এগিয়ে এল। হাতে ত্রিশূল ধরণের একটি অস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুধীনদা। বললেন, দরজায় খেয়াল রেখ, আর কেউ না আসে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে লোকটা মেঝের ওপর হাতপা ছুঁড়ছিল। কিভাবে ওকে ঘায়েল করা হল আমি দেখতে পাইনি কিছুক্ষণ ভীষণ হাপাহাপি চলেছিল। আমাকে দরজার দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল। তবে সুধীনদা ওকে মেঝের ফেলে দিয়ে কী কায়দায় শেষ করে দিলেন। পরে বলেছিলেন, যে ফাঁসীতে ইংরেজ আমাকে ঝোলাবে সে ফাঁসীর মতো করে গলা টিপে এ ভূতকে ঘায়েল করে দেখলাম কিরূপ অবস্থা হয়।

স্বীকার করব আমার শরীরটা কাঁপছিল। এরপর আমি বলছিলাম, দুটো লোক এখানে থেকে ভয় দেখিয়ে মানুষ মারে—আশ্চর্য!

সাবধান! চেয়ারটা নিয়ে এসো দরজার সামনে বসে থাকব দুজনা। শুধু দুটো লোক না আরো কেউ, কে জানে? এখান থেকে বেরুনো বিপজ্জনক। দাঁড়াও ওই লাশটাকে এনে এই ঘরের মধ্যে ফেলব তারপর।

অত্যন্ত সাবধানে সুধীনদা বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন, চট করে ফিরে এসে দরজা খোলা রেখে

সামনে বসে পড়লেন, বললেন, আলোটা নেভানো যাবে। লাসটা দেখায় না। পেটে হাত চেপে হয়ত তাড়াতাড়ি কোথাও দিয়ে পড়েছে, অথবা অন্য কোন লোক আছে সরিয়েছে। একটা দল আছে এও হতে পারে। ভয় দেখানো ওদের পেশা। অথবা দুটো লোকই দলে ছিল। ওদিকে চেয়ে দেওয়ালের আলমারীটা দেখছিলাম। তক্তাগুলো খুলে মানুষ ঢোকাবার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পেছন দিকের দেওয়াল ভাঙা। একটা বাঁশের ডগায় চমৎকার কৃত্রিম হাত তৈরি করেছে, এটা হঠাৎ কখনো আলগোছে ঠেলে বের করে দেয়, আবার ভেতরে নিয়ে যায়। সুধীনদা বললেন, ভাবোনা, বাক্সটার ভেতরে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে, নিশ্চয় কেউ ভয় পেয়ে মরেছিল বহুদিন আগে তারপর সেখানেই টেনে রেখে দিয়েছে এদের ব্যবসাটা মন্দ নয় কিন্তু যদি একটা ডাকাতের দল হয়ে থাকে? না, তা নয় নমিতা এখন আর কেউ আসতে সাহস পাবে না—তাহলে এখানকার ভূতুড়ে কাণ্ডটা প্রকাশ হয়ে যাবে।

এরপর ঘরজার সামনে বসে সেই অন্ধকারে সামনে নিয়ে আমরা দুজনে নীরব হয়েছিলাম। এক কোণে দেওয়ালের আড়ালে মেঝেতে মোমবাতিটা জ্বলছিল। আর দুটো মোমবাতি হাতে আছে, বেশিক্ষণ থাকবে না। দূরে সর্দারের বাড়ির ঢোল বেজে গেল—রাত্রি একটা। সমুদ্রের চেউয়ের ক্ষীণ আওয়াজও যেন বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে। আশ্চর্য নীরবতা। মৃত্যুর মত নীরবতা। কিছুক্ষণ পর সুধীনদা নীরবতা ভাঙলেন, কি ভাবছ নমিতা? খারাপ লাগছে। হয়ত এখন ভয় হচ্ছে না। কিন্তু মুখস্থ দেখো।

না। ভাবছিলাম, আমাদের জীবনের পুরোনো কথা সুধীনদা। আমার মাসতুতো ভাই যেদিন এসে বলেছিলেন, রিভলভারটা বুকের ভেতরে রেখে দে। সুধীন এসে খোঁজ করবে ওকে দিয়ে দিস্। সুধীনদা তখন তুমি আমাকে পড়াবার জন্যে মাষ্টার হয়ে এসেছিলেন। তুমি আমাকে পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলে লাঠিখেলা শেখার ব্যবস্থা করেছিলে। তারপর কত ইতিহাস। কাকাবাবু কত সাবধান করতেন। তবুতো আমি মেয়েদের দলের সঙ্গে নানান সেবার কাজ করে বেড়াতাম। মৃদু সম্মিলনীতে ছোরাখেলা দেখিয়েছিলাম। বাবা আমাকে কাকার প্রয়োচনায় কলকাতা পাঠালেন।

সুধীনদা বললেন, তুমি হয়ত ভাবছ তোমার সেই কাকাকে আমিই গুলী করে মেরেছি। হ্যাঁ, মেরেছি। ভাবছো—লোকটা কি খুনী! অদ্ভুত না?

আমি বললাম, কই, আমি তো সে কথা ভাবিনি, কখনো জিজ্ঞেস করিনি, কোনদিন জানতেও চেষ্টা করিনি সে প্রসঙ্গ। কারণ, এমন একটা হতে পারে জানতুম।

তা হলে কি ভাবছ?.....

চা-এর কাপ নিয়ে হোটেলের ঘরটিতে বসে এতক্ষণ একটানা কথা বলে শ্রোতার দিকে চেয়ে বললেন আমি কি বললাম জানো ধীরা?

ধীরা এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিল কাহিনী বলল, কি বললেন, নমিতা দি?

বললাম, আমি ভাবছি, কাল বিয়ের কনে হয়ে তোমার বৌ সেজে এসেছি। সেটা জীবনে কতবড় সত্য জানিনে জানতেও চাই নে, কারণ তুমি তাকে সত্য বলবে না হয়ত সুধীনদা। কিন্তু আজ আমাদের কাল-রাত্রি একথা একেবারে সত্যি। তা হলেও তোমার জন্যে এপথে পা বাড়িয়েছি পার্টির মেয়েই বলো আর বিয়ের কনেই বলো—আমি তোমার মঙ্গল চাই। হোকনা কাল-রাত্রি।

সুধীনদা হাসলেন। হাসি প্রতিধ্বনিত হল, বললেন, বেশ বলেছ নমিতা, বেশ বলেছ। কাল-রাত্রিই আমার চির সত্য রাত্রি। আমাদের কখনও ভয় হবে না।

সুধীনদা আমার হাতটাকে বুকের ওপর টেনে নেন, বলে ওঠেন এ বুকটা শুধু আগুনে তৈরি। একে মনে রেখো বীভৎসতার মূর্তিরূপে। এ আলায় কে জলবে বলো?

আমি বলছিলাম, মরতেতো আমারও ভয় নেই। জলব আমি।

সুধীনদা বললেন, সে ডাক তোমার আসেনি। তুমি হয়ত ভাবো অনর্থক হয়ে লাভ কি?

আমার মনের কথা কি করে বোঝো সুধীনদা? অন্যের মনের মধ্যে যাবার সময় কোথায়? তোমার বেলায় তুমি চলেছ কোথায়, তুমিই জানো। যা খুশি করতে পারো তুমি কিন্তু, তোমাকে হারাতে ইচ্ছে হয় না আমার।

সুধীনদা বললেন, কারণ তোমাকেও বেঁচে থাকতে হয়—কালরাত্রিতে তোমারো বৈধব্যযোগ নেই। আমি অগ্নি যুগের লোক শরীর মন আগুনে তৈরি—ছায়া বিশ্বাস করি না। তাই কায়াকে ধ্বংস করে এখানে বসেছি—রাত্রি যাপনের জন্যে তোমার সঙ্গে। দাঁড়াও।

উঠে গিয়ে একবার দেখে এলেন লোকটা মরেছে কি না না ঠেক ধরে পড়ে আছে। আবার নীরব হয়ে দুজন বসে রইলাম কিছুক্ষণ। রাত্রি তিনটেতে সুধীনদা বললেন। এবারে চলো ভূতের বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে যাই। ওখানে মুসিদারা রাত্রি থেকে শঙ্খ আর কড়ি কুড়োয়। আমরাও তাই করে রাত্রি পার করে দেব। খুব সাবধান! আগে আগে চলো আমি পেছনে। সাবধানে ভূতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আজ থেকে প্রায় চাল্লিশ সাতাশ বছর আগে।

নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। সমুদ্র চেউয়ের অবিশ্রান্ত গর্জন আর বাইরের আষাঢ়ে বর্ষণ তখনো চলেছে। ধীরা এ কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।—এই নমিতাদির জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল? এই নমিতাদিই অমন সন্ন্যাসবাদী ছিলেন?

কিন্তু নমিতাদি, এরপর আপনার সুধীনদার কি হল? তিনি কোথায়? জিজ্ঞেস করে ধীরা।

তাইত কোথায় যে সুধীনদা?

কিন্তু যেরে ঘরে আপনি কিভাবে বিদায় দিলেন নমিতাদি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তখন আমি কি মেয়ে ছিলাম? হ্যাঁ ছিলাম। সুধীনদা সেই সকালে স্বর্গদ্বারে আবার বিধবার হোটেলে এসে উঠে আমাকে রেখে পাণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিন সুধীনদার জন্যে অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরেও একসঙ্গে খাবার জন্যে অপেক্ষা করে করে সামান্য কিছু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিকেলে পাণ্ডা এসে আমাকে একটি ছোট পত্র দিয়েছিল "নমিতা, পাণ্ডাকে দিয়ে গহনা গলানো সোনার বাট সংগ্রহ করে নিয়েছি। বিদায় নিচ্ছি, কারণ, আমি বৃদ্ধ ও চৈতন্য-দেবের দেশের লোক তোমার কাছ থেকে আমার এভাবে বিদায় নেওয়াই ভালো। তোমার সামনে রেখে বলে করে বিদায় নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। কাল-রাত্রিই আমাদের শেষ। ইতি সুধীনদা।"

আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরা একবার জিজ্ঞেস করলে এরপর আর কখনো কি খোঁজ পেয়েছেন?

বাইরের খবরটা একবার পেয়েছিলাম। নেতাজীর আই এন এর দলের সঙ্গে নাকি মণিপুর পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপর আর জানা যায় নি।

সেই আষাঢ়ে রাত্রিতে পুরীর এই হোটেলের ঠাকুরটা এসে রাত্রির খাবার তৈরির কথা জানিয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে ধীরা বলে উঠল, এ সময়ে—অদ্ভুত!

দূর দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক নমিতা দেবী ধীরাকে বললেন, কিন্তু ছেলেরের খবরটা না বলে পারছি না তোর কাছে আজও আমার মনের মধ্যে ভূতের চেয়ে এই অদ্ভুত আরো স্পষ্ট।

আপদ-বিদায়

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শিবদাসের পাওনা মানুষটি বড়ো মজার। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, তাদের জন্যে তাঁকে নিত্য নোতুন ব্যাসাতে পড়তে হয়; কিন্তু কিছুতেই ঘাবড়ান না তিনি। একটা না একটা উপায়ে সর্বদা বিপদের বেড়াজাল কাটিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন। এবারে তাঁর মেজমেয়ের আপদ-বিদায়ের গল্পটা তাঁর নিজের জবানিতেই শুনুন তা'হলে আপনারা।]

আমার মেয়েদের মধ্যে ইভারই দেখছি বিষয় বুদ্ধিটা বেশী। বিয়ের ব্যাপারেই তা বোঝা গেছে। আমি বাপু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে খালাস, তারপর যে যা করে করুক সে। ওদের কেউ কেউ নিজের পছন্দমতো বর বা কনে বেছে নিয়ে সংসারী হয়েছে কেউ বা বিয়েই করে নি। ইভার কাছে যে ছেলেগুলো ঘুরঘুর ক'রত তার মধ্যে শিবদাসকেই সে. পছন্দ করলে শেষপর্যন্ত। তার বাবা ছিলেন নামকরা অ্যাটর্নি, ওকালতি থাক করে তাঁরই কাছে আর্টিক্ল ছিল সে বাপ মরতে এখন নিজেই অফিসের মালিক হয়ে বসেছে। সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী নেই, অবশ্য কি চাকর-বাঁদুনি আছে তিনজন। মোটা মোহনার মেসোডাঙ করে না, সাদাসিধে মানুষ। উপস্থিত বাড়ী বা মোটর নেই তবে শীঘ্রিরই হবে। বাপ মরার হাতে খরচ করে দেনা রেখে গেছলেন, ছেলে সৌখিন বাড়ী গাড়ী বেচে শোধ করেছে। তা ছিয়ে খুয়েও এখনও মস্ত নেই, ইভার খাওয়াপরার কষ্ট হবে না, ইচ্ছে মতো এটা সেটা কিনতে পারবে। শিবদাস এখন চৌরঙ্গী পাড়াতেই ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে, বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তার কারবার। সব বুঝেই ইভা রাজি হ'ল আমিও মত দিলুম। শিবদাসের চেহারাটা এমন কিছু 'আহা মরি' নয় তা সত্যি, আমার মেয়ের সঙ্গে তুলনাই হয় না। তবে ইভা আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে তার দিদি নিভার মতো সে যে সাপুড়ে বেদে বা ভুটিয়া কবিকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে ওঠেনি, এই আমার ভাগ্যি। ইভা বলে, "যাটা ছেলের চেহারায় কি আসে যায়? দরকার হ'লে আমি চোখ বুজে 'আপোলোর' মূর্তি ধ্যান করব।" শিবদাসের মেজাজটা মাঝে মাঝে ঠিক থাকে না, তাতে এমন কিছু আসে যায় না। মেয়ে আমার বলে, "ও খড়ের আগুন, জ্বলতেও যতক্ষণ, নিভতেও ততক্ষণ।" দুটো গান শোনালে, কি মনের মতো দু'পদ—ঝোঁকায় তালনা কি মোচার চপ—টোনার পোলাও কিংবা গলদা চিংড়ির মালাইকারি,—রেঁধে খাওয়ালেই নাকি জামাই আমার ঠাণ্ডা জল হ'য়ে যায়। তবে সংসারে থাকতে গেলেই মাঝে মাঝে দু' একবার ঠোকাঠুকি লাগে বইকি? আমার কর্তার সঙ্গেই কি আমার লাগত না? সেধারকার কথাই ধরোনা কেন। সন্ধ্যের পর ঠাণ্ডা লাগিয়ে 'হাঁচ্চো, হাঁচ্চো' করে হাঁচতে হাঁচতে বাড়ী ফিরলেন। গুরুনো জামা কাপড় এগিয়ে দিলুম; হাঁচি আর থামে না। বললুম, "সবার পায়ে খুতুর ছিটে লাগছে, রুমালটা মুখের সামনে ধরলে কিছু

কতি আছে ?" ব্যস কর্তা রেগে টং। বিড়বিড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। "মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝো না কেবল শাসন শিখেছ। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।" কত কি বললেন, তা রাগ করুন যা করুন, তিনি ঘরে বসেই করতেন তাতে এক পয়সা লোকসান ছিল না। জামাই যে আমার শিল্প রসিক হয়ে টাকা ওড়াতে আরম্ভ করলে, তার কি উপায় ? শিবদাসের রোগটা সম্প্রতি হয়েছে, ইহার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই এই নিয়ে। টাকা খরচে মেয়ের আমার অরুচি নেই, কিন্তু দু'জনের খরচের ধারাটা আলাদা বলেই ঝগড়া বাধে। ইভার ইচ্ছে ছিল পুজোয় একটা দামী আংটি কিনবে শাশুর, তা না, জামাই এক ছবি কিনে এনে দিলে পুজোর উপহার ব'লে। তাই কি সে ছবির কোনো ছিরি-ছাঁদ আছে ? একটা মেয়ে মানুষের আদল আসে বটে খানিকটা। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও কাপড় চোপড়ের কোনও বালাই নেই। গায়ের মাংসটা যেন পচে সবুজ আর থলথলে হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে—এখনই খসে খসে পড়বে। ঐ তো রূপ তার ওপর আবার আড় নয়নে তাকাবার ভঙ্গী কি ! দেখলেই মনে হয় দিই ঠাস করে গালে এক ঘা চড় বসিয়ে। দিনের আলোয় মাশীকে দেখলে গা ঘিনঘিন করে, অন্ধকারে দেখলে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়।

আমার ছেলে স্নেহেন্দু আমার সঙ্গে ওবাড়ীতে গেছল একদিন : বললে, "তোমরা বুঝছ না, এর মধ্যে রহস্য আছে। বাজার ভিকিরীর বাচ্চা ধরে এনে পচা ছানার সঙ্গে গাঁদাল পাতার রস মিশিয়ে গাধার ল্যাজের তুলি দিয়ে আঁকানো হয়েছে ছবিটা, শনিবারের বারবেলায় বাসি কাপড়ে নিঃশ্বেস বন্ধ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে এ ছবি না হলে এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না।" তাই বটে ! অনেক বড়ো লোকের বাড়ীতে কাপড় না পরা মেয়েমানুষের ছবি থাকে। তার কোনোটা সুন্দর, কোনোটা অশ্লীল, কোনোটা কেমন বোবা-বোবা। আমার জামাই-এর কেনা 'ভিনাস' ও-সবের ধার দিয়ে যায় না, যাকে বলে বীভৎস, বিভিকিচ্ছিরি। ছবিটা আমরা পছন্দ করিনি বলে জামাই-এর কি রাগ ! "বুর্জোয়া, ভিক্টোরিয়ান উন্নাসিক" কত কি ব'লে গালাগালি দিলে আমাদের। শেষপর্যন্ত আমি আর থাকতে পারলুম না, বললুম "আমরা ভিক্টোরিয়ার যুগে আছি ঠিকই কিন্তু বুর্জোয়া আমরা নই। না বুঝে নিত্যিনোতুন ফ্যাসানের পেছনে যারা ছোটে তারাই বুর্জোয়া। আর নাক খাকলেই মানুষ উন্নাসিক হয়, পচা গন্ধ সইতে পারে না। তোমার তো ও বালাই নেই, বুঝবে কি ?" শিবদাসের নাকটা একটু চাপা, দারুণ চটল। যাইহোক শেষপর্যন্ত একটা রফা হ'ল। যে ছোট্ট খুপরির মতো ঘরটায় শিবদাস কাপড়চোপড় বদলাতো সেই ঘরটায় চালান দেওয়া গেল ছবিটাকে। ইভা সে ঘরে বড়ো একটা ঢুকত না, তার চোখে পড়বার সম্ভাবনা রইল না আর।

কর্তার মৃত্যুর পর দিল্লীর পাট চুকিয়ে ক'লকাতায় এলুম। বছর দুই গেল সামলে উঠতে—স্নেহেন্দুর চাকরি পেতে, ইভার বিয়ে দিতে। বড়ো নিভা তো বিয়েই করলে না। নাকি আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সংসারে। আমাদের অপরাধ আমরা তাকে চীনে পাড়ায় হোটেল খুলতে দিই নি, ফুটিয়া সাতকেলে ছাড়া বুড়ো 'হোরলি', আর রকিনী চটকলের মজুর 'হরমণিয়া'কে বিয়ের ব্যাপারে ভাংচি দিয়ে তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি। তার ইচ্ছে ছিল, যদি ধনিক শ্রমিকে যুদ্ধ বাধে তবে সে কিছু ধনিক খুন করে শহীদ হয়ে যাবে সেই সুযোগে, কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম ! বস্তির ঝগড়া থামাতে গিয়ে এক শ্রমিক গিন্নীর চ্যালাকাঠের ঘায়ে কপালটা দাগী হয়ে যাওয়ার পর থেকে সে এখন ওপাড়ায় যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছে, শান্তিনিকেতনে গেছে গান শিখতে। আমরাও নিত্যি পুলিসের উৎপাত থেকে বেঁচেছি।

ইভার আর ক'মাস পরে ছেলে হবে। আমি তাদের বাসায় প্রায়ই যাই আসি আজকাল। শিবদাসের 'ভিনাস' প্রথম চোখে পড়তেই বলতে নেই, আমার পিত্তিতক্ জ্বলে উঠেছিল রাগে। বর্-ছেলের

মা'র চোখের সামনে ঠাকুরদেবতার ছবি, মহাপুরুষের ছবি রাখে লোকে। এ কি কাণ্ড! শিবদাসকে বললুম, "তোমার বউ-এর যদি ঐ রকম পট-টট্‌ভটে চেহারার একটি খোকা হয় তা'হলে কেমন লাগবে দেখতে? দিনরাত্তির চোখের ওপর ঐ মূর্তি থাকলে না হয়ে উপায় কি?"

শিবদাস কথাটা কানেই তুললে না, কারিগর কারুকার্য কাঁধ থেকে একটু তুলে ইভাকে বললে, "একটা পুরনো বই রবীন্দ্রনাথের।" ইভা গাইলে, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।' জামাই আমার তন্ময় হয়ে শুনলে। গান থামলে আমি বললুম, "যে মানুষ রবিবাবুর গান এত ভালোবাসে, সে কি করে এইসব অর্থহীন বীভৎস ছবি পছন্দ করে তা বুঝতে পারি না।" কবি তখনও ছবির আসরে নামেন নি; কি জানি, না হ'লে জামাই আমাকেই উল্টে সাতশ' কথা শোনাত। সে এবারেও আমার কথার জবাব দিলে না; ইভাকে বললে, "একটা মালকোষ আলাপ করবে সেতারে?" ইভা সেতার নিয়ে বসল, মালকোষ জমল না। জামাই মাথা নেড়ে বললে, "মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো বৃথা। বিশুদ্ধ কলা-রসের সেজ চওড়া মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়।" তারপর যতক্ষণ বাড়ীতে রইলুম, এ-কথা সে-কথা নিয়ে খিট খিট করতে লাগল কেবলই। যেন গর্ভযন্ত্রণাটা তাকেই ভোগ করতে হচ্ছে সারাক্ষণ, আমার মেয়েকে নয়। শেষে বললুম তাকে কথাটা "এত বেজার কিসের জন্যে?" শিবদাস বললে, "আমার মতো অবস্থায় পড়লে কার মেজাজ ঠিক থাকে? একদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শিল্পী মার্তণ্ড পতিতুণ্ডি মোংরা গলির মধ্যে অন্ধকার ঘরে না খেয়ে মরতে বসেছে, আমাকে তার একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পীকীর্তি জলের দামে দিয়েছে নিরুপায় হয়ে আর একদিকে দু'জন অর্ধশিক্ষিত সবজান্তা মেয়েমানুষ তাই নিয়ে যা-তা সমালোচনা করছে, টাকা নষ্ট করেছি ব'লে কথা শোনাচ্ছে। এই যে ছবিখানা আমি হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনেছি পঞ্চাশ বছর পরে এর এক ইঞ্চির দাম হাজার টাকা হবে তা কা'কে বোঝাব?"

শুনে খুব উৎসাহ বোধ করলুম না। বয়স হয়েছে, পঞ্চাশ বছর পরে পৃথিবীতে কি ঘটবে তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে না নিশ্চয়ই। বর্তমানে হাজার টাকায় সংসারের অনেক দরকারী জিনিস কেনা চলত। ইভার শখের পাল্লার আংটির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কাপড়, বাসন, আলমারি কতকিছু হ'তে পারত।

যাই হোক শিবদাসদের সংসারে সত্যিকারের অশান্তি বলতে কিছু ছিল না, আমি ওদের বাড়ী যেতে ভালোই বাসতুম। আমার বড়ো কন্যারত্নটির ধমক খেতে খেতে মোটঘাট বেঁধে তাকে হাওড়ার ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে ভাবলুম একবার ঘুরে আসি মেজ মেয়ের বাড়ী। ওদের বামুন দিদিটি ছিল চমৎকার অনেক ভালো এরকম রাঁধুনি মেলে। ভেবেছিলুম দু'একদিন নিশ্চিন্তি হয়ে ভালোমন্দ খাওয়া যাবে জামাইবাড়ীতে। বাড়ী ঢুকে দেখি ইভা মুখ গোমড়া ক'রে একা বসে আছে, চোখে জল। প্রশ্ন করলুম না, জানতুম তার মনের ভারটা আমার মনের ওপর চেপে বসতে দেরী হবেনা, কিছু না বললেও। আমাদের পরিবারের এটা বাঁধা নিয়ম, একজনের বোঝা আর একজনের না ব'য়ে গতি নেই। ঐজন্যে আমি টেলিগ্রাম এলেই ভয়ে মরি, প্রায় সর্বদাই টেলিগ্রাম আসার মানে—হয় কোনো ছেলের টাকা চুরি গেছে (যা ব্যবসাতে সর্বদাই হয়েছে) পত্রপাঠ টাকা পাঠাও; না হয়তো বড়োমেয়ে আত্মহত্যা করতে বা বিয়ে করতে যাচ্ছে কোনো ধাউন্ডুলেকে, না হয় মর-মর অবস্থায় বাড়ী আসতে চাইছে, গাড়ীভাড়া পাঠালেই বাড়ী কিরে আমার কোলে মাথা রেখে মরবে। স্নেহেন্দু বলে, আমার চিঠি কেবল অসুখের আর অশান্তির জন্য। তা কি ক'রব? আমি কি সাধ করে অসুখ, অশান্তি ডেকে আনি? তারা আমাকে ঘুঁষে বাঘ ক'রে ছাড়ে। ইভার চোখে জল

দেখেই বুঝলুম, আবার একটি দুর্ঘটনা আসছে—আমার মেয়ের কপাল থেকে আমার কপালে। হয় তার বামুনদিদির ছেলের চাকরী হয়েছে, সে আর তার মাকে পরের বাড়ী রাঁধতে দেবেনা, না হয় তার কি কান্তমণি নোটিশ দিয়েছে, 'দুবেলা এত কাজ পারবনা, তোমরা লোক রাখো।' আর একটা সন্দেহও উঁকি দিচ্ছিল মনের মধ্যে, শিবদাসের কোনো কলেজের পুরোনো বান্ধবী তাদের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করেছে সম্প্রতি! শোনাই যাক কি ব্যাপার।

ইভা বললে, "আজ দুপুরে আমরা একলাই খেতে বলব। তোমার জামাই-এর অফিসে কে একজন ব্যবসায়ী বন্ধু আসছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হবে। হোটেলে নিয়ে যাবে তাঁকে। খানাপিনা হবে সেখানেই।" তবু রক্ষে, বামুন-চাকর ছেড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা কিছু নয়। আমি বললুম, "এতো ভালো কথাই এতে কাঁদবার কি আছে? বড়োলোক বন্ধুকে রেস্তোরাঁর খাওয়ানো তোরই তো দাদামো বাঁচল। আর পুরুষমানুষকে ওরকম মাঝেমাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে হবে বই কি—উন্নতি করতে হ'লে সব রকম লোককে হাতে রেখে চলতে হবে।"

ইভা বললে, "তা সত্যি। বাড়ীতে লোক আসলে আমার খাটুনি বাড়ত।" সে উঠে এসে আমার গা থেকে ঘরের চাবিটা খুলে নিয়ে আলনায় গুছিয়ে রাখলে। আমি ফেলে রেখে শাখাটা পুরোদমে চালিয়ে দিলে। পান খেতে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি তাকে বুকে টেনে নিলুম। বললুম, "লক্ষীমা, কাঁদিসনি। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোর কোনও ভয় নেই। বাবার ঘরে অনাদর হয়তো আমার ঘর আছে, আমরা দু'জনে কেউ কাউকে দুঃখ পেতে দেব না। তুই চল আমার সঙ্গে।"

ইভা কেঁদে বললে, "আমি কি ক'রে সহ্য করব, আমি যে আর পারছি না!"

তার চোখের জলে আমার বুকের কাপড় ভিজে গেল, উত্তেজনায় গলা বুজে গেল তার। ব্যাপার কি আমি কিছুই জানি না, কি বলব? তার মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগলুম নিঃশব্দে।

একটু সময় নিয়ে ইভা বললে, "পুরুষমানুষ যখন সংসার করেছে তখন তার বাড়ীর সম্মান এবং পবিত্রতা যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।" আমি অস্ফুটস্বরে সমর্থন জানালুম, ইভার চুলে হাত বুলিয়ে চললুম সমানে। সত্যি বলতে কি, তার কথায় আমি ভয় পেয়ে গেছি, খুব চটেছি জামাই-এর ওপর। কি করেছে না জানি হতভাগাটা!

ইভা বললে, "তাকে অফিসে স্নান দিনেই যথেষ্ট লজ্জার কথা হত তা নয়,—একেবারে মায়ের ঘরে! এই মুহূর্তে, এই বাড়ীতে, আমার সঙ্গে সে করেছে?"

শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠেছে। "কি সর্বনাশ! কখন এল? কে সে?" ইভা ব'ললে, "কাল এসেছে। আমি তোমার কাছে গেছলুম দিদিকে বিদায় দিতে, সারাদিন বাড়ী ছিলুম না। সেই সুযোগ ওটাকে এনে ঘরে তুলেছে তোমার জামাই। তাকে নিয়েই উন্মত্ত এখন। আমার মাথা খেতে এসেছে সর্বনাশী।"

"বলিস কি? তুই বাড়ী ফিরে দেখলি দু'জনে একসঙ্গে রয়েছে?"

ইভা বললে, "তা নয় তো কি? হাত না পোড়াতেই মুখে জল না দিয়ে তাকে দেখতে ছুটেছিল আজ।"

"তুই কি বলছিস? কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়নিতো? আত্মীয়া নয়তো কেউ।"

ইভা বললে, "কাল চৌধুরীবাড়ীর সিন্ধী ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে বেড়াতে আসবেন সাজানো ঘর . যে ঘরে আমি ঐ ঘরেই বসাই আমি। কাল কি ক'রে তাঁদের বসাব জানিনা, মূর্তিমতী বসে আছেন ঘরের মাঝখানটিতে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।"

আমি বললুম, "কিন্তু কে সে? তাকে বসিয়ে খাওয়াবার কি দায় তোর? বিদায় করেদিতে পারলি না ঘাড় ধরে?"

ইভা বললে, "কি করব? তাকে বিদায় করবার মতো শক্তি আমার নেই।"

আমি বললুম, "বেশ, তোর না থাকে আমার আছে। আয় আমার সঙ্গে আজ তাকে না তাড়িয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।"

কী যে হ'ল, ইভা আমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল হঠাৎ। তারপর আমার সঙ্গে গিয়ে মাঝের ঘরের দরজাটা খুলে দিলে। ফাল্গুন মাসের সোনালি রোদ পড়েছে ঘরে, চারদিকে কৌচ-কেদারা সাজানো, জনমানব নেই। কেবল ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা উবড়ো-খাবড়া মার্বেল পাথরের উলঙ্গ মূর্তি আমাদের দিকে পিঠ ক'রে এক-হাঁটু উঁচু পাদপীঠের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ব'সে আছে।

আমি অবাক হয়ে বললুম, "এর জন্যে এত কাণ্ড? এই পাথরের ঢিপিটার জন্য তুই কেঁদে ভাসাচ্ছিলি?"

ইভা বললে, "ঘরটা নোংরা ক'রে দিয়েছে ঐ মূর্তিটা এসে। বীভৎস! বিকট!"

আমি এগিয়ে গিয়ে মূর্তির সামনের দিকটা দেখলুম। খাবড়া নাক বাঁকা কুৎকুতে চোখ, পুরু ঠোঁট, ঝুলে পড়া বুকের আভাস। কিন্তু আসলে কিছুই সম্পূর্ণ নয়, একটা চারচৌকো পাথরে বাটালির আঁচড় কেটে যেন কোনো আনাড়ি একটা কাফ্রি মেয়ের চেহারা ফোটাতে চেয়েছে, পারেনি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আর একটা 'ভিনাস'?"

ইভা বললে, "না, ইনি 'সাইকি', ভিনাসের পুত্রবধূ। সোজা বাংলায় মদন পত্নী রতিদেবী।

"কার তৈরী?"

"সেই খোঁড়ার-মুখো মার্ভত পণ্ডিতটির।"

"শিবদাস কত টাকা খরচ করেছে কে জানে? এত বড়ো একটা মার্বেল পাথরের দাম নিশ্চয় কম হবে না।"

ইভা বললে, "হয় এ বাড়ী থেকে বিদায় হবে, না হয় আমি বিদায় হ'ব।"

এটা হ'ল রাগের কথা, বোকার মতো কথা। একটা পাঁচ সাত মণ ওজনের পাথরের চাঙড়া বাড়ীতে এসেছে বলে কেউ এমন সুখের সংসার ছেড়ে যায় না, যাওয়া উচিত নয়। তবু ইভার দুঃখ আমি বুঝলুম। ঘরটা তেমন বড়ো নয়, মাঝখানে ঐ মূর্তিটা সামনে থাকবে তোবের ওপর। যত নজর করে দেখা যাবে ততই ঘৃণের ঘা বেড়ে যাবে। এই আপদ লোকে পয়সা দিয়ে ঘরে তোলে?

ইভা বললে, "ওর দিকে চাইলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মনে হয় শরীরটা যেন জল হয়ে যাচ্ছে, হাতপায়ের হাড়গুলোর বাঁধন আল্গা হয়ে খিল খুলে পড়ে যাবে এখনই। হৃৎপিণ্ডটা মোমের মতো গলে গিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে মনে হয়। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন কে শুষে নিচ্ছে আমার।"

এরপর আর চুপ করে থাকা যায় না। আমি কাজে লেগে গেলুম। মেয়ে আমার একলা নয়, পেটের ছেলেটার কাছে না হয় তাও যেতে হবে। পাশেই খাবার ঘর, সেখানে থেকে টেবিলচাকা এনে

চাবিটা তুলে এনে ইভার সাহায্যে বেশ করে মুড়ে ফেললুম মূর্তিটাকে। বললুম, "শিবদাস আসুক তার সঙ্গে আজ একটা হেস্তনেস্ত করব এ বিষয়ে, তুই ভাবিসনি।"

এর পর খেতে বসলুম দু'জনে। সকালবেলায় মানসিক বিপ্লব কম যায়নি, ষড়োমেয়েকে বিদায় দিয়ে মেজমেয়ের বাড়ী এসেই দুর্ভাবনায় পড়ে গেছলুম। বেশী দুশ্চিন্তা করলেই আমার খিদেটা বেশ চমচমে হয়ে ওঠে, আজও হয়েছিল। বামুনদিদির রান্না আমার ঠাকুরের রান্নার চেয়ে ভালোই। ভাবছিলুম, যতই কান্নাকাটি করুক, আমার আইবুড়ো মেয়ের চেয়ে এ মেয়ে সুখেই আছে স্বামীর ঘরে। খাওয়ার পর দুটো পান মুখে দিয়ে খাটে শুলুম দুজনে। কথা হচ্ছিল, ও মূর্তি না সরালে মায়ের ঘরে আর বাইরের লোককে বসানো চলবেনা। কি উপায় করা যাবে ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা বুজে এল, ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্তি পেলুম কিছুক্ষণের জন্যে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি ইভা পাশে নেই। তার লেখা একটুকরো কাগজ পড়ে আছে। "মা, আজই আমার একটু কেনাকাটা আছে আমি বেরোচ্ছি। তোমাকে জাগালুমনা। চারটের সময় ফিরব, পাঁচটায় একসঙ্গে চা খাব, চলে বেরোনা যেন। ইভা।"

চিঠিটা শেষ করতেই ঝি এসে বললে, "বাবু টেলিফোনে মাকে ডাকছেন। মা বাড়ী নেই, আপনি কি ধরবেন ফোনটা?" যেতেই হ'ল। একে কানে কম শুনি, তাতে শিবদাসের গলা টেলিফোনে ভালো খোলে না, কেমন কথাগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ না করেই গিলে ফেলে। তার কথা না শুনতে পাই তাকে কিছু কথা শোনাবার ছিল, তাই টেলিফোন ধরলুম গিয়ে।

"কে, শিবদাস? না আমি ইভা নই, ইভার মা। অ্যামেরিকান ঢঙের আসছেন? খুব ভালো, আমি ইংরিজিতে কথা বলতে পারি অ্যামেরিকানরা ইংরিজি বোঝে শুনেছি। ইভা চারটের আগে ফিরবেনা। এখনি আসছেন? বেশতো! তুমি তাঁকে খুশি রাখতে চাও? শুনে খুশি হলুম, সংসারে তাহ'লে এমন মানুষও আছে যাকে তুমি খুশি রাখতে চাও? আজ সকালে তাঁর সঙ্গে কিছু কারবার করেছ? আরও একটা সওদা করতে চাও? কি বলছ? আমাকে খুব শক্ত হতে হবে? নিশ্চয়, আমি খুব শক্ত হতে জানি। কিন্তু কারবারটা কিরকম হবে? কী বেচবে তাকে?"

টেলিফোনের ব্যাপার তো জানেন আপনারা। সেই বাণিজ্যের ব্যাপারে তালিম নেবার জন্য মনটা উদ্গ্রীব হয়েছে অমনি টেলিফোন থেমে গেল। তাকাতাকি করলুম, সাড়াও নেই, শব্দও নেই। হয় শিবদাস ছেড়ে দিয়েছে, না হয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আমাদের লাইন কেটে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে ঝিকে ডাকলুম। ততক্ষণে বাইরের দরজার কে ঘন্টা টিপেছে। ঝি গিয়ে সদর দরজা খুলে দিতেই এক দীর্ঘকায় সাহেব হন হন করে এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক এক মিনিট অপেক্ষা না করেই আমার করমর্দন করলেন, নিজের পরিচয় দিলেন, আমার পরিচয় জানলেন। টুপি খুলেই হাত বাড়িয়ে বললেন "ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ডাকোয়ার সিটিতে আমার বাড়ী আমার নাম, 'এনক ডো, গেপ্রাস'। আপনি নিশ্চয় মিসেস মুখার্জি, আমাদের বন্ধু শিবদাস ব্যানার্জির স্ত্রীর মা। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলুম। মেটা কোথায়?"

"কোন্‌টা কোথায়?"

"মার্ডেরের 'ভিনাস'। আমি দেখতে চাই।"

"ও, সেইটে?" আমি হতাশ হলুম। আমার আশা ছিল সাহেব 'সাইকি' কিনতে এসেছেন। শিবদাসের কাগজ ছাড়বার ঘরে ভিনাস লোক চক্ষুর অগোচরে থাকলে ক্ষতি ছিল না, তার কথা ভুলেই গেছলুম

আমি। যাইহোক আমি মিস্টার গ্রেগ্রাসকে নিয়ে গেলুম সে ঘরে, জানলার পর্দা টেনে ফাঁক করে দিতেই ছবির ওপর আলো পড়ল। তার পলীর-পলীর রঙ আর ঝুলোঝুলো গাঁটে বোঝাই চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মিঃ গ্রেগ্রাস বললেন, "শুনেছি এটা একটা বিরাট শিল্পকীর্তি।"

আমি সতর্কভাবে বললুম, "শিবদাস তো তাই বলে।" বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল 'পচা মাছের দুর্গন্ধ ছাড়ছে' কিন্তু চেপে গেলুম। অ্যাবেরিজিনালদের রুচি সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল না।

মিঃ গ্রেগ্রাস বললেন, "রঙটা কিন্তু অদ্ভুত!"

আমি বললুম, "শিল্পী মার্তণ্ড ঐরকম বিচিত্র রঙই দেখেন সব জিনিসের।"

"তাঁর মাথার কোনও গোলমাল আছে? ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "অস্বাভাবিক বলেই তো তাঁর তুলির একটি আঁচড় বা ছেনির একটি দাগ এত দুর্মূল্য। শিবদাস বলে, মার্তণ্ড গ্রীষ্মকালের আগেই মারা যাবেন। তখন তাঁর প্রত্যেকটি হাতের কাজের দাম বাড়তে থাকবে। শেষপর্যন্ত এরকম একটা বিরাট শিল্পকীর্তির দাম দশ বিশ হাজার টাকা হেঁড়ে যাবে।"

মিঃ গ্রেগ্রাস বললেন "গড্।"

আমি বললুম, "আপনি নিশ্চয় জানেন একটা ভালো মূর্তি বা ছবির দামের কোনো সীমা নেই। এসব এক একটি সোনার খনি কোন্‌টার দাম কত উঠতে পারে কেউ জানে না।"

মিঃ গ্রেগ্রাস বললেন, "আমি আবার জানি না। আমি, ম্যাডাম, পৃথিবী ভ্রমণ করে এসেছি। প্যারী, রোম, মুনিখক্লোয়েল, কাইরো সর্বত্র ঘুরে ছবি আর মূর্তি কিনেছি। এক রোমেই সাতদিন গেছে। নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে বেরিয়েছি স্যাকারায় সিটির জাদুঘরের জন্য শিল্পসংগ্রহ করতে। যতই সময় নষ্ট হোক, দায়িত্ব ভুলি না আমি, নিজের চোখে না দেখে কোনও জিনিস কিনি না।"

আমি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলুম তাঁর কথা। মিঃ গ্রেগ্রাস উৎসাহিত হয়ে বললেন, "য়ুরোপের প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে আমার শহরের জন্য ছবি কিনে আমি এসেছি ভারতবর্ষে। পুরোনো ছবি কিনেছি কয়েকটা এখন অতি আধুনিক দু'একটা নমুনা পেলেই আমার সংগ্রহ শেষ হয়। এই ছবিটা আমার নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমাদের বন্ধু শিবদাসবাবু বললেন এটা বেচবেন না। একঘণ্টা আগে আমি তাঁকে বলেছিলুম ন্যায্যদামে দিলে আমি কিনতে তৈরি আছি।"

আমি বললুম, "আর একবার বলে দেখুন না।"

"আমি পাঁচটার সময় কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি। আপনার জামাইকে ফোনে পাব?"

আমি সাহেবকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলুম। শিবদাসকে টেলিফোনে ডেকে অফিসে পাওয়া গেল না। আমি বললুম, "তাতে কিছু আসে যায় না। শিবদাসের সঙ্গে আমার একটু আগেই কথা হয়েছে, সে আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ন্যায্যদামে বেচবার জন্য।"

"আপনি কি বলতে চান, শিবদাসবাবু শেষমুহূর্তে মত বদলেছেন?"

আমি ধরা ছোঁয়ার মধ্যে গেলুম না। কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলুম এর মধ্যেই। বললুম, "আপনি এখনও 'সাইকি' দেখেন নি। শিল্পী মার্তণ্ডের শেষ এবং মহত্তম ভাস্কর্য। আপনার সংগ্রহের মান বেড়ে যাবে সেটা পেলে। শিল্পীর মৃত্যুর পর জগতের লোক তীর্থযাত্রায় যাবে আপনাদের শহরে সেই মূর্তিটা দেখতে।"

মিঃ গ্রেগ্রাস বললেন, "আমি পিসাশহরের হেলানো মিনারটা ট্রেন থেকে দেখেছিলুম। তার একটা ছোটো মডেল কিনেছি। তাকর্ষ বেশী মিচ্ছি না বওয়া বড়ো ঝঞ্ঝাট।"

আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মাঝের ঘরের দরজা খুলে মূর্তির গায়ের চাকা তুলে দেখালুম। মিঃ পেগ্রাস দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললেন "ওপ্‌। মূর্তিটা বোধহয় সবে খোদাই আরম্ভ হয়েছে।"

আমি বললুম, "না, শেষ হয়ে গেছে। সামনে থেকে এসে দেখুন।" আমরা দুজনে মূর্তিটাকে প্রদক্ষিণ করলুম খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ইভা এই ঘরে বন্ধু-বান্ধবদের বসায়, এই বীভৎস পাথরখানা না সরালে এঘরে মানুষকে বসতে বলা সম্ভব নয়।

মিঃ পেগ্রাস বললেন, "স্যাকায়ার সিটি লিউয়ে উঠবে এমূর্তি দেখলে। চমকে যাবে।"

আমি বললুম, "মাঝে মাঝে এইরকম চমকে দেওয়া দরকার মানুষকে। এটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে শিক্ষার অঙ্গ।"

"স্যাকায়ার সিটি বোধহয় নয় মূর্তি পছন্দ করবে না। আমরা একটু রক্ষণশীল।"

"শিল্পপ্রদর্শনীতে সব রকম রাখা উচিত। বিশেষ করে মর্মর মূর্তির মাস্টই আলাদা। ক্যানভাসের চেয়ে এতে উচ্চস্তরের কাজ আছে। বড়ো হল ঘরের শেষে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে। স্টেটসের লোকের আলোচনার বস্তু হবে অদূর ভবিষ্যতে এই মূর্তিটি।"

"স্যাকায়ার সিটির লোক কিন্তু এরকম তাচ্ছিল্য আশা করবে না।"

"আপনার অতিরিক্ত পেয়ে বিস্মিত হবে সবাই, আপনার তো সেইখানেই ঘর। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, 'মার্ভেলের সাইকি।' দর্শকরা স্পষ্ট করতে পারবে না, পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে উচ্চারণটা কিভাবে করতে হবে, মূর্তিটার মহত্ত্ব কোথায়? অর্থ কি।"

মিঃ পেগ্রাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওকথা বলবেন না, ম্যাডাম। স্যাকায়ার সিটিতে অনেক শিক্ষিত লোক আছে, পৌত্তলিকদের পুরাণের কাহিনী অনেকে জানে। আজকাল অনেক শিক্ষিতা মহিলার ফ্যাশন হচ্ছে 'সাইকিড' হওয়া আত্মা নিয়ে পরলোক নিয়ে চর্চা করা। আপনি 'সাইকিড' হন নি?"

"এখনও হতে পারিনি।" কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললুম, "দেবীর চোখের দৃষ্টি কি অপূর্ব দেখেছেন? যেন এইমাত্র স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলেন।"

আমি ইভার মঙ্গলের জন্যই এই মিথ্যার জাল বুনছিলুম, আশাকরি ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করবেন, তা ছাড়া আমি তো বলে খালাস, ক্রেতা এরমধ্যে যা দেখবার নিজেই দেখুন না। মিঃ পেগ্রাস একবার ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ একপায়ে না দাঁড়ালে বোধহয় চিন্তাটা তেমন জমেনা তাঁর। তারপর তিনবার মূর্তিটাকে প্রদক্ষিণ করলেন দাড়িতে হাত চেপে। বুঝলুম আমার উৎসাহ তাঁর মনে সংক্রমিত হয়েছে। অনেকক্ষণ দেখে দেখে মিঃ পেগ্রাস বললেন, "এটা নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্য শিল্পকীর্তি। আমার বন্ধু শিবদাসবাবু এরজন্য কত খরচ করেছেন জানতে পারলে ভালো হ'ত।"

আমি বললুম, "সত্তর টাকা।" আমার কোনও ধারণা ছিল না মূর্তিটার দাম সম্বন্ধে, তবে ভিনাসের কাপড়ে আঁকা ছবির যদি হাজার টাকা দাম হয় তবে এত বড়ো মার্বেল পাথরটার দাম নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশী হবে—এটুকু বুঝেছিলুম। অ্যামেরিকান ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। আমি বললুম, "শিবদাস নিশ্চয় কিছু লাভ না রেখে বেচবে না। যখন বাড়ী নিয়ে আসে তখনই বলছিল, কেনা দামের দু'গুণ এর চাহিদাদাম। সে সত্তায় পেয়েছে।"

মিঃ পেগ্রাস বললেন, "অপরাধ নেবেন না। মূর্তিটা অযথা রকমের কুৎসিত।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, চোখভোলানো মধুর মধুর ভাব নেই ওতে। যেসব জিনিস যারা চায় তারা শিল্পী মাওঙের চাঁদ বা মূর্তির মর্যাদা বুঝবে না।"

"তাকায়ার সিটির জন্য আমি সব ছেলের সেরা শিল্পকর্ম নিয়ে যেতে চাই।"

আমি কিছু না ব'লে মূর্তিটার অ্যাবড়া নাকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। অ্যামেরিকান ভদ্রলোক মৃদুস্বরে বললেন, "আপনি বলছেন এটা শিল্পীর শেষ এবং মহত্তম শিল্পকীর্তি?"

আমি মৃদুস্বরে বললুম, "হ্যাঁ! অপূর্ব! অতুলনীয়!"

আবার কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে চেয়ে আছি। তারপর হঠাৎ ভদ্রলোক পকেট থেকে চেকবুক এবং ফাউন্টেন পেন বারকরলেন। বললেন, "আমি লক্ষ টাকাই দেব, তার বেশী দেবার শক্তি নেই আমার। শহরের লোক যে টাকা দিয়েছিল তা এইতেই শেষ হবে। প্যাক করবার এবং পাঠাবার খরচ আমার নিজের পকেট থেকে যাবে।"

আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লুম। "মাফ করবেন, কেনাবেচায় আমি ছাড়তে পারব না, সিংহাস আসুক, তার সঙ্গে আপনি দরদস্তুর করবেন। কখন নিয়ে যেতে চান আপনি?"

"এই মুহূর্তে। যদি কিনি তাহলে এখনই এটাকে লরিতে চড়িয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে প্যাকিং বাক্সে ভরব আমি। তারপর জাহাজে তুলব।"

"আপনি ঠিকানা রেখে গেলে আমরা পরে পাঠিয়ে দিতে পারতুম দামে পোষালে।"

"না, আমি বাছাইকরা মূল্যবান জিনিসগুলি আমার সঙ্গে জাহাজে নিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে পৌঁছোব তাকায়ার সিটিতে।"

"বেশ, তবে একলক্ষ দশ হাজারই দিন। সাধারণের টাকা, পাঁচজনে দেখবে শুনবে, তাই কমেই ছাড়ছি। তাকায়ার সিটির যদি শ্রীবৃদ্ধি হয়"—

"শ্রীবৃদ্ধি হবে না মানে? আমি বলছি, ম্যাডাম, দশবছরের মধ্যে তাকায়ার সিটির এমন উন্নতি হবে যে তার তুলনায় নিকাগোকে ছাইগাদা মনে হবে। দিনরাত হৈ হৈ রবে কাজ চলছে সেখানে। ছেলেগুলোর পর্যন্ত কি দাপট। আমার একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে তার চীৎকারে লণ্ডনের মতো শহরে থরহরিকম্প লেগে যাবে। এটা অবশ্য কিছু গর্বের কথা নয়, ইংরেজের এখন পড়তি দশা, আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না।"

"বেশ, তাহ'লে একলাখ দশ হাজারই দিন। দশহাজার বেশী দিলে তাকায়ার সিটি দেউলে হবে না, আমার জামাইকেও কিছু লাভ না দিলে সে আমার ওপর বিরক্ত হবে।"

"বেশ, ম্যাডাম। একলাখ দশ হাজারই পাবেন আপনি।"

ভদ্রলোক চেক লিখে আমার হাতে দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। দশমিনিটের মধ্যে কোথাথেকে একটা লরি এবং একদল কুলিমজুর নিয়ে ফিরে এলেন। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে মূর্তিটাকে ধরাধরি করে বার করে নিয়ে গেল বাড়ী থেকে, লরিতে উঠিয়ে ফেললে। তারপর আবার তারা ফিরে এসে পাথরের পাদপীঠটা নিয়ে গেল। একজন বললে "সাহেব কিছু কাপড়চোপড় চাইছেন মূর্তিটা ঢেকে নেবার জন্যে, আর লরির গায়ে ধাক্কা না লাগে সেজন্যেও কিছু কাপড় মূর্তির ধারে গুঁজে দিতে হবে।" ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে নিজে এসে ঢুকলেন, বললেন "ভাগ্যক্রমে রাস্তায় বেরিয়েই একটা খালি লরি পেয়ে গেলুম। ছুট করে ফিরছিল, ভেতরটা বড়ো নোংরা একটু নরম কাপড় কিছু মূর্তিটাকে মুড়ে নেবার জন্য চাই।"

আমার ছেলেমেয়েদের মুখে কখনও আমার বুদ্ধির প্রশংসা শুনিনি তবে বিপদে পড়লে বুদ্ধি আমার খুলে যায়। ইভার খাবার ঘরের দরজা জানালার পরদাগুলো তার মোটে পছন্দ নয়, বদলাবে বদলাবে করছিল অনেকদিন থেকে। আমি মিঃ সেগ্রামকে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে তাঁর সাহায্যে সমস্ত পর্দাগুলো খুলে তাঁকে দিয়ে দিলুম। বাইরে গিয়ে তাঁকে মূর্তিটাকে কিভাবে ঢাকতে হবে বুঝিয়ে দিলুম, কোথায় কোথায় কাপড় গুঁজতে হবে লরির ধাক্কা বাঁচাবার জন্যে তাও শিখিয়ে দিলুম কুলিদের। আমার বাইরের শান্তভাব দেখে কেউ বুঝতেও পারলেনা আমার মনের মধ্যে তখন কি ঝড় বয়ে চলছে। ইভার যে মতলব ছিল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু জামাই যে রাগে আগুন হয়ে কি অপমান ক'রে বসবে ভাবতেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। মিঃ সেগ্রামকে বন্ধুভাবে বিদায় দিলুম, কথা দিলুম আমেরিকায় গেলে অবশ্যই তাঁদের সিটিতে তাঁর অতিথি হ'ব। লরি গাড়ীর মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করেছিলুম। সঙ্কল্প ছিল, শিবদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না একটা চিঠি এবং চেকটা রেখে বিদায় নেব সে ফেরবার আগেই। কিন্তু দরজায় খিল দেবার আগেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে, ইভা এবং শিবদাস নেমে এসে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল বৈঠকখানায়।

ইভা বললে, "আশ্চর্য ব্যাপার। আমি দিব্যিগেলে বলতে পারি, এই মাত্র রাস্তায় একটা চলতি লরিতে আমার খাবার ঘরের পরদাগুলো দেখেছি। তোমার জামাই বলছে আমার চোখের ভুল, কিন্তু আমি নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না।"

শিবদাস বললে, "একরকম পর্দা কি আর থাকতে নেই কারও বাড়ীতে? তুমিও যেমন!"

আমি বললুম, "ঐ ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বল, আমি বাড়ী ফিরব।"

ওরা আমার কথা কানেই তুললে না। শিবদাস বললে, "আমি আফিস থেকে সকাল সকাল পালিয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে গল্প করব বলে, আর ইভা আপনার জন্যে মার্কেট থেকে বুঝি ভাজা চানাচুর এনেছে, চায়ের সঙ্গে খাওয়া হবে।" আমি ওদের আন্তরিক আগ্রহ দেখে তখন উভয় সঙ্কটে পড়লুম। পালাতেও পারিনা, আমার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে থাকাও কষ্টকর। আমি যা করেছি ওদের ভালোর জন্যেই করেছি, কিন্তু হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ? আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কি করছিলুম সে প্রশ্ন কেউ করলে না। ইভা ছুটল খাবার ঘরের পরদা দেখতে, শিবদাস নেমে গেল ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে। বাড়ীর সমস্ত ঘরের দরজা খোলা, মেঝেতে ধুলোসুরকী মাখা সারি সারি পায়ের ছাপ। খাবার ঘরের টেবিলক্লথটা তখনও মাটিতে পড়েছিল, পর্দা খোলার জন্য যে ছোটো কাঠের মইটা আমরা ব্যবহার করেছিলুম সেটা তখন পর্যন্ত দরজার পাশেই দাঁড় করানো ছিল। ইভা চারদিকে দেখে চীৎকার করে উঠল "চোর চোর।" রান্নাঘর থেকে বামুনদিদি আর ঝি ছুটে এল। শিবদাস কাপড় বদলাতে ঢুকেছিল, আমি বামুনদিদিকে এবং ঝিকে বললুম, "কিছু হয়নি, তোমরা এখন যাও।" তারা চলে যেতেই শিবদাস ছুটে গিয়ে ঢুকল মায়ের ঘরে, তারপর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে এল মূর্তিটা নেই দেখে। আমাকে প্রশ্ন করলে, "এর মানে কি? বাড়ীতে কি ডাকাতি হয়ে গেছে?" তারপর ঘরেঘরে ঢুকে খুঁজতে লাগল, তার মূর্তিটা কোনও আনাচেকানাচে লুকোনো হয়েছে কিনা।

ইভা বললে, "আমি তখনই বলেছি আমাদের খাবার ঘরের পরদা যাচ্ছে। তুমি বললে আমার চোখের ভুল।"

আমি বললুম, "তোর তো চক্ষুশূল হয়েছিল পরদাগুলো। বলছিলি বিদায় করতে পারলে বাঁচি।"

ইভা বললে, "তা যদে হার তো কম নেয়নি। তা'ছাড়া আমাদের চুরির জন্ত ইন্সিওরকরা নেই, যা গেল তা গেলই। আমার গহনাগাটি কি গেল দেখিগে।"

তত্তক্ষণে ঘরে ঘরে চেঁচামেচি করে বেড়াচ্ছে দুজনে, কি গেল না গেল খোঁজ হচ্ছে। ওদের বামুন-ঝিঝি এবং তিও মনিবদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তাদেরও গলা শুনতে পাচ্ছি। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি, আমার তখন চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়েছে। চেকটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়েছি মুঠে রেখেছি হাতের মধ্যে। একটু পরেই শিবদাস এসে ঘরে ঢুকল পিছন পিছন ইভাও এসে দাঁড়াল।

শিবদাস বললে, "কি হয়েছে এখনও বলুন। আপনি এর যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাতে পারলে আমি পুলিস ডাকতে বাধ্য হ'ব।"

ইভা মিনতি করে বললে, "ওগো তুমি অমন করছ কেন? আর কিছুই যায়নি দেখছি। আমার মা নিশ্চয় তোমার মূর্তি নেয়নি। নিলে কোথায় রাখবেন তিনি?"

"তুমি যখন বাইরে যাও তখন মূর্তিটা ঘরে ছিল, কি ছিল না?"

"নিশ্চয় ছিল। আমরা ঐ টেবলক্লথ দিয়ে সেটাকে ঢেকে রেখেছিলুম চাওয়া যাচ্ছিল না বলে।"

আমি মুখ খুললুম এইবার। বললুম, "শিবদাস, তুমি একটা কথার উত্তর দাও। তোমাকে যদি তোমার স্ত্রী এবং ঐ বীভৎস মূর্তিটার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয় তবে তুমি কাকে নেবে?"

সে রাগে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, কি যে বলতে লাগল বিড় বিড় করে বোঝা গেলনা। আমিও বুঝলুম তাকে এখন ভালো কথা বলা নিষ্ফল। ইভা বললে "গান শুনবে?"

আমার জামাই তখন উন্মত্ত। বললে "তোমার গানের নিকুচি করেছে। আমার 'সাইকি' কোথায় গেল বলো?"

আমি বললুম, "তুমি চুপ ক'রে না বসলে আমি কা'কে ব'লব? বলতে হলে গোড়া থেকে সব খুলে বলা দরকার।"

শিবদাস বললে, "হায় হায়, দশ হাজার টাকা আমার জলে চলে গেল, আর আপনি বলছেন, চুপ করে বসতে? পুলিস না ডেকে উপায় নেই, তারা ঠিক খুঁজে বার করবে।" সে বেরোতে যাবে, ইভা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বললে, "আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে তোমার পুলিস ডুকবে তার আগে নয়। মা'র কি বলবার আছে আগে শোনো। তিনি যা করেছেন নিশ্চয় আমাদের ভালোর জন্তে করেছেন।"

"বুঝেছি তাই মনে করে বটে। ভালো করছি ভেবে পরের সর্বনাশ ক'রে বসে।"

"খবরদার।" দুজনেই উত্তেজিত, কারও মাথার ঠিক নেই, আমি কিন্তু তত্তক্ষণে দামলে উঠেছি, গালমন্দ যা শোনবার শোনা হয়ে গেল, হাতের চেকটা মনের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে, বেশ আনন্দ উপভোগ করছি বলতে গেলে ওদের দুর্দশা দেখে।

আমি প্রশ্ন করলুম, "মার্ডক কি সিরিয়াসই অসুস্থ?"

শিবদাস বললে, "অসুস্থ? মরবে কেন? তার যক্ষ্মা হক।"

"তুমি যেন বলেছিলে সে খুব অসুস্থ, মরতে বসেছে।"

"অসুখ হ'লেই মরতে হবে-এমন কি কথা আছে? তার তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল।"

"আমি মিঃ গ্রেগরিকে তোমার কথা মতো কিন্তু বলেছি, মার্ডক আর বাঁচবেনা, গ্রীষ্মকাল আসবার আগেই মারা যাবে সে।"

"মেগ্রাস তাহ'লে এসেছিল বাড়ীতে ?"

আমি মাথা নেড়ে জানালুম "এসেছিলেন।" কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই নীরব, দুইএ দুইএ যোগ করে চার হচ্ছে তখন, কতের যোগ কম্ম হচ্ছে মনের মধ্যে।

শিবদাস হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "আপনি তাকে বেচেছেন মূর্ত্তিটা ?"

"তুমি তো তাকে বেচতেই চেয়েছিলে ? চাওনি ? সেই কথাই বলেনি টেলিফোনে ?"

"আমি তাকে বেচতে চেয়েছিলুম ? আজ কিনে কাল বেচব- কোনও লাভ না রেখে,—আমাকে কি তেমনি পাগল পেয়েছেন ?"

"তুমি তাকে পাঠাওনি বাড়ীতে ?"

"পাঠিয়েছিলুম ভিনাসের ছবিটা দেখবার জন্যে। সে তার পরের জন্মদিনের জন্য ছবি কিনতে বেরিয়েছে। মার্ত্ত অসুস্থ, তাছাড়া তার ঘরে সাহেবকে নিয়ে যাওয়া যায়না আমার আশা ছিল, আমি তাকে কিছু অডার পাইয়ে দেব, ঐ ছবিটা পছন্দ করলে।"

জামাই আমার বন্ধুবাসী হ'লে কি হয়, মানুষটা ভালো। পরোপকার করবার জন্য নিজের ক্ষতি করতে তার হেলদোল্ নেই। আমি তার কথায় খুশি হলুম। বললুম, "তুমি যাই মনে করো, মিঃ মেগ্রাসের পক্ষে আর নোতুন করে কোনো ছবির অর্ডার দেওয়া সম্ভব হ'তনা। তিনি তাঁর পরের জন্য গচ্ছিত টাকা সব শেষ করে 'সাইকি'র মূর্ত্তিটি কিনেছেন, নিজের খরচে প্যাক ক'রে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাবেন। তা চাও তো তুমি মার্ত্তকে তোমার টাকা থেকে কিছু দান করতে পারো।"

"দান করব ? জানেন, আমি মার্ত্তকে দশ হাজার টাকা দিয়েছি ঐ মূর্ত্তিটার জন্য, সে তা'তে এখন পাঁচ বছর বসে খেতে পারবে। আপনি একটা উইকো অ্যামেরিকানকে বেচে দিলেন মূর্ত্তিটা! সে তার কদর বুঝবে ? আপনার এবং উইকোর চেয়ে তার নিজের জ্ঞান কখনোই বেশী নয়। আমি জানতুম সে ভিনাসটা নিতে চাইবে, আমি তাই অঞ্জনাকে ছাড়তে বারণ করেছিলুম। হায় হায়, আমার সাইকি গেছে অ্যামেরিকায় চলে গেল! ক'টাকা দিলে লোকটা ? টাকা কই ?"

উইলোর কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত হয়ে ওথেলো যখন ডেস্‌ডিমনাকে খুন করতে যায় তখন তার যে রকম জ্ঞান লুপ্ত অবস্থা হয়েছিল আমার জামাই-এরও প্রায় সেইরূপ সেই অবস্থা। সে আর একটু হলে বোধহয় মারত, নিতান্ত গুরুজন ব'লে গায়ে হাত তোলেনি। চাপা আক্রোশে কেবল গোঁ গোঁ করছিল আর ছটফট করে তাকাচ্ছিল থেকে থেকে।

আমি বললুম, "শিবদাস, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে যে, আমি ইভাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যাইনি। গেলে আমাকেও অপমান হ'তে হ'ত না, তুমিও তা হ'লে তোমার 'সাইকিকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতে এবাড়ীতে। তুমি যদি সংযতভাবে-ভদ্রভাবে চলতে না পারো তা'হলে আমার পক্ষে তোমার হাতে আমার মেয়েকে এঅবস্থায় ছেড়ে রাখা সম্ভব নয়।"

ইভা ব'ললে, "মা, ওকে আর এখন কিছু বোলোনা, ওর মাথার ঠিক নেই।"

শিবদাস বললে, "জানেন, আমি নিজের রক্ত-জল করা কতগুলি টাকা ঢেলেছি ঐ মূর্ত্তিটার পিছনে ; দশ হাজার,—দশ।"

আমি বললুম, "আমি তো তা জানতুম না, আমাদের তো তুমি বলোনি কিছু ওর দাম সম্বন্ধে। আমি নিজে আন্দাজ করে দাম ধরেছি।"

"কি কাজই করেছেন! তাস্থর্যের দায় সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে যে আন্দাজ করে যা, তা দাম নিতে গেছেন।"

"কি জানি বাবা, জানতুম তোমার একখানা বাড়ী বরকার নিজের মেয়েরও একখানা বাড়ীর শখ। তা যাক, যা হবার হয়ে গেছে, আমাকে তুমি মাফ করতে চেষ্টা কোরো। এই নাও তোমার মুক্তির দাম।"

আমি হাত খুলে চেকটা দেখালুম, তারপর নিজে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিবদাসকে দিলুম চেকখানা। অবাক বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল চেকখানার দিকে। তারপর হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে পা জড়িয়ে ধরে কি কান্না! ভাগ্যিস বাইরের লোক কেউ দেখেনি। আমি তো লজ্জায় মরি। "আরে ছাড়ো, ছাড়ো, কাঁদবার কি হয়েছে?"

আর ছাড়ো! ক্যাপা জামাই আমার একলাখ টাকা লাভ পেয়ে আরও ক্ষেপে গেছে তখন। শেষে ইভা এসে অনেক কষ্টে তার হাত থেকে আমার পাদুটো উদ্ধার করে আর তাকে তুলে বসায়। জামাই আমার শুধু ক্ষমা চাইলেই যথেষ্ট হ'ত, পায়ে মাথা কুটে কাঁচড়ে পাঁচড়ে দেবার কি দরকার ছিল বলো তো! একে বাতের শরীর, ব্যথা সারতে তিন দিন যায়। ইভার টিকার আইডিয়া কিন্তু কাজ দিয়েছিল, যা হয়নি একটাও।

সেদিন জামাই আমাকে নানারকম অকথা কুকথা বলার জন্যে বার বার ক্ষমা চেয়েই ছাড়লেনা। সারা সন্ধ্যে থেকে তাদের বাড়ীতে রাত্রে খেয়ে আসতে হ'ল কত রকম বায়না করে আবদার আমার জন্যে কি বলব ও রকম করলে বেশীদিন থাকা চলে কি কারো বাড়ীতে?

এর মধ্যে এক সময় কি খাতমণি এসে ঢুকল পরদার পাশ দিয়ে। মেগ্রাস সাহেব বুঝি করে কেতে পাঠিয়েছেন সেগুলো। ইভার আর চুরমুর করবার কিছু রইল না।

• 'মিসেস অ্যালফ্রেড লিঙ্কুইক' এর 'ডাক অ্যাণ্ড সুগার' বইএর একটা অংশের ছায়াবলম্বনে।

যখন মিলন

রজত রায় চৌধুরী

নির্দিষ্ট জায়গায়, এমন কি তনিমা নির্দেশিত পথিপার্শ্বস্থ বকুলগাছের তলায় এসে দাঁড়াল সুকান্ত। পাছে দেরি হয়ে যায় তাই বেশ কিছু সময় আগেই এসে পৌঁছিয়েছে। সুকান্ত ভাবল, তনিমা তো ট্রাম-বাসের ভিড় কি অপ্রত্যুলতার কথা বিশ্বাস করত না। বলত, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তুমি মজা দেখতে চাও।

সুকান্ত বলত, এই ধারণা তোমার সত্য নয় তনু, আসলে এই সময়ে ট্রামে-বাসে—

সুকান্তকে কথা শেষ করতে দিত না তনিমা। বলত, থাক থাক, দোষটা ট্রাম-বাসের ওপর আর চাপিয়ো না, তোমাদের আমি চিনি। আর তনিমার মুখকে চুপ করে যেত সুকান্ত।

ঠিক সময়ে হচ্ছে তখন। বকুলগাছের ভেতর ছটফট করছে কয়েকটা পাখি। তারা এবার ঘুমোবে। ঘুমোক ; সুকান্ত একদৃষ্টে চেয়ে রইল রাস্তার ওপারের সিনেমার প্রকাণ্ড ছবিটার দিকে। সিনেমা হলের নিচে প্রচুর লোক। নানা ফেরিওয়ালা। তাদের বিচিত্র সুরে ক্রেতা আকর্ষণের প্রচেষ্টা। মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ ট্রাম-বাস অন্যান্য যানবাহন দৃষ্টিপথে পড়ছে। ঢেকে যাচ্ছে সম্মুখের ছবিটা। সিনেমার ইভ্‌নিং শো এখনও আরম্ভ হয়নি। পোর্টিকোর নিচে এখানে ওখানে ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে এপথ ওপথের দিকে চেয়ে রয়েছে কয়েকটি মেয়ে। সুকান্ত ভাবল, তারাও তার মতনই কারুর না কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। ওই তো একটি মেয়ে ছটফট করে উঠল, রুমাল দিয়ে আলতো করে মুখটা মুছল, মণিবন্ধের ঘড়িটা দেখল। তারপর ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, মেয়েটি কথা বলছে। সুকান্ত ভাবল, নিশ্চয় ছেলেটির বিলম্বের কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করছে না মেয়েটা। বলছে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

হঠাৎ সুকান্ত দেখল, তারই ইউনিভার্সিটির ক্লাসমেট অনিরুদ্ধ হাঁটতে হাঁটতে এদিকে আসছে। দেখে ছেলেটি মুশকিল। নানা কৈফিয়ৎ চাইবে। নয়তো কোনো চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসাবে। যা বকবাজ ছেলে। কেবল বকর বকর করেই যাবে ননস্টপ ছেড়ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা। অতএব, আড়াল হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুকান্ত একটু বাঁদিকে হেঁটে অন্ধকার গলিটার নিচে থাকা ল্যাম্প-পোস্টার আড়ালে দাঁড়াল।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অনিরুদ্ধ ওই বকুলগাছের তলাতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। সর্বনাশ যা কথা বলে ছেলেটা, ওকি আর ঘণ্টাখানেকের আগে ওখান থেকে নড়বে। ঘড়ি দেখল সুকান্ত এবং সময়টা দেখেই থেমে উঠল। তনিমার আসার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন কোনো অবস্থাতেই গাছতলায় যাওয়া যায় না। অনিরুদ্ধ আটকে রেখে। এবং সে আটকানো যে কি—

এবার রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠল সুকান্ত। তণিমা আসছে। মন্থরপায়ে বকুলতলার দিকে। এখানে এই গলির মোড়ের অন্ধকার থেকে সুকান্ত কেবল তণিমার চোখের ভ্রূটি, মুখের কাঠিন্য। এত কাছে তবু ভাবতে পারল না সুকান্ত। একবার ভাবল, এগুবে যা হয় হবে, যা ভাববার ভাববে অনিরুদ্ধ—বয়ে গেছে। বরং অনিরুদ্ধের চোখে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তণিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পথে হাঁটবে সে। অনিরুদ্ধ না হয় বলবে, আরে গুড্ডিগুড্ডি ঘর সুকান্তের খবর জানো। সে এখন মেয়ে ছাড়া পথে হাঁটে না—আর কফি হাউসের চারপাশ থেকে কতকগুলো টিকটিকে পড়ুয়া-চোখ চমকে উঠবে। যা হয় হোক্—সুকান্ত পা বাড়াল।

আর তখন, ঠিক তখনই থমকে পড়তে হল তাকে। তণিমা, হ্যাঁ তণিমাই কথা বলছে অনিরুদ্ধের সঙ্গে। বকুলগাছের তলায়, যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে, সেখানটায় পাশের দোকানের আলো এসে পড়েছে। অনিরুদ্ধের মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তণিমার হাতে একটা খাতা। মুখটা ঈষৎ তৈলাক্ত। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে গলির মুখ ছেড়ে বড় রাস্তার ফুটপাথে উঠল সুকান্ত। তারপর ফুটপাথের এক মনোহারী ফেরিওয়ালার বিচিত্র টুকিটাকি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

আশ্চর্য লোক তুমি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিলামঅলা দেখছ! তোমার কোথায় দাঁড়াবার কথা ছিল?

শান্ত নির্বিরোধ চোখ দুটো সুকান্তের। মৃদুকণ্ঠে বললে, অনিরুদ্ধ চলে গেছে।

কে অনিরুদ্ধ?

যার সঙ্গে বকুলতলায় কথা বলছিলে?

লোকটা দারুণ স্মার্ট। আমায় বলে কিনা, আপনিই তো তণিমা মিত্র, ফিলজফিতে এবার এম. এ. দেবেন?

আর কি বলল?

আর কি বলবে; মৃদু হাসল তণিমা। বললে, আলাপ জমাবার চেষ্টায় ছিল। চলো, বলে সুকান্তের হাত ধরে আলগা টান দিল তণিমা।

আর একটু এগিয়েই পার্ক। সন্ধের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। রাস্তায় বেশ লোক। তাদেরই ভেতর দিয়ে মন্থর পায়ে ওরা পার্কের একপ্রান্তে এসে পৌঁছুল। তণিমা বললে, আজ আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। রিকশায় চড়বো।

রিকশাটা একটু চলতেই সুকান্ত যেন সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এ রাস্তায় যানবহন কম। পথচারিও কম। বাঁহাতটা আস্তে করে তুলে দিল তণিমার কাঁধে। তণিমা বাধা দিল না। মৃদু হেসে বললে, তোমার তো আজ খুব সাহস দেখছি।

হাসতে হাসতে সুকান্ত বললে, এ আর কি সাহস।

মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে চোখ দুটো সুকান্তের চোখের ওপর রাখল তণিমা। চোখটা সম্পূর্ণ খোলা। সাদা জমির ওপর কালো চোখের তারা দুটি বড় সুন্দর হয়ে দেখা দিল।

সুকান্ত সেই চোখের দুর্লভ রমণীয়তায় নিবিড় মাধুর্য উপলব্ধি করল। আস্তে আস্তে নত হতে লাগল তার মুখটা।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রিক্সাটা তার স্পীড কমাল। সামনে একটা চৌমাথা। গাড়ি আসছে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। আর এগোবে রাস্তা পার হচ্ছেন তাদেরই পাড়ার মিসেস তালুকদার।

এই রিক্সা বাঁয়ে। বাঁয়ে চলো।

তণিমার দুচোখের রমণীয়তার জায়গায় আগুন। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়েছে সুকান্ত। কাঠ হয়ে হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করে বসে আছে সে। বৃষ্টি পথের দিকে।

তণিমা বললে, রিক্সা বাঁয়ে ঘোরালে কেন?

এবার ডাইনে যেতে বলো।

বলছি। কিন্তু ঘোরালে কেন তার জবাব দাও।

মিসেস তালুকদার।

সে কে? কই? পথের এদিকে ওদিকে তাকাল তণিমা।

ঘোড়ের মাথায় ছিল।

হুঁ। তাই তুমি রিক্সা ঘুরিয়ে দিলে। তিনি কি করতেন তোমায়? নিন্দে করতেন?

চুপ করে রইল সুকান্ত।

আশ্চর্য। রাগে সরসর করতে লাগল তণিমা। তুমি এখনও সহজ হতে পারছ না। কবে পারবে?

ভদ্রমহিলা তিলকে সবসময় ভাল করেন। সেজন্যই এড়াতে চাচ্ছিলাম: সুকান্ত কৈফিয়ৎ দিল।

তবে তো সুবিধেই। সবাই তাকে চেনে। তাছাড়া, সেদিনও তোমায় বলেছি, তুমি সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে মেলামেশায় অন্যায় বোধ করো কিনা।

বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত বেদনা নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠল। না না তণিমা তুমি অমন করে অভিযোগ করো না। সুকান্ত চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোমায় তো সেদিনই বলেছি তণা, আমি অনেকের মত নই, আমি অন্যায় বোধ করলে প্রথমেই সরে দাঁড়াতাম। তাছাড়া আজকে এসব প্রশ্ন অবান্তর।

তবু তোমার ভয় যায় না। চেনা লোক দেখলে আঁতকে ওঠো।

রিক্সা থেকে নেমে ভিড়টা হেঁটে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে বসল তণা। জায়গাটা শুধু নিরিবিলি নয় অন্ধকারও। ঠিক আশপাশে কেউ নেই। একটু আড়ালে আবডালে যারা আছে তারাও তাদের মত অন্ধকারময় নিরিবিলি প্রত্যাশী। দূরের রাস্তার আলো। সুকান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তণিমার একটা হাত ধরে বলল, তণা।

কি? মুখ তুলল তণিমা।

সেই সুপ্রশস্ত সাদা ললাটের ভেতর কালো আঁখিতারায় মাধুর্যময় ইঙ্গিত। দুহাতে সেই মুখখানি ধরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল সুকান্ত। বললে, তণা, আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল। এমন করে তোমায় কখনও পাইনি।

তণিমা সুকান্তের বাহুবন্ধনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি যত ওটিয়ে নাও নিজেকে, যত ভয় পাও সামান্য চেনা লোক দেখলে—ততই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি।

চুপ করে রইল সুকান্ত। নির্জন অন্ধকারের মধ্যে শুধু রক্তমাতাল হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি। আস্তে

আস্তে সোজা হয়ে বসল তপিমা। ছড়িয়ে নিল কাপড়। বললে, কী মুশকিলেই পড়েছিলাম আজকে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই বুঝি বা বানচাল হয়ে যাচ্ছিল।

কারণটা শোনবার জন্য উৎসুক চোখ তুলল সুকান্ত। প্রশ্ন করল না।

কুলাদি একটা ফাংসানে গান গাইতে নিয়ে যাবার জন্য মাস্তোড়বাবা। অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছি।

মিথ্যে কথা বললে তো?

তা একপ্রকার বলতে হল। কি করব বলো?

তাহলে দেখ। তুমিও দেখছি বিশেষে ভয় পাও। সোপন কথা।

তোমার মতন নই—আবার চোখ তুলল তপিমা। কিন্তু পরক্ষণেই দৃষ্টিটাকে মুখমণ্ডলের অন্ধকারে প্রসারিত করে বললে, তুমি তাহলে রবিবার সন্ধেয় আমাদের বাড়ি যাচ্ছ?

চুপ করে রইল সুকান্ত।

কি হল? বাবার নামে ভয় পেয়ে গেলে?

তা নয়! সুকান্ত বলল, আমি ভাবছিলাম আরও অনেকে তো আসবে সেদিন—

তুমি লোককে এত ভয় করো কেন বলো তো?

তোমায় বোঝাতে পারব না তমা, ভয় ঠিক নয়, আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আজকে তোমার হয়েছিল কি?

কিছুই হয়নি।

তবে গাছতলায় না দাঁড়িয়ে মিলনমেলার কাছে দাঁড়িয়েছিলে যে?

গাছতলাতেই ছিলাম, হঠাৎ দেখি অনিরুদ্ধ আসছে। যা বকবাজ ছেলে, হয়ত টেনে নিয়ে ঢোকাবে বেতোঁয়ায়—আটকে দেবে—সেজন্য আড়ালে ছিলাম।

অনিরুদ্ধের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

বা! একসঙ্গে পড়েছি যে।

ওঠবার সময় হল। সুকান্ত বললে, তমা রবিবারের এখনও পাঁচদিন দেরি। এর মধ্যে দেখা হবে তো?

অন্ধকারের বুক চিরে আলোর দিকে এগোতে লাগল ওরা। তপিমা রুমালে আলতো করে মুখটা মুছল। দুহাত তুলে মাথার চারপাশে আলসা করে বুলিয়ে নিল। তারপর বললে, শুক্রবার হবে। আজকের মতন সামনের স্কুলের বাইরের ওই গাছতলায় থেকো।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পড়ল। সুকান্ত বলল, নর্থ বেঙ্গল থেকে চাকরির একটা অফার এসেছে। লিখেছে আমার বন্ধু পরিমল।

তুমি উত্তর দিয়েছো?

দিয়েছি। লিখেছি, কলকাতা ছাড়া এখন সম্ভব নয়।

তোমার স্কুলের ওটার কি হল?

বলছে তো, সামনের মার্চেই কমিটিতে পারমেন্টের প্রপোজালটা উঠবে। বোধহয় দু'একদিনের মধ্যেই মিটিং।

আমার চাকরি কিন্তু বাঁধা। মামা বলে রেখেছে।

সে তো পাবেই। সবাই কি আমার মতন বরাত নিয়ে—

থাক মলাই। এবার চুপ করো।

তণিমাকে বাসে তুলে দিয়ে উল্টোমুখে হাঁটা শুরু করল সুকান্ত। মেয়েটাকে যেন কিছুতেই চিনতে পারছে না সুকান্ত। এক এক সময় এমন আচরণ করে যে মনে হয় তণিমা বোধহয় সত্যি সত্যিই নাগালের বাইরে। সুকান্ত আজকের দিনটাকে তারিয়ে তারিয়ে মনের মধ্যে ভরিয়ে তোলবার জন্য মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল। আর তো মাসখানেক পরেই রেজাল্ট বেরুবে তণিমার। তারপর ওর মামার স্কুলে চাকরি ওর বাঁধা। মনে মনে কতকগুলো টাকার অঙ্কের যোগ করল সুকান্ত। তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

শুক্রবারের সারা সন্ধেবেলাটা বকুলগাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে গেল সুকান্তের। রাস্তার অবিশ্রান্ত কোলাহল, বাসের চর্ণ, ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি, ফেরিওলার চিৎকার সবকিছুর মধ্যে একটি লঘু অথচ দ্রুত পরশক একটি চাপকা সুরের মিষ্টি আহ্বান শোনবার জন্য প্রহরের পর প্রহর উৎকর্ণ হয়ে রইল সুকান্ত কিন্তু সে ডাক এল না। যখন সাড়ে সাতটা বেজে গেল, তখন নিশ্চিন্ত হল সুকান্ত, তণিমা আজ আর আসবে না।

না আসার কারণ একটাই হতে পারে এমন অনুমান করে সুকান্ত স্থির করল এখুনি একবার তণিমার বাড়ি গিয়ে তার অসুস্থতার সংবাদটা নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু দূর থেকে চেনা বাড়িটার মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় হবে কিনা এ উপলব্ধি এল তখন, যখন সে তণিমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সুকান্ত। মনে হল, তণিমার বাড়ি যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। হয়ত তারা ভীষণ বিরক্ত হবে, হয়ত দেখাই করবে না। সুতরাং সুকান্ত তার এই হঠাৎ থমকে দাঁড়ানোর জন্য নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করল।

চলেই আসছিল সুকান্ত, হঠাৎ দেখল তণিমার বাড়ির দরজা খুলে একজন লোক এইদিকে আসছে। তবে কি তণিমা কোনো ঘরের জানলা থেকে তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোক মারফৎ ডেকে পাঠাচ্ছে। স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল সে। মনের ভেতর হাজার চিন্তার এলোমেলো প্রবাহ।

কিন্তু না। লোকটা তারই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। অগত্যা সুকান্তই তাকে ডাকল। বলল, মিঃ সেন বাড়ি আছেন?

লোকটা থমকে দাঁড়াল। বললে, না ওনারা সব দীঘা গেছেন।

দীঘা? কবে আসবেন?

চার পাঁচদিন পরে।

চার পাঁচদিন নয়। প্রায় একমাস হতে চলল তণিমার সঙ্গে দেখা নেই সুকান্তের। সুকান্ত আর গানের স্কুলের কাছে বকুলতলায় দাঁড়ায়নি, যায়নি তণিমার বাড়ি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভারবোধ নিয়ে সে দিন কাটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আরও অনেকরকম ভাবনা—বিশেষ করে তার নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা তার আচরণ তার স্বভাব সম্বন্ধে সে আঁতিপাঁতি করে ভেবেছে।

তবু যখন তণিমার চু'ছত্র চিঠি সেদিন হাতে এসে পড়ল, দুলকে উঠল বুকের রক্ত। তণিমা ফিরেছে

এবং তাকে দেখা করতে বলেছে! সুকান্ত হঠাৎ খুব খুশি হল। ভাবল, তার সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান। মনের ভারবোধ যেন নিমেষে হাল্কা।

কিন্তু যতই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হবার সময় ঘনিয়ে এল ততই একটা অস্বস্তি একটা বিচিত্র শিথিলতা তার সর্বদেহ মন আচ্ছন্ন করল।

তণিমা বললে, তুমি রাগ করেছ জানি, রাগ করবার কথাই, কিন্তু কি করব বলো, হঠাৎ রাঙাদি এল দিল্লী থেকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রাম হল আর সদলবলে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা।

সুকান্ত চুপ করে রইল।

তণিমা বললে, রাঙাদি যেমন তেমনি পুলকদা। দীঘা থেকে ঠিক হল পুরী। এমনি করে গোপালপুর অন সী পর্যন্ত।

কবে ফিরলে? এবার সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

গতকাল। ফিরেই তো তোমায় চিঠি লিখেছি। খুব রেগেছ—না?

না। রাগব কেন?

আরে শোনো না, তোমার ওই যে বন্ধু অনিরুদ্ধ, তার সঙ্গে পুরীতে দেখা। কী আমুদে লোক না! পুলকদাকে আর ও'তে সমস্ত ভ্রমণ পথটা মাতিয়ে রেখেছিল।

খুব সন্তর্পণে তণিমাকে এড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সুকান্ত। ভাবল, তণিমা একবারও বলল না, তুমি থাকলে খুব আনন্দ হত।

তণিমা খুব একচোট গল্প করে গেল পুরীর সমুদ্র স্নানের, কোণার্কের, উদয়গিরি, খণ্ডগিরির। তারপর হঠাৎ বললে, তোমার এখনও রাগ পড়ল না! আশ্চর্য। তোমার বন্ধুকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, সে কি বললে জানো?

চোখ তুলে তমার চোখের ওপর দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করল সুকান্ত। তণিমার চোখে কৌতুক। ঠোঁট দুটোয় রসিকতার স্পর্শ। বললে, অনিরুদ্ধ বলে কি, সুকান্ত নাকি মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় পায়। বলতে বলতে তণিমার সমস্ত মুখখানা কৌতুকের রঙিন স্পর্শ আভাসিত হল।

চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুকান্ত। ভাবল, তাকে নিয়ে তণিমা রসিকতা শুধু নয়, অপমান পর্যন্ত করতে পারে অনায়াসে অন্যের সঙ্গে।

তণিমা বললে, সুকান্ত প্লীজ, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে এখনই একবার উঠতে হবে।

উঠবে?

কেন তোমার কি কিছু বলবার ছিল?

ছিল? তবে তোমার তো এখন না উঠলেই নয়।

দেখো না—আজ সকালে অনিরুদ্ধ এসে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেছে। কী মুশকিল বলো তো? রাঙাদি আবার কালই চলে যাবে কিনা।

আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল সুকান্ত। তাকাল তণিমার দিকে। শান্ত নির্বিরোধী দৃষ্টি। কিন্তু তবুও সেই প্রশান্ত চাউনির ভেতর যেন একটা কাঠিন্য ছিল। তণিমাও চেয়ে রইল সুকান্তর দিকে।

সুকান্ত বললে, বেশি সময় নেব না। কারণ আমার বক্তব্য ছোট।

বলো। তণিমার চোখের দৃষ্টি স্থির। সমস্ত চাপল্য তিরোহিত।

দেখো তন্ময়, আমি প্রায়ই ভাবি, সুকান্ত বলল, আমার যা পছন্দ তোমার তা নয়, আমার স্বভাবে যা বর্তমান তোমার স্বভাবে তার বিপরীত। তাছাড়া আর্থিক প্রশ্নটাও এর সঙ্গে ধরা দরকার।

কী বলতে চাইছ, স্পষ্ট করো বলো। তন্ময়ের কণ্ঠস্বরে অনুনয় নয় আদেশের ভঙ্গি।

অনেকটা গ্রহণ বর্জনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে দাম্পত্য জীবনের ভিতটা—সুকান্ত বলল, তুমি পশ্চিমে যাবে, আমি পছন্দ করব পুব তাতে মিলনের সার্থকতা কোথায়? কোনো বিশেষ দুর্বল মুহূর্তে আমরা পরস্পর সন্নিকটে আসব, তারপর দুস্তর ব্যবধান—এটা ভাবা দরকার।

আর কিছু বলবে?

বলব। আমি স্বভাবতই ভীরু। লোকজন ভিড় পছন্দ করিনে। অনিরুদ্ধের ভাষায়, মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত আমার ভয়। খুব মিথ্যে বলেনি সে। যাক্‌গে। আমার স্বভাব বিশেষ বদলাবে এমন আশা করিনে—তুমি কি পারবে এমন অবস্থায় রাজি হতে? বেশ করে ভেবেচিন্তে উত্তর দিও। কারণ, আমি ভীরু হলেও স্ত্রীর কাছে হাসপাতাল নিয়ে যেতে পারব না। বা তার উপহাস উপদেশের নিতান্ত বাহন হতে পারব না।

উঠে দাঁড়াল তন্ময়া। হাওয়ায় উড়তে লাগল তার চুল। আঁচলটা উড়ে যেতে চাইল কাঁধ থেকে। অনেকক্ষণ দূর পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে শুধু অস্ফুটে বলল, আমাকে ভাবতে দাও সুকান্ত—আমাকে ভাবতে দাও।

———

বিন্ধ্যাচলী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আমার এক পিসতুতো দিদি থাকতেন এলাহাবাদে—ওঁরই চিঠিতে এই নামটার উল্লেখ ছিল। মনে হয়েছিল বানান ভুলে উচ্চারণটা বিকৃত হয়েছে। বিন্ধ্যাবলী নামটা পুরাণে আছে। সে যুগে হামেশাই রাখত লোকে। কিন্তু অমন একটা ভরন্তপ্ত পাচাত্তকে ব্যাকরণের পাঁচে ফেলে লিঙ্গান্তরিত করার দৃষ্টান্ত এই প্রথম চোখে পড়ল। আর পরে যখন প্রত্যক্ষ করলাম—তখন ওর বাপমায়ের বুদ্ধিটির প্রশংসা করতেই হলো। এই নাম ওই মেয়েতেই সার্থক হয়েছে বলা যায়।

হাঁ, দেহ গৌরবের কথাই বলছি। শালোয়ার সুলভ অমন একটি বপু বাংলার জল হাওয়াতে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, পশ্চিমেও কদাচিৎ চোখে পড়ে। কাড়া দু'ফুট লম্বা, দু'হাত মেপে ঘিরেও দেহ-পরিধির পরিমাপ দুঃসাধ্য। আর বর্ণ, বর্ণনা থাক, অচল যখন সচল হয়ে সামনে এলো এবং কপালে দু'হাত ঠুকে বলল, নমস্তে বহিনজী—চমকে উঠেছিলাম বই কি।

দিদি আমার চমকটুকু লক্ষ্য করে ঈষৎ হেসে বললেন, চিঠিতে এঁরই কথা জানিয়েছিলাম বিন্ধ্যাচলী দেবী—মিনতি বাবাজী।

পরিচিত হওয়ার পর অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে নেমে এলাম আমরা। এতে ওঁরই কৃতিত্ব সর্বাধিক।

একই বাড়ীর উপর তলার থাকে বিন্ধ্যাচলী নীচের একাংশের ভাড়াটে আমার দিদি অপরাংশে ওই দেশীয় আর এক ভদ্রপরিবার থাকেন। অপর অংশের ভদ্রলোক স্বজাতীয় হলেও বিন্ধ্যাচলীর সঙ্গে সদ্ভাব নাই। দুই মহলের প্রবেশ পথটি সব সময়ে বন্ধ রেখে জানিয়ে রেখেছেন বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটেদের আত্মীয়তা বাঞ্ছনীয় নয়। এধারে আমার দিদিটি কোমল মনা,—দূরত্ব রচনা করে থাকাটা নিরাপত্তা মনে করেন। সেই কারণে দুয়ার তাঁর সব সময়েই খোলা থাকে।

পরের সংসারে উঁকি মারা স্বভাব আছে যাঁদের নিজের সংসার সামলে নিয়ে তাঁরা সেই কাজটি করেন। বিন্ধ্যাচলীর আসাযাওয়াটা অন্য কারণে। তার নিজের সংসার আছে বটে—সেটা ভারহীন। ওর স্বামী থাকে দূর প্রবাসে মাসান্তে না পুণায়; বছরে একবার মাত্র বাড়ী আসে—কোনবার আসে না। একটি মেয়ে—বিয়ে হয়ে গেছে; সেও থাকে না বারোমাস। আত্মীয় পরিজন কেউই থাকে না ওর কাছে। এবাড়ী ওবাড়ী গল্পগুজব করে ওর দিন কাটে।

কিন্তু শুধুই গল্পগুজব করে না; যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে—একটা না-একটা কাজ ওর লেগেই থাকে। কোন দিন একরাশ ডাল ভিজিয়ে বেটে মসলার সঙ্গে মিশিয়ে ছাঁচ ভর্তি করে বড়ি দেয়—কোন দিন পাঁপড় কোন দিন বা আচার তৈরী করতে বসে। সে পদের সমারোহ কত! আত্মীয়স্বজন পড়শী সকলের জন্যই তৈরী করে এই মুখরোচক জিনিসগুলি। ঘরে ঘরে বিলিয়ে আসে কখনো বা ছোট ছেলে মেয়েদের

ডেকে এনে পকৌড়ী ভাজমুট ছুকো কচুড়ি খাওয়ায়। কাজের চাপ সৃষ্টি করে তারই মধ্যে ডুবে থাকতে চায় ও।

এইটাই ওর বিশেষত্ব বলছি না। আত্মীয় স্বজনহীন অনেক মানুষই তো এমনি কাজ নিয়ে মন খুঁজে নিজেকে ভরিয়ে রাখতে চায়। এটা জীব বা জীবনের ধর্ম। বন্ধ্যা রমণীর পাখী কুকুর বিড়াল নিয়ে মাতামাতির দৃষ্টান্ত বহু আছে. দেবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মূলেও মনের এই ক্রিয়া বিদ্যমান। কিন্তু আমার আত্মীয়ার মুখে যা শুনলাম তাতে আমার ধারণা পালটে গেল।

দিদি বললেন, তুমি ভাবছ সময় কাটাবার জন্যে ও এইসব নিয়ে থাকে? হায় হায় তাই যদি হবে তো মেয়ে জামাইকে কেন কাছে রাখে না! বলতে নেই তাদের তো অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা—নাতি নাতনীগুলো থাকলে ওর ঘর কি খাঁ খাঁ করত!

বললাম, জামাই নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে আসবে কেন?

দিদি বললেন কেন আসবেন না? জামাইয়ের তো সেই অবস্থা—মধ্যে ভাত খায়? না—হাত ধোব কোথায়? ওর বাপ মায়ের অনেকগুলো ছেলে—অবস্থা ভাল নয়। দু'একটা ছুটকে ছিটকে এধার ওধার গেলে তো বর্ত্তে যায়।

তবে আসে না কেন?

আসে তো মাঝে মাঝে—থাকতে বলেই আসে। কিন্তু থাকতে পারে না।

এতো আশ্চর্য্য ব্যাপার! কারণটা কী?

দিদি হেসে বললেন, কারণ বিন্ধ্যাচলী।

মানে। অবাক হয়ে শুধোলাম।

মানে দিনকতক থাক বুঝবে। এইবার ওর মেয়ের আসার সময় হয়েছে। কাল বলছিল—জামাই আসছে তিন-চার মোকের ভিতর।

দেখছি বটে বিন্ধ্যাচলীর উৎসাহ বেড়ে গেছে। রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে পোলা ফিরিয়ে নিলে ঘরগুলোর।

দিদি বললেন, ওটা বাড়তি কিছু নয় কি বছর দেওয়ালীর আগে বাড়ীঘর চুণকাম করানো এই দেশের প্রথা। দেওয়ালির সময় নতুন বাসন কেনার ধুমও দেখতে পাবে। আমাদের পারশীয়ার মতই তো পক্ষটা।

মেয়ে জামাই আসবার আগে আর একটা ঘটনা ঘটলো—স্বামী এসে পড়লো পুণা থেকে।

ওই রুগ্ন লোকটা যে বিন্ধ্যাচলীর স্বামী জানতাম না। বেলা তখন ন'টা। প্রতিদিনকার মত জানালার ধারে বসে পথের লোক চলাচল দেখছিলাম। ফিরিওয়ালারা বিবিধ পণ্যের গুণকীর্ত্তন করে বিচিত্র সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করছিল সেও শোনবার মত। চেনা জিনিসের অচেনা নাম উচ্চারণে অদ্ভুত টান, সঙ্গে সঙ্গে ছড়া শুনতে বেশ মজা লাগে। শুনছিলাম—হঠাৎ দুই হুই করে একখানা টাঙ্গা এসে থামল এই বাড়ীর দরজায়। টাঙ্গায় মধ্যে একটি মাত্র মানুষ, আর বেশ কিছু জিনিষপত্র। লোকটি টাঙ্গা থেকে নামতেই মনে হল সুস্থ নয়। দীর্ঘ চেহারা—দীর্ঘকাল রোগে ভুগলে যেমন শ্রীহীন হয় তেমনি। ও এগিয়ে এসে দুয়োরের কড়া নাড়ল, কিন্তু দুয়োর আর খোলেই না। এটা কিন্তু ব্যতিক্রম। কোন পড়শী কিংবা ছোট বাচ্চারা এসে

কড়া নাড়লে উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসে বিন্ধ্যাচলী। মনে হয় যেন দুয়োর খুলে দেবার জন্যই ও সব সময়েই প্রতীক্ষা করছে। একটা হাঁক দিয়ে পর্যন্ত শুধোয় না—কে? প্রয়োজন হয় না। উপরের বারান্দা থেকে সদর দরজাটা স্পষ্টই দেখা যায়। বিন্ধ্যাচলী জানে প্রতিবেশিনীরা আসছে গল্পগুজব করতে ছেলেমেয়েরা আসছে আচার কি খেলনার লোভে। দু'রকম সবই ওর প্রলোভনের বস্তু। এই ক'দিনই তো দেখছি—ওরা এলে কি অপরূপ প্রাণ-চাঞ্চল্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে ও। খুশির স্বরে বলে এসো—এসো।

কিন্তু দীর্ঘকাল পরে এলো ওর সবচেয়ে প্রিয়জন,—ওর স্বামী। তাকে দেখে ও খুশি হল না। গড়িমসি করে বেশ খানিক সময় নিয়ে দুয়োর খুলল। দুয়োর খুলে হাসি মুখে বলল না, এসো, ভাল তো? কিংবা রাস্তায় রাখা বেডিং সুটকেস আর পোঁটলা-পুঁটলির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল না। কর্তা স্বামীর পানে না চেয়েই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

জানালার ধারে বসে অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখলাম।

ওর স্বামী কিন্তু আশ্চর্য হল না। এ যেন ওর জানা। গাড়োয়ানের দিকে ফিরে মালগুলো তুলে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল।

উপরে মাল উঠলো—মানুষও উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে উপরতলা সরগরম হয়ে উঠলো।

বিন্ধ্যাচলীর প্রবল কণ্ঠস্বর শুনলাম—লোকটির গলা শুনলাম না। ক্রোধ এবং ভর্ৎসনার উত্তাপে সেই স্বর তখন ফেটে পড়তে চাইছে যেন।

দিদি বললেন, কে এলোরে ওপরে? চেঁচায় কেন?

বললাম, বয়স্ক একটা লোক। অসুস্থ মনে হল।

চেহারার বর্ণনা শুনে দিদি বললেন, ও হরি—তাই বল! উনি যে ওর পরমাত্মীয়—পতি পরম গুরু।

তা অমন চেঁচাচ্ছে কেন?

চেঁচাবেই তো—মানুষটাকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। শুধু নোংরা বলে নয়—রোগা বলেও। আর, কথাটা চেপে গেলেন দিদি।—ওদের সম্পর্কটা সাপে নেউলে গোছের যে।

কেন—স্বামীটি কি ভাল ব্যবহার করে না?

দিদি বললেন, কি জানি—মন্দ ব্যবহার করতেও দেখিনি। আসে—দিন দুই থাকে—আবার চলে যায়। মানে যেতে বাধ্য হয়। কথা যা বলে বিন্ধ্যাচলীই—লোকটা উত্তর দেয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়—ও বুঝি বোবা।

বললাম, না—না বোবা নয়। এইমাত্র গাড়োয়ানটাকে বলল—

দিদি হাসলেন, জানি রে—জানি। আমি শুধু ভাবি এত চড়া চড়া কথা ও সহ্য করে কি করে। যে সম্পত্তির ন্যায্য মালিক—

আশ্চর্য হয়ে বললাম, বরাবরই এমনি কি?

বরাবর। স্বামীকে ও সহ্য করতে পারে না।

স্বামীর অপরাধ? নেশাখোর? চরিত্রহীন? জিজ্ঞাসা করলাম।

কি জানি—আজ ষোল বছর এই বাড়ীতে রয়েছি—তেমন প্রমাণ কিছু পাইনি। লোকটাকে দশ বারো বার অন্তত দেখেছি—দুতিন মাস এক নাগাড়ে থেকেছে এখানে—বেচাল কিছু দেখিনি। একবার বিন্ধ্যাচলীকে বলেছিলাম, মানুষটাকে অমন কর কেন? ও উত্তরে বলেছিল, ও মানুষ নয়, শয়তান।

বলেছিলাম, ওর কসুর কি ? বলেছিল, সে বলা যায় না।

উত্তর শুনে রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, শাস্ত্রে বলে—স্বামী দেবতা।

ও চটে উঠে বলেছিল, দেবতার জাত আলাদা, ও শয়তান।

ওর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার পিতাজী কি তোমাকে ভালবাসেন না ? তুমি এলে—কই—তোমাকে তো দেখতে আসেন না।

বিষণ্ণ মুখে মেয়ে বলেছিল, আমি যখন আসি পিতাজী জানতেই পারেন না।

চিঠি লিখে জানাও না কেন ?

বাপরে ! শিউরে উঠেছিল মেয়ে। জানতে পারলে মা আমায় আস্ত রাখবেন। চেলা কাঠ দিয়ে ঠেঙিয়ে জান খতম করে দেবেন।

কিন্তু তোমার পিতাজীর ওপর উনি নারাজ কেন ?

জানি না তো ! জ্ঞান হয়ে অবধি এমনি—দেখছি।

দিদিকে বললাম, কিন্তু ওই লোকটাই তো বাড়ীর স্থায্য মালিক—

দিদি হাসলেন, মনে হয় না এই বাড়ীতে ওর কোন স্বত্ব আছে। আমরা ভাড়ার বিল পাই বিন্ধ্যাচলীর নামে। ট্যাক্স, লাইটের বিল, খাজনা খারিজীর ব্যাপার ওরই নামে। তুমি তো বাড়ীটা—এবং আরও বহু সম্পত্তি পুত্রবধূর নামেই করে দিয়েছেন শ্বশুর।

তুমি দেখেছ শ্বশুরকে ?

দেখেছি বইকি। এই তো মাত্র দু'বছর হল মারা গেছে। বয়স হলে কি হবে—দিব্য শক্ত সমর্থ চেহারা। তা বউটাকে স্নেহ করত খুব। বুড়োর আরও আত্মীয়-স্বজন ছিল। ভাই, ভাইপো-ভাইঝীর দল, তাদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনীরা। বাড়ীটা কাউকেই দেয়নি। পুত্রবধূর নামে পুরোপুরি। অথচ দেখ—এরও ভোগদখল করার দ্বিতীয় জন নেই।

কেন, মেয়ে-জামাই তো রয়েছে ?

ও ওদের পাত্তা দেয় নাকি। দু'টো দিন থাকতে না থাকতে এমন পিছনে লাগে যে—ওরা পালাতে পথ পায় না। মেয়ে প্রায়ই কাঁদতে কাঁদতে বলে, চাচী-মাতাজী এমন শক্ত হয়—দেখেছ কোথাও ? আমরা ছাড়া ওর কে আছে—কিন্তু আমাদেরও খলকুল দেয় না। শ্বশুরবাড়িতে কম কষ্ট। পাঁচ ছেলে শ্বশুরের। মাস্তর তিনখানা ঘর আর একটা বড় দাওয়া—তারই এক কোণে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পড়ে থাকি বকরীর মত।

বলেছিলাম, মায়ের মন বুঝিয়ে চলতে পার না ?

মেয়ে বলেছিল, মন কোথায় ওর—ও যে পাষাণ ! আমরা এলে ভাবে—ওর যথা সর্বস্ব লুটপাট করে নেব—ওকে কতুর করে দেব। ছোট ছেলেমেয়েরা দুষ্টু হয়—লাফালাফি ছুটোছুটি করে দুয়োর জানালা আছড়ায়—ঘরদুয়োর নোংরা করে—খাবারদাবার চুরি করে খায়—এটা ওটা ভাঙেও—তার জন্য বড়দের টেনে টেনে গালমন্দ করা—শুনেছেন তো নিজের কানে। কোন্ মা সহ্য করতে পারে !

বলেছিলাম, তবে আস কেন ?

কি জানেন—মন বোঝে না। ভাবি মা-তো দিন দিন বুড়ী হচ্ছে—এখন আমরা যদি না দেখি তো কে দেখবে ! বয়স হলে মানুষের মেজাজ নরম হয়, কিন্তু দেখছেন তো। আমরা এলে দুচার দিন

ঘরঘাস্তি করে—এটা ওটা রাঁধে—ছেলেগুলোকে পুতুল কিনে দেয়—মেওয়া মিষ্টি খাওয়ায়, তারপর দিনকতক পরে যে কে সেই! বাড়ী থেকে এমন উধাও হয়ে যায়—সারাদিন আসেই না। হাট বাজার করে না—এক একদিন ঘরে চাল আটাও থাকে না।

দিদি বললেন, একদিন বলেছিলাম বিন্ধ্যাচলীকে, দিদি—মেয়েটা আজ কাঁদছিল,—তুমি সারাদিন বাইরে ছিলে—

ও বলেছিল, মেয়ে তো কচি খুকি তো নয় যে কোলে করে সোহাগ করব! কাজছিল বাইরে ছিলাম। ওকে বারণ করিনি তো রান্নাবান্না করোনা।

তা নয়—ঘরে চাল আটা ছিল না—

বাধাদিয়ে বলেছিল বিন্ধ্যাচলী, কাছেপিঠে বাজারও ছিলনা কি? এই দু'পা বাড়ালে কত দোকান—

হাতে ওর পয়সা ছিলনা।

কেন, জামাই কি মরদ নয়? রোজগারপাতি করেনা। একপাল ছেলেমেয়ে যার তার কি শাশুড়ীর পিত্যেশ করা উচিত?

কটু শোনাবে বলে স্পষ্ট কথাটা বলতে পারিনি। না হলে বলতে পারতাম, শ্বশুর বাড়ীতে এসে কোন জামাই নিজের পয়সা খরচ করে সংসার চালায়? তার উপর মেয়ে জামাইকে তো তুমিই চিঠি লিখে আনিয়েছ! সে সব কথা বলা যায়না চুপ করে থাকি। বিন্ধ্যাচলী ওদের হাজারটা দোষের কথা বলে। বলে—অমন মেয়ে জামাই জাহান্নামে যাক। ওরা আমার এখেকালে টেঁকে আছে। তো শ্বশুর ঠাকুরও সে আশায় ছাই দিয়ে গেছেন! আমি মলে ওরা এই বাড়ী পাবে নাকি? বলে হেসে ওঠে।

অবাক হয়ে বলে, তবে কে পাবে বিন্ধ্য?

কেন—আমার খুড়তুতো দেওররা নেই—তাদের ছেলেপুলেরা নেই? তারাই পাবে।

আর তোমার স্বামী?

মুখে আগুন! বলে ও ঠিকরে চলে গিয়েছিল। তা যাই বল ভাই—এ দেশের আচার ব্যাভারই আলাদা। ওদের সম্পর্ক যে এমন তেতো হল কেন বুঝি না!

একটু থেমে দিদি বললেন, মানছি স্বামী এমন খারাপ ব্যবহার করেছে যাতে মনটা বিষিয়ে আছে, কিন্তু পেটের মেয়েটা তো কোন অপরাধ করেনি। আর তোরও যখন ওরা ছাড়া গতিগম্য নেই! তাও বুঝতাম একলা থাকতে ভালবাসিস কারও সঙ্গ সহ্য করতে পারিসনে—সে এক কথা। অনেক একলাবেঁড়ে মানুষ দেখেছি—এ যেন বিধাতার সৃষ্টিছাড়া।

সত্যি এমন মানুষ দেখিনি—শুনিনিও এমন মানুষের কথা। পৃথিবীতে আপনজন বলতে স্বামী আর একমাত্র কন্যা আর নাতি নাতনীরা যার সম্বল—সে কেন তাদেরই ওপর জড়ো করে রেখেছে ঘৃণার জঞ্জাল। যাদের না হলে সংসারের স্বাদ থাকে না, আলো জ্বলেনা, জীবন অরণ্যতুল্য তারাই ওর মনে জেগে দিয়েছে বিষের বাতি। দেখছি তো দুটি দিনে কি হলাহলই না উপচে উঠলো উপর তলায়। কি হালই না হয়েছে বাড়ীটার। নীচের তলায় আমরা পালাই পালাই ডাক ছাড়ছি।

মাত্র দুটিদিন—তারপর দেখলাম—একখানা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল দুয়োরে। বিছানার বাণ্ডিল আর টুকিটাকি কয়েকটি জিনিস নিয়ে সেই রোগা লোকটি রিকশায় চাপল। রিকশা চলে গেল। সদর দরজাটা বন্ধ হল দড়াম করে? উপরে চমকাল শব্দ। মিনিট কয়েক চুপচাপ সূচীপতন শব্দ শোনা যায় এমন নিস্তব্ধতা। তারপর অকস্মাৎ বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। কে যেন আর্ত্ত বেদনায় দুহাতে বুক চেপে ধরে ছটফট করছে। কাকে যেন তপ্ত শূল বিঁধিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিংবা এইমাত্র অতি আপন প্রিয়জনকে জন্মের মত চিতায় তুলেদিয়ে কে যেন তার শূন্যঘরে ফিরে এসে আছড়ে পড়েছে।

ছুটছিলাম উপরে—দিদি বাধা দিয়ে বললেন, থাম।

দেখবনা—কি হলো?

না এখন নয়। এখনই সামলে উঠবে। মনে করোনা দুঃখ ওর স্বামীর জন্য—ও নিজের কথাই ভাবছে।

বললাম, সে ঠিকই—নিজের কথা ভেবেই মানুষ দিশেহারা হয়। যাই না—দেখে আসি একবার।

যাও। দিদি বাধা দিলেন না।

• • • •

কল্পনার ছবিটা সামনে দেখলাম। বিন্ধ্যাচলী খড়ির চারপাইএর উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। ওর ভারি দেহটা কান্নার বেগে থরথর করে কাঁপছিল। থরথর সেই কান্নার কাঁপুনি। অস্থির আবেগে ও নিজেকে বিস্ফারিত করে খণ্ড খণ্ড করে দিতে চাইছিল।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভাবলাম চোখের জলে মনের উত্তাপ খানিকটা কমুক তারপর কথা বলব। ওর বেদনা আমার মনেতেও সঞ্চারিত হল। আমার চোখও আর্দ্র হয়ে উঠল।

মনের তারে তারে অদৃশ্য তড়িৎ স্পর্শ দিয়ে যাব কিনা বুঝিনা, কিন্তু একটি মনের বেদনা গভীর হলে আর একটি মনকে তা স্পর্শ করবেই। কিছু না বলেও শোকাহতকে সুস্থ করে তোলা যায় এও বহুবার লক্ষ্য করেছি। মনে মনে বললাম—ওর মনের ভার কমুক—ও সুস্থ হোক।

আশ্চর্য্য সেই মুহূর্ত্তে পাশ ফিরল বিন্ধ্যাচলী। আমাকে দেখল। দেখেই দুহাতে মুখ ঢেকে আবার আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না—এগিয়ে এসে ওর মাথায় একখানা হাত রেখে ডাকলাম—দিদি।

ওপাশ ফিরে আমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। আমার বলার আর কিছু রইলনা—দু'জনের চোখের জলে সান্ত্বনার কথাটা লেখা হয়ে গেল।

সেই দুর্বল মুহূর্ত্তে বিন্ধ্যাচলী তার মনের ভার মুক্ত করতে চাইল। বলল, তুমি তো ভিন্‌দেশী থাকনা এখানে, কিন্তু আজ তোমার কাছে যা পেলাম তাতে কিছুই লুকোতে ইচ্ছে করছে না। বড় লজ্জার কথা জ্বালার কথা—বলাও যায়না, কিন্তু কাউকে না বলতে পেরে আমি যে মরে যাচ্ছি!

বললাম, যদি লজ্জার কথা হয়—থাক।

ও প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, না না। একজনকেও যদি না বলতে পারি কেমন করে থাকব আমি! মানুষ তো পাথর নয়।

বললাম, তোমার জ্বালার কারণটা যদি বুঝতেই পেরে থাক তাহলে তো প্রতিকার হয়েই গেল।

ম্লান হেসে বলল বিন্ধ্যাচলী, সে জ্বালার প্রতিকার নেই। গঙ্গার স্রোত কি উল্টো দিকে বেয়ে। যা হয়ে গেছে তা শেষ হয়েছে। আচ্ছা তুমি তো রামায়ণ পড়েছ একটা কাহিনী নিশ্চয় মনে আছে। বেদবতীর উপাখ্যান।

বললাম, গল্পটা ঠিক মনে নেই রামায়ণ খুব বেশিবার পড়িনি।

ও বললে, রামচরিত মানস আমাদের প্রতিদিন পড়তে হয়। ওটা ছেলেবেলার অভ্যাস। তাছাড়া বোম্বাই থেকে একখানা আনিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই—প্রতিদিন পড়ে শোনাতেন। শুনে শুনে অনেক কহানী মুখস্ত হয়ে গেছে। এক একটা কহানী মনের সঙ্গে গেঁথে গেছে। যেমন ওই বেদবতীর কহানী। শোন।

এই মুহূর্তে গল্প শোনার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ওর মনের গতিকে ভিন্নমুখী করার ইচ্ছায় সায় দিলাম।

বিন্ধ্যাচলী বলল, রাবণ রাজা একদিন স্বর্গ জয় করে ফিরছিলেন, পথে পড়ল এক তপোবন। সেখানে এক পরমা সুন্দরী কন্যা তপস্যা করছিলেন। কন্যার রূপ দেখে দাঁড়ালেন রাবণ। রাক্ষসের কামনা জেগে উঠল তাঁর মনে। কন্যাকে লাভ করার ইচ্ছায় তাঁর কাছে এসে শুধোলেন—তুমি কে? এত অল্পবয়সে ভোগবিলাস ছেড়ে এমন কঠোর তপস্যা করছ কেন? কন্যা বলল, আমার নাম বেদবতী। আমি বৃহস্পতির পৌত্রী, নিশুম্ভ দৈত্য আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, মা সহমরণে গেছেন। আমি তপস্যা করছি নারায়ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য। রাবণ বললেন, ছি-ছি, সেই বুড়ো নারায়ণের জন্য তুমি দেহপাত করছ! সে কি তোমায় সুখী করতে পারবে। আমি লঙ্কার রাজা রাবণ - ত্রিভুবন জয় করে ফিরছি—আমাকে ভজনা কর রাজ্য ঐশ্বর্য সব তোমার পায়ে লুটিয়ে দেব। বেদবতী ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কামনায় তখন তিনি পশুর মত হয়েছেন। বলপূর্বক কন্যার ধর্মনষ্ট করে ফিরে গেলেন রাবণ। তপস্যা ভঙ্গ হল, ধর্ম নষ্ট হল কন্যার সারাদেহে জ্বলে উঠল আগুন। প্রতিজ্ঞা করল কন্যা—যেমন করে হোক রাবণকে এই দুষ্টতার শাস্তি দেব। এ জন্মে হল না—জন্মান্তরে এর শোধ নেব। আগুন জ্বেলে কন্যা দেহত্যাগ করল।

একটু থেমে বিন্ধ্যাচলী বলল, জান বহিনজী—এই পৃথিবীতে এমন কত শত বেদবতী রয়েছে যাদের কুমারী ধর্ম নষ্ট করেছে রাবণের মত পশুরা। তাদের সর্বাঙ্গে জ্বালা, তবু তারা পুড়ে মরতে পারছে না। বেদবতী এই কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করেছিল—জন্মান্তরে সে-ই যেন রাবণের মৃত্যুর হেতু হয়। সেই কামনা তার পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু কলিকালের বেদবতীদের সে পথ বন্ধ। তারা দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরছে পশুদের সাজা দিতে পারছে না।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল বিন্ধ্যাচলী। দু'হাতের মুঠো বেঁধে কোন অদৃশ্য শত্রুকে যেন শাসন করল তারপর দ্রুতপায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

আমি তো স্তম্ভিত। ও কি নিজেকে বেদবতী কল্পনা করে নিয়েছে? তাহলে অত্যাচারী রাবণ রাজা কে? ওর স্বামী? সেই নিরীহ চেহারার নির্বাক মানুষটি? আশ্চর্য!

• • •

এরপর একদিন দেখলাম বিন্ধ্যাচলীর মেয়ে জামাই এলো। সঙ্গে তিনটি নাতিনাতনী। কমবয়সী মেয়ে জামাই, বাচ্চা তিনটি এক বছরের পিঠোপিঠি। দুষ্টুমিতে ওদের জুড়ি নেই।

বিন্ধ্যাচলী যেন নূতন জীবনে ফিরে এলো। প্রথম দিনকয়েক কী খাওয়ানো-খাওয়ানোর ধুম! ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি লাফালাফি ওদের কত রকমের খেলনা পুতুল কিনে দেওয়া, রিকশা করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, নতুন নতুন পোষাক, খাবার দেখে অবাক হলাম। একটি উৎসবাদী হৃদয়ের মধ্যে এত ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল। কিন্তু এসব ক'দিনের জন্যই বা! অতঃপর হাওয়া বদলাতে লাগল—আরম্ভ হল খিটিমিটি। তর্জন-গর্জন—শাসন-প্রহার। উঠতে বসতে খাওয়া পরার খোঁটা—জামাই-এর কর্মহীনতা নিয়ে বক্রোক্তি। কলহ কচকচি বাড়তেই লাগল। একদিন চরমে উঠল ঘটনা। সারাদিন উপবাসী রইল মেয়ে জামাই। বাচ্চা-গুলোকে খাইয়ে দিলেন দিদি। মেয়েকেও অনুরোধ করলেন খেতে।

মেয়ে কেঁদে বলল, না চাচী, এ বাড়ীর অন্ন মুখে দেব না।

অন্ন তো তোর বা দিচ্ছেন না।

তা হোক—এ বাড়ীতে বসে আমি খাবনা—খাবনা—খাবনা। বলতে বলতে ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। জান চাচী, মায়ের মতলব আমি জানি। ও আমাকে বিষয়-সম্পত্তি কিছু দেবেনা, তাই ছল করে তাড়াতে চাইছে।

দিদি বললেন, মুখে যাই বলুক বিষয়সম্পত্তি তোকেই অর্শাবে। আইন তোর দিকে।

মেয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বলল, তুমি জাননা চাচী—অনেকদিন আগে থেকে সব ঠিক হয়ে আছে। আমার আব্বা লেখাপড়া করে ঠিক করে দিয়ে গেছে। আদালতের টিপ ছাপ ইলাহী সইসাবুদ সব ঠিক আছে।

তুই জানিস সব?

জানি।

তা ও তোকে নাই দিক সম্পত্তি তোর বাবার নামে থাকলেই—

বাবার নামে তো নেই—আব্বাকে দিয়ে ওসব নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। ওর অবর্তমানে বিষয় পাবে চাচা।

চাচা? সে আবার কে?

আব্বার ভাই-এর ছেলে রায়বিলাস। দেখনি কিউগঞ্জে যার কিতাবের দোকান আছে। দোকানের অবস্থা ভাল নয়—ওদের অবস্থাও পড়ে গেছে। তা ভাবনা কি ওদের। মা-তো সেই ব্যবস্থা করেই রেখেছে। এই মোকাম আর ফেতিখামার নগদ টাকাকড়ি সবই তো ও পাবে।

কেন? ও কি তোর মাকে অসময়ে দেখাশোনা করবে?

না-না, বুঝছ না—সে তারি সরলের বাত আছে। শুনতে চেয়ো না। ধর্ম এর বিচার করবেন। ও যেমন আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে—আঙুল মটকে শাপ দিতে লাগল মেয়ে।

ও চলে গেলে দিদিকে বললাম, কি ব্যাপার—বিন্ধ্যাচলীর স্বভাবচরিত্র কি ভাল নয়?

দিদি বললেন, না—না, ও খাঁটি মেয়ে। কিন্তু মেয়েটার কথাও তো অবিশ্বাস করতে পারছিনে। তবে নিছক গায়ের জ্বালায় এমন একটা কলঙ্ক রটাচ্ছে মনে হয় না। সেই কলঙ্ক ওরও তো। বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপার।

* * *

ঘটনার শেষ এইখানেই নয়—মেয়ে জামাই চলে যেতেই সেটা শাখা পল্লবে ঘটপাছের আকার ধরল।

সত্যিই সেটা বটগাছ। তার অন্ধকার ছায়া ঘিরে বিন্ধ্যাচলীর পথে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিবেশিনীরা এখন কদাচিৎ এ বাড়ীতে আসে। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেশ দূরত্বে চলে গেল।

দিন কয়েক শুদ্ধ হয়ে রইল বিন্ধ্যাচলী। তারপর একদিন দেখা গেল—পোটলা পুঁটুলি বাঁধছে—কোথায় যাবার তোড়জোড় করছে যেন। ওকি বাপের বাড়ী চলেছে? না, সে পাট তো বহুদিন চুকে বুকে গেছে। বাবা মা বেঁচে নেই—ভায়ের সংসারে বোনের আদর কতদিন!

চলে যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। বলল, আমার ফুপুতো বহিনের বাড়ী যাচ্ছি মোরাদাবাদে। থাকব—যতদিন ভাল লাগবে। চাবিটা রইলো তোমার কাছে—চাকরটাকে দিয়ে ঘর দুয়োর সাফ সুতরো করিয়ে রেখো।

দিদি বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁরও কৌতূহল ছিল। ভদ্রতাবোধে কিছু শুধোতে পারলেন না। ওর মনের ভাব বুঝে বিন্ধ্যাচলী বলল, তুমি তো জানই বহিনজী তামাম দুনিয়ায় আমার সঙ্গে কারও দোস্তি নাই এই দৌলতই হয়েছে আমার কাল। কিন্তু এ-ও বলি দৌলত যদি না থাকত আমাকে ওরা ছেঁড়া কাগজের মত কি পথে ফেলে দিত না? আমার স্বামী শত্রু, মেয়ে জামাই শত্রু, ওই নাতি নাতনীরা বড় হলে—ওরাও শত্রু হবে। ওরা সবাই আমার মরণ কামনা করে। কিন্তু আমি শীগ্‌গির মরছি না, বিষের জ্বালায় ওদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব।

বলতে বলতে ওর দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখের রেখায় রেখায় ফুটলো ঘৃণা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, না হলে মেয়ে হয়ে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছে অতি পরও তা পারে না। হিংসুক কোথাকার।

দিদি বললেন, কিন্তু দিদি এসব বলার সুযোগ তুমি দিচ্ছ কেন?

আমি সুযোগ দিয়েছি। এমন চোখে চাইল—যাতে মনে হল এখনই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু পরমুহূর্তে ওর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো—কণ্ঠস্বরও নেমে গেল নীচু পরদায়। বলল: বহিন, সবকথা বলার নয়—বলতে পারছি নে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। এ আমারই অদৃষ্ট! ভুলও বটে। কেন বেহুঁশ হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে পারলাম না। তখন যদি এখনকার বয়স পেতাম বুদ্ধি পেতাম—হয়ত সেই পথে যাবার সাহস হতো। কিন্তু তখন যে আমি খুব ছেলেমানুষ!

দু'হাতে মুখ ঢেকে ও বসে পড়ল মেঝের উপরে। ফুলে ফুলে অবশ্য কাঁদল না—মৌন থেকে সেই দুঃস্মৃতিকে যেন দূরে সরিয়ে দিতে চাইল।

পরের দিন ভোর বেলাতে রিক্সার টুংটাং ঘন্টির আওয়াজ কানে এলো। জানালা দিয়ে দেখি—জিনিসপত্র নিয়ে রিক্সার উপর উঠে বসেছে বিন্ধ্যাচলী আমাদের দেখে হাত উঠিয়ে একটু হাসল।·· কি বলল—শুনতে পেলাম না। টুংটাং আওয়াজ তুলে রিকশাটা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

কাহিনীটা এইখানে মিলিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল না। কারণ আর কয়েকদিন মাত্র ওখানে ছিলাম। সাক্ষাৎ সংস্পর্শে যে কৌতূহল ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছিল—তাও নূতন তথ্যের অভাবে স্তিমিত প্রায় হয়ে আসছিল। শুধু এক একবার মনে হতো যে কথা বলতে চেয়েছিল বিন্ধ্যাচলী তা বলতে পারল না কেন। কিসের সঙ্কোচ ওকে মুখ খুলতে দিল না! ওকি সত্যই নির্দোষী? রামায়ণের গল্প শুনিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল এক দানবের অত্যাচারে গড়ে উঠেছিল বিরূপ মনোভাব। আমরা দুই বোনে কয়েকদিন ধরে এ নিয়ে আলোচনা করলাম পরে কৌতূহলটা আর তেমন প্রখর রইল না।

মাস কয়েক পরে আত্মীয়ার এক পত্র পেলাম। সেই পত্রে বিন্ধ্যাচলীর কথা ছিল। বিন্ধ্যাচলী নাকি উইল করে বিষয় সম্পত্তির একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা ওর স্বামী অথবা মেয়ে জামাই মানে নি। ওরা আদালতে আপত্তি জানিয়েছে—উইলটা মিথ্যে। প্রয়োচনার বশে। অপর পক্ষের উকীলদের অমন একটা আইন বিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটেছে। না হলে কে না জানে স্ত্রীর উত্তরাধিকারী থাকতে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কি করে বিষয় সম্পত্তির মালিক হতে পারে।

এটা কি সূত্রে ঘটল সেই মানিকর ইতিহাস ওরা আদালতের সামনে তুলে ধরেছে। অপর পক্ষও জবাবদিহি করেছে। কিন্তু সমস্ত কাণ্ডটাই হচ্ছে স্বামী ছোড়াছুড়ির ব্যাপার, ভারি নোংরা। অপর পক্ষ নাকি বিন্ধ্যাচলীর হাতে লেখা একখানা ডায়েরীও দাখিল করেছে আদালতে। তার থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছে এটা মোটেই অসম্ভব হয়নি। মূল ঘটনা জানা থাকলে অনায়াসে বুঝা যায় একটি মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য এক পশু যেমন কৌশল করে ফাঁদ পেতেছিল। মেয়েটির কুমারী মনের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার পরিণতিতে এমন আপাত-অসঙ্গতিপূর্ণ উইলের সৃষ্টি। মেয়েটির মন এতদূর বিষিয়ে উঠেছিল যাতে করে নিজের গর্ভজাত কন্যাকে, ক্ষমা করতে পারেনি। সেই বিষের জ্বালায় স্বামীকে এবং মেয়েকে জ্বালাবার জন্যই এমন ধারা উইলের সৃষ্টি।

আত্মীয়ার চিঠি পেয়ে পুরাতন কৌতূহল মাথা তুলল। লিখলাম, মামলার শেষ ফলটা অবশ্যই জানাবে। উৎসুক রইলাম।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি গত মামলার নিষ্পত্তি এত অল্প সময়ে হয় না। যেমনি মামলা চলে শম্বুক গতিতে। সম্পত্তি লাভের জন্য যে নালিশ জানায় অনেক ক্ষেত্রে তারা আর দখলীস্বত্ব নিতে হয় না। একটার পর একটা কোর্টে মামলা গড়াতে গড়াতে জীবনের দীপও নিভে যায়—কৌতূহল ফুরিয়ে যায়।

মাস কয়েক পরে আত্মীয়া লিখেছিলেন, মামলা ছোট আদালত থেকে বড় আদালতে গেছে। ছোট আদালতে হার হয়েছে বিন্ধ্যাচলীর। তোমার জামাইবাবু বলছেন—এ বাড়ী ছাড়ব। নিত্যি নতুন হাঙ্গামা ভাল লাগছে না শীগ্‌গির বাড়ী বদল করব। নতুন বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে নতুন ঠিকানা জানাব। পত্র দিও। বিন্ধ্যাচলীর বৃত্তান্ত বোধকরি এইখানেই শেষ হলো। ওর স্বামী আর কন্যা ফিরে এসেছে—উপরের তলাটা ওরা দখল করে আছে। বিন্ধ্যাচলী আমার পাশের একতলা ঘরটাতে থাকে। ও একাই উকিল ধর করে মামলা চালায়। বড্ড মেয়ে। এত যে গালাগালি তবু দেখানো কেলেঙ্কারি একটুও দমে নি। একটা মামলা হেরে গিয়েও দমে নি। বলছে সারব্য যায় যাক—ওদের কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেব না। ওরা শয়তান। মরুকগে ওরা—শীগ্‌গির বাসা বদল করছি।

তারপর বাসা বদল করে ওরা নতুন ঠিকানা জানিয়ে পত্র দিল। সেই পত্রে বিন্ধ্যাচলীর কথা ছিল না। আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলাম সেই বাড়ীটাকে।

মনোবিদরা বলেন, মনের সমুদ্রে যে জিনিস একবার এসে পড়ে তা নাকি কিছুতেই হারিয়ে যায় না। সমুদ্র গভীর, সমুদ্রতলা অন্ধকার সেখানে যদি লুকিয়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র একটা বস্তু কখনো কোন সময়ে তরঙ্গ উৎক্ষেপে সেটা ভেসে ওঠে আলোর ওপরে। কবি এই কথাটা বলেছেন আরও সুন্দর করে—'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা ছড়ায় তাদের যত হোক অনাদর'। সুতরাং বিন্ধ্যাচলীও আমার কৌতূহলের সীমানা থেকে সরে গিয়েও হারিয়ে গেল না—আবার একদিন ভেসে উঠল আলোর দরিয়ায়।

বছর কয়েক পরে সেই আত্মীয়ার আহ্বানে এলাহাবাদ গিয়েছি। এবারে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে গিয়েছি। নব-রাত্রির মেলায় বিন্ধ্যাচলে গিয়ে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন করে আসব। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর মনোরম—বেশিদূরও নয় এলাহাবাদ থেকে। ট্রেনে কিংবা মোটরে যাওয়া সুবিধা। আমরা একখানা মোটর ঠিক করে নিলাম।

নবরাত্রির মেলাটা এখানে জাঁকিয়ে হয়—বহু যাত্রীর সমাগম হয়েছে। যথারীতি দেবীদর্শন করে পূজা দিয়ে আমরা বিশ্রামশালার দিকে চলছিলাম। একদল যাত্রী আমাদের সামনে এসে শুধাল, তোমরা কি মাইজীর আশ্রম থেকে আসছ? আমাদের বাতলে দাও কোন দিকে যাব?

আমরা বললাম, মন্দির তো ওই দিকে। বলে পিছনে হাত ইশারা করলাম।

ওরা মাথা নেড়ে বলল, মন্দির মালুম আছে আমরা মাতাজীর আশ্রমের কথা শুধোচ্ছি।

একজন পাণ্ডা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে বললে, ও অচলা মাতাজীর আশ্রমে যাবে? এই দিকে। এস আমার সঙ্গে।

আত্মীয়া জিজ্ঞাসা করলেন, অচলা মাতাজী কে?

পাণ্ডা বলল, তিনি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না এক তপস্বিনী। একবার দৃষ্টিপাত করে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে পারেন। দাওয়াই নিতে আসে অনেকে।

সুতরাং বিশ্রামাগারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা যাত্রীদলের অনুবর্তী হলাম। পথটা পাহাড়ের উৎরাইএর একটি গুহামুখে এসে শেষ হয়েছে। গুহার সামনে বেশ খানিকটা সমতল প্রশস্ত জায়গা ছায়াস্নিগ্ধ বট ও বেল গাছের মহিমায় এবং কয়েকটি গোলাপ গাঁদা ও সাদা টগর ফুলের শোভায় আশ্রমের রূপ নিয়েছে। বেল গাছের নীচের একটি বেদী। বেদীর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আলপনা দেওয়া এবং বেদীর উপরে একটি বাঘছাল বিছানো। বাঘছালের উপরে একটি কাঠের আসনে ফুল দিয়ে সাজানো একজোড়া খড়ম। একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে তার পাশে। ত্রিশূলে সিঁদুর মাখানো, কয়েক গাছা টগর মালতী ও জবা ফুলের মালা জড়ানো। বেদীর নীচের একটি আসনে বসে আছেন মাতাজী গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী। তাঁকে ঘিরে বহু ভক্তিমান ও ভক্তিমতী বসে আছে।

মাতাজী কথা কইছেন না, দর্শনার্থীরাও নীরব। এইমাত্র কোন তত্ত্ব কথা হয়তো শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে তার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে স্থানটিতে।

আমরা সামনে এসে বসলাম। একটু পরে আত্মীয়া আমার পা টিপে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, মাতাজীর মুখের পানে ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি—চিনতে পার?

বেশবাস ও পটভূমিকা বদলে গেলেও চিনতে দেরী হল না। বিন্ধ্যাচলী। চেহারাটা বেশ উজ্জ্বল, দৃষ্টিতে প্রশান্তির ছায়া, মুখে সূক্ষ্ম একটি হাসির আভাস।

বিন্ধ্যাচলীও চাইল আমাদের দিকে। দৃষ্টিতে পরিচয়ের আলো উজ্জ্বল হলো। পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করল না। বলল, একটু বসবে তো বহিনজী? সব কুশল?

এইবার যাত্রীরা নিজেদের কথা বলতে লাগল। আধিব্যাধি, সাংসারিক দুঃখকষ্ট, আধ্যাত্মিক মার্গের কঠিনতা নানা প্রসঙ্গ উঠল। মাতাজী তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে গেলেন—উত্তর দিলেন না। বললেন, ভগবানের নাম কর, সত্যপথে চলবার চেষ্টা কর, সরল হও—কোন কষ্ট থাকবে না।

কথা শেষে যাতাজী উঠে দাড়ালেন যাত্রীদল, উঠল। আমরাও উঠছিলাম—যাতাজী বললেন, একটু থেকে যাও—গুহার মুখে গিয়ে বস।

যাত্রীদের বিদায় দিয়ে আমাদের কাছে এসে বসলেন। কোন ভূমিকা না করে বললেন, বহিনজী, তোমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম কতকগুলি কথা বলব বলে, এখন শুনতে চাও তো শোনাতে পারি।

আত্মীয়া বললেন, এখনও সে সব কথার প্রয়োজন আছে কি! আপনি তো সংসার ছেড়েই এসেছেন।

বিন্ধ্যাচলী হেসে বললেন, হাঁ—বাইরের পোষাকটা তাই আমার বটে! এতক্ষণ বসে থেকে কি বুঝলে? সংসার ছাড়তে পেরেছি?

আত্মীয়া বললেন, সংসারের কথা আপনাকে শুনতে হয় বাধ্য হয়ে—তা বলে ওতেই তো জড়িয়ে নেই আপনি।

কে বললে এ কথা? এখনও এলাহাবাদের মানুষ দেখলে আমি খুশি হই—দেশের কথা জিজ্ঞাসা করি।

কিন্তু বাড়ীর কথা আত্মীয়স্বজনের কথা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করেন না?

না—তা করিনা। কারণ সেই দিক থেকে ভগবান আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা বহিনজী, আমার সম্বন্ধে কোন কথা কি আপনাদের কানে যায়নি? যশ নয়—কলঙ্কের কথা? বলে হাসতে লাগলেন।

আত্মীয়া বললেন, সে কথা শুনে লাভ কি দিদি?

বিন্ধ্যাচলী বললেন, লাভ! একটু আছে বহিনজী। তুমি তো আমায় ভালবাস—সেই কথাগুলো শুনে কষ্ট পাও; কিন্তু কথাগুলো যে মিথ্যে এ জানলে তো কষ্ট হবে না। তোমার কষ্ট না হলে আমি যে আনন্দ পাব বহিনজী।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি না-ই বল—আমি জানি সবাই কি বলাবলি করে। ওরা বলে—বিন্ধ্যাচলী আসলে খারাপ মেয়ে—সে উইল করে যাকে বিষয় সম্পত্তি দিয়েছে সেই ওর পেয়ারের মানুষ। কেমন, এইসব কথা তো?

হাসতে লাগলেন বিন্ধ্যাচলী। হাসতে হাসতেই বললেন, বাদ্ধাধনরা ভারি জব্দ হয়েছেন। মামলার শেষ রায় নিশ্চয় শুনেছ ওপরের আদালতে আমার জিত হয়েছে। সেই রাগেই ওই কথাটা সহরে জোর রটে গেছে।

আত্মীয়া চুপ করে রইলেন। বিন্ধ্যাচলী বলে চললেন, আসলে গোড়াতেই যে ভুলটা হয়ে গিছল সেটার খবর কেউ রাখেন না। মানে যাকে বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গিলাম—সেই ভূতভূতো দেওরের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় প্রথমে। সম্বন্ধ করেন আমার শ্বশুরমশাই। কিন্তু তাঁর গুণধর ছেলে বিয়ের আগে এমন এক কাণ্ড করে বসল যাতে করে ঘটনাটা ঘটলো উল্টো। ওই ছেলে কৌশল করে আমাকে নষ্ট করল। আমার বাপের কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া শ্বশুরও আমার বিয়েতে যৌতুক বলে একখানা বোকায় লিখে দেবেন বলে ছিলেন। ওর ভাইয়ের অবস্থা তো ভাল ছিল না—থাকত ওরা খাপড়ায় খোপড়ীতে। যা হয়ে থাকে, জাত-ভাইয়ের সঙ্গে এদের বনিবনাও ছিল না। ওরা চাইছিল বিয়েটা যাতে না হয়। সেই মতলব করেই একদিন পরবতের সঙ্গে কি মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে

দিয়েছিল। আমার অচেতন অবস্থায় ওর পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছিল। তার ফলে গর্ভে এলো ওই মেয়ে। সে ঘটনা কেউ জানত না। এদিকে বিয়ের তোড়জোড় চলছে। এক প্রস্থ পোষাক উপহার এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে। গয়নাও উপহার হয়েছে বাড়ী থেকে। একটি রাত্রির খেলা শেষ হয়ে গেছে, থাকবে কেন? আমি কিন্তু লজ্জা করে চুপচাপ রইলাম না। বাবাকে সব খুলে বললাম। বাবা আকাশের মত ফুটে বেরুলেন আমার শ্বশুরের কাছে। শ্বশুর ছিলেন মহাপুরুষ লোক। সব শুনে তিনি বললেন, আপনি স্থির হোন—এ বিয়ে হবেই। আমার ছেলের সঙ্গেই হবে। সব ঠিক করে ফেললেন। বিয়ে হয়ে গেল। আমি কিন্তু সেই বিয়ে মেনে নিতে পারিনি বহিনজী। যে আমার দেহ-মন নোংরা করে এমন একটা কলঙ্কের ভার চাপিয়ে দিয়েছিল তাকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারলাম না। কেবলই মনে হতো আমি ভ্রষ্ট হয়েছি ধর্ম থেকে। কুমারী ধর্ম থেকে—সতী ধর্ম থেকে।

আত্মীয়া বললেন, কেন ওই সব কথা ভাবতেন? যাতে সতীধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না হন—সেইজন্যই তো আপনার শ্বশুর অমন ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিন্ধ্যাচলী হেসে বললেন, কাকে সতীধর্ম বলছ বহিনজী! যাকে দেহ দিয়েছি অজ্ঞানে অনিচ্ছায়, তাকেই জীবন ভোর দেহদান করতে হবে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান আর মন্ত্রের জোরে। মনটা বুঝি কিছু নয়?

কিন্তু দিদি, সেই মন তো আপনি আর কাউকে দেননি।

বিন্ধ্যাচলী বললেন, একজনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে মেয়েদের মন কোথায় থাকে বহিনজী? কার কল্পনা নিয়ে তারা খোয়াব দেখে? সেই পবিত্র চিন্তাই কি তাদের সতীধর্ম নয়।

আত্মীয়া বললেন, তাহলে ছেলেটিকে ভালবেসেছিলেন?

ভালবাসা! আশ্চর্য কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বিন্ধ্যাচলী। না ঠিক ভালবাসা নয়। কিন্তু ওই সব আলোচনার মধ্যেই একজন দেবতা হয়ে মনের মাঝে আসছিল। সে মূর্তি সম্পূর্ণ হবার আগে দেহমন কলুষিত হল। আমি বিয়ের মন্ত্র মেনে নিতে পারিনি, ভালবাসতে পারিনি শ্বশুরকে। ভালবাসতে পারিনি মেয়েকে। ওতো সেই বিষবৃক্ষেরই ফল।

হাওয়াটা কেমন শ্বাসরোধকর হয়ে উঠল—আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে আত্মীয়া বললেন, আজও এসব কথা আপনার মনে হয় দিদি?

আজ তো আমি সংসারে নেই। আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি, প্রতিশোধ নিয়েছি—ওদের কথা আর ভাবি না।

আত্মীয়া আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কারও কথা আপনার মনে হয় না? যাকে বিষয় সম্পত্তি দিয়ে এলেন—একদিন যাকে মনে মনে—

বাধা দিয়ে বিন্ধ্যাচলী বললেন, না—না। সেই মায়াবন্ধন থেকে সেই আমায় মুক্তি দিয়েছে বহিনজী তার সংসার সে পেয়েছে। বউ, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী। অর্থের অভাব ছিল—তাও মিটেছে। সে সংসারে আমার মূল্য কি।

আত্মীয়া আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাহলে আপনিই তাকে ছেড়ে চলে এসেছেন?

এসেছি। একটু থেমে বললেন বিন্ধ্যাচলী, সেকি কোনদিন চেয়েছিল আমাকে? সে আমাকে ঘৃণাই করেছে।

সুধা! কেন—কেন? তারই জন্ম আপনার এই দুঃখ—

হেসে ফেললেন বিন্ধ্যাচলী। আমার দুঃখ সে জানবে কেমন করে। যে মেয়ে বিয়ের আগে অন্তরে বেহদান করে তার সম্বন্ধে কেউ কি উচ্চ ধারণা পোষণ করে? সংসারী মানুষ এত উদার হয়। হঠাৎ বিয়ে বদল হওয়ায় অনেক কথাই তো রটেছিল।

আত্মীয়া বললেন, কিন্তু যখন তাকে সম্পত্তি ফিরে দিলেন—

সে কি জানল কেন দিলাম। সে বুঝল—আমার পক্ষে মানে তার চাচা এমনই একটা উইল করে নিয়েছিলেন যার ফলে ওটা তার ন্যায্য পাওনা। যাক, সে যা হবার হয়ে গেছে ও নিয়ে আমি আর ভাবি না। এই তো ভাল হয়েছে। অন্তের সংসারে অশান্তি এনে আমিই কি সুখী হতে পারতাম।

আত্মীয়া বললেন, যাক শুনে সুখী হলাম, আপনি যে শান্তি পেয়েছেন—

কথা শেষ হবার আগেই উঠে পড়লেন বিন্ধ্যাচলী ওঘরের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলেন। যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, একটু বস তোমরা মায়ের প্রসাদী ফলমূল আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মনে হল, ওর কণ্ঠস্বরে এতটুকু খুশির আমেজ ছিল না।

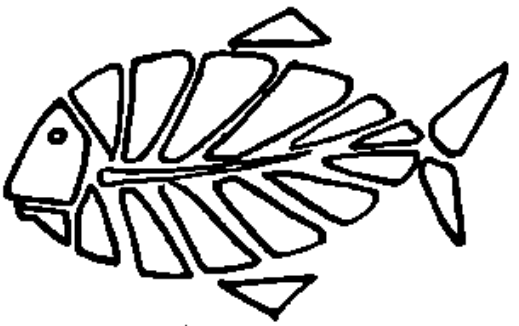

এই প্রথম

[যন্ত্র-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এইভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। যাঁদের ভেতরে প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এই করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবে না তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

জীবন বিচিত্রা

শ্রীমতী সুধা সেনগুপ্ত

(১)

দীপালী একবার চারধারে তাকিয়ে দেখল। ডিপার্টমেণ্টে কেমন একটা ঝিমুনী ভাব এসেছে। কেউ কাজ করছে না। আর আধঘণ্টা পরেই টিফিন। কিছুক্ষণের জন্যে কাজের বিরতি। দীপালী টিফিনের সময়েও কাজ করে। ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে। সে এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার সারা বুক জুড়ে কি জ্বালা রয়েছে, লোকেরা তা জানে না। দুবছর হল দীপালী চাকরীতে ঢুকেছে। চাকরী করার দরকার ছিল না। চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকতে পারেনি। বাবা আপত্তি তুলেছিলেন, মা বারণ করেছিলেন, দীপালী কারো কথাই শোনেনি।

দীপালী বিধবা। তিনবছর হল ওর স্বামী বিভাস মারা গেছে। বিভাস এম. এ. করেছিল। ব্যাঙ্কে চাকরী করত। পাঁচশো টাকা মাইনে পেত। বিভাস মামার বাড়ীতে মানুষ। বিয়ের পরও মামার সংসারেই ছিল। মামার ছেলেপুলে নেই। কিন্তু বিয়ের একবছর পরেই সে মারা গেল। টি. বি. হয়েছিল। যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে দিল, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, বিভাসকে বাঁচাতে পারা যায়নি। মামা মামীমা অবশ্য দীপালীকে বাড়ী ছেড়ে না যেতে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধ রাখতে পারেনি দীপালী। সে বাবা মার কাছে ফিরে এসেছিল।

দীপালী বি. এ. পাশ। সে ভেবে দেখল, চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকা যাবে না। আগে ঠিক করল, সে মাষ্টারী করবে। কিন্তু সারাদিন বক বকতে হবে। সে তখন অফিসে অফিসে দরখাস্ত পাঠাতে লাগল।

বছরখানেকের ভিতরেই সে একটা বেসরকারী অফিসে চাকরী পেয়ে গেল। ক্লাইলিং ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল এখন অফিসার ইন চার্জের পি. এ.।

দীপালীরা তিন বোন। দীপালী বড়, শ্যামলী মেজ, চৈতালী ছোট। শ্যামলীর বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী রেলের অফিসার। ভাল মাইনে পায়। একটি মাত্র ছেলে। বোনেদের মধ্যে দীপালীই সুন্দরী। শ্যামলীর রং কালো। দীপালীর বিয়ে হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। শ্যামলীকে কেউ চট করে পছন্দ করছিল না। শ্যামলীর বিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। দীপালী কেরানীর হাতে পড়েছিল, শ্যামলীর স্বামী অফিসার। ছোট বোন চৈতালী বি. এ. পড়ছে। দুদিন পরে তারও বিয়ে হবে। দীপালীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। শ্যামলী সুখে আছে। দুদিন পরে চৈতালী নতুন জীবনের স্বাদ পাবে। কিন্তু দীপালী জীবনে কি পেল?

দীপালীর রূপ আছে, রূপের আগুন নিভে যায়নি, যৌবন আছে, হয়ত যাযাবরের দেহটার জন্যেই সে আজ ক্লাইলিং ক্লার্ক থেকে অফিসার ইনচার্জের পি. এ. হতে পেরেছে। ডিপার্টমেণ্টে এ নিয়ে ঢের আলোচনা চলে। অফিসার ইনচার্জ মিঃ মল্লিক বিপত্নীক। বয়স চল্লিশের মধ্যে। প্রিয়দর্শন চেহারা, রজনীগন্ধার পাপড়ির মতন গায়ের রঙ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, চোখ দুটো ভাষাময়, কথা কম বলেন। মিঃ মল্লিককে দীপালীর বেশ ভাল লাগে, ভাল লাগে তাঁর ভদ্র ব্যবহার, ভাল লাগে তাঁর সান্নিধ্য। দীপালী ভাবে, মিঃ মল্লিক কি মনে মনে তাকে কামনা করেন। তবে এটা ঠিক, মিঃ মল্লিক দীপালীকে পছন্দ করেন।

দীপালী বিধবা। সে মনে মনে অন্য পুরুষের কথা ভাবছে। হয়ত এটা পাপ। কিন্তু মাত্র একবছর যে পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে, তার ছবি কি চিরজীবন মনের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা সম্ভব? দীপালীর বয়স হয়েছে, রূপ আছে, তার দেহে যৌবনশ্রী সুলক্ষিত, অন্তরের কামনা বাসনা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। অফিসের ছুটির পর দীপালী মিঃ মল্লিকের সঙ্গে বেড়াতে যায়, তার বাড়ী ফিরতে রাত হয়। বাবা বকাবকি করেন, মা গম্ভীর হয়ে থাকেন, কোন উত্তর দেয় না দীপালী। শ্যামলী চিঠি লিখে জানিয়েছে, চাকরী ছুট ছেড়ে দে। তুই বিধবা, তোর ইজ্জত চলে যাবে। শ্যামলীর চিঠিখানা পড়ে দীপালী মনে মনে উচ্চারণ করেছিল:

When wealth is lost
Nothing is lost,
When health is lost
Somthing is lost.
When character is lost
Everything is lost.

দীপালী চাকরী ছাড়তে পারেনি। অফিসের ছুটির পর সে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাত করে বাড়ী ফিরছে।

(২)

শ্যামলী দীপালীর কথা ভাবল। দিদির জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। দিদিকে দেখতে ভাল। একরকম বিয়ে হয়েছিল। বিভাস ছেলেও খুব ভাল ছিল। ভাল চাকরী করত। এমন অসুখ করল, কেউ বাঁচাতে পারল না। এখন দিদিকে দেখলে মনে হয় না, ওর কোন দুঃখ আছে। বেশ সেজেগুজে অফিসে

যায়। শ্যামলী জানতে পেরেছে, দিদি অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে। অফিসার উন চার্জের সঙ্গে নাকি খুব বেড়ায়। শ্যামলী দিদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, চাকরীটা ছেড়ে দিলে মান ইজ্জত বাঁচবে। দিদি চিঠির উত্তর দেয়নি।

শ্যামলী জীবনে সুখী হতে পারেনি। শ্যামলীর স্বামী মলয় এম. এ পাস, রেলের অফিসার, আটশো টাকা মাইনে পায়। মলয়ের প্রিয়দর্শন চেহারা। লোকে জানে, শ্যামলীর ভাগ্য খুব ভাল। শ্যামলীর একটা বুকচেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। সে যদি দিদির মতন সুন্দরী হত! শ্যামলীর যদি মন ভোলানো রূপ থাকত, মলয় তাকে অবজ্ঞা করতে পারত না। শ্যামলী মলয়কে ভালবাসে। কিন্তু সেও মলয়ের কাছ থেকে ভালবাসা চায়, আদর চায়, সোহাগ চায়। নারীর জীবন ব্যর্থ হয়, যদি সে স্বামীর ভালবাসা না পায়। একটা বুকভরা প্রেম নিয়ে তাকে জীবনের পথে চলতে হবে। শ্যামলী আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে এমন নীল শূন্যতা। পেঁজা তুলোর মতন সাদা সাদা মেঘ যেন ভেসে চলেছে।

মলয় আজকাল রেসের মাঠে যাচ্ছে। সে রেস খেলছে। মাসখানেক আগে শ্যামলী মলয়ের জামার পকেট থেকে রেসের বই পেয়েছিল। শ্যামলী মলয়কে প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি রেস খেলছ? মলয় গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল, আমার পড়ার আমি খেলছি, তোমার কোন ক্ষতি হচ্ছে কি? শ্যামলী আর কোন কথা বলতে পারেনি। মলয়ের স্ত্রী সে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, মলয় বিপদের পথে যাচ্ছে, স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে সাবধান করে দেওয়া কি তার কর্তব্য নয়? যে অবুঝ, তাকে বোঝাবে কে? আজ রেস খেলছে, দুদিন পরে মদ ধরবে। বাবা, মা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন, মা চোখের জল ফেলবেন। মা, বাবা জানেন শ্যামলী বেশ সুখী।

শ্যামলীর মনে হল, দিদিকে চিঠি লিখে সে ভুল করেছে, দিদিকে চাকরী ছেড়েছিতে বলা উচিত হয়নি। কেন হীরালী পরের ওপর নির্ভর করে থাকবে সারাটা জীবন? এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। সে অন্যায় করেছে চিঠি লিখে। শ্যামলী দিদিকে জানাবে, দুদিন পরে শ্যামলীকেও চাকরী করতে বেরোতে হবে। মলয় যখন রেসের মাঠে যাচ্ছে, সে নির্বাক হবে। দিদিকে সব কথা খুলে বলাই ভাল। দিদি হয়ত মনে মনে হাসবে। দিদির কাছে আগের চিঠির জন্যে ক্ষমা চাইবে। বাবা যার কি সুখের জীবন! বড় মেয়ে বিধবা, মেজ মেয়ে বিয়ের পর সুখী হতে পারল না, ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, তার কপালে কি আছে কে জানে? শ্যামলী দিদিকে চিঠি লিখতে বসল।

(৩)

চৈতালীর এখন ক্লাশে যেতে ইচ্ছে করল না। বাংলার ক্লাশ ছিল। চৈতালী হয়ত ক্লাশে যেত, আজ দিব্যেন্দু কলেজে আসেনি। চৈতালীর কিছু ভাল লাগছে না। দিব্যেন্দু সকালে বলেছিল, মায়ের অসুখ করেছে। ওর মার হার্টের অসুখ আছে। দিব্যেন্দু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবা সাধারণ কেরাণী। দিব্যেন্দু ফার্স্ট ডিভিসানে পাশ করেছিল। স্কলারশিপ পেয়েছিল। কলেজে ফ্রীতে পড়ছে। বাংলায় অনার্স আছে। সে আশা করে, ফার্স্ট ক্লাশ পাবে। দিব্যেন্দু প্রাইভেট টিউশনী করে। সংসারের জন্যে কত ভাবে।

দিব্যেন্দু বলে, বাবার মুখের দিকে তাকালে বড় দুঃখ হয়। সারাজীবন কষ্ট করেছেন। আর দুদিন

বছর পরেই অবসর নেবেন। এতদিন কাজ করে তিনশো টাকার বেশীই হয়ে গেছেন। দিব্যেন্দুরা পাঁচ ভাই। চারজনই স্কুলে পড়ে। সকলেই লেখাপড়ায় ভাল। দিব্যেন্দু তিনটে ছেলেকে বাড়ীতে দিয়ে পড়ায়। ষাট টাকা পায়। তাছাড়া স্কুলের মাইনে ওই দেয়। কলেজের প্রিন্সিপাল দিব্যেন্দুকে খুব ভালবাসেন।

দিব্যেন্দুকে দেখতে সুন্দর। মাথায় প্রায় ছ'ফুট লম্বা, রোগা রোগা চেহারা, কিন্তু মানানসই, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, বড় বড় ব্যঞ্জনাময় চোখ দুটি, প্রশস্ত মসৃণ কপাল, এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল চেরা সিঁথি। দিব্যেন্দু বলেছে, সে চাকরী করবে না। বাবার মত কেরাণী হতে পারবে না। সে এম. এ. পাশ করে অধ্যাপনা করবে। চৈতালীও তাই চায়। সে মনে মনে আশা করে, দিব্যেন্দু কলেজের প্রফেসর হবে।

চৈতালীর ভয় হয়, বাড়ীতে ওর বিয়ের কথা প্রায়ই ওঠে। বাবা বলেছেন, ছ'মাস পরেই দশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি ম্যাচিওর করবে। একটা ভাল ছেলে পেলেই চৈতালীর বিয়েটা দিয়ে দেবে। কলকাতার বিয়ে হলে বিয়ের পরও পড়াশোনা করতে পারবে। আর বি, এ. পাশ করেই কি দুটো হাত বেশী গজাবে! সেই ত পরের ঘরে যেতে হবে, ঘুঁটি নাড়তে হবে। চৈতালী ভাবে, দিব্যেন্দুকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না। সে দিব্যেন্দুকে ভালবাসে। কিন্তু দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিয়েতে সামাজিক বাধা রয়েছে। দিব্যেন্দু বৈদ্য, চৈতালী কায়স্থ।

চৈতালী ভাবল, বিয়ে করে কোন দিদিই সুখী হতে পারেনি। দীপালীর ভাল বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দীপালীর নীড় ভেঙে গেল। সে বিধবা হল। দিদির জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। দিদি চাকরী নিয়েছে। বাবা বলেছেন, চাকরী করতে হবে না, মা বলেছেন, মেয়েছেলে কি পরের ঘরে চাকরী করতে যাবে, চৈতালী দিদিকে সমর্থন করেছে। দিদি চাকরী নিয়ে ঠিক কাজই করেছে। লেখাপড়া শিখেছে, কেন আজীবন পরের ওপর নির্ভর করে থাকবে। বিধবা হয়েছে বলেই কি চার দেয়ালের আড়ালে কাটাতে হবে? দিদি চাকরী করছে টাকা পাচ্ছে, নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নিচ্ছে। চৈতালীর মনে হয়, মেজদি শ্যামলী সুখী হতে পারেনি। শ্যামলীর বিষণ্ণ মুখখানা দেখে ত তাই মনে হয়। মলয় ভাল চাকরী করে, অনেক টাকা মাইনে পায়, শ্যামলী কালো বলে হয়ত মলয় ওকে পছন্দ করে না। পৃথিবীতে রূপটাই কি সব! মলয় বড় বড় কথা বলে, চোখের চাউনীতে কেমন যেন কামনার আগুন জ্বলে। চৈতালী মলয়কে এড়িয়ে চলে। চৈতালী ঠিক করেছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেকেই সে বিয়ে করবে। সে দিক দিয়ে দিব্যেন্দুই উপযুক্ত। কিন্তু বাবা মা কি রাজী হবেন? চৈতালীর কিন্তু ভাল লাগল না। সে বাড়ী ফিরে চলল।

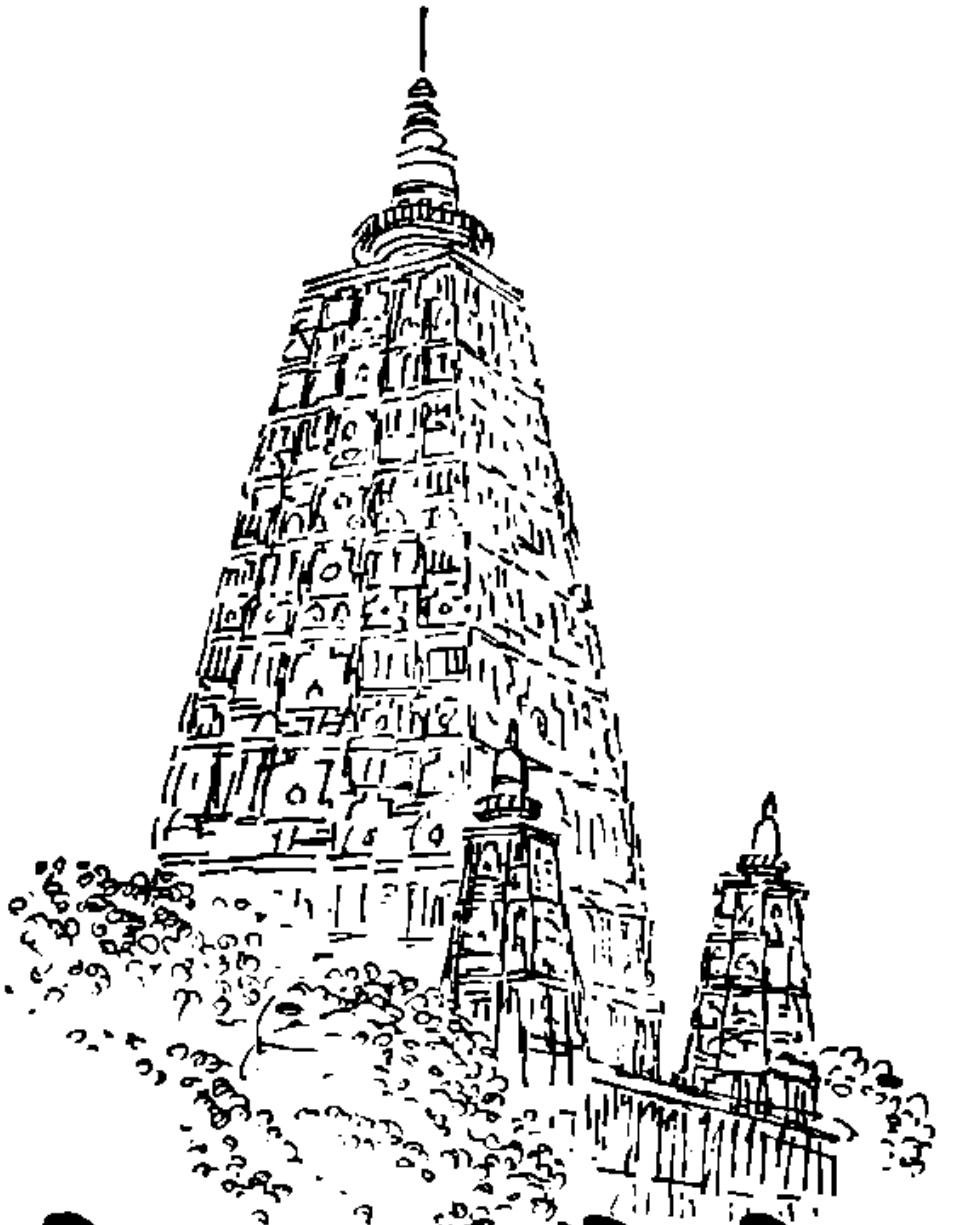

বিহারের সংস্কৃতি ও শিল্প

॥ গল্প ভারতী। কার্তিক ১৩৭৫ ॥

একদা বিহার ছিল বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। চিরদিনই বিহারের সঙ্গে বাংলার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বিহারের সংস্কৃতিকে বাংলা সর্বযুগে সর্ব প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। বিহারের পুণ্যস্থানগুলিকে বাঙালী নিজের দেশের পুণ্যতীর্থ বলেই মনে করে এসেছে সেদিন পর্যন্ত। বিহারেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালী স্থায়িভাবে বাস করেছে এবং সেই দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করেছে। বিহারের সরকারী ও বেসরকারী বহু উচ্চপদে বাঙালী বহুদিন ধরে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। বিহারে বসেই একাধিক প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক সাহিত্য জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

বিহারের নালন্দা, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, গয়া, প্রভৃতি স্থানগুলি বাঙালীর প্রাণে চিরদিন এক অপূর্ব ঝংকার তুলেছে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বাঙালী সেই সব তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে বিহারের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান বিহার। শুধু জন্মস্থান নয়, এইখানেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা সিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তিনি দিব্য আলোকে শুধু ভারত নয় সারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

বাঙালী কবি ও নাট্যকার বিহারের বহু পুণ্যশ্লোক সন্তানদের জীবনী নিয়ে লেখবার প্রেরণা পেয়েছেন।

এই সংখ্যায় বিহারের সংস্কৃতি শিল্প, তার পালপার্বণ এবং লোক-সাহিত্যের একটি কাহিনী দিয়ে এই বিশেষ বিভাগটি গ্রথিত হয়েছে।

বিহার

নীলকান্ত গুপ্ত

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!

ভারতের পূর্ব দিগন্ত সেই বৈদিক যুগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছিল তার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েছিল মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যগুলির সাংস্কৃতিক জীবন-যাত্রার রূপ।

আশ্বিন (পূজা) সংখ্যার গল্প-ভারতীতে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সংখ্যায়, ভারতীয় শিল্প শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বিহারের কথা কিছু বলা হল।

বিহারের ঐতিহ্য প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সবার উপরে তো বটেই, এই প্রদেশে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে শিল্প সংস্কৃতি ও শিক্ষার যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, এমন অন্য আর কোন প্রদেশেই হয় নি। বাংলা দেশ সেই আদিযুগেই বিহারের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিহারের বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অবদান নিজের করে নিয়েছিল। এই সূত্রে গল্পভারতীর পূজা সংখ্যায় 'বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"মগধের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, কারণ মগধ উত্তর বাংলার সংলগ্ন প্রদেশ এবং মগধ হইতেই একদিন বৌদ্ধধর্ম উত্তর বাংলার পথে বাংলার অন্যত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। মগধ বিশেষত মিথিলার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ভাষার মাধ্যমেও এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হইয়াছিল।"

যে দেশে শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, যে দেশে অশোকের মতো সম্রাট, চন্দ্রগুপ্তের মতো শাসক, চাণক্যের মতো কূটনীতিবিদ ও জ্ঞানী, বিদ্যাপতির মতো কবি তাঁদের সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে প্রেরণা দিয়েছেন, সে দেশের গৌরব কম সামান্য নয়।

আজ আমরা বিহার বলতে যে রাজ্যটিকে ইতিহাস ও ভূগোলের পৃষ্ঠায় বিধৃত দেখি সে রাজ্য কিন্তু কোন একটি সম্প্রদায় বা একমতাবলম্বী গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত নয়। উত্তরে বাস করে মৈথিলীরা আর দক্ষিণে মাগুডালরা। এই দুই সম্প্রদায়ের আচার, অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোজপুর, মিথিলা, অঙ্গ, মগধ এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী ভূমি—এই অঞ্চলগুলি নিয়ে বৃটিশ সরকার রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্যে 'বিহার' প্রদেশের সৃষ্টি করেছিলেন।

এক সূত্রে বাঁধা হলেও অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকাশে নিজস্ব ধারা আছে, একের সঙ্গে অন্যের সেখানে মিল নেই। অবশ্য প্রাচীন যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভিন্ন গোষ্ঠীগত ধারা ছিল না। নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র বিহারে শিক্ষার এক সুনিয়ন্ত্রিত ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল।

নালন্দা মহাবিদ্যালয়! মানব ইতিহাসের আদিযুগে সে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি, যার কোন তুলনা আজো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত পাটনা থেকে ছাপ্পান্ন মাইল দূরে অবস্থিত এই বিরাট বিদ্যাভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখে আমরা অবাক হয়েছি, স্থাপত্যশিল্পের সে কী চরম প্রকাশ তার মধ্যে নিহিত!

এই শিক্ষাকেন্দ্রে দশ হাজার সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীর বাস করার উপযুক্ত প্রকোষ্ঠাদি ছিল। সারা এশিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো! ভারতের এবং এশিয়ার প্রত্যেকটি ভাষার চর্চা এখানে হত, প্রত্যেক ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্যবৃন্দ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, এবং শুধু পঠন পাঠনই নয়, এখানে জীবন বিকাশের উপযোগী সর্ব রকম ক্রীড়া এবং প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সারা জগতের মধ্যে সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষামন্দির রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

এই প্রদেশের স্থাপত্যশিল্পের অন্যান্য নিদর্শন যথা মহাবীরের জৈন মন্দির, গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত হরমন্দির, বুদ্ধগয়ার মন্দির—এগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়!

সর্বভারতীয় সাহিত্যেও এই প্রদেশের অবদান বড় সামান্য নয়। চর্যাপদের গাথাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। ১৪ শতকে জ্যোতিশ্বর ঠাকুরের বর্ণ রত্নাকর, ১৫ শতকে বিদ্যাপতির পদাবলী এবং ১৭ শতকে উমাপতির পারিজাত হরণ আজো প্রাচীন ভারত-সাহিত্যের মধ্যমণি বলে বিবেচিত। আধুনিক কালে বিহারের বহু হিন্দি কবি ও সাহিত্যিক সর্বভারতীয় সম্মান লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন—১৮৭২ সালে প্রবর্তিত প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক "বিহার বন্ধুর" সম্পাদক কেশব রাম ভাট, প্রবন্ধ লেখক শিবনন্দন সহায়, রাম অবতার শর্মা, অক্ষয় ভাট মিশ্র, ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা, শিবপূজন সহায়, লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু, নাট্যকার বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠী, কেশবরাম ভাট, রাজ-রাজেশ্বরী প্রসাদ, জৈনন্দন কিশোর, কৃপানাথ মিশ্র, রামবৃক্ষ বেনিপুরী, ঔপন্যাসিক ভুবনেশ্বর মিশ্র, রাধিকারঞ্জন সিং, অনুপলাল মণ্ডল, নাগার্জুন, রাজকমল চৌধুরী, দিবাকর বিদ্যার্থী, কবি দিনকর, কেদার মিশ্র, প্রভাত, জানকী বল্লভ শাস্ত্রী এবং রাজকমল চৌধুরী।

এই রাজ্যের অধিবাসীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ-স্বরূপ আর এক বিষয়ে তাদের জীবনবিকাশের চরমোৎকর্ষ সাধন করেছিল, সে হচ্ছে তার নৃত্যকলা। বস্তুতঃ বিহারের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধারার যে নৃত্যছন্দের প্রচলন হয়েছিল সেই আদিযুগ থেকে, এই শিল্পের পরম প্রকাশের দিক থেকে তার তুলনা সারা ভারতে নেই বললেই হয়! বিচিত্র এবং কঠিন তালের আংগিক, বহু আয়াস ও সাধনার দ্বারা লব্ধ তালের অভিব্যঞ্জনা।

এই রাজ্যের লোকনৃত্যের তিনটি বিশিষ্ট ধারা আছে। একটির প্রচলন মিথিলায়, কবিদের গানের ধারাই যাদের সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি আদিবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ, প্রকৃতি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এদের উপজীব্য, তৃতীয় ধারার ক্ষেত্র হল দক্ষিণ বিহারের সেরাইকেলার ছাউ নৃত্য।

মিথিলায় নাচগান বাজনার বিশেষ কদর ছিল। ১৪ শতকে মহারাজা শিব সিংহ বিদ্যাপতির পদাবলী নৃত্যছন্দে রূপায়িত করবার জন্যে নর্তক ও নর্তকী নিয়োজিত করেন।

মিথিলার লোকনৃত্য প্রধানত ধর্ম ও লোকাচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় ঢোল সানাই পাখোয়াজ এবং ডঙ্কা। ধর্মীয় লোকনৃত্য রূপে এদেশে প্রচলিত নৃত্যগুলির নাম রামলীলা নাচ, ভাগবত নাচ, কীর্তনীয়া নাচ, বুঢ় নাচ, নারদীয় নাচ, বিদ্যাপত নাচ এবং পূজারতি নাচ।

বিহারের আদিবাসীরা হিন্দুসংস্কৃতির প্রসার এবং মিশনারীদের ব্যাপক কার্যকলাপ সত্ত্বেও নিজেদের বিশিষ্ট জীবনধারাকে এতটুকুও শিথিল করেনি। তাদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। তাদের চারটি মুখ্য নৃত্য-পরব, যথা, মাঘী পর্ব, ফাসিয়া পর্ব, বা পর্ব এবং কর্ম পর্ব। এদের মধ্যে পেশাদার নর্তক নর্তকীদের দেখা পাওয়া যায়। তাদের বলা হয় নাচনী এবং নাটুয়া।

পেরাইকলা খরসোয়ান অঞ্চলের ছাউ নৃত্য বরাবরই লোকনৃত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। ছাউ শব্দের অর্থ মুখোস। এই আপাদলম্বিত মুখোসে মানুষটাকেই শুধু গোপন করে না—স্ত্রী কী পুরুষ, তা অবধি বোঝবার উপায় থাকে না। এই নৃত্যে, রাজকুমার রাজ আত্মীয় এবং ঐ ধরণের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করে।

এক শ্রেণীর আদিবাসীর কাছে ছাউ হল শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং তারা মাঝে মাঝে মুখোস ব্যবহার করে না।

লোক নৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ গান। কিন্তু ছাউ নৃত্যে গান নেই। এই নৃত্যে শিল্পী শুধু নিজের অঙ্গভঙ্গী ও অভিব্যক্তির দ্বারা নৃত্যের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র থাকে, বীণা, বাঁশী ও ঢোল। অত্যন্ত কঠিন এই নৃত্য। শিল্পীকে শুধুমাত্র তার নৃত্যনৈপুণ্যের জোরে সাফল্য লাভ করতে হয়, গানের সাহায্য সে পায় না। শুধু তাই নয়, যন্ত্রের ব্যবহারও অতি পরিমিত।

পায়ের কাজ দিয়ে সাধারণত এই নৃত্য শুরু হয়, শিল্পী প্রথমে তালে তালে কখনো দ্রুত কখনো মন্থরলয়ে পা ফেলে ফেলে নৃত্যছন্দের একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারপর আরম্ভ হয় তার হাতের মুদ্রার খেলা। সেই সঙ্গে সারা দেহ, এবং মুখ ও মাথাও সমান তালে চলতে থাকে, সৃষ্টি হয় নৃত্যের সেই মহামন্ত্র:

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমণ্ডলে বাজিল চন্দ্রভানু,

জীবনমরণ-নাচের তরঙ্গ বাজাও অনুক্ষণ হে।

সিংভূমের সাঁওতালদের—শঙ্কর-পার্বতী নৃত্য

হাজারিবাগের মাটুয়া নৃত্যের শিল্পীগণ

রণসাজে ছৌ নৃত্যের শিল্পীবৃন্দ।

॥ বিহারের সংস্কৃতি ও শিল্প ॥

ভূয়াং নৃত্য।
বিচিত্র সাজে
সজ্জিত
নৃত্য কুশলী
সাঁওতাল
যুবকগণ

[মহাভারত রূপায়ণে

শাস্ত্রীয় নাচ : মুখোস পরিহিত।

বিহারের সংস্কৃতির কথা বলতে হলে তার পাল-পার্বণের প্রসঙ্গ স্বতই এসে পড়ে। এই নিবন্ধে ছোটনাগপুরের কয়েকটি লোক-পার্বণের কথা বলা হল। লেখক আজীবন ঐ অঞ্চলে বাস করেছিলেন, ছোটনাগপুর ও বিহারের তদানীন্তন কালের অনেক অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর লেখায় পাওয়া গেছে। এই রচনাটি ১৩১০ সালের ভারতী পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশেষ আলোচনায় সেই দুষ্প্রাপ্য লেখাটি পুনরুদ্ধার করে পাঠকদের উপহার দিতে আনন্দ বোধ করছি।

—গল্প-ভারতী সম্পাদক।

বিহারের পালপার্বণ

(ছোটনাগপুরের লোকউৎসব)

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিহারের এই অঞ্চলের পার্বণের মধ্যে করমা, জিতিয়া, দশহরা, গোধন, ছট, ফাগুয়া, প্রভৃতি প্রধান। ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে করমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহিলাগণ সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া থাকেন। রজনী সমাগমে যখন সুধাকরের রজতালোকে দশদিক ভাসিয়া ওঠে, তখন তাঁহারা স্নানান্তে পূজোপকরণ লইয়া বাহির হন। প্রফুল্ল কুসুম শোভিত দীর্ঘ শাখা বিস্তারী করম বৃক্ষতলে তাঁহাদিগের এই যত্নানীত প্রীতি ও ভক্তির উপহার নীত হয়। তৎপরে পুরোহিত সাহায্যে যথাবিহিত পূজার পর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন আর জলস্পর্শ করেন না। পরদিন প্রাতঃকালে এক মনোহর দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। দুইটি দল বাঁধিয়া স্ত্রীপুরুষে বাহির হইয়াছে, এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা মহানন্দে গান গাহিতেছে আর পুরুষেরা মাদর (খোল) বাজাইতেছে। এই নৃত্যগীত সমাপনের পর তাহারা গৃহে আসিয়া আহারাদি করিয়া থাকে, এবং এইরূপে করমার পার্বণ শেষ হইয়া যায়। ভ্রাতার মঙ্গলার্থে মহিলাগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অনার্য্য পার্ব্বতীয় জাতিদিগের মধ্যে এই পর্ব্ব প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন ইহা উচ্চ সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

করমার পরই জিতিয়া। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমাতিথিতে এই পূজার দিন। পূজা প্রকরণ প্রায় সমস্তই করমার ন্যায়, করমা বৃক্ষের পরিবর্ত্তে এই উৎসবে জিতিয়া দেবী পূজিত হইয়া থাকেন, এইমাত্র প্রভেদ। এই উৎসব উপলক্ষেও মহিলাগণ দেবতা পূজনোদ্দেশে নিশীথ সময়েই বাহির হইয়া থাকেন এবং তৎপর দিবস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গীত বাদ্যও হইয়া থাকে। সন্তানের মঙ্গল কামনাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

প্রতিমা পূজা এখানে প্রচলিত নাই। কিন্তু তাহা হইলেও দুর্গা পূজার দশমীর দিন এখানে আনন্দ কোলাহল প্রস্ত হইয়া থাকে। ঐ দিবস তাহারা আত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করে ও পরস্পরের প্রীতি উৎপাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ছোটনাগপুরবাসীরা এই পার্ব্বণকে দশহরা বলে। বলা বাহুল্য বঙ্গদেশীয় দশহরার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। দশহরার পরই গোধন। গোধন বঙ্গের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সমতুল্য। তবে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার দিন স্নানান্তে 'বোদিনীর' কাঁচা টেঁকিতে কুটিয়া লইয়া ঘরের দুয়ারে কাঁচা সিদ্দুর এই মন্ত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করে। ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ হইলে

ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করে এবং তাহার নিকট পরিতোষরূপে ভোজন করে। এতদ্ভিন্ন ঐ দিন ভগ্নীকে ভ্রাতার বিদ্যা কামনায় মসিপাত্র পূজা করাইতে হয়।

শরৎকালে ছোটনাগপুরে আর একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম ছট। কার্ত্তিক মাসের ১লা হইতে ৬ই পর্য্যন্ত এই পার্ব্বণ চলিতে থাকে। ছট উপলক্ষে দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষে সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে ছয় দিবস ব্যাপিয়া এই পূজা চলে। এই ছয়দিনের মধ্যে পাঁচদিন উপাসনা করিয়া বাটিতে স্নান করে বটে, কিন্তু ষষ্ঠ দিবসে তাহাদিগকে নদীতে স্নান করিতেই হইবে। স্নানান্তে ঠেকুয়া (একপ্রকার পিঠা) দান করিবার প্রথা আছে, এবং ইহা লইতে অস্বীকার করিলে সূর্য্যদেবকে অবমাননা করা হইয়া থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠানের পর উপাসনাকারীরা আত্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত হয়। এই সকল গান হিন্দিতে রচিত। এই পর্ব্বে মুসলমানেরাও যোগদান করে। ছোটনাগপুরবাসী হিন্দুদিগের ইহা একটি প্রধান উৎসব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই ইহা প্রচলিত দেখা যায়।

বসন্ত ঋতুর আগমনে ছোটনাগপুরবাসীদিগের হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরেনা। ফাগুয়া উপলক্ষে বাঙ্গালার ন্যায় তথায় নিরানন্দের কুৎসিত ছবি নয়নগোচর হয় না, এই দিবস তাহারা প্রাণ খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। মাতা, পুত্র, পিতা, বন্ধু সকলে এক নূতন আনন্দে মাতিয়া আবির লইয়া খেলা করে। ফাগুয়া উপলক্ষে যে নাচ গান হয়, স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই গীতে যোগদান করে। নিম্নে একটি হোলির গান দেওয়া গেল।

গোপিনীরা বলিতেছেন,—

বরজো জি যশোদা জি কানা।
হাম দধি বেচত যাতে বৃন্দাবন,
　　দারণ হাঁটলানা।
বরবস মোকে তোড় সুচকিয়া,
　　সে হি মুখমানা।

যশোদা ইহার উত্তর দিতেছেন,—

তোমায়তি গোয়া বহুত হায় রাধিকা,
　　যেয় গোপাল না যানা।
কেয়া জানে ইনো রক্তি যাতিয়া,
　　জানত খেলত খানা।

শ্রীকৃষ্ণ এই অভিযোগ শ্রবণ করিলেন,—

এতনা শুনকে আরে মনমোহন,
　　মরমোমে রোদন যানা।
যেয় যেইয়া হামকো বহুত খিজানা,
　　যারত যেন নিশানা,
উলট মরমে তোর হানা।

রাধা তাহাতে বলিতেছেন,—

মুরলীর ব্রজ বসধো না
যাই বসধো কঁহ হানা।
করব আমন মন মানা।

ফাগুয়া ব্যতীত আর একটি বসন্তোৎসব দৃষ্ট হয়, তাহাকে বসন্ত পঞ্চমী কহে। এই পার্ব্বণ ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীর দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত হয়। এই উৎসবকালে ছোটনাগপুরে একটি মেলাও হইয়া থাকে। ডালটনগঞ্জ হইতে ৮৪ মাইল দূরে হেও নামক স্থানে এই মেলা হয়। হাতি, ঘোড়া, গরু প্রভৃতির দৌড় ও অন্যান্য নানা প্রকার কৌতুকজনক ক্রীড়ার এখানে আয়োজন হইয়া থাকে। পালওয়ানদিগের কুস্তিও হয় এবং নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। এই মেলা বাঙ্গালির নিকট এক অভিনব ব্যাপার।

পূর্ব্বোল্লিখিত উৎসব ব্যতীত ছোটনাগপুরে আরও কয়েকটি পার্ব্বণ আছে, যথা—ছাতুয়াস, ঘোঠান, তিল পার্ব্বণ ইত্যাদি। ছাতুয়াস চৈত্র মাসে, ঘোঠান কার্ত্তিক মাসে ও তিল পার্ব্বণ পৌষমাসে হইয়া থাকে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ছোটনাগপুরবাসী হিন্দুরা হাসেন হোসেন পর্ব্বে যোগদান করিয়া থাকে।

এই হাসেন হোসেন পর্ব্বে প্রথম দিবস রাত্রিতে গান গাহিতে গাহিতে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া নদীতীর হইতে মাটী কাটিয়া আনে।

তৎপর দিবস কোন উৎসবের অনুষ্ঠান হয়না।

তৎপরদিন রাত্রিকালে সঙ্গীত করিতে করিতে কলাপাতা কাটিয়া আনা হয়।

পরদিন প্রাতঃকালে ছোট চেরাগ বাহির হয়, এবং তৎপর দিবস মহরম বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

"হোসেন হাসেন দুনো ভেইয়া,
চলে লড়াইয়া," ইত্যাদি

গাহিতে গাহিতে হিন্দুরাও মুসলমানদিগের অন্তর্বর্ত্তী হয়।

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ইহা একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

রঙ্গরসিকা দেবদাসী

বীরভদ্র

একদিন বিকালবেলায় দুই পণ্ডিত-বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মাঠ পার হয়ে তাঁরা মন্দিরের পথে প্রবেশ করেছেন এমন সময় দেখলেন, সেই মন্দিরের রূপবতী দেবদাসী পাশের গলি থেকে বেরিয়ে মন্দিরের সোপানে উঠে তাঁদের দিক মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল এবং মৃদু হেসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে মন্দিরের মধ্যে চলে গেল।

দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে দুই পণ্ডিতেরই মুখ প্রফুল্ল হল।

প্রথম পণ্ডিত মাথা দুলিয়ে বললেন—চমৎকার মেয়েটি, ওর মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার ছাপ আছে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মান্য করতে জানে। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো, মাথা নুইয়ে ও কেমন সুন্দর ভঙ্গীতে আমায় প্রণাম জানিয়ে গেল।

মৃদু হেসে দ্বিতীয় পণ্ডিত বললেন—বন্ধু, তোমার কথা আংশিক সত্যি। মেয়েটি প্রকৃতই সুন্দরী শিক্ষিতা এবং জ্ঞানী মানুষকে সম্মান দেখাতে জানে। কিন্তু তুমি একটি মস্ত ভুল করেছো। মেয়েটি তোমায় প্রণাম জানায়নি। সে প্রণাম করে গেল আমাকে।

প্রথম পণ্ডিত বললেন—তোমার কথা সর্বৈব মিথ্যে। সে আমায় প্রণাম জানিয়েছে। তোমার দিকে সে ফিরেও তাকায়নি। হাসবড়া হয়ে যাওয়া বললেই তো আর হল না।

কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দ্বিতীয় পণ্ডিত বললেন—হাসবড়া আমি না তুমি! শুধু হাসবড়া নয়, ভাঙ্গকামা। দেখেও দেখতে পাওনা। মেয়েটি আমাকেই প্রণাম করেছে।

প্রথম পণ্ডিত কণ্ঠনিনাদে কম যান না, হুঙ্কার দিয়ে বললেন—তুমি যতই চিৎকার কর বা লম্ফ ঝাঁপ, তুমি যে একটি প্রথম শ্রেণীর আহাম্মক, তাতে আর সন্দেহ নেই।

—আমি আহাম্মক হলে, তুমি তস্কর। আমার প্রণাম তুমি অপহরণ করতে চাও।

—আমি বলছি মেয়েটি আমায় প্রণাম করেছে।

—কখনোই নয়। আমায়।

ঘণ্টাখানেক ধরে দুই পণ্ডিতের মধ্যে তুমুল তর্ক চলল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিধান-বহির্ভূত শব্দ প্রয়োগ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না।

তখন একজনের মাথায় সহসা এক বুদ্ধির উদয় হল। তিনি বললেন—আমরা অযথাই মূর্খের মত পথে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ বিদীর্ণ করে লোক জড় করছি। খুব সহজেই এর মীমাংসা হতে পারে। চল, এখনি ওই মেয়েটির কাছে যাওয়া যাক এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা যাক, কাকে সে প্রণাম জানিয়েছে। তাহলেই বোঝা যাবে তুমি কত বড় মূর্খ।

অন্যজন সোৎসাহে বললেন—সেই ভাল। এখনি প্রমাণ হয়ে যাবে, তুমি কত বড় আহাম্মক।

দু'জনে দ্রুতপদে মন্দিরাভ্যন্তরে উপস্থিত হলেন।

তাঁদের আহ্বান শুনে দেবদাসী উঠে হয়ে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর দুই পণ্ডিতের বক্তব্য এবং প্রশ্ন শুনল।

পণ্ডিতদ্বয়ের উত্তেজনা দেখে মেয়েটি মনে মনে মহা কৌতুক বোধ করল। প্রকৃত পক্ষে মাথা নুইয়ে সে প্রণাম জানিয়েছিল, পণ্ডিত দু'জনের কাউকেই নয়, ঠিক সেই সময় রাস্তায় ওধার দিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি বিশেষ পরিচিত এক ধনী বণিক, তাকেই উদ্দেশ করে মৃদু হেসে সে প্রণাম জানিয়েছিল। কিন্তু কৌতুকপরায়ণা মেয়েটি সে তথ্য প্রকাশ করল না। পরিবর্তে বলল—আমি আপনাদেরই একজনকে প্রণাম করেছি। কিন্তু কাকে করেছি তা প্রকাশ করতে বড়ই দ্বিধা বোধ করছি। কারণ তাতে আপনাদের একজনের মনে ব্যথা দেওয়া হবে। তা তো আমি পারি না। আপনারা দু'জনেই আমার বিশেষ ভক্তিভাজন। তবে আমি একটি সূত্র আপনাদের দিতে পারি যার সাহায্যে আপনারা সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারবেন, আমি কাকে প্রণাম করেছি।

—বেশ, বেশ। কী সে সূত্র বল!

হাতজোড় করে মেয়েটি বলল—আপনারা দু'জনেই বুদ্ধিমান। কিন্তু একথা তো জানেন যে দু'জন মানুষের বুদ্ধি নিক্তির ওজনে সমান হয় না। কিছু কম বেশি হবেই।

—তা তো হতেই পারে। বললেন প্রথম পণ্ডিত।

দ্বিতীয় পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে বললেন—অবশ্য, অবশ্য।

মেয়েটি বলল—আপনাদের মধ্যে যাঁর বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম, আমি তাঁকেই প্রণাম করেছি।

মেয়েটির 'সূত্র' শুনে দুই পণ্ডিত কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু দুজনের কেউই হতবাক পাত্র নন। উৎসাহ-সহকারে প্রথম পণ্ডিত বললেন—আমি জানতাম, আমার ভুল হয়নি। আমি কী রকম অল্পবুদ্ধি, তা আমার কাহিনীটি শুনলেই বুঝবে। একদিন বাজারে গিয়েছি! গৃহিণী বলে দিয়েছেন রোহিত মৎস্য আনতে। বীরদর্পে বললাম, পুঁটুই দেখে নাতিবৃহৎ রোহিত মৎস্য আমাকে দাও। সে তৎপরতার সঙ্গে আমার থলির মধ্যে একটি মাছ ভরে দিয়ে দাম নিল। মহানন্দে রোহিত মৎস্য নিয়ে বাড়ি এলাম। কিন্তু মাছ দেখেই গৃহিণী তো ক্রোধে বিদীর্ণপ্রায়। বললেন, এই কি রোহিত মৎস্য! এ তো পাঙাস মাছ। দেখলাম, সত্যিই তো, রোহিত মৎস্যের পরিবর্তে পঙ্ক-মৎস্য এনে হাজির করেছি। এখন, বল তো ভদ্রে, আমার বুদ্ধির অল্পতা পর্বতপ্রমাণ কি না?

হাসি চেপে মেয়েটি বলল—তাতে আর সন্দেহ নেই, পণ্ডিত মশায়। আপনি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন।

ঘন ঘন মস্তক আন্দোলন করে দ্বিতীয় পণ্ডিত বললেন—তা দিয়েছেন। কিন্তু আমার উদাহরণ তো এখনো শোন নি। আমার নির্বুদ্ধিতা পর্বতের চেয়েও আকাশ-চুম্বী। শোন। একদিন আমি আমার ভৃত্যকে আদেশ করলাম, আমার শয়ন কক্ষের গবাক্ষপথে যে নিম্ববৃক্ষের বড় ডালটা আলো প্রবেশের পথকে রুদ্ধ করেছে, তাকে কেটে ফেলতে। আদেশ মত ভৃত্য গাছের মাথায় আরোহণ করে কুঠার দিয়ে সেই বৃহৎ ডালটি কর্তন করতে লাগল, আর আমি তার নীচে দাঁড়িয়ে তার কাজ তদারক করতে লাগলাম। আমি এমনি অল্পবুদ্ধি যে ভৃত্য যে, ডালটি কাটছিল আমি ঠিক তার নীচেই দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৃত্যের কুঠারের আঘাতে ডালটি ধরাশায়ী হল। এবং সেই সঙ্গে আমাকেও ভূতলশায়ী করে দিল। তিনদিন শয্যাত্যাগ করতে সক্ষম হই নি। এখন, বল তো সুভদ্রে, আমার নির্বুদ্ধিতার কাছে উনি শিশু কি না?

উদ্যত হাত সম্বরণ করে নিরীহভাবে দেবদাসী বলল—আপনারা দু'জনে যে উদাহরণ দিলেন, সে দুটি সত্যিই অতুলনীয়। আমার মত অল্পবুদ্ধি মেয়ের পক্ষে তার বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। আপনারা দয়া করে এক কাজ করুন। নগরের কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নির্বাচিত করে তাঁর কাছে আপনাদের বৃত্তান্ত দুটি পেশ করুন। তিনি যে অভিমত দেবেন তাকেই আমি স্বীকার করে নেব এবং আপনারাও সন্তুষ্ট হবেন। এখন দয়া করে আমায় ছুটি দিন। আমি কাজে যাই।

এই বলে দেবদাসী হাসি চাপতে চাপতে মন্দিরের ভিতর অদৃশ্য হল।

পণ্ডিতদ্বয় মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন—দেবদাসী উপযুক্ত কথাই বলেছে। চল, কোন বিচক্ষণ নাগরিকের কাছে যাওয়া যাক।

তারপর, একের পর এক তাঁরা বহু বিচক্ষণ নাগরিকের কাছে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্তগুলি উপস্থাপিত করতে লাগলেন! কিন্তু এরূপ দুরূহ সমস্যার সমাধান তো সহজ কথা নয়। তাই দুই পণ্ডিতের বিতর্কের আজো শেষ হয় নি। নগরবাসীরা তাঁদের দুজনকেই বিলক্ষণ চিনে ফেলেছে।

"গোঠে পর ননদী শোতে রহি
কানাইহা বাত ধীরে বোলো
বাত ধীরে বোলো।" *

রাধিকার ঘরে কৃষ্ণ এসেছেন অভিসারে নিশীথরাত্রে।
রাধা বলছেন, ওগো কানাই, পাশের ঘরে ননদিনী শুয়ে আছে, তুমি আস্তে কথা বল।

---

* মিথিলা অঞ্চলের একটি বহু প্রচলিত লোক-সংগীতের অংশ।

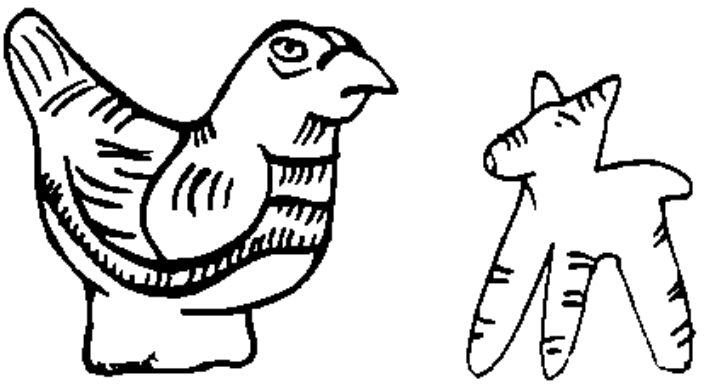

বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের
মৃৎশিল্প
স্কেচ : উৎপল চক্রবর্তী

বাংলার দারু ও মৃৎশিল্প

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্ব বহু যুগাব্দব্যাপী। এই দেশের কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার একদা বিশ্বের হাটে বহু আকাংখিত ও বহু সমাদৃত ছিল। ঢাকার মসলিন, মুর্শিদাবাদের রেশম, বীরভূমের পোড়ামাটির জিনিষ, কৃষ্ণনগরের পুতুল, হুগলীর তাঁত শিল্পজাত দ্রব্য রীতিমতো ব্যাপকভাবে বিদেশে চালান হত।

গত পূজা সংখ্যায় আমরা বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি।

এই সংখ্যায় পূর্ববঙ্গ, বাঁকুড়া, বীরভূম, টাঙ্গাইল ও মুর্শিদাবাদের কয়েকটি দারু শিল্প ও মৃৎ শিল্পের নমুনা পাঠকদের উপহার দিলাম।

মাটির এবং কাঠের এই জিনিষগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্য, রঙের বাহার এবং গঠনের পারিপাট্য শিল্পস্রষ্টার চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক।

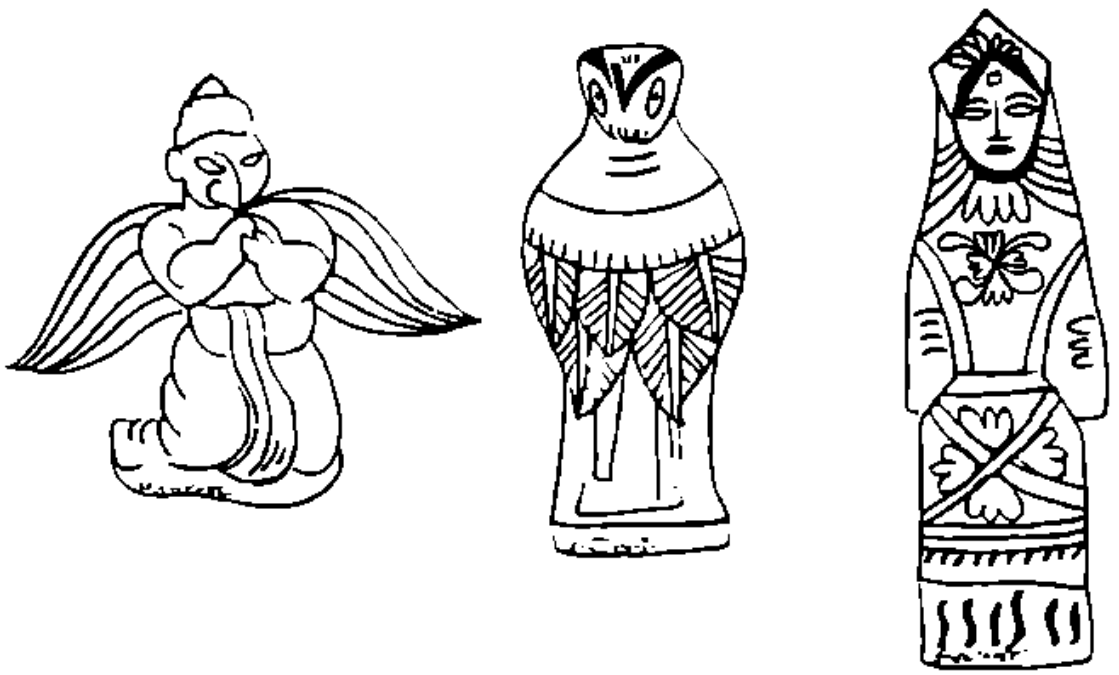

দারুমূর্তি : বীরভূম ও পূর্ববঙ্গের

॥ বাংলার দারু ও মৃৎশিল্প ॥

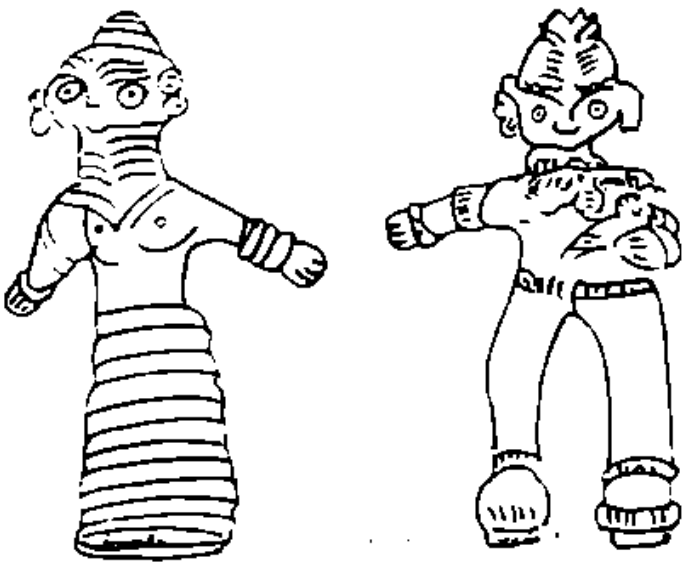

টাঙাইলের দু'টি পুতুল
মৃৎশিল্প

স্কেচ : উৎপল চক্রবর্তী

আমেরিকান রিপোর্টারদের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ

—অভিরূপ

যে কোন সমাজেই সংবাদমাধ্যমের অবদান ও মূল্য অসীম। তাঁদের মত এমন অত্যাবশ্যক এবং নীরব কর্মী দুর্লভ। রাত দুটোয় যে বিমান দুর্ঘটনা হলো, রিপোর্টারদের তৎপরতায় সে খবর আমরা সকালে ছ'টার মধ্যেই পেয়ে গেলাম। শুধু যে এ ধরণের তৎপরতা তা নয়, অসীম সাহস ও ধৈর্য এঁদের অন্যতম গুণ। যুদ্ধের তাজা খবর পাঠাবার জন্য সৈন্যদলের সাথে সাথে এঁরাও চলেন। এই রিপোর্টারদের মধ্যে থাকেন নানান ধরণের লোক—কেউ কবি, কেউ আবার এ্যাডভেঞ্চারার। তাই একই সংবাদ অনেক সময় বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকান রিপোর্টাররা দেখেছেন নানাভাবে। এঁদের সংবাদে শুধু যে তথ্যই থাকতো তা নয়, এর সাথে সাথে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম মজাদার মন্তব্য।

আমেরিকান রিপোর্টাররা সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়েছিলেন স্বামীজির নাম নিয়ে। 'বিবেকানন্দ' (Vivekananda) এঁদের হাতে প্রথম প্রথম বিরকানন্দ (Virchananda) ভিভি রানন্দ (Vivi Ranandа), ভাইভে কানন্দ (Vive Kananda), বিবেকান্ডি, ভাইভ কানন্দ, ভিভি কানাউড়া (Vivi Kanauda), ভেরে কানন্দ (Vere Kananda), ইভেকানন্দ (Vivekananda), ভিভে কিওন্দা (Vive Kyonda)—এমনি কত দুর্দশাই না ঘটলো। স্বামী (Swami) শব্দটিরও একই অবস্থা,—সিওয়ামী (Suami), সোওয়ানি (Swani) সামিক (Swamic), এমন কি সিভানী (Sivanei) পর্যন্ত। আমেরিকান রিপোর্টাররা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। তাই 'Swami Vivekananda' শব্দটিকে তাঁরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছিলেন.—Swami, Vive এবং Kananda। তাঁরা ভাবলেন, 'Vive' হচ্ছে নাম, 'Kananda' উপাধি এবং 'Swami' শব্দটি Mr.-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিবেকানন্দ তাঁদের কাছে পরিচিত হলেন Kananda নামে ; কেউ কেউ অভিহিত করলেন Mr. Kananda বলে। অবশ্য শেষের দিকে স্বামীজির নামের ঠিক বানান অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন।

এতো গেল নাম নিয়ে। কিন্তু, তাঁর পরিচয়? ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন ; অতএব তিনি নিশ্চয়ই রাজা (Rajah)। সন্ন্যাসীবেশ দেখে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়াও হলো (Brahmin ; Brahman), কারুর কারুর কাছে তিনি পুরোহিত, ধর্মযাজক বলে পরিচিত হলেন। কেউ কেউ তাঁকে বৌদ্ধ, কেউ বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বিখ্যাত হিন্দু সাধু (Famous Hindu Monk of the Brahmo Samaj) বলেও নির্দেশ করলেন।

স্বামীজির নাম নিয়ে আমেরিকান রিপোর্টারেরা যতই হোঁচট খান না কেন, তাঁরা যে তাঁকে দেখে

মুগ্ধ হয়েছিলেন, এ নিঃসন্দেহ। প্রথম থেকেই তাঁরা এই হিন্দু সাধুর দর্শনে আচরণে বিমুগ্ধ। ১৮৯৩ সনের আগষ্ট মাসের একেবারে প্রথমদিকে তিনি যুক্তরাজ্য (U. S. A.) প্রবেশ করেন সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে। কিন্তু খুব শিগগিরই তিনি V. I. P. হতে শুরু করেন। বস্টন নগরীর (Boston) Evening Transcript কাগজে ২৩শে আগষ্ট তারিখে স্বামীজির খবর প্রথম পরিবেশিত হয়—

"Swami Vivekananda of India, a Brahmin monk, who is on his way to the Parliament of religions to be held at Chicago in September is the guest of Miss Kate Sanborn at her abandon farm in Metcalf, Mass. Last evening he addressed the inmates of the Sherborn Reformatory for Women upon the manners, customs and mode of living in his country."

পরদিন, ২৪ তারিখে, Salem Evening News, ২৫শে তারিখে Boston Evening Transcript এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা Framingham Tribune স্বামীজির সংবাদ পরিবেশন করেন। তিনদিন পরেই ২৮শে তারিখে Gloucester Daily Times-এ তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা করা হয়। ২৯ তারিখে Salem Evening News প্রায় ৭০০ শব্দে এবং Daily Gazzette ৬৫০ শব্দে স্বামীজির খবর জানান, এ থেকেই বোঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যে শহরেই যাচ্ছিলেন রিপোর্টারদের চোখে ধরা পড়েছিলেন। মনে রাখতে হবে শিকাগোর পার্লিয়ামেন্ট্ অব্ রিলিজিয়নস শুরু হতে তখনও বাকী রয়েছে। Daily Gazette-এর মতে স্বামীজির বক্তৃতাতে বেশ ভীড় হতো। তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আশা এ কাগজই প্রথম প্রকাশ করে ;—"The Speaker explained his mission in his country to be to organise monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and this to elevate them and improve their condition." রিপোর্টারদের মতে তাঁর ইংরেজী ইংরেজদের মত ; কারুর মতে 'remarkably well'। শ্রোতাদের ভীড় সম্বন্ধে সংবাদদাতারা লিখেছেন যে, স্বামীজির বক্তৃতা শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগেই সমস্ত হল ভর্তি হয়ে যেতো এবং অনেক লোক জায়গা না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। Salem Evening News তাঁর সম্বন্ধে বলছেন—"তাঁর ধরণটা সুন্দর····· । অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকেদের প্রতি তিনি অত্যন্ত উদার এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গেও সুন্দরভাবে কথা বলেন"। বক্তৃতা সম্বন্ধে রিপোর্টারেরা লিখেছেন—"Like all men who are educated in the higher Universities of India. Vive Kananda speaks English easily and correctly", "Vive Kananda, the Hindoo monk, addressed the audience in an inteligent and interesting manner"। Northampton Daily Herald স্বামীজির গলার স্বরকে 'musical voice' বলে বর্ণনা করেছেন। Detroit শহরের Free Press-এর রিপোর্টারদের বর্ণনা কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্বামীজির ভাষণ সম্বন্ধে তাঁরা লিখছেন—"It was a beautiful logical garment that he wore, replete with as many bright colours and as attractive and pleasing to contemplate as one of the many-hued fabrics made by hand in his native land and scented with the most seductive fragrance of the Orient". (তাঁর বক্তৃতা ভাষণটি যেন প্রাচ্য পদ্ধতিতে তাঁর স্বদেশে হাতে-বোনা এবং অতি চমৎকার নানা রংয়ের একটি বস্ত্রের মতই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ী)! Appeal-Avalanche পত্রিকার মতে স্বামীজি পাশ্চাত্য জগতে অন্যতম অপরাজেয় বক্তা এবং বক্তৃতা তাঁকে দিয়েছে world wide reputation as one of the most thoughtful scholars of the age। শুধু তাই নয়, তিনি

চিন্তায় শিল্পী, বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ও মঞ্চে সুনিপুণ অভিনেতা। এই পত্রিকার মতে স্বামীজির চিন্তা আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে সহজেই স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং তিনি 'long felt want' (বহুকালের অনুভূত চাহিদা) মেটাতে পেরেছেন। একটি পত্রিকা তো সরাসরি বলেই দিলেন যে স্বামীজিকে দেখা ও তাঁর কথা শোনার সুযোগ কোন বুদ্ধিমান আমেরিকানেরই ছাড়া উচিত নয় এবং তিনি মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। Boston Evening Transcript-এর মতে তাঁর বক্তৃতা আকাশের মত উদার। স্বামীজী যদিও সাধারণত ধীর স্থির ভাবে বক্তৃতা দিতেন, তবুও দেশের দুর্দশায় আকুল হয়ে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের অত্যাচার তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। ক্রীশ্চান মিশনারীদের তীব্র নিন্দা করে বহু বক্তৃতাতেই বলেছেন যে বর্তমানে ভারতের ধর্মের চেয়ে বেশি প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের, অতএব পাশ্চাত্য জাতি যেন ধর্মযাজক না পাঠিয়ে পাদরি পাঠায়। অবশ্য এর সাথে সাথে তিনি ভারতের অপূর্ব দর্শন যোগ ও আধ্যাত্মিক সাধনার উল্লেখ বারবার করেছেন এবং ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ভুল ভাঙার চেষ্টাও চালিয়েছেন।

স্বামীজির চেহারা সম্বন্ধে আমেরিকান রিপোর্টারদের মত কি? প্রিয়দর্শন, যদিও রং ব্রোঞ্জের মত; দাঁত মুক্তোর মত সাদা। ছয় ফুট উচ্চতা, ১৮০ পাউণ্ড ওজন, বলিষ্ঠ আকৃতি এবং এত জনপ্রিয় যে Platform এর উপর দিয়ে শুধু হেঁটে গেলেও লোকেরা হর্ষধ্বনি করে ওঠে। তাঁর ভঙ্গী বীরত্বব্যঞ্জক, গাল পরিষ্কার ভাবে কামানো এবং কথা বলার সময় স্মিত হাসিতে সুন্দর ঠোঁটদুটি সাদাতে ফাঁক হয়ে যায়; চোখদুটি বড় বড় এবং উজ্জ্বল। তাঁর গৈরিক আলখাল্লাটির রং রিপোর্টারদের চোখে কখনো কমলা, কখনো গাঢ় লাল, আবার কোন কোন সময় গেরুয়া বলে মনে হয়েছে। নিউইয়র্কের এক রিপোর্টারের মতে তিনি কমলালেবু রংয়ের কোট পরেছেন, মেহ্‌ফিসে কালো প্যান্ট ব্যবহার করার কথা দেখা যায়, যদিও অন্যত্র 'লাল আলোয়াস'-এর কথাই আছে। মাথার পাগড়ী গেরুয়া রংয়ের। স্যাগিন সহরের Courier Herald-এর সংবাদদাতা স্বামীজির পাগড়ীটি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী মনোযোগের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে একটি লম্বা শাল জড়িয়ে জড়িয়ে ঐটি তৈরী করা হয়েছে। সালেমের রিপোর্টার লিখেছেন যে স্বামীজি পাগড়ীর লেজটিকে দরকার মত রুমাল হিসাবে ব্যবহার করতেন। ক্রিটিক পত্রিকার মতে—বিবেকানন্দের চেহারায় আভিজাত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং ইভনেস্টন ইনভেস্টের মতে তাঁর ব্যক্তিত্বে ওজস্বীভাব আছে। স্বামীজির প্রতিভাদীপ্ত মুখ ও মার্জিতরুচির উল্লেখ বহু কাগজই করেছেন।

কাগজে স্বামীজির খবরের হেডলাইনগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। এই খবরগুলি সাধারণত দুই ধরণের হতো,—প্রথমত, তাঁর বক্তৃতার ঘোষণা এবং দ্বিতীয়ত, বক্তৃতার বিষয়বস্তু। ১৮৯৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে Detroit Tribune-এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় এই interesting ছোট্ট ঘোষণাটি বেরোয়—

VIVE KANANDA

Brahmin Monk of India,
In the Costume of His Order.
Wednesday, Thursday, Saturday, evening at Unitarian Church.
Tickets: Single lecture, 50 cents; Course S. 1.
For sale at Mac Fariane's and Wright & Kay's.

"Orator by Divine Right,"
"Giant of the platform,"
"A Master of English."
"Sensation of world's parliament."

১০ই মার্চের Detroit Journal-এর ছোট ঘোষণাটিও কৌতূহল জনক—

DETROIT OPERA HOUSE.

SUNDAY EVE., MARCH 11.

KANANDA

Subject—"The Christian Missions in India"

ALL RESERVED SEATS 50c—GALLERY 25c.

Reserved seats on sale at Box Office.

এ ছাড়া ছোট ছোট কয়েকটি বিজ্ঞাপন। এছাড়া Memphis Commercial প্রায় ১৫০০ শব্দে স্বামীজির বক্তৃতার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু প্রায় কাগজেই বড় করে ছাপা হতো। Minncapolis Journal 'An Oriental View' শিরোনামায় ১৪০০ শব্দে, Appeal Avalanche 'A Talk with the Hindoo Monk' শীর্ষকে প্রায় ২৪০০ শব্দে এবং 'Gave his Farewell Lecture' শীর্ষকে ১৪০০ শব্দে তাঁর বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছাপিয়েছিলেন। স্বামীজির বক্তৃতার কথা কাগজে বেরুবার সময় শিরোনামাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হতো। 'A Monk From India', 'Gave an Intersting lecture', 'Swami Vivekananda here,' 'The destiny of man discussed', 'Most moral nation', 'Praise for Kananda', 'Women of India', He is instructive'—এ ধরণের লেখা তো বের হতোই, এমনকি 'Rishi's voice', 'An evening with our Hindoo cousins' শীর্ষকও বেরুতো। কোন শহরে বহুদিন পরে বক্তৃতা দিতে এলে রিপোর্টাররা সংবাদ দিতেন—'Kananda again in our midst', 'Vive Kananda again,' 'Kananda arrives' ইত্যাদি। তাঁর শহর ত্যাগের খবর বেরুতো 'Vive Kananda leaves', 'Gave his farewell lecture' শীর্ষকে। বক্তৃতাগুলিতে খুবই ভীড় হতো, অবশ্য এমনদিনও হয়েছে যেদিন বেশ কম লোক এসেছে শুনতে। আমেরিকান রিপোর্টাররা স্বামীজিকে এত ভালবেসে ফেলেছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতায় কম ভীড় হলে জনসাধারণের উপর ক্ষেপে যেতেন। এমনি এক বক্তৃতায় কম ভীড় হওয়ায় Saginan Evening News পত্রিকা সাগিন শহরের লোকেদের বিদ্রূপ করে লিখলেন—

"What is the matter with the people of Saginan, any way? For several days, it had been announced that Kananda, a Hindoo priest was to deliver a lecture at the academy. He is one ··· of the distinguished men who has visited America in years. He takes high rank among the learned men of the age. ··· He speaks English fluently and is an orator. And yet this distinguished visitor talked to empty seats. Perhaps if Kananda would learn a skirt dance or would sing a tropical song the people would turn out to hear them [sic]". এ থেকেই বোঝা যায় আমেরিকান রিপোর্টারদের চিত্তে স্বামীজির স্থান কত গভীর।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার টিকিটের দাম সাধারণত পঞ্চাশ সেন্ট ও এক শিলিং থাকতো যদিও বহু বক্তৃতাই তিনি বিনে পয়সায় দিয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি ভারতের বিভিন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজের সাহায্যের জন্য, এমনকি আমেরিকারও কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য বক্তৃতা করতেন

এবং সংগৃহীত অর্থ তাদের পাঠিয়ে দিতেন। বক্তৃতার সময় আধঘণ্টা, এক ঘণ্টা, কখনো কখনো দু'ঘণ্টাও হতো। বিকেল চারটে, সন্ধ্যা সাতটা, রাত আটটা ছিলো সাধারণত তাঁর বক্তৃতার সময়, যদিও সকালেও অনেকবার বলেছেন।

স্বামীজির বয়স? Bay City Times-এর ধারণা ত্রিশ এবং Tribune-এর মতে এগত্রিশ বছর।

ধর্মমহাসভায় পাশ্চাত্যবাসীদের 'ভাই-বোন' বলে সম্বোধন করে জয় করে ফেলেছিলেন তিনি তাদের হৃদয়। Detroit Free Press-এর সংবাদদাতাও কিন্তু তাঁকে 'প্রাচ্য দেশীয় ভ্রাতা' (Eastern Brother) বলে উল্লেখ করেছেন কাগজে। Northampton Daily Herald স্বামীজিকে 'Cousin' বলে ডেকেছিলেন।

কাগজে শুধু যে তাঁর বক্তৃতার কথাই ছাপা হতো, তা নয়; রিপোর্টাররা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে interview-র জন্যও আসতেন। এমনি এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন Appeal Avalanche পত্রিকা। পুরো সংবাদটি না দিয়ে কিছু কিছু অংশের বাংলা ভাবানুবাদ নীচে দিলাম।

—হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার—

…কানন ইতিমধ্যে তাঁর দেশের জনসাধারণ ও ধর্ম এবং আমেরিকান ও খ্রীষ্টধর্ম মত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁর কথাবার্ত্তা ও আচরণে এমন একটি শিশুসুলভ সরলতা রয়েছে যা সকলের মন কেড়ে নেয় এবং তাঁর কথার সত্যতা সম্বন্ধে শ্রোতাকে নিঃসন্দেহ করে।…মেরফিল্ড হাউজেট একাডেমীতে বসে তিনি বলছিলেন—আমি একজন সন্ন্যাসী; পুরোহিত নই। দেশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে দিয়ে যান হতে যানান্তরে শিক্ষা দিতে দিতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। লোকেদের উপরেই আমি ভরসা করে থাকতাম, কারণ তখন আমি পয়সা ছুঁতাম না।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'আমি বাংলাদেশে জন্মেছি এবং স্বেচ্ছায় অবিবাহিত জীবনকে বরণ করে সন্ন্যাসী হয়েছি। আমার জন্মের সময় বাবা আমার একটি কোষ্ঠী করিয়েছিলেন যেটা আমি আগে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক বছর আগে, যখন আমি বাড়ী গিয়েছিলাম তার বাক্সে ঐ কোষ্ঠীটি পাই। দেখলাম, তাতে লেখা আছে যে আমাকে পৃথিবীর বুকে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।'

বক্তার এই কথা খুবই করুণ শোনালো এবং সাথে সাথে সমস্ত শ্রোতারা তাঁর প্রতি সমবেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। কানন তাঁর সিগারের ছাই ফেলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন।

একজন বলে উঠলেন—আপনাদের ধর্ম যদি এত উন্নত, কেন তা সমাজের প্রগতিতে সাহায্য করতে পারলো না?

সন্ন্যাসী দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—'কারণ, এটা ধর্মের আওতার মধ্যে নয়। আমার দেশবাসীর নৈতিক চরিত্র কোন দেশের চেয়েই ছোট নয়; তারা মানুষের প্রতি তো বটেই, মূক পশুপাখীদের প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাদের বাস্তব বুদ্ধি কিছু কম ছিলো।…তাছাড়া তোমাদের সর্বের খ্রীস্টানধর্মও এ বিষয়ে আলাদা কিছু নয়। তোমাদের ভারউইনেরা তোমাদের বিজ্ঞেরা তোমাদের হিউমেরা তো কখনও তোমাদের ধর্মযাজকদের কাছ থেকে সহানুভূতি পাননি। তাহলে শুধু শুধু আমাদের ধর্মকেই কেবল সমালোচনা করছো কেন?…তোমরা আমেরিকানেরা, কার পুজো করো? ডলারের! তোমাদের মধ্যে কজন মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারো?

একজন বলে উঠলেন—ধর্মের দিকে নজর দিতে গিয়ে আপনারা বাস্তবদৃষ্টি হারিয়েছেন। আপনাদের পথ মানুষকে বাঁচতে শিক্ষা দেয়না।

তিনি উত্তর দিলেন—এ পথ তাঁদের মরতে শেখায়।

—আমরা বর্তমান সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।

—তোমরা কোন কিছুতেই নিশ্চিন্ত নও।

আদর্শ ধর্মের উদ্দেশ্য হবে মানুষকে বাঁচার মত বাঁচতে আর মরার মত মরতে শেখানো।

—ঠিক বলেছো—হিন্দু সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—আর এটাই আমরা দেখতে চাই। আমার মনে হয়, হিন্দুরা ধর্মজীবন গড়ে তুলতে গিয়ে বাস্তবকে উপেক্ষা করেছে এবং পাশ্চাত্য জগৎ ঠিক তার উলটোটি। পাশ্চাত্যের বহির্জগতের জ্ঞান ও হিন্দুদের অন্তর্জগতের জ্ঞান—এই দুইয়ের সম্মিলন করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

—আপনি যা করতে চান তাতে ভারতের সমাজ জীবনের আমূল রূপান্তর ঘটাতে হবে না কি?

—হয়তো তাই; কিন্তু এটা করতে হবে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত না দিয়ে।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে তিনি বললেন যে এটি তাঁর ধর্মের একটি অঙ্গ এবং প্রতীক বিশেষ।

তোমরা কি পূজো করো?—সন্ন্যাসীটি প্রশ্ন করলেন—ভগবান সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?

এক ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বল্লেন—চৈতন্য।

—চৈতন্যটিই বা কি? তোমরা, প্রোটেস্টাণ্টরা, বাইবেলের বাক্যকে পূজো করো, না অন্য কিছু? আমরা প্রতিমার মাধ্যমে ভগবানকেই উপাসনা করি।

এক ভদ্রলোক এই বিদেশীর কথাগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন। তিনি বললেন—তার মানে আপনারা বহির্জগতের মাধ্যমে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন।

—ঠিক বলেছেন ···।

স্বামীজির কথা বুঝতে না পেরে রিপোর্টারেরা মাঝে মাঝে ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছেন তাঁদের সংবাদে। Saginan Evening News ১৮৯৩ সনের ১৯, ২০, ২১, ২২ মার্চ পরপর চারদিন স্বামীজির খবর দেয়। এর মধ্যে ১৯ এবং ২০ তারিখের সংবাদে তাঁকে 'বৌদ্ধ' ও পরের দুদিন 'হিন্দু' বলে উল্লেখ করা হয়। Saginan Courier Herald একই খবরে স্বামীজিকে প্রথমে হিন্দু ও পরে বৌদ্ধ বলে অভিহিত করে। New York Daily Tribune পত্রিকাটিও একবার তাঁকে বৌদ্ধ বলে উল্লেখ করে। স্বামীজির কথা বুঝতে না পেরে Des Moines News ১৮৯৩ সনের ২৮শে নভেম্বরে, '৯৪ সনে ২১ জানুয়ারীতে Appeal-Avalanche এবং ১৪ই মে তারিখে Boston Herald ভুল সংবাদ দেয়। ব্রুকলিন শহরের Standard Union সংবাদিনী শব্দটি বুঝতে না পেরে লিখল, 'Sabatimini' এবং 'কর্মকাণ্ডকে' লিখলেন 'Cura Makunda'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে অলৌকিক কার্যকলাপ আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন নয়। স্বামীজিও তাই জীবনে খুব কমই এ বিষয়ে নজর দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ লোকেদের এদিকে অত্যধিক ঝোঁক, বিশেষত আমেরিকার জনসাধারণের ধারণা ছিলো যে ভারতে এ ধরণের কার্যকলাপ পথে ঘাটে দেখা যায়। Evening News পত্রিকাটি ১৮৯৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Give us some Miracles শীর্ষকে

স্বামীজির ডেট্রয়েট শহরে শুভাগমনের খবর পরিবেশন করেন। পত্রিকার সংবাদদাতা দাবী জানালেন যে যেহেতু ভারতের মহাত্মারা অদ্ভুত শক্তির অধিকারী, সেহেতু স্বামীজিকেও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির নিদর্শন স্বরূপ কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ দেখাতেই হবে এবং শুধু এর সাহায্যেই তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে পারবেন। সংবাদদাতা আরো লিখলেন যে কয়েক মিনিটের মধ্যে ৪০—৭৫ ফুট বড় গাছ তৈরী করে দর্শকদের সেই গাছে চড়তে দেওয়া, পাহাড় পর্বত অদৃশ্য করে দেওয়া, আঙুলের ডগা থেকে বিদ্যুৎ বের করা, এসবও অদ্ভুত কাজ নাকি ভারতে দেখতে পাওয়া যায়, সেজন্য স্বামীজি যেন আর বক্তৃতা না দিয়ে কিছু এ ধরণের কাজ দেখান। দু'দিন বাদে Detroit Journal-এ এক ভদ্রলোক Evening News-এর এই দাবীর অযৌক্তিকতা নিয়ে একটি চিঠি লিখেন। পরদিন ১৭ তারিখে Evening News কাগজটিতে 'Miracle's সম্বন্ধে স্বামীজির বক্তব্য প্রকাশিত হয়, তাঁর মতে এ ধরণের কার্যকলাপ বেশির ভাগই হাতসাফাই বা সম্মোহনী বিদ্যার কারসাজি এবং হিন্দুধর্ম এইসব ইন্দ্রজালের উপর নয়, বিশুদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমেরিকান রিপোর্টারদের আরেকটি দিকের কথা উল্লেখ না করলে এ রচনা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। স্বামীজির নামযশে ঈর্ষাকাতর হয়ে পাশ্চাত্যের কিছু পাদ্রী এবং ভারতের ব্রাহ্মসমাজের ও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানারকম কুৎসা রটাতে থাকেন। হিন্দুধর্মকে, ভারতীয়দের, ভারতীয় সমাজকে, এমনকি শেষে স্বামীজির চরিত্রের উপর তাঁরা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, যখনই কোন কাগজে তাঁর নিন্দা বেরুতো সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটি কাগজে সেই নিন্দার প্রতিবাদও বেরুতো। ভারতের খবরের কাগজগুলির মধ্যে Indian Nation-এর শ্রী এন. ঘোষ, Mirror-এর সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, Daily News-এর সম্পাদক ডাঃ জে. বি. ভাজি, National Guardian-এর সম্পাদক শ্রীনগিন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, Hope-এর সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায় স্বামীজির প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ সমর্থন জানালে আমেরিকান রিপোর্টারদের উপর তা খুবই কাজ করে এবং শিকাগো, নিউইয়র্ক প্রভৃতি জায়গার পত্রিকাগুলিতে স্বামীজির পুনরায় প্রতিফলন হয়। আমেরিকার বিভিন্ন খবরের কাগজে স্বামী বিবেকানন্দের তৎকালীন সংবাদ কিরকম পরিবেশন করা হয়েছিলো, এ সম্পর্কে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সেরি লুই বার্ক সুদীর্ঘকাল ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর Swami Vivekanada in America : New Discoveries' এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, স্বামীজির আমেরিকায় প্রবাসজীবন সম্বন্ধে বইটি এখন পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত। প্রবন্ধটির তথ্যসমূহ এই বইটি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ১০ম খণ্ডের সামান্য সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীপ্রবোধ কুমার চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

। এগার ।

ম্যাড্রাস মেল বেজওয়াড়ার পৌঁছয় রাত ন'টার আগেই। গাড়ির গতি কিছু মন্থর হতেই আমি আমার ঝোলাঝুলি গুছিয়ে নিলুম। মৈত্র মশায় দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই হঙ্কার শুনলুম হালদার মশায়ের : কি মশাই, নামবেন নাকি এখানে ?

আমি সবিনয়ে বললুম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

হালদার মশায়ের কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ শোনাল, বললেন : মাথা আপনার খারাপ নাকি, যে যেখানে সেখানে নেমে পড়ছেন !

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না দেখে মৈত্রমশাই বললেন : ব্যাপার কী ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : কর্তার হুকুম।

গাড়ি এসে বেজওয়াড়ার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই আমি নেমে পড়লুম। মামার গাড়ির দিকে একটুখানি এগিয়েই মিস্টার নাইডুকে দেখলুম যে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরতলায় উঠে গেলেন। স্বাতি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছিল, বলল : একটুখানি অপেক্ষা কর গোপালদা, রিটায়ারিং রুম পাওয়া যাবে কিনা মিস্টার নাইডু তা দেখতে গেছেন।

দরজার হাতল ধরে মামা দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন : কাঁচা কাজ করা ঠিক হবে না, বুঝলে গোপাল। গাড়ি যখন অনেকক্ষণ দাঁড়ায় তখন বুঝে সুঝেই নামা উচিত।

হুড়মুড় করে মিস্টার নাইডু নেমে এলেন, বললেন : কুলি এই কুলি।

তারপরে আমাদের কাছে এসে বললেন : বলেছি তো, রিটায়ারিং রুম এখানে সব খালি পড়ে থাকে।

মামা নেমে পড়লেন, মামীও নামলেন। আমি বললুম : আপনারা এগোন, জিনিষপত্র নিয়ে আমি আসছি।

সেই ভাল।

বলে মামা মিস্টার নাইডুর সঙ্গে এগিয়ে গেলেন।

স্বাতি গেল না, মামীও অপেক্ষা করতে লাগলেন। মালপত্র নিয়ে আমরা একসঙ্গে উপরতলায় উঠলুম।

মিস্টার নাইডু ঠিকই বলেছেন। স্টেশনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত লম্বা টানা বারান্দা তার এক মাথায় রেস্তোরাঁ, আর সব রিটায়ারিং রুম ও রেলের অফিসারদের জন্যে রেস্টরুম। বোধহয় সবই খালি পড়ে আছে। মেট্রন আমাদের জন্যে দুখানা ঘর খুলে দিয়েছে।

মিস্টার নাইডু বললেন : আর একটা কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে। রেস্তোরাঁ এখানে তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়, খাবারের অর্ডার এখুনি দিয়ে আসতে হবে।

মামা আমার দিকে তাকালেন। আর স্বাতি বলল : এস গোপালদা।

তারপরে মামীকে বলল : তোমরা মুখ হাত ধুয়ে নাও মা, খাবারের অর্ডার দিয়েই আমরা চলে আসছি।

অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে মামা বিদায় দিলেন মিস্টার নাইডুকে, আর আমরা এগিয়ে গেলাম বারান্দার শেষ প্রান্তের দিকে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে ফেরার পথে স্বাতি বলল : এই অনিশ্চিত যাত্রা তোমার কেমন লাগছে গোপালদা ?

বললুম : অনিশ্চয়তা বাড়লে আরও ভাল লাগবে।

স্বাতি বলল : ঠিক বলেছ। রিটায়ারিংরুমে জায়গা না পেয়ে যদি ধর্মশালায় যেতে হত, কিংবা রাত কাটাতে হত ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে, তাহলে আরও মজা লাগত।

আমি হেসে বললাম : মামা তাহলে গাড়ি থেকে নামতেনই না।

সকালবেলায় মামী আমাদের তাড়া দিলেন, বললেন : দুর্গার মন্দিরে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

গম্ভীরভাবে মামা বললেন : স্নানটা কি কৃষ্ণার জলে হবে ?

চুপিচুপি স্বাতি আমাকে বলল : মিস্টার নাইডু এই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মা নদীতে স্নান করতে চান না।

মামী এ কথার উত্তর না দিয়ে স্নানের উদ্যোগ করতে লাগলেন। আমি বললাম : আমাদের শাস্ত্রমতে কৃষ্ণা কোন পবিত্র নদী নয়।

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন : কী রকম ?

আমি বললুম : পূজোর জল সোধনের মন্ত্রটি মনে করুন। মামা সেই মন্ত্র পড়লেন :

গঙ্গে চ যমুনে চ গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।

তারপরে নদীর নামগুলি একবার আওড়ে নিয়ে বললেন : তাইতো কৃষ্ণার নাম এখানে নেই। তবে ঐ ভদ্রলোক যেন কৃষ্ণাকে এমন পবিত্র নদী বলছিলেন !

আমি বললুম : সব নদীই পবিত্র। নদীতে নেমে অবগাহন স্নান করলে যে তৃপ্তি হয় তাতে মনে হয় মালিন্যের সঙ্গে পাপও ধুয়ে মুছে গেল। সেরকম পবিত্র হবার তৃপ্তি পাওয়া যায়।

মামা বললেন : সে তো তোমার নিজের কথা। এরা কেন পবিত্র বলে ?

আমি বললুম : কৃষ্ণার উৎস হল সহ্যাদ্রি পাহাড়ে, মহারাষ্ট্রের শৈলাবাস মহাবালেশ্বরের কাছে। এই পাহাড় থেকে আরও চারটি নদী বেরিয়েছে, তাদের নাম বেণা, কৃষ্ণবেণী, সাবিত্রী ও গায়ত্রী। লোকে বলে যে এই পাঁচটি নদীই পবিত্র। এদের নাম স্মরণ করলেই পাপক্ষালন হয়, নদীতে স্নান করবারও দরকার হয় না।

মামা বললেন : তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। সকাল বেলাতেই যখন কৃষ্ণার নাম স্মরণ করেছি, তখন আর জলে নামবার দরকার নেই।

আমরা চা খেয়ে নিলুম, কিন্তু মামী খেলেন না। স্নান করে পরনের শাড়ি পরেছিলেন একখানা। এবং বেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মামা বললেন : অমন ব্যস্ত হবার কী আছে, তোমার মন্দির তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

স্বাতি আমাকে বলল : মিস্টার নাইডু আসবেন, তিনি আমাদের শহর দেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন। শুধু এ শহর নয়, আরও অনেক শহর।

মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, এদিকের লোক বেশ ভালো অনেক কিছু।

আমিও গাড়িতে এই কথা শুনেছি। তাই আশ্চর্য হলুম না তার মন্তব্য শুনে। বললুম : এঁদের নিজেদের দেশ তো তাই অনেক কিছু জানেন।

মামা বললেন : বাঙ্গালোর সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি বলতো ?

এ কথার উত্তর দেবার আগেই মিস্টার নাইডু এসে উপস্থিত হলেন হন্তদন্ত ভাবে। সবাইকে নমস্কার করে বললেন : খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না ?

উত্তর মামা দিলেন, বললেন : আমাদের তো আর ট্রেন ধরতে হবেনা যে আপনার দেরি হয়েছে বলব।

মিস্টার নাইডু বললেন : আমি একটা বিশেষ কাজে গেছি বলে আপনাদের সঙ্গে আর যেতে পারবনা। তবে এ অঞ্চলের দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। হাতে যদি সময় কম থাকে তবে কৃষ্ণায় স্নান করে কণক দুর্গার মন্দিরে চলে যান। ফেরার পথে শিবালয় দেখে ফিরবেন, আমি দুখানা রিক্সা ঠিক করে দেব।

চা শেষ করে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন, মুখের পাইপ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর ?

মিস্টার নাইডু বললেন : কাল ভোরের ট্রেনে চলে যান মঙ্গলগিরি। তিন চার ঘণ্টা পর পর ট্রেন আছে। এক ট্রেনে নামবেন, মন্দির দর্শন করে আর এক ট্রেনে যাবেন গুন্টুরে।

তারপর ?

রাতে গুন্টুরের রিটায়ারিংরুমে থাকবেন। আর সকাল বেলায় বাসে করে চলে যাবেন অমরাবতী। ফিরবেন বিজেলের বাসে।

তারপর ?

তারপর দিন সকালের ট্রেন ধরে চলে যাবেন মাচেরলা। দুপুর বেলায় সেখানে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে প্রতি পনর মিনিট অন্তর বাস ছাড়ে নাগার্জুন সাগরের। চমৎকার রেস্ট হাউস আছে সেখানে, অপরূপ চারিদিকের দৃশ্য। পুরনো শহর বিজয়পুরী আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণার দু'তীরে, মাঝখানে বাঁধ, যানবাহন চলাচলের জন্যে সুন্দর পুল আছে কৃষ্ণার ওপরে। প্রথম দিন এই সব দেখবেন, আর দ্বিতীয় দিন দেখবেন নাগার্জুন কোণ্ডার যাদুঘর। নাগার্জুন সাগরের একটি দ্বীপই এই যাদুঘর, পারাপারের জন্যে মোটর লঞ্চ আছে।

মামা একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপরে মামীর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন : চল, তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক।

বলে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিস্টার নাইডু বললেন : গুন্টুর থেকে আপনারা যাবেন তিরুপতি।

রেনিগুন্টার একখানা থ্রু-কোচ আছে, তাতে উঠলে গুন্টুরে আর গাড়ি বদল করতে হবেনা। বাসে চেপে তিরুমালা পাহাড়ে উঠবেন, একটা রাত থাকবেন সেখানে। সকাল বেলায় ঠাকুর ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী দর্শন করে রেনিগুন্টাতেই ফিরবেন। সেখান থেকে মাদ্রাজের থ্রু-ট্রেন পাবেন। ঘণ্টা চারেকের পথ।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : বুঝেছি।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল যে তিনি বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কেন হয়েছেন তা বুঝতে পারলুমনা।

দুখানা রিক্সা ঠিক করে দেবার আগে ভদ্রলোক আমাদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর রিক্সায় বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি বললুম : আপনি সঙ্গে থাকলে আরও ভাল হত।

ভদ্রলোক দুঃখিত ভাবে বললেন : কী করব বলুন। যদি পারি সন্ধ্যাবেলায় আবার আসব।

মামা কোন কথা বললেন না।

মামার সঙ্গে আমি উঠেছিলুম এক রিক্সায়, আর সামনের রিক্সায় স্বাতি আর স্বামী একসঙ্গে বসেছিলেন। কোথায় কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন মিস্টার নাইডু। আমাদের তাই কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা। কিন্তু মামা গম্ভীর হয়ে ছিলেন। পথে একটি কথাও তিনি কইলেন না।

কৃষ্ণানদীর ঘাট বেশি দূরে নয়। একা হলে হেঁটে গিয়েই স্নানকরে আসা যায়। কিন্তু আমরা সহরের মধ্য দিয়ে ঘর বাড়ি দোকান পাট দেখতে দেখতে ডান হাতে একটি পাহাড় ফেলে রেখে নদীর ধারে এসে পৌঁছলুম।

কাশীর গঙ্গার মতো জমজমাট ঘাট নয়, আবার নির্জনও নয় গাঁয়ের নদীর মতো। পাড়ের উপরে ছোট মন্দির আছে, বাঁধানো ঘাট আছে। আর সেই ঘাটের উপর এসে দাঁড়ালেই অসংখ্য মানুষ দেখা যায় নদীর ধারে। নদীরজল এখানে ঘাটের উপর পর্যন্ত উঠে আসেনি, স্নানার্থীদের এখানে অনেকটা দূরে নেমে যেতে হয়। প্রশস্ত নদী ধীর মন্থর গতিতে সমুদ্রের দিকে বয়ে যাচ্ছে। মানচিত্রে দেখেছি যে সমুদ্র এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাছেও নয় বিশাখাপত্তনের মতো। এর পরে কৃষ্ণা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

এখানে চোখের সামনে আমরা অন্য দৃশ্য দেখতে পেলুম। ডান হাতে একটি সুন্দর সুদৃশ্য পুল নদীর এপারকে যুক্ত করেছে ওপারের সঙ্গে। ওপারে ছোট ছোট পাহাড় দুটি পাশাপাশি তার কাছে মন্দিরের উঁচু চূড়াও দেখতে পাচ্ছি। কোন্ দেবতার মন্দির তা আমাদের জানা নেই, এমন কেউ কাছে নেই যাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

রিক্সা থেকে মামা কসরৎ করে নেমেছিলেন, এবারে চারি ধারে চেয়ে দেখে বললেন : বেজওয়াড়ায় কি আমরা এই নদী দেখতে এলুম !

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : মহারাষ্ট্র মহিশূর ও অন্ধ্রের প্রাণ হল এই কৃষ্ণা।

মামা হাসলেন : কী রকম ?

বললুম : বেজওয়াড়ায় আমরা যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি তা পূর্বঘাট পাহাড়েরই বিন্ধ্যির অংশ। কিন্তু কৃষ্ণার জন্ম হয়েছে ভারতের অপর প্রান্তে পশ্চিমঘাট পাহাড়ে।

স্বাতি কাছেই ছিল, বলল : তুমি পাহাড়ের অন্য নাম বলেছিলে।

বললুম : সহ্যাদ্রি পাহাড় পশ্চিমঘাটেরই অংশ। সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে কৃষ্ণার উৎসের কাছে

নাকি একটি মহাদেবের মন্দির আছে। পাহাড় থেকে নেমে এই নদী মহারাষ্ট্রে মহিশূর ও অন্ধ্রদেশের উপর দিয়ে সগৌরবে প্রবাহিত হয়েছে। তুঙ্গভদ্রা ও ভীমা হল কৃষ্ণার দুটি বড় উপনদী। কৃষ্ণাকে বাঁধা হয়েছে নানা স্থানে, খাল কাটাও হয়েছে অনেক। নাগার্জুন সাগরে যদি যাওয়া হয় তো সেখানে আমরা কৃষ্ণার বাঁধই দেখতে পাব। এখানেও দেখছি কৃষ্ণার বাঁধ। এখানে খাল কেটে যে শুধু এই অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে তা নয়, উত্তরে গোদাবরীর খাল ও দক্ষিণে বাকিংহাম খালের সঙ্গেও যোগকরা হয়েছে। অনেক জায়গায় নৌকো চলাচল করে।

স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম : একজায়গায় অনেকগুলো নৌকো বাঁধা দেখনি।

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : দেখেছি।

ঐসব নৌকোয় নানা জায়গা থেকে পণ্যদ্রব্য আসে।

মাসী বললেন : এইখানে দাঁড়িয়েই তোমরা গল্প করবে, না মন্দিরেও যাবে!

রিক্সার দিকে পা বাড়িয়ে স্বাতি বলল : গোপালদাকে নিয়ে এই বিপদ। গল্প শুরু করলে আর শেষ হয়না।

আমি তার মন্তব্য শুনে লজ্জা পেলুম। প্রতিবাদ করবার মতো যুক্তি নেই। পড়ার সুযোগ পেলে যেমন পড়ি, তেমনি বলার সুযোগ পেলে তা হারাতে চাইনা। শ্রোতার ধৈর্যের কথা যদি ভাবতে পারতাম তো এই বদনামের ভাগী হতে হতনা। নিঃশব্দে আমি মাসীর পাশে গিয়ে রিক্সায় বসলুম।

রিক্সাওয়ালাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, কৃষ্ণার ঐ পুলের উপরে আমরা যাব কিনা, উত্তর মাসী দিয়েছিলেন : সোজা কণক দুর্গার মন্দিরে।

এই কণক দুর্গার মন্দিরের কথা আমি এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম। মাদ্রাজ থেকে ঘুরে এসে সে বলেছিল যে সে এক অপরূপ দৃশ্য। বিজয়ওয়াডার স্টেশন ছাড়বার পরে ট্রেন কৃষ্ণার পুলে উঠবে। নদীর ধারে পাহাড়ের উপরে কণকদুর্গার মন্দির অসংখ্য আলোর মালায় সাজানো হয় সন্ধ্যার-সময়। অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে এই আলোর মন্দিরটি দেখে ট্রেন থেকে নেমে পড়তে ইচ্ছা করে। নদী পাহাড় আর এই মন্দির নাকি বিজয়ওয়াডাকে বিভূষিনীর গৌরব দিয়েছে।

পুরনো পথ ধরে আমরা শহরের মধ্যে দিয়ে এলাম। তারপরে বাঁ হাতে অগ্রসর হলাম মন্দিরের দিকে। এই রাজপথ নাকি অন্ধ্রের রাজধানী হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত গেছে, নিয়মিত বাস চলাচল করে এই পথে। আমাদের রিক্সা কিন্তু বেশিদূর গেলনা, ডান হাতে ফিরে পাহাড়ের দিকে এগোল। এ পথ ক্রমাগত উপরে উঠছে, আর বেশিদূর যে উঠতে পারবেনা তা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

মাসী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : ব্যাপার কী গোপাল, কোন পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি!

দুশো সিঁড়ি ভাঙবার কথা আমি শুনেছিলুম, কিন্তু সেকথা বলবার সাহস হলনা, ভাল মানুষের মতো বললুম : তাইতো!

এ যে কোন মন্দিরের পথ তা দুধারের দোকান পাট দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সামনের একটা বাঁক ঘুরেই রিক্সা দাঁড়াল। ফুল বেলপাতা মিষ্টান্নের দোকান দু পাশে, কিন্তু মন্দিরের চূড়া নেই। রিক্সা থেকে নেমে চারিধারে তাকাতেই রিক্সা ওয়ালা আঙুল দিয়ে দেখালে : ঐ দেখুন।

দেখতে পেলুম কণকদুর্গার মন্দির। পথের ধারে নয়, পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে সেই মন্দির নিচে থেকে ছবির মতো ছোট দেখাচ্ছে। বাঁধানো ধাপ উঠেছে পথের ধার থেকেই।

মামার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেলুম, কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম মামীকে দেখে। রিক্সা থেকে নেমে তিনি নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্বাতি এসে আমাদের কাছে।

মামা কী বলবেন বোধহয় ভেবে পেলেন না। চোখের দৃষ্টি তাঁর পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, বড় অসহায় মনে হল তাঁকে। স্বাতি বলল: তুমি কি রিক্সাতেই বসে থাকবে বাবা?

করুণ ভাবে মামা বললেন: তাইতো ভাবছি।

বলে নিজের ভারি বপুর দিকে একবার ও আরেকবার সামনের পাহাড়ের দিকে তাকালেন। রিক্সাওয়ালারা কিন্তু সন্দেহ করেছিল। বলল: বেশি সময় লাগবেনা, এধার দিয়ে উঠে ওধার দিয়ে নেমে এলেই হল।

বলে দুটো পথ আমাদের দেখিয়ে দিল। এইখানেই এসে দুটো পথ মিলেছে।

মামীকে ধরল করেছিল একটি ব্রাহ্মণ বালক, পথ দেখিয়ে সেই আমাদের উপরে নিয়ে যাবে। রিক্সাওয়ালাদের পরামর্শে জুতো ও চটি আমরা রিক্সার উপরে খুলে রাখলুম। শেষ পর্যন্ত মামাও নামলেন। বললেন: বড় ভয় হলুম এখানে।

গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে আছে কণক দুর্গার মন্দিরে উঠবার পথ। কারও জন্যে অপেক্ষা না করে স্বাতি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম মামা মামীর সঙ্গে। তাকে অদৃশ্য হতে দেখেই মামী বললেন: মেয়ের কাণ্ড দেখেছ।

মামা আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম: কোন ভয় নেই, এই সিঁড়ি মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হবে।

কিন্তু মামী আমার কথায় ভরসা পেলেন না বললেন: কেমন যেন অন্ধকার পথ।

বলে তিনিও আমার দিকে তাকালেন। আমি বলতে পারতুম যে আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু তা না বলে বললুম: ডাকব স্বাতিকে?

মামা বললেন: ডাকবে কেন, তুমি এগিয়ে যাওনা।

সেই ভালো।

বলে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলুম।

তাকে ধরে ফেলতে আমার সময় লাগল না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। আমি যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি তা বুঝতে পেরে বলল: কী কী দেখতে হবে ওপরে, তা ভাল করে জেনে নাও এখানে। নেমে এসে আপশোষ কোরোনা।

আমি দেখলুম যে দর্শনীয় স্থানের একটি তালিকা দেওয়া আছে এখানে। এই পাহাড়ের নাম ইন্দ্রকিলাদ্রি, মূল মন্দির হল কণক দুর্গার, নটরাজ স্বামীরও মন্দির আছে, আর মন্দিরের পিছনে আছে কোনেরু ও চিকাতি কোনেরু। স্বাতি বলল: কোনেরু কী গোপালদা?

আমি বললুম: কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

দেখবার জিনিষ আরও আছে—রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া ও গঙ্গাবতরণ। সকলের শেষে মল্লেশ্বরের মন্দির।

স্বাতি বলল: সবনাম মনে থাকবে তো?

আমি বললুম: মনে রাখতে চাইলে মনে থাকবে না কেন! মনতো কাগজ নয় যে হারিয়ে যাবে।

স্বাতি বলল : জলে দাগের মতো মুছে যায় যে অনেক কিছু।

বললুম : মনতো জল নয়, মন শিলাও নয়। কোন দাগ রাখতে হবে আর মুছে ফেলতে হবে কাকে, মনই যে বিচার করে। তবে মন বড় বাধা, বলে দিলে শোনে অনেক কথা।

বলে আমি এগোতে শুরু করলুম। পাশে চলতে চলতে স্বাতি বলল : মন তোমার বাধা কেমন তা দেখব ওপরে উঠে।

বলে হাসতে লাগল।

ধাপগুলো বেশি উঁচু নয়, উঠতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। স্বাতিও কতকটা অনায়াসেই উঠছিল। হঠাৎ বলল : এমন চুপ করে আছ কেন গোপালদা ?

বললুম : স্বভাবটা শোধরাবার চেষ্টা করছি।

মান হয়েছে !

বলে স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল। আর আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত বোধ করলুম।

কয়েকটা ধাপ উপরে উঠে স্বাতি আবার কথা কইল। বলল : এই মন্দিরের সম্বন্ধে কোন পৌরাণিক কাহিনী নেই ?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : পৌরাণিক কোন কাহিনী নেই এমন মন্দির কি এদেশে আছে।

স্বাতি অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপরে বলল : বলনা সেই কাহিনী।

বললুম : অর্জুনের তপস্যার কথা মনে আছে ? শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্যে অর্জুন তপস্যা করেছিলেন এই ইন্দ্রকিল গিরিতে। মহাবলীপুরমে এক পাহাড়ের গায়ে সেই ছবি উৎকীর্ণ আছে।

স্বাতি বলল : এ তোমার বানানো গল্প।

বললুম : আমার বানানো নয়, বানিয়েছে অন্য কেউ। আমি যা পড়েছি, তাই তোমাকে বললুম। বনবাসী পঞ্চ পাণ্ডব যখন এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন একদিন বেদব্যাস এলেন তাঁদের কাছে। বললেন, তোমাদের একজন এই পাহাড়ে তপস্যা কর তাহলে শিবের কাছে পাশুপতাস্ত্র পাবে। সেই অস্ত্র পেলে কোন শত্রু তোমাদের হাতে রক্ষা পাবে না। ঠিক হল যে অর্জুন তপস্যা করবেন, আর এই ইন্দ্রকিল পাহাড়টি পছন্দ করলেন তপস্যার জন্যে। তারপরে এই পাহাড়ে উঠে অর্জুন তপস্যা শুরু করলেন। কঠিন তপস্যা। চারিদিকে আগুন আর মাথার উপরে সূর্য, তারই মধ্যে দুহাত তুলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অর্জুন তপস্যা করছেন। শিব তো অল্পেই তুষ্ট হন, ভাবলেন যে অর্জুনকে এখানে বর দেবেন। তবে একটু ছলনা করবার জন্যে পার্বতীর সঙ্গে এলেন কিরাতের বেশে। মহাভারতের সেই ছবিটি মনে পড়ে ? অর্জুনের সামনে পার্বতীকে নিয়ে কিরাতরূপী শিব, পরণে বাঘছাল, হাতে তীর ধনুক আর মাথায় পাখির পালক।

সংক্ষেপে স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপর সেই কিরাতের গল্প। শিব একটা বুনো শুয়োর তাড়িয়ে আনলেন অর্জুনের সামনে। অর্জুন ও কিরাত একই সঙ্গে তীর ছুঁড়ে শুয়োরটা মারলেন।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : অর্জুনের এ কেমন তপস্যা ?

বললুম : সে অর্জুনই জানেন। আমি জানি দুজনের বিবাদের কথা। কিরাত বললেন, শুয়োরটা আমি মেরেছি। আর অর্জুন বললেন, আমি। এই নিয়ে বিবাদ বাধল, শেষপর্যন্ত প্রবল যুদ্ধ। হেরে গিয়ে অর্জুন তাড়াতাড়ি একটি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুজো করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য ! যে ফুল বেলপাতা শিবলিঙ্গের

মাথায় দিলেন, তা পড়ল কিরাতের মাথায়। অর্জুন মুখ তুলে সবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলেন যে শিব এসেছেন তাঁকে ছলনা করতে। তারপরেই দেখলেন যে কিরাত আর নেই, তার জায়গায় স্বয়ং শিব সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে পাশুপতাস্ত্র পেলেন, তারপর সেইখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন বিজয়েশ্বর শিবের। ইন্দ্রকিল পাহাড়ে যে সব প্রাচীন গুহা মন্দির আছে তার একটি মন্দিরে নাকি এই কিরাতার্জুনের গল্প খোদাই করা আছে।

স্বাতি বলল : বিজয়েশ্বর শিবের নাম তো লেখা দেখিনি।

বললুম : আমি শুনেছি যে তিনটি মন্দির নিয়ে বিজয়ওয়াড়া। কণকদুর্গা, মল্লেশ্বর ও বিজয়েশ্বর। কণকদুর্গার প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না, তাই লোকে স্বয়ম্ভু বলে। মল্লেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রথম পঞ্চ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। কিন্তু তার আগের কথাও শোনা যায়। উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা দক্ষিণ ভারতে এনেছিলেন অগস্ত্য ঋষি। তিনি অমরেশ নামে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইখানে অনেকে বলেন যে অর্জুন এই শিবেরই নাম দিয়েছিলেন মল্লেশ্বর নিজের মল্লযুদ্ধের পরে।

স্বাতি বলল : আমার কী মনে হচ্ছে জান? ফেরার সময় আমার শিবালয়ম দেখব, সেখানেই বোধহয় বিজয়েশ্বর শিব।

আমি বললুম : বোধহয় তাই

কণক দুর্গার মন্দিরে পৌঁছতে আমাদের বেশি কষ্ট হয়নি। পথে দু'তিনবার মাত্র দাঁড়িয়েছি, আর বিশ্রাম করেছি কয়েক মিনিট। তারপরেই মন্দিরের প্রশস্ত অঙ্গনে পৌঁছে সমস্ত ক্লান্তি চলে গিয়েছে। বড় মনোরম শান্ত পরিবেশ। দেবতার আরাধনার উপযুক্ত স্থান।

মন্দিরে যাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল না। দেবী দর্শনের জন্যে তারা দু'লাইনে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষদের এক লাইন আর আর মেয়েরা অন্য লাইনে। মেয়েদের লাইন অনেক বড় দেখে স্বাতি আমার সঙ্গেই এগোল। পাণ্ডার অত্যাচার নেই, পূজারীরা হাত-পাতল না। বিদেশী দেখে যাত্রীরা আমাদের সমীহ করে দেখবার সুযোগ করে দিল।

কণকদুর্গা দেখে আমরা নটরাজকে দেখলুম স্বতন্ত্র মন্দিরে। তারপরে স্বাতি আমার স্মরণশক্তির পরীক্ষা নিল। বলল : এইবারে বলতো, আর কী দেখবার আছে?

আমি বললুম : রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া আর গঙ্গাবতরণ।

স্বাতি বলল : সে আমার মনে আছে, আর কী আছে বল।

বললুম : মল্লেশ্বর শিব।

যার মানে বুঝিনি, সেই কথাটি বল। তোমার মন যেমন বাধ্য তার প্রমাণ পাব এইবারে।

বললুম : কোনেক।

আর?

আর—

একটুখানি ভাবতেই মনে পড়ে গেল : চিকাভি কোনেক।

পরম বিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল : দারুণ।

বারো মাসী তখনও উপরে পৌঁছননি। সিঁড়ির দিকে একবার তাকিয়ে স্বাতি বলল : চল তাহলে তোমার কোনেক দেখে আসি।

যাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন অসম্ভব। ভাষা তার অন্তরায়। অনেক চেষ্টার পরে মন্দিরের এক ব্রাহ্মণের কাছে কোনেকের সংবাদ পাওয়া গেল। মন্দিরের পিছনে যাবার একটি পথ আছে, সেখানে গেলে কোনেক দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলুম, আর পৌঁছলুম একটি ছোট জলাশয়ের ধারে। গাঢ় সবুজ রঙের জল। এই পুকুরের নাম কোনেক না আরও কিছু দেখবার আছে এখানে, তা আমরা দেখলুম না! মামা মামী ওদের পৌঁছে দেবেন ভেবে ফিরে এলুম সেখান থেকে। আমি বললুম: কোনেক তো আরও একটা আছে, দেখবে না সেটা?

স্বামি বলল: এবারে তোমার মনকে ছুটি দাও। কষ্ট করে ও নাম আর মনে রাখবার দরকার নেই।

মামা ও মামীকে এবারে দেখতে পেলুম। মন্দিরের সিঁড়ির একটা ধাপের উপরে বসে মামা হাঁপাচ্ছিলেন, আর মামী দাঁড়িয়েছিলেন মেয়েদের লাইনে। আমি কাছে আসতেই মামা গর্জে উঠলেন, বললেন: আজেল দেখেছ এদেশের লোকের। এখন শুনতে পাচ্ছি যে মোটরে উঠবার রাস্তাও নাকি তৈরি হচ্ছে।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বললুম: মামাতে আর কষ্ট হবেনা।

মামীর পুজো হল, মামাও ঠাকুর দেখলেন। তারপরে আমরা মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরের দিকে এগোলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক বালক হিন্দী বলতে পারে। জিজ্ঞাসা করল: উপর থেকে শহরের দৃশ্য দেখবেন?

বলে পাহাড়ের ধারে নিয়ে গেল আমাদের। দেখলুম সিমলাওয়াতার দৃশ্য। এ যেন একটি পাহাড়ী শহর। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে নদী যাচ্ছে বেয়ে। ওপারেও পাহাড়। তার নাম নাকি সীতানগরম। পুরাকালে এইসব পাহাড় যুক্ত ছিল। কৃষ্ণানদীকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে ভগবানের কৃপায় পাহাড় সরে গেছে।

বালক বিশ্বাস করে এই গল্প। পথ চলতে চলতে আরও দুটি গল্প শোনাল আমাদের।

কলিযুগের প্রথম দিকে মাধব বর্মা নামে একরাজা ছিলেন। রাজপুত্র একদিন এক গরীব স্ত্রীলোকের ছেলেকে হঠাৎ মেরে ফেলে। সেই স্ত্রীলোকটি তেঁতুল বিক্রি করে কোন রকমে সংসার চালাত। রাজার কানে এই খবর যেতেই রাজা রাজপুত্রের বিচার করলেন। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল। রাজার এই বিচার দেখে মল্লেশ্বর শিব ভারি খুশী হলেন। তিনি দুজনের প্রাণই ফিরিয়ে দিলেন। রাজপুত্র আর সেই গরিব ছেলে দুজনেই বেঁচে উঠল।

দ্বিতীয় গল্প পণ্ডিতার্য নাম এক ভক্তের। একবার তিনি এখানে এসে বললেন যে শিবের ভক্তরা মুনিঋষিদের চেয়েও বড়। তার একটা মজার প্রমাণ দিলেন। জলন্ত অঙ্গার একটুকরো কাপড়ে রেখে শমী গাছের ডাল দিয়ে বাঁধলেন, অঙ্গার ছাই হয়ে গেল, কিন্তু কাপড় পুড়লনা। মল্লেশ্বর শিব খুশী হয়ে পণ্ডিতার্যকে দেখা দিয়েছিলেন।

পথের ধারে আমরা দুবার দাঁড়ালাম। একবার দেখলাম রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া, আর একবার গজাবতরণ। খোলা জায়গায় মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো দৃশ্য। যাত্রীরা এখানেও এক একটা প্রণাম করে যাচ্ছে।

আরও কয়েক ধাপ নিচে নামবার পরে মল্লেশ্বর শিবের মন্দির। এ মন্দিরও একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যে। মামা বললেন: অলৌকিক কথা তো অনেক শুনলুম, পুরাণ আর কিম্বদন্তীর কথা। তোমার ইতিহাস কী বলে?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: ইতিহাসে তো কিছু নেই। তবে শুনেছি যে এই মল্লেশ্বর শিবের মন্দির চালুক্যরাজা ত্রিভুবন মল্ল নির্মাণ করেছিলেন দশম শতাব্দীতে। মন্দিরের বয়স প্রায় একহাজার বছর হয়েছে।

মামা বললেন : দেখেছ কাণ্ড! রাজা নিজের নামে শিবের নাম রাখলেন, আর এরা বলছে যে অর্জুন মহা বুদ্ধ ভাল বাসতেন বলে শিবের নাম রেখেছিলেন মল্লেশ্বর!

মামী শিব পূজা করে তৃপ্তি পেলেন, আর মামা দূর থেকেই প্রণাম করলেন শিবকে। আমরা সুন্দর কিছু দেখবার জন্যে ঘুরে ঘুরে হতাশ হলুম।

এখান থেকে নেমে আসতে আমাদের একেবারেই কষ্ট হলনা। বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হলনা কোথাও। রিক্সাওয়ালারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্রাহ্মণ বালককে বিদায় দিয়ে আমরা আবার যাত্রা করলুম।

বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা শিবালয়ের সামনে এসে নামলুম। বড় মন্দির, যাত্রীদের আনাগোনায় মুখর হয়ে আছে। সব কিছু দেখে শুনে আমরা আবার ফিরে এলুম।

মামা বললেন : আরও কিছু দেখবার আছে?

স্বাতি বলল : না।

মামা আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম : আর কিছু নেই তা জোর করে বলা যায়না।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : খুব প্রাচীন শহর এই বিজয়ওয়াড়া। এর পৌরাণিক নাম বিজয় বাটিকা, আর ইন্দ্রের কোলাপুরম হল ঐতিহাসিক নাম। কাছেই কোথাও আছে নন্দী গ্রাম। ত্রেতাযুগে রাম যখন বনবাসে, তখন ভরত এই নন্দীগ্রামে এসে রামের নামে রাজা শাসন করেছেন। এক সময় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল এই অঞ্চলে। অনেক স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউএন চাংও এসেছিলেন এই সব দেখতে। খুঁজতে বেরলে কি আর কিছু দেখা যাবেনা!

মামা রিক্সায় উঠে বসেছিলেন। আমিও উঠে বসলুম তাঁর পাশে। স্বাতিদের রিক্সা এগিয়ে দিয়ে আমরা পিছনে চললুম। শিবালয় থেকে স্টেশনে ফিরবারই নির্দেশ ছিল রিক্সাওয়ালাদের উপরে।

পথে যেতে যেতে মামা বললেন : রামেশ্বর দর্শনে বেরিয়েছিলুম, এখন দেখছি এই অঞ্চলেই ঘুরে মরতে হবে।

আমি বললুম : ভাল কিছু দেখতে পেলে আফশোষ থাকবেনা।

মামা বললেন : ভাল কিছু না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। কোমরটা যেন না ভাঙে। অন্য কোথাও যাবার আগে সব কিছু জেনে নিও। এদের ওপর আর আমার বিশ্বাস নেই।

সত্যিই আজ তিনি কষ্ট পেয়েছেন। বললুম : আজই সব খবর সংগ্রহ করব।

কয়েকটি দোকানে আমি নানারকমের কাঠের খেলনা দেখতে পেয়েছিলুম। পরে জেনেছিলুম যে এর নাম কোণ্ডাপল্লীর পুতুল, বিজয় ওয়াড়ায় এই পুতুলও দেখবার জিনিষ। মাইল দশেক দূরে কোণ্ডাপল্লী গ্রাম। আগে সেখানে পাহাড়ের উপর একটা দুর্গ ছিল, এখন তার ধ্বংসাবশেষ আছে। কাঠের পুতুলগুলি এই গ্রামেই তৈরি হয়, বেনারসের খেলনার মতো এগুলিও বিখ্যাত। বিজয়ওয়াড়ায় বেড়াতে এসে লোকে এই সব পুতুল কিনে বাড়ি ফেরে।

দেখতে দেখতেই আমরা সদর রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। স্টেশনের ওপারের পাহাড়টি এখন দেখা যাচ্ছে। এই পাহাড়ের নাম নাকি গান্ধী পাহাড়। কয়েকটি ঘর-বাড়ি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। স্টেশনে যে ওভার ব্রিজ আছে—তাই দিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। তা নাহলে খালের উপরের পুল পেরিয়ে যেতে হয়। সহরে নাকি গোটা কয়েক পুল আছে।

স্টেশনে পৌঁছে আমরা রিক্সাওয়ালাদের বিদায় দিলুম।

[ক্রমশঃ

মেকসিকো অলিম্পিক ১৯৬৮

গল্প-ভারতী—কার্তিক। ১৩৭৫।

অলিম্পিকের উনিশ বছরের ইতিহাসে এবারের মত উত্তেজনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক এবং তীব্র প্রতিযোগিতা আর কখনো দেখা যায়নি। বিস্ময়কর ক্রীড়া নৈপুণ্য; অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড। বহু বহু পূর্ব-রেকর্ড ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার আগে এবং অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববাসীর মনে নানা সন্দেহ জেগেছিল। প্রথমতঃ, পৃথিবীর টুঙে উঠে মরণ পণ লড়াই, দমে কুলোবে তো? তারপর ছিল ছাত্র বিক্ষোভ। লাটিন আমেরিকায় এই প্রথম অলম্পিক হল। মেকসিকো বাসীরা এতবড় বিরাট অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে পারবে কিনা? এই সব সংশয়! কিন্তু দেখা গেল, এমন সুশৃঙ্খল বর্ণাঢ্য এবং সুব্যবস্থা-সম্পন্ন অলিম্পিয়াড খুব বেশী হয়নি। এবার সবচেয়ে যা পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে আমেরিকার বিস্ময়কর সাফল্য। ১০৬টি মেডেল লাভ করে আমেরিকা রাশিয়ার ১০৩টি মেডেল প্রাপ্তির রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে। এবার ছিল বিপুলতম আয়োজন। ১০৯টি দেশ থেকে প্রায় ৮ হাজার প্রতিযোগী। রেকর্ড। ১৫০০ রিপোর্টার জড় হয়েছিল সেখানে। এক লক্ষ দর্শকের বসবার ব্যবস্থা। এবারকার প্রতিযোগিতার আর একটি স্মরণীয় ব্যাপার হল, দৌড় বিভাগে নিগ্রোদের প্রাধান্য। ১৫টি দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে ১০টিতে 'কালো' প্রতিযোগিরা জয়লাভ করেছেন। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অলিম্পিকে নবীন প্রতিযোগী জাপানের শেষের দিকের কৃতিত্ব। প্রথম অবস্থায় পদক বিজেতা হিসাবে তার স্থান ছিল অনেক নীচে। শেষের দিকে অনেকগুলো মেডেল জেতার পর সে উপরে উঠে গিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করল।

এই বিরাট ক্রীড়া অনুষ্ঠান থেকে আমরা কি শিখলাম? শিখলাম যে, প্রস্তুতি, সাধনা এবং নিষ্ঠা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় এবং তা না থাকলে পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে অবধারিত ডুবে যেতে হয়। দীর্ঘ চার বছর ধরে প্রতিযোগিদের কি প্রাণঢালা প্রয়াস প্রস্তুতি এবং সাধনা। তারই প্রকাশ দেখা গেল ২০টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। চারবছর আগে টোকিও অলিম্পিকে হকিতে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল মেলবোর্নালে। অস্ট্রেলিয়া শপথ নিয়েছিল, এ গ্লানি তারা মোচন করবেই। সেই শপথের পিছনে ছিল প্রতিটি খেলোয়াড়ের নিবেদিত-প্রাণের আন্তরিক এবং নিরলস প্রয়াস। এবং কি আশ্চর্য! এই বছরেই তারা সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করল! হারিয়ে দিল, কাঁদিয়ে দিল ভারতীয় হকিবীরদের। সত্যিই, খেলার পর ভারতীয় দলের ম্যানেজার কেঁদেছে হাপুস নয়নে, কেঁদেছে অধিনায়ক, ফুঁপিয়েছে অন্যসব খেলোয়াড়রা আর ভারতীয় দর্শকবৃন্দ। কিন্তু এখন আর কাঁদলে কি হবে? ফুটির প্রাণ গড়ের মাঠ - এই মেজাজ নিয়ে কি আর জয়লাভ করা যায়। আর তাছাড়া হেরে গিয়ে মেয়েছেলের মতো কান্না কেন? সে যে আরো লজ্জার! খাঁটি কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী। আমাদের হারার কারণ, নিষ্ঠার অভাব, আন্তরিকতার অভাব। আমরা তার সঙ্গে যোগ করব—চরিত্রের অভাবও। আর তাছাড়া আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই বা সে মহৎ সে প্রেরণা দেবার পরিবেশ কোথায়। পাকিস্তান হকিদল যখন মেক্সিকো থেকে রওনা হচ্ছে তখন আয়ুব খাঁ প্রত্যেক খেলোয়াড়ের চিবুক নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, সোনার মালা নিয়ে আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু জিতে আসতে যদি না পার, তাহলে—এই বলে গলাটা একটু গম্ভীর করে নীচু স্বরে বলেছিলেন—তোমাদের কাউকে বাড়ী ঢুকতে দেবনা।

অলিম্পিক

জ্যোতির্ময়

ঐতিহাসিক প্রবাদ অনুসারে মহাবলী হারকিউলিসের সময়ে রাজা আজিয়াস-এর রাজত্বকালে এই মহাক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সূচনা। অনুমান খৃঃ পূঃ ১২৪৩ অব্দে অলিম্পিকের জন্ম।

প্রথম প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি দৌড় ছিল, ২০০ গজ। মাঠের মধ্যে খেলার চেয়ে ধর্মের ভাবই বেশী দেখা যেত। প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা এবং নৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। অলিম্পিকের পীঠস্থান অলিম্পিয়া নগরের আশে পাশে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সে সময়ে স্ত্রী-লোকদের ঐ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার অধিকার ছিল না।

পরে যখন রোমান খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সব বাজি জিততে লাগল তখন গ্রীকরা বললে যে, রোমানরা জোচ্চোর, তারা ঘুস দিয়ে বাজি মেতে। দুপক্ষে গালিগালাজ এবং নানা অযথা ব্যাপার চলতে লাগল। ব্যাপার দেখে রোম সম্রাট থিয়োডোসিয়াস খৃঃ পূঃ ৩৯৪ অব্দে এই প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন। তারপর পনেরো শতাব্দি পরে আবার এই মহা-প্রতিযোগিতা চালু হয়। এই পুনঃ প্রচলনের কৃতিত্ব ফরাসী নাগরিক ব্যারণ দ' কুবার্তিন-এর।

অলিম্পিকের আদি কথা সম্পর্কে অন্যান্য প্রবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে হেরাক্লেস (হারকিউলিস) এলিসের রাজা এজিয়াস কে এক যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে রাজাকে নিহত করে এলিস রাজ্য অধিকার করেন। এই বিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হেরাক্লেস এলিসের আলফিউস নদীর তীরবর্তী প্রান্তরে এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানের মত এখানেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ ছিল। প্রতিবৎসর এই দিনটির স্মরণে দেবাধিদেবের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আলফিউসের প্রান্তরে যে মহাপূজা, আনন্দ অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত তাই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা বলে মনে করা হয়। অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে হেরাক্লেস কর্তৃক রোপিত ক্যালিস্টোফানোস (পবিত্র অলিভ বৃক্ষ)—হেরাক্লেসের প্রতি সম্মানে—বৃক্ষ থেকে পত্র চয়ন করে পরবর্তী কালে অলিম্পিক বিজয়ীর মস্তকের মালা নির্মিত হত।

আর একটি প্রবাদ : পেলোপস ও ওয়েনোমাসের স্মরণীয় রথ প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত। পিসার রাজা ওয়েনোমাস তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা হিপোডামিয়ার বিবাহের জন্য এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে যে কুশলী বীর রথের গতি প্রতিযোগিতায় ওয়েনোমাসকে পরাজিত করতে পারবেন তাঁর সঙ্গে হিপ্পোডামিয়ার বিবাহ দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীকে হিপ্পোডামিয়াকে রথে বসিয়ে রথ পরিচালনা করতে হত এবং কিছুক্ষণ পরেই ওয়েনোমাস একটি জেভেলিন

হাতে নিয়ে নিজের রথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনুসরণ করতেন ও প্রতিযোগীর সম্মুখীন হওয়া মাত্র জেভেলিন নিক্ষেপ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতেন। তারপর রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে হিপোডামিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতেন। কিন্তু অপরূপ লাবণ্যময়ী হিপোডামিয়ার আকর্ষণ গ্রীক যুবকদের এমন মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল যে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পাণিপ্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত হতেন না।

শেষ পর্যন্ত তেরটি হতভাগ্য পাণিপ্রার্থী যুবক ওয়েনোমাসের তীক্ষ্ণ জেভেলিনের আঘাতে নিহত হওয়ার পর পেলোপস নামে এক বীর যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন সোজা পথে ওয়েনোমাসকে পরাজিত করবার কোন উপায়ই নেই, তাই ওয়েনোমাসের রথের সারথিকে উৎকোচের লোভে বশীভূত করলেন। রথ প্রতিযোগিতার অল্পক্ষণ পূর্বে সারথি ওয়েনোমাসের রথচক্র সংযুক্ত কীলক দুটি অপসারণ করে সেখানে মোমের কীলক প্রবিষ্ট করে রাখে। প্রতিযোগিতার সময় তীব্র গতিতে ধাবমান ওয়েনোমাসের দুটি রথচক্রই রথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও রথটি সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ওয়েনোমাসও মৃত্যু বরণ করেন। পেলোপস হিপোডামিয়াকে বিবাহ করেন এবং এই রথ প্রতিযোগিতার বিজয়ে পিতামহ জিউসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অলিম্পিয়ার প্রতিযোগিতা সুরু করেন। সেই প্রতিযোগিতাটিই প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে প্রচলিত।

কুবার্তিনের চেষ্টায় ১৮৯৬ সালে আধুনিক যুগের অলিম্পিকের প্রবর্তন হয়। তারপর কোন্ কোন্ বছর কোথায় কোথায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

বছর	স্থান	প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা	প্রতিযোগীর সংখ্যা	বিজয়ী দেশ
১৮৯৬	এথেন্স	১০	৪৮৪	গ্রীস
১৯০০	প্যারিস	১৬	১৪০৪	ফ্রান্স
১৯০৪	সেন্টলুইস	৭	১৬০৯	আমেরিকা
১৯০৬	এথেন্স	২১	৯০১	ফ্রান্স
১৯০৮	লণ্ডন	২২	২৬৬৬	ইংলণ্ড
১৯১২	স্টকহলম	২৭	৪৭৪২	সুইডেন
১৯২০	অ্যান্টওয়ার্প	২৬	২৭৪১	আমেরিকা
১৯২৪	প্যারিস	৪৫	৩০৮৫	আমেরিকা
১৯২৮	আমাসটারডাম	৪৬	৩৯০৫	আমেরিকা
১৯৩২	লসএঞ্জেলেস	৩৯	২৪০৩	আমেরিকা
১৯৩৬	বার্লিন	৪১	৪০৬৯	জার্মানি
১৯৪৮	লণ্ডন	৫৯	৬০০৫	আমেরিকা
১৯৫২	হেলসিনকি	৬৯	৪৮৬৭	আমেরিকা
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	৬৭	৩৫৩৯	রাশিয়া
১৯৬০	রোম	৮৪	৫৩৯৬	রাশিয়া
১৯৬৪	টোকিও	৭৮	৫৬০১	রাশিয়া

(১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে যুদ্ধের জন্য প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল)

১৯ তম (১৯৬৮) অলিম্পিকের বিশেষত্ব : টুকরো কথা—এই প্রথম অলিম্পিক স্পেনদেশে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ৭৩৪৯ ফুট উঁচুতে মেকসিকোয় অনুষ্ঠিত হল। এত উঁচুতে আর কখনো অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়নি। এই প্রথম একজন মহিলা অ্যাথলিট অলিম্পিকের মশাল জ্বালালেন।

আগেকার তুলনায় এবারে অনেক বেশি সংখ্যক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হয়েছে যাতে ৮০র বেশি দেশ অংশ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে ছিল, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, ডাকটিকিট, গ্রন্থ ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব প্রভৃতি।

এত উঁচুতে এই ধরণের কঠিন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়াতে অনেক অ্যাথলিটকে অক্সিজেনের অভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বীর রন্ ক্লার্ক দৌড়বার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সারা অস্ট্রেলিয়া সেজন্য বেদনায় মুহ্যমান হয়। তিনি স্বর্ণপদক পাবেন এই আশা তাঁর দেশবাসীরা করেছিল। রন ক্লার্ক সত্যিই এক রেকর্ড ভঙ্গকারী দৌড়বীর। আর একজন দৌড়বীর কেনিয়ার কিনো এবং সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বজয়ী বাইচ খেলার দাঁড়ি মারচিন সুগায় ও আমেরিকার বাইচ অ্যাথলিট বিল মেহারেও হিটের সময় জ্ঞান হারান। প্রতিযোগিতার সময় অ্যাথলিটদের অসুস্থ হয়ে পড়ার আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এবং একজন মারা গেছে।

• • •

তারপর মেকসিকোর ছাত্রবিক্ষোভ। সেও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। অবশ্য ছাত্ররা অলিম্পিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেনি। তাদের বিক্ষোভ ছিল শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত। কিন্তু অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় যে প্রায় নিশ্চিত হয়েছিল সবাই যে এবছরকার অলিম্পিক পণ্ড হবে—হয়ত আদৌ অনুষ্ঠিতই হতে পারবে না। কিন্তু মেকসিকোর ছাত্ররা অধৈর্যোদ্যত নয়। প্রতিযোগিতা সুরু হবার দু'দিন আগে তারা তাদের বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিলে। অলিম্পিককে তারা বিঘ্নিত করবে না। কিন্তু তাহলেও পুলিশের সতর্কতার শৈথিল্য ছিলনা। প্রতিযোগিতার সময় যাতে কোনরকম গোলমাল না হয় সেজন্যে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট যে বিপুল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা জেনে অবাক হতে হয়। ৯০ হাজার দর্শকের মধ্যে সাদা পোষাকে ৬০০০পুলিশ রাখা হয়েছিল। স্টেডিয়মের বাইরে প্যারাট্রুপ বাহিনী সব সময়েই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষারত ছিল। এতটুকু গোলমাল দেখলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাদের প্রতি এইরকম নির্দেশ ছিল। এমনকি স্টেডিয়ামের আশেপাশে তিনমাইলের মধ্যে যাতে কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেজন্যে হাজার হাজার পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, প্রধান প্রধান পথের ধারে, রাস্তার গায়ে গায়ে। কয়েক শত সামরিক বাহিনীর লোকদের সুসজ্জিত অবস্থায় ঝোপে ও খালের মধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বিরাট সতর্কতা অবলম্বন কিন্তু কোনই কাজে লাগেনি। কোথাও কোনরকম গোলমাল বা উত্তেজনার চিহ্নও দেখা যায়নি। উদ্বোধন উৎসব দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা সুশৃংখলার মধ্যেই শেষ হয়।

• • • •

অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম বেয়াদপির অপরাধে পদকবিজয়ী প্রতিযোগিদের বহিষ্কৃত করা হয়। দুই নিগ্রো প্রতিযোগী টমি স্মিথ ও জন কারলোস পুরস্কার নেবার সময় বিজয় সোপানে উঠে যে ভাবে হাত তুলে অভিবাদন করা উচিৎ তা না করে হাতে কালো দস্তানা পরে হাত মুঠো করে অভিবাদন করেন। এটা হল তাঁদের বিক্ষোভের প্রকাশ। নিগ্রো শক্তির প্রতীক এই কালো মুঠি দিয়ে তাঁরা জানাতে

চান যে জগতে অন্য সব মানুষের সঙ্গে নিগ্রোরাও সমান। অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের মতে এটা হল ঘোরতর অসভ্যতা ও অবজ্ঞার প্রকাশ এবং সেজন্যে তাঁরা ওই দুই প্রতিযোগীকে অবিলম্বে অলিম্পিক গ্রাম ছেড়ে যেতে হুকুম দেন। এই ব্যাপার নিয়ে দারুন বিক্ষোভ সেখানে, আমেরিকাতেও। অলিম্পিকের আসরে আরো অনেক প্রতিযোগী স্মিথ ও কার্লোসের প্রতি সমবেদনা জানাবার জন্যে কালো মুঠি প্রদর্শন করেন। অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিক্ষোভের জের এখনো মেটেনি। স্মিথ ও কার্লোসের প্রতি সমবেদনায় ও তাঁদের সমর্থনে আরও আটজন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা বর্জন করেন।

• • • •

এবারকার অলিম্পিকে সর্বসমেত মোট সাতাশজন ভারতীয় প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

পারভিন কুমার—হাতুড়ি ছোঁড়া

ভীম সিং—উচ্চলম্ফ

বিশ্বেশ্বর সিং, উমর চাঁদ, মুক্তিয়ার সিং ও সুরেশ কুমার—মল্লযুদ্ধ

ডাঃ করণ সিং ও রণধীর সিং—বন্দুক ছোড়া। মোহনলাল ঘোষ—ভারোত্তোলন।

এঁরা ছাড়া হকি দলে ছিলেন আঠারো জন।

• • • •

এই প্রতিযোগিতার নেপথ্যে অনেক হাসির ব্যাপারও ঘটেছে প্রতিযোগিদের ঘিরে। বেলজিয়াম থেকে আগত এক প্রতিযোগী দৌড় প্রতিযোগিতার হিটে যোগদানের সময় হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন? কী ব্যাপার? না, তাঁর মায়ের জন্যে মন কেমন করছে, তাঁকে না দেখলে তিনি দৌড়তে আসবেন না। কী ফ্যাসাদ! কোথায় তাঁর মাকে এখন পাওয়া যায়। তখন তাঁর সঙ্গী সাথীরা বুদ্ধি করে এক বৃদ্ধাকে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, মনে কর এই তোমার মা। প্রতিযোগীও খুশী হয়ে মহিলাকে মা মা করে ডেকে দৌড় দিতে ছুটল।

মালয়েশিয়ার সাইকেল চালক নীজুপং ভাষা বিভ্রাটে তাঁর শখের ও গর্বের চুল হারিয়েছেন। সেলুনে চুল ছাঁটতে গিয়ে তিনি মেকসিকোর নরসুন্দরকে যেভাবে চুল ছাঁটতে বলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নরসুন্দর সে ইঙ্গিত ও ভাষা বুঝতে না পেরে অথবা ভুল বুঝে দিয়ে দিয়েছিল সূক্ষ্ম এক কদম ছাঁট। আর্শিতে নিজের চুলের হাল দেখে নীজুপং দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন। সে কান্না আর তাঁর থামে না। অনেক কষ্টে তাঁকে ঠাণ্ডা করা হয়।

• • • •

অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম যে মেয়ে স্টেডিয়মের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন তাঁর নাম এনরিকুয়েটা ব্যাসিলিও। পয়মাসুন্দরী কৃষ্ণকুন্তলা নীলনয়না ব্যাসিলিও মেকসিকোর এক ক্ষেত্রমজুরের মেয়ে। বয়স কুড়ি। তিনি মেক্সিকোর হার্ডলস চ্যাম্পিয়ন। এই পুণ্য কাজের ভার পেয়ে ব্যাসিলিও বলেন—অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্টেডিয়মের অগণিত দর্শকের সামনে আগুন জ্বালাবার সময় আমি প্রসাধন করব না, চুল বাঁধবো না, ঠোঁটে রঙ মেখ না। স্টেডিয়মের চূড়োয় ওঠবার সময় নব্বইটি সিঁড়ি ভাঙতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমার মনের মধ্যে তখন থাকবে এক ঐশী প্রেরণা।

• • • •

এবারকার মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষার কড়াকড়িও এর আগে অন্য কোন বারে হয়নি। প্রতিযোগিদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা প্রতিযোগিদের মধ্যে রীতিমতো বিক্ষোভ ঘনিয়ে উঠেছিল। মেয়েরা যে মেয়ে আর পুরুষরা যে পুরুষ তা যাচাই করে দেখা হয়েছিল সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে। অষ্ট্রেলিয়ার একটি মেয়ে, দৌড়ে তাঁর পদক পাবার বিশেষ সম্ভবনা ছিল, পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেলেন। কারণ, তিনি তিনমাস গর্ভবতী! নিয়ম নেই কোন গর্ভবতী মেয়ের প্রতিযোগিতায় যোগদানের। অতএব চোখের জল ফেলতে ফেলতে মেয়েটি দর্শকদের সামনে দিয়ে বললেন। সেদিন রাত্রেই তিনি একদিকে দুঃখের ও অপরদিকে আনন্দের সংবাদটি স্বামীকে তার করে জানালেন।

অলিম্পিকে যে সব মহিলারা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েক শ' মেয়ে গত দু'বছর ধরে গর্ভ-নিরোধক বড়ি খেয়েছেন। উদ্দেশ্য, গর্ভবতী হলে অলিম্পিকে যোগ দেওয়া যাবেনা, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁদের ফেল করিয়ে দেওয়া হবে, দ্বিতীয়ত, প্রস্তুতির সময়েও গর্ভবতী হলে শারীরিক শুচিতা নষ্ট করে যাবে। এই নিরোধ ব্যবস্থায় শুধু বিবাহিতারাই নেই—কুমারীরাও আছেন!! সংবাদটি জানিয়েছেন অলিম্পিক গ্রামের একজন বিখ্যাত সাঁতার প্রশিক্ষক!

মেডেল জয় করে যাতে বিজয়িনীরা গর্ববোধ করতে পারেন সেজন্যেই গর্ভ-রোধের ব্যবস্থা।

• • • •

মেকসিকো অলিম্পিকে ১১৯-টি দেশ যোগ দিয়েছিল। এ পর্যন্ত কোন অলিম্পিকে এতগুলো দেশ যোগদান করেনি। অলিম্পিক গ্রামের লোক সংখ্যাও বেড়ে বেড়ে প্রায় ৮ হাজারে পৌঁছেছিল। তার মধ্যে ৬৮১৩ জন পুরুষ ও ৯৯৬ জন মহিলা ছিলেন।

বিশ্ব অলিম্পিকে অনেক নতুন রেকর্ড হয়েছে, অনেক রেকর্ড ভেঙেছে, অনেক কীর্তি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এবছর ১৯তম অলিম্পিকে দীর্ঘ লম্ফ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলেটিক বীর বব বীমন যে অবিশ্বাস্য কীর্তির স্বাক্ষর রাখলেন তা সারা জগৎকে বলতে গেলে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। এও কী সম্ভব নাকি? এক লাফে ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, এই রকম সহজ ধারণাই সকলের মনে এতদিন ছিল। কিন্তু বব বীমন তাদের সকলকে হতবাক এবং বিস্ময়াহত করে এমন এক রেকর্ড স্থাপন করলেন যা নাকি কেউ কোনোদিন ভাঙতে পারবে না। স্কোর বোর্ডে যখন তাঁর লম্ফের রেকর্ড ফুটে উঠল তখন বাটহাজার দর্শক প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিশেষজ্ঞরা এই অদ্ভুত লম্ফ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করে দিলেন। বিশ্ব-রেকর্ড ছিল তাঁরই দেশবাসীর র‍্যালফ বোসটনের ২৭ ফুট ৪½। সেই রেকর্ডকে একেবারে এক আধ ইঞ্চি দিয়ে নয় পোনে বাইশ ইঞ্চি দিয়ে ডজনছয় করা অবিশ্বাস্য বৈ কি। ক্রিড়া বিশারদরা এই অসম্ভব কীর্তির তুলনামূলক হিসাব কষে' বলেছেন, এই কীর্তি ৯'৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়ান, কিংবা ৩ মিনিট ২০সেকেণ্ডে ১৪০০ মিটার পার হওয়া, অথবা উঁচু লাফে ৭ ফুট ১০½ ইঞ্চির সমান কীর্তি। আমাইকার ২২ বছর বয়সী এই নিগ্রো অ্যাথলিটের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেহের অনুপাতে পা দুটো বেশী লম্বা। দেশের লোক তাঁকে বলে 'আমেরিকান কাঙারু'। আমাদের দেশের মানুষ হলে বলতাম, "কলির মহাবীর।'

• • • •

সত্যি, এবারকার অলিম্পিকে চমক লাগানো সব তাজ্জব ব্যাপার। একদিকে চলেছে মরণ পণ প্রতিযোগিতা আর একদিকে প্রেমের কলকূজন। এ যে আমাদের কবির সেই কথা চিরকালের সত্যি

বলে প্রমাণিত হল—"প্রেমে কাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে"। চেক মেয়ের জিমনাস্ট-রাণী ভেরা কাসলভিসকা, সেও বাদ গেলো না, ওখানেই গাঁটছড়া বেঁধে ফেলল চেক এ্যাথলিট জোসেফ এ্যাডলোজিলের সঙ্গে। 'পলকের দৃষ্টি করে করেছ একি সন্ন্যাসী। বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে।' শুধু ভেরা আর জোসেফই নয়, আরো অনেকেই সেই আমোঘ বাণের আঘাতে জরজর হয়েছে। কানাডার জিমনাস ছুঁড়িয়ে অর্থ ক্রসের সঙ্গে সুইডিস সাঁতারু আনেস মারিয়া, ইতালির সাঁতারু—প্রশিক্ষক ভিক বিতানের সঙ্গে মেক্সিকান দোভাষী নোরা বাজ এবং মেক্সিকান এ্যাথলিট মাতুয়েল রোসার সঙ্গে জিমনাস্ট রোজারিও ত্রিয়বক্রসের মালাবদলের পালা ওখানকার সিঁড়িতেই সাঙ্গ হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে শোকাবহ খবরও আছে। অস্ট্রেলিয় এ্যাথলেটিক দলের ম্যানেজার জেমস হার্ডলিন এখানে মারা গেছেন। ১৪ই অক্টোবর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ২০শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

• • • •

ভারত ছবিতে সেমি-ফাইনালের পরাজিত দুই প্রতিযোগির খেলায় ওয়েস্ট জার্মানীকে ২—১ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ছবিতে দেখলাম এই খেলায় জিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আনন্দে লাফাচ্ছে। ছবি দেখে হারার কী কারণ ভেবে পেলাম না।

• • • •

অলিম্পিকের ইতিহাসে ৪টি ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয় করার অতুলনীয় কীর্তির অধিকারিনী চেকমেয়ে ভেরার বিয়েতে রসহাভার মেক্সিকোবাসী আনন্দের আবেগে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়েছিল বিয়ের দিন। একটি মজার খবর। ভেরার বিয়ে খুব আকস্মিক। সে তার ম্যানেজার মিসেস দিমাসোভাকে নাকি বলেছিল, 'যদি দুটোর বেশী সোনার পদক পাই তবেই বিয়ে করব।' বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হল যে বর কনের বাপ মা এসে পৌঁছবার সময় পেলেন না। বিয়ের পর ভেরা বলেছে, সে তার চারটি সোনার মেডেল দেশের রাষ্ট্রনায়ক লুডোভিগ স্বোবোডা এবং পার্টির অন্যান্য কর্তাদের হাতে তুলে দেবে।

মেক্সিকো অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, এরকম সহজ সুন্দর আড়ম্বরহীন ভাবগম্ভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান তাঁরা অনেক অলিম্পিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু এরকমটি আগে কখনো দেখেননি।

এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানটিও হয়েছে তেমনি অনবদ্য, আন্তরিকতা আর প্রীতির আবেগে তুলনা রহিত। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এযাবের মত সুনিয়ন্ত্রিত, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রপূর্ণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান আধুনিক কালের অন্য কোন অলিম্পিক উপলক্ষে হয়নি। প্রতিযোগিরা পরস্পরের কাছে বিদায় নেবার সময় একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। মেক্সিকোর যুবকযুবতীরাও কেঁদেছেন আর তাঁদের বলেছেন —"আমাদের ভুলবেন না। আবার আসবেন। মেক্সিকোর দরজা আপনাদের জন্যে সব সময়েই খোলা থাকবে।" সারা মাঠে যেন আবেগ আর আন্তরিকতার বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এইদিন কালো আর সাদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। কালো ও সাদা ছেলেমেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

অনুষ্ঠান শেষে স্টেডিয়ামের সব আলো নিবে গেল। কেবল এককোনে উজ্জ্বল হয়ে রইল—"১৯৭৬ সাল, মিউনিক।" চার বছর পরে ১৯৭২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে—পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক শহরে।

অনুষ্ঠানের শেষে সবাই যেন অনুভব করেছিল—এমন একটি জগৎ এখানে সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্যে ধর্ম নেই, জাত নেই, বর্ণ নেই—সবাই এক জাতি এক প্রাণ!

মেক্সিকোর অনুষ্ঠান অলিম্পিক ইতিহাসের এক উজ্জলতম অধ্যায়—তাতে আর সন্দেহ নেই।

মেক্সিকো অলিম্পিকে বিভিন্ন দেশের অর্জিত পদকের খতিয়ান :—

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট		স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	৪৫	২৭	৩৪	১০৬	ক্যানাডা	১	৩	১	৫
রাশিয়া	২৯	৩২	৩০	৯১	ফিনল্যাণ্ড	১	২	১	৪
জাপান	১১	৭	৭	২৫	ইথিওপিয়া	১	১	০	২
হাঙ্গেরী	১০	১০	১২	৩২	নরওয়ে	১	১	০	২
পূঃ জার্মাণী	৯	৯	৭	২৫	নিউজিল্যাণ্ড	১	০	২	৩
ফ্রান্স	৭	৩	৫	১৫	ত্রিউনেশিয়া	১	০	১	২
চেকোশ্লোভিকিয়া	৭	২	৪	১৩	পাকিস্তান	১	০	০	১
পঃ জার্মাণী	৪	১০	১০	২৪	ভেনেজুয়েলা	১	০	০	১
অষ্ট্রেলিয়া	৫	৭	৫	১৭	কিউবা	০	৪	০	৪
বৃটেন	৪	৫	৩	১৩	অষ্ট্রিয়া	০	২	২	৪
পোল্যাণ্ড	৪	২	১১	১৮	সুইজারল্যাণ্ড	০	১	৩	৪
রুমানিয়া	৩	৬	৫	১৪	মঙ্গোলিয়া	০	১	৩	৪
ইতালী	৩	৪	৯	১৬	ব্রাজিল	০	১	২	৩
কেনিয়া	৩	৭	২	৯	বেলজিয়ম	০	১	১	২
মেক্সিকো	৩	৩	৩	৯	উগাণ্ডা	০	১	১	২
যুগোশ্লোভিয়া	৩	৩	২	৮	দঃ কোরিয়া	০	১	১	২
নেদারল্যাণ্ডস	৩	৩	১	৭	ক্যামেরুণ	০	১	০	১
বুলগেরিয়া	২	৪	৩	৯	জামাইকা	০	১	০	১
ইরাণ	২	১	২	৫	আর্জেন্টিনা	০	০	২	২
সুইডেন	২	১	১	৪	গ্রীস	০	০	১	১
তুরস্ক	২	০	০	২	ভারত	০	০	১	১
ডেনমার্ক	১	৪	৩	৮	তাইওয়ান	০	০	১	১

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে

[প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন গল্প-ভারতীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর অনেক লেখাই একদিন গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্য রসিকদের প্রচুর আনন্দ দান করেছে। আজ তিনি পৃথিবীর ওপারে। বিশবছর পূর্বে গল্প-ভারতীতে ছাপা তাঁর এই গল্পটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমরা কৃতার্থ।]

সম্পাদক—গল্পভারতী

চুম্‌কি

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

বাঁক বোঁটমের মেয়ে চুমকি, বয়স আঠারো উনিশ···গোলাপাড়ার ধানকলে কাজ করে। এখনো বিবাহ হয় নাই, বাপ মরিয়া গিয়াছে, মা পাগল—বিধবা পিসির কাছে থাকে। পিসি এক ভাওয়পোর সঙ্গে দু'বছর আগে বিবাহের ঠিক করিয়াছিল, পাত্র মাধব কো-অপারেটীভে সিমনের কাজ করে। মাধব আসিয়া চুমকিকে দেখিয়া গেল—দেখিয়া পছন্দ করিল।

পছন্দ কেন না করিবে? ছোটঘরে জন্মিলেও চুমকিকে বিধাতা রূপযৌবনের সম্পদে বিভূষিত করিতে কার্পণ্য রাখেন নাই। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী···যৌবনের নিটোল ছাঁদে দেহখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, কোথাও এতটুকু অনাবশ্যক মেদ-মাংস নাই এবং এ রূপযৌবন উপলব্ধি করিয়া তাহার রক্ষায় চুমকির ত্রুটী নাই। বিবাহের কথা প্রায় পাকা হঠাৎ চুমকি বলিয়া বসিল—ধেৎ ওকে আমি বিয়ে করবো কি! মানুষ—না—টিক্‌টিকি···লিক্‌লিক্ করছে না!

চুমকিকে পিসি জানে। যা ধরে, তাহা সে না করিয়া ছাড়েনা।

তাছাড়া চুমকিকে এখানে কতলোক চাহিয়া আকুল। কলের ম্যানেজার গোবিন্দ সাহা—প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রী মারা গিয়াছে · ঘরে একপাল ছেলে মেয়ে রাতদিন চ্যাঁ ভ্যাঁ···তাদের জ্বালায় গোবিন্দ যতখানি পারে নিজেকে কলেই আটকাইয়া রাখে! বেনী-রঞ্জিত গোলগাল আর-একখানি মুখের জন্য প্রাণ আকুল··· কিন্তু ঐ ছেলেমেয়েগুলোর মাঝখানে···এমনি চিন্তা অহরহ মনে যখন···

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যার আগে গোবিন্দ কলের সামনে বড়ির খাটিয়ায় খাতা খুলিয়া ক'দিনের হিসাব মিলাইতে বসিয়াছে···বাড়ী ফিরিবার আগে মুখ হাত ধুইয়া ফরমাসমাফিক চুমকি একটা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল···বলিল -তামুক নাওগো ম্যানেজার বাবু···

গোবিন্দর চমক ভাঙিল···চোখ তুলিয়া চাহিল। চাহিতেই চোখে পড়িল চুমকির যৌবন-কমনীয় মূর্তি ··কপালে ক'গাছি চুল ঘামে সাঁটিয়া আছে···দুইটা ঘনা-মাজা মুখখানি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—রং-ওঠা খাটো নীলাম্বরীখানা নিটোল গায়ে টানিয়া আঁটা·· গাছের পাতার ফাঁক বহিয়া অপরাহ্নের লাল আলো ঝরিয়া পড়িয়াছে চুমকির গায়ে···গোবিন্দর মনে হইল, তাহার মনের কামনা যেন ছবি হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

একদৃষ্টে গোবিন্দ অনেকক্ষণ চুমকির পানে চাহিয়া রহিল·· হারানো যৌবনের একটা সুর বুকের মধ্যে ঘনিয়া ঘনিয়া পাক খাইতে লাগিল···কলিকা লওয়ার কথা মনে উদয় হইলনা।

কাজটুকু সারিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে·· চুমকি কহিল—হাঁ করে তাকাচ্ছো কি ম্যানেজার বাবু··

অতিভূতের মতো গোবিন্দ হুঁকা হাতে লইল···হুঁকায় কলিকা আঁটিয়া দিয়া চুমকি চলিয়া যাইতেছিল···

গোবিন্দ ডাকিল—চুমকি··

চুমকি ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—কিছু কি বলবে ম্যানেজার বাবু?

গোবিন্দর সব কেমন গোলাইয়া গেল! যে কথাটা ঠেলিয়া কণ্ঠে আসিয়াছিল, চুমকির চোখের দৃষ্টি দেখিয়া সেকথা নিহরিয়া আবার যেন বুকের গহনে ফিরিয়া গেল!

চুমকি কহিল বলোনা গো, কি বলবে!

আমতা আমতা করিয়া গোবিন্দ বলিল না·· মানে, চিরকাল গোলায় এমনি ধান মেপে, ধানমেপেই কাটাবিরে চুমকি?

প্রশ্নটা চুমকি ঠিক বুঝিল না···নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল গোবিন্দর পানে · দুচোখে কৌতূহলী দৃষ্টি।

কথাটাকে ঘুরাইয়া কোনোমতে গোবিন্দ বলিল,—তাপর···তোমরটি হয়েছিস তো···এখন একটি বিয়ে-থা করে'···

ভ্রূকুটিভরে চুমকি বলিল—হুঃ···বিয়ে করে' তারপর, পরের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরি আর কি!

কথাটা বলিয়া চুমকি আবার চলিয়া যাইতেছিল·· গোবিন্দ বলিল— বিয়েতে যদি এত তোর ভয়··· তাহলে শোন একটা কাজের কথা বলি···

চুমকি বলিল—কি?

গোবিন্দ একবার চাহিল চারিদিকে·· কাছাকাছি কেহ ছিল না·· নির্জন অবসর···যেন প্রজাপতির ইঙ্গিত · ঘরিয়া হইয়া গোবিন্দ বলিল,—অর্থাৎ নেহাত বেজাত কিনা·· বিবাহ তো হইতে পারে না···তবে গোবিন্দর বৌ যারা গিয়াছে · তাকে দেখিবার জন্য, ঘর করিবার জন্য একজন লোক তো চাই তা চুমকিকে গোবিন্দর খুব ভাল লাগে · চুমকি যদি গোবিন্দর সব ভার গ্রহণ করে—বিবাহ নয় · অথচ···অর্থাৎ কলে তাহা হইলে চুমকির উন্নতি যা করিয়া দিবে · আর চুমকিকে লইয়া গোবিন্দ আলাদা ঘর-সংসার পাতিবে···ছেলে মেয়েদের সঙ্গে এতটুকু সংস্রব থাকিবে না ··এবং এ নূতন ঘরে চুমকি হইবে সর্বময়ী কর্ত্রী · টাকাকড়ি গোবিন্দ আনিয়া চুমকির হাতে দিবে···অর্থাৎ গোবিন্দকে চুমকি রাখিবে সম্পূর্ণ তার হাতের তালুতে ইত্যাদি।

কথাগুলো চুমকি শুনিল একাগ্রে মনোযোগে...তারপর বাতাসে গাছের পাতা যেমন করিয়া নীচে পড়ে ··তেমনিভাবে স্নেহের ফুৎকারে কাটিয়া একপাক ঘুরিয়া চুমকি বলিল—ধেৎ কি যে বলো ম্যানেজার বাবু ··তোমার বয়স হলো কত···বলে, আমার বাপের বয়সী···ছিঃ! কথার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে অন্তর্ধান।

ব্যস্···জলবিম্ব ফুটিতে না ফুটিতে টুটিয়া বিলাইয়া গেল !

তারপর আরো কতজনের বুকে চুমকি কি ওরফ না তুলিয়াছিল ! ··ও-পাড়ার ঐ বহু কথক··· চুমকিকে সেদিন তাকঘরের কাছে একা পাইয়া বলিয়া বসিল—চণ্ডীদাসের গল্প জানিস্ চুমকি ? চণ্ডীদাস রে···মস্ত সাধক···মস্ত পণ্ডিত তা ঐ চণ্ডীদাস মজেছিল রামী-ধোপানিতে। আমিও তেমনি তোকে দেখে ·· বুঝলি চুমকি···তুই পথ চলিস, আর আমার মনে হয়, যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাওয়োতো অর্থাৎ তোর তো ও পা নয় ··যেন সকালের মিষ্টি-মিষ্টি রাঙা রোদের আভা···

ব্যাখ্যা শুনিয়া চুমকি হো-হো করিয়া হাসিয়া মুখ বাঁকাইয়া জবাব দিল,—আর থাক্ ঠাকুর মশাই, আমার গায়ে রাঙা রোদ্দুরের গুঁড়ো ছড়াতে হবে না পাঁচজনে দেখলে তোমাকে জাতে ঠ্যালা করবে।

তারপর বৃন্দাবন বৈরাগী··অম্বিকাদের তরুণ পুত্র শশধর·· চুমকি সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে··· অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিমায় ! হতাশের দল অবাক হইয়া ভাবিত—চুমকির বুকে মন বলিয়া কি কোন পদার্থ নাই ?

সকলে তারপর আরো অবাক হইয়া গেল সেদিন, ভবিষ্যতের সব আশা নির্মূল করিয়া তারা শুনিল, কালু মিস্ত্রীর বেকার বখাটে ছেলে নিতাইয়ের সঙ্গে চুমকির বিবাহ হইয়া গেছে। দেখিতে কার্ত্তিকটি হইলে কি হয়, নিতাইয়ের মতো হতভাগা এ-তল্লাটে আর নাই।

কালু মারা গিয়াছে—কালু কাজ করিত এখানকার চটকলে—মিস্ত্রীর কাজ···সাহেব খুব পেয়ার করিত কালুকে ··মাহিনা দিত মাসে চল্লিশটা করিয়া টাকা···তার উপর ছিল উপরি। কালু মারা গেলে হতভাগা নিতাইকে ডাকিয়া সাহেব বলে চাকরি দেয়···একেবারে ত্রিশ টাকা মাহিনা···কিন্তু সে-চাকরি নিতাই রাখে নাই। নেশা করিয়া কামাই করিয়া তিন-তিনবার সদপেণ্ড···কত অরিমানা···শেষে চার বারের পর ওপারে নেশা করিয়া সাত-সাতদিন পড়িয়াছিল—তখন তার হয় বরখাস্ত।

সেজন্য তার এতটুকু আপশোষ নাই ! বাড়ীতে বিধবা মা···মায়ের হাতে আছে কিছু সঞ্চয়···তার উপর হাতের আছে দু'দুটা গরু—সে গরুর দুধ বেচিয়া মা যে-টাকা আনে তাহাতে দুটো প্রাণীর অন্ন বস্ত্র খুব কুলাইয়া যায়। তার উপর নিতাইয়ের নেশা···তার টাকাও কাঁদিয়া কাটিয়া মারধোর করিয়া নিতাই ঠিক আদায় করিয়া লয় ! বিবাহে নিতাইয়ের ঝোঁক ছিল না, মায়ের জিদে চুমকিকে বিবাহ করিতে কিন্তু আপত্তি করিল না। তার কারণ চুমকি পয়সা রোজগার করে—তার সে-টাকাটা কোন্‌না নিতাইয়ের নেশার খরচে আসিবে···তার উপর চুমকির চেহারাখানা নিতাইয়ের মনে রীতিমত নেশা জমাইয়া তুলিয়াছিল !

বিবাহের পর একটা মাসও শান্তিতে কাটিল না। চুমকি কারো আধিপত্য বা শাসন নিষেধ মানিয়া চলিবে, সে-স্বভাবই তার নয় শাশুড়ীও চিরকাল কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে। সেই বা এ নবাগতার স্বাধীন ইচ্ছা কি বলিয়া সহিবে। চলা-ফেরা ওঠাবসা লইয়া দুজনে নিত্য খিটিমিটি বাধে ··কেহই ছাড়িয়া বা সহিয়া থাকিবার পাত্রী নয় মাঝে হইতে সুবিধা মিলিয়া গেল নিতাইয়ের · বৌয়ের বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া মা আসিয়া ছেলেকে বলিত—ওরে নিতাই...বৌও করিত নালিশ শাশুড়ির নামে, জানলে তোমার মা ··

দুজনের নালিশ শুনিয়া নিতাই যেদিকে যার পক্ষে রায় দিত, তার দিক হইতে চাহিবামাত্র তৎক্ষণ কয়টা টাকা পয়সা বাহির হইয়া আসিত। তাহাদের বাড়ী ছিল এতকাল নিরুপদ্রব নিরীহ নিস্তব্ধ বৈচিত্র্যহীন ...এখন প্রত্যহ এই নালিশ করিয়াযে বৈচিত্র্যে ভরিয়া বাড়ী কলরব-কোলাহলে সজীব হইয়া উঠিল !···

নিতাই বেকার বলিয়া তার চাকরীর কি প্রয়োজন ? সংসারের জন্য চাকরি···টাকার জন্য চাকরি !

সংসারে মায়ের ভার—আর টাকা যখন চাহিবামাত্র পাওয়া যায়—মিথ্যা বাড়িয়া মরি কেন? ভবিষ্যৎ? যেখার হাত যারা যুক্তিয়াছে, ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের মনে স্থান পায় না!

এমনি ভাবে দুটো বছর কাটিয়া গেল। তারপর ·

চুমকির ছেলে হইতে··আর একটা মাস বাকী। এ-অবস্থায় লইয়া জলে কাজ করা চলে না। চুমকি ছুটী নিয়াছে। বাড়ীতে যাবে।

আগন্তুকের পায়ের ধ্বনি তার কাণে বাজে। আগন্তুকের উদয় সম্ভাবনায় তার মনে কেমন স্বপ্নের ছোঁয়া লাগিয়াছে। ঘরে বসিয়া ছেঁড়া কাপড় দিয়া কাঁথা সেলাই করে···কাঁথায় কত রকমের নক্সা তোলে···

সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসিয়া ভাবে·· কত কথা ভাবে। আকাশে চাঁদ ওঠে···চুমকি ভাবে খোকাকে লইয়া দাওয়ায় বসিবে, ঐ চাঁদকে ডাকিয়া বলিবে,—আয় চাঁদ—তি দিয়ে যা...

·· উঠানে পেয়ারা গাছের ডালে একটা চয়না পাখী বসে। দেখিয়া চুমকি ভাবে—খোকা হলে খোকার জন্ত ঐ চয়না ধরে দেবো···

ভাবে এমনি আরো অনেক কথা। সেদিনও সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসিয়া চুমকি ভাবিতেছিল··· খোকা? না, খুকী?·· যাই হোক তারি তো··· ! দাওয়ায় একটা দোলনা খাটাইয়া দিবে সেই দোলনায় শোয়াইয়া দোল্ দিতে দিতে চুমকি ··

টলিতে টলিতে নিতাই আসিয়া বাড়ী ঢুকিল·· আসিয়া চুমকির সামনে বসিল, দুটো টাকা দে, চুমকি।

চুমকির স্বপ্ন গেল ভাঙিয়া · চুমকি ফিরিয়া চাহিল।

নিতাই বলিল—দে·· টাকা দে--এখ্খনি চাই···দুটো···

চুমকির সর্ব্বাঙ্গ রাগে কঠিন হইয়া উঠিল । চুমকি বলিল— টাকা আমার নেই।

—না, নেই! ভ্রুকুটি করিয়া নিতাই বলিল,—আছে আলবৎ আছে টাকা···দে, বলছি চুমকি ! দিধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুমকি বলিল—যদি, থাকে টাকা, তবু আমি দেবো না · মরে গেলেও না।

—হুঁ···এতবড় আস্পর্দ্ধা · দিবি না·· মরে গেলেও না।

নিতাইয়ের ভঙ্গী চুমকির ভালো লাগিল না কোনমতে তাকে ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্তে বলিল— শোন ··দুদিন পরে ছেলে হবে···তার খরচপত্তর আছে·· এখন কি এমন ভালো দেখাবে? না, উচিত তোর··· ছেলের কথা ভেবে···

নিতাই খিঁচাইয়া উঠিল, কহিল—ও ছেলে? ছেলে আমি নেই মান্‌তা নেহি জান্‌তা···যার ছেলে সে দেখবে·· আমার টাকা চাই বাবা, টাকা···টু কপী···

চুমকির আবার রাগ হইল···অনেক বেশী চুমকি বলিল,—দেবো না আমি টাকা—কখনো না, তুই যা ··

—যাবো! তোর বাড়ী তোর হুকুমে আমি যাবো···বটে।

কাকে বুঝাইবে! ও কি মানুষ! চুমকি চলিয়া যাইতেছিল ··

দেখিয়া নিতাই হুঙ্কার তুলিল—হুঁ! তুচ্ছ করা · খাঁচল উড়িয়ে ধনী বললেন·· কখনো না···বলিতে বলিতে নিতাই উঠিল দাওয়ায় ··উঠিয়া চুমকির টুঁটি চাপিয়া ধরিল, ধরিয়া তাকে ঠেলিয়া দিল একেবারে দেওয়ালের দিকে...ছম করিয়া পড়িয়া গেল চুমকি ··

ছেলের হুঙ্কার শুনিয়া মা গোয়াল হইতে বাহিরে আসিল, ছেলে তখন আবার বীরবিক্রমে চুমকির হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। যেভাবে ধরিয়াছে···চুমকির ভয় লাগিল নিজের জন্য নয়—পেটে বেটা আছে··· তার কত আশার · কত কামনার ধন চীৎকার করিয়া চুমকি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমার·· পেটে বেটা আছে···এমনি নাহলে মরে যাবে ··

যাক্ মরে' · বলে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম · হুঁ বলিয়া সবলে এক ঝট্‌কা.. চুমকি একেবারে মুখ গুঁজিয়া পড়িল গিয়া একেবারে দাওয়ার নীচে.. শুধু একটি আর্ত্তরব তুলিল—মাগো...

তারপর সব চুপ !···

মা চিৎকার করিয়া উঠিল—করলি কি হতভাগা—ওরা পোয়াতি..এমন করে আছাড় মারলি... হাতে খড়ি পড়বে যেয়ে হতভাগা—নিতাই চাহিয়া দেখে.. চুমকি পড়িয়া আছে মাটীর ডালের মত...কাপড় চাকা...আর কাপড়খানা যেন রাঙ্গের রঙে রাঙা...

শিহরিয়া সে সরিয়া পড়িল...

বাড়ী ফিরিল দুদিন পরে তখন সন্ধ্যা হয়-হয়...

মা বলিল—কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা ?

ছেলে বলিল—খুনের কিনারা হলো মা ?

নেশায় এখনো ভর—মা বিরক্ত হইল। বলিল—একদিন ফাঁসিকাঠেই ঝুলবে তুমি !

নিতাই বলিল—খুন হো গিয়া ?

মা বলিল—ভগবান বাঁচিয়েছেন দুটো দু'টাই হয়েছে ! ভাগ্যে পাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবুটি তখন বাড়ী ছিলেন . কেঁদে গিয়ে পড়লুম....বললুম দাওয়া থেকে বৌ পড়ে গেছে—তা, যাক, ফাঁড়া যে কেটে গেছে... সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়েছি ..খোকা হয়েছে রে.. দিব্যিটি....

নিতাই দাঁড়াইয়া রহিল···যেন কাঠ !···

মা বলিল—যা, দেখে আয়·· ছেলের মুখ দেখতে হয় রে ··

নিতাই আসিল আঁতুড়ের সামনে। আঁতুড়ে চুমকি তখন খোকাকে দুধ দিতেছে ·

দ্বারের সামনে ছায়া···চুমকি মুখ তুলিল। খুসী হইল অনেকখানি···অত মার খাইলেও মন চাহিতেছিল, কখন নিতাই আসিবে। ··

বলিল—খোকা·· তোমার মতন মুখ · আখো···আঁচলের নীচ হইতে খোকার মুখ বাহির করিয়া দেখাইল বলিল সুন্দর···না ?

—বেড়ালছানা।···নিতাই মুখ বাঁকাইল।

হাসিয়া চুমকি বলিল—নিজের ছেলেকে বুঝি বেড়ালছানা বলতে আছে !··

নিতাই বলিল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে···দুটি ভাত চাই, বাবা···পেটে যেন বোমা ফাটছে !

চুমকি বলিল—মাকে বলো গিয়ে ..ভাত কি আছে ! তোমায় ক'দিন দেখা নেই মা বলছিল দু'চারদিন রেঁধে রেখে ভাতগুলো ফেলে দিতে হলো !....কুকুরের পেটে গেল !

নিতাই বলিল—অত শত বুঝি না....আমায় ভাত চাই...এখনি....যেখান থেকে পারিস্ নিয়ে আয়।

চুমকি বলিল;—আমায় যে নড়াচড়া মানা·· পাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবু বারণ করে গেছেন....জানো

ডাক্তারবাবু খুব ভালো লোক ··রোজ দুবার করে এসে দেখে যান.. সকালে একবার··আর সন্ধ্যার সময় একবার। খোকা হয়ে কাঁদেনিকো.. চক্ষু মেরে মেরে ডাক্তারবাবু তবে ওকে কাঁদালেন।

নিতাইয়ের অধৈর্য্য বাড়িল...বলিল—ওসব কান্না-কান্না দিকের রাখ্ তুলে। ভাত মাংতো...ভাত লাও ··।

···চুমকি বলিল—বলছি তো, মাকে বলো...

—কি . হুকুম! হুঁ...আমায় হুকুম চালাচ্ছিস ··চিনিস্নে আমাকে ?

নিতাইয়ের দু'চোখে আগুন জ্বলিল।···

...ভয় পাইয়া চুমকি ডাকিল—মা···মা...

পাশুড়ি শুনিল · বলিল কি ?

চুমকি বলিল, ভাত চাইছে।

পাশুড়ি বলিল—তো বোস্···ওকে বলছিস্ কি...ও কি ঐ শরীরে গিয়ে ভাত রাঁধতে বসবে।

—আলবৎ রাঁধতে বসবে....কি এমন নবাবের মেয়ে....

—ভালো জ্বালা.. সব সময়ে মেলা করে থাকবি যদি·· আমি এখনি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি...

মা চলিয়া যাইতেছিল ··নিতাই ধরিল মায়ের হাত...বলিল—না, তোমার হাতে খাবো না, ও যেমে রেঁধে !....

তারপর চুমকির দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—ওঁ নবাবের বেটি শুয়ে থাকবেন আর আমার বুড়ো মা গিয়ে রাঁধবে···বটে !

মা রাগ করিল, বলিল—মা, ও, রাঁধবে না · রাঁধতে পারে কখনো ?··

নিতাই কি ভাবিল, তারপর বলিল, রাঁধতে পারবে না ?...আচ্ছা, তার দরকার নেই...আমি হোটেলে গিয়ে খাবোখন...

চুমকির পানে চাহিয়া বলিল—একটা টাকা দে...

দুঃখে রাগে অপমানে চুমকির সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছুটির জ্বালা। চুমকি বলিল,—টাকা আমি দেবো না.... খালি-খালি টাকা দেবো....আর সে টাকার মদ গিলে এসে আমাকে ধরে পিটুনি দেবে...বটে !—

—তোর বাবার কি...বিয়ে করেছি তোকে...রাখতে পারোনা বলে খৎ লিখে বিয়ে করিনি তো ! বলিতে বলিতে রাগ গেল চড়িয়া···চুমকির চুল ছিল এলানো...সেই চুলের মুঠি ধরিয়া জোরসে টান্...

ঠিক সেই সময়ে যাকে বলে, নাটকীয় ক্ষণ...

দাওয়ার নীচে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠ—কোথায় গো নিতাইয়ের মা...

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু উঠিলেন দাওয়ার উপর...স্থপাল চাটুয্যে...এম-বি পাশ করিয়া দু'বছর প্রাকটিস সুরু করিয়াছেন ..টাকার চাপে বুকের দয়া-ধর্ম্ম এখনো পিষিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় নাই।

দাওয়ায় উঠিয়াই যে দৃশ্য দেখিলেন, স্থির থাকিতে পারিলেন না...ঝাঁপ দিয়া নিতাইয়ের উপরে পড়িলেন—তার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া তাকে দাওয়ায় আনিয়া ফেলিলেন—ফেলিয়াই জোর একটি ধাক্কা—সামলাইতে না পারিয়া নিতাই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তারবাবু হাঁকিলেন—রাস্কেল...এখনি খুন করেছিলি ! ভয়ানক হেমারেজ্ হয়ে...

কথা শেষ হইল না...সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজ পড়িল। হুঙ্কার দিয়া চুমকি কহিল—কোথাকার মানুষ

তুমি···চলে যাও...আমার চোখের সামনে আমার সোয়ামীকে এমন করে' তুমি...মরদ দেখতে এসেছেন... ভারী আমার ডাক্তারবাবু রে !

মা বলিল—হুঁ—কেমনধারা তদ্দরলোক তুমি...ঘরের মধ্যে আমাদের যদি কসড়াবাটি হয়....তার মাঝখানে তুমি ...

ডাক্তারবাবু হতভম্ব...বলিলেন, কিন্তু...তুমি দাঁড়িয়ো না...দাঁড়িয়ো না নিতাইয়ের বৌ—এখনি সর্ব্বনাশ ঘটে যাবে...

—ঘটুক সর্ব্বনাশ...আমার ঘটবে...তোমার তো নয়—তুমি যাও—এখন চলে যাও বলছি...আমায় দেখতে হবে না তোমায় ..সোয়ামীকে করবে লাহনা...

মা তুলিল বৌয়ের কথার প্রতিধ্বনি···বলিল—হাঁ...যাও তো তুমি চলে...ডাক্তার দরকার নেই আমাদের...তুমি যাও ..

কৃপাল চাটুয্যে বলিলেন...যাচ্ছি আমি...আচ্ছা তোমার বৌকে শুয়ে পড়তে বলো নিতাইয়ের মা.. না হলে এখনি বিপদ হবে...প্রাণে মারা যেতে পারে...

চুমকি বলিল.—আচ্ছা ..আচ্ছা...আচ্ছা ..আমার প্রাণ আর তোমায় রক্ষা করতে হবে না.... তুমি যাও....

অপ্রতিভের মতো ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন....নিতাই তখন ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে —আলুথালু টক্‌টকে রাঙা দুই চোখ—কিম্ভূত-মূর্ত্তি !

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাচলী' গল্পটী এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হল।

তাঁর পরলোক গমনের পর গল্প-ভারতীতে তাঁর তিন চারটি অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করে আমরা তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকদের আনন্দ বর্দ্ধন করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলেম।

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিনেতারূপে মঞ্চে নেমে অভিনয়ের মধ্যে যতই ডুবে যাও, একথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুললে চলবে না যে, তুমি কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে বাঁধা, যথা, তোমার সামনে দর্শকরা বসে আছেন, তাঁরা তোমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, তোমার কথা শুনছেন, সুতরাং তাঁদের সেই দেখা এবং শোনাকে তোমায় সার্থক করতে হবে। তারপর তোমার আশেপাশে সহ-অভিনেতৃরা রয়েছেন। তাঁদের সম্বন্ধেও তোমায় সজাগ থাকতে হবে। সর্বশেষে, তোমায় এমনভাবে সর্বক্ষণ নিজেকে স্টেজের উপর চালিত করতে হবে যাতে তোমার অভিব্যক্তি, চলা বলা, এমন কি ভুরু কাঁপানো পর্যন্ত দর্শকদের নয়নগোচর হয়। তাই তো, আলমগীরে যখন তুমি আত্মনিমগ্ন হয়ে Trance দৃশ্য অভিনয় করবে তখনো তোমাকে সজাগ থাকতে হবে, Spot lightটা কীভাবে তোমার মুখে এসে পড়ছে, ঠিকমত পড়ছে কিনা, অর্থাৎ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তোমায় করতে হবে। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েও এই যে চেতনা না-হারানো—অভিনয় তো এরই সমন্বয়।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

১৯২৯ সালের ২রা জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আচার্য মন্মথ মোহন বসুর পরিচালনায় আমরা আলমগীর নাটকটি অভিনয় করেছিলাম। সেই সময় একাধিকবার আমরা শিশিরকুমারের কাছে যাই এবং এই নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করি। মনে পড়ছে, যখনই গেছি তখনই তিনি কী উদার প্রসন্নতায় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলমগীর চরিত্রটিকে তিনি বিশদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন, নানা ছোট ছোট অথচ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে স্বপ্ন দৃশ্যটি নিয়ে তিনি বহু সময় ব্যয় করে একাধিক তুলনামূলক দৃষ্টান্তের দ্বারা নাটকের এই দৃশ্যটির ব্যাখ্যা করেন।

সেই প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে থেকে প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে দিলাম। তাঁর সেদিনকার সেই কথাগুলির তাৎপর্য আজো সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

বিগতযুগের মঞ্চ নায়ক

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

জন্ম ১২৮, ডিসেম্বর ১৮৬৮। মৃত্যু ২৮শে নভেম্বর ১৯৩২

একদা বাংলা থিয়েটারের দর্শক যে-অভিনেতার নাম প্রাচীর-পত্রে দেখলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে, থিয়েটারের গ্যালারী, পিট্, স্টল, অর্কেষ্ট্রা, ড্রেস সার্কেল,—সব আসন পূর্ণ করে ফেলতেন, যে-অভিনেতার নামে রঙ্গমঞ্চে যাদু বিস্তারিত হত, যে অভিনেতা মঞ্চে প্রথম দেখা দিলেই সমবেত দর্শক মণ্ডলী বিপুল করতালি ধ্বনি জানাতেন প্রতি রাত্রে প্রতি অভিনয়ে, বিগত যুগের সেই নট কেশরী দানীবাবুর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল এই বছর। কিন্তু এহেন নটকুলতিলকের জন্মশত বার্ষিকী পালনের কোন উদ্যোগ নেই। বর্তমান বাংলা থিয়েটারের মালিকরা যে কী করে এই বিশেষ স্মরণীয় ঘটনাটি ভুলে গেলেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। তাঁরা তো অনেকেই দানীবাবুকে দেখেছেন, দেখেছেন সেই নট-কেশরীর তপস্যার শক্তি, প্রতিভার বল, প্রতিভার প্রভাব, হৃদয়ের তেজ, রুদ্ধ বিক্রম, দুর্জয় প্রতাপ। তবে?

সমালোচকের চুলচেরা বিচারে দানীবাবুর অভিনয়-ক্ষমতার মধ্যে হয়ত অনেক 'খামতি' আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কি ছিল তাঁর অভিনয়ের মধ্যে যার জোরে তিনি সকল ত্রুটির ঊর্ধ্বে উঠে মঞ্চের ওপর চিত্তগ্রাবী অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন, কি করে তিনি তাঁর অভিনীত সকল চরিত্রকেই এমন প্রত্যয়যুক্ত করে তুলতেন যার জোরে দর্শক বেবাক্ আত্মবিস্মৃত হোতো? তাঁকে দেখেছি —দুর্গেশনন্দিনীতে ওসমান, সিরাজদ্দৌল্লার সিরাজ, চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, বলিদান-এ করুণাময় ও দুলালচাঁদ, শাস্তি কী শাস্তিতে প্রসন্ন, সাজাহান-এ ঔরঙ্গজেব, মেবার পতন-এ অমরসিংহ, সরলায় গদাধরচন্দ্র, মোগল-পাঠান-এ সেরশাহ, দেবলাদেবীতে খিজির খাঁ, কালাপাহাড়ে লেটো, প্রফুল্লর যোগেশ, পোষ্যপুত্রে শ্যামাকান্ত, পথের শেষেতে দুর্গাশঙ্কর, শ্রীগৌরাঙ্গে চাপাল গোপাল ইত্যাদি বহু নাটকে। বিভিন্ন চরিত্র। এবং তাঁর অভিনয়ে প্রত্যেকটা চরিত্রই যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। মূলত তিনি ছিলেন ট্রাজেডির নায়ক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে? সেখানেও তিনি তুলনারহিত বলা যেতে পারে। তাঁর গদাধরচন্দ্র, লেটো এবং দুলালচাঁদ যিনি দেখেছেন তিনিই একথা স্বীকার করবেন। অমৃতলাল বসু এই প্রসঙ্গে একদিন গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন —"গুরুদেব, আপনি মস্ত ভুল করছেন, দানীকে 'কমিক' পার্ট দেন না কেন? অর্দ্ধেন্দুর পর ওর মত কমিক পার্ট করবার লোক বাংলা স্টেজে নেই।" প্রথম যৌবনে দানীবাবু স্টার থিয়েটারে কয়েকটি ছোট ছোট রসিকতাপূর্ণ চটুল ভূমিকায় অভিনয় করেন। যৌবা নামক প্রহসনে একটি ছোট ভূমিকায়, গিরিশচন্দ্রের হীরক জুবিলিতে মাতালরূপে এবং অমৃতলাল বসুর প্রায় বিরাটে ভোলা কামারের বেশে তিনি প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান তুলতেন।

কণ্ঠস্বরে, চেহারায় এবং অন্যান্য ছোট ছোট ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যেকটি ভূমিকায় প্রাণ মাতানো অভিনয়ে দর্শকরা যে বিহ্বল অভিভূত হোত তার কারণ বোধকরি তাঁর দুর্জয় প্রাণশক্তি। কী অদ্ভুত প্রাণময় অভিনয়ই না করতেন তিনি। প্রাণ ঢেলে দিয়ে চরিত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। কোনোদিন তাঁর কোনো অভিনয়ে এর ব্যত্যয় ঘটতো না। অভিনয়-শিল্পের এতখানি একনিষ্ঠ মহাসাধক, এমন ভক্তি ও বিশ্বাস, আর কোনো নটের জীবনে দেখা গেছে, একথা সহজে বলা যায় না। প্রতিটি অভিনয়ের মধ্যে কী দুর্বার প্রাণের স্ফুরণ, কী অমিত তেজ, কী অপার আন্তরিকতা। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর চোখ মুখের মধ্যে দিয়ে ভাব প্রকাশের অতুলনীয় ক্ষমতা। প্রফুল্ল নাটকে যখন জানকীকে লাথি মেরে বাক্সটা নিয়ে পালাচ্ছেন, অথবা যখন একটা পয়সা দাওনা বলে ভিক্ষে চাইছেন, শাজাহানে ঔরঙ্গজেবরূপে যখন দারার মৃত্যু-দণ্ডের দলীল লিখে আলীর হাতে দিচ্ছেন (এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে) তখন কথা আর কতটুকু? সবটুকুই তো এক্সপ্রেসন। আর কী অপূর্ব সেই সব অভিব্যক্তি। সারা প্রেক্ষাগার হাততালিতে ফেটে পড়ত।

এই সূত্রে দানীবাবু সম্বন্ধে মনীষী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। তার মধ্যে পাঠক কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য ও কাহিনী পাবেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রাভিনেতা

নাট্য-বেদজ্ঞ নটশেখর

নরেশচন্দ্র মিত্র

অশীতিবর্ষ অতিক্রম করেও নাট্যানুশীলনে বিস্ময়কর

কর্মোদ্যমের মধ্যেই পরলোকগমন করেছেন।

এই বিভাগে অন্য পৃষ্ঠায় আমরা তাঁর

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

॥ তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক ॥

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু

বেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮৯০ সালের ২৪শে জুলাই গিরিশচন্দ্রের চণ্ড নাটকে দানীবাবুর প্রথম অভিনয়। তারপর একে একে বহু নাটকেই তিনি ছোট বড় বহু ভূমিকায় অভিনয় করেন। তার মধ্যে সিরাজএর ভূমিকায় তাঁর প্রথম অভিনয় তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অতঃপর ১৯১১ সালে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এত উচ্চ শ্রেণীর হয় যে সারা সহরে লোকের মুখে মুখে সে কথা শোনা যায়।

যে-দৃশ্যে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নন্দর সভা হইতে চলিয়া যান, যেখানে চন্দ্রগুপ্তকে শিষ্য বা পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন, যে স্থানে অবসন্নচিত্ত চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করেন, যেখানে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশও উপেক্ষা করিতে তিনি দ্বিধা করেন না, যেখানে ভিখারীর নিকট হইতে কন্যাকে ফিরিয়া পান—সে সমস্ত দৃশ্যই অতুলনীয়। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথম রাত্রে বক্সে বসিয়া চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় দেখিতেছিলেন। যখন দানীবাবু নন্দকে অভিশাপ দিবার দৃশ্যে "সেই দিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপ"..... বলিয়া সরোষে চলিয়া গেলেন, তখন সেই দৃশ্যের শেষে স্বয়ং নাট্যকার বন্ধুসহ নামিয়া আসিয়া দানীবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "দানী, তুমি সত্যিই ব্রাহ্মণ।"

• • •

গিরিশ-স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে একটি সম্মিলিত অভিনয় হয়। শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল ও আবু হোসেন অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। ভূমিকা লিপি ছিল এইরূপ: যোগেশ—দানীবাবু, রমেশ—শিশিরকুমার, সুরেশ—শৈলেন চৌধুরী, শিবনাথ—রবি রায়, কাঙালী চরণ—হীরালাল দত্ত, মদন ঘোষ—যোগেশ চৌধুরী, পীতাম্বর—কার্তিক দে, যাদব—আশমানতারা, মাতাল—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, ভক্তহরি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, উমাসুন্দরী—তারাসুন্দরী, জানদা—সুরমসুধাময়ী, প্রফুল্ল—প্রভা, জগদম্বা—সুশীলাবালা, মাতালিনী—আশ্চর্যময়ী।

আবু হোসেনে আবু—দাঁতুবাবু, যোবেদা—সুবাসিনী, দাই—চারুশীলা, বাদশা—হীরালাল দত্ত, মন্থর—শান্তকড়িবাবু, সখী—কৃষ্ণভামিনী ইত্যাদি।

এই অভিনয় হয় ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর। এই রাত্রির জন্য প্রবেশ মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু তবুও এই অভিনয়ে এত দর্শকের সমাগম হয় যে অনেকে মূল্য দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে স্বীকৃত হইয়াও প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। অনুমান ৫০০০ হাজার টাকারও বেশি টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

অভিনয় হইয়াছিল খুব সরস ও উচ্চকলাসম্মত। নূতন ও পুরাতন যুগের দুই বিরাট অভিনায়ক আজ এক সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, এই প্রথম এক সঙ্গে অভিনয় করিবেন, সেই বিশাল জনসংঘ আজ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, আজ পুরাতনের জয়, না নূতনেরই প্রাধান্য।

প্রাণ ঢালিয়া ধানীবাবু যোগেশ চরিত্রের অভিব্যক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার একাগ্রতায় সকলে মুগ্ধ হইল। অবশ্য শিশির ভাদুড়ি মহাশয়ের অভিনয়ও খুব ভাল হইয়াছিল, তবে সেদিন ধানীবাবুর প্রশংসাই অধিক হইল।

অভিনয়ের জন্য ধানীবাবু খুব প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। তিনি কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে পারে আশঙ্কায়, অভিনয়ের পূর্বে দুইদিন পর্যন্ত কাহারো সঙ্গে কথা বলেন নাই। ইসারায় ভাব ব্যক্ত করিতেন। অভিনয় রাত্রে একটি প্রকাণ্ড ভোজ হয়, সকলেই তাঁহাকে মদ খাইতে বলেন, কিন্তু অভিনয় কালে তিনি কখনো সুরা পান করেন নাই।

• • •

ইহার পরে ১৯২৯ সালে মনমোহন থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়ির উদ্যোগে ধানীবাবু ও শিশিরবাবু মিলিত হইয়া সাজাহান এবং প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় করেন (৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৯)। এখানেও ধানীবাবু খুব প্রশংসা পান।

একটি দৃশ্যে সাজাহান-বেশী শিশিরকুমার হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া আওরঙ্গজেব রূপী ধানীবাবুকে বলেন, "বাচ্ছা, বড় রোগা হয়ে গিয়েছো।" কথাগুলি নাটকে নাই।

পরদিন আবার শিশিরবাবু—যোগেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ধানীবাবুর "ভালো মোর ভাইয়ে, চাঁদরে" প্রভৃতি কথা তাঁহাকে বলিবার অবকাশ না দিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলেন, "কি, এখানে আবার কি মাতলামো করতে এয়েছো?" হঠাৎ এইরূপ সম্বোধিত হইয়া ধানীবাবু প্রথমে একটু থতমত খাইলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই সামলাইয়া লইলেন এবং শিশিরকুমারের চিবুকটি কৌশলে ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে, "বাঃ! উকীল কী চিজ রে" বলিয়া আবার একটু পরেই উচ্চৈস্বরে "যেদো, ধর ধর তোর কাকাবাবুকে ধর" বলিয়া এমন অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দিলেন যে, দর্শকের উল্লাস আরও যেন শতগুণ বর্ধিত হইল।

এই অভিনয়ের রাত্রে নির্মলেন্দুবাবুকে ভজহরি রূপে দেখিয়া শিশিরবাবু বলেন, "বাঃ, ছোকরা বাবার খেয়ে বেশ গোলগাল চেহারাটি করেছে তো?" নির্মলেন্দুবাবু কথাটা ভুলিলেন না। একটু পরে ভজহরি যখন বলেন, "এই, দু'টাকার মদ, আড়াই টাকার পাঁঠা" ইত্যাদি, তখন যোগেশ উত্তর দেন, "ওহে ছোকরা, দু টাকায় এখন আর মদ পাওয়া যায় না।" সঙ্গে সঙ্গে ভজহরি বলেন, "তা, মদের কথা, দাদা, তুমি যেমনটি জানবে এমন আর কে জানবে বল।"

অতঃপর যোগেশ যখন ভজহরিকে মুদ্রাদোষ ধুঁধুরিয়া সারিতে বলেন, তখন নির্মলেন্দুবাবু উত্তর করেন, "দু'টাকা দিলে শিশির ভাদুড়ি পর্যন্ত সারতে পারি। মুদ্রাদোষ সারতে পারি না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া শিশিরবাবু কাঙালীকে বলেন, "ওহে কাঙালীচরণ, তোমার ভাগনের কথাবার্তা তো দেখছি ভাল নয়—।"

বলা বাহুল্য এসব কথা নাটকে নাই। শুনিয়াছি, এই কৌতুকপূর্ণ ঘটনায় নাকি উভয়ের মধ্যে একটু মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধা নিবেদন

"তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ!
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশায় নেশায় করি জীবন যাপন।"

"রঙ্গভূমি ভালবাসি"—নরেশচন্দ্র এই কথাটি যেমন করে নিজের জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন তেমন বোধকরি আর কেউ নন! সেই যে ১৯২২ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেলারামের স্বল্পেশিতায় একটি ছোট ভূমিকায় পেশাদার নটরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সেইদিন থেকে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রঙ্গভূমিকে তিনি ছাড়তে পারেন নি। বয়স হয়েছিল একাশি, বলতে গেলে প্রায় বধির, তবুও অভিনয় করবার কি প্রবল স্পৃহা। আর সে অভিনয় ছিল না দুর্বল জরাগ্রস্তের অক্ষম প্রচেষ্টা, সে অভিনয় ছিল প্রায় সেই আগেকার দিনের মতোই তেজোদীপ্ত, ব্যঞ্জনাময়। শেষের ক'দিন আগে তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে যাত্রার আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর অতুলনীয় অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলেন। কর্ণার্জুন নাটকে শকুনি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে চরিত্র-চিত্রণের যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে বহু বহু চরিত্র রূপায়ণে তাঁর সেই ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। অভিনয়কলা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর ছিলেন এক অনন্যতন্ত্র নাট্য-শিক্ষক ও পরিচালক; বস্তুত তিনি বড় ছিলেন অভিনেতারূপে, না, নাট্যশিক্ষকরূপে তা আলোচনার বিষয়। আমরা আজ তাঁকে স্মরণ করছি এক অসামান্য শক্তিধর অভিনেতারূপে, প্রায় পঞ্চাশ বছর নিরলস যত্নে তিনি বাংলার লক্ষ লক্ষ নাট্যামোদীকে যে আনন্দ দান করে গেলেন, সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে সে কথা স্মরণ করছি, ইংরাজ কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলছি—

Go, get thy honours home
Rank with the best
Garrick Kemble and the rest
Who made a nation purer
Through the Art.

এই সূত্রে বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভিনয় শিক্ষা" গ্রন্থে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম। নাট্য-শিক্ষকরূপে তিনি অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও তাঁদের রূপসজ্জা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে চিন্তা করতেন এবং তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

মঞ্চাভিনয়ে রূপসজ্জা

সুরেশচন্দ্র মিত্র

অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলে, তিনি চার পাশের আলোকমণ্ডলীর প্রাখর্যের দ্বারা যে আবেষ্টিত হন, একথা দর্শকবৃন্দ বুঝতে পারেন না। মঞ্চ যদি ভালরূপ আলোকিত হয়, তাহলে অভিনেতার সামনে স্পট লাইট কিম্বা হাই পাওয়ার রিফ্লেক্টার থেকে নির্গত আলোর প্যাচ্ এসে পড়ে, ছায়ার বা কখনো অডিটোরিয়মের পিছন থেকে নিক্ষিপ্ত প্রখর ক্যালসিয়মের আলোয় তার ঔজ্জ্বল্য বর্ধিত হয়।

এই যে মঞ্চের উপর আলোক শ্রেণীর ব্যবস্থা এর উপকারিতা কি? এর উপকারিতা হচ্ছে, প্রথমত, অভিনেতার মুখের স্বাভাবিক রং ও ছায়াকে নষ্ট করে সেই স্থানে অস্বাভাবিক রং ছায়া প্রভৃতি সৃষ্টি করা। রং এবং স্বাভাবিক ছায়াকে তাড়াতে হবেই এবং তাঁর আকৃতিকে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অংশ থেকে অভিনেতাকে সুন্দর রূপে দেখা যায়। এখানে বলা কর্তব্য, এইগুলি সম্পূর্ণরূপে মেকআপ বা রূপসজ্জার উপর নির্ভর করে।

পেণ্ট করবার আগে দেখতে হবে নাটকোল্লিখিত ব্যক্তির বয়স কত, তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী কিরূপ, এবং তিনি কোন জাতীয়। এই বুঝে এমনভাবে পেণ্ট করতে হবে যাতে স্বাভাবিক রঙের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। এর পর মুখমণ্ডলের উপর স্বাভাবিক যেসমস্ত ছায়া পড়ে—সে সমস্ত ছায়া আলোর সংস্পর্শে দূরীভূত হয়, সুতরাং রূপসজ্জার সময়—সেইসব ছায়ার স্থানগুলি নির্দেশ করে পেণ্ট করতে হবে।

রঙ্গমঞ্চে আধুনিক আলোক প্রণালীর যে ব্যবস্থা আছে তাতে মেকআপ অবশ্যকর্তব্য অর্থাৎ না করলে চলবে না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকেও যদি আলোক-বেষ্টিত মঞ্চের উপর দাঁড় করানো হয় এবং তিনি যদি মেকআপ বিহীনা হন তাহলে শুধু যে তাঁর রং বিশ্রী দেখাবে তাই নয়, তার সঙ্গে তাঁর চোখ সংকুচিত দেখাবে এবং উজ্জ্বলতাবিহীন বোধ হবে। ফলে তাঁকে বয়স্কা বা বৃদ্ধা দেখাবে। এমন কি, একটা কালো ধূসর বর্ণের ছায়া তাঁর মুখের চারদিকে লেগে থাকবে। আবার অন্য দিকে কেবল মাত্র আলো ও পেটিং-এর গুণে একজন শ্রীহীনা বালিকার মুখের যা কিছু খুঁত সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার আকৃতি ভঙ্গিমা এমন মনোহর হয় যাতে দর্শকদের কাছে সে অপরূপ সুন্দরী বলে অভিনন্দিত হয়।

তবে একটা কথা বলা দরকার। মেকআপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে যিনি একদশার্ট তাঁরই উপর একাজের ভার দেওয়া উচিৎ।

আমরা অনেক সময়ে দেখেছি, যে কোন মেকআপম্যানকে দিয়ে হাল সারা গোছের মেকআপ করানোর ফলে, বিশেষ বিশেষ ছোট বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপর হাজার ভাল অভিনয় করা সত্ত্বেও দর্শকদের মন জয় করতে পারেননি · তার কারণ, ভুল মেকআপ, ত্রুটিপূর্ণ মেকআপ, যার দরুন সুন্দরকে মঞ্চের উপর অসুন্দর দেখিয়েছে।

নাট্য প্রবাহ

গত মাসের নানা অভিনয়। দলগত উৎকর্ষ : নতুন নাট্যরূপ।

বালীগঞ্জ নাট্য সংসদ। গত মাসে দক্ষিণ কলকাতার যুক্ত অঙ্গন মঞ্চে এঁরা আলোক বর্ষের 'বাঘ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

এক অধ্যাপকের চরিত্রে দিলীপ চ্যাটার্জীর অভিনয় স্বাভাবিক। থানার দারোগার ভূমিকায় এবং থানার ও-সির ভূমিকায় যথাক্রমে সোমেন চক্রবর্তী ও সমর ঘোষের অভিনয় সহজ এবং সুন্দর। সর্দার পেয়ারীলালের চরিত্রের ক্রূরতা নিরঞ্জন ভৌমিক স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি লঘু চরিত্রে ছেংত্রুত চক্রবর্তীর অভিনয় অতিরঞ্জিত হলেও দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাতে পেরেছে। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে শিব শেখর নন্দর দর্শকদের মনে রেখাপাত করেন।

নাটকের পরিচালনায় ও নায়কের ভূমিকায় স্নেহময় রায়চৌধুরী স্বাভাবিক ও যথাযথ।

লোকমঞ্চ। সম্প্রতি এই মঞ্চের শিল্পীরা মিনার্ভায় ম্যাকসিম গোর্কির 'এনিমিজ' নাটকের বাংলা রূপ 'দানব' নাটকটি অভিনয় করলেন। নাটকটি বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন সুনীল দত্ত।

লোকমঞ্চের শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। নাট্যকার সুনীল দত্ত ও রমেন নন্দী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন—আনন্দ ঘটক, গোপাল হালদার, শ্যামলাল সোম, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত দাঁ, বৃন্দাবন কুণ্ডু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক নন্দী, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র ঘোষ, তপন সেন।

মঞ্চ পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন বৃন্দাবন কুণ্ডু।

সুদর্শনা নাট্যগোষ্ঠী। সম্প্রতি বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'নিতাই গড়গড়ির' বৌ মুক্ত অঙ্গনে প্রদর্শিত হয়েছে। নাট্যকার একটি চিরন্তন সামাজিক ব্যাধির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এ নাটকে। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—সীমা বিশ্বাস, কুমার শোভন, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, মধু ব্রহ্মচারী, পরিমল ভট্টাচার্য, অভেদ্যুশেখর, তনুশ্রী দত্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, জীতেন দত্ত, রমেন মুন্সী, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচার। গত মাসে এই সংস্থা সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে প্রশংসা পাবেন চন্দ্রকান্তের ভূমিকায় অশোক মিত্র। কাত্যয়নির চরিত্রে অলকা বসুকে চমৎকার মানিয়েছিল। সীতা চক্রবর্তীর ইন্দুমতী অনু। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতও চমৎকার। কমলমুখীর চরিত্রে গৌরী রায়-এর অভিনয় সন্তোষজনক। নেপথ্য-কণ্ঠশিল্পী কুমারী রাখী চ্যাটার্জীর কণ্ঠসঙ্গীত শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি (হাতিবাগান শাখা)

সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে সাংস্কৃতিক বিভাগের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক 'মরণী, আমের মরণী' নামক নাটকটি অভিনীত হয়েছে। বিখ্যাত রুশ লেখক আন্তন চেখভের 'চেরী অর্চার্ড' অবলম্বনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি রচিত করেছেন। এমন একটি পরীক্ষামূলক কঠিন নাটক নির্বাচন করে উদ্যোক্তারা যে বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

নাটকটি শুধু সু-অভিনীতই হয়নি, স্থানে স্থানে অভিনেতৃবৃন্দের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। নাটকটির নির্দেশনার ভার ছিল শ্রীপশুপতি বসুর উপর। তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে পালন করেছেন। দলগত অভিনয়ে সকলেই যথাযথভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। অভিনয়াংশে ছিলেন, সর্বশ্রী শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস বসু, মনতোষচন্দ্র দে, তপনকুমার দেবনাথ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, মনীগোপাল পাল, সতীশচন্দ্র দত্ত, শিবাজী সিংহ রায়, সুবলচন্দ্র সুর, ভোলানাথ বাগচী, শ্রীমতী দীপালী চক্রবর্তী, শ্রীমতী বীণা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বনু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চ ব্যবস্থায়, আলোক সম্পাতে, রূপসজ্জায় এবং নেপথ্য সঙ্গীতে যথাক্রমে সর্বশ্রী রাধারমণ ভাণ্ডারী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শক্তি সেন ও বিদ্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় কর্মকুশলতার স্বাক্ষর রাখেন। সহ নির্দেশনায় শ্রীরমেন ভাদুড়ীর কর্মকৃতিও উল্লেখযোগ্য।

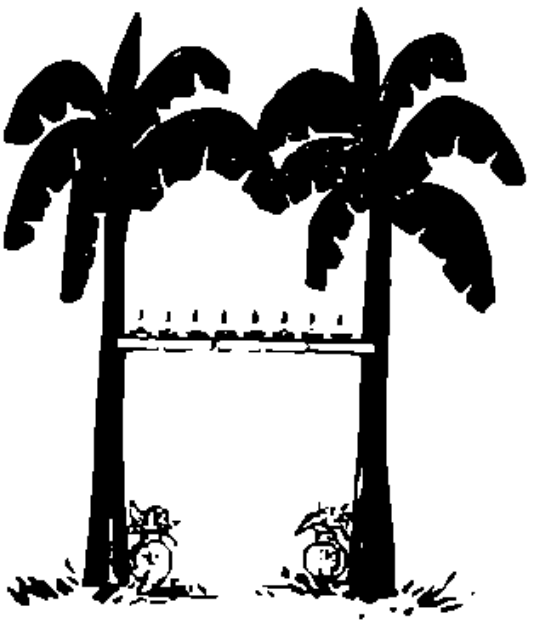

দীপান্বিতা ও ভাইফোঁটা

ক্রোড়পত্র

শঙ্খ-ভারতী কার্তিক ১৩৭৪

"গৃহস্থের গৃহ আছে, আবার তার প্রাঙ্গণও আছে। গৃহের ভিতরে যে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধসূত্রে বাস করে, গার্হস্থ্য ধর্মের সাধনায় কল্যাণশক্তি অর্জন করে, পুষ্ট করে, রক্ষা করে—প্রাঙ্গণে সেই কল্যাণশক্তির প্রেরণায় সে বাহিরে এসে বিশ্বকে কোল দেয়। প্রাঙ্গণ-ই তো পাড়াপড়শীর সঙ্গে মেলামেশার স্থান। গৃহস্থের বাড়ীর উঠানেই পাঠশালা বসে, ছেলেরা ছুটাছুটি খেলা করে, চণ্ডীমণ্ডপে বসে সদালাপ, সদ্যুক্তি, সামাজিক ভাবে দেবার্চ্চনা, আনন্দ উৎসব, বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ সবই চলে। গৃহস্থের কল্যাণবুদ্ধি এখানেই বিশ্বের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে।

রবীন্দ্রনাথ

দীপান্বিতা

লীলিমা সেনগুপ্ত

বাংলা দেশকে মিথিলের দেশ বলে যাঁরা অভিহিত করেছিলেন, তাঁরা হয়তো রাজনৈতিক মিথিলের কথা ভেবেই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন—কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হবার বহুপূর্বেও এ দেশের পথে যে নিত্য নতুন মিথিল দেখা যেত সে হল উৎসবের মিথিল। একদা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা সোনার বাংলায় বার মাসে তেরো পার্বণ হত। উৎসবে, আনন্দে, প্রাচুর্যে বাংলা অন্য সকলকার আকর্ষণীয় ছিল। সেই আকর্ষণের ফলেই আজ বাংলা দেশ সকল প্রদেশের লোকের বাসভূমি, আর বাঙালী নিজ বাসভূমে পরবাসী। কিন্তু দুঃখের বন্যায় উৎপাটিত-মূল বাঙালীর মনচিত্ত, সাংস্কৃতিক চেতনা সমস্ত প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করে আজও এই উৎসব ধারাকে প্রবহমান রেখেছে।

অতীতকালে—যখন আধুনিক যুগের প্রমোদ কেন্দ্রগুলি যথা—সিনেমা হল, বিভিন্ন ক্লাব, প্রভৃতি স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তখন এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে উপলক্ষ্য করেই মানুষ মিলিত হত। তাই বিভিন্ন ব্যক্তির বিচিত্র ভাবসম্পদে পুষ্ট এই উৎসবগুলি বাঙালীর জাতীয়তার প্রতীক, ঐতিহ্যের ধারক।

বাংলা দেশে ঋতুর আবির্ভাব হয় তার বিচিত্র বর্ণ ও রসের সম্ভার নিয়ে। তাই তার আগমনের সঙ্গে সমতা রেখে বাঙালী তার উৎসবগুলি সৃষ্টি করেছে। এখন শরতের অরুণালোকে মাঠ ঘাট প্লাবিত। বর্ষার বর্ষণ ক্লান্ত আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে শরৎ এসেছে। সোনা ঝরা রোদে, শেফালী গন্ধ মাখা বাতাসে উড়ছে তার উত্তরীয়। স্থলপদ্ম আর, কাশবনের হাতছানিতে মন কোথায় উধাও হয়ে যেতে চায়। শরতের নির্মেঘ আকাশ, তার বর্ণ-গন্ধের সমারোহ বাঙালীর উৎসব প্রিয়তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। তাই তাদের সম্বৎসরের সবচেয়ে বড় উৎসব 'দুর্গাপূজা', 'কালীপূজা' প্রভৃতি এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার শেষে এখন কালীপূজা আসছে। কালীপূজার উৎপত্তি

কথায় বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী, গীতা ও দুর্গাসপ্তশতীতে কাহিনীগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও শক্তি যে পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে পূজিতা ও সকল শক্তির মূলে অবস্থিতা, তা নিয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। শাক্তধর্ম ছাড়াও, অন্যান্য ধর্মে—এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও পরোক্ষভাবে শক্তিপূজার উল্লেখ দেখা যায়।

বর্তমানে হিন্দুরা প্রতিবৎসর কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহরে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাধ্যমত উপচারে তাঁর পূজা করেন।

কালীপূজার প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে জাগে। কালীর বর্ণ কালো কেন? যাঁর চক্ষু তারকায় চন্দ্রসূর্য্যের দ্যুতি বিদ্যমান, যাঁর শরীরের দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ আলোকিত, তাঁর বর্ণ এমন মসীময় কেন? এ বিষয়ে শাস্ত্রে যাই থাকুক না কেন, আমাদের সহজ বুদ্ধিজাত যুক্তি এই যে যেখানে সমস্ত বর্ণের অবসান তা কালো, যেখানে দিক ও কাল অন্তর্হিত হয় তা কালো এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবীতে অসীম মসীবর্ণ ও আদ্যাশক্তি ভিন্ন কিছুই ছিলনা। কালোর মধ্যেই অসীমত্বের অনুভব করা যায়। বোধহয় এইজন্যই শক্তি শ্যামা রূপে পূজিতা ও বোধহয় এই-ই তাঁর উপযুক্ত বর্ণ। এই কালোরূপই শত শত ভক্তচিত্তকে যুগে যুগে আলোকিত করে রেখেছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

"কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের আভাস
স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।"

কালীপূজার পরই আসে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা। অমাবস্যার রাত্রিতে অলক্ষ্মীকে দূর করে মা লক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে তোলা হয়। সৌন্দর্য্যের, ঐশ্বর্য্যের আলোক বিকীর্ণ করে মা আসেন, তাঁর চরণকমল স্পর্শে ধন্য হয় গৃহস্থের গৃহাঙ্গন—বিকশিত হয় ভক্তজনের চিত্তশতদল।

পূজার অন্তে উৎসবের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে এলে তারই ছোঁয়া লেগে থাকে বাংলার মেয়েদের মনে তখন সে কল্পলোকের দেবতাকে ছেড়ে মাটীর মানুষের পূজায় আত্মনিয়োগ করে।

সে পূজা হল ভ্রাতৃপূজা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভগ্নীগণ কার্ত্তিকী দ্বিতীয়ার উষাকালে শয্যাত্যাগ করে শিশির বিন্দু সংগ্রহ করে রাখেন। তারপর তদ্দ্বারা চন্দন ঘসে সেই চন্দন দিয়ে ভ্রাতার ললাটে তিলক দান, অন্ন, বস্ত্র, ধূপ, দীপাদি দ্বারা ভ্রাতার অর্চ্চনা করেন। ভ্রাতা ভগ্নীর সুমধুর সম্পর্ককে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার বাসনায় এই প্রথা আজও বাংলা দেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। ভ্রাতার সকল অমঙ্গলকে দূরীভূত করে তাকে দীর্ঘায়ু ও বিত্তবান করবার কামনা নিয়ে বাংলার মেয়েরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রত পালন করেন, তা যে কোনও দেশের মেয়েদের আদর্শ স্থানীয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। কবিগুরুর ভাষায় আমরাও প্রার্থনা জানাই—

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান—"

———

শ্যামাপূজা মাহাত্ম্য

গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

কার্তিকমাসের অমাবস্যা—এই বিশেষ রাত্রিটিতে আমরা আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ কালীর পূজা করে থাকি। ভারতে যুগ যুগ ধরে হিন্দুরা শক্তির পূজা করে আসছে। পুরাণে আছে কালী আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপ বিশেষ।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই প্রবল দৈত্য যখন দেবগণকে নানা অত্যাচারে উৎপীড়িত করে তুলেছিলেন তখন বিপন্ন দেবগণ ভগবতীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী ভগবতী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে প্রতিজ্ঞা করেন তিনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করবেন।

তখন তিনি আবির্ভূতা হন হিমালয় প্রদেশে। তিনি অম্বিকা নামে ভুবনমোহিনী ষোড়শীর রূপধরে যখন হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করছিলেন—তখন শুম্ভের চরেরা তাঁকে অনুরোধ জানায় দৈত্যরাজের মহিষী হওয়ার জন্য :

মাং বা ময়ানুরং বাপি নিশুম্ভমুপযাহি ত্বম্।
শুম্ভ ত্বং ভজ চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥১১৩
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য ময়ি ভুঙ্ক্ষ্ব মহাসুরম্ ॥১১৪ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫ম অঃ।

তিনি জানান—যিনি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন তিনি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন :

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১১৮
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥১১৯
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥১২০
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু ॥১২১ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫ম অঃ।

শুম্ভ তখন একে একে বহু বীরকেই পাঠাতে লাগলেন দেবী অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি মহাবীরেরা দেবী অম্বিকার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। দেবী একে একে সকলকেই সংহার করেন। পরে নিশুম্ভ আসেন যুদ্ধার্থে। দেবী অল্পেশে তাঁহাকে বিনাশ করেন। অবশেষে শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। দেবী তাঁকেও সদলে শমন ভবনে প্রেরণ

করেন। এইযুদ্ধ দেবীযুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে দেবী নানা রূপ ধারণ করে শুম্ভ এবং তাঁর চরদের বিনাশ করেন।

শুম্ভের অনুচর চণ্ড যখন যুদ্ধার্থে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হন দেবী তাঁকে কৌষিকীরূপে বিনাশ করেন।

এরপর শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি রক্তবীজ দেবীর সঙ্গে সমরে অবতীর্ণ হলে দেবী বিপর্যস্ত হয়ে যান। দেবী রক্তবীজের মস্তক ছেদন করলে—রক্তবীজের প্রতিটি রক্তকণা থেকে রক্তবীজের সমতুল্য এক একজন বীর উৎপন্ন হয়ে দেবীর সঙ্গে সমরে ব্যাপৃত হয়। তখন দেবী অম্বিকার ললাট থেকে উৎপন্ন হয়ে লোলজিহ্বা প্রসারিত করে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ার পূর্বে পান করে রক্তবীজের বিনাশ করেন। রক্তবীজের বিনাশ সাধনকালে দেবী যে চামুণ্ডামূর্তি ধারণ করেন সেই মূর্তি কালী মূর্তি।

ভ্রুকুটী-কুটিলাত্তস্যা ললাট-ফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৬
বিচিত্র-খট্বাঙ্গধরা নরমালা-বিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম-পরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৭
অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললন-ভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥৮ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৭ম অঃ

এই মূর্তি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। এই মূর্তি দিগম্বরী, পূর্ণযৌবনা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, আকর্ণনয়না, চতুর্ভুজা এবং শ্যামবর্ণা। এই মূর্তি শিবের বক্ষের উপর দণ্ডায়মান। শিব অর্থাৎ শুভ। অশুভ বিনাশের ঘোর সঙ্কটকালে দেবী শুভ অর্থাৎ শিবকেও পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হননি।

এই অশুভনাশিনী বিরাটশক্তিকে আমরা কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে পূজা করি অর্থাৎ শক্তির আধার এই দেবীর কাছে আমরা শক্তি প্রার্থনা করি।

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর! মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥৩৮
সৈবকালে মহামারী সৈবসৃষ্টির্ভবত্যজা। স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী ॥৩৯
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে। সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥৪০
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা। দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্ ॥৪১
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২শ অঃ

এই দিনটিই সারা ভারতে দীপান্বিতা বা দেওয়ালী উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। দেওয়ালীকে আমাদের অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ দীপ জালিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে এই ঘোর অমাবস্যার রাত্রির কালিমা দূর করার।

এইদিন সন্ধ্যায় সমস্ত হিন্দুস্থানে অসংখ্য আলোকরাজি জ্বলে ওঠে। অজস্র আতসবাজি জালিয়ে শিশু কিশোর তরুণ এই বিচিত্র বহ্নিদ্যুতির উৎসবে মেতে ওঠে। এ উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। এই উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার—মনের কালিমা যেন আমাদের প্রাণের প্রদীপটি জালিয়ে বিনাশ করতে পারি।

জাতীয় উৎসব দীপান্বিতা

বেলা দে

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ উৎসবের পীঠস্থান। বাস্তবিক নানা অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে রকম উৎসবের আয়োজন সে রকম পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! বর্ষারম্ভ থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে একটীর পর একটী ছোটবড় কত উৎসব! বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুতে আনন্দের কি অপূর্ব আয়োজন! কি গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কি বর্ষার অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে, কি শরতের হাস্যময় আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতে, কি হেমন্তের কুহেলিকাময় উষায়, কি শীতের শিশির সজল কুজ্ঝটিকাময় প্রভাতে, কি বসন্তের ক্লান্তিহরা দিনগুলিতে, সকল সময়েই চলে আমাদের উৎসব! আমাদের দেশের এই উৎসবগুলি নতুন নয়, বহুকালের প্রাচীন! আমাদের সমাজ-জীবনে যে একদিন উচ্ছল প্রাণধারা বইত, এই উৎসবগুলি তারই নিদর্শন। এই উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে সমাজবদ্ধ মানুষের গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসা! প্রতিদিনের কাজে আমরা মত্ত থাকি নিজেকে নিয়ে কিন্তু উৎসবের দিনে আমরা নিজেদের সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের সঙ্গে মিলিত হই। উৎসবের দিনে মানুষ তাই নিজেকে মেলে ধরে বিশ্বের খোলা প্রাঙ্গণে! সেদিন আর ঘরের কোণে বসে জমা খরচ লিখে সে আরাম পায়না। সেদিন সে কাঁধ থেকে সংসারের ঝোলা ফেলে, প্রতিদিনের সুখ দুঃখ ভুলে, প্রতিবেশী, আত্মীয় অনাত্মীয়কে ডেকে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে! সেদিন সকল ভুলে নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েই যেন তার আনন্দ। তাই আমাদের দেশের পূজাপার্বণ গুলি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আচার পর্ব নয়, এগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি।

দীপান্বিতা দেওয়ালী বা কালীপূজা এমনি একটী সর্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব! এইউৎসবটী ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব আশ্বিনী পৌষচন্দ্রের অমাবস্যার রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুরাণ, ইতিহাস, ও ধর্মের অপূর্ব সমাবেশে এই উৎসবটী গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর এই উৎসবকে উপলক্ষ করে পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে ভারতবর্ষের ধনী, দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আনন্দে মেতে উঠে। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই দিনটীতে ভোরবেলায় সকলে স্নান সেরে নানা রঙের নতুন পোষাক

পরিচ্ছন্ন পরিধান করে থাকেন। এতে উৎসবের সমারোহ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মারোয়াড়ী ও গুজরাটী ব্যবসায়ীরা এই দিনে তাঁদের 'নতুন খাতা' মহরৎ করেন। অনেকে এই দিন নতুন দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেন। তবে উৎসবের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হলো আলোক সজ্জা ও আতসবাজী পোড়ানো। দীপালী বা দীপান্বিতা উৎসব সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর কাহিনী ও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তার দু' একটী এখানে উল্লেখ করছি।

এইসব কাহিনীর মধ্যে নরকাসুরের কাহিনীটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে দৈত্যরাজ নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষের (পশ্চিম আসাম) রাজা ছিলেন। পরে দৈত্যরাজ বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবতারা দৈত্যরাজের অত্যাচারে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। তখন পরাজিত অত্যাচারিত দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে দৈত্যরাজের অত্যাচার থেকে স্বর্গ ও মর্ত্যকে রক্ষা করতে হবে। ভগবান বিষ্ণু তখন দৈত্যরাজকে যুদ্ধে নিহত করলেন। মৃত্যুকালে দৈত্যরাজ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে তাঁর এই মৃত্যুর দিনটী যেন বিশেষ সমারোহ সহকারে পালন করা হয়। ভগবান বিষ্ণু তাঁর এই প্রার্থনা পূরণ করেন। কথিত আছে সেই থেকে এই দিনে সাড়ম্বরে এই দীপালী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। কালীপূজার রাত্রে এই আলো দেওয়া সম্পর্কে আরো একটী কাহিনী আছে। সেটী হচ্ছে, যে প্রাচীনকালে এক রাজাকে তাঁর জ্যোতিষীরা বলেছিলেন যে আশ্বিনী অমাবস্যার রাত্রে সর্পরাজ গোখুরের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সাবধানতা অবলম্বন করলেন, মহারাণী সতর্ক হয়ে রাত্রিজাগরণ করতে লাগলেন। তথাপি যথাসময়ে সর্পরাজ রাজাকে দংশন করলো। কিন্তু মহারাণীর সেবায় প্রীত হয়ে সর্পরাজ রাণীকে বর দিতে চাইলো। রাণী তখন রাজার প্রাণ-ভিক্ষা চাইলেন। রাণীর ইচ্ছা পূর্ণ করবে বলে সর্পরাজ কথা দিল। তখন সর্পরাজ রাজার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যমপুরীতে উপস্থিত হল। কৌশলে চিত্রগুপ্তের খাতাখানিতে দেখলো যে রাজার আয়ুস্থানে একটি শূন্য লেখা আছে। তখন সে সকলের অগোচরে সেই শূন্যের বাঁদিকে একটি সাত বসিয়ে দিল। এরপর যমরাজ খাতাখানি দেখে অনুচরদের ভুলের জন্য দুঃখিত হলেন ও রাজাকে পুনরায় মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে কৃতজ্ঞ রাজা যমরাজ ও সর্পরাজকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ দিন থেকে দীপালী উৎসবের প্রবর্তন করেন। এছাড়া দীপান্বিতার দিন লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর পূজাও বাংলাদেশের অনেক স্থানে হয়ে থাকে। এই পূজা সম্বন্ধেও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর প্রচলিত গল্প আছে। একটি গল্প এখানে উল্লেখ করছি। কথিত আছে কোন এক দেশে রাজকন্যা তার পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল যে তার নিজের ভাগ্যে খায়! কন্যার উত্তরে রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যাকে শাস্তি দেবার জন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে কন্যা ও জামাতাকে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তারা তখন এক বনের মধ্যে ভিক্ষায়ে দিনাতিপাত করতে লাগল। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় কিছু না পেয়ে একটি মৃত সাপ নিয়ে ঘরে এলেন। কেননা রাজ-কন্যার নির্দেশ ছিল শূন্যহাতে ঘরে ফিরবে না। রাজকন্যা সেই মৃত সাপটিকে তাদের কুটিরের বাইরে ফেলে দিলে। এদিকে এক রাজা সেই বনের একটি পুকুরে স্নান করছিলেন, তার গলার দামী মুক্তার মালাটি পুকুর পাড়ে খুলে রেখে স্নানে নেমেছিলেন। এমন সময় একটি কাক সেই মুক্তার মালাটি মুখে করে উড়ে চলল, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুটিরের কাছে এসে সেই মৃত সাপটিকে দেখে

মুক্তার মালাটি ফেলে দিয়ে ঐ মণি সাপটি মুখে করে চলে গেল। দূর থেকে রাজকন্যা সবই দেখলেন। তিনি মালাটি তুলে রাখলেন। এদিকে রাজা মালাটি না পেয়ে ঘোষণা করলেন যদি কেউ তাঁর মালাটি পেয়ে থেকে থাকে তাহলে তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। রাজকন্যা সেই মালাটি ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে রাজ দরবারে পাঠিয়ে দিলেন আর বলে দিলেন পুরস্কারের বদলে রাজাকে অনুরোধ করতে যেন দীপালীর রাত্রে একমাত্র তাঁদের ঘর ছাড়া অন্য কারুর ঘরে আলো না জ্বলে! যথা সময়ে রাজা হারটি পেয়ে ব্রাহ্মণের উপর সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কথামত দীপান্বিতার রাত্রে সেবারে আর কোথাও আলো জ্বললো না একমাত্র ব্রাহ্মণের কুটির ছাড়া। এদিকে রাত্রে লক্ষ্মীদেবী রাজ্যের কোথাও আলো দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন। অবশেষে রাজ্যের বাইরে ব্রাহ্মণের কুটিরে আলো দেখে প্রীত হলেন। দেবীর আশীর্বাদে ব্রাহ্মণের কুটির প্রাসাদে পরিণত হলো। তাঁদের ঘরে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হয়ে বাঁধা রইলেন। সেই থেকে আশ্বিনী অমাবস্যার রাত্রে সমস্ত গৃহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আবাহন করার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে এই দিনে দীপান্বিতা উৎসবের সঙ্গে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীকালীপূজাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার পর কালীপূজাও বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ পূজা উৎসব। স্মরণাতীত কাল থেকে মহাশক্তিরূপিনী কালীর পূজা বাংলাদেশে হয়ে আসছে। এই জড় পৃথিবীর অন্তঃস্থলে অদৃশ্যভাবে যে সমস্ত শক্তি রয়েছে, মহাকালী তারই জীবন্ত প্রতীক! মানুষের একদিকে জীবন ও অন্যদিকে মৃত্যু একদিকে সৃষ্টি অপরদিকে ধ্বংস। সর্বভূতে যে চেতনা শক্তিরূপে সংস্থিত তার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পূজা। এই অখণ্ড শক্তিকে আমরা নানাভাবে দেখি বিদ্যারূপে বিত্তরূপে ও শক্তিরূপে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কালীপূজা আর সেই সঙ্গে সহস্র দীপাবলীর আলোকে দেবীর উপাসনা সমাপ্ত হয়।

আলপনা ও লক্ষ্মীসরা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

বাংলার গ্রাম আর আলপনা যেন প্রকৃতির পটে আঁকা ছবি। জানিনা কি থেকে মেয়েদের মনে প্রথম আলপনা চিত্রের উদয় হয়েছিল! কিন্তু এই আলপনা আবিষ্কারের গৌরব একমাত্র নারীর। এই শিল্পের সকল কৃতিত্বই নারীর। এর অনুভূতি এর ভাব, এর চিত্রের ভাষা নারীর। আলপনা শুধু সুন্দরের প্রকাশ নয় সংসারের ও পরিজনের কল্যাণ কামনার প্রকাশ।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায় মানুষ নানান লোকাচার, পূজা, অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে মেঝের আলপনা ও চিত্র আঁকতেন। বাংলা দেশেও বহুকাল থেকেই আলপনার প্রচলন হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বহুকাল পূর্বেও বাংলা দেশে গৃহমধ্যে লৌকিক ব্রত, আচার অনুষ্ঠান এবং বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকাজে আলপনা দেবার প্রথা ছিল। কাজেই

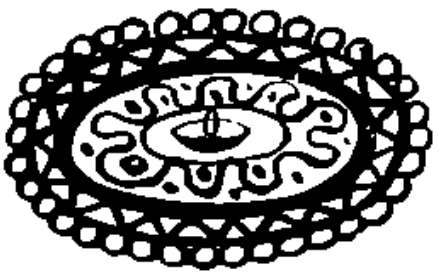

তখনকার দিনে প্রধানতঃ মাঙ্গলিক হিসাবেই আলপনা ব্যবহার হোত এবং এরই মাধ্যমে পুরনারীরা সহজ ও স্বাভাবিক শিল্পরুচির পরিচয় দিতেন। বাংলার পর্ণ কুটিরে শিল্প সাধনার অতি সামান্য উপকরণ থেকে বাংলার মেয়েরা স্বাভাবিক শিল্প অনুরাগ ও সহজ প্রতিভার মাধ্যমেই এই আলপনা শিল্পের জন্ম দিয়েছেন।

সাধারণতঃ চালের গুড়ো দিয়েই আলপনা দিতে হয়। বাটা চালের সঙ্গে জল মিশিয়ে আলপনার রঙ তৈরী করতে হয়। তারপর তুলো বা সাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। অনেক জায়গায় চালের গুঁড়ো দিয়ে শুকনো আলপনাদেবার রীতি দেখা যায়। চালের গুঁড়োরসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আবার লাল, হলুদ বা সবুজ রং ইত্যাদিও মিশিয়ে নেওয়া হয়।

তবে আলপনা দেবার কয়েকটি রীতি আছে। যে জায়গায় আলপনা দিতে হবে সে জায়গাটি ধুয়ে মুছে বেশ শুকনো করে নিতে হবে। তারপর মনে মনে আলপনার নকসাটি ঠিক করে নেবেন। কারণ কি উপলক্ষে আলপনা দিচ্ছেন সেটি জানা দরকার। স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশের মেয়েরা বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নকসার আলপনা এঁকে থাকেন। আলপনা খানিকটা গতানুগতিক ভাবে লোকপরম্পরা চলে আসছে। তবে আলপনা সাময়িক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার হলেও বাংলা দেশে লক্ষ্মীব্রতে আলপনাই প্রধান। লক্ষ্মীপূজার আলপনার বৈশিষ্ট হল লক্ষ্মী নারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা,

লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানছড়া, বলমিলতা, জোপাটিলতা, এছাড়া আলপনার নানা অলংকার এবংচৌকিতে

লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না এঁকে কেবল দুটি আর দু'খানি পা কিংবা পদ্মের উপরে পা এমনি সব চিত্র দেওয়া হয়। সারা বাড়ী এবং ঘরে ঢোকবার চৌকাটের সামনেও লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকতে হয়।

শ্রী এবং ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। তিনি সম্পদরূপিনী। তাই বাঙালী মাত্রেইলক্ষ্মীদেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকেন। আমাদের দেশে নানা ধরণের লক্ষ্মীপূজার বিধি আছে। বারমেসে লক্ষ্মীপূজা হয় প্রতি বৃহস্পতিবার। এ ছাড়া ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, চৈত্রমাসে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এর মধ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাই শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশে কালীপূজার দিন সন্ধ্যেবেলায় অলক্ষ্মী বিদায়ের পূজা হয়।

তবে লক্ষ্মীপূজার সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ, কি করে লক্ষ্মীদেবী মর্ত্তবাসীর দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে নিজ পূজার প্রচলন করেছেন মর্ত্যধামে, কি করে বিশ্ববাসী হিংসাদ্বেষ, দারিদ্র্য মুক্ত হয়ে সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন সেই বিবরণই এই পাঁচালীতে আছে।

লক্ষ্মীপূজায় অনেকে মাটীর প্রতিমা পূজা করেন, অনেকে চৌকিতে ধান সাজিয়ে তার উপর একটী কুনকে বসিয়ে, তাতে সিন্দুর কৌটো রেখে একখানি লাল চেলি ঢেকে দেন। আবার কোথাও বা লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে ঘটপূজার প্রচলন দেখা যায়। এ ছাড়া অবশ্য লক্ষ্মীপূজার রীতিনীতি কিছু রকম ভেদ আছে।—পূর্ববাংলায় প্রায় সর্বত্র এবং উত্তরবাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে সরা ব্যবহার করার রীতি আছে। আসলে এটা মাটীর সরা; তাতে রং দিয়ে আঁকা থাকে লক্ষ্মীর মূর্তি আর চারদিকে অন্যান্য দেবতাদের চিত্র। অথবা সরার চারধারে ধানের গাছ, পায়ের নীচে পদ্ম আর লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।—তবে নামে লক্ষ্মীসরা হলেও সব সময়েই যে তাতে লক্ষ্মীর মূর্তি আঁকা থাকবে তাই নয়। লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে দুর্গা, কার্ত্তিক, গনেশ, রামসীতা, প্রভৃতি দেবদেবীর আবির্ভাব দেখা যায়। অবশ্য তাতে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা আর লক্ষ্মীর আনুসঙ্গিক প্রতীক জিনিস যেমন সিঁদুরের কৌটো, আয়না, চিরুনী, এগুলো আঁকা থাকবে।

লক্ষ্মীসরা দিয়ে লক্ষ্মীপূজার প্রচলন পূর্ববঙ্গেই বেশী। পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে যে লক্ষ্মীসরার প্রচলন ছিল তার নাম ঢাকাই সরা।—লক্ষ্মী বসে আছেন ময়ূরপংখী নৌকোয়—ময়ূরের মুখে সাপের চিত্র। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রতীক এই নৌকো। অবশ্য আজকাল লক্ষ্মীসরার প্রচলন উঠে যাচ্ছে।—পশ্চিম বাংলায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীসরা অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।—কোনো কোনো জায়গায় ঘরের শোভা হিসেবে লক্ষ্মীসরা দেয়ালে টাঙানো হয়।—যে ভাবেই হোক বাংলার মেয়েরা শ্রী ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শুদ্ধ আচারে পূজা করে থাকেন।

দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপূজা

শকুন্তলা

বাংলার প্রধান উৎসব পূজা ও পার্বণ। প্রাচীন যুগে সমাজ জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল ধর্ম। দেবদেবীর পূজা বা ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার আশা আকাংখা প্রকাশ করতো। বিশ্বাস করতো যে দেবদেবীর সাহায্যেই তার সকল ইচ্ছা বা কামনা পূর্ণ হবে।

বাংলা দেশে ব্রতপূজা ছাড়াও আরো কয়েক রকমের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীপূজা, দীপান্বিতা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ষোলযাত্রা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পর আসে কালীপূজা বা দীপান্বিতা উৎসব। মানুষের একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু, একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে সংহারের লীলা! সর্বভূতে যে শক্তিরূপা চেতনা রয়েছে তার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পূজা। এই অখণ্ড শক্তিকে আমরা খণ্ডিতভাবে অনুভব করি বিদ্যারূপে বিত্তরূপে, শক্তিরূপে এর বিচিত্ররূপ, বিচিত্র প্রকাশ। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে চলে অনন্তরূপিণী শক্তির উদ্বোধন। সহস্র দীপাবলীর আলোয় আমরা অন্ধকারকে অপসারিত করে দিয়ে কালীপূজার দিনে প্রাণচাঞ্চল্যকে অবারিত করে তুলি! ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের বাজী পোড়ানোর আনন্দ এই উৎসবটীকে আরো সুন্দর করে তোলে। দীপান্বিতার দিব্যদ্যুতি মানুষের অন্তরের সমস্ত

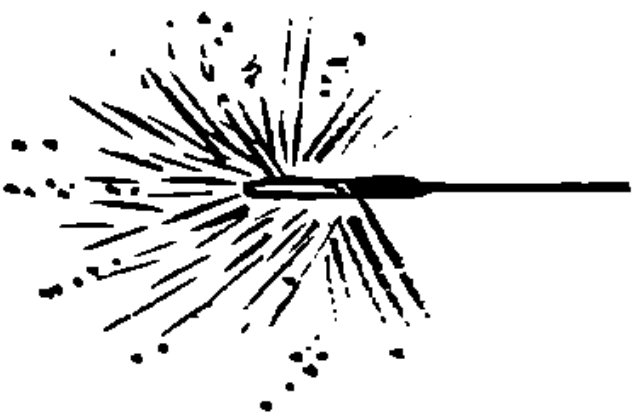

কালিমাকে মুছে দেয়। এ তো গেল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু দীপান্বিতা কালীপূজার রাত্রে মেয়েরা করেন:লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মী ধন সম্পদের দেবতা, চঞ্চলা হলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করবার আগ্রহ মানুষের

স্বভাবসিদ্ধ। বছরের বিভিন্ন সময়ে মেয়েরা লক্ষী ব্রত করে থাকেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা লক্ষীর ঘট সাজিয়ে পুষ্পশোভিত করে, আলপনা দিয়ে লক্ষীর পাচালী পাঠ করে থাকেন। তবে আশ্বিনের পূর্ণিমার দিন ও দেওয়ালির দিন রাত্রিতে পূজার উৎসব ও আয়োজন কিছুটা বেশি।

দেবতার প্রীতিলাভই মানুষের কাম্য। তাই সে দেবতার পূজা করে অসুর অপদেবতাকে দূর করে দেয়। দেবতার পূজায় সেই জন্যই ভূতাপসারণের ব্যবস্থা। কিন্তু এই সামান্য অনুষ্ঠান মানুষের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানও আছে যেগুলি বিশেষ কৌতুককর। অলক্ষীর পূজা তাদের মধ্যে অন্যতম। দেওয়ালির দিন সন্ধ্যায় যে লক্ষীপূজা হয় তার পূর্বে এই পূজার প্রচলন কোথাও কোথাও দেখা যায়। আসলে এটা অলক্ষীকে বিদায় দিয়ে লক্ষীপূজার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। গোবর দিয়ে এই অলক্ষীর মূর্তি তৈরী করে কুলো বাজিয়ে, ছেঁড়া চুল ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে তাকে রাস্তার বাইরে রেখে আসা হয়—ছড়া কাটা হয়, অলক্ষী বিদায় হও, ঘরের লক্ষী ঘরে এসো। অবশ্য মেয়েদের ব্রতকথায় এই সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটী গল্পও আছে। একটী হলো - এক দেশের নিয়ম ছিল হাটে কিছু বিক্রি করতে করতে কেউ যদি শেষ পর্যন্ত তা বিক্রি না করতে পারে তাহলে স্বয়ং রাজাই তাকে সম্মান দেখার জন্য সে সব কিনে নেবেন। এমনি একদিন হাটশেষে এক কামারের কাছ থেকে লোহার দেবী মূর্তি রাজা কিনলেন। লোহার মূর্তি ছিল অলক্ষীর। অমনি সেই রাত্রেই লক্ষী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রাজা বললেন আমি সত্যপালন করেছি এতে দোষ কি? লক্ষী রাজাকে বর দিলেন তিনি পশুপক্ষীর কথা বুঝবেন কিন্তু তিনি আর রাজ্যে রইলেন না। এমনি করে প্রথমে রাজলক্ষী, তারপর ভাগ্যলক্ষী, যশোলক্ষী সবাই চলে গেলেন। তারপর ধর্ম আর কুললক্ষী চললেন।—রাজা ধর্মকে বললেন—কুললক্ষী যেতে চান তো যান, কিন্তু ধর্ম, আপনি তো যেতে পারেন না কেননা আমি সত্যধর্ম পালন করতেই এ কাজ করেছি। ধর্মরাজ বাড়ীতেই রইলেন। এরপর রাজা একে একে সর্বস্ব হারালেন—তারপর রাণী অনেক কষ্টে লক্ষীপূজা করে তবে রাজা রাজ্য সব ফিরিয়ে আনলেন।

লক্ষীব্রতটী বাঙালী মেয়েদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয়। সকাল থেকে মেয়েরা উপোস করে পূজার সব কিছু ব্যবস্থা করে ঘরদোর আলপনায় ভরিয়ে তোলে। কত বিচিত্র পদ্ম, আলপনার নানা অলংকার লক্ষীপেচা, ধানছড়া, কলমীলতা, লোপাটীলতা, লক্ষীর পদচিহ্ন আঁকা হয়।

দেশভেদে অবশ্য অনুষ্ঠানে কিছু অদলবদল দেখা যায়। মেয়েরা লক্ষীব্রত করে ছড়া কাটেন—

"লক্ষীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার!
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার॥"

দুর্গাপূজার পরেই ব্যাপকতার দিক থেকে কালীপূজাই প্রধান। তাছাড়া অধিকাংশশাক্তের ইষ্টদেবতা দশমহাবিদ্যার আদি ও প্রতীক স্বরূপা কালীর পূজা খাঁটি শাক্তের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। যদিও গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত ঋতুতে নির্দিষ্ট দিনে কালীর বিশেষ পূজার প্রচলন বর্তমানে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। তবে হেমন্তে কার্তিকের অমাবস্যার দীপান্বিতা কালীপূজাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

———

ভাইফোঁটার খাবার

আগেকার দিনে শুধু ভাইফোঁটা কেন, যে কোনো পূজা পার্বণে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বেশ খাওয়া, দাওয়ার আয়োজন করা হোত। আজকের দিনে সকলের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও সবাই চান যার যা সাধ্য তাই দিয়ে তৃপ্তি সহকারে আত্মীয় পরিজনকে খাওয়াতে।

কালীপূজার পর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইবোনের প্রীতিমিলনের এই উৎসবটীতে বোনেরা থালা বা রেকাবী সাজিয়ে ভাইদের খাইয়ে থাকেন। গার্হস্থ্য জীবনে এ এক পবিত্র উৎসব। অনেকে একে বলে যমদ্বিতীয়া। এই দিনে নাকি যমের বোন যমুনা চিত্রগুপ্ত ও ভ্রাতা যমকে নিজের বাড়ীতে এনে পূজা করে নানা রকম সুস্বাদু খাবার খাইয়েছিলেন। ভাইফোঁটার দিন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্নান করে শালগ্রাম ইত্যাদি পূজা করার পর চিত্রগুপ্ত বা যমকে পূজা করে যমুনাকে অর্চনা বা নমস্কার করার নির্দেশ পাওয়া যায়। এমনি করে যমরাজ ও তার ভগ্নি যমুনাকে স্মরণ করে ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের আয়ুবৃদ্ধির শুভ কামনায় ভাইকে বোনেরা নতুন কাপড় উপহার দেয় এবং

নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। কপালে দেয় শ্বেত ও চুয়াচন্দনের মঙ্গলটীকা। বাংলাদেশে অবশ্য দেশাচার ভেদে ভাইকে ফোঁটা দেবার সময় নানা রকম ছড়াও বলা হয়।

এখানে ভাইফোঁটার কয়েক রকম খাবারের কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। সাধারণতঃ দেওয়ালী ও ভাইফোঁটায় ঘিয়েরই খাবার পরিবেশন করার রীতি আছে। খাজা, গজা, নিমকি, সিঙ্গাড়া, কুরিভাজা, মুগের বরফি, গাজরের হালুয়া, ইত্যাদি। এটা হল জলখাবার। এরপর পাঁচ সাত রকম তরকারী যেমন, শুক্তো, শাকের ঘন্ট, ডাল, মাছের চপ, মাছের কালিয়া, চাটনী দই মিষ্টি আর শেষে পান। এ ছাড়া যার যা সাধ্য সেইভাবে ভাইয়ের খাওয়াতে পারেন। বিকল্প খাবার হিসেবে লাউয়ের পায়েস, ঘালিয়ার পোলাও, আলুর লুচি, আলুর চপ, আলুর পায়েস। ছানার জালপো, আটা বা ময়দার ছোলার ডালের ডালপুরী, আলুর দম। বড়ি দিয়ে শালংশাক ভাজা. ইত্যাদি যা সম্ভব তৈরী করে সাজিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে।—

আসল কথা হচ্ছে সামান্য আয়োজন হলেও যত্ন করে খাওয়ানোর মধ্যেই থাকে প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি।

ঋতুভেদে গৃহপ্রসাধন

শান্তা বসু

গৃহসজ্জা বা ঘর সাজানোর কাজটিতে নারী তার নিজস্ব সত্তার প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যে, সম্পদে বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনকে বিকশিত করে একখানি গৃহ। সুন্দর গৃহ ও গৃহ পরিবেশ মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য্য এনে দেয় এবং জীবনকে আরো মনোরম করে তোলে। গৃহসজ্জার প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন সু-রুচি। আবার যদি প্রতিটী ঋতুকে উপলক্ষ করে গৃহখানিকে সজ্জিত করা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

হেমন্তের হিমেল হাওয়া প্রকৃতিকে একটি স্বচ্ছ আবরণ পরায়। এই সময় ঘরের পরিবেশকে ফিকে রাখা দরকার। দর্জা জানলায় বেশ হাল্কা রংয়ের পর্দা টাঙিয়ে দিন, কারণ আমাদের দেশে এই সময় বিশেষ করে শ্যামাপূজার সময় ছোট ছোট পোকা আলোর সামনে ঘুরতে থাকে, আমরা বলি শ্যামাপোকা। কাজেই ইলেকট্রিক ল্যাম্পগুলোতে লাল বা সবুজ কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলে ভাল হয় অথবা পাতলা রঙীন কাপড় মুড়ে দিতে পারেন। অবশ্য নানা রকম আতস বাজি এই সময় পোড়ানো হয় আর বারুদের ধোঁওয়ায় ঐ পোকাগুলো মরে যায়।

আমাদের দেশে কার্ত্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দেওয়ার প্রচলন এক সময় খুব বেশী ছিল এখনো কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়।—এ ছাড়া কালীপূজার দিন মেয়েরা প্রদীপ দিয়ে বাড়ী সাজায় পল্লীগ্রামে এখনো মেয়েরা নিজের হাতে মাটীর প্রদীপ তৈরী করে কালীপূজার রাত্রে বাড়ীঘর আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে রাখে। এখন অবশ্য সে কাল নেই, সে ঐশ্বর্য্য নেই, হয় তো সে মনও নেই তাই গৃহসজ্জার রীতিও বদলেছে।

সেই যে লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আমরা পড়েছিলাম পল্লীর সেই বধূটী তার মাটীর কুঁড়েঘরখানি ঝক্‌ঝকে করে মাটী দিয়ে নিকিয়ে মাটীর প্রদীপ জেলে সারারাত লক্ষ্মীর আগমন প্রার্থনা করেছিল লক্ষ্মীদেবী যদি তাঁর ঘরে সত্যিই এসে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহের পরিবেশ দেখেই এসেছিলেন।

নিখুঁত গৃহ অলংকরণে রুচির স্থান সবার উপরে। যার অর্থের অভাব নেই তিনি ইচ্ছামত দামী জিনিসে ঘর সাজাতে পারেন, কারুর আপত্তি নেই কিন্তু রুচিসম্মত বিন্যাস চাই। আসলে রুচি ও ইচ্ছা এর উপরেই গৃহাভ্যন্তরের পরিবেশ নির্ভর করে। অর্থ এখানে নিতান্তই গৌণ। নাই বা রইল ঘর ভর্ত্তি আসবাবপত্র। একখানি তক্তপোষের উপর হাতের কাজ করা কার্পেট জাতীয় কিছু বিছিয়ে রাখবেন, দুটি কাজ করা কুশন থাকবে। ঘরের কোণায় একটি মাটির ঘড়ায় কিছু ফুল বা লতাপাতা সাজিয়ে রাখুন। সামান্য সবুজের ছোঁয়া গৃহের রূপ বদলে দিতে পারে। ঋতু অনুযায়ী ফুল, লতাপাতা, গাছের ডালপালা ইত্যাদি দিয়েও গৃহখানিকে বেশ সুসজ্জিত করে তোলা যায়।

মেয়েরা স্বভাবতই শিল্পীমন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিল্প সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাদের অন্তর্নিহিত। এই কারণেই তখনকার দিনের মেয়েরা বিনা শিক্ষায় বিভিন্ন লতাপাতা, নকশা ফুল ইত্যাদি আলপনার মধ্যে অতি সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারত।

গৃহ রচনার ভার মেয়েদের হাতে। কাজেই শিল্পীমনকে কখনো লুপ্ত হতে দিতে নেই। পরিচ্ছন্নতায় ও প্রসাধনে ছবির মত করেই গৃহখানিকে সাজিয়ে তুলতে হবে। ঘরের মেঝে দেওয়ালের গায়ে ছাদের বিতানে, বিভিন্ন ছাঁদের আলপনা এঁকে আর প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে গৃহখানিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে হবে। গৃহপ্রসাধনের প্রতিটী কাজে নিজের মনকে প্রতিফলিত করাই গৃহসজ্জার সার্থক পরিকল্পনা।

মনই সব! পুরুষ বা মেয়ে সকলেরই মনই সব। মনটাকে স্বচ্ছ, সুন্দর, রাখলে জীবনে কখনও দুঃখ পেতে হয় না। হৃদয়ে যার ভালবাসা, প্রেম, সে কখনও পরকে না দেখে নিজকে দেখতে পারেনা। সেইখানেই তো তার জীবনের সার্থকতা, পরিপূর্ণতা। নিজকে বিলিয়ে দিয়ে সে আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায়। তার চেয়ে মহৎ কে। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে এই তো তার স্বাভাবিক ধর্ম—তা যে না করে, সে তো মানুষ নামের যোগ্য হতে পারে না।

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা কলকাতার জেনারেল পোষ্ট অফিসের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। উদ্যোগী পুরুষ। লক্ষ্মী তাঁর পিছনে ছুটেছিলেন। তাঁর থিয়েটারের প্রেক্ষাগার ও মঞ্চ ইজারা নিয়ে "আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড" নামে যে যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রবোধচন্দ্র সেই কোম্পানীর প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কর্মকুশলতায় মৃত 'তাঁর থিয়েটার' নব-জীবনলাভে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল।

প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা তাঁর থিয়েটারের বা আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের সচিবপদ পাবার পর থেকে হ'য়ে উঠেছিলেন সর্বজন পরিচিত 'প্রবোধ গুহ'। আমরাও তাঁর কথা উল্লেখ করবার সময় 'প্রবোধ গুহ' বলেই উল্লেখ করতুম। মানুষটির একটি অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি সকল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সমান অন্তরঙ্গ হ'য়ে মিশতে পারতেন। এ গুণ আমি খুব কম লোকেরই আছে বলে মনে করি।

'আর্টথিয়েটার্স লিমিটেড' একটি প্রাইভেট যৌথ কোম্পানী। যে কয়েকজন ধনীর অর্থে অর্থাৎ অংশী-দারিত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু, আত্মীয় এবং পরিচিত ব্যক্তি। যেমন, বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ সুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায়। আহিরীটোলার বিখ্যাত ধনী ডাক্তারের ক্ষীরোদগোপাল মিত্রের সুযোগ্য পুত্র এবং সিমিডির অভ্র খনির মালিক কুমার কৃষ্ণ মিত্র। প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী এটর্নী সতীশ সেন। প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, এমারোল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মালিক শশধর সাজুলী, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, গণাধর মল্লিক প্রভৃতি। সকলের নাম আমার স্মরণ নেই। তবে এই ক'জনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাই, এঁদের নাম আজও ভুলিনি। প্রবোধ গুহ তাঁর কর্মতৎপরতার গুণে এঁদের সকলেরই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কাগজে-কলমে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম রঙ্গালয়ের ম্যানেজার বলে বিজ্ঞাপিত হ'ত, কিন্তু তিনি সদাই মল্লিকের বাগানে বসে নাটক লিখতে এবং থিয়েটারে নটনটীদের নিয়ে মহড়ায় অভিনয় শিক্ষাদিতেই ব্যস্ত থাকতেন। প্রকৃত ম্যানেজারের কাজ অপরেশবাবুর 'ব'-কলমে প্রবোধ গুহকেই করতে হত। কাজেই 'আর্টথিয়েটার লিমিটেডে'র নট নট-নটীর দল অপরেশবাবুকে গুরুর তুল্য ভক্তি করলেও প্রবোধ গুহকেই তাঁরা ভালোবাসতেন আপন জনের মতই এবং প্রবোধ গুহর কোনও আদেশ উপদেশ ও অনুরোধ তাঁরা যথাসাধ্য মেনে চলতেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, প্রবোধ গুহ তাঁদের ঠিক নিয়ন্ত্রণের বেতন ভোগী কর্মী বলে মনে করতেন না। বরং তাঁদের সঙ্গে সহকর্মী বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন। ফলে, আর্টথিয়েটার লিমিটেডের সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছিল। অনেকসময় প্রবোধ গুহর অন্যায় আদেশও তাঁরা বিনা প্রতিবাদে পালন করতেন।

অপরেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক কর্ণার্জুনের অপত্যাশিত বিরাট সাফল্য 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' কে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল। এর কারণ 'কর্ণার্জুন' নাটকের রচনা শৈলীর আকর্ষণ নয়। আকর্ষণ ছিল অভিনয়কলার নূতনত্বের। ইঁদের অভিনেতা অভিনেত্রীরা অধিকাংশই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একেবারে নূতন আমদানি। তিনকড়ি চক্রবর্তী ভবানীপুর অঞ্চলে যাত্রাভিনয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যাত্রায় তিনি প্রথম বয়সে স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সঙ্গীত ও অভিনয়ে সকল শ্রোতাকেই মুগ্ধ করে দিতেন। পরে ভবানীপুর ক্লাবে ঢুকে তিনি রঙ্গমঞ্চে পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় শুরু করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সুনাম বিস্তৃত হয়ে পড়ে সারা শহরে। উত্তর দক্ষিণের নানা আমেচার সৌখীন ক্লাব তাঁকে টানাটানি ক'রে নিয়ে যেতো। চোরবাগানের 'ক্রেওন্ ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাবে' তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অতি সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সুপুরুষ ছিলেন তিনি। তাই "কর্ণের" ভূমিকায় সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েই তিনি তাঁর সুঅভিনেতার খ্যাতি দর্শক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনকড়িবাবু ছিলেন আমাদের ইভনিং ক্লাবের পুরাতন বন্ধু। কিন্তু অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তাতে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। অহীন্দ্রবাবুও ওই দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর ও কালিঘাট অঞ্চলের যাত্রা দলের নাম করা অভিনেতা ছিলেন। নট-নৈপুণ্য তাঁর পৈত্রিক প্রতিভা। তাঁর পিতাও একজন নামকরা সৌখীন অভিনেতা ছিলেন। তিনি চাননি যে তাঁর পুত্রও অভিনয় কলায় সুদক্ষ হয়ে উঠুক। কারণ, তাঁর ভয়ছিল এপথ বড় পিচ্ছিল পথ। পাছে এ পথে নেমে পুত্রের পদস্খলন হয়, এ আশঙ্কায় তিনি কণ্টকিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? পুত্র তাঁর সুদক্ষ অভিনেতার যশগৌরবের জয়মালা অর্জন করে বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন।

তারপরই উল্লেখ করতে হয় অতুলনীয় প্রতিভাবান অভিনেতা দুর্গাদাসের নাম। দুঃসহ যৌবন আর অতুল প্রশান্ত সৌন্দর্যের অধিকারী এই নবীন শিল্পী সেদিন কর্ণার্জুন নাটকের একটি অতি ক্ষুদ্র ও অবিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও আপন অভিনয় দক্ষতায় সেই চরিত্রেই সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই অদ্ভুত শক্তিশালী নট।

'দুর্গাদাস' আমার বন্ধু শরৎচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের ভালক। সেই সূত্রে পূর্ব হ'তেই পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে। জমীদার বংশের ছেলে। চিত্র-শিল্পী হিসাবেই তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কলাতেও যে তিনি সকলের এমন এক বিস্ময় হয়ে উঠলেন, এটা আমরা আশা করিনি। 'বিকর্ণরূপী দুর্গাদাস আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

'শকুনীর' ভূমিকায় নরেশচন্দ্রের অসামান্য সাফল্যের কথা বলবো না। কেন না তিনি আমাদের ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটের একজন পুরোনো পাপী। রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও অবশ্য রঙ্গমঞ্চে এক নব-নট-প্রতিভার নূতন সংযোজন। এদের সকলের সঙ্গেই পূর্ব হ'তে পরিচয় ছিল। কিন্তু সব্যসাচী অভিনেতা অর্জুনরূপী অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ ছিলনা। প্রবোধ গুহ সে খেদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রতিভাবান নটের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছিল। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই তাঁর 'সাজঘরে' গিয়ে ঢুকতুম। অতি ভদ্র তিনি। আপত্তি করতেন না। বরং খুশীই হতেন।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবাল্য বা কিশোর বয়স থেকেই যে মানুষ রঙ্গমঞ্চের নেশায় অভ্যস্ত সে তো নটনটীদের শিল্পী বন্ধু ব'লে চিরদিন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে আসবেই। রঙ্গমঞ্চের উপর

যিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেই চরিত্রটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পরিস্ফুট করতে পারতেন আমি সেই শিল্পীকেই তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থবোধ করতুম।

মিনার্ভায় একবার সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীর 'জনা'র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁর সঙ্গে—আলাপ করবার জন্য নয়—আমার শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য উপযাচক হ'য়ে মিনার্ভার গ্রীনরুমে অনধিকার প্রবেশ করেছিলুম। এ দুঃসাহসের মূলে ছিল অপরেশ চন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়। সে সময় মিনার্ভা থিয়েটারের তিনিই ছিলেন 'ম্যানেজার'। তিনকড়ি নিরক্ষরা শুনে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত! জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম গিরিশচন্দ্র তাঁকে অতি যত্ন করে মুখে মুখে বার বার ব'লে 'পার্ট' মুখস্থ করাতেন এবং শ্রীমতী তাঁর স্বাভাবিক নাট্য-প্রতিভার গুণে অবলীলাক্রমে তা আয়ত্ত করতে পারতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। আর একটা কথা না বলে পারছিনে। অতুলনীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতি তিনকড়িকে সেই প্রৌঢ় বয়সেও অপরূপ রূপসী বলে মনে হয়েছিল আমার! অবশ্য, তিনি তখনও তাঁর stage make up ত্যাগ করেন নি। সুন্দর সুগঠিত তনু, দীর্ঘতনু দেহ। অনুপম মুখশ্রী এবং দীপ্ত দুটি চোখে তখনও যেন যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত হ'য়ে রয়েছে। কণ্ঠস্বরে বাজছে মাধবের মুরলীধ্বনি। আজও কাণে যেন সে ধ্বনি অনুরণিত হয়ে রয়েছে।

এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে বহু অভিনেত্রীর সঙ্গেই পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল অভিনয় দেখবার নেশার টানে। তাঁদের শালীনতা নম্র ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়েছি। তাঁরা যে সমাজচ্যুতা দুর্ভাগিনী একথা একবারও মনে হত না। বরং মনে হ'ত এঁরাই ভাগ্যবতী। শিল্পীর জাত। নিজগুণে বহুজনের মনে আনন্দ বিতরণের যে সুযোগ এঁরা পান, আমাদের ক'জন ঘরণীর ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে? অবশ্য, একান্নবর্তী পরিবারের আমলে গৃহিণীদের এ গৌরব অর্জনের সুযোগ ছিল। কিন্তু আজকাল তো তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যেই একান্তভাবে আবদ্ধ।

যাক্। যে কথা বলছিলুম। স্টার থিয়েটারে স্টেজের মধ্যে প্রবেশের মুখেই আছে একটি নাতি প্রশস্ত দালান। এখানে অনেকগুলি চেয়ার এবং একখানি ইজি-চেয়ার পাতা আছে। এই ইজি চেয়ারখানি ঐতিহাসিক। একদিন এই চেয়ারে মহাকবি গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বসেছিলেন। সেদিন অপরেশ চন্দ্রকেও ওই সিংহাসনে বসে নাট্যাভিনয় শিক্ষা দিতে দেখেছি। আর্টথিয়েটার লিমিটেডের ডিরেক্টররা এলে ওই দালানের চেয়ারগুলি আলো করে বসতেন। তবে একমাত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছাড়া অপর কোনও ডিরেক্টারকে নিত্য রঙ্গমঞ্চের বৈঠকে উপস্থিত হতে দেখা যেত না। মনে রাখবেন এই হরিদাসবাবু এক সময় ছিলেন সখের দলের একজন সু-অভিনেতা। স্টার থিয়েটারের মক্ষ সংলগ্ন ঐ দালানে নিত্য সন্ধ্যায় বসতো একটি জমাট আড্ডা। ডিরেক্টার, ম্যানেজার, সেক্রেটারি এবং তাঁদের বন্ধুবর্গই ছিলেন এই আড্ডার সদস্য। অভিনেতাদের মধ্যে তিনকড়িবাবু, অহীন্দ্রবাবু ছাড়া বিশেষ কেউ এ আড্ডায় 'কষে' পেতেন না। আশেপাশে 'কাউকে' উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখলেই অপরেশবাবু অপ্রিয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন: কীহে! তোমার কি আজ 'রিহার্সাল নেই?

তৎক্ষণাৎ কোনও উত্তর না দিয়েই সে বেচারি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতো। আমি এ আড্ডায় নিয়মিত আসতে পারতুম না। মাঝে মাঝে উঁকি মারতুম। তবে নতুন নাটক অভিনয়ের ঘোষণা পড়লেই ম্যাডান সাহেবের বেঙ্গলী থিয়েটার থেকে পালিয়ে এখানে ছুটে আসতুম। যদিও সেখানে শিশির ভাদুড়ীর আলমগীর অভিনয় দেখবার জন্য প্রায় প্রতি শনি, রবিবার হাজির হতুম। যদি জিজ্ঞাসা করেন কেউ—একই নাটকের

পুরাতন অভিনয় প্রতি রজনীতে কি দেখতে ভালো লাগতো? ওঁকে জোর গলায় বলবো—হ্যাঁ লাগতো। কিন্তু একই অভিনয় নয়। অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী নট-শিল্পী শিশির কুমারের 'আলমগীর' অভিনয় যাঁরা একাধিকবার দেখেছেন, তাঁরা আমার একথার সাক্ষ্য দেবেন যে প্রতি রজনীর অভিনয়েই এই শক্তিশালী নটের আশ্চর্য প্রতিভা আলমগীরের ভূমিকা নিত্য নব-নব রূপে মূর্ত করে তুলতেন।

শিশিরের আড্ডার খবর পরে দেবো। এখন প্রবোধ গুহর 'নাটকীয় আড্ডার' 'নাটকীয় কাহিনী' আগে শুনুন। সত্যকথা বলতে কি স্টারের মফঃস্বল দালানে প্রবোধদা হর বন্ধুদের সঙ্গে তেমন প্রাণ খুলে আড্ডা দেবার সুবিধা হত না। তিনি ছিলেন উক্ত রঙ্গালয়ের বেতন ভোগী কর্ম-সচিব। পরিচালক বর্গকে পরিতুষ্ট রাখা, তথা, ম্যানেজার অপরেশচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত হয়ে ওঠার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার প্রয়াসে তাঁকে রোজই প্রায় কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে দুটি মাত্র হাতেই চার হাতের কাজ দেখাতে হত। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো এ ব্যাপারে প্রবোধ গুহ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্মকুশল ব্যক্তি। তাই সর্বজনের প্রীতিভাজন হতে পেরেছিলেন তিনি। এতো উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও হাতীবাগানের শুকতারাটি ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে একদা তিমিত হল। তাঁরের অংশীদার ও ডিরেকটারেরা আইনজ্ঞ ও ব্যবসাদার হ'য়েও দীর্ঘকালের মধ্যে কোনও মুনাফার মুখ দেখেননি। যদিও এখানে 'কর্ণার্জুন' 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি এক একখানি নাটক শত শত রজনীর অভিনয় গৌরবে বহু রঙ্গালয়ের ইতিহাস রচনা করেছিল। দেশ বিদেশ থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসতো। প্রেক্ষাগারে দর্শক উপচে পড়তো।

তবু কিন্তু সেই ভরা জোয়ারেই ভাটার শুরু হ'ল। মনমোহন থিয়েটার উঠে যাবার পর ধানীবাবু (৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) যেমন স্টারে এসে যোগ দেন, সঙ্গে সঙ্গে স্টারের উজ্জ্বলতম তারকা অহীন্দ্রবাবু দীর্ঘ অবকাশ নেবার পর থিয়েটারে যোগদিলেন। এই সময় সিনেমার আকর্ষণটা বড় হ'য়ে ওঠায় নরেশচন্দ্র, দুর্গাদাস, অহীন্দ্রবাবু সকলেই রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণের চেয়ে রূপালী পর্দার হাতছানিতেই সাড়া দিয়েছিলেন। তবে একমাত্র অহীন্দ্রবাবুকেই দেখা গেছলো দুকূল বজায় রেখে চলতে। পরবর্তীকালে ছবি বিশ্বাসকেও অহীন্দ্রবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেখি।

'স্টার থিয়েটারের' দরজা বন্ধ হ'লেও প্রবোধ গুহ আবদ্ধ হ'য়ে পড়ার পাত্র নন। তিনি মনমোহন পাড়ের 'মনমোহন থিয়েটার' ইজারা নিয়ে নিজেই একটি অভিনবত্বসজ্ঞ গড়ে নব নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের নূতন নূতন নাটক নিয়ে মহাউদ্যমে ব্যবসা শুরু করলেন। আমাদের আড্ডাও দ্বিগুণ উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো মনমোহন থিয়েটারে স্থানান্তরিত হ'য়ে। নব নাট্যকার শচীন তারার সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় ছিল। তার পিছু পিছু এলেন চাঁদসদাগরের দীর্ঘবপু নাট্যকার মন্মথ রায়। এলো বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম আর কণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ নলিনীকান্ত সরকার। নরক গুলজার একেবারে।

প্রবোধ গুহর এই থিয়েটারে সাহিত্যিকদের আড্ডা বিশেষ করে নাট্যকার ও সঙ্গীতজ্ঞ যারা, তাঁদের জমায়েৎ প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই হ'ত। এই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সর্বগুণালঙ্কৃতা অভিনেত্রী নীহার বালা। নীহার বালার একমাত্র অভাব ছিল সুতনুর। কিন্তু সে অভাব নটরাজ পূর্ণ করে দিয়েছিলেন গীত বাদ্য নৃত্য ও অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দিয়ে। বিপত্নীক প্রবোধ তারা নীহারের একান্ত অনুগত হয়ে পড়ায় থিয়েটারের আড্ডার এই বিশেষ গুণী বন্ধু কয়জনকেও শ্রীমতী বিশেষ সমাদরের সঙ্গেই আপ্যায়িত করতেন। আড্ডার যা Sinews—অর্থাৎ, মুহুর্মুহু চা পান সিগারেট এবং সন্ধ্যা যখন রাত্রির দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করে অতিথিবৎসল প্রবোধ গুহ বিবিধ মুখরোচক সুখাদ্যও নীহারকে দিয়ে পরিবেশন করাতেন।

সুতরাং এ আড্ডার মূল কেন্দ্রেই পত্তীরে চলে যায় এবং এর ভার পালার ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটতে থাকে। মনমোহন রঙ্গালয়ে বেশ কিছু টাকা বসাবার মতো প্রশস্ত স্থান ছিলনা। আড্ডাধারীদের এ অভাব ঘুচেছিল যখন প্রবোধ তাঁতীবাগানে অকল্পকেই 'থিয়েটার পাড়া' ক'রে তোলবার জন্য প্রশস্ত জমি লীজ নিয়ে বিরাট 'নাট্যনিকেতন' গড়ে তুলেছিলেন।

মনমোহন রঙ্গমঞ্চে শচীন ও মন্মথ তাঁহার জাদু-লেখনী প্রসূত 'পৌরিক পতাকা' 'কারাগার' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটক প্রবোধ গুহর দক্ষীর ঝাঁপিকে উপচে তুলেছিল। এজন্য নটনায়ক নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সর্বতোমুখী প্রতিভাশালিনী নটী নীহারবালার কাছে প্রবোধের ঋণ অপরিশোধ্য।

'নাট্যনিকেতনের' নবগৃহে আসবার পর প্রবোধের অবস্থা হয়ে উঠেছিল প্রায় আবুহোসেনের মতো। রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে প্রায় পাঁচ সংসারই বলা চলে প্রবোধ গুহ তাঁর বাস-গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ গৃহের দ্বার কিন্তু তাঁর সকল বন্ধুর জন্যই উন্মুক্ত ছিল। যখনই আসুন না কেন আপনি—এ প্রবোধাবাসে সর্বদাই—'সুস্বাগতম!

নীহারবালা শুধু অভিনেত্রীই ছিলেন না, গৃহিনীও ছিলেন। প্রবোধের লক্ষ্মীহীন সংসার সে লক্ষ্মীশ্রী নিয়ে এসেছিল। তার উদার জীবনকে সংযত করেছিল। তার মাতৃহীন সন্তানদের জননী স্বরূপা হ'য়ে উঠেছিল। নাট্যনিকেতনের এই অপেক্ষ গুণবতী নটী আমাদের স্মরণে আনায় পূরক রচিত বঙ্কুবটিক নাটকের 'বসন্তসেনা' ও 'চারুদত্তের' কাহিনী। অবশ্য, মহাকবি ভাস রচিত "চারুদত্ত" নাটকই এর মূল ভিত্তি।

অবিভীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীরও নাকি এগুণ ছিল। অপরেশচন্দ্রের মুখে শুনেছি এছাড়াও তারাসুন্দরী ছিলেন নাকি গার্হিক ভাবাপন্ন অতি ভক্তিমতী নারী। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী শিষ্যদের প্রতি ছিল তাঁর অপার শ্রদ্ধা। আমার কনিষ্ঠ সহোদর যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ, ষোলো সতেরো বছর বয়সেই বেলুড়মঠে স্বামীব্রহ্মানন্দ মহারাজের শরণ নিয়ে তাঁর কাছেই দীক্ষা লাভ করেছিল। তারার আমার নাম হয়েছিল 'স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজ'! শ্রীমতী তারাসুন্দরী স্বামী অমৃতানন্দজীর শিষ্যা ছিলেন। আমার মাকে দেখবার জন্য প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। একথা বোধহয় আগে একবার বলেছি। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল অবিতীয়া অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গেও আত্মীয়তা কম ছিল না। তাঁর ভুবনেশ্বরের বাড়ীতে বহুবার আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বেড়িয়ে আসবার জন্য। কিন্তু, যাই যাই করে আর যাওয়া হয়নি। আজ কোথায় অপরেশ? কোথায় বা তারাসুন্দরী? ওদের কথা লিখতে লিখতে আজ কেবলই মনে পড়ছে একদিনের কথা। অপরেশচন্দ্র তখন গড়াই মল্লিকের বাগানে বাস করছেন। কি একখানি নাটক লেখায় কাজনিয়ে। আমার একপরিচিত বন্ধুর সনির্বন্ধ পীড়াপীড়িতে তাঁকে নিয়ে অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গেছলুম। তিনি একখানি নাটক লিখেছিলেন। বিষয়বস্তু কি আজ স্মরণ হচ্ছেনা। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে নাটকখানি যাতে তাঁর থিয়েটার অভিনীত হয়। কারণ, তাঁর থিয়েটারের যে আভিজাত্য গড়ে উঠে ছিল, তার প্রতি বন্ধুবরের বেশ একটু মোহ ছিল।

অপরেশচন্দ্রকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। তিনি কারো মনরেখে চলার মানুষ ছিলেন না। আমার বন্ধু সেই নাট্যকারকে মুখের ওপরই বললেন আপনি যখন 'দেবকবির' সঙ্গে এসেছেন আপনাকে ফিরিয়ে দেবনা। নাটকখানি আমার কাছে রেখে যান। অবসর মতো পড়ে দেখবো। কিন্তু

মশাই! স্পষ্টই বলে রাখছি আপনাকে, আপনার এ নাটকখানি যদি আমার খুব ভালো লাগে তাহ'লে আর এটি আপনি ফেরত পাবেন না। ওটার নাম পাল্টে একটু আধটু সংস্কার করে স্রেফ আমার লেখা বলে চালিয়ে দেবো। এরপরও যদি নাটকখানি রেখে যেতে চান আপত্তি নেই আমার।

কিন্তু আমার সে বন্ধুটির আপত্তি ছিল। তিনি ম্লানমুখে নাটকখানি ফেরৎ নিয়ে চলে এলেন।

প্রবোধ গুহর আড্ডার কথা বলতে বলতে অপরেশ প্রসঙ্গে চলে গেছলুম। এটা মার্জ্জনার অপরাধ। ক্ষমা করবেন।

আপনারা হয়ত জানেন না। আমরা জানি। জিভে স্বাদ এখনও লেগে আছে। প্রবোধ গুহ শুধু থিয়েটার চালাতেই জানতেন না, হাতাখুন্তি চালাতেও নিপুণ ছিলেন। অর্থাৎ রন্ধনবিদ্যায় তিনি বোধহয় বিরাট রাজের সূপকার মধ্যম পাণ্ডবকেও হার মানিয়ে দিতেন। নাট্যনিকেতন সংলগ্ন তাঁর সেই শিল্পনের বাড়িতে—বৈদ্যুতিক অথবা গ্যাসের চুল্লী ঠিক মনে পড়ছেনা। প্রবোধ গুহ প্রত্যহই কিছুনা কিছু 'স্পাকে' মুখরোচক আহার্য বন্ধুদের পরিবেশন করতেন।

শুধুই কি সে আড্ডায় কেবল মুখরোচক খাদ্য পরিবেশিত হ'ত? না। তার সঙ্গে আমরা পেতুম বন্ধুবর নলিনীকান্ত সরকারের উদাত্ত কণ্ঠের হাসির গান, কাজীর প্রাণমাতানো সঙ্গীত, আর নীহারের অপরূপ বিনিন্দিত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত। হায়! কাজী আজ থেকেও নেই। নলিনী ও নীহার দু'জনেই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু, নীহার সবার মায়া কাটিয়ে স্বর্গে রওনা হয়েছেন। প্রবোধ গুহও তাঁর পশ্চাদানুসরণ করেছেন।

আজ ফাউল কাটলেট করেছি খেয়ে যাও। আজ পরশু তপসে মাছ ভাজা ব্যাসম দিয়ে। আজ সন্ধ্যায় টাটকা ইলিশ পেয়েছি খেয়ে যাও পরশু পরশু ভাজা দু'চারখানা। আজ কী? পলতা চিংড়ির চচ্চড়ি কাবাব! এইরকম এক-একদিন এক-এক নতুন ডিশ প্রবোধ গুহর আড্ডায় সুলভ ছিল। আর এ আড্ডার আলোচ্য বিষয়—থিয়েটার জগতের সীমানা পার হয়ে বড় একটা যেতনা। তবে রাজনীতি মাঝে মাঝে এসে পড়তেই। কারণ ঐতিহাসিক নাটক এমন ভাবে লিখতে হ'ত যাতে নাটকখানি আইনের আওতায় না-পড়ে, অথচ দেশাত্মবোধের প্রচারও ষোলো আনা করা যায়।

কুশলী নাট্যকার ছাড়া এ রকম নাটক লেখা অন্যের পক্ষে কঠিন। খেলার সময় ছেলেরা যেমন একটা খোঁটাকে বা গাছকে 'বুড়ি' করে নিয়ে খেলতো, এঁদেরও তেমনি ব্রিটিশ বা ইংরেজের বদলে ওদের পূর্ববর্তী ভারত বিজেতা মোগল বা পাঠানদের নিয়ে "Proxy" খাড়া করানো হোত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বৈমাত্রেয় ভাইরা এই কৌশলটা বুঝতে না পেরে হিন্দু নাট্যকারদের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও এজন্য অনেক লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছিল ইসলামী পত্র পত্রিকায়। তবে, কাজী নজরুল ইসলামের মতো আমাদের আরও অনেক মুসলমান কবি বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তাঁরা আজ পাকিস্তানে দেশভাগ হবামাত্র ভারত ছেড়ে তাঁরা পবিত্র ইসলাম ধর্মের পাকামাটি পাকিস্তানে চলে গেছেন। শুধু চলে গেলে কোনও কথাই ছিলনা। কিছুই বলবার ছিলনা। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হিন্দুর আশ্রয়ে মানুষ ও সাহায্যে পুষ্ট কোনও কোনও কবিকে অকস্মাৎ ভারত বিদ্বেষী হ'য়ে উঠতে দেখে বোধাগেল নিমক-হারামি করেই তাঁরা আজ নবজাত রাষ্ট্রের প্রিয় প্রজা হতে চাইছেন।

থাকগে ওসব রাজনীতিপূর্ণ দুর্নীতিপূর্ণ আলোচনা। আসুন আবার আড্ডাতেই ফেরা যাক। আমার

জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা এই—যেখানে বিশেষতঃ যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে জমাটি আড্ডা যেন প্রগাঢ় হ'য়ে ওঠে, সেখানে "ঘুণ ধরে" সুনিশ্চিত। কোথায় গেল সেই আর্ট থিয়েটারের ধনকুবেরদের আড্ডা? "ভারত সঙ্গীত সমাজের" মতো লক্ষপতি রাজা মহারাজাদের আড্ডা আজ তাও নিশ্চিহ্ন। "ষ্টার থিয়েটার" আজ স্বনামেই আবার "দেবনারায়ণের" কৃপায় সমুজ্জল হ'য়ে উঠেছে। জানিনা সেখানে আড্ডাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা। সম্ভবতঃ হয়না। সলিল মিত্র তারা আপদমস্তক কাজের লোক!

প্রবোধ গুহর 'মনমোহন' থেকে গড়ে তোলা তাজমহলের মতো কীর্তি 'নাট্য-নিকেতন আজ' কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল। সেখানে মহা ঢক্কা নিনাদে "বিশ্বরূপা" যে সেতু বেঁধেছিলেন 'থিয়েটার স্কোপের' মতই কি তাও ছায়াবাজী হ'য়ে গেল! থিয়েটারের আড্ডার উপর সম্ভবতঃ কোনও আদি যুগের নট-নটীদের অভিসম্পাত দেওয়া আছে। নইলে গোপাল লাল শীল, জ্যোতি অহরী প্রভৃতি সেকালের লক্ষপতি ক্রোড়পতিদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও একে একে সব রঙ্গপীঠই ভেঙে পড়ে আবার দেখি নব কলেবরে নূতন নামে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে।

কিন্তু, সেকালের মতো তেমনি আড্ডা কি সব থিয়েটারে এখনও আছে? জানিনি। বহুকাল হল থিয়েটারের আড্ডা ছেড়ে ঘর-সংসারী হয়ে পড়ছি। রাতজাগার বয়সও আর নেই! কাজেই বর্তমান যুগের নব রঙ্গালয়গুলির আড্ডার খবর জানা নেই। গিরিশবাবুর অমূল্য কথা "দেহ পট সনে নট সকলি হারায়।" বন্ধুবর শিশির কুমার ভাদুড়ীর ইডেন উদ্যানের একজিবিশন থেকে বেঙ্গলী থিয়েটার, 'নাট্যমন্দির' 'ষ্টার' ও 'শ্রীরঙ্গমের' আড্ডার আলোচনা পরের মাসে করা যাবে।

• • • •

অনেকদিন ধরে আমরা বৃন্দাবনবিলাসী মাখন-চোরা নবনী কোমল রাসমঞ্চবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছি; আজ প্রয়োজন সেই কৃষ্ণের ভজনা, কুরুক্ষেত্রে যাবার পথে চাবুক হাতে যিনি পথ রোধকারী শ্রীমতীকে পর্যন্ত আঘাত করতে দ্বিধা করেননি।

বাঁশী নয়, দেবতার হাতে আজ সুদর্শন চক্র। সারথী নয় আজ গোপবালা আর রাখালবালক। সাথী আজ নারায়ণী সেনা। আর গাণ্ডীবধারী অর্জুন।

রথ আজ কপিধ্বজ, সামনে কুরুক্ষেত্র, লক্ষ্য মহাভারত।

আমাদের সমস্যা :—

সামাজিক পরিবর্তন এক জটিল সমস্যা। পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত উপায়েই প্রত্যেক সমাজে প্রয়োজন বোধে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন এসে থাকে। সমাজ যখন প্রগতির পথে চলতে থাকে তখন পিছনের দিকে তাকাবার সময় থাকে না। তবুও আমাদের দেশে আজ যে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে তার জন্য দায়ী কারা? হয়তো বা সামাজিক সংঘাতে মানুষের মন ধীরে ধীরে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই সমাজের দিকে চাইলে মনে হয় ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু এর প্রতিকার না হলে সমাজের পাপ স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে এবং জাতির মহা দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে একটী ভয়াবহ ঘটনা জানিয়ে 'আমাদের সমস্যার' আসরে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। এইখানে সেটি প্রকাশিত হল। শ্রীমতী চক্রবর্তীকে অশেষ ধন্যবাদ। —বেলা দে।

আমাদের সমস্যা

জয়শ্রী চক্রবর্তী

উনিশ শো তিরিশ সাল আঠারই মে, মাতৃসেবাসদনের মেট্রণ প্রধান সাক্ষীর কৃষিকায় আদালতের কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে—সেই চাঞ্চল্যকর শিশু হত্যার নৃশংস কাহিনী বিবৃত করেছিলেন।

তাঁর বর্ণিত ঘটনায় জানা যায়, মাতৃসেবাসদন হস্পিটালটি গড়ে উঠেছে সমাজের হতভাগ্য অবাঞ্ছিত সন্তানদের আশ্রয়াগার হিসেবে এবং কুমারী মায়েদের অবৈধ সন্তান হত্যার পাপ থেকে বিরত করে—তাদের নির্ভয়ে জননী হবার অধিকার দান করাও এই সেবাকেন্দ্রের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সংসারে কতরকম ভুলই না মানুষ করে থাকে—কিন্তু কোন কুমারীর মা হওয়ার মত অভিশপ্ত ভুল আর নেই। সমাজ সংসার তাকে কোনদিনই ক্ষমা করেনা। ফলে গোপনে কত নিষ্পাপ শিশুহত্যার মারকীয় ঘটনা ঘটে থাকে যা সমাজ সংসার—আইনের অন্তরালেই থেকে যায়। অন্ধকারেই এই ভীষণ পাপ প্রতি নিয়ত ঘটছে।

কিন্তু সেই অন্ধকার থেকে কুমারী মায়েদের পরিত্রাণ করবার জন্য কোন একজন মহৎ ব্যক্তি

এই মাতৃসেবাসদনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভেবেছেন এই অভিশপ্ত মাতৃজাতিকে সম্মানজনক উপায়ে—সেবা করতে এবং তাদের সন্তানদের এই সেবাকেন্দ্রে রেখে, সেবা পূজা শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে। তাঁর এই মহতী চেষ্টার ফলে—এই সব অভিশপ্ত মায়েরা অসহায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতো। তাছাড়া তাদের সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সেবাকেন্দ্রকে নিশ্চয় যোগ্য বল বিবেচনা করেছিল। কাজেই, অন্ধকারের পাপ কমে আসছিল সমাজে।—কিন্তু যে পাপ বন্ধ করবার জন্য এই সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—তারই বুকে বসে এক ভয়াবহ শিশুহত্যার পাপ অনুষ্ঠিত হোল।

এই সেবাসদনের আশ্রিত অবোধ শিশু সন্তানদের ত্রুটিহীন পরিচর্যার জন্য—কয়েকজন দায়িত্ব সম্পন্ন—সুকোমল নারীকে নার্সের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন সেবাসদন প্রতিষ্ঠাতা। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ দেওয়া থাকতো—যাতে কোন ঘৃণা বা অবহেলা নিষ্পাপ শিশুদের ওপর না থাকে। উপরন্তু মাতৃ সম্পর্কহীন—এইসব অসহায় শিশুদের যোগ্য মায়ের স্নেহ সুধা দিয়ে তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। তার জন্য মোটা বেতনও দিতেন নার্সদের।

সেই সেবা কেন্দ্রের নব নিযুক্ত ফুনিয়ার নার্স মাত্র বছরখানেক এই দায়িত্বহীন কর্মে নিয়োজিত হ'য়ে—সেই নৃশংস শিশুহত্যার কাণ্ডটি করে বসলো।

মেট্রন সাক্ষ্য দিলেন, মে' মাসের মাঝামাঝি সময়—দিবাভের নিদারুণ তপ্ত মধ্যাহ্ন, সেবা সদনের খোলা ছাদ থেকে একটি শিশুর ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন হসপিটাল কম্পাউণ্ড-এর মধ্যে—তাঁর কোয়ার্টার থেকে। তারপর কি মনে করে অফ ডিউটিতে এসে পড়লেন ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে। তিন নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যাহ্ন ডিউটি ছিল—সুজাতা সুরের, সে তখন একাই ওয়ার্ডে ছিল। তখন ওয়ার্ড বয়, ঘাই জমাদার চাকরানী সবাই প্রায় খেতে চলে গেছে কিংবা এদিক ওদিক ছিল।

তিনি রাউণ্ড দিতে এসে দেখলেন ওয়ার্ডের সতেরো নম্বর বেডী সিট শূন্য। তিনি তখন সুজাতাকে জিজ্ঞেস করলেন—বেবী কোথায়? নার্স নির্ভীক এবং ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে জবাব দিল—তাকে ছাদে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

তার মানে? মেট্রন প্রশ্ন করলেন।

নার্স এবারও নির্ভয়ে উত্তর দিল, ভীষণ কাঁদছিল কিছুতেই চুপ করাতে না পেরে—ছাদে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

তখন তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হ'য়ে—নিজেই ছুটে গেলেন ছাদ থেকে বেবীকে আনতে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলেন—তাতে প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। নিদাঘের—প্রখর সূর্যের তাপে—সেই এক মাসের শিশুটি—পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে। সম্ভবতঃ তার চেঁচানোর জন্যে তার মুখে ন্যাকড়া পুরে দেওয়া হ'য়েছে। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে চেয়ে—তিনি আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। মুহূর্ত মধ্যে হসপিটালের লোকজন সব ছুটে এলো—তারপর তারাও শিহরিত হ'য়ে সেদিকে চেয়ে রইলো।

শিশুটিকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিলনা ভীষণ যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে তার মৃত্যু হ'য়েছে। এর পরে, নার্সকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হয়। আঠারশী খৃষ্টি এক তরুণী নার্সের বিরুদ্ধে একটি অসহায় শিশুকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার—ভারতীয় দণ্ড বিধির কঠিন ধারায় অভিযোগ এনে, মামলা দায়ের করা হলো।

আশ্চর্য, আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে—সেই নার্স স্বয় তার ইচ্ছাকৃত অপরাধকে স্বীকার

ভরে নেয়। এবং এই ধরণের অপরাধ করার পেছনে তার জীবনের আর একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে যে ভয়াবহ কাহিনী বোন—তার শেষাংশ পরে উদ্ধৃত করছি।

এই শহরের কোন অভিজাত গোঁড়া পরিবারে তার জন্ম হয়। পরিবারের মধ্যে নিদারুণ কুসংস্কারের আবহাওয়া ছিল। কিন্তু ওই গণ্ডীবদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও সুজাতার প্রণয় হয় একটি ছেলের সংগে। ছেলেটির নাম সুশান্ত। সুজাতার এক স্কুলের বান্ধবীর দাদা ছিল সুশান্ত। তাই পরিবারে চোখে ধুলো দিয়ে বান্ধবীর বাড়ী যাওয়ার নাম করে—মাঝে মাঝে সে প্রণয়ীর সংগে মিলিত হোত। কিন্তু মেয়েদের জীবনের যে ভুলের ক্ষমা নেই—সেই ভুলই সে করে বসেছিল। তার আগে সুচতুর সুশান্ত তাকে আশ্বাস দিয়েছিল—তাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। মেয়েদের জীবনে একটি বিচিত্র প্রলোভন! মেয়েটি যাকে সবস্ব প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল—তার কোন ছলনাকেই সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি—ধনতান্ত্রের নির্মম ভালবাসায়—তার নারীত্বের অবমাননা হবে। সেই ভুলই যখন সে করে বসলো—তখন যুবকটী কোথায়? সে দেশ ছাড়া হ'য়ে চলে গেছে। মেয়েটীর সংগে ভালবাসার নিষ্ঠুর অভিনয়টুকু সেরে—তার সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তখন বাড়ীর সকলের কাছে মেয়েটীকে ধরা দিতে হোল। তার জন্য তাকে নিদারুণ অত্যাচার করা হয়েছিল—বিধবা মা, ঠাকুমা, দাদা তিন জনে মিলে নৃশংস প্রহার করে একটি তালাবন্ধ ঘরে আটকে রেখেছিল সাত মাস পর্যন্ত। বাইরের কেউই জানতনা।—বাড়ীতে কেউ এলে বলা হোত মেয়েটী মামার বাড়ীতে গেছে। এই ভাবে দীর্ঘ দশমাসের দুঃসহ প্রতীক্ষা শেষ হোল—এক ভয়ঙ্কর রাতে। দাদা চুপি চুপি বুড়ি দাইকে ডেকে এনেছিল। তাকে অনেক টাকা দিয়েছিল—খবরটা গোপন রাখার জন্যে।

সব কাজ সেরে সে চলে গিয়েছিল। আরো অন্ধকার ঘরে অসহায়ের মত পড়ছিল মেয়েটি ওর বুকের কাছে ফুলের মত একটি শিশু ঘুমিয়ে। ছাদিকেনের ঘোলা আলোটা জ্বলছিল নিঃশব্দে। ঘরের দরজার সামনে বসে মা ঠাকুমা। কি নিষ্ঠুর ভাবে যেন ওরা চেয়ে দেখছিল—সেই নিষ্পাপ শিশুটির দিকে। মেয়েটির কেমন ভয় হচ্ছিল। বত্রিশ নাড়ির একটা অব্যক্ত যন্ত্রনা ওই শিশুটিকে ঘিরে ওর বুকে বাজছিল। তারি ইচ্ছে করছিল বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেয়। কিন্তু মা ঠাকুমার সেই ভীষণ দৃষ্টির দিকে চেয়ে ওর শিহরণ জাগছিল। হঠাৎ সে সময় শিশুটি কেঁদে উঠলো। যেন তার সদ্য বেড়াতে আসা জগৎটা কেমন খারাপ লাগছিল। ঠিক সেই ভাবে যেন সে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই মুহূর্তে ঠাকুমা এগিয়ে এসে তাকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। মা-ও গেল সংগে। মেয়েটির যেন তখন বড় কষ্ট হচ্ছিল। ওকে কেন পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল—সেটা বুঝতে পারলো পর মুহূর্তে ঠাকুমার গলা শুনে। চাপা গলায় যেন ঠাকুমা বললো—ওকে চুপ করাতে হ'বে যে করে হোক। আশপাশের লোক শুনলে যে আর মান থাকবেনা।

একসময় সেই কান্না থেমে গেল। মেয়েটির মনে হোল, তার দুই কাঁকনে খোকা ঘুমিয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ আর তার ঘরে এলোনা সেই ভয়ঙ্কর রাত ফুরিয়ে গেল, তার ঘুমন্ত ছেলেকে কেউ আর তার কাছে এনে দিলনা। ভোর বেলায় মা আর ঠাকুমা দুজনেই এলো তার ঘরে। মেয়েটির ভারি সঙ্কোচ হচ্ছিল বলতে যে খোকাকে এনে দাও একটিবার। কতক্ষণ দেখেনি তাকে।

দেখা হোলনা আর কোনদিনই তার সঙ্গে। পরে, সে জানতে পেরেছিল—খোকার কান্না থামাতে সেই রাতেই ঠাকুমা পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে—তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কান্না থামায়। সেই-

ভাবে সে দম আটকে মরে যায়। তার অবুঝ কান্নাটা চিরদিনের জন্য থেমে যেতে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর, খোকাকে হারা যেন কোথায় ফেলে দিয়ে আসে।

সেদিন কে যেন বলছিল—ভাস্টবিনে পড়ে থাকা একটি সুন্দর মৃত শিশুকে দূরে যাচ্ছে। আহা। কার ছেলে সে ? ... কেউ বলতে পারেনা। ওর তখন বুক ভেঙে যাচ্ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, তার নিরপরাধ খোকাকে মেরে ফেলেছে যারা, তাদের সবাইকে ধরিয়ে দেয় পুলিশকে। কিন্তু কোথায় যেন বাধছিল—দ্বিধা ছিল সেই অভিশপ্ত জীবনে। তাই অপরাধীদের বিরুদ্ধে সে নালিশ জানাতে পারিনি কাউকে।

আজকের সেই নার্স আদালতে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে বলে উঠেছিল—সেবাসদনে চাকরী করতে এসে দেখলাম কত খোকা এখানে সুখে বেঁচে আছে। তারা আমার খোকার মতই এসেছে—সমাজে অবাঞ্ছিত হ'য়ে। কিন্তু তাদের সুখের জন্য কত আয়োজন এই সমাজে ছিল। অথচ আমার খোকাকে বাঁচাতে পারিনি।

তাই, যেদিন সেই এক অবৈধ শিশুর কান্না শুনলাম, যাকে কিছুতেই চুপ করাতে পারছিলাম না—তখন মনে হোল আমার খোকার মতই তাকে চুপ করিয়ে দিই। চিরদিনের মত ওর কান্নাকে থামিয়ে দিই। যেমন করে আমার খোকার কান্না থামানো হ'য়েছিল, তেমনি করেই তারও কান্না থামিয়েছিলাম।

যে সমাজে অভিশপ্ত মায়ের স্থান নেই—যে সমাজে নিরপরাধ শিশুর আশ্রয় নেই—যাদের দাবীকে এমনি করে স্তব্ধ করে দেবার—সহযোগিতায় সমাজ তার খুনে হাত বাড়িয়ে দেয়—সেই সমাজে বাস করে—সেই সমাজের নায়কীয় রক্ত দেখে আমিও পশু হ'য়ে গিয়েছিলাম। এর জন্য আমি শাস্তি পাব—সেই অপরাধে—দায়ী আরো যারা, সমাজের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে—যেন তাদেরও সেই সব শিশুহত্যার নির্মম শাস্তি দেওয়া।

• • • •

আজ বাংলায় নানা সমস্যা.. বাংলার নাম আজ সমস্যার দেশ.. তার দেহ বিখণ্ডিত। তার নেতার অন্ত নেই। আর তারা সব বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। জনতা বিভ্রান্ত। হরি বলছে শ্যামের দোষ তার বলছে রামের দোষ। নিজেকে বাদ দিয়ে সবাই দোষী বলে অপরের দিকে দেখাচ্ছে আঙুল।

কিন্তু সমস্ত অভাব-অভিযোগ, দৈন্য আর হতাশার মাঝখানে ফুটে উঠেছে এক বড় সত্য, বাংলায় আজ মানুষ নেই। মনুষ্যত্ব গিয়েছে মরে বাংলায়।

জনকল্যাণ কল্পে

"বসন্ত রোগ উচ্ছেদ সপ্তাহ"

বেতার ভাষণ।

ডাঃ কণক সর্ব্বাধিকারী

"অধিকর্ত্তা স্বাস্থ্য বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ"

আপনারা জানেন যে বসন্তরোগ মানুষের এক ভয়াবহ শত্রু। কারো এ রোগ হয়েছে শুনলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আগে হাজারে হাজারে মানুষের জীবনান্ত ঘটেছে। এখন প্রতিষেধক টিকা বার হওয়ার পর এর প্রকোপ কিছুটা কমেছে, কিন্তু জনসাধারণের অসতর্কতার সুযোগ পেলে এখনো এ রোগ মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়ে।

বসন্ত রোগ আক্রান্ত হবার আগে প্রবল জ্বর হয়, তিন দিন পরে সারা দেহে লাল লাল ছোপ বেরিয়ে পড়ে, চতুর্থ দিনে ফুসফুড়ির মত Papule দেখা দেয়। পাঁচদিনে Vesicle বা গুটি বেরোয়। প্রথমে কপালে মুখে কব্জিতে, ক্রমে সারা গায়ে, হাতের তালুতে ও পায়ের চেটোয় এই গুটি ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে গলার ভিতরেও এই গুটি হতে পারে। প্রথম দিকে গুটিগুলির মধ্যে তরল পুঁজ হয়, পরে এই পুঁজ গাঢ় হলদে রংয়ের হয়ে যায়। দু সপ্তাহ দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে যন্ত্রণা কমে আসে গুটিগুলি শুকিয়ে মামড়িতে পরিণত হয়। ক্রমে মামড়িগুলি আপনা থেকে খসে পড়তে শুরু করে। এই সময়টা রোগীর বাড়ীর অন্যান্যদের পক্ষে খুব মারাত্মক। এই মামড়ীগুলি যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না পড়ে, তার জন্য সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার। কারণ এই মামড়ী থেকেই রোগের বীজাণু অন্যান্যদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

বসন্তরোগ যাহাদের হয়, তার মধ্যে আমাদের দেশে শতকরা ৫০ জনের মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে যায়, তাদের দেহে ঘটে নানা বিকৃতি। কেউ চিরকালের মত অন্ধ হয়ে যায়, কেউ হয় বধির, কারো বা দেখা দেয় খাদ যন্ত্রের রোগ, সারা দেহে থেকে যায় দাগ। মুখের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

অথচ এই রোগ নিবারণ করার অতি সহজ প্রতিষেধক রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও সাধনায় এই রোগের প্রতিষেধক টিকার উদ্ভাবন সম্ভব হ'য়েছে। এই সাঙ্ঘাতিক রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হ'লে তিন বছর অন্তর রক্ষা কবচ হিসাবে বসন্ত রোগের টিকা নিলে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করা যায়।

এই রোগের নানারূপ (১) প্রথমতঃ Conglucut type এতে আক্রান্ত রোগের শতকরা ৯০ জনের মৃত্যু ঘটে।

(২) দ্বিতীয়তঃ Discrete type এতে মারা যায় রোগীদের মধ্যে শতকরা ৬ জন।

(৩) তৃতীয় প্রকার রোগকে বলা হয় Haemorrhagic type পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের বসন্তরোগ বিশেষ দেখা যায় না।

এর আবার দুটো রকম আছে (১) প্রথমতঃ Pustulan form এতে রোগীদের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগের মৃত্যু হয়। আর দ্বিতীয়তঃ Pur puric form এতে শতকরা রোগীদের মধ্যে ১০০ ভাগেরই মৃত্যু ঘটে। (৪) চতুর্থ বা শেষ প্রকারটির নাম হচ্ছে Modified type এই type এর রোগে আক্রান্ত হলে কোন উপসর্গ না থাকলে রোগী মারা যায় না। কিন্তু এই typeটি আবার অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকও ধরতে পারেন না—রোগী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা। এতে রোগী শয্যাশায়ী হয় না—হাটে বাজারে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ও রোগের বীজাণু ছড়ায়। সুতরাং এটি যে কত মারাত্মক, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব রোগের লক্ষণ বা উপসর্গের সূচনা দেখলেই জনস্বাস্থ্য অফিসে অবিলম্বে খবর দেওয়া একান্ত দরকার।

এখনও কারো কারো বিশ্বাস যা শীতলার রোষে এই রোগ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে তা নয়। এই রোগ হয় Variola virus এর আক্রমণে। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু Variola virus এই রোগের বাহক। রোগীর কফ ও থুথু কণায় এই জীবাণু থাকে। রোগাক্রান্তের হাঁচি, কাশি বা কথা বলার সময় থুথু কণার মধ্য দিয়ে এই রোগ অন্য দেহে প্রবেশ করে। হাঁচি প্রায় ২০ ফুট, কাশি ১৫ ফুট, কথা বলার সময় থুথু কণা ৪ ফুট পর্যন্ত এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। বসন্তের গুটি শুকিয়ে গিয়ে যে মামড়ী খসে পড়ে, তাঁর কণাগুলিও বাতাসে উড়ে রোগ ছড়ায়। যারা এক বা একাধিকবার বসন্ত প্রতিষেধক টিকা নেন নি, তাদের মধ্যে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটা সকলের বিশেষ করে মেনে রাখা দরকার বসন্তের টীকা নিলে, এই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যায়।

প্রাথমিক টিকা দেওয়া উচিত শিশু জন্মের ৬ মাসের মধ্যে। তারপর ৩ বছর অন্তর নিয়মিত ভাবে নিতে হবে। গর্ভবতী মায়ের টিকা নিতে আপত্তি নাই, কিন্তু গর্ভধারণের ৩ মাস না নিলেই ভাল হয়। যখন কোন অঞ্চলে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে বলে শোনা যায়, তখন ঐ এলাকার প্রত্যেক অধিবাসীদের উচিত টিকা নেওয়া। এমনকি, সেই এলাকায় সদ্যজাত শিশুদেরও টিকা দেওয়া উচিত। এটা করতে পারলে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায় বসন্ত রোগের প্রকোপ থেকে। নিছক কুঁড়েমী বা অবহেলা করে এই মারাত্মক রোগের আক্রান্ত হওয়া কি ভাল? এর হাত থেকে নিজেকে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে এই সহজ উপায়ে রক্ষা করতে না পারলে, আপনি কি অপরাধী হবেন না? সহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতি মানুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন পশ্চিম বাংলা সরকার। এই সুযোগ গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? আমাদের শাস্ত্রেইত আছে "আত্মানাং সততং রক্ষেৎ" শাস্ত্র বাক্য মেনে নিয়ে আসুন প্রিয়জনদের এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা করবার ও নিজে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথা সময়ে বসন্ত প্রতিষেধক টিকা নেওয়া সকলের কর্তব্য।

টিকা নেওয়ার পর ৩।৪ বছর কেটে গেলে টিকার প্রতিষেধক ক্ষমতা চলে যায় বা বহুলাংশে হ্রাস পায়। যে সব লোক আদৌ টিকা নেন নি, তাঁদের নাক ও মুখের মধ্য দিয়ে Variola virus জীবাণু প্রবেশ করে।

এই রোগ হ'লে রোগীকে পৃথক করে রাখতে হবে। রোগীর পক্ষে মুক্ত আলো বাতাসের প্রয়োজন আছে। যে ঘরে রোগী থাকবে, সে ঘর থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ

রোগের বীজাণু কখন কোথায় ছড়িয়ে পড়বে, লুকিয়ে থাকবে, তার ঠিক নেই। রোগীর পক্ষে মশারী ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এর দ্বারা মশা মাছির আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করাও সম্ভব হয়। মাছি আবার এ রোগ ছড়াবার একটা বড় রকমের বাহক। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র পরিধেয় বস্ত্র সবই জলে ফোটান দরকার। তারপর সেইগুলিকে রোদ্দুরে শুকান উচিত। রোগীর কফ ও থুথু ঢাকা পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে দিতে হবে। বাসন্ডিগুলির বেলাতেও তাই। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র শোধন করতে হলে ১০% করমালীন লোশন কিংবা ৫% ব্লিচিং পাউডার লোশন (Bleaching powder lotion) ব্যবহার করা যেতে পারে। এক ঘণ্টাকাল এগুলিকে ঐ লোশনে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

রোগীর সেবা করবেন তারাই, যারা কিছুদিন আগে বসন্তের টিকা নিয়েছেন। এঁদেরও হাত ও কাপড়-চোপড় শোধন করবার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। এঁরা ছাড়া রোগীর ঘরে আর কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ।

বসন্ত রোগে মৃত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব দাহ অথবা কবর দিতে হবে। শবদেহ নিয়ে যাওয়ার আগে শতকরা ১০% করমালীন লোশনে (Formalin lotion) ভেজান কাপড় দিয়ে শবের সর্বাঙ্গ মুড়ে দিতে হবে। কি সধবা কি বিধবা, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সবক্ষেত্রেই এটি অবশ্যই করণীয়।

পূর্বে এ'রোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জেনার নামক একজন ইংরেজ নিজের দেহের উপর অল্প মাত্রায় গো বসন্তের ইনজেকুলান নিয়ে প্রমাণ করেন যে এর দ্বারা দেহে বসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে...রোগের প্রকোপ কমে বা একেবারেই নিরোধ হ'য়ে যায়। টিকার প্রকৃত প্রতিরোধ ক্ষমতা যে কী, এবং কি করে তা সম্ভব হয়, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লুই পাস্তর তা প্রমাণ করেন। সেই থেকে পৃথিবীর লোক ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়েছে এই প্রতিষেধক টিকার উপরে।

এই মারাত্মক রোগ আমাদের দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবাংলায় এই পরিকল্পনা চালু হ'য়েছে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই পরিকল্পনার কাজ হয়েছে অনেক, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নি।

আমরা এখন জেনেছি বসন্ত রোগের সহজ ও একমাত্র প্রতিষেধক হলো ব্যাপকভাবে এই টিকা নেওয়া। এই টিকা যদি সফল হয়, তাহলে বসন্ত রোগের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেও কেউ রোগাক্রান্ত হবেন না। কিন্তু শুধু এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই চলবে না। বাংলার প্রতিটি মানুষকে অভ্যাস করতে হবে নিয়মিত ভাবে এই টিকা নেওয়া। যুক্তি যতই সুদৃঢ় হোক, আইন কানুন, কর্মসূচী যতই হউক যতদিন না দেশের প্রতিটি মানুষ এই জাতীয় পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, ততদিন নির্মূল হবে না এই ভয়ংকর রোগ।

আমার অনুরোধ, আপনারা সকলে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য, এই মহামারীর হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্য এই জাতীয় পরিকল্পনাটিকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা দিয়ে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলুন।

চতুর্বিংশতি বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এই পৃথিবীতে নানান বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেমন ভগবানের কাজ, সাহিত্যিকের কাজও ঠিক তেমনি। কাজেই সাহিত্যিকের জীবন হবে সাধকের জীবন। জটাজুটধারী ছাই-ভস্মমাখা গেরুয়াবসনপরা সন্ন্যাসী সাধক নয়—জীবন-সাধনায় সিদ্ধ সাধক।

অপরের জীবনের সুখ-দুঃখ যাকে অনুভব করতে হবে, জীবনের বিকাশ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় হবে ঘনিষ্ঠ, তাঁর নিজের জীবনটি চিরাচরিত একটি নিতান্ত সাধারণ জীবন হলে চলে না—জীবনটিকে বেঁধে নিতে হয় একটি উঁচু সুরে।

এই মর-জগতে অজ্ঞান-অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান মানুষের জীবনের দিশারী বলে থাকি কবি সাহিত্যিককে। কিন্তু সেই কবি-সাহিত্যিকের জীবনের দিশারী কে? তাঁদের জীবনের চিরন্তন দিশারী তাঁদের হৃদিস্থিত হৃষীকেশ—যিনি অলক্ষ্যভাবে অন্তরে থেকে সব-কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এইখানে আশ্রয় নিতে পারলে, নিত্য নিয়মিত ব্যাকুল প্রার্থনা জানালে সাহিত্যসেবীর হৃদয়ের দ্বার খুলে যায় এবং এমন এক জগতের সন্ধান তিনি পান—চৈতন্যের লীলা যেখান অব্যাহত।

এরই ওপর একটি গল্প লিখেছিলাম।

গল্পটি প্রকাশিত হবার পরেই নিতান্ত অপরিচিত এক যুবক একদিন হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে হাজির! চেহারাটি দেখতে ভারি সুন্দর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই বললে, আলাপ-পরিচয় নেই, তবু এলাম।

বললাম, বোসো।

বসেই বললে, আমার নাম রামদেবক শর্মা। আমিও একজন গল্প-লেখক। আপনি লেখেন বাংলায়, আমি লিখি হিন্দীতে। নাম শুনেই বোধহয় বুঝতে পেরেছেন আমি হিন্দুস্থানী।

—এমন সুন্দর বাংলা বলছো, তুমি হিন্দুস্থানী তা বুঝবার উপায় নেই।

রামসেবক বললে, বুঝবেন কেমন করে? চার-পাঁচ পুরুষ ধরে আমরা এই বাংলাদেশে বাস করছি। আমার জন্ম এই কলকাতা শহরেই—এইখানেই মানুষ হয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ব্রাহ্মণ?

হেসে বললে, আজ্ঞে হাঁ। উপাধিটা যখন শর্মা, তখন ব্রাহ্মণ না হয়ে উপায় কি? তবে পৈতে-টৈতে সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কাশীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের ছেলে আমরা নিরামিষাশী। আমি কিন্তু মাছও খাই, মাংসও খাই, পেঁয়াজ রসুন কিছু বাদ দিই না। পুরোদস্তুর বাঙালী হয়ে গেছি।

বললাম, বাংলা লেখা-টেখা পড়?

—সব—সব পড়ি। বাঙালী লেখকরা সবাই আমাকে চেনে। আপনি বয়েসে অনেক বড়, তাই আপনার কাছে আসিনি। আজ এলাম ঝগড়া করবার জন্যে।

কথাটা শুনে একটুখানি অবাক হয়ে গেলাম।—'ঝগড়া করবার জন্যে? কেন?'

—আপনার সব লেখাই আমি পড়েছি। কিন্তু এবার এ কী গল্প লিখেছেন আপনি? সবাই কি যোগ অভ্যাস করবে নাকি?

বুঝলাম আমার গল্পটি সে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবানে বিশ্বাস কর?

রামসেবক বললে, ভগবান থাকলেই তো বিশ্বাস ক'রবো!

—তোমার কি মনে হয় ভগবান নেই?

—আজ্ঞে না। ভগবান নেই। মানুষ তার কল্পনা দিয়ে ভগবান তৈরি করেছে। ভূত আর ভগবান এই দুটো জিনিস মানুষের কল্পনার তৈরি। এই দুটো জিনিসের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে নেই।

বুঝলাম পঁচিশ-তিরিশ বছরের এই যুবক—এ-যুগের ফসল। বললাম, তোমার সুখ-দুঃখ, তোমার ভবিষ্যৎ, সবই তাহ'লে তুমিই তৈরি করেছ?

খুব জোর দিয়ে রামসেবক বললে, নিশ্চয়। আমার চরিত্রই আমার জীবনের সুখ বলুন, দুঃখ বলুন, বর্তমান বলুন, ভবিষ্যৎ বলুন—সবই তৈরি করেছে। সুতরাং আমিই আমার বিধাতা। এখানে দ্বিতীয় বিধাতা বা ভগবান কেউ নেই।

—খুব ভাল কথা।

বললাম, তোমার সেই 'আমি'কে কোনোদিন চোখে দেখেছো?

রামসেবক বললে, আজ্ঞে না। তাকে দেখা যায় না।

বললাম, দেখা যায়। তার সঙ্গে কথা বলা যায়। কথার জবাব পাওয়া যায়।

রামসেবক বললে, সব গাঁজাখুরী। প্ল্যানচেটে যেমন পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব হয়—এও ঠিক তেমনি।

—তা হোক্। তবু আমি তোমাকে একটি অনুরোধ করবো। শুনবে?

রামসেবক বললে, বলুন, শুনবো।

বললাম, রোজ সন্ধ্যায়, নয় তো শোবার সময় তোমার মন যখন একটুখানি শান্ত থাকবে তখন কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে তোমার সেই 'আমি'কে ডাকবে, তার কাছে প্রার্থনা করবে। বলবে, তুমি এসো, আমাকে দেখা দাও। আমার জীবনের প্রতিটি দিন যাতে আনন্দময় হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা কর। তারপর

সকালে তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন আর-একটুখানি সময় দাও; চুপ করে শোনো—তোমার সেই 'আমি' তোমাকে কি বলে। সে যা বলবে তার নির্দেশমত কাজ করবে। প্রথম প্রথম হয়তো তোমার মন বসবে না, খারাপ লাগবে। তবু ছাড়বে না। কিছুদিন পরে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল রামসেবক। হঠাৎ বলে বসলো, এ এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

বললাম, না। তোমাকে আমি যাগ-যজ্ঞ করতে বলছি না, হরিনাম সংকীর্তন করতে বলছি না। তোমার সেই 'আমি'র চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই, তোমার সম্পদে বিপদে সব সময় সে তোমার সঙ্গেই রয়েছে। তুমি যখন ঘুমোচ্ছ তখনও সমাধিগ্রস্ত প্রহরীর মত সে তোমাকে আগলে বসে আছে। তোমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু—সেই একান্ত আপন-জনের সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা বলো। এতে আনন্দ আছে। এ তুমি নিশ্চয়ই পারবে।

রামসেবক বললে, পারবো।

বললাম, আমার সঙ্গে ঝগড়াটা তা'হলে মিটে গেল?

রামসেবক হেসে উঠলো। বললে, হ্যাঁ। আর আমি আপনার সময় নষ্ট করব না।

এই বলে আবার সে আমাকে একটি প্রণাম করে উঠে চলে গেল।

মাস-তিনেক হয়ে গেল রামসেবকের কোনও পাত্তা নেই।

হঠাৎ একদিন তার কাছ থেকে একখানি পোষ্টকার্ডে-লেখা চিঠি পেলা। লিখেছে, 'আপনার নির্দেশমত কাজ করে যাচ্ছি। প্রথম-প্রথম মন বসতো না। এখন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি। রামসেবক।'

ছোট্ট এই চিঠি। তারপর আবার নীরব।

কতদিন পরে ঠিক মনে নেই। বোধকরি পাঁচ ছ' মাস হবে। রামসেবকের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

নিজেই এলো একদিন। মুখখানি আগের চেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বেশ হাসিখুশী ভাব। প্রণাম করে এসে বসলো। বললে, এক পেয়ালা চা খাব। আপনার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে।

কথা এমন বেশি কিছু নয়। আমার কাছে আসবার আগে কিরকম জীবন সে যাপন করতো তারই সবিস্তার বর্ণনা। কোনও কথাই সে গোপন করলে না। চা খেতে খেতে সবই সে বললে।

একটি হিন্দী ইস্কুলে সে মাষ্টারী করে। আগেও করতো, এখনও করে। হিন্দী তার মাতৃভাষা। হিন্দীতে গল্প লেখার শখ তার অনেকদিনের। অনেক গল্প লিখেছে, কিন্তু একটি মাত্র গল্প সেই কোন্ যুগে ছাপা হয়েছে, তারপর আর কোনও গল্পই কেউ নেয় না। কাগজের আপিসে পাঠায় আর সঙ্গে সঙ্গে অমনোনীত বলে ফেরত আসে। টিকিট দেওয়া না থাকলে তার আর পাত্তাটি পাওয়া যায় না। রামসেবক বাংলা বেশ ভালই জানে। বাঙালী লেখকদের লেখা গল্প পড়ে আর ভাবে এমনি লিখতে না পারলে ছাপা হবে না। নকল করে লেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। তখন সে এক ফন্দী আবিষ্কার করলে।

রামসেবক হাসতে হাসতে বললে, আপনার গল্প দিয়েই আরম্ভ। আপনার একটি পুরনো গল্পের নাম-ধাম এদিক-ওদিক একটু-আধটু অদল-বদল করে দিলাম পাঠিয়ে হিন্দী পত্রিকায়। পরের মাসেই ছাপা হয়ে গেল। তারপর ধরলাম আর-একজন লেখককে। তারপর আবার আর-একজন। এমনি করে

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাদের গল্পগুলো নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দিতে লাগলাম। আট-দশটা গল্প ছাপা হতেই নাম হয়ে গেল। পত্রিকা আপিস থেকে রামসেবক শর্মার নামে চিঠি আসতে লাগলো। ক্রমাগত গল্পের জন্য অনুরোধ আর পারিশ্রমিকের টাকা।

নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছি। কেউ কিছু ধরতে পারছে না।

এমন সময় আপনার সেই গল্পটি বেরুলো—যাতে আপনি ভগবানের কথা লিখেছিলেন। তখন আমি ভগবান-টগবান বিশ্বাস করি না। এলাম আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

এই পর্যন্ত বলবার পর থামিয়ে দিলাম রামসেবককে। জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তোমাকে যা করতে বলেছিলাম, করেছিলে?

রামসেবক বললে, রোজই করি। কাল রাত্রেও প্রার্থনা করেছি। আজ সকালেও নির্দেশ পেয়েছি। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতাম না। শেষের দিকে প্রায়ই নির্দেশ আসতো চুরি কোরো না। চুরি করা অপরাধ।

বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম লেখা চুরি করার জন্য আমার অবচেতন মনে একটা অপরাধ-বোধ তো প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে, এটা বোধকরি তারই বহিঃপ্রকাশ।

তখনও কিন্তু নির্বিবাদে চুরি চালিয়ে যাচ্ছি।

এমন দিনে হঠাৎ একটা কথা ক্রমাগত মনে আসতে লাগলো—'অক্ষয়বর'। 'অক্ষয়বর'।

কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিন চারদিন পরে রাস্তার ধারে বইএর একটি ষ্টলে নতুন একটি হিন্দী মাসিকপত্র দেখলাম। পত্রিকাটির নাম অক্ষয়বর। এককপি কিনে নিয়ে এলাম বাড়ীতে। উল্টে দেখলাম। কোথাও কিছুই দেখতে পেলাম না। কাগজখানা ফেলে রেখে দিলাম। অথচ 'অক্ষয়বর' কথাটা কিছুতেই মন থেকে ফেলতে পারছি না।

চারপাঁচদিন পরে হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী বললে, দেখেছো কেমন মজা! তোমার সেই গল্পটা কে একজন হুবহু চুরি করে মেরে দিয়েছে জানো।

বুকের ভেতরটা ধক্‌করে উঠলো। আমিই তো চুরি করি, চোরের ওপর বাটপাড়ি আবার কে করলে?

দেখলাম আমার স্ত্রীর হাতে সেই 'অক্ষয়বর' পত্রিকাখানি।

যে-গল্পটি দেখিয়ে দিলে সেইটি পড়লাম।

কে একজন 'রঙ্গনাথ' ছদ্মনামে আপনার সেই পরিশোধ গল্পটি হুবহু চুরি করে মেরে দিয়েছে। গল্পের নাম আর পাত্র-পাত্রীর নামগুলি দিয়েছে বদলে।

আমিও আপনার সেই 'পরিশোধ' গল্পটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য নাম দিয়ে অন্য একটি কাগজে ছাপিয়েছি।

এবার আর আমার ধরা পড়তে দেরি হবে না।

কিন্তু এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে কে আমাকে দেখিয়ে দিলে?

যে নাম আমি কখনও শুনিনি, সেই 'অক্ষয়বর' নামটি কে আমাকে বার-বার শোনালে?

সে কি আমার সেই 'আমি' না আমার অন্তরের দেবতা, যাকে আপনি ভগবান বলছেন?

এই বলে রামসেবক রেট হয়ে আমাকে একটি প্রণাম করে মেট মুখ তুলেছে, দেখলাম তার চোখদুটি জলে টল্‌টল্ করছে।

মাথায় হাত রেখে রাম-সেবককে আশীর্বাদ করলাম। বললাম, একটিমাত্র অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লসিত হয়ো না, ভেবো না তুমি এই জীবন-রহস্যের সব-কিছু বুঝতে পেরেছো। এটা মাত্রিক নয়। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার চেষ্টা। সেপথে এমনি করেই পা বাড়াতে হয়।

এ শুধু তোমার অন্তর-দেবতাকে প্রত্যহ একটি করে প্রণাম নিবেদন, আর যে তোমার চির মঙ্গল-কাঙ্ক্ষী সেই তোমার অন্তরের অন্তরতমের কাছে তোমার হৃদয়টিকে খুলে ধরা। এরই নাম প্রার্থনা।

একটি গল্প বলি তোমার কাছে।

বাসবাজারের রাস্তার ওপর দিয়ে দুই বন্ধু যেতে যাচ্ছে। একজন ভগবানে বিশ্বাসী, আর একজন নাস্তিক। আর ঠিক সেই সময়ে ওদিক থেকে একটি শোভাযাত্রা আসছিল। শোভাযাত্রার সুমুখে মাটির একটি মহাদেবের মূর্তি।

সেই মহাদেবটিকে দেখে বন্ধুদের মধ্যে একজন হাতদুটি জোড় করে একটি প্রণাম করলে।

তার প্রণাম করা দেখে আর-একজন বলে উঠলো, এ কি রে? তুই না নাস্তিক! তুই তো ভগবানে বিশ্বাস করিস না!

নাস্তিক-বন্ধুটি বললে, ভগবানে বিশ্বাস করি না সত্যি, কিন্তু পথে-ঘাটে ভগবানের সঙ্গে যদি হঠাৎ দেখা হয় তো একটা প্রণাম ঠুকে দিই শুধু। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না।

বিশ্বাসী-বন্ধুটি বললে, কথা বলে একবার দেখতে পারিস। কথা বললে তোর সঙ্গে কথা বলবে না—তাকালে সাড়া দেবে না—ভগবান-লোকটা বোধহয় এত বড় অভদ্র নয়।

গল্পটি শুনে রামসেবকের মুখে হাসি ফুটলো।

বললাম, এই কথা-বলা, শেষে রূপান্তরিত হয় প্রার্থনায়।

ঐকান্তিক প্রার্থনা। শুধু প্রার্থনা।

আমাদের দেশের সব মহাপুরুষেরাই এই প্রার্থনার কথা বলেছেন।

বাইবেলেও লেখা আছে: Know Thy Self. Be Thy Self and Know Thy God. Seek therefore the source of power in God—deep down in thine own heart.

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিঠি শুধু চিঠি নয়

[আজকালকার মানুষ দেশবন্ধুকে জানেন না ; যাঁরা জানতেন তাঁরাও আজ ভুলতে বসেছেন। কিন্তু একদিন ছিল যেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু সারা ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ঐতিহাসিক মামলার সময় থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যে স্বার্থত্যাগ, যে মহত্ত্ব, যে স্বদেশপ্রেম আর জীবনে যে রাজ-চক্রবর্তীর গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড হয় তখন দেশবরেণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রখানি প্রকাশ করে আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য বোধ করছি।]

"প্রিয় ভগ্নি,

আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেইদিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ মহত্ত্ব, স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীন দরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আমি আন্তরিক অনুভব করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত দাসের এই অগ্নি-পরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত দাসের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেননা লোক সমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধহয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আপনি আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনে প্রাণে আশা করি যে কৃষ্ণমেঘ আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

১৪।১২।২১

ভবদীয়—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্তরীক্ষে

গান্ধী জয়ন্তী

এই কি আমার দেশ।

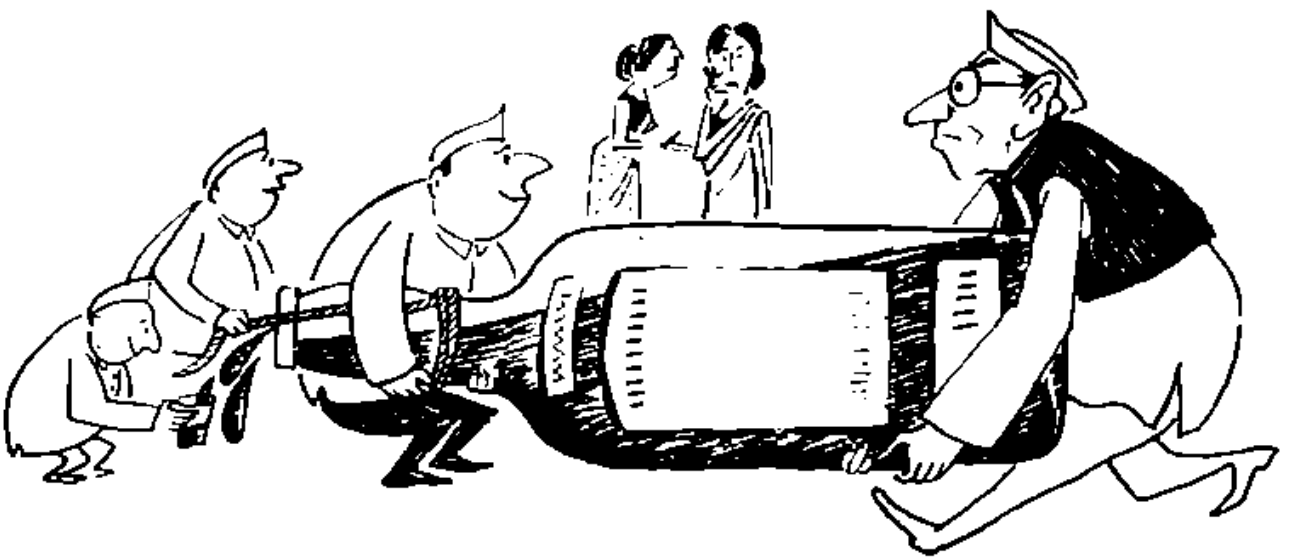

বোতল নিয়ে টানাটানি !

বিনা টিকিটে
এসনকারী-
দেশের শত্রু

প্রস্তুতির পথে...

বনমালকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : নরসিঙ্ক মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজ্‌মেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। নরসিঙ্ক মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর নরসিঙ্কের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কাছে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। নরসিঙ্কবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের

সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘুমিয়া মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপট্যেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙ্গিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানছে, বনছায়াও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের

অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃস্বতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছয়র জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল।

সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুধীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলাই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুধীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুধীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুধীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুধীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিজেরা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে খেয়ে সেদিন যাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুধীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুধীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভূল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুধীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুণ্ঠিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুধীর তার নিজের গর্ভ পালন করল না। বিরোধ ঘুঘায়িত হল।]

১ কুড়ি ১

অফিসেই অভিরামকে ডেকে বলে দিল হিমাংশু, সন্ধের পর এক ফাঁকে বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে যেন দেখা করে।

ব্যস, নিরক্ষরে এই একটু নির্দেশই যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে অভিরাম বনছায়াকে বলতে গেল। কতটুকু বলতে হবে তা আর তাকে শেখাতে হবে না।

'মা, আমি বাপ করে একটু ঘুরে আসছি।'

বুকের নিচে বালিশ দিয়ে খাটে উপুড় হয়ে লিখছিল বনছায়া, মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে?'

'ক্লেশের থেকে লোক এসেছে, একটু দেখা করা দরকার। আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসব।'

'বেশি দেরি কোরো না।' লেখায় আবার মন দিল বনছায়া।

যেতে-যেতে অভিরাম বললে, 'দরজাটা খোলা রইল মা।'

'বাইরে থেকে টেনে দিয়ে যাও।'

তা তো যাবেই, তবু তো ঘরজাটা অরক্ষিতই হইল। বাইরে থেকে আস্তে একটু ঠেলেই লোক অনায়াসে ঢুকতে পারবে। অভিরামেরও যেন ইচ্ছে না তাড়াতাড়ি উঠে ঘরজায় খিল লাগিয়ে দেন। দিনকাল ভালো নয়।

উঠি-উঠি করেও উঠল না বনছায়া। খিল লাগালেই তো কতক্ষণ পরে আওয়াজ শুনে ফের উঠে গিয়ে খুলে দিতে হবে। আর খুলে দেওয়ার মুহূর্তে বেশ একটু মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা সুধীরের মুখে আবার সেই মদের গন্ধটা টের পাবে নিশ্চয়। মুখ আর যত মুখের কাছাকাছি না হয়—নিশ্বাস নিশ্বাসের।

যখন খুশি ফিরুক, ঢুকুক ঘরজা ঠেলে। ঢুকে যদি পাশের ঘরে, বসবার ঘরে চলে যায়, বনছায়া একটু রেহাই পায়, আরো খানিকক্ষণ লিখতে পারে মন মাতিয়ে। যদি এ ঘরে ঢুকে অবসাদে ভেঙে পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে চায় তা হলে বনছায়াই নিজে পাশের ঘরে আশ্রয় নেবে। তারপর অভিরাম ফিরলে যখন ইচ্ছে উঠে যাবে, যদি ইচ্ছে না-ই হয় যাবে না, ঘুমে তলিয়ে যাবে।

সেই সুযোগে আরো কটা পৃষ্ঠা লিখতে পারবে বনছায়া।

ঘরজা খোলা পেয়ে একমাত্র সুধীরই ঢুকবে এমন কী কথা আছে? অতর্কিতে কোনো অভাবনীয় তো চলে আসতে পারে। অভাবনীয়ের জন্যে আবার নিয়ম কী, নিয়ন্ত্রণ কোথায়?

কিন্তু সে আসবে না। সে বনছায়ার মতই দেখার মনশ্চক্ষে।

'এই যে এসেছ।' অভিরামকে ঘরে ঢুকতে দেখে হিমাংশু প্রায় অভ্যর্থনা করে উঠল: 'তোমার খবর কী?'

'ভালো।'

'বাবুদের খবর কী?'

বাবুদের বলতে কাদের নির্দিষ্ট করছে বুঝতে অভিরামের দেরি হল না। বললে, 'ভালো নয়।'

'কেন কী হয়েছে?'

'বাবু আজকাল প্রায়ই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছে।'

'মদ খেয়ে!' যেন আকাশ থেকে পড়ল হিমাংশু: 'তার আবার এই দুর্মতি হল কবে?'

'আর বলেন কেন?' নিলিপ্ত-নির্মল মুখ করল অভিরাম: 'কার পাল্লায় গিয়ে যে পড়ল!'

'কই অফিসে তো কিছু বোঝা যায় না—'

'না, না, সারা দিনমান বাবু ভালো, ফিটফাট। সন্ধে হয়ে এলেই—'

'হুঁ।' যেন বিরক্ত হয়েছে এমনি একটা শব্দ করল হিমাংশু। জিজ্ঞেস করল, 'এ নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হয়?'

'হয় বৈকি, খুব হয়।'

'কী হয়?'

'ঝগড়া—কথা-কাটাকাটি—' বলতে গিয়েই কী ভেবে থেমে পড়ল অভিরাম। মুখ উঠতে পারল না অফিসের খোদ কর্তার কাছে কতটুকু কী বলা সঙ্গত হবে, তাই ওটিয়ে গিয়ে বললে, 'ওদের ঘরজা তো বন্ধ থাকে, তাই সব কথা শুনি না। যেটুকু কানে আসে—'

'না, না, শুনবে বৈকি।' একটু অন্য দিকে মুখ করল হিমাংশু: 'অন্যমহিলা আমাদের আমাশোলা

ঘরের মেয়ে, আমারই বন্ধুর বোন। তা'র সঙ্গে আমারই অফিসের এক কর্মচারী খারাপ ব্যবহার করবে এটা ভালো নয়। তা—ঝগড়া শুধু মুখে-মুখে, না, হাতাহাতিও হয় মাঝে-মাঝে?' দু'চোখ উজ্জ্বল করে তাকাল হিমাংশু।

'না, অত দূর গড়ায়নি।'

'যাক গে, গড়াবে। মদ যখন ঢুকেছে তখন কিছুই বাকি রাখবে না।' হিমাংশু আরেক ছিলে উস্কি মারল: 'ওদের সংসারের অবস্থা কেমন? সচ্ছল?'

'আগে ছিল, এখন মদ অনেক শুষে নিচ্ছে।'

'কী রকম?'

'আগে-আগে দুজনের টাকা সবটাই মার কাছে জমা হত, মা খরচ করতেন। কিন্তু ইদানি বাবু মদ খাচ্ছেন বলে মা তাঁর হাত-খরচের টাকা কমাতে চাচ্ছেন—তাই নিয়ে দুজনের বচসা হচ্ছে। এবার তো দেখলাম বাবু তাঁর মাইনের পুরো টাকাটা মাকে দিলেন না, মোটা টাকা নিজের হাতে রেখে বাকিটা ছাড়লেন—'

'তুমি দেখলে?' হিমাংশুকে একটু বুঝি বিরক্ত শোনাল।

'দেখলাম মানে ওদের ঝগড়া থেকে আন্দাজ করলাম। ওদের ঝগড়া তো সব সময়ে ওদের শোবার ঘরেই হয় না, মাঝে মাঝে আমার সামনে খাবার টেবিলেও এসে পড়ে। শুনে যা বুঝলাম তাকেই দেখলাম বলছি।'

মুচকে হাসল হিমাংশু। বললে, 'তা নাও হতে পারে। যাক গে, পুরো টাকা না পেয়ে ভদ্রমহিলা কী বললেন?'

'বললেন, হাত-খরচের টাকা মানে তো মদ খাবার টাকা, ও তুমি পাবে না।'

'বাবু কী বললেন?'

'মার কথা শুনলেন না। বললেন, আমার টাকা আমি যেমন খুশি খরচ করব।'

'মা কী বললেন?' একটু বুঝি ক্রুর চোখে তাকাল হিমাংশু।

'মা বললেন, সে কথা তো আমিও বলতে পারি। তা হলে তো সংসার করা চলে না।'

'বললেন?' হিমাংশু উৎসাহিত বোধ করল: 'তারপর? তারপর কী হল?'

অভিরাম চোঁক গিলল। শুকনো মুখে বললে, 'কই তেমন কোনো ঝগড়া পাকিয়ে উঠল না! মা গম্ভীর হয়ে বসলেন, টাকার আর আমার-তোমার নেই, টাকা দুজনের, টাকা একজনালি। বাবু চটে উঠে বললেন, না, সমস্ত টাকা আমার—হ্যাঁ, তোমার টাকাটাও আমার। তোমাকে রোজগার করার সুবিধে করে দিচ্ছি বলেই না এত চোট! তাই সব টাকাই আমার হাতে থাকবে, যা ছাড়া বুঝি তোমাকে সংসার-খরচ বাবদ দেব আর যা ভালো বুঝি তা আমার হাত-খরচ বলে সরিয়ে রাখব।'

মনে মনে সুবীরের প্রতি সপ্রশংস হল হিমাংশু কিন্তু গোড়ায় সে সরবে তার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে ফেলেছে বলে কোনো অভিনন্দনের বাক্য পর্যাপ্ত উচ্চারণ করতে পারল না। বলতে হল: 'ভদ্রলোক খুব সৌখিন তো!'

'এ সবই মদের ক্রিয়া!' অভিরাম বিজ্ঞতমের মত মুখ করল।

'তা কেন? মদ তো আমরাও খাই।'

'ছি ছি ছি, আপনারা তো ড্রিঙ্ক করেন। এ একেবারে খাওয়া। খাওয়ার চেয়েও বেশি—এ সেবা—

'তা গোঁয়ার গোবিন্দ যখন, তখন জোর করে ঘরে স্ত্রীকে না খাওয়ায়। স্ত্রীকে দুষী করে। স্ত্রীকে দুষী করতে পারলেই নিজে খালাস, স্ত্রী আর তখন কিছু বলতে-কইতে পারবে না।'

'তা হলে তো গঙ্গা-যমুনা! কিন্তু,' অভিরাম মুখ কঠিন ও নিষ্ঠুর করে তুলল: 'যা আমার জীবন টাইট, তাকে টলাতে পারে এমন কার সাধ্য নেই।'

মনে-মনে অপ্রসন্ন হল হিমাংশু, কিন্তু বিদ্রূপ করার মত কথা খুঁজে পেলেও বলবার মত মুখ পেল না, যেহেতু পোড়াগুড়ি সে ভদ্রমহিলার পক্ষে: তাই হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তারপর টাকা নিয়ে ঝগড়ার নিষ্পত্তি কী করে হল? বাবু নিজের হাতেই রাখলেন না স্ত্রীর কাছ থেকে হাত-খরচ চেয়ে নিলেন?'

'তা জানি না। তবে যে ভাবেই পান তাঁর টাকা ফুরিয়ে গেল। শেষকালে আমার কাছে হাত পাতলেন।'

'তোমার কাছে?' হিমাংশু গর্জে উঠল: 'কে, তোমার বাবু? সুধীরবাবু?'

'হ্যাঁ, তিনি ছাড়া আর কে। আমাকে চুপিচুপি বললেন, অভিরাম, আমাকে কুড়িটা টাকা ধার দিতে পারো? আমি আগামী মাসে মাইনে পেয়েই তোমাকে ফিরে দেব।'

'কুড়ি টাকা!' অবজ্ঞায় মুখভঙ্গি করল হিমাংশু।

'তার মানেই তো ঘরের জন্যে! যা হাতে ছিল তা উড়িয়ে দিয়েছেন।'

'ঘর থেকে কত উড়োনো যায়? ঘরের সঙ্গের জিনিসটা যখন ছুটবে তখনই তো সত্যিকার সর্বনাশ। সে তো আর ঘরের স্ত্রী নয় যে বিনা পয়সায় খাটনি দেবে।'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসল অভিরাম: 'তেমন এখনো জোটেনি মনে হচ্ছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'বাবু তো সন্ধেরাত্রেই বাড়ি ফেরেন। তেমন হলে ফিরতে রাত বেশি হত। কোনো কোনো রাত হয়তো ফিরতেই না। তা ছাড়া ঝগড়া-বচসা যা চলে তাতে মন ধারার কথাটাই শুধু ওঠে, আর কোনো পাঁচালি গাওয়া হয় না।'

'তারপরে বাবুকে টাকাটা ধার দাওনি তো?' হিমাংশু আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'না, না, আমি কোত্থেকে দেব?'

'হ্যাঁ, ওসব প্রশ্রয় দেওয়া ভালো নয়। মিছিমিছি অন্যের অশান্তি বাড়ানো।'

'তা আমার কাছ থেকে না পেয়ে বাবু খেয়েছেন নাকি? কোত্থেকে কী জোটপাট করে ঠিক টেনে এনেছেন।'

হঠাৎ হিমাংশুর গলার সুরটা বদলে গেল: 'তাহলে দেখা যাচ্ছে বিয়ে করে ভদ্রমহিলা বিশেষ সুখী হননি।'

'তাই তো মনে হয়। অমন স্বামী হলে—'বাইরে তাকিয়ে কথাটা শূন্যে ছেড়ে দিল অভিরাম।

'অফিস থেকে এসে দুজনে একত্র হয়ে বেড়াতে বেরোয় না?'

'কই ইদানি দেখিনা তো। মা তাঁর মোটা খাতা নিয়ে লিখতে বসেন আর বাবু সিগারেট মুখে দিয়ে নিজের ঘরে বেরিয়ে যান।'

'কী লেখেন ভদ্রমহিলা? ধোবার হিসেব না বাজার-খরচ?'

'জানেন কী এক বই লিখছেন নাকি। মা একজন লেখিকা। অফিসের বাবুরা বলাবলি করে।

আসতে টাকছে তার লেখা বেরোয়।' অভিরাম আবার বিজ্ঞতম মুখ করল : 'আমার চোখে এখনো পড়েনি একটাও। আমি ঠিক একদিন চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখব।'

'তহমহিলার খুব অহঙ্কার!' হিমাংশুর গলা আবার কঠোরের চেহারা নিল।

অভিরাম কথাটা ঠিক ধরতে পারল না।

'অহঙ্কার বলেই তো স্বামীকে অমন উপেক্ষা করে। স্বামীর কথা শোনে না, স্বামীকে সম্মান দেয় না। লেখিকা না আরো কিছু! তোমার বাবু যে সিগারেট মুখে দিয়ে বাইরে যান বলছে, সেটা ধরানো থাকে না?'

অভিরামের মূঢ়তা এখনো কাটেনি, 'হ্যাঁ, ধরিয়েই তো যান দেখি।'

'সেই আগুনটা স্ত্রীর ঐ মাতার মুখে ধরিয়ে দিতে পারেন না? তাহলেই তো সমস্ত জঞ্জাল সাফ হয়ে যায়। লেখা নিয়ে খুব দেমাক কিন্তু বই তো একখানাও ছাপা হতে দেখলাম না। যাক গে, ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কেন? আচ্ছা,' আবার হঠাৎ সুর পালটে অন্তরঙ্গ হল হিমাংশু : 'তোমার মাইনেটা ঠিকমত পাও তো?'

'আমার মাইনে তো আফিস থেকে পাই।'

'সে তো অফিসের কাজের জন্যে। ওদের ওখানে কাজ করে হাত বলে কিছু দেয় না? আমি তো সুধীরবাবুকে ত্রিশ টাকা দিতে বলেছিলাম—'

'পঁচিশ টাকা দেন।' অভিরাম মুখের চেহারা ম্লান করতে চাইল।

'তাহলে এই কুড়িটা টাকা তুমি রাখো।' ব্যাগ খুলে দুটো দশটাকার নোট অভিরামের দিকে বাড়িয়ে দিল হিমাংশু।

অভিরাম ঘাবড়ে গেল। মাথা চুলকোতে লাগল।

'তোমার কাছে রাখো। না হয় কখনো কোনো তৃষ্ণার্তকে ধার দিও।' উদার চোখে হাসল হিমাংশু : 'তৃষ্ণার সময় পানীয় না পেলে কী কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে? নাও, ধরো, মন্দ কী, তোমার নাহয় নতুন একটা মহাজনী কারবারের সূচনা হল।'

সাহেবের কথার অবাধ্য হয় কী করে, টাকাটা নিল অভিরাম। আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, এটুকু বুঝল সাহেব আবার হঠাৎ সুধীরবাবুর দিকে হেলেছেন! তার মা যাচ্ছেতাই লেখিকা, স্বামীর অবাধ্য, তার উপর অহঙ্কারী। সে অহঙ্কারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

'আর শোনো' সিঁড়িতে কার ওপরে ওঠার শব্দ পেয়ে উঠে পড়ল হিমাংশু : 'ওদের ঝগড়ার মধ্যে তুমি থেকো না।'

'না, আমার কী দরকার!' অভিরাম সায় দিল।

'হ্যাঁ, তুমি দূরে থেকো। ওরা যত খুশি মেরোধেরি করুক, মারামারি করুক, তুমি যেন মাঝখানে গিয়ে পোড়ো না। বলা যায় না, হয়তো তোমাকে ওদের মামলার সাক্ষী করে বসবে।'

'কী ব্যাপার?' ততক্ষণে সিঁড়ির শব্দ শরীরী হয়ে উঠেছে। শরীর শব্দটাও বুঝি ভুল—বলা উচিত উগ্র আধুনিকতার একটি মেয়েলি রূপ। খাপ যেটুকু আছে তাও পাপচক্ষুকে উৎসুক করবে বলে। শীতের সন্ধ্যায় বাইরে কোথাও বেরা হয়ে গেলে ঘরে ফিরে যাদের ন্যাপারটা খুলে দিয়ে থাকি! তবে অসুখ হলেও

ওদের শরীর খারাপ হয়না, শুধু ক্ষুধের বাধ্য বলে। রোগের চিকিৎসাও সহজ। শুধু জলে-পাথরে ঘষে নিলেই ক্ষুধ আবার তেমনি ধারালো।

নিখাসটা পুরো ফেলবার আগেই লাবণি বললে, 'বেশ ইন্টারেস্টিং তো!'

'হ্যাঁ, প্রায় তোমারই প্রতিদ্বন্দ্ব। সুন্দর কিন্তু-স্টোরি।'

'সত্যি? জলজলে চোখে লাবণি অভিরামের দিকে তাকাল: 'ওর কী রোল?'

'ওর রোল হচ্ছে ভিতর থেকে দরজাটা খুলে দেওয়া।'

লাবণি কী বুঝল কে জানে হিমাংশুর হাসির সঙ্গে নিজের হাসিও যুক্ত করেছিল।

পরে আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে হিমাংশু অভিরামকে লক্ষ্য করল: 'তুমি তো রাত্রেও বাড়িতেই থাকো।'

'তাই তো বলেছিলেন।' অভিরাম মনে করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ওখানে অসুবিধে হয়না?'

'অসুবিধে কোথায়? বরং আমার সুবিধে, আমার ঘরভাড়া বেঁচে যায়।'

'কিন্তু ওদের ঝগড়াঝাটির মধ্যে তোমার ঘুম আসে?'

'আমার বউয়ের মধ্যেও ঘুম আসে।' অভিরাম হাসবে না ভেবেও হাসল।

'আমার মনে হয় রাত্রে তোমার না থাকাই ভালো।' হিমাংশু যেন একটু রুঢ় হল: 'রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে তোমার আগের বাসায় ফিরে যাওয়াটাই ঠিক হবে।'

'তাহলে মা একলা থাকলে মাকে দেখবে কে?'

'দেখবে কে মানে?' হঠাৎ বিরক্ত হল হিমাংশু: 'কেন সুধীরবাবু নেই?'

'যদি এমন হয় বাবু একরাত ফিরলেন না কিম্বা কোথাও আটকা পড়লেন, তখন মার একজন লোকের দরকার হবে তো। যাতে বাজে লোক ভিতরে ঢুকতে না পারে তার জন্যে বাড়ির দরজা বন্ধও তো রাখতে হবে।'

'তার মানে তুমি তোমার নিজের বাবুকেই ঢুকতে দেবেনা বাকি?'

'তাঁর কথা আলাদা।'

তেতালার দরজা ঠেলে কেউ ভিতরে ঢুকল বুঝে বনছায়া উচ্চকিত হয়ে উঠল। ভাবল একবার 'কে?' বলে ওঠে। না, অভাবনীয় কেউ নয়, ময় বা ভয়ানক কেউ—যে অবধারিত সেই এসেছে।

মুখের সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সুধীর বিছানার ওপর পড়ল।

বনছায়া তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বৃত করে নেবে পড়ল খাট থেকে।

'এই জঞ্জালগুলো এখান থেকে সরিয়ে নাও।'

বনছায়ার লেখার সরঞ্জামকে সুধীর জঞ্জাল বলছে!

বনছায়া কোনো উত্তর দিলনা, লেখাপত্র নিয়ে পাশের বসবার ঘরের দিকে চলল।

'আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।' হুকুম করল সুধীর।

'ইচ্ছে হলে নিজে নেবাও।' বনছায়া নিজের ঘরে চলে গেল পাশের ঘরে।

বিছানায় উপর এক ঝটকায় উঠে বসল সুধীর। বনছায়াকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললে, 'জানো ইচ্ছে করলে আমি সমস্ত আলো নিবিয়ে দিতে পারি?'

'পারোনা।' ও ঘর থেকে অবিচলিত স্পষ্ট কণ্ঠে বনছায়া বললে, 'আমার ঘরের আলো কিছুতেই নেবাতে পারোনা।' বলে টেবিলে সব গাছিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে লেখায় মন দিল। বোঝাতে চাইল এই সাহিত্যই তার ঘর, তার ঘরের আলো—এ নেববার নয়।

সুধীর আবার শুয়ে পড়ল, যেমন-কে-তেমন জ্বলতে লাগল আলোটা!

কতক্ষণ পরে আর্তকণ্ঠে ডাক দিল: 'শোনো, শুনে যাও।'

বনছায়া বুঝতে পারল এ সুধীর ডাকছে না, এ ঘর ডাকছে। তাই বনছায়া এ ডাক কানেও তুলল না। অনড় হয়ে রইল।

'শোনো, কথা আছে।'

বনছায়া জানে, কোন কথা। বিছানার কাছে গেলেই পলকে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। হয়ছাড়া তুফান হয়ে যাবে। এই ঝড়ই তো একদিন তার কত স্পৃহার বস্তু ছিল—সে তো প্রেমিক সুধীর, কবি সুধীর—এই চাকুরে মাতাল সুধীর নয়। সে মাতাল সুধীরের কাছে আর যাবে না। সে আগ্রহকঠিন হবে। তাকে আর প্রশ্রয় দেবেনা। শাসনে সচেতন করে তুলবে।

'বলছি জরুরি কথা।'

'জরুরি কথা থাকে তো এখানে এসে বলো।'

অগত্যা সুধীর উঠে এসে বনছায়ার মুখোমুখি বসল। কোনো ভূমিকা না করেই বললে, 'তুমি কি চাওনা আমি চাকরিতে উন্নতি করি?'

'চাকরিতে উন্নতি! উন্নতির এই চেহারা!' শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের বিষও বনছায়ার ভাষায় অলক্ষ্যে এসে গেল: 'তবু যদি চাকরিটা নিজের মুরোদে জোগাড় করতে।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমিই চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিলাম।'

'সে তো গোড়ার কথা। তারপর যা উন্নতি করেছি তা নিজের গুণে।'

'নিজের গুণে না মদের গুণে!' জ্বালাটাকে কণ্ঠস্বর থেকে কিছুতেই বনছায়া মুছে ফেলতে পারছে না।

'নিশ্চয়ই, মদের গুণও আছে বৈকি। মদ খেয়ে হজম করতে পারাটাও গুণের কথা।'

'তবু যদি সব সময়ে তা নিজের পয়সায় হয়!'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকল সুধীর। বললে, 'সেই টাকা-পয়সার একটা হীটোয়ারা করব বলেই পাকাপাকি কথা বলতে এসেছি। কিন্তু মদ সম্বন্ধে তোমার এই ঘৃণা কেন? মদ তো তুমিও খেয়েছ।'

'আমিও খেয়েছি!' বনছায়া ধিক্কার দিয়ে উঠল: 'একদিন খেয়েছি বলে নিত্যি খেতে হবে?'

'আমিও রোজ খাইনা। মাঝে মাঝে খাই। খেতে ভালো লাগে বলে এক-আধদিন বেশি খেয়ে ফেলি। কিন্তু জানো,' সুধীর উষ্ণ হয়ে উঠতে চাইল: 'আমাকে মদে খেলেই আমার বস সন্তুষ্ট। জানো এটা ইউরোপীয়ান স্টাইলের কার্ব, তাই ও-সবের অন্যথা যায়। আমি তো জানছি শিগগিরই

আমার একশো টাকার ইনক্রিমেন্ট হবে। যদি এ স্টাইলে থাকলে আমার উন্নতি হয় তুমি আপত্তি করবে কেন?'

'উন্নতি!' বনছায়া মাথা উঁচু করে তাকাল: 'আমি কি একটা শুধু চাকুরেকে বিয়ে করেছি নাকি? তোমার লেখা কই, কবিতা কই?'

'ধুর-ধুর! কবিতা লিখে কী হবে? কবিতা বেচে কত পাওয়া যায় বাংলা দেশে? শুধু একটা কবিকেই বা কোন হতভাগী বিয়ে করে?'

'তবু ঐ কবিতাই তোমার আসল স্বরূপ এ তুমি ভুলে যেও না, চেষ্টা না ভুলতে।' এবার বনছায়ার কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল; 'তুমি যা করছ কর, যা পাচ্ছ খাও। শুধু তুমি তোমার স্বরূপে থাকো—সুখ না হও, স্বস্থ থাকো—'

'বাজে কথা কোরো না।' সুধীর বললে, 'আমার পক্ষে এখন কবিতা লেখা ডিসকোয়ালিফিকেশন। আমি আর এখন হাড-মট নই।'

'আমি তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব, তুমি আবার কবি হবে, আমার রাজা হবে।'

'রাজা হবে, না, দাস হবে! তার মানে তোমার উপরে বসে খাব! বাঃ, কী সুমহান ব্যবস্থা! বলতে লজ্জা করল না?'

চুপ করে গেল বনছায়া।

সুধীর বললে 'আমি ঠিক করেছি সমস্ত সংসারের খরচ অভিরামের কাছে থাকবে। আমরা দুজনে তার পেছি পেস্ট হব। মোট খরচ সমান দু ভাগে সে আমাদের থেকে আদায় করে নেবে—তারপর বাকি টাকা যার-যার তার-তার—'

'তার মানে তোমার টাকায় আমার হাত নেই, আমার টাকায় তোমার হাত নেই?'

'প্রায় সেই রকম। তোমার বাড়তি টাকা চাই কি তুমি জমাও, আমার বাড়তি টাকা আমি উড়িয়ে দিই।'

'আর ঘর?'

'চাও তো, ঘরও আলাদা-আলাদা। তুমি তোমার ঘরে যতক্ষণ খুশি আলো জেলে লেখ, আমি আমার ঘর যতক্ষণ খুশি অন্ধকার করে রেখে ঘুম মারি।' বলে সুধীর ফের বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়ল। কতগুলো অসংলগ্ন কবিতার লাইন আওড়াল। বললে, 'জল আসবে, ঝর ঝর করে কবিতার শিউলি ঝরিয়ে অঙ্গন ভরে দেব, আর তুমি, ঘণ্টাও ঘণ্টাও, কলম দিয়ে কাগজ চষো, কোনোদিন কোনো ফসল ফলাতে পারবে না।'

বনছায়া ভাবল তার নিজের পয়সায় ঘরের জন্যে ছোট একটা খাট কিনে নেবে।

কিন্তু অনুভব করল, উপলব্ধি করল, উপলব্ধি করে ভয় পেল, তার আলাদা হয়ে থাকা চলবে না। সে যা হতে চলেছে। তার পেটে সুধীরের সন্তান।

(ক্রমশঃ)

কোডপত্র পত্র-ভারতী—অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

আমাদের সমস্যা

বেলা দে

প্রত্যহ যদি খবরের কাগজের আইন আদালতের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে অথবা দুষ্ট দুর্বৃত্তের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে কত মেয়ে পাপের পথে পা দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এর প্রতিকারই বা কি? মনে হয় সমাজের সুস্থ বিবেক আজও এদের সার্থক ব্যবস্থা করতে পারেন নি তাই এ পথে একবার যাঁরা পা যেন বা দিয়েছেন, তাঁরা আর ফিরে আসার সুযোগ পান না। সারা পৃথিবীর ঘৃণা মাথায় নিয়ে ব্যাধি ও দুর্ঘটনায় মধ্যেই এঁরা জীবন শেষ করে যেন কত অমূল্য প্রাণই এইভাবে প্রতিদিন অবহেলায় ঝরে যাচ্ছে কে তার হিসেব রাখছে?

যে সমাজ, রক্ষা করার শক্তি রাখে না বা সহানুভূতির হস্ত এগিয়ে আসে না উপরন্তু মেয়েদের দণ্ড দেয় সে সমাজের মেয়েরা বেশী করে দুর্নীতির আবর্তে পড়িয়ে পড়েন। যদিও এ থেকে উদ্ধারের রাস্তা পেলে অনেকেই আবার সমাজের পক্ষে উপযোগী হতে পারেন।

সমাজের নানা সমস্যার মধ্যে পণপ্রথা একটি জটিল সমস্যা। যদিও আইন করে এ প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে কিন্তু তা প্রমাণ সাপেক্ষ। যে কন্যার পিতা অর্থশালী তিনি পণ দেন কিন্তু তার রূপ একটু বদলে যেন—মনে করেন আইনের চোখে তিনি দোষী নন। অথচ একটী মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এ ব্যবস্থা অসহনীয়—আইনজীবি শ্রীমতীগৌরী চক্রবর্তী পণপ্রথার সেই আধুনিক রূপের চিত্রটী তুলে ধরেছেন—

পণ প্রথার অধুনিক রূপ

গৌরী চক্রবর্তী (বন্দ্যোপাধ্যায়)
(এ্যাডভোকেট)

আমাদের সমাজে বিবাহের উৎসব একটী মাঙ্গলিক উৎসব কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে শিক্ষার প্রসার হওয়া সত্ত্বেও পণপ্রথার মত একটী ঘৃণ্যপ্রথা আমাদের এই আনন্দ উৎসবকে তিক্ত ও কলুষিত করছে। বহু পরিবার এই শোষণ-চক্রে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তাই আজ পণপ্রথা সম্বন্ধে নতুন যে আইন হয়েছে তার বিষয়ে কিছু জানাতে চাই।

প্রাচীন যুগে পণপ্রথার রূপটী এত ভয়াবহ ছিল না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশিত প্রাচীন হিন্দু-

শাস্ত্র আলোচনা করে দেখা গেছে যে যদিও তখন পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলনা কিন্তু বিবাহের সময় পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ যৌতুক হিসাবে বস্ত্র, অলঙ্কার, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সহ কন্যা দান করতেন। এই সম্পত্তি কন্যার নিজস্ব সম্পত্তি। এই সম্পত্তিকে স্ত্রীধন বলা হোত। পরবর্তী কালে এই দানই পণ হিসাবে প্রচলিত হয় এবং পাত্রপক্ষ এই দানকে তাদের দাবী বলে মনে করেন।

বর্তমান সমাজে এই প্রথা এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ এর চাপে কঠোর ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। কত দরিদ্র পিতা কন্যার বিবাহে নিঃস্ব হয়েছেন তার হিসাব নেই। এই প্রথাকে সমাজ থেকে দূর করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'পণ নিবারণ আইন' পাশ করেছেন। ১লা জুলাই ১৯৬১ থেকে এই আইন কার্যকরী করা হয়। 'হিন্দু কোড বিল' পাশ হবার পর হিন্দুদের সামাজিক আইনকানুন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে পণ নিবারণ আইন সকল শ্রেণীর হিন্দুদের ওপর প্রযোজ্য হবে। মুসলমান, ক্রীশ্চান বা অন্য সম্প্রদায়-এর ওপর এই আইন প্রযোজ্য হবেনা।

এই আইনে বলা হয়েছে যে স্থাবর অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি পাত্র বা পাত্রীর পিতা মাতা বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে দান করলে তাকেই পণ বলে ধরে নেওয়া হবে। যৌতুক বা পণ হিসাবে বস্ত্র অলঙ্কার নগদ অর্থ ইত্যাদি বাবদ ২০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই ২০০০ টাকার অধিক পণ দান অথবা গ্রহণ করা আইনত অপরাধ। যে ব্যক্তি এই পণ দেবেন এবং যে ব্যক্তি এই পণ গ্রহণ করবেন দুজনেই আইনের চোখে সমান দোষে দোষী। পণ দান বা গ্রহণে—সাহায্যকারী ব্যক্তিও অপরাধী। এই অপরাধের জন্য অপরাধীকে ছয়মাস কারা দণ্ড এবং ৫০০০৲ টাকা জরিমানা অথবা দুইপ্রকার দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল এই অপরাধ সংঘটিত হবার এক বছর সময়ের মধ্যে বিচার প্রার্থনা না করলে আদালতে এর প্রতিবিধান করা যাবে না।

পণ দান বা গ্রহণ সম্বন্ধে কোন চুক্তি আইনে স্বীকৃত হবে না। এই চুক্তি ভূয়া চুক্তি বলে গণ্য হবে।

বিবাহের কোন যৌতুক পাত্রী ছাড়া অপর কেহ গ্রহণ করলে বিবাহের এক বছরের মধ্যে ঐ যৌতুক পাত্রীকে অর্পণ করতে হবে।

নারীকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বর্তমান যুগের আইনগুলির গুরুত্ব অনেক; তবুও সমাজের একটি বৃহৎ অংশ নতুন নতুন আইন সম্বন্ধে বেশ উদাসীন। সমাজের মঙ্গলের জন্যই পুরোণ আইন বদল করে নতুন আইন হচ্ছে। আইন প্রণয়নের অধিকর্তা যারা দেশের মঙ্গলের জন্য নতুন আইন রচনা করেন—কিন্তু যাদের জন্য আইন তাঁরা যদি উদাসীন থাকেন তাহলে আইন থাকবে পুঁথির পাতায় নিষ্ক্রিয়, এর দ্বারা সমাজের কোন মঙ্গল হবে না। পণ নিবারণ আইনটাও ঠিক এমনি একটি আইন যার সম্বন্ধে সমাজের অধিকাংশ লোকই উদাসীন। পণ গ্রহণ আইনতঃ অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্য আইনে কঠোর শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঘরে এই আইন লঙ্ঘনের চেষ্টা হচ্ছে। পিতার সম্পত্তিতে যখন কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তখন এই ঘৃণ্য প্রথা বিলোপে মেয়েদের সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

———

কু-সংস্কার না সু-অনুশাসন ?

তৃপ্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই শুনতাম আমাদের হিন্দুধর্ম কেবল কুসংস্কারে ভরা। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম ব্রহ্মধর্ম, ইসলামধর্ম, খৃষ্টধর্ম কত উদার কত সংস্কারমুক্ত।

সত্যিকথা বলতে কি দিনরাত এই করতে নেই, ঐ করলে এই হয়, ইত্যাদি শুনে শুনে মনটা ছোটবেলায় বিরক্তিতে ভরে উঠতো। ভাবতাম, বড় হলে এসবের কিছুই মানবো না। যার ব্যাখ্যা নেই, অকারণে তাকে গুরুত্ব দেব কেন ?

এইসব কথা ভাবতে বসলেই প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে, তার নাম ভক্তি। আমাদের বাড়ীর পুরোনো ঝি। আমরা ডাকতাম ভক্তদি। রাত্রে আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসলেই হা হা করে ছুটে আসতো ভক্তদি—রাত্রে আয়না দেখোনি যেজদি কলঙ্ক পড়বে তোমার নামে। একথা শুনে রাগ করে প্রত্যেক দিনই চুল বাঁধতাম রাত্রিবেলাতেই, দেখি কি করে কলঙ্ক পড়ে আমার নামে ?

এখন বয়স বেড়েছে। মনও বেড়েছে—বয়সের সংযোগে সাংসারিক অভিজ্ঞতায়। আজ বুঝেছি, কেন রাত্রে আয়না দেখা বারণ করেছিলেন আজ থেকে কত যুগ আগের কোন মনীষি; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অগভীর চিন্তাশক্তিতে যাকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারি না।

শতকাল আগে, যখন স্কুল কলেজ ছিল না, কথায় কথায় আইন করে কোন কাজ বন্ধ করার রেওয়াজ ছিলনা, স্বাধীনতার কথা তো মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তখন কোন কোন মনীষির মাথায় আসতো এক একটা সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার কথা যাতে সংসারের অধিকাংশের কল্যাণ হয় এ কথা চিন্তাকরে তারা অনুশাসন তৈরী করতেন। সেই সঙ্গে ধর্ম-অধর্ম, ভগবান-শয়তান, স্বর্গ-নরক এ কথাগুলোও দিতে বাধ্য হ'তেন, সাধারণে যাতে এসব অনুশাসনে অবহেলা না করে, তার জন্য।

তখন ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো ছিলনা। গ্রাম প্রধান বাংলার ভারতের অধিকাংশ ঘরে আলো জ্বলে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। বেশীর ভাগ বাড়ীতেই সে লণ্ঠনেরও প্রাচুর্য্য নেই। একটি কি দুটি লণ্ঠনই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাড়ীর সম্বল। সেই অপ্রচুর লণ্ঠনের একটি যদি চুল বাঁধার প্রয়োজনে চলে যায় তাহ'লে বাড়ীর আর সকলের সব কাজের অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আর কলঙ্কের ভয় করে না এমন নারী অন্ততঃ ভারতে দেখা যাবে না বোধহয়। অতএব যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে সংসারের একটি লণ্ঠনও বাঁচিয়ে রাখা যায়, ক্ষতি কি !

চুল বাঁধার পর উঠে-আসা চুলগুলো উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। পদে পদে বারের চোখ রাঙানি—চুল উড়লে মেয়েদের মন উড়ু উড়ু হয়।

মুখটা কুঁচকে উঠতো আমার, আবার সেই কুসংস্কার ! পদে পদে বাধা · এটুকু বুঝতামনা, চুলগুলো উড়ে খাবারে পড়তে পারে, এই আশঙ্কাতেই মন 'উড়ু উড়ু'র ভয় দেখিয়ে রেখেছেন কোন বুদ্ধিমান অথবা বুদ্ধিমতী প্রাচীনা।

সব থেকে কষ্ট হত বিধবা পিসীমাকে দেখে। বিধবাদের জন্য নানান বিধি। নানান বাধা-নিষেধ। একাদশী, উপবাস, নিরামিষ খাওয়া, একবেলা ভাত খাওয়া এবং আরো কত কি।

ভাবতাম, একটুকরো মাছ-মাংস খেলেই মৃত স্বামীকে কতটুকু অসম্মান দেখানো হ'বে? মাছ মাংস বিধবারা জিভে লাগান মাত্রই কি বিধবার স্বামী অনন্ত স্বর্গ থেকে দুরন্ত নরকে ঝুপ করে পড়ে যাবেন?

একটু বড় হয়ে জেনেছিলাম আমিষ খেলে বিধবাদের দেহে আঁশ রসের প্রাচুর্য হ'তে পারে। তাতে সমাজে অনাচার বাড়ার আশঙ্কা। ভাবতাম তাই যদি, তবে বয়স্কা কুমারীদেরও তো ঐ একই কারণে নিরামিষ খাওয়ানো, উপবাস করানো উচিত!

আরো বড় হয়ে মনে হয়েছে সেদিনের সমাজপতি, ভবিষ্যদ্রষ্টা স্মৃতিতুল্য মানুষেরা অনেক চিন্তা করে স্থির করেছিলেন—এই লোভনীয় খাবার মাছ মাংস, ডিম এতে বিধবারা (যাদের অধিকাংশই গলগ্রহ) ভাগ বসালে বৌ-ঝিদের বাধ হ'বে। গলগ্রহ বিধবা পিসীশাশুড়ী বা ননদের মুণ্ডপাত করবে প্রকাশ্যে এবং গোপনে; সংসারে এই গলগ্রহদের ঠাঁই হওয়াই কঠিন হ'বে।

তার থেকে সেই নিদারুণ দিন, স্বামীর মৃত্যুদিন থেকেই নিয়ম করে দাও মাছ মাংস খাবে না তোমরা। অলঙ্কার পরবে না, ভাল শাড়ীও না। প্রসাধন করবে না। মাসে দু'চারটে উপোষ দেবে একবেলা দুটো ভাত, একবেলা দুখানা রুটি কি গুটো শুকনো মুড়ি খাবে।

তাহ'লেই স্বভাবতঃই সবাই বলবে, আহা একবেলা দুটো শাকভাত, ওতে আর কতই খরচ পড়বে। তার পরেও আসে দুটো একাদশী, দু'তিনটে অন্য ব্রতব্রত। তা একটা 'গতরের' বিনিময়ে এটুকু দিতে অস্বীকার করবে না বোধহয় কেউই।

যদি 'সংস্কারের' এই কড়া নিষেধ না থাকতো, বিধবার এই সব কড়াকড়ি না মানলে আগামী জন্মে আবার বিধবা হ'বার এবং এজন্মে পুত্রকন্যার অকল্যাণের ভয় না থাকতো, তাহ'লে লোভের বশে বিধবারা হয় তো চুরি করে আমিষ খেতে খেতো, একাদশীতেও খানিকটা খাবার চুরি করে খেত। একদিন ধরা পড়ত, তার অন্ন উঠতো বরাবরের মত।

এরপর আর আমাদের ধর্মের সংস্কারকে, কুসংস্কার বলার মত স্পর্ধার কথা মনে আসে না।

তেল মেখে নাকি বাইরে যেতে নেই। ডাক্তারি শাস্ত্র না পড়লেও, তাঁরা বুঝেছিলেন, তেল মেখে কিছুক্ষণ থাকলে সেই সময় ঘামের সঙ্গে শরীরের ময়লাগুলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে সময় বাইরে গেলে বাইরের ধুলো লোমকূপের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে পারে। দূষিত ময়লা তাহ'লে বেরোবার পথ পাবে না। অতএব ভয় দেখানো হল, তেল মেখে বাইরে গেলে 'ডাইনীর নজর' লাগবে।

আঁতুড়ে ভিক্ষে দিতে নেই। এ আবার কি নিয়ম! তারও কারণ আছে বৈকি। কত রকমের ভিখারী আসে, কার কি রোগ আছে ঠিকানা নেই, সে রোগের জীবাণু হয়তো বড় মানুষের মধ্যে শীঘ্র সংক্রমিত না হতে পারে, কিন্তু আঁতুড়ের শিশু, যার প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ, তার মধ্যে সংক্রমিত হওয়া সোজা। অতএব গৃহস্থের অকল্যাণের ভয় দেখিয়ে আগে থেকেই বাড়ীতে আঁতুড় থাকলে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, রাত্রে শোবার ঘরটা একটা ঝাড় দিতে হয়, দিদি শাশুড়ী ঝাঁটার

শব্দ পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—বলি ও ভালোমানুষের মেয়ে, রাতে ঝাড়ু দিলে যে সে খাঁটা পূর্বপুরুষের মাথায় পড়ে, মা বাবা শিখিয়ে দেয় নি কথাটা ?

না—একথাটা জানতাম না। নতুন শুনলাম। শুনেই ভাবতে লাগলাম এ সংস্কারের ব্যাখ্যা কোথায় ? একটা ব্যাখ্যা পেয়েও গেলাম।

ঐ ভদ্রলোকের কথাই মনে এল প্রথমে, তা থেকে রাতে আয়না দেখা, আর তা থেকে গ্রামাঞ্চলের লণ্ঠনের আলোর কথা। লণ্ঠনের আলোয় অথবা আধা-আঁধারে রাত্রে দিতে গেলে আবর্জনার সঙ্গে কত দরকারী কাগজপত্র, মূল্যবান জিনিষ চারিয়ে যেতে পারে, দিনের বেলায় সে ভয় থাকে না। অতএব ?

কাপড়ের জল ভালো করে না নিংড়ে নিলে নাকি ক্ষতি হয় ? কুসংস্কার আর কাকে বলে ?

কিন্তু এর সহজ ব্যাখ্যা কি এই নয়, কাপড়ে জল থাকলে শীঘ্র শুকোওলো পচে গিয়ে কাপড়টা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা।

এই সূত্রেই মনে পড়লো আর একটা কথা—সকালে উঠে ধোপার মুখ দেখতে নেই। এর ব্যাখ্যা হ'ল ধোপারা কাপড় কাচলে স্বভাবতঃই সে কাপড়ের আয়ু কমে যায়। সেইজন্যই মনীষিরা ধোবতর নিষেধ করে গেছেন সকালেই যাতে বাড়ীতে ধোপা আসার প্রয়োজন না থাকে। যে যার কাপড় যতটা সম্ভব নিজে কেচে নাও।

ঘটি খালি রাখতে নেই। লক্ষ্মী ছাড়ে। লক্ষ্মীছাড়ার ভয়ে স্বভাবতঃই সবাই ঘটিটা পূর্ণ রাখার কথা মনে রাখবে। তাতে সকলেরই সুবিধা। তৃষ্ণার্ত সজ্ঞানে থাকলেও হাত বোওয়ার অসুবিধা নেই।

বসন্ত হলে বাড়ীতে মাছ মাংস আনা নিষেধ। মা শীতলা রুষ্ট হ'বেন। মা শীতলার ক্রোধ সম্বন্ধে ধারণা নেই, তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝি, বসন্ত রোগীর ভাত খাওয়ার নিষেধ থাকে না। কিন্তু মাছ মাংস এ রোগে নিষিদ্ধ। বাড়ীতে অন্যে মাছ ভাত খাবে, আর অসহায় রোগী ভাতই পাবে, অথচ মাছের গন্ধ পাবে, মাছ নয়, তার চেয়ে আত্মীয়-স্বজনেরাও কজন না দুদিন কৃচ্ছ্রসাধন।

এবার আসা যাক আমাদের বারো মাসে তের পার্বণের কথায়। আমাদের যে উৎসব তা নিজের সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়েই আমাদের উৎসব। আমাদের যে মূর্তিপূজা, তাতে কুমার মাটির প্রতিমা তৈরী করে জীবিকার্জন করে, পুরোহিত পূজা করে, নাপিত পূজার উপচার সংগ্রহ করে, ঢোল বাজনা বাজিয়ে, বাজীকররা বাজী তৈরী করে, মালীরা ডাকসাজ তৈরী করে আনন্দের সঙ্গে কিছু কিছু উপার্জন করে। একটা পূজার মাধ্যমে কত লোকের আর্থিক সাশ্রয় হয়।

কালসন্ধ্যাবেলা খেতে নেই, সন্ধ্যাবেলা শুতে নেই, বিছানা পাততে নেই ইত্যাদি। তারমানে ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে ঐ সন্ধ্যাবেলাটা।

যেমন ছোট শিশুকে তার মা একটা বই নিয়ে শুধু পড়তে বসতে শেখায়, শুধু একমনে বসবার জন্য মনটাকে চঞ্চলতা থেকে দূরে রাখার জন্য পড়ুক আর না পড়ুক ; তেমনি আমাদেরও বলা হয়েছে সন্ধ্যাবেলা অন্ততঃ খানিকটা সময় কু-কাজ, কুচিন্তা থেকে বিরত হয়ে খানিকটা সময়

একাগ্রমনে সৎচিন্তা করার জন্য। স্বভাবতঃই ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনায় বসলে অন্যের ক্ষতির একথা তো বলা যায়না। সংসারের মংগল কর—এইকথা অন্ততঃ সারাদিনে একবারও তো ভাবা হয়।

আর আমাদের বারোমাসে তেরো পার্বণে অসুবিধাও কিছু নেই। বাজনিক খরচও নেই। যখন যে সময় যে জিনিষ প্রচুর পাওয়া যায়, সেই জিনিষ ভগবানের পায়ে একটু নিবেদন কর। তাই কি ভগবান খাবেন? ভগবানের নাম করে খাবো তো আমরাই।

অগ্রহায়ণ মাসে ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠেছে। অতএব বরাত করে ঠাকুরের ভোগদিয়ে পাঁচজন প্রতিবেশীকে, দুজন ভিখারীকে খাইয়ে তোমরা খাও।

পৌষমাসে লক্ষীপুজা। চাল তো হয়েছে প্রত্যেকেরই। অতএব পিঠেপুলির উৎসব হোক।

মাঘমাসে সরস্বতী পূজা। তারপরদিন শীতলাষষ্ঠী। শীতের দিন ঠাণ্ডাভাত, বাসিমাছের অম্বল, ভাজাভুজি খেতেও ভালো লাগে, আর মেয়েদের একটি বিশ্রামের দিনও পাওয়া গেল।

ফাল্গুনে আবীর খেলা। আবীর বসন্তের প্রতিষেধক, একথা বোধহয় আজ সবারই জানা।

চৈত্রের সংক্রান্তিতে পূর্বপুরুষদের জলদান করতে হয়। এখান থেকে মন্ত্রপাঠ করে দেওয়া হল আর স্বর্গ থেকে এসে পূর্বপুরুষেরা সেই জল খেয়ে গেলেন, একথা বললে কে বিশ্বাস করবে?

এই শ্রাদ্ধে প্রয়োজন হয় তিনটি ছোট ছোট মাটির কলসী। পরে কলসীগুলো গ্রামের কাউকে দান করে দিতে হয়। সামনে প্রচণ্ড বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস আসছে। নতুন মাটির কলসী কেনারও সামর্থ্য অনেকের নেই। তাই পূর্বপুরুষকে জল দেওয়ার অছিলায় এ দরিদ্রকে জলদানেরই পুণ্য। বৈশাখমাসে তো কত পুজো। যতদান করবে তত পুণ্য এমাসে। জলদান, জলদান, পানসুপারী, মিষ্টি। বিশেষ করে জলদান। তাই সারা বৈশাখ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় কত জলসত্র।

জ্যৈষ্ঠমাসে ভদ্র মংগলচণ্ডীর ব্রত। এ সময় পাকা আমের সময়, পাকাআম, দই চিঁড়ে দিয়ে অতি উপাদেয়। অতএব মেয়েদের নিজেদের সুবিধার জন্যই প্রচলিত হল এ ব্রত।

আষাঢ় মাসের অনুষ্ঠানটী, আমার মনে হয় বিশেষ করে মেয়েদের কথা মনে করে—। এসময় পাকা আম কাঁঠালের সময়। আজা বিধবাদের সবদিন থেকেই বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সপ্তার আমটা তিনদিন থাক তারা পেট পুরে।

তাই মনে হয় বারোমাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও সংসারের সকলের দিকে তাকিয়ে, সকলের সুবিধার জন্যই করেছেন।

আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ যারা ঠাট্টার চোখে দেখে, আমাদের প্রাচীনদের অনুশাসনকে যারা কুসংস্কার বলে মনে করে, এখন আর তাদের সংগে মতে মেলেনা আমার।

ছোটবেলায় ভাবতাম, যার ব্যাখ্যা নেই, তাকে গুরুত্ব দেব কেন? আজ প্রায় প্রতিটি তথাকথিত কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, আর এই সংস্কারের আবিষ্কর্তাদের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানাই।

বাঙলাদেশের পাল পার্বণের মধ্যেই তার সংস্কৃতির বিশেষ রূপটি পরিস্ফুট। অগ্রহায়ণ মাসে বাঙালী হিন্দুর ঘরে ইতুর পুজো হয়। এই অনুষ্ঠান একটি বিশেষ ধারার সংস্কৃতির বাহক। বিগত যুগের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন পূর্বে একজন অনুসন্ধিৎসু পুরললনার জ্ঞাতার্থে একটি পত্রের মাধ্যমে এই পুজোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে যে নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন, সেই অপ্রকাশিত লেখাটি 'মেয়ে মজলিশে' পরিবেশন করার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত।—

—বেলা দে

ইতুপূজা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে বাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরে ইতু পূজা আরম্ভ হয়। এই পূজা সূর্যের পূজা।

ইতু শব্দটি বহু দূর বিদেশের অনার্য শব্দ। আরব দেশে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর দোআবের অর্থাৎ দুইটি জল স্রোতোধারার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে পর পর বহু সুসভ্য জাতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইউফ্রেটিস্ নদীর দক্ষিণ কূলে পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের নাম ছিল ক্যালডীয়া। এই ক্যাল্‌ডীয়া ভাষায় ইতু শব্দের অর্থ ছিল 'মাস'। তিন হাজার বৎসর পূর্বে যখন এই জাতীর অভ্যুদয় হয়, তখন ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতা অভ্যুদিত হয়েছে। তখন ভারতবর্ষে বৎসরের আরম্ভ ধরা হ'ত অগ্রহায়ণ মাস থেকে। যে মাস হায়ণের অর্থাৎ বৎসরের অগ্রবর্তী সেই মাসের নাম হয় অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণ মাসের আর একটি নাম মার্গশীর্ষ—অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণের মার্গের অর্থাৎ পথের অগ্রবর্তী মাস, এবং মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যের সংক্রমণের মাস। সূর্য হচ্ছেন বৎসরের অধিপতি, তাঁর দ্বারাই সময়ের উৎপত্তি। বৎসর শব্দের মধ্যে সূর্যের এই স'রে স'রে চলার পরিচয় আছে। মাস শব্দের অর্থও সূর্যের দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা—চান্দ্রমাস শব্দের মধ্যেও এই মাসের ইঙ্গিত আছে। যখন নীতের সূত্রপাত হয়, যখন সূর্যের তেজোহ্রাস হয়, সেই সময় থেকে বৎসর গণনার সুবিধা হয়, এবং মৃগশিরা নক্ষত্র বা কালপুরুষ নামে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে সকলেরই বিশেষ পরিচিত, সেই জন্য সেই নক্ষত্রে সূর্য সংক্রমণের দিন থেকে বৎসর গণনা আরম্ভ করা হ'ত। সূর্য হচ্ছেন জগৎ প্রসবিতা, তাই তাঁর নাম হয়েছে সবিতা, এবং জগতের সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর উৎপাদক—যদি সূর্য না থাকতেন তা হ'লে প্রাণী বাঁচতে পারত না, সূর্যের উত্তাপেই জল বাষ্পে ও বাষ্প মেঘে ও মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত হয়। উদ্ভিদ সূর্য কিরণ থেকে তার পরিপোষণের উপাদান সংগ্রহ করে,

প্রাণীদের স্বাস্থ্য ও কর্ম সবই সূর্যের উপর নির্ভর করে। এইরূপ উপকারী জ্যোতিষ্ককে আদিম কালের লোকেরা সহজেই দেবতা মনে করেছিল। তাই সকল দেশে কোনো না কোনো নামে সূর্যের পূজা প্রচলিত হয়েছিল—ইজিপ্টে, ব্যাবিলনে, ফিনিসিয়াতে, ক্যালিডীয়াতে, পারস্যে, ভারতে, সব সভ্য দেশে সূর্যের পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে সূর্য বা সবিতা বা বিষ্ণুর পূজা না হলেও তাঁর বন্দনা নিত্য হ'ত। পরে পারস্যদেশে জরথুস্ত্র ঋষির আবির্ভাবে যখন দেশে সর্বত্র একেশ্বরবাদ প্রচারিত হ'লো, তখন পারস্যের সূর্যোপাসক মগী সম্প্রদায়ের ১৮টি কুল বা পরিবার পারস্য থেকে পলায়ন করে ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে সীমান্তে এসে উপনীত হন। এবং সেইখানে তাঁরা প্রথম সূর্য পূজা করেন, সাম্বের পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, সেই রোগ উপশমের জন্য তিনি পূজা করান। সূর্যপূজার প্রথম স্থান মূলস্থান নামে পরিচিত হয়, তার আধুনিক নাম হয়েছে মুলতান। এর বিশদ বিবরণ ভবিষ্যপুরাণে আছে। সূর্যপূজা যে একসময়ে ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ হ'তে সমুদ্র পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তার সাক্ষী স্বরূপ সূর্যমন্দিরের দুটি প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান আছে—কাশ্মীরে মার্তণ্ড মন্দির ও উড়িষ্যায় কোনার্ক মন্দির বা কোনারক। সূর্য সকল প্রকারের রোগের প্রতিষেধক ও উপশমকর্তা—ইউরোপের এখন রৌদ্র চিকিৎসা খুব প্রচলন হয়েছে। এই জন্য সূর্যের নাম হয়েছিল আদিত্য যিনি অভাবাদি বিপৎ সমূহে আবির্ভূত হন অর্থাৎ যিনি দারিদ্র্য ও রোগনাশক। গৃহস্থের শস্য-সম্পদের বাণিজ্যে সফলতার ও সুস্থতার মূল কারণ হচ্ছেন সূর্য। অতএব তাঁর পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমাদের দেশের আর্য ঋষিরা জানতে পারলেন যে সূর্য একটা জড়পিণ্ড মাত্র বাষ্পের পুঞ্জ তখন তার প্রতি দেবভাব রক্ষা করা আর চলল না, কিন্তু যে শক্তি ও দেবতা বিশ্বকারণ তাঁর আবির্ভাব তো সর্ব বস্তুতে সর্বভূতে তাই উপনিষদ্ বললেন—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপসু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যো বৈ সংবৎসরঃ সঃ প্রজাপতিঃ।

যিনি সংবৎসর তিনিই প্রজাপতি—বিশ্বকর্মা।

সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির জড় রাজ্যে উদ্ভিদ্ রাজ্যে যে দেবতা আছেন যেমনি সমান, সেই দেবতাই প্রাণীদের মধ্যে প্রাণশক্তির রূপে চেতনারূপে, আত্মরূপে বিরাজিত।

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ হরেঃ সত্ত্বনিধের্ মুনে।

হে মুনি, যিনি সত্ত্বনিধি অর্থাৎ সর্ব প্রাণাধার প্রাণ-স্বরূপ তাঁর অবতারের আর সংখ্যা নাই, কৃমি কীট পতঙ্গ সরীসৃপ পশু পক্ষী মানব সকলেই তাঁর অবতার, চন্দ্র সূর্য সকল জ্যোতিষ্কই তাঁর কিরণে বিভাসিত হয়ে তাঁর অবতার হয়েছে।

এই জ্ঞানলাভের পর থেকে আমাদের দেশের জ্ঞানীরা সূর্যের জড়মূর্ত্তির উপাসক রইলেন না, তাঁরা সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়বপু চৈতন্যময় পুরুষ নারায়ণের উপাসক হলেন,—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-হারী হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।

সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পদ্মাসনে সন্নিবিষ্ট সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত হিরণ্ময় দেহধারী ও শঙ্খচক্রধারী নারায়ণের যিনি অয়ন বা গতি সেই পরম দেবতাকে সদাসর্ব্বদা ধ্যান করবে।

শঙ্খ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দ হচ্ছে আকাশের বা ঈথারের ধর্ম্ম। আবার শঙ্খ হচ্ছে মঙ্গলজনক, আলস্য থেকে লোককে কর্ম্মে উদ্বোধন করবার আহ্বান, চেতনা সম্পাদনকারী। এই জন্য ভগবান্ নারায়ণের হাতে শঙ্খ। চক্র হচ্ছে কালচক্র। তাঁর হাতে গদাপদ্মও আছে। গদা শাসন ও পালনের চিহ্ন এবং পদ্ম সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক।

ইতু পূজাকে কেবলমাত্র জড় পিণ্ড সূর্যের পূজা না ভেবে একে সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের পূজা মনে করলে আর কোনো আপত্তির কারণ থাকে না।

ইতু পূজা কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য সংক্রমণের দিন থেকে ও বৎসরের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করতে হয়। এবং প্রতি রবিবারে ইতুর বা রবির পূজা করতে হয়। হিন্দী ভাষায় এইজন্য রবিবারকে ইতবার বা ইতুবার বলে। একমাস এই পূজা করনীয় এই পূজা ছোট ছোট চারিটি ঘটে করতে হয়, ঘটগুলিকে একটি মাটিতরা সরার উপরে রাখা হয়। মাটিতরা সরাটি যেন মৃন্ময়ী পৃথিবী, আর তার উপরে চারিটি ঋতুই প্রধান, আর্য্যরা যখন শীত প্রধান দেশে ছিলেন তখন তাঁরা বর্ষা ও হেমন্ত ঋতুর বিশেষ রূপ জানতে পারেননি, ভারতবর্ষে আসার পরে ঐ দুই ঋতু গণ্য হয়েছে। সরার মাটির উপরে ধান, ছোলা, মটর, যব, গম, মুগ প্রভৃতি শস্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং একমাস জল সেচের ফলে সেই শস্যগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সূর্যদেব যেন অনুকূল হয়ে গৃহস্থের শস্য সম্পদ আরোগ্য বিধান করেন—এই হ'লো এই পূজার ইঙ্গিত।

ইতু পূজার দিন পুরুনারীরা নিরামিষ ভোজন করেন। রবিবারে তেল মাখা ও আমিষ খাওয়া নিষিদ্ধ। অনেকেই এখনো এই বিধান মেনে চলেন। আমরা ছেলেবেলা এই বিধান মানতে বাধ্য ছিলাম পিতামাতার অনুশাসনে।

ইতুর পূজা শেষ হলে ইতুর সাধ দিতে হয়—অর্থাৎ তাঁর তুষ্টি সাধনের জন্য পায়স-পিষ্টকাদি ভোগদিতে হয়। এমনই পায়স-পিষ্টকাদি সুভোজ্য যেন আমরা সকলে স্বচ্ছন্দে সংবৎসর ভোগ করিতে পারি।

পূজার পরে পুরোহিত ঠাকুর সূর্য ব্রতের কথা শুনান। সূর্যের তেজোহ্রাসের কাহিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে একটি গল্প আছে বিশ্বকর্ম্মার একটি কন্যা আছেন, তাঁর নাম সংজ্ঞা। যিনি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বস্রষ্টা তিনি চিৎশক্তির চেতনা-শক্তির জনক তাই তাঁর কন্যার নাম সংজ্ঞা বা চেতনা। বিশ্বকর্ম্মা কন্যার বিবাহ দিয়েছেন সূর্যের সঙ্গে—সূর্য উদয় হলেই বিশ্বের চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে, পশু পক্ষী প্রাণী মাত্রই ও উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই চেতনা পুষ্টি লাভকরে সূর্য থেকে। তাই সংজ্ঞা সূর্যের সহধর্ম্মিনী সহচারিণী পত্নী। কিন্তু সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারতেন না, তাই তিনি তাঁর সখী ছায়াকে নিজের রূপ ধারণ করিয়ে সূর্যের কাছে রেখে বাপের বাড়ী পলায়ণ করলেন। বাপ অনেক

করে সংজ্ঞাকে পতিগৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু সংজ্ঞা গেলেন না, তিনি তপস্যা করতে গেলেন। কিছুদিন পরে ছায়া সূর্যের কাছে ধরা প'ড়ে গেলেন যে তিনি সংজ্ঞা নন। যেখানে আলোকময় সূর্য সেখানেই তাঁর সহচারিণী ছায়া থাকেন, কিন্তু ছায়ার সঙ্গে সংজ্ঞার তো মিল নেই। তাই ধরা পড়লেন; ধরিয়ে দিলেন সংজ্ঞার পুত্র যম ও কন্যা যমুনা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে এঁদেরই ভাই বোনের প্রীতির পরিচয় ও ইতিহাস বহন করে এঁদের পূজার্চনা করতে হয় ও ভ্রাতার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বকর্মাও সংজ্ঞার পতির প্রতি বিরূপের কারণ জানতে পারলেন, তখন তিনি সূর্যকে শাণযন্ত্রে চড়িয়ে সূর্যের তেজ খানিকটা ছেঁটে কেটে কমিয়ে দেন্‌লেন, সে এই কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকেই সুরু হয়।

এর পরে বাড়ীর গিন্নিরা বাংলা ভাষার নিজস্ব গল্প উম্‌নো-ঝুম্‌নোর কথা বলেন—'এক অতি দরিদ্রির বেবাক্কনের দুই মেয়ে ছিল উম্‌নো আর ঝুম্‌নো।' এই কথায় মধ্যে দেখানো হয় যে কেমন করে সূর্যের ব্রত অবহেলা করার ফলে উম্‌নোর দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য শোক, পীড়া ইত্যাদি হয়েছিল, আর সূর্যের ব্রত পালন ক'রে কেমন করে ঝুম্‌নোর সুখ সম্পদ বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল।

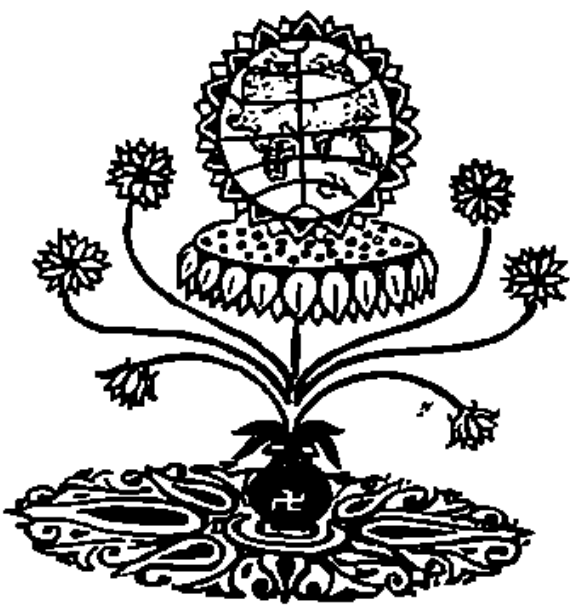

বড়ি একটি শিল্প

বেলা দে

আমাদের বাংলাদেশে হিম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের দুপুরে মেয়েরা বসে যান নানারকমের বড়ি দিতে। এমন কি বাংলাদেশে আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের একটী শুভদিন দেখে মেয়েরা বড়ি দেওয়া সুরু করেন। নতুন গামছা বা পাতলা কাপড়ের উপর অথবা থালায় তেল মাখিয়ে বড়ি দেওয়া হয়। প্রথমে বড় বড় ছুটি বড়ি পাশাপাশি বসা হয় বুড়োবুড়ি। তাদের মাথায় দুর্বা সিঁদুর দিয়ে শংখধ্বনি উলুধ্বনি ও করা হয়।

শীতকালে নানারকম শাক সবজি পাওয়া যায় কাজেই সেগুলো অধিকাংশই বড়ির পক্ষে অপরিহার্য্য। যেমন মূলো, পালংশাক, কড়াইশুঁটী, আলু, কপি ইত্যাদি। সাধারণতঃ বড়ির জন্য দরকার হয় কলাই ডাল, মুসুর ডাল, মটর ডাল, খেসারীর ডাল। ছাঁচি কুমড়ো, পোস্ত, তিল, আদা, মৌরীবাটা, শুকনো ও কাঁচালঙ্কা।—হিং ও নুন। এছাড়া যার যেমন রুচি সেইভাবে মশলাও ব্যবহার করতে পারেন।

বাংলা দেশের মধ্যে আবার বিশেষ কয়েকটি জায়গায় যেমন মেদিনীপুর, বীরভূম ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় মেয়েরা এমন চমৎকার বড়ি দেন যা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। নানারকম সুক্ষ্ম কারুকার্য করে থাকেন, অলঙ্কার, পশুপক্ষী, বাড়ী, বাসনপত্র সবই বড়ি দিয়ে করা হয় অথচ এত হালকা যে সেগুলো শুকোবার পর তুলোর উপর সাজিয়ে এক সময় মায়েরা শীতের তত্ত্ব করতেন মেয়ের বাড়ী। আজকের দিনে বড়ির ব্যবহার থাকলেও তেমন সুক্ষ্ম বড়ি দিয়ে অনেকে সময় নষ্ট করতে চান না। তাই এখানে সাধারণ কয়েকটী বড়ির উল্লেখ করছি—

নিরামিষ বড়ি—মটর অথবা খেসারী ডাল আগের দিন ভিজিয়ে, পরদিন জল ঝরিয়ে মিহি করে বেটে নেবেন। তাতে অল্প কালোজিরে ও সামান্য সোডা দিয়ে কেটিয়ে নিয়ে বড় বড় করে বড়ি দেবেন। ইচ্ছে করলে এই সঙ্গে মূলো বাটা সামান্য লঙ্কা জিরেবাটাও দেওয়া যেতে পারে। খেতে খুব সুস্বাদু। কড়াইশুঁটীও বেটে দেওয়া যায়।

তিলের বড়ি—মটর অথবা মুসুর ডাল, মাজা তিল, নুন ও লঙ্কাবাটা। ডাল যথারীতি ভিজিয়ে বেটে, খোসাছাড়ানো তিল মিশিয়ে অন্যান্য মশলা দিয়ে কেটিয়ে ছোট ছোট বড়ি দিন।

ফোলের বড়ি—কাঁচাকলাই ডাল ভিজিয়ে বেটে ঐ সঙ্গে ছাঁচি কুমড়োর খোসা ও বীচি বাদ দিয়ে পরিষ্কার স্যাকড়ায় ছেঁকে জলটা বাহির করিয়া নিন। এই সঙ্গে অল্প হিং ও নুন মেশান। কলাই ডালের বড়ির ডাল ঠিক ফেটানো হয়েছে কিনা দেখতে হলে বড় বাটীতে জল দিয়ে দেখতে হবে একটী বড়ি ফেলে যতক্ষণ না ভাসতে থাকে ততক্ষণ ডাল ফেটাতে হবে। কড়াই ডালের বড়ি অনেক রকমের হয়। শুধু আদা মৌরীবাটা ও হিং দিয়েও করা যায়। অথবা পোস্তদানা বাটিয়েও করা যায়। এছাড়া ছোট ছোট ভাজা বড়িও দেওয়া হয়। কড়াইডাল, মুলকপি ও জিরেবাটা দিয়ে ভারী মুখরোচক বড়ি হয়। ছাঁচি কুমড়োর শুকনো বীচি দিয়েও বেশ ফাঁকা বা পোড়া বড়ি করা যায়।

খেঁসারী ও মটর ডালের বড়ি—ফেটাবার সময় বেশী জল দিতে নেই। এতে কালোজিরা মিশিয়ে ছোট ছোট বড়ি দিতে হয়—এই বড়ি, শুক্তো, টক ইত্যাদিতে ভাল খেতে হয়।

ফ্রেড্ সাইকেল

রবীন্দ্র নারায়ণ দে

চাকরিটা পাওয়ার দিনেই বুধন মার খেলো। অবশ্য মার না খেয়ে উপায় ছিলনা, কারণ ছাপিছুক্ কাম্পেটেরিয়ার এইসব হালচাল সে জানবে কোথা থেকে? কেষ্টার সঙ্গে আলাপ হবার পর বুধন শুধু এই টুকুই বুঝেছিল ছাপিছুকে কোন ভবিষ্যুক্ত খদ্দের ঢুকলেই তার ভার পড়বে কুমকুমের ওপর। চারিদিকে ঘেরা কেবিনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের তোলা হবে আর তার পরেই খাবারের মেনু হাতে করে কুমকুম গিয়ে ঢুকবে সেই এনক্লোজারে। শুধু ঢুকবেই না, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের পর্দাটা ভাল করে টেনে দেবে।

বাতাসে সেই পর্দা একটু আধটু উড়েও যেতে পারে কিন্তু বুধনের ওইটেই জানা ছিল না যে কেবিনের মধ্যে যখন খদ্দের আসবে, আর তারপর যখন কুমকুম গিয়ে ঢুকবে, তখন পর্দা যতই উড়ুক ওর তৃতীয়নয়ন কারও যাবার হুকুম নেই।

আর···বুধন প্রথম দিনে ঐ ভুলটাই করে বসল।

সুরজলাল ইসারা করবার আগেই বুধনের অবাধ্য চোখদুটো বাতাসে-ওড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে যা দেখবার দেখে ফেলেছে, আর পরক্ষণেই ঘাড়ের কাছে জামার কলার সুদ্ধ শক্ত হাতে টান পড়তেই বুধনের মুখ শুকিয়ে গেছলো। ঘাড় ফেরাতেই দেখলে সুরজলাল তার ঘাড়টা সাঁড়াসির মত চেপে ধরে নেকড়ে বাঘের মত চেয়ে আছে।

এরপর অবশ্য বুধনও চালাক হয়ে গেছলো। খদ্দের বুঝে তাকে সোজা কেবিনে নিয়ে হাজির করত। ব্যাস্, তার কাজ শেষ, এর পরের কাজ কুমকুমের। সে কথা, না কারী, না ফিসফ্রাই খাবে এসব চিন্তা করবে কুমকুম। তবে এটা জানা কথা, কুমকুম গেলেই একটা মোটা অর্ডার আসবে। এইত সেদিন জানহাতে ঘড়ি আর প্যান্টের ওপর সফেদ্‌শার্টপরা লোকটা যদিও একঘণ্টা ধরে মাত্র একচাপ চা খেলো কিন্তু টাকার ভাঙ্গানি ফেরত নিতে গিয়ে একটা পুরো সিকি প্লেটের ওপর ফেলে রাখলো। এমন অবশ্য অনেকেই রাখে, তবে দু'পয়সা বড়জোর পাঁচ পয়সা। কিন্তু কুমকুমের হাতদিয়ে টাকার ভাঙ্গানি ফেরত আসতেই খদ্দেররা যে একেবারে একটা পুরো সিকি টিপ্‌স দিয়ে বসবে, এটা দেখে বুধন অবাক হয়ে গেছলো কিন্তু তার থেকেও বেশি অবাক হলো যখন কুমকুম ঐ পয়সা সুদ্ধ ডিসটা তাচ্ছিল্য ভরে বুধন আর কেষ্টার দিকে ঠেলে দিলো।

বুধন সমস্ত জিনিসটা বোঝবার আগেই কেষ্টা ছোঁ মেরে সিকিটা তুলে নিলে। বুধন মনে মনে ভাবলো, যে মেয়ে তাচ্ছিল্য ভরে সিকিসুদ্ধ ডিস্ সরিয়ে দিতে পারে, সেদিন খদ্দেররা তাকে না জানি কি

দিয়ে পড়ই করে···। আর এটাও বুধন হাড়ে হাড়ে বুঝলো যে বেটুরেন্টের বয় আর ওয়েট্রেস্ এক জিনিষ নয়··· । ছুটোর মধ্যে বেশ একটু ফারাক আছে।

হাপিমুকের বাঁধা খদ্দের খোকন হালদার। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা ঝিনঝিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরে বাদশাহী মেজাজে হেলতে দুলতে গিয়ে ঢোকে কেবিনে। রোজ তার জন্যে বরাদ্দ মোগলাই পরটা আর চিকেন রোস্টেরাজী। আবার কোন কোন দিন তার ওপর স্পেশাল কবিরাজী কাটলেট্।

বুধন অনেকবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছে···খোকন হালদার কেবিনে ঢুকলে কুমকুম এতক্ষণ ওখানে কি করে?

একদিন একফাঁকে যা দেখেছিল তাতেই তার চক্ষু চড়কগাছ—

গদিওলা চেয়ারে হেলান দিয়ে খোকনবাবু বসে আছেন আর তার কোলের ওপর বসে কুমকুম তারই গলা জড়িয়ে ধরে তাকে কাটলেট ভেঙে ভেঙে খাওয়াচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বুধন এইটেই বুঝেছিল—যারা নগদ ঝকঝকে সাতটাকা বারআনা টাঁকে গুঁজে স্পেশাল কবিরাজী আর চিকেন রোস্টেরাজী অর্ডার দেয় তাদের হাতে করে খাইয়ে না দিলে তারা বোধ হয় কোন জিনিস মুখে তোলে না। আর বাদশাহী খানা খেতে গেলে এরকম একটু বাদশাহী মেজাজ না হলেও ঠিক মানায় না। তবে যাইহোক, খোকন হালদার লোকটা একটু রগচটা হলেও কিন্তু দিলদরিয়া। মাঝে মাঝে এমনিই বুধনকে পয়সা দিয়ে যায়। আর যেদিন বাইরে থেকে পানটা, সিগারেটটা এনে দিতে হয় সেদিন ত আর কথাই নেই।

আড়ালে কেষ্টা বলে—জানিস, বেটা ক্রোকোডাইল অফ্ মানি।

বুধন অতশত বোঝে না। শুধু এইটুকুই বুঝতে শিখেছে এই সব ক্রোকোডাইল দেখলেই সেলাম করতে হয়।

একদিন বুধন হঠাৎ কুমকুমকে দেখেই চমকে উঠল—ওমা!·····মেয়েটাকে আর যেন চেনাই যায় না।

কুমকুম পাঞ্জাবী আর জুতোর মাঝামাঝি গোছের কি যেন একটা পরেছে। তলায় আবার কার্ডিগানের মত গোড়ালির কাছে টেপা সিল্কের পালোয়ার। জামাটা কাঁধের কাছ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একেবারে শরীরের সঙ্গে টাইট্।

বুধনের মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকলো না যে অত টাইট্ জামা কুমকুম পরল কি করে? হয়ত যেন কিছুক্ষণ কসরৎ করেই ওটা ওকে পরতে হয়েছে।

বুধন তার থেকেও বেশি অবাক হলো যখন নজরে পড়লো কুমকুমের কপালে আগে যেখানে ফুল থাকতো এখন আর সেখানে তা নেই? এখন কাল কুচকুচে টানাটানা কপাল জোড়া ভুরু। আগে কেবল ঠোঁটের রং লাল ছিল এখন ঠোঁট, গাল, হাতের নোখ, পায়ের নোখ সব লাল।

রাত তখন প্রায় দশটা। ছুটির পর কি খেয়াল হলো কেষ্টা আর বুধন হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়লো। হঠাৎ হৈচৈ টান পড়তেই বুধনকে থামতে হলো। কেষ্টা ইশারায় বুধনকে দেখালে—ফুটে লাইট পোষ্টের কাছ বরাবর একটা টানা রিক্সায় খোকন হালদার আর কুমকুম যেন ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে আছে। খোকন হালদারের বাঁ হাতখানা কুমকুমের কোমরের ওপর জড়ানো আর কুমকুমের মাথাটাও যেন আলতো করে খোকন হালদারের কাঁধের ওপর ভর করে আছে।

ক্রমে কেষ্টা আর বুধন আবিষ্কার করলে · রোজ রাত্রে খোকন হালদার বেশ খানিকটা দূরে রিক্সা নিয়ে অপেক্ষা করে। আর কুমকুমের ছুটী হলেই দুজনে সেই রকম করে বসে পশ্চিমমুখো চৌরঙ্গী পাড়ার দিকে চলে যায়।

বুধন আজকাল একটু একটু বুঝতে শিখেছে। কুমকুমের রিক্সার দিকে চেয়ে বলে—মাইরী কি ঘরাৎ!

পাশ থেকে কেষ্টা ভেংচিকেটে জিভের একটা আওয়াজ করে বলে,

—ওর ঘরাৎ হবেনা ত কি তোর মত ছোঁড়ার হবে?

সেদিন খোকন হালদার আসবার আগেই পাতলুন পরা গোলগাল চেহারার একটা লোক এসে লেডিজ্ কেবিনে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে খাবারের মেহু হাতে করে কুমকুমকেও ঢুকতে হলো।

মোগলাই পরটা গেল, চা গেল কিন্তু কুমকুমের আর বেরোবার নাম নেই। এদিকে খোকন হালদার এসে বসে আছেত বসেই আছে·····।

—এই ছোঁড়া শোন্!

খোকন হালদার বুধনকে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কে ঢুকেছে রে?

কেষ্টা মুখিয়েই ছিল·····। বুধন কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে খোকন হালদারকে ইসারায় সব বুঝিয়ে দিলে।

সেদিন সেখানে বসে বসেই খোকন হালদার প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেললে তবু কুমকুম বেরোয় না।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা কাবার করে পাতলুন পরা লোকটা আর কুমকুম কেবিন থেকে বেরলো।

বর্শার খোঁচা খাবার পর মহিষাসুর যা-দুর্গার দিকে যেমন করে চেয়েছিল, খোকন হালদারও সেই রকম দৃষ্টিতে কুমকুমের দিকে চেয়ে রইলো।

একদিন কেষ্টা বললে—জানিস্ এটা শিগ্রী ‚বার' হয়ে যাবে।

বুধন ঘাবড়ে গেল—'বার' আবার কি জিনিস্?

—আরে বুদ্ধু 'বার্' জানিস্? রাম্, ভ্যাট, জিন্ এ সবের নাম শুনেছিস্?

কেষ্টা দাঁত বার করে হেসে বললে—তখন দেখবি খদ্দেরের লপচপানি·····, তখন পয়সা উড়বে··· বুঝলি? আর ঐ মাগী তখন নেচে নেচে সব টেবিলে গিয়ে মদ ঢেলে দেবে···।

সমস্ত দৃশ্যটা বুধন একবার মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করল—সেই টাইট জামা পরে কুমকুম —নাচতে নাচতে গিয়ে সবার টেবিলে মদ ঢেলে দিচ্ছে।

হাপিহুকের যতই উন্নতি হচ্ছে কুমকুমের পোষাক ততই স্বল্প আর সল্প হয়ে আসছে। হয়ত আরো কিছুদিন থাকলে কুমকুম জামা পরাই ছেড়ে দিত···।

কিন্তু তা আর হলো না।

কুমকুমের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হতে আরম্ভ করল। মুখ চোখ কেমন শুকিয়ে গেল, আর একটু একটু জ্বর।

মাঝে মাঝে কুমকুমের সঙ্গে সুরজ্‌লালের ফিস্ ফিস্ করে কি সব কথাবার্তা চলে দূর থেকে কেষ্টা আর বুধন অনেক চেষ্টা করেও ঠিক ধরতে পারে না।

কি যে হলো? কুমকুমের একটু একটু জ্বর আর ছাড়তেই চায় না, তার সঙ্গে লাল ঘামাচির মত ব্রণ শরীরের এখানে সেখানে বেরোতে আরম্ভ করেছে।

আগের সেই হেসে গড়িয়ে-পড়া চনমনে ভাবটাও আর নেই। একলোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি বিমোয়। অত টাইট জামাও এই কদিনে যেন ঢলঢলে হয়ে উঠেছে।

সারা গায়ে লাল ঘামাচির মত ব্রণগুলো আকারে যত বড় হতে লাগল কুমকুম যেন ততই ফিকিয়ে পড়তে লাগলো।

কমিশনের খাতায় আগে যেখানে কুমকুমের নামে জমা পড়ত দিনে পাঁচটাকা থেকে সাতটাকা তা ক্রমে বন্ধ হলো। তারপর একদিন কুমকুমের আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

খোকন হালদারের মত বাঁধা খদ্দেরের আসা আগেই বন্ধ হয়েছিল। সব যেন এক সুরে বাঁধা।

গন্ধের কবিরাজী কাটলেট আর চিকেন রোষ্ট আজকাল বড় একটা কেউ ছোঁয় না। অনেক সাধাসাধি করলে তবে চায়ের সঙ্গে একপিস্ মাখন কটি বড় জোর একটা ভেজিটেব্‌ল চপ্।

একদিন কেষ্টা আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল—

—ছুটী, ছুটী, সবার ছুটী···।

—কি ব্যাপার?

স্বাপিস্থকে যা কোনদিন হয়নি তাই হলো। সুরজলাল পুরো মাইনেতে একমাস সবাইকে ছুটী দিয়ে দিলে।

কারণ—স্বাপিস্থক কাফেটেরিয়ার রিনোভেশন্ হবে।

একমাস পরে বুধন পুঁটলি আর বিছানা নিয়ে ফিরে এসেই চমকে উঠল।

স্বাপিস্থককে আর চিনতেই পারা যায় না। সমস্ত দোকান-ঘরটা বিলকুল ঢেলে সাজান হয়েছে। দিকে নীল রং-এর দেওয়ালের ওপর প্যারিস প্লাস্টারের কত রকম ডেকরেশন্। কোথা থেকে যে আলো আসছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তবু সারা ঘরখানা পূর্ণিমার রাতের মত মিহি আলোয় ভরে আছে।

প্রথম কেবিন ছিল একটা। এখন তৈরী হয়েছে পাশাপাশি তিনটে। তাতে ঝোলানো রয়েছে দেওয়ালের সঙ্গে ম্যাচ্ করা স্কাই-ব্লু রং-এর ভারী ভারী পর্দা। চকচকে ফায়মাইকা ল্যামিনেট দিয়ে মোড়া চেয়ার টেবিল। আগেকার ঝুলনো পাখার আর নাম গন্ধ নেই। তার বদলে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে নতুন নতুন এয়ার-কণ্ডিশনিং সেট্। সমস্ত মেঝে মোজাইক করা চৌকো চৌকো টালি দিয়ে ঢাকা।

বুধন দরজার বাইরেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। পুরু কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে বুধনেরই কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

ভেতরে ঢুকে বুধন আরএকবার চমকে উঠল—সামনেই গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক কুমকুমেরই মত ·····তবে একজন নয়, দুজন।

প্রথম যেদিন কুমকুমকে দেখেছিল সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল।

বুধন আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলে।

হঠাৎ একদিন কেষ্টা বুধনকে ডেকে বললে—তোকে কুমকুম একবার দেখা করতে বলেছে·····খুব দরকার।

বুধন বললে—যাঃ, হতেই পারে না।

সত্যি কথাই। কুমকুম একজন ওয়েট্রেস্ হয়ে কোন্ দুঃখে হঠাৎ বুধনের মত একজন সামান্য বয়কে নিজের বাড়ীতে ডেকে পাঠাবে?

কেউ আবার বললে—হ্যাঁ রে, সত্যি।

কুমকুমের নাম ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ বুধনের হাতে এগিয়ে দিলে।

বহু কষ্টে বুধন একবেলা খানিকক্ষণের জন্যে ছুটী পেল। ঠিকানা ধরে খুঁজে খুঁজে শেষে বুধন গিয়ে হাজির হলো—অনেক এঁদো গলি পার হয়ে, বস্তির মধ্যে।

একধারে কতকগুলো প্যাকিং কাঠের বাক্সের ওপর বসে বসে পাঁচ সাতটা লোক তাস খেলছিল আর জটলা করছিল।

বুধন গিয়ে কুমকুমের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল।

—কার ঘর? কুমকুম?

লোকগুলো এ ওর মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগল। বুধন একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে……

—রেষ্টুরেন্টে কাজ করে…খুব সুন্দর দেখতে…

—ও ·· ··আমাদের ফটকি? লোকটা বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতখানা সাপের ফণার মত আকৃতি করে কয়েকবার বুধনের নাকের ডগায় নেড়ে দিলে।

—তাই বল্, ছড়িত লট্‌কেছে।

শেষ পর্যন্ত বুধন ঘর খুঁজে বার করলে। অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে খোলার চালওলা একখানা ঘর।

একটা ভাঙা চৌকিতে ছেঁড়া তেলচিটে একটা কাঁথার ওপর কুমকুম শুয়ে আছে।

এই কয়মাসের মধ্যে তাকে যেন আর চেনাই যায় না। বুধন লক্ষ্য করলে—সেই লাল রঙের মত জিনিসগুলো সারা দেহে আরো বড় বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার চুলগুলোও প্রায় উঠে গেছে।

বুধন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কুমকুমের সারা ঘরখানা দেখলে—। কুমকুম আসলে বুধনের থেকেও গরীব।

কুমকুম বললে—আমার একটা উপকার করবি ভাই? সেই পাঞ্জাবী পরা লোকটাকে একবার আমার কথা বলবি?

বুধন চিনতে পারল—সেই কবীরাজী কাটলেট-খাওয়া লোকটা ত? কিন্তু সে ত আর আসে না।

কুমকুম খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তার রক্তজবার মত লাল লাল চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে কুমকুম বললে,

—যদি কখনো দেখা হয় আমার কথা একবার বলবি ভাই…কেমন?

বুধন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

বুধনের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই কুমকুম যখন রাত্রিবেলা সেজেগুজে খোকন হালদারের সঙ্গে রিক্সায় করে বাড়ী ফিরতো, তখন কে জানতো তারই কপালে একদিন এই দুর্দশা ঘটবে।

বুধন বললে—তুমি কাঁদছ কেন? তুমি আবার সেরে উঠবে।

কুমকুম কাঁদতে কাঁদতে বললে—নারে, আমি বোধহয় মরে যাব ·· আমার মত যারাই এ চাকরী করবে তারা সবাই একদিন এই রকম মরবে…ও সব তুই বুঝবি না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কুমকুম বললে,

—বুধন আমাকে ভাই কিছু টাকা ধার দিবি? আমার হাতে কিছুই নেই।

বুধন যেন মুসকিলে পড়ে গেল।

পকেট হাতড়ে ছুটো টাকা বেরলো, বুধন তাই কুমকুমকে দিয়ে দিলে।

হরজলাল বুধনকে আধবেলা ছুটী দিয়েছিল এই শর্তে যে সন্ধ্যে বেলার মধ্যেই বুধনকে ফিরে আসতে হবে।

বুধন হাঁটতে হাঁটতে ফিরেই এসেছিল। হাপিহুকের কাঁচের দরজার বাইরে থেকেই বুধন দেখতে পেলো নতুন আমদানী মেয়ে ছুটো কুমকুমেরই মত রং চং মেখে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা টাইট্ আর পরে দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে হাসাহাসি করছে আর ভেতর থেকে পর পর আটখানা রেকর্ড চাপান রেকর্ড প্লেয়ার কিট কর্ণা রেডিও গ্রাম থেকে বিলিতি অরকেষ্ট্রার ঝাঁকালো সুর ভেসে আসছে।

হাপিহুকের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবু কোথায় যেন একটা মিল আছে।

বুধনের আজ মনটা খুব খারাপ। মনে মনে ভাবলো....কুমকুমও একদিন এদের মত হেসে গড়িয়ে পড়তো।

আবার হয়ত খোকন হালদারের কবিরাজী কাটলেট আর চিকেন রোষ্টেরাজীর পাকা বন্দোবস্ত হবে...আবার এদের খাতায় কমিশনের টাকা উপরে উঠবে।

কুমকুমের কথাগুলো মনে পড়ে গেল—হয়ত এরাও একদিন কুমকুমের মত ব্রণ হয়ে ফিমিয়ে পড়বে তারপর একটু একটু করে এদেরও আশা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। তখন আবার হয়ত নতুন মেয়ে আসবে ঐ একই ভঙ্গিতে হেসে হেসে তারাও নিজেদের পায়েই চলে পড়বে।

বুধনের আজকে আর দোকানে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না।

ফুটপাথের রেলিং-এ হেলান্ দিয়ে অলসভাবে বুধন দূর থেকেই দেখতে লাগল ... ...

হাপিহুকের নিয়ন্ সাইন্ দেওয়া নতুন সাইনবোর্ডটার জলন্ত লাল অক্ষরগুলো অন্ধকারের মধ্যে একবার জ্বলছে আবার নিভছে ··আবার জ্বলছে···আবার নিভছে।

• • • •

"গোলাপটি-যেমন টক্‌টকে লাল তেমনি মিষ্টি তার গন্ধ। ক'দিন ধরে ঘরটি যেন ঝলমল করতে লাগলো। হঠাৎ একদিন দেখা গেল গোলাপটির পাপড়িগুলি শুকিয়ে মেঝেতে ঝরে পড়ে আছে।"

আকাশ লিপি

সমর বসু

কথাটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারলনা মনোরমা। অথচ কয়েকদিন ধ'রে কত চেষ্টা ক'রে কথাগুলো মনে মনে তৈরী ক'রে রেখেছিল। কল্যাণের সঙ্গে দেখা হ'লে সর্বপ্রথম তাকে এই সুসংবাদটা দেবে।

কিন্তু কল্যাণ আসতেই সব যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল। কল্যাণের দৃপ্ত মুখের দিকে চাইতেই ওর সুন্দর বড় বড় চোখ দু'টোর ওপর দৃষ্টি পড়তেই কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়ল মনোরমা। কোনও কথাই বলতে পারলনা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে একপাশে স'রে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্যাণ জিজ্ঞেস করল,—কী, অমন থম্‌থমে কেন? কোন পরীক্ষা হ'চ্ছে? আর ক'টা পেপার বাকী?

চোখ না তুলেই মনোরমা উত্তর দিল,—এখনও তিনটে বাকী। ব'লেই একটু হাসল। তারপর বলল,—এখানে থাকতে কিন্তু আর ভাল লাগছেনা। পরীক্ষা শেষ হ'লে বাঁচি।

—সে কি রে! এরই মধ্যে শহর অরুচি হ'য়ে গেল। এখনও তো দু'বছর থাকতে হবে!—অবশ্য যদি পাশ করিস।

মনোরমা আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল,—অরুচি হয়নি। তবে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে! মনে হচ্ছে এখানে থাকতে গেলে সব সময় বোধ হয় যুদ্ধ করতে হবে। এটা চাই, ওটা চাই,—নইলে এই করব, তাই করব। শুনে শুনে কান ঝালাপালা। রাস্তায় বেরুলেই দেখি,—মানুষগুলোর কী ছুটোছুটি। সবাই যেন দিশাহারা। পথে যেমন গাড়ির ভীড় তেমনি মানুষের। সবাই যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।

—বাঃ, বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো! শহরে এসে এই ক'বছরের মধ্যেই তোর অনেক উন্নতি হ'য়ে গেছে দেখছি!—মানুষগুলো যন্ত্রণায় অস্থির!—বাঃ চমৎকার কথা! কিন্তু তাদের যন্ত্রণাটা কিসের বলতো?

—অতশত জানিনা! যা' মনে হ'য়েছে তা-ই বললাম।

—আমিও তো তাই জানতে চাইছি,—ওদের যন্ত্রণাটা কিসের বলে তোর মনে হয়!

একটু ভেবে মনোরমা বলল,—খানিকটা বেঁচে থাকার, খানিকটা বিলাস।

—অর্থাৎ ওদের চেঁচামিচির সবটাই সত্যি নয়।

—না!—খুব দৃঢ়ভাবে বলল মনোরমা।

যেন অত দৃঢ়ভাবে বলল, তা অবশ্য ও ভেবে দেখেনি।

ভাবল কল্যাণ তবে কিন্তু আনন্দিত হ'তে পারলনা। মনোরমার এই পরিবর্তনের অঙ্গে মনে মনে

সে প্রস্তুত ছিলনা। নায়মা আর পাঁচটা মেয়ের মত সিনেমা দেখে, সিনেমার পত্র-পত্রিকা প'ড়ে, হাল্‌কা আলাপ-আলোচনার মধ্যে সময় কাটাবে, এইটাই বোধহয় আশা ক'রেছিল কল্যাণ। ওর কোনও জীবন-জিজ্ঞাসা থাকবেনা, থাকবেনা কোনও গভীর উপলব্ধির দৃঢ়তা। মনোরমা কোনও প্রত্যয়ের প্রতি তিষ্ঠিষ্ঠ হ'বেনা। সাদামাটা জীবন যাপন ক'রে মনোরমা খুশী থাকবে। এই-ই ছিল কল্যাণের প্রত্যাশা। তাই এত অল্পকালের পরিচয়ে সহসা জীবন সম্বন্ধে ওর দৃঢ় মন্তব্য কল্যাণকে উদ্বিগ্ন করল।

—কী অত ভাবছ কল্যাণদা?—মনোরমা খুব সহজ গলায় প্রশ্ন করল।

কল্যাণ কিন্তু ততখানি সহজভাবে উত্তর দিতে পারলনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপরও কিছুক্ষণ ভাবল, ভেবে বলল,—ভাবছি তোমার এই অদ্ভুত কথাবার্তার কথা। এ-সব কথা শিখলে কোত্থেকে?

মনোরমা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ 'তুই' ছেড়ে একেবারে 'তুমি'তে প্রমোশন,—ব্যাপার কি বলতো।

কল্যাণ মনোরমার প্রগল্‌ভতা লক্ষ্য ক'রে একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। বলল,—কলেজের দুয়ার পার হ'লেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় গিয়ে হাজির হবে। আর সেখানে তো আমরা সমগোত্রীয়। অর্থাৎ শিক্ষক-ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষক;—পরস্পর বন্ধু। সুতরাং সেখানে পৌঁছবার আগে থেকেই মনটাকে তৈরী করবার চেষ্টা করছি। তাই 'তুই' না ব'লে বললাম—'তুমি'। কিন্তু ব'লে বোধ হয় ভাল করিনি।

—কেন?—অতখানি মর্যাদা পাবার যোগ্যতা আমার নেই বুঝি! না তুমি ধরে নিয়েছে যে, কলেজের দুয়ারই বোধহয় পার হ'তে পারবোনা! তা' যদি হ'য়ে থাক তো তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে আমার মত হ'ল, পাশ আমি করবই, কিন্তু আর পড়বোনা। সুতরাং তোমার কাছ থেকে মর্যাদা পাবার আশা আমি করিনা।

কল্যাণ একটু বিব্রত বোধ করল। তাড়াতাড়ি বলল,—আমি তো মর্যাদার কথা বলতে চাইনি। আমি তো জানি,—মর্যাদা দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। কেননা,—তখন এই মর্যাদা বোধটাই ব্যবধানের প্রাচীর হ'য়ে দাঁড়ায়। দু'জনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে।

—বিচ্ছিন্নতাকে অত ভয় কর কেন?

কল্যাণ অবাক হয়ে তাকাল মনোরমার দিকে। মনোরমার মুখখানা খুব গম্ভীর বলে মনে হ'ল। একটু আগে যে উজ্জ্বলতা তার সমস্ত মুখমণ্ডলে জলজল করছিল, নিমেষে কোথায় যেন তা' মিলিয়ে গেল।

—তুমি কি সিন্সিয়রলী বলছ! না ঠাট্টা করছ!—কল্যাণ ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করল।

মনোরমা হাসি চেপে বলল,—আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে,—যে, ঠাট্টা করছি। আর এ-সব বিষয় নিয়ে কি ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে!

—কেন চলেনা! সব বিষয় নিয়েই ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে, যদি পরস্পরের সম্পর্কটা অনুকূল হয়।

—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিরকম, তা একটু বিষদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে আমায় বুঝিয়ে দাওনা কল্যাণদা। এবং ভবিষ্যতে সে-সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন হতে পারে কিনা, সে-টাও ব'লো।

কল্যাণ ভেবেই পেলনা এখন সে কী বলবে। মনোরমার এই অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে কল্যাণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই ক'বছরেই এতখানি পরিবর্তন কি ক'রে সম্ভব!

বছর চারেক আগে মনোরমা কলকাতায় এসেছে। মাঝে মাঝে প্রতি বছরই সে যেতে গিয়েছে। একটানা পুরো একবছর বোধহয় কখনও সে এখানে থাকেনি। কলেজে ভর্তি হবার সময় বারবার বলেছিল,—কলকাতায় আমার একটি দিনও কাটাতে ইচ্ছে করেনা। বলেছিল,—আমরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ,—শহরে আদব-কায়দা বুঝিনা। সহ্যও করতে পারিনা। অথচ তোমরা আমাকে জোর ক'রে কলেজে ভর্তি ক'রে দিচ্ছ: আমাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে কেন যে তোমাদের এত মাথাব্যথা তাও বুঝিনা। গ্রাজুয়েট হ'লে কি পাঁচটা হাত-পা বেরুবে, না তোমরা আমাকে মাথায় তুলে নাচবে। লেখাপড়া না শিখে তোমাদের যা অবস্থা হ'য়েছে, লেখা-পড়া শিখে আমারও ঠিক সে-ই অবস্থাই হবে। দু'বেলা হাড়ি ঠেলতে হবে,—আর নীলষষ্ঠী, রামনবমী, বীরাষ্টমীর ব্রত পালন করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বে। আসলে তোমরা চারবছরের জন্যে আমাকে নির্বাসন দিতে চাও। তাইতেই যদি তোমরা সুখ পাও, তাহলে তাই হোক! চারবছরের জন্যে 'বনবাসে' অর্থাৎ 'শহরবাসে' গিয়ে তোমাদের সবাইকে আমি সুখী করব। কিন্তু মনে থাকে যেন তারপর একদিনের জন্যেও আমি কলকাতায় থাকবো না।

—সে কি এম্. এ. পড়বি না?—কথাগুলো বলেছিল মনোরমার কাকীমা!

—মনোরমা চুপ ক'রে ছিল।

ঠিক সেই সময় কল্যাণ বলেছিল,—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। অর্থাৎ মনোরমা এম্. এ. পাস না করে কলকাতা থেকে ফিরবে না। সুতরাং আরও দু'বছরের জন্যে ওকে 'বনবাস' দেওয়া হোক!

কল্যাণের এই প্রস্তাবে মনোরমা হাসতে হাসতে বলেছিল—কলকাতায় থেকে থেকে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে কল্যাণদা, নইলে শুধু দু'বছরের জন্যে তুমি আমায় কলকাতায় থাকতে বল।

কল্যাণ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল,—কেন, তুই বুঝি আরও বেশীদিন থাকতে চাস।

মনোরমা চোখ টিপে মৃদু হেসেছিল।—কোনও উত্তর দেয়নি।

আর সেই মুহূর্তেই কল্যাণের মনে পড়ে গিয়েছিল যে সে কলকাতারই অধিবাসী।

তখন কল্যাণ মনোরমাকে বুঝতে পারত। কিন্তু আজকের মনোরমা কল্যাণের সম্পূর্ণ অপরিচিতা। শুধু তাই নয়, কেমন যেন রহস্যময়ী।

কল্যাণ ভাবল,—অতীত দিনের কথা উত্থাপন করে মনোরমাকে সেই পুরোণ জীবনে যদি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ওকে বোঝা আর শক্ত হবে না। এবং ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনের হেতুও বোধহয় আবিষ্কৃত হবে।

ভাবতে ভাবতে কল্যাণ বলল,—তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সেটা তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবে তা যদি সত্যিই তুমি ভুলে গিয়ে থাক, তাহলে তোমায় সেই অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়!

মনোরমা হাসতে হাসতে বলল,—অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না,—কেউ ভোলে। তাই যাওনা কল্যাণদা, আমাকে স্মরণ করিয়ে যাও। আগেকার কথা আমি সব ভুলে গেছি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছি। প্রতিদিনই আমি যেন নতুন ক'রে জন্মাচ্ছি। কেন এমন হয় কল্যাণদা তোমারও কী মনে হচ্ছে না যে, আমি অনেক বদলে গেছি।

মনোরমার ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি তখনও লেগে আছে।

কল্যাণ সেই দিকে তাকিয়ে বলল,—তোমার এই পরিবর্তনের পরটাই মিথ্যে। তুমি শুধু চেষ্টা ক'রে নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছ। এবং কেন তা চাইছ, তা আমি জানি বলে আমার বিষাদ।

মনোরমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। তুমি অধ্যাপক, আর আমি এখনও ছাত্রী। তাই আমি নিজেকে সংযত করলাম। নইলে—

—নইলে কি, তুমি আমার অপমান করতে?—কল্যাণের মুখের রেখা সহসা বিকৃত হ'য়ে উঠল।

মনোরমা বুঝতে পারল,—কল্যাণ ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল—আমি ভাবতেই পারিনি এতে তুমি রাগ করবে। অধ্যাপক না-ও যদি হ'তে, যেহেতু এখনও আমি তোমাকে দাদা ব'লে ডাকি—সেই হেতুই অপমান যে তোমায় আমি করতে পারিনা, তা তো তুমি ভাল ক'রেই জান। তবে কেন তুমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলে। এ থেকে কিন্তু তোমার আর একটা পরিচয় আমার কাছে আর গোপন রইল না। তুমি ধরা প'ড়ে গেলে।

কল্যাণ কোনও ক্রমে নিজেকে সংযত ক'রে বলল,—উত্তেজিত? না, না, উত্তেজিত আমি হইনি। তোমার কথা বলার ভঙ্গী আমার ভাল লাগছিল না, তাই হয়তো একটু বিচলিত হয়েছিলাম। সে যাইহোক, আমার কি পরিচয় আবার তোমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

মনোরমা বলল,—সে কথা এখন বলবোনা। এখনও তুমি পুরোপুরি শান্ত হওনি। ব্যস্ত হবার দরকার নেই, ধীরে ধীরে সব কথাই আমি বলব। কদিন ধরে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। আজ যদি না আসতে তাহলে, আরও দু'একদিন অপেক্ষা করে তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। কেন না তোমাকে সবকথা বলা দরকার। আজও আমি তোমাকে সেই কথা বলার জন্যেই তৈরী হ'য়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এখনও তা বলা হ'ল না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

—কেন? আমার মুখে কি Prohibition-এর নোটিশ টাঙানো ছিল—!

—না, তা নয়!—মনোরমা গম্ভীর হ'য়ে বলল।

কল্যাণ তা লক্ষ্য ক'রল। মনোরমা এই মুহূর্তে ইচ্ছে ক'রেই উচ্ছল হ'তে চাইছে না। তবুও কল্যাণ পরিহাস ক'রে বলল,—আমি অধ্যাপক বলে বুঝি আমায় করুণা করতে ইচ্ছে হল।

মনোরমা এ-কথার জবাব না দিয়ে বলল,—এখন আমার মনে হচ্ছে কথাগুলো আমি বলতে পারবো। কেন না, সেই কথাগুলো যতই মর্মান্তিক হোক না কেন, তোমার কাছে দুঃসহ হবে না। আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরিস্থিতিটা অনেক সহজ করে ফেলেছি। বক্তব্যের মধ্যে যদি কোথাও কঠোরতা থাকে, তাহলে তার আঘাতটা আর আকস্মিক বলে মনে হবে না।

কল্যাণ বলল,—মনু, আজ কিন্তু তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। ঐসব গুরু গম্ভীর কথাগুলো তোমার কচি মুখে মানায় না। তা ছাড়া তোমার আমার সে সম্পর্কও নয়।

—কাকীমার চিঠি পাবার পর, সেই সম্পর্কের কথাই তো আমি নতুন ক'রে ভেবে দেখেছি। এবং সেই কথাইতো আজ বলবো বলে ঠিক ক'রেছি। কিন্তু তুমি যে এখনও শান্ত হলে না।

—বেশ, বল! আমি ধীর ভাবে সব কথা শুনবো। একটুও প্রতিবাদ করবোনা।

—অবশ্যই করবে!—বলেই মনোরমা ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে এল আশেপাশে কেউ আছে কি না।

তারপর ঘরে এসে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—আর মাত্র বাইশ মিনিট সময় হাতে আছে, এরই মধ্যে আমাকে সব কথা বলতে হবে। সুতরাং আর দেরি নয়।

—না, আর একমুহূর্ত দেরি নয়। কল্যাণ একটা সিগারেট ধরালো।

মনোরমা একবার কল্যাণকে দেখে নিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে বলল,—কি উদ্দেশ্যে কাকীমা আমাকে কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়েছিল, তা আজ আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। কিন্তু কাকীমার উচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতার সাধ্য আমার নেই।

—ঠিক বুঝলাম না! আরও পরিষ্কার করে বল।

—না বোঝবার ভান করোনা কল্যাণদা! তোমার বয়স হয়েছে। তুমি একটা নামকরা কলেজের অধ্যাপক! সর্বোপরি তুমি একজন জনপ্রিয় আধুনিক কথাশিল্পী।

—তাতে হয়েছে কি! ঐ গুণগুলো কিংবা দোষগুলো তোমার হেঁয়ালী বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারচেয়ে তুমি বরং আরও একটু সহজভাবে বল, যাতে ক'রে আমি অর্থাৎ তোমার কল্যাণদা, (অধ্যাপক, কিংবা সাহিত্যিক কল্যাণ রায় নয় তা অনায়াসে বুঝতে পারে। তোমার ভাষণের কি কোনও Mind-easy নেই। তুমি কি আরও একটু সহজ হ'তে পারো না মনোরমা?

মনোরমা মৃদু হেসে বলল,—তোমার আজ কি হয়েছে বলতো এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গে তুমি যেন অতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছ। আমি কি সত্যিই অনেক বদলে গেছি।

—বাঃ, এবার উল্টো চাপ। আমি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছি না তুমি।

মনোরমা চুপ করে রইল।

—সত্যিই তুমি অনেক বদলে গেছ মনোরমা।—একটু থেমে কল্যাণ ভারাট গলায় বলল—যত বারেও আমি এসেছিলাম,—তখন তোমায় এতখানি 'সিরিয়স' হ'তে দেখেনি। তখনও তোমার আমার চিরপরিচিত মনকেই আমি দেখেছিলাম।

মনোরমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল: তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল,—তুমি একটু ব'সো। আমি 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট'-এর কাছ থেকে একটু সময় ভিক্ষা করে নিয়ে আসি। নইলে হোষ্টেলের নিয়মে এখনই তোমায় বিদায় নিতে হবে। অথচ আমার কোন কথাই এখনও বলা হ'লনা।

কল্যাণ তার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল।

প্রায় দশবছর আগে কল্যাণ প্রথম দেখেছিল মনোরমাকে। সেই বছরই এল. এস. পরীক্ষা দিয়ে কল্যাণ পিসিমার সঙ্গে তাঁর শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। মনোরমা তখন গ্রামের স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ে। বয়স বোধহয় নয় কিংবা দশ।

সেই সময় প্রায় মাসখানেক ওদের ওখানে ছিল কল্যাণ। সেই তিরিশ দিনের মধ্যেই একরাত্তি মনোরমার সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। মনোরমার সান্নিধ্যে কল্যাণের নবোন্মেষিত যৌবন-চেতনা আনন্দিত হয়েছিল। শিহরিত হয়েছিল বার বার।

তারপর অনেকবার ওদের ওখানে গিয়েছে কল্যাণ। কিছুদিন থেকেছে, আবার ফিরে এসেছে।

কিশোরী মনোরমার সমস্ত অস্তিত্ব উন্মুখ হয়ে থাকত কল্যাণের আগমনের প্রত্যাশায়। দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে কল্যাণ তা উপলব্ধি করত।

তারপর একটু একটু ক'রে আষাঢ় আকাশের মেঘের মত মনোরমা কল্যাণের জীবনকে নতুন ভাবনায়, নতুন অনুভবের রমণীয়তায় পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। একটা নতুন মানুষের অস্তিত্ব নিজের দেহ-চেতনার মধ্যে উপলব্ধি ক'রেছে কল্যাণ। সে-মানুষের প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তকে রমণীয় ক'রে তুলেছে, মনোরমার একটু চাহনি, একটু হাসি, একটু কাছে আসা, একটু স্পর্শ। কল্যাণ তার মনের মণিকোঠায় একটি মধুর আশাকে আশ্রয় ক'রে দিন গুনেছে। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর অতিবাহিত হ'য়েছে; কল্যাণ আজ তাই একটু অধীর, একটু যেন বেশী চঞ্চল।

অপর দিকে মনোরমা আগের চেয়ে অনেক বেশী স্থির, অনেক বেশী অচপল।

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন।

কল্যাণ কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলনা মনোরমা কি চায়। পিসিমার চিঠি থেকে কী জানতে পেরেছে মনোরমা। যা জানতে পেরেছে, সেটা কি এতদিনও জানতোনা! এত দিনের এত নিবিড় মেলামেশা, সে-সবই কি তার কাছে মিথ্যে হ'য়ে গেল। এতদিনের এত গভীর বন্ধুত্ব, সে কি আর স্বীকার করেনা।

কল্যাণ আবার একটা সিগারেট ধরালো।

একঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে কল্যাণদা! সুতরাং তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ধীরে-সুস্থেই সব আলোচনা করা যাবে।—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো মনোরমা।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কল্যাণ বলল,—আলোচনা করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। তবে তুমি যা বলতে চাইছিলে, তাই একটু পরিষ্কার ক'রে বল, যা'তে আমি সব বুঝতে পারি।

চেয়ারে বসেই মনোরমা সুরু করল,—

আমার কাকীমা যিনি, তিনিই তোমার পিসিমা। তুমি তাঁর ভাইপো, আর আমি ভাগ্নেবৌ। তাঁর ইচ্ছা তুমি তাকে কাকীমা বলে ডাক, আর আমি ডাকি পিসিমা ব'লে এ-ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ করতে গেলে আমাদের বিয়ে হওয়ার দরকার। এবং তাই তিনি চান। শুধু তিনি নন, আমার মায়েরও ইচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক!

কল্যাণ ছাইদানে সিগারেটটা গুঁজে রেখে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই মনোরমা বলতে লাগল,—কাকীমা আরও লিখেছেন,—যে, তুমি নাকি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবেনা। তাই আমার কলকাতায় আসা; কলেজে ভর্তি হওয়া, এবং গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে তপস্যা করা।

একটু থামল মনোরমা।

তারপর গলা আরও গম্ভীর ক'রে বলল,—কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-কাকীমার আশা আমি পূর্ণ করতে পারবো না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ-সবের কিছুই জানতাম না। তাঁরা যে অনেকদিন আগে থেকেই মনে মনে সব স্থির ক'রে রেখেছেন, তা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু বাবার অবর্তমানে আমরা, যেহেতু কাকার উপাশ্রিত অর্থে প্রতিপালিত, সেই হেতু, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত হবে, এতে আর বলার কি আছে! কিন্তু আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্যও জড়িয়ে যাবে ব'লে এ-বিষয়ে তোমাকে আমার সতর্ক ক'রে দেওয়া কর্তব্য ব'লে মনে ক'রেছি। কেননা, তোমাকে আজও আমি ভালবাসি।

শেষের কথাগুলো বলবার সময় গলাটা একটু নরম হ'য়ে গেছল মনোরমার। তাই তাড়াতাড়ি চোখ নিচে দুর্বলতা কাটিয়ে নিয়ে বলল —আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমার মন উঠবে না। এ আমার ধারণা নয়, স্থির বিশ্বাস।

কল্যাণ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শব্দকে হেসে উঠল। ঘরের স্তব্ধ আকাশ যেন ভেঙে খান্ খান্ হ'য়ে গেল।

মনোরমা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল,—অমন ক'রে হেসে উঠলে কেন?

কল্যাণ বলল.—হাসির কথায় আমি যে কাঁদতে শিখিনি, তাই।

কল্যাণের কথাশুনে মনোরমা কিন্তু হাসল না। ঠিক তেমনি গম্ভীর ভাবেই বলল,—তোমার হাসির কারণ পরে শুনবো। আমার কথা আগে শেষ ক'রে নিই।—

তোমার বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ জমা হ'য়ে আছে। অবশ্য, সে-অভিযোগ সবই তোমার লেখা সম্পর্কে। তুমি একজন নামকরা জনপ্রিয় কথাশিল্পী জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে গিয়ে কী যে তুমি সৃষ্টি করছ, তা বোধহয় নিজে তুমি কোনও দিনই ভেবে দেখনি, নইলে আমরা যারা তোমার আত্মীয়-স্বজন, তারা তো ভাবতেই পারিনি, এমন লেখাও তুমি লিখতে পার।

এই চারবছর ধ'রে আমি অনেক বই পড়লাম। বিশেষ ক'রে সাম্প্রতিক কালের বাঙলা গল্প-উপন্যাসের বই। তোমার লেখা একটাও বাদ দিইনি। প'ড়ে কিন্তু খুশী হ'তে পারিনি। তোমাদের ওপর আমার আর ভরসা নেই। তোমাদের লেখায় এমন কিছু পেলাম না, যা আমাদের আনন্দ দিতে পারে। কোনও ধ্যান, কিংবা ধারণাকে তোমরা তুলে ধরতে পারনি। তোমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছ। আজকের এই উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজ তোমাদের ব্যর্থতারই ফসল। কোনও সুদৃঢ় প্রত্যয়কে তোমরা যেমন আশ্রয় করতে পারনি, তোমাদের পাঠক পাঠিকারাও তেমনি কোনও গভীর জীবনবোধের সন্ধান না পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাতে ক্ষতি হ'চ্ছে দেশের ভাবীকালের। কিন্তু সে দায়িত্ব-বোধ তোমাদের নেই। সমাজের এই উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে তোমরা তাই উদ্বিগ্ন হওনা। লজ্জাও পাওনা।

কল্যাণ হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলল,—একস্‌কিউজ্ মী ম্যাডাম্, একটা সিগারেট ধরাচ্ছি।

এক সঙ্গে অনেক কথা বক্তৃতার ভঙ্গীতে ব'লে যাওয়াতে মনোরমাও হাঁপিয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগে একটু দম নিয়ে তারপর বলল—আমাদের দেশ কী হ'তে পারতো আর কী হয়েছে! কত আশা ক'রে কত মানুষ নির্যাতন সহ্য করেছে,—প্রাণ বলি দিয়েছে,—কিন্তু বিনিময়ে যা পেয়েছে, তা না পেলেই বোধহয় ভাল হ'ত।

দেশ স্বাধীন হবার পর বাইরের সম্পদ হয়তো অনেক বেড়েছে—কিন্তু ভেতরের বৈভব বলতে আর বোধহয় কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভেতরের ঐ সম্পদ গ'ড়ে তোলার কারিগর তোমরা। তোমাদের এই ব্যর্থতার কি কৈফিয়ৎ যে তোমরা দেবে, তা আমি ভেবেই পাইনা।

'Technique' এর কারিকুরি নিয়ে শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে,—Realistic হ'তে গিয়ে শুধু দেহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইলে, Material-কে আঁকড়ে ধ'রে প্রচার করলে যান্ত্রিক মতবাদ। তার ঊর্দ্ধে কিংবা তার গভীরে যাবার কোনও চেষ্টাই করলেনা। Dadaism, Surrealism, Existentialism কতই না ভাবনা আমদানী করলে বিদেশ থেকে, কিন্তু যে-সম্পদে আমাদের দেশ এখনও ধন্য, সেই অধ্যাত্ম-জীবনের চৌহদ্দিতে তোমাদের আজও পদার্পণ-ঘটলনা। অন্য 'ism' গুলো যৌবনের ধর্ম আর Spiritualism

বাঙ্কিকোর,—সাধারণ মানুষের এই কৃত্রিম ধারণাকে তোমরা বদলাতে পারবেনা। পারবে কি ক'রে। অধ্যাত্মবাদেই তোমাদেরও যে আস্থা নেই। আশ্চর্য!

বিদেশকে গভীর ভাবে জানলে জাতের সীমা থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু স্বদেশকে একটুও না বুঝলে অজ্ঞানতার অন্ধকার যে একেবারেই ঘোচেনা।

—উঃ, অসহ্য!—কল্যাণ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। সিগারেটটা ছাইদানে না রেখে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল,—পরিশেষে তুমি কি বলতে চাও সেইটাই সর্বাগ্রে বলে তোমার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেল। এই আমার অনুরোধ। আর যদি তা'না করতে চাও, তাহলে দয়া ক'রে অন্ততঃ একটু চায়ের ব্যবস্থা কর, নইলে আমি আর পারছিনা।

মনোরমা মৃদু হেসে বলল,—এখনও পনেরো মিনিট হয়নি এরই মধ্যে তুমি আমাকে আর সহ্য করতে পারছনা, তাহলে বুঝতে পারছ,—আমাকে সঙ্গিনী করলে, তোমার সমস্ত জীবনটাই বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে।—একটু অপেক্ষা কর,—আমি চায়ের কথা বলে আসছি।

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে কল্যাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনোরমার কথাগুলো যেন কোথায় প'ড়েছে ব'লে মনে হ'ল কল্যাণের। কি একটা পত্রিকায় কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। খুব বেশীদিন নয়। বোধহয় গেল হপ্তাতেই—পত্রিকাটা কল্যাণের হাতে এসেছিল। ঐ একটিমাত্র প্রবন্ধ ছিল তাতে।—এবং কল্যাণ তা ভাল ক'রে প'ড়েছিল।—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিক-দায়িত্ব বোধ'।—লেখকের নামটাও সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিয়েছিল কল্যাণ। সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম। শ্রীভাস্কর না শ্রীবাস্তব এই রকম কিছু হ'বে। সেই ভদ্রলোকই বোধহয় মনোরমার মনের মধ্যে এই দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মনোরমা তো এই কেতাঁজ্ হোষ্টেলে থাকে। পড়ে-শোনা কলেজে। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার অবকাশ কোথায়!

তবুও কল্যাণের সংশয় ঘুচলনা। ভাবল,—যে-কোনও কারণেই হোক শ্রীবাস্তবের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে মনোরমার। শুধু তাই নয় তার ওপর অনুরাগও জন্মেছে। তাই ক্যাণকে সে পূর্বাহ্নেই বিদায় দিতে চায়।

তা'যদি সত্যি হয়, তা'হলে কল্যাণের কিছু করার নেই; মনোরমার মত মেয়েকে জোর ক'রে বিয়ে করা যায়না। পিসিমা যদি পীড়াপীড়ি করেন, তবুও কল্যাণ সম্মতি দেবেনা। মনোরমার এই মন্তব্য অন্ততঃ সত্যি যে, কোনও বিধবা মেয়েকে কল্যাণ বিয়ে করতে চায়না। অন্য যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যায়, কিন্তু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নৈব নৈব চ। কিন্তু তার আগে মনোরমাকে ভাল ক'রে বোঝা দরকার।

বি এসে চা-বিস্কুট আর সন্দেশ দিয়ে গেল। বলল,—একটু অপেক্ষা করুন, চলে যাবেন না যেন, দিদিমণি এক্ষুণি আসবেন।

একগ্লাস জল নিয়ে মনোরমা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল। বলল,—আগে মিষ্টি খেয়ে নাও, তারপর চা খেও। আমি চা-টা চাকা দিয়ে রাখছি।

দু'টো সন্দেশ একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে কল্যাণ বলল,—বাকী দু'টো তোমার জন্যে রইল। তবে এটা ঠিক হ'লনা সদ্ভাবলে গদ্গদ্ভো করবার রীতি থাকলেও, এক্ষেত্রে আমার উচিত ছিল এক প্যাকেট সন্দেশ নিয়ে এসে তোমায় উপহার দেওয়া। যাক্, তা যখন হ'লনা, তখন আর কি করা।

মনোরমা ভ্রূ কুঁচকে কল্যাণের দিকে তাকাল। কিন্তু বলল না :

চা খাওয়ার পর কল্যাণ বলল,—কই মিষ্টি মুখ করলেনা !

—মুখ দিয়ে মিষ্টি কথা চেষ্টা ক'রেও যখন বার করতে পারছিনা, তখন আর মিষ্টি মুখ ক'রে লাভ কি !

—মিষ্টি মুখ অন্য কারণে ! সে-কথা পরে বলবো। আগে তোমার বক্তব্য শেষ ক'রে ফেল।

প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে মনোরমা বলল,—বক্তব্য আর বিশেষ কিছু নেই। একটা অনুরোধ আছে সেটা বলেই শেষ করব।—আমার মত মেয়ের পক্ষে ভবিষ্যতে কারও গৃহিণী হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার অনুরোধ—তুমি, মা এবং কাকীমাকে জানিয়ে দিও যে তুমি অন্যত্র বিয়ে করতে ইচ্ছুক। বাস্, আর বেশী কিছু বলতে হবেনা।

কল্যাণ অস্পষ্ট গলায় বলল,—তা না হয় দিদিমাকে বললাম, কিন্তু বিয়েতে তোমার আপত্তিটা যে কেন তাতো জানতে পারলাম না।

মনোরমা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল,—আপত্তির হেতু কি হ'তে পারে বলে তোমার মনে হয়।

কল্যাণ বলল,—দৈহিক, মানসিক, আর্থিক,—কোনওটাই তো বাধা বলে মনে হ'চ্ছেনা।

মনোরমা হাসল। হাসিমুখেই কল্যাণের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল,—আমরা পরস্পরের দাসদাসী হতে চাইনা। অথচ বিয়ে হলে তাই হ'তে হবে।

কল্যাণকে বিস্ময় প্রকাশ করবার সুযোগ না দিয়েই মনোরমা বলতে লাগল,—আমার বিশ্বাস, বিয়ের পর পুরুষের কাছ থেকে নারী পায় নিরাপত্তা, তার যৌবনের দেহগত কতকগুলো কামনার পরিতৃপ্তি এবং মাতৃত্ব। এইগুলো পায় বলেই মনে মনে পুরুষের কাছে নিজেকে দাসী হিসেবে সমর্পণ করে। তেমনি পুরুষও নারীর কাছ থেকে কতকগুলো সুখ-সুবিধে পায়। তাছাড়া অপরের প্রতি প্রভুত্ব করবার যে বৃত্তি পুরুষের মজ্জাগত, বিয়ের পর নারীকে আপন কর্তৃত্বাধীনে পেয়ে পুরুষের সে-বৃত্তি চরিতার্থ হয়। সবশেষে আছে Sexual pleasure. স্ত্রীর কাছ থেকে এতগুলো পাওনা অনেক সহজে লাভ করা যায় বলেই পুরুষেরাও স্ত্রীর আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত হয়। মানুষের এই বন্ধন মানুষকে সমাজবদ্ধ ক'রেছে সত্যি কিন্তু সভ্যতে আবিষ্কার করতে পেরেনি।

কল্যাণ হঠাৎ শুকে বাধা দিয়ে বলল,—বিয়ের প্রয়োজনীয়তাও তাহ'লে তুমি স্বীকার করনা।

– না! প্রজাবৃদ্ধি করাই যখন বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন বর্তমানে আমাদের দেশে তার কোনও প্রয়োজন নেই। বিবাহের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে বলেও আমি মনে করিনা।

কল্যাণ বুঝতে পারল,—স্ত্রীত্বের প্রভাব মনোরমার চেতনার প্রতিটি স্তরকেই আবিষ্ট ক'রে দিয়েছে। স্ত্রীত্বের যে-ই হোকনা কেন,—তার এই সাফল্যকে কল্যাণ মনে মনে ঈর্ষা করল। পাছে মুখের রেখায় তা' প্রকাশ পেয়ে যায় এই ভয়ে সমস্ত পরিবেশটাকে খুব সতর্ক ভাবে নেবার চেষ্টা করল কল্যাণ।

– কি ধরনের মানুষকে তুমি শ্রদ্ধা কর।—হঠাৎ কল্যাণ একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ক'রে বসল।

মনোরমা তবুও বিচলিত না হ'য়ে বলল,—মানুষের মূল্য, কতখানি শিক্ষা সে অর্জন ক'রেছে তার উপর নির্ভরশীল নয়। কত সম্পদের সে মালিক, কত গভীর তার পাণ্ডিত্য, সমাজে তার কত মর্যাদা, কত খ্যাতি, এ-সবের ওপরও মনুষ্যত্ব নির্ভর করেনা। মানুষের মূল্য নির্ভর করে তার অন্তর সত্তার বাহ্যিক পরিচয়ে। সে কি করে,—সেটা বড় কথা নয়, সে কি হয়েছে,—সেইটাই বিবেচ্য। যে-মানুষ পশু-মানুষকে অতিক্রম ক'রে পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠেছে, তাকেই আমি শ্রদ্ধা করি।

কল্যাণের মনেহ'ল মনোরমার কথাগুলো বড় বেশী অ্যাকাডেমিক সেই জন্যে একটুও আন্তরিক নয়। কল্যাণ ভাবল, কতকগুলো গালভরা অর্থহীন শব্দ লিখে লিখে মুখস্থ ক'রে সেইগুলোই এখন, কোনও অদৃশ্য গুরুর নির্দেশে, আবৃত্তি করছে মনোরমা। বিরক্ত হ'য়ে উঠে পড়ল কল্যাণ।

মনোরমা তাকে বসতে অনুরোধ করল।

এখনই উঠছ কেন কল্যাণদা। এখনও তো হাতে অনেক সময় রয়েছে। আমি যা বললাম তার ওপর তুমি তো কোনও মন্তব্য করলেনা।

- মন্তব্য করবার কিছু নেই।—বলতে বলতে কল্যাণ আবার বসে পড়ল। সাহিত্য সম্বন্ধে তোমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমারও ধারণা সাহিত্যিকদের দায়িত্ব বোধ নেই। একটা Vicious cycle এর মধ্যে লেখক পাঠক এবং প্রকাশক এমন বিশ্রীভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যে তার থেকে মুক্তি পাবার কোনও চেষ্টাই তারা করতে পারছেনা।

পারছেনা নয়, করছেনা। মনোরমা বাধা দিয়ে বলল। কিন্তু আমরা।

এবার আমরা পাঠক-পাঠিকারা সচেষ্ট হব। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করব, দরকার হলে নিজেরাই পত্রিকা বার করে তোমাদের লেখার ধরণ বদলাতে বাধ্য করব। অথবা তোমাদের অন্ন ঘোচাবো। মোটকথা তোমাদের আর আমরা মেনে নেবোনা।

কল্যাণ সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তোমরার উক্তি আমি অভ্রান্ত বলে মনে করিনা। তবে বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করতে চাইনা; কেননা, আমার সঙ্গেই তোমার বিবাহ হওয়ার কথাছিল।

যাইহোক, তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল, শ্রীযাত্তবের কথা। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনিও সেদিন আমাকে বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন, আজ তোমার মুখেও যেন সেইসব কথাই শুনলাম। শ্রীযাত্তবের সঙ্গে তোমার পরিচয় কত দিনের?

কল্যাণ ভেবেছিল শ্রীযাত্তবের নাম শুনে মনোরমা চমকে উঠবে! কিন্তু আশ্চর্য্য মনোরমা একটুও বিচলিত হল না। হাসি চেপে বলল,—প্রায় তিন বছর। তাঁর কাছ থেকেই তো আমি সব শিখেছি! নইলে আমার সাধ্য কি ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের কাছে ঐসব মন্তব্য করি। এ-প্রসঙ্গে আরও একটা কথা তোমায় জানানো হয়নি। আসলে সেইটাই ছিল আমার মূল বক্তব্য। একচল্লিশ সালে, আশীবছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ বললেন,—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' অথচ আমাদের কী দুর্ভাগ্য, যে তাঁর মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যেই তাঁর উত্তর সূরীরা সে-কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। তাই তাঁদের রচনায় দেখি ক্লেদ বিকৃত মানুষের মিছিল। আত্ম-অনুসন্ধানের নামে তারা যা কিছু অনুসন্ধান করে, সেগুলো সবই দেহের সমস্যা, কিংবা মনের, মন বা দেহের উর্দ্ধে চেতনার যে আরও অনেক স্তর আছে একথা তো লেখকের জানা দরকার, তা না হলে পাঠকেরা তা জানবে কি করে?

তুমি সাহিত্যিক তদুপরি তুমি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক তাই তোমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি। সবল-সুস্থ-বলিষ্ঠ মানুষকে তোমরা ভুলে থাকতে পারলে না কেন?

কল্যাণ চুপ ক'রে রইল।

মনোরমা বলল, তুমি হয়ত বলবে,—যুদ্ধ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বেশ বিভাগ এবং আরও অনেক রকমের সামাজিক বিপর্য্যয় মানুষকে ক্লেদ করে ফেলেছে, সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি যদি ফুটে উঠে তাতে আশ্চর্য

হবার কি আছে। কিন্তু আমি বলব—মানুষের এই বিশ্বাস সত্য নয়, মানুষের এই বিকৃতি তার স্বভাবের স্বরূপ নয়,—সাময়িক দুর্ঘটনা মাত্র। যা চিরকালের, সাহিত্য তো তারই বিশ্বাসী। কিন্তু তোমরা তার সন্ধান দিলে কই?

কল্যাণ মৃদুহেসে বলল -আমাদের অক্ষমতা দূর করবে আগামী কালের সাহিত্যিকেরা। আশাকরি শ্রীমান্তব তাদের অন্যতম।

—তোমার আশাপূর্ণ হোক,— বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা।—বলেই আর একটা মিষ্টি মুখে তুলে নিল মনোরমা।

কল্যাণ বলল,—এই জন্যেই তো বলছিলাম, মিষ্টিমুখটা আমারই করানো উচিত ছিল। বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীর গলায় বলল,—বিধাতার কাছে কোনও দিনই কোনও প্রার্থনা জানাইনি। আজ জানাচ্ছি,—বিধাতা তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করুন।

—অর্থাৎ!—ঘাড় বেঁকিয়ে প্রশ্ন করল মনোরমা।

—অর্থাৎ—শ্রীমান্তবের মধ্যে তুমি তোমার জীবনের সার্থকতা যেন আবিষ্কার করতে পার,—এই প্রার্থনা।

—কল্যাণদা, সত্যিই তুমি আমার লেখা পড়েছ? এতক্ষণে সুসংবাদটা দিতে পারল মনোরমা।

—তোমার লেখা।

—হ্যাঁ! শ্রীমান্তব আমারই ছদ্মনাম।

—মনু! তুমি! তুমিই লিখেছ!—না, তোমাকে আর কিছু বলার নেই।—

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মনোরমাকে দেখতে লাগল কল্যাণ।

মনোরমা একটু অস্বস্তি বোধ করল। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল,—আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবছ কল্যাণদা।

কল্যাণ কোনও জবাব দিল না। যেমন চেয়েছিল তেমনি স্থিরভাবে মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মনোরমা বলল,—আমি জানি তুমি কি ভাবছ!

—কি?—মৃদুহেসে জিজ্ঞেস করল কল্যাণ।

—তুমি ভাবছ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কত নিবিড়, অথচ, অথচ—আমি কতদূরে চলে গেছি। কি, তাই না?

কল্যাণ এবারও চুপ করে রইল।

মনোরমা বলল,—মাটি থেকে আকাশ কতদূরে, কিন্তু তবুও তারা কত কাছাকাছি। আকাশের থাকী নিয়েই তো মাটির যা কিছু গৌরব। এ-সত্য তো চিরকালের।

কল্যাণ একটুখানি কাছে এসে তার গলায় বলল,—আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল। তোমার নতুন লেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।

মনোরমা কিছু বলল না। কল্যাণের দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

———

দূরপরবাসে

শক্তিপদ রাজগুরু

বাঙালীর চিরকালের বদনাম সে নাকি ঘরকুনো।

কিন্তু এটা আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে।

ভারতের দূর প্রান্তে অথ্যাত অবজ্ঞাত ঠাঁইও দেখেছি কোন বাঙালীকে, মনে হয়েছে কেউ আজ ভাগ্যের তাড়নে, কতক বা এমনি অজানাকে জানবার আচেনাকে চেনবার মোহেই বের হয়ে পড়েছি আমরা পথে পথে।

ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে দেখেছি বাঙালীর সম্বন্ধে এখনও অশেষ শ্রদ্ধা রয়ে গেছে সেখানকার মানুষের মনে।

তারও কারণ অবশ্যই আছে।

তবু দেখেছি বহু তীর্থে বা দর্শনীয় স্থানে বাঙালী দর্শক বা ভ্রমণকারীর প্রাধান্য। দলে দলে বাঙালীরা এখনও বের হন দেশভ্রমণে। ভারতবর্ষকে চেনবার-তার মহান ঐতিহ্যকে জানবার জন্য তার আগ্রহ চিরন্তন।

প্রধানতঃ মন নিয়ে বাঙালী গেছে দূর দূরান্তরে। ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম, যারা দূর দূরান্তরে গিয়ে বসবাস করেছেন তাঁদেরও দেখেছি দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে সেই প্রদেশের যা কিছু ভালো সেটাকে মন দিয়ে গ্রহণকরে আপনার করে নিয়েছেন, সেই প্রদেশের মানুষের কাছেও আপন জন হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ভাষা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও বাঙালীয়ানা বজায় রেখেছেন।

ডাল ভাত চচ্চড়ি শাক শুক্তো ভাঁটা মাছের ঝোলও খেয়ে থাকেন বাঙালী মতে, পথে ঘাটে বাঙালীকে দেখলে ডেকে আলাপ করেন বাড়িতে গেলে খুশী হন। আতিথ্য সেখানে আন্তরিক।

ভারতের প্রতিটি সহরেই নানা ব্যাপারে বাঙালীরা রয়েছেন। এরা দেশেদেশে বসবাসও করেছেন, অধিকাংশই এদের হয় উকিল ব্যারিষ্টার না হয় ডাক্তার অথবা অধ্যাপক বা লেখক। তাই জনসংখ্যাটা এদের ঘটে, কেউবা বদলির চাকরী নিয়ে যান।

কিন্তু সেখানে গিয়েও সেই দলেই মিশে যান, অর্থাৎ সেই সামাজিক পরিবেশে গিয়ে তিনিও ভুলেযান যে বাংলা থেকে এতদূরে গিয়ে পড়েছেন।

তাছাড়া কালীবাড়ি না হয় দুর্গাবাড়িতো আছেই তাঁদের একটা স্থায়ী আস্তানা, সেই সঙ্গে লাইব্রেরী—খেলাধূলার জায়গা আর একটা নাটক করার মত অস্থায়ী মঞ্চও। বাঙালীর নাড়ির সঙ্গে ওটার যোগ।

রাজধানী দিল্লীতেই দেখেছি তাদের নাটক অভিনয়, নিজেরাই অনেক সময় নাটক লেখেন। নয়াদিল্লী কালীবাড়ির কথা নোতুন করে বলার কিছুই নেই। বিরাট মন্দির অতিথি নিবাস মার্বেল পাথর বসানো হলঘর সংলগ্ন বাগান নাটমঞ্চ দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে। সিমলার শৈলশিখরেও কালীবাড়ির কথা নোতুন নয়; তাছাড়াও দিল্লীতে আর একটি পুরোনো সংস্থা আছে পুরোনো দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব।

ঐতিহ্যময় কান্সিটিউশনের সেই পাথরের বেষ্টনীর কাছেই একটা বাড়ির দোতলার বৃহৎ অংশ জুড়ে লাইব্রেরী—পাঠাগার খেলাধূলোর ব্যবস্থা সবই আছে।

এঁদের মধ্যেই আমার একবার দিন দশেক কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদের মধ্যেও বহু বিদ্বান সংস্কৃতিবান লোক আছেন। উৎসাহী তরুণও দেখেছি যারা সেই উৎসবের ক'দিন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ক্লাবে থিয়েটার হলে রয়েছেন। দিল্লী সহরের সমস্ত সংস্থার সভ্য কর্মকর্তারা এতে অংশের অনুষ্ঠানে আসেন। একটা প্রীতির সম্পর্ক রয়ে গেছে।

ডক্টর গুপ্তুল নামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির অধ্যাপক নিজেও নাটক লেখেন। তাদের নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—বেশ উচ্চমানের নাটক অভিনয় এবং প্রযোজনাশৈলী, যা কলকাতার অনেক তাবড় দলকেও দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।

নিউদিল্লী কাশীবাড়ির নাট্যবিভাগও নামকরা। তাছাড়া নয়াদিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙ্গালীর ছোট বাটো অন্য সংস্থাও আছে। সেগুলোকে শাখা সংস্থাই বলা যেতে পারে। তবে সকলের মূল ওই দুটি প্রধান বেঙ্গলীক্লাব।

…ওই ক'দিন ওখানে থাকবার সময় মনে হয়েছিল কলকাতার ক্লাবঘাতেই আছি। এখান থেকে ন'শোমাইল দূরে আছি তা মনে হয়নি। খানা পুরোপুরি বাঙ্গালী—মেলামেশাও অধিকাংশ ওদের মধ্যেই ওঁদের সব বাড়িতেই বাংলাতেই সব কথাবার্তা ঘরের পরিবেশও তেমনি আর একটা জিনিষ দেখলাম বাঙ্গালীর মানসিক শক্তি—তার হতবুদ্ধির বাংলায় যেন নাচিখান উঠেছে! রকে মোড়ে মোড়ে ওই ড্রেনপাইপপ্যান্ট পরা লিকলিকে ছেলের দল—মেয়েদের মধ্যেও বেপরোয়া কমতে কমতে সীমান্তে এসে ঠেকেছে—চালচলন ও হয়তো বেপরোয়া। ছেলে মেয়েদের আলোচনার বিষয় বস্তুও কানে দেখে—লজ্জায় সরে পালাবেন, মনে হয় বাঙ্গালীর যেন বিরাট একটা অংশকে ঘুনিয়ে আসছে এই বাংলার বুকে তার নিজের ঘরের মধ্যেই চোখেমুখে হতাশার ছায়া মনে শুধু বিক্ষোভ জ্বালা আর ভেঙে ফেলার মত্তা।

কিন্তু ওখানের বাঙ্গালী যুব সমাজকে দেখে মনে হয়ে ছিল যেন বিশ পঁচিশ বছর আগের বাঙ্গালী তরুণদের দেখছি যেমন ছিল আমাদের কলকাতায়।

শালীনতাবোধ দৃপ্ত রুচিবান কর্মঠ একটি যুব সমাজ, যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা রাখে, যারা ভাবে দেশের কথা সমাজের কথা। বৃহত্তের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার কথা। যা বাংলাদেশে আজ প্রায়ই লুপ্ত হতে বসেছে আগামী দিনের অধিকাংশ তরুণের মন থেকে। তবুও এখন বাংলার মফঃস্বল সহরে কিছু অবশিষ্ট আছে এই সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতা মহানগরীতে সেই ঐক্যটা বড় করে চোখে।

বাংলার বাইরের বাঙ্গালী সমাজ এখনও প্রাণ উজ্জ্বল। বাংলাদেশের বুক ভরা গ্লানি আর হতাশার বেড়াজাল থেকে তারা এখনও মুক্তই রয়েছেন।

দিল্লীর এক বন্ধু আমাকে একবার যাবার সময় এখান থেকে কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা নিয়ে যেতে লিখেছিলেন। শুনে কথা, নিয়েও গেলাম ওই বস্তুটি, পৌঁছবার পরই বাঙ্গালী সমাজে ওই দ্রব্য দুটির বিলি হয়ে গেল কারণ দিল্লী অঞ্চলের কাঁচা লঙ্কার তেমন ঝাল আর মিষ্টি গন্ধ নেই, ধনেপাতাও নাকি এখানের মাটিতে অন্য আর গন্ধময়।

… লক্ষ্ণৌ সহরের বাঙ্গালীরা বেশ ভালোই আছেন। সান্যাল পরিবার সেন পরিবার আরও অনেকেই সেখানে সুপরিচিত। তারাও নাটক সঙ্গীত নানা কিছু নিয়েই আছেন। কাজ কারবারও রয়েছে অনেকেরই।

বিদ্বান্ (ডিগ্রেন সাহ্যাল) ওখানের সহরের অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁদের নামে সহরের রাস্তাও রয়েছে, যেমন আছে নিউ দিল্লীতে কোন বিশিষ্ট বাঙালী ডাক্তারের নামে, শুনেছি তাঁর ছেলেরাও আজ কৃতি-চিকিৎসক।

আগ্রা সহরেও একদা বহু বাঙালী অধ্যাপক চিকিৎসক ছিলেন, এখনও আগ্রার প্রবাসী বাঙালী সমাজ ওখানে বিশেষ পরিচিত এবং শ্রদ্ধা ভাজন। এমনকি বাঙালী একজন প্রেমের চিকিৎসক সেখানের একটি বিশিষ্ট ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্ব পদও পেয়েছিলেন তবু তেমনি অমায়িক সজ্জন সাধারণ মানুষের মতই গার্হস্থ্যধর্ম পালন করতেন। তাঁর সন্তানও ওখানকার চিকিৎসক তারা ওখানেরই বাসিন্দা।

বৃন্দাবনের ইতিহাস খুঁজলে দেখাযাবে শ্রীচৈতন্যদেবই ওই বৃন্দাবনের রূপ পরিবর্তনের মূলে, বাংলার প্রখ্যাত কবি—ভক্ত সাধকের দল বৃন্দাবনে যান, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বামী আরও কতজন। পরবর্তীকালে লালাবাবু আরও কত ভক্ত গেছেন সেখানে।

আজও বৃন্দাবনের পথে ঘাটে দেখাযাবে বাঙালীকে। মনে হয় কাশীতে আর বৃন্দাবনে বাঙালী প্রচুর আছেন। বাহ্যিক্য বারানসী আর বৃন্দাবন এখনও বাঙালীর কাছে আকর্ষনীয়। তবে বৃন্দাবনে একদিন সংস্কৃত কাব্য এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত যে কালজয়ী মহাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল আজ তা আর হয়না।

বাঙালী আজ সেখানে খুরিকু একমাত্র বাঙালীর নাম বহন করে গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন।

শিক্ষা দীক্ষায়—একদিন এলাহাবাদের বাঙালী সমাজ উত্তর প্রদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল আজও তারই পরিচয় বহন করে চলেছে সেখানের বাঙালীরা।

দুর্গাপুজোর সময় ভারতের বিভিন্ন দূর দূরান্তের সহরে বাঙালীরা একটা করে জমায়েত করেন। কথাটা আমাকে জানিয়েছিলেন পুণার ফিল্ম ইন্‌স্টিটুটের একজন অধ্যাপক।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সহর পুণা—নীল পাহাড়ের সীমারেখা একে ঘিরে আছে মধ্যমণি কালোজল ওরা মূলী আর মুঠি নদী,…পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর উপত্যকায় সুন্দর সাজানো সহর একদিকে মাথা তুলেছে একটি পাহাড় তার শীর্ষে শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির। তারই নীচে সমতল উপত্যকায় সাজানো বাড়িগুলো—সুন্দর রাস্তা; বিজয়নগর কলোনী, বর্তমানে ওখানে বাস করছেন প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাস সূত্রে সেখান থেকে বোম্বেতে দীর্ঘদিন থাকবার পর পুণায় বাস করছেন।

এপারে প্রত্যুত্তরোতে সেদিন ঘুরছি, এক অধ্যাপক বন্ধুর খোঁজে। রাস্তাটা ঠিক করতে পারছিনা—কেবল চৌপল আর চৌপল পায় হয়ে পটবর্ধন বাংলোর সন্ধান করছি হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়ালাম।

—আপনারা বাঙালী।

পরিচয় হল পুণা ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটে ইনি অধ্যাপনা করেন, বাংলা ছবির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এখানে, পরে ওখানে গেছেন চাকরী নিয়ে।

যাহোক বিদায় নিলাম বন্ধুর।

উনিই শোনালেন পুণায় প্রায় হাজারপাঁচেক বাঙালী আছেন। দুর্গাপুজোর সময় সবাই একত্রিত হন।

তাছাড়া পুণা থেকেই বাঙালী নামে একটি পত্রিকাও বের করেন বাঙালী সমিতি। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গেও তারা সহজ ভাবেই মিশেগেছেন।

বোম্বাই-এর ওই বিজাতীয় সংমিশ্রণের আর উৎকট আধুনিকতার ঔদ্ধত্যের স্রোতে একাকার হয়ে গেছে। তবু বাঙালী সমাজ সেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ করে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর দান সেখানে অবিস্মরণীয়—হিমাংশু রায় (বোম্বে টকীজের) এর আমল থেকে আজও শশধর মুখার্জি, হেমন্ত মুখার্জি, শক্তি সামন্ত প্রভৃতি চিত্র প্রযোজক—পরিচালক টিকে আছেন. বিমল রায় আজ নেই তবু তিনি সেখানের চিত্রশিল্পে নোতুন দিগন্ত এনেছিলেন। আজও তপিকেশ মুখার্জি, নীতিন বোস, শক্তি সামন্ত, বিভূতি মিত্র, দুলাল গুহ, যতি ভট্টাচার্য, বাসু ভট্টাচার্য আরও অনেক কৃতি পরিচালক আছেন। সচীন দেববর্মন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত সুরকারও রয়েছেন. অভিনয়ে অশোক কুমার, কিশোর কুমার, প্রদীপকুমার, অভি ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ এর নামও ভারতজোড়া।

বাঙালী ব্যবসায়ী বলতে দুচারজন আছেন। হিন্দুস্থান অনসট্রাকশন কোম্পানীর নামও সুপরিচিত।

মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরে সেদিন এক বন্ধুর সন্ধানে গেছি! ঠিকানাটা জানা নেই। সময়ও হাতে নেই। মাদ্রাজ সহরের ট্যাক্সি সেদিক থেকে বিচিত্র, ছোট গাড়ি ফিয়াট এ্যামবাসাডর তো আছেই ট্যাক্সি হিসাবে, তাছাড়া বড় ট্যাক্সিও আছে। হাতদশ পেরুলেও ট্যাক্সি হিসাবে মিলে।

ড্রাইভারই বলে।

—বেঙ্গলী ক্লাবে চলুন হয়তো পাত্তা মিলবে।

সুন্দর গাছগাছালি ঢাকা পরিবেশ, রাস্তাটাও ঝকঝকে তকতকে। মাদ্রাজ এমনিতেই পরিচ্ছন্ন সহর। মনোরম।

শুনেছিলাম কামরাজের বাড়ির কাছাকাছিই বেঙ্গলী ক্লাব।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ঠিক জায়গাতেই এনে হাজির করে।

বিরাট এলাকা নিয়ে ক্লাববাড়ি। তখনকার ওই সহরের মধ্যে প্রায় তিনবিঘে জায়গার উপর গড়ের টেনিস লন, ব্যাডমিন্টন কোর্ট. লাইব্রেরী ঘর পাঠকক্ষ তাছাড়া প্রায় সাতশো লোক বসতে পারে এমনি একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ।

সন্ধ্যার পর অনেকেই এসে হাজির হন। যে কোন কারণেই হোক পরিচয় দিতে তারাই কোনক্রমে বন্ধুকে খবর দিলেন, তৎক্ষণ তারাই দেখালেন সবকিছু। কোত্থেকে চা সিঙ্গাড়া রসগোল্লাও এসে হাজির হল।

মাদ্রাজ দক্ষিণভারতে এ বস্তু সত্যই দুর্লভ তামাম দক্ষিণ ভারতে বাঙালদেশে কিছু উত্তর ভারতীয় হালুইকরের মিষ্টির দোকান আছে আর কালাকাদ পোড়াজাতীয় কিছু ক্ষীরের মিষ্টি মেলে—ত্রিচীনপল্লীতে কিঞ্চিৎ আছে মাদ্রাজের দ্বিতীয় সহর মাদুরাইতে। তাছাড়া মিষ্টির চাষ ওদের নেই।

কোথাও কোথাও একমাত্র মিষ্টিজাতীয় কিছু মেলে তার নাম ওই মাইসোর পাক। নাহলে ওখানের খাস বলতে ইডলি দোসা—রসম দোসা বড়া—বড়দোর উপ্‌মা ইত্যাদি।

সেইখানেও ওরা দিব্যি রসগোল্লার ব্যবস্থা করেছেন। শোনালেন,

এসব পাবার ব্যবস্থা আছে এখানে।

সে যাত্রা বেশী সময় থাকার উপায় ছিল না—পরদিনই কাঞ্চীপুরম মহাবলীপুরম পক্ষীতীর্থে যাবো তার পরদিন পণ্ডিচেরী হয়ে সোজা নেমে যাবো দক্ষিণে—ত্রিচীনপল্লী কন্যাকুমারীর দিকে।

খাওয়ার অসুবিধাই ওদিকে একটু বেশী। ওদের সেই আতপায় একটু ঘি ওদের ভাষায় ওকে বলে 'নেই'। তার ওপর রসম—সম্বরম্—ইত্যাদি। সাধারণতঃ তরকারী বলতে পেতাম কাচাকলা সেদ্ধ মশলাদিয়ে ভর্তা গোছের করা। পর্বত্র এমনকি রেলওয়ে ক্যাটারিং এই ব্যাঙ্গালোরেও এই মাঝে মাঝারে সুবাদির হোটেলে ঘিয়ে ভাজা চচ্চড়ি ঝোল ঝাল সমেত খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে এখানেও অনেক পদস্থ কর্মচারী বাঙ্গালী. কিছু স্থায়ী বাঙ্গালী বাসিন্দাও আছেন, সেখানের সংস্কৃতিকে মেনেনিয়েও এরা একজায়গায় পুরোপুরি বাঙ্গালীয়ানা বজায় রেখেছেন।

নাগপুর ইন্দোর ভূপাল উজ্জয়িনীতেও বাঙ্গালীর জনপ্রিয়তার মূলে ওই প্রবাসী বঙ্গ সমাজ। তারা সারা ভারতেই ছড়িয়ে আছেন শিক্ষা চিকিৎসা আইনব্যবসা না হয় চাকরী নিয়েও বেটার মধ্যে সেখানের সাধারণ মানুষের সেবা করার প্রচুর অবকাশ হয়ে গেছে এবং তারা তার সদ্ব্যবহার করেই সেখানকার লোকদের প্রীতি আর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে সেখানের মানুষদের সামনে বাঙ্গালীর মান মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

কেউ সেখানে চাল ডাল আটা গঁদ মকাই এর চোরা কারবার করেছেন বলে জানা নেই, সরষের তেলের মিল খুলে শিয়ালকাঁটার তেল করেছেন কিনা জানা যায়নি।

তাই বোধহয় সাধারণ মানুষের কাছে তারা ভালবাসা পেয়েছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের একটি মিলনস্থল জনতেপাই ওই প্রবাস বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, আজকাল তার নাম হয়েছে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' প্রতিবৎসর এক এক সহরে অনুষ্ঠিত হয়, দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসী বাঙ্গালীরা আসেন. বাংলাদেশ থেকেও অনেক প্রতিনিধি যান, কয়েকদিন ধরে সেখানে বাঙ্গালীর সাহিত্য কাব্য নাটক সাংস্কৃতিক জীবনের মেলা বসে সেই মিলনমেলায় উপস্থিত হন স্থানীয় কবি সাহিত্যিক চিন্তাবিদ্‌রা, সঙ্গীতশিল্পী নৃত্যশিল্পীর দল। তাদের আদান প্রদান ঘটে।

সেই মিলন তীর্থে যাবার সুযোগ সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি,বোধহয় সেই তীর্থে আমরা ভ্রাত্য, তাই তীর্থনীরে পবিত্র করতে পারিনি আমার মনকে তবু দূরান্তরে গেছি প্রবাহতের মত অনাহুতের মত।

সেইখানেও পেয়েছি প্রীতির স্পর্শ—দেশভ্রমনের একটা উদ্দেশ্য মানুষকে চেনা, সেই দূর দূরান্তরে গিয়েও নানাভাবে তাদের অন্তরের পরিচয় পেয়েছি ধন্য হয়েছি।

এই প্রসঙ্গে একটি মানুষের কথা হয়নি, তিনি সদানন্দ মুখোপাধ্যায়। আদিনিবাস বর্দ্ধমান-বর্তমানে আসমীরের বাসিন্দা। বেঁটে খাটো লোকটি সদাআনন্দময়। বাঙ্গালী ধর্মশালা দুর্গাবাড়ির নীচে তাঁর দোকান হিন্দীতে লেখা আছে পবিত্র ভোজনালয়. প্রসাদোন্না সন্দেশ পাওয়া যায়। বাংলায় লেখা আছে 'চপ কাটলেট পাওয়া যায়'।

জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ;

ওটা এখানকার চল,

আমার পরনে ছিল সেদিন পাঞ্জাবী আর পায়জামা। কাছেই ঐশন ফিটারাফিং অফিসে গেছি, তাই ওই পোষাকেই গেছি তার সন্ধান করতে। সঙ্গী বন্ধু অরুণ মুখার্জিও সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত। পরিচয় করিয়ে দিতে সদানন্দবাবু বলেন—

—অরুণ মুখার্জি।

নাই কেন এ্যাসি ?

শিশুর মত হাসিতে ফেটে পড়েন। মিলনার লোক একক প্রচেষ্টায় ওই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, রাজস্থানের শুকনো পাহাড় আর মরুভূমির মাঝে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে আছেন কিছু বাঙ্গালী এটা তাদের মিলন ক্ষেত্র।

আজমীর শহরে সরানন্দর ওখানে দেখলাম বাংলা ধরনের কাগজ কিছু পত্র পত্রিকা আর ওর আছে একটি বাঁধানো খাতা।

তাতে বাংলার যে কেউ ওখানে গেছেন তাদের কিছু লেখা রয়েছে, পুষ্কর তীর্থের যাত্রাপথ আজমীর বাংলার বহু গুণীজ্ঞানীর সই রয়েছে ওই খাতায় তাদের সমালোচক, সাহিত্যিক, ডাক্তার অধ্যাপক সাধারণ বাঙ্গালী অবধি সেখানে সামিল হয়েছেন।

আমিও সেই মিলনক্ষেত্রে হাজিরা দিয়ে এসেছি।

আরও অনেক কথাই মনেপড়ে।

বিদেশে যারা আছেন—তারা মোসাহার সঙ্গে সেই যাত্রিত্ব পালনকরে চলেছেন। বাঙ্গালীর ঐতিহ্য সংস্কৃতি নিয়ে সেই দূর প্রবাসের মানুষ, তাদের সমাজকে শ্রদ্ধা করে তারা নোতুন মিলন সেতু রচনা করে চলেছেন, এটা ভাবতেও ভালোলাগে। বুক ভরে উঠে আনন্দে বাইরে যত দূর দূরান্তরে যেয় হয়েও মনেহয় একা নই 'সবঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর ঘরি খুঁজিয়া'।

কথাটা মনে হয়েছিল সেদিন ভারতের শেষপ্রান্ত আরব সমুদ্রতীরে দ্বারকা তীর্থে সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলাম দুটি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত কয়া সুন্দর মঠে, তাদের নিঃস্বার্থ আতিথেয়তার কথা আজও ভুলিনি।

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে

[প্রখ্যাত কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম একদিন সকলের মুখে মুখে ঘুরতো। তাঁর সঙ্গে গল্প-ভারতীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। অতি অসুস্থ অবস্থায়ও এই লেখাটি তিনি দিয়ে যান এবং তা যথাসময় প্রকাশিত হয়। তাঁর পরলোকগমনের পর দেখতে দেখতে বহুদিন কেটে গেল। আজ আর তাঁর কথা অনেকেরই মনে নেই। স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এই সংখ্যায় তাঁর এই লেখাটি পুনরায় প্রকাশিত করে আমরা ধন্য হলাম।]

কলমে হরফে

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম আর চলতে চায় না।

অচল হয়ে আসা কলমটাকে জোর করে চালাতেও মন চায় না। আজে-বাজে সস্তা কলম নয়—দামী বিলাতী পেন। আপিসে কলমপেষার কাজে একটু সখের আমেজ লাগাবার জন্য জ্যাঠামশায় হঠাৎ একদিন ঝোঁকের মাথায় কলমটা কিনে ফেলেছিলেন।

কলম পিষতে পিষতে যথারীতি জ্যাঠামশায় মারা গেলে জেঠিমা কলমটা মানবকে দান করেছিলেন।

বলেছিলেন, এটা আর কার কাজে লাগবে বাবা? তোর লেখার বাতিক জন্মেছে, তুই-ই এটা নে।

কলম রেখে নিজের পেটটাকে দু'হাত দিয়ে খামচে ধরে পেটটাকে উদ্দেশ করেই মানব বলে, কেন বাছা গোল বাধাচ্ছ? নিজের অতি নিজে করছ? আর ঘণ্টা দু'তিন চুপ-চাপ থাকলে লেখাটাও শেষ হত, আর তোমায় খুসী করার ব্যবস্থাও হত!

একটু অনুকম্পার হাসি হেসে মুখ বাঁকিয়ে মানব একটা বিড়ি ধরায়। মস্ত একটা হাই তুলে জোঁয়া ছাড়ে।

সকালে রবির দোকানে বসে খেয়েছিল দু'খানা টোষ্ট আর দু'কাপ চা। আরও কিছু খাওয়া যেত অনায়াসেই। রবি তাকে ধার দেয় না, আগের পাওনাটা শোধ হয়নি। কিন্তু ক'দিন নগদ পয়সায় চা টোষ্ট খেয়েছে—আজও রবি ধরে নিয়েছিল খেয়ে উঠে হামটা নগদ মিটিয়ে দেবে।

আধার বাকী রাখছে শুনে রবি অপমানের সুরে যেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, আর কিছু বেশী খেলেও সেই ভাবেই বলত, আগে না জানিয়ে ধারে খাবেন না মানুষবাবু।

গায়ে তাতে ফোস্কা পড়ত না। তবু সে আরও কিছু খাওয়ার লোভটা সম্বরণ করেছে- নারায়ণ আর কিছু জুটবে কিনা জানা না থাকলেও করেছে।

একবারে বেশী বোঝাই নিয়ে লাভ নেই। খিদে যথাসময়ে তার পাবেই। বেশী খেলে লাভের মধ্যে শুধু লেখার ধারটা তার একটু ভোঁতা হয়ে যাবে—চাই উঠবে ঝিম ধরবে, চিন্তার জট ছাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে, কলম বন্ধ রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

দুপুরে খেয়েছে পুরো চার পয়সার মুড়ি। অলিকে পর্যন্ত একটু ভাগ না দিয়ে তেল মেখে ঘসিয়ে ঘসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে একলা খেয়েছে। তেল আছে প্রায় আধশিশি আজ দুদিন চারবেলা সে রান্না করেনি। আলস্য করে নয়। চাল ডাল তরকারী কয়লা কাঠ কিছুই ঘরে নেই বলেও বটে, ওসব কিনে কেটে রাঁধতে গেলে এক বেলাতেই হাতের পয়সা কটা ফুরিয়ে যেত বলেও বটে রান্না করার সময়টা লেখাটার পিছনে ঢালতে পারবে বলেও বটে।

অলি টের পেয়ে ঘরে এসে দামী ছেঁড়া তোষকের বিছানাটা ঝেড়ে দিয়েছিল, ময়লা কুট-কুটি চাদরটা তুলে নিয়ে বলেছিল, সাবান দাও না, কেচে ফেলি? বড্ড ময়লা হয়েছে।

অলি জানত তার সাবান নেই, সাবান কেনার পয়সাও নেই—তবু বলেছিল। একমুঠো মুড়ি কিন্তু সে তাকে ভাগ দেয়নি। সে জানত কম করে হলেও খেলারীও ডাল পুঁই-চচ্চরী দিয়ে অলি ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়েছে।

বীভৎস জোয়ালো দেহের উদর মন্থিরের ক্ষুধার দেবতা পুরো চার পয়সার মুড়ি ভোগ পেয়ে খুশী হয়নি। বেলা পড়ে আসতে আসতে গুর গুর করে ডেকে উঠেছে।

তবু কাজ এগিয়ে চলছিল। উপোসী পেটের তেজী খিদের আরও সাফ হয়ে গিয়েছিল মাথা, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কল্পনা।

এতক্ষণে ঝিমিয়ে নিস্তেজ হয়ে গিয়ে খিদে খতম করেছে তার কলম চালানো।

পেটে হাত বুলিয়ে যেন আদর করেই মানব বলে, কলম তুমি একেবারে থামাতে পারবে না বাছাধন এত চেষ্টায় মাথায় ঝিমঝিম শুরু করিয়েছ, আস্তে আস্তে তুমিই আবার ফুরিয়ে যাবে। আবার আমি কলম চালাবো জোরসে। দু'ঘণ্টা লেখা থামিয়ে নিজের পুজোয় নিজেই বাদ সাধলে।

পাঁচ-দশটাকা ধার করা যায় অনায়াসেই—অনেক আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে। মাথা নীচু করে গিয়ে নরম সুরে একটা বানানো অজুহাত দিয়ে শুধু হাত পাতার অপেক্ষা।

কোনদিন ফেরে যায় না, কোনদিন চায় না। খুশীতে একরকম গদগদ হয়েই সামান্য কটা টাকা চাওয়া মাত্র দেবে।

কিন্তু যাওয়া কি যায়? চাওয়া কি যায়? তার চেয়ে পেটের খিদে পেটে হজম করাই ভাল!

অনেক বন্ধুও আছে মানবের বন্ধু বলতে মানুষ যা বোঝে এবং সমাজ সংসারে যে মানে মানা হয়। আত্মীয়তার মতো এ বন্ধুত্বের নিয়মনীতি সেই সনাতন। টাকা ধার চাও, দু'একবার পাবে বন্ধুত্ব পাবে না! তার অবস্থা চোখে দেখছে তবু এই বস্তির গরীবদের কাছে চাইলে দু'চার টাকা ধার সে পাবে অবশ্য ধার কাছে চাইবে গাঁট খসি না ফাঁকা হয়।

ওরা জেনে গিয়েছে না জেনে ওদের চলে না। ওরা জানে সে ইচ্ছা করিলেই ভদ্রিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতে পারে তার দিদির প্রাসাদে কিম্বা তার পতা দুই কাকা আঠো মামা মেসোর যোগাড়া একতলা পাকা বাড়িতে।

লাঞ্ছনা দেবে, গঞ্জনা দেবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য অপমান করবে বাড়ির যুদে পড়া ছোট মেয়েটা পর্যন্ত—কিন্তু খেতে দেবে মাছ দুধ ভাল ভাত।

বাড়িতে যে আছে সে আপন হোক অতিথি হোক—নিজেরা যা খাবে তাকে তার সমান ভাগ দেবে। তার আপনজনদের সংসারে এ নীতি আজও অচল হয়নি।

রমেনই যোগেনের সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু।

সাত্যকারের বন্ধু সে নিশ্চয় নয়! কারণ ওকে যতো বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা আছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ভক্তিও বুঝি আছে। কথাবার্তা মেলামেশা চলে সকলের মতই, ভক্তিটা মাঝে মাঝে তারই ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করে বসে। পরস্পরকে অশ্রদ্ধা করাটা অবশ্যই বন্ধুত্ব খাঁটি হওয়ার একটা লক্ষণ নয় এবং ভক্ত হয়েও যনিষ্ট হওয়া যায় কিন্তু সমানে সমানে ছাড়া খাঁটি বন্ধুত্ব হয় না ওতো জানা কথাই।

রমেনও বলে তুই রাখেল, বড় কথা বলিস, কাজে পিছু হটিস। তোর মত হাবা আমি আর দেখিনি।

এত পয়সাওলা আত্মীয়-স্বজন থাকতে ফাঁকা মানের গাড়িয়ে টি. বির ঝুঁকি নিয়েছিস। ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসতে পারিস না? ওদের হায় নেই? খেতে পরতে দিতে না চায়, একটা চাকরী জুটিয়ে দিক।

মুখে সে একথা বলে কিন্তু মানব জানে যে লেখা আর স্বাধীনতার খাতিরে আপনজনদের সাথে তার আপোষহীন বিরোধ, মত হবার বদলে সতেজে ওদের সাহায্য প্রত্যাখান করা রমেনকে অভিভূত করে রেখে।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তার আপোষ কেন অসম্ভব রমেন ঠিক ধারণা করতে পারে না।

কাকার বাড়ি ছেড়ে তাকে এই বস্তিতে আসতে হয়েছিল। সেই সকালটি চিরদিন স্মরণীয় থাকবে।

ভোরে কাকা এলেন।

অপরাধীর মতো।

নইলে এত কষ্ট করে এত ভোরে কেন আসবেন? বস্তি তার অনেক আগেই জেগে গেছে।

জলের ডোঁ শুনতে হবে, আট-ঘাটার জন্য ঘর ছাড়ার আয়োজন করতে হবে, খাটতে যেতে হবেই তো!

কাকা এসে প্রথম কথাই বললেন বস্তির উঠানে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে: বড় হবার চেষ্টা করছ, কর। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশ তারিখে আশালতার বিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে যেও, ইচ্ছে না হলে যেও না। হাঙ্গামা করে বুড়োর ধকা শেষ করে দিওনা।

মানব প্রশ্ন করেছিল, আপনার বিয়েতে গিয়ে হাঙ্গামা করব? কি হাঙ্গামার কথা ভাবছেন?

: তুমি সব কিছু করতে পার—তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

আপনি আপনার মেয়েকে বিয়ের নামে বলি দিচ্ছেন, আমার হাঙ্গামা করার কি কারণ থাকতে পারে? তবে এতই যখন ভয় আপনার আমি যাবই না।

কাকার রাগ হয়েছিল, প্রকাশ করেন নি।

মানব আবার বলেছিল, এমনিতেই আমি যেতাম না। এরকম বিয়েতে যাওয়াই পাপ!

রমেশ কি করে ধারণা করবে কেন তাকে আত্মীয়স্বজন চায় না, কেন ওদের নিয়মনীতি চালচলন নীরবে মেনে নিলে তার সেবার সাধনা বজায় থাকে না!

আশালতার ব্যাপারটাই হয় তো ভাল বুঝবে না রমেশ—অন্য কারো সাথে ভালবাসা হয়নি, জানাশোনা অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত ভালছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, শুধু আশালতার আপত্তি আছে বলেই এ বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটা বলি দেওয়া হবে কেন?

আশালতার হিষ্টিরিয়া রোগ আছে শুনেও রমেশ বুঝবে কিনা সন্দেহ। তার রোগটা একেবারে সারাতে না পারুক অন্ততঃ সামলাতে পারবে সাবধানে; এ রকম ছেলে না খুঁজে যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অর্থই যে মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দেওয়া রমেশের পক্ষে এটা হোকা কঠিন।

ধনীর ঘরের নরম লাজুক ছেলেটির সঙ্গে আশালতার বিয়ের ভয়াবহ ফলটা কল্পনা করে মানবের ভিতরটা কি রকম জ্বালা করে সেটাও রমেশ বুঝবে না।

যেখানে জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা চলে; সেখানে মিথ্যা আর বিকারের ভয় ও ঘৃণামাজা রসের অন্ত নেই; সেখানে সবকিছু মাথা নীচু করে মেনে নিয়ে বাস করলে কি সেবার সাধনা চলে?

অনেকের হঠাৎ ঝোঁক চাপে লেখক হব। লেখক হতে হলে লিখতে হয়; লিখতে হয়।

লিখতে লিখতে হয়।

লিখতে লেখাটাই ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার।

গোড়ার দিকে আরও বেশী। মনের মাঝে লেখক হবার ঝোঁকের ফুলটাই ঝরে যায় অনেকের।

অনেকের ঝরে যায় অঙ্কুরে।

অনেকের কচি ফল বোঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

কয়েকজন ফল ফলায়।

ফল ফলিয়েও ফল পাকানোর ধৈর্য্য আর কষ্ট তাদের সকলের সয় না।

সস্তা বনে যায়।

দাম তারা পায়।

টাকায় যায়।

তাই নিয়ে তারা আত্মীয় বন্ধু পাড়ার লোকেদের কাছে বিশেষ ব্যক্তি হয়ে থাকে। বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের সাহিত্যিক প্রতিভার নিষ্ফল পরিণতি পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। বেশ মোটা টাকা দেয় সস্তা সিনেমায় লাগতে পারলে।

কত চিন্তাই যে তোলপাড় করে ঝিমের ঝিমানো মাথাটা! প্রথম দিকে অনেক কিছু গুলিয়ে যেত কয়েক বছরের চিন্তা আর অভিজ্ঞতায় আজ মাথা সাফ হয়েছে।

সে অনায়াসে যেতে পারে ভূপতির আফিসে কিম্বা বাড়িতে। তবু সে যায় না এটা কি তার একগুঁয়েমি? আগে যেটুকু ছিল আজ বুঝতে বাকী নেই।

দু'চার পয়সার মুড়ি-চিঁড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা বা দু'চার আনা ট্রামবাসের খরচা জোগাড় করার কায়দা না পেয়েই কি সে এই বয়সে লেখক হিসেবে নাম করতে পেরেছে?

একবার গিয়েছিল কৃপতির আফিসে। কিভাবে সে তার লেখকত্ব গুণটা কিনতে চায় তারই নিয়ম কানুন জানার বোঝার চেষ্টা করার জন্য।

সব কিছু না জানলে বুঝলে কি লেখক হওয়া যায়। বিষ কি না জেনে শুধু অমৃত পান করে কেউ লেখক হয়! বিষ বর্জন করে শুধু অমৃত নিয়ে জগতে আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক জগতকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

সব জানতে হবে লেখককে।

বস্তির ড্রেন থেকে রাজ প্রাসাদের ড্রইং রুম পর্য্যন্ত।

মানবখানের সমস্ত কিছু।

কৃপতি বলেছিল, খেতে পাচ্ছিস না? তোকে তো আগেই বলেছি আমি। কাব্যি রোগ সারিয়ে আমার অফিসে ঢুকে পড়। স্পেশাল পোষ্ট, আড়াইশ টাকা মাইনে।

কাব্যি রোগ সারিয়ে জাকে লাগা মানেটি ছিল পরিষ্কার। তাকে লেখা ছাড়তে হবে, তবে চাকরী জুটবে।

আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়েছিল তর্ক, তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে চটে লাল হয়ে গিয়েছিল।

একুশ বছর বয়েস!

গল্প আর পৌঁছে দিতে হয়না সব মাসিক পত্রে কয়েকটা সেরা মাসিকপত্র থেকে তার গল্প চাওয়া হয়—গল্প দিলেই দাম!

বইও বেরিয়েছে দুটো! প্রকাশক নিজের খরচে ছাপবে তাই খুশী হয়ে একজনকে একশো আর আরেকজনকে তেরশো টাকায় বই দুটির সংস্করণ বিক্রী করেছে।

নগদ নয়—কিন্তু দাম তো পাবে।

কী উদার সাহিত্যিক কর্ণধারদের মোটা টাকা ধার দিয়ে মাসিক পত্রের কর্ণধার তথা খ্যাতনামা পুরুষদের। মহাপুরুষেরা তাই ভুলে যায় তাদেরও একদিন একুশ বছর বয়েস ছিল, বাপ দাদা খাতিরের লোক হলেও সাতরাত্রি জেগে লেখা গল্পটার জন্য দশটা টাকা পেয়েছিল—প্রিয়তমাকে এক দিনের বেশী সিনেমার নিয়ে যেতে পারেনি সাতদিনের দিনরাত্রি খেটে রোজগার করা দশ টাকায়!

তিননম্বর বইটা মাসিকে বার হচ্ছে। প্রুফ দিতে যাবার পথে মানব তার ঘনিষ্ঠতম সম্পাদক মহেশের বাড়িতে যায়।

মানব বলে, ওবেলা আপিসে গেলে সব টাকাটা আমায় হবে?

নিশ্বাস ফেলাটা মানস শুনতে পায়।

সেদিন কি আছে ভাই?

মহেশ স্নেহ আর জ্বালা মেশানো দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেদিন যে আর নেই মানবই যেন সেজন্য দায়ী! সেদিন মানে বছর পাঁচেক আগের কথা। মানব যখন গল্প লেখা শুরু করে।

নতুন প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে মহেশ উদার ভাবে বলে, থাকগে। আমার দুঃখের কথা শুনে তো তোমার পেট ভরবেনা। বাড়িতে এলে, চা দিলাম মা খাবার দিলাম না—কি করি বল ভাই? একজোড়া শাড়ীর জন্য ক্ষেপে আছে, এক কাপ চায়ের কথা বলতে গেলেই ঝামড়ে দেবে।

একটু থেমে বলে, সিগারেটটা ধরাও। ওসব নেই আজকাল।

ধরাধ।

মহেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভিতর থেকে নিস্তব্ধ শোনা যায় তার কথা।

দু'কাপ ধোঁয়াটে পানীয় আসে বিনা হুকুমে। চা দিয়ে চন্দ্রা উত্তেজিত স্বরে বলে, আমি এর একটা গল্প পড়েছি দাদা। ওনার গল্পটা যে ভাল তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি ছাড়া আর কেউ সাহস করে ছাপাত?

ছাই ছাপাত!

মহেশ হেসে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকেই ছাপাত। সম্পাদকের হাত থাকলে কি ভাল লেখা বাদ যেত?

কাগজটার হজম হবে কিনা ভাবতে হয়।

চা খায়। একথা ওকথা বলে। পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে জগন্নাথ বলে, পকেট থেকেই দিলাম ভাই, করি কি। আমারও তো অচল অবস্থা। স্যানকসন হলেই আমরা মাইনে পাব, তুমিও তোমার বাকী টাকাটা পাবে।

মানবের হল ঘরে শুয়ে মাথা কাগজের বুকে কলমের আঁচড়ে অক্ষর লাগিয়ে যাওয়া আর আন্তির বাবা কালাচাঁদের প্রেসে সারাদিন শুধু ঘরে ঘরে ছককাটা ঘরগুলি থেকে অক্ষর আর সাঙ্কেতিক চিহ্ন বেছে বেছে সাজিয়ে যাওয়া।

সোজা বাঁকা টানা—নানারকম হাতের লেখার পাণ্ডুলিপির দিকে চোখ রেখে!

এতগুলি অক্ষর।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি। ভাবতে হয় না, খুঁজতে হয়না—ঘরের সব হাত দিয়ে টপ্ টপ্ করে তুলে এনে সাজিয়ে যায় সীসার অক্ষর।

গোড়ায় কালাচাঁদ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি বাক্যের মানে গলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করত।

কাজ এগোত না একদম।

তবে ভুল কম হত।

আজকাল চোখকান বুজে যন্ত্রের মতো অক্ষর সাজিয়ে সে যা গাঁথে—কার্বন প্রুফের রূপ নিয়ে সেটা কাগজে ছাপা হয়ে সেটা ফিরে আসে অসংখ্য সংশোধনে কণ্টকিত হয়ে।

তাকেই আবার মিলিয়ে মিলিয়ে সংশোধন করে আবার নতুন করে অক্ষর বদল করতে হয়!

আগে হাতে লেখা কপি পড়ে মানে বুঝে অক্ষর সাজাবার সময় এখনকার চেয়ে কার্বন প্রুফে তিনচার ভাগেরও কম ভুল থাকত—বেশি কপি সাবাড় করতে না পারলেও তার কম্পোজ করা ম্যাটারে দু'বারের বেশী প্রুফ তোলার দরকার হত না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কপি শেষ না করলে তো চলবে না, দৈনিক যত বেশী সেলি প্রুফ তুলে দিতে পারবে কপি খতম করে তত বেশী সে বিবেচিত হবে কাজের লোক বলে।

মানে বুঝে কাজ চালাবার চেষ্টা বন্ধ করে তাই তাকে অক্ষর সাজাতে হয় দ্রুত গতিতে।

পাণ্ডুলিপির শব্দগুলি শুধু দেখবার চেষ্টা করে বুঝতে না পারলে যেমন মনে হয় তেমনি সাজিয়ে যায়।

নাম করা লেখক উমাকান্তবাবুর লেখা প্যাচানো প্যাচানো—যেমন প্যাচালো মানুষটা তেমনি প্যাচানো হাতের লেখা।

শিক্ষিত সাহিত্যরসিক কম্পোজিটার বলে তাকেই দেওয়া হয় উমাকান্তের বইয়ের পাণ্ডুলিপি। ছেলেমেয়েদের স্কুলে ব্যবহার্য দু'আনা দামের বিশ-পঁচিশটা খাতা।

উমাকান্তের নিজেরই সংশোধন করা কার্ড ফেরত দিয়ে এলে আজও এমন হাসি পায় মানুষের।

উমাকান্ত কলমে লিখেছিল "বহু মহিমামণ্ডিত মানুষ"—সীসার অক্ষর সাজিয়ে সে কার্ড প্রুফে ওটাকে দাঁড় করিয়েছিল "বহু মেয়ে মানুষ বলিত—কানুষ!"

এরকম আরও যে কত হাস্যকর ভুল।

উমাকান্ত প্রেসে আসে।

: কি রকম প্রুফ দিচ্ছেন আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছেন নাকি?

ধনদাস সবিনয়েই জবাব দেয়, যতটা পারছি দিচ্ছি। একটু যদি স্পষ্ট করে লেখেন, একটু যদি কম তাড়াতাড়ি কম জড়িয়ে লেখেন—

সে অমায়িক ভাবে হাসে।

: আমিই আপনার লেখা পড়তে পারি না—মুখ্যু কম্পোজিটারদের সাধ্য কি বলুন?

উমাকান্তের ব্যাজার মুখ দেখেও হেসে আবার বলে, একটা কাজ করেন না কেন? একটা লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য কত ছোকরা কত বুড়ো তো আমাকে জানিয়ে রাখছে। ওদের কাউকে দিয়ে লেখাটার একটা কেয়ার কপি যদি করিয়ে নেন—

উমাকান্ত নিঃশ্বাস ফেলে।

উমাকান্ত সিগারেট ধরায়।

উমাকান্ত গোটাতিনেক হাই তুলে।

: কপি করতে দিলে কেউও পাব বইটা? নিজের শালাকে সাতশ' পাতায় একটা উপন্যাসের একটা কেয়ার কপি করতে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম, অন্তত তার দুটো গল্প ভাল কাগজে ছাপিয়ে দেব। তাছাড়া শালাকে তো আর পয়সায় বহুরী দেওয়া যায় না আজ চার বছর পাত্তা পাচ্ছি না হারামজাদা শালাটার।

ধনদাস আমোদ বোধ করে বলে, কলেজের চাত্র, রোজগার করে না। শ্বশুর বাড়ি গিয়েও পাত্তা পান না শালাটার?

: পাই না।

: সে কি কথা? রাত নটা দশটায় একবার গেলেই হয়।

: গিয়েছি না? কড়া নাড়লাম দু'চারবার কে কে বলার পর জবাব শুনে শালী খুশীতে উথলিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু!

: তারপর?

: বৈঠকখানার শালাটা পড়ছিল, চোখের সামনে দিয়ে ভুরুক করে দোতলায় উঠে গেল। সোজাসুজি তো চেয়ে বলতে পারি না নিজের বৌয়ের মায়ের পেটের ভাইকে—দোকান থেকে কিনে আনা দামী খাবার মুখে দিতে দিতে শুধোলাম, নন্দকে দেখছি না?

: কোথায় গেছে, আসবে এখনি।

: দোতলায় পালিয়ে গেল দেখলাম যেন?

সহধর্মিনী বাপের বাড়ী ছিলেন, এগিয়ে এলেন। বললেন, দুদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসেছি ফিরে গিয়ে তোমার হাঁড়ি ঠেলব—বাপের বাড়ী এসেও যদি আমার ভাইকে নিয়ে গোলমাল কর তাদের কাছ থেকেই পটাপটায় সাধারনাইজ থেরে সব আলা ঘুচিয়ে দেব বলে রাখছি।

উমাকান্তের লেখা পড়েই কিন্তু কালাচাঁদেরও লেখার সাধ জাগে।

সাধ অবশ্য মিলিয়ে যায়।

ছোট বড় কত লেখকের কত টুকরো টুকরো লেখা পড়ছে আজ কতকাল—কেটে কেটে পড়ছে, হরফ ভাগ করে করে। তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গেছে দু'চারটে ভারি মজার লাইন, অদ্ভুত আশ্চর্য লাইন, খাপছাড়া উদ্ভট লাইন। কম্পোজ বন্ধ করে তখন পড়বার সময় নয়—কাজের শেষে ঘরে নিয়ে গেছে হাতের লেখার কাগজ কটা, আগাগোড়া পড়েছে।

জেগেছে কৌতূহল।

বই ছাপা হবার পর, বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরোবার আগে—ছাপা ফর্মাগুলি ঘরে নিয়ে গেছে, মানবের ঘরে গিয়ে গ্রান্থি ক্লান্তির আক্রমণ ঠেকিয়ে তার টেবল ল্যাম্পটার আলোয় রাত জেগে পড়ে শেষ করেছে না-কাটা না-বাঁধানো ফর্মাগুলি।

কাটার উপায় নেই, বই না হোক প্যাম্পলেটের আকারে এক একটা ফর্মা যে পড়বে সে উপায় নেই। যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় ফর্মাগুলি ফেরৎ দিতে হবে।

ভাঁজ খুলে চাউস কাগজটার উল্টোপাল্টা করে সাজানো নম্বর দেওয়া পৃষ্ঠাগুলি তাই পড়তে হয়।

উল্টোপাল্টা কিন্তু এলোমেলো নয়।

নিখুঁত হিসাব করেই কাগজটায় দু'পৃষ্ঠায় এমনভাবে সাজানো হয়েছে হরফ যেন ভাঁজ করলে বই-এর ষোলখানা পাতা পরপর সাজানো হয়ে যাবে।

কালাচাঁদ সঙ্কোচ বোধ করে। মানবও তো লেখক! বলে, এসে বসে পড়ছি—এতে আপনার লেখার অসুবিধা হবে না তো মানববাবু?

: তুমি চুপচাপ পড়ছ—লেখার অসুবিধা হবে কেন?

মাথার কাজ, বিশেষ কাজ—

মানব হাসে।

বলে, আমার কি সখের লেখা, লোকের প্রাণে সুড়সুড়ি দেবার লেখা? আমি হাটে বাজারে বসে লিখতে পারি।

কালাচাঁদ চেয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাকি গল্প উপন্যাস কম্পোজ করার ঝোঁক বেশী? ফুল মুক হরফে কাজ সুবিধে হয় না?

কালাচাঁদ প্রায় সলজ্জ হাসি হেসে বলে, কেমন একটা বদ অভ্যেস জন্মে গেছে। এসব বই মোটা মোটা লাগে, মোটে হাত চলে না।

: এখন কি চালাচ্ছ?

সাহিত্য কম্পোজ করার ঝোঁক চাপার মুস্কিলটা দেখলে তো? যারা প্রাণ দিয়ে লেখে, যাদের সখের লেখা নিয়ে তাদের যে কি ঝামেলা! ঠিক লেখকের মত সাহিত্যের অজ্ঞান নাক কুঁচকে কুঁচকে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। সখের যে লেখা নিয়ে তোমার স্পেশাল ডিউটি, এইগুলি সবচেয়ে বিশ্রী অজ্ঞান।

লেখার সবটা খারাপ মানুষবাবু? সখ না হলে এত খরচ করে বাবুরা লেখেন কেন? কেউ তো বলে নি যে লিখতে হবেই! অত কাজ করলে হয়।

: স্বাধীনতার জন্ত দেশের কত লোক প্রাণ দিয়েছে, কত লোক জেল খেটেছে জানো তো? কী দরকার পড়ে তাদের জেল খাটার, প্রাণ দেবার! অত কাজ করে নিজে বেঁচে বাপের নাম বজায় রেখে গেলেই হত!

তাৎপর্য্য অনুভব করে কিন্তু কথার মানে ঠিক ধরতে পারে না বলে কালাচাঁদ চুপ করে থাকে।

মানব হেসে বলে, ধরো আমি একজন সত্যিকারের লেখক। আমি কি যশের জন্ত লিখি? আমি লিখি প্রাণের তাগিদে। না লিখে উপায় নেই বলে লিখি? কত লোকের কত যশ তো মেটে না। লেখাটা যশের ব্যাপার হলে কেউ এত কষ্ট করত না।

জগতে সাহিত্য বলে কিছু সৃষ্টি হত না। কালাচাঁদ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ ভাবে। কালাচাঁদ গভীর হতাশার সুরে বলে, মুখ্যু হওয়া কি অভিশাপ মানুষবাবু অল্প একটু বিদ্যের দান পাওয়া! যশের এত বাবিশ লেখা ছাপা হচ্ছে—

শুধু যশের লেখা নয় কালাচাঁদ, লেখার বাজারে মুদী দোকানী মালের মত লেখাও চের ছাপা হচ্ছে পয়সার জন্তে।

মনে হয় কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, বৃথাই মোদের জন্ম।

তোমাদের জন্ম বৃথা হয়ে থাকলে, আমাদের লেখাও বৃথা হয়েছে কালাচাঁদ। মুখ্যু তোমাদের জন্ম বৃথা ধরে নিয়ে পণ্ডিত আমরা লিখতে চাইলেই আমাদের জন্মও তাই বৃথা হয়ে যাচ্ছে।

: বটে নাকি?

: তবে কি? তোমাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতার জন্ত জেল খাটা প্রাণ দেওয়া পর্য্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে। তোমাদের বাদ দিয়ে লেখক হবার ক্যাসানও গেছে শেষ হয়ে।

আন্তির তীক্ষ্ণ গলা শোনা যায়, মা বলছে, কাজে যাবে না বাবা?

কালাচাঁদ চমকে ওঠে।

মানবের দস্তা পুরাণো টাইমপিসটার বিবর্ণ ডায়েলের দিকে এক নজর তাকিয়েই কালাচাঁদ যেন শীতকে ওঠে।

: হায় সর্ব্বনাশ! এখনিতে লেট হবে, সরোজবাবু ওদিকে এসে বসে থাকবে। কর্ত্তা আজ তাড়াবেই আমাকে।

মানব তাকে অভয় দিয়ে বলে, ঘড়িটা বিশ মিনিট ফাষ্ট চলেছে—ভয় পেয়ো না। বেলা আঁচ করে করে আন্তি রোজ তোমায় যেমন তাগিদ দেয় আজও তাই দিয়েছে। তুমি এঘরে আছো, শুনতে পাবে কি পাবে না ভেবে গলাটা আকাশে চড়িয়ে দিয়েছে।

: মিনিট দশেক অবশ্য তবে বসে যাই?

: অনায়াসে। আন্তি তিনবার তাগিদ দিলে তবে তো তুমি যাইতে যাও।

আন্তি আরও দু'বার চেঁচাবে।

কালাচাঁদ আনমনে বলে, আন্তি চালাক চতুর হয়েছে মেয়েটা। যার তার হাতে দিতে মন চায় না। না দিয়ে উপায় নেই তার বয়েসের আশাতে বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে।

কবে জেগেছিল লেখার নেশা?

আন্তির মাকে বিয়ে করার আগে না পরে?

কিছুই মনে নেই কালাচাঁদের।

সাধটা অনেকদিনের এই টুকুই তার খেয়াল আছে। সাধটা মনে মনে কয়েকবছর পুষে রাখবার পর বোধহয় তার প্রথম চেষ্টা শুরু হয়েছিল লেখবার।

নতুন খোয়াই কলম দিয়ে একটা নতুন কেনা পাতলা একসারসাইজ বুকের পৃষ্ঠায়।

সে লেখা আজও যত্নে তাকে তোলা আছে। আন্তি মানবকে দেখাতে আসে বাপের কলম চালাবার নমুনা। কলম নয়, পেন্সিল।

প্রুফ তোলা একখণ্ড কাগজে লেখা কয়েক লাইন ছড়া। ভোরবেলা কি ঝগড়া আন্তির মা আর কালাচাঁদের মধ্যে—ভোর মানে একরকম শেষ রাত্রে?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে প্রদীপ ছেলে নিজের মনে চুপচাপ কাগজে আঁচড় কেটে গেছে কাজে যাবার বেলা পর্যন্ত।

আন্তি হেসে বলে, বাবাকে এসব লিখতে শেখাও না মাস্টারবাবু। বাবার এসব লেখার সখ।

কাটা-কুটির অন্ত নেই, তবে মোটামুটি পড়া যায়। কালাচাঁদের হাতের লেখা মোটা মোটা।

কান্তবাবুর গল্প কম্পোজ করিতে করিতে একটি স্থান কৃষ্ণের বড় ভাল লাগিল। গয়নার জন্য বউ আজার ধরিয়া ঝগড়া করিয়েছিল, প্রমথ তাহাকে বলিল যে তুমি অসতী, সতীত্বের পরীক্ষায় তুমি ফেল করিয়াছ। শ্রীরামের সঙ্গে বনবাসে গিয়া সীতাদেবী কি কোনদিন শাড়ী গহনা চাহিয়া স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিল!

প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিল, কান্তবাবু এবার গল্পে দামী কথা লিখিয়াছেন, খুব খাঁটি কথা। কিন্তু কথাটা খোলসা করেন নাই।

আখ্যানটা কৃষ্ণ পড়িয়া শোনাইল। তারপর বলিল, সকলেই জানে সীতাদেবীর সতীত্বের পরীক্ষা হইল অগ্নি পরীক্ষা। তাহা সত্য নয়। বসন-ভূষণ সব ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত তিনি বনে গিয়াছিলেন, কোনদিন কিছু চাহিয়া ঝগড়া অশান্তি করেন নাই। ইহাই আসল পরীক্ষা। কান্তবাবু ইহা খোলসা করেন নাই, লোকে বুঝিবে না।

প্রহ্লাদ হাসিয়া বলে, কান্তবাবু ইহা বলিতে চাহেন নাই, ইহা তোমার মনগড়া কথা। বৌদিদি কাপড় গহনা চাহিয়া ঝগড়া করিয়াছে বুঝি?

মানব জিজ্ঞাসা করে, কালাচাঁদ কতদূর পড়েছে তা কি জানো?

: হ্যাঁ জানি বৈকি। বাবা কতবার গল্প শুনিয়েছে। ইস্কুল থেকে বেরোবার পরীক্ষাটা না? সেটাতে ফেল মেরেছিল। বাবা বলে, ফেল মারবো না? তোর ঠাকুর্দা রোগে ভুগলো আটমাস—সব ভণ্ডাট আমি সোমাইনি? খেতে না পাওয়ার অবস্থা। বলতে বলতে বাবার মুখ চোখ কি রকম হয়ে যায় যদি দেখতে মাস্টারবাবু।

: বুঝেছি। তারপর?

: ঠাকুর্দা কাকে ধরে বাবাকে পরীক্ষা দেওয়ালে বাবা ফেল মেরে গেল। ঠাকুর্দা বাবাকে ছাপাখানায় কাজ শিখতে ঢুকিয়ে দিলে।

আন্তি সগর্বে বলে, ঠাকুর্দা ছাপাখানার বেত ছিল জানো?

ছাপাখানার হেড বলতে ঠিক কি বুঝায় আজিরও ধারণা নেই। কিন্তু মানব জানে, ছাপাখানায় যারা ধরক চালে তাদেরই হেড ছিল কালাচাঁদের বাবা।

: তোর বাবা যদি সুযোগ পেত আজি—রোগা কিন্তু এতবড় চ্যাঙা মেয়ে কালাচাঁদ যে পায় না ঘরে ঘরে বেখেছে এটাও একটা জ্বলন্ত প্রমাণ বৈকি যে সুযোগ সুবিধা পেলে কালাচাঁদ কিছু করতে পারত!

হরফ কথা যার দিয়ে বিশ্ব বরেণ্য হস্তাক্ষরের লেখা পাণ্ডুলিপি ঘরে নিয়ে গিয়ে যে প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকটা একটানা সময় ধরে ধরে এগিয়ে খানিকটা ছকবে কিভাবে কলম দিয়ে লেখকেরা লেখেন তারও উপায় নেই।

পেলি প্রুফের সঙ্গে গেঁথে-গিঁথিয়ে দিতে তবে লেখকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সে পাণ্ডুলিপি আর ফেরৎ আসে না।

মানবের কাছে সে শুনেছে, লেখকেরা নাকি হাতে লেখা কপি সযত্নে ইস্পাত ট্রাঙ্কের তলে তুলে রাখে।

কে জানে হয়তো একদিন তার হস্তলিখিত ম্যানুস্ক্রিপটের দাম হাজারটাকা, লাখ টাকা।

মানব হেসে বলেছিল, যা: কোটি টাকার কথা স্বপ্নে কল্পনা করাও অসাধ্য বাংলার লেখকের পক্ষে।

আগে তৈরী কথা বৈরিটুকু কাগজ থেকেই মুখে ঢেলে দিয়ে নীচের ঠোঁটের ফাকে ঠেলে দেয়।

হরফ বেছে সীসার হরফ সাজানোর হাতে তৈরি তুলে মুখে দিতে সাহস হয় না—কে জানে সীসাটুকু কিভাবে পেটে বেয়োবে পোড়ায় পোড়ায় নয় তো চর্মরোগে।

কালাচাঁদের লেখার চেষ্টার নমুনাটুকু সভীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে মানব কয়েকবার পড়ে।

কলমপেষা বন্ধ রেখে সারাদিন শুধু ভাবে। কালাচাঁদ বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞাসা করে, এখন তুমি কি কম্পোজ করছ কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ বলে, স্পেশাল কাজ করছি। বাটিতে চলা এরোপ্লেনের মত একটা মোটর গাড়ীতে এসে একটা সভের পাতার কবিতার বই ছাপতে দিতে এসেছেন। নিজেই এসেছেন। হুকুম দিলে অন্যেরা সাত দাত পাতা সাত দিনে ছেপে দেবে। তিনি নিজে এসেছেন সভের পাতার কবিতার বই ছাপানোর ব্যাপার। নিজের ছেলেবেলার লেখা কবিতার বই।

মানব বলে, মানুষের নিজের লেখা সন্তানের মত দামী।

: তাই তো দেখলাম। কোন পাতায় হেডিং দেওয়ার পর কতটা ফাঁক থাকে, কোন লাইন কোথায় ভেঙে ভেঙে বেঁকে বেঁকে চলবে, কোন লাইনে দুটো কথার পর ড্যাস আর সেমিকোলন পড়বে—

: যাও যাও।

: কি করে যাব বলেন? স্পেশাল ডিউটি। কর্তা বলেছেন, একটা কমা সেমিকোলন এদিক ওদিক হলে, একটা বুকই দীর্ঘই গোলমাল হলে আমাকে বিদায় করে দেবেন।

: আপনি কি করে লেখেন মানুষবাবু।

: চোখেই তো দেখছ কি করে লিখছি।

কালাচাঁদ হেসে বলে, তা নয়। কি নিয়ে কি লিখবেন ধরেন কি করে? ভাবেন কি করে?

মানব হাসে।

: চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখেশুনে হদিস পাই কি নিয়ে কি লিখতে হবে।

: লিখতে হবে বলে লেখেন?

: করতে না হলে কেউ কোন কাজ করে ভাই ?

সে যাই করুক, করতে হবে বলেই করে। যে সখ করে কোন কাজ সেও সখের খাতিরেই কাজ করে।

: কবিতাও তাই ?

: নিশ্চয়।

কালাচাঁদ চিন্তিত হয়ে বলে, অনেকবাবুও লিখতে হবে বলেই কবিতা লেখেন।

: কি তবে ? কবিতা লেখার এত ঝঞ্ঝাট নইলে ও পোষাবে কেন ? কি দরকার ওর কবিতা লেখার ?

বুক ফেটে যেতে চেয়েছে কালাচাঁদের। আরেকটু যদি কেউ লেখাপড়া তাকে শেখাত। আরেকটু বিদ্যা যদি তার পেটে পড়ত।

স্কুল থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে জুতে দেওয়া হয়েছিল সীতার ম আ, ক, খ, আকার ইকার মাত্রাবার কায়দা শিখতে।

: মুখ্যুরা শুধু পড়বে, লিখবে না ?

মানব এবার সমস্ত চেতনা মেলে কালাচাঁদের দিকে, স্থির দৃষ্টিতে তার রকম সকম লক্ষ্য করতে করতে বলে, কি বলতে চাও ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। কথাটা হল লেখাপড়া। লেখা আর পড়া একসাথে চলে, যে ক, খ লেখে সে ক খ পড়ে। যে বড় জ্ঞানের বই লেখে সে বড় জ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা কি খোলসা করে বলত ভাই ?

কালাচাঁদ কাচুমাচু করে বলে, অল্প লেখাপড়া শেখা কেউ যদি চেষ্টা করে, আপনাদের মত লিখতে পারবে।

: নাঃ !

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ। ব্যাপারটা বুঝে চেষ্টা করলে তুমি লিখতে পার ভাই, পেটে যতই কম বিদ্যা থাক।

কালাচাঁদ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে।

: বড় বড় মস্ত মস্ত লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে কিন্তু পারবে না, চেষ্টা করতে গেলে দু'এক বছরে টি বি জন্মে যাবে, ছ'মাস আটমাসে মরবে।

তবে—কালাচাঁদের উৎসুক চোখে উৎসাহ যেন জলজল করে :

: তবে, তোমার চেয়েও যারা মুখ্যু, অল্পবিদ্যা তুমি যেটুকু জানো তার হাজার অংশও যারা জানে না বোঝে না, তাদের জন্য যদি লেখ—তবে অল্পবিদ্যা নিয়েও লিখতে পারবে।

মানব হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

: নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য যারা লেখে তুমি মাথা খাটিয়ে অন্যভাবে চালিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবছ নাকি ?

একটু নদির ভাব টের পেয়েছিল বা ন্যাজ-ম্যাজ করার ভাবটাও।

উপবাসে উপকার হবারই কথা।

মানবের হয়েছিল নিদারুণ সর্দি-কাশি। নাক বন্ধ মশকটা পাখা যেন গিটে টনটন করছে।

চোখ মেলে চাইতে গেলে চোখ টনটন করে। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঝাঁজ-ধরা ফুসফুসটা মেহিয়ে মিনিয়ে পড়তে চায়।

নিমুনিয়া নয় তো?

কোন ভাকে আন্তি এক বার চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সে টেরও পায়নি। আদা মেশানো গরম চা।

মেঝে আদা চা দিতে এসে ঘোমটা খাটো করেছে আন্তি। মুখ দেখা যায়। শ্রান্তিতে মুখচোখ যেন প্রতিমাদের ছবির মতো হয়েছে। লুকিয়ে চুপিচুপি আদা চা এনে দিয়েছে কিন্তু চোখে মুখে তার এতটুকু ভাবান্তর নেই।

মানবের নিদারুণ দরিদ্রতার পরিচয় হয়েছে এ সংবাদ জানতেও কেউ তাকে বলেনি, সংবাদ জেনে আদা চা তৈরী করে এনে দিতেও কেউ তাকে বলেনি।

বলে, ধীরে ধীরে গরম গরম চুমুক চুমুক খান। বেশী খাবেন না একবারে, জিভ পুড়ে যাবে, দাহ হবে নাকো। ধীরে ধীরে খান একটু একটু চুমুক দিয়ে গরম সইয়ে আস্তে আস্তে খান।

মানব ভাবে কেন পারলাম না? মায়া করি বলেই কি? মায়া কাটিয়ে যতই নির্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়ে উঠতে চাই না কেন, মায়া আমাকে চরমে উঠতে দেয় না?

ভীত-ব্যথিত ভীতা-ব্যথিতার সকরুণ গর্জনের প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমায় কাবু করে দেয়।

কামড়ায় না। কেঁদে উঠে গর্জন করে কামড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে আমায় হারিয়ে দেয়।

কি করে পারা যায় এদের সঙ্গে?

যারা এত নরম।

যারা পীড়নের চেষ্টার সুরেতে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে।

সাধারণ ছটফট করে মানব সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, আন্তির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

হোক বস্তিবাসী গরীব কম্পোজিটরের মেয়ে।

সে কিছু বাজে টের পেয়েই ঘুরঘুর করে তার ঘরের আশেপাশে নড়েচড়ে বেড়িয়ে জানিয়ে দিয়ে যাক—তারও ভীষণ কিদে পেয়েছে।

না বুঝতে পেরে থাক যে সে পীড়ন করতে চায়নি আদর করতে চেয়েছিল—ওর ভেবেকে সম্মান দিতেই হবে।

অন্য কেউ সত্যি সত্যি পীড়ন করতে চাইলেও সেতো গর্জন করে উঠবে এমনিভাবেই।

গায়ের জোর খাটিয়ে যে অত্যাচার করতে চায় তার বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে, তার গালে চড় মেরে হাতে কামড়ে দিয়ে তেজ দেখানোকে উৎসাহ দিতে হবে বৈকি।

প্রায় তখন সন্ধ্যা।

(সীতার মা) কাল্পি শেষ রাত্রি পাড়ে তিনটা নাগাদ উনান ধরিয়ে রেঁধে ফেলে দুবেলার মাল্লা —পচা চাল, পচা আটা, ঘাসপাতা যদি জোটে দুবেলায়। নইলে একবেলাই খায়।

মানব ভেবেছিল, সবাই যেন চুপ হয়ে আছে, মুখ সকলের অন্ধকার।

দেখেই সীতার মা ছেঁড়া ময়লা শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে তাকে গাল দিতে শাপ-মন্যু করতে শুরু করবে।

আন্তি এক গাল হেসে নীরব অভ্যর্থনা জানায়। কী ঝকঝকে তকতকে তার দাঁতগুলি।

নাবণ্যহীন চক্ষিবিহীন কী আঁটো-সাটো গড়ন। আজ যেন প্রথম চোখে পড়ল।

মাত্র বয়সী আন্তির মার দেহটা পর্যন্ত এত সুন্দর! এত পরিশ্রম তার এবং আন্তির মন?

তাড়াতাড়ি চটের টুকরোটা পেতে বসতে দেয়। আসন হিসাবেই তাঁজ করে রাখা হয়েছিল ছেঁড়া চটের টুকরোটা। মানুষ এলে বসতে দেবার জন্য।

অপরাধীর মত সে বসতেই আন্তির মা বলে, এত বোঝাতাবা হয়েছে মেয়েটা। নষ্ট ভাতারমাগীদের মত। বাপ একটু বেশী আদর করলেই গলা নিকেশ।

বাপের আদর চেনেনা:— চিনবেই বা কি করে?

বাপের সাথে তো দেখা-সাক্ষাৎ দু'চার মিনিটের—

হাকে! আন্তি!

আন্তি এসে বলে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর, বুঝা দেয়ে!

আন্তি পায়ে মাথা নত করা মাত্র মানব মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে।

আদর করে বলে, আদর করছিলাম বুঝতে পারিসনি কেন বলত তো আমায়?

অমন আদর ভাল লাগেনা। সস্তা আদর সবাই করতে চায়।

ওভার টাইম খেটে কালাচাঁদ ঘরে ফেরে রাত্রে।

মিনিট দশেকের মধ্যে মানবের ঘরে এসে হাজির হয়।

: খেয়েছ কালাচাঁদ?

: খেয়েই আসছি।

কী খাওয়াই যে কালাচাঁদ হবে খায়। হাত ধুতে করতে লাগে মিনিট আষ্টেক। শুকনো রুটি শুকনো ছেঁচকি দিয়ে খেতে মিনিট তিনেক।

আজ যেন দুঃসাহসী কালাচাঁদ একেবারেই যেন মরিয়া হয়ে গেছে। ভূমিকা না করেই সুতো দিয়ে গাঁথা এক বাণ্ডিল লেখা কাগজ বাড়িয়ে দেয়।

বলে, পড়ে দেখবেন মানুষবাবু? বলবেন লেখাটা আমিক কিছু হয়েছে নাকি?

কালাচাঁদের লেখা পাণ্ডুলিপি। সাদা নীলও গোলাপী রঙের কাগজের ছোট বড় টুকরোর লেখা।

এত দামী কাগজ সে পেলে কোথায়? বোঝা যায় লেখকদের লেখা পাণ্ডুলিপির বাড়তি কাগজ কেটে কেটে সঞ্চয় করেছে কালাচাঁদ।

: চুরিকরা কাগজে লিখেছ কালাচাঁদ? কালাচাঁদ আশ্চর্য হয়ে বলে চুরিকরা কাগজ? ফুলস্ক্যাপের এক পাতায় মোটে চার পাঁচ লাইন লেখে বাকীটা ফাঁকা রেখেছেন।

পরের পাতায় মাঝখানে শুরু করেছেন। ফাঁকা কাগজটা নষ্ট হয়ে, যাবে না? ফেলে দেবে নাহলে তাকে রাখলে উই ধরে, পচে যাবে কাজে লাগালাম বলে তোর গলায়?

মানব লজ্জিত হয়ে বলে, আমারি ভুল হয়েছে ভাই—বুঝতে পারিনি। আঁকিয়ে বলে, বিড়ি ধরাও, আমাকে একটা দাও।

তাকে বিড়ি দিয়ে নিজে বিড়ি ধরিয়ে কালাচাঁদ বলে, পড়তে পারবেন তো? যে ছিরি মুক্তা মানুষের হাতের লেখার!

কালাচাঁদের পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে মুখ বা চোখ না তুলে মানব বলে, দাঁড়িয়েই তো রয়েছ। পড়তে না পারলে জিজ্ঞেস করব।

আধঘণ্টার বেশী লাগে কালাচাঁদের পাণ্ডুলিপি পড়তে। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করে নিতে হয় তোতা কলমে কি লিখেছে কালি ছাড়ছে।

পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ শুধু চেয়ে থাকে মানব।

হারাণ বলে, তুমি লিখতে পারবে কালাচাঁদ। সত্যি লিখতে পারবে, যদি এই লেখাটা উনানে গুঁজিয়ে দিতে পার, যদি -

কালাচাঁদ বিচলিত হয় না।

: লেখা পড়ে টের পেলেন যে চেষ্টা করলে লিখতে পারব ?

: পারবে।

: তবে আর এটা পোড়াব কেন মানুষবাবু ? লিখতে লেখার লিখতে পারার চেষ্টা হিসাবে এটা ছাপিয়ে দিন। আমিই নয় কম্পোজ করব লেখাটা।

কলমের ও হরফের শব্দ ভাসানো মধুর দু'জন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

• • • •

"অনেক দিন হইল একটী সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নাম 'হাজারগ্রেণ'। তিনি সেই সুদূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোন একটা ব্যাপারে পাইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মনে এমন একটী ভক্তি জাগ্রত হইয়াছিল যে তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রামমোহন রায়ের দেশকে তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়েকদিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই দেশের হিতের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া আমাদের কোন সাপ্তাহিক পত্র .কাত প্রকাশ করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রফেসার শিশির কুমার ভাদুড়ী এম-এ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। ইংরাজী সাহিত্য সম্ভার। বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়রের নাটক যেদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর অধ্যাপনা সূচীর মধ্যে থাকতো সেদিন প্রফেসার ভাদুড়ীর ক্লাশে ছাত্রের ভিড় ঠেলে যেতো। শুধু যে বিদ্যাসাগর কলেজের সব সেক্সনের ছেলেরাই অত হ'ত তাই নয়, অন্যান্য কলেজের ছেলেরাও শুনতে আসতো। কেন না, সে তো শুধু সাধারণ পড়ান নয়, রীতিমত আবৃত্তি বা কতকটা অভিনয় বলতে পারা যায়।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ছাত্রাবস্থায় অভিনয় করে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিভিন্ন নাটকের চরিত্রকে যিনি রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত করে তুলতেন তাঁর অধ্যাপনা শোনার মধ্যে শুধু আনন্দের পরিতৃপ্তি নয় শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট। ছাত্র শিশিরকুমার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বরাবরই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার সৌভাগ্য লাভ করতেন। তাঁর সেই "পদ্মনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" যিনি শুনতেন তিনিই মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন।

শিশির কুমারের অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা কেবল মাত্র ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা। সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ যেমন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে শিশির কুমারের অভিনয় খ্যাতিও তেমনি সুদূর প্রসারী হ'য়ে ওঠে। এডওয়ার্ড, মহার্ণব ক্লাসটিক ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত নাটকের প্রধান ভূমিকাটিকে গৌরবান্বিত করবার জন্য।

এমনি করেই তাঁর নাট্যপ্রতিভার অপোসুর্য যখন মধ্যগগনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে ম্যাডান কোম্পানী তাঁদের প্রমোদ পসরার অঙ্গস্বরূপ হঠাৎ বাংলা থিয়েটারের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হলেন এবং মাসিক সহস্রমুদ্রা বেতনে শিশিরকুমারকে নিয়ে গেলেন তাঁদের নাট্যবিভাগের শিরোমণি পদে বরণ করে। পেশাদার নট হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাব সেই প্রথম।

কিন্তু, কেবলমাত্র শিশিরকুমারকে নিলেই তো হবেনা, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভক্ত ও অনুরাগীদের গতি কী হবে? যাঁরা শিশিরকুমারের সঙ্গ ও সাহচর্য নিত্য কামনা করেন! সন্ধ্যাটা তাঁরা কার প্রতিভার আলোকে ধ'রে পুলকিত হ'য়ে মধ্যরাত্রে বাড়ী ফিরবেন? ছুটির সকালটা কার হুল্লড় লঘুত্বে সার্থক হল বলে মনে করবেন? বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার ক্ষমতা সকল মানুষের থাকেনা। বিশেষকরে যে আড্ডা 'রঙ্গরাজ বাবুদের' আলগা মুখের খোলো মনের ও হালকা চরিত্রের মুক্ত অনোচিত ঘটনা নয়। আমাদের বৈমাত্রেয় ভাদেরের অনুকরণে "এবুধে শালা" 'তেরা অমুকের তমুক' যাদের কথার মাত্রা নয়,

তত্ত্ব শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ও রসজ্ঞ যুবকদের বিরুদ্ধ আলোচনাই যাদের আড্ডার প্রধান খোরাক—তাদেরও একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ থাকে। আমরা এই শেষোক্ত টানে বাঁধা পড়েছিলুম।

শিশির ভাদুড়ীকে ঘিরে যে উচ্চাঙ্গের আড্ডা—একটি "Myth" রচনা করেছিল, তার আকর্ষণ বহু বিদগ্ধ জনকেই টেনে এনে ছিল ভাদুড়ীর ভাবজগতের নাড়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ একটু আলগা ছিল। যেমন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আড্ডায় এলে তাঁর রসনায় রাস টিলে হয়ে পড়তো। তা বলে কি তিনি দুর্ধর্ষিতি করতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে 'না'ও বলা চলে না 'হ্যাঁ'ও বলা চলে না। যেমন জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে ঐ প্রশ্ন করলে একই উত্তরদিতে হবে আমাকে। ওঁরা শিক্ষিত সুপণ্ডিত ব্যক্তি। যে ভাষাকে 'পচাল' বা 'খেউড়' বলে ওঁরা তা কোনও দিনই ব্যবহার করতেন না বা করতে পারতেন না। তাঁদের মুখ দিয়ে কোনও দিনই আড্ডাতেও নোংরা কথা বেরোতো না।

গ্রাম্য লোকেরা যেমন রেগে উঠলে অনায়াসেই কাউকে বলে ফেলেন—"বেটা ষাঁটকুঁড়ির পুত", সুনীতির মত নীতিবাগীশ পণ্ডিতেরা ছিন্নাকে নির্মল রেখে তার পরিবর্তে বলতেন "পুত্রহীনার নন্দন।" কোনও লোকের ব্যবহার আমাদের কাছে অত্যন্ত হীন ও নীচ মনে হলে আমাদের আড্ডাধারীরা তাকে 'খানকীর ছেলে' বা 'বেশ্যাপুত্র' বলে রসনা কলুষিত করতেন না। ওঁরা বলতেন ছোকরাটি দেখছি স্বর্গের কোনও 'অপরা তনয়!' তেমনি, কোনও বেটা দুর্দান্তকে হয়ত 'প্রচলিত গালিটি' না দিয়ে বলতে হত 'পুরীষ ভোজীর সন্তান!' সুতরাং বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে আমাদের আড্ডা শ্লীলতা ও ভদ্রতা বর্জিত ছিলনা। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সাহায্যেই কটুক্তি বর্ষণ করা হতো। যে সব গালাগালি ভদ্রলোকের মুখে শোভন ভাষায় উচ্চারণ করা চলেনা, আড্ডার ক্ষেত্রেও আমরা তা কোনও সময়েই উচ্চারণ করতুম না। এমন কি, কারুর বেয়াদপি দেখে যদি তাকে 'শালা' বলে গালদিতে ইচ্ছে হ'ত। আমরা বলতুম তাকে—ওটি আমাদের "জায়াসুত!" এই কটমট শব্দ শুনে হয়ত হাসি পেতে পারে, কিন্তু পবিত্র আর্যভাষা ব্যবহার করলে কেউ আর এ অভিযোগ করতে পারেন না যে আমরা আড্ডাধারিরা অসভ্যের মতো ইতর ভাষায় গালমন্দ করি।

মনুষ্যে আড়াল দিয়ে গুরুজনদের পশ্চাতে ছ'কোটানা সেকালের সমাজে দোষের ছিলনা, তেমনি ব্যোপদেবের অনুসরণে সংস্কৃত ভাষায় কেউ মুখখিতি করলে আমাদের আড্ডায় সেটা নিন্দিত না হ'য়ে প্রশংসাই পেতো। অবশ্য, এই দেবভাষায় অসাধু বাক্য প্রয়োগে মনের বিরাগ প্রকাশ করবার উপায়টি আমাদের পণ্ডিত বন্ধু সুনীতি ভায়াই প্রচলিত করেছিলেন। এজন্য আড্ডাবাজ ভক্তসমাজ তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

যতদূর স্মরণ হয়—ইংরিজী ১৯২০ কি ১৯২১ সালে শিশির কুমার একজন পেশাদার নটরূপে ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েটারে যোগ দিয়েছিল। অবশ্য ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েটার-এর আগেই আশা-হিসাবের ঊর্দুনাটক অবলম্বনে রচিত "অপরাধী কে?" নিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু করেছিলেন। শিশিরের সে নাটক পছন্দ হয়নি এবং তাতে কোনও ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন নি। আমাদেরও সে নাটক ভালো লাগেনি। সে নাটকই নয়। যেমন ছোমাকের 'অবাক জলপান!'

পরে, পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'আলমগীর' নাটক নিয়ে শিশিরকুমার নাম ভূমিকায় সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। শিশিরের সম্বন্ধেও একথা বলা যেতে পারে—Veni, Vedi.

Vici! অর্থাৎ "I came, I saw, I conquered!" শিশিরকুমারের আলমগীরের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমরলোকে খ্যাতির অবিস্মরণীয় পরিচ্ছেদ রচনা করেছে। পাশীদের কর্তৃত্বে পরিচালিত এই বেঙ্গলী থিয়েটারের সাজঘরে সকলের অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিলনা। কিন্তু, শিশিরের নিজস্ব 'সাজঘর' ছিল এর ব্যতিক্রম। কাজেই আমাদের মতো কোনো কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু বিরামের অবকাশে শিশিরের নিজস্ব প্রীণরুমে এসে হাজির হ'ত বটে, কিন্তু, আড্ডার অবকাশ বিশেষ পাওয়া যেতো না। কেবলমাত্র আজ রাত্রের অভিনয়ে কোন সিনে কেমন হ'ল সেইটুকু মাত্র আলোচনার সুযোগ পাওয়া যেতো। অবশ্য বেশ কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরের অভিনয়ের খ্যাতি যখন ক্রমে দেশময় ছড়িয়ে পড়লো তখন এই মহান শিল্পীর অবকাশ হয়েছিল সাজঘরে সমবেত বন্ধুদের সঙ্গে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে এসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেবার।

কিন্তু, সুকুমার-শিল্প বোধহীন ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে পার্শী মালিক ও ম্যানেজার শিশিরের নির্দেশ বাতিল করেছিলো রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটে নিজের খেয়াল খুশী মতো দুঃখীর গ্রামে দীনের কুটীরকেও প্রাসাদের স্বর্ণ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করতে চাইলেন, শিশির তখন পার্শী ম্যানেজার ও মালিকের এ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারলেন না। ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েটার থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন তিনি।

এরপর শিশির এসে যোগদিলেন এক ফিল্ম কোম্পানীতে। নামটা ঠিক মনে পড়ছেনা। সম্ভবতঃ সেটাছিল—"ইষ্টইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী"। আমাদের ইনষ্টিটিউটের মণ্ড বোস বোধহচ্ছে এর একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। আর মূলধন যুগিয়েছিলেন 'মল্লীবিলাস' হোটেলের বাবুরা। কোথায় কোন কাঁসুন্দিয়াড়ির না ঘষমহের বাগানে এই সিনেমা কোম্পানীর 'ষ্টুডিয়ো' হয়েছিল। সারা দুপুর আমাদের আড্ডাও সেখানে সরে গিয়েছিল। বেশ চড়ারোদ না পেলে তখন ফিল্ম তোলা যেতনা! কারণ এখনকার মতো বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্য পাওয়া সে সময় দুর্লভ ছিল। রোদে মুখখানা যাতে কালো না দেখায় এজন্য মুখে ও শরীরের অন্যান্য অনাবৃত অংশে হলুদে রংয়ের পাউডার মাখতে হ'ত।

ছবি যতটা উঠুক বা না উঠুক ষ্টুডিয়োতে আমাদের আড্ডা জমতো খুব জোর। ক্যামেরার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভরে উঠতো আমাদের আড্ডার আনন্দ লহরা। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ শিশির এই সময় একদিন মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং-র আয়ু সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লো।

শিশির সেরে ওঠবার পর আড্ডা উঠে এলো ওল্ড ক্লাবে। ওল্ড ক্লাবের আড্ডার কথা বলবার সময় বোধহয় একথাটা লেখা হয়নি যে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে অভিনয় করবার প্রস্তাব 'ওল্ড ক্লাবই' প্রথম করেছিল শিশিরের কাছে। শিশির এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হয়ে দল গঠন করে ফেললেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের মহড়া দিতে শুরু করলেন। শিশির যে কতবড় একজন নটগুরু এবং অভিনয় শেখাবার তার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম। যাকে বলে 'পাথা পিটে ঘোড়া করা, শিশিরকে তাই করতে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়েছি আমরা।

ইডেন গার্ডেনের একুহিবিশানে 'সীতার' অভিনয় এমন আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল যে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ কনট্র্যাক্ট রিনিউ করে প্রদর্শনীর শেষ দিন পর্যন্ত 'সীতা'র অভিনয় চালালেন। প্রেক্ষাগৃহে প্রতিসন্ধ্যায় দর্শকের অনভব ভীড় জমে উঠতো। সেই শীতের রাত্রে আমরা আড্ডার টানে রোজই

ইডেন-গার্ডেনে ছুটতুম শিশিরের থিয়েটারের তাঁবুতে। অভিনয় যত বেশি আর না বেশি আমাদের কাছে বন্ধু শ্রীতিজনিত আড্ডার আকর্ষণটাই সব চেয়ে বড় ছিল।

এরপর শিশিরের পিছু পিছু আমাদের আড্ডা উঠে এলো 'এ্যালফ্রেড থিয়েটারে'। এই রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারী ছিলেন চোরবাগানের বিখ্যাত ধনী অটল সেন। ম্যাডান কোম্পানী তাঁর কাছ থেকে এইজন্যি লীজ নিয়ে এখানে এ্যালফ্রেড থিয়েটার নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ্যালফ্রেড থিয়েটারে নিয়মিত "পার্শী থিয়েটার" হত। তার অধিকাংশ নাটকই উর্দু বিদ্যা হিন্দী। মাঝে মাঝে সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদও অভিনীত হত! শ্রীযুক্ত অটল সেন শুধু আমাদের চোরবাগানের পল্লীবাসীই ছিলেন না, আমার সেজদা কবীন্দ্র চন্দ্র দেবের সমবয়সী ও সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁরও বিশেষ আসক্তি ছিল। 'ভারত সঙ্গীত সমাজের' একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন তিনি। বিপুল আকৃতির বিরাট চেহারার মানুষ। সঙ্গীত সমাজের অভিনয়ে কোনও কোনও নাটকে তাঁকে যথাযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে দেখেছি। তাঁর কাছথেকে পাশ নিয়ে বহুবার এ্যালফ্রেড থিয়েটারে আমাদের পার্শী থিয়েটার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পার্শী থিয়েটারের নাট্যাভিনয় শুধু অভিনয়ই নয়, ভোজবাজী, ম্যাজিক, মিমক্রীক ইন্দ্রজাল, 'ভাগ্যবতীর খেল' ইত্যাদির সংমিশ্রণে সে এক অদ্ভুত নাট্য প্রদর্শনী বলা চলে। হুম্ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে খাম ডিয়ে, দেয়াল ফেটে অথবা মাটি ফুঁড়ে 'কিষণজীর' আবির্ভাব ঘটতো যেখানে সেখানে, অপ্সরা ও পরীরা ডানামেলে উড়ে যেতো আকাশে। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে বাড়ি ঘর ভেঙে পড়তো। বজ্রের অভিসম্পাতে ঘাট ঘাট করে স্টেজের ওপর আগুন জ্বলে উঠতো। একেবারে যাদুরাজ্য বলা যেতে পারে। আবার ঝরঝর করে আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টিও ঝরে পড়তো। পাখীর ডাকের সঙ্গে কুকুরের কোয়ারা উৎসারিত হত! অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের গর্জনও শোনা যেতো। দুঃখের বিষয় পার্শী থিয়েটারে মেয়েদের ভূমিকায় তখন ছেলেরাই স্ত্রীবেশে অবতীর্ণ হতেন। সাজপোষাকের ঝলমলানির সঙ্গে অভিনয় মন্দ হতনা, তবে তর্জন গর্জন করতেন অভিনেতারা—একটু নয়—অনেক বেশি!

কাজেই, বাঙালী পাড়ায় পার্শী থিয়েটার চললো না। বড়বাজারের শালওয়ারী মহাজনেরাও এ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন না। অগত্যা এ্যালফ্রেড থিয়েটার শূন্য অবস্থায় অনেকদিন পড়েছিল। ইডেন গার্ডেনের অভিনয়ান্তে কিছু অর্থসাতে এসেছিল, শিশির কুমারের। শিশির কিছুদিনের জন্য এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে দোলপর্বের শুভদিনে "বসন্তলীলা" গীতিনাট্য নিয়ে অভিনয় করেন সেখানে। অবশ্য এ সময় বিডনষ্ট্রীটের "মোনমোহন থিয়েটার" শূন্য পড়ে থাকায়, শিশির ওই রঙ্গালয়টি লীজ নেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু, অত টাকা কোথায়, শিশির কুমার গুনবান ছিলেন বটে, কিন্তু, ধনবান ছিলেন না। তবে বন্ধুভাগ্য তাঁর ভালোই ছিল। তাঁরা শুধু শিশিরের সঙ্গে আড্ডাদিতেই আসতেন না, তাঁর সুখ দুঃখের শরিকও ছিলেন তাঁরা। এগিয়ে এলেন সবাই অর্থকোষ খুলে বন্ধুকে সাহায্য করতে।

প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হতেই মোনমোহন থিয়েটার লীজ নিয়ে শিশিরকুমার তার ভিতরটা আগাগোড়া বদলে ফেলে ঢেলে সেখানে নিজস্ব রঙ্গালয় 'নাট্যমন্দির।' তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকখানি নিয়েই তিনি এই নাট্যমন্দিরের যবনিকা উন্মোচন করেন। কারণ এই সীতা নাটকের কল্যাণেই তার লক্ষীছাড়া জীবনে লক্ষীলাভ হয়েছিল। কিন্তু, প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারের চতুর পরিচালক তা জানতে পেরে 'সীতা' নাটকের অভিনয়-স্বত্ব তাড়াতাড়ি কিনে ফেললেন।

শিশির কুমার এ দুঃসংবাদে বিশেষ বোধ করলেও হতাশ হ'য়ে পড়বার পাত্র নয়। তিনি নাট্যকার

ও অভিনেতা যোগেশ চৌধুরীকে নিয়ে নূতন ক'রে একখানি 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নিয়ে 'নাট্য মন্দিরের' যবনিকা তোলবার জন্ত প্রস্তুত হলেন। আজ্ঞাধারী বন্ধুরা যে তাঁর কেবল মাত্র আজ্ঞারই পরিক ছিলেন তা নয়। 'নাট্য মন্দিরের মূলধন যুগিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরাই আবার এই 'সীতা' নাটকের জন্ত কালোচিত ভাবমধুর সঙ্গীত রচনা করে ছিলেন। হেমন্তকুমার রায় আর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তারুণ্যের আজ্ঞার বন্ধু ছিলেন তাঁরাই দিয়েছিলেন। নটীদের নলিত নৃত্যকলায় উচ্চ রুচির সুষমা সৌন্দর্যে অনুসন্ধানের শিক্ষা। ভারতীয় প্রাচীন ধ্রুপদী কলার আদর্শে দৃশ্যপট এঁকে ছিলেন চারুশিল্পী প্রীযুক্ত রায়। সঙ্গীতে সুর সন্নিবেশ করলেন মহারাজা সার সৌরীন্দ্রমোহনের মৌহিত্র বংশের সুরজ্ঞ শিল্পী ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্য সুরার পৌরাণিক পরিকল্পনা ছিলেন সুরসিক বন্ধু পণ্ডিত প্রবর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বকর্মার মতো অযোধ্যার আনুষ্ঠানিক নগর বিন্যাসের সম্ভাব্য একটা নক্সা।

নাট্যমন্দিরে এই নব সপ্তরথীর সানন্দ বেজা-সংযোগে "সীতা" নাটকের প্রযোগ হ'য়ে উঠলো নাট্যজগতের এক ঐতিহাসিক সম্পদ! তারপর অভিনয়। সে এমন এক অতুলনীয় অনুপম ধর্মগত সুঅভিনয় যা নিত্য দেখলেও পুরাতন মনে হয়না। সুতরাং বলা বাহুল্য, যে দর্শকের স্রোত নিত্য সন্ধ্যায় রঙ্গালয়ের দ্বারে জনতার সৃষ্টি করতো। সেই দাক্ষণ্য পরিত নাট্য মন্দিরের যবনিকার অন্তরালে আমাদের আজ্ঞা জমে উঠেছিল যেন সুর সভাতলে অমর লোকের আনন্দ সমাবেশ—যেখানে অমৃত রসের উদার পরিবেশনে সুরাসুর নর পরিতৃপ্ত হ'ত। প্রসন্ন হ'ত। প্রভাবিত হত অভিনব কলা সৌন্দর্যের আদর্শ পরিচয় পেয়ে।

অতএব বলা বাহুল্য—যেমন জমে উঠেছিল নাট্য মন্দিরের অভিনয়, তেমনি জমে উঠেছিল আমাদের আজ্ঞাও। কিন্তু, আজ্ঞার ওপর বোধ করি কোনও দুর্বাসার অভিসম্পাত আছে যে সে কোনও দিনই চিরস্থায়ী হতে পারবেনা। তাই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নোটিস জারি হ'ল মনমোহন থিয়েটারের ও বাড়ি ছাড়তে হবে। ওর ওপর দিয়ে চলে যাবে প্রশস্ত নূতন পথ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু একেবারে সোজা টানা উত্তর কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রীট পর্যন্ত।

নাট্যমন্দিরে তখন জম-জমাট অভিনয়ের সঙ্গে জম-জমাট আজ্ঞা চলেছে আমাদের। এপাশে রঙ্গালয়, ওপাশে মিনার্ভা—অদূরেই চিৎপুর রোডের দেশবিশ্রুত—"স্বর্ণ তরুর" (সোনাগাছির) শাখা প্রশাখা প্রসারিত। আশে পাশে তুফানিবাসিনী 'স্বর্গ সুধা' অমৃতরস বা তরল গরলের বিপণী। পুলিশের নিয়ম ও কড়াকড়ি থাকলেও রাত্রের যে কোনও প্রহরে পিপাসিত কণ্ঠের তৃপ্তির জন্ত সোমরসের নির্ঝার দুর্লভ ছিলনা। সুতরাং, রসিক দর্শকদের থিয়েটার দেখতে এসে রথ দেখা কলা বেচা দুইই হ'ত। কোনও রকমে একখানা থিয়েটারের প্রোগ্রাম যোগাড় করতে পারলেই বড়বাজারেই বাড়ি ফেরনা কেন—সাতখুন মাফ্। এমনকার মতো সেদিন অভিনয় রজনীর সময় সীমাবদ্ধ ছিলনা। কাজেই, থিয়েটার সেদিন অনেক তরুণকেই বিপথে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। পঞ্চাননাদের অবশে গড়াগড়ি দিয়ে তাঁদের অজ্ঞাতে রক্ষিত হতেন অনেকেই। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচরেরাও কেউ কেউ নিরামিষ আজ্ঞার চেয়ে আমিষ আজ্ঞারই অধিকতর পক্ষপাতি ছিলেন। স্থলপথের আজ্ঞার চেয়ে জলপথে বিহার তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল বেশি।

ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের হাতুড়ী-কুরাল-বরন শেষ পর্যন্ত গ্রাস করলে আমাদের বড় সাধের মনোরম আজ্ঞা 'নাট্যমন্দির' বা আগের সেই মনমোহন পাড়ের অভিজাত সম্পত্তি 'মনমোহন থিয়েটার'। এখান থেকে উৎখাত

হয়ে শিশির সম্প্রদায় কি করেছিলেন ঠিক স্মরণ হচ্ছেনা। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' বই নিয়ে চলচ্চিত্র করার চেষ্টা এবং সে চিত্র উঠবে গিয়ে ছায়াছবির রাজ্যে সাধনা অর্জনের গৌরব শিশির কুমারকে তরঙ্গায়িত করিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে হবেন চৌধুরীর 'গিন্নি বালা' চিত্রও এই সময় হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে শিশির কুমারকে বেশিদিন পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। তিনি আবার এলেন কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে। পাশীদের পরিচালিত বাংলা থিয়েটার তখন উঠে গিয়েছে। শিশির কুমার সেই নাট্যশালা 'লীজ' নিয়ে মহাসমারোহে আবার 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করলেন। আমাদের আড্ডাও শিশিরের পিছু পিছু এখানে চলে এলো। এ আড্ডায় এবার অনেক নূতন সভ্য এসে যোগ দিলেন। বিদগ্ধ যুবক সুধা মুখুর্যে ও প্রতিভাবান সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই সময় শিশিরের আড্ডায় এসে যোগ দিলেন। আসর সরগরম!

কিন্তু, মুস্কিল হ'ল এই যে এখানে আসবার পর আড্ডার রসিক বাক্যীর প্রবাহ এমন ঈক্ষুসিক্ত স্রোতে প্রবাহিত হ'তে শুরু হ'ল যে নাট্যমন্দিরের চূড়া টলে টলে শেষ পর্যন্ত হেলে পড়লো। পরের পর রবীন্দ্রনাথের ছোট নাটকগুলি একে একে অভিনয়ের দুর্লভ সুযোগ পেয়েও নাট্যমন্দির নবপ্রাণ-স্পন্দনে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠতে পারলোনা। 'বিসর্জনের' অভিনয় 'শেষ রক্ষার' অভিনয়, 'তপতী'র অভিনয়, 'বিদায়রঙ্গ' 'চন্দ্রহাস' 'সীতা' 'ষোড়শী' 'যোগাযোগ' 'বিজয়া' প্রভৃতি অধিতীয় নাটকের অপূর্ব অভিনয় করা সত্ত্বেও অ্যাডির যীশু যথারীতি নবনাট্য মন্দির ধীরে ধীরে তিমিত হয়ে এলো। দর্শকের দল প্রায়ই হতাশ হ'য়ে ফিরে যায়। নটনায়ক বাকি অক্ষয়।

মাডান কোম্পানী কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চকে 'ক্রাউন সিনেমা' করবেন স্থির করায় শিশিরের 'লীজ' ফুরুতেই আর তারা সর্ত্তটি 'রিনিউ' করলেন না। রঙ্গালয় ছেড়ে দেবার নোটিশ দিলেন। শিশির আবার অথৈ জলে! আমরা আড্ডাধারীরা সবাই প্রায় ফুটপাথে ঠিকরে পড়লুম। শিশির এই সময় আমেরিকায় অভিনয় করবার আহবান পেয়ে সদলে প্রশান্ত সাগর পাড়ি দিলেন। আমরা তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে প্রায় অনাথের মতো ম্রানমুখে বাড়ী ফিরলুম।

কিন্তু "রাধে কৃষ্ণ মা'রে কে?" স্টার থিয়েটারের তখন শুরু দশা। আমেরিকা প্রত্যাগত শিশিরকে তারা মহাসমাদরে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন। আর; শিশিরের পিছু পিছু আমাদের দীর্ঘ উপবাসী—আড্ডাও বিনা আমন্ত্রণেই ষ্টারে এসে জুটলো। কিন্তু, ষ্টারে এসেও শিশিরের ষ্টার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলোনা। প্রয়োগ নৈপুণ্যে দক্ষ,অভিনয় কলায় কুশলী, অধিতীয় নট শিশির কুমার হাতীবাগানের এই বনিয়াদী রঙ্গালয়ে এসেও হাতী বাঁধতে পারলেন না ঘোড়ে। হঠাৎ তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা আবিষ্কার করলে যে পৃথিবীর সব দেশেই ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য নাট্যশালায় ছোটদের উপযোগী নাটক অভিনয় হয়- আমাদের দেশেই বা হবেনা কেন? আমাকে ডেকে একদিন বললে, নরেন, দুইতো ছোটদের জন্য অনেক কিছু লিখিস দেখি, একখানা ছোটদের উপযোগী নাটক লিখে দে। আমি সেটা এখানে ম্যাটিনী শো'তে বাচ্চাদের জন্য অভিনয় করাবো।

মহাআনন্দে উৎসাহে লিখে ফেললুম ছোটোদের উপযোগী নাটক "ভূলের আসর।" শিশিরের নাটকখানি খুব ভালো লাগলো। শুরু হ'য়ে গেল রিহার্সাল এবং যথা কালে বাচ্চাদের জন্য ম্যাটিনী অভিনয় করে এদেশের নাট্যজগতে শিশির এক নূতন কীর্তির ইতিহাস স্থাপন করলেন। কিন্তু অধিকাংশ দর্শকেরা সেদিনও ছোটদের থিয়েটার দেখার বিপক্ষে থাকায় কয়েক সপ্তাহ সান্ধ্য-অভিনয়ের পর এ প্রচেষ্টাতেও শিশিরকে

ভূমিকা টানতে হয়েছিল। বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু ষ্টার থিয়েটারের যিনি অন্যতম কর্মদাতা তিনি এসে দাঁড়ালেন শিশিরের পাশে। সেই পরিণত বার্ধক্যেও উৎসাহ ছিল তাঁর অসীম। কিন্তু যে প্রলয়ের ঝড় তাকে অমৃত দিয়েও বাঁচানো গেলনা।

এই সময় প্রবোধ গুহর 'নাট্যনিকেতন' হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রবোধ নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য ব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। শিশির কুমার এই সুযোগে 'নাট্যনিকেতন' লীজ নিয়ে "শ্রীরঙ্গম" নামে আবার নতুন নাট্যশালা স্থাপন ক'রে নূতন উদ্যমে অভিনয় শুরু করলেন। কিন্তু শিশির কুমারের ভাগ্যদেবী ক্রমেই এখন এই মহান নটের প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠছিলেন। বোধকরি তাঁকে 'যোগভ্রষ্ট' হ'তে দেখে 'দেবী' আর তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখালেন না। বহু চেষ্টাতেও এই অশেষ গুনাকৃষ্ট নট ও নাট্যাচার্য আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেন না। শ্রীরঙ্গমের 'লীজ' ফুরিয়ে যেতেই তাঁকে ম্লানমুখে বিদায় নিতে হ'ল।

ভগ্ন মনোরথ না হ'লেও থিয়েটার পাড়া ছেড়ে শিশির একেবারে গুরুর ব্যারাকপুরের একখানি ছোট বাড়ী। বাড়ীতে তাঁর নিঃসঙ্গ শেষ জীবন অধ্যায়ের মধ্যেই ডুবিয়ে রেখেছিলেন। আজ্ঞাবারীরা কে কত যেত তাঁর কাছে জানিনা। কিন্তু, আমি মধ্যে মধ্যে না গিয়ে থাকতে পারতুম না। যদিও সেই মহামহীরুহের ভূপতিত অবস্থা আমার অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিত। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হতুম শিশির এই ভাগ্যবিপর্যয়কে বেশ শান্ত ভাবেই গ্রহণ করেছিল।

প্রতিভার দীপ্তি-অগ্নি-শিখার মতই তাঁর মধ্যে ঝিকি ঝিকি জ্বলছিল। স্বাধীন ভারত সরকার যখন তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দানে সম্মানিত করতে চাইলেন শিশির কুমার তুচ্ছজ্ঞানে তা গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। যাঁর Peerage পাবার যোগ্য প্রতিভা-তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেবার প্রস্তাব করে কেন্দ্রিয় সরকার মূঢ়তার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁকে রবীন্দ্রনাট্যশালা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু, সরকারী কমিটির আদেশ উপদেশ মেনে চলতে হবে শুনে তিনি এ পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। দুঃখ ও অভাব এই মহান নটকে কিছুতেই নত করতে পারেনি। গৌরবের মুকুট পরেই এই মহৎ শিল্পী দারিদ্রকে তুচ্ছকরে ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ করেছেন।

• • • •

"এত ভাল বঙ্গদেশ তবু বড় ভয়"

ঈশ্বর গুপ্ত - পৌষপার্বণ

বাঙালী জাতি অত্যন্ত আমোদ প্রিয়। বারমাসে তেরো পার্বণ এবং তদুপলক্ষে নানারূপ আনন্দোৎসব সর্বজনবিদিত। দুর্গাপূজার মত সমারোহ বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মানুষ্ঠানে ঘটে না। কোন কোন উৎসব - রথযাত্রা, রাসযাত্রা উপলক্ষে দীর্ঘ কালব্যাপী মেলা ব'সিয়া থাকে। কীর্তন, তর্জা, কবির গান, যাত্রা গান ইত্যাদি বহুরূপ ধরিয়া বাঙালী জাতির আনন্দ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জাতির জীবনে বারবার বহু সংকট উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের ঘোর দুর্দিনেও বাঙালীর আমোদ প্রিয়তা দূর হয় নাই।

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এইভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। যাঁদের ভেতরে প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এই করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবে না তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

হাসি

স্নেহেন্দু মাইতি

শিবনাথ নদীর তীরে এসেছিল। নদী বরাবরই ওর প্রিয়। নদীর তীরে বসে হৃদয় দিয়ে অনেক কিছু ভাবা যায়। ব্যথাতুর হৃদয়ে নদীর তরংগ সমবেদনা জানিয়ে যেন দুঃখ হালকা করে। তাই প্রায় এক মাইল দূর থেকে নদীর তীরে হেঁটে আসে শিবনাথ। নিঃসঙ্গ আসে। চেষ্টা করেও বন্ধুদের সাথে বেড়াতে পারে না। ওদের রক্তমাংসের স্থূল আলোচনায় শিবনাথের বিরক্তি আসে। আজো সে একলা এসেছিল।

শিবনাথ স্লুইসের দিকে এগিয়ে এলো। ওখানটায় একটু বেশি নির্জনতা অনুভব করা যায়। দু'চার জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা নদীর তীরে হাওয়া খেতে আসে। তবে কেউ ওই স্লুইস ঘেঁসে বড় একটা বসে না। শিবনাথ জোর করে মৃদুলাকে ঐ স্লুইসের ধারে বসাত। মৃদুলা ঠিক ঐ ধারগায় বসতে চাইত না। ভয় পেত। বলত, 'না, না, শিবু, ওখানে নয়।' কিন্তু শিবনাথ ছাড়ত না। মৃদুলা ভয় ভয় করে প্রথম প্রথম বসত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার ভয় কেটে গেল। আজ থেকে প্রায় একবছর হল অবশ্য আর মৃদুলা তার পাশে বসে না।

তাই সুন্দর হাসতে পারত মৃদুলা। সে হাসি শিবনাথ উপলব্ধি করতে পারে যায়। সে হাসির

ব্যাখ্যা করতে গেলেই হাসির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বলে কেউ শিবনাথ, 'তুমি চমৎকার হাসতে পার মৃদুলা।'

'আর তুমি'? বলেই আরো জোরে হাসত মৃদুলা। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথও। বহু, বহুদিন আর শিবনাথ সে হাসি হাসে নি।

স্যুইশের পাশে আজো শিবনাথ বসে। নদী ঠিক তেমনি করে বয়ে যায়। বাতাস তেমনি ভিজে নোনতা গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। শিবনাথ বসে, যে জায়গায় মৃদুলা'কে নিয়ে বসত। তরঙ্গের সংগীত শোনে। সমবেদনার সুর পরিষ্কার শুনতে পায় শিবনাথ।

মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হয়ে শিবনাথ শুনতে চেষ্টা করে মৃদুলার সেই হাসি। সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে। হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পায় মৃদুলা হাসছে। শিবনাথ শোনে মাত্র। শিবনাথ হাসে না হাসতে সে পারে না। শিবনাথ জানে, সে হাসি তার ঠিকই আছে। প্রকাশিত হয় না এই যা। হৃদয়ে ঠিকই আছে। তাই সে অনুভবের অশরিরী-মৃদুলার পাশে আজো বসতে পারছে।

আর একটু এগিয়ে গেলেই স্যুইশে পৌঁছে যাবে শিবনাথ। বসবে তার চির পরিচিত যায়গাটিতে। বাংলার শিক্ষক শিবনাথ মাঝে মাঝে শুনবে মৃদুলার হাসি। ভিজে নোনতা বাতাস বহুদূর থেকে বয়ে আনবে সে হাসি। শিবনাথের কানে পৌঁছে দেবে।

শিবনাথ গরীব। তাই শিবনাথ মাঝে মাঝে বলত, 'আমি গরীব। আমি তোমায় কোনদিন পাবনা মৃদুলা।'

মৃদুলা বলত, 'ছিঃ কোথায় তুমি গরীব! তোমার ঐ হাসিই বিত্ত। ওতেই তুমি ধনী। ওতেই তুমি আমার।'

কিন্তু শিবনাথ মৃদুলাকে পেল না। কেন পেল না, সে কথা আরও স্মরণ করতে চায় না শিবনাথ। শুধু সে মনে করবে, হাজার হাজার ব্যর্থ প্রেমিকের মধ্যে সেও একজন। ব্যর্থতা নিয়তির বিধান। ব্যর্থ প্রেমে নিয়তির নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ।

একরকম স্যুইশের কাছে এসে পড়ল শিবনাথ। হঠাৎ একটা তীব্র হাসি শুনতে পেল। চমকে উঠল সে। দেহের শিরা উপশিরাগুলো যেন মুহূর্তে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলল। না, অনুভূতি নয়, কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। স্পষ্ট হাসি শুনছে শিবনাথ। বড় পরিচিত এ হাসি। এক যুগ আগে এ হাসি সে শুনত। এখন শোনে অনুভূতি দিয়ে। কিন্তু মেয়েলি হাসি উঁচুতে আজকে এক বড়ো হাসি। পুরুষের হাসি। শিবনাথ নিজেকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার হাসি কে হাসে! তার হাসিকে কে চুরি করে নিয়েছে! কয়েক পা এগিয়ে গেল শিবনাথ। মৃদুলা—আর সেই মৃদুলার পাশে একটা যুবক। যুবককে এক নিমেষেই চিনল শিবনাথ। টোপর মাথায়দিয়ে মৃদুলার পাশে দাঁড়ান, সেই একবছর আগে রাত্রে দেখা যুবক। শিবনাথ দেখল এক নিমেষে, নীলাম্বরী শাড়ীর পাশে হলুদ রং-এর পাঞ্জাবী। এক মুহূর্তমাত্র দেখেই ফিরল শিবনাথ। শিবনাথের হাসি চুরি হয়ে গিয়েছে। তাই সেই হাসি শিবনাথ হাসতে পারে না পুরো একটা বছরেও। সে রিক্তবিত্ত। এক বিত্তহীন হয়ে স্যুইশের পাশে বসবার অধিকার তার নেই।

মেকসিকো অলিম্পিকে ভারত ঃ

ময়না তদন্ত

জ্যোতির্ময়

(মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগিদের লজ্জাকর ব্যর্থতায় দেশের নানা মহলে আলোচনা পৌঁছায় চরমে।

যদ্যে একবার বাদে ভারত প্রতি অলিম্পিকে অন্ততঃ একটি স্বর্ণ পদক পেয়েছে। তার সঙ্গে একবার ব্রোঞ্জ পদকও যোগ করেছে। এবার জুটেছে একটিমাত্র ব্রোঞ্জ পদক—হকিতে, যে খেলায় ভারত এতদিন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্ণ পদক ছিল যার বাঁধা।

এ লজ্জা রাখবার সত্যিই জায়গা নেই। সর্ববিভাগে এ বছরের মতো ব্যর্থতার পরিচয় ভারত আর কখনো দেয় নি। কুস্তিতে, ভারোত্তোলনে, বক্সিং ছোঁড়ায় এবং অ্যাথলেটিক বিভাগে, এক কথায় সর্ব বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধিরা অন্যান্য সব বছরের তুলনায় এ বছর সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক ফল দেখিয়েছেন।

এ কথা সত্যি, একমাত্র হকি ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় ভারত স্বর্ণ পদক পায় নি। কিন্তু তা না পেলেও, অন্যান্য বিভাগে ইতি পূর্বেকার অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগিরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, অনেকে প্রশংসা পেয়েছেন। হকি ছাড়া, ১৯৫২ সালে ভারত কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পদকও অর্জন করেছে।

এ বছরের হতাশা এই জন্যে আরো তীব্র যে দীর্ঘ চার বৎসরের প্রস্তুতির পর, কোথায় আশা করা গিয়েছিল যে ভারতের প্রতিনিধিরা এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় দেবেন তা নয়, এবারই তাঁরা প্রতি বিভাগে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে সবচেয়ে অবনত নজীর রেখে এলেন।

ইতিপূর্বেকার অলিম্পিকে, ১৯৫২ সালে মনখেত কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন, তাছাড়া, পদক না পেলেও লেভি পিন্টো, মিলখা সিং ও গুরবচন সিং সমান পাল্লা দিয়ে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি অকর্ষণ করেছেন।

রোম অলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন, সেই দৌড়ে প্রথম তিন জনেই অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছিলেন, সে বিচারে মিলখার কৃতিত্ব কম ছিল না।

১১০ মিটার হার্ডলস-এ গুরবচন দুর্ভাগ্যক্রমে নবম বাধাতে পড়ে যাবার পান, তাহলেও তিনি পঞ্চম হয়েছিলেন।

তাঁদের নৈপুণ্য দেখে আশা হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত ভারত থেকে পদক বিজয়ীর সন্ধান মিলবে কিন্তু এ বছরকার ফলাফল দেখে সে আশায় ছাই পড়েছে।

ভারতের দুই অ্যাথলীট, পরভিন কুমার ও ভীম সিং প্রথম দশও অতিক্রম করতে পারেন নি। হাতুড়ি ছোঁড়ায় পরভিনের নিজের দেশে যে রেকর্ড ছিল মেকসিকোয় গিয়ে সে রেকর্ডের কাছেও তিনি পৌঁছোতে পারেন নি! পরভিন সম্বন্ধে অনেকের অনেক আশা ছিল।

হাইজাম্প-এ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ভীম সিং দেশে ৭ ফুটের কাছাকাছি পার হয়েছেন, কিন্তু মেকসিকোয় গিয়ে তিনি ৬ ফুট ১০½ ইঞ্চির বেশি লাফাতে পারেন নি!

কুস্তিতে আমাদের কর্মকর্তারা আশা দিয়েছিলেন যে আমাদের মল্লরা কারুর চেয়ে কম যাবেন না। সরকারী মহলের সঙ্গে অনেক কেজিয়া করে তাঁরা আর ভজন কুস্তিগীর আর সরসংখ্যক কর্মকর্তা মেকসিকোয় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের চার মল্ল উৎসটাদ, বিশম্ভর, সুদেবকুমার আর মুক্তিয়ার তাঁদের লড়াইএ মেডেল জেতার পথ যোজন দূরে ছিলেন! এই সূত্রে ইতিপূর্বেকার অলিম্পিকে যাদব ও যমলেতের নৈপুণ্যের কথা সতই মনে পড়ছে। তাঁরা দুজনেই উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন দর্শকদের কাছ থেকে।

ভারোত্তোলনে এম. এল. ঘোষ ১৫ তম স্থান পেয়েছেন। নিজের দেশে তিনি যে রেকর্ড করেছেন তার চেয়ে অনেক খারাপ ফল তিনি সেখানে গিয়ে দেখালেন।

বক্সিং ছোঁড়ায় ভারতীয় বক্সিংবীররা অনেক নীচে পড়েছিলেন।

প্রতিযোগিদের এই তো হাল। হাস্যকর, লজ্জাকর তাঁদের প্রতিযোগিতার বহর। অথচ মেকসিকোয় যাওয়া নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা আরো বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী এবং কর্মকর্তা মেকসিকোয় পাঠাবার জন্যে ভারত সরকারের সঙ্গে কতই না লড়াই করেছিলেন।

সেখানে কর্মকর্তা সেজে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের "খেল্" নাকি আরও লজ্জাজনক হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে, এই ১৯জন কর্তা ব্যক্তি মেকসিকোয় গিয়ে দেশের স্বার্থ কতখানি রক্ষা করেছিলেন, প্রতিযোগিদের জীবনযাত্রানির্বাহে কতখানি সহায়ক হয়েছিলেন, সে নেপথ্য কাহিনী হয়ত একদিন জানা যাবে। ইতিমধ্যেই তাঁদের সম্বন্ধে যে সব রিপোর্ট চুঁয়ে এসেছে তা অতিশয় প্রতিকূল।

মেকসিকোয় ভারতের বিপর্যয়ে এদেশে এখন একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে, ৫০ কোটি লোক যে দেশে বাস করে সে দেশ থেকে কেন আজো একজনও পদকবিজয়ীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ, অনেক ছোট ছোট দেশ, যথা, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, কেনিয়া এবং আরও অনেকে ইতিমধ্যে একাধিক পদকবিজয়ী প্রতিযোগীর সৃষ্টি করেছে,—এর কারণ কি? এবং এই যদি ভারতীয় প্রতিযোগীদের ক্রীড়ামান হয়, তাহলে বিদেশে গিয়ে লোক হাসাবার জন্যে লাখ লাখ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করার সার্থকতাই বা কোথায়?

মেকসিকোয় ভারতের শোচনীয় বৈফল্যে প্রখ্যাত ক্রিকেটার কমল ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন তার অংশবিশেষ এখানে পুনরুদ্ধার করে দিলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেছেন—"মানুষের রক্তের তফাতে বুদ্ধির কিছু হেরফের হয় না। কালোরা (অর্থাৎ নিগ্রোরা) সেই পরীক্ষায় ঢুকলেন অলিম্পিকের আসরে যেখানে মর্যাদার জন্যে সাদা কালোয় তফাতের থাকে না। অলিম্পিকে ঢুকে কালোরা অচিরেই চমকের পর চমক সৃষ্টি করলেন।.....অনুশ্রম ও সাধনার ফলে আমেরিকার নিগ্রো

অ্যাথলিট টমি স্মিথের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা সবাইকার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। স্মিথ হিটের ২০০ মিটার দৌড়ে পায়ে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে যান। কিন্তু ফাইনালে তিনি পিছিয়ে পড়েন নি। সেই আঘাতকে উপেক্ষা করে তিনি শুধু দৌড়োন নি। নিজের পুরনো রেকর্ডটিও ভেঙে ফেলেন। এমন দেশাত্মবোধ যাঁদের, এই দুঃসাহসিক সংগ্রাম তাঁদের সাফল্য না হয়ে যায় না। ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল্য অনেক বেশী। খেলাধুলোর আসরে আমেরিকার অভাবনীয় সাফল্য দেখে অনেকেরই চোখ টাটিয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকার সবচেয়ে বেশী সোনার মেডেল জয় করা দেখে রাশিয়া নিজেদের স্পোর্টস মহলকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছে। .....খেলাধুলোর আসরে নিগ্রোদের এই সাফল্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না কেন? ভারতীয় দলের হকির গৌরবও গেল। ভারত হকিতে তেমন সুবিধা করতে পারবে না সেকথা আগেভাগেই প্রাক্তন হকি বিশারদরা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাবধান হতে বলেছিলেন। মেকসিকোর উঁচু জায়গায় খেলবার আগে আমরা তেমন বিকল্প ব্যবস্থায় খেলার অভ্যাস করিনি। ভারতে কি উঁচু জায়গার কিছু অভাব ছিল? সেসব ব্যবস্থা না করে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল বিদেশে শুভেচ্ছা সফর করেছে। কিন্তু হকির অঙ্গে যখন বিভিন্ন দেশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে তখন আমরা নিজেদের প্রতিভা সবার সামনে তুলে ধরলাম কেন? যে জাপানের ফুটবল খেলায় কোন অস্তিত্ব ছিল না সেই দেশই টেক্কা দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল। পশ্চিম জার্মানির কোচ জাপানের খেলা দেখে উজ্জীবিত হয়ে বলেছিলেন— ওরা যা খেলা দেখাচ্ছে তাতে শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলগুলিকে এদের কাছে একদিন মাথা নোয়াতে হবে।...এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ যখন আন্তর্জাতিক খেলায় সুনাম বাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে তখন ভারতের এই অধোগতি দেশবাসীর কাছে দারুণ লজ্জার বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই।"

আর একজন হকি খেলোয়াড়ের মন্তব্যও প্রণিধান যোগ্য। ইনি হলেন কে. ডি. সিং, ডাক নাম বাবু, বিখ্যাত খেলোয়াড়, হেলসিনকি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

কথা উঠেছিল যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতই ভারত একবার ফাইনালে উঠতে পারেনি। বাবু সেকথা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অনুশীলনের অভাব, সুচিন্তিত পরিকল্পনা না থাকা এবং খেলোয়াড়দের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অনটন—এইগুলিকে ভারতীয় দলের পরাজয়ের কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

হকি খেলার কর্তাদের কর্মধারার তীব্র সমালোচনা করে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তাঁর অধীনে ২৫ জন করে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের ছাত্র দেওয়া হলে তিনি তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়ে আগামী চার বছর ধরে গড়ে তুলবেন এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস সেই দল ভারতের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবে!

অতঃপর তিনি কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের ক্রীড়াধারার সমালোচনা করেন এবং দল নির্বাচনে অসতর্কতা ও উপযুক্ত বিবেচনার অভাবের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, অলিম্পিক দলের পক্ষে ছ' সপ্তাহের শিক্ষণশিবির যথেষ্ট নয় বলে বলা হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্যে শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় নি কেন? পাতিয়ালায় শিক্ষা শিবিরে গিয়ে তিনি দেখেছেন, যে পরিমাণ খাদ্য খেলোয়াড়দের দেওয়া হয়েছে তা একজন খেলোয়াড়ের পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এইসূত্রে মেকসিকোর ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক পৃথ্বিপাল সিং কয়েকটি কথা বলেছেন, তাও শোনা দরকার।

মেকসিকো থেকে ফিরে এসে পৃথ্বিপাল প্রতিযোগিতামূলক হকি থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেন, তার স্বপক্ষে কোন কারণ তিনি দেখাননি। তাই লোকে যেমন ইচ্ছে তেমনি অনুমান করে নিচ্ছে।

ভারতের বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন—এর জন্যে গালমন্দ করলেই কোন ফল পাওয়া যাবেনা। বরং এই মুহূর্ত থেকেই চিন্তা করতে হবে কি করে পরবর্তী অলিম্পিকে এবং এশিয়ান গেমস-এ আমরা এই পরাজয়ের কলঙ্ক মোচন করতে পারি।

তিনি ভারতীয় হকি দেবতাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেছেন—এখন থেকেই খেলোয়াড়দের কঠিন অনুশীলনের ব্যবস্থা না করলে অলিম্পিক এবং এশিয়ার দুটো প্রতিযোগিতায়ই আমরা হারতে থাকবো।

মেকসিকোর ভারতীয়দের খেলা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ভারতীয় খেলোয়াড়রা একেবারে নিজের খেলা খেলেনি। তা খেললে কি আর তারা নিজেদের গ্রুপে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করতে পারতো।

তিনি বলেন, ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রধান ত্রুটি ছিল দৈহিক অপটুতা, মনে হয় শরীর যতখানি পুষ্ট থাকা দরকার তার অভাব ছিল ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে। তিনি প্রস্তাব করেছেন, ১। এই বিষয়ে অর্থাৎ শারীরিক পটুতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হোক, ২। প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হকি বাধ্যতামূলক করা হোক, ৩। প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন খেলোয়াড়রা যাতে ভাল চাকরি পান তার ব্যবস্থা করা হোক, ৪। হকি খেলোয়াড়দের জন্যে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক এবং সর্বশেষে ভারতীয় হকিদলের অনবরত বিদেশ সফর বন্ধ করা হোক।

পৃথ্বিপাল সিং-এর কথাগুলি কেলনা নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের প্রতি মনোযোগ দেবার মন কি ওঁনাদের আছে?

ইংলণ্ডের রাণী আর ফুটবলের রাজা

কৃতী খেলোয়াড়দের আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করার রেওয়াজ ইংলণ্ডে আছে। বিখ্যাত সেন্টার ফরওয়ার্ড স্ট্যানলি ম্যাথুজ কিছুদিন আগে নাইট উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু সে ছিল এক মস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। অনেকদিন ধরে অনেক নির্বাচন, অনেক সুপারিশ ইত্যাদির ব্যাপার। তার চেয়ে অনেক বড় সম্মান পেয়েছেন, ব্রাজিলের বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলে—ইংলণ্ডের রাণীর কাছ থেকে।

সম্প্রতি রাণী এলিজাবেথ দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। রিও ডি জেনিয়োতে পৌঁছে রাণী বললেন, তিনি একটি ফুটবল খেলায় পেলের খেলা দেখতে চান। সঙ্গে সঙ্গে একটি খেলার আয়োজন করা হল—সাও পওলো দল বনাম রিও একাদশ। পেলে সাও পওলো দলের হয়ে খেলতে নামলেন এবং তাঁর খেলায় দর্শকদের আর একবার চমকৃত করলেন। তাঁর খেলা দেখে রাণী এলিজাবেথের সে কী উল্লাস! পেলের গায়ে বল এলেই তিনি সোৎসাহে হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তারপর পেলে যখন একটি দর্শনীয় গোল করলেন তখন রাণী এলিজাবেথ আনন্দে যেন ফেটে পড়লেন। পেলের দল সেই খেলায় ৩-২ গোলে জয়লাভ করল। মাঠে এক লাখ দর্শক হাজির ছিলেন! খেলার শেষে আয়ুক-কাপটি রাণী এলিজাবেথ যখন পেলের হাতে তুলে দিলেন তখন সেই একলাখ দর্শক একযোগে হাততালি দিয়ে পেলেকে অভিনন্দন জানালো।

পেলে আরও একবার অতীতে এই রকম দুর্লভ সম্মান পেয়েছিলেন : গল্পভারতীর পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে যে ইতিপূর্বে যখন আমরা পেলের জীবনী প্রকাশ করেছিলাম তখন তার মধ্যে এই তথ্যটি ছিল : সেবার রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব্ এডিনবরা ব্রাজিল পরিভ্রমণে গিয়ে একটি ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই খেলায় পেলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ডিউক বিশেষ করে পেলের খেলা দেখবার জন্যে গিয়েছিলেন। যথারীতি পেলে সেই খেলায় বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন। নিয়ম আছে যে, কোন রাজকীয় অতিথি খেলার মাঠে উপস্থিত থাকলে, খেলার শেষে খেলোয়াড়রা এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবেন। কিন্তু ডিউক অব্ এডিনবরা সে নিয়ম মানলেন না, খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসন ছেড়ে উঠে মাঠের মধ্যে গিয়ে পেলেকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর করমর্দন করলেন। সেই দৃশ্য দেখে সমবেত দর্শক মণ্ডলী উল্লাসে ফেটে পড়েছিল এবং সেই রাত্রে ডিউক ও পেলের সম্মানে তারা বহু রাত অবধি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বাজী পুড়িয়ে আনন্দ করেছিল।

ক্রিকেটের অবিশ্বাস্য ঘটনা

ক্রিকেট এসে গেল। দেশে বিদেশে তার সমারোহ। কোথায় কোন্ সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্ট ইনডিয় দল খেলছে, আমরা এখানে উত্তেজিত মনে তাদের খবর শুনছি, পড়ছি, নোট রাখছি।

ক্রিকেটের কত ব্যক্তিগত কীর্তি! কত বিস্ময়কর খেলার নজির। এদের মধ্যে আছে আবার অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। সেই রকম দুই একটি চিত্তাকর্ষক-কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ পরিবেশন করছি :

একই দিনে তিনটি বিভিন্ন খেলায় তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন এরকম ক্রিকেটার এযাবৎ জন্মেছেন মাত্র একজন। তিনি আমাদের প্রিন্স রণজিৎ সিংজি। ১৮৯০ সালে রণজিৎ সিংজি বিলাতে খেলছেন। একদিন সকালবেলায় একটি দলের হয়ে ব্যাট করতে নেমে বিদ্যুৎবেগে ১৫২ রান করে আউট হয়ে তিনি পাশের একটি মাঠে আর একটি খেলা দেখতে গেলেন। সেখানে একটি দলের খেলোয়াড় কম পড়েছিল। তিনি তাঁদের হয়ে ব্যাট করতে নামলেন এবং মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই সেঞ্চুরি করলেন। তারপর ফিরে এলেন নিজের মাঠে। এসে শুনলেন, নিজের দলের সবাই আউট হোয়ে গেছে এবং বিপক্ষ দলেরও পাঁচছটি উইকেট পড়ে গেছে। নিজের দলের কাপ্তেন রণজিৎ সিংজিকে খুঁজে না পেয়ে পরিবর্ত খেলোয়াড় দিয়ে ফিল্ডিং করাচ্ছেন। যাইহোক রণজিৎ সিংজি ফিল্ড করতে নামলেন এবং তারপর আধঘণ্টার মধ্যে বিপক্ষদলের বাকি উইকেটগুলি পড়ে গেল। রণজিৎ সিংজির দল আবার ব্যাট করতে নামলো এবং তিনিই প্রথম ছুটির অন্তর্বর্তীরূপে মাঠে নামলেন। সময় বেশি ছিল না। কিন্তু তাহলেও তাঁর ব্যাটে সেদিন যেন বিদ্যুতের স্পর্শ। খেলা শেষ হবার আগেই আবার ১৪০ রান করলেন—নট আউট! পরদিন রণজিৎ সিংজির খেলা সম্বন্ধে একটা কথাই বড় করে সবাই লিখেছিল—Unbelievable!

• • • •

পর পর ছ'টি বলে ছ'টি উইকেট পাওয়া যে কোন বোলারের পক্ষেই সত্যিই অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব।

এই কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মাত্র একজন বোলার ইংল্যাণ্ডের উইলফ্রেড। ১৮৫৯ আমেরিকা বাদলের বিরুদ্ধে তিনি একটি ম্যাচে এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

• • • •

বোলারের পক্ষে হ্যাট্রিক করা খুবই গৌরবের। পর পর তিন বলে তিনজন আউট—বড় কম কথা নয়। একটি টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার টি, জে, ম্যাথুস দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি নয়, দুটি হ্যাটট্রিকের যে নজির টেস্ট খেলায় স্থাপন করেছেন তা আজো রেকর্ড হয়ে আছে। ১৯২৯ সালে তিনি এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

একই খেলাতে পাঁচটি হ্যাট্রিক! এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র একজনই। তিনি হলেন ডব্লিউ রীড! ইংল্যাণ্ডের বোলার। ১৯১২ সালে তাঁর কলেজ অপ্রাসটিনের হয়ে অ্যাসলোর্ড চার্চ বয়ের দলের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম ইনিংসে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

দুটি পা না থাকলে ক্রিকেট খেলার কথা ভাবাই যায়না! কিন্তু ইংল্যাণ্ডের এমন দু'জন ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন যাদের একটি করে পা ছিলনা—তাঁরা কাঠের পা লাগিয়া ক্রিকেট খেলতেন এবং ভালো খেলতেন। তাঁদের মধ্যে একজন কর্ণেল ওমমন। ওমমন ছিলেন একজন সৈনিক, যুদ্ধে তাঁর একটি পা খোয়া যায়। কিন্তু তাতে তিনি দমেননি, কাঠের পা লাগিয়ে খেলেছেন, কয়েকটি সেঞ্চুরি এবং একটি ডবল সেঞ্চুরি পর্যন্ত করেছেন। মর্গান ওয়াটার ওয়ার্থ নামে আর একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় পাঁচ বছর বয়সেই একটি পা হারান। কিন্তু কাঠের পায়ের সাহায্যে তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং দু'য়েতেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি বোলিংএ মোট ১০০০ উইকেট পেয়েছিলেন, আর তাঁর মোট রানসংখ্যা ছিল ৩৬০০। দশবার তিনি দলের অধিনায়কত্ব করেছেন।

ক্রিকেট সত্যিই এক পরমাশ্চর্য খেলা, এ খেলায় যেমন 'মহান অনিশ্চয়তা', তেমনি আবার 'মহান অবিশ্বাস্য' কৃতিত্বের নজির।

ক্রিকেট সফর বাতিল—

কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত চার পাঁচ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় মঞ্জুর করায় এম, সি, সির, ভারত সফর বাতিল হয়েছে।

দেশের যখন এই অবস্থা, চারিদিকে হাহাকার, বন্যা, খোয়া, ছাত্র-তাণ্ডব এবং আরো কত প্রকারের বিপর্যয় কাণ্ড চলেছে তখন এই উটকো সফর বাতিল করে ভারতসরকার অনেক গোলমালের মধ্যে অন্তত একটি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

আর এম, সি, সিরই বা কি! বাঘনা বিশ হাজার পাউণ্ড না হলে চলবে না! তাঁরা ভেবেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তো টাকা পাওয়া গেলনা, এখন ভারতেই যাওয়া যাক, সেখানকার মহারাজা ক্রিকেট কর্তারা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রস্তাব লুফে নেবে। নিয়েও ছিল। এই সফর পরিত্যক্ত হলো বলে ভারতের জনসাধারণ একটুও অখুশী হয়নি, তাদের মধ্যে বহু ক্রিকেট রসিকও আছেন। কিন্তু কতিপয় কর্তার কী ক্ষোভ আর আপশোষ! ক্রিকেট মাঠে মাইকেল জমাবার, নানাভাবে নানা জনের টাকা রোজগার করবার, টেস্ট খেলার টিকিট নিয়ে কালোবাজারী করবার এত বড় একটা সুযোগ হাত ছাড়া হোয়ে গেল! আপশোষের কথা বৈকি! কিন্তু এম, সি, সির ভাঙা দলের ছেঁড়া-খেলা দেখতে পাওয়া গেল না বলে, বোধ করি, জনসাধারণের কোন ক্ষোভ নেই। তাদের অনেক খেলাই এদেশের মাটিতে দেখা গেছে! আহারাদি কিছু নয়। বরং তার বিপরীত!

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে চেকোস্লোভাকিয়া সম্প্রতি আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল, সেই চেকোস্লোভাকিয়ার কর্মশিল্পে ('ইন্ডাস্ট্রি') ও ক্রীড়াঙ্গনে অঙ্গনারা অগ্রগামী, এটা নিশ্চয়ই আনন্দের। ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য এবারের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি (সে কথায়ও পরে আসছি)—আগে কর্মশিল্পের কথাটাই বলে নিই।

গড়পড়তা হিসেব নিলে দেখা যাবে, ঐ দেশের 'কমিনী' মেয়েদের মোটামুটি উচ্চতা ১৬১ সেন্টিমিটার, ওজন ৬১·৮ কিলোগ্রাম এবং বুকের ছাতির মাপ ৮৯·৬ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এটা জানা গেছে তথাকার 'ইনস্টিট্যুট অফ ওয়ার্ক হাইজিন এণ্ড অকুপেশানাল ডিজিজেস'-এর এক সমীক্ষায়। চেক্-দেশের বাইরের অন্যান্য দেশ বা সংস্থা কর্তৃক এই বিষয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাদের ফলাফলের সঙ্গে উপরি উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সমীক্ষা মিলিয়ে দেখা যায়,—নির্ণীত ফলাফল একটু, তফাৎ যা, তা সামান্যই।

উক্ত চেক্ ইন্‌স্টিট্যুটটি পনের শ' কর্মী-নারীর মধ্যে গবেষণা চালিয়েছিলেন। উচ্চতা-ওজন-ছাতি ছাড়াও আরো তেত্রিশ একমের দৈহিক মাপ (যেমন, হাতের ও পায়ের দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি) তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমীক্ষার ফলে যন্ত্রবিদ্‌দের সুবিধে হয়েছে—যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির 'ডিজাইন' কমিনীদের ধাত অনুসারে তৈরি করার পক্ষে।

• • • •

পৃথিবীর মধ্যে প্রথম নারী-ভ্রমণ-সংস্থাটির নাম 'লেডী সাবেনা ক্লাব'। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশবিদেশে যেসব মেয়েরা পর্যটন করে দেখতে চান, তাদের সংশ্লিষ্ট নানা ব্যাপারে সাহায্য করা, যেমন—শুল্ক বিভাগ, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কৃত্য; তাছাড়া যেসব মায়েরা বাচ্চাকাচ্চা সমেত ভ্রমণ করেন তাঁদের বিশেষ সুবিধাদান, ইত্যাদি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ক্লাবটির বর্তমানে ২,৩০,০০০এরও বেশি সদস্যা। এই সদস্যারা বেশির ভাগই সাবেনা বেলজিয়াম ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্‌স্-এর মহিলা যাত্রী।

লেডী সাবেনা ক্লাবের বিভিন্ন শাখার ক্লাবঘরগুলি সুসজ্জিত, আরামদায়ক। সদস্যাদের আছে এইসব জায়গায় অবাধ যাতায়াতের অধিকার—তা সে ব্রাসেল্‌স্-ই হোক, নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ এভিনিউই হোক, মন্ট্রিল, প্যারিস, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, স্যান ফ্রান্সিস্কো, মেক্সিকো, জোহানস্‌বার্গ, কেপটাউন, বুডাপেস্ট, যেখানেই হোক। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে নিমন্ত্রণাদিও করে থাকেন। ফলে গড়ে:ওঠে এক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ-ভাব ও আদানপ্রদান।

• • • •

এবারে মেক্সিকো ও অলিম্পিকে রাশিয়ার মেয়েরা বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি যেন, সে

বিষয়ে অনেকের বিস্ময় জেগেছে। শোনা গেল, রুশ প্রতিনিধিরা মেক্সিকোর মত অতটা উঁচু জায়গায় অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জায়গাটা অনেক উঁচুতে বলে বাতাসে অক্সিজেনের অনুপাত নাকি কিছু কম এবং তারই ফলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়ে রুশ মেয়েদের (পুরুষদেরও) অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। আর সেই অসুবিধের জন্যেই রুশ প্রতিযোগিনীরা তাক্ লাগতে পারলেন না জগৎকে।

• • • •

অলিম্পিক যে-কদিন ধরে হয় সেই কদিন ক্রীড়াঙ্গনের একধারে জ্বলে এক অনির্বান মশাল—পূতাগ্নি। নিয়ম, অলিম্পিকের আদি অনুষ্ঠান গ্রীস থেকে পবিত্র আগুন 'গ্রীসে'-প্রথায় ক্রীড়াস্থানে আনা হয় এবং সেখানে একজন অ্যাথলীট পুত মশালটি ঐ আগুনে ধরিয়ে নেবেন। এবারে এই শেষ পর্বের ভার যাঁর ওপর পড়েছিল তিনি মেক্সিকোর মেয়ে, দৌড়বিদ, নাম এনরিকোয়েটা বাসিলিও। ঐ পবিত্র দায়িত্ব ব্যাসিলিওর কাছে যেন যোগসাধনার সামিল হয়েছিল। ঠিক মনে হয়েছিল, ওঁর ওপর দৈবের 'ভর' হয়েছে এই ব্যাপারে। বহু আগে থেকেই দেহে ও মনেপ্রাণে তিনি তৈরি হয়েছিলেন এই কাজের জন্যে—যেন যোগিনী, সাধিকা। এই প্রসঙ্গে কে যেন একজন মন্তব্য করেছিলেন, 'এ আর-এক জোয়ান অফ আর্ক।'

• • • •

অনেক পদের মধ্যে একটি অলিম্পিক 'পদ' ছিল মেয়েদের ব্যক্তিগত 'ফয়েল' প্রতিযোগিতা। 'ফয়েল' (foil) হচ্ছে একধরণের তরোয়াল যার মাথা ও দু'পাশ (ধার) ভোঁতা, ধারালো নয়, আর শীর্ষস্থানে বোতাম বসান। এই প্রতিযোগিতার কোয়ার্টারফাইনাল খেলায় দেখা গেল, খেলাধূলোয় মাথা গরম করাটা পুরুষদেরই কেবল একচেটে নয় (আমাদের, মেয়েদের পক্ষে, অবশ্য লজ্জার কথাই, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।)

তিনঘণ্টা ধরে এই খেলায় মুখোমুখি ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইটালি। তিনঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি, বচসা, মেয়েলি ঝগড়া, খেলা বন্ধ হওয়া মাঝে মাঝে, রেফারীর নির্দেশ সম্পর্কে বার প্রতিবাদ, ইত্যাদি।

একসময়ে ইটালির মেয়েরা বললেন, রুশিনীরা অবৈধ পন্থা গ্রহণ করছেন, রেফারী তা দেখছেন না। তাঁরা জানালেন, রুশ দলের গ্যালিনা গোরোখোভা ও আর্টিয়ানা সামুসেঙ্কো বুকের আড়াআড়ি হাত রেখে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে দিচ্ছেন না। রুশিনীরা প্রতিবাদ করলেন। মাঝখান থেকে রেফারী বুকান্‌ৎজ্ অপসৃত হলেন।

আরেকটি ঘটনা। ইটালিনী আন্টোনেলা ব্রাগ্‌নো এবং রুশিনী গ্যালিনা গোরোখোভার মধ্যে অসিযুদ্ধ হচ্ছে। ইটালির প্রতিনিধিরা অভিযোগ জানালেন, দুই দলুয়ের তরোয়ালের হাতল খালি, কোন আচ্ছাদন নেই; যার ফলে লড়াইয়ের কালে "শর্টসার্কিট" হবার খুব সম্ভাবনা।—খেলা তখন বন্ধ করান হল।

এমনি সব আরো কত।

• • • •

যা দেখা যায়, তা-ই সব সময় সত্য না হতেও পারে, বিশেষতঃ প্রকৃতিদেবী যখন মাঝে-সাঝে ধাপ্পাবাজীপনা করেন। যে মানুষটিকে আপনি মনে করছেন স্ত্রীলোক তার মধ্যে হয়ত পুরুষত্ব রয়েছে লুকিয়ে আর যে পুরুষ, তিন বছর বাদে সে-ই হয়তো নারীতে পরিণত হয়ে গেল। এই কারণেই এবারের অলিম্পিক লিঙ্গ নির্ণয় ব্যাপারে (প্রতিযোগিনী-প্রতিযোগীদের) ডাক্তারী প্রথায় অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হয়েছিল। পুরুষ বা স্ত্রী হওয়া চাই তবে নামতে দেওয়া হবে। মোটমাট ৮৪৮ জন প্রতিযোগিনীকে চিকিৎসাশাস্ত্রমতে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তবে সার্টিফিকেট দেওয়া হল যে, হাঁ, ওঁরা খাঁটি স্ত্রীলোক, মহিলাবিভাগে নামতে পারেন।

• • • •

হাঙ্গেরী দেশের তরুণী তেইশ বছরের আনা পেকার 'ব্যালেটিং' প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। সেমিফাইনালে তিনি অংশগ্রহণ করছেন, কালো চুলে অনেকটা যেন জলপরীর মত দেখাচ্ছে, অলিম্পিক ক্রীড়া-যোদ্ধীরা তাঁর সাহসিকতার জন্যে প্রশংসা করছেন—এমন সময়—কী বিপত্তি! আচমকা নৌকা থেকে পড়ে গেলেন আনা। চোট লাগল, প্রায় অজ্ঞান হয়ে তলিয়ে গেলেন। হৈ হৈ উঠে গেল, ডুবুরীরা সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল জলে, উদ্ধারও করে নিয়ে এল তাঁকে। ইতিমধ্যে কিন্তু সেমিফাইনালের গতি পেরিয়ে গেছেন আনা—বিশ্রামের সময় নেই, দেড় ঘণ্টাটাক বাদেই নামতে হল ফাইনাল প্রতিযোগিতায়।—প্রথম হতে পারলেন না (কে জানে, দুর্ঘটনা না ঘটলে হতেন হয়ত!), আনা হলেন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, পেলেন রূপোর পদক।

• • • •

হাই ডাইভিং-এ চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে মিলেনা ডুচকোভা, বয়স ষোল, পলকা আসনে উঠে দাঁড়ালেন সোনার পদক নিয়ে। ঐ দেশের আর কোন ডাইভার এর আগে অলিম্পিকে সোনার পদক পাননি। দ্বিতীয় হলেন যিনি তাঁর নাম লোবানোভা, ডুচকোভার চাইতে প্রায় ৪ পয়েন্ট কম হল তাঁর। লোবানোভা রুশ মেয়ে।

• • • •

উইলমা টাইউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, একজন 'স্প্রিন্টার'। বয়স ২৬। টোকিও, অনুষ্ঠানে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। এবারে মেক্সিকোতেও ঐ বিভাগে বিজয়িনী হলেন। আধুনিক অলিম্পিকে এ এক অভিনব কৃতিত্ব, যার একমাত্র অধিকারিণী এই তরুণীটি। এগারো সেকেণ্ডে ১০০ মিটার জিতে পৃথিবীর এক রেকর্ড স্থাপন করলেন। মাঠে তখন অঝোর বর্ষা। সোনার পদকটি হাতে নিয়ে টাইউস হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘোষণা করে বসলেন সবার সামনে—স্প্রিন্ট থেকে আমি এবার অবসর নিলাম, এতে আর ভবিষ্যতে নামব না।

• • • •

লং জাম্প প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার তরুণী ভিওরিকা ভিস্কোপোলিয়ানু কৃতিত্ব দেখালেন ২২ ফুট ৪½ ইঞ্চি পার করে দিয়ে। গত টোকিও অলিম্পিকে ২২ ফুট ২½ ইঞ্চি পেরিয়ে নাম কিনেছিলেন ইংলণ্ডের মেরী র‍্যাণ্ড, এবং সেটাই এযাবৎ পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড হয়েছিল। ভিওরিকা সে গৌরব ম্লান করে দিলেন এবারে।

• • • •

আর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে ভেরা কাসলা—ভাভা। গত টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাষ্টিক্সের চ্যাম্পিয়ন এবারেও চারটে সোনার পদক নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন। মহিলা বিভাগের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপও আয়ত্ত করলেন। রানার্স আপ হলেন জিনাইদা তরাসিনা।

মাঠের পর জুডো। সেখানেও ভেরার সাফল্য। চাব্বিশ বছরের মেয়ে প্রতিযোগিতার পরেই বিয়ে

করলেন স্বদেশীয় ক্রীড়াবিদ্ মোলেক অন্তর্লোকিনকে। হঠাৎ বিয়ে, তড়িঘড়ি বন্ধন—এই জন্ত, যে বর কনের বাবা-মা'রাও মেক্সিকোর এই বিবাহানুষ্ঠানে এসে পৌঁছবার সময় পেলেন না।

• • • •

বাস্তবিক, এবারের মেক্সিকো অলিম্পিক যেমন অনেক রেকর্ড দেখিয়েছে, তেমনি রেকর্ড স্থাপন করেছে দাম্পত্য ক্ষেত্রে। দেব প্রজাপতি যেন ওৎ পেতে ছিলেন। বিয়ের ছড়াছড়ি অলিম্পিক 'গ্রামে'।

প্রথম বিয়ে করলেন মিস্ ইন্গ্রিড এবুসেন। নরওয়ের হৌড়বীর আর্ন কৃতালহাইম হলেন বর। নরওয়ের অ্যাথলেটিক ফ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পের্ সোমেরুড কর্ণধার দাঁড়ালেন। মেয়েও নরওয়েরই।

এর পরেই গেল ডেরা কান্সাডাস্তার বিয়ে।

চব্বিশ বছর বয়স্কা সুইডিশ ব্যালেরিণা কুমারী অ্যানেল মেরিয়া মোহানসন মালা দিলেন কানাডিয়ান ডিস্কাস্ ফেলক ছাব্বিশ বছরে জর্জ ক্রুসের গলায়।

মেক্সিকোর হোস্টেস্—দোভাষী মিস্ নোরা ডেল পালো বিয়ে করলেন ইটালির সাঁতার শিক্ষক রিচার্ড বীডাগকে।

বিয়ে করলেন মেক্সিকোর জিমন্যাস্ট মিস্ রোজারিও ব্রিওনেস স্বদেশীয় ওয়েটলিফ্টার ম্যাহুয়েল ম্যাটীওস ডি লা, রোজাকে। দুজনেই কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কা, অতএব বয়স্কার উভয়ের বাবা-মার সম্মতি। তা, সে সম্মতি পেতে কোন অসুবিধা নেই—'দুল্হা-দুল্হিন রাজি তো ক্যা করেগা কাজি'!

• • • •

সব ভাল, যার শেষ ভাল। এইগুলি ছাড়া প্রজাপতির নির্বন্ধ আরো ঘটেছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে মেক্সিকো অলিম্পিকের যে মহড়ের সমাপন হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। নতুন বরকনের সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করুক, এটাই দেবতাদের চায়।

কলকাতার আদিপর্বে টেকচাঁদের 'আলাল' এবং 'হুতোমের নক্সা' প্রকাশিত হবার সমসাময়িক কালে পুলিয়ার রামসহায় গুপ্ত 'টেকচাঁদ ঠাকুর (ঘুনিয়ার)' এই ছদ্মনামে "কলিকাতার নুকোচুরি" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির প্রকাশকাল ১লা এপ্রিল ১৮৬৯। তার নাম-পৃষ্ঠার প্রতিলিপিটি এই সঙ্গে দেওয়া হল।

এই গ্রন্থে লেখক ১০০ বছর আগেকার কলকাতার সমাজের কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকেছেন। কাহিনীগুলির মধ্যে স্নেহ আছে, কেচ্ছা আছে, বড়মানুষদের বেহিসাবী কাণ্ড কারখানার কথা আছে, নামী ব্যক্তিদের ভণ্ডামীর প্রতি বিদ্রূপ আছে, আর আছে অযোগ্য ব্যক্তিদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার দুঃসংবাদ। এইসব কাহিনীর মধ্যে যে-নীতি বাক্যটি প্রচ্ছন্ন, তা এই সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটির মুখপাতেই দেওয়া হয়েছে। বইটির মধ্যে লেখকের যে কথাটা বড় হয়ে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে, দেশের মানুষ ক্রমে অমানুষে পরিণত হচ্ছে এবং তার ফলে দেশ ও সমাজ ক্রমেই অধঃপাতে যাচ্ছে। একশো বছর আগে বাংলা রচনারীতি কেমন ছিল, তারও কিছু আভাস এইসব কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। বইটির মধ্যে থেকে প্রথম কাহিনীটি এই সংখ্যায় পরিবেশিত হল। এগুলি আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য, বিলুপ্ত বললেই চলে। সম্পাদকীয়—সম্পাদক

কলিকাতার নুকোচুরি

টেকচাঁদ ঠাকুর (ঘুনিয়ার)

অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল

ধন বিদ্যা কার্য্যদক্ষ হইলে কি হয়
বুঝিয়া যে নাহি চলে কভু সুখী নয়।
দেখে শুনে তবু দেখি চলে সেই ছেলে
কারে কি বলিব এই দোষে দেশ খেলে।

আমার নাম গদাধর ঘোষ, বয়স ত্রিশ বৎসর, ভদ্রবংশীয় এবং আমার নিবাস বলাগড়।

আমার পিতা পনেরোকড়ি ঘোষ মৃত্যুকালীন প্রচুর বিষয় রাখিয়া যান, তাহা আমি অল্পদিনের মধ্যে সব শেষ করেছি।

ইংরাজী ১৮৬২ সালে পিতার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিবস কোম্পানীর কাগজ ও হরেক রকম চা ও ব্যাঙ্কের শেয়ার খরিদ বিক্রয় করিলাম।

কথায় বলে 'যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের পিঠে লাটি বাজে।' আমারও হইল তাই। যাহা

কলিকাতার নুকোচুরি

THE MYSTERIES OF THE SOCIETY IN CALCUTTA

By

Tekchand Thakur (Junior)

Hear me a little
For I have been silent so long
Shakespeare

CALCUTTA
Printed by : Oroonodoy Ghose
BIDYA RUTNA PRESS
Chitpore Road, Buttolah, No 318
April—1869.

To be had at Messrs D. Rozario & Co.,
Sanskrit Press, Calcuta Vernacular
Literature Society & at, 318, Buttolah
Price 12 Annas.

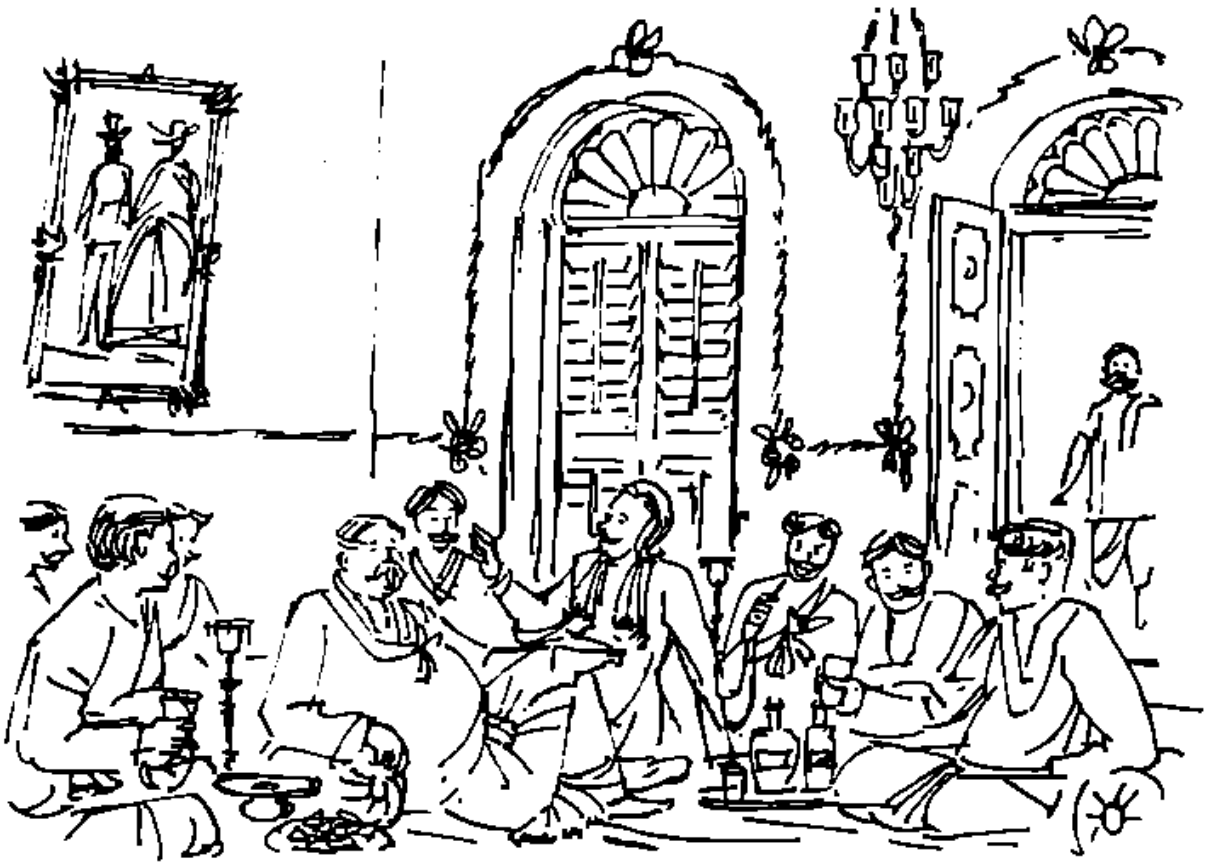

বাবুর বৈঠকখানা সর্বদা গুলজার
থাকিত···বাবু হাই তুলিলে
তুড়ি দিতে হত·····

জানিনা বুঝিনা সেই কর্ম করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক বিষয় জলাঞ্জলি দিয়া বড়বাজারে বুঁইর খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাহাতেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিল

কলিকাতা আজব সহর। পরে আমি পক্ষীর দলে ঢুকিয়া সুখলাভ করিতেছি এমন সময় "সুরাপান নিবারিনী" নামে এক সভা স্থাপন হল। তাহাতে এক নামকাটা সেপাই, পগারের অগাধর পগাধর বাবুরা ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকেই সভ্য হইয়া প্লেজ (pledge) লইলেন। ইহারা দিবসে সভার সভ্য হইয়া সুরাপান নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন; রাত্রে পুনর্বার আমার সহিত পক্ষীর দলে ঢুকিয়া ওড়েন। এ এক রকম মন্দ লুকোচুরি নয়।

একদা আমি কতিপয় সঙ্গী লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে গিয়া দেখিলাম, নব্য, ভব্য, সভ্য ব্রাহ্মেরা সকলেই চক্ষু মুদিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন ও প্রধান আচার্য্য যেমত অঙ্গ দোলাইতেছেন, অন্য অন্য সম্প্রদায়িরা টু কপি (true copy) করিয়া সেইরূপ করিতেছে। তাঁহের ভাব ভঙ্গি দেখে আমারও মনের মধ্যে একটি ভাবোদয় হল, "ঈশ্বর কি অঙ্গ না দোলাইলে ও চক্ষু মুদিত না করিলে আবির্ভাব হন না?" আমি তো ইহা কিছুই বুঝিলাম না, কাহাকে যে জিজ্ঞাসা করি, এমন একজনকেও নিকটস্থ দেখিলাম না। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের চার ইয়ারী দলের অনেককে ঐ দলভুক্ত দেখিলাম, তাঁরা দিবসে যে কার্য্য না করেন এমন কর্ম নাই, ও রাত্রে স্থান বিশেষে পরমহংস হন। কলিকাতার এও একরকম লুকোচুরি।

শামরলাল মিত্র বাবু বড় ধনিয়াদি ঘরের দৌহিত্র সন্তান। তিনি বাল্যকালাবধি পিতৃ আদর পাইয়া আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন। দেখা পড়ায় সরস্বতী কঠিন, দেহতে কার্ত্তিকের ন্যায়, পেটটি গণেশের মত, বয়সে তরুণ, লক্ষ্মী বিরাজমানা, আর বড় খোরচে ছিলেন। তিনি আমাদের চার ইয়ারি দলের কাপ্তেন। বাবুর বৈঠকখানা সদা সর্ব্বদা গুলজার থাকিত, উইলসনের খানা ও সেইন কোম্পানীর মদে পরিপূর্ণ, এ কারণ আমাদের সদা অহরহ ভিজান ও উদর পূর্ণ থাকতো। আমার বিষয়াদি নষ্ট হওয়াতে শামরবাবুর এডিক্যাম্প হইলাম। বাবু হাই তুলে তুড়ি দিতে হোতো ও হাঁচলে জীবো বলতে হোতো।

কলিকাতায় এক একদিন একরকম হুজুক উঠে। আজ হরি মোহিনী হাংগাম, কাল কালীবাবুর হাড়কাণ্ডী, পরশু চিৎপুরে ইয়ং বেঙ্গলের ঘোড়দৌড়, ও মধ্যে মধ্যে কেশব সেনের কেরাকি গাড়ীর মতো লেকচার, তাহার থামা নাই, কেবল ঘড় ঘড়ানি।

"অবাক কলি পাপে ভরা।" সময়ে সময়ে কত রকমই দেখতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না।

ক্রমে অগাধর পগাধর বাবুরা বড় ঘরের মেম্বর, ও শ্যালার মার শ্যালা মুৎসুদ্দি, ও দালাল ডিরেক্টর হলেন। কলিকাতার যাচবিচার নাই।

ক্রমে রাজা প্রতাপচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন। রাধাকান্ত বাবার লীলা দর্শনে বৈরাগী হলেন। বাহাদুরদের বাহাদুরির সীমা ছিল না। অন্নাপুত্র দুর্ভিক্ষ দুর্ভীকরণে অবৈতনিক সম্পাদক হলেন। সিদুলার রুদ্রচন্দ্র গরুচন্দ্র মিলিয়ে গ্যালেন, আজকাল তাঁহাদের কথা আর বড় শোনা যায় না। হরচন্দ্রের গুলদাস শুঁই মাথা ছেড়ে বেড়ে উঠলো। পীরের মরণায় বিবি কীর্ত্তি স্থাপন কোরলেন। কলিকাতার লুকোচুরির কোথাও কমী নেই।

ক্রমে বিদ্রোহীরা শাসন হইলে লর্ড কেনিং বিলাত গিয়া ঐর্য্য প্রাপ্তি হইলেন। এখানে গুজব উঠলো,

নন্দু ঠাকুর সিবিল হলেন, কৃষ্ণ বন্দ্যো কালী যাবার উদ্যোগ কোরেন, বিহারীলাল প্রসিদ্ধ পাদরি হোলো। আমাদের মহেশরপুরের দাদাঠাকুর হাড়হোড় ভাঙ্গা "দ" হইয়া পড়িলেন। তিনিও পক্ষীর দলের একজন প্রধান, "সময়ে সকলি করে, মণি, কবি হয়ে হংসে অমৃত গরলাকরে।" এই এক বুলি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে কালাবতী লাগাইতেন। দাদা ঠাকুরের খিড়কীর পারের কেষ্টা ছোলা সভাপণ্ডিত হইয়া চূড়ামণি কবলাতে লাগলেন। তাহার পেটের ভিতরে সরস্বতী হাবা হাবা করে, সংস্কৃতের মধ্যে গোটাকতক "বংসের গাদু মারি জামি:" গোচ বোল শিখিয়াছিলেন। এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই বিদ্যা সেইরূপ। এও কলিকাতার লুকোচুরি।

কালাচাঁদ আনাড়ি মেজেষ্টর হইলেন, গজাপতি মাষ্টার একবাড়ি দুইবাড়ি দিয়া কেতাব ছাপাইলেন। হাবাতে কালী গাইয়ে হোলো, কন্দর্প ঘরের ঘরে মদ চুকলো। দেখে শুনে মহাতাপ চন্দ্র হাবজিপিসে সরলেন। জ্ঞান চন্দ্রের দীপ্তি প্রজ্জলিত হোলো, রেলের গাড়ী দিল্লী যেতে শুরু হোলো, ও শরতের মেঘের ন্যায় গোটাকতক টোকরে ছোঁড়া ছোঁটা ছোঁটা ইংরাজী কহিতে আরম্ভ করিল, তাদের মাথা মুণ্ডু কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, ইংরাজী কহিতে কহিতে অমনি বাংলা কথা এসে বসে, কিন্তু ইংরাজী না কহিলে নয়।

গোবের মার গোবের চাকরি হোলো, অঘোর বসু কানা গরু পার করিল, রেভাব দয়জী "সমীরণ তোরা" বোলে বাছা রামের মত খোনা আওয়াজে গাইতে লাগল। দেখে দাদা ঠাকুর লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন, "আমার ছিল যে বাসনা, পোড়াকপাল ক্রমে তা হোলো না।" আমিও দেখে শুনে বেরিয়ে পড়লেম। কলিকাতার লুকোচুরির দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

The Theatre has become the home of great thoughts, profound problems, intense human emotions and passions. The Theatre has ceased to be a soulless recreation, it has become an Art that has to be approached in all seriousness and with the greatest sense of responsibility.

P. A. Markar
The Soviet Theatre.

আলোচনা

প্রতিবেশী মণিপুরের নাট্যধারা

অরবিন্দ পালিত

উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজদের সঙ্গে মণিপুরের যোগসূত্র স্থাপিত হয় ব্রহ্মযুদ্ধের মাধ্যমে। ১৮৩৪ সালে মণিপুরে বৃটিশ ভারতের পোলিটিক্যাল এজেন্সী স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সালে বৃটিশরাজ মণিপুর অধিকার করে এবং তখন থেকে মণিপুর দেশীয় রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়। মধ্যযুগ থেকেই মণিপুরের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র ছিল। তাছাড়া, শ্রীহট্ট এবং পূর্ব বাংলার বহু বাঙালী মণিপুরে বসবাস করতেন। ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত হতেই উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বহু বাঙালী ভাগ্যান্বেষী মণিপুরে আসতে থাকেন। পোলিটিক্যাল এজেন্সীর অফিস, মণিপুর রাজদরবার, শিক্ষকতা, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরী জুটিয়ে শিক্ষিত সংস্কৃতি প্রিয় বাঙালীর সমাবেশ হতে থাকে মণিপুর তথা তার রাজধানী ইম্ফলে। ইম্ফল নদীর ধারে বাবুপাড়া নামে একটি চমৎকার বাঙালী কলোনী গড়ে ওঠে এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাবুপাড়া থিয়েটার হল—মণিপুরের প্রথম থিয়েটার হল। দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য বিবিধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে অভিনীত হত বাংলা নাটক। তৎকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর অপেশাদারী নাট্যমঞ্চ বলা যায়। নাটক, অভিনয়, প্রয়োগ, শিল্প ইত্যাদি সবকিছুই ছিল যুগোপযোগী অর্থাৎ গিরিশবাবু দানীবাবু অমৃতলাল—এই ধারায়। যেহেতু বাংলা ভাষা তখন মণিপুরের প্রচলিত ভাষা, সুতরাং এই সব নাটকের রসগ্রহণে মণিপুরীদের কোন অসুবিধেই ছিল না। এই সময়েই

একদল মণিপুরী যুবক এই বাঙ্গালী থিয়েটারে যোগদান করেন এবং অভিনয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এঁরাই হলেন পরবর্ত্তীকালের মণিপুরী নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ।

এই সময়ে যে সমস্ত বাংলা নাটক মণিপুরীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেগুলি হল, কর্ণার্জুন, হিন্দিবহী, জগাইমাধাই, আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে লক্ষনীয় যে বাংলা সামাজিক নাটক বা প্রহসন যেমন প্রফুল্ল, সধবার একাদশী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এগুলি মণিপুরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি, সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসে বাংলা দেশে তখন যে যুগসন্ধিক্ষণ চলছিল, মণিপুর সমাজ তার থেকে অনেক পেছনে একটা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়াতে বাস করছিল। সম্ভবতঃ সেইজন্যই সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্ত্তনজনিত সংঘর্ষে যে নাটকগুলি সম্পর্কিত, মণিপুরীদের কাছে সে সংঘর্ষ ছিল হয়তো কিছুটা অবাস্তব। তাই সেগুলি ততটা হৃদয়গ্রাহী হয়নি।

ইতিমধ্যে মণিপুরী যুবকেরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালীদের মতই, মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করে তোলার দিকে মন দিলেন। ধীরে ধীরে মণিপুরি ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু হল। অবশেষে মণিপুরী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও স্বীকৃত হল।

এর প্রভাব মঞ্চেও পড়ল। শুরু হল মণিপুরী ভাষায় লিখিত নাটকের উৎপত্তি। নিঃসন্দেহে প্রথম প্রথম জনপ্রিয় বাংলা নাটকগুলিরই অনুবাদ হতে থাকল। অভিনয় এবং প্রযোজনাশিল্প তৎকালীন বাংলা নাট্য-মঞ্চেরই অনুরূপ ছিল। পরিচালক এবং শিল্পীরা প্রযোজনার পূর্বে কলকাতায় এসে এইসব নাটকের অভিনয় দেখতেন রাতের পর রাত ধরে।

এরপর এল মৌলিক নাটক। প্রথমদিকের মৌলিক নাটকগুলি হল চৈতন্যদেবের জীবনীমূলক এবং পৌরাণিক রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী আশ্রিত। এরপর এলো কিছু ঐতিহাসিক নাটক। ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের রাজা-রাজড়াদের কাহিনী নিয়ে লেখা। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা নাটকের অনুবাদ সমানভাবেই চলল। বাঙলা নাট্যমঞ্চে প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিশিরবাবুর আগের যুগ অবধি মণিপুরী নাটক খুব সহজেই পৌঁছে গেল। কর্ণার্জুন, কৌরবপতন, ভীষ্মের শরশয্যা, রামের অভিষেক, সম্রাট অশোকের ত্যাগ, আলেকজাণ্ডারের চন্দ্রগুপ্ত—এই ধরণের মৌলিক নাটক প্রচুর লেখা হল। একই বিষয় নিয়ে একাধিক নাটকও লেখা হল। মণিপুরের ইতিহাসের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীও নাট্যরূপায়িত হল। ওদিকে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁদের নাটকের অনুবাদও চলল।

বর্ত্তমানে মণিপুরে কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ নেই। অবশ্য বহু অপেশাদারী নাট্যদল আছে। এদের মধ্যে তিনটি দলের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে ইম্ফলে। সেগুলি হল, মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন, রূপমহল থিয়েটার এবং এরিয়ান থিয়েটার। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় এবং প্রযোজনাতে এঁরা আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছেন। ইম্ফল কলেজের অধ্যাপক শ্রী জি, সি, তোষত্রা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সোসাইটি থিয়েটার একটি নামকরা নাট্যদল। অধ্যাপক তোষত্রা নিজে একজন খ্যাতনামা নাট্যকার। মণিপুরের সমাজ জীবনের ছবি তিনি তাঁর নাটকে বিধৃত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বহু নাটক প্রহসনধর্ম্মীও বটে। বর্ত্তমানে তিনি একটি গ্রীক নাটকের অনুবাদ ও প্রযোজনা করবার চেষ্টা করেছেন। মণিপুরী নাটকে আধুনিকতার হাওয়া আনবার কিছুটা গৌরব নিঃসন্দেহে আকাশবাণী ইম্ফল কেন্দ্রের প্রাপ্য। ইম্ফল বেতার থেকে প্রচারিত মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীর লেখা "নন্দিনী" এবং "কাওয়াবারা হায় মানুমাবাগী আহিঞ্জো" (সেই রাত পুনিমার রাতের কথা কি ভুলে গেছ ?) নাটক দুখানি নিঃসন্দেহে মনোবিশ্লেষণ ধর্ম্মী

নাটক রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এছাড়া folk tale এর মধ্যে যে মাটা উপাদান রয়েছে সেগুলিও কিছু কিছু আকাশবাণীর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ড্রামা ফেসটিভ্যাল-এ মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন folk drama শাখায় রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করে।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

বিগত যুগের মঞ্চ নায়ক
যাদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০১—১৯৭৫

নতুন করে রঙমহলে নতুন নাটক খোলা হচ্ছে। অনুরূপা দেবীর মহানিশা উপন্যাসের নাট্যরূপ। রাশিয়া ফেরৎ সেতু সেন প্রডিউসার। ১৯৩৩ সালের ১৭ই এপ্রিল মহানিশা খোলা হয়। দেখতে গেলাম। চমৎকার দৃশ্য সজ্জা, আলোক সম্পাত, সেট সেটিং। অভিনয়ও চমৎকার প্রত্যেকেরই। তার মধ্যে একটি তরুণ অভিনেতা সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এই প্রথম তাঁকে সাধারণ মঞ্চে দেখা যাচ্ছে। সুন্দর পুরুষোচিত চেহারা। মিষ্টি কণ্ঠস্বর। চলনে বলনে পরিণত অভিনয় ক্ষমতার আভাষ। নাম রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। নায়ক নির্মলের ভূমিকায় অভিনয় করলেন এবং অভিনয়ে অল্প সকলকার ওপরে টেক্কা দিলেন। সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাও অর্জন করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

১৯০১ সালে ভালতলায় বাঁড়ুজ্যে পরিবারে জন্ম। ছোটবেলাতেই বাপ মাকে হারালেন। কাকীমার কাছে মানুষ। লেখাপড়া বেশীদূর করতে পারেননি। প্রথম চাকরি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে। পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংকেটরাণ সমিতিতে যোগ দেন, এবং তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেষ্টায় বেঙ্গল কেমিক্যালের কেশিয়ারের পদ লাভ করেন।

মুক্তির ডাকের সাহায্য সমিতির প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে মুরেশের ভূমিকায় তাঁকে সর্ব প্রথম মঞ্চে দেখা যায়। তারপর বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মিগণ কর্তৃক অভিনীত চন্দ্রশেখরের প্রতাপ এবং রঘুবীর নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে এতই খ্যাতি অর্জন করেন যে বহু পেশাদার রঙ্গ মঞ্চ থেকে তাঁর ডাক আসে। শেষ পর্যন্ত অভিনেতা রবি রায় তাঁকে রঙমহলে নিয়ে আসেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তারা তাঁর পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ে আপত্তি জানালে তিনি প্রথমে থিয়েটার ছেড়ে দেন কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি পেশাদার নটরূপে 'বাংলার মেয়ে' নাটকে সন্তোষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহু নাটকে তাঁর সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন অভিনয় আমরা দেখে আনন্দ পেয়েছি। অশোকে কুণাল, পরিত্রাণে রমেন, রাবণে মেঘনাদ, পথের সাথীতে বিশ্বনাথ, চরিত্রহীনে সতীশ, মন্বন্তরীয় সংসারে যতিলাল, মেঘমুক্তিতে প্রংশুৎ, তটিনীর বিচারে বসন্ত, সংগ্রাম ও শান্তিতে অবিনাশ, নাগিং হোমে নিরুপম, সিঁথির সিঁদুরে অশোক, পি. ডব্লিউ ডিতে সৌম্যেন, মেঘদূত-এ বসন্ত,

প্রভৃতি নাটকে তিনি উচ্চাঙ্গের নাটনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪২ সালের ২৭শে এপ্রিল মিনার্ভায় পটীন সেনগুপ্তের ঘাসী পান্না নাটকে বিক্রমজিৎ-এর ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়।

চলচ্চিত্রেও বহু ছবিতে তিনি স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। কয়েকটির নাম মনে পড়ছে, বিষবৃক্ষ, মন্ত্রশক্তি, পণ্ডিতমশাই, সোনার সংসার, পরিচয়, চাণক্য, শেষউত্তর, মাটির ঘর, শেষরক্ষা, সাপুড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক এবং পরিশীলিত রুচির মানুষ ছিলেন। আকর্ষণীয় ছিল তাঁর আলাপচারিতা।

নানা প্রসঙ্গ

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ঠাকুরবাড়ীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বিশেষ নাম। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ এবং রসরচনায় তিনি ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভা। তাঁর একটি বিলুপ্ত রচনার স্বল্প সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। নাটক যাঁরা চর্চা করেন, নাটক যাঁরা লেখেন, নাটক যাঁরা দেখেন, এক কথায় প্রত্যেক নাট্যামোদীই এই রচনার মধ্যে বহু তথ্য পাবেন]

সকল দেশের সাহিত্যে ও নাট্যের রচনা-পদ্ধতিতে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

নাটক বলিলে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝিয়া থাকি? নাটক কাহাকে বলে? যখন কবি নিজমুখে কিছু বর্ণনা না করিয়া, কোন আখ্যায়িকার কতকগুলি পাত্রকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া, তাহাদের নিজমুখে নিজকথা কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করান, তখনই তাহা নাটকের আকার ধারণ করে। কিন্তু উহা কেবল নাটকের বাহ্য আকার মাত্র। ঐ সকল পাত্রগণ পরস্পরের সহিত এমনভাবেও কথা কহিতে পারে, যাহাতে পরস্পরের মনে কোনপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না—উহাকে কি নাটক বলা যাইতে পারে? "তুমি কেমন আছ?—আমি ভাল আছি" ইত্যাকার কথাবার্ত্তায় নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায় না—উহাকে নাটক বলা যায় না। এই প্রকার কথোপকথন, অঙ্ক হিসাবে যতই মনোরম হউক না, নাটকের হিসাবে উহা ফলপ্রদ নহে। প্রধান পাত্রদিগের পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করাই নাটকের প্রধান কার্য্য, এবং তাহার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে। এই মানসিক বিকারের সমষ্টিই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। এই সুখদুঃখময় জীবনে, মানুষ সুখকে আলিঙ্গন ও দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে, এবং ভবিতব্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নিজ পুরুষকার প্রকটিত করে। এই মানসিক জীবন-সংগ্রামে মানুষ উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, নিজ স্বার্থকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই, নাটকে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া কখন শত্রুভাবে, কখন মিত্রভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতেছে। এই কার্য্যশীলতাই নাটকের প্রাণ। নাট্য-কবি, জীবনের সামান্য দৈনিক ঘটনাগুলি বাদ দিয়া, যে গুলি প্রধান ঘটনা—যাহা পরস্পরের মনোবিকার উৎপাদনে সমর্থ—তাহাই

নির্দ্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে মূর্ত্তরূপে প্রদর্শন করেন এবং এমন ভাবে প্রদর্শন করেন, যাহাতে তাঁহার নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উপরেই নাট্য-কাব্যের গুণপনা নির্ভর করে।

আধুনিক উপন্যাসেও এইরূপ কথোপকথন মধ্যে মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন কখন যে তাঁহা পড়িয়া যায়, আখ্যান-কবি তাহা নিজ কথায় পূরণ করিয়া লেন; অর্থাৎ আনুষঙ্গিক অবস্থা ও ঘটনাগুলি তাঁহার নিজ মুখে বর্ণনা করেন। কিন্তু নাট্য-কবি এরূপ উপায় অবলম্বন করেন না। তিনি সকল স্থলেই তাঁহার পাত্রগণকে জীবন্ত সাজাইয়া আসরে আনয়ন করেন; এবং তাহাদের অবস্থার অনুরূপ কথাবার্ত্তা তাহাদের নিজের মুখ দিয়াই ব্যক্ত করেন। উপন্যাস ও নাটকের রচনায় এই মুখ্য প্রভেদটি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। এই জন্যই রঙ্গপীঠের আবশ্যকতা। অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুকরণবৃত্তিই অভিনয়ের মূল। কোন নাট্য-রচনাকে দুই হিসাবে বিচার ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এক, উহার কাব্যাংশ লইয়া, আর এক, উহার নাট্যাংশ লইয়া। নাটক দৃশ্য-কাব্যের অন্তর্গত; অভিনয়ই উহার প্রাণ। উৎকৃষ্ট নাটক মাত্রই কতকটা কাব্যরসাত্মক। এ স্থলে শুধু ছন্দোবদ্ধ লেখাকেই আমি কবিতা বলিতেছি না। কি গদ্য, কি পদ্য, উভয়েতেই কাব্য-রস থাকিতে পারে। নাট্য-রচনার ভাবে ও বাস্তব কল্পনার মধ্যে যে কাব্য-রস প্রকাশ পায়, তাহা কাব্যাংশেরই সামিল। নাটকের নাট্যকলা বিশেষরূপে কিসের উপর নির্ভর করে? যখন সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি অখিণ্ডিত অথচ সম্পূর্ণ যোগ প্রকাশ পায়, তখনই উহা কলার মধ্যে পরিগণিত হয়। শিল্পকলা মাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি। প্রত্যেক ললিত কলার বিশেষ সৌন্দর্য্য এক একটি বিশেষ-বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা, এই রূপ কল্পনা প্রত্যেক কলা-বিদ্যার ভিত্তিভূমি। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস প্রতিভাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত কলার অন্তর্গত হয়। তাজমহলের গঠনে যে রূপ-কল্পনা লক্ষিত হয়, তাহার বিচিত্রতার মধ্যে সুন্দর একতা আছে। এই বিচিত্রতার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের এত প্রশংসা। গ্রীসদেশীয় নাট্য-সমালোচকগণ এইজন্য নাট্য-কলায় তিনটি একতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। প্রথম—কালের একতা, দ্বিতীয়—স্থানের একতা, তৃতীয়—আখ্যান-বস্তুর একতা। কিন্তু সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কতকগুলি য়ুরোপীয় নাটকে দেশকালের একতা ততটা রক্ষিত হয় না। আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচকগণ, বস্তুগত একতা ও উদ্দেশ্যগত একতাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্য-দর্পণও কতকটা এই মতের পক্ষপাতী। সাহিত্য-দর্পণ বলেন—

"বিষ্কম্ভাবঙ্কটৈঃ কার্যঃ কিঞ্চিৎ সংসারিবিষ্কুকঃ।
দূরোক্ত বহুভিঃ কার্য্যৈর্যুক্তসংহৃতিমান্ ন চ।"

অর্থাৎ "নাটকের বিষ্কম্ভ অবান্তর অংশগুলির মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গতা রক্ষিত হওয়া চাই; বিষ্কুগুলি—অর্থাৎ মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও কিঞ্চিৎ সংসার হওয়া চাই; নাটকে বহু ব্যাপার থাকা সঙ্গত নহে এবং বীজ অর্থাৎ প্রধান প্রকৃতিরূপ মূল কারণেই যাহাতে সংহার না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।" নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচকগণ যাহা বলেন, আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণও ঠিক তাহাই প্রতিপাদন করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অভিনয়ই নাট্যকলার প্রাণ। নাট্যশাস্ত্রে চারি প্রকার অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়,—বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক। গদ্য পদ্যাদির দ্বারা অর্থযুক্ত রচিত বাক্যের দ্বারা যে

অভিনয় হয়, তাহাকে বাচিক অভিনয় বলে। নেপথ্য-বিধানের দ্বারা যে অভিনয় হয় তাহাকে আহার্য্য অভিনয় বলে। নেপথ্য-বিধি চারি প্রকার,—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা। শৈল, যান, বিমান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা, এই সকলের নাম পুস্ত। মালা আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে অঙ্গাদি ভূষিত করাকে অলঙ্কার বলে নেপথ্য হইতে যে প্রাণী প্রবেশ হয়, তাহারি নাম সংজীব। পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও বিবিধ বর্ণের দ্বারা সাজানকে অঙ্গরচনা বলে। সুখদুঃখ মনোবিকারকে সত্ত্ব বলে। এই মনোবিকার আট প্রকার। যথা,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বিবর্ণতা, ও অশ্রু প্রকাশ করিয়া যে অভিনয় হয় তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলে।

বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সাম্বিমা; সেই দৃশ্য যদি বহুঘটিত হয়, তবে তাহাকে ভঙ্গিমা বলে; যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টমান। ইহার মধ্যে সচিত্র দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে চিত্রপটের দৃশ্যও রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত হইত; তাঁহারা বলেন যে, ভবভূতীর "উত্তর রামচরিতে," সীতাকে লক্ষ্মণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন ভ্রমণ-পথের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, সেকালে সচিত্র দৃশ্যও ছিল। কিন্তু এই যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা আখ্যান-বস্তুরই অন্তর্ভূত, তাহা নাট্যদৃশ্যের হিসাবে প্রদর্শিত হয় নাই। আর এক কথা, সেকালের চিত্রকলার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দূরদৈকট্য সূচক পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রলেখা-পদ্ধতি জানা ছিল কি না, কিম্বা প্রচলিত ছিল কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাস্তবের কতকটা অনুকরণ করিয়া, দর্শকের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন করাই অভিনয়ের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে দৃশ্য-চিত্রে কৌশল প্রকটিত না হয়, তাহা বাস্তবিক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বোধ হয়, তখনকার নাট্যাভিনয়ে সচিত্র দৃশ্যের ব্যবহার ছিল না। রথ, বিমান, জীবজন্তু প্রভৃতি রঙ্গপীঠে আনীত হইত, কিন্তু কোন প্রকার সচিত্র দৃশ্য প্রদর্শিত হইত না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার আবশ্যক হইলে দৃশ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত না—রঙ্গপীঠের উপর চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়াই তাহা সূচিত হইত। কলকথা এখনকার ন্যায় সেকালে দৃশ্যাদির আড়ম্বর ছিল না, অনেকটা দর্শকদের কল্পনার উপরেই নির্ভর করা হইত। একালে, সর্ব্বদেশের রঙ্গালয়েই দৃশ্য প্রদর্শনের আড়ম্বর বাড়িতেছে এবং প্রকৃত অভিনয়ের ক্রমশই অবনতি হইতেছে। প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ে দৃশ্য আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অভিনয়-বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া ছিল। অভিনয়-বিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে expression—অর্থাৎ অনুভাব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ভাবপ্রকাশের ব্যাপারসমূহ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিও অতি বিস্তৃত। উহাতে বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস এই চারিটি তথ্য অবলম্বন করিয়া অভিনয়-বিদ্যার তত্ত্ব সকল নিরূপিত হইয়াছে।

বিভাব কি?—না, যে বাহ্য অবস্থা ও ঘটনা হইতে মনুষ্যহৃদয়ে ভাব উদ্দীপিত হয় তাহাই বিভাব, এবং এই হৃদয়-ভাবের বাহ্য লক্ষণ সকল যাহা মুখাদি অবয়বে প্রকটিত হয়, তাহাই অনুভাব। ভাব ও রসে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। ভাবগুলি যখন উপভোগ করা যায়, অথবা আস্বাদন করা যায়, তখনই তাহা রস নামে অভিহিত হয়। নাট্যব্যাপারে এই রস, স্বাভাবিক অভিনয়ের দ্বারা, প্রেক্ষক-মণ্ডলীর হৃদয়ে

সঞ্চারিত হয়; যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব যখন উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মনে উদ্দীপিত হয় সেই অভিনয়কেই উৎকৃষ্ট অভিনয়.—সফল অভিনয় বলা যায়। নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত এই রস আট প্রকার,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত; এবং ইহারই অনুরূপ আট প্রকার স্থায়ী ভাব, যথা :—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। নাট্যশাস্ত্র বলেন, "যেমন মনুষ্যের মধ্যে কুল, সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ীভাবগুলি সেইরূপ। যেমন রাজা বহুজন-পরিবৃত হইলেও রাজা এই নাম পাইয়া থাকেন, অন্য কোন পুরুষ তাহা পায় না, সেইরূপ বিভাব ও ব্যভিচারী-পরিবৃত স্থায়ী ভাবই রসত্ব লাভ করিয়া থাকে।" এই সকল স্থায়ী ভাব হইতে যে সকল গৌণভাব অবস্থানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলা যায়। নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এইগুলি ব্যভিচারী ভাব। এইগুলি সর্ব্বসমেত তেত্রিশটি। সাত্ত্বিক ভাব আটটি, যথা :—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এই সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে অনুভাবের শ্রেণীতে ধরিলেই সঙ্গত হইত; কারণ, এই সকল ভাবও ভাবেরই শারীরিক বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ভরতমুনি বলেন, "যেমন নানা ব্যঞ্জন ও ঔষধিদ্রব্য সংযোগে রসের সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থায়ীভাব সকল নানা ভাব দ্বারা অনুগত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রস কিরূপ—না, যাহা আস্বাদ্য? যেমন লোকে নানা ব্যঞ্জন যুক্ত সুসংস্কৃত অন্নভোজন করিয়া রস আস্বাদন করে, সেইরূপ মনস্বী নাট্যদর্শকেরা নানা ভাবাভিনয়-প্রকাশিত স্থায়ীভাব-সকল আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভাবহীন রস নাই, এবং ভাবও রসহীন নহে; অভিনয়ে উভয়ের সিদ্ধি পরস্পরকৃত জানিবে। যেমন ব্যঞ্জন ও ওষধি সংযোগে অন্ন স্বাদু হয়, রসভাবকে সেইরূপ জানিবে; ফলতঃ এই দুই অন্যোন্যাপেক্ষ।" ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিটি অন্যান্য রসের মূল। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত, এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপন্ন হয়। শৃঙ্গারের যাহা কার্য্য তাহা হাস্য; রৌদ্রের যাহা কার্য্য তাহা করুণ, বীরের যাহা কার্য্য তাহা অদ্ভুত; আর যাহা বীভৎসদর্শন তাহা ভয়ানক।

এই সকল বিভাব, ভাব, ও অনুভাব অনুসরণ করিয়া নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাভিনয়ের কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এইখানে উদ্ধৃত করি,—তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, অভিনয় সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা সূক্ষ্মদর্শিতা ছিল। শোক-অভিনয়ের এইরূপ উপদেশ আছে :—"প্রিয়-বিয়োগ, বিভব-নাশ, বধ বন্ধন ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিদেবন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহ-বৈধির্য্য, ভূমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। রোদন তিন প্রকার :—আনন্দজ, কাতরতা-জনিত, ও ঈর্ষাকৃত। তন্মধ্যে যাহা আনন্দজ তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল, এবং অনুস্মরণহেতু নয়ন হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-জনিত, তাহাতে পর্য্যায়রূপে অশ্রুপাত, মুক্তকণ্ঠতা, অনুস্মরণের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিপাত, বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ঘূর্ণন, শিরঃকম্প, ভ্রূকুটি, ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতি মনুষ্যের দুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।"

ক্রোধ সম্বন্ধে ভরতমুনি এইরূপ বলিয়াছেন :—"বিবাদ, কলহ ও প্রতিকূলাচরণাদিদ্বারা ক্রোধ জন্মে। পক্ষ জন্মে। পক্ষ নির্য্যাতন করিবার সময়ে ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, কর-পরামর্ষণ, দশন

কৃষ্ণদণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ, ও রক্ত প্রকাশ করিবে। কোন শুক্ললোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ঘর্ম মুছিতে থাকিবে, এবং ওষ্ঠের চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর ক্রোধ হইলে বিচরণ সহসা হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত, ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠস্ফুরণ করিবে। পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রূরতা রহিত হইয়া তর্জন, ভৎর্সনা, বেত্র-বিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকার দৃষ্টিপাত করিবে।" গ্রন্থান্তরে আর উদ্ধৃত করিলাম না। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি হইবে, নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা সূক্ষ্মদর্শন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-শক্তি।

নাট্য প্রবাহ

গত মাসের অভিনয়

নতুন আংগিক : নতুন নাট্য প্রচেষ্টা

রক্তসন্ধ্যা। নাটকের নাম "বিদ্রোহী ডিরোজিও"। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষকরূপে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও "ইয়ং বেঙ্গল" নামে এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। সেই সম্প্রদায় ছাত্রদের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে অদম্য উৎসাহ জুগিয়েছিলেন জীবনপণ করে, তাকেই প্রাণবন্ত নাটকের মধ্যে দিয়ে রক্তসন্ধ্যা এই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি এই নাটকের শততম অভিনয় অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রসদনে। একটি যৌবিন নাট্যসংস্থার পক্ষে কোন নাটকের একশ' রাত্রি অভিনয় করতে পারা নিঃসংশয়ে গৌরবের কথা। পীযূষ বসুর পরিচালনায় নাটকটির অভিনয় অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়। অভিনয় করেন পীযূষ বসু (নাম ভূমিকায়), দিলীপ রায় (রাধানাথ), ভোলা বসু (কৃষ্ণমোহন), চন্দন রায় (দক্ষিণারঞ্জন), সুধাংশু চৌধিক (রাম কমল), অজন দাস গুপ্ত (রাজা রাধাকান্ত) সুপ্রিয় সরকার (আলফ্রেড), অবনী দত্ত (কৃষ্ণদাস), পান্না দত্ত (ডেভিড হেয়ার), সুনিতা স্যান্যাল (এমিলিয়া), ও জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় (মিস হুড)। তাঁরা সকলেই সুষ্ঠুভাবে নিজে নিজে দায়িত্ব পালন করেন। আবহ সঙ্গীত ও রক্তসন্ধ্যা উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে।

ঐকতান। জনাইএ বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে ঐকতানের সভ্যরা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্ধন' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। 'কেরায় খোয়াবের' ভূমিকায় ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের সুঅভিনয় দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দান করে। নারীচরিত্রে অপর্ণার ভূমিকায় দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রূপায়ণ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় সকল শিল্পীই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মঞ্চরূপ ও নির্দেশনায় অরুণ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন।

ই. ই. আর. সি.। ত্রিবেণী টিস্যু এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা তাঁদের একাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিজস্ব মঞ্চে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চার প্রহর' একাঙ্কিকা অভিনয় করে দর্শকদের তৃপ্তিবিধান করেন। অভিনয়াংশে হিমাংশু গাঙ্গুলি, ভাস্বা মুখার্জি, নমিতা মুখার্জি ও মায়া চ্যাটার্জি নিজ নিজ ভূমিকার রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় দেন।

শুভদা। গতমাসে রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে এঁরা দুটি নতুন স্বাদের একাঙ্কিকার অভিনয় করলেন। একাঙ্কিকা দুটি হল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দয়াতি' ও বনফুলের 'শিক্ষকাবাব'। দুটি নাটকের চরিত্র চিত্রণে ছিলেন, দেব মুখার্জি, প্রবীর রাহা, শৈলেন দাস, রণজিৎ পাকুড়ী, অশোক দাস, সমিতা দে ও বিপাশা গোস্বামী। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ।

কর্মী পরিষদ, কেন্দ্রীয় শিল্পসংস্থা, দালনগর (হাওড়া)

সম্প্রতি এঁরা রঙমহল মঞ্চে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটির অভিনয় করলেন। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন, অরুণ রায় চৌধুরী, পাঁচুগোপাল রায়, মেনকা দেবী, গোপাল মিত্র, কালী চক্রবর্তী, ভোলা পাল, মনু বসুই, শরৎ রায় ও নিমাই কাঁড়ার। পরিচালনায় ছিলেন প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায়। নাটকটি সুঅভিনয় গুণে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিরলস মধ্যবসায়ের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় কলকাতার যে সব সংস্থা মাঝে মাঝে কর্মকৃতির পরিচয় দেন, বাণীবিতান তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। সম্প্রতি ৬৮ বিধান সরণীর নাহাভবনে এঁদের যে বৈশিষ্ট্যিক অনুষ্ঠান হলো তা সর্বাঙ্গীন দিয়েই মনোজ্ঞ হয়েছিল। গান, আবৃত্তি, স্বরচিত রচনাদি পাঠ ছাড়াও মহিলা-শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের একটি সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশিত হয়। ঐ অভিনয়ে রঘুপতি, গোবিন্দ মাণিক্য, নক্ষত্র রায় ও জয়সিংহের ভূমিকায় যথাক্রমে রেণু দাস গুপ্তা, সুনন্দা দাস, অলিভা দত্ত এবং সুমিত্রা দাস নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। সঙ্গীতে অংশ নেন, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দাসগুপ্ত, রেখা পাত্রা, কৃষ্ণা দত্ত, দেবাশিষ চক্রবর্তী, বুলবুল মুখোপাধ্যায় কাবেরী দত্ত, শিখা পাত্রা ও মীরা মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীদিনীকান্ত সরকার, শ্রীমতী বাণী রায়, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী, ডাঃ উমা রায়, ডাঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনবর্মা, এবং সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (ভবানী)। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস, শ্রীপ্রভাস চক্রবর্তী এবং সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু বসু।

মার্কিনের চোখে কলকাতা

[কলকাতা নামক যে জীবন্ত নরকের মধ্যে আজ আমরা এই বিংশ শতাব্দীর সেবার্থে বাস করছি তার সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক শ্রীজোসেফ লেলিভেল্ড ১৩ই আইাযর, ১৯৬৮, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের রবিবারের পাতায় তাঁর "ক্যালকাটা সিটি অব্ মেনি ডিজাষ্টার্স" নামক প্রবন্ধে যে অতিসাধারণ চিত্র ও অতি সত্য তথ্যগুলি আমেরিকা-বাসীদের চোখে তুলে ধরেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। লেখাটি পড়লেই বোঝা যায় এটি কুখ্যাত মিস মেয়োর ভারতের ওপর কাদা ছুঁড়ে দেওয়ার মতো লেখা নয়। এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে শ্রীলেলিভেল্ডের কলকাতার প্রতি ও বাঙালী জাতের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতি ফুটে উঠেছে। বাঙালী পাঠক পাঠিকার জন্যে এটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম—অনুবাদক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।]

জুনমাসটা কলকাতার পক্ষে খুবই খারাপ। একটা দুর্গন্ধ কম্বলের মতো গ্রীষ্ম সমস্ত শহরটার ওপর ভারি হয়ে বিছিয়ে আছে। অবক্ষয় যেন চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ছে। মাছির সংখ্যা, জঞ্জালের স্তূপ, কলেরা ও মৃত্যু যে পরিমাণ বাড়ছে সেই পরিমাণেই কমে আসছে এসব সম্বন্ধে চিন্তা করার মতো মন। পরম অক্ষরের ঝকঝকে চড়া সাদা রোদে কলকাতার রূপ যেন আরও বীভৎস হয়ে ফুটে উঠেছে। দম আটকানো ভ্যাপসা গরমটা কলকাতায় অনেক আগেই আসে তখনই কলকাতা থেকে কেটে পড়া। ভ্রমণকারীর দল ধরেন ঠিক পরের ফ্লেনটা। ব্যবসায়ীরা শীতপুত্র হিমালয়ের পাহাড়ী সহরে পাঠিয়ে দিয়ে ক্লাবের সবচেয়ে ছায়াশীতল কোনটাতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেন। উদীয়মান লেখক ও রাজনীতিকরা কফিহাউসগুলোর ফ্যানের তলায় দীর্ঘকালধরে আলোচনা ও গল্পগুজব চালাতে থাকেন। শ্রমিকরা ফুটপাথের ওপর উপু হয়ে বসে ছাতিফাটা তেষ্টায় চোঁ চোঁ করে ডাবের জলে চুমুক মারে। যাদের কোন গতি নেই, এমনকি ডাব খাবার মতো পয়সাও জোটেনা তারা ঘুমিয়ে কাটাতে চায়। কিম্বা বলা যায় তারা ঘুমিয়েই কাটায়—কাটায় তাদের খিদে, তাদের শরীরের অবসাদ, তাদের জীবনের সমস্ত হতাশা।

কিন্তু জুলাই মাসে যখন বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বাতাস ছুটে আসে, সুরু হয় বর্ষাকাল তখন অবস্থা আরও কাহিল হয়ে ওঠে। বিশেষকরে যেসব হাজার হাজার মানুষ পুরোন ভেঙেপড়া ছোট ছোট মেটে ঘরের বস্তিতে কিম্বা ফুটপাথের ওপর বাসকরে তাদের অবস্থাতো রীতিমতো শোচনীয়। তখন ভারতবর্ষের এই সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে বেশী প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সংস্কৃতি সচেতন সহর—পৃথিবীর নাগরিক দুর্গতির অন্যতম উদাহরণ এই কলকাতার ওপর কয়েক দশকের অবহেলার কথা চিন্তা না করে পারা যায়না।

কলকাতার যে সব এলাকায় পুরোন মাধাতার আমলের নর্দমা আছে, সে জায়গাগুলো বর্ষায় মুখ বন্ধ হয়ে জেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাস্তাগুলো বিজী নোংরা জলে আর পচা দুর্গন্ধে ভরা খালের

মতো হয়ে যায়। কলকাতার বস্তি এলাকায় জনবসতির চাপ দুনিয়ার যে কোন সহরের জনবসতির রীতিনীতিকে অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে। এই বস্তিগুলো বর্ষাকালে কুৎসিত ডোবা বাদা অঞ্চলের রূপ নেয়। এই সময়ে কলকাতায় একটা নরু গলি দেখলে হাইকস্ নদীকে মনে হবে স্বচ্ছ পার্বত্য নির্ঝরিণী।

বস্তু সমস্যা—

কলকাতার দুর্গতি একটা নয় অনেক। এদের প্রত্যেকটা নিজস্ব ধারায় সৃষ্টি করে যাচ্ছে নৈরাজ্য—এক একটা বিশেষ রকমের দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। সহর পরিকল্পনার ভার যাঁর ওপর তিনি এ সহরের জল সরবরাহের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, এর স্বাস্থ্য ও যানবাহন ব্যবস্থার দৈন্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে কলকাতার আর কোন আশা নেই। এ সহরের ভাঙন প্রায় ষোল আনা পুরো হয়ে এসেছে। তাই লোকে এখন এখান থেকে, যুদ্ধ কিম্বা মহামারীর জায়গা থেকে যেমন ছোটে পালায়, তেমনি করে পালাবে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন এখানকার সামাজিক বুনন ঢিলে হয়ে তার রং চটা, জরাজীর্ণ সুতোগুলো একটা অপরটা থেকে সরে গেছে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। অর্থনীতিবিদরা বলেন এখানকার ক্ষত এতো গভীর যে তাকে আর পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নৈরাজ্যবাদ' বা 'নাস্তিকবাদ' বলে কতোগুলি কথার আশ্রয় নেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন ভারতীয় গণতন্ত্র এই ভয়ংকর বিষাদের ভাঙন থেকে বাঁচতে পারবে কিনা। জনসংখ্যা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কাছে ভবিষ্যতে কলকাতা সম্বন্ধে বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এখন থেকে ২০ বছর পরে এই কলকাতার সহর অঞ্চলে বাস করবে ১২০ লক্ষ লোক, আজই যেখানে ঠাসাঠাসি গাদা গাদি করে বাস করছে ৭৫ লক্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা পরে, এখনই এই সহরে যা ঘটছে তা চিন্তাতে আনা যায় না। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে (অবশ্য তাদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, তাদের বাদ দিয়ে) সামাজিক উদ্বেগ, সংগঠন ও জাতীয় সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলার যে একটা আত্মঘাতী প্রবণতা এসেছে, কলকাতা ইতিমধ্যে তার জলন্ততম উদাহরণস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা যে কর্মদক্ষতায়, শিল্প কুশলতায়, সাহিত্যে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে দুনিয়ার যে কোন সহর থেকেই অনেকখানি এগিয়ে আছে, এই কথাটাতেই আর বিশেষ স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এ কেবল একটামাত্র প্রশ্নই সবার সম্মুখে তুলে ধরছে, কলকাতার এই সৎ, উদ্যমশীল লোকেরা কেন এই সহরের অবস্থা খানিকটা ভালর দিকে ফেরাতে পারেন না?

সর্বদাই অধঃপতন—

হতে পারে কলকাতা সে সুযোগ কোন দিনই পায়নি। সেই ২৮০ বছর আগে যখন বৃটিশ বণিকরা প্রথম এই সহরের পত্তন করে তখন থেকেই এ সহরটা মরতে সুরু করেছে। তারা তাদের বাণিজ্যকে ভারতবর্ষের শস্য সম্পদে ভরা অভ্যন্তর প্রদেশগুলিতে পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে এতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল যে তারা শেষ পর্যন্ত বসে গিয়েছিল একটা ম্যালেরিয়াভরা বাদা অঞ্চলের ওপর। এক শতাব্দী পরে সেই বাদা অঞ্চলেই হল বৃটিশ ভারতের রাজধানীর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের "দ্বিতীয় সহর", লন্ডনের পরেই কলকাতা। রাজধানী ৫৬ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতাতেই ছিল। পরে ভাইসরয় কলকাতা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিল্লীতে করলেন রাজধানী।

আজ বৃটিশের তৈরী ভাওলা ধরা পুরোন বাড়ীগুলোর প্রাচীন ভাঙন দেখায় যেন ঠিক পচা সবুজীর মতো। সেই সব অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর গুলোর মধ্যে যে সব ঘর ছাড়ারা বাস করে তাদের মতো প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত ঘরে বাসকরার সৌভাগ্য ভারতবর্ষের বহু ধনী অথবা কি বিদেশী

লোকের আছে বলে মনে হয় না। এখন অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো কলকাতা 'ভালো সহর' 'মন্দ সহর' এ ভাগ হয়ে নেই। আর এখন ও অনের একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে বৃটিশ নবাবদের মতো কেউ ১০০ জন চাকরবাকরও রাখে না। তবুও ক্লাবগুলো আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত রাস্তার গোলমাল এড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নিরিবিলি জায়গায় সরে আছে। তাদের সাঁতার পল্‌ক্, টেনিস কি ঘোড় দৌড়ের এতটুকু ক্ষতি নেই।

পুরোন বৃটিশ আমলের ওপরতলার পদগুলিতে যে সব উঠতি বাঙালীরা এখন সবে বসতে সুরু করেছেন—তাঁরা অবিশ্যি মাঝে মাঝে নাগরিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে এবং কলকাতাকে বাঁচাবার জন্যে দুচার কথা বলে থাকেন বটে। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উঠতি উচ্চপদস্থ বাঙালী কিম্বা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের সবারই উৎসাহ ঐ ক্লাবের কালা-ধলার ভেদ ঘোচাতেই সবচেয়ে বেশী খরচ হয়ে যায়। সেই ভেদটা উঠে যেতেই অনেকে পুরোন ঔপনিবেশিক অফিসারদের চালে 'আফিস থেকে ক্লাব' এই পদ্ধতিটাই চালু রাখেন। একজন ওয়াল ষ্ট্রীটের দালাল চারিয়েনের ট্রেনে চেপে হার্লেমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় নিউইয়র্কের বাস্তবতায় যতোটা না অপমানিত বোধ করে কলকাতায় করবে তার চেয়ে ঢের বেশী। ভোগৈশ্বর্য আর দারিদ্র্যের হয় আটকানো তফাৎগুলো সহরের একজন নবাগতকে স্তম্ভিত করে দেবে। সেগুলো তো সব নমুনেই এ সহরে রয়েছে। বেশ কয়েক যুগ আগেই কিপ্‌লিং দেখেছিলেন এ সহরে "Poverty and pride, side by side" দারিদ্র্য ও দম্ভকে পাশাপাশি বাস করতে। তা দেখেই তিনি এখান থেকে সরে পড়ে ছিলেন। সেই দম্ভ আজও দেখা যায়। প্রকাণ্ড ময়দানের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা সংএর মতো দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চলে গেছে (এই লংটাকে ভারতবর্ষের কর্তা ব্যক্তিরা যত্ন ও আদিখ্যেতা করে বাঁচিয়ে রেখেছেন) সেখানে, কোর্টে যাবার রাস্তায়, রেসকোর্সের পথে, ক্যাথিড্রালের রাস্তায় বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুতুড়ে যে কোন বাড়ীতে যাবার পথেই শুধু যে দম্ভের দেখা পাওয়া যায় তাই নয়, দেখা পাওয়া যায় কলকাতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া বকবকে প্রকাণ্ড আকাশ ছোঁয়া নতুন অট্টালিকা গুলিতেও। তাতেই মনেহয় কবি কিপলিংএর কথা বোধহয় আর দ্বিতীয়বার উল্লেখের প্রয়োজন নেই যে—

Above the packed and pestilential town
Death looks down.
এই গলা পর্যন্ত ঠাসা, মহামারী ভরা সহর
এ যমেরও অরুচি।

প্রধান হল সহরের প্রাণে দুহাতের বসতবাড়ীর ছাদের কার্নিশে বসে থাকা শকুনির দল। তাদের তল্লাস দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ কালের করাল ছায়া। কিম্বা খুব সোজা করে বলা যেতে পারে, অনশনে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু।

অনশনে মৃত্যু—

এক সন্ধ্যায় দেখলাম কলকাতার সবচেয়ে বেশী যানবাহন চলাচল করে যে চৌরঙ্গী, তারই ওপর অজস্র লোকের ভীড়ের মধ্যে একটা ভিখারী স্ত্রীলোক ধপ করে পড়ে মরে গেল। মেয়েটাকে দেখে তার বয়স বোঝা গেল না। কলকাতার সবচেয়ে গরীব লোকদের শরীরগুলো এতোদূর শীর্ণ যে তাদের দেখে বয়স ঠিক পাওয়া যায় না। ছেলেই হোক বা বুড়োই হোক এরা দেখায় একই রকম করে যাওয়া। প্রথমে কেউই সেই মড়ার শক্ত দেহটাকে দেখে দাঁড়ায় না। যদিও এখানে ওরকমভাবে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীর ফুটপাথের ওপর আর দ্বিতীয় ছিল না। একজন সঙ্কোচ, লাজলজ্জাহীনা মহিলার নজর পড়ল সেই

মড়াটার ওপর। তিনি ভাল করে দেখে নিয়ে মড়ার পাশে দাঁড়ালেন, অনেকটা বিদ্রোহের মতো। আমি কারুর সাহায্য নেবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

"এটা কি একটা ট্রাফিক এ্যাক্সিডেন্ট?—আমি মড়ার খবরটা তাকে জানাতেই সেই পুলিশটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল। বেই শুনল "না"—তখুনি সে কাঁধ উঁচুতে পিছন ফিরল। আমিও সেই সঙ্গে পিছন ফিরলাম।

কলকাতাতে আগে আপনি নিশ্চয়ের ভিতরে করুন, ঘৃণা অথবা দুঃখ দারিদ্র্যের দৃশ্যগুলো থেকে চোখকে সরিয়ে নিতে হয়। তারপর আপনি আর সে সব দেখতেই পাবেন না। বিদেশীরা প্রথমেই সুরু করে পেশাদার ভিখারীদের ওপর বিরক্ত হতে। এই ভিখারীদের বিদেশী লোক দেখলেই তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভিখারীগুলো ঠিক সরীসৃপের মতো গুটি গুটি এগোয়। কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তরা তাদের গলে থলে পড়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে এমন বীভৎস ভাবে ঘোরে যে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ন্যাংটা ছেলেগুলো চেঁচায়—মো বাবা মো পাপা, সাহেব বকশিস্। বিদেশীরা তখন তাদের ঘৃণা করে এত নীচ, এত হীন হওয়ার জন্য। শেষ অবধি তারা তাদের আর গ্রাহ্যই করেনা। অথবা সবচেয়ে খারাপ যেটা তাই করে। অর্থাৎ কোন ভারতীয় আপন ভোলা মানব প্রেমিকের মতো ভিখারীর হাতে একটা পয়সা ফেলে দিয়ে চলে যায়। বাস্, তারপরে আর কোন সম্বন্ধ নেই। যেন এই ভিখারী জাতটা যে রয়েছে তাদের কোন অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাদের আর কোন কৌতূহল নেই এরা হল অধুমাত্র ঘৃণার পাত্র, হাসির পাত্র।

ভিক্ষুক—

যে সব লোক মরতে পরবাচ্চা নয় তারা আর পেশাদার ভিখারীরা মিলে এই সহরে রীতিমতো একটা সেনাদলের সামিল। তারা সংখ্যায় ৪০০০ থেকে ৬০০০। প্রায়ই এদের দলে দলে এখানে সেখানে ঘুরতে দেখা যায়। এরা হল সেই বিরাট জনসমষ্টিরই একটা অংশ মাত্র যাদের বাঁধা কোন চাকরীর আশা নেই, এরা বেকার। সুতরাং এদের বাঁচবার তাগিদে কিছু না থাকার ভিতর থেকেই কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে হয়। দুনিয়ার বোধহয় এমন আর একটা জায়গাও নেই যেখানে এতো বেশী সংখ্যায় লোকে এতবেশী পরিশ্রম করে এত সামান্য উৎপাদন করবার জন্যে। কলকাতায় এতো বেশী হকার আছে যে তাদের সংখ্যা কোন সহরের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বোধহয় বেশী। কিন্তু তাদের এক একজন সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে বেচে হয়তো একটা কি দুটো কাউন্টেন পেন, একটা রঙীন চশমা, কিছু পুরোন পোষাক কি টিনের তৈরী কিছু খুচরো। কিন্তু একটা করে একটা কি দুটো টাকা তারা দিন চালাবার জন্যে রোজগার করে।

এইসব লোকগুলো সব সময়েই আশাহীন, মরীয়া। তাই এদের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প প্রতিভার মধ্যেও প্রকাশপায় এই ধরণের হতাশা। মনে হয় এগুলো যেন পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার। একটা ফেরিওয়ালা পুরোন ৭৮ আর. পি. এম এর গ্রামোফোন রেকর্ড কেটে হাতি আর তালগাছের কংগলের সিলুট করেছে। হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েসের চাকতিটা যাতখানে রেখেছে এমনভাবে সেটা দেখাচ্ছে যেন অন্তর্হিত সূর্য। সে চৌরঙ্গীতে এইগুলো ফেরি করে বেড়ায়। কিম্বা ধরুন, এমনও আছে যারা গোবর আর কয়লার গুঁড়োর মতো যাতে জিনিষের কারবার করে। কয়লার গুঁড়ো গোবর আর মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গোল করে পাকালে একরকম জ্বালানী তৈরী হয়, তার নাম গুল। এ-ছাড়াও আছে গোবরের ঘুঁটে। এগুলো বহুলে কাঁচা মালও খরিদ করা যায়। কোথাও এগুলো নগদ পয়সায় বিক্রীও হয়। এগুলো হল গরীব লোকেদের জ্বালানী। ৬৮ বছর বয়সের বিপিন ঠিকাদার আর তার ২১ বছরের ছেলে রতন, গোবর আর কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে। এই

ধরণের মিশেল বাকি উঁচু ধরের মিশেল। এরা—পঞ্চানন তলা রোডের বস্তি এলাকায় কুড়ি বছরেরও বেশী বাস করছে। এই বস্তিটা এক কথায় বলা যায় নরক। একটা মকঃস্বল রেল লাইনের ধারের উপর কয়েক একরের সরু সরু কালি জমি। এখানে গাদাগাদি করে বাস করছে ৫০০০ লোক। আর রাস্তার ঠিক ওপারেই সরকারী কর্মচারীদের জন্যে সরকার বানাচ্ছে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ী। এই বাড়ীর বাসিন্দাদের সব সময়ে জানালায় পর্দা টাঙিয়ে রাখতে হয় ঐ সব বস্তির দৃশ্য যাতে চোখে না পড়ে তার জন্যে। কিম্বা বস্তির ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যদি একবার ছিটকে গিয়ে বড় রাস্তায় ছুটে চলা গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে সে দৃশ্য যাতে না দেখতে হয় তার জন্যে। ঠিকাদারেরা একটা গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে, তার যতোগুলো গরু আছে তাদের সবকটার গোবরের জন্য তাকে মাসে গরু পিছু ২ টাকা করে দেয়। আর একটা কয়াতকলের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে বস্তা পিছু ১ টাকা করে কাঠের গুঁড়োর। এই গোবর আর কাঠের গুঁড়োর তৈরী ঘুঁটে বিক্রী হয় ৩৬ পয়সা করে শ'। ৩৬ পয়সা অর্থে প্রায় সাড়ে চার সের। এত কম দামের জ্বালানীও এই বস্তির লোকেরা পয়সা খরচ করে কিনতে পারেনা। তাই খদ্দের দেখতে হয় কাছে পিঠের কোন অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদের পাড়ায়। ঠিকাদার এত্ সন্ এর এই কারবারে দিনে নীট লাভ হয় ৪ টাকা এই আয়ের ওপর বেঁচে থাকে তাদের সংসারের আটটী প্রাণী।

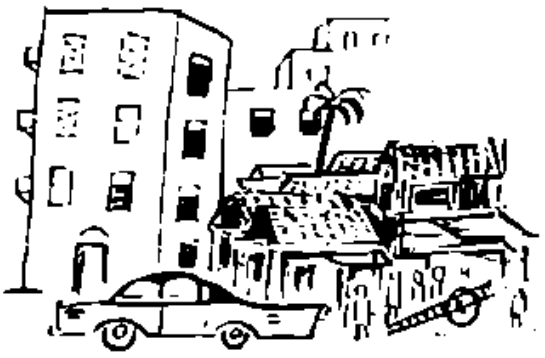

নীচু কাজ—

হুমদমের এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ী করে সহরে ঢুকতে একজায়গায় একফালি কাটা এস্‌প্লেনের রাস্তা পার হয়ে যেতে হয়। রাস্তাটা নির্জন, নাম হুমদম ফুলার হাইওয়ে। তারই পাশে দেখতে পাবেন খালের পাড় দিয়ে লোকেরা খচ্চরের মতো পাহাড় প্রমাণ পাট বোঝাই গাধাবোট টেনে নিয়ে চলেছে। যেই আপনি জনবহুল রাস্তাতে মোড় নেবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখে পড়বে বহুলোক ঠেলা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ ঠেলাগুলোতে বোঝাই থাকতে পারে লোহার রড, ইট, কয়লা, খাবার জিনিষপত্র বা যা কিছু। যে কাজ-গুলো ভারতের অন্যান্য সহরে বলদে করে সেই সব কাজ এসহরে করে মানুষে। সহরের সর্বত্র রিক্সা-ওয়ালাদের দেখা যায়। গঙ্গার সমতল এলাকায় জনসংখ্যা যেখানে প্রচুর, সেখান থেকে এরা এই সহরে এসে জোটে। এরা গ্রীষ্মকালের জলন্ত রোদে পীচগলা রাস্তায় খালি পায়ে রিক্সা টেনে নিয়ে যায়। রাতে হল বেঁধে ঘুমোয় ফুটপাথের ওপর। তাতেই এরা মাসে মাসে প্রায় তিন, চার গুদামের মতো বেশে পাঠাতে পারে। এইভাবে ৪ কোটি গুদার প্রতি বছরে কলকাতা থেকে গ্রামাঞ্চলে চলে যায়। চলে যায় পোষ্ট অফিসের অতি সামান্য টাকার মনিঅর্ডার হয়ে।

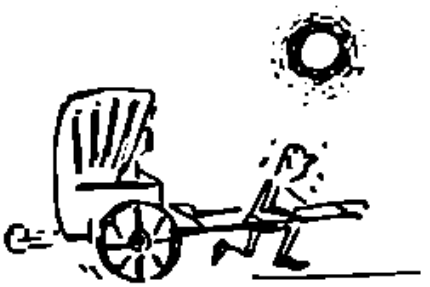

কলকাতার লোংরা, কদর্য চেহারার চেয়ে আরও নক্কারজনক ব্যাপার হল এর ভিখেরী। এই সহরটা

একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র যার শিয়ার শুধু চূর্ণ করে, তার দাতগুলো একটার সঙ্গে আর একটা খাপে খাপে বসে না। নতুন স্কুল তৈরী করতে নতুন রাস্তা বানাতে, বাদাকেটে বর্ষার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জল নিকাশ করতে, কিম্বা শুধুমাত্র সহরের রাস্তায় জমা এই প্রকাণ্ড জঞ্জালের স্তূপকে পরিষ্কার করতে, এখানে যে লোকবলের অভাব আছে তা নয়। অভাব হল শুধু প্রচেষ্টাকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগাবার ক্ষমতার।

সমাধান মরীচিকা –

সহরের ভালমন্দের বিষয়ে জনপ্রচেষ্টাকে কার্যকরী করবার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা হল তহবিল তছরুপের চেয়েও মূলগত। কলকাতার হাজার হাজার সমস্যাও তাদের কারণের একটা তালিকা তৈরী করা মোটেই কঠিন নয়। সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় বাতলান হয়তো খানিকটা কঠিন কাজ, তবুও একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, সহরের এই নিদারুণ দুর্গতি দিনের পর দিন যখন চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে তখন সেই সমাধানের তালিকা আর ফাঁকা বক্তৃতার বুলি গুলো কেন যে কাজে লাগান হচ্ছে না, সেই কথাটা বুঝতে পারা। সর্বগ্রাসী লোভ আর অন্ধত্বে ভরা আত্ম-সন্তোষ তাদের নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হল কলকাতার অধিবাসীদের এই পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিষ্ক্রিয়তা। মার্জিত, মননশীল বাঙালীরা ভারতবর্ষের সমস্ত সহরের মধ্যে মাত্র এই সহরকেই একটা রূপ দিয়েছেন যেটা সত্যজিৎরায়ের 'কস্‌মোপলিটন', কিন্তু সে তথ্যটাও চিরকালের জন্য ধামা চাপা পড়ে আছে। ভারতের কোথাও কলকাতার চেয়ে বেশী সামাজিক সচেতনতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সামাজিক সচেতনতার কোনরকম প্রতিফলন যে পারিপার্শ্বিকের ওপর পড়েনি, এমনটা অন্য কোন জায়গাতে চোখে পড়েনা। সহরের এই বিধ্বংসকরা ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিধর্মী বাঙালী সন্তানরা আজ মাও এর কৃষক বিপ্লবের কর্মসূচী সম্বন্ধে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। যতদূর বোঝা যায় এ কাজটা সহরকে ধ্বংস থেকে বাঁচানর চেয়ে বেশী সহজ।

এ সত্ত্বেও বুদ্ধিধর্মী বাঙালীরা আজও কলকাতার একটা বিশিষ্ট চরিত্র রেখে যাচ্ছে। এমনকি এই নরকের মতো জঞ্জালের স্তূপেভরা সহর, যার রাস্তায় হাঁটলে পেট কি হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে সবকিছু গুলিয়ে তালপাকিয়ে বার হয়ে আসতে চায়, সেই সহরকেই এই বাঙালীর ছেলেরা মহিমায় ভূষিত করে তুলেছে। বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার হাস বাঙালীর কথা বলা একটা নেশা (সে এই নেশায় সহজে নিজেই বুঁদ হয়ে যায়)। বাঙালী কথাবলে রোমান্টিকভাবে, সামান্য কিছুর ওপরেই প্রচুর হৈ হৈ করে। এমনকি অনর্গল কথা বলতে সে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার দম ফুরিয়ে যায়। এক একটা বদ্ধ ধারণা এমন সাংঘাতিক ভাবে তার মাথার মধ্যে ঢুকে থাকে যে তাকে এক একসময়ে পাগলই মনে হয়। কিন্তু সে ভীষণ বুদ্ধিমান। তার জীবনটা চারপাশের চাপে যতো বেশী সংকুচিত, যতো বেশী দম আটকানো মনে হোক না কেন সে তার চিন্তার দিগন্তকে সব সময়েই রাখতে চায় উন্মুক্ত ও সুদূর। ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা তাকে বাচাল, নির্কর্মা বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু যে দেশে "মডার্নাইজেশন" এর অর্থ শুধুমাত্র যান্ত্রিক উন্নতির বাহাদ্যে সার প্রভুত্ব আর জন্মনিরোধ, সে দেশে বাঙালীর প্রতি পদক্ষেপে হতাশায় ঘা খাওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে আত্ম অভিব্যক্তির প্রয়াস—এরও একটা মূল্য আছে।

বৃটিশ, ভারতবর্ষে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যদিয়ে যে মুক্ত চিন্তাধারার আমদানী করে, যার ফলে এদেশে আসে যুক্তিবাদ, আধুনিক সাহিত্যের রূপ, গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে ধারনা—এই বাঙালীই প্রথম সেই ভাবধারার ধারক। "ভারতের জাতীয় বিপ্লবেরই একটা অংশ"—বাঙালীর কবি

কবি রবীন্দ্রনাথ এই কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর সঙ্গে একমত হননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতবর্ষের মুক্তি শুধুমাত্র ভিতর দিকে তাকিয়ে থাকলেই আসবে না। অন্য যে কোন ভারতবাসীর চেয়ে বাঙালী আজ অনেক বেশী পরিমাণে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে। ("আমার নাম, তোমার নাম, ভিয়েৎনাম" একটা চলতি স্লোগানে অতি পরিচিত এই কথাগুলো প্রায়ই শোনা যায়)। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতেই তার সমস্ত সময় বয়ে যায়, কলকাতার সম্বন্ধে আর ভাবা হয় না। সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা হল ঠিক এর বিপরীত। অর্থাৎ কলকাতার এই অবক্ষয়ই হল বাঙালীর বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে এতবেশী দুশ্চিন্তার কারণ—নিজেদের সমস্যা থেকে পালাবার একটা উপায়। আর বাঙালীর এই পলায়নী মনোবৃত্তি যেন উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে ভীষণভাবে।

প্রায় একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মতোই বাঙালী ছুটে যায় জাঁ-লুক গডার্ড, এ্যালেন রেসনাই, রাঁসোয়া ট্রুফাউট এবং আরও অনেক উজবুক ব্যক্তিত্বের দলে একাত্মতা প্রকাশ করতে। কারুর মতে বাঙালীদের এই অনুচ্ছার প্রতিবাদগুলো কিছুটা পরিহাসের মতো মনে হয়—কিছুটা করুণও। একটা মনগড়া রায় খাড়া করে বলা সোজা যে অন্যায় হাতের কাছে দেখলে তখুনি বেশী করে প্রতিবাদ করা দরকার। অন্য কারুর মত হল মদনোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও চমৎকারিত্ব কিছু পরিমাণে ছিল। 'কসমোপলিটন' হবার জন্যে আপ্রাণ কষ্ট করা সত্ত্বেও একজন বুদ্ধিজীবী বাঙালীর বাঙলা মন দেশের মাটীতে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে। সে যখন সন্ধ্যাবেলায় তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডামারতে যায় তখন সে অফিসে পরা দার্ট প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে সাদা সুতীর পাঞ্জাবী পরে। এই জামাগুলো আজকাল হিপিরা প্রায় সবত্র খুব ব্যবহার করতে সুরু করেছে। আড্ডার মোড় একবার পাউণ্ড কি গানার মিরডালের ওপর ঘুরে গেলেও সে সব আলোচনা কেবল বাংলা ভাষাতেই হয়ে থাকে। এসবক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা ইংরেজীতে বলতেই বেশী সচ্ছন্দ করেন। তখন বাঙালী একজন ইংরেজের লেখা কোন একটা প্রবন্ধ থেকে খানিকটা অংশ তোতাপাখীর মতো আউড়ে যান।

কাজের বড় অভাব—

কলকাতার সবচেয়ে বড় অভাব হল ভালরকমের কাজের। মাত্র মুষ্টিমেয় লেখক ও সিনেমা কর্মচারী, যাঁদের মধ্যে ডিরেক্টর সত্যজিত রায় একজন, পুরো সময়ের জন্যে সৃজনধর্মী বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বুদ্ধিজীবি বাঙালী স্কুলে পড়ায় কিম্বা কোন অফিসে অত্যন্ত কম বেতনে কেরাণীর কাজ করেন। তিনি যাকে 'আসল কাজ' বলেন, সেই কাজ তিনি করেন তাঁর অবসর সময়ে অথবা কফি হাউসে আড্ডা দিয়েও যদি কোন সময় হাতে থাকে তো সেই সময়ে। হয়তো তিনি একটা স্ক্রিপ্ট তৈরী করেন কোন একটি প্রগতিশীল ফিল্মএর জন্যে। সেই স্ক্রিপ্ট হয়তো কোন দিনই ছবি হয়ে বার হবার কিম্বা অগুনতি অভিনেতৃ অভিনেত্রীর মধ্যে যে কোন একটির আনুকূল্যের অভিনীত হবার সুযোগ নাও পেতে পারে। হয়তো তিনি ইয়েটসএর কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করেন। অথবা বাংলা ভাষায় ছাপা অসংখ্য ছোট ছোট খন্ডাদ্ব পত্রিকার মধ্যে যে কোন একটা চালান।

ভাস্কর মুখার্জি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। তিনি একটা ছোট পত্রিকা সম্পাদনা করেন ও তাঁর পত্রিকার দীর্ঘজীবনেরও দাবী রাখেন। 'লেখা ও রেখা' প্রায় বারো বছর ধরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তিনি আশা করেন একদিন এই পত্রিকাটির যথেষ্ট প্রচার হবে। তার থেকে যে পয়সা আসবে তা দিয়েই তাঁর সংসার চালাতে তিনি সক্ষম হবেন, চাকরীও ছেড়ে দিতে পারবেন।

কিন্তু আজ পর্যন্ত পত্রিকা চালিয়ে তাঁর একটাকাও লাভ হয়নি। তিনি তাঁর কেরানীর কাজ যথেষ্ট মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠা ও কর্মতাটুকু প্রয়োগ করেন তাঁর সাহিত্য কর্মে। এইভাবে তিনি সেক্সপীয়রের ৫টি সনেট বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এবং তাঁর মুখার্জি এই ক্ষেত্রে যে একমাত্র উদাহরণ তা নয়। তিনি বলেন - আমরা আমাদের জীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি।

জীবনের দ্বৈত সত্তা—

এখানে দ্বৈততাই হল জীবনের একটা পথ। বাঙালী বাকি হিসাবে যতো উন্নতিই করতে চাক না কেন, তাকে তার সংসারের দাবী সর্বপ্রথমে মেটাতেই হবে। আর সংসারের সব দাবী মেটাবার পরে তার আর পাঁচজনের জন্য ভাববার বা কাজ করবার স্পৃহা আদৌ থাকে না। রাস্তার যতো আবর্জনাই থাক না কেন বাঙালীর গৃহ কিন্তু নিষ্কলঙ্ক। তাদের বৈঠকখানার বিতর্ক শুধু তত্ত্বগত আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। এটাকে বাঙালীর কথা বলার নেশা। বৈচিত্র্যহীন, উত্তেজনাহীন দিনগুলো থেকে মুক্তিপাবার একটা নির্দোষ স্বপ্ন বিলাস।

বাইরের এই ভয়াবহ অবস্থা বাঙালী বুদ্ধিজীবির জীবনকে যতদূর তেতো করে তোলে বলে মনেহয় আসলে ততটা নয়। কারণ বাঙালীর অন্তরে একটা ভরসা আছে যা প্রায় সবরকম আঘাতকে অনায়াসে সহ্য করতে পারে। একজন অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন—"আমরা আপনাদের পত্র পত্রিকা ও সমালোচনা থেকেই কেন্তানেবল্ কথাগুলো পাই ও তা'নিয়ে বলাবলি করি যেমন—'এ্যালিনেশন' (বিরক্তিকর) এইসব।

এই সমস্ত বিরূপ মনোভাব দর্শকরা কলকাতার দরিদ্রলোকদের এত হীন বলে মনেকরেন যে তাদের তাঁরা মনুষ্য পদবাচ্য বলেই মনে করেন না। সব সময়েই তাঁদের প্রশ্ন হল - মানুষ এত জঘন্য অবস্থায় কী করে থাকতে পারে? যেন কলকাতার লোকেরা সখ করেই এ অবস্থায় থাকে। যখন কলকাতার এই সব দরিদ্রদের দুই পাথ আর বস্তির মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয় আর বিশেষকরে যদি তাদের বন্ধুবান্ধবরা সবাই ফুট পাথেই কাটায়, তখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুব সহজ নয়। একটা ব্যাপার কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখতে হয়। - ঐ সব ফুট পাথের বাসিন্দারা তাদের জীবনযাত্রায় নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে, নিয়মতান্ত্রিকতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কিরকম সজাগ। তাদের অনেকেই দিনে দু'বেলা স্নান করে। নরকের মতো জায়গায় বারোয়ারী কলে দাঁড়িয়ে স্নান করাটা তাদের দোষ নয়, তাদের অন্য কোন জায়গা নেই বলে তাই।

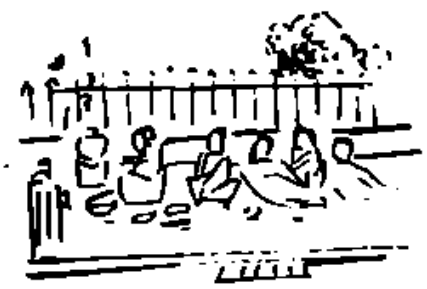

তারা ঘরের বদলে একটা তাক বাক্স ভাড়া নেয়। তাতেই তাদের ঠিকানা থাকে আর তাতেই তারা রেশনকার্ড পাবার অধিকারী হয়। রাতে তো শোবার জন্যে ফুটপাথ আছেই। সেখানে তারা নিজেদের লোকের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয়। ফুটপাথের বাসিন্দাদের মধ্যে বংশপরম্পরা কয়েক পুরুষ ধরে সন্তানাদি নিয়ে রীতিমতো সংসার করে আসছে—এমন মানুষও দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য তাদের মধ্যে গৃহহারাও খুঁজলে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেকেরই সঙ্গে থাকে বাচ্চা ছেলেপুলের পাল।

কল্পনাতীত মানুষের ভীড়ের চাপে সহরে জঞ্জাল নিত্য স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। ৪০,০০০ হাজারের ওপর খাটাপায়খানা আছে কলকাতায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশে মাছি। এই সব মানুষের

ভ্যাপকরা মল ঠিকমতো অপসারণ করার প্রয়োজনই তো একটা মস্ত জটিল সমস্যা। কিন্তু সহরের ময়লাফেলা ট্রাকের যে সংখ্যা তার তিনভাগের দু'ভাগই অচল। সুতরাং ময়লা ফেলা হয় কখনো সপ্তাহে একবার, কখনো দুমাসে একবার, আর কখনো করে যে হয় তা কেউ জানেনা। আরও ঘোরাল ব্যাপার হল, মিউইয়র্কে যখন গত বছরে একবার ময়লা সরাবার লোকেরা ধর্মঘট করে সহরটিকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছিল, এই কলকাতার সহরে সে বছরে ৩৫ বার ঐ রকম ধর্মঘট হয়েছিল।

একটী সমস্যা আর একটী সমস্যাকে সৃষ্টি করেছে। সহরের সর্বত্র পচা আবর্জনার স্তূপ জমাতে আর জলের কলের পাইপগুলোতে মরচে পড়াতে পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠেনা। গত শতাব্দীতে পানীয় জল খুব ভাল ছিল। এখন কলকাতার তিনভাগের দুভাগ জলই আসে হুগলী নদীর দূষিত জল থেকে সোজা অপরিশুদ্ধ অবস্থায়। কেবলমাত্র সম্প্রতি কয়েক বছরই এই অপরিশুদ্ধ জলকে রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা কিছুটা শোধনকরা হচ্ছে কলেরার প্রকোপ কমাবার জন্য। এ সত্ত্বেও এই জলের মধ্যে আন্ত্রিক ব্যাধির সমস্ত রকম বীজাণুর তালিকা আছে। ন বছর আগে জল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একটী আন্তর্জাতিক সংস্থা বলেছিলেন "আমাদের মানব সভ্যতার এইযুগে বলাই নিষ্প্রয়োজন যে সহরের মধ্যে অপরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা ভয়ানক বিপজ্জনক। বিশেষ করে কলকাতার মতো সহরে যেখানে পাইপ লাইনগুলো যেন পাইপ থেকে সোজা বার হয়ে এসেছে।" গত বছরে কলকাতার জলসরবরাহের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে বৈ উন্নত হয়নি।

শিক্ষার অভাব

শিক্ষাপদ্ধতিতে অবহেলা একটি আরও বেশী ভয়াবহ ব্যাপার। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী শিক্ষায়তনের পুরোণ ভেঙেপড়া বাড়ীগুলো মেরামত করে নতুন নতুন বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। অন্য কথায় বলাযায় উঠতি ছেলে মেয়েদের জন্যে নতুন একটি স্কুলও তৈরী হয়নি। এতে করে সহরের ছেলেমেয়েরা যাদের স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশই স্কুলে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের একটী বেশ বড় অংশই বেসরকারী স্কুলে পড়ে। কিন্তু ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে একচতুর্থাংশ আছে যারা কোন স্কুলেই পড়েনা। স্কুলে যে সব ছেলেমেয়েরা পড়ে তাদের তুলনায় যারা পড়েনা তাদের সংখ্যা ভারতের কোন সহরে কলকাতার মতো এমন ভয়াবহভাবে বছর বছর বেড়ে যাচ্ছেনা। স্কুলে পড়লে ছেলেমেয়েদের একটা আশ্বাস থাকে যে ভবিষ্যতে তারা অনিপুন হলেও কাজ তাদের একটা কিছু জুটবেই। পূর্বভারতের একমাত্র বৃহত্তম সহর হওয়ার জন্যে কলকাতা দেশের ভিতরকার অংশ থেকে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রমিককে কাজে লাগায়। এই সব নতুন আগা, অপটু শ্রমিকদের অতি অল্প পারিশ্রমিকে লাগান, ভারতবর্ষের শিল্পপতিদের একটি সনাতন অভ্যাস। তাঁরা কম খরচ করে লাভের অংশটা রাখেন বিরাট। এদিকে অনটনের জন্য বাজারে চালের দাম ভারতবর্ষের সব সহরের চেয়ে কলকাতাতেই হল সবচেয়ে বেশী।

শ্রমিক আন্দোলন

গত বছরে চালের দাম, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর থেকে যে দাম বাড়ছিল তার চেয়ে ঢের বেশীগুণে বেড়ে গিয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলন, যাকে শিল্পপতিরা উচ্ছৃঙ্খলতা বলে অভিহিত করেন তা চলেছিল পূর্বগতিতে। শ্রমিকদের কাজের সময় যাকে 'ম্যানডে' বলে, ১কোটি বরবাদ হয়ে গিয়েছিল সারা ভারতবর্ষে, তারমধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই ছিল ৬০ লক্ষ 'ম্যানডে'। এ হল কয়েকটি সরকারী তথ্যমাত্র এর মধ্যে একটি যার ওপর দেশের শিল্প বাণিজ্যের লাভ লোকসানের খতিয়ান বহুপরিমাণে নির্ভর করে।শিল্পপতিরা আপাতত কিছুটা বাগত হলেও, তাঁরা বুঝছেন না যে নৈরাজ্যবাদের সেবটা তাঁরা দেখানেই দেখেছেন। যে কোন লোকের মতো তাঁরাও জানেন যে, তাঁদের শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা ভীষণভাবে ঘরীয়া। কাজেই স্রোতটাকে অন্যগতিতে বওয়ানোর চেয়ে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন এ সহরে আর টাকা পয়সা ঢেলে ব্যবসা তাঁরা করবেন না। তাঁরা বলেন কলকাতা একটা মৃত সহর!

———

যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকি ইহার প্রধান উপকরণ

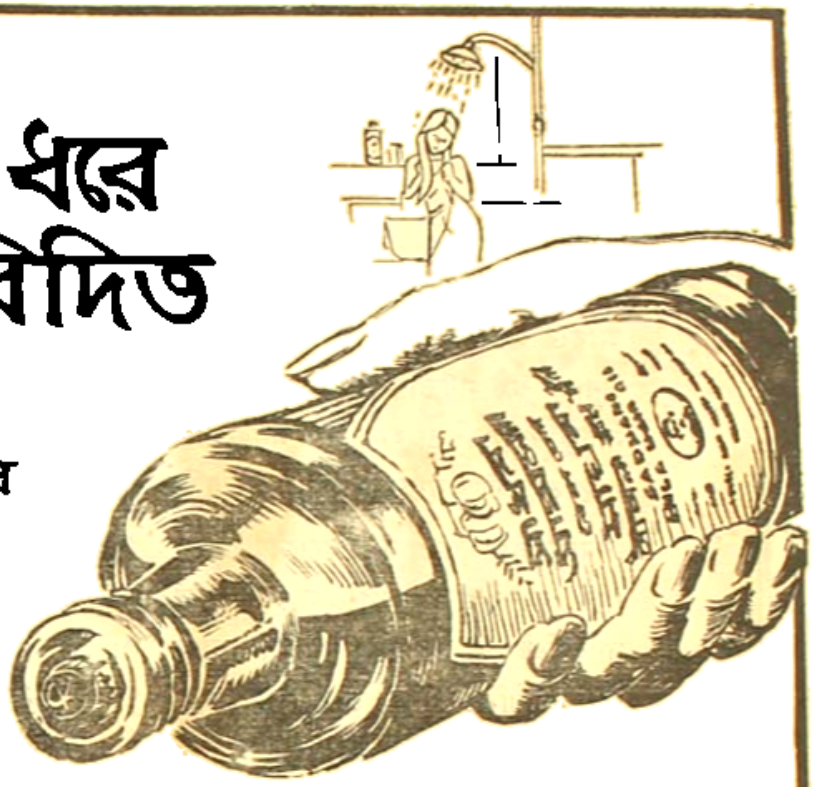

এখন এই নূতন শিশিতে পাবেন

সাধনা

আমলা

কেশ তৈল

কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়
পরম উপকারী আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৩৮

জামশেদপুরে নতুন সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জামশেদপুরে রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ জাকির হোসেন এবং আরও অনেক সম্মানিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। জামশেদপুরের রবীন্দ্র ভবন একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে। শুধু নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্য অনুশীলন নয়, এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কলা ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

জামশেদপুরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় 'ভারতীয়তার অখণ্ড রূপটি চোখে পড়ে' কারণ জামশেদপুরে সারা ভারতের নরনারী সুখেস্বচ্ছন্দে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে একাত্ম হয়ে বাস করেন। এই জামশেদপুরের এক প্রতীক হ'ল নবনির্মিত রবীন্দ্র ভবন।

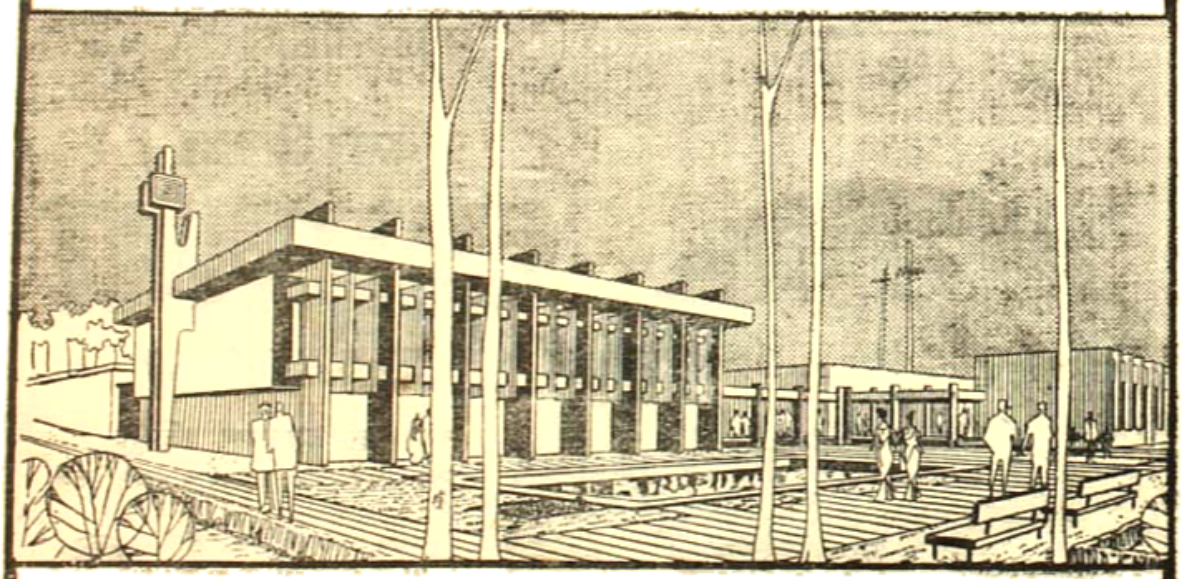

শিল্পীর চোখে রবীন্দ্র ভবন। মহান্ কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এই সুন্দর আধুনিক ভবনটি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত এবং ভবনাদর্শ বিনির্মাণে বহন করেছেন।

THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

শ্রাবণ ১৩৭৫, JULY, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—১ম সংখ্যা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীঘোষ বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বরষার পথে ভরসা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

দেশের কথা —নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়

মেয়ে-মজলিশ—

আমাদের সমস্যা —বেলা দে

অন্তরীক্ষে (কার্টুন)

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে—

বিশ্বের সেরা গল্প শেখভের ডারলিঙ —অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সিঁদুর চরণ —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় । The House of the Tagores । ১·০০

ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী । Studies in Aesthetics

Tagore on Literature And Aesthetics

ডঃ নবীনচন্দ্র সেন । A Critique of the Theories of Viparyaya

ডঃ আনন্দ রায়চৌধুরী । Studies in Artistic Creativity

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত । রবীন্দ্র-সুভাষিত

৺হরিশ্চন্দ্র সান্যাল । চৈতন্যোদয় ২·৫০ জ্ঞানদর্পণ

ডঃ বীরেন্দ্র দেবনাথ । রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীমিহিরকুমার বসু গান্ধীজীবনদর্শন

শ্রীবালকৃষ্ণ সেনন । Indian Classical Dances

৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । সঙ্গীতচন্দ্রিকা । ১৫·০০

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় । Reform and Regeneration in Bengal । ১৬·৫০

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা । সম্পাদক—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক । ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । বর্তমানে ষষ্ঠ বর্ষ চলছে । প্রতি সংখ্যা । এক টাকা । বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) এবং সাত টাকা রেজিষ্ট্রি ডাকে ।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : **জিজ্ঞাসা :** ৩৩, কলেজ রো, ১·৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

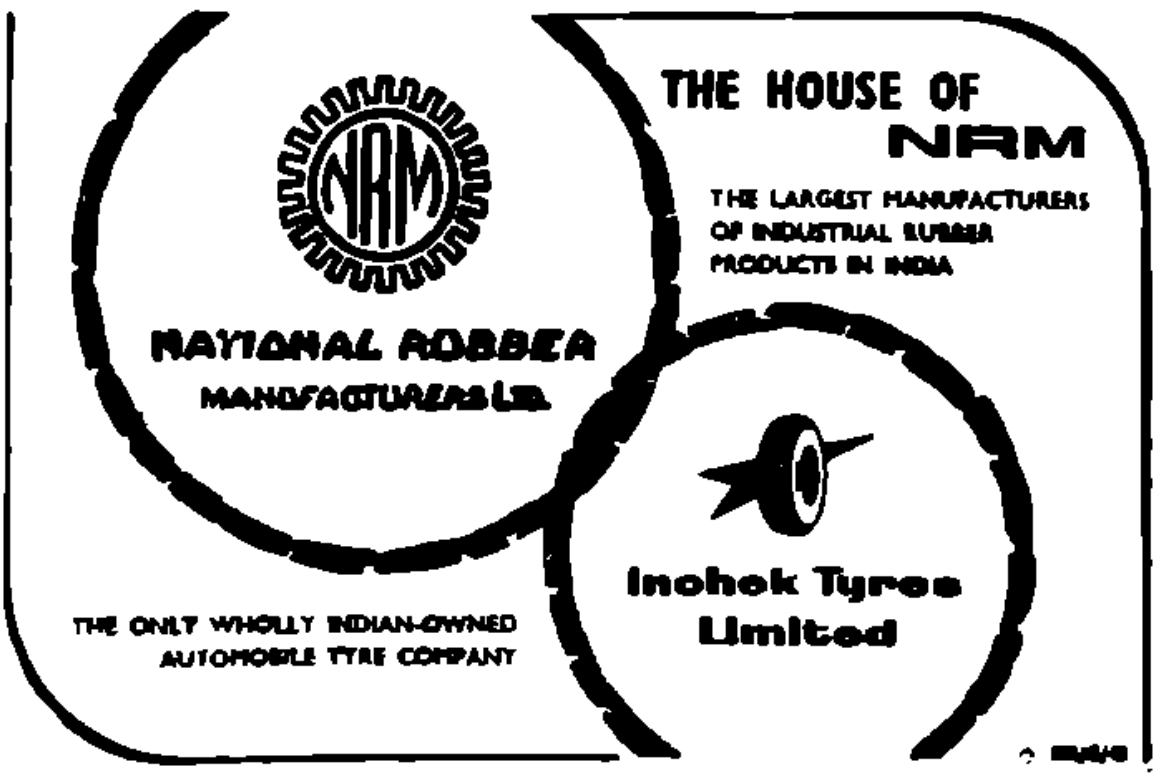

এই সংখ্যায়

পিছনের জানালায় (কাহিনী)	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	২৫
রাক্ষস গণ (গল্প)	—বেলা দেবী	২৯
আলো নেই	—জীবন সরকার	৩৩
সময়	—অশোক দত্ত	৩৬
রঙ্ করা পাখি	—অনিল কুমার দলুই	৪০
বিশ্বাস	—প্রভাত দেবসরকার	৪৯
ছাপা কাহিনী	—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৫৪
প্রেম	—দক্ষিণারঞ্জন বসু	৬১

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
adeyar

এই সংখ্যায়

একটি শিশির বিন্দু (গল্প)	—সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	৬৮
দণ্ডদাতা	—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	৭২
অঙ্গনা সংবাদ	—দেবযানী	৭৯
দিবা স্বপ্ন	—সুভাষ সেন	৮৪
পুরাতন পাতা—		
সেদিনের সাহিত্য-সমালোচকদের কড়া মেজাজ		৮৮
বিশ্ব-সাহিত্য—		
শেষ পাঠ	মূল : আলফঁসো দোদে অনুবাদ—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ	

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

॥ শারদীয়ার নূতন বই ॥

প্রমথনাথ বিশির উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭৷৷০ **প্রাচীন পারষিক হইতে (কবিতা) ৫৷৷০**

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৭৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নতুন তোরণ ৫৲

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

অন্য ভুবণ ৫৲

বিমল করের উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৫৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃশ্য রহস্য ৩৷৷০

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৩১৯২
৩৫-৮৭৯১

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **কিশোর গ্রন্থাবলী ৪৲**

এই সংখ্যায়

নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ময়
আজও যা ভুলিনি (স্মৃতিকথা)	—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মন যেতো যেথা ছুটে (,,)	—নরেন্দ্র দেব
যা দেখে এলাম	—মন্মথ রায়
এই প্রথম	
হোর ফ্রস্ট (গল্প)	—ভাস্কর ঘোষ

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষগুলি হবে সুদৃঢ়, কেশমূল হবে সুপুষ্ট ও কেশগুচ্ছ হবে সুন্দর ঘন কৃষ্ণ। টাক পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

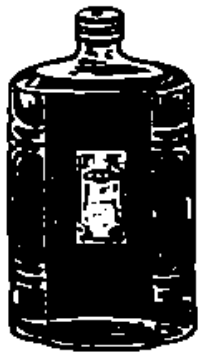

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

লাহোর • দিল্লী

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

প্রেষ্টিজ * স্বেবাশীষ * রেশমী * লাভলি * পাইওনীয়ার কুল * ব্রাইট আই * 'সিলভার আই' * 'ব্রাইটেক্স' * সিল্কফিল * সুপার মার্সিটেক্স * ইন্টারলক * উইন-টেক্স' * 'পাইওটেক্স' ও জনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

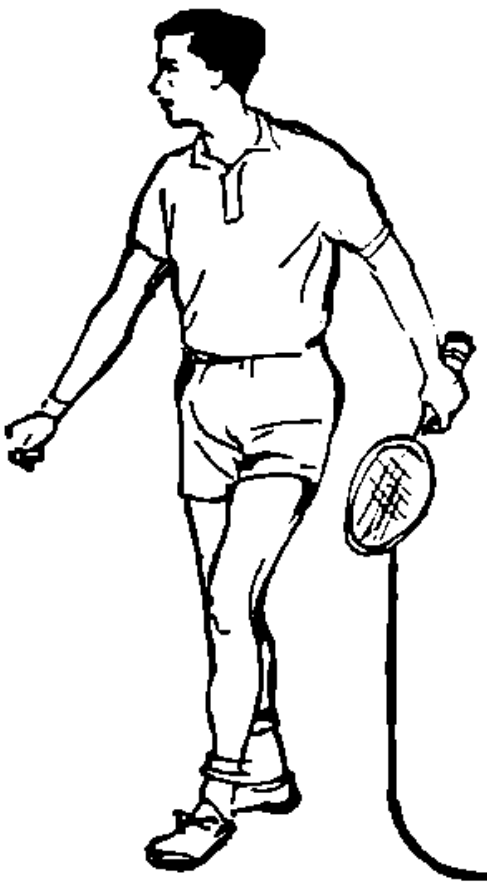

* দেখতে সুন্দর
* আরামপ্রদ
* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • ভেষ সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুবাস্থ ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অনুরূপ, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

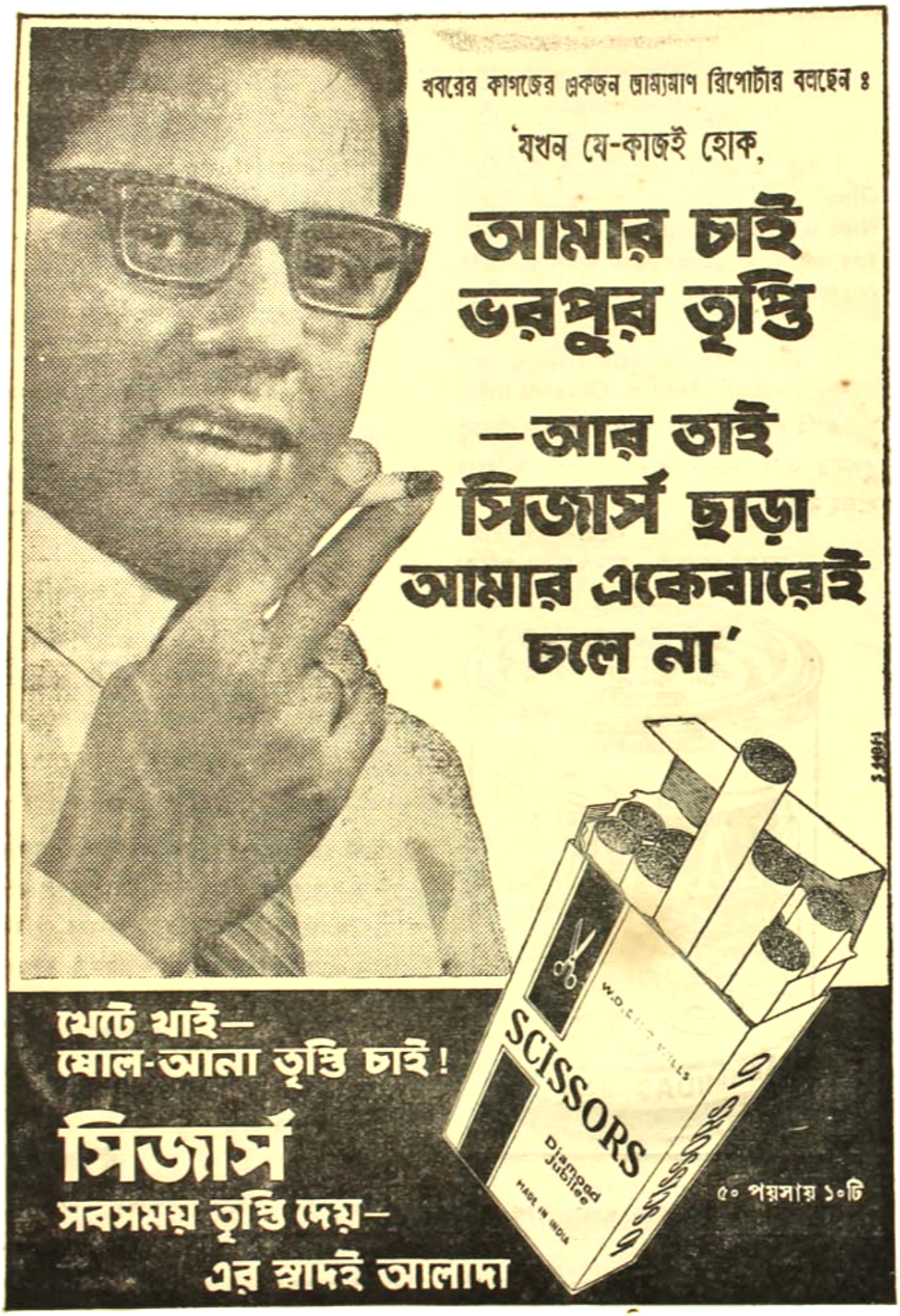
খবরের কাগজের একজন ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টার বলছেন ঃ
'যখন যে-কাজই হোক,
আমার চাই ভরপুর তৃপ্তি
—আর তাই সিজার্স ছাড়া আমার একেবারেই চলে না'
খেটে খাই—
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!
সিজার্স
সবসময় তৃপ্তি দেয়—
এর স্বাদই আলাদা
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
৫০ পয়সায় ১০টি

দেশের কথা

শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহ রায়

'দেশের কথা' রচয়িতা স্বর্গত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে আমরা প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছি। বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষ 'দেশের কথা' গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে মন্তব্য করেছিলেন যে,—'দেশের কথা'র মতো সুরচিত ও তথ্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ পাঠ করলে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর শাসনের সঙ্গে যুগপৎ শোষণ-নীতির অনুবর্তনের জন্য বিদেশী প্রশাসক-শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগবেই।

ওই একখানা গ্রন্থ বাঙালীর রাজনীতিক জীবনে কী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা স্মরণে আনলে সত্যি সত্যি আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না! 'দেশের কথা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের তদানীন্তন বড়লাট সাম্রাজ্যবাদ-মদ-গর্বিত লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। স্বদেশ-ভক্ত ও স্বজাতি-বৎসল গ্রন্থকার নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করলেন ওই অমূল্য গ্রন্থখানি, যেন—শুধু অখণ্ড বঙ্গদেশে নয়, বাংলার বাইরেও বঙ্গভাষী বাঙালী মাত্রের ঘরেই তা পঠিত হয়। সেজন্য তিনি ২০ /২৫০ পৃষ্ঠার ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারের গ্রন্থের মূল্য ধার্য করলেন পাঁচ সিকা কি দেড় টাকা। দেউস্কর মশায় এমন সুকৌশলে বইখানাতে তথ্য সংযোজিত করেছিলেন যে, প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ সুবিধা রাখেন নি বিদেশী প্রশাসক গোষ্ঠীর জন্য। পার্লামেন্টের ভারতহিতৈষী সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতানুরাগী বৃটিশ সাংবাদিকদের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তিনি প্রমাণ ক'রে দিলেন,—কী নির্মম ভাবে বৃটিশ প্রভু-গোষ্ঠীর পোষণের মতলবে ভারত-বাসীকে শোষণ করা হচ্ছিল! একজন বিশিষ্ট বৃটিশ নাগরিকের ব্যঙ্গিকতাপূর্ণ উক্তি -'India must be bled white'—উদ্ধৃত ক'রে তিনি অকাট্য প্রমাণ উত্থাপিত করলেন শোষণ-নীতির প্রতিকূলে।

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। অমৃত তুল্য
সাধনা অশোকারিষ্ট তার অটুট স্বাস্থ্য
এনে তাকে আজ জননীর গৌরবে

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা কলিকাতা-৪৮

Regd. No. C3643

SEP 1988

প্রতিদিন
প্রতিঘরে

লক্ষ্মীঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মীঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

CALCUTTA CENTRAL UNIVERSITY

স্বাধীনতা সংখ্যা

১৩৭৫

গল্পভারতী

এবারের বিশেষ আকর্ষণ

গল্পভারতীর পাতা থেকে

হিন্দু-মেলা —বিপিন চন্দ্র পাল

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী —মণি বাগচি

জাতীয় পতাকা

মন যেতো যেথা ছুটে—নরেন্দ্র দেব

অন্ধের মণিহার (ভ্রমণ কাহিনী)

— সুবোধ কুমার চক্রবর্তী

মেয়েমজলিশ

একটি উপন্যাসোপম বড় গল্প

চারটি বিভিন্ন রসের গল্প

ব্যঙ্গ চিত্র

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট

লিলির

থিন

এরারুট

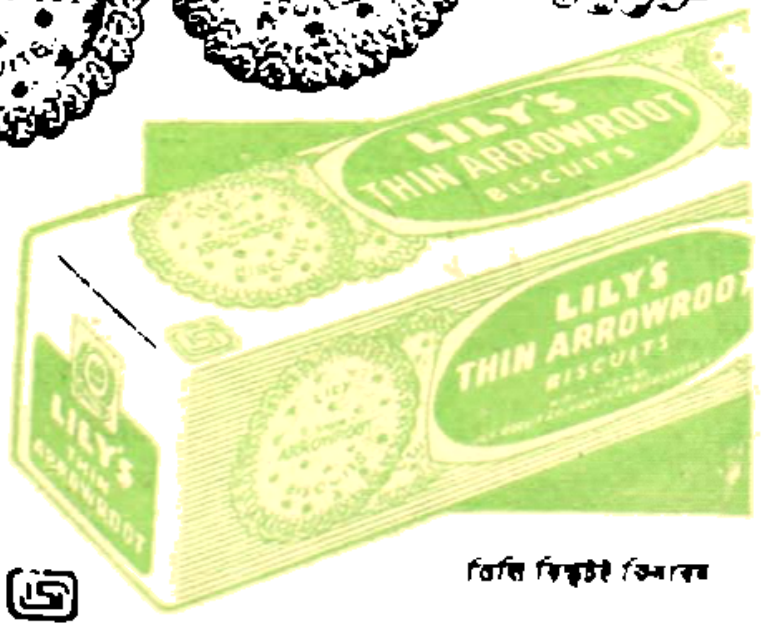

রোগী এ জন্য ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী

সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্বত্রই বিক্রয় হয়ে থাকে

লিলি বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

লিলি বিস্কুটই কিনবেন

যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকি ইহার প্রধান উপকরণ

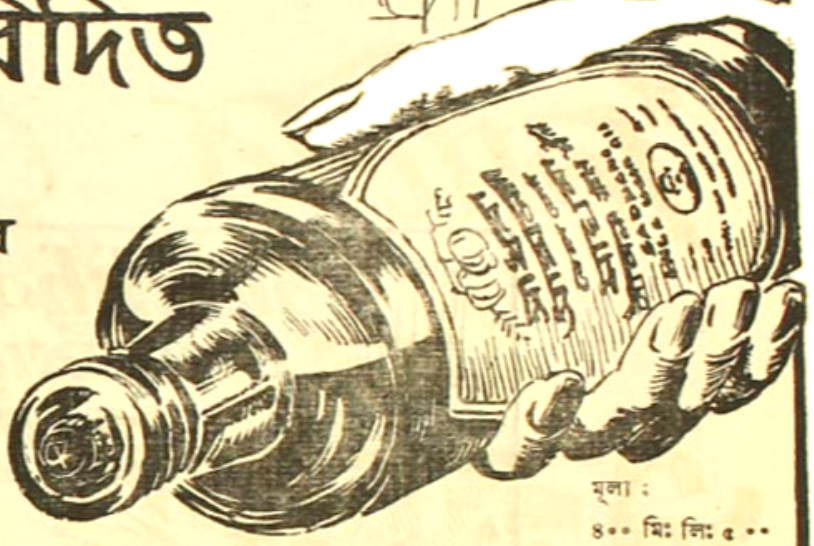

এখন এই নূতন শিশিতে পাবেন

মূল্য :
৪০০ মিঃ লিঃ ৫·০০
২০০ মিঃ লিঃ ২·৭৫
১০০ মিঃ লিঃ ১·৫০

সাধনা

আমলা

কেশ তৈল

কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়
পরম উপকারী আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস
(লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)।
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ), আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৭৮

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK,
CALCUTTA - 32
adayar

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
ভাদ্র ১৩৭৫, AUGUST, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—২য় সংখ্যা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীহরি বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই সেদ্ধাদের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

পুরাতন পাতা—

হিন্দু মেলা —বিপিন চন্দ্র পাল

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী —মণি বাগচী

জাতীয় পতাকা

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

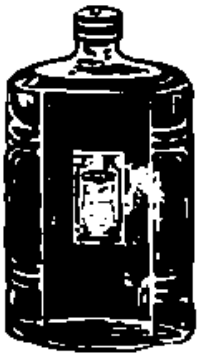

বেঙ্গল কেমিক্যাল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা
কোনটী থেকে ভুগছেন ?
আমাদের
ভাস্কর লবণ
খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।
যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা
করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্
২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

এই সংখ্যায়

অন্তরীক্ষে (কার্টুন)

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে—

ময়ূর —পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

কাটামুণ্ড রহস্য (গল্প) —প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অরণ্য —প্রফুল্ল সরকার

পৌনঃপুনিক —অতুলরঞ্জন দেব

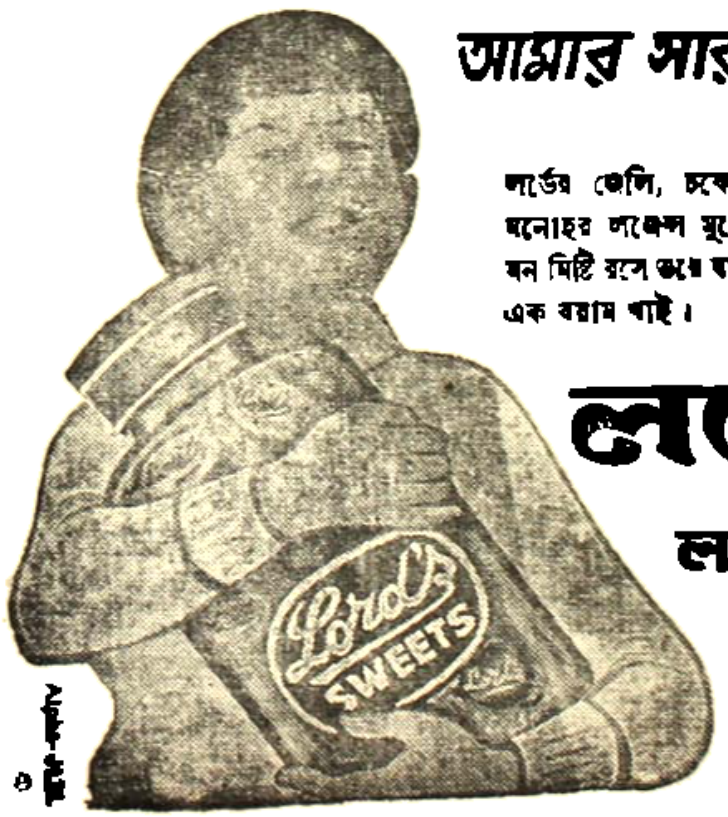

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

প্রেষ্টিজ * বেবাশীষ * রেশমী * লাভলি * পাইওনীয়ার কুল * ব্রাইট আই * 'সিলভার জাই' * 'ব্রাইটেক্স' * সিল্কফিল * সুপার মাসিটেক্স * ইন্টারলক * উইন-টেক্স' * 'পাইওটেক্স' ও জনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

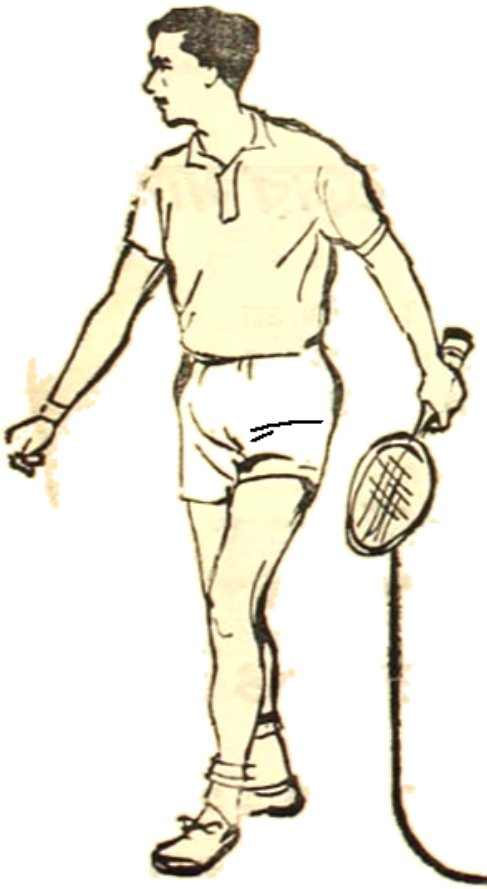

* দেখতে সুন্দর
* আরামপ্রদ
* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২৯৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

মৃগয়া (গল্প)	—নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
সুখের খবর	—নির্ম্মলেন্দু গৌতম
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়
মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিকথা)	—নরেন্দ্র দেব
অন্ধের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)	—সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

॥ শারদীয়ার নতুন বই ॥

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭৷৷০ **প্রাচীন পারসিক হইতে (কবিতা) ৫৷৷০**

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪৷৷০

শম্ভুমহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

অন্য ভুবন ৪৷৷০

বিমল করের উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪৲

'যাত্রিক' প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩৷৷০

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙ্গালী জীবনে রমণী ১০৲

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪৷৷০

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ

আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অমৃত জীবন-কাহিনী

লেখক—জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিবে।

'জনক জননী'

বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্ত্তি একটা নতুন যুগের রচনা···
বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮··

প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৩৫৫

এই সংখ্যায়

অঙ্গনা সংবাদ —দেবযানী

মেয়ে-মজলিশ—

আমাদের সমস্যা —বেলা দে

স্বাধীনতার পর

বাংসার পূজাপার্বণ —শ্রীমতী শকুন্তলা

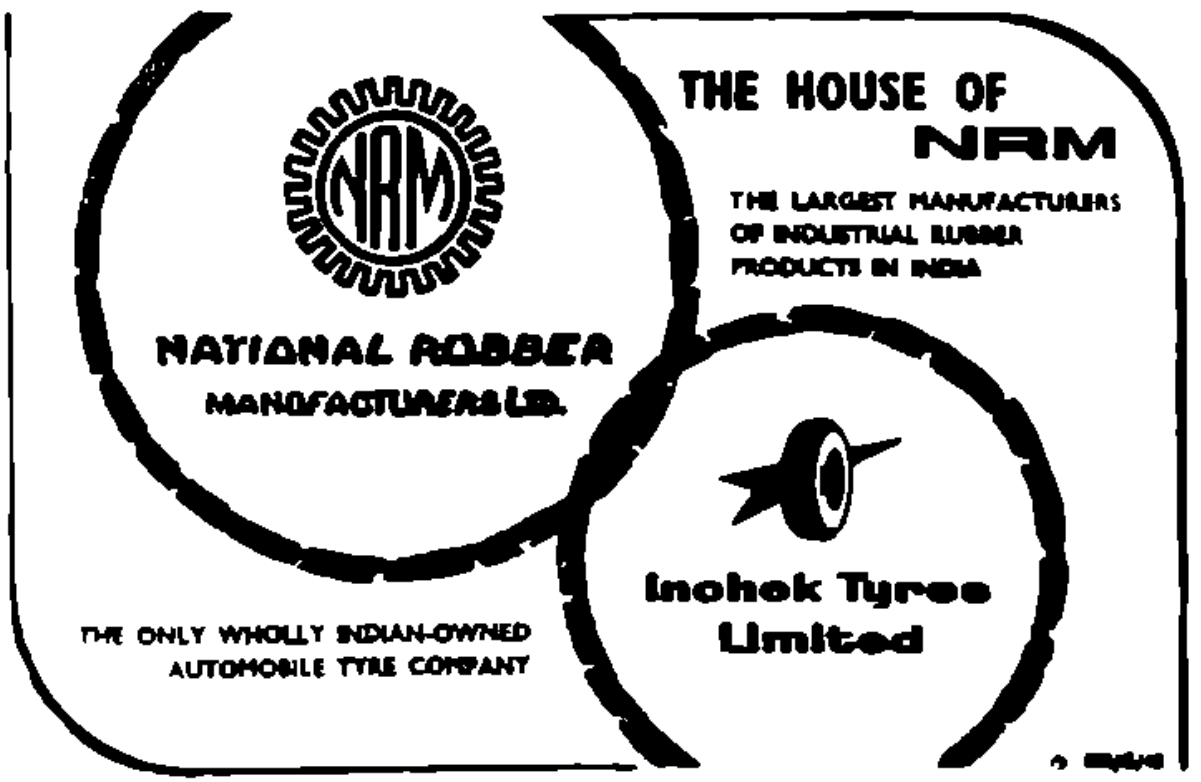

ঠিক যেমনটী আমি চাইছিলাম!

এমন একটী মাথার ত্বক আমি চাইছিলাম।
যা চট্‌চটে হবেনা, চামড়াপড়ে বাদ লাগবেনা আবার যার গন্ধটীও হবে মনোরম
কেয়ো-কার্পিন ঠিক এমনি একটী মাথার ত্বক

চুল কোমল, মসৃণ ও পরিপাটি
রাখতে কেয়ো-কার্পিনের তুলনা
নেই। সুন্দর ঘন চুল চান তো
কেয়ো-কার্পিনই আপনাকে
নিতে হবে।

কেয়ো-কার্পিন কেশ তৈল...আজ চল্লিশ বছরের জন্য

কেশ মেডিকেল
কৌশ প্রাইভেট
লিমিটেড
কলিকাতা, নাগপুর
দিল্লী, লাহোর
পাটনা, মাদ্রাজ
ঢাকা, কানপুর
লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ
হায়দ্রাবাদ,
হিসার।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

(১৮৬৯-১৯৩২)

মণি বাগচী

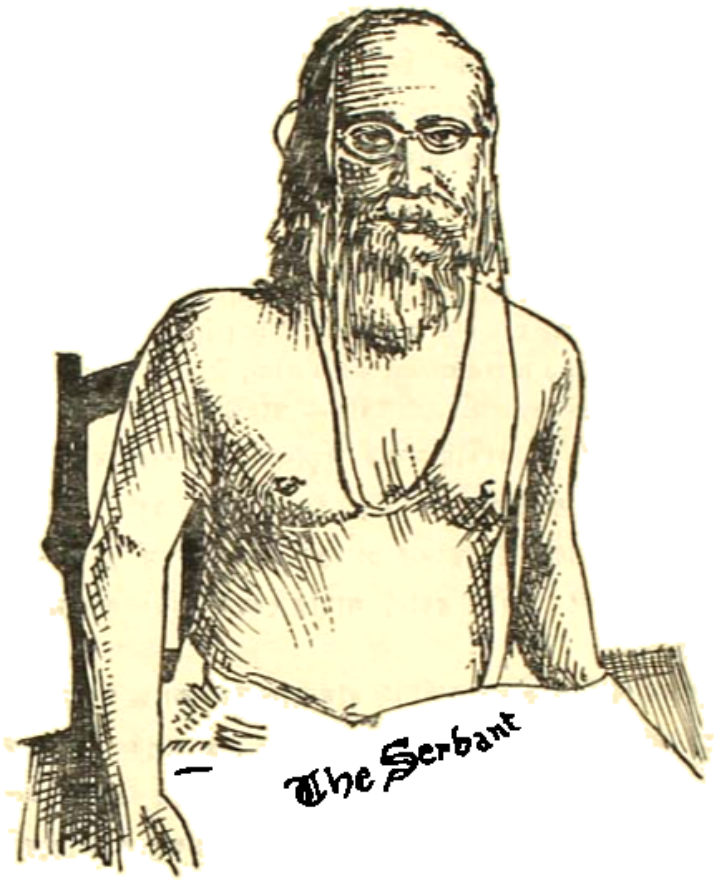

[বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন এবং পরবর্তী-কালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। জাতীয়তাবাদী নেতা, সুদক্ষ সাংবাদিক এবং বাগ্মী হিসাবে একদা তাঁর খ্যাতি বাংলা তথা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তিলক, মালব্য, মুঞ্জে থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত শ্যামসুন্দরের স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে তাঁহার নি ভী ক তা তেজস্বিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বি পি ন চ ন্দ্র পাল, অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন —প্রভৃতি বাংলার বরেণ্য নেতৃবৃন্দ সকলেই ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দরের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। দেশজননীর সুসন্তান শ্যামসুন্দরকে শাসকজাতির হাতে একাধিকবার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। একালের বাঙালি সন্তানদের কাছে এই দেশপ্রেমিকের নাম আজ বিস্মৃত বললেই হয়। আগামী বৎসর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবার কথা। তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল; তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আমরা চিরকাল পোষণ করি। সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এই চরিতালোচনাটি 'গল্প-ভারতী'র পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিলাম।

সম্পাদক—গল্প-ভারতী।

"এ বঙ্গ আঁধার করি হে কবি, গিয়াছ চলি
তেজোময় রূপধরি মর্ত্যদেহ হেথা ফেলি।
দেশহিত লাগি দিলে প্রাণ মায়ের চরণে—
কাঁদিছে জননী তাই হারায়ে তোমা রতনে।
আশুতোষ হে সন্ন্যাসী! মাতৃমুক্তি করি ধ্যান
কর্মক্লান্ত জীবনের করিলে কি অবসান?
তব কথা আজো হায় তেমনি যে শোনা যায়
হে মায়াবি মন্ত্রবাক্! কেমনে ভুলিব তায়?
সুদীর্ঘ জীবন তব জাতির সে ইতিহাস
বর্ণিতে ভাষা নাই, অশ্রুতে লভিছে প্রকাশ।
রাজ-রোষ নির্য্যাতন অসহ্য সে নির্ব্বাসন
বারবার সহিলে তুমি একক আজীবন।
মিলিত জাতির অর্ঘ্য লহ হে ব্রাহ্মণ!
লহ সবার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পুণ্য-তর্পণ।
হে বন্দেমাতরম্ কবি! অরবিন্দ সহচর
যুগে যুগে এস তুমি বাঙলার শ্যামসুন্দর।

স্বাধীনতা লাভের দৃঢ়সংকল্প লইয়া যেদিন এই দেশের মানুষ আসমুদ্র হিমাচলে—এক অভাবনীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল সেইদিন এই বাংলা দেশেই স্বাধীনতার বীজ রোপিত হইয়াছিল সর্বপ্রথম। এই বাংলা দেশের ছেলেরাই ১৯০৪—০৭ সালে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিদেশীদ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল প্রথম ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায়। এক বৎসর পূর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্বে নেতৃবর্গ ও কর্মিগণ মহাসমারোহের সঙ্গে বার্ষিক উৎসব পালনের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক এমনি সময় তৎকালীন ছাত্রসমাজের ছত্রপতি নেতা বাগ্মী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট স্বদেশী আন্দোলনের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলে তিনি তা সাদরে অনুমোদন করেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন দেশবরেণ্য নেতা ও সেদিনের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক কৃষ্ণকুমার মিত্রের জামাতা। তাঁরই একমাত্র পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র (এখনও জীবিত আছেন) প্রস্তাব করেন যে আমাদের একটি জাতীয় পতাকা (National flag) হওয়া উচিত এবং এই পতাকা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ৭ই আগষ্টের জনসভায় উড্ডীন করা হউক। জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ কালবিলম্ব না করিয়া একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন ও সুরেন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার এক পরামর্শ সভায় তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। যৎসামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রা কলেজ স্কোয়ারের ন্যাশনাল-সাহিত্য সোসাইটির (তৎকালীন ছাত্র ও যুবকসংঘের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া সভাস্থলের দিকে যাত্রা সুরু করে। অগ্রে একজন বলিষ্ঠ যুবক অশ্বপৃষ্ঠে জাতীয় পতাকা হাতে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তার পশ্চাতে ছাত্র ও যুবকসংঘের বাছাইজন সভ্য পীত বর্ণের পতাকা হস্তে জননায়ক

অন্তরীক্ষে

১০ বৎসর বিবাহ
বন্ধ রেখে জন-
সংখ্যা কমান
জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের
জন্য
১০ বৎসর বিবাহ
বন্ধ রাখুন
বন্ধ রাখুন
বন্ধ রাখুন

প্রাক স্বাধীনতা যুগে বাঙ্গালীর বংশধর

SATYAMEVA JAYATE

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জানেন
'সাধনা অশোকারিষ্ট'
কিভাবে এনে তাঁকে অফুরন্ত
প্রাণশক্তি দান করেছে।

সুস্থ সুন্দর
এই কথা।

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

প্রতিদিন
প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

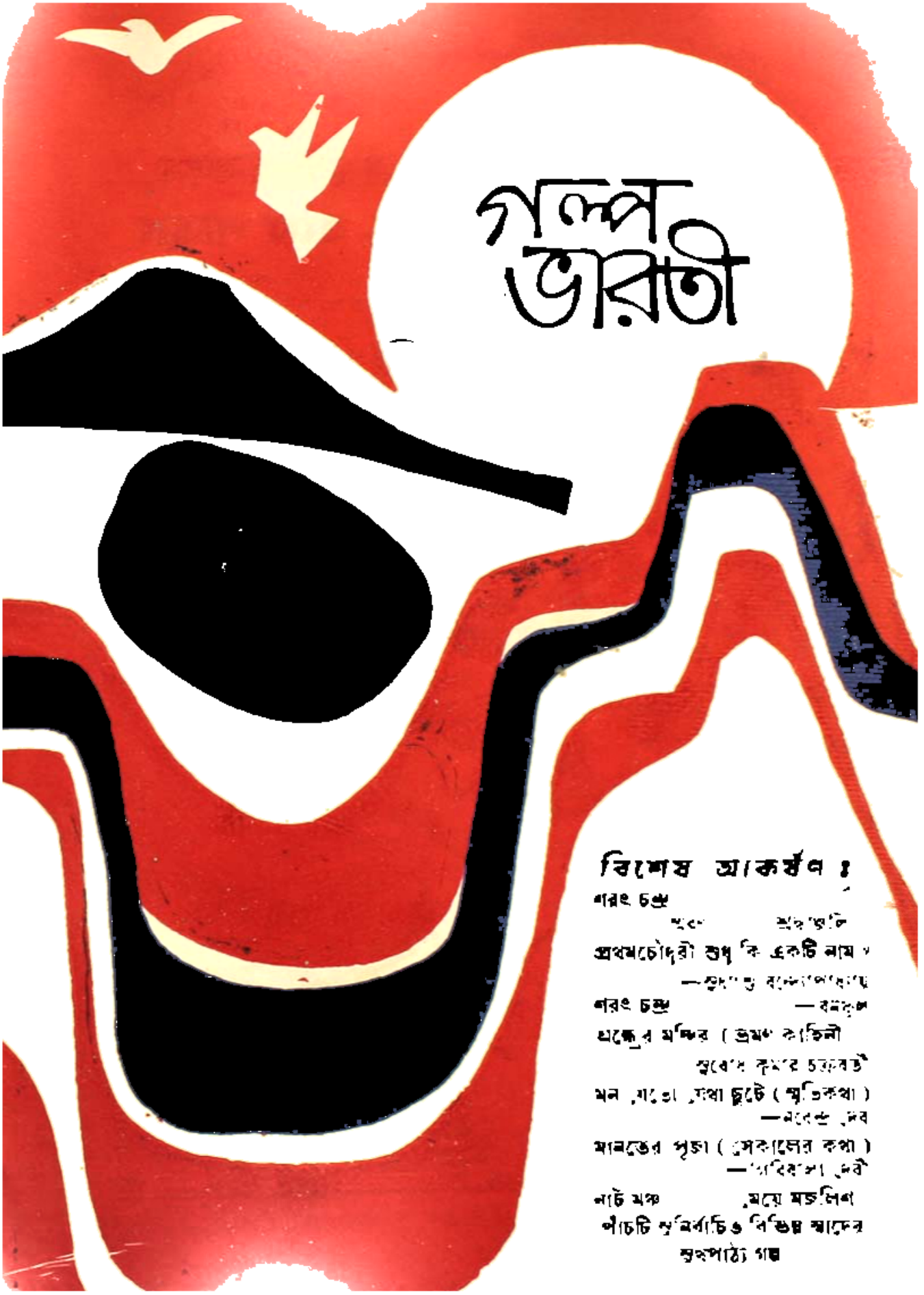

বিশেষ আকর্ষণ :

শরৎ চন্দ্র
[illegible] [illegible]
প্রথমচৌধুরী শুধু কি একটি নাম ?
—সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
শরৎ চন্দ্র —বনফুল
প্রেমের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী
সুবোধ কুমার চক্রবর্তী
মন যাহা চায় ছুটে (স্মৃতিকথা)
—নরেন্দ্র দেব
মানভের পূজা (সেকালের কথা)
—পরিমলা দেবী
নাট মঞ্চ [illegible] মেয়ে মজলিশ
পাঁচটি সুনির্বাচিত বিভিন্ন স্বাদের
সুখপাঠ্য গল্প

দিনের শেষে আপনি যখন কাজ করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন

এক গ্লাস টাটকা লিলি বার্লি খেলে
অনেক আরাম ও আনন্দ পাবেন

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি
বলে চাইবেন

আধুনিক
শিল্পোন্নয়ন
প্রচারের প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৩

যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকি ইহার প্রধান উপকরণ

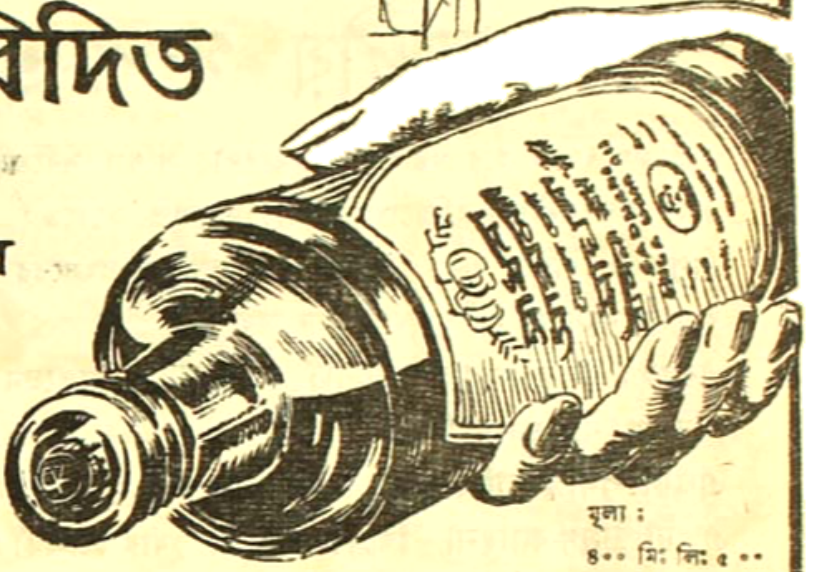

এখন এই নূতন শিশিতে পাবেন

মূল্য :
৪০০ মিঃ লিঃ ৫ ০০
২০০ মিঃ লিঃ ২·৭৫
১০০ মিঃ লিঃ ১·৫০

সাধনা

আমলা

কেশ তৈল

কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়
পরম উপকারী আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অধ্যাপ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ সি. এস
(লণ্ডন), এম সি. এস. (আমেরিকা)।
ঢাকাস্থ কলেজেঃ হিন্দুশাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ), আয়ুর্বেদাচার্য।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৫৮

বাংলা সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী

শারদীয় গল্প-ভারতী

গত ২৩ বৎসর ধরে গল্প-ভারতী শারদীয় সংখ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা সংখ্যারূপে ভারতের সর্বত্র অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বিপুল ও বিচিত্র রচনা সম্ভারে সমুজ্জ্বল এ বৎসরের গল্প-ভারতী শারদীয় সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের গৌরবকেও ম্লান করবে।

এবারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ **তিনটি উপন্যাস**—লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

একটী পূর্ণাঙ্গ নাটক—লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

একটী ভ্রমণ-কাহিনী—লিখেছেন সুবোধকুমার চক্রবর্তী।

বিশেষ আকর্ষণ—দু'টি অপ্রকাশিত মূল্যবান রচনা—**"সিনেমা" "রবীন্দ্রযুগ"** লিখেছেন ভূতপূর্ব গল্প-ভারতীর সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ।

পঁচিশটী ছোট বড় গল্প লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, গজেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়, অনিল ভট্টাচার্য, শম্ভু মহারাজ, বিভূতিভূষন গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন মাইতি, প্রভাত দেব সরকার, সুবোধ বসু, কবিতা সিংহ, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্রিতা দেবী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর বসু, নমিতা চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারেন্দ্র পাল।

স্মৃতিচারণ—রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, নাটোর রাজমাতা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী।

মেয়ে-মজলিশ, ব্যঙ্গচিত্র ও দু'টী অতুলনীয় সচিত্র ও বিচিত্র সংযোজন।

এই বিরাট বিপুল গ্রন্থের মূল্য মাত্র চার টাকা।

ডাক মাশুল এক টাকা।

সত্বর টাকা পাঠিয়ে অর্ডার দিন। এজেন্টরা কার কত কপি প্রয়োজন জানিয়ে অগ্রিম টাকাসহ অর্ডার দিন।

মনে রাখিবেন এই বিরাট বিপুল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব।

গল্প-ভারতী

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৮ : ৫৫-১৩৫৫

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
ভাদ্র ১৩৭৫, SEPTEMBER, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—৩য় সংখ্যা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex- Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt- of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুখাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

শরৎচন্দ্র —বনফুল

প্রমথ চৌধুরী—শুধু কি একটি নাম ? —সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণ : শ্রদ্ধাঞ্জলি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুরাতন পাতা—

সমুদ্র বিহঙ্গ (গল্প) —হরিপ্রসাদ ভৌমিক

গরল —হিরণ্ময়ী বসু

ছাত্রী —রবীন্দ্রনারায়ণ দে

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল রকমের উপযোগী।

[illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • পাইওনীয়ার [illegible] • [illegible] • [illegible] •

এই সংখ্যায়

ডাকাত কেষ্ট চৌধুরী (গল্প)	—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
মানতের পূজা (স্মৃতিচিত্র)	—গিরিবালা দেবী
মন যেতো যেথা ছুটে „	—নরেন্দ্র দেব
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গল্প-ভারতীর পাতা থেকে	
মতির মা	—রামপদ মুখোপাধ্যায়
এই প্রথম	
নবাব (গল্প)	—নীহার পাকড়াশী

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশগুলি সুন্দর ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে অবিলম্বে কেশ-কোমল হবে কেশ মূলের কোষগুলি ও মস্তিষ্ক সুস্থ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

NRM

NATIONAL ROBBER MANUFACTURERS LTD.

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres Limited

এই সংখ্যায়

অঙ্গনা সংবাদ —দেবযানী

মেয়েমজলিশ—

পূজা এলো —বেলা দে

আমাদের সমস্যা

দায়ী কে? —বেলা দেবী

অক্ষের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী) —সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

খেলাধূলা —শ্রীজ্যোতির্ময়

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেমস লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

॥ শারদীয়ার নতুন বই ॥

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭৷৷০ প্রাচীন পারসিক হইতে (কবিতা) ৫৷৷০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪৷৷০

শম্ভুমহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

অন্য ভুবন ৪৷৷০

বিমল করের উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪৲

'যাত্রিসাথী' প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩৷৷০

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙ্গালী জীবনে রমণী ১০৲

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪৷৷০

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ

আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অমৃত জীবন-কাহিনী

লেখক—জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম মৌলিক ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিবে।

'জনক জননী'

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটা নতুন যুগের রচনা····
বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ·····
প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ মেশান্ত ঘট
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮০০

প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৩৫৫

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32

ঠিক যেমনটা আমি চাইছিলাম!

এমন একটা মাথার তেল আমি চাইছিলাম
যা চটচটে হবেনা, জামাকাপড়ে দাগ লাগবেনা আবার যার সুগন্ধটিও হবে মনোরম
কেয়ো-কার্পিন ঠিক এমনি একটা মাথার তেল

চুল কোমল, মসৃণ ও পরিপাটি
রাখতে কেয়ো-কার্পিনের তুলনা
নেই। সুন্দর ঘন চুল চান তো
কেয়ো-কার্পিনই আপনাকে
দিতে হবে।

কেয়ো-কার্পিন কেশ তৈল—রাখে ঠান্ডা মাথা চুলের জন্য

কেশ মেডিকেল ষ্টোর্স এণ্ড কেমিক্যাল লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কটক, রাজমুন্দ্রী, কানপুর, আহমদাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, ইন্দোর

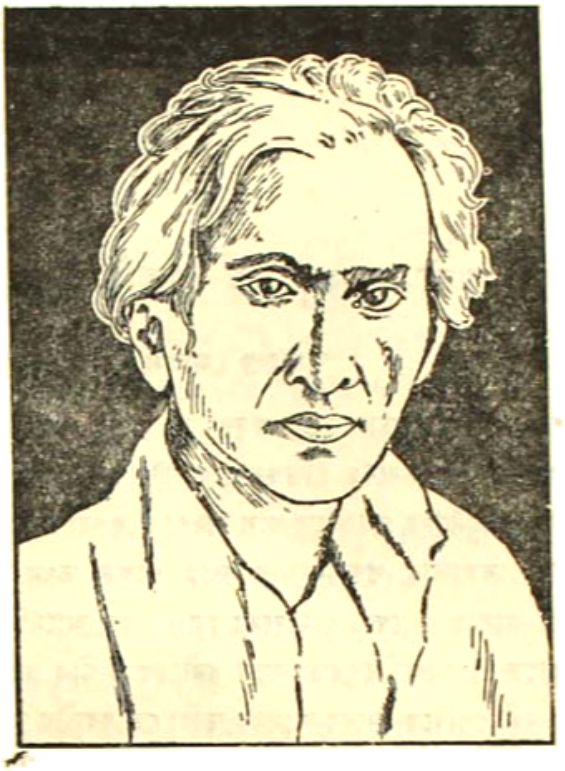

শরৎচন্দ্র

বন্দনা

হে মহাশিল্পী শরৎচন্দ্র,
আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর।
শরতের মতোই একদিন এসেছিলে তুমি
বাংলার ঘাটে মাঠে বাটে
বাংলার নদীতে, বাংলার অরণ্যে
বাংলার মহাকাশে
বাঙালীর মনে প্রাণে আনন্দ বেদনায়
বাঙালীর শাশ্বত শিল্প চেতনায়
তোমার সে আবির্ভাব বিস্ময়কর।
শরতের মতোই তোমার আকাশ নির্মল নীল
স্বর্ণ-কিরণ-মণ্ডিত
স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-পুলকিত
শুভ্র মেঘের আনাগোনায় চঞ্চল।
শরতের মতোই সুন্দর সুবিস্তৃত তোমার রাজসভা
সে সভায়
কুন্দ কাশ শেফালি-কুমুদ-কহ্লার রঞ্জনের উৎসব
খঞ্জনের লঘু নৃত্যের সঙ্গে
বহিয়ান-বুলবুল-পাপিয়া-ভরদ্বাজের সুর-সঙ্গৎ
মিলন তৃপ্তা ভাহকীর প্রণাম্ত প্রশস্তি
মধুমল্ল সবুজ দুর্বাদলের বুকে নীহারের মুক্তাবলী।
তোমার সাহিত্যই তোমার রাজসভা
সেখানে ধনী দরিদ্র সৎ অসৎ
ভাগ্যবান ভাগ্যহত, মানুষ অমানুষ
অনাথ সনাথ
সকলের ভীড়
তুমি তাদের স্রষ্টা
তুমি তাদের ব্রহ্মা
তারা সকলেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে
চেয়ে আছে তাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে
জানাচ্ছে তোমাকে প্রণাম
অমর করেছ তুমি তাদের সুখ দুঃখকে
নরনারীদের করেছ অগ্রগণ্য
পাপীকে মার্জনা করেছ স্নেহস্পর্শ দিয়ে
হে মহাশিল্পী
তোমাকে আবার প্রণাম করি।

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। সীবোঃ অমৃত তুল্য 'সাধনা অশোকারিষ্ট' তার অটুট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে তাঁকে আজ জননীর গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে।

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড সাধনা নগর কলিকাতা ৪৬

প্রতিদিন
প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

শারদীয় গল্পভারতী ১৩৮৭

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

লিলির ক্রীম ক্র্যাকার

উৎসবের দিনে
প্রচুর আনন্দ
দেয়

লিলি বিস্কুটই কিনবেন

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

এই সংখ্যায়

●

উড়িষ্যা

পাষাণে প্রাণের ভাষা	—গীতা মাইতি
উড়িষ্যার পল্লীগীতি	—সুকুমার রায়
উৎকলে পাল পার্বণ	—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎকল ললনা	—উষা ভট্টাচার্য

আসাম

আসামে লোকধর্ম ও লোকরীতি	—ডঃ সন্ধ্যা ভাদুড়ী
উত্তর সীমান্তের লোকসংগীত	—মনসেন্দুবিকাশ কর চৌধুরী
আসামের লোকনৃত্য	—শান্তা বসু
আসামের রেশম শিল্প	—মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
অসমীয়া দারুশিল্প	—দেবধানী
বাংলা-ওড়িয়া-অসমীয়া সাহিত্য	—ডঃ উমা রায়

যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকি ইহার প্রধান উপকরণ

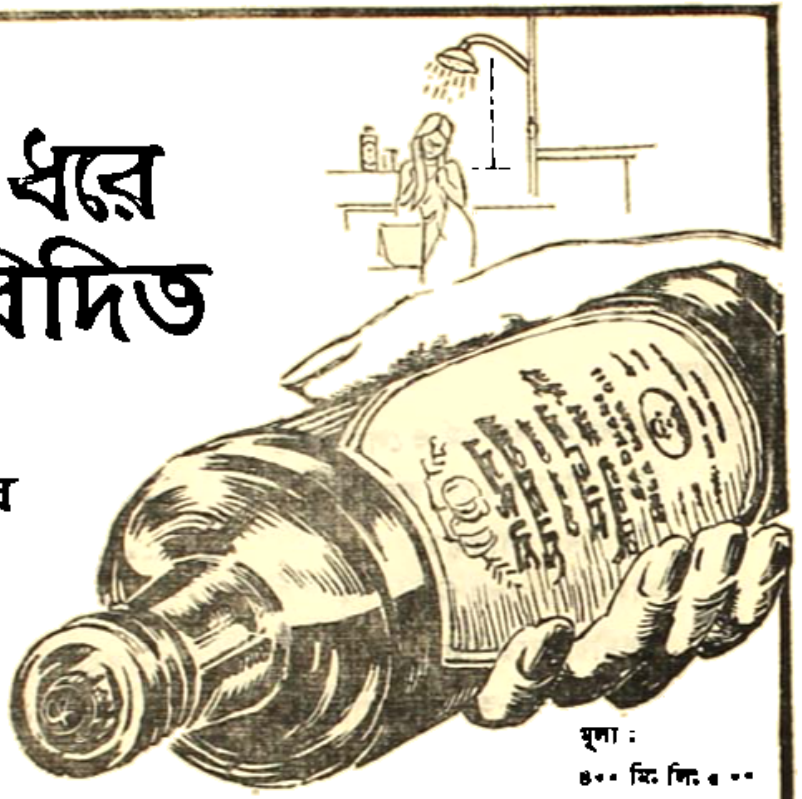

এখন এই নূতন শিশিতে পাবেন

মূল্য :
৪০০ মিঃ লিঃ ৫ ০০
২০০ মিঃ লিঃ ২·৭৫
১০০ মিঃ লিঃ ১ ৪০

সাধনা

আমলা

কেশ তৈল

কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়
পরম উপকারী আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

কলিকাতা কেন্দ্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।

আধার ভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে
কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

উন্মোচন

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয়
স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক

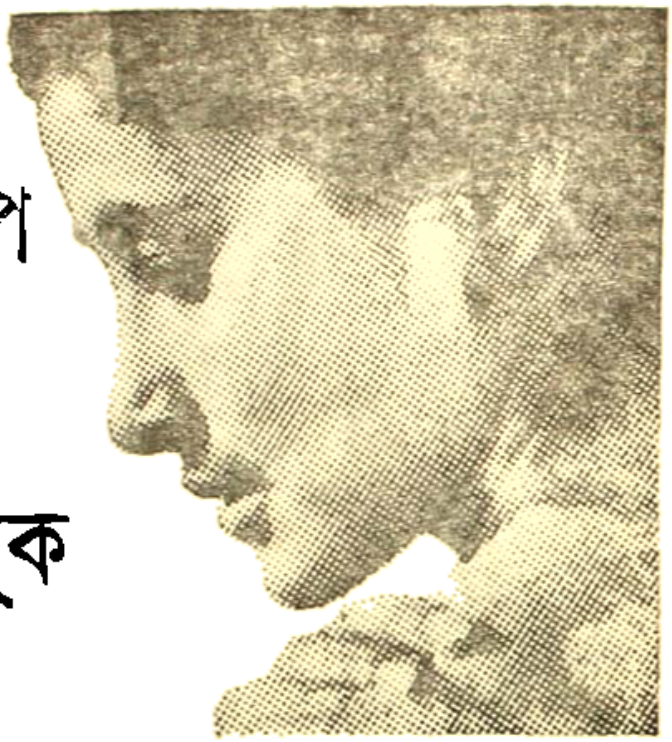

ঘুরে ফিরে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে

মলয় স্যাণ্ডাল সোপের মনমাতানো দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার—দুয়ে মিলে আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে সারাদেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিন ভর কত ঝরঝরে ও হাল্কা বোধ করেন। মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তগুলিতেও আপনাকে ঘিরে থাকবে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী

MLT 3760

ওরনার শেষকথা। সুতো পটাং করে ছিঁড়ে পটলবাবুর হাতে চলে এল। খানিকটা গিলে ফেলতে হল। সুতো, জল, সব! পটলবাবু আর কিছু না পেয়ে শুক্তির পায়েসের সসপ্যানটাই বাজাতে লাগলেন লোহার খাটের পায়ে। একলা, শয্যাশায়ী, অসহায় বৃদ্ধ আর কি করতে পারে?

অবশ্য তরলাই হেমাঙ্গিনী, আর নিবারণকে বুদ্ধি সে-ই দিয়েছিল। কিন্তু পটলবাবুকে কেউই ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি, করা সম্ভবও নয়। বিছানার সঙ্গে যে মানুষটা চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা, তাকে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দেখেশুনে পুলিশের লোক শুধু আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে, 'পায়রা ধরতে গেছলে কেন? পাখীপক্ষ ধরা কি ভাল?' বলে সন্তুকে একটা ধমক মেরেই চুপকরে গিয়েছিল।

শুধু রমেশ সরকার পটলবাবুর কথার উত্তরে আগাগোড়া চুপকরে রইল, একটা কথাও বলল না। ভেসলিন দিলে পায়রার পা পিছলে যায় এ বুদ্ধি সন্তুর মাথায় আসতে পারে না। এও নিশ্চয় পটলবাবুর শিক্ষা।

ঘোড়ামারার জেলখানায় বসে নারকেল তেলে মেখে পেচল করে কয় পায়রা ধরেছিলেন একসময়ে পটলবাবু? সবাই বলত পায়রাপটল।

———

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায় কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুসুরভি গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল···চুলের সুরক্ষার জন্য

কেশ বেদিকেম কোম্পানী লিমিটেড

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, লোহারু, [illegible]

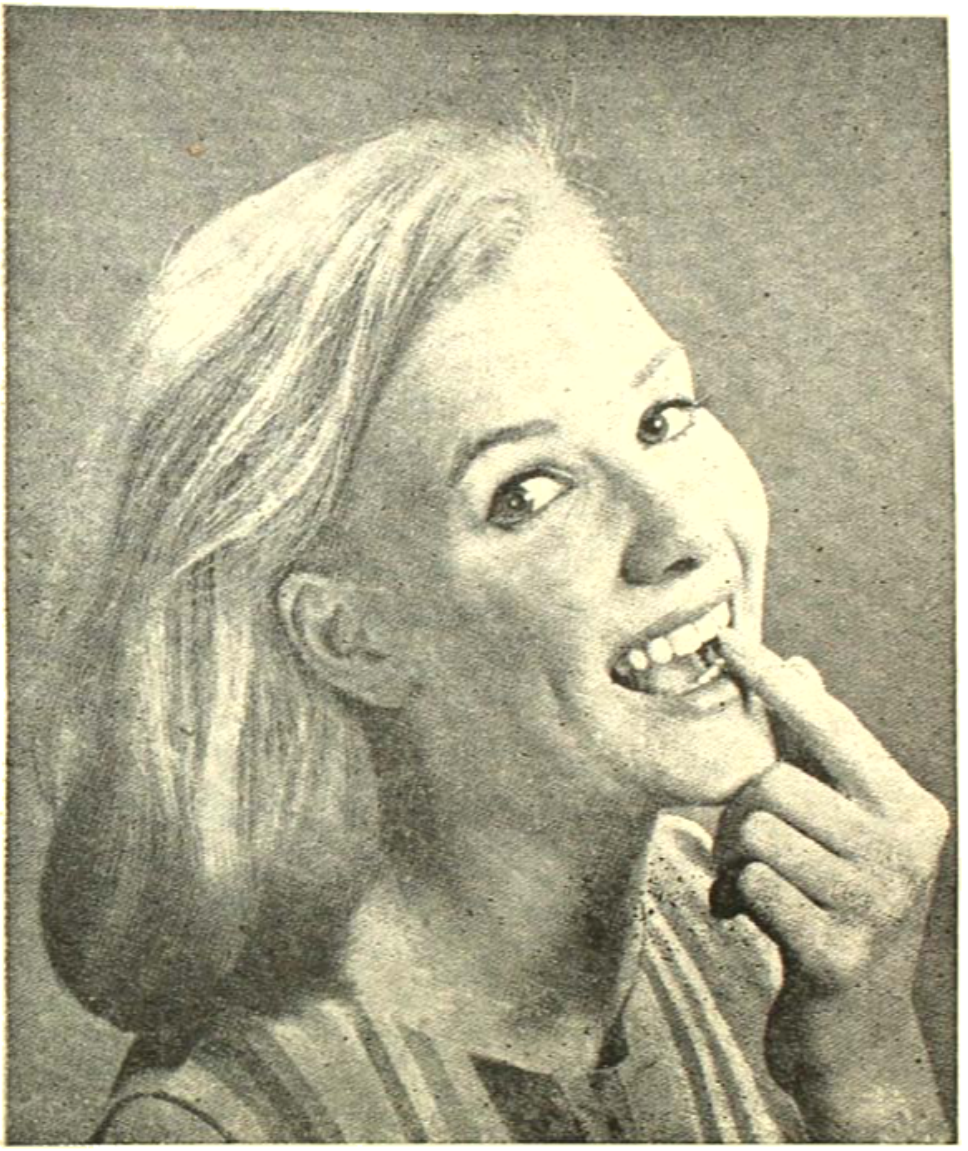

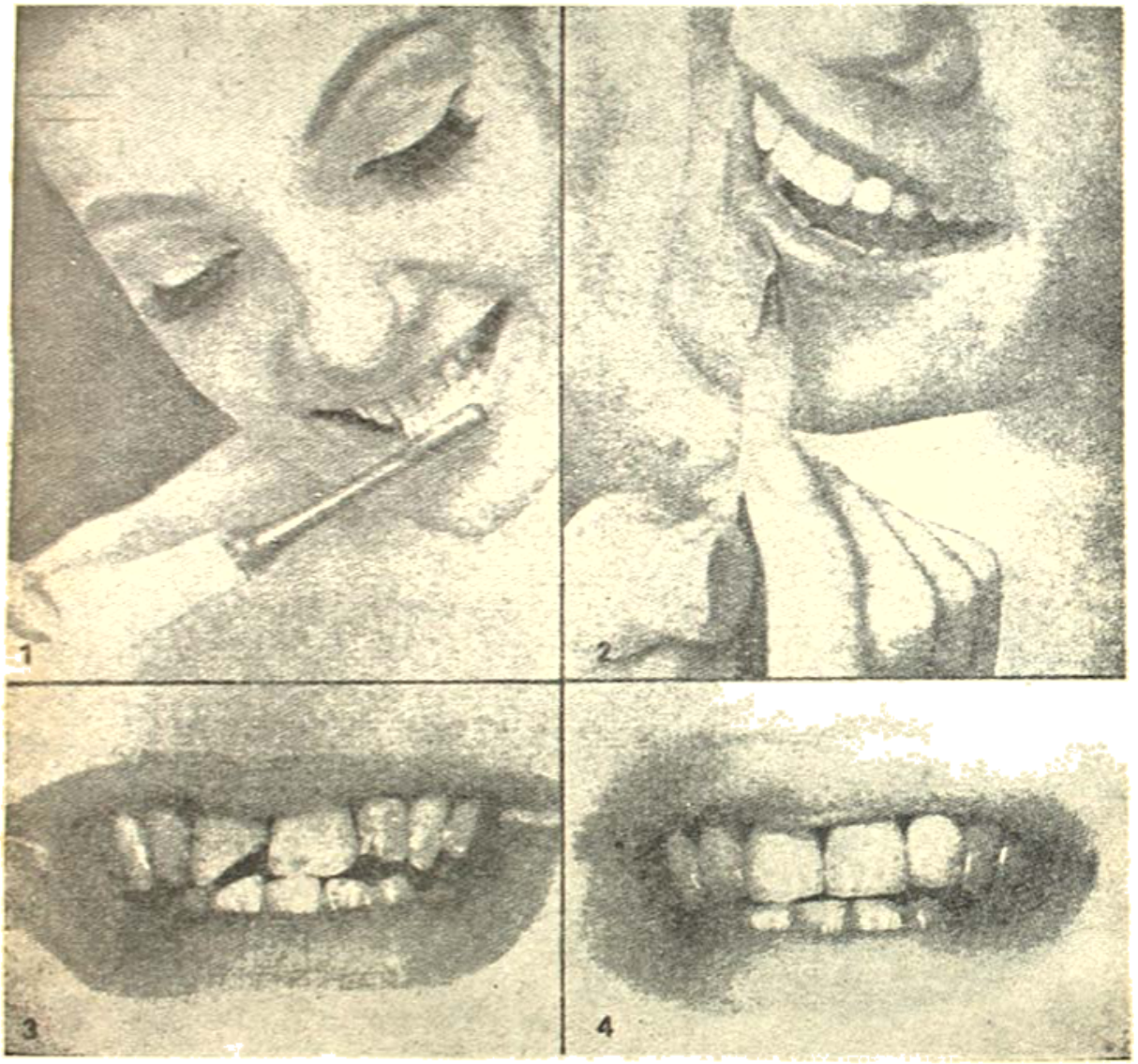
1
2
3
4

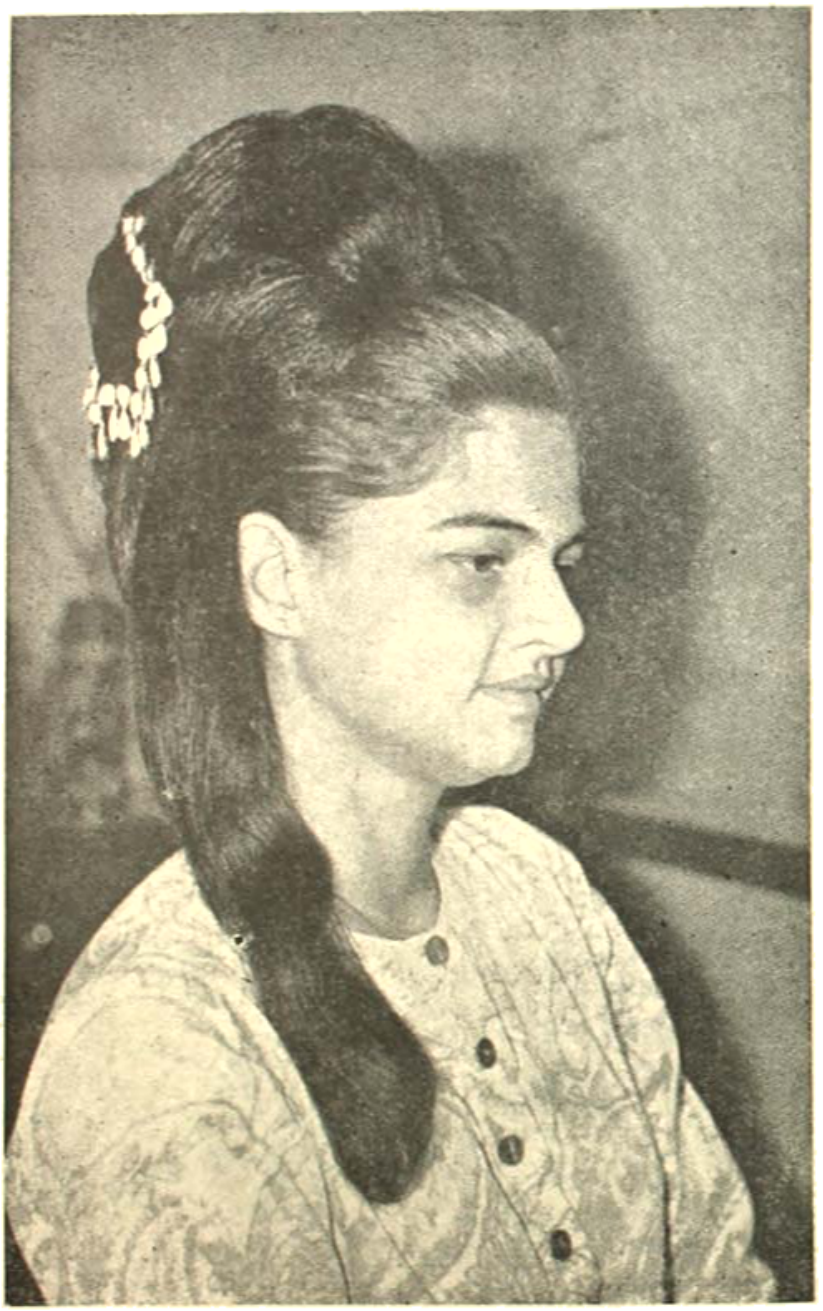

6
6
7
8

1

2

3

4

5

6

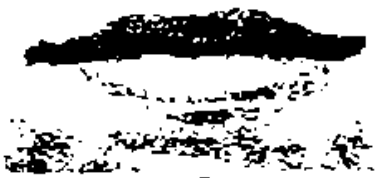

7

8

9

10

11

12

13

14

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য

নারীকে রূপলাবণ্যময়ী হতে হলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে হবে। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা ও সমতার উপরই নির্ভর করে নারীর আনন্দমুখর জীবন।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

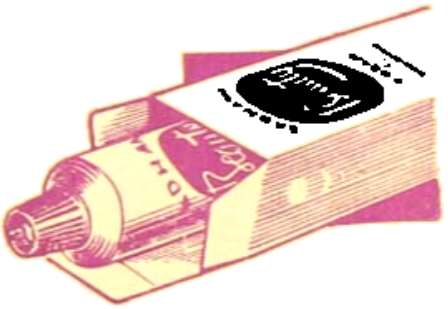

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

ত্বকপ্রসাধনে অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অবদান

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

প্রতিদিনই
লক্ষ্মী ঘি
সকলকে এই দেয়
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI

গল্প-ভারতী

চতুর্বিংশতি বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৭৫

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের
একান্ত প্রয়োজন লিলি ব্র্যান্ড বার্লি

নিয়মিত খেলে
শক্তি ও স্বাস্থ্য গঠনে
সাহায্য করে।

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

L-11/58

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি বলেই চাইবেন

লিলি বার্লি মিল্‌স্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

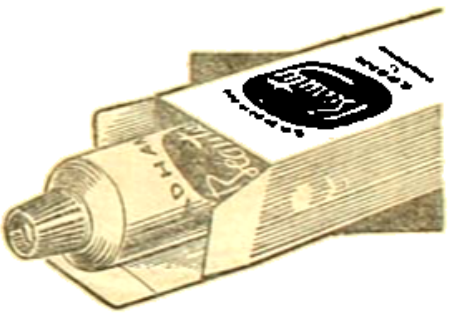

সাধনা বিউটি ক্রীম

রূপসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অস্ত্রাগার

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

EXPORT QUALITY
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা®
একসিকিউটিভ কালি
এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
পার্মানেন্ট ব্লু-ব্ল্যাক, নেভি ব্লু ও জেট ব্ল্যাক
ওয়াশেবল রয়েল ব্লু, এমারেল্ড গ্রীন ও স্কারলেট রেড
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
Sulekha
EXECUTIVE IN
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
Progressive/SW-34

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
কার্ত্তিক ১৩৭৫, NOVEMBER, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—৫ম সংখ্যা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বার্ষিক দশের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, দিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও সুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

আপনি পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে, আপনার আয় অনুযায়ী সীমিত পরিবার
গঠন করে সন্তানদের সুশিক্ষিত, কর্ম্মঠ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী
ক'রে গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজেও ভাবনা চিন্তা ও অভাব
অনটনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিবাহিত জীবনকে
সুখ ও শান্তিময় করতে পারেন।

এ' বিষয়ে স্থানীয়
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের
পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আপনাকে পছন্দমত
পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবে। যোগাযোগ করুন।
বিনা অর্থব্যয়েই সব রকম সাহায্য পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্টেট্ হেলথ্ এডুকেশন ব্যুরো কর্ত্তৃক প্রচারিত।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত রচনাবলী

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন (আশ্চর্য আত্মকাহিনী) ৩·০০
গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক-মহলে বিপুল ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ :

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ)

নব নব রূপে (সুখভোগ্য রম্য কাহিনী)

বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভারত্ন বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার কাহিনী) ৩·০০

আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ৩·০০

হে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য উপন্যাস) ২·৫০

তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (দুটি রহস্য উপন্যাস একত্রে) ২·০০

মহাজাল ও মরণাভিসার (,,) ২·০০

কালো করাল ছায়া (রহস্য উপন্যাস) ১·৫০

তিন সর্গ (পিরানদেল্লো, মলেয়ার, স্ট্রিন্‌ড্‌বার্গ) (নাটক) ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের **মায়াবসান** (নাটক) ২·৫০

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের **রাণাপ্রতাপ** (,,) ৩·০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

Glimpses of the Olden Times (,,) ১০·০০

: যন্ত্রস্থ :

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Echoes form Old Calcutta (সম্পাদনা)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres Limited

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৩৫৩
গুরুশিষ্য সংবাদ	—সদানন্দ	৩৫৬
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৫৯
অদ্ভুত (গল্প)	—সুকুমার রায়	৩৬৯
আপদ বিদায় (গল্প)	—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭৯
যখন মিলন (গল্প)	—রঞ্জত রায়চৌধুরী	৩৯২
বিন্ধ্যাচলী (গল্প)	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	৩২৯
এই প্রথম		
জীবন বিচিত্রা	—শ্রীমতী সুধা সেনগুপ্ত	

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা

হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত মহোপকারী ***নিম***-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি ***নিম*** টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া ***নিম*** টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। ***নিম*** টুথ পেস্ট-এর হিতকর কেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিম টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
বর্ষব প্রস্তুত

CNF-18-67

এই সংখ্যায়

●

বিহারের সংস্কৃতি ও শিল্প

[সচিত্র সংযোজন]

শিল্প ও সংস্কৃতির আদিভূমি বিহার —নীলকান্ত গুপ্ত

বিহারের পালপার্বণ —সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রঙ্গরসিকা দেবদাসী (মিথিলার লোকসাহিত্য)—বীরভদ্র

আমেরিকান রিপোর্টারের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ —অনিরুদ্ধ

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়সে যাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

ব্রেইভ • কোর্টেক্স • কেলনী • লাডলি • পাইওবাল্ব • ফ্লফ • ব্রেইট আই • 'স্পিডস্টার আই' • 'ব্রাইটেক্স' • সিল্কিন • সুপার মার্সিটেক্স • ইকোনোমিক • উইন-টেক্স' • 'পাইওটেক্স' ও এবংগা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাণ্ডএর পাওয়া যায়।

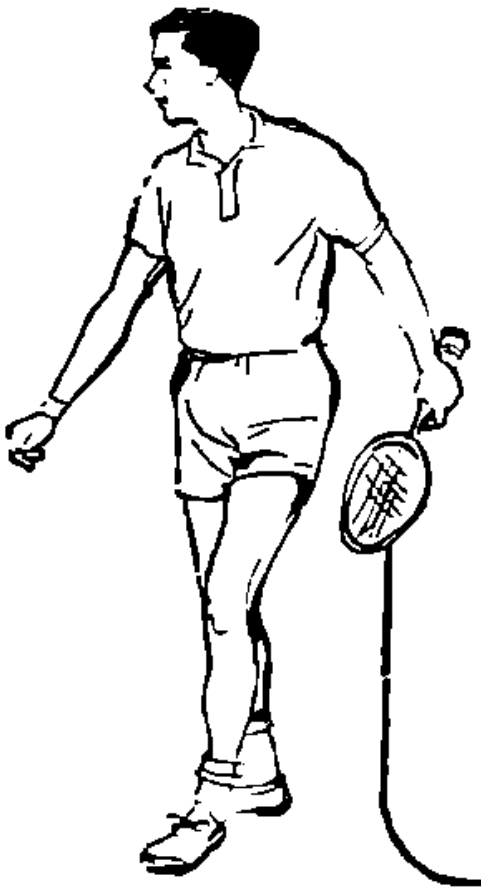

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেস সার্ট • ড্রয়ার ও ট্রাক প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২২৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

অজন্তার মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী) —সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

মেক্সিকো অলিম্পিক —জ্যোতির্ম্ময়

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে

চুমকি (গল্প) —সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নাটমঞ্চ —অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রোঙ্গীন পত্র

[দীপান্বিতা ও ভাইফোঁটা (সচিত্র সংযোজন)]

দীপান্বিতা —নীলিমা সেনগুপ্ত

শ্যামাপূজা মাহাত্ম্য —গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

জাতীয় উৎসব দীপান্বিতা —বেলা দে

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন কেশের অযথা ঝরাপড়া বন্ধ করে ও নূতন কেশোদ্গমে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

ছোটোদের জুতো দেখেশুনে কিনবেন
নতুবা পায়ের গঠনে
আজীবন খুঁত থেকে যেতে পারে

বাটা লিলিপুট ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি। কোমল আর নরম চামড়ায় এমন কৌশলে এর বডলা যা পায়ের গঠনের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, যাতে অবাধে পা বাড়তে পারে। এমন মোড়ালির ডাউটার যা সুষ্ঠোম চলনে সাহায্য করে। নমনীয় আর মজবুত এর জুতোর তলি, অবলীলায় পা-সঞ্চালনের সহনবে। আর তেমনি এর মোড়ালি, যা পায়ের পাশে হড়কায় না। বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ নকশায়, উপকরণে আর নির্মাণে, ছোটোদের আদর্শ জুতো বাটা লিলিপুট। বাহারে রঙে নানান স্টাইল এখন বাটার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আজই নিয়ে আসুন, আসবা কিট ব্যাগ নিই বাটা লিলিপুট, দেখুন কেমন খুশিতে ভরে ওঠে ছোটোদের পা।

বাদামী ৮.৫০

কালো ৮.৫০

ডাল ৮.৫০

Bata

লিলিপুট

ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি

এই সংখ্যায়

আলপনা ও লক্ষ্মীসরা — কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপূজা — শকুন্তলা

ভাইফোঁটার খাবার

ঋতুভেদে গৃহ প্রসাধন — শান্তা বসু

মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিচারণ) — নরেন্দ্র দেব

মেয়ে মজলিশ—

আমাদের সমস্যা — জয়শ্রী চক্রবর্তী

জনকল্যাণ কল্পে

বসন্ত রোগ উচ্ছেদ সপ্তাহ — ডাঃ কনক সর্বাধিকারী

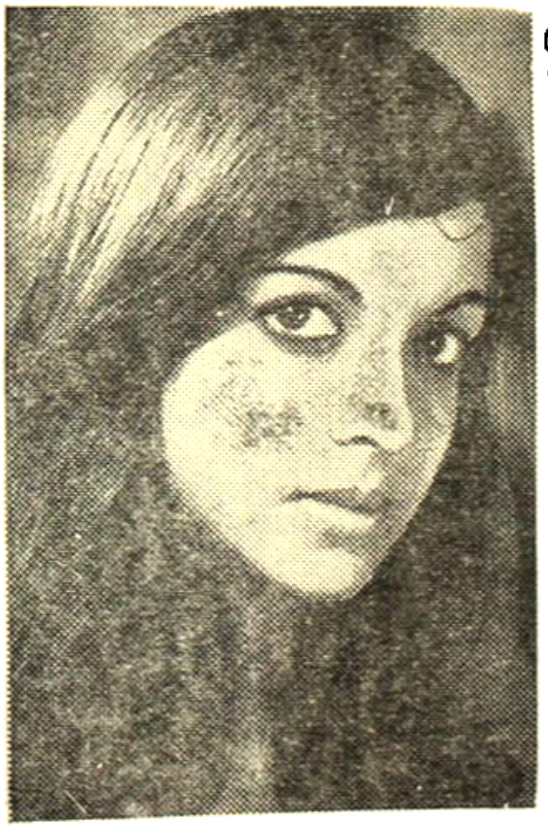

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায় কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

ডাবর

ডাবর কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড

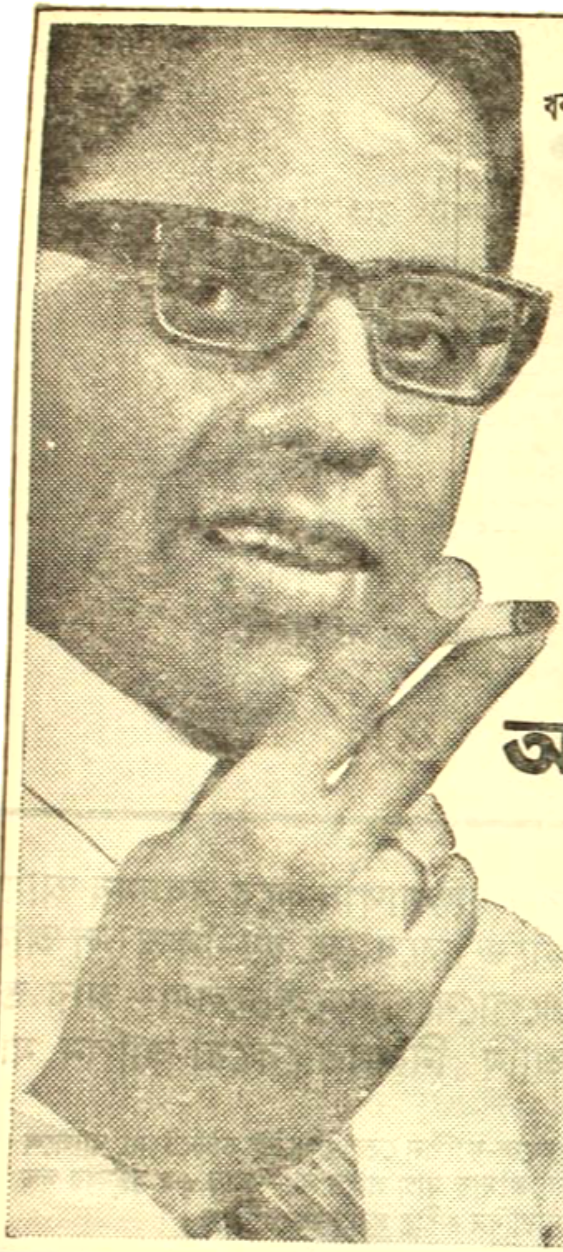

খবরের কাগজের একজন জায়মাণ রিপোর্টার বলছেন ঃ

'যখন যে-কাজই হোক,

আমার চাই ভরপুর তৃপ্তি

—আর তাই সিজার্স ছাড়া আমার একেবারেই চলে না'

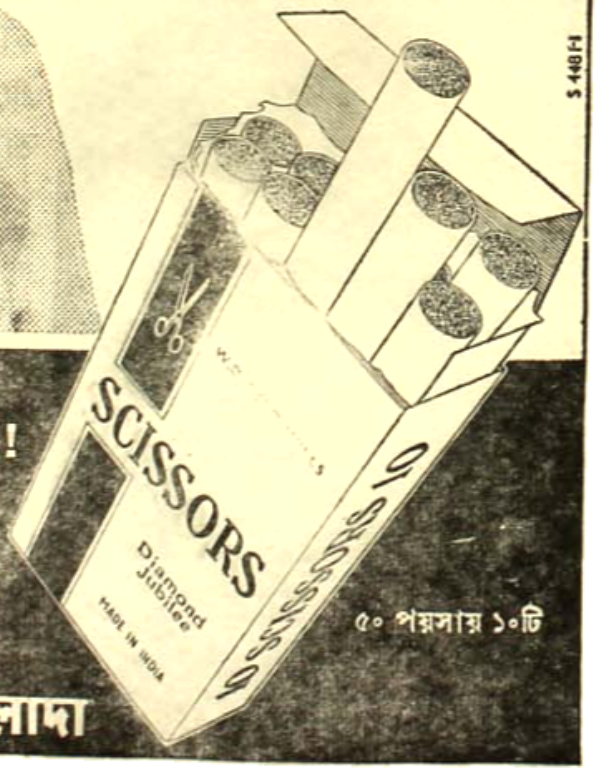

S 148 FH

খেটে খাই—
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!

সিজার্স

সবসময় তৃপ্তি দেয়—
এর স্বাদই আলাদা

৫০ পয়সায় ১০টি

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ
আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের
অমৃত জীবন-কাহিনী
লেখক জীবনী-সাহিত্য রচনায় প্রতিষ্ঠায়—কুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙালীকে মুগ্ধ করিবে
'জনক জননী'
বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটী নতুন যুগের রচনা
বাংলা ভাষার জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন
মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮০০
প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৩৪৫

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা
কোন্‌টী থেকে ভুগছেন ?
আমাদের
ভাস্কর লবণ
খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।
যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্
২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬

ফোন : ৪৪-৩২৯৪

- **আপনার লাইব্রেরীর জন্যে আজই সংগ্রহ করুন**
- **বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সংযোজন**
- **প্রাণরসপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ**

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে কয়েকজনের সমাবেশ।

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

একজন আর কয়েকজন

। দাম : চার টাকা।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে ভূমিকায় স্বর্গীয় ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—ব্যক্তি উপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহার্যে যাঁরা না এসেছেন, তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন—একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। মজলিশে, আলাপে, রসিকতায়, সজ্জনতায়, কৌতুক-পরিহাসে এমন একজন মানুষ আজ মিলবে না। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাই একটি যুগের অবসান। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রেখায় অনিলবাবু সেই অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। অনিলবাবু নিজে কবি ও কথক। কবি-মন নিয়ে তিনি মানুষ উপেন্দ্র নাথের অসংখ্য গল্প শুনিয়েছেন।

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

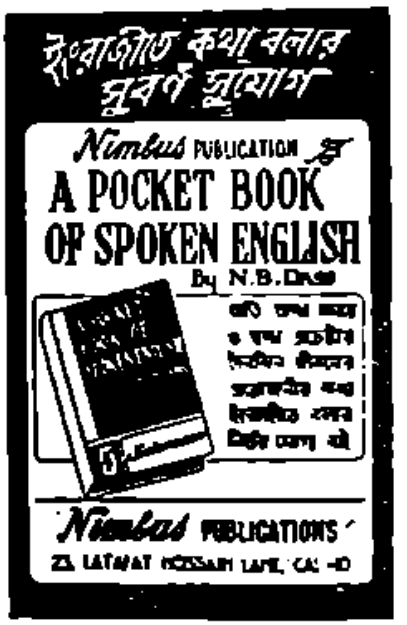

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। পুত্রসন্তান অমৃত তুল্য 'সাধনা অশোকারিষ্ট' তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ফিরে এনে তাঁকে আজ জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা ৪৮

অন্যান্য প্রোডাক্টস্ এবং...

এস. সাধনা ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

ঢাকা

কলিকাতা

Regd. No. C3643

গল্প-ভারতী

চতুর্বিংশতি বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

লিলির

বার্লি

বিস্কুট

পুষ্টিকর
ও সুপাচ্য

বিশেষ স্বাদ ও
গন্ধের জন্য
ছেলেমেয়েদের
অতি প্রিয়

লিলি বিস্কুট কোং. প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা-৩

"লিলি বিস্কুটই কিনবেন"

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকার তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

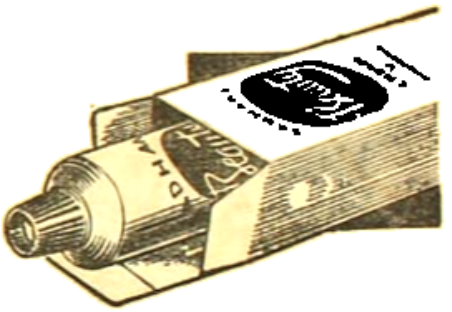

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

ত্বকের যত্নের অপরিহার্য
অতি আধুনিক অবদান

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা

হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত মহোপকারী **নিম**-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি **নিম** টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া **নিম** টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। **নিম** টুথ পেস্ট-এর হিতকর ফেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

CNF-19-B

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
দর্পণ প্রডাক্ট

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, DECEMBER, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী' ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

চিঠি শুধু চিঠি নয়—

অন্তরীক্ষে (কার্টুন)

বন্ধা কন্যা (উপন্যাস) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

—সঙ্কেশ বিক্রেতা—

সি মলা ন্ন

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশচন্দ্র দত্ত

হেড অফিস—৫৬/২ বি, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-১৮৫০

শাখা — ৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-১৮৯৯
২৮, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

প্রেষ্টিজ * বেবাশীষ * রেশমী * লাভলি * পাইওনীয়ার কুল * ব্রাইট আই * 'সিলভার আই' * 'ব্রাইটেক্স' * সিল্কফিল * সুপার মাসিটেক্স * ইন্টারলক * উইন-টেক্স' * 'পাইওটেক্স' ও জনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

* দেখতে সুন্দর
* আরামপ্রদ
* টেকসই

ট্রা সার্ট • টেনিস সার্ট • কেন সার্ট • ভেস্ট ও ব্রাফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধোত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২৯৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

●

[ফ্রোড় পত্র]

মেয়ের মজলিশ

আমাদের সমস্যা

পণপ্রথার আধুনিক রূপ	—গৌরী চক্রবর্তী (বন্দ্যোপাধ্যায়)
কু-সংস্কার না সু-অনুশাসন ?	—তৃপ্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতুপুজা	—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বড়ি একটি শিল্প	—বেলা দে

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় যেন এই বয়সে যাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন লিঃ

কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি উল্লেখযোগ্য বই

প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাগৈতিহাসিক বাংলার প্রথম মানব জীবন সম্পর্কিত

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া

রচনা—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মূল্য দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার

সম্পাদক—শ্রী প্রমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইতিহাস, জনসমাজ, কৃষি ও সেচ, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সমন্বিত

১৮টি আর্ট প্লেট ও ১১টি মানচিত্র

মূল্য পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—অধীক্ষক পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা ২৭

প. ব. (তথ্য ও জন সংযোগ)/২৩৫১৬/৬৮

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ

আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অমৃত জীবন-কাহিনী

লেখক—জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিবে।

'জনক জননী'

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটী নতুন যুগের রচনা···

বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ··

প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮০০

প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৩৫৫

এই সংখ্যায়

ট্রেড সাইকল (গল্প) —রবীন্দ্রনারায়ণ দে

আকাশ লিপি (গল্প) —সমর বসু

দূর পরবাসে (গল্প) —শক্তিপদ রাজগুরু

গল্প-ভারতীর পাতা থেকে

কলমে হরফে (গল্প) —মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিচারণ) —নরেন্দ্র দেব

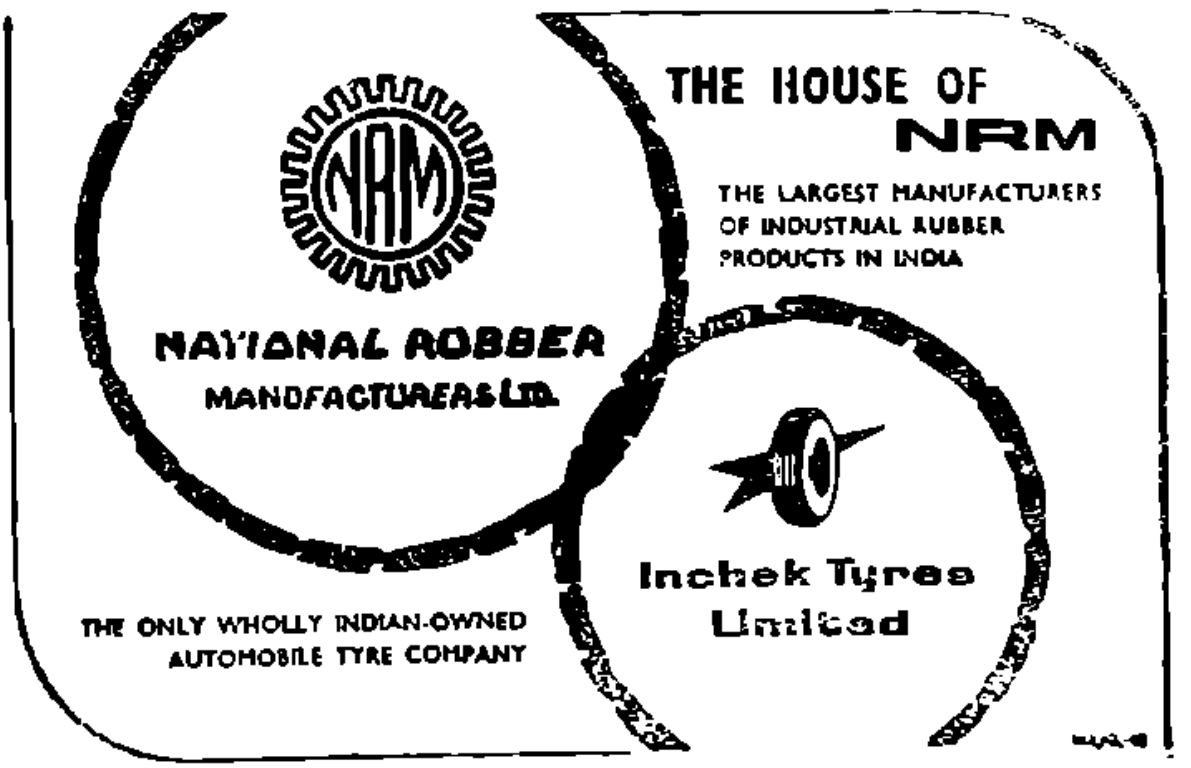

EXPORT QUALITY
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা®
একসিকিউটিভ কালি
এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
পার্মানেন্ট ব্লু-ব্লাক, নেভি ব্লু ও ডেড ব্লাক
ওয়াশেবল মরুন ব্লু, এমারেল্ড গ্রীন ও স্কারলেট রেড
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
EXECUTIVE IN
Progressive/SW-34

এই সংখ্যায়

এই প্রথম

হাসি —স্নেহেন্দু মাইতি

খেলাধুলা—

মেক্‌সিকো অলিম্পিকে ভারত —জ্যোতির্ময়

অঙ্গনা সংবাদ —দেবযানি

কলিকাতার লুকোচুরি —টেক্‌চাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র)

নাটমঞ্চ —অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কিনের চোখে কলকাতা —রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

খবরের কাগজের একজন ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টার বলছেন ঃ

'যখন যে-কাজই হোক,

আমার চাই ভরপুর তৃপ্তি

—আর তাই সিজার্স ছাড়া আমার একেবারেই চলে না'

S 440 H

খেটে খাই—
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!

সিজার্স

সবসময় তৃপ্তি দেয়—
এর স্বাদই আলাদা

৫০ পয়সায় ১০টি

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। স্ত্রীরোগে অমৃত তুল্য 'সাধনা অশোকারিষ্ট' ও তার অটুট স্বাস্থ্য সম্ভোগে তাঁকে আজ জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
এম এ, ডক্টরেটধারী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এফ. সি. এস. (আমেরিকা)।
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
এম বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

Regd. No. C3643

14 DEC 1968